বিক্রমপুর
রামপালের ইতিহাস



বিষ্ণু মূর্তি—রামপাল গ্রামে প্রাপ্ত

বিক্রমপুর রামপালের ইতিহাস

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত



মহামায়া—কাগজীপাড়া

সম্পাদনা/সংযোজন

কমল চৌধুরী

ভারবি

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২

প্রচ্ছদ ও রেখাঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : দীপঙ্কর ধর।
রাজেন্দ্র অফসেট। ১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন। কলকাতা-৯।

গ্রন্থপ্রসঙ্গে

'সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস' (লেখক ঃ স্বরূপচন্দ্র রায়) এবং ঢাকার ইতিহাস-২ খণ্ড (লেখক ঃ যতীন্দ্রমোহন রায় ও কেদারনাথ মজুমদার) প্রকাশিত হয় ২০০১ এবং ২০০২ সালে। এই বই প্রকাশের আগে বিক্রমপুর ও রামপালের বিবরণ সংগ্রহের কাজ শুরু হলেও, প্রকাশনার উদ্যোগকে পিছিয়ে দিতে হয়। কারণ, সে সময়ে হঠাৎই যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তর 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' কলকাতার একটি ভিন্ন সংস্থা প্রকাশ করে। তারপর এই বইটির পুনঃর্মুদ্রণ হয়েছে ঢাকা থেকে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত বইটির মুদ্রণ পারিপাট্য ও অঙ্গসজ্জা ঈর্ষণীয়।

আমাদের লক্ষ্য ছিল বিক্রমপুরের ইতিহাস সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে রামপালের তথ্য নির্ভর বিবরণ উদ্ধার। সেই কাজে আমরা নির্ভর করেছি প্রধানত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মূল্যবান গ্রন্থাগারের ওপর। বিক্রমপুরের প্রথম ইতিহাস লেখেন অম্বিকাচরণ ঘোষ। বইটি আকারে খুব ছোট হলেও, নির্ভরযোগ্য তথ্যপূর্ণ। ১২৭৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর বিক্রমপুরের ইতিহাস লেখেন যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ১৩১৬ সালে (১৯৩৯ খ্রিঃ) প্রকাশিত হয়। লুপ্ত ইতিহাসের অতুলনীয় বিবরণ সংগ্রহ করে যোগেন্দ্রনাথ এক অসাধারণ কাজ করেছিলেন সে সময়ে। বলা যায়, যোগেন্দ্রনাথ যদি ঐ সময়ে বিক্রমপুরের তথ্যসংগ্রহে তৎপর না হতেন, তাহলে পরবর্তীকালে অনেক কিছুই পুনরুদ্ধার সম্ভব হত না। বইটি অসংখ্য দামি আর্ট প্লেটে সমৃদ্ধ। যোগেন্দ্রনাথ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৩৪৬ সালে। আমরা সেই গ্রন্থের মাত্র পাঁচটি অধ্যায় ব্যবহার করেছি, প্রাসঙ্গিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে। এজন্য আমরা যোগেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী অধ্যাপক উত্তরা চক্রবর্তীর কাছে কৃতজ্ঞ।

যোগেন্দ্রনাথের জীবিতকালেই হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় বিক্রমপুরের বিবরণ সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। পরবর্তী কালে তাঁর সংগৃহীত বিবরণ প্রকাশিত হয় তিন খণ্ডে। বইটির নাম "বিক্রমপুর"। মোট প্রায় দু হাজার পাতার সুবৃহৎ গ্রন্থ। অসংখ্য আর্ট প্লেটে ও মানচিত্রে ভরা। তিন খণ্ডকে বলা যেতে পারে বাংলার ইতিহাসের অসাধারণ আকর গ্রন্থ। এমন বিস্ময়কর পরিশ্রমসাধ্য গবেষণাকর্ম চোখে পড়ে কম। প্রথম খণ্ডে আছে প্রাচীনকাল থেকে ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত ; দ্বিতীয় খণ্ডে মোঘল ও পাঠান শাসনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিক্রমপুরের ভূস্বামীগণের বংশের বিবরণ। এই খণ্ডে তাছাড়া বিক্রমপুরের কৃতীসন্তানদের পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে আছে উত্তর বিক্রমপুরের ২৫টি গ্রামের বিবরণ এবং বহু ব্যক্তিবিশেষের কথা। তিন খণ্ডের প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৩৩৮, ১৩৪৪ এবং ১৩৫০। বিক্রমপুর প্রতিভা কার্যালয় থেকে দয়াময় চট্টোপাধ্যায় তিন খণ্ড প্রকাশ করেছিলেন। লেখকের বিবরণ যথাযথ রেখে সংক্ষিপ্ত আকারে সামান্যমাত্র অংশ বর্তমান গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে। এই বৃহৎ গ্রন্থ ভবিষ্যতে প্রকাশিত না হলেও, কিছুটা অংশ রক্ষা পাবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থগারিক অরুণা চট্টোপাধ্যায় একদিন আমার হাতে এনে দিলেন "বিক্রমপুরের মেয়েলি ব্রতকথা"। ১৩৩২ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল হিরণবালা দেবীর সম্পাদনায়। ঢাকা পটুয়াটুলির বীণা প্রেস থেকে বইখানি ছেপেছিলেন শশীভূষণ ভট্টাচার্য। বাংলার মেয়েরা, বিশেষ করে বিক্রমপুরের মেয়েরা, একসময়ে যে সব ব্রত পালাপার্বন উদ্‌যাপন করতেন সেসব নিয়েই এই বই। লেখকদের মধ্যে কয়েকজন আছেন সেকালের কৃতি মানুষ। সমাজ জীবনের বিশেষ একটি পর্বে মহিলারা সংসারের এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গল কামনায় যে সমস্ত লৌকিক আচার পালন করতেন, বইটি থেকে তা জানা যায়।

বিক্রমপুর নিয়ে পত্র পত্রিকায় লেখালেখিও কম হয়নি। সেসব লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গেছে দীর্ঘকাল আগেই পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে সেরকম বেশ কিছু লেখা সংগ্রহ করে বর্তমান

গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে। এইসব আলোচনায় প্রাচীন জনপদটি সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারা যায়।

এখনকার ইতিহাসের পাতায় বিক্রমপুর-রামপালের ঐতিহ্যময় দিনের কথা মাত্র কয়েকটি শব্দে-বর্ণনায় মাত্র সীমাবদ্ধ। আমাদের পূর্বপুরুষদের উপেক্ষা ও উৎসাহহীনতায় সমৃদ্ধির বিবরণ সম্পূর্ণ মসীলিপ্ত। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে বাংলার প্রাচীন রাজধানীর পরিচয় একটি গ্রামনামে সীমায়িত হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের আগ্রহ এবং গবেষকের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখেই বর্তমান গ্রন্থটি সম্পাদনা করা হয়েছে।

বিক্রমপুর শিক্ষার বিকাশ ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য জনবসতি ছিল দেশভাগের আগেও। এক সময়ে সংস্কৃত ভাষা চর্চার অন্যতম পীঠস্থান হিসাবে বিক্রমপুরের খ্যাতি ছিল সারা দেশ জুড়ে। পরবর্তীকালে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে ব্যাপকভাবে। প্রতিটি পরিবারের কৃতি সন্তানেরা সারা ভারতের কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল। ক্রমশ তাদের সংযোগ কমে যেতে থাকে জন্মস্থানের সঙ্গে। ফলে ক্রমশ বিক্রমপুর উপেক্ষিত হয়ে পড়ে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব বিক্রমপুরের যুব সমাজকে উদ্দীপ্ত করেছিল ব্যাপকভাবে। স্থানীয় ভূস্বামীদের সহানুভূতি এবং উদ্যোগও ছিল জনকল্যাণমূলক। যা তৎকালীন বিদেশি শাসকদের আতংকের কারণ হয়ে উঠেছিল। যে কারণে বিক্রমপুর ব্যাপক পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়। সে সময়ে জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করেছিল বিক্রমপুরের বহু মানুষ। দেশ ভাগের আগেই বিক্রমপুরের ঐতিহ্য পুরোপুরি ম্লান হয়ে পড়ে।

একাধিক রচনায় একই বিষয় আছে, কিন্তু বিশ্লেষণের পদ্ধতি ভিন্ন এবং বিভিন্ন লেখকের আলোচনায় একই তাম্রশাসন বা শিলালিপির কথা বলা থাকলেও—বক্তব্যে স্বাতন্ত্র থাকায় সেগুলিকে যথাযথ রাখা হয়েছে। এগুলিকে কারো কারো পুনরুক্তি মনে হতে পারে। কিন্তু কোন একটিকে বাদ দিলে, সেই লেখকের রচনার অমর্যাদা করা হয়। সে কারণে, উভয় বিশ্লেষণকে গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে।

ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায় সম্পর্কে একালের বাঙালি সমাজে কিছুমাত্র আলোকপাত করতে পারলে, আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব। আরও বহু তথ্য আছে। বহু ব্যক্তির স্মৃতিতে আজও বেঁচে আছে বিক্রমপুর-রামপাল। মুদ্রিত বিবরণও আছে। ভবিষ্যতে সেগুলির সংগ্রহ ও প্রকাশের ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

সূচিপত্র

বিক্রমপুরের ইতিহাস

অম্বিকাচরণ ঘোষ

বিক্রমপুরের ইতিহাস

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিক্রমপুরের মেয়েলি ব্রতকথা
হিরণবালা দেবী

সংযোজন

বিক্রমপুর (সংক্ষিপ্ত)

হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়

AN ANCIENT AND MODERN HISTORY OF VICRAMPUR IN BENGALI

বিক্রমপুরের ইতিহাস

প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ

শ্রী অম্বিকাচরণ ঘোষ প্রণীত

ঢাকা সুলভ যন্ত্র

মূল্য দশ আনা

Printed and Published by
Ishan Chandur Seel

বিজ্ঞাপন

বিক্রমপুর বিস্তীর্ণ স্থান। ইহাতে বিবিধ সম্প্রদায়স্থ লোকই বাস করিতেছে। ইহার প্রাচীন সময়ের উন্নতির বিষয় চিন্তা করিলে এখন যারপরনাই ক্ষোভ উপস্থিত হয়। ফলতঃ বিক্রমপুরের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্থান অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কী পরিতাপের বিষয়? এতাদৃশ জনসঙ্কুল উন্নত বিক্রমপুরের একখানা ইতিহাস নাই। যদিও পলাশী প্রভৃতি সমর বিখ্যাত স্থানের ন্যায় বিক্রমপুরে কোন প্রসিদ্ধ যুদ্ধঘটনা সংঘটিত হইয়া না থাকুক—যদিও এখানে অন্যান্য স্থানের মত রাজাসন লইয়া নিরন্তর বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত না হউক, তথাপি ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না যে, বিক্রমপুর ঐতিহাসিক বিবরণ কিছুই নাই। এখানে অনেক লোক জন্মগ্রহণ করিয়া বহুবিধ কীর্তিকলাপ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে অন্যান্য স্থানীয় ইতিহাস যেমন সময় লইয়া লিখিত হইয়াছে, বিক্রমপুরের তদ্রূপ কোন সাময়িক ইতিহাস হইবার যো নাই। ইহাতে আধুনিক বিবরণ থাকাও আবশ্যক।

আমি এই সকল চিন্তা করিয়া, প্রায় তিন বর্ষ অতীত হইতে চলিল, বিক্রমপুরের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হই। ইহার পুরাকালের সমস্ত বৃত্তান্ত ও ইতিবৃত্ত পরিজ্ঞাত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমাবস্থায় যতদূর জানা আবশ্যক তাহা সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না। বিবরণের প্রায় সমস্ত ভাগই সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হয়। তখন ভরসা করিয়াছিলাম না যে, উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি আমার কতিপয় বন্ধু বান্ধবের প্রদত্ত উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া তাহা 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' নাম দিয়া প্রকাশিত করিতে সাহসী হইলাম। এখন ইহা সদাশয় দেশহিতৈষী মহোদয়দিগের প্রীতির নেত্রে পতিত হইলেই সমস্ত শ্রম ও যত্ন সফল বোধ করিব। পুস্তকে কোন বিষয়ের ত্রুটি দেখিতে পাইলে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক জানাইয়া বাধিত করিবেন।

অনন্তর কৃতজ্ঞতা সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ ঢাকা কলেজের অন্যতর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পুস্তক খানার ভাষা দেখিয়া দিয়াছেন। এবং মাননীয় শ্রীযুক্তবাবু শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বাবু চৈতন্যকৃষ্ণ বসাক, বাবু রামপ্রসাদ সেন, বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয়গণ পুস্তক মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে অর্থানুকূল্য করিয়াছেন। অতএব এই সকল মহাত্মার নিকট বাধ্য রহিলাম।

উপক্রমণিকা



প্রায় বিংশ শতাব্দী অতীত হইল উজ্জয়িনীর অধিপতি রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বঙ্গভূমিতে উপনীত হয়েন। কিয়দ্দিন পরে কার্যোপলক্ষে অনুচরবৃন্দ সমভিব্যাহারে এইস্থানে আগমন করেন। তাঁহার সেই শুভাগমন ও নামানুসারে এই স্থান বিক্রমপুর এই বিখ্যাত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এমত কিংবদন্তী যে নৃপকুঞ্জর বিক্রমাদিত্য বজ্রযোগিনী ও রামপাল এ দুয়ের অন্যতর স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বস্তুত একথা অপ্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় না। আজিও ওই সকল স্থানে সুরম্য হর্ম্যাবলীর অনেক ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। এখন উল্লিখিত ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ নিতান্ত বনাকীর্ণ মধ্যে মধ্যে বিরল বাস দৃষ্ট হয়। নৃপবর অত্যল্পকাল বাসের সঙ্গে সঙ্গেই এই বিক্রমপুরকে বিবিধ ভূষণে বিভূষিত করিয়া যান। তখন আধুনিক সমৃদ্ধিশালী নগরনিচয় তাহার নিকট নিতান্ত নিষ্প্রভ, শোভাশূন্য এবং বিষণ্ণ ভাবধারণ করিত। তৎকালে বিক্রমপুরের আয়তন যে নিরতিশয় অল্প ছিল, তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

প্রবাদ আছে যখন নৃপবল্লভ বিক্রমাদিত্য এখানে সমাগত হন, তখন এ স্থান নদীগর্ভস্থ পুলিনবৎ ছিল। বৃক্ষ গুল্মাদির প্রচার নিতান্ত বিরল ছিল। পরে ক্রমোন্নতি সহকারে ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সম্পূর্ণতা ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইয়াছে। একদা এই বিক্রমপুর বঙ্গভূমির রাজধানী ছিল। তখন রাজশ্রী বৈদ্যকুলের অঙ্কশায়িণী ছিলেন। প্রকৃতি সুন্দরী যে, নিতান্ত শান্তিদায়িনী ও একান্ত শুভকরী হইয়াছিলেন, এতদ্দ্বারা তাহার বেশ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। প্রকৃতিবৃন্দ তখন অনল্প সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিত, সন্দেহ নাই। এমনকি, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে এই বিক্রমপুরই একমাত্র সৌভাগ্য ও সম্পদের আস্পদ ছিল। সুশাসন রাজ্যধুরন্ধর এখানেই বাস করিতেন। তখন ইহা কী আশ্চর্য মহীয়সী শ্রীই ধারণ করিয়াছিল! কিন্তু দুরন্ত কৃতান্ত নিষাদের কী তীক্ষ্ণ শর! কি ভয়ঙ্করী মূর্তি ; এখন বিক্রমপুরের আর সেদিন নাই, তাহার আর সেই বিক্রম নাই সমস্ত মহত্ব ও সৌন্দর্য এককালে প্রস্থান পর হইয়াছে—রাজপদরজঃ এখন ইনি কর প্রসারণ করিয়াও প্রাপ্ত হইতেছেন না। রাজলক্ষ্মী ইহার প্রতি যেন চিরকালের নিমিত্ত অপ্রসন্না হইয়াছেন। কাল! তোমার দর্শন, কী সুতীক্ষ্ণ! হস্ত কী কঠোর! তুমি বিক্রমপুরকে এককালে জর্জরিত করিয়াছ ; ইহার যত বড় বড় কার্যক্ষম সন্তান প্রিয় পুত্র ছিল, তোমার হৃদয় কী নির্মম! কী কঠিন! তুমি তাহাদের সমুদায়কে চর্বিকৃত ও উদরস্থ করিয়াছ। আর কি ইহার উন্নতির প্রত্যাশা আছে? যে ভূষণে বিভূষিত হইয়া এই বিক্রমপুর নিখিল ভারতের একমাত্র গৌরব ভাগিনী ছিল,—অপর সমুদায় স্থান ও নগরী যাহার নিকট নিস্তেজ দীপশিখার ন্যায় নিষ্প্রভ লক্ষিত হইত, আজি সেই বিক্রমপুরকে তুমি একেবারে ভিখারিনী ও শ্রীহীন করিয়াছ, তাহার রাজছত্র কোনস্থানেই স্থাপন করিয়াছ। আর কি কখন বিক্রমপুরের হৃত বিক্রম প্রত্যাবর্তন করিবে? আর কি ইহার মৃত প্রিয় সন্তানগণ অনাথা জননীর দায় দারিদ্র বিমোচনার্থ পুনর্জীবিত হইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবে? অথবা এইরূপ আশা করা শুদ্ধ দুঃখ ও বিড়ম্বনার কারণ।

সীমা ঃ

বিক্রমপুরের উত্তর সীমা ধলেশ্বরী ও ইছামতী স্রোতস্বতী ; পূর্ব সীমা মেঘনা নদীর দক্ষিণ

সীমা ইদিলপুর ; পশ্চিমসীমা ফরিদপুর ও ভরবাজুস্থিত কতিপয় গ্রাম। বিক্রমপুর বিস্তৃতায়ত উপ-প্রদেশ (পরগনা)। ইহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তারের বিভিন্নতা অতিশয় অল্প হইবে।

ভূমির আকৃতি ঃ

বিক্রমপুর সমতল ভূমি নহে। অনেক স্থান অতিশয় উচ্চ। এমন কি তৎসমুদায় বর্ষা মুখ দেখিতে পায় না বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। রামপাল, বজ্রযোগিনী, ইছাপুর প্রভৃতি পল্লী নিচয় ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পক্ষান্তরে তদিতর সমস্ত স্থান নিরতিশয় নিম্ন ভূমি বলিয়া বর্ষার জলে এককালে প্লাবিত হইয়া যায়।

জলবায়ু ঃ

সত্য বটে, বিক্রমপুরের প্রায় স্থানের জলবায়ুই উৎকৃষ্ট ও স্বাস্থ্যজনক। কিন্তু আবার এমন অনেক স্থানও দৃষ্ট হয় যে তথায় ক্রমাগত কতিপয় দিবস অবস্থান করিলে মাতঙ্গ কল্প সুস্থকায় বীরপুরুষকেও পীড়াগ্রস্ত এবং দিন দিন ক্ষীণ দেহ ও হত বীর্য হইয়া একেবারে শ্রীহীন হইতে হয়। আইরল, মলধা, ধীপুর, রাইতভোগ, যশোলঙ্গ, কাঠাদিয়া, কেয়ার, নয়না, কামারখাড়া প্রভৃতি গ্রামসমূহ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। এই নিমিত্তই উল্লিখিত স্থানগুলি অত্যন্ত বিরল বসতি হইয়া রহিয়াছে। তাদৃশ অল্প জলাকীর্ণ স্থানেও বিকট মূর্তি পীড়া দেবীর মন্দ প্রভাব লক্ষিত হয় না। এমন গৃহ অতি অল্প যাহাতে দুই একজন রুগ্ন, এবং শয্যাগত ও শান্তি সুখ বঞ্চিত দৃষ্ট না হয়। অনেকে বলেন গুবাক, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষোদগত বায়ুই এতাদৃশ অস্বাস্থ্যের কারণ ; পার্শ্ববর্তী সহকার, পারিজাত, মন্দার প্রভৃতি পাদপ নিচয়ের পল্লবজাত নিপতিত হইয়া পুষ্করিণী জল নিতান্ত দুর্গন্ধময় সুতরাং অব্যবহার্য ও রোগমূলক করিয়া তুলে। অস্পর্শনীয় সত্ত্বেও অনন্যোপায় হইয়া সন্নিহিত গ্রামবাসিদিগকে তাহা গ্রহণ করিতে হয়।

উত্তুঙ্গ বিস্তীর্ণ শাখা তরু শ্রেণী ভেদ করিয়া সূর্যরশ্মির প্রবেশাভাব ও নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন বনাকীর্ণতা স্বাস্থ্যনাশের অন্যতর কারণ, সন্দেহ নাই। বিক্রমপুরের তৃতীয়াংশ তারা, ইকর ; এবং কাশ প্রভৃতি বনরাজিতে একেবারে সমাচ্ছন্ন। পল্লীবৃন্দ অরণ্যময় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সকল স্থানে রৌদ্রের মুখ অতি অল্প লোকের গৃহ প্রাঙ্গণেই দেখিতে পাওয়া যায়। অত্রত্য পুষ্করিণীরাজির জল যে নিতান্ত বিকৃত ও বিবিধ রোগ নিদান, তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং তৎসমুদায়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ু উল্লিখিত বনোদ্‌গীরিত বায়ু যোগে যে একান্ত অবিশুদ্ধ ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিবে, তাহাতে বিচিত্রতা ও বিস্ময়ের বিষয় কি? মহানুভব অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট লায়েল মহোদয় নিরতিশয় নির্বন্ধ সহকারে বন পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্য বৃদ্ধির নিমিত্ত অনেক যত্ন প্রকাশ করেন। বোধ হয় অল্পকাল পরেই স্থানান্তর গমন নিবন্ধন তাঁহাকে কার্য সম্পাদনে বিরত থাকিতে হয় যাহা হউক এখন বলা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, যাহাতে শান্তিনাশক এই সমুদায় অন্তরায়ের এককালে নিরসন হয়, গবর্নমেন্টের মুখাপেক্ষী না হইয়া তৎপ্রতি নিজের উৎসাহ ও প্রয়াস বিধান স্থানীয়বৃন্দের একান্ত কর্তব্য। অন্যথা অচিরে উল্লিখিত স্থানগুলি "বিজন গ্রাম" বলিয়া পরিগণিত ও সাধারণের যারপরনাই খেদের কারণ হইবে, তাহার অনুমাত্র সংশয় নাই।

এখানকার জলবায়ু ঋতু বিশেষে পরিবর্তনশীল বলিয়া অনুমিত হয়। বিক্রমপুর বর্ষাপ্রধান স্থান। এইকালে খাল, বিল, সরসী, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়সমূহ জলে পরিপূর্ণ হইয়া বিক্রমপুরকে শিলাচ্ছাদিত শৈলের ন্যায় ধবলিত করিয়া থাকে। তখন অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূমি বাসীদিগের আর ক্লেশের পরিসীমা থাকে না। অনেকের অন্তঃপুর, চত্বরে এমন কি, গৃহের মেঝেয় পর্যন্ত জল উঠিয়া মহান কষ্ট উৎপাদন করিয়া দেয়। গৃহস্থগণ তখন বংশ কাষ্ঠাদি বিনির্মিত মঞ্চোপরি বাস করিতে বাধ্য হয়। এই রূপ ক্লেশ ও অসুবিধা তাহাদিগকে ক্রমাগত প্রায় দুইমাস কাল সহ্য করিতে হয়। উহার পর বর্ষাকাল আরও ২/৩ মাস কাল অবস্থান

করে। অতি বর্ষা নিবন্ধন ধান্যাদি শস্যরাজি নষ্ট হওয়াতে অত্রত্য প্রাণীমণ্ডলী, বিশেষতঃ কৃষিবলদগণ, সময়ে সময়ে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে এই সময়ে নৌকা ব্যতিরেকে বিক্রমপুরবাসিদিগের গমনাগমনের আর সাধ্য থাকে না। এখানে 'আরলবিল' নামক একটি প্রসিদ্ধ বিল আছে। তাহার দক্ষিণ প্রান্তে মাইজপাড়া, কোলাপাড়া, উত্তরে শ্রীধরখোলা, বারইখালি এবং শেকেরনগর ; পশ্চিমে নারিশা গ্রাম, পূর্ব প্রান্তে দয়হাটা, হাসাড়া, গাদিঘাট, প্রাণীমণ্ডল প্রভৃতি পল্লী গ্রাম। পূর্ব পশ্চিমে দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ মাইল (৬ ক্রোশ) এবং উত্তর দক্ষিণে প্রস্থ প্রায় ৭ মাইল (৩।। সাড়ে তিন ক্রোশ) হইবে। অতি প্রাচীনকালে সমগ্র বিক্রমপুর এই বিলের গর্ভস্থ ছিল। এখন অনেক স্থান গ্রাম রূপে পরিণত হইলেও আরলবিল বিক্রমপুরের, প্রায় তৃতীয়াংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই বিলে বর্ষাকালে কুম্ভীরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে, এবং ঝড় উত্থিত হইয়া বিলের জল এরূপ তরঙ্গায়িত করিয়া তুলে যে, পোতস্থিত জনগণের জীবনে জলাঞ্জলি দিতে হয়। বাস্তবিক বিলটি তখন নিতান্ত ভীমদর্শন হইয়া থাকে। বিক্রমপুরে বর্ষার বাদল প্রভাব লক্ষিত হয়, গ্রীষ্ম ঋতুরও তদপেক্ষা বড় ন্যূনতা দেখা যায় না।

গ্রীষ্মকালে নদ নদীর খাল, বিল, সরোবর প্রভৃতি জলাশয়শ্রেণী সূর্যালোকে প্রায় এককালে শুষ্ক হইয়া যায়। তখন লোকবৃন্দে জলাভাবজনিত কষ্টের আর ইয়ত্তা থাকে না। সময়ে উত্তপ্ত ধূলিরাশি বায়ু সহকারে সমুত্থিত ও সমান্দোলিত হইয়া পান্থদিগের নিতান্ত ক্লেশদায়িনী হইয়া উঠে। জলাধারই তখন সকলের প্রিয় হয়। এই কালে বিক্রমপুরের অধিকাংশ স্থলে প্রবল বর্ষা অজস্র উত্থিত হইয়া খড় নির্মিত গৃহবাসিদিগকে যার পর নাই ব্যাকুলিত ও সশঙ্ক করিয়া তুলে। এমন কি, ঝড় উঠিয়া সময়ে সময়ে সুনিহিত মূল পাদপ পর্যন্ত সমূলে উৎপাটিত করিয়া দেয়। এতদ্ব্যতিরেকে এখানে বৃষ্টি হইয়া মনুষ্যাদি প্রাণীপুঞ্জের প্রাণ বিনাশও করিয়া থাকে। নীল, আশুধান্য প্রভৃতি শস্যরাজি ঈদৃশ উৎপাতের ভীষণ হস্ত এড়াইতে পারে না। এখানে হেমন্ত ঋতুর তাদৃশ চিহ্ন লক্ষিত হয় না ; তখন কেবল আমন ধান্যের কর্তন হয়। শীতেরও মন্দ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় না। তৎকালে সর্বত্র প্রাতঃকালে প্রায় প্রহরৈক পর্যন্ত কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন থাকে।

উদ্ভিজ্জ ও শস্য ঃ

ধলেশ্বরী, ইছামতী, মেঘনা, পদ্মা প্রভৃতি তরিঙ্গণীমালা প্রতিনিয়ত বিক্রমপুরের শস্যোৎপাদিনী শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। দেবরাজও ভূমির উর্বরতা সাধন বিষয়ে অল্প অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তন্নিবন্ধন এখানে প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ শস্যজাত সমুৎপন্ন হইয়া অধিবাসী বিশেষত কৃষিজীবিদিগের হৃদয়ে নিরতিশয় সুখ ও আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকে। আশুধান্য অত্রত্য সাধারণ লোকের প্রধান উপজীবিকা। আশুবর্ষ আশুধান্যের অন্যতর পুষ্টিসাধক। এতদ্ব্যতীত হৈমন্তিক ধান্য (আমন ধান্য, হেমন্তকালে ইহার কর্তন হয় বলিয়া 'হৈমন্তিক' বলে) সর্ষপ, দ্বিদল কুসুম্ভ, যব, তিল, কলাই, পাট, ছেটে, কার্পাস, কালিজিরা, ধনিয়া, তামাক, গুবাক (সুপারি), মেথি শণ, চিনাই, কায়ন প্রভৃতি জন্মিয়া সকলের মহান উপকার সাধন করে।

বিক্রমপুর হইতে বর্ষে বর্ষে ধান্য, কুসুম্ভ প্রভৃতি শস্য নিচয় দেশান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। কিন্তু এতন্মধ্যে শেষোক্ত বস্তুই বিদেশীয়গণ সমধিক আদর সহকারে গ্রহণ করিয়া থাকে। দূর দেশ হইতে প্রধানত তুলা এখানে আনীত হয়। এস্থানে আম্র, কাঁঠাল, নারিকেল, খর্জুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল এবং ফুট, ক্ষিরাই, শশা ও নানা জাতীয় সুমিষ্ট কদলী প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিল তৈল, সর্ষ তৈল ও ফুলে তৈল অধিক পরিমাণে মিলে। রামপালের কলা সর্বত্র পরিশ্রুত ও বিখ্যাত। আতা, পেয়ারা, কুল, কাউ, লিটকা, বৃক্ষালু, শাকালু, দাড়িম্ব ও তরমুজ প্রভৃতির এককালে অসদ্ভাব নাই। পূর্বাঞ্চলে বেতকা, বজ্রযোগিনী, পাইকপাড়া, কসবা প্রভৃতি

স্থানে ইক্ষু, অদ্র (আদা), হরিদ্রা অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়। বজ্রযোগিনী, রাজাবাড়ি, সেরেজাবাদ, তালতলা ও তৎসন্নিহিত স্থান সমূহে সামান্যত ইক্ষুরসে গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাকে 'আকিগুড়' বলে। ইক্ষুরস গ্রহণ বিষয়ে মন্দ নৈপুণ্য প্রকাশিত হয় না। খাজুরি গুড়ও এখানে দুষ্প্রাপ্য নহে।

এ স্থানে অরণ্য তরুর মধ্যে জারুল, উড়ি আম, জাম, সপ্ততাল (সাধারণ ভাষায় ইহাকে সায়তান বলিয়া থাকে), পয়াই প্রভৃতি প্রধান। উড়ি আম এবং সামান্যত পয়াই কাষ্ঠে প্রাচ্য বিক্রমপুরবাসিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী নির্মাণ করিয়া বর্ষাকালে গমনাগমনের অনল্প সৌকর্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

অধিবাসী ও ধর্ম ঃ

বিক্রমপুরের আয়তন ও আকারানুসারে বসতি সংখ্যা অনেক অধিক। এই স্থানে অন্যূন দেড় লক্ষ লোক বাস করিতেছে। তন্মধ্যে হিন্দুদিগের সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত অধিক। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টান এই ত্রিবিধ ধর্মাবলম্বী লোকেরই বাস লক্ষিত হয়। ক্রমে তাহাদিগের অবশ্যজ্ঞেয় পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে।

হিন্দু ঃ

হিন্দুরা বিক্রমপুরের আদিম অধিবাসী সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন সময়ে তাহারা এই ভুস্থানে আগমন করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এই হিন্দু জাতির মধ্যে বৈদ্য ও শুদ্র মণ্ডলী ব্রাহ্মণ জাতি হইতে অধিকতর। দ্বিজ নিচয়ের অধিকাংশ যাজন ব্যবসায়ী। কায়স্থাদি ও শুদ্রবৃন্দ বেশ চাকুরিপ্রিয় (বিষয়লোভী)। স্বাধীন ব্যবসায়কে ইহারা যেন নিতান্ত অপবিত্র মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং উন্নতি প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই হইতেছে না, বলিলে এককালে অসঙ্গত হয় না।

হিন্দুরা মর্যাদা, বিদ্যা, বুদ্ধি ও চতুরতায় অন্যান্য স্থানবাসীদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। সুবিখ্যাত বল্লাল ভূপতি ইহাদিগের মধ্যে (কি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কি শুদ্র সকলের মধ্যে) যাঁহাদিগকে আচারাদি নবগুণ বিশিষ্ট[১] বলিয়া জানিতেন, তিনি তাদাদিগকে "কুলীন" এই উপাধি প্রদান করিয়া সাধারণে খ্যাত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! অর্বাচীণ হিন্দুগণ তদবধি কৌলিন্য প্রথাকে বংশ মর্যাদার প্রধান চিহ্ন মনে করিয়া তদ্বারা ক্ষণ ভঙ্গুর অর্থোপার্জনে নিরত রহিয়াছেন। তন্নিবন্ধন কুলীনগণ অথগৃধ্নু বলিয়া জনসমাজে পরিচিত।

বিক্রমপুরে ব্রাহ্মণদিগের যেমন চারি মেল (সমাজ) আছে, কায়স্থমণ্ডলীর মধ্যেও সেইরূপ সাড়ে তিন মেল দৃষ্ট হয়। যথা, মালখানগরের বসুবংশ ; পাওলদিয়ার ঘোষ বংশ ; রাইসবরের মুস্তফী (গুহবংশ) এবং কাঠালিয়ার দত্ত। শেষোক্তেরা অর্ধ কুলীন বলিয়া সর্বত্র পরিগণিত[২]। এই সার্ধত্রি গৃহের সহিত পরিণয়াদি ক্রিয়ানুষ্ঠান সাধারণের সাধ্যায়ত্ত ও সম্ভাবিত নহে। যিনি ইহাদিগের উদর পূর্ণ করিয়া একবার একটি ক্রিয়া করিতে পারিলেন, তিনিই একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী লোক বলিয়া আপামর সকলের সম্মানভাজন হইলেন। কিন্তু কি ঘৃণার বিষয়! ইহাদিগের (কুলীনবৃন্দের) প্রণয় স্থাপন বোধ হয় কেবল অর্থের জন্য। সম্প্রতি এই কৌলীন্য প্রথা অনেকের উপজীবিকা হইয়া মহাকলঙ্ককরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতন্নিবন্ধন ব্রাহ্মণেরা যে বিষময় ও অহিতকর ফল উৎপাদন করিতেছেন, তাহা স্মরণ ও দর্শন করিলে হৃদয়ে যুগপৎ শোক ও ঘৃণার উদ্রেক হয়। অনুচিত কুলাভিমানী উত্তমাঙ্গজাত কোন কোন মহাপুরুষ ধনলোভে বিমোহিত হইয়া শত শত কুলবালার পাণিগ্রহণ করিয়া অচিরকাল পরে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্বক পরিণয়ান্তর অনুসন্ধান করিতেছেন। পরে জীবনান্তেও উহাদিগের তত্ত্ব লওয়া ঘটিয়া উঠে না।

কৌলীন্য প্রথার প্রাধান্য মনে করিয়া কুল ভয়ে অনেকানেক ব্রাহ্মণ পঞ্চবর্ষীয়া বালিকাকে চিরকালের নিমিত্ত স্খলিত দন্ত পলিত কেশ লোলতাঙ্গ অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধের হস্তে সমর্পণ

করিতেছেন। এক বৃদ্ধের মৃত্যুতে শত শত কুলকামিনী—অবলাবালা এককালে বৈধব্যদশায় নিপতিতা হইতেছে। সুতরাং নানাবিধ ব্যভিচার দোষে যে তাহারা দেশকে উৎসন্ন করিয়া ফেলিবে বিচিত্র কি? ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে "ঘটক" নামে এক সম্প্রদায় আছে। ইহারা শুকের মত পরের তোষামোদে বিলক্ষণ পাটব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে ইহাদিগকে বিবাহাদির ক্রিয়াকালীন কিছু পূজা দিতে পারে, ইহারা তাহাকে চৌদ্দপুরুষসহ স্বর্গগামী করিয়া তুলেন। পরের গুণোৎকীর্তন ঘটকদিগের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন। ইহারা কুলীনদিগের বংশাবলী গ্রন্থাকারে লিখিয়া রাখেন।

সাধারণত বিক্রমপুরীয়গণ পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান। কিন্তু ভীরু ও সাহসহীন। পূর্বকালে অত্রত্য হিন্দুদিগের ধর্মবিষয়ে (পৌত্তলিকতায়) প্রগাঢ় বিশ্বাস ও একাগ্রতা ছিল। তখন কেহ অন্য কোন ধর্মের আলাপ করিলে তাহাকে নানা প্রকার অবমাননা সহ্য করিতে হইত। এমনকি তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়াও বিচিত্রতা ও বিস্ময়ের বিষয় ছিল না। কিন্তু বলিতে কি, অধুনা তাহাদিগের তাদৃশী আস্থা ও তাদৃশ অনুরাগ নাই। মধ্যে মধ্যে দুই একজন গোড়া হিন্দু বলিয়া প্রতীয়মান হন সত্য, কিন্তু প্রায়ই মুখপাত মাত্র দৃষ্ট হয়। প্রাচীনেরা ইষ্টদেবদত্তমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে স্নান আহ্নিক না করিয়া আহার করেন না। ইহারা ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ইষ্টমন্ত্র কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন না। যদিও ইহাদিগের মধ্যে তাদৃশী কুপ্রথা লক্ষিত হয়, যদিও ইহারা পূজাকালীন মুখের এক পার্শ্ব দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ এবং অপরের দ্বারা বৈষয়িক আলাপ করিয়া থাকেন ও তন্নিবন্ধন তাহাদিগকে বিশেষ একাগ্রতা সম্পন্ন দেখা না যাউক, তথাপি ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে, ইহাদিগের পূজার কাল নির্ধারিত আছে। ইহা তাহাদের পক্ষে মন্দ শ্লাঘার বিষয় নহে।

যদি অন্য বহুবিধ প্রয়োজনীয় কার্যও নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলেও তাঁহাদের আহ্নিক বিষয়ে ও সায়াহ্ন বেলায় গোঁসাইর নাম গ্রহণে ভ্রম হয় না। অধুনা সনাতন ব্রাহ্মধর্মে অনেক যুবকের বিশ্বাস ও প্রীতি লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মানুরাগী নব্য কৃতবিদ্যগণ প্রাচীনদিগকে ব্যাঘ্রবৎ অনুচিত ভয় করেন বলিয়া তাদৃশ কার্যানুষ্ঠান তৎপর দৃষ্ট হন না। নব্যদিগের ধর্মার্থ ত্যাগ স্বীকাররূপ তরবারি পৌত্তলিকদিগের প্রতি ভয়রূপ মরীচায় এককালে কলঙ্কিত ও নিস্তেজ হইয়া উঠিতেছে। যদিও মধ্যে মধ্যে দুই এক মহাত্মা সেই কলঙ্কশ্লিষ্ট-অস্ত্র শাণিত ও পরিষ্কৃত করিবার জন্য কথঞ্চিৎ যত্নশাণু অবলম্বন করেন ; কিন্তু অর্বাচীন কুসংস্কারাবিষ্ট প্রাচীনদিগের প্রদর্শিত সমাজচ্যুতির আশঙ্কারূপ পিচ্ছিলতা নিবন্ধন সেই তরবারে হস্তকর্তনরূপ তিরস্কার ও নিন্দাভাজন হইয়া শঙ্কিত হৃদয় কোমলমতি সুশিক্ষিত বৃন্দ প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন। সুতরাং তাহারা ঈদৃশী ধর্মভীরুতাবশত প্রকৃত ধর্মশৈলের কার্য সোপানারোহণ হইতে যে বহু দূরবর্তী রহিয়াছেন, তাহার সংশয় কি? অপর দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, কোন কোন অপরিপক্ক মতি তরল চিত্ত যুবক এই ধর্মের জন্য এমনই ত্যাগ স্বীকার ও বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, কতিপয় দিবস পাঠ করিলেই বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য ও পুস্তকালোচনা ত্যাগ করিয়া বসেন। এতন্নিবন্ধন তাহাদিগের উন্নতি যে অতি অল্পই হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন।

প্রাচীন সম্প্রদায়ান্তর্গত দ্বিজগ্রামের মধ্যে কোন কোন মহাত্মা এ প্রকার গোঁড়া যে, তাহারা চর্ম পাদুকা ও সিলাই বস্ত্র (অঙ্গরাখা প্রভৃতি) ব্যবহারে নিতান্ত অপবিত্রতা ও ঘৃণা বোধ করিয়া থাকেন। বচন-সর্বস্ব সংস্কৃত ব্যবসায়ী টোলের পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীর লোক। ইহারা আসাম বাসিদিগের ন্যায় পেন্টুলন পরিধান এবং তাঁহাদিগকে প্রণাম না করাকে ধর্মচ্যুতির (খ্রিস্টান হওয়ার) লক্ষণ মনে করেন। কেবল মনে করিয়া নিরস্ত হন এমন নহে, প্রকাশ্যত বলিয়াও থাকেন।

কুল-সর্বস্ব দ্বিজবৃন্দ যেমন শত শত বালার পাণিপীড়ন করিয়া স্ব স্ব অর্থগৃধ্নুতার পরিচয় প্রদান করেন, সেই প্রকার অত্রত্য শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ প্রায় এককালেই বিবাহজনিত কর্তব্যতা

পরিপালনে অসমর্থ হন। তাহাদের অনেকে আজীবন আইবড় ভাবেই লক্ষিত হয়, তাহাকে, বলিতে গেলে, এক বিবাহের নিমিত্ত যথাসর্বস্ব পণ করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। কেবল কন্যাবিক্রয় প্রথার প্রচলনই ঈদৃশ মহানঅর্থের মূলীভূত কারণ।

বিক্রমপুরে হরি, কালী, শিব, দুর্গা, বসুমতী, মনসাগুরু ও বাসুদেব প্রভৃতি নানা দেবদেবীর মন্দির ও সাধক আছে। রাজানগরের হরি[৩] কোমরপুর বা ভাওয়ালের কালী ও দুর্গা (অর্ধ কালী ও অর্ধ দুর্গা)[৪] অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। হেরেমনেশ্বরের কালীও[৫] ন্যূন খ্যাতাপন্ন নহে। প্রাচীন হিন্দুগণ অধিকাংশ কবিরাজ প্রদত্ত ঔষধাদি দ্বারা রোগোন্মুক্ত হইতে না পারিলে হরিঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এবং "হরিভক্ত" নাম ধারণপূর্বক বৈষ্ণব মহাত্মাদিগের ন্যায় ললাটদেশে, নাসিকাগ্রে, স্কন্ধ দেশে ও বক্ষস্থলে গঙ্গামৃত্তিকার ফোটা ও তিলকাদি দ্বারা সুরঞ্জিত হন। ঠাকুরের আদেশানুসারে তিন বেলা স্নান করিয়া থাকেন। হরিভক্তি পরায়ণ হিন্দুগণ সন্ধ্যার সময় মন্দির সমীপে মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সহকারে হরি কীর্তন করেন। ইহারা হরিকে যে সকলে উপহার প্রদান করেন, তৎসমুদয় ঠাকুরের উদর পোষনার্থে প্রদত্ত হয় বলিলে লেখনী অত্যুক্তি দোষস্পৃষ্টা হইবে না। দেখিলাম এক ব্যক্তি জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়া হরিঠাকুরের আজ্ঞানুসারে তিন বেলা স্নান যাহা ইচ্ছা (দধি, দুগ্ধ, অম্ল ইত্যাদি) ভক্ষণ করিয়া পরদিনেই শমন ভবনে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। আত্মীয়বৃন্দ আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপ দুর্ঘটনা প্রায়ই দর্শন ও শ্রবণ গোচর হইয়া দর্শক ও শ্রোতৃবর্গকে ব্যাকুলিত করিতেছে! তবে ধন্বন্তরির ঔষধ প্রয়োগের পর আমাদের "কবিরাজ খুড়োর" হাত পাইয়া কদাচিৎ দুই চারি ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করেন। অনেক ভদ্রলোকের মধ্যেও ঈদৃশী হরিভক্তি পরায়ণতা সংলক্ষিত হয়। এই জন্য উক্ত দেব-দেবীর সম্মুখে অনবরত শত শত অজচ্ছেদ হইতেছে।

মুসলমান জাতি ঃ

মুসলমান জাতি হিন্দু জাতির চতুর্থাংশ হইবে। কৃষিকার্য সাধনই ইহাদিগের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় সত্য বটে, ইহাদের মধ্যে পারসি ভাষাজ্ঞ দুই একজন মুন্সি মানুষ দৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রায় সকলেই বিদ্যা শিক্ষায় এককালে বীতস্পৃহ ও অনুরাগী। ধান্য কর্তন, বীজ বপন, গোচারণ ও হাল চালনা প্রভৃতি সাধারণ কার্যে নিপুণ হইলেই ইহারা স্ব স্ব পুত্রদিগকে নিতান্ত কৃত ও গুণশালী বলিয়া মনে করে কৃষিকার্যের উন্নতি বিধায়িনী বিদ্যাশিক্ষা এককালে অনাবশ্যক, এই তাহাদিগের চিরবোধ। যদিও বাণিজ্য বৃত্তি ইহাদের প্রিয় ব্যবসায় হউক, শিক্ষাভাবে তাহাতেও ইহাদিগকে তাদৃশ উন্নতিশীল ও ধন সম্পন্ন বলিয়া অনুমিত হয় না। কিসে ভূমির উর্বরতা সাধন করে, তাহা তাহারা স্বপ্নেও জানে না, এ রূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এতদাবস্থায় তাহারা যে অভিলাষিত বিষয় লাভে পূর্ণকাম ও বিতথ যত্ন হইবে তাহার, বিচিত্রতা কি?

অধিকাংশ মুসলমান যারপর নাই হীনাবস্থা। তাহাদের আচরণ নিতান্ত জঘন্য। বোধ হয় তদ্দর্শনে অপবিত্রা হইবেন ভাবিয়াই যেন বিদ্যাদেবী ইহাদিগের প্রতি নিরনুগ্রাহিণী। অপর, ইহারা নাগরিক মুসলমানদিগের ন্যায় তাদৃশ ধর্মানুরাগীও দৃষ্ট হয় না। কার্তিকপুরের মুন্সিগণ এবং অপর কতিপয় প্রধান পরিবার যে উৎকৃষ্টতর অবস্থাপূর্ণ তাহা আবশ্য স্বীকার্য। ঢাকা নবাবীয় স্থান। নগরটির সূত্রপাত হইতেই অনেক মীর মোঘল মহা সমৃদ্ধি ও উন্নতি সহকারে তথায় বসতি করিয়াছেন। বিক্রমপুর তাহার অনতিদূরে অবস্থিত সত্ত্বেও কেন যে তত্রত্য (বিক্রমপুরস্থ) মহম্মদীয় সমাজ নগরের দৃষ্টান্তে উন্ননিত হইতেছে না, নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় বলিতে হইবে সন্দেহ নাই। স্বোদর পরিবার প্রতিপালন মাত্রই ইহাদিগের কর্তব্যকর্ম বলিয়া অনুমিত হয়। দুই তিন বেলা "নমাজ পাঠ" ইহাদের সাধারণ সম্বল। কেহ কেহ ত্রিশ রোজায় কথঞ্চিৎ আয়াস স্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু চিহ্ন কি নিদর্শন স্বরূপ বিশ্বের কোন মসজিদ নির্মিত নাই।

খ্রিস্টিয় জাতি ঃ

বিক্রমপুরের খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী লোকেরও অসদ্ভাব নাই। অত্রত্য পোর্তুগিজ সম্প্রদায় উদাহরণস্থলে উল্লেখনীয়। প্রায় শত বর্ষ অতীত হইতে চলিল, উহাদিগের (পোর্তুগিজদিগের) আদি পুরুষগণ বাংলার নবাব মহানুভব সায়স্তা খাঁ কর্তৃক মুন্সিগঞ্জের উত্তরাংশে সম্মানীত হয়। তদবধি সেই স্থান "ফিরিঙ্গিবাজার" বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে। উহা ঢাকা নগরী হইতে ছয় ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এস্থলে উল্লেখ করা অপ্রাঙ্গিক নয় যে, সেই সময় উক্ত নবাব ঐ স্থানের নিকট একটি বিশল দুর্গ নির্মাণ করান। উহার ভগ্নাবশেষ আজিও পূর্বকালীন গৌরবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সম্প্রতি পোর্তুগিজবৃন্দ নানাস্থানবাসী হইয়াছে। মোহনগঞ্জের উত্তর পূর্বে শিকারপুর নামক স্থানেও অনেক ফিরিঙ্গি বাস করে। ইহাদিগকে এখন আর পাশ্চাত্য জাতি বলিয়া অনুমান করা যায় না। দেশীয়দিগের ন্যায় উহাদেরও কৃষিকার্য উপজীবিকা ; সন্তোষের বিষয় এই যে, ইহারা ধর্মকে এককালে বিস্মৃত হইয়া যায় নাই। ইহাদিগের ধর্মনুরাগিতা ও দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় স্বরূপ কয়েকটা গির্জা (উপাসনা মন্দির) সংস্থাপিত আছে। প্রতিদিন প্রাতঃ ও সায়ংকালে তাহাদের পাদ্রি (উপদেশক) কর্তৃক স্ত্রী পুরুষ উভয়বিধ জাতিই উপদিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু শিক্ষা বিষয়ে ফিরিঙ্গিরা তাদৃশ উন্নতমনা বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

খ্রিস্টধর্মাবলম্বিগণ এখানে আসিয়া এদেশীয়দিগকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত ও তন্মতানুগত করিবার জন্য অনল্প প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু তাদৃশ সফল যত্ন ও সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারেন নাই। তাহাদের দলবল নিতান্ত হীন ও দীনদশাপন্ন ছিল। সম্ভ্রান্ত লোক অতি অল্পই দৃষ্ট হইত। সত্য বটে অনেকদিন হইল কনকসার নিবাসী সূর্যকুমার চক্রবর্তী মহাশয় খ্রিস্টধর্মে সুদীক্ষিত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে সাহস সহকারে বলিতে পারি, সূর্যকুমারবাবু খ্রিস্টানদিগের নীচ প্রলোভনে বিমোহিত হইয়া তদ্ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। তিনি স্বেচ্ছানুসারে তাহা অবলম্বন করিয়াছেন। সম্প্রতি অল্পকাল গত হইল কয়কীর্তন নিবাসী জগন্নাথ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র ও মালখানগরের কুলীন বংশ সম্ভূত, পূর্ণচন্দ্র বসু নামক এক অল্প বয়স্ক যুবক খ্রিস্টীয় ধর্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন।

অত্রত্য পোর্তুগিজদিগের আচার ব্যবহার প্রায়ই মুসলমানদিগের ন্যায় জঘন্যভাব ধারণ করিয়াছে। তাহাদিগের বিবাহ পদ্ধতি ও জাতীয় রীতিকে এককালে অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু দেশিয় মুসলমানদিগের সহিত তাহাদিগের কোন প্রক্রিয়া হইতে দেখা যায় নাই।

বাণিজ্য ও শিল্প ঃ

যদি বিক্রমপুরবাসী সমস্ত জাতিই দেশের কল্যাণকর বাণিজ্যকার্যেরত ও মনোযোগবান লক্ষিত হইত। এখনকার মত যদি তাহারা পরের দাসত্বের নিমিত্ত এতাদৃশী ব্যাকুলতা প্রকাশ না করিত, চাকুরি প্রিয়তার মোহিনী মায়ায়ই যদি তাহারা বিমোহিত না হইত, তাহা হইলে কি আজি সোনার বিক্রমপুরের এইরূপ অনুন্নত হীনদশা অবলোকন করিয়া, আমাদিগকে ব্যথিতহৃদয় হইতে হইত? আর তাহা হইলে কি ইহার ঈদৃশ নীরস ভাব সঞ্জাত হইত? কখনই নহে। বিক্রমপুরের সৌভাগ্য সূর্য চিরসমুদিত থাকিয়া অধিবাসীবৃন্দকে সুখরূপ কিরণ জাল নিয়ত প্রদান করিত। কিন্তু হায়! কি ইতর, কি ভদ্র সকলেই ভৃত্যভাবে ধনার্জনে লালায়িত। পরাধীনতায় কাহারও অবমাননা বোধ নাই। স্বাধীনতা বিচ্যুত হইয়া পারতন্ত্রাবলম্বন যেন তাহাদের প্রিয় ও প্রার্থনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

মুসলমান জাতিকেই এখানে বাণিজ্য কার্যে কিছু বিশেষ অভিনিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিবিধ মঙ্গলকরী বিদ্যা শিক্ষাভাব-নিবন্ধন তাদাদিগকে সমধিক উন্নত দৃষ্ট হয় না, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ধান্যানয়ন ও তদ্বিক্রয়েই তাহাদিগকে প্রধানত নিরত বলিয়া

লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতিরেকে বন্দর ও হট্টাদিতে তৈল, গুড়, চিনি ও নানাবিধ ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র প্রভৃতি উল্লিখিত বাণিজ্য বস্তুর সৌলভ্যার্থে মুন্সিগঞ্জে[৩] শ্রীনগর, হলিদা, মীরকাদিম, ধান্যকুরিয়া, লৌহজং প্রভৃতি স্থানে বন্দর আছে। বন্দর ব্যতীত স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হট্ট ও সাময়িক মেলা বিক্রমপুরে অনেক দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে তালতলা ও খলিপাশার হাট প্রধান।

বিক্রমপুর হইতে ঘৃত, ক্ষীর, বাংলা কাগজ এবং সামান্যরূপ পরিধেয় বস্ত্র অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হইয়া তত্তদ্‌বাসীদিগের প্রয়োজন সাধন করিতেছে। হলিদা, বাহিরঘাটা প্রভৃতি স্থানে দূরদেশ হইতে সমানীতে মুরঙ্গী সুন্দরী কাষ্ঠ অধিক পরিমাণে বিক্রিত হইয়া থাকে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিক্রমপুর শিল্প দ্রব্যজাতের নিমিত্ত অতিশয় প্রতিপন্ন হইয়া আসিতেছে। এখানকার কর্মকার, স্বর্ণকার এবং তন্তবায়গণ বিলক্ষণ পটুতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া জনসাধারণ্যে প্রশংসার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্তুবায়ের সংখ্যা এখানে অপেক্ষাকৃত অল্প সন্দেহ নাই। বস্তুত সকলেই স্বীকার করিবেন যে অত্রত্য স্বর্ণকার নির্মিত দ্রব্য রাশি দ্বারাই ঢাকা নগরী বিশেষ খ্যাতিশালিনী। ঝায়টিয়ার বাউ, সামসিদ্ধি ও ষোলঘরের কর্ণাভরণ, কাণ এবং শেষোক্ত স্থানের ডানির (চাদরের) উৎকৃষ্টতা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এখানে চুণকার ও কাগজ নির্মাতার সংখ্যাও ন্যূন নহে। তাম্র, পিতল, টিন, লৌহময় বস্তু ও অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অল্প প্রশংসনীয় নয়। বিক্রমপুরে কাষ্ঠ-নির্মিত পদার্থ জাতেরও অনেক আদর লক্ষিত হয়।

রাজানগর, সেরাজাবাজ ও ইছাপাশা প্রভৃতি স্থানে নীলের কুঠি আছে। এই সকল কুঠিতে মন্দ নীল জন্মে না। কিন্তু তাদৃশ প্রচুররূপে না হইলেও স্থানান্তরবর্তী লোকদিগের যথোচিত উপকার সম্পাদন করিয়া থাকে।

রাজ্যশাসন ও বিচারালয় ঃ

সুশাসন ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট প্রকৃতিপুঞ্জের শাসন জন্য বিক্রমপুরের নানা স্থানে অত্যাবশ্যকীয় বিচার মন্দির সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু নিতান্ত ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয় এই যে, কর্মচারীবৃন্দের কর্তব্যকর্মে শিথিলতা নিবন্ধই হউক, স্থানে স্থানে অনেক শান্তিভঙ্গ ও নানা বিষয়িনী বিশৃঙ্খলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানে শ্রীনগর, রাজাবাড়ি এবং মুলপদ্মগঞ্জ এই কয় স্থানে পুলিশ স্টেশন স্থাপিত আছে। এক এক স্টেশনে একজন সাব ইন্সপেক্টর (অধস্তন তত্ত্বাবধায়ক), দুই একজন হেডকনেস্টবল ও কতিপয় কনেস্টবল থাকিয়া থাকিয়া দেশের শান্তিরক্ষণ কার্যে ব্রতী রহিয়াছেন। স্টেশন ব্যতিরেকে সাবডিবিসন (উপবিভাগ) মুন্সিগঞ্জে একটা ম্যাজিস্ট্রেটী অফিস (শান্তিরক্ষণালয়) সংস্থাপিত আছে। ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে দশ আইন ও রেজিস্টারির ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। উপপ্রদেশে ফৌজদারি সংক্রান্ত যতবিধ বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয় এই স্থানে (মুন্সিগঞ্জে) তৎসমুদায়ের প্রথম বিচার সম্পন্ন হইয়া থাকে। পরে ঢাকা তাহাদের অপিল হয়।

১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে মুন্সিগঞ্জে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটি অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। জন ফ্রেঞ্চ নামক একজন ইউরোপিয় প্রথম এই পদে অভিষিক্ত হইয়া আগমন করেন। অধুনা প্রায় পঁচিশ বৎসর অতীত হইল এই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটি অফিসের সৃষ্টি হইয়াছে। এযাবৎ কাল মধ্যে মৃত মীর আবদুল মজিদ, বাবু দীনবন্ধু মৌলিক, সিবিলিয়ান মেঃ এল, ক্রে এবং ডি আর, লায়েল প্রভৃতি মহাত্মগণ ক্রমান্বয়ে প্রোক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের আসনে সমাসীন হইয়া সাধারণ্যে উপকার করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য মহোদয় এই শান্তি রক্ষণ কার্যে নিয়োজিত আছেন।

এদিকে দেওয়ানি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির নিমিত্ত বহর নামক স্থানে মুনসেফী বিচারালয় ও ছোট আদালত স্থাপিত আছে। পূর্বে পোড়াগাছা নামক স্থানে মুনসেফী মহকুমা ছিল। বাবু

গোবিন্দচন্দ্র বসু তথাকার মুনসেফ ছিলেন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ১৪ মার্চ উক্ত বিচারালয় পোড়াগাছা হইতে ঢাকায় উঠিয়া আসে। গোবিন্দ বাবু তখন এই পদে থাকিয়াই এডিশনল (অতিরিক্ত) মুনসেফ নাম প্রাপ্ত হন। ইনি বিচারকার্যে মন্দ পটু ছিলেন না। অনন্তর ঢাকার এডিশনল মুনসেফী পদ রহিত হইয়া মফঃস্বলে পুনরায় মুনসেফী পদ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হয়। এই সময় বাবু নিত্যানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় এডিশনল মুনসেফ ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে এই মহাত্মাই বহরে মুনসেফ হইয়া আইসেন। ইহাই বহরে মুন্সেফী পদের প্রথম সৃষ্টি। নিত্যানন্দবাবুর পর হাসমতুল্লা নামক একজন মুসলমান এই পদ প্রাপ্ত হন। ইনি অল্পকাল হইল মাদারিপুরে পরিবর্তিত হইলে বাবু হরচন্দ্র দাস মুনসেফ হন। ইনি এখনও এই পদে আসীন আছেন। ইহার কার্যদক্ষতা মন্দ নয়।

১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে বহরে ছোট আদালত সংস্থাপিত হইয়াছে। ঢাকার ছোট আদালতের জজের প্রতি উক্ত ছোট আদালতের কার্যভার সমর্পিত আছে। বাবু অভয়কুমার দত্ত মহোদয় এখন জজের আসনোপবিষ্ট আছেন। জজের অধীনে প্রধানত একজন হেড ক্লার্ক ও একজন নাজির কাজ করেন।

পদ্মানদীর উত্তর পার্শ্ববর্তী লৌহজং ও কেদারপুর নামক দুই স্থানে দুইটি আউট পোষ্ট (ফাড়ি) ছিল। কিন্তু ২য় বর্ষ হইল কনস্টাবুলারি পুলিশের সৃষ্টি অবধি কনেস্টবল শান্তিবিধান করিতেছেন। লৌহজঙ্গে এখন একটি আবকারী আফিস সংস্থাপিত আছে। কিন্তু তত্রত্য এককালে উঠিয়া গিয়াছে।

বার্তাবহালয় (পোষ্টাফিস) ও সাধারণ সরণি ঃ

সত্য বটে, অধুনা বিক্রমপুরের স্থানে স্থানে ডাকগৃহ সংস্থাপিত হইতেছে ; দেশিয় লোকের পত্রপত্রিকাদি প্রাপ্তি ও প্রেরণ বিষয়িণী সুবিধা সম্পাদন জন্য গবর্নমেন্ট কর্তৃক অনেকগুলি উপায় অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রকৃতিপুঞ্জ ও তদ্বারা বিলক্ষণ সুখভোগ করিতেছে। কিন্তু বলিতে গেলে, উহা আজিও পর্যাপ্ত পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে না। কর্মসম্পাদকবৃন্দের অমনোযোগিতা ও অনুচিত ঔদাস্য নিবন্ধন উহাদিগের (পোষ্টাফিস সমুহের) কার্যকলাপ সুন্দররূপ নিষ্পন্ন হইয়া উঠিতেছে না। সুতরাং স্থানীয়দিগের অসুবিধা এককালে নিরাকৃত হইতে পারে নাই। এখানে শ্রীনগর, বহর, জৈনসর, রাজাবাড়ি, মুলপদ্মগঞ্জ, কাঁচাদিয়া এবং সোনারঙ্গ এই কয় স্থানে পোষ্টাফিস আছে।

কোন কোন স্থান পঙ্কিল ও জলময়—কোন কোন স্থান বিবিধ জঙ্গলাকীর্ণ থাকা নিবন্ধন লোকবৃন্দের নিয়ত গমনাগমনের অনেক অন্তরায় উপস্থিত হইয়া থাকে। নৃপকুঞ্জর বল্লাল এবং রাজবল্লভ প্রভৃতি মহাত্মনিচয় কতিপয় প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ বর্ত্ম নির্মাণ করান সত্য, কিন্তু তৎসমস্ত এখন কালের করাল হস্তে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে বলিলে এককালৈ অসঙ্গত হয় না। মধ্যে মধ্যে ইহাদিগের কথঞ্চিৎ ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বহর হইতে তালতলা পর্যন্ত একটি অনতি অল্প পরিসর খাল আছে। উহাতে বৎসরের মধ্যে প্রায় ছয় মাস পোতাদি জলযানের গমনাগমন লক্ষিত হয়। অনেকের বিশ্বাস যে রাজবল্লভের অন্যতর পুত্র রামদাস যখন ঢাকায় নবাবের সহকারী ছিলেন, তখন এক দিবস তিনি (রামদাস) সন্ধ্যার সময় অনুচরদিগকে জানাইলেন যে, এমন একটি তরণীবর্ত্ম নির্মাণ করাইতে হইবে যে তাহা দ্বারা কালি প্রত্যুষ সময়ে যাত্রা করিয়া, সায়ংকালে গৃহে উপস্থিত হইতে পারা যায়। তদনুসারে অনুচরবৃন্দের যত্নে এক রজনীর মধ্যেই ঐ খাল প্রস্তুত হয়। ঐ খাল দৈর্ঘে ৯/১০ মাইল হইবে। উহাকে লোকে সচরাচর "সুবচনীর" খাল বলিয়া থাকে। খালের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া মৃন্ময় এক উচ্চ পথ আছে। সত্য বটে সম্প্রতি প্রজাহিতৈষী গবর্নমেন্ট বহুল অর্থ ব্যয়ে শ্রীনগর হইতে তালতলা পর্যন্ত এক সরণি প্রস্তুত করাইতেছেন।

কিন্তু কার্যকারকবৃন্দের গুণে আশানুরূপ ফল লাভ নিতান্ত অসম্ভব। প্রায় তিন বর্ষ অতীত হইয়া গেল আজিও উহাকে সর্বাঙ্গসুন্দর দৃষ্ট হইতেছে না। এখন বর্ষাকালে উহার নিরতিশয় জঘন্য অবস্থা সঞ্জাত হইয়া থাকে। যাহা হউক যদিও এই পথ নির্মাণে আপাতত কাহার কাহার অপকার দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু পরিণামে অনেকের ইষ্ট লাভ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। বর্ত্ম নির্মাণ কার্য এখনও শেষ হয় নাই।

ভাষা ও বিদ্যালয় ঃ

বিক্রমপুরের ভাষা বিষয়িনী উন্নতি মন্দ দেখা যাইতেছে না। এখানে সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাঙ্গালা ভাষা বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। দিন দিন প্রোক্ত ভাষাত্রয়ের সমধিক উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। আপামর সাধারণ সকলেই অধুনা বিদ্যা শিক্ষার প্রতি অনল্প আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে। এখানে বি এ, এম এ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবৃন্দের এককালে অসদ্ভাব নাই। এই অনতি পরিসর বিক্রমপুরে সম্প্রতি প্রায় বিংশতিটি ইংরেজি বঙ্গবিদ্যালয়, পঞ্চবিংশতিটি বঙ্গবিদ্যালয়[৭] প্রতিষ্ঠিত আছে। একদা বিক্রমপুরবাসী যুবগণের হৃদয়ে উন্নতি বিধায়িনী অনুরাগিতা এতাদৃশী বলবতী দৃষ্ট হইয়াছিল যে, তখন অনেকের উৎসাহ ও যত্নাতিশয়ে এখানে মাইজপাড়া, কোরহাটি, ষোলঘর, কামারগাঁ, কুমারভোগ, ব্রাহ্মণগাঁ, প্রাণিমণ্ডল এবং হাসাড়া গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। পরম হিতৈষী বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের (ইনি তখন অত্রত্য বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন) একমাত্র পরিশ্রমশীলতা এবং কর্তব্যপরায়ণতাই ইহার মূল কারণ। কিন্তু দিন দিন শেষোক্ত বিদ্যালয়গুলির (বালিকা বিদ্যালয় সমূহের) সংখ্যা বৃদ্ধি ও অধিকতর উন্নতি হইবে দূরে থাকুক অধুনা ক্রমশ তাহাদের ক্ষয়সাধন হইতেছে। কোন কোনটি প্রভাতকালীয় দীপশিখার ন্যায় নিষ্প্রভ লক্ষিত হইতেছে।

গবর্নমেন্ট সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরেজি বঙ্গবিদ্যালয়ের মধ্যে কালীপাড়া, মুন্সিগঞ্জ, শ্রীনগর, তেয়টিয়া, বজ্রযোগিনী এবং লোহাজঙ্গ স্কুল প্রধান। উল্লিখিত বিদ্যামন্দির ব্যতীত কয়েকটি প্রাইভেট (গুপ্ত) স্কুল এবং স্থানে স্থানে কতকগুলি দেশহিতৈষিনী বিদ্যোন্নতিসাধিনী সাপ্তাহিক সভা সংস্থাপিত আছে। তন্মধ্যে কালীপাড়ার 'জ্ঞানদায়িনী' ও কোরহাটির 'জ্ঞানজ্যোতি-র্বিকাশিনী' সভা প্রধান। সভা দেশের অশেষ মঙ্গলকরী সন্দেহ নাই। কিন্তু একতা এবং একাগ্রতা উৎসাহের অনুগামিনী না হইলে কিছুই হইতে পারে না। যেখানে প্রোক্তগণত্রয়ের একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয়, তথায় অনেক কাজের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। জ্ঞানজ্যোতির্বিকাশিনী আজ পঞ্চমবর্ষে পাদবিক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু ইহার জন্মগন্ধ বিদূরিত হইতে না হইতেই এ একটি অনল্প মঙ্গলের কাজ সাধন করিয়াছে। বলিতে কি, বিকাশিনীই তেয়টিয়া ইংরেজি বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রসূতি স্বরূপ।

এখন আমরা সংস্কৃত ভাষার আন্দোলন বিষয়ে কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার বিগত শোচনীয় অবস্থা স্মৃতিপথবর্তিনী হইলে ইহার উপর দিয়া যে ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝানল প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা একবার চিন্তা করিলে, আমাদের ন্যায় পাষাণহৃদয়েরও শোক উপস্থিত হয়—অশ্রুজলে বক্ষস্থল প্লাবিত হইয়া উঠে। যখন দুরাদ যবনালন ভারত কাননে প্রবেশ করে—যখন ভয়ঙ্কর যবনরাহুস্পর্শে আমাদের হিন্দুসূর্য এককালে ম্রিয়মান ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে—যে সময় ভারতের রাজশ্রী যবনাঙ্কশায়িনী হয়েন—যখন হিংসা, ঈর্ষা, মত্ততা প্রভৃতি বিকটাননা পিশাচীবৃন্দ মহানন্দে ভারত উদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করে, তখন সেই ভারতলক্ষ্মী ও স্বর্ণভূমি ভারতের চূড়ামণি আর্যজাতির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে আর্যাবর্তের একমাত্র গৌরবের কারণ আমাদের মাতৃভাষা—সর্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণ সংস্কৃত ভাষা মৃতপতিতা কামিনীর মত দীন বেশ পরিধান ও হীনভাব ধারণ করিতে থাকেন। ইনি ক্রমশ ছিন্নলতিকার ন্যায় আদরবঞ্চিতা হইয়া

দুরন্ত যবনভয়েই যেন প্রস্থানোন্মুখী হইলেন। পারসি ভাষা তখন সংস্কৃতের স্থলবর্তিনী হয়। হিন্দুগণ রাজভয়ে ভীত হইয়া অগত্যা বিদেশিনী পারসি ভাষাকেই সংস্কৃতের বিমল-আসল প্রদান করেন। দুর্ধর্ষ যবনরাজের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, কাহার সাহস, এই সকল ভাব দর্শন করিয়া কাহার মনে বিশ্বাস ছিল যে আমরা পুনরায় সংস্কৃতের দর্শন লাভ করিব? কে জানিত আমরা সেই যবনতাড়িত পবিত্র সংস্কৃত ভাষার মধুর—পীযূষপূরিত আস্বাদন পুনঃ উপভোগ করিতে সমর্থ হইব? কিন্তু কি আনন্দ ও সুখের বিষয়! এই প্রচণ্ড যবন-ঝঞ্জাবাত প্রবাহের সময়ে ও আমাদের—হিন্দুদিগের মধ্য হইতে মাতৃভাষা সংস্কৃতের রক্ষণার্থ একদল বীরপুরুষ নির্গত হইলেন। ইহারা বস্তুত শারীরিক বলে তাদৃশ বলীয়ান ও বীর বলিয়া খ্যাত ছিলেন না। মানসিক বল একমাত্র উৎসাহই ইহাদিগের প্রকৃত বল এবং একীভাব ইঁহাদিগের প্রধানতম অস্ত্র ছিল। ইহারা এইমাত্র সম্বল লইয়া নিরাশ্রিতা অনাথিনী সংস্কৃত। ভাষার উদ্ধার সম্পাদন পূর্বক তাহাকে স্ব স্ব পর্ণ-কুটিরে আশ্রয় প্রদান করেন।

অনেকে উল্লিখিত উৎসাহশীল পুরুষদিগের পরিচয় জানিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া থাকিবেন। ফলতঃ ঈদৃশ উৎসাহবান ব্যক্তিদিগের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক ও অসাময়িক নহে, ইহার স্মৃতি, দর্শন, ন্যায় প্রভৃতি প্রধান প্রধান শাস্ত্রজ্ঞ কতিপয় ব্রাহ্মণ। আজি এই মহাত্মাদিগের সন্তানবৃন্দই "সার্বভৌম" প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়া সাধারণ্যে "পণ্ডিত" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। সংস্কৃত ভাষা তদবধি ইহাদিগের পর্ণকুটীরবাসিনী এবং ইহাদিগের যত্নে সংরক্ষিতা হইয়া অদ্য আমাদের এতাদৃশ সন্তোষ বর্ধন করিতেছেন। বলিতে কি, একমাত্র এই দরিদ্র দ্বিজবৃন্দের উৎসাহ-বারি সিঞ্চনেই প্রায় বীতজীবনা সংস্কৃত ভাষা সঞ্জীবিতা রহিয়াছেন। ইহারা এই নিমিত্ত জনসমাজের বিলক্ষণ ধন্যবাদের পাত্র।

বিক্রমপুরে সার্বভৌম, বিদ্যারত্ন, বিদ্যাবাগীশ, বিদ্যাভূষণ, শিরোরত্ন, শিরোমণি, শিরোভূষণ, ন্যায়পঞ্চানন, ন্যায়রত্ন, তর্কবাগীশ, তর্করত্ন, তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি সম্ভ্রমাত্মক উপাধিপ্রাপ্ত প্রায় তিনশত পণ্ডিত আছেন। পণ্ডিতবৃন্দ সংস্কৃত ভাষার রক্ষণ জন্য এতাদৃশ মনোযোগ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন যে, শুনিলে চমৎকৃত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ফলত তখন তাহাদের নিঃস্বার্থভাব প্রণোদিত শিক্ষা প্রদানানুরাগ দর্শন করিয়া তাহাদিগের প্রতি হৃদয়ভাণ্ডার ভক্তিরসে পরিপূরিত হইয়া উঠে। পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রত্যেকের অধীনে এক একটি টোল (চতুষ্পাঠী) আছে। টোলে যে সকল দ্বিজতনয় শিক্ষা করিতে আইসেন, পণ্ডিত মহাশয়গণ তাহাদিগের আহারীয় প্রদান করেন ও নিজ গৃহে বাসস্থান দেন। বলিতে গেলে তাহারা ছাত্রদিগের (পড়ুয়াগণের) একপ্রকার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন। পণ্ডিতগণ বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে সমাহূত হইয়া থাকেন। সভাতে ইহারা তার্কিকতার একশেষ পরিচয় প্রদান করেন। ইহাদের অন্তকরণে জিগীষা পিশাচীর এরূপ আধিপত্য যে অনেকেই তর্ককালে পরস্পর 'পাছাড়' ধরিবার উপক্রম করেন। শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ে অনভিজ্ঞতাই ইহার মূলীভূত কারণ।

সম্প্রতি বিক্রমপুরের স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠী ভিন্ন সংস্কৃত বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইতেছে। গবর্নমেন্ট ইংরেজি বঙ্গ বিদ্যালয়ের ন্যায় কোন কোন সংস্কৃত বিদ্যালয়েও যথারীতি সাহায্য দান করিতেছেন। সত্য বটে অধুনা এই সকল বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা নিতান্ত অল্প। কিন্তু এগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অনেক উপকারের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। গবর্নমেন্টের আদেশানুসারে অনেক সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরেজি বঙ্গবিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। সংস্কৃত বিদ্যালয়ের যত বাহুল্য হইবে ততই উহার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অপেক্ষাকৃত ভদ্রবংশজবৃন্দের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে যাদৃশ আদর ও যত্ন দেখা যাইতেছে—তাহারা স্ব স্ব শিক্ষার নিমিত্ত যেরূপ বদ্ধপরিকর ও মনোযোগবান হইতেছেন, সেইরূপ তাহাদিগের প্রিয় ভ্রাতা গ্রামীণ ও ইতর জনগণের উন্নতি ও শিক্ষার জন্য কিছুই প্রয়াস বিধান করিতেছেন না। আত্মসুখেই যেন এককালে নিরত

রহিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষিবল প্রভৃতি দেশীয় দরিদ্রদিগের নিঃস্বতার প্রতি একটুকও কটাক্ষপাত করিতেছেন না। ইহা অপেক্ষা স্বার্থপরতা ও নির্দয়তার কার্য আর কি হইতে পারে? ন্যায়পরতা দেবী ইহাদিগের হৃদয়াসন এককালে পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিলেও বোধহয় লেখনী অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইবে না। কৃতবিদ্যগণ! আপনারা আর কতকাল স্ব স্ব উন্নতির নিমিত্ত ব্যাকুলিত থাকিবেন? কতকাল আত্মসুখে রত থাকিয়া দেশের—মাতৃভূমির অবনতি দর্শন করিবেন? আপনারা কি অবগত নন যে, আপনাদের উপর দেশের সর্বাঙ্গীনমঙ্গল নির্ভর করিতেছে? বিদ্যাশিক্ষার ফল কি কেবল আপনারাই উপভোগ করিবেন? যে বিদ্যা দ্বারা দেশের নিরীহ প্রকৃতি গ্রামীণ সাধারণের উপকার না হইল তাহার উপভোগ করিয়া আপনাদিগের কি লাভ হইবে? বিদ্যাবলে আপনাদের হৃদয়াকাশ অজ্ঞানতিমির হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ভ্রাতৃদিগকে অশিক্ষা ও অজ্ঞানতারূপ ভয়ঙ্করী নিশাচরীবৃন্দ হইতে উন্মুক্ত করা কি আপনাদের নিকট উচিত বলিয়া অনুভূত হয় না? এই সাধারণ কর্তব্যবোধ কি এখনো আপনাদিগের চিত্তক্ষেত্রে নিহিত হয় নাই? মহাত্মগণ! সময় গিয়াছে মনে করিবেন না। এখনো সময় আছে। আজি হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া কার্যক্ষেত্রে গমন করুন অবশ্যই কৃতকার্য হইবেন।

দুর্ভাগিনী বিক্রমপুরের দিন দিন কি ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইতেছে! প্রতিনিয়ত শোকাশ্রু প্রবাহে ইহার বক্ষস্থল ভাসমান হইতেছে! ইহার ভাবী অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া হৃদয় ব্যথিত ও কম্পিত হইতেছে! আমরা যেমন ক্রমশ ইহার (বিক্রমপুরের) উন্নতি শশির সুবিমল মুখচ্ছবি দর্শনের প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছি, কঠোর হৃদয় কৃতান্ত রাহু তেমনই ভীষণাকার ধারণ সহকারে করাল মুখ ব্যাদানপূর্বক সেই উদয়গিরি আরোহণোন্মুখ উন্নতিশশিকে এককালে কবলস্থ করিতে বসিয়াছে; হতভাগিনী বিক্রমপুর ভূমির শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে কাতর হইয়াই যেন ইহার সৌভাগ্য লক্ষ্মীর বিনাশ সম্পাদনে কৃতসংকল্প হইয়াছে। ইহার প্রতি দুরন্ত শমনের যাদৃশ প্রকোপ ও শাত্রবভাব লক্ষিত হইতেছে তাহাতে আমাদের নিশ্চিত প্রতীতি জন্মিতেছে যে, হতশ্রী বিক্রমপুর কখনও পুরাকালীয় গৌরব লাভ করিতে পারিবে কিনা সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। বিক্রমপুর সর্বসুখহর যমদেবের আক্রমণ ও ভয়ঙ্কর অত্যাচারে প্রতিদিন যশোবিচ্যুত ও মলিনীকৃত হইতে থাকিবে এরূপ দৃষ্ট হইতেছে। ক্রমে ইনি উপযুক্ত প্রিয়সন্তানগণকে হারাইতেছেন। তেজোহীন পাণ্ডুভাব ধারণ করিতেছেন দেখিয়া কাহার হৃদয়ে না শোকশঙ্কু বিদ্ধ হয়?

যাহাদিগের দ্বারা লোক বিশ্রুত আমাদের সংস্কৃত ভাষার সমধিক অঙ্গ সৌষ্ঠব পরিবর্ধিত হইতেছিল—যে সকল মহাত্মবৃন্দের প্রযত্নে ইনি (সংস্কৃত ভাষা দেবী) উজ্জ্বল বেশ ও মোহিনী মূর্তি ধারণ করিতেছিলেন, অচিরকাল বিগত হইল সেই সংস্কৃত ব্যবসায়ী বিক্রমপুরের কতিপয় সুপ্রধান পণ্ডিত-নক্ষত্র চিরকালের নিমিত্ত অন্তর্হিত হইয়াছেন। প্রায় অষ্টাধিক বর্ষকাল অতীত হইল, বিক্রমপুরস্থ পণ্ডিত কুলচূড়ারত্ন কমলাকান্ত সার্বভৌম মহোদয় পরলোকগমন করিয়াছেন। ইঁহার মরণে বিক্রমপুর যারপরনাই শোকপরিচ্ছদ ধারণ করেন। অত্রত্য আবাল-বৃদ্ধ সকলেই ভাবী উন্নতির শিরে অশনিপাত হইল মনে করিয়া নিতান্ত ক্ষুভিত ও খিন্ন হৃদয় হয়েন; পণ্ডিতবৃন্দ তাদৃশ আকস্মিক বিপৎপাতে নিরতিশয় ব্যথিতচিত্ত ও একান্ত কাতর হইতে থাকেন। ফলত সার্বভৌম মহাশয় বিক্রমপুরস্থ অপর পণ্ডিত মণ্ডলীর আশ্রয় তরু স্বরূপ ছিলেন; ইনি ষোল আনী বিদায়ের অধিকারী ছিলেন। ইহার যশঃ সৌরভ দিগ্‌দিগন্তব্যাপী হইয়া উঠে। সুতরাং যমনিকেতনে ইহার অকাল আতিথ্য স্বীকার সাধারণের বিশেষত পণ্ডিত নিচয়ের নিতান্ত বিষাদ ও আক্ষেপের কারণ হইতে বিচিত্র কি?

কিন্তু ইহার বিরহ নিবন্ধন বিক্রমপুর যদিও ম্লান বেশ ধারণ করেন, তথাটি প্রোক্ত সার্বভৌম মহাত্মার ন্যায় না হইলেও ইনি পণ্ডিতরত্নরাজি ভোগে এককালে বঞ্চিত হইয়া ছিলেন না। অনন্তর চিত্রকরা নিবাসী গোলকচন্দ্র সার্বভৌম, পয়সাগাঁর অলঙ্কার শ্রীযুত পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ মহোদয়দ্বয় প্রধানতম বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ও অতিশয় বিখ্যাত

হইয়া উঠেন। কিন্তু কালের কি নির্দয় হৃদয়! কি বিদ্বেষপূর্ণ নয়ন! অল্পদিন হইল উল্লিখিত গোলকচন্দ্র সার্বভৌম, বজ্রযোগিনী নিবাসী আনন্দচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, পুড়ার রত্নযুগল দীননাথ ন্যায়পঞ্চানন ও নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার এবং হোগলা[৮] নিবাসী গোলোকচন্দ্র সার্বভৌম প্রভৃতি মহোদয়বৃন্দ জীবলীলা সংবরণ করিয়া অল্প লোকের হৃদয়ে শোকশেল প্রদান করেন নাই। ইঁহাদিগের এইরূপ অসাময়িক মৃত্যুতে সংস্কৃতের উন্নতি আশা ক্রমে আমাদের চিত্ত-ক্ষেত্র হইতে অপনীত হইতেছে, এইরূপ দৈবদুর্বিপাকজনিত দুর্ঘটনার সমাচার বায়ু কোন মহাত্মার হৃদয়সাগরে না খেদ তরঙ্গের সঞ্চার করিয়া দেয়? পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ মহোদয় যদিও বিগত জীবন না হইয়া থাকুন; কিন্তু তাঁহার যেরূপ পীড়া উপস্থিত, তাহাতে বিলক্ষণ অনুমিত হইতেছে ইনি অচিরেই শমন ভবনে অতিথি সৎকার গ্রহণ করিবেন। হায়! ইহার মরণ হইলে বিক্রমপুর এককালে না হউক অনেকাংশে যে হতভাগিনী হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। এই মহাত্মাও ষোল আনী বিদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সংপ্রতি বিক্রমপুরে সম্পূর্ণ বিদায়াধিকারী অনেক পণ্ডিত বিদ্যমান আছেন। তাহারা তাদৃশ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন না হইলেও বিদ্যাবত্তা প্রকাশে এককালে কম নহেন। তর্কশক্তি সকলের সমান নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য সংশয় নাই। কেহ বিচার বিষয়ে বিলক্ষণ পটু, কেহ তাহা অপেক্ষা ন্যূন। মৃত মহাত্মা পণ্ডিতকুঞ্জর কমলাকান্ত সার্বভৌম মহাশয় তর্কশক্তির একশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বলিতে কি, নবদ্বীপস্থ বিখ্যাত পণ্ডিত মণ্ডলীর কেহ কেহও তার্কিকতায় তাঁহার নিকট একপ্রকার পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। সার্বভৌম মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী ও বিশারদ ছিলেন। তিনি তর্ককালে বীর পুরুষের ন্যায় উত্তর দান করিয়া প্রগল্‌ভতা সহকারে বলিতেন "নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস কর, কমলাকান্ত সার্বভৌম যাহা বলিলেন তাহা ঠিক ও অভ্রান্ত।" ফলত তাহার তর্কে ভ্রম প্রমাদের আশঙ্কা অতি অল্পই ছিল। কমলাকান্ত সার্বভৌম মহোদয়ের ছাত্রদিগের বিচার দর্শন করিলে তাহার অধ্যাপনা শক্তিরও ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। তাঁহার অধ্যাপনা নিয়ম যে অনল্প বিশদ ছিল তাহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অনেক দিন অতীত হইল বিক্রমপুর অপর একটি পণ্ডিত রত্নে বঞ্চিত হইয়াছেন, ইহার নাম অভয়াচরণ চমৎকার। ইনি এত অল্প সময়ের মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ বুৎপত্তি ও বিচক্ষণতা লাভ করেন যে, শুনিলে যারপরনাই চমৎকৃত হইতে হয়। ইনি এই নিমিত্তই "চমৎকার" এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি এই মহাত্মা অভয় চমৎকার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইনি বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। চমৎকার মহাশয়ও বিচার কালে অতিশয় পটুতা সহকারে তর্কশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার বক্তৃতায় সকলেই সন্তোষ লাভ করিতেন। সকলেই তাহা শ্রবণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। তাঁহার টোলে ছাত্র সংখ্যার যে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়াছিল এতদ্বারা তাহার লক্ষণ বেশ লক্ষিত হইতেছে। ইঁহার অবলম্বিত শিক্ষাপ্রদান পদ্ধতি ও সন্তোষপ্রদ ও প্রশংসনীয় ছিল। অধুনাতন টোল সকলের শিক্ষা প্রণালীর উৎকর্ষ বিধান জন্য কতিপয় টোলে সদাশয় গবর্নমেন্ট নিয়মিত সাহায্য দান করিতেছেন।

আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসা ঃ

বিবিধ মণিপূর্ণ খনি যত খনন করা যায় ততই যেমন তাহা হইতে বহু মূল্য রত্নরাজি প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ এই বিক্রমপুরের প্রাচীন মহাত্মাবৃন্দের খ্যাতি ও যশোযোনি সংস্কৃত শাস্ত্ররূপ মহান আকার খনন করিতে করিতে অনল্প মঙ্গলকর আয়ুর্বেদরত্ন আমাদের হস্তগত হইল। যদিও এই রত্ন আজি আমরা লাভ করিলাম, কিন্তু ইহা অনেকদিন হইতেই ইহার উজ্জ্বল আভা দ্বারা বিক্রমপুরকে আলোকিতা ও খ্যাতিশালিনী করিয়া আসিতেছে।

আয়ুর্বেদ ও ইহার (বিক্রমপুরের) উন্নতির অন্যতর প্রধান কারণ। সত্য বটে পুরাকালের ন্যায় অধুনা এখানে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের তাদৃশ আন্দোলন দৃষ্ট হয় না—সত্য বটে প্রাচীন সময়ে এতদপেক্ষা ইহার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত অনুসন্ধিৎসুচক্ষে দর্শন

করিলে আজিও ইহার মন্দ আদর লক্ষিত হইতেছে না দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও অনেকানেক মহাত্মা এই আয়ুর্বেদ শিক্ষা বিষয়ে প্রচুর উৎসাহশীল ও একান্ত অনুরাগবান প্রতীয়মান হন। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রের এক প্রধানতম অঙ্গ। নিদান প্রভৃতি মহত্তর শাস্ত্রনিচয় ইহার অন্তর্গত। এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে ব্যাকরণ শাস্ত্রে সমীচীন বুৎপত্তি থাকা নিতান্ত আবশ্যক। সংস্কৃত সাহিত্যে ও কলাপাদি ব্যাকরণ শাস্ত্রে বিচক্ষণতা না জন্মিলে আয়ুর্বেদের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করা অনেক কঠিন হইয়া উঠে। সুতরাং সম্মানাত্মক প্রধান প্রধান উপাধি লাভে যে অনেক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে যত্ন করিতে হয় তাহা বিলক্ষণ রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। অত্রত্য চতুষ্পাঠী সমূহের ছাত্রবৃন্দ (পড়ুয়াগণ) যেমন সাধারণত নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে যাইয়া বিদ্যারত্ন, বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি উপাধি লাভ করেন, এবং অন্যান্য অনেক স্থানীয় ছাত্রগণ যেমন এই বিক্রমপুরে আসিয়া বিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট হইতে সেইরূপ উপাধি প্রাপ্ত হন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পারদর্শী বৈদ্যদিগকে তাঁহাদের ন্যায় স্থানান্তর গমন করিতে হয় না এখানেই ইঁহাদের নামকরণ হয়। বৈদ্য ভিন্ন আর কেহ এই খ্যাতি লাভ করিতে পারে না। এখানে আয়ুর্বেদ শিক্ষার মন্দ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইতেছে না। ক্রমশই ইহার উন্নতি আমাদের নেত্রপথবর্তিনী হইতেছে। ইহার আধুনিক ভাব দর্শন করিয়া নিশ্চিত প্রতীতি হইতেছে যে, বিক্রমপুর অচিরকাল মধ্যেই আয়ুর্বেদ আলোচনার নিমিত্ত পূর্ববৎ এক অতি বিখ্যাত স্থান হইয়া উঠিবে। কেবল দুই এক স্থানে নয় এখনো বিক্রমপুরের নানা স্থানে আয়ুর্বেদের বিলক্ষণ আন্দোলন হইতেছে। এমন পল্লী অতি বিরল, যেখানে দুই একজন আয়ুর্বেদ বিশারদ বাস না করেন। টোল সম্বল পণ্ডিত মহোদয়দিগের ন্যায় ইহারদিগের অধীনেও দুই চারিজন করিয়া ছাত্র পাঠ করেন।

সম্প্রতি ইহাদের মধ্যে সোনারঙ নিবাসী কালিদাস কবিরত্ন, পাটাভোগের কালীশঙ্কর কবিভূষণ, বেলতলীর কালীকুমার কবিভূষণ, বটেশ্বরবাসী পীতাম্বর কবিরত্ন, মালকদিয়াস্থ কালীপ্রসাদ কলীসাগর এবং সাওগাঁ পল্লীর গৌরীনাথ সেন প্রভৃতি আয়ুর্বেদবিদ্‌গণ প্রধান। ইঁহারা সাধারণের উপকার সম্পাদন সহকারে দেশ বিদেশে বিপুল প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেছেন। ইঁহারা সংস্কৃত ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন। ইঁহাদের অনেকে কলিকাতা, বরিশাল, ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়া স্ব স্ব চিকিৎসা নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন। কোঁমড়পুরবাসী গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয় কলিকাতা মহানগরীতে চিকিৎসা কার্যে নিরত থাকিয়া নিরতিশয় প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন। যদিও ইনি কোন উপাধি প্রাপ্ত না হউন, তথাপি ইঁহার বিদ্যাবত্তা ন্যূন নহে। এই মহাত্মা অধীত শাস্ত্রের উন্নতি বিধানার্থ নিয়ত প্রয়াস পাইতেছেন। গঙ্গাপ্রসাদবাবু আয়ুর্বেদ বিষয়ে একখানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তাঁহার দেশহিতানুরাগ বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে। বস্তুত গঙ্গাপ্রসাদ সেন, কালিদাস কবিরত্ন প্রভৃতি আয়ুর্বেদ ব্যবসায়ী মহোদয়বৃন্দ সঞ্জীবিত থাকিলে বিক্রমপুরের যশোভাণ্ডার নিয়ত পরিপূর্ণ থাকিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আমাদের মাতৃভূমি বিক্রমপুর অপরাপর সমস্ত দেশের পরাজয় সম্পাদন করিয়াছেন। কালে ইহার সেই জয়শ্রী অপরাজিত রূপে বিরাজমানা থাকিয়া লোক লোচনের আনন্দবর্ধন করিবে এরূপ প্রতীয়মান হইতেছে।

কিন্তু বিক্রমপুর নিতান্ত হতভাগিনী। ভয়ঙ্কর কাল যেন ইহার পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নির্দয় নিষাদের ন্যায় ধীরে ধীরে ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাদবিক্ষেপ করিতেছে। ইহার করাল আক্রমণে প্রধান প্রধান পণ্ডিতবৃন্দ ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইতেছেন দেখিয়া আশা আর হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে না! আত্মানীরস ভাবধারণ করিতেছে! কাল যে কেবল বিক্রমপুরের পরম শোভাকরী পণ্ডিতরত্ন মালাহরণ করিয়াই পরিতৃপ্ত ও নিরস্ত রহিয়াছেন এমত নহে। বিবিধ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রবিদ মহাত্মাবৃন্দকেও গ্রাস করিতে বসিয়াছেন! কত মহোদয়কে ইহার মধ্যে স্বকীয় উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। কালকবলিত কবিরত্ন প্রভৃতির

স্মরণ হইলে শোকাবেগ সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। অধিককাল বিগত হয় নাই বানরী নিবাসী রাজনারায়ণ কবিরত্ন, রাজপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ রামদুর্লভ সেন মহোদয়দ্বয় লোকান্তরিত হইয়া সাধারণকে শোকাচ্ছন্ন করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কত স্থান হইতে কত মহাত্মা গগনস্থ উল্কাবৎ স্খলিত ও অন্তর্হিত হইতেছেন তাহা কে বলিতে পারে?

এখানে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সমান্দোলন ব্যতিরেকে অপরবিধ চিকিৎসা প্রণালীরও মন্দ উন্নতি লক্ষিত হয় না। ইহারও ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। কবিরাজগণ সাধারণ রোপোন্মূলন সময়েও অনল্প কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে কোন কোন মহাত্মা জ্ঞান ও বিদ্যাবিষয়ে সরস্বতীর বরপুত্র এবং ভেষজ বিধানে আমাদের সেই "কবিরাজ খুড়োর" ন্যায় বিলক্ষণ নিপুণ। যাহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন প্রায়ই তাহার পক্ষে একবারে কৃতান্ত সহোদর হইয়া দাঁড়ান। কিন্তু এরূপ চিকিৎসকের প্রভাব এখন আর কার্যকর বলিয়া প্রতীত হইতেছে না। ইহাদের দলবল এখন অনেক ন্যূন ও নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে। এখন কিবরাজবৃন্দ চিকিৎসা বিষয়ে প্রাচীন মত পরিবর্তন ও নবপ্রণালী অবলম্বন করিতেছেন। ইহাতে তাহারা কৃতকার্যতাও লাভ করিতেছেন। অনেকে আশ্চর্য আশ্চর্য কৌশল প্রদর্শন করিয়া ভয়ানক রোগের উপশম করিতেছেন। কোন কোন শ্বেতকান্তি মহোদয় কবিরাজদিগকে বিদ্যাবিমূঢ় ও হতবুদ্ধি মনে করিয়া ইহাদিগকে চিকিৎসা ব্যাপারে বিরত করিবার জন্য সাধারণে মত প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা ইউরোপীয় আধুনিক চিকিৎসা প্রণালীকে অমোঘ জ্ঞান করিয়া সর্বত্র তাহার প্রাধান্য স্থাপনার্থ নিতান্ত ব্যাকুল ও একান্ত ব্যগ্র। এই শ্বেতকায় মহাপুরুষগণ যে এদেশজাতদিগের উন্নতি ও সৌভাগ্যকাতর তাহা তাহাদের ঈদৃশ বাক্ বিন্যাসে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে। ইহারা স্বীয় অনভিজ্ঞতা স্বীকারে এককালে পরাঙ্মুখ। যদি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আলোচনা করিয়া দেখা যায় তাহাতে উল্লিখিত শুভ্রাঙ্গদিগের বাক্যগুলি শুদ্ধ অসূয়া ও হিংসা প্রণোদিত বলিয়া সংলক্ষিত হয়। কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া ইহাদিগের মনে নিরীহ কবিরাজদিগের প্রতি ভয়ঙ্কর শাত্রবভাব লব্ধ প্রবেশ হইয়াছে, তাহা আমরা মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিয়াও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। আমাদের কবিরাজবৃন্দের মধ্যে এমন অনেক মহাত্মা আছেন যে, তাহাদিগকে জ্ঞানবত্তা ও চিকিৎসা বিষয়ে ইউরোপী চিকিৎসাবিধানজ্ঞ মহোদয়গণ এককালে পরাস্ত করিতে পারেন না বলিতে কি কোন কোন বিষয়ে তাহারা শ্রেষ্ঠতর রূপে দৃষ্ট হন, সুতরাং প্রোক্ত শ্বেতমুখদিগের মত যে নিতান্ত অবিশুদ্ধ ও ভ্রমশঙ্কুল তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীস্থ কবিরাজদিগের মধ্যেও অনেকে কার্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছেন। দেশ মধ্যে তাহাদের মন্দ প্রতিপত্তি নহে।

কৃষিকার্য ঃ

অনেকে মনে করেন—মনে করেন কেন বলিয়াও থাকেন যে, কৃষিকার্য কেবল ইতর শ্রেণীস্থ লোকেরই অবলম্বনীয়। উহাতে বিদ্যা শিক্ষা, জ্ঞানশিক্ষা প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন নাই। বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ ফল ও উপকার কি? যেরূপ চলিয়া আসিতেছে তাহাতে কোন মতে একমাত্র হল চালনা করিতে পারিলেই হইল। কিন্তু যাহারা এরূপ অসার কথা বলিয়া থাকেন, তাহারা ভ্রমেও একবার মনে স্থান দেন না যে সেই হলচালনা কার্যই বা কি প্রকার প্রণালীতে সম্পাদিত হওয়া উচিত। অধুনা যে রীতি অবলম্বন করিয়া কৃষকবৃন্দ হলচালনা, ক্ষেত্র নিড়ান প্রভৃতি কার্যকলাপ সম্পাদন করিতেছে তাহা যে সর্বাঙ্গীন ফল প্রসবিনী নয় ইহা কখন পর্যালোচনা করিয়া দেখেন কি না সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল। আমাদের বিক্রমপুরবাসীদিগের মধ্যেও এরূপ বিশ্বাসপন্ন মানুষের অসদ্ভাব নাই। হৃদয়ের অপ্রশস্ত ও সঙ্কুচিত ভাবই এতাদৃশ অনুচিত ও অশুভকর সংস্কারের উৎপত্তির মূল কারণ। কি ভদ্র, কি ইতর যদি সকলেই প্রকৃত উৎসাহ সহকারে সমভাবে কৃষিকার্যের উন্নতি বিধানের চেষ্টা ও প্রয়াস পাইতেন আপামর সাধারণ সকলেই যদি একমত হইয়া দেশোন্নতির প্রধানতর উপায় কৃষিকার্য অবলম্বন

করিতেন ; কেহই যদি এখনকার মত পরপ্রত্যাশী হইয়া অকিঞ্চিৎকর ভৃতি লাভের জন্য লালায়িত না হইত, তাহা হইলে আজি কি বিক্রমপুরের এতাদৃশী দুরবস্থা সঞ্জাত হইত? বিক্রমপুর কি ক্ষুন্নিবৃত্তির নিমিত্ত পরমুখপ্রেক্ষিণী হইয়া আমাদের—তাহার সন্তানদিগের এত খেদের সঞ্চার করিত? ইহার কি এই দীনভাব দর্শন করিতাম, যদি সকলেই স্ব স্ব করে লাঙল ও কোদাল ধারণ করিয়া ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত তাহা হইলে স্বর্ণ ফলবতী বিক্রমপুরের এত অধিক স্থান কি অনাবাদ ও অরণ্যময় থাকিত? কখনই নহে। বিক্রমপুর তখন বিবিধ শস্যরত্নে বিমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব শ্রীধারণ করিত। ইহার অধিবাসীবৃন্দের যথেষ্ট তৃপ্তি সম্পাদন করিয়া পরকীয় দেশসমূহের জীবিকা নির্বাহ বিষয়েও বিলক্ষণ সাহায্যদায়িনী হইয়া উঠিত।

হায়! এই ভাব যখন হৃদয়ে সমুদিত হয়, তখন অশ্রুজল বিসর্জন না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারা যায় না। আমাদের ভ্রাতৃগণ সমবেত হইয়া স্বয়ং কার্য ক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন দূরে থাকুক, কিসে ভূমির উর্বরতা শক্তির বৃদ্ধি সম্পাদন করে, কি রূপ উপায় অনুষ্ঠিত হইলে আশানুরূপ ফল লাভ হয়, কোন প্রকার শস্যের পর কোন প্রকার শস্যের বীজ বপন করিতে হয়, ইতর শ্রেণীস্থ কৃষিবলদিগকে এবংবিধ ভূমির উৎকর্ষ সংসাধিনী প্রণালীর শিক্ষা প্রদানেও তাহারা কিঞ্চিন্মাত্র উৎসাহ ও প্রয়াস বিধান করিতেছেন না। ইহারা পরমুখাকাঙ্খী হইয়া থাকিতে যেন একটুও ক্লেশ ও লজ্জা বোধ করেন না। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? আজিকালি বিক্রমপুরে কৃতবিদ্য ও সুশিক্ষিতের সংখ্যা অল্প নহে। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া কার্য করিলে অনায়াসে এতাদৃশ মহদনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হন। কিন্তু ওরূপ আশা করিয়া কি হইবে? বাঞ্ছিত কার্য দর্শনের দিন এখনও অনেক দূরবর্তী রহিয়াছে, এরূপ অনুভূত হইতেছে। ইহাদের হৃদয়েও অশেষ মঙ্গলকর অনুচিত মনে বোধ লক্ষিত হইতেছে। এ বিষয়ে এই মহাত্মগণও যেন দেশাচারের দাসত্ব পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। এরূপ মান বোধ ও কুৎসিত দেশাচারের দাসত্ব স্বীকার নব্য কৃতবিদ্য যুবকদিগের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। এখন সমাজের আশঙ্কা করাও বিধেয় নয়। যদি তাহারা অলীক মান বোধ পরিত্যাগ করিয়া প্রোক্তবিধ কর্তব্যসাধনে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাহাদেরই এক বিস্তীর্ণ সমাজ ও দেশ হস্তগত হইয়া উঠে। তবে যে দেশাচার তাহাদের নিকট এ বিষয়ে একান্ত অযৌক্তিক রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহার সেই প্রকৃত মানহর দাসত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি?

সম্প্রতি বিক্রমপুরের যে সকল শস্য জাত[১] উৎপন্ন হইতেছে তাহা অত্রত্য লোকদিগের জীবিকা নির্বাহ বিষয়েও পর্যাপ্ত নহে। অধুনা যে প্রণালীতে কৃষকগণ কার্য করিতেছে তাহাতে ভূমির উৎকর্ষ সম্পাদন ও শস্যোৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি হইবে এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। পক্ষান্তরে উহার হ্রাসই যেন দেখা যাইতেছে। ইহা অপেক্ষা খেদের বিষয় আর কি আছে? কৃষিজীবিদিগের শিক্ষাভাবই ইহার একমাত্র প্রধান কারণ। মহান অনিষ্টকর এই শিক্ষাভাবের অপনয়ন চেষ্টা পাওয়া কি আমাদের কর্তব্য নয়? আমরা কি এই সময় মৃৎপিণ্ডবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিব? আমাদের বিবেক কি এ বিষয়ে সায় প্রদান করিবে? কখনই নহে। মাতৃভূমির সৌন্দর্য ও মঙ্গল বিধান আমাদের একান্ত বিধেয় হইয়া উঠিয়াছে। অতএব মহাত্মগণ! দুঃখিনী বিক্রমপুরের প্রিয় সন্তানগণ! আপনারা মনোযোগী হউন। যাহাতে কৃষিকার্যের শ্রীবৃদ্ধি সুতরাং দেশের অভাব বিদূরিত হয় তাহার জন্য সত্বর প্রস্তুত ও অগ্রসর হউন। আপনারা সমবেত হইয়া পরস্পর সাহায্য দানে স্থানে স্থানে এক একটি কৃষি বিদ্যালয় স্থাপন করুন। তাহা হইলে অনেকাংশে অভিলষিত বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পারিবেন।

বিক্রমপুরের নদী (কীর্তিনাশা) ও বিভাগ ঃ

বিক্রমপুরের প্রধান নদী কীর্তিনাশা। ইহার ন্যায় বেগবতী স্রোতস্বতী অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কীর্তিনাশার চিত্ত চমৎকারিণী বিস্তীর্ণতা দর্শন করিলে হৃদয় বিস্মিত ও কম্পিত

হয়। ইহার উৎপত্তির বিবরণ অল্প আশ্চর্যবহ নহে। অনেকে বলেন বিখ্যাতনামা রাজবল্লভের নিবাসভূমি রাজনগরের উত্তরাংশে অনতিদীর্ঘ একটি ক্ষুদ্র খাল ছিল। একদা রজনীযোগে সেই খালের জলপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া তথায় এক ভয়ানক খাত হইয়া পড়ে। কতিপয় মাসের মধ্যে উহা এতাদৃশী বিস্তারশালিনী ও তরঙ্গবতী হইয়া যুগপৎ তেত্রিশখানা প্রসিদ্ধ গ্রাম এবং অনেকগুলি জমিদারের কীর্তিকলাপ বিলোপ করে বলিয়া ঐ অংশের নাম 'কীর্তিনাশা' হয়। কাহারও বিশ্বাস, প্রায় শতবর্ষ অতীত হইল ব্রহ্মপুত্র নদের বেগ হ্রাস ও ক্রমে স্রোতোরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহাতে ঝিনাই ও গঙ্গা প্রভৃতির বারিধারা পদ্মা দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। এবং বর্ত্তমান আইরল খাঁ নদী ঐ সকল প্রবাহ নিঃসারিত করিয়া দিতে না পারাতে জলরাশি প্রবলবেগ ধারণপূর্বক বিক্রমপুরের বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিয়া কীর্তিনাশা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

কীর্তিনাশার এক শাখানদী বহরের মধ্য দিয়া ভুজঙ্গাকারে গমনপূর্বক সানিহাটি, তেয়টিয়া, কোরহাটি, ব্রাহ্মণগাঁ প্রভৃতি গ্রাম নিচয়কে কাঞ্চীবৎ পরিবেষ্টন করিয়া সুশোভিত করিয়াছে। কীর্তিনাশার জল সুরস, তৃপ্তিকর এবং স্বাস্থ্যজনক। ইহার ইলিস মৎস্য অতিশয় সুস্বাদু বলিয়া নানা স্থানে প্রেরিত ও বহুমূল্যে বিক্রিত হইয়া থাকে। এই নদী বর্ষাকালে ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করিয়া নৌকারোহীদিগের অন্তঃকরণে মহান আতঙ্কের উৎপাদন করিয়া দেয়। তখন ইহার স্রোতঃ অতিশয় প্রবল হয় এবং যখন পূর্বদিগ হইতে নিরতিশয় ভীষণ বাত্যাসহকারে ইহার গর্ভস্থ জলরাশি পর্বত সমান উত্তাল তরঙ্গরূপ ধারণ করে, তখন কীর্তিনাশা ও পদ্মা এমনি ভীমদর্শনা হয় যে, সেই সময় সমুদ্রগামী কোন কোন সুনিপুণ নাবিকও কর্ণধারণে সাহসী হয় না। পদ্মাকে কখন কখন অপার বলিয়া ভ্রম হয়। শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি অপরাপর ঋতুতেও পদ্মার বেগ ও আকার অল্প ভয়াবহ লক্ষিত হয় না। তখনও ঝড় সমুত্থত হইলে নাবিকদিগকে হাতে প্রাণ রাখিয়া পাড়ি ধরিতে হয়। পদ্মা, কীর্তিনাশা ভিন্ন এখানে আর কয়েকটি নদী ও শাখানদী আছে। অপ্রয়োজনীয়তা বোধে তৎসমস্তের বিবরণ এস্থলে পরিত্যক্ত হইল।

ভয়ঙ্করী কীর্তিনাশা বিক্রমপুরকে উত্তর, দক্ষিণ প্রধানত এই দুইভাগে বিভক্ত করিতেছে। দক্ষিণতটে রাজনগর, দেভোগ, বিলাসপুর, বকসীপুর, মৌশুড়া, পারগ্রাম, বিজারি মহীসার, শিয়ালদহ, আটপাড়া প্রভৃতি পল্লীনিচয় এবং উত্তর পার্শ্বে বহর, রাজাবাড়ি, ধীপুর, বজ্রযোগিনী, টংগিবাড়ি, বালিগাঁ, রাউৎভোগ, আইরল, জৈনসার, পশ্চিমপাড়া, শ্রীনগর, হাসাড়া, মাইজপাড়া, কনকসার, তেয়টিয়া, কালীপাড়া, ষোলঘর, কোরহাটি, ভাগ্যকুল, সানিহাটি প্রভৃতি গ্রাম অবস্থিত। কীর্তিনাশার যে শাখা উত্তরবাহিনী হইয়া বালিগাঁ, সুবচনী, তালতলা প্রভৃতি স্থান দিয়া ধবলেশ্বরীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে তাহা এই উত্তরভাগকে আবার পূর্ব বিক্রমপুর ও পশ্চিম বিক্রমপুর এই দুই অংশে বিভক্ত করিতেছে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ বিভাগ কখনই অসঙ্গত ও বিশৃঙ্খলরূপে প্রতীয়মান হয় না। প্রত্যেক ভাগেই এক একটি স্টেশন (থানা) স্থাপিত আছে। দক্ষিণ ভাগে মূলফতগঞ্জ, পশ্চিমাংশে শ্রীনগর ও পূর্বভাগে রাজাবাড়ি স্টেশন বিক্রমপুরের শান্তিরক্ষণ ব্রতে ব্রতী রহিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম বিক্রমপুরে ন্যূনাধিক পাঁচশত ও দক্ষিণ বিক্রমপুরে (কীর্তিনাশার দক্ষিণতটে) তিনশত পল্লী হইবে।

এক একটি বিভাগ অবলম্বনপূর্বক গণ্ডগ্রাম সমূহের বিবরণ লিখিবার পূর্বে, বিক্রমপুর যাহাদের দ্বারা এতদূর বিখ্যাত, আমরা সেই কতিপয় প্রধান প্রধান মহাত্মার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বল্লাল সেন ঃ

রামপাল। —মেঘনা নদীর পশ্চিম পার্শ্বে রামপাল নামক স্থানে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তক বৈদ্যবংশসম্ভূত বল্লাল সেন রাজত্ব করিতেন। বনে লালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম

'বল্লাল' হয়। বল্লালের পিতা বিজয় সেন।[১০] ইঁহার প্রতাপাদির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বল্লাল সেনের মহীয়সী শক্তি ও কীর্তিকলাপের ভূরি ভূরি চিহ্ন আজিও প্রকাশমান রহিয়াছে। এরূপ সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, বল্লাল সেন রাজবল্লভের পূর্বে রাজ্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি কয়েকটি প্রসিদ্ধ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দেশিয় লোকের জলকষ্ট নিবারণোপায় করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে স্বীয় জননীর নিকট বল্লাল নরপতি এরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে সম্বদ্ধ হয়েন যে, "তিনি (বল্লাল মাতা) একাদিক্রমে অপ্রতিহতভাবে যতদূর গমন করিতে পারিবেন বল্লাল যেন ততদূর ব্যাপিয়া এক দীর্ঘিকা পরিখাত করাইবেন। একবার দাঁড়াইলে আর গমন করিতে পারিবেন না।" প্রতিজ্ঞানুসারে বল্লালের জননী ক্রমাগত চলিতে লাগিলেন। তাঁহার গতি দর্শনে নৃপবর বিবেচনা করিলেন, এরূপ হইলে তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা নিতান্ত দুর্ঘটনা হইবে। অতএব কোন কৌশলে একবার মাতার গতিরোধ করিতে পারিলেই হয়। অনন্তর রাজার পরামর্শনুসারে তদীয় অনুচর এক ব্যক্তি বলিল, "ঠাকুরানি! আপনার পাদদেশে যে শোণিত চিহ্ন দেখিতেছি?" তচ্ছ্রবনে রাজমাতা সচকিতা হইয়া দাঁড়াইলেন। সুতরাং বল্লাল মাতার গমনারম্ভ হইতে তাঁহার অবস্থিতি পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাত দীর্ঘিকা খনিত করিলেন। এই দীর্ঘিকা এরূপ দীর্ঘ যে প্রবাদ আছে তাহার এক পার্শ্ব হইতে দুন্দুভিধ্বনি করিলে অপর পার্শ্বস্থ লোকের তাহা শ্রবণ গোচর হয় না। উল্লিখিত দীর্ঘিকা খনন সময়ে মজুরেরা যখন সায়ংকালে কোদাল ধুইয়া যাইত, তখন তাহাদিগের প্রত্যেকে অন্য এক স্থানে 'এক কোদাল মাটি, কাটিত'। ইহাতে এক সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকা উৎপন্ন হয়, তাহা 'কোদাল ধোয়া দীঘি' বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

এরূপ কিংবদন্তী যে, কোন জ্যোতির্বিদ আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আগত পণ্ডিত স্বার্থান্ধতা পরতন্ত্র হইয়াই হউক অথবা রাজাজ্ঞানুসারেই হউক, গণনা করিয়া স্থির করিলেন যে, মৎস্যের কণ্টক গলায় বাঁধিয়া রাজা দেহত্যাগ হইবে। এতৎ শ্রবণে বল্লাল সেন পাণ্ডিত্যের নিকট আত্মরক্ষার উপায় (অপমৃত্যু নিবারণের পন্থা) জিজ্ঞাসা করেন। জ্যোতির্বেত্তা নিষ্কণ্টক বা কোমল মৎস্য ভক্ষণের বিধান করিলেন। এই বিধানানুসারে নৃপতি প্রতিদিন পদ্মা হইতে অনায়াস ভোজ্য কাচকি মৎস্য আনাইবার নিমিত্ত এক পথ প্রস্তুত করান। তদবধি ঐ পথ 'কাচকি দরজা' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। দরজা ফরিদপুর মুখে পদ্মার সহিত সম্মিলিত হয়। আজিও স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অনেকের এই প্রকার বিশ্বাস আছে যে, কোন এক সন্ন্যাসী রাজার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার মানসে তাহার বহির্বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হন। সন্ন্যাসী দ্বারপালদিগকে বল্লালের দর্শন প্রার্থনা জানাইলে তাহারা নৃপবল্লভ বল্লালের নিকট সমস্ত নিবেদন করিল। রাজা তৎকালে নিদ্রাকর্ষণে বিমোহিত ও বিচেতনপ্রায় ছিলেন। দ্বাররক্ষক ঐ কথা সন্ন্যাসীকে জানাইল। কিন্তু সন্ন্যাসী 'রাজাকে আশীর্বাদ দিব' বলিয়া পুনরায় তাঁহার দর্শন লাভ প্রার্থনা করিলেন। বারংবার এইরূপ প্রার্থনা করাতে রাজা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, দ্বারপাল! তুমি যাইয়া সন্ন্যাসীকে বল, আমি এখন তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণে ইচ্ছুক নহি। ইচ্ছা হয় তিনি তাহা কোথাও রাখিয়া যাউন। সন্ন্যাসী তচ্ছ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া পথ প্রান্তবর্তী আলানোপরি আশীর্বাদ রাখিয়া গেলেন। আলানটি গজারি বৃক্ষের ছিল। তদবধি আশীর্বাদ পাইয়া কর্তিত গজারি বৃক্ষ শাখাপল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। উহা এখনও জীবিত আছে। এটি কৌতুকাবহ ব্যাপার সন্দেহ নাই।

মহামতি বল্লাল সেন ঢাকা উর্দুর বায়ু কোনস্থ অল্পতর বনাকীর্ণ আবর্জনা সম্পূরিত স্থানকে বাসোপযোগী করিয়া তথায় ঢাকেশ্বরীর মন্দির নির্মাণ ও তাহার সম্মুখভাগে এক অনল্প পরিসর পুষ্করিণী খনন করান এবং তাহার আদেশানুসারেই ঢাকেশ্বরী সেবার জন্য কয়েকজন ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতে থাকেন।

মনুজনাথ বল্লাল সমরনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াও বিলক্ষণ যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার

মৃত্যুবিষয়ে এক আশ্চর্য কিংবদন্তী আছে। অনেকে বলেন মুসলমানদিগের প্রতি রাজার পূর্বাবধি আন্তরিক কিছু ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল।[১১] একদা বাও আদম নামক কোন যবন শূর স্বজাতির অবমাননায় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া প্রস্তর নির্মিত মুদ্গর হস্তে ধারণপূর্বক বল্লালের বহির্ভবনে আসিয়া উপস্থিত হয়। বাও আদমের ফকিরী ব্যবসায় ও মহম্মদীয় ধর্মে নিতান্ত অনুরাগ ছিল। সে রাজার অনুচরদিগকে মহা আস্ফালন সহকারে বলিল "কোথায় তোদের বল্লার রাজা? সে বহুকাল হইতে মুসলমান জাতির প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। এই ফকির বাও আদম তাহারই প্রতিশোধ করিবার জন্য আজি উপস্থিত হইয়াছে। আজি আমারই ফকিরালী যায়, কি তাহাকেই বল্লালিত্ব হারাইতে হয়, তাহার স্থিরতা নাই। প্রতিহারিগণ শশব্যস্ত হইয়া রাজাকে সংবাদ প্রদান করিল। বল্লাল তচ্ছ্রবণে বিস্মিত চিত্তে বিবেচনা করিতে লাগিলেন "আমি নিয়ত প্রজামণ্ডলীর হিতসাধনে ব্যস্ত থাকি ; কেহ কখনো মনোবেদনা না পায় আমি এই নিমিত্ত প্রকৃতিপুঞ্জের মুখাপেক্ষী। বিচার বিষয়েও আমার জ্ঞান সত্ত্বেও কাহার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করি নাই। অথবা দ্বারপালেরা যে আমার সহিত, ভয় দেখাইবার জন্য, প্রতারণা করিবে তাহাও মনে করিতে পারি না। এখন নিশ্চয়ই জানিলাম, বিধি আমার প্রতি আর অনুকূল নহেন। আজি বুঝি রাজশ্রী বল্লালকে পরিত্যাগ করিয়া যবনাঙ্কগতা হইবেন।"

এইরূপ চিন্তার পর মহানুভব ভূপতি পুত্রকলত্রদিগকে আহ্বানপূর্বক বলিলেন 'অদ্য আমাকে আগন্তুক এক যবনের সহিত সমরে প্রবেশ করিতে হইবে। রাজ্যরক্ষা রাজার প্রধান ধর্ম ও কর্তব্য কর্ম। এখন বিদ্রোহ দমন করিতে না পারিলে কাপুরুষ বলিয়া সর্বত্র আমার অপযশ ঘোষণা হইবে। আমি কোন অনুচর সঙ্গে নিব না, কারণ উপস্থিত যবন একাকী। সুতরাং আমিও একাকী যাইব। আমি তোমাদের সমক্ষে এই কপোতটিকে অঙ্গবস্ত্র মধ্যে করিয়া নিতেছি। যদি জয়লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাকে পুরীতে প্রবিষ্ট দেখিতে পাইবে ; পরাভূত হইলে মুসলমানদিগের আধিপত্য হইবে। তখন তোমাদের জীবনধারণ করা বিড়ম্বনামাত্র বলিতে হইবে। তোমরা এখন হইতেই এক 'অগ্নিকুণ্ড' প্রস্তুত করিয়া রাখ। যখন দেখিবে এই কপোত উড়িয়া আসিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই মনে করিবে, আমি নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছি। সেই সময়ে তোমরা অপেক্ষা না করিয়া কুণ্ড মধ্যে প্রবেশপূর্বক হিন্দুবংশের গৌরব বর্ধন ও আপনাদের কীর্তিপতাকা স্থাপন করিবে।

এই বলিয়া বল্লাল সেন অস্ত্রশস্ত্র সমভিব্যাহারে বাও আদমের সমরে যাত্রা করিলেন। রাজবাটির অনতিদূরে এক বিস্তৃত উদ্যানে সেই যুদ্ধ হয়। প্রত্যুষ সময়ে যুদ্ধারম্ভ হইল। হিন্দু ও যবন উভয়েই মহাবীর্য সম্পন্ন ও প্রচুর সাহসী। সংগ্রাম চলিতে লাগিল। জয়লক্ষ্মী কোন পক্ষাবলম্বিনী হইবেন তাহার স্থিরতা রহিল না। আবালবৃদ্ধ সকলেই বল্লালের প্রজাবৎসলতাগুণে সমৃদ্ধ হইয়া তাঁহারই বিজয় প্রার্থনা করিতে লাগিল। এই সময়ে সর্বলোক প্রকাশ কমরীচিমালী মস্তকোপরি আরোহণ করিলেন। অবশেষে বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরের কালে ফকির সাহেব রণশায়ী হইলেন। তখন সকলে চতুর্দিক হইতে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল,[১২] কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! নৃপচূড়ামণি বল্লাল সেন রণশ্রমে পিপাসাতুর হইয়া জলপান করিতেছেন, ইত্যবসারে হঠাৎ কপোতটি মুক্ত বস্ত্র হইয়া আকাশপথে উড্ডীয়মান হইল। তখন রাজা ব্যস্ত সমস্ত ও হতাশ হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্বেই কপোত দর্শন করিয়া আত্মীয়েরা অগ্নি-প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং বল্লাল পরিজন শোকে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ জ্বলন্ত অনলে জীবনাহুতি দিলেন। তাঁহার (বল্লালের) যে শস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল, এই তাহার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি আপনার ঐশ্বর্যকে তাদৃশ গৌরবের কারণ মনে করিতেন না।

নওপাড়ার চৌধুরী ঃ

নওপাড়া। অত্রত্য চৌধুরীগণ নিরতিশয় প্রতাপসম্পন্ন ও ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। বিখ্যাত রঘুনন্দন দাস এই চৌধুরীদিগের পূর্বপুরুষ ছিলেন। অনেকে বলেন রাজবল্লভ অপেক্ষা ইহাদের

জনবলও সাহসিকতা অধিক ছিল। যাহা হউক ইহারা সাধারণত লোকের প্রতি অনেক অত্যাচার ও তাহাদের মানহরণ ও অপকার করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের কৃতকার্য কলাপের বিষয় শ্রবণ ও স্মরণ করিলে অনায়াসেই তৎসমস্তের প্রমাণ প্রত্যক্ষীভূত হইবে। যখন আরাকানে ব্রহ্মদেশীয়দিগের সহিত ইংরাজদিগের সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তখন কতিপয় রণপোতারোহণে কয়েকদল পশ্চিমাঞ্চলীয় সিপাই আরাকানভিমুখে গমন করে। পথিমধ্যে নওপাড়ার নিকট উপস্থিত হইলে তাহাদের আহারের সময় হয়। নওপাড়ার চৌধুরীদিগের অনেক কদলী বাগান ছিল। সিপাইগণ কদলী পত্রে বাসনের কার্য সম্পাদন করিত। সুতরাং উহার আবশ্যক হওয়াতে তাহারা তীরে নামিয়া বাগানে প্রবেশ করে। প্রবেশকালে চৌধুরীগণের লোকেরা তাহাদিগকে অনেক প্রকার নিষেধ বাক্য বলে। কিন্তু রণকুশল সিপাইবৃন্দ তাহাদের কথায় ভীত না হইয়া অশঙ্কিতচিত্তে পাত কাটিতে থাকে। দারপালগণ চৌধুরীদিগকে এ বিষয় জ্ঞাপন করিলে তাহারা তাহাদিগকে (সিপাইদিগকে) প্রহার ও তাহাদের যানসমূহ নদীগর্ভে নিমগ্ন করিবার আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে চৌধুরীবৃন্দের সেনাগণ বীরত্ব প্রদর্শন পূর্বক সিপাইদিগের অনেককে হত ও অনেককে আহত করে। তাহাদিগের পোতাবলী জলমগ্ন করিয়া তাহাদিগকে যার পর নাই দুরবস্থা করিয়া দেয়।

এই সংবাদ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইলে তাহারা চারিজন প্রধান দারোগার উপর এ বিষয়ে তদন্ত করিবার ভার দেন। দারোগাগণ নওপাড়া উপনীত হইবামাত্র তাহাদের তিনজনকে চৌধুরীবৃন্দ নানাবিধ বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে বন্দি করিয়া রাখেন। অবশিষ্ট ব্যক্তি অতি কষ্টে পলায়ন করিয়া এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনা গবর্নমেন্টের গোচর করেন। গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে এ রূপ অত্যাচারিত মনে করিয়াছিলেন যে, তাহারা, যাহাতে সমূলে চৌধুরীগণ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ আদেশ করিলেন। চৌধুরীদিগের গৃহতোপ দ্বারা জ্বালিয়া দেওয়ার অনুমতি হয়। অনন্তর গবর্নমেন্ট প্রেরিত সৈন্যবৃন্দ তোপাগ্নিতে চৌধুরীদিগের বাটি ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। যে চৌধুরীগণ দোর্দণ্ডপ্রতাপবলে দাঙ্গা হাঙ্গামাদি করিয়া সকলের মনে মহা আতঙ্কের উৎপাদন করেন যাহাদের ভয়ে নদীমার্গ দিয়া বহুমূল্য দ্রব্যপূর্ণ নৌকা শ্রেণীর গমন অসাধ্য হইত, যাঁহারা দেখিবামাত্র সুন্দরী কামিনীদিগকে বলপূর্বক মন মদে মত্ত হইয়াছিলেন, সেই বহু প্রতাপ সম্পন্ন নওপাড়ার চৌধুরীগণ এইরূপে একটি সামান্য ঘটনায় একবারে বিপন্ন ও উৎসন্ন হইয়া যান।

চৌধুরীবৃন্দ আর একটি কার্য করিয়া সর্বত্র অযশ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহারা এরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হন যে এক রাত্রিতেই শার্ধ সপ্তশত নফর করিতে হইবে। এই অনষ্টকারী প্রতিজ্ঞার ভাবে পরিচালিত হইয়া চৌধুরীগণ দেশ মধ্যে ও চতুর্দিগে লোক প্রেরণপূর্বক ভদ্রলোকসমূহ আনয়ন করিয়া নফরখত লইতে লাগিলেন। এইরূপে ছোট কায়স্থের মধ্যে শত শত উন পঞ্চাশ ঘর নফর করিলেন। আর একঘর অবশিষ্ট থাকে। তখন ভাবিলেন "নিজ বংশ বৈদ্যগণের মধ্যে করিব না। কায়স্থও (ছোট ভদ্রগোছের) পাওয়া যায় না। অতএব একঘর ব্রাহ্মণকেই নফর শ্রেণীস্থ করা যাউক।" তদনুসারে বলপূর্বক একঘর ব্রাহ্মণ তাহারা নফর করেন। কি অত্যাচার! কি অত্যাচার!!

মহাতরঙ্গবতী কীর্তিনাশা এখন নওপাড়ার অস্থিপঞ্জর পর্যন্ত উদরস্থ করিয়াছে। উহার কিছুমাত্র চিহ্ন লক্ষিত হয় না।

চাঁদরায় ও কেদাররায় ঃ

ফুলবাড়িয়া—স্রোতস্বিনী কীর্তিনাশা তরুণাবস্থায় যে তেত্রিশখান পল্লীকে উদরসাৎ করিয়া স্বীয় নামের গৌরব ও সার্থকতা সম্পাদন করেন, চাঁদরায় ও তৎপুত্র কেদার রায় নামক বিখ্যাত ব্যক্তিদ্বয় তৎসমুদায়ের অন্যতম গ্রাম ফুলবাড়িয়া নিবাসী ছিলেন। তাঁহারা প্রভূত পরাক্রমশালী ও বদান্য ছিলেন। তাঁহাদের এরূপ প্রতিপত্তি ছিল যে আজিও আশিশু সকলের

মুখে ক্ষমতার পরিচয় প্রদান সময়ে তাঁহাদের নাম শ্রুত হয়। রায়দিগের বিভাগও অনল্প ছিল। ইঁহাদিগের কার্যাবলী সম্বন্ধে নানা প্রকার কিংবদন্তী আছে।

এমত কথিত আছে যে, চাঁদরায় পিতৃব্যপুত্রগণ কর্তৃক অশেষ প্রকারে অত্যাচারিত হইয়া পরিশেষে জমিদারি লাভে এককালে বঞ্চিত হন। মনন্তর চাঁদরায় নিজ জীবনে বীতৃষ্ণ হইয়া তাহার বিসর্জন মানস করিয়া ভগবতীর আরাধনা ও ধ্যানে প্রবৃত্ত হন। দেবীর প্রতি চাঁদরায়ের অকৃত্রিম ভক্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। ভক্ত বৎসলা দেবী চাঁদরায়ের স্তুতিতে নিতান্ত প্রীতা হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভুতা হন। স্কন্দজননী তাঁহার জীবন পরিত্যাগের কারণ অবগত হইয়া এই বলিয়া উৎসাহ দিতে লাগিলেন "বৎস"! তুমি জীবিতাশা পরিত্যাগ করিও না। যদিও তোমাকে অত্যন্ত হীনবল দেখিতেছি। কিন্তু এখন হইতে তোমার দলবল প্রবল হইবেই হইবে। ব্রহ্মাণ্ডগিরি তোমার ইষ্ট দেবতা। যাও, তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য করিতে থাক। তোমার মনোরথ অবশ্যই সিদ্ধ হইবে এই বলিয়া জগদম্বিকা অন্তর্হিতা হইলেন। চাঁদরায় তদবধি ইষ্টদেবতার নিকট পরামর্শ লইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্বে যে প্রজামণ্ডলীর একজন মাত্রও তাঁহার পক্ষ সমর্থনকারী ছিল না, এখন ক্রমে তাহাদের সকলেই চাঁদরায়ের দলস্থ ও বশীভূত হইল। মহাবল চাঁদরায় এইরূপ প্রোৎসাহিত হইয়া দায়াদবৃন্দের পরাজয় সম্পাদন করেন। অনন্তর সমস্ত জমিদারি ইঁহার হস্তগত হয়। সূচ্যগ্র ভুমিও তাঁহার পিতৃব্য পুত্রদিগের অধিকারে রহিল না। অনেকের মত, চাঁদরায় অতি প্রাচীনকালের বিখ্যাত বারভূঁইয়ার (ভৌমিক) এক ভূঁইয়া বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। একথা একালে অলীক ও ভ্রমাত্মক বোধ হয় না।

চাঁদরায়ের পুত্র কেদাররায়ও একজন অসামান্য লোক ছিলেন। ইঁহাদের বাসভবন নিরতিশয় প্রশস্ত ছিল। ইঁহারা কার্তিকপুরের নিকটবর্তী কোন স্থানে এক বাটি নির্মাণ করান। উহাও অল্প পরিসর নহে। উহার চতুর্দিকস্থ প্রাকার এত অধিক স্থান বেষ্টন করিয়াছিল যে অধুনা তাহার গর্ভস্ত ভূমিতে প্রায় ৪৫০ টাকা স্থিত হইয়াছে। ইহাতে অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, কতটি লোক উহার মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। ঐ বাটি "কেদার বাটি" শব্দে বিখ্যাত। কেদাররায় কীর্তিনাশার উত্তরতটে রাজাবাড়ি নামক স্থানে অন্য এক বাটি নির্মাণের মানস করেন। প্রথমত তথায় আসিয়া এক অনল্প উচ্চ মঠ দেওয়ান। এরূপ উক্ত আছে যে, মঠ নির্মাণকার্য পরিসমাপ্ত হইলে কেদার রায় স্থপতিকে জিজ্ঞাসা করেন, এই মঠ আরো উচ্চ হইতে পারে কিনা? স্থপতি বলিল "টাকা ব্যয় করিলে কেন না হইবে?" কেদাররায়, মঠ এতদপেক্ষা উচ্চ হইল না কেন? ইহাতে রাগান্বিত হইয়া তাহার (স্থপতির) প্রাণবধের আজ্ঞা দেন। কোন প্রকারেই ঐ আজ্ঞার রোধ করা গেল না। অবশেষে স্থপতি, বোধহয় অপমরণে গ্লানি জ্ঞান করিয়াই, বলিল "মহারাজ! মঠোপরি আমার কাজের কিছু বাকি আছে। আমি তাহা পূরণ করিয়া আসি ; পরে আমার প্রাণ বধ হউক।" কেদাররায় তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর স্থপতি উত্থিত হইয়া যেমন মঠের স্বর্ণচূড়া ধরিল, অমনি তৎসহ ভূতলে নিপতিত হইয়া গতাসু হইল। এই ভগ্নচূড় মঠ অদ্যাপি বর্তমান আছে।

এই প্রকার উপন্যাস আছে যে, একদা অর্চনার্থ কালী দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা তাঁহাদের বাটিতে আনীত হয়। পুরোহিত প্রবর তাম্বুল চর্বণ করিতে করিতে তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হন। অগত হইবামাত্র রায়গণ বলিলেন কি পুরোহিত ঠাকুর! আপনি যে পান চিবাইতেছেন? আপনাকে ত পূজা করিতে হইবে। উপবাসী থাকিতে হয় নিয়ম আছে। আপনি বেশ উপবাসী রহিয়াছেন। আপনারাই শাস্ত্র করেন, আবার মহাশয়েরাই তাহার মাথা খাচ্ছেন, পুরোহিত তচ্ছ্রবণে অভিমানান্ধ হইয়া বলিলেন, আচ্ছা! আমি দেখিব, কালী কেমন ভোক্তার হস্তে পূজোপহার গ্রহণ না করেন। আমার কিছু ক্ষমতা নাই, আজি তোমাদিগকে তাহা প্রদর্শন করিতে হইবে। অনন্তর পূজায় উপবেশন কালীন ঋত্বিকবর স্বকীয় প্রভাব প্রদর্শন করিবার আশয়ে হস্তস্থিত তীক্ষ্ণ ছুরকা যেমন কালীর জানুদেশে বিদ্ধ করিয়া দিলেন অমনি, সত্য সত্যই, সেই স্থান দিয়া অবিরল শোণিত ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এতদ্দর্শনে

সমাগতলোকবৃন্দ যারপরনাই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় রহিলেন। সকলেই পুরোহিতকে অলৌকিক গুণসম্পন্ন বলিয়া প্রশংসা ও ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে মহাসমারোহে পূজার কার্য নির্বাহিত হইল।

অপর এক দিবস সেই পুরোহিত মহামতিই কোন আপন হইতে পানাশয়ে সুরা ক্রয় করিলেন, সঙ্গে অর্থ ছিল না। তিনি বিক্রেতাকে বলিলেন, আমি মদীয় যজমান চাঁদরায় ও কেদাররায়ের বাটি হইতে তোমার প্রাপ্য লইয়া আসিতেছি। তখন দিনমণি প্রায় মস্তকোপরি আরোহণোন্মুক হইয়াছিলেন। দ্বিজ বলিলেন, "হে ব্যবসায়িন! আমি বলিতেছি যে, সূর্যদেব এখন যে স্থানে অবস্থিত আছেন। এই স্থান হইতে স্থানান্তর হইতে না হইতেই আমি তোমাকে মূল্য আনিয়া দিব।" বিপান স্বামী তথাস্তু বলিয়া সম্মত হইলেন। ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন, কোথায় গেলেন স্থিরতা রহিল না। সুরাপায়ী একপ্রকার উন্মত্ত সন্দেহ নাই। কতক্ষণ যায় দ্বিজ সত্তম আর প্রত্যাবৃত্ত হন না। সুরা বিক্রয়ী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রায় নিকেতনে সমুপস্থিত হইলেন। চাঁদরায় কেদার রায় আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ভাল আমরাই তোমার প্রাপ্য দিব, শৌণ্ডিক প্রত্যাবৃত্ত হইলে ঐ পুরোহিত বহু বিলম্বে আসিয়া তাহাকে সুরার মূল্য প্রদান করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! ব্রাহ্মণ আসিবামাত্রই সূর্যদেব পূর্ব নিরূপিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে প্রস্থান করিলেন। রজনী তখন দেড় প্রহর প্রায় হইয়া উঠিল; নক্ষত্র জগৎ সুপ্রকাশিত করিয়া নভোদেশ পরিশোভিত করিল; চন্দ্র শান্তিপ্রদ কিরণাবলী বিস্তারপূর্বক জনগণের হৃদয়ানন্দ বর্ধন করিতে লাগিল। আমরা পাঠ করিয়াছি, বীরেন্দ্র পবন তনয় লক্ষ্মণকে শক্তিশেল হইতে রক্ষা করিবার জন্য গন্ধমাদন গিরি হইতে ঔষধ আনয়নকালে ভানুদেবের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপনচ্ছলে তাঁহাকে স্বকক্ষস্থ করিয়াছিলেন এবং কার্য সিদ্ধ্যনন্তর রবিকে কক্ষ হইতে মুক্ত করিয়া দিলে রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর হইয়াছিল। সর্বতোভাবে এ কার্যটি ঠিক তদনুরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রত্যুত অঞ্জনাকুমার অপেক্ষা উল্লিখিত দ্বিজের অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছিল। এ প্রস্তাবটি যারপরনাই কৌতুকাবহ সন্দেহ নাই।

রাজা রাজবল্লভ ঃ

রাজনগর বৌলাসার, শুকসার, চাপেরবাড়ি, নারিকেলতলা, আঁকসাইল, খিলগাও, ফরায়গাও, পশ্চিমপাড়া, পশাইল, শিবেরদিঘির পাড়, খার চাকা, গয়ঘর প্রভৃতি পল্লী রাজনগরের অন্তর্নিবিষ্ট। এই স্থানে সুবিখ্যাত রাজবল্লভ প্রভূত পরাক্রম সহকারে বাস করিতেন। মহারাজ রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদার। ইনি তত বড় প্রতাপ সম্পন্ন ছিলেন না। মজুমদার মহাশয় কাননগুইর সেরেস্তার মোহরের ছিলেন। মালখানগরের বসু বিশেষ তখন কানগুই বলিয়া পরিচিত হন। রাজবল্লভ অতিশয় প্রিয়দর্শন ছিলেন[১৬]। ইনি প্রথমত মুর্শিদাবাদস্থ প্রসিদ্ধ ধনী জগৎশেঠের কার্যালয়ে অল্প বেতনে একজন সামান্য মোহরের ছিলেন। প্রবাদ আছে একদা নবাব পরিভ্রমণ কালে জগৎশেঠের কার্যালয়ের পার্শ্বদেশ দিয়া যাইতেছিলেন। রাজবল্লভ তখন সেই গৃহে নিদ্রিত থাকেন। নবাব গমনকালে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার পদতলে পদ্মচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। নবাব গৃহে যাইয়া রাজবল্লভকে তাহার নিকট উপস্থিত হইতে তৎক্ষণাৎ আদেশ করেন। শেঠগণ "প্রোক্ত আদেশে নবাব ভ্রমণ কালীন তাহাদের মোহরেরকে নিদ্রিত দেখিয়াছেন। অতএব ইহার প্রাণ বধ করিবেন" এই স্থির করিয়া নিতান্ত ব্যস্ত হইলেন। রাজবল্লভ নবাবের আদেশে তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহার প্রতি পরম সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, জগৎশেঠ তোমাকে যত বেদন দেন, তদ্ব্যতিরেকে আমি তোমাকে মাসিক পঁচিশ টাকা করিয়া বেতন দিব! নবাবের সম্মুখস্থ সকল লোক তদর্শনে বিস্মিত হইয়া নবাবকে ধন্যবাদ ও রাজবল্লভকে প্রশংসা করিতে লাগিল। নবাব আরও রাজবল্লভের অধ্যয়ন জন্য তাঁহার বাটিস্থ মুন্সিকে আদেশ দেন। তদনুসারে রাজবল্লভ তথায় শিক্ষানিরত হইয়া মনোযোগ সহকারে অল্প দিন মধ্যেই পারসিভাষায় বিলক্ষণ বিচক্ষণ হইয়া উঠেন।

এইরূপে ক্রমে তাঁহার উন্নতিও লক্ষিত হইতে থাকে। অনন্তর প্রায় ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার বৃদ্ধ নবাব সুজাউদ্দীনের পুত্র সরফরাজ খাঁ আপনার আত্মীয় পুত্র মুরাদ আলীকে যখন ঢাকা প্রদেশের ডেপুটি গবর্নর করিয়া প্রেরণ করেন, তখন রাজবল্লভ তাঁহার পেস্কার হইয়া আসেন। ইহারা উভয়েই প্রজাপীড়ন করিয়া রাজ্যশাসন ও ধনোপার্জন করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়ে যশোবন্ত সিংহ ঢাকায় সরফরাজ খাঁর ডেপুটি নায়েব নাজিম ঘালিব আলির দেওয়ান ছিলেন। তিনি মুরাদ ও রাজবল্লভের তাদৃশ দৌরাত্ম্য দর্শনে বিরক্ত হইয়া স্বপদ পরিত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁহাদের দুর্ব্যবহার এতাদৃশ প্রবল হয় যে, তাহাতে সমস্ত দেশ যার পর নাই বিপন্ন ও দুরবস্থ হইয়া উঠে। ভাটি অঞ্চলস্থ বোজের গোমেদপুর লইয়া রাজবল্লভের জমিদারির সূত্রপাত হয়। পরে তিনি সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভূসম্পত্তিরও বৃদ্ধি করিয়া অসামান্য রাজস্ব সুখ সম্ভোগ করিতে থাকেন। তাঁহার মহীয়সী কীর্তি এবং বিপুল ঐশ্বর্য ছিল। অনেক ইতিহাসে রাজবল্লভের নাম অদ্যাপিও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। একদা সমস্ত প্রদেশের রাজলক্ষ্মী তাঁহার গৃহে আশ্রিতা এবং বহুকাল অচলা ছিলেন। আজিও আবালবৃদ্ধ সকলে রাজনগরের রাজদিগের নামোল্লেখ ও তাঁহাদিগের কার্যাবলী স্মরণ করিয়া অনেক আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিক্রমপুরস্থ জমিদার ও তালুকদারদিগের গৃহে এখনও তৎসাময়িক দলিল দস্তাবেজাদি চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। ফলত আমরা রাজবল্লভের ন্যায় প্রতাপশালী ও কীর্তিমান ভূপতি অতি অল্পই দর্শন করিয়া থাকি। রাজাধিরাজ রাজবল্লভের যশোরাশির অনেক নিদর্শন আজিও দণ্ডায়মান থাকিয়া কালের করাল হরণ শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদর্শন করিতেছে।

নৃপতির বহির্বাটিস্থ সিংহদ্বারোপরি উচ্চতুঙ্গ চূড়াসম্বলিত এক বিংশতি রত্ন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সিংহদ্বার ধনুর আকারেই টক নির্মিত। অনেকে ঐ রত্নরাশি গণনাকালে ভ্রম প্রমাদে নিপতিত হইয়াছেন। সচরাচর সাধারণ লোকে উহাকে "একুশ রত্ন" শব্দে অভিহিত করে। রত্নরাজি প্রোত্তোবস্থায় বিরাজমান থাকিয়া নানা দেশীয় ভ্রমণকারী ও দর্শকবৃন্দের মনোনেত্র আশ্চর্যরস পরিপ্লুত করিতেছে। কিয়দ্দুরে ইষ্টকগঠিত একটি দোলমঞ্চ সংস্থাপিত রহিয়াছে। দোলমঞ্চ এরূপ উচ্চ যে, তাহার চূড়ার প্রতি অবিশ্বাস জন্মে। দোলটি সপ্তদশ রত্নে মণ্ডিত ও সুশোভিত। মূল প্রদেশের চতুষ্কোণে চারিটি, তদনন্তর দোলমঞ্চের প্রথম স্তম্ভের (যাহাকে সচরাচর "থাক" কহে) চারি কোণে চারিটি তৎপর মধ্য স্তম্ভে চারিটি, তদূর্ধ স্তম্ভদেশে অপর চারিটি রত্ন এবং চূড়ার উপর অবশিষ্ট রত্নটি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রত্নাবলী ক্রমান্বয়ে উচ্চ। এই দোলের সর্বোচ্চ শিখরোপরি উত্থিত হইয়া অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিলে পথবর্তী গমনশীল লোকদিগকে ক্ষুদে বিড়াল অপেক্ষা অধিক বড় দেখায় না, এবং ঈদৃশী তরঙ্গময়ী সুবিস্তৃতা পদ্মাকেও একখানি ক্ষুদ্রপরিসর ধৌত উত্তরীয় বসনবৎ ভ্রম হয়। বস্তুতৎ একুশ রত্ন হইতে সপ্তদশ রত্ন যে অপেক্ষাকৃত সমধিক আর্যদর্শন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। দোলমঞ্চোপরি একাদিক্রমে গোপনপংক্তি অতিক্রম করিয়া উঠিতে হইলে স্থানে স্থানে দুই তিন বার বিশ্রাম করিতে হয়। প্রতি বৎসর এই ইষ্টক বিনির্মিত দোলমঞ্চেই মহারাজ রাজবল্লভ মহাসমারোহে উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। উৎসব সময়ে ঋত্বিগণ বোঝায় বোঝায় "লক্ষ্মীনারায়ণের" বলিয়া অভিহিত হয়। উত্থাপনান্তে ঠাকুরকে এত অধিক পরিমাণে আবীর দেওয়া হইতে যে, তাহাতে সমুদায় গ্রাম আচ্ছাদিত ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত।

শ্রুত আছে, নৃপতিপুঙ্গব রাজবল্লভের আদেশানুসারে ছয় পশুরি (ত্রিশ সের) সুবর্ণ দ্বারা একটি কাত্যায়নী দেবীর প্রতিমূর্তি নির্মিত হয়। প্রতিদিন মহা আড়ম্বর সহকারে উহার অর্চনা কার্য নির্বাহিত হইত। অধুনা তাহার চিহ্নও আছে কিনা সন্দেহস্থল। রাজবাটির অধিকাংশ স্থলই সম্প্রতি ভয়ানক ভুজঙ্গ ও হিংস্র জন্তু নিচয়ের আবাসভূমি হইয়াছে। তাহাদিগের ভীম গর্জনে নিকটস্থ হওয়া কাহার সাধ্য? রত্নাবলী নানাপ্রকার জঙ্গল লতায় আচ্ছাদিত থাকাতে

বোধ হইতেছে যেন তাহারা রাজবলীর বিয়োগশোকে অধীর ও ব্যাকুল হইয়া বল্লীরূপ মলিন বসন এবং দ্রুমরূপ শ্মশ্রু ধারণ করিয়া সংসারের অনিত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে, এবং কার্মুকাকারে অবস্থিত থাকিয়া যেন দুরন্ত কৃতান্তের চরণে প্রণত রহিয়াছে।

রাজা রাজবল্লভ কতকগুলি সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকা খনন করাইয়া যান। তৎসমুদায়ের এক একটি এরূপ দীর্ঘ যে, এক তট হইতে বন্দুক ধ্বনি করিলে তটান্তরস্থ লোকেরা শুনিতে পাইত না। ব্যবহারানুসারে তাহাদের নামকরণ হইয়াছে। মহারাজ যে দীর্ঘিকায় স্নান করিতেন তাহার নাম "রাজসাগর"। রাজ্ঞীদিগের স্নান দীর্ঘিকার নাম "রানীসাগর"। ধাত্রীদিগের স্নান জন্য খনিত দীঘি "ধাইসাগর" এবং অনুচরগণ যে জলাশয়ে শুকপক্ষীকে স্নান করাইত তাহা 'শুক সাগর" বলিয়া অভিহিত। তদতিরিক্ত আর আর অনেকগুলি পুষ্করিণী ছিল। রাজবাটির চতুর্দিকে যে চৌগাড়া ছিল তাহার পরিসর পদ্মার কোন কোন শাখা নদী অপেক্ষা বড় ন্যূন হইবে না। উল্লিখিত জলাশয় সমূহের অধিকাংশই পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে কেবল স্থানে স্থানে ভগ্নাংশ মাত্র রহিয়াছে।

রাজার বহির্বাটির নিকট হইতে রাজাবাড়ি কেশারমার দীঘিরপাড়[১৪], মাকোহাটি বজ্রযোগিনী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া ঢাকা নগরীর সম্মিলিত একটি সুপ্রশস্ত পথ নির্মিত হয়। তাহার পার্শ্বদ্বয়ে বৃক্ষ শ্রেণীরোপিত ছিল। অদ্যাপিও স্থানে স্থানে ঐ "রাজদরজার" চিহ্নরাশি নয়ন পথের আতিথ্য স্বীকার করিয়া থাকে।

রাজবল্লভের সাত পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র রামদাস। ইনি ঢাকার নবাবের সহকারী ছিলেন। ইনি শৈশব কালাবধিই অত্যন্ত সাহসী চতুর ছিলেন[১৫] কিন্তু অনুচিত চপলতার জন্য অনেক লোকের অপ্রীতিভাজন হন। রামদাস সাধারণ লোকের কামিনীদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার অনুজ কেবলকৃষ্ণ কোন কার্য করিতেন না ; ইঁহারা উভয়েই পিতা জীবিত থাকিতে মানবলীলা সংবরণ করেন। তৃতীয় পুত্র গঙ্গাদাস, ইনি রাজোপাধি লাভ করেন। ইঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাস বাহাদুর। ইনিই বাংলার নবাব দুর্বৃত্ত সিরাজউদৌলার ভয়ে ভীত হইয়া ইংরেজ কর্মচারী ডে সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজবল্লভের পঞ্চম তনয় রায় গোপালকৃষ্ণ, এই মহোদয়ই কার্তিকপুরের মুন্সিদিগের সঙ্গে সংগ্রাম করেন। ইঁহার কনিষ্ঠ রায় রাধামোহন ও কেবলরাম। রায় রাধামোহনও নবাব সরকারে কাজ করেন। গঙ্গাদাসের পুত্র কালীশঙ্কর। ইনি জমিদারি উপভোগ সহকারে কালক্ষেপ করিয়াছেন। নিত্যানন্দ, স্বরূপচন্দ্র, অভয়চন্দ্র, নবকুমার ও ঈশানচন্দ্র নামধেয় তাহার এই পাঁচ পুত্র জন্মে। আজি তাঁহাদিগের বংশ প্রভাতকালীন চন্দ্র কিরণের ন্যায় নিষ্প্রভরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

রাজা রাজবল্লভ যে উল্লিখিত রূপ যশো বিস্তার করিয়াই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন এমত নহে। অন্যান্য বহুবিধ সৎকার্যের অনুষ্ঠানের জন্যও তাঁহার বিলক্ষণ কীর্তি আছে। তিনি আপনার অষ্টম বর্ষীয়া বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত অনেক প্রয়াস ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে ভূপতি সর্বদেশীয় পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা প্রাপ্তির জন্য স্বদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ প্রথমত কান্যকুব্জে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য প্রধান পণ্ডিতমণ্ডলীর সমীপে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা প্রার্থী হন। তাঁহারা রাজপ্রেরিত অধ্যাপকদিগকে মহা সমাদর করিলেন। ব্রাহ্মণবৃন্দের আগমন কারণ তত্রত্য আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেরই কর্ণগোচর হইল। পণ্ডিতনিচয় বিধবা বিবাহের ঔচিত্য বিধায়িনী ব্যবস্থা প্রদান করিলেন। এবং ঈদৃশ উন্নমনস্কতার কার্যে রাজবল্লভের তাদৃশী উৎসুকতা দর্শন করিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণগণ তথা হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহারা নেপালে উপনীত হইয়া সম্ভ্রম সহকারে সমাদৃত হইলেন। তত্রত্য ব্যবস্থাপকগণ প্রথম তাঁহাদিগের (ব্যবস্থা জিজ্ঞাসুদিগের) অনুকূল মত প্রকাশ করিলেন কিন্তু মনের কি আশ্চর্য পরিবর্তন, কি বিচিত্রভাব! তথাকার হিন্দু ধর্মানুরাগী আত্মাভিমানী লোকের

অনুরোধেই হউক[১৬] অথবা কুৎসিত দেশাচারের প্রভাবেই হউক, তাহারা এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে উপহার স্বরূপ একটি গোবৎস আনিয়া দিলেন এবং বলিলেন "বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য আপনাদিগের রাজা চেষ্টিত হইয়াছেন, উহা শাস্ত্র সম্মত সন্দেহ নাই। কিন্তু একুশ দিনের গোবৎস ভক্ষণ যেমন শাস্ত্রনুমোদিত তাহা কলিতে প্রচলিত নাই, সেইরূপ বিধবা বিবাহ যুক্তিসম্মত শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও দেশাচার মতে অবিধেয়। যদি আপনারা এই গোশাবক ভক্ষণ করিতে পারেন ; তাহা হইলে আমরা বিধবা বিবাহে মত ও যোগ দিতে পারি। নৃপ প্রেরিত দ্বিজগণ তৎদর্শন ও শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত ও বিস্মিত হইলেন। তাহারা অন্যত্র গমন করিবেন কি! কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। অনেকে বলেন এই বিষয়ে এক ব্যবস্থাপত্র হয়, তাহাতে নানা দেশীয় অধ্যাপকের নাম স্বাক্ষরিত আছে। আশ্চর্য ও আক্ষেপের বিষয় এই যে, নরেন্দ্র রাজবল্লভও উক্ত কার্যে সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারেন নাই। যাহা হউক ইহা দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, অনেক পূর্বেও এখানে সত্যের প্রখর জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছিল। অদূরদর্শী যে সকল আত্মভিমানী বলিয়া থাকেন যে, এদেশীয়দের মানসিকভাব কোন কালেও তাদৃশ উন্নত ছিল না, আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, রাজবল্লভ কোন দেশীয় ছিলেন? কোথা হইতে তাঁহার এরূপ মনের ভাব হইল? তিনি কি পূর্ব বাংলার নন? দেশের উন্নতির জন্য যে তাঁহার মন অনল্প ব্যাকুলিত ছিল, এই বিবরণটি পাঠ করিয়া সাধারণে তাহা সুন্দর রূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। রাজবল্লভের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এখানকার উন্নতির আশা যে এককালেই তিরোহিত হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

একদা আগারাজা রাজবল্লভের গৃহ লুঠ করিয়া বহুল ধনসম্পত্তি লইয়া যায়। এই ডাকাইতির সময় ঐ ব্যক্তি অনেক অত্যাচারও করে।

এমত প্রবাদ আছে যে ভূপাল 'অগ্নিস্টোম" নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বহু দেশীয় পণ্ডিতসমূহ তাহাতে সমাহূত হন। পণ্ডিতমণ্ডলী সমাগত হইলে নৃপতি তাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য জানাইলেন। তচ্ছ্রবনে তাঁহারা বলিলেন "হে নৃপেন্দ্র! যাহাদিগকে একমাস পর্যন্ত অশৌচ ভোগ করিতে হয় এবং যাহারা দিনের মধ্যে দুই বেলা অন্ন গ্রহণ করে, এতাদৃশ যজ্ঞানুষ্ঠানে তাহাদিগের অধিকার নাই। তৎকালে বৈদ্যদিগের উপবীত ছিল না। রাজবল্লভ তাঁহাদিগের বাক্যকে প্রারব্ধ কার্যের অন্তরায় মনে না করিয়া অকুতোভয়ে তৎসম্পাদন চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সেই সময়ে স্বধন ব্যয়ে সমুদায় বৈদ্যকে উপবীত দান এবং তাহাদিগকে একমাস না হইয়া একপক্ষ অশৌচ ভোগ করিতে হইবে বলিয়া সর্বত্র আজ্ঞা প্রচার করেন। তদবধি বৈদ্যগণ দিনে দ্বি ভোজন করেন না। অনন্তর অতি সমারোহ সহকারে উপস্থিত পণ্ডিতদিগের সমক্ষে যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। রাজবল্লভের কতদূর প্রতাপ ও প্রজারঞ্জনকারিতা গুণ ছিল, এতদ্বারা সকলেই তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। রাজবল্লভের ন্যায় পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন এমন লোক অতি বিরল। প্রায় ১৭৬৩ সালে মুঙ্গেরের নিকট দুরাত্মা নবাব মীরকাসিমের আদেশে রাজবল্লভের প্রাণদণ্ড হয়। যেরূপে ইঁহার মৃত্যু হয় তাহা নিরতিশয় শোচনীয় ও অনল্প খেদজনক। সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের সমগ্র বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিলে যে একখানা বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে তাহার আর সন্দেহ কি?

কার্তিকপুরের মুন্সি ঃ

কার্তিকপুর-অত্রত্য জমিদারবৃন্দ বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী লোক। তাহারা মুসলমান জাতীয় ; মুন্সি বলিয়া সর্বত্র বিখ্যাত। রাজা রাজবল্লভের সময়েও কার্তিকপুরের মুন্সিদিগের নিরতিশয় প্রতাপ ছিল। রাজা রাজবল্লভের সহিত ইঁহাদিগের অল্প প্রতিযোগিতা ছিল না। একদা উভয়ের কলহ উপস্থিত হইলে পরস্পর উভয় পক্ষ হইতেই বহুতর যষ্টিধারী বীরপুরুষ বিবাদমল্ল

হইয়া সংগ্রামস্থলে সমাগত হয়। তাহাতে এত অধিক লোকের প্রাণ বিনাশ হয় যে, সমীপবর্তিনী তরঙ্গিণীর জল তৎকালে শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছিল। মুন্সিদিগের প্রতিই জয়লক্ষ্মীর কিছু রুচি দৃষ্টি হয়।[১৭] অনতিবিলম্বে তাঁহারা (মুন্সিরা) মহাসমারোহ সহকারে এক বৃহৎ কালীমূর্তি নির্মাণ ও তাঁহার পূজা করেন। হিন্দুদিগের দেবদেবীর প্রতি মুসলমানদিগের ঈদৃশ বিশ্বাস দেখিয়া যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ঐ মূর্তি এখনও সংস্থাপিত আছে। আজিও অনল্প সমারোহে উহার অর্চ্চনাদি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। দূরবর্তী নানাস্থানে মুন্সিদিগের অনেক হট্টাদি বন্দর আছে। ইহারা জমিদারিতে অনেক লাভ করেন। এখানেও প্রতি বৎসর একটি মেলা মিলিয়া থাকে।

জপসা ঃ

এখানে অনেক বৈদ্যের বাস। অত্রত্য লালাগণের কীর্তি সমস্তের কিছু কিছু চিহ্ন আজিও লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহারাও বৈদ্য কুলোৎদ্ভূত মহা সম্ভ্রমশালী লোক ছিলেন। ইহাদের প্রতাপ বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া ইহাদের বিখ্যাত নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন মহারাজ রাজবল্লভের অন্যতর সহোদর এই জপসাতে আসিয়া বাস করেন। তাহা হইতেই তাহার বংশীয়গণের ক্রমে উন্নতি হয়।

দক্ষিণ বিক্রমপুরে রাজনগর, কার্তিকপুর, ফুলবাড়িয়া, জপসা, বকসীপুর, মহীসার, কাঞ্চনপাড়া, মগড়, পোড়াগাছা, শিয়ালদহ, প্রভৃতি গ্রাম প্রধান।

বকশীপুর, মহীসার, কাঞ্চনপাড়া প্রভৃতি গ্রামে ব্রাহ্মণের বাসই অপেক্ষাকৃত অধিক। মৈশুড়া, দেভোগ, শিয়ালদহ, হোগলা, কার্তিকপুর, পণ্ডিতসার প্রভৃতি পল্লী নিচয় বৈদ্যসমূহের আবাস স্থান।

পশ্চিম বিক্রমপুরে শ্রীনগর, ষোলঘর, হাঁসাড়া, বীরতারা, বয়রাগাদি, মালখানগর, ফুসাইল (ফুল্লশালী), পাঐলাদিয়া, জৈনসার, পশ্চিমপাড়া, কনকসার, ব্রাহ্মণগাঁ, লৌহজঙ্গ, বহর, সানিহাটি, তেয়টিয়া, কোরহাটি, কুমারভোগ, তারপাশা, কালীপাড়া, মাইজপাড়া, ভাগ্যকুল, কাঁচাদিয়া প্রভৃতি পল্লী গণ্ডগ্রাম নামে পরিচিত হইতে পারে।

শ্রীনগর ঃ

শ্রীনগরের পূর্ব নাম রাইসবর। অত্রত্য জমিদার মৃত লালা কীর্তিনারায়ণের পিতা কংসনারায়ণ বসু বেজগাঁ হইতে এখানে আসেন। তখন কংসনারায়ণের তাদৃশ ধন সম্পত্তির প্রভাব ছিল না। এক প্রকার নিঃস্ব ছিলেন। তাঁহার পুত্র কীর্তিনারায়ণ পিতার দারিদ্র্য স্বত্বেও স্বকীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রম বলে পারসি ভাষায় বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরে ইনি নবাব সরকারের প্রবেশ করিয়া ক্রমে উন্নত হইতে থাকেন। এই সময়েই তিনি "লালা" খ্যাতি প্রাপ্ত হন। কলিকাতাবাসী হরিরাম মল্লিক যখন কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন, লালা কীর্তিনারায়ণ তৎকালে তাহাদের পেস্কার রূপে নিযুক্ত থাকিয়া অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে কার্য নিষ্পন্ন করেন। এইরূপে ইনি অনেক ঐশ্বর্য লাভ করেন।

অনন্তর রাজনগরের রাজার যে সকল স্থান দেয় অপরিশোধহেতু কালেক্টরির অন্তর্গত হয়, তিনি তৎসমস্তের অনেকাংশ বন্দোবস্ত করিয়া লন। তদবধিই ইহাদিগের জমিদারির ক্রমশ উন্নতি হইয়া আসিতেছে। ইহারা বৈকুণ্ঠপুরের জমিদার বলিয়া অধুনা আবাল বৃদ্ধ সকলের নিকট পরিচিত।

অনেকে বলেন লালা কীর্তিনারায়ণ[১৮] কর্মোপলক্ষে আপনার এক ভৃত্যকে রাজনগরের[১৯] রাজবাটিতে প্রেরণ করেন। ভৃত্য উপস্থিত হইলে নৃপকুঞ্জর রাজবল্লভ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিহে তুমি কোথা হইতে আসিলে? ভৃত্য বলিল, মহারাজ শ্রীনগর হইতে এ দাসের আগমন। রাজা কহিলেন, কি শ্রীনগর নাম ত কখনও শুনি নাই! ভাল রাইসবর আর শ্রীনগর কত অন্তর? ভৃত্য চতুর ও সাহসী ছিল। সে বলিল মহাশয়! বলিতে ভয় হইতেছে। যেমন

বিলদাওনিয়া, রাজনগর, সেইরূপ রাইসবর শ্রীনগর। ভৃত্যের তাদৃশ বাগ্‌বিন্যাসে সম্মুখস্থ জনগণ মনে করিয়াছিলেন, রাজা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ও শোধপরবশ হইবেন। কিন্তু মহানুভব রাজবল্লভ তুচ্ছশ্রবণে বিষন্নচিত্ত ও ক্রুদ্ধ না হইয়া ভৃত্যকে বহুমূল্য এক জুড়ি শাল খেলাত দিলেন। এদিকে ভৃত্য গৃহে সমাগত হইলে লালাবাবুও তাহাকে এক সুন্দর পরিচ্ছদ প্রদান করেন। ইহাতে অনুমিত হইতেছে যে, রাজনগরের উন্নতি সময়ে শ্রীনগরের অনেক প্রতিপত্তি ছিল।

কীর্তিনারায়ণ অপুত্রক ছিলেন। তিনি এই নিমিত্ত সর্বদা অসুখে কাল ক্ষেপণ করিতেন। পরে এক দত্তক পুত্র রাখেন। তাহার নাম কৃষ্ণকুমার বসু। কৃষ্ণকুমার বসু জামিদারি রক্ষণে মন্দ পটু ছিলেন না। বাবু জগবন্ধু বসু তাহারই পুত্র। ইহারা বহুদিন হইতেই অতিথি সেবা করিয়া বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়া আসিতেছেন। বিক্রমপুরস্থ অন্যান্য বদান্য নিচয় বিগত দুর্ভিক্ষে দরিদ্রবৃন্দের উপকার বিষয়ে কিছু কিছু শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদিগের এতাদৃশী দানশীলতা যে, ইহারা সেই সময়ে নিয়মিত ফুৎকার (পান্থগণ উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে একবেলা ভোজন প্রদান) অপেক্ষা অতিথিদিগকে প্রতিগমন কালে পাথেয় ব্যয় প্রদান করিয়াছেন। এই নিমিত্ত জমিদারগণ সাধারণের ধন্যবাদর্হ সংশয় নাই।

অত্রত্য ইংরেজি বঙ্গবিদ্যালয়টি দিন দিন মন্দ শ্রী ধারণ করিতেছে না। জগবন্ধুবাবু ও শ্রীনাথবাবু প্রভৃতি মহোদয়দিগের বিশেষ যত্ন থাকিলে উহার আরো উন্নতির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। অনেকদিন যাবৎ শ্রীনগরে একটি থানা ও একটি পোস্টালয় সংস্থাপিত আছে।

ষোলঘর ঃ

বিক্রমপুরস্থ অপরাপর পল্লীগ্রাম অপেক্ষা আয়তনে এই গ্রাম অনেক বৃহৎ। বসতি সংখ্যাও ন্যূন নহে। এই স্থান নানা শ্রেণীস্থ লোকের অবস্থানভূমি। অনেকানেক সম্ভ্রান্ত পদবীস্থ লোক এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এক স্থানে এত অধিক ধনী থাকা সত্ত্বেও ষোলঘরকে তাদৃশ উন্নত বলিয়া অনুমিত হয় না। এই ষোলঘর ঢাকার পরিমাপণ বিভাগের ভূতপূর্ব ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্তবাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের জন্মভূমি। কিন্তু স্বদেশের উন্নতি সাধন পক্ষে তাঁহাকে তূষ্ণীভূত বলিয়া লক্ষিত হয় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, ঘোষজ মহাশয় মাসিক ৬০০ ছয় শত মুদ্রা বেতন পাইতেন। অধুনা ইনি পেন্সন গ্রহণ করিয়াছেন। এখন ইনি অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটরূপে নিয়োজিত ও শ্রীনগর স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত হইয়া কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। নিজ বাটিতেই কাছারি করিতেছেন। দুর্গাপ্রসাদবাবু একজন দক্ষ ও সুবিচারক লোক। ইহারই পুত্র বাবু চন্দ্রমাধন ঘোষ কলিকাতাস্থ উচ্চতম আদালতের (হাইকোর্টের) একজন প্রধান উকিল। ইঁহার খ্যাতি মন্দ নয়।

হাঁসাড়া ঃ

এখানে পাল চৌধুরী পরিবার বহুকালাবধি সর্বত্র বিশেষ পরিচিত। পূর্বকালে ইহাদের জমিদারি অতি বিস্তৃত ছিল। কিন্তু অধুনা তাহা নানা অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এখানে একটি সাহায্যপ্রাপ্ত বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে। কিন্তু অধ্যক্ষদিগের শিথিল যত্নে উহা সময়ে সময়ে তাদৃশ শ্রীসম্পন্ন বোধ হয় না। মহামতি স্যর সিসিল বীডন, হাঁসাড়ায় একটি ডিস্পেন্সরি স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া তত্রত্য শ্রীযুক্তবাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে ধন্যবাদ সহকারে অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন কোথায়? এখন তাহার (ডিস্পেন্সরির) নামগন্ধও তো উপলব্ধ হয় না। কৈলাসবাবু যত্ন করিলে অনায়াসে একটি ঔষধালয় সংস্থাপন করিয়া দেশিয় লোকের অনেক উপকার করিতে পারেন। অত্রত্য সেন পরিবার মন্দ খ্যাত নহে।

বীরতারা ঃ

পূর্বে এখানকার মজুমদারগণের অনেক প্রতাপ ছিল। এখনও কতিপয় ব্যক্তির মন্দ ঐশ্বর্য নহে। এই মজুমদার পরিবার অতিশয় বিস্তৃত, দেশমধ্যে মজুমদারবৃন্দের বেশ নাম আছে।

অত্রত্য মৃত জয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রতিপত্তির বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। ইনি সুধারাম পরিমাপণ বিভাগের ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। এই বীরতারা গ্রামে বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য ব্রাহ্মধর্মানুরাগী বাবু গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নিবাসস্থান। গিরিশবাবুর ধর্মে বিলক্ষণ বিশ্বাস দৃষ্ট হয়। ইহার পিতা ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি তাদৃশ বিপৎপাতে কাতর না হইয়া অবিচলিত ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে অবলম্বিত ধর্মের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন।

বয়রাগাদি ঃ

এস্থানে মৃত রামলোচন ঘোষ মহাশয়ের আবাস ভূমি। ইনি কৃষ্ণনগর আলাসদর আমীন ছিলেন। প্রথম শ্রেণীতে মাসিক সাত শত টাকা বেতন পাইতেন। তথায় অনেকদিন পর্যন্ত অত্যন্ত নৈপুণ্য ও প্রতিপত্তি সহকারে কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার কার্য বিষয়ে পারদর্শিতা অবলোকন করিয়া গবর্নমেন্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। কৃষ্ণনগরের আবাল বৃদ্ধ সকলেই রামলোচনবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকে। ইনি অতি সম্ভ্রান্ত ও পারসী ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কলিকাতা অবস্থান সময়ে প্রসিদ্ধ ধর্মানুরাগী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার নিতান্ত সদ্ভাব জন্মে। পরিশেষে তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর এরূপ প্রণয় সঞ্চায় হয় যে, উভয়ই পরস্পরের অদর্শনে বিলক্ষণ কষ্ট বোধ করিতেন। এমন কি, সদাশয় দ্বারকানাথ ঠাকুর রামলোচন রায় বাহাদুরের পরামর্শ ও অভিপ্রায় গ্রহণ না করিয়া কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন না।

রামলোচনবাবু বার্ধক্য নিবন্ধন পেনশন গ্রহণ করেন। ইনি ঢাকা কলেজের উন্নতির আশয়ে এক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্বারা তাহার দানশীলতার মন্দ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দুই বর্ষের অধিককাল অতিবাহিত হইল রামলোচনবাবু মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

বিজ্ঞবর মনোমোহনবাবু ইহারই জ্যেষ্ঠপুত্র। অনেকে জানেন মনোমোহনবাবু ইংলন্ড গমনপূর্বক তত্রত্য পরীক্ষায় কৃতকার্যতা লাভ করিয়া সম্প্রতি "বারিস্টার" হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছেন। সত্য বটে ইনি নিজ গৃহে একবার উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দেশানুরাগিতার সহিত ইহার কতদূর পরিচয়, বিক্রমপুর তাহা এখনও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। সুতরাং তাহাকে তাহার প্রত্যাশা করিয়া থাকিতে হইল।

বহুদিন পরে যদি করিয়া স্মরণ,
আইলি স্বদেশ পানে রে মনোমোহন।
দুখিনী জননী তোর এ বিক্রমপুর
ভাসিছে নয়নাসারে হয়ে শোকাতুর।
মায়েরে দর্শন বাছা দেওরে আসিয়া
সূর্যের মতন কিন্তু থেক না ভুলিয়া।
তোমরা আমার ধন ভাবি অনুক্ষণ
অম্বিকার আশা, পুর অম্বার বদন।।"

অল্পদিন হইল মনোমোহনবাবুর বাটিস্থিত ইংরেজি বিদ্যালয়টি উঠিয়া গিয়াছে। বাংলা বিভাগটি এখনও আছে সত্য, কিন্তু নিতান্ত হীন অবস্থা।

মালখানগর ঃ

এই গ্রামে প্রসিদ্ধ কুলীনবৃন্দের বাসস্থান। ইহারা ঢাকার অন্তর্ভূত নারিন্দা নামক স্থান হইতে এখানে সমাগত হন। এখনও তথায় 'বসুরনগর' বলিয়া এক স্থান আছে। ইহারা তাহাতেই বাস করিতেন। ইহারা এখন যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন তাহাকেও অনেকে মালখাঁনগর না

বলিয়া প্রায়ই 'বসুরনগর' বলে। এই বসুগণও অনেকদিনের প্রধান তালুকদার। ইহাদের তালুক সমুহ 'তালুক গোপাল ধর' নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে অনেক সুশিক্ষিত ও কৃতবিদ্য আছেন। অনেকে নানা স্থানে গবর্নমেন্ট স্থাপিত অনেক উচ্চ পদে সমাসীন থাকিয়া নিরতিশয় সম্মান লাভ করিতেছেন। অত্রত্য বাবু রামকুমার বসু মহোদয় ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদে নিয়োজিত ছিলেন। বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয় ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার অন্যতর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ইঁহারা যেরূপ নৈপুণ্য সহকারে কার্য করিতেছেন তাহা অনেকের অবগতি আছে। রামকুমারবাবু ঢাকা হইতে কৃষ্ণনগরে, তদনন্তর তমোলুকে পরিবর্তিত হন। অল্পদিন হইলে তিনি চব্বিশ পরগনায় আসিয়াছেন। তিনি গ্রাম্য লোকের উপকারার্থ নিজ বাটি হইতে তালতলার হাট পর্যন্ত একটি মৃন্ময় পথ নির্মাণ করাইয়াছেন। তিনি যেন এই কার্যটিকেই দেশোন্নতির শেষ মনে করেন না। কৌলিন্য প্রথার কি মোহিনী শক্তি! সুশিক্ষিতগণও ইহার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে এককালে সমর্থ হন না। ইহারাও সময়ে সময়ে অকিঞ্চিৎকর অর্থের জন্য ব্যাকুলিত হইয়া থাকেন। নিজ পল্লীস্থ বিদ্যালয়টির প্রতি বসু মহোদয়দিগের সমুচিত যত্ন লক্ষিত হয় না সুতরাং তাহার যে তাদৃশী উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে না বলা বাহুল্য।

ফুরসাইল (ফুল্লশালী) ঃ

ফুরসাইল মৃত মহাত্মা রামকানাই রায়ের আবাস পল্লী। ইনি অনেক ধনসম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইহার জমিদারিও আছে। লোকের উপকার সাধনার্থ ইহার মন্দ দয়া দৃষ্ট হয় নাই। প্রোক্ত রায় মহোদয় অনেক বড় বড় দীর্ঘিকা খনিত করাইয়া যান সুতরাং সাধারণের জলকষ্ট অনেকাংশে বিদূরিত হইয়াছে।

পাঐলদিয়া ঃ

পাঐলদিয়াকে দুই ভাগ করিয়া বলা হয়। বড় পাঐলদিয়া ও ছোট পাঐলদিয়া। এই পাঐলদিয়া গ্রামে কুলীনবর ঘোষ বংশজগণের অবস্থান। ইহাদের মন্দ নাম নয়। এই ঘোষজগণ ব্যতিরেকে এখানে ভদ্রলোকের বাস অতি অল্প। এমনকি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঘোষ মহোদয়দিগকে দেশের উপকারজনীন কোন সৎকার্যানুষ্ঠানে বড় উৎসাহিত দেখা যায় না।

জৈনসার ঃ

এই গ্রামে ঢাকার ছোট আদালতের বর্তমান জজ শ্রীযুতবাবু অভয়কুমার দত্ত মহাশয়ের গৃহ সংস্থাপিত। ইনি একজন বিচারদক্ষ, বিচক্ষণ লোক। ইহার পরিশ্রমশীলতায় অনেকেই প্রীত আছেন। এমন অনেক উচ্চ পদবীস্থ লোক আছেন যে তাহারা নিয়মিত সময়ের অতিরিক্ত সময় ব্যয় করিয়া গবর্নমেন্টের কার্য করিতে চাহেন না। সর্বদা নির্বাচিত পাঁচ ঘণ্টা কালকেই কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের সময় বলিয়া স্বীয় গৌরব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু অভয়বাবু সে প্রকৃতির লোক নন। ইনি দিবসের (দ্বাদশ ঘটিকার) মধ্যে প্রায় আট নয় ঘটিকা গবর্নমেন্টের কার্য সাধনে পর্যাবসান করিয়া তাহাদিগের সমীপে কৃতজ্ঞতা ভাজন হইতেছেন। একথা আমরা নিঃস্বার্থ রসনায় বলিতেছি। অভয়বাবু প্রতি মাসে প্রথম সপ্তাহের নিমিত্ত বহর ছোট আদালতে আসিয়া বিচার সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই জন্য গবর্নমেন্ট সহস্র মুদ্রার উপরে তাহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।

অভয়বাবু দেশিয় লোকের উপকারার্থ নিজালয়ে একটি ডিস্পেন্সারি (ঔষধালয়) সংস্থাপিত করিয়াছেন। ইচ্ছানুসারে তাহারা তথা হইতে ঔষধ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার বাটিতে একটি বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। তথা হইতে 'পল্লীবিজ্ঞান' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছিল। গ্রাহক সংখ্যাও নিতান্ত মন্দ ছিল না। পত্রিকা প্রায়ই বিনামুল্যে দেওয়া হইত। অভয়বাবু স্বয়ংই সমুদায় ব্যয় নির্বাহ করিতেন। এতদ্বারা দত্তজ মহাশয়ের দেশানুরাগিতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু হতভাগিনী বিক্রমপুরের কি অদৃষ্ট ফের!

কয়েক মাস বিগত হইল পল্লীবিজ্ঞান প্রচার এককালে বন্ধ হইয়াছে! বিক্রমপুরবাসিগণ পল্লীবিজ্ঞানের জন্মদর্শন করিয়া যেমন পুলকিত হইয়াছিলেন, উহার মরণ সংবাদে তেমনই ব্যতিত ও বিষণ্ণ হইয়াছেন। পল্লীবিজ্ঞান উঠিয়া গেল ইহা তত দুঃখের নয়। অধিকতর খেদ ও দুঃখের বিষয় এই যে, অপর লোকে আর দেশের মঙ্গলকর কার্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে না। যখন অভয়বাবুর ন্যায় তাদৃশ, মহৎ লোকেই এই সৎকার্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে অচিরকাল পরেই তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন, তখন মধ্যবিৎ লোক মণ্ডলী যে, ইচ্ছা সত্ত্বেও, দেশের উন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ ও বিরত হইবেন, তাহার বিচিত্রতা কি?

পশ্চিমপাড়া ঃ

এখানে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক। চট্টোপাধ্যায়, মুখোচি, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বিজবৃন্দ বিলক্ষণ প্রতিপন্ন। মুখোচি মহাশয়গণ এই গ্রামের আদিম নিবাসী এবং চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কুলীন ব্রাহ্মণগণের স্থাপয়িতা। এই পল্লী মৃত মহাত্মা কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের আবাসভূমি। ইনি ঢাকার জজ আদালতের একজন প্রধান ব্যবহারজীবি ছিলেন। কিরূপ নৈপুণ্য সহকারে ইনি কার্য করিয়া গিয়াছেন তাহা অনেকেরই অবগতি আছে। এই মহোদয় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদিগের আশ্রয় ভূমি ছিলেন। নিজেও এই ধর্মের অতিশয় সম্মান করিতেন। একদা ইনি হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য রক্ষার্থে অনেক প্রয়াস পাইয়া ছিলেন। এবং তাহারই উদ্যোগে ও পরিশ্রমে হিন্দু ধর্ম, যদিও সর্বতোভাবে না হউক, অনেকাংশে রক্ষিত হইয়াছে। যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম ঢাকা নগরীতে আধিপত্য সংস্থাপন করিতে না পারে, এমন কি যতবিধ উপায় অবলম্বন করিলে উহা সমূলে উৎপটিত হইয়া যায় ইনি তদ্বিষয়ে অনেক যত্ন করিয়াছেন। ইহার চরিত্রগত বিশুদ্ধতাও অনেক ছিল। ইনি হৃদয়ের অনন্মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কাহারও তোষামোদ করা নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিতেন। প্রায় দুই বর্ষ হইল ঢাকায় যে হিন্দুধর্ম রক্ষণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, ইনি তাহার এক প্রধান উদ্যোগী ও সংস্থাপক ; কাশীকান্তবাবু এবং অন্যতর উকিলবাবু বরদাকিঙ্কর রায় প্রভৃতি মহোদয়দিগের উৎসাহ ও অধ্যবসায় বলেই প্রোক্ত সভা হইতে হিন্দু হিতৈষিণী নাম্নী একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হইতে থাকে। সেই সময় হিন্দুদিগের যে প্রবল দলবল ছিল, তাঁহা মৃত্যু নিবন্ধন অধুনা তাহার যেন নিত্য নিস্তেজভাব লক্ষিত হইতেছে। তখনকার ন্যায় এখন তাহাদিগের (হিন্দুদিগের) মধ্যে বড় উৎসাহ দেখা যায় না। বস্তুত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরহে অনেকে হতাশ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছেন।

হিন্দুগণ বহু পরিবার সম্মিলিত হইয়া বাস করিতে একান্ত সুখ অনুভব করেন। ফলত তাহারা তাহাদের এই অকৃত্রিম প্রীতির নিমিত্ত সকল জাতিকে পরাজিত করিয়া প্রকৃত মহত্ত্ব ও গৌরব স্থাপন করিয়াছেন। আমরা এখানকার (পশ্চিমপাড়াস্থ) একটি পরিবার দর্শন করিয়া যারপরনাই আনন্দ ও বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হইয়াছি। অত্রত্য কোন মুখোটি মহাশয়ের পরিবার নিতান্ত বিস্তৃত ও বহুজনসঙ্কুল। উহা সপ্ততিতম গৃহে বিরচিত। এই পরিবার এত দীর্ঘ কালায়ত যে, অধুনা পরিবারস্থ লোকদিগকে ত্রিরাত্রির অধিক, জ্ঞাতি মরণ জনিত অশৌচের কষ্ট সহ্য করিতে হয় না।

কনকসার ঃ

এই গ্রামে কুলীন ব্রাহ্মণের সংখ্যা মন্দ নয়। এই ক্ষুদ্র পল্লী সুবিখ্যাত গুণি সূর্যকুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের জন্ম স্থান। ইহার পূর্ব বিবরণ শ্রবণ করিতে অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে। আমরা অবগত আছি ইনি শৈশবকালেই পিতৃমাতৃহীন হন। ইহার পিতা এমন কোন বিশেষ সংস্থান রাখিয়া যান না যে, গ্রাসাচ্ছাদনান্তর উদ্বৃত্ত সম্পত্তি দ্বারা স্বচ্ছন্দে তাহার অধ্যয়ন চলে। তথাপি কোন সুযোগ বিধান করিয়া তিনি পাঠ আরম্ভ করেন। কতিপয় বৎসর এই রূপে গত হইলে কোন ইংরেজ মহামতির সহিত তাঁহার আলাপ হয়। উক্ত মহোদয় তাহার

অধ্যয়ন বিষয়ে সহায়তা করিবেন বলিয়া সূর্যবাবুকে কলিকাতা লইয়া যান। তখন তাঁহার মনে স্বদেশানুরাগ কিছু কিছু নিহিত ছিল। অনন্তর তিনি তথায় পাঠ কার্যে নিরত থাকিয়া ইংরেজি ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করে।

ইতিমধ্যে সূর্যকুমারবাবু খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী হন। ইহার অব্যবহিত পরে উল্লিখিত সাহেব মহোদয়ের মৃত্যু হয়। অনন্তর সূর্যবাবু ইংলন্ড গমন করেন। ইহার কিয়দ্দিবস পরে তিনি ফ্রান্স দেশীয় কোন ভদ্র পরিবার সম্ভূতা এক কামিনীর পানিগ্রহণ করেন। পরিশেষে বহুল পরিশ্রম সহকারে তিনি মেডিকেল বিদ্যায় (চিকিৎসা শাস্ত্রে) এতাদৃশী পারদর্শিতা লাভ করিয়া আজি একজন প্রধান ও প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হইয়া পড়িয়াছেন। এই সময়েও তিনি গৃহের প্রতি এককালে প্রীতিহীন ও অনুরাগ শূন্য হন নাই। বাটিতে বর্ষে বর্ষে অর্থ প্রেরণ করিতে থাকেন। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন, তাঁহার প্রেরিত অর্থ দুর্গোৎসবে পর্যবসিত হয় তখন তিনি অর্থ প্রেরণ বন্ধ করেন। সূর্যবাবু যদি ধর্মচ্যুত না হইতেন তাহা হইলে আজি বিক্রমপুরের সৌভাগ্যের সীমা কি ছিল? কিন্তু প্রকৃত হিতৈষণা থাকিলে ধর্মান্তরতায় কিছু করিতে পারে না, তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি।

ব্রাহ্মণগাঁ ঃ

এই পল্লী পূর্ব ব্রাহ্মণগাঁ ও পশ্চিম ব্রাহ্মণগাঁ এই দুই ভাগে সংবিভক্ত। পূর্ব ব্রাহ্মণগাঁ কেবল ব্রাহ্মণ্যের পরিপুরিত। কুলীনের সংখ্যা অল্প নয়। পক্ষান্তরে পশ্চিম ব্রাহ্মণগাঁয় উহার (ব্রাহ্মণের) বিন্দুবিসর্গও নাই বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। তত্রত্য জমিদারবাবু কৃষ্ণকুমার ঘোষ মহোদয়ের যত্নে একটি সার্কেল বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত সার্কেল হইতে একদা যারপরনাই আহ্লাদজনক ফল প্রসূত হইয়াছিল। কিন্তু আজিকালি উহার তাদৃশী উন্নতি লক্ষিত হয় না, বলিয়া বড়ই ক্ষোভ উপস্থিত হয়। ঘোষজ মহাশয়গণ প্রায় দুই তিন বর্ষকাল হইল প্রজাপুঞ্জের হিতসাধনার্থ 'গ্রামহিতৈষিণী' নাম্নী একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সভার জীবন ও অবস্থা এরূপ সমুন্নত ছিল না যে, তদ্দ্বারা উদ্দিষ্টফল সম্যক লাভ করা যাইতে পারে। বাবুদিগের সমুচিত উৎসাহ ও যত্নাভাবে গ্রাম হিতৈষিণী আজি বিগত জীবনা হইয়াছে।

লৌহজং ঃ

এই স্থান কীর্তিনাশা নদীর উত্তর তটে অবস্থিত। ইহার আয়তনের ন্যায় বসতি সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। সম্প্রতি কীর্তিনাশা লৌহজঙকে এককালে উদরস্থ করিয়াছে। লৌহজঙের ধনী প্রধান পালবৃন্দ সর্বত্র পরিচিত। পূর্বকালে ইহাদিগের বিপুল প্রতিপত্তি ছিল। ইহাদিগের প্রাচীন কার্যকলাপ স্মরণ করিয়া মধ্যকালে আমাদের অন্তঃকরণে খেদের আবির্ভাব হইত। কিন্তু আধুনিক ভাব দর্শন করিয়া অনুমান হইতেছে, ইহাদের অস্তমিত যশোরবি পুনরুদিত হইবে। পালদিগের প্রযত্নে এখানে একটি ইংরেজি বঙ্গবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ক্রমেই উন্নতি হইতেছে। অত্রত্য কতিপয় দেশহিতৈষী ব্যক্তি অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে এই বিদ্যালয়ে 'জ্ঞানপ্রকাশিকা' নাম্নী একটি সাপ্তাহিক সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অল্পকাল হইল লৌহজঙে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সংস্থাপন হইয়াছে। কিন্তু শুনা যাইতেছে গবর্নমেন্ট উহার স্থায়িত্বের জন্য সাহায্য প্রদানে অসম্মত হইয়াছেন। তাহারা বলেন এক গ্রামে তিন শ্রেণীস্থ বিদ্যালয় স্থাপন তাহাদের উদ্দেশ্য নয়।

পাল মহোদয়দিগের বাটির সন্নিকটে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে একটি মেলা হইয়া থাকে। মেলা প্রায় সমস্ত ভাদ্র মাস ব্যাপিয়া থাকে। ইহাতে ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান হইতে বহুবিধ বণিক আগমনপূর্বক আপন স্থাপন করিয়া বিবিধ শিল্পজাত দ্রব্যজাত ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। মেলায় দর্শক ও অনেক সমাগত হয়। এই মেলায় দর্শকবাবুরা নাট্য, সঙ্গীত প্রভৃতি আমোদ উপলক্ষে অনেক টাকা ব্যয় করেন।

লৌহজঙে বাণিজ্যাবলম্বিদিগের সংখ্যা মন্দ নহে। অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয়ই সুন্দররূপে চলিতেছে। পালগণও ইহার দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান হইতেছেন। বহু দূরবর্তী স্থান লইয়া ইহাদের লবণ, বস্ত্রাদির ব্যবসায় হইয়া থাকে। অনেকের তৈল, তিল, গুড়, চিনি, তামাক, সরিষা প্রভৃতির কারবার আছে। কলিকাতা, পাটনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, দক্ষিণ সাহবাজপুর প্রভৃতি স্থানসমূহে ইহাদের বাণিজ্য চলিতেছে।

বহর ঃ

বহর গ্রামের হৃদভেদ করিয়া কীর্তিনাশার শাখা নদী উত্তরাভিমুখে গিয়াছে সুতরাং বহর পশ্চিমপাড়া ও পূর্বপাড়া বলিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এখানে বসু বংশসম্ভূত অনেক জমিদার আছেন। তাহারা চৌধুরি বলিয়া পরিচিত। অনেকে বলেন তাহারা বংশজ কুলীন নন। বসুগণ আপনাদিগকে পর্যায় সম্পন্ন বলিয়া গৌরব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি চৌধুরীদিগের জমিদারি নানা অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের পূর্বের ন্যায় তত প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয় না। এস্থানে শিক্ষিত, লোকের সংখ্যা অনেক অল্প। অত্রত্য ইংরেজি বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহাদিগের তাদৃশ যত্ন না দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইতে হয়। মুন্সেফী বিচারালয় ও ছোট আদালত উক্ত শাখা নদীর পূর্ব তটে অবস্থিত। চৌধুরীগণ সমবেত হইয়া দশবিদ্যার[২০] প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করেন।

প্রবাদ আছে, চৌধুরিগণের কাহারও প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, মন্দির সমীপে পূজা করিয়া একটি নরবলি প্রদান করিতে হইবে। নতুবা যারপরনাই অমঙ্গল ও অনিষ্ট সংটিত হইবে। ইহা সকলের (অপরাপর চৌধুরিদিগের) কর্ণগোচর হইলে নরান্বেষণ আরম্ভ হয়। অনেকে বলেন ধীবর জাতীয় কোন একটি শিশুকে নানা ছল অবলম্বনপূর্বক ক্রয় করিয়া বলি দেওয়া হয়। আবার কেহ কেহ বলেন শ্রীহট্ট নিবাসী এক ভৃত্যকে আনিয়া দশবিদ্যার সমীপে বধ করা হয়। ইহা কিরূপ লোমহর্ষণ ঘটনা আপামর সকলেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। এমন কোন পাষাণ হৃদয় আছে যে, তাহার শুষ্ক নেত্র হইতে অশ্রুজল বিগলিত না হয়? তদবধি দেশ মধ্যে "ঐ ছেলে নিতে এল, ঐ ছেলে নিতে এল" বলিয়া এক জনরব উঠিয়া গেল। সকলের মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। কেহই তাহার সন্তানদিগকে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে দিত না। যদি কখন কোন ক্রমে নয়নান্তরালবর্তী হইত তাহা হইলে জননী হাহতোস্মি! স্বরে উন্মাদিনী প্রায় ইতস্তত ধাবমানা হইতেন। অজনন মমতাশীলা মাতার ঈদৃশ স্নেহভাব কখনই অবিশ্বাসনীয় নহে। পুত্রস্নেহ কি মহান পদার্থ! এই স্নেহের পরতন্ত্রা হইয়া যে জননী স্বীয় জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত এমন স্বর্গীয় প্রতিমা জননীর প্রতি কাহার না ভক্তি হয়? এবং যে সন্তানের প্রতি মাতার যারপরনাই আশা ভরসা রহিয়াছে ও যাহার প্রতি স্নেহ স্বভাবত হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া থাকে, ঈদৃশ পুত্রের প্রতি তাদৃশ মমতা ও বাৎসল্য বিচিত্র নহে।

সানিহাটি ঃ

এই স্থানে বহুবিধ জাতির বাসস্থান দৃষ্ট হয়। অত্রত্য মৌলিকবৃন্দ এখানকার আদিমনিবাসী। ইহাদের আগমনের পরে এখানে অন্যান্য লোকের সমাগম হয়। এই নিমিত্তই তাঁহারা মৌলিক খ্যাতি লাভ করেন। ফলত ইহারা অনেকদিনের ভদ্র লোক। অত্রত্য সরকারগণও মন্দ প্রতিপন্ন নন।

তেয়টিয়া ঃ

ইহা মৃত মুন্সি মৃত্যুঞ্জয় দত্তের আবাস স্থান। ইনি বহুদিবস পর্যন্ত ঢাকার দেওয়ানি আদালতের সেরেস্তাদার পদে নিয়োজিত থাকিয়া অনেক নৈপুণ্য সহকারে স্বকর্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। ঢাকা নগরীর অনেক লোক ইহার প্রতিপ্রীতি যুক্ত ছিল। দত্তবর সময়ে সময়ে দেশিয় লোকের উপকার করিয়া তাহাদেরও শ্রদ্ধা ভাজন হইয়া গিয়াছেন। বস্তুত ইহার

মরণে অনেকে ব্যথিত চিত্ত হইয়াছেন। কিন্তু দত্তমহাশয় বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি সাধারণ হিতকর কোন বিষয়ে কিছু যত্ন করেন নাই। হিন্দু ধর্মে ইহার মন্দ অনুরাগ ছিল না। মুন্সি মহাশয় অনেক অর্থ ও ভূসম্পত্তি রাখিয়া সংসার লীলা সংবরণ করেন। প্রায় তিন বর্ষ অতিবাহিত হইল তাহার পুত্রবৃন্দের প্রযত্নে এখানে একটি ইংরেজি বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের কার্য মন্দ চলিতেছে না। পেস্কার মহোদয়গণ কৃতবিদ্য লোক সন্দেহ নাই। ইহারা তাদৃশ আড়ম্বরপ্রিয় নন। কিন্তু লোকানুরাগ প্রিয়তা ইহাদিগের হৃদয়েও মন্দ বলবতী নয়। সুতরাং কার্যে প্রবেশ কালীন কিছু কিছু সঙ্কোচিত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

কোরহাটি ঃ

এই স্থান পূর্বে অতি বিস্তৃত ছিল। কীর্তিনাশা ইহার প্রায় সব কটি পর্যন্ত গ্রাস করে। কিন্তু কালের কি চমৎকারিণী শক্তি অধুনা নদী গর্ভস্থ অনেক স্থান শীর্ষোত্তোলনপূর্বক ক্রমশ বর্ধিতকায় হইয়া উঠিতেছে। সেই সমুদয় স্থল কোরহাটির অন্তর্গত হইয়াছে। তাহাদের সমষ্টির নাম "চড় কোরহাটি"।

কোরহাটি সম্প্রতি ক্ষুদ্র পল্লী বলিয়া পরিগণিত হইলেও তথায় অনেক ভদ্রলোকের বসতি আছে। অত্রত্য ঘোষ ও বসু পরিবারদ্বয় মন্দ পরিচিত নয়। এখানে সুশিক্ষিত লোকও আছেন। ইহাদের দেশোন্নতির পক্ষে একদা যারপরনাই উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু কেহই তাদৃশ সম্পন্ন নন বলিয়া ইহাদিগকে কোন প্রধানতর কার্যে বড় যত্নশীল দেখা যায় না। সকলেই সাধারণত এক প্রকার নিঃস্ব। ইহারাও প্রাচীনদিগের অনুচিত ভয়ে ধর্ম বিষয়ে বড় একটা অগ্রসর হইতে যত্ন করেন না। দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকেই লোকানুরাগপ্রিয়তার বশংবদ। কোরহাটি গ্রামে কতিপয় সুশিক্ষিত মহাত্মার প্রযত্নে একটি ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশত উহা প্রাচীনদিগের বিদ্বেষসমূহ অপ্রতিহত প্রভাব সহ্য করিয়াও করালকালের ভীষণ গ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব অন্যতম শিক্ষক মৃতমহোদয় আনন্দমোহন বসুই উহার প্রধান উদ্যোগী ও স্থাপয়িতা ছিলেন। দুরন্ত কৃতান্ত তাহাকে অকালে হরণ করিয়া কোরহাটির ভাবী উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। এখন পূর্বের ন্যায় কাহারও হৃদয়ে অদৃশ উৎসাহ লক্ষিত হয় না।

কুমারভোগ ঃ

বিক্রমপুরে যতটুকু বাংলা ভাষার উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে, এই কুমারভোগ নামক ক্ষুদ্র পল্লীকেই তাহার আদিভূত কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতে হইবে। বিক্রমপুরের মধ্যে কুমারভোগই সর্বপ্রথমে সার্কেল বিদ্যালয় প্রসব করে। যাহাদের উৎসাহে এইরূপ সৎকার্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে এবং যাহাদিগের যত্নবারিসিঞ্চনে ঐ বিদ্যালয় আজিও জীবিত থাকিয়া অনেক বালকের হৃদয় হইতে অজ্ঞানতিমির বিদূরিত করিতেছে তাহারা মহান হিতৈষী। তাহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়। তাহাদিগের অধ্যবসায় থাকিলে তাহা পরিণামে যে আরও কত সুফল বিতরণ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই সময়ে শ্রীযুতবাবু দীনবন্ধু মৌলিক মহাশয় (ইনি সম্প্রতি মান্দারিপুর মহকুমায় ডেপুটি শান্তিরক্ষকের (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের) পদে স্থায়ী আছেন।) ঢাকা জেলা ও বিক্রমপুরস্থ বিদ্যালয়সমূহের ডেপুটি তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। অব্যবহিত পরেই ব্রাহ্মণগাঁয় অপর একটি সার্কেল প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে অত্যল্পকাল মধ্যেই স্থানে স্থানে পল্লীতে পল্লীতে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া বিক্রমপুরের যে কিছু সৌভাগ্য সূর্যের আলোক প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। কুমারভোগে অনেক সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র পরিবারস্থ লোকের বাস আছে।

কিছুদিন পূর্বে এই স্থানে ভাস্কর্য বিদ্যারও প্রভাব মন্দ ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নিজ গ্রামে চুরি হইতে দেখা যায় নাই। অনেকে অনুমান করেন দলবদ্ধ তস্করদিগের মধ্যে

বন্দোবস্ত থাকে যে, তাহাদের দল সংসৃষ্ট ব্যক্তি যে কোন গ্রামবাসী হউক না কেন, তথায় তাহারা আশুতোষিনী চৌর্যবিদ্যা প্রকাশ করিবে না। দেশিয় ভদ্র মহাত্মাদিগ হইতে ক্লেশ প্রাপ্তির ভয়, রাজদ্বারে প্রেরিত ও অবশেষে দেশ হইতে বহিস্কৃত হওয়ার আশঙ্কা, এই সমুদায়ই এতাদৃশ বন্দোবস্তের কারণ। এতদ্বারা বোধ হইতেছে যে, দেশিয় মহাত্মারা ঈদৃশ চৌর্য ক্রিয়ার সমস্ত অবগত থাকিয়াও শাসন বিষয়ে কিছুমাত্র অবহিতমনা হন না। ইহাতে কি তস্করদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না? প্রতিবাসী বন্ধু বান্ধবদিগের ধনাপহরণ দর্শন করিয়া কি তাহাদিগের মনে একটুও দুঃখের উদ্রেক হয় না? আমরা কেবল এই স্থানে এইরূপ দেখিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছি এমন নহে। বিক্রমপুরের আরো অনেক স্থানে এতাদৃশী দুষ্ক্রিয়ার সমাবেশ লক্ষিত হইয়া থাকে। দিন দিন যতই কেন সভ্যতার প্রাদুর্ভাব হউক না, যতই কেন আমরা বড় বড় উপাধি লাভ করিয়া বিখ্যাত হই না, কিন্তু যতদিন ইতর লোকদিগের হৃদয় বিদ্যার উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত না হইবে, ততদিন বিক্রমপুরের প্রকৃত উন্নতি নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

তারপাশা ঃ

তারপাশা অত্যন্ত আয়ত স্থান। এই গ্রাম সর্বত্র মন্দ পরিচিত নহে। অত্রত্য মহাশয়গণ নানাবিধ সাধু কার্যানুষ্ঠান করিয়া অতিশয় প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া গিয়াছেন। ইহাদিগের সঙ্কল্প বিশুদ্ধ ও মহান ছিল বলিয়াই বোধ হয় ইহারা "মহাশয়" এই সম্মানাত্মক উপাধি লাভ করিয়া সাধারণ্যে তাদৃশ বিখ্যাত হন। আজিও মহাশয়দিগের অনুষ্ঠিত কার্যাবলীর অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদিগের নিজ বাটি উত্তুঙ্গ সৌধমালয় পরিশোভিত। বিচিত্র কারুকার্য সম্পন্ন সিংহদ্বার প্রভৃতি কতকগুলি অট্টালিকা আজিও আমাদিগের নেত্র যুগলের আতিথ্য পালন করিয়া থাকে। মহাশয়দিগের বাটি নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ক্রমে সিংহদ্বারের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। অট্টালিকাগুলি অধুনা জঙ্গল লতায় পরিপূর্ণ হইয়া কালের চমৎকারিণী শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। মহাশয়গণ বাটির চতুর্দিকে এক সুপ্রশস্ত প্রাকার নির্মাণ করান। তাহাদিগের পরিবার মধ্যে এরূপ শাসন ছিল যে, দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক কোন ব্যক্তিই তাহাদিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিত না। এমন কি অন্তঃপুরস্থাকামিনীদিগের অল্প বয়স্ক কোন ভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেও তাহাকে ইহারা ভাগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না। তাহাকে যথারীতি বহির্বাটিতে অবস্থান করিতে হইত। এরূপ রীতি যদিও সাধারণের হৃদয়গ্রাহিণী বলিয়া প্রতীত না হয়, কিন্তু মহাশয়গণ ইহাকে যারপরনাই সম্মান ও সভ্যতার চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেন।

মহাশয়দিগের জমিদারি নানা স্থলে বিদ্যমান ছিল। মহাশয়গণ অতি বিস্তৃত শ্যামপুর ও ভুলুয়া পরগণার অধিকারী ছিলেন। অধুনা তাহাদিগের তাদৃশ প্রতাপ ও কীর্তিরাশি লক্ষিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদিগের কিছুই জানি না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; আজি তাহাদিগের বংশগণ তেজোহীন হইয়া রহিয়াছেন।

এরূপ কিংবদন্তী যে, তারপাশা গ্রামে পূর্বে কুলীন ব্রাহ্মণের নামমাত্রও ছিল না। মহাশয়গণ বহুল ধন ব্যয় ও আয়াস স্বীকার করিয়া বেইঘে হইতে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া নিজ পল্লীতে স্থাপিত করেন। তদবধি এই তারপাশা গ্রাম অন্যতর কুলীন প্রধান স্থান হইয়া সর্বত্র পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

বেইঘে ঃ

বেইঘে প্রসিদ্ধ কুলীন দ্বিজগণের আবাসভূমি বলিয়া বিখ্যাত। প্রাচীন সময়ে ইহার প্রতিপত্তি বহুদূর ব্যাপিনী ছিল। এরূপ জনশ্রুতি যে, তৎকালে অত্রত্য ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ প্রভূত ধনসম্পত্তির পরিচায়ক বহুবিধ কার্যানুষ্ঠান করেন। দ্বিজগণ বদান্যতার নিমিত্তও অত্যন্ত প্রসিদ্ধি

লাভ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি! অধুনা তাদৃশ খ্যাতিসঙ্কুল বেইঘের শুদ্ধ নামমাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে! ইহার ভূচিহ্নও আজি লক্ষিত হয় না। এখন কোথায় তাহাদিগের (ব্রাহ্মণদিগের) সেই প্রচুর প্রতিপত্তি, কোথায় তাহাদিগের সেই দিগন্ত ব্যাপিনী মহীয়সী কীর্তিমালা? এবং কোথায় বা তাহাদিগের বংশধর সন্তানগণ? আজি তৎসমুদায়ের বিরহজনিত শোকাবেগ কাহার চিত্তকে না ব্যাকুলিত করিয়া তুলে? বস্তুত তাদৃশ মহোদয়দিগের বিচ্ছেদ যন্ত্রণা অনুভব করা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। দ্বিজবৃন্দের জমিদারির প্রভাবও মন্দ ছিল না।

এই গ্রামে অতি প্রাচীন কালীয় কয়েকটি পুষ্করিণী ও একটি সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকা আছে। কিন্তু তদ্দ্বারা পল্লীবাসীদিগের জলকষ্ট নিবারিত হয় না। অধুনা দীঘিটি একেবারেই শুষ্কতায় পরিণত হইয়া রহিয়াছে। উহা এরূপ দীর্ঘ যে পূর্বে উহার একপার হইতে পারান্তর দর্শন গোচর হইত না। এখন উহা মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়া পারভূমির সমান হওয়াতে মধ্যস্থল লোকের বাসস্থান হইয়াছে। আজিও দীঘির অংশদ্বয়ের প্রশস্ততা ও দৈর্ঘ্য বড় ন্যূন হইবে না।

কাচাদিয়া ঃ

অত্রত্য সেন পরিবার বিশেষ খ্যাতাপন্ন। এখানে ব্রাহ্মণেরও এককালে অসদ্ভাব নাই। বিদ্বৎবরবাবু গুরুপ্রসাদ সেন এম. এ. মহোদয় এই গ্রামের প্রধান অবতংস। গুরুপ্রসাদবাবু পূর্বে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। অল্পদিন পরেই পাটনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া বিলক্ষণ পটুতা প্রকাশপূর্বক কার্য সম্পাদন করিতেছেন। ইনি বিজাতীয় ভাষায় (ইংরেজি ভাষায়) মন্দ পরিপক্ক নন। সত্য বটে ইনি বিদ্যা বদ্ধিতে একজন সুনিপুণ মানুষ—এবং ইনি সম্ভ্রান্ত পদে থাকিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন, কিন্তু স্বদেশানুরাগ এখনও ইহার হৃদয়ে উদ্দীপ্ত হয় নাই—দেশের উন্নতি সাধনে একপ্রকার বিরত রহিয়াছেন বলিলে লেখনী বোধ হয় সত্য হইতে বিচ্যুত হইবে না। এই সেন পরিবারস্থ শিবচন্দ্র সেন অনল্প খ্যাত কবি ছিলেন। তাহার রচিত "সারদামঙ্গল" নামক পুস্তক তাঁহার কবিত্বশক্তির সুন্দর পরিচয় প্রদান করে।

কালীকিঙ্কর সেন একজন বিখ্যাত আয়ুর্বেদ বিশারদ ছিলেন। অনেকে বলেন তাঁহার ন্যায় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ লোক অতি বিরল। গৌরীকান্ত সেন নামে অন্য এক ব্যক্তি শিল্পকার্যে বিলক্ষণ পটুতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। বর্ষাধিককাল অতীত হইল এই কাঁচদিয়া গ্রামে একটি পোস্টালয় ও "শুভকরী" নাম্নী একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। অফিসটির কার্য বেশ চলিতেছে। শুভকরীও সাধ্যানুসারে দরিদ্রোপকার ব্রত পালনে নিরত রহিয়াছে।

সাহাবাজনগর ঃ

এই গ্রাম কুলীন দ্বিজ গ্রামে একপ্রকার পরিপূর্ণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি নদীবেগ প্রপীড়িত কাঁচাদিয়া নিবাসী সেন মণ্ডলীর অনেকে এই সাহাবাজ নগরে বাস করিতেছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কুলীনগণ প্রসিদ্ধ কুলীন স্থান বেইঘে হইতে এখানে সমানীত হইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে শিক্ষিত সংখ্যাও মন্দ নহে। শিক্ষিত বলিয়া যে ইহার কৌলীন্য প্রথার মোহিনী মূর্তিতে বিমোহিত না হন এমন বলা যাইতে পারে না। ইহারাও সময়ে সময়ে কুলগঞ্জে অন্ধীভাব ধারণ করেন।

এখানে কায়স্থাদি ভদ্রগণের বাসও মন্দ দেখা যায় না। কিন্তু ভয়ঙ্করী পদ্মার দুর্ধর্ষ আক্রমণে অনেক ব্যক্তি স্থানান্তর গমন করিতেছেন। দুরন্ত তরঙ্গিণী সাহাবাজনগরের প্রায় অর্ধাঙ্গ গ্রাস করিয়াছে। আজিও ইহার যেরূপ পরাক্রম ও অত্যাচার লক্ষিত হইতেছে তাহাতে বোধ হয়, অচিরেই এই স্থান তাহার বিশাল উদরসাৎ হইবে।

এই গ্রামে অতি প্রাচীনকালীয় কয়েকটি পুষ্করিণী ও একটি সুপ্রশস্ত দির্ঘিকা আছে। কিন্তু তদ্দ্বারা পল্লীবাসীদিগের জলকষ্ট নিবারিত হয় না। অধুনা দিঘিটি একেবারেই শুষ্কতায় পরিণত

হইয়া রহিয়াছে। উহা এরূপ দীর্ঘ যে পূর্বে উহার একপার হইতে পারান্তর দর্শনগোচর হইত না। এখন উহা মৃত্তিকা পূর্ণ হইয়া পারভূমির সমান হওয়াতে মধ্যস্থল লোকের বাসস্থান হইয়াছে। আজিও দিঘির অংশদ্বয়ের প্রশস্ততা ও দৈর্ঘ্য বড় ন্যূন হইবে না।

কালীপাড়া ঃ

কাওলী(কাপালী)বৃন্দ এখানকার আদিমবাসী বলিয়া এই গ্রামের নাম প্রথমে "কাওলীপাড়া" হয়। পরে ভদ্রলোকের বাসের সঙ্গে সঙ্গে ইহার নামের পরিবর্তন হইয়া অধুনা এই স্থান "কালীপাড়া" সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছে। অত্রত্য জমিদারদিগের অনেক প্রতাপ ছিল। এখনও অন্যান্য জমিদারগণ অপেক্ষা ইহাদের ক্ষমতা অধিকই দৃষ্ট হয়! ইহারা হীন প্রতাপ হইয়াছেন ইহা কখনই বলা যাইতে পারে না। ইহাদিগের পূর্বপুরুষ রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চাঁচেরপাশা[২০] গ্রাম হইতে আগমন করিয়া এই কালীপাড়ায় বাসস্থান নির্মাণ করান। ইনি নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় কালযাপন করিয়াছেন। তাহার পুত্র সূর্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমে পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন। ইনি অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। ভাটি অঞ্চলস্থ কাদিরাবাদ পরগণাস্থিত রঙ্গাভঙ্গা নামক স্থানের স্বামিত্ব লইয়া ইহার সহিত ইদলপুর নিবাসী রামকান্ত রায় প্রভৃতি চৌধুরীগণের ভয়ানক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। দাঙ্গায় এত অধিক লোকের জীবন নষ্ট হয় যে, রুধিরে সমীপবর্তী খালের জল এককালে রক্তবর্ণ হইয়া যায়। ইহাতে বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিই জয়শ্রীর অনুকম্পা লক্ষিত হয়।

অনন্তর ঘটনাক্রমে কলিকাতা নিবাসী অন্যতম জমিদার গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের সহিত তাহার পরিচয় হয়। গোকুলবাবু সূর্যনারায়ণের বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতায় বেশ প্রীত হন। তাহার নীলাম ক্রীত চিরলী মধুরদী নামক স্থানের স্বামিত্ব স্থাপন সম্বন্ধে তত্রত্য তালুকদারদিগের সঙ্গে অত্যন্ত হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। তিনি কোন প্রকারেই কৃতকার্যতা লাভ করিতে না পারিয়া সুচতুর সূর্যনারায়ণবাবুকে তথায় (চিরলীমধুরদীতে) প্রেরণ করেন। সূর্যবাবু অনেক যষ্টিধারী পুরুষ পরিবৃত হইয়া তথায় গমন করেন। তিনি নানাবিধ কৌশল অবলম্বনপূর্বক ঐ স্থান আয়ত্ত করেন। ইহাতে গোকুলবাবু তাহার প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে থাকেন।

সূর্যবাবু এই কার্য দ্বারা বহুল ধন সম্পত্তি উপার্জন করেন। অনন্তর তিনি প্রোক্ত অর্থ দ্বারা ভূসম্পত্তি ক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হন। রঙ্গাভাঙ্গা অংশ লাভই তাহাদিগের জমিদারির সূত্রপাত। সূর্যবাবু গৃহে আসিয়াই এক সুপ্রশস্ত দীঘিকা খনিত করান। অনেকে বলেন এই দীঘি খননকালে তিনি মোহরপূর্ণ কতিপয় কলস প্রাপ্ত হন। তাহার দুই পত্নী ছিল। প্রথম কামিনীর গর্ভে বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী অপুত্রবতী ছিলেন বলিয়া তিনি তাহাকে এক দত্তক পুত্র রাখিয়া দেন। তাহার নাম কান্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতার পরলোক গমনের পর ইহাদের মধ্যে ধন সম্পত্তির অংশ লইয়া পরস্পর অনেক বিবাদ হয়। কিন্তু পরিণামে তাহাদিগকে পিতৃকৃত বিনিয়োগ পত্রানুসারেই কার্য করিতে হইল। বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইতেই তাহাদের "চৌধুরী" বলিয়া খ্যাতি হয়। ইহার তিন পুত্র। বাবু উমাকান্ত, বাবু কাশীকান্ত ও বাবু কালীকান্ত ইহারা কেহই এখন জীবিত নন। কান্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র বাবু শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই জমিদারবৃন্দ বিদ্যাবিষয়ে অনেক উৎসাহ দান করিতেছেন। অত্রত্য ইংরাজি বঙ্গ বিদ্যালয়টি তাহার উদাহরণস্থল। এখানে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে। জমিদার মহোদয়দিগের অন্তঃকরণে বিদ্যানুরাগিতা যতদূর দৃষ্ট হয়, যদি অন্যান্য বিষয়ে তা দৃশ উৎসাহ থাকিত, তাহা হইলে ইহা অসংশয়িত রূপে বলা যাইতে পারে যে, কালীপাড়া অপর গ্রাম সমূহের অনুকরণস্থল হইয়া উঠিত। সম্প্রতি কালীপাড়ার অনেকাংশ ভয়ঙ্করী পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে।

এখানে জয়কালিকার মৃন্ময়ী প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতিদিন ইহার অর্চনা হইয়া

থাকে। প্রত্যেক অমাবস্যা নিশিতে কালীর সম্মুখে এক একটি অজচ্ছেদ হয়। পূর্বে এই কালীর বড়ই প্রতাপ ছিল। কিন্তু সংপ্রতি উহার তাদৃশ উচ্চ নাম নাই।

রাঢ়ীখাল ঃ

রাঢ়ীখাল ভূতপূর্ব অন্যতর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের মাতৃভূমি। ইনি এখন বর্ধমানে পরিবর্তিত হইয়াছেন। যখন বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের বিধবা কন্যার বিবাহের জন্য ঢাকা নগরীতে তুমুল চেষ্টা ও উদ্যোগ হয়, ইহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বসু (ইনি সম্প্রতি চট্টগ্রাম গবর্নমেন্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক) তাহার অন্যতম উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ইহার সহধর্মিনী, শুনা যায়, তাহাতে (বিবাহে) স্ত্রী আচার সম্পাদনার্থ সমাহূতা হইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য নিবন্ধন কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। এখানে বেশ ভদ্রলোকের বাস আছে।

মাইজপাড়া ঃ

বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় এই গ্রামের অলঙ্কার। ইনি অধুনা রাজসাহী, রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রতি জেলাস্থ বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়ক। এই মহাত্মা ঢাকা জেলার বিদ্যালয় সকলের ভূতপূর্ব ডেপুটি ইনস্পেক্টর ছিলেন। তখন ইনি যেরূপ বিপুল প্রতিষ্ঠা সহকারে দেশের উন্নতি সাধন ব্রতে ব্রতী ছিলেন, এখন তদপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ প্রণোদিত হইয়া পরকীয় জেলা সমূহের উন্নতি বিধান করিতেছেন। বস্তুত তাহারই যত্নাতিশয়ে বিক্রমপুর যে কিছু সৌষ্ঠব সম্পন্ন দৃষ্ট হয়। কাশীবাবুর সময়েই বিক্রমপুরে বালিকা বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়। মাইজপাড়ার বঙ্গবিদ্যালয়টি অপেক্ষাকৃত উন্নত ও প্রধান।

মাইজপাড়ায় হরিকিশোর রায়, তারাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি মহোদয়গণ বেশ প্রতিপন্ন লোক। দেশ মধ্যে ইহাদের কম প্রতাপ নহে। এখানে অনেক সুশিক্ষিত দৃষ্ট হন।

ভাগ্যকুল ঃ

অত্রত্য প্রসিদ্ধ ধনী কুণ্ডুদিগের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ভাগ্যকুলে শ্রীবৃদ্ধি দৃষ্ট হইতেছে। এখন বিক্রমপুরে ইহাদের ন্যায় ধনশালী লোক নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহারা দানশীলতার নিমিত্ত সাধারণে" বিশেষ বিখ্যাত। বিগত দুর্ভিক্ষে কুণ্ড মহোদয়গণ দারিদ্র্যপীড়িত অনাথদিগের নিরতিশয় উপকার সাধন করিয়াছেন। তাহাদিগকে ভোজের আনুসঙ্গিক অর্থ দানও করেন। ফলত ইহাদিগের হৃদয়মুকুরে দয়ার প্রতিবিম্ব বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। ইহারা সাধারণের উপকারার্থে নিজ গ্রামে একটি ডিস্পেন্সারি স্থাপন করিয়াছেন। ভাগ্যকুলের বিদ্যালয়ের প্রতি কুণ্ডুবাবুদিগের বেশ যত্ন আছে সন্দেহ নাই। ইহাদের যত্ন ও উদ্যোগে এখানে একটি ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে। কুণ্ডুদিগের বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের বিলক্ষণ প্রচার আছে।

বাগড়া ঃ

বাগড়া এককালে বিরল বসতি নহে। অতি অল্পকাল হইল, এই স্থান শুদ্ধ কাশবনে আবৃতও বালুকাময় ছিল। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় প্রবল সমীরণ সহযোগে যখন কাশকুসুমগুচ্ছ ও বালুকাকণা দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিত, তখন পথিকদিগের যারপরনাই কষ্ট উপস্থিত হইয়া সমাগমন অসাধ্য হইয়া উঠিত। দূর হইতে দৃষ্টিপাত কেবল ধু ধু করিতেছে দেখা যাইত। কিন্তু তাদের কি বিচিত্র গতি। কি চমৎকার পরিবর্তন। এখন বাগড়া, কামারগাঁ, মণ্ডলপাড়া প্রভৃতি স্থান সমূহের চতুর্দিকস্থ গ্রামাবলী অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি রূপে প্রতীত হয়।

এই গ্রামে শ্রীনাথ ও বাসুদেবের প্রতি মূর্তি সংস্থাপিত আছে। সাধারণ্যে পুত্র কন্যাদিগের অন্নপ্রাশন সময় ইঁহাদিগের (শ্রীনাথ ও বাসুদেবের) প্রসাদ গৃহীত হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে বাসুদেব ও শ্রীনাথ দর্শনার্থ অনেক বিদেশিয় লোক সমাগত হয়। তখন হট্টাদির ন্যায় অনেক স্থল লোক পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এস্থানে সংপ্রতি শিক্ষিত লোকও বেশ দৃষ্ট হইতেছে।

কুকুটিয়া ঃ

এই পল্লী দ্বিজবংশ সম্ভূত চৌধুরী ও সরকারসমূহে পরিপূরিতা ; ইহাদের পূর্বের ন্যায় সমৃদ্ধি নাই। এখানে বিদ্যোৎসাহিনী নাম্নী একটি সভা আছে বটে, কিন্তু বড় উন্নতিশালিনী বোধ হয় না। এমন কি, এখন উহা জীবিত আছে কিনা সন্দেহ স্থল। একদা অত্রত্য বিদ্যালয়ে পূর্ব পণ্ডিত বাবু জগন্নাথ সরকার ও কতিপয় হিতৈষী ব্যক্তির যত্নে "সংসার সংশোধিনী" নাম্নী একখানা মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছিল। কালে পরিবর্তনশীল ধর্মের সঙ্গে কিছুদিন পরে আর তাহাদিগের উৎসাহ ও অধ্যবসায় লক্ষিত হইল না সুতরাং পত্রিকার জীবনান্ত হইল। পল্লীগ্রামে অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধনই এইরূপ সৎকার্যের অনুষ্ঠান হইয়াও অচিরাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। ধনীদিগের তাহার প্রতি তত মনোযোগ দেখা যায় না।

এই গ্রাম নিবাসী মৃত কালীকুমার দত্ত ময়মনসিংহ জজ আদালতের একজন প্রধান উকিল ছিলেন। ইনি বিস্তর বদান্যতার কার্য করিয়া "দাতা কালীকুমার" বলিয়া সর্বত্র প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন। হায়! কি পরিতাপের বিষয়! প্রায় দুই বর্ষ অতীত হইল ইহার পরোপকারিতা গুণদর্শনে কাতর হইয়াই যেন দুরন্ত শমন বিকটমূর্তি পরিগ্রহপূর্বক ইহাকে নিজ নিকেতনে লইয়া গিয়াছে। ইহার অকাল লোকলীলা সংবরণে অনেকেই ক্ষুব্ধ হৃদয় হইয়াছেন।

কোলা ঃ

যদিও কোলার অনেক স্থান অরণ্যাকীর্ণ হউক, কিন্তু যতটুকু পরিস্কৃত ও বাসযোগ্য আছে তৎসমুদয় স্থানই মনুষ্য বাসের পরিপুরিত বলা যাইতে পারে। এখানে অনেক ঘটক ও কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করেন। বোধ হয় ঘটকদিগের সংখ্যাধিক্য বশত ইহাকে "ঘটকের কোলা" বলিয়া থাকে। এখানকার সার্কেল বিদ্যালয়টির কার্য উৎকৃষ্টরূপে চলিতেছে। অন্যান্য বাংলা বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা অপেক্ষা এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা অনেক অধিক। কোলা ও ইহার নিকটবর্তী অনেক পল্লী প্রায়ই অরণ্যময়।

সানসিদ্ধি ঃ

এখানকার গুহ ও মিত্রমগুলী একপ্রকার বেশ সম্পন্ন। ইহাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যাও এককালে মন্দ নহে। অত্রত্য মৃত শম্ভুচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এক মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মঠ বিক্রমপুরের আধুনিক অপরাপর স্থানের মঠ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। ফলত উহাকে আজি বিক্রমপুরের এককীর্তি স্বরূপ বলিতে হইবে।

পূর্ব বিক্রমপুরে নিম্নলিখিত গ্রামসমূহ গণ্ডগ্রাম বলিয়া উক্ত হইতে পারে। নওপাড়া, তেলিরবাগ, ভরাকৈর, পাইকপাড়া, রামপাল, বজ্রযোগিনী, নগরকস্বা, সোনারঙ, আইরল, বিদগাঁ, বানরী।

তেলিরবাগ ঃ

এই গ্রাম বিজ্ঞবর বাবু কালীমোহন দাশ ও বাবু দুর্গা দাশ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জন্মস্থান। ইহাদের পিতা কাশীশ্বর দাশ মহোদয় বরিশালে প্রধান ব্যবহারাজীবী ছিলেন। তিনি উক্ত কর্মে বিলক্ষণ কার্যদক্ষতা প্রদর্শন করিয়া অনেক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগকে একপ্রকার বিদেশবাসী বলা যাইতে পারে। কালীমোহনবাবু বঙ্গদেশীয় উচ্চতম আদালতের একজন বিখ্যাত উকিল। দুর্গামোহন বাবু বরিশালের গবর্নমেন্ট নিয়োজিত প্রধান উকিল। ইহারা উভয়েই শিক্ষিত ও উন্নত স্বভাব। ধর্ম ও দেশের উন্নতি সাধন বিষয়ে ইহারা বিধবা বি[illegible]তার বিবাহ প্রদান করিয়াছেন. অনেকে এই জন্য ইহাদের প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিয়া থাকেন। ইহারা অত্যন্ত পরোপকারী ব্রাহ্মণ। বরিশালের যে কিছু উন্নতি দেখা যায় দুর্গামোহন বাবুকেই তাহার মূল বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাদিগকে গৃহে আসিতে বড় একটা যত্নশীল দেখা যায় না। ইহারা ব্রাহ্মধর্মের উন্নতির নিমিত্ত নানা স্থানে দান করিয়া থাকেন। বিধবা বিবাহ দান পক্ষে ইহারা

বিলক্ষণ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। বাস্তবিক কতকদিন জীবিত থাকিলে ইহাদের দ্বারা দেশের বিশেষত বিক্রমপুরে অনেক উন্নতির সম্ভাবনা। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে ইহারা স্বদেশে আসিয়া শীঘ্র তাহার অঙ্গ সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবেন, আমাদের এরূপ মনে হইতেছে না।

ভরাকৈর ঃ

এই স্থানে কাঠালিয়ার দত্ত বংশজগণ একপ্রকার প্রাধান্য সহকারেই বাস করিতেছেন। ইহারাই অর্ধকুলীন বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত। এই দত্তজ নিচয়ের প্রতি দুরপনেয় কলঙ্ককর কৌলীন্যদেবের সম্পূর্ণ অনুগ্রহ না জন্মিবার এক কৌতূকাবহ কিংবদন্তী আছে। তাহা এই ঃ—

আদিশূরের রাজত্বসময়ে রাজ্য মধ্যে অনেকদিন পর্যন্ত বৃষ্টি হয় না। এতন্নিবন্ধন প্রজামণ্ডলীর বহুবিধ কষ্ট উপস্থিত হয়। প্রজা হিতৈষী মহানুভব আদিশূর প্রকৃতির ক্লেশ দর্শন করিতে না পারিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের করুণা লাভাশয়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে স্থির সঙ্কল্প হন। তখন এতদ্দেশীয় দ্বিজগণ বেদশাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং স্থানান্তর হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়নের আবশ্যকতা হইল। নৃপবর কান্যকুব্জরাজ বীরসিংহকে তাঁহার রাজ্য হইতে বেদকুশল পাঁচজন ব্রাহ্মণ প্রেরণের অনুরোধ করেন। তদনুসারে রাজা বীরসিংহ ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড় এবং শ্রীহর্ষ এই প্রধান বেদজ্ঞ ৫জন ব্রাহ্মণকে আদিশূর সমীপে পাঠাইয়া দেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কবিবর ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্য মুণির বংশসম্ভূত বলিয়া শাণ্ডিল্য গোত্র ছিলেন। বঙ্গদেশে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় যত ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারা সকলেই ভট্টনারায়ণের সন্তান। মকরন্দ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ইঁহার সঙ্গে ভৃত্য হইয়া আগমন করেন। ঘোষ বংশীয় সকলেই এই মকরন্দ ঘোষের সন্তান। কশ্যপ মুনি দক্ষের আদি পুরুষ ছিলেন ; সুতরাং তিনি কাশ্যপ গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত।

আদিশূর প্রোক্ত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা মহা সমারোহে যাইয়া ক্রিয়া সম্পাদন করেন। তদবধি দ্বিজ নিচয় বঙ্গদেশেই বসতি করেন। কালক্রমে তাহাদের ৫৬ জন সন্তান হয়। নৃপমণি বল্লাল সেন তাঁহাদিগকে ৫৩ খানি গ্রাম ব্রহ্মাত্র দিয়া সংস্থাপন করেন। ইহা হইতেই ৫৩ গাঁই হয়। তিনি সমুদয় ব্রাহ্মণের মধ্যে ধর্ম ও আচারগত প্রভেদ গৌণ, দ্বাবিংশতি ব্যক্তিকে কুলীন এবং অবশিষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে শোত্রীয় শ্রেণীতে পরিগণিত করিলেন, অনন্তর কন্যার দানাদান প্রভৃতি দোষে শেষোক্ত শ্রেণীস্থ দ্বিজ ভিন্ন ত্রিবিধ ব্রাহ্মণের সন্তানবৃন্দের কেহ কেহ কুল ভ্রষ্ট হইয়া বংশজ ক্ষান্ত রহিলেন এমন নহে। তিনি এদেশে পূর্বে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাদিগের সহিত উল্লিখিত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানাদির বিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধ স্থাপিত, না হয়, এই জন্য ঐ দ্বিজগণকে সাত শত গৃহে গণনা করিয়া স্বতন্ত্র এক শ্রেণী করিয়া দেন. তাহারা "সপ্তসতী" শব্দে অভিহিত হন। এইরূপে রাজা বল্লাল সেন কানোজ হইতে সমাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণের ও দেশস্থ সপ্তসতী দ্বিজবৃন্দের বিভাগ বিধান করেন।

অনন্তর বল্লালতনয় লক্ষ্মণ সেন যখন রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তখন তিনি প্রোক্ত রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণ সন্তানসমূহের সমীকরণ করেন। তাহাতে উক্ত সন্তানগণ তাহাদিগের আদিপুরুষ পঞ্চদ্বিজ হইতে যত শ্রেণী (পুরুষ) অন্তর হইয়াছেন তাহা নির্ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যেই পরস্পর আদান প্রদান হইবে, এই নিয়ম সংস্থাপন করেন। কিয়ৎকাল বিগত হইলে দেবীবর নামক এক ঘটক ব্রাহ্মণ বহুদিন স্বীয় ইষ্ট মন্ত্র জপ করিয়া বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। তিনি স্বেচ্ছানুসারে যাহাদিগকে কুলীন করিয়া লিখিলেন, তাহারাই কুলীন এবং যাহাদিগকে কুলীন পদের অযোগ্য বলিলেন, তাহারই কুলহীন হইলেন। দেবীবর বলিলেন, তাহারাই কুলহীন হইলেন। দেবীবর প্রণীত নিয়ম আজও অব্যাহত রহিয়াছে। পঞ্চ ব্রাহ্মণের সমভিব্যাহারে আগত কায়স্থ পঞ্চ জনের মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র এই চারিজনের সন্তান কুলীন এবং দত্ত ভ্রাতৃত্ব স্বীকারে অসম্মত হন বলিয়া তাহার বংশীয়গণ কুলীন না হইয়া মৌলিক হইলেন। উক্ত পাঁচজন কায়স্থের আগমণের পূর্বে এদেশে যে সকল

কায়স্থ ছিলেন, তাহাদের মধ্যে আটঘর সিদ্ধ মৌলিক ও বায়াত্তর ঘর সামান্য মৌলিক হয়। শেষোক্তদিগকে সাধারণে "বাহত্তরিয়া" শব্দে কহিয়া থাকে। এই রূপে মহাত্মা বল্লাল সেন ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন, কায়স্থবৃন্দের শ্রেণী স্থাপন করেন। অনন্তর হোসেন সাহ যখন গৌড় দেশের সম্রাট হন, তখন তাঁহার উজীর পুরন্দর বসু পুনরায় একশ্রেণী নির্মাণ করেন।

নরনাথ বল্লাল ব্রাহ্মণদিগকে "কুলীন" উপাধি প্রদান করিয়া তাহাদের ভৃত্যগণকেও কৌলীন্যভূষণে বিভূষিত করিতে সমুৎসুক ও অভিলাষী হন। তাহারা আহূত হইয়া তাহার সন্নিধানে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমরা কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? প্রথমোক্ত চারি ব্যক্তি (ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র) "আমরা ব্রাহ্মণ মহাত্মাদিগের ভৃত্য। তাঁহাদের সমভিব্যাহারে আসিয়াছি" বলিয়া স্ব স্ব পরিচয় দিলেন। নৃপবর তখন "তুমি ও কি দ্বিজ দাস?" বলিয়া দত্তর পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলেন। দত্ত স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার মানসে উত্তর করিলেন মহাশয়! "ন দত্তঃ কস্যচিদ্দাসঃ সহৈতৈস্ত্ত সমাগতঃ" দত্ত কারো ভৃত্য নয় সঙ্গে এসেছেন। 'রাজা তচ্ছ্রবে তাহাকে নিতান্ত গর্বিত মনে করিয়া অনেক ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। ঘোষ, বসু প্রভৃতিতে কুলীন শব্দে খ্যাত করিলেন। অনন্তর দত্ত মহাপ্রমাদ আশঙ্কা করিয়া নৃপতির স্তব স্তুতিত প্রবৃত্ত হইলেন। উদার চিত্ত নৃপকুঞ্জর বল্লাল বহুবিলম্বে তাহাকে 'অর্ধকুলীন' উপাধি প্রদান করিলেন। কিন্তু তখন কিছু করিতে পারেন না। এককালে না থাকা অপেক্ষা কিছু থাকাও ভাল। সুতরাং তাহাতেই আপনাকে শ্লাঘ্য মনে করিলেন। অনন্তর সেই সমুদায় কুলীন বিক্রমপুরের নানা স্থানে অবস্থান করিতেছেন। দত্তগণ কাঠালিয়ায় আইসেন। কিন্তু এখন কাঠালিয়ার চিহ্নও দৃষ্ট হয় না। কোথায় বিলুপ্ত হইয়াছে নির্ধারণ করা সহজ নহে।

বজ্রযোগিনী ঃ

এই গ্রাম সাতাইশ উপপল্লীতে বিভক্ত। শঙ্করবন্ধ, সোমপাড়া, পুকুরপার, আটপাড়া প্রভৃতি তন্মধ্যে প্রধান। ইহাতে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। এখানে সুপ্রসিদ্ধ রাজা বল্লাল সেনকৃত অট্টালিকা সমূহের অনেক ভগ্ন অবশেষ লক্ষিত হয়। অধুনা তৎসমস্ত দ্বারা অনেকানেক ভদ্রমহোদয় বেশ প্রাসাদ নির্মাণ করাইতেছেন। এরূপও জনরব যে অনেকে তাঁহার সাময়িক বহুমূল্য স্বর্ণ রৌপ্যখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অত্রত্য গুহবংশজগণ বিলক্ষণ পরিচিত সন্দেহ নাই। মৃত মহোদয় জয়চজন্দ্র গুহের খ্যাতির বিষয় অনেকে অবগত আছেন।

এখানকার ইংরেজি বঙ্গবিদ্যালয়টির ক্রমশ উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। স্থানীয় সাহায্য দাতৃগণও মন্দ উৎসাহ সম্পন্ন নন। এই বিদ্যালয়ে জ্ঞান প্রদায়িনী নাম্নী একটি সাপ্তাহিক সভা প্রতিষ্ঠিত আছে। উহার মন্দ উন্নতি নয়।

নগর কস্‌বা ঃ

এই স্থানটি সুন্দর নগরের মতই দৃষ্ট হয়। এখানে নানা ব্যবসায়ী লোকের বাস আছে। অত্রত্য সাহাগণ বিশেষ সম্পন্ন। এখানকার সার্কেল পণ্ডিতবাবু নিত্যানন্দ চক্রবর্তী মহাশয়ের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে এখানে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশিয় লোকের উৎপীড়নে নিত্যানন্দ বাবুকে কাতর করিতে পারিয়াছিল না। বহুদিন পর্যন্ত ইনি সকলের বিদ্বেষভাজন হইয়াও ক্রমাগত অবিচলিত উৎসাহ সহকারে সভার কার্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি সমাজটি গতজীবিত হইয়াছে।

বজ্রযোগিনী, বেতকা, পাইকপাড়া প্রভৃতি স্থানে চৌর্য্যের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব। 'বেতকাই চোর বলিয়াই বহুকাল প্রসিদ্ধ একটি প্রবাদ আছে।

সোনারঙ ঃ

এই স্থানে বৈদ্য বংশজগণের সংখ্যাই অনেক অধিক। অন্যান্য শ্রেণীস্থ লোকেরও এককালে অসদ্ভাব নাই। বিক্রমপুরের অধুনাতন ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় এই

সোনারঙ নিবাসী। সমধিক অধ্যবসায় লক্ষিত না হইলেও ইহার অন্তঃকরণে স্বদেশানুরাগিতা ও হিতচিকীর্যা মন্দ বলবতী নয়। অতি অল্পদিন হইল ইহারই যত্নাতিশয়ে এখানে একটি ইংরেজি বঙ্গ বিদ্যালয় ও একটি ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অত্রত্য অন্যান্য বৈদ্য মণ্ডলীও সাতিশয় ক্ষমতাশালী সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের হিতসাধনে অত্যল্প মাত্র যত্নবান দৃষ্ট হন। এই গ্রামে মুন্সেফ, সদর আমীন, প্রধান সদর আমীন, কোর্ট আমীন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর, ডেপুটি ইনস্পেক্টর, হেডমাস্টার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী অনেক আছেন।

আইরল ঃ

এই স্থান অনল্প পরিসর। এখানে মুসলমানদিগের সংখ্যাই অনেক অধিক। অনেকে বলেন, আইরলে সাতশত ঘর কাগজী আছে। বাস্তবিক একথা অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। বহুদূর হইতে "কাগজ কোটার" শব্দ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। কাগজও লিখিতে মন্দ নয়। আইরলে চুনকার ও কাপলিক অল্প নহে। চুনকারগণ বেশ পরিস্কৃত চুন প্রস্তুত করিয়া থাকে। এখানে শ্রোত্রীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ অনেক আছেন। কিন্তু কায়স্থ নিতান্ত বিরল। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্যতর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু উমাচরণ উপাধ্যায় মহাশয় এস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

অল্পদিন হইল ইনি এই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই গ্রামের স্থানে স্থানে ভ্রমণ সময়ে পাদতল ইষ্টকবর্ণে প্রায় রঞ্জিত হইয়া উঠে। ইহাতে বোধহয় পূর্বকালে এখানে অতি সমৃদ্ধিশালী কোন ব্যক্তি বাস করিতেন।

১. "আচারে বিনয়ো বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদান ; নবধা কুললক্ষণং।।"
২. ইহাদিগের আমূল বৃত্তান্ত স্থানান্তর উল্লিখিত হইবে।
৩. পাটাভোগ নিবাসী কালীকুমার ঠাকুর ইহার অধ্যক্ষ। ইহা তাহার বেশ অর্জন-পন্থা।
৪. ভাণ্ডারের দীনদয়াল চক্রবর্তী ইহার ধুরন্ধর। ইহাতে ভানকারিতা বিলক্ষণ লক্ষিত হয়।
৫. একটি শূদ্র জাতীয়া বিধবা কামিনী কালীর অর্চনাক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন।
৬. এখানে কার্তিক বারুণী নামে একটি প্রসিদ্ধ মেলা হইয়া থাকে।
৭. সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ব্যতীত সার্কেলগুলি (মণ্ডল বিদ্যালয়) এক একটি প্রায়ই তিন তিন পাঠশালায় বিভক্ত। সার্কেলের সংখ্যা মন্দ নহে।
৮. এই স্থান কীর্তিনাশা তরঙ্গিণীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত।
৯. "উদ্ভিজ্জ ও শস্য" মধ্যে যে সকল শস্যের বিষয় বিবৃত হইয়াছে তাহাই এখানকার কৃষিজাত শস্য বলিয়া এখানে আর তাহাদের নাম নির্দেশ করা গেল না। কৃষিকার্যের উন্নতি বিধানের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করাই এই প্রস্তাবের মুখ্যোদ্দেশ্য।
১০. অনেক বলেন, ধীসেন বল্লালের পিতা ছিলেন। তিনি দিল্লীতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।
১১. বল্লালের কার্য প্রণালী দর্শন করিলে এ কথা অমূলক ও অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তিনি সহৃদয়তা ও দয়ার অনল্প পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।
১২. ইহাতে বোধ হয় একমাত্র বাওআদমই বল্লালের অরি ছিল। অন্য মুসলমানেরা তাহার সহিত যোগ দেয় নাই।
১২. ইহার জন্ম বিষয়ে একটি কৌতুকাবহ কথা আছে। রাজবল্লভের জননী যখন গর্ভবতী ছিলেন, তখন একদা তিনি নিশীথ সময়ে স্বপ্ন দর্শন করিয়া স্বামীর নিকট বললেন যে হে স্বামিন! আমি দেখিলাম যেন আমার গর্ভবনে একটি চন্দ্র প্রবেশ করিল। কৃষ্ণজীবন পত্নীর এই বাক্য সমাপ্ত না হইতে হইতেই তাহাকে এক চপেটাঘাত করিলেন তাহার প্রণয়িনী পতিকেঈদৃশ ভাবাপন্ন দর্শন করিয়া নিতান্ত বিস্মিতও একান্ত চমৎকৃত হইলেন। এবং প্রোক্ত আঘাতে মহতী যতনা অনুভব করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে রজনী প্রভাত হইলে তিনি স্বামীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কৃষ্ণজীবন বলিলেন প্রিয়ে! আমি তোমাকে ক্লেশ প্রদান উদ্দেশ্যে চপেটাঘাত করিয়াছি এরূপ মনে করিও না। শাস্ত্রে উক্ত আছে

তাদৃশ স্বপ্ন দর্শন করিয়া আর নিদ্রা যাইবে না, প্রভাত পর্যন্ত জাগরিত থাকিবে। তুমি রোদন করিয়া রজনীযাপন করিবে ভাবিয়াই আমি তোমাকে ঐরূপ আঘাত দিয়াছি। তাহার স্ত্রী ইহা শ্রবণ করিয়া আপনাকে নিরতিশয় শ্লাঘনীয়া মনে করিতে লাগিলেন। এই গর্ভেই বিখ্যাতনামা রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন।

১৩. কথিত আছে, দীঘি খনিত হইলে অনেকদিন পর্যন্ত তাহাতে জল উঠে না। পরে স্বপ্নাদেশ হয় যে "এক পুত্রবতী মাতা তদীয় পুত্র কাটিয়া রক্তদান করিলে দীঘিতে জল উঠিবে।" কেশা তাহার মার একমাত্র পুত্র ও কৈবর্ত জাতীয় ছিল। রাজাদেশে দীর্ঘিকা তটে কেশার শিরচ্ছিন্ন হয়। পুত্র বিয়োগ শোকে মাতা অধীরা হইলে তাহার শোকোপনয়নার্থ প্রভু দীর্ঘিকার নাম "কেশার মার দীঘি" রাখেন। উহা অত্যন্ত প্রশস্ত।

১৪. রামদাসের সাহসিকতা ও চতুরতার একটি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। প্রবাদ আছে তিনি নবাব ভিন্ন সম্ভ্রান্তই হউক অথবা নীচ জাতীয়ই হউক অপর সকলকে বাম হস্তে সেলাম দিতেন ও তাহাদিগ হইতে সেলাম গ্রহণ করিতেন। রামদাসের ঈদৃশ দুর্ব্যবহারে আপনাদিগকে নিতান্ত অপমানিত মনে করিয়া কতিপয় প্রবাস ব্যক্তি নবাব সমীপে তাহার নামে অভিযোগ করেন। রাজবল্লভ তখন দেওয়ান ছিলেন। তিনি পুত্রের তাদৃশ আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। নবাব তাঁহার পুত্রকে আনয়ন জন্য আদেশ করেন। তদনুসারে রাজবল্লভ রামদাসের নিকট তাহাকে শীঘ্র আসিবার জন্য পত্র লিখেন। তিনি "তাহার প্রাণবধ হইবে। এবার আর রক্ষা নাই" মনে করিয়া এককালে অস্থির ও ব্যাকুল হইলেন। এদিকে পিতার পত্র পাইয়া রামদাস অকুতোভয়ে তাহার নিকট উপনীত হইলেন। রাজা রাজবল্লভ তাহাকে দেখিয়া প্রাণনাশ হইবে বলিয়া অনেক ভয় দেখান। রামদাস বলিলেন পিতঃ! আমি ত কৃষ্ণজীবনের পুত্র নই যে, আপনার মত ভীত হইব। আমি রাজা রাজবল্লভের পুত্র। আমি কেন শঙ্কিত হইব?" পরে তিনি নবাব সমীপে উপস্থিত হইলে নবাব তাঁহাকে সমস্ত ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। রামদাস নির্ভয় চিত্তে কহিলেন 'মহাশয়, আমি দক্ষিণ হস্তে আপনাকে সেলাম দি। এবং অপর হস্তে অন্যান্যকে সেলাম প্রদান করিয়া থাকি। যদি দক্ষিণ হস্তও সাধারণের নমস্কার সময়ে ব্যবহার করি তাহা হইলে আপনাতে ও সামান্য লোকে প্রভেদ কি থাকে?' নবাব ইহাতে শাস্তি দিবেন দূরে থাকুক প্রত্যুত বহুমূল্য এখন পরিচ্ছদ পুরস্কার দান করিলেন।

১৫. অনেকের বিশ্বাস জমিদারগণ পণ্ডিতদিগকে ধনোপচারে পূজা দিয়া বশীভূত করেন।

১৬. অনেকে বলে, সংগ্রামে রাজবল্লভ বিজয়ী হন। কেহ কেহ এই সংস্কারাপন্ন দৃষ্ট হন যে জয়লক্ষ্মী চৌধুরীদিগের অঙ্কশায়িণী হন। আবার অনেকের বিশ্বাস প্রথমে একবার রাজবল্লভ ও বারান্তরে চৌধুরীগণ জয়লাভ করিয়াছিলেন। "নানা মুনির নানা মত।" আমরা অধিকাংশের সংস্কারের বশবর্তী হইয়া কার্তিকপুরের চৌধুরীদিগকে রণজিৎ বলিয়া লিখিলাম।

১৭. ইহার সময়েই রাইযবর "শ্রীনগর" নামে খ্যাত হয়।

১৮. রাজনগরের প্রাচীন নাম বিল দাওনিয়া।

১৯. কালীতারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
বগলাসিদ্ধি বিদ্যাচ মাতঙ্গীকমলাত্মিকা।
ভৈরবী ছিন্নমুণ্ডাচ বিদ্যাধূমাবতী তথা।।
একাদশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধি বিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা।।

২০. চাঁচেরপাশা এখন পদ্মার গর্ভস্থ হইয়াছে।

—সম্পূর্ণ—

বিক্রমপুরের ইতিহাস

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বঙ্গদেশ ও বিক্রমপুর



বৈদিক যুগ ও বঙ্গদেশের প্রাচীনত্ব ঃ

বৈদিক যুগে যখন আর্যগণ প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তখন তাহারা পশ্চিমে সুলেমান গিরিশ্রেণী এবং পূর্বে পবিত্র-সলিলা গঙ্গা-যমুনার পুণ্য-সঙ্গম, উত্তরে তুষারমণ্ডিত শুভ্র হিমালয় পর্বতশ্রেণী হইতে দক্ষিণে সিন্ধু-সঙ্গম পর্যন্ত প্রকৃতির এই লীলানিকেতনের মধ্যেই তাহাদের বাসস্থান সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর্যগণের অধিকৃত এই ভূমিখণ্ডই আর্যাবর্ত নামে অভিহিত। তাহাদের আগমনের পূর্বে এই সকল স্থান অনার্য—অধিবাসীদের কর্তৃক অধিকৃত ছিল। আর্যগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া অসভ্য প্রাচীন অধিবাসীবৃন্দ বন হইতে বনান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। বৈদিকযুগে আর্যগণ আর্যাবর্তে বাস করিতেন বলিয়া যে ইহার বহির্ভূত, অন্য কোনও প্রদেশের নাম অবগত ছিলেন না, তাহা নহে, কারণ ঋগ্বেদের ঐতবেয় আরণ্যকে (২/১/৩) সর্বপ্রথমে বঙ্গনাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা ঃ

"ইমা প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি।
বঙ্গা-বগধাশ্চেরপাদান্যন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি।।"

অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসীগণ, মগধবাসীগণ এবং চের জনপদবাসীগণ, এই ত্রিবিধ প্রজাই কি দুর্বলতা, কি দুরাহার ও বহু অপত্যতায় কাক, চটক ও পারাবত সদৃশ।

বঙ্গের প্রাচীনতম উল্লেখ ঃ

ইহা দ্বারা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ঐতরেয় আরণ্যক রচনাকালে বঙ্গ, মগধ ও চের—এই তিন জাতিকে আর্যগণ দৌর্বল্য, দুরাহার ও বহু অপত্যতার জন্য কাক, চটক ও পারাবতের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। বঙ্গ, বঙ্গদেশের নাম। মগধ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে নানারূপ মতভেদ দেখা যায়। বগধ হয় মগধের প্রাচীন নাম অথবা বগধ ও চের অর্থে বগধ নামক জাতি এবং চের জাতি, অথবা দেশ-বিদেশের নাম কিনা সে বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই তিনটি শব্দের অর্থ 'বঙ্গ' জাতি, 'বগধ' জাতি ও 'চের' জাতি। বঙ্গ শব্দের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ ঐতরেয় আরণ্যকেই প্রথম পাওয়া যায়।

ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে বৈদিকসাহিত্য সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঋক, যজুঃ, সাম, অথর্ব—এই চারি বেদের প্রত্যেক বেদের **মন্ত্র** এবং **ব্রাহ্মণ** এই দুইটি প্রধান ভাগ। বেদের মন্ত্রভাগ **সংহিতা** নামে অভিহিত। ঋগ্বেদ-সংহিতার ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের পুণ্ড্র এবং অন্ধ্রগণকে শবর এবং পুলিন্দগণের সহিত দস্যুজাতির মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। যথা ঃ

এতেহন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মুতিরা ইত্যু দন্ত্যা বহবো ভবন্তি বৈশ্বামিত্রা দস্যুনাং ভূয়িষ্ঠা। ৭/১৮

অথর্ব বেদ-সংহিতা ঃ

অথর্ব-বেদ সংহিতার পঞ্চম কাণ্ডে অঙ্গ ও মগধদেশের নাম আছে। তাহাতে এইরূপ আছে, যে জ্বর আমাদিগকে পীড়ন করিতেছে, সেই জ্বর মগধ ও বঙ্গদেশে যাইয়া আশ্রয়

গ্রহণ করুক। অথর্ব-বেদ-সংহিতা অনেকটা পরবর্তীকালের রচনা বলিয়া কিথ্ (Keith) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্দেশ করিয়াছেন।

সংস্কৃত-সাহিত্যে বিন্ধ্যপর্বতবাসী বর্বর জাতিনিচয়কে শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানকালে এই সকল জাতি সাঁওতাল, কোল, ভীল নামে পরিচিত। শবর এবং পুলিন্দগণের সহিত একত্র দস্যুর সামিল বলিয়া গণনা করা হইয়াছে বলিয়াই যে পুণ্ড্রগণ অর্থাৎ বরেন্দ্র প্রদেশের প্রাচীন অধিবাসীগণ শবর, পুলিন্দদের মত বর্বর ছিলেন এইরূপ মনে করিতে পারা যায় না।

কল্পসূত্র ও বাংলাদেশ, আর্যাবর্তের অন্যান্য প্রদেশের লোকের বঙ্গ-বিদ্বেষ ঃ

বয়স হিসাবে বেদের ব্রাহ্মণখণ্ডের পরে সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে বেদাঙ্গের অন্তর্গত **কল্পসূত্র**। বৌধায়নের কল্পসূত্রের অন্তর্গত ধর্মসূত্রে এইরূপ ব্যবস্থা আছে, যদি কেহ **পুণ্ড্র**, **বঙ্গ** এবং **কলিঙ্গগণের** দেশে গমন করে, তবে তাহাকে দেশে ফিরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরী জেলা এবং পুরীর দক্ষিণে অবস্থিত গঞ্জাম জেলা প্রাচীনকালে **কলিঙ্গ** নামে পরিচিত ছিল। কলিঙ্গ দেশ উড্র, কোলিঙ্গ (আধুনিক গঞ্জাম) মুখ্য কলিঙ্গ ইত্যাদি ভাগে সম্মিলিত ছিল। একটি মহানদী ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী অংশ ও অপরটি মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী ভাগ। পুণ্ড্র-বঙ্গ-যাত্রীর জন্য বৌধায়নের এই প্রায়শ্চিত্তবিধি অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রেও আছে। সুতরাং শ্রুতির বা বেদের এবং স্মৃতির বা ধর্মশাস্ত্রের বচন-বিচার করিলে দেখা যায়, প্রাচীনকালে এক সময় আর্যাবর্তের অন্যান্য ভাগের লোকেরা **বাংলার অধিবাসীগণকে বর্বর** মনে করিত এবং বাংলায় যাওয়া-আসা পাপজনক মনে করিত।

শ্রুতি-স্মৃতি ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের শাস্ত্র। অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ, যাহারা ধর্মবিষয়ে শ্রুতি-স্মৃতির অনুসরণ করে না তাহাদের) শাস্ত্রেও দেখা যায়, প্রাচীনকালে একদিকে বিহার (মিথিলা, মগধ, অঙ্গ) এবং অন্যদিকে বাংলা (পুণ্ড্র, সুহ্মা, বঙ্গ) এই দুই দেশের লোকের মধ্যেও বিশেষ পরিচয় বা যাওয়া-আসা ছিল না।

রামায়ণ ও মহাভারত ঃ

রামায়ণ ও মহাভারতে বঙ্গের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বাল্মীকির রামায়ণের বয়স আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ৫০০ অব্দ এবং মহাভারতের রচনাকাল আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী। এই দুই গ্রন্থেও বঙ্গের নাম অনেকবার উল্লিখিত হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণে বঙ্গদেশের যে উল্লেখ আছে, তাহাতে বঙ্গকে ছোটজাতি বলিয়া মনে হয় না, কেন না সেখানে বিদেহ, মলয়, কাশী, কোশল প্রভৃতি বড় বড় জাতির সহিত উহার উল্লেখ দেখা যায়। যথা :

সুহ্মান্ মাল্যান্ বিদেহাংশ্চ মলয়ান্ কাশিকোশলান্।
মগধান্ দণ্ড-কুলাংশ্চ বঙ্গানঙ্গাংস্তথৈচ।। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। ৪০ অঃ। ২৫ শ্লোক।

মহাভারতের আদি, সভা, উদ্যোগ প্রভৃতি প্রায় প্রতি পর্বেই বঙ্গের উল্লেখ আছে। এবং কেন এদেশের নাম বঙ্গ হইল সে উপাখ্যানও রহিয়াছে।

বলিরাজার পুত্রগণের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্মা। অঙ্গের নামে **অঙ্গদেশ**, বঙ্গের নামে **বঙ্গদেশ**, কলিঙ্গের নামে **কলিঙ্গদেশ**, পুণ্ড্রের নামে **পুণ্ড্রদেশ** ও সুহ্মের নামে **সুহ্মদেশ**।[১]

বৌধায়ন ধর্ম সূত্রে লিখিত আছে, যিনি আরট, কাস্কর, পুণ্ড্র, সৌবীর, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও প্রাণূন দেশে ভ্রমণ করিবেন, তাহাকে পুনস্তোম বা সর্বপৃষ্ঠা ইষ্টি করিতে হয়।

মনুসংহিতায়ও বঙ্গদেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মনুর মতে—

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র-মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।।

অযোধ্যাকাণ্ডের দশম সর্গে আছে—আমার পৃথিবীতে অধিকার আছে, সুসমৃদ্ধ দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, কোশল, কাশী, সৌরাষ্ট্র, মৎস্য, বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ এবং দক্ষিণ রাজ্য প্রভৃতি সমুদয় রাষ্ট্রই আমার অধীন এবং ঐ সকল জনপদে অজাবিক, ধন ও ধান্য প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য জন্মিয়া থাকে। তুমি সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে দ্রব্য লইতে বাসনা কর, আমি তোমাকে প্রদান করিব।

মহাকবি ভাসের কাব্যে, অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিতে, পাণিনির বৃত্তি ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতিতে, গৌড়-বঙ্গের নামের উল্লেখ আছে। এইভাবে আমরা ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে বাংলা দেশের প্রাচীনত্বের কথা জানতে পারি। বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, হরিবংশ এবং ভাগবতেও বঙ্গের নামোল্লেখ আছে।

বৈদিক যুগ, মহাকাব্যের যুগ এবং পৌরাণিক যুগ—এই তিন যুগ হইতেই বঙ্গের নাম সুপরিচিত। কিন্তু সেকালে বঙ্গের সীমা কিরূপ নির্দিষ্ট ছিল, তাহার মীমাংসা করা সুকঠিন।

৩২৬ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে মেসিডনের অধীশ্বর দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর (Alexander) যখন পঞ্চনদ অধিকার করিয়া বিপাশা-তীরে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাহার শিবিরে 'প্রাসিই' এবং 'গণ্ডরিডয়' নামক দুইটি রাজ্যের সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। সেকেন্দরের ইতিবৃত্তে লেখকগণ যেভাবে এই দুইটি রাজ্যের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে 'গণ্ডরিডয়' সম্বন্ধে বিশেষ কোনও তথ্য সংগ্রহ করা সুকঠিন।[১]

ইহার কিছুকাল পরে, গ্রিক্‌দূত মেগাস্থিনিস্ পাটলিপুত্র নগরে মৌর্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায় আগমন করিয়াছিলেন। পাটলিপুত্র-নগরে যে জনপদের রাজধানী ছিল, মেগাস্থিনিস্ তাহাকে 'প্রাসিই' (প্রাচ্য) বলিয়া অভিহিত করিয়া, উহার পূর্বদিকে 'গঙ্গরিডি' নামক আর একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। গ্রিক্ লেখকগণের উল্লিখিত 'গঙ্গরিডয়' এবং 'গঙ্গরিডি' অভিন্ন বলিয়াই অনুমিত হয়। মেগাস্থিনিসের লিখিত ভারতবর্ষের বিবরণ-সম্বলিত মূল 'ইন্ডিকা' গ্রন্থ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পরবর্তী লেখকগণ তাহার যে সকল অংশ আপন আপন গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই এখন আমাদের অবলম্বন।[২] ডিওডোরস্ মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—গঙ্গা নদী—'গঙ্গরিডই দেশের পূর্ব-সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। গঙ্গরিডই-নিবাসীগণের অসংখ্য বৃহদাকার রণ-হস্তী আছে। এই নিমিত্ত তাহাদের দেশ কখনও কোনও বিদেশিয় রাজা কর্তৃক অধিকৃত হয় নাই। কারণ, অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা গঙ্গরিডইগণের অসংখ্য এবং দুর্জয় রণহস্তি-নিচয়কে ভয় করে।[৩] বাংলার যে অংশ ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত, তাহা এখন **'রাঢ়া'** নামে অভিহিত। প্রাচীনকালে এই প্রদেশ **'সুক্ষ্ম'** নামে পরিচিত ছিল। 'রাঢ়া' নামটিও প্রাচীন 'আচারাঙ্গ-সূত্র' নামক প্রাকৃতভাষায় রচিত প্রাচীন জৈন-গ্রন্থে (১/৮/৩) 'লাঢ়া' বা রাঢ়াদেশ উল্লিখিত আছে। 'গঙ্গরিডই' রাজ্য যে রাঢ়াদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন মনে হয় না। কারণ, কেবল রাঢ়াদেশের অধিপতির পক্ষে পরাক্রান্ত মগধ-রাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হইত না। বাংলার অপর দুইটি বিভাগ,—পুণ্ড্র (বরেন্দ্র) এবং বঙ্গ,—নিশ্চয়ই, 'গঙ্গরিডই-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্যান্য ঐতিহাসিকেরাও এই মতের সমর্থন করিয়া আসিতেছেন।[২]

আমরা এ সমুদয় প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে যে 'বঙ্গ' দেশের নাম পাই—সে সময়ে **বঙ্গ পূর্ববঙ্গকেই** বলিত। পূর্ববঙ্গ শব্দের অর্থ পূর্ব বা প্রাচীন বঙ্গ অথবা পূর্বদিকে অবস্থিত দেশকে বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে যে বঙ্গ হইতে সমগ্র বঙ্গদেশের নাম হইয়াছে, তাহা বঙ্গ সমতট বা পূর্ববঙ্গকেই বুঝাইতেছে।

মহাবংশ গ্রন্থে বঙ্গরাজ্য এবং ইহার রাজা সীহবাহুর উল্লেখ আছে। সীহবাহুর পুত্র বিজয়, লঙ্কায় একটি নতুন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। মিলিন্দপ্রশ্ন হইতে আমরা জানিতে পারি যে,

নাবিকেরা নৌযানে বঙ্গদেশে গমন করিত। 'অঙ্গুত্তর নিকায়' গ্রন্থে বঙ্গজাতির উল্লেখ আছে। 'দীপবংশ' গ্রন্থেও এই বঙ্গজাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গ এবং আধুনিক পূর্ববঙ্গ অভিন্ন। পূর্বে ইহা সমস্ত দেশকে বুঝাইত না, যেমন বর্তমানে বুঝায়।[৩]

প্রয়াগের অশোকস্তম্ভ-গাত্রে উৎকীর্ণ কবি হরিষেণ বিরচিত প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়কাহিনী বর্ণিত আছে। এই প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্ত (সমতট-ডবাক্-কামরূপ-নেপাল কর্তৃপুরাদি-প্রত্যন্ত নৃপতিভিঃ) প্রত্যন্ত প্রদেশের নৃপতিগণ কর্তৃক ('সর্বকর দানাজ্ঞা-করণ প্রণামাগমন-পরিতোষিত প্রচণ্ড শাসনস্য') সর্বকরদান-আজ্ঞাকরণ, প্রণাম এবং আগমনের দ্বারা পরিতুষ্ট প্রচণ্ড শাসনকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এতদিন পর্যন্ত 'ডবাক্' বলিতে ঢাকাকে বুঝাইত। কিন্তু বর্তমান সময়ে পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, ডবাক্ বলিতে কামরূপের অধিকাংশ প্রদেশকে বুঝাইত। সমতট (বঙ্গ) এবং ডবাক্ ব্যতীত বাংলার অন্যান্য অংশ পুণ্ড্র (বরেন্দ্র, উত্তরবঙ্গ এবং রাঢ়) গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বিক্রমপুর সমতটের অন্তর্ভূক্ত। বৌদ্ধযুগে পূর্ববঙ্গকেই সমতট বলা হইত। এখন কথা হইতেছে সমতট বলিতে পূর্ববঙ্গের কতটা ভূ-ভাগকে বুঝাইত। নবম শতাব্দীতে বঙ্গোপসাগরের তটব্যাপী কতকগুলি স্থান সমতট বলিয়া পরিচিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান্চায়ঙ্গের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তখন বিক্রমপুর সমতটাখ্যা প্রাপ্ত স্থানসমূহের অন্তর্ভূক্ত ছিল। সে সময়ে বঙ্গদেশ নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত ছিল ঃ

১. চম্পা—ভাগলপুর জেলা।
২. কাজঙ্গলা—সাঁওতাল পরগণার উত্তর-পূর্ব সীমা, রাজমহলের চারিদিকের অংশ লইয়া অবস্থিত ছিল।
৩. পুণ্ড্রবর্ধন—মালদহের কতকাংশ, এবং রাজশাহী ও বগুড়া জেলা।
৪. সমতট—যশোহরের কতকাংশ, ফরিদপুর, খুলনা, বাকরগঞ্জ, ঢাকা এবং ত্রিপুরা জেলা। 'সমতট' সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ চলিয়া আসিতেছে।
৫. তাম্রলিপ্ত—চব্বিশপরগণা ও মেদিনীপুর জেলার কতকাংশ।
৬. কর্ণ-সুবর্ণ—বর্ধমান জেলার উত্তরাংশ এবং মধ্যভাগ ও সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলা। ইউয়ান্চায়ঙ্গ তাহার ভ্রমণ-বিবরণে সে সময়ে ঐ সব রাজ্যে কে কে রাজত্ব করিতেন, সে বিষয়ে কোনও কথা বলেন নাই।[১] মিঃ বিভারেজ তৎপ্রণীত বাখরগঞ্জের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, সমতটাখ্যার পূর্বে বিক্রমপুরের দক্ষিণ ভাগ পর্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল; মধ্যে মধ্যে কেবল দুই-একটি দ্বীপের ন্যায় স্থান লোকচক্ষুর দৃষ্টিগোচর হইত। ইদিলপুর, চন্দ্রদ্বীপ, সাহাবাজপুর, হাতিয়া, সনদ্বীপ প্রভৃতি যে এইরূপ চড়া পড়িয়া উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

মিনহাজ-ই-সিরাজ তৎপ্রণীত 'তবকাৎ-ই-নাসিরি' নামক পুস্তকে সমতটকে কোনও স্থানে সনকট, কোথায় বা সাকাট বা সকাট এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। সমতট সম্বন্ধে বিভিন্ন যত প্রকারের মতই হউক না কেন, বিক্রমপুর যে সমতটের অন্তর্ভূত ভূ-ভাগ ছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতে পাইতেছি না।

বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব ঃ

বিক্রমপুর অতি প্রাচীন স্থান। যে সময়ে নবদ্বীপ, সোনারগাঁ, ঢাকা, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থান-সমূহের নাম জনসাধারণের নিকট পরিচিত হয় নাই, তাহারও অতিপূর্বে বিক্রমপুর শিক্ষায় সভ্যতায় ও উন্নতিতে সর্বজন পরিচিত ছিল। মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি স্থান বিক্রমপুরের বহু পরে খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বিক্রমপুর নাম কতদিনের প্রাচীন? ঃ

এখন দেখিতে হইবে বিক্রমপুর নাম কত দিনের প্রাচীন? বিক্রমপুরের নামোৎপত্তির সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত। কিংবদন্তীর সহিত ইতিহাসের কোনওরূপ সম্বন্ধ নাই! আমরা তাম্রশাসনে বিক্রমপুরের নাম যে সময় হইতে পাইতেছি সে সময় হইতেই বিক্রমপুরের নামের প্রাচীনত্ব নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে পারি। তথাপি আমরা এখানে অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য কিংবদন্তীমূলক 'বিক্রমপুর' নামোৎপত্তির কাহিনিও কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিলাম। এগুলি যে একেবারেই প্রমাণসহ নহে, তাহা বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।[৪]

বিক্রমপুরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে 'বিক্রম-ভূপবাসাত্বাৎ বিক্রমপুরমতো বিদুঃ' ইহাও অন্যতর।

বিক্রমপুরের সর্বত্র এইরূপ একটি জন-প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ভ্রাতা ভর্তৃ-হরির সহিত কোনও কারণে রাজা বিক্রমাদিত্যের মনোমালিন্য হয়, তাহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া সহোদরের উপর রাজ্যভার অর্পণান্তর দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন, এবং সাগরতীরবর্তী সমতট প্রদেশের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া কিছুদিনের জন্য তথায় অবস্থিতি করেন। তাহার নামানুসারে উহাই বিক্রমপুর আখ্যা-প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ হয়, কারণ 'বিক্রমাদিত্য' বলিতে আমরা কাহাকে বুঝিব? ভারতবর্ষের ইতিহাসে তো আর একজন বিক্রমাদিত্য ছিলেন না![৫]

'বিপ্রকুলকল্পলতিকা' পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সেনবংশীয় রাজন্যবর্গের পূর্বপুরুষ অর্থাৎ নিভুজসেন, বীরসেন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে বঙ্গপ্রদেশে আগমন করেন। তাহাদের বংশধর বিক্রমসেনই বিক্রমপুর নগর স্থাপয়িতা।[৬] 'বপ্রকুলকল্পলতিকার' এই উক্তির মধ্যে যে কোনওরূপ ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহা মনে হয় না। কেননা সেনবংশীয় নৃপতিদেব যে বংশতালিকা আমরা তাম্রশাসন ইত্যাদির অনুসরণ করিয়া পাইতেছি, তাহাতে মনে হয় যে, 'বিপ্রকুলকল্পলতিকার' এই উক্তি প্রমাণসহ নহে।

কেহ কেহ বিক্রমাঙ্ক চালুক্য বিক্রমাদিত্যকে বিক্রমপুরের নামোৎপত্তির সংশ্রবে টানিয়া আনিতেছেন। এই বিক্রমাদিত্য গৌড় ও কামরূপের রাজাদের পরাজিত করিয়া বিক্রমপুর নগরী প্রতিষ্ঠা করেন, ইহাই তাহাদের মত। বিহ্লন, চালুক্য বিক্রমাদিত্যের যে জীবনচরিত প্রণয়ন করেন, তাহার নাম বিক্রমাঙ্কচরিত। গৌড় ও কামরূপ অভিযান ব্যতীত তাহার সেনাপতি কলিঙ্গ, বঙ্গ, মরু, গুর্জর, চের ও চোলপতিকে, চালুক্যপতির অধীন করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সেনাপতি কর্তৃক 'বিক্রমপুর' নামক নগর প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই হইতেছে ইহাদের মত। বিক্রমাদিত্য বিক্রমাঙ্ক (১০৭৬-১১২৬) পর্যন্ত রাজত্ব করেন, কাজেই ইহার সহিত বিক্রমপুর নামোৎপত্তির যোগ থাকিতে পারে বলিয়াও অনেকের অনুমান। এই অনুমানের মূলে কোনও সত্যই নাই, কেন নাই তাহাও আমরা বলিতেছি।

বিক্রমণীপুর বিক্রমপুর ঃ

সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা **'বিক্রমণীপুর'** নাম দেখিতে পাই, বিক্রমণী হইতে বিক্রমপুর নামও হইতে পারে। এইগুলি আনুমানিক সিদ্ধান্ত মাত্র। আবার কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন যে, **বিক্রমপুরী-বিহার** হইতে বিক্রমপুরের নাম হইয়াছে। তেঙ্গুরের মতে বিক্রমপুরী-বিহার বঙ্গদেশে (মগধের পশ্চিমে) অবস্থিত ছিল। নামের মিল দেখিয়া মনে হয় যে, উহা পূর্ববঙ্গের (ঢাকা বিভাগ) বিক্রমপুর নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। এবং জায়গাটির নাম, বিহারটির নাম দুই-ই ধর্মপালের বিক্রমশিলার অপর নাম হইতে হইয়াছিল। এই ধর্মপালই

বাংলাদেশের একমাত্র রাজা, যাহার বিক্রমশীলদেব নাম ছিল এবং তিনি যে পূর্ববঙ্গের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।[৭]

এখন কথা হইতেছে যে, বিক্রমপুরী-বিহারের চিহ্ন কোথায়? বিক্রমপুরের নানাস্থানে প্রাপ্ত অসংখ্য বৌদ্ধ মূর্তি হইতে একথা সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, বিক্রমপুরে একসময়ে বৌদ্ধধর্ম বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। আমরা যদি এখন বিক্রমপুরের স্তূপগুলি এবং দেউলবাড়িসমূহ খুঁড়িতে পারিতাম তাহা হইলে এ বিষয়ে সন্ধান সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। ধর্মপাল বাঙালি রাজা ছিলেন, তিনি বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী নৃপতি ছিলেন; এই বাঙালি বীর-সম্রাটের রাজশক্তি সুদূর উত্তর-পশ্চিমাংশের সীমান্ত প্রদেশ গান্ধার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন—তিনি মগধ, বারেন্দ্র ও বঙ্গে তিনটি বিহার স্থাপন করেন। পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরী-বিহার প্রতিষ্ঠা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এই বিক্রমপুরী-বিহারেই কুমারচন্দ্র, যিনি আচার্যঅবধূত নামে পরিচিত, যিনি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের টীকা করিয়াছিলেন, তিনি ঐখানে বাস করেন। উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরের স্তূপ, মহেঞ্জোদোরের অপূর্ব আবিষ্কারের মত যে ঐতিহাসিক কীর্তি ও গৌরব প্রকাশ করিয়াছে, তেমনি বিক্রমপুরের স্তূপগুলির খনন-কার্য পরিসমাপ্ত হইলে বাংলার ইতিহাসের পৃষ্ঠা নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন, শ্যামলবর্মার তাম্রশাসন ও সেনরাজাদের যে সকল তাম্রশাসন আমরা পাইয়াছি তাহাতে বিক্রমপুরকে, '**শ্রীবিক্রমপুর**' নামে অভিহিত দেখিতে পাই। শ্রীবিক্রমপুরের নাম একজন বাঙালি রাজাই দিয়াছিলেন এই বিশ্বাস আমাদিগকে আনন্দ দেয় এবং তাহার প্রমাণও উপেক্ষণীয় নহে। কাজেই নবম শতাব্দী হইতেই আমরা বিক্রমপুরের নাম পাইতেছি। বিক্রমাঙ্কচালুক্য কিংবা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য প্রভৃতির নাম হইতে শ্রীবিক্রমপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্ত যে সমীচীন নহে, তাহা সন তারিখের বিচারের দিক দিয়াও বুঝিতে পারা যায়। বিক্রমাঙ্কচালুক্যের রাজত্বকালের পূর্ব হইতেই '**বিক্রমপুর**' নাম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এখন আমাদিগকে বিক্রমপুরী বিহারের অনুসন্ধান করিতে হইবে। সে অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত হওয়ার আশা ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত রহিয়াছে। কাজেই নদী-মেখলা-বন-রাজিনীলা রম্যাভূমি আমাদের জন্মভূমি **শ্রীবিক্রমপুর**, —এই গৌরবময় নামে কবে কোনও্ যুগ হইতে আখ্যাত হইতে থাকে তাহা সঠিক নির্ণয় করা সুকঠিন।

গৌড়দেশ ও বিক্রমপুর ঃ

এখানে গৌড়দেশের কথা বলিতেছি। কেননা গৌড়দেশ বলিতে সেকালে এক বিস্তৃত দেশকে বুঝাইত। বিক্রমপুর গৌড়দেশের অন্তর্ভূত ছিল কিনা এখানে প্রসঙ্গত সে বিষয়ের আলোচনা করিব। বঙ্গদেশের অধিবাসীদিগকে প্রাচীনকালে 'গৌড়' বলা হইত। আবার 'গৌড়' শব্দ জনপদ অর্থেও ব্যবহৃত হইত। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে যথা, মৎস্য, লিঙ্গ, কূর্ম, বায়ু, আদিপুরাণে ও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' ও বাৎসায়নের 'কামসূত্রে' গৌড় নামটি পাওয়া গিয়াছে। গৌড়দের আদিম নিবাস সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'গৌড়' নামের দ্বারা ভাগলপুরের পূর্বস্থিত রাজমহল পর্বতমালার অপর পারের দেশকে বুঝাইত। এই দেশটি অনেকগুলি অংশে বিভক্ত ছিল—যথা, পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গ, কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলা), সমতট (আধুনিক ঢাকা, ফরিদপুর ও কুমিল্লা জেলা), তাম্রলিপ্ত (আধুনিক তমলুক)। মৌখরিরাজ ঈশানবর্মার হরাহা লিপিতে গৌড়দিগকে 'সমুদ্রাশ্রয়' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সমুদ্র তাহাদের আশ্রয় ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তাহারা সামুদ্রিক জাতি ছিল। কালিদাসও বাঙালিদিগকে 'নৌসাধনোদ্যত' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ রণতরী ছিল তাহাদের যুদ্ধের

সাধন। তাহারা জলপথে রণপোতের সাহায্যে যুদ্ধ করিত। সেকালে বাঙালিরা জাহাজে করিয়া জলপথে অনেক দূরদেশে বাণিজ্যের নিমিত্ত যাওয়া-আসা করিত। আবার তাহারা সমুদ্রপারে উপনিবেশও স্থাপন করিয়াছিল। সিংহল, যবদ্বীপ, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি দেশে এখনও তাহাদের সে সমুদয় প্রাচীন কীর্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গৌড়দেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড়দেশের রাজ্যগুলি স্বাধীন হইয়াছিল। তাহা ফরিদপুরে প্রাপ্ত চারিটি লিপি হইতে তিনজন স্বাধীন রাজার কথা জানিতে পারা যায়। ইহাদের নাম ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব। এই তিনজন রাজার রাজ্য-সীমার বিষয় কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না—সম্ভবত তাহারা পূর্ববঙ্গ ছাড়া উত্তর ও মধ্যবঙ্গেও শাসন করিতেন। গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্যের সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু একথা নিশ্চয় করিয়া বলিবার কোনও উপায় নাই যে, সমাচারদেব ধর্মাদিত্যের পূর্বে অথবা গোপচন্দ্রের পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

এই তিনজন রাজা ছাড়া জয়নাগ নামক আর একজন গৌড়াধিপের বিষয় লিপি-প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায়। জয়নাগ মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাহার রাজধানী কর্ণসুবর্ণে ছিল। আর্য-মঞ্জুশ্রী-মূলকল্পে একজন জয়নাগ নামক রাজার উল্লেখ আছে। মনে হয় লিপির জয়নাগ ও গ্রন্থোক্ত জয়নাগ অভিন্ন।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাংলা দেশ অনেক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়াছিল। এবং এই সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে দেশটি প্রায় উজাড় হইয়া গিয়াছিল।

কাজেই আমরা দেখিতে পাইলাম যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড়দেশের যে তিনজন স্বাধীন রাজার নাম পাই তাহারা পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন এবং তাহাদের রাজ্য উত্তর ও মধ্য বঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ইহাতে এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, বিক্রমপুর সেই সময়ে গৌড়দেশের অন্তর্গত থাকিলেও স্বাধীন রাজাদের শাসনাধীন ছিল।—বিক্রমসেন নামে গৌড়ের একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। কথাসরিৎসাগর, বিদ্বন্মোদতরঙ্গিনী ও তন্ত্রবিভূতি গ্রন্থে বিক্রমসেনের নাম পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, এই বিক্রমসেন বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন বিক্রমপুর। এই বিক্রমসেন বিপ্রকুলকল্পলতিকা গ্রন্থে উল্লিখিত বিক্রমসেন কিনা বলা কঠিন। বিক্রমপুর নাম কথাসরিৎসাগরেও পাওয়া যায়। বিক্রমসেনের সহিত বিক্রমপুর নামের ইতিহাস যদি আমরা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ নাও করি, তথাপি বাংলাদেশ বা বঙ্গের অন্তর্গত বিক্রমপুর বা পূর্ববঙ্গের স্বাধীন রাজ্য যে সুবিস্তৃত গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল, এ সত্য আমরা সহজভাবেই গ্রহণ করিতে পারি। পরবর্তীকালে বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, বর্তমান ঢাকা জেলার অনেকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ তৎসময়ে বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইত।

বিক্রমপুরের চারিদিক বেড়িয়াই নদী। নদ-নদী বেষ্টিত এই উচ্চভূমিতে যে সকল রাজবংশীয়েরা রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারা যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ডাক্তার শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন,—হরিকেলামগুলের ভাবী ভূপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া সর্বপ্রথম যিনি এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন, রাজধানীর নাম তিনি বর্ধমানপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হরিকেল রাজলক্ষ্মীর আধার ছিলেন যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র, তাহার পুত্র শ্রীচন্দ্রের অদ্যাবধি চারিখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাম্রশাসনগুলির আবিষ্কারস্থান এবং ঐগুলিতে উল্লিখিত গ্রামের অবস্থান পর্যালোচনা করিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়, বর্তমান ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল জেলা লইয়া তাহার রাজ্য গঠিত ছিল। তাহারই তাম্রশাসনে রাজধানীর নাম প্রথম বিক্রমপুর বলিয়া উল্লিখিত দেখা

যায়।'—আমরা শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন হইতে রাজধানীর যে উল্লেখ পাই, সেই বিক্রমপুর নাম হইতে সমগ্র ভূ-ভাগের নাম বিক্রমপুর হইয়াছে বলিয়া আমরা নির্বিবাদে প্রামাণিক সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারি। শ্রীচন্দ্রদেবের পরে বর্ম রাজাগণ প্রায় এক শতাব্দীকাল এবং সেনবংশীয় নৃপতিরাও প্রায় এক শতাব্দীকাল বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছেন। বর্মরাজগণের এবং সেন রাজগণের তাম্রশাসনেও বিক্রমপুর রাজধানীর উল্লেখ রহিয়াছে—সখলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমর্জেয়স্কন্ধাবারাত ইত্যাদি। অতএব, বিক্রমপুর নাম যে প্রায় সহস্র বৎসরের প্রাচীন তাহা আমরা তাম্রশাসনের সাহায্যেই প্রমাণ করিতে পারিতেছি। এখন আমরা সুদৃঢ়ভাবে এই কথা বলিতে পারি যে, বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে যত প্রকারের কিংবদন্তীই প্রচলিত থাকুক না কেন, সে সকল আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাম্রশাসনের দ্বারা বিক্রমপুর নামের যে পরিচয় পাইতেছি তাহাই হইতেছে প্রকৃত প্রমাণ, এবং সে হিসাবে '**বিক্রমপুর**' নাম প্রায় সহস্র বৎসরের প্রাচীন এবং তাহা ঐতিহাসিক সত্য। বিক্রমপুর নামের উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা যে কথা বলিলাম, তাহা হইতে পাঠকগণ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন।

১. বিক্রমপুরের নামোৎপত্তি সম্পর্কে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে কোনওরূপ ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না।
২. পালবংশীয় নৃপতি ধর্মপালের নির্মিত 'বিক্রমপুরী-বিহার' হইতেও বিক্রমপুরের নামোৎপত্তি হইতে পারে। এবিষয়ে লামা তারনাথ রচিত তিব্বতের ইতিহাস বা তেঙ্গুর আমাদের প্রমাণ। তারনাথ ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, কাজেই তাহার লিখিত বিবরণীতে যদি আমরা আস্থা স্থাপন নাও করি, তথাপি শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন হইতে যে বিক্রমপুর নাম পাই, সেই বিক্রমপুর রাজধানীর নামানুযায়ী সমগ্র বিক্রমপুরের নাম হইয়াছে এবং তাহাই আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

বিক্রমপুরের সীমা ঃ

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনগুলি যে যে স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে যে সমুদয় গ্রামের নাম রহিয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়·যে, শ্রীচন্দ্রদেবের রাজ্য ফরিদপুর ও বরিশাল জেলা লইয়া বিস্তৃত ছিল। বর্মরাজগণ, সেন রাজগণ প্রভৃতির রাজত্বকালে এবং বারভূঁইয়ার শ্রেষ্ঠ বীর কেদাররায়ের রাজত্বকালে বিক্রমপুর রাজ্যের সীমা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দী হইতে বিংশতি শতাব্দী অর্থাৎ বর্তমান কাল পর্যন্ত নদ-নদীর গতি পরিবর্তনের সহিত বিক্রমপুর একান্ত বিপর্যস্ত হওয়ার জন্য দিন-দিনই ইহার সীমার পরিবর্তন হইতেছে,—হয়ত ভবিষ্যতে আরও হইবে। বিক্রমপুরের সীমা—পদ্মা, ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদীর আক্রমণে প্রতিবৎসর যেভাবে হ্রাস পাইতেছে তাহাতে অদূর-ভবিষ্যতে বিক্রমপুরের ক্ষুদ্র ভূখণ্ড একেবারে বিলুপ্ত হওয়াও অসম্ভব নহে।

বর্তমান সময়ে পদ্মার ভীষণ আক্রমণে বিক্রমপুর যেমন হতশ্রী এবং পূর্ব-গৌরব-বিভব শূন্য হইয়াছে, পূর্বে এইরূপ ছিল না। তখন প্রাকৃতিক বৈষম্যহেতু বিক্রমপুর দুইভাগে বিভক্ত হয় নাই।

থাকবস্ত জরিপ হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ যখন রণভাওয়াল হইতে সমুদ্রতীর পর্যন্ত একটা ম্যাপ বা মানচিত্র প্রস্তুত হয়, তখন কীর্তিনাশার (পদ্মা) কোনও উল্লেখ উহাতে ছিল না। পূর্বে অল্পপরিসরা কালীগঙ্গা নদী বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইয়া শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে এবং খাদ্য-দ্রব্যাদির প্রাচুর্য-বিধানে যথেষ্ট সাহায্য করিত। উহার তীরবর্তী পল্লীসমূহের শ্যামল সৌন্দর্য ও শস্যশ্যামলক্ষেত্রনিচয়ের মনোমোহন দৃশ্য বিক্রমপুরকে বিদেশি পর্যটকের নিকট স্বর্ণ-কীরিট-মণ্ডিতা কমলার আবাসভূমি বলিয়াই প্রতিপন্ন করিত। সে শোভা-সম্পদ,

সর্বধ্বংসকারিণী পদ্মার তরঙ্গ-প্রহারে কবি-কল্পনায় পর্যবসিত হইয়াছে। তখন পশ্চিমে পদ্মা, পূর্ব-উত্তরে ধলেশ্বরী, দক্ষিণ দিকে আরিয়ল নদী ও কৃষ্ণসলিল মেঘনাদ নদের সম্মিলিত সাগরাংশ—এই চতুঃসীমাবর্তী স্থানই বিক্রমপুর নামে সর্বজনপরিচিত ছিল।

জপ্‌সা নিবাসী কবি লালা রামগতি রায় তাহার রচিত 'মায়াতিমিরচন্দ্রিকা', নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন। ঃ

ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থ পূর্বেতে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার।।
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহে সদ্‌জ্ঞানী বিস্তর।।

তাহার গ্রন্থেও কীর্তিনাশা নদীর কোনও উল্লেখ নাই। অতএব ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সে সময়েও 'কীর্তিনাশা' নামক কোনও নদীর অস্তিত্ব ছিল না।—কিংবদন্তী এইরূপ যে, চাঁদরায-কেদার রায়েরকীর্তি ধ্বংস করিয়াই যে পদ্মা এই অপনাম লাভ করিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

পূর্বে পদ্মা একটি শীর্ণকলেবরা স্রোতধারা ছিল এবং তখন উহা উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরেব মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মেহদিগঞ্জের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইত। বর্তমান সময়ে উহা দুইটি স্বতন্ত্র শাখায় প্রবাহিত হইযা মেঘনার সহিত মিলিত হইতেছে। ইহাব একটি শাখাব নাম **কীর্তিনাশা** এবং অপবটির নাম **নয়াভাঙ্গনি**।

১৭৮১ সনে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিব অধিকারসময়ে, বোর্ড অব ডাইরেক্টরগণের অনুমত্যানুসারে তৎকালীন বঙ্গদেশের সার্ভেয়ার জেনারেল জেমস রেনেল, এফ, আর, এস, সাহেব ঢাকার ও তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহের যে মানচিত্র অঙ্কিত করেন, তাহাতে কালীগঙ্গার উল্লেখ আছে। সে সময়ে কালীগঙ্গা ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিক্রমপুরের মধ্যভাগ দিয়া প্রবাহিত হইয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তখন ইদ্রাকপুর, (মুন্সিগঞ্জ), ফিরিঙ্গিবাজার, আবদুল্লাপুর, মীবগঞ্জ, মাঝহাটি, সেরাজদি, সেকেরনগর, হাসারা, যোলঘর, বারইখালি, নুরপুর, ঠাওদিয়া, বালিগাঁ, নুনকিশর, রাজাবাড়ি, চণ্ডীপুর প্রভৃতি স্থানগুলি কালীগঙ্গার উত্তর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান **আরিয়ল বিল**, তৎসময়ে **চুরাইন বিল** নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

কালীগঙ্গা নদীর দক্ষিণতটবর্তী স্থানে মুলফৎগঞ্জ, করাতিকল, জপসা, কান্দাপাড়া, শ্যামসুন্দর ও খিল গাঁ, সারেঙ্গা, চিকন্দি, গঙ্গানগর, রাধানগর, ঘাগরিয়া, সমকোট, রাজনগর লড়িকুল ইত্যাদি গ্রাম বিরাজ করিত।

মেঘনাতটে—কালীগঙ্গার দক্ষিণ-বুহার, স্নানঘাটা, কার্তিকপুর, ডলুই, বামগাঁও, ভয়ারা, সাদকপুর, শ্রীরামপুর, পাতলাডাঙ্গা, সিরান্দী, দুদুলিয়া, সননদীয়া (মিলন্দীয়া), নাদারদিয়া, ঢেউখালি, ছোটবাকরগঞ্জ, গাঞ্জরা ইত্যাদি।

পদ্মা-তটে কালীগঙ্গার দক্ষিণে—দীঘারিপাড়া, রাজাখালি, ভাঙাবাড়ি, কলার গাঁ, বালীসার, **বুদারশাশ, (বদরাসন) মাছুয়াখালি, গজারিয়া, সোনাপাড়া, সনয়পুর, সলুয়ার হাট, বগাও, কুশারিয়া, ইসলাচর, মেন্দিগঞ্জ, আবদুল্লাপুর, সুলতানি, কন্দর্পপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পল্লী বর্তমান ছিল। কন্দর্পপুরের নিকটই মেঘনা ও পদ্মা মিলিত হইয়াছিল। কালের আশ্চর্য পরিবর্তনে প্রায় দেড়শত বৎসরের মধ্যে বিক্রমপুরের এমন আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। স্থলভাগ জলে এবং জলভাগ স্থলে পরিবর্তিত এবং এক নদীর স্থানে অন্য নদীর আবির্ভাব হইয়া একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রদেশ স্থাপিত হইয়াছে। এই সমুদয় বিষয় মানচিত্রের সাহায্য ব্যতীত অবগত হইতে পারা অসম্ভব। কালীগঙ্গার বর্তমান**

নাম পড়া বা পোড়া গঙ্গা। অদ্যাপিও বিক্রমপুরে উহার সঙ্কীর্ণখাত দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যপাড়া, জৈনসার প্রভৃতি গ্রামের নিকট দিয়া এখনও উহা ক্ষুদ্রদেহে প্রবাহিত হইতেছে। বর্ষার সময় ভিন্ন ইহাতে নৌকা চলাচলের উপযুক্ত পরিমাণ জলও থাকে না। উত্তর বিক্রমপুরে যেমন উহার নাম পর্যন্ত পরিবর্তিত হইয়া পোড়াগঙ্গায় পরিণত হইয়াছে, দক্ষিণ বিক্রমপুর তদ্রূপ হয় নাই, এখনও সেখানে কালীগঙ্গার ক্ষুদ্র খণ্ডকে কালীগঙ্গাই বলিয়া থাকে।

কীর্তিনাশা নামের উৎপত্তির ইতিহাস ঃ

অনেকের বিশ্বাস যে, পদ্মার প্রবল তরঙ্গে মহারাজা রাজবল্লভের কীর্তি ধ্বংস হওয়ার পর হইতেই পদ্মার নাম কীর্তিনাশা হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভুল, চাঁদ-কেদার রায়ের কীর্তিনাশ হেতুই ইহার নাম প্রথমে কীর্তিনাশা হয়, পরে রাজবল্লভের কীর্তি ধ্বংস কবায় উহা আরও দৃঢ়ীভূত হয়।[৮]

বিক্রমপুরের বর্তমান সীমা ঃ

নদী-প্রবাহের দিন দিন গতি পরিবর্তন হেতু বিক্রমপুরের সীমারও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তারপর চন্দ্র, বর্ম, সেন প্রভৃতি হিন্দু ও বৌদ্ধ নৃপতিগণের শাসনকালে, পাঠান ও মোগল প্রভাবকালে চাঁদরায়, কেদাররায় প্রভৃতি বারভুঞার প্রাধান্য সময়েও বিক্রমপুরের সীমা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে, তারপর ইংরাজ-রাজত্বকালে বিক্রমপুরের সীমা পদ্মানদীর গতি পরিবর্তনে ও ভীষণ আক্রমণে দিন-দিনই পরিবর্তিত হইতেছে। বিভিন্ন রাজবংশের প্রভুত্বকালে বিক্রমপুরের সীমা কিরূপ ছিল তাহা যথাস্থানে বলিব। বর্তমান সময়ে আমরা বিক্রমপুরের সীমা এইরূপ নির্দেশ করিতে পারি—উত্তরে ধলেশ্বরী নদী, পূর্ব-সীমা মেঘনাদ বা মেঘনা, পশ্চিম-সীমা পদ্মা ও চন্দ্রপ্রতাপ কতকটা এবং আরিয়ল বিলের অপর পারের দোহার, গাঞ্জিমপুর (উহা চন্দ্রপ্রতাপ ও বিক্রমপুরের সীমান্ত স্থানে অবস্থিত) প্রভৃতি স্থান ; দক্ষিণ-সীমা ইদিলপুর। রেনেলের মানচিত্র দেখিলে (১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে সার্ভেয়ার জেনারেল জেমস্ রেনেল এফ. আর, এস, অঙ্কিত) বুঝিতে পারা যায় বর্তমান সময়ে বিক্রমপুরের কত পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বে উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর একই সংলগ্ন ভূমিখণ্ড ছিল—কিন্তু পদ্মা নদী (কীর্তিনাশা) বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে পশ্চিমে আনুমানিক প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দীর্ঘ ও উত্তর-দক্ষিণ প্রায় আট-দশ মাইল প্রশস্ত যে ভূমিখণ্ড ছিল, তাহা রাক্ষসী পদ্মা নিজ কুক্ষিগত করিয়া বিক্রমপুরের ক্ষীণ কলেবরকে ক্ষীণতর করিয়া ফেলিতেছে। এই প্রায় দুইশত বৎসরের মধ্যে কত পল্লী, কত দেবমন্দির, কত মঠ—মসজিদ প্রভৃতি প্রাচীন কীর্তি যে পদ্মার বুকে অদৃশ্য হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

উত্তর বিক্রমপুর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর ঃ

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে পদ্মার গতি পরিবর্তনের জন্য বিক্রমপুরের দক্ষিণ ভাগ ঢাকা জেলা হইতে পৃথক হইয়া যায়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ১৭ জুনের গভর্নমেন্টের বিজ্ঞাপন অনুসারে ঐ সনের ১লা আগস্ট হইতে রাজনগর, জপসা, কোয়রপুর, নড়িয়া, লোনসিংহ, কার্তিকপুর, ফতেজঙ্গপুর, নগর বিঝারী, পণ্ডিতসার, কেদারপুর, মুলফৎগঞ্জ পালং পোড়াগাছা, কুড়াড়ি, পাড়গাও প্রভৃতি ৪৫৮ খানা গ্রাম সহ দক্ষিণ বিক্রমপুর বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই গ্রামগুলি মুলফৎগঞ্জ থানার অধীন ছিল। ১৮৬৬ সালের পূর্বেই মুলফৎগঞ্জ থানার শাসন সংক্রান্ত কার্য বাকরগঞ্জ জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে ন্যস্ত করা হইলেও কার্যত তাহা হয় নাই। অধিবাসীবৃন্দের তুমুল আন্দোলনের ফলে মুলফৎগঞ্জ সহ মাদারিপুর মহকুমা ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।[৯]

উত্তর বিক্রমপুরের পশ্চিম দিক দিয়া পদ্মার যে শাখা উত্তরবাহিনী হইয়া প্রবাহিত উহা দিঘলী (পূর্ব লৌহজঙ্গের নিকটে) বন্দরের পশ্চিম সীমা দিয়া ঘোড়দৌড় (গ্রাম) কনকসার, কোরহাটি, খরিয়া, হলদিয়া, গয়ালীমান্দ্রা, দক্ষিণ পাইকসা, ফৈনপুর, শ্রীনগর, ষোলঘর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া বাহিয়া যাইয়া পুটিমারার নিকট হইতে একটি শাখা-পথে আলমপুর, শেখরনগর এবং রাজনগর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। অপর একটি শাখা হাসাড়া, মোহনগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামের ভিতর দিয়া ধলেশ্বরী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সলিলপ্রবাহ উত্তর বিক্রমপুরকে প্রধানত পূর্ব ও পশ্চিম বিক্রমপুর এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। পদ্মার গতি পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রসিদ্ধ খালটির স্রোতবেগ মন্দীভূত হইয়া স্থানে স্থানে ভরিয়া যাইতেছে।

শেখরনগরের প্রবাহটিই অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও গভীর। জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক মাসে হাসাড়ার খালে যখন জল কম থাকে, তখন শেখরনগরের খাল দিয়াই গহেনার নৌকা ও লঞ্চ ইত্যাদি যাতায়াত করে। এই জলপথের দুই ধারে অনেক প্রসিদ্ধ গ্রাম অবস্থিত।

নদ ও নদী ঃ

বিক্রমপুরের সীমান্তবর্তী নদ-নদীগুলির বিষয়ে আলোচনা করিয়া পরে খাল ও বিল ইত্যাদির কথা বলিব। বিক্রমপুরের উত্তর সীমা ধলেশ্বরী নদী যমুনার একটি শাখা-নদী। ধলেশ্বরী ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সলিমাবাদ নামক স্থানের নিকট হইতে যমুনা হইতে বর্হিগত হইয়াছে। এই নদীর গতিপথ এইরূপ : প্রথমত—দক্ষিণবাহিনী হইয়া পরে আবার পূর্ববাহিনী হইয়া উত্তর দিকে যাইয়া পুনরায় দক্ষিণ ও পূর্বদিকে মাণিকগঞ্জ পর্যন্ত আসিয়া ক্রমে সাভার পর্যন্ত পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে এবং সাভার হইতে ফুলবেড়িয়ার কতকটা দক্ষিণে আসিয়া বুড়িগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে ক্রমে রোহিতপুর, কুচিয়ামোড়া, পাথরঘাটা এবং রামকৃষ্ণদির পথে পাইনার দক্ষিণ দিকে সিংদহ নামক একটি শাখা-নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গম স্থান হইতে পশ্চিমদী, সরাইল, কোণ্ডা প্রভৃতি স্থান দিয়া পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া শীতললক্ষ্যা, ধলেশ্বরী এবং মেঘনা একত্র মিলিত হইয়াছে। এই তিনটি নদীর সঙ্গমস্থান অত্যন্ত বিশাল। এই সঙ্গমস্থান **কলাগাছিয়া** নামে পরিচিত। মুন্সিগঞ্জ, কমলাঘাট, ফিরিঙ্গিবাজার, রিকাবিবাজার, মিরকাদিম, আবদুল্লাপুর, তালতলা, ফুরসাইল, বয়রাগাদি প্রভৃতি স্থান ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। বিক্রমপুরের উত্তর সীমা ধলেশ্বরী বা ধবলেশ্বরী নদী এইভাবে বিক্রমপুরের উত্তর দিক দিয়া প্রবাহমানা।

মেঘনাদ বা মেঘনা নদ—বিক্রমপুরের পূর্বসীমা দিয়া প্রবাহিত। মেঘনাদ নদ ময়মনসিংহ জেলার পূর্বসীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঢাকা জেলার পূর্ব ও উত্তর সীমানায় ব্রহ্মপুর নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। সেখান হইতে মেঘনাদের সলিলরাশি দক্ষিণ দিকে বহিয়া চলিয়াছে। এই নদ ত্রিপুরা ও ঢাকা জেলার সীমা বিভাগ করিয়াছে। মেঘনাদ নদ ঢাকা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আসিয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে।

মেঘনাদ নদীর পূর্বতীর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমতীরে বিক্রমপুর অবস্থিত। মেঘনার পশ্চিমাংশে বিস্তৃত চরাভূমি, সেই চরাভূমির পশ্চিমে একটি নদী ও জলপ্রণালী প্রবাহমানা। এই জলপ্রণালীটি রেভিনিউ সার্ভে-ম্যাপ এবং বর্তমান সেটলমেন্টের মানচিত্রে ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত (Old bed of Brahmaputra) নামে উল্লিখিত। এই নদীটি মুন্সিগঞ্জ মহকুমার পূর্বদিকে ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে এবং ক্রমশ আঁকিয়া-বাঁকিয়া কাটাখালির মুখ হইতে দক্ষিণ দিকে, পূর্বে রাজাবাড়ির নিকট, বর্তমান সময়ে পুরান দিঘিরপাড়ের কাছে আপনার প্রবাহধারা পদ্মার সহিত মিলিত করিয়াছে। এই নদীর পূর্ব ও পশ্চিম তীরে অনেকগুলি

প্রসিদ্ধ গ্রাম অবস্থিত। মুন্সিগঞ্জের দিক হইতে কেওয়ার, মহাকালী, মাকুহাটি (মাকুহাটির খাল এখানে ব্রহ্মপুত্রের এই প্রাচীন খাতের সহিত মিলিত হইয়াছে), ঘামিরপুকুরপাড়, সেরাজাবাদ, পুরুয়া, কামারখাড়া (স্বর্ণগ্রাম) মূলচর, দিঘিরপাড়, বাহেরক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রামগুলি এই নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই নদীকে বর্তমান সময়ে কেহই ব্রহ্মপুত্র বলে না। সাধারণত দিঘিরপাড়ের গাঙ্গ, মূলচরের গাঙ্গ, সেরাজাবাদের গাঙ্গ (নদী) বলিয়া থাকে।

এই নদী যে ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত ছিল, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে—রেভিনিউ সার্ভেম্যাপে, ইহা ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত বলিয়াই লিখিত রহিয়াছে, বর্তমান সেটলমেন্টের মানচিত্রেও ঐরূপ লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত—এই নদীতীরে একটি তীর্থস্থান আছে, এই ঘাটটি **যোগিনীঘাট** নামে পরিচিত। লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমীঘাটে যে তারিখে স্নান হয়, এখানেও ঠিক সেই তারিখে লোকে তীর্থস্থান করিয়া থাকে।

কখন কোনও্ সময়ে কিভাবে ব্রহ্মপুত্রের গতি পরিবর্তনের জন্য এই প্রবাহের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন,—"ব্রহ্মপুত্রের এই দিকস্থ প্রবাহ কোনও্ সময়ে কলাগাছিয়ার উত্তরাংশের নদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা সুনিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা সহজ-সাধ্য নহে। এগারসিন্ধুর দক্ষিণ পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় নদী পূর্ববাহিনী হইয়া আরিয়ল খাঁ বা আড়িয়ল খাঁ নদীর মধ্য দিয়া আসিয়া প্রথমত—নরসিংদীর নিকটে, পরে ভৈরববাজারের নিম্নে, মেঘনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। কিয়ৎকাল পর্যন্ত ধলেশ্বরীই ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ থাকায়, উহার প্রাচীন শুষ্ক খাত কর্তনের সুবিধা হইয়াছিল।"

পদ্মা বা কীর্তিনাশা—বর্তমান সময়ে বিক্রমপুরের যে অংশ ভেদ করিয়া পদ্মা মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছে, অনেকেব মতে পদ্মার গতি বিক্রমপুরের পশ্চিম দিক পরিত্যাগ করিয়া মার-পদ্মা নামে এক প্রবলাংশ যাহা প্রায় শত বৎসর মধ্যে উদ্ভব হইয়া প্রাচীন কালীগঙ্গা নদীর বিলোপ-সাধন করিয়াছে, উহা **কীর্তিনাশা** নামে পরিচিত।

মেজর রেনেলের অঙ্কিত ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের মানচিত্র হইতে দেখা যায়, পূর্বে পদ্মা-নদী বিক্রমপুরের অনেকটা পশ্চিম দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভুবনেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়াছিল। সে সময়ে '**কীর্তিনাশা**' বা '**নয়া ভাঙ্গনী**' নামে কোনও নদী ছিল না। বিক্রমপুরের রাজনগর ও ভদ্রেশ্বর গ্রামের মধ্যে একটি অপ্রশস্ত জলপ্রণালী মাত্র বিদ্যমান ছিল।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে পদ্মানদীর প্রধান স্রোত রেনেলের কালীগঙ্গার খাতে প্রবাহিত হইত। রেনেল কালীগঙ্গার নামোল্লেখে ভুল করিয়াছেন। গঙ্গানগর হইতে লড়িকুল এবং মুলফৎগঞ্জের মধ্য দিয়া চণ্ডীপুর পর্যন্ত প্রবাহিত নদীর নাম **কালীগঙ্গা**। তিনি উহার উত্তরের নদীটিকে কালীগঙ্গা বলিয়াছেন। যাহা হউক, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে পদ্মার প্রধান স্রোত রেনেলের কালীগঙ্গার খাতে প্রবাহিত হইত। এই পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে ঘটিয়াছিল। এমনকি ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পদ্মা নামে এবং নতুন নদীটি কীর্তিনাশা নামে অভিহিত হইত। এই নতুন নদীটি বাস্তবিক পক্ষে রেনেলের তথাকথিত কালীগঙ্গার বিস্তৃতি মাত্র। এই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে দুইটি নদীর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ব্রহ্মপুত্র, কীর্তিনাশার সাহায্যে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া মেঘনাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিল। ফলে সম্পূর্ণ অভিনব স্থান দিয়াই নদী প্রবাহিত হইল। রেনেলের উল্লিখিত কালীগঙ্গার প্রকৃত নামে ছিল নয়া-নদী রথখোলা। এই পরিবর্তন ক্রমে ক্রমে ঘটিয়াছিল। কোনও নদী অকস্মাৎ জলে ভরিয়া যাওয়া সম্বন্ধে সাধারণত যেরূপ জনশ্রুতি থাকে এ বিষয়ে তদ্রূপ কোনও জনশ্রুতি নাই, এমনকি ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহু পরিমাণে জল দক্ষিণ বিক্রমপুরের পশ্চিম দিকস্থ গঙ্গানগরের নিকটবর্তী পুরাতন খাতেই প্রবাহিত হইত। রেনেলের উল্লিখিত কালীগঙ্গার প্রকৃত নাম **নয়ানদী রথখোলা** ছিল। উহার

অন্তত দুইশত বৎসর পূর্বেও কোনও নদী এই যোজকের সহিত মিলিত হয় নাই। কীর্তিনাশার স্রোত খুব প্রবল ছিল, এইজন্যই সেকালে লোকে ইহার নাম দিয়াছিল '**কীর্তিনাশা সর্বনাশা**'। (কেন না কীর্তিনাশা (পদ্মা) বক্ষস্থলকে বিদীর্ণ করিয়া বিক্রমপুরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, কত কীর্তিকলাপ উদরসাৎ করিয়াছে। কি বলিব!)[১০]

গঙ্গা ও মেঘনা নদীর তলের (লেভেল) পার্থক্য বোধ হয় ইহার কারণ। ইহাতে মেঘনা নদীর আপাতত কিছু অসুবিধা হইয়াছিল। রাজবাড়ির দক্ষিণ-পূর্বে রেনেল কর্তৃক পোম্মানারা নামক প্রকাণ্ড চর বিধৌত হইয়া যাওয়ায় মেঘনা নদীর দ্বারা উত্তরদিকস্থ দ্বীপগুলি ভরাট হইতে লাগিল। এইরূপে প্রকাণ্ড একটি যোজক উৎপন্ন হইল। এদিকে কীর্তিনাশা নদী মেঘনার পশ্চিম তীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু নতুন নদীর গতি স্থির ছিল না। স্রোতের প্রবলতাবশত ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে রেনেলের মুলফৎগঞ্জ বিধৌত করিয়া নদী এক মাইল দক্ষিণে প্রবাহিত হইতে থাকে। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ হইতে মেঘনা প্রবল রূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করে ; এবং নতুন নদী উত্তরে সরিয়াছে দেখিয়া বোধ হয় যে, গঙ্গার স্রোত উত্তর-পূর্বদিকে প্রবল ছিল। এই নতুন নদী হইতে মেঘনার পশ্চিম পার পর্যন্ত দক্ষিণ দিকে প্রকাণ্ড চর পড়িয়া দ্বীপের চরের সহিত সংযুক্ত হয়। এত বেশি চর পড়িয়াছিল যে, কীর্তিনাশার মুখ বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, ইহা অন্য দিক দিয়া প্রবাহিত হইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল। নুরপুর হইতে পাঁচচরের ধরে দিয়া প্রায় ভদ্রাসন পর্যন্ত কীর্তিনাশা পুনরায় উহার পুরাতন খাত দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। এখানেও ইহার উত্তর-দক্ষিণ-প্রবণতা পুনরায় প্রকাশ পায় এবং গতি-চাঞ্চল্য বশত ইহাও খাগুটিয়া গ্রাম বিধ্বস্ত করে। ইহাতে রাজনগর হইতে মুলফৎগঞ্জ পর্যন্ত আর একটি নদীর সৃষ্টি হয়। এই সময় (১৮৫৮-৬০ খ্রিস্টাব্দে) মেঘনা নদীর সহিত নতুন নদীর সঙ্গমস্থলে পশ্চিম তীরে নতুন নদীতে যে চর উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে। পদ্মা নতুন পথে বাহির হইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। নতুন নদী খুব ভরাট হইতে আরম্ভ করিল এবং কীর্তিনাশার মূল স্রোত ইহার পূর্ব গৌরব পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মেঘনার স্রোত-প্রাবল্যে কীর্তিনাশা নতুন পথে প্রবাহিত হইতে পারে নাই। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কীর্তিনাশা রাজনগরের পূর্বদিকস্থ নতুন পথে পুনরায় প্রবাহিত হয়। বেগ এত অধিক হইয়াছিল যে, কীর্তিনাশা আর একবার পূর্ব মূর্তি ধারণ করিয়া মেঘনার পশ্চিম তীরস্থ নতুন চর বিধৌত করিয়া ফেলে। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে রাজনগরের সমস্ত কীর্তি নদীগর্ভে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু নদীর দক্ষিণদিক্‌গামী ভাঙ্গন বড় সুবিধাজনক হইয়াছিল না। ১৮৮৬—৮৭ খ্রিস্টাব্দে **লুরিকুল** এবং **জপ্‌সা** দেবমন্দিরাদিসহ নদীগর্ভে সম্পূর্ণ ভাবে বিলীন হইয়া যায়। উহারই কিঞ্চিৎ পূর্বে তারপাশা, বাঘিয়া, কাঁচাদিয়া, কালীপাড়া, লৌহজঙ্গ, পোড়াগাছা, বিলাসপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানগুলি কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হয়। বর্তমান তারপাশা নামীয় স্থান হইতে নদীর উত্তর-তীর-ব্যাপী-চর পদ্মার ও মেঘনার সঙ্গম পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায়, দক্ষিণ পারের রাজনগর (চর) পুনরায় নদীগর্ভস্থ হওয়ায় সম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।[১১]

আর একটি নদী যেন কৃষ্ণনগর, গঙ্গানগর, ডোমসার, পালঙ্গ, আঙ্গারিয়া প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া কীর্তিনাশা ও আড়িয়ল খাঁর সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। রাজনগর পদ্মার কুক্ষিগত হইবার অব্যবহিত পূর্বে কীর্তিনাশার বুকে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটিত। ১২৭৩ চৈত্র। ইংরেজি ১৮৬৭। মার্চ মাসের 'পল্লীবিজ্ঞানের' স্থানীয় সংবাদাবলীতে দেখিতে পাই—'বহর হইতে কয়েক ব্যক্তি রাজনগর যাইতেছিল, কীর্তিনাশা নদীতে নৌকা ডুবিয়া ৫ জন প্রাণ হারাইয়াছে। নদীর প্রকৃত বেগের সময় আসিতে না আসিতেই কীর্তিনাশার এত পরাক্রম। পদ্মা কীর্তিনাশায় সচরাচরই এরূপ ঘটনা হইয়া থাকে।'

সেদিন হইতে পদ্মা নদীর ভীষণ আক্রমণের হাত হইতে আজ পর্যন্তও বিক্রমপুরবাসী

নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। এই নদী প্রথমে 'রথখোলা', পরে 'ব্রহ্মবধিয়া' পরে কাথারিয়া এবং সর্বশেষ কীর্তিনাশা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এই কীর্তিনাশার প্রভাবেই এখন **উত্তর বিক্রমপুর** ও **দক্ষিণ বিক্রমপুর** দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে 'রথখোলার' কথা বলিতেছি। এ বিষয়ে নানারূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত। কেহ বলেন, বিক্রমপুরের জমিদার নয়পাড়ার চৌধুরীগণের রথের ভারে রাস্তার উপর চাকার দাগ পড়িয়া গঙ্গা হইতে মেঘনা পর্যন্ত জল প্রবাহিত হওয়ায় ঐ দাগ খালরূপে পরিণত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, চাঁদরায়-কেদার রায়ের রথচক্রের দাগেই যে খালের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই রথখোলার খাল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

পদ্মার প্রবাহ পরিবর্তনের কারণ ঃ

এখানে পদ্মার প্রবাহ পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে বলিব। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের প্রবল বন্যার জন্য ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহের পরিবর্তন হয়। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে মেজর রেনেল ঢাকার উত্তরাংশেই ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদ নদের সম্মেলন দর্শন করিয়াছিলেন। আইন-ই আকবরি গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীতে উহাই ব্রহ্মপুত্রের মূল স্রোত ছিল। রেনেলের জরিপের প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকালমধ্যে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান স্রোত ঢাকার পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া জাফরগঞ্জের নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই সম্মিলিত প্রবাহ রেনেলের উল্লিখিত নালা ও ফরিদপুরের অন্তর্গত পাচ্চারের মধ্যস্থিত পদ্মার প্রাচীন খাত পরিত্যাগ করিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ **রাজাবাড়ি মঠের** কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল রাজাবাড়ির মঠ পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। রেনেলের জরিপসময়ে এই সম্মেলন-স্থান পদ্মা-মেঘনাদের সম্মেলন স্থান হইতে সোজাসুজি উত্তরে অবস্থিত ছিল। পূর্বোক্ত নালা হইতে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত মেন্দিগঞ্জ নামক স্থান পর্যন্ত নদীর প্রবাহ প্রায় ১২০ মাইল দীর্ঘ হইবে। উহা দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে ঠিক দক্ষিণ দিকে পরিবর্তিত হইয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত চণ্ডীপুরের দিকে গিয়াছিল (দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ মাইল) ; রেনেলের ম্যাপের (২৩° নিরক্ষ) শ্রীরামপুর যোজকের মধ্য দিয়া নয়াভাঙ্গনি নামে একটি নতুন নদীর উদ্ভব হইয়া মেঘনাদকে পদ্মার প্রাচীন প্রবাহের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে উহা মেঘনাদ হইতে উৎপন্ন হইয়া পদ্মার প্রাচীন প্রবাহ-মধ্যে আসিয়া পতিত হইয়াছে।

১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের বন্যার ফলেই যে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের প্রাচীন প্রবাহের পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। প্রকৃতপক্ষে এই জলপ্লাবন হেতুই যে ঢাকার উত্তর হইতে বর্তমান ফরিদুর জেলার দক্ষিণ পর্যন্ত ভূ-ভাগের প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ভীষণ জলপ্লাবনের ফলেই নয়াভাঙ্গনি নদীর সৃষ্টি হইয়াছে, এতৎ-সাপক্ষে প্রমাণাবলি অত্যন্ত প্রবল থাকায়, তিস্তানদীই যে ভয়ানক পরিবর্তনের মূলীভূত কারণ, এইরূপ অনুমান প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে।

রাজনগর পরগণা সাধারণত পদ্মা ও কালীগঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। এই কালীগঙ্গা নদী খুলিয়া যাওয়ায় —১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পদ্মানদী মেঘনাদ নদে প্রবেশলাভ করিবার অভিনব পথ-প্রাপ্ত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, এই অভিনব পথটিই স্বনামধন্য **কীর্তিনাশা**। যে সময়ে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের অধিকাংশ সলিলরাশি যমুনার মধ্য দিয়া জাফরগঞ্জের নিকট পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইতেছিল, তৎসময় হইতে এইরূপ পরিবর্তন সম্পূর্ণতা লাভ করিতে ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

পদ্মার প্রাচীন প্রবাহ ঃ

পূর্বে পদ্মানদী ফরিদপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাকরগঞ্জ জেলার মেন্দিগঞ্জ

থানার অন্তর্গত কন্দর্পপুরের সন্নিকটে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইত। এই প্রাচীন প্রবাহ এখন **ময়নাকাঁটা ও আড়িয়ল খাঁ** নামে পরিচিত। পদ্মার গতিপরিবর্ত্তন অতি বিচিত্র। উহার মধ্যে এমন সমুদয় চরের উদ্ভব হয় যে, কোনও স্টিমার সপ্তাহকাল পূর্বে যে স্থান অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। পূর্বে যে স্থান ক্ষীণ-তোয়া ছিল, উহাই আবার গভীর হইয়া পড়িয়াছে দেখা যায়। পদ্মা বা পদ্মাবতীর নাম ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দৃষ্ট হয়। উহাতে পদ্মাবতী গঙ্গার শাখানদী বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে! ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও দেবী ভাগবতে ইহাকে স্বতন্ত্র নদী বলা হইয়াছে।[১২]

বিক্রমপুরের সীমার কথা বলিয়াছি, এইবার খালের কথা বলিব। **তালতলার খাল** বিক্রমপুরের বিশেষ প্রসিদ্ধ।

খাল বিল ইত্যাদি ও তালতলার খাল ঃ

এই খাল বহরের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া বালিগাঁও, সিলিমপুর, কোরাল, বাকাইচাল ফেগুনাসার, মালখানগর ও তালতলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ধলেশ্বরীতে যাইয়া মিশিয়াছে। এই বিখ্যাত খালটি বা পয়ঃপ্রণালীটির জন্যই ধলেশ্বরী হইতে পদ্মার যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। এই খালটি বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় খাল। ইহা বিক্রমপুরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। হলদিয়ার ও তালতলার এই প্রসিদ্ধ খাল দুইটি প্রধানত উত্তর বিক্রমপুরকে পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব বিক্রমপুর এই তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছে। পশ্চিম বিক্রমপুর হইতে পূর্ব ও মধ্য বিক্রমপুরের আয়তন অনেকটা বেশি হইবে। তালতলার খালের জন্য ধলেশ্বরী হইতে পদ্মার চলাচলের পথ সুগম হইয়াছে। কীর্তিনাশা ও মেঘনাদ নদ ঘুরিয়া যাওয়া অপেক্ষা এই পথ প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মাইল সোজা। বরিশাল প্রভৃতি ভাটি অঞ্চলের মহাজনগণের নৌকা এই পথে সহজেই ঢাকা যাইতে পারে। কে এই খালটিকে খনন করাইয়াছিলেন, সে কথা বলা কঠিন। জন-প্রবাদ এইরূপ যে, সুপ্রসিদ্ধ মহারাজা রাজবল্লভের পুত্র রাজা রামদাস দেওয়ান কর্তৃক এই খাল প্রথমত খনন করা হইয়াছিল। তাহার সময় ঐ খাল দিয়া স্বীয় আবাস-ভূমি রাজনগর হইতে ঢাকা আসিতে এবং ঢাকা হইতে রাজনগর যাইতে পারিতেন। যে সকল লোক নৌকাযোগে কীর্তিনাশা নদী দিয়া ঢাকা প্রভৃতি স্থানে আসে, তাহাদিগকে বাহির নদী দিয়া প্রায় দুই-তিন দিনের পথ ঘুরিয়া আসিতে হয়। কাজেই এই খালটি বিক্রমপুরের একটি প্রসিদ্ধ খাল। আমাদের মনে হয়, রামদাস দেওয়ান কিংবা মহারাজা রাজবল্লভ এই খালের সংস্কার করিয়াছিলেন মাত্র। কারণ, এই খালের উপরকার ইষ্টক-নির্মিত পুলটি অনেকদিনের পুরানো এবং বল্লালি আমলের বলিয়া পরিচিত। পুলটি ভগ্ন। এই জন্যই মনে হয় যে, তালতলার খালটির সংস্কার মহারাজ রাজবল্লভ কিংবা দেওয়ান রামদাস করিয়া থাকিবেন।[১৩]

মীরকাদিমের খাল ঃ

এইবার মীরকাদিমের খালের সম্বন্ধে বলিতেছি। বিক্রমপুরের বিশেষত উত্তর বিক্রমপুরবাসী সকলেই এই খালটির নাম জানেন। মীরকাদিমের খাল বর্তমান রেকাবি-বাজারের নিকটে ধলেশ্বরী নদী হইতে উৎপন্ন হইয়া মোকামখোলা নামক স্থানে মাকুহাটির খালের সহিত মিশিয়াছে। প্রাচীনকালে ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণে ইছামতী নদী প্রবাহিত ছিল, এবং ইছামতী নদী হইতেই খাল বাহির হইয়াছিল। এখন ইছামতী ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। তালতলার খালের সম্বন্ধে রাজবল্লভ ও রামদাস দেওয়ানের সহিত খনন সম্পর্কে যেরূপ একটা জনপ্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে, মীরকাদিমের খালের সম্বন্ধে সেইরূপ কোনও কিংবদন্তী প্রচলিত নাই।

খালের উপরের প্রধান কীর্তি একটি হিন্দু আমলের তিন খিলানযুক্ত প্রকাণ্ড ইটের পুল। জনপ্রবাদ বলে, পুলটি বল্লালসেনের নির্মিত। পাইকপাড়া ও আবদুল্লাপুর গ্রামের উভয় সীমায়

পুলটি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ খালকে পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ হইয়া অতিক্রম করিয়াছে। পুলটি যে রাস্তাকে স্বীয় দেহের উপর দিয়া এইভাবে খাল অতিক্রম করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা মীরকাদিমের খালের তিন মাইল দূরে সমান্তরালে অবস্থিত তালতলার খাল অতিক্রম করিয়াছে এবং তথায়ও ঠিক এইরূপ আরেকটি ইটের পুল আছে। সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই পুল দুইটি কে কবে নির্মাণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। পুল দুইটি যে অতি প্রাচীন, দেখিবামাত্রই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না। গাঁথুনি আগাগোড়া ইটের কোথাও পাথর ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু ইটের গাঁথুনিই বজ্রের মত দৃঢ়। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের বিখ্যাত ভূমিকম্পে ইহার বিশেষ কোনও ক্ষতি করিতে পারে নাই। এই খালটি সম্বন্ধে ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাহার মতে ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোনও বৎসর মীরকাদিমের খাল খনিত হইয়াছিল। কাজেই এই খালের বয়স প্রায় নয়শত বৎসর হইতে চলিল, সেই হিসাবে তালতলা খালের বয়সও এইরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। এই খালটি ধলেশ্বরী নদী হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতে বা সেরাজাবাদের নদীতে পড়িয়াছে।

ধলেশ্বরী নদী হইতে উৎপন্ন হইয়া যে খালটি চূড়াইনের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া আড়িয়ল বিলে যাইয়া মিশিয়াছে, তাহা 'চূড়াইনের খাল' নামে খ্যাত। উহার অপর একটি শাখা সেরাজদিঘার পূর্ব-প্রান্তে লুপ্ত অবস্থায় আছে।

এই সমস্ত স্বাভাবিক ও খনিত পয়ঃপ্রণালীগুলি হইতে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খালের উদ্ভব হইয়াছে। সে সমুদয় খালের নাম যে যে গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে সে গ্রামের নাম অনুযায়ী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে; যেমন বেতকার খাল, বজ্রযোগিনীর খাল, কামারখাড়ার খাল, বাঘিয়ার খাল, হাসাডার খাল। বিক্রমপুরের প্রায় প্রত্যেক গ্রামের মধ্যভাগ ও সীমা ধৌত করিয়া এ সমুদয় খাল প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। খালের সংখ্যা বেশি বলিয়া বিক্রমপুরের ভূমির উর্বরা-শক্তি অত্যন্ত বেশি। এইসমস্ত ছোট ছোট খালগুলিকে চলতি ভাষায় 'ঝোরাখাল' বলে।

হলদিয়া, তালতলা, মীরকাদিম এই তিনটি প্রসিদ্ধ খাল হইতে বহু-সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোরাখাল বাহির হইয়া বিক্রমপুরের অভ্যন্তরস্থ গ্রামগুলিকে ও হাটে-বন্দরে চলাচল ও বাণিজ্য-পণ্য বহনের সুবিধা করিয়াছে। এইসমস্ত খালে জোয়ার-ভাটায় জল কমে ও বাড়ে। জোয়ারের সময়ে মাল-বোঝাই বড় বড় নৌকাও যাতায়াত করিতে পারে। এই প্রকার যে সব খালগুলি দ্বারা লোকের যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হইয়া থাকে, সেইরূপ কতকগুলি খালের বিবরণ দেওয়া গেল।

হলদিয়ার খাল—এই খাল হইতে যে সকল খাল বাহির হইয়াছে তাহার পরিচয় দিলাম।

ক. লৌহজঙ্গের নিকট হইতে ইহার যে শাখা পূর্বগামিনী হইয়া গাউদিয়ার নিকটে তালতলার খালে মিশিয়াছিল, তাহা পদ্মার ভাঙ্গনে পদ্মার সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

খ. দিঘলি হইতে উৎপন্ন হইয়া একটি শাখা পূর্ববাহিনী হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ঘোড়দৌড় হইতে উত্তরবাহিনী হইয়া বেজগাঁ, ভোগদিয়া, মসদাগাঁও, আটিগাঁও প্রভৃতি গ্রাম ভেদ করিয়া দক্ষিণ-চারিগাঁয়ের নিকট অন্য "ঝোরা খালে" পতিত হইয়াছে। ইহার পারে বেজগাঁ, ভোলদিয়া, আটিগাঁও ও দক্ষিণ-চারিগাঁও-এর হাট-বাজার অবস্থিত।

গ. ঘোড়দৌড় গ্রামের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্বগামিনী হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসরের পর উত্তরবাহিনী হইয়া এক শাখা ধীৎপুরের মধ্য দিয়া বিলে পড়িয়াছে, অপর শাখা মসদাগাঁও ভেদ করিয়া উত্তর দিকে যাইয়া গ্রামের সহিত মিশিয়াছে।

ঘ. কনকসারের পূর্বসীমা স্পর্শ করিয়া এক শাখা ধীৎপুরের মধ্য দিয়া কনকসারের বন্দরের পশ্চিম প্রান্ত ধৌত করিয়া নাগেরহাটের মধ্য দিয়া, অপরশাখা নাগেরহাটের নিকট একটি ক্ষুদ্র খালে যাইয়া মিশিয়াছে। নাগেরহাট বন্দর ইহার পারে অবস্থিত। নাগেরহাটে বহু কুম্ভকারের বাস ; এ খাল দ্বারা তাহাদের ব্যবসায়ের প্রভূত উপকার সাধিত হয়।

ঙ. এই খাল হইতে উৎপন্ন দু'টি অপ্রশস্ত জলধারাকে লোকে 'কালীগঙ্গা' ও 'পোড়াগঙ্গা' বলে। প্রথমোক্তটি কোরহাটি ও খরিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া ভাওয়ারের নিকট পদ্মায় মিশিয়াছে। এটিকে 'কালীগঙ্গা' বলে, পুরাতন থাক-নক্সায়ও এই জলাধারটি 'কালীগঙ্গা' বলিয়া বর্ণিত ও চিহ্নিত হইয়াছে।

চ. হলদিয়া গ্রামের উত্তরপ্রান্ত স্পর্শ করিয়া একটি অপ্রশস্ত জলাধার পূর্বগামিনী হইয়া নাগেরহাট, দক্ষিণ-চরিগাঁও, ভবানীপুর, জৈনসার প্রভৃতি গ্রামের ভিতর দিয়া মধ্যপাড়ার নিকট একটি ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্রোতধারাটিই 'পোড়াগঙ্গা' নামে পরিচিত। ইহার পারে নাগেরহাট, দক্ষিণ-চারিগাঁও, ভবানীপুর প্রভৃতি বন্দর অবস্থিত; হলদিয়া হইতে নৌকাযোগে মাল বহনে সুবিধাজনক খাল।

ছ. হলদিয়ার খালের পশ্চিম-পার হইতে শিমুলিয়া বন্দরের পূর্ব সীমা ভেদ করিয়া খরিয়া গ্রামের ভিতর দিয়া কোরহাটি ও খরিয়া হইতে আগত 'কালীগঙ্গা'র সহিত মিলিত হইয়া ভাওয়ারের নিকট পদ্মায় মিশিয়াছে।

জ. সাতঘরিয়ার নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া মৌছার ভিতর দিয়া কাজিরপাগলায় মিশিয়াছে।

ঝ. কারপাশার নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া হরিয়ামুন্সির ভিতর দিয়া বিলে পতিত হইয়াছে।

ঞ. গয়ালি-মান্দ্রার দক্ষিণ হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্বগামিনী হইয়া কুকুটিয়ার মধ্য দিয়া বিলে মিশিয়াছে।

ট. গয়ালি-মান্দ্রার পশ্চিম হইতে পশ্চিমবাহিনী হইয়া কাজিরপাগলার খালে যাইয়া মিশিয়াছে।

ঠ. দক্ষিণ-পাইকসার উত্তরসীমানা ভেদ করিয়া এক শাখা কাজিরপাগলা, দোগাছি, কোলাপাড়া প্রভৃতি গ্রাম ভেদ করিয়া বিলে পতিত হইয়াছে। অপর শাখা দক্ষিণ-পাইকসার দক্ষিণসীমানা স্পর্শ করিয়া পশ্চিমবাহিনী হইয়া বিলে যাইয়া মিশিয়াছে। প্রথমোক্ত ধারাটির তীরে কাজিরপাগলা, দোগাছি এবং কোলাপাড়া বন্দর অবস্থিত।

ড. শ্রীনগরের দক্ষিণ প্রান্ত ধৌত করিয়া শ্যামসিদ্ধির মধ্য দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া বক্রাকৃতি ভাবে রাড়িখালের উত্তর দিয়া আরিয়ল বিলে মিশিয়াছে।

ঢ. পদ্মানদীর ভাঙ্গনির জন্য অনেকসময় চর পড়িয়া নতুন নতুন পয়ঃপ্রণালীর সৃষ্টি হইয়া থাকে। বর্তমানে এইরূপ একটি জলপ্রণালীর নাম করা যাইতে পারে, উহা কমলার নিকট হইতে বাহির হইয়া পুরান দিঘিরপাড়ের নিকট যাইয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। এইসব পয়ঃপ্রণালী পদ্মার প্রকোপে পুনরায় নতুন চর ভাঙ্গিয়া গেলে আবার মূল পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া যায়।

এইভাবে তালতলার খাল ও মীরকাদিমের খাল হইতেও অনেক 'ঝোরাখালের' উৎপত্তি হইয়াছে। বিক্রমপুরের নিম্নভূমিকে উচ্চ করিয়া না লইলে বাড়ি-ঘর ইত্যাদির নির্মাণকার্য চলিতে পারে না। তারপর যাতায়াতের জন্যও খালের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি। কি ব্যবসায়-

বাণিজ্যের জন্য, কি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার জন্যও খালের আবশ্যক। এইজন্য বিক্রমপুরের প্রত্যেক গ্রামের প্রান্ত দিয়া কিংবা মধ্য দিয়া খাল আছে, ঐ সব খালের নাম গ্রামের নাম অনুসারেই হয়। যেমন আউটসাহির খাল, বাঘিয়ার খাল, বেত্‌কার খাল, বজ্রযোগিনীর খাল এইরূপ। সে সমুদয়ের নাম করা অনাবশ্যক-বোধে আর নাম লিখিলাম না। প্রধান কয়েকটি খালের কথাই বলিলাম।

বর্ষাকালে বিক্রমপুরের গহেনার নৌকা ও ছোট ছোট লঞ্চগুলি প্রধান প্রধান খালগুলির মধ্য দিয়াই মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা যাতায়াত করে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগ হইতে কার্তিক মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত পাঁচ মাস কাল খালের ভিতর দিয়াই গহেনা, লঞ্চ ইত্যাদি যাতায়াত করিতে পারে। কার্তিকের মধ্যভাগ হইতে জ্যৈষ্ঠর মধ্যভাগ পর্যন্ত অবশিষ্ট সাত মাস সময় ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ-গামী গহেনাগুলি পদ্মা, মেঘনা, শীতললক্ষ্যা ঘুরিয়া ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার পথে ঢাকা পৌঁছে। **দক্ষিণ বিক্রমপুরের** খালগুলির মধ্যে ভোজেশ্বর, ঘড়িসার, নড়িয়ার, মহিষখোলার, নওপাড়ার, গোয়ালমারীর, গোয়ালার, পিঞ্জিরির, ফতেপুর গোয়াখালি, ঘাগরের বিনোদপুর বা চিকন্দির, রাজগঞ্জ বা পালঙ্গের খাল ও বিলরুট প্রসিদ্ধ।

বিল ঃ

বিক্রমপুরের বিলের মধ্যে **আড়িয়ল বিল** বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহার দক্ষিণ প্রান্তে মাইজপাড়া, কোলাপাড়া, উত্তরে শ্রীধরখোলা, বারুইখালি এবং সেকেরনগর বা শেখরনগর। পশ্চিমে নারিশা গ্রাম, পূর্বপ্রান্তে দয়হাটা, হাসাড়া, গাঁদিঘাট, প্রাণীমণ্ডল বা পরাণিমণ্ডল প্রভৃতি গ্রাম। এই বিলটির দৈর্ঘ্য পূর্ব-পশ্চিমে ১২ মাইল এবং দক্ষিণে প্রস্থ প্রায় ৭/৮ মাইল হইবে। অতি প্রাচীনকালে বিক্রমপুরের অধিকাংশ ভূখণ্ড যে এই আড়িয়ল বিলের গর্ভে ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। এখন অনেক স্থান গ্রামরূপে পরিণত হইলেও আড়িয়ল বিল বিক্রমপুরের এক তৃতীয়াংশ স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই বিলে বর্ষার সময়ে কুমীরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়, এবং ঝড় উঠিয়া বিলের জলে এমন ঢেউ উঠে যে, বিলের মধ্যে নৌকা থাকিলে জীবনের আশা বড় কম থাকে। এই বিলটিকে ছোট-খাটো হ্রদ বলা যাইতে পারে।

ঢাকা জেলার বিলগুলির মধ্যে আয়তন ও প্রশস্ততায় আড়িয়ল বিলই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। অনেকে অনুমান করেন যে, সম্ভবত রাজশাহীর চলন বিল এবং ঢাকার আড়িয়ল বিলেই অতি প্রাচীনকালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম হইয়াছিল। পরে উভয় নদীর প্রবাহ পরিবর্তন হেতু এই স্থান শুষ্ক হইয়া প্রকাণ্ড বিলে পরিণত হইয়াছে।

আড়িয়ল বিল বা চুড়াইন বিল ছাড়া আরও কয়েকটি ছোট ও বড় এবং মাঝারি রকমের বিল আছে। এখানে তাহাদের নাম করিলাম :

ক. কদম বিল—হলদিয়া ও নাগেরহাটের মধ্যস্থলে অবস্থিত। পৌষ-সংক্রান্তির দিনে এই বিলে বহুলোকে মৎস্য ধরে।

খ. জিয়াস্ বিল।

গ. হাসাড়ার বিল—এই বিলকে চুড়াইন বিলের একটি অংশ বলিলেই হয়। এইরূপ আরও অনেক ছোট ছোট বিল আছে। সে সমুদয় সাধারণত যে যে গ্রামের কাছাকাছি অবস্থিত, ঠিক সেই সেই গ্রামের নামেই পরিচিত হইয়া থাকে।

দক্ষিণ বিক্রমপুর ঢোলসমুদ্র বিশেষ বিখ্যাত। ইহা ফরিদপুরের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অবস্থিত। এক সময়ে ইহার আয়তন ৮ মাইল ছিল, পরে বর্ষার সময়ে প্রায় দুই মাইল জলপূর্ণ থাকিত। বর্তমান সময়ে গ্রীষ্মকালে এই বিল প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বিল হাতিমোহনা আড়াই মাইল দীর্ঘ ও দু'মাইল প্রশস্ত ছিল। কাজলারবিল, বাঘিয়াবিল, কোটালিপাড়ার উত্তর। রামশীলা দিঘি, বড়য়া ইত্যাদি। এই সমুদয় বিল ক্রমশই শুকাইয়া আসিতেছে।

ভূমির আকৃতি ও প্রকৃতি ঃ

বাংলাদেশ পলিমাটির দেশ। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিতে গেলে ইহার বয়স অনেক কম। কম বলিয়াও একেবারে নেহাত কম নহে। কেননা বাংলাদেশের উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অনেক প্রাচীন ভূমি রহিয়াছে। এমনকি চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে, যে সমুদয় প্রত্ন-প্রস্তর-যুগের শিলা-নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, দক্ষিণাপথবাসী আদিমমানবগণের সহিত উত্তরাপথবাসী প্রাচীন মানবজাতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। মাদ্রাজে ও বাংলায় আবিষ্কৃত প্রত্ন-প্রস্তর যুগের অস্ত্রসমূহের সাদৃশ্য কেবল আকারগত নহে, অনেক সময়ে উভয়দেশে আবিষ্কৃত অস্ত্রের পাষাণ একইজাতীয়।[১৪] এ সকল হইতে প্রমাণ হয় যে, আমাদের জননী বঙ্গভূমি নবীনা হইলেও একেবারে নবীনা নহেন, তিনি বেশ প্রবীণা।

বিক্রমপুর বলিয়া নহে, পূর্ববঙ্গ নদীমাতৃক স্থান এবং বিক্রমপুর তো একেবারেই নদীমেখলা। একজন ইংরাজ লেখক বিক্রমপুরের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সর্বতোভাবে সত্য : Encircled in a network of rivers where Ganges and Buriganga, Megna, Ishamutti and Brahamputra meet, lies ancient Kingdom of Vikrampur... Every where the influence of the great rivers has made itself felt in the story of Vikrampur. Silted up by them in days gone by, when the world was young, it is practically an island set in their midst. Having brought in into being, they made of it their Special Care.[১৫] নদ-নদী পরিবেষ্টিত বিক্রমপুরের উপর নদ-নদী তাহার ইতিহাস প্রতিদিন লিখিয়া যাইতেছে। সেই কবে কোনও যুগে কোথাও নদী শুকাইয়া গিয়াছে, কোথাও নদীর স্রোতধারা বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। বিক্রমপুর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপবিশেষ। এজন্যই বিক্রমপুরও বাংলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় পলিমাটির দেশ। নদী তটরেখা হইতে সাধারণত ইহার উচ্চতা অল্প। বর্ষার প্লাবনে সারা বিক্রমপুর সাত সাগরের এক সাগরে পরিণত হয়, শুধু জল-জল-জল। মাঝে মাঝে শ্যামল-তরু-গুল্ম-পরিশোভিত বনরাজিপরিবেষ্টিত পল্লীগ্রামগুলির, সবুজ ধান্য-ক্ষেত্রের তরঙ্গায়িত সৌন্দর্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। বৎসরের প্রায় অর্ধেক সময় বিক্রমপুরের অধিকাংশ ভূ-ভাগ জলমগ্ন থাকে।

ভূ-ভাগের বৈচিত্র্য ঃ

বিক্রমপুরের ভূমি সমতল নহে। কোথাও উচ্চ, কোথাও নীচ। এমন কোনও কোনও স্থান আছে যে স্থানে বর্ষার জলপ্লাবন ও পৌঁছাইতে পারে না। যেমন রামপাল, বজ্রযোগিনী, পাইকপাড়া প্রভৃতি গ্রাম। পূর্ব বিক্রমপুরের ভূ-ভাগ পশ্চিম বিক্রমপুর হইতে উচ্চ। পশ্চিম বিক্রমপুরের মধ্যে পদ্মার তটভূমির নিকটবর্তী স্থানগুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চ। আড়িয়ল-বিল পশ্চিম-বিক্রমপুরে অবস্থিত এজন্য ইহার চারিদিকে যে সমুদয় স্থান আছে সে গুলি নিম্নভূমি।

মৃত্তিকার গুণাগুণ ও কৃষি ঃ

পূর্ব বিক্রমপুরের মৃত্তিকা খুব উর্বরা। রামপাল ও মুন্সিগঞ্জের নিকটবর্তী স্থানে ভূমি উচ্চ এবং মৃত্তিকা পীতবর্ণ। এজন্য ঐ স্থান কদলি উৎপাদনের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। সেখানকার দুধসাগ; অমৃতসাগর, অগ্নিশ্বর, সবরি, চিনিচম্পা, কবরি, আট্যা, কানাইবাঁশি প্রভৃতি কদলি খুবই বিখ্যাত এবং দেশে-বিদেশে ইহার চালান হইয়া থাকে। রামপালের মুলাও বিশেষ বিখ্যাত। পূর্বে বিক্রমপুরে কপির চাষ হইত না। বর্তমান সময়ে রামপাল, মুন্সিগঞ্জ ও তাহার চারিপাশের গ্রামে গ্রাম বহু ফুলকপি, বাঁধাকপি ও গোলআলুর চাষ হইতেছে। এখানকার কচুও

উৎকৃষ্ট। আখের (ইক্ষু) চাষও বেশ ভাল হয় এবং এবং এখানে যে উৎকৃষ্ট আখিগুড় হয় উহা 'রামপালের আখিগুড়ি নামে প্রসিদ্ধ। মুন্সিগঞ্জে এজন্য বহু আখমাড়াই কল মজুত থাকে। একসময়ে রামপালের চৌগাড়ার (নালা ডোবা) অন্ত ছিল না, সেখানকার সুগভীর চৌগাড়া দেখিলে ভয় হইত। এখন তাহা ভরাট হইয়াছে। সে সমুদয় উচ্চ স্থানে নানাবিধ শস্য উৎপাদিত হয়। বিশেষত রামপালের কলা, মূলা, বাইগুণ (বেগুন) সর্বত্র প্রসিদ্ধ। ইক্ষু ও খর্জুরের রসে তথায় অধিক পরিমাণে অতি উপাদেয় গুড় উৎপন্ন হয়। এমন মিষ্ট ও পরিষ্কৃত গুড় কোথাও বড় দৃষ্ট হয় না। এখানে তেঁতুল ও শিমূল তুলা অনেক জন্মিয়া থাকে। মধ্য বিক্রমপুরের পানিয়া, খিলগাঁও, তন্তর, দক্ষিণ চরিগাঁও প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট পাট জন্মে। পানের 'বোরো'র বা বরোজ এ অঞ্চলেই বেশি। পানের বরোজ—পটল, মরিচ প্রভৃতিও উৎপন্ন হয়।

পশ্চিম-বিক্রমপুরের মৃত্তিকা উর্বরা বটে কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনও ফসল উৎপন্ন হয় না। ধান, পাট, কায়ন, তিল প্রধান ফসল।

মৃত্তিকার প্রকারভেদ ঃ

বিক্রমপুরের সমগ্র ভূ-ভাগের মৃত্তিকাই আটালে বা (১) আটালিয়া, (২) দোয়াসা (বিল ও ঝিল প্রভৃতির নিকটবর্তী মৃত্তিকাই এই শ্রেণীভুক্ত), এই মৃত্তিকা সাধারণত কৃষ্ণবর্ণের হয়। সম্ভবত উদ্ভিজ্জ-পদার্থ মিশ্রিত থাকার দরুণই এইরূপ হইয়া থাকে। (৩) বালুকাময় যেমন চরভূমি এবং নদীর তটদেশের ভূ-ভাগ। পশ্চিম-বিক্রমপুরের কোনও কোনও স্থানে বিশেষ হলদিয়ার মৃত্তিকা অত্যন্ত বালুকাময়। অথচ পার্শ্ববর্তী অনেক গ্রামের মাটিই আটালিয়া ও দোয়াসা। হলদিয়া গ্রামে এক ফুট মাটি খুঁড়িলেই গভীর বালুকাময় স্তর পাওয়া যায়, এ জন্য এখানে উৎকৃষ্ট জলাশয় যেমন দিঘি, পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন করা অসুবিধাজনক। আড়িয়ল-বিলের পাড়ে স্থানে স্থানে এবং রাড়িখালের গ্রামের মৃত্তিকার উদ্ভিজ্জ-পদার্থের সংমিশ্রণ থাকাতে উহার মৃত্তিকা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। এখানে অনেক সময় মৃত্তিকা মহিষের শিং ইত্যাদি পাওয়া যায়।

চরাভূমি ঃ

পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদীতে বহু চর আছে। কোনও চরই বড় একটা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। পুরাতন চর ভাঙ্গিয়া নূতন চরের সৃষ্টি হয়। এই সমুদয় নূতন চর দখল করিতে ভূম্যধিকারীদের মধ্যে অনেকসময়ই দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া থাকে। উহাতে খুন-জখম পর্যন্ত হয়। বহরের চৌধুরী জমিদারদের সহিত ভাগ্যকুলের কুণ্ডুদের চর-দখলি খুন-জখমের কথা আজও লোকের মুখে মুখে প্রবাদের মত শোনা যায়। প্রত্যেক চরেরই এক-একটি নাম থাকে। সাধারণ জমিদারদের নামানুযায়ী চরের নাম হয়, যেমন মিত্রের চর, কুণ্ডুর চর, চরজজিরা এইরূপ। এ সমুদয় চরে মুসলমানদের বসতি বেশি। অনেক নমঃশূদ্রও আছে। বর্তমান সময়ে ভাগ্যকুল হইতে দুয়াল্লি পর্যন্ত একটি বিস্তৃত চর পড়িয়াছে তাহাতেই 'পদ্মার ভাঙ্গনি' অনেক কমিয়াছে, নতুবা এত দিন আরও বহু গ্রাম পদ্মার অতলতলে নিমজ্জিত হইত। এই সমুদয় চরে ধান, পাট, মুগ, আখ জন্মে এবং আখের গুড়ও চরেই জন্মে। দুধ তো প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পদ্মার তীরবর্তী বন্দরগুলিতে যথা,—ভাওয়ার, খরিয়া, দিঘলি, কমলা, দিঘিরপাড় প্রভৃতি স্থানে চরের দুধ ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য প্রচুর আমদানি হয়।

চরের লটা বা লঠা ঘাস—গরুর প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য। চরে একজাতীয় ছোট ছোট ঝাউগাছ, ঐগুলি সাধারণ 'বুনো বা বউনা ঝাউ' নামে পরিচিত। ইহা জ্বালানি কাঠরূপে ব্যহহৃত হয়।

বন-জঙ্গল ঃ

বিক্রমপুরের কোনও স্থানেই বর্তমান সময়ে গভীর বন-জঙ্গল নাই। কিন্তু একদিন ছিল। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে বিক্রমপুরের অবস্থা কিন্তু এইরূপ ছিল না, তখন বিক্রমপুরের অধিকাংশ গ্রামই বনাকীর্ণ ছিল।—যেরূপ উত্তর পাড়ে, তেমনি দক্ষিণ পাড়ের গ্রামসমূহও ঐপ্রকার বনাকীর্ণ ছিল। সেকালের 'পল্লীবিজ্ঞান' পত্রে লিখিত আছে—"সমুদয় বিক্রমপুরের গ্রাম সংখ্যা যত ব্যবহার জন্য পুষ্করিণী তাহার শতাংশ একাংশ নাই। একে নানাপ্রকার বনারণ্য এবং বৃক্ষাদিতে বিশুদ্ধ বায়ু অবরোধ করিতেছে, তাহাতে উত্তম পানীয়-জল একেবারে অভাব বলিলেই হয়। কোনও মাঠ কি ক্ষেত্রমধ্যে দাঁড়াইলে চারিদিকে দৃষ্টি করিলে কেবল অরণ্যময়ই দেখা যায়। তাহাতে যেমন লোকালয় আছে তাহার লক্ষণ কিছুই দর্শন হয় না। পূর্বাংশে রামপাল, মহাকালী ইত্যাদি, উত্তরে ইছাপুর, শিয়ালদি, বয়রাগাদি প্রভৃতি, দক্ষিণে কীর্তিনাশার পারে জপ্‌সা, ভোজেশ্বর প্রভৃতি স্থান এমন কি সে অঞ্চলগুলিই মনে করিলে আমাদের ও লেখা অবস্থাসম্মত কিনা প্রতীত হইবেক। রামপালের ও তন্নিকটবর্তী গ্রাম ও পথ ঘাটগুলির অবস্থা শতবর্ষ পূর্বে কিরূপ ছিল, তাহাও এখানে বলিতেছি : —আহা কি আক্ষেপ! পূর্বে যেখানে রাজা ও রাজপরিবারদের অধিবাস ছিল, যে স্থানে সর্বদা শান্তিজনিত চতুরঞ্জক জয়ধ্বনিতে কর্ণকুহরকে আমোদিত করিত, সেখানে ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ পশ্বাদিতে বসতি করিতেছে, আর সেই চতুরঞ্জক জয়ধ্বনি কর্কশ অসুখকর শৃগালধ্বনিতে পরিবর্তিত হইয়াছে, পূর্বে যে সমস্ত বর্ত্ম দিয়া নানাদেশ বিদেশের লোক অহর্নিশি গমনাগমন করিত, এইক্ষণে তাহা দিয়া নানাজাতীয় পশুচয় বিচরণ করিতেছে। ..... রামপালের দিঘির পশ্চিম পার দিয়া উত্তরে ধলেশ্বরী খাড়ি (রেকাবিবাজারের খাড়ির সম্মুখস্থ গুদারাগাট) হইতে প্রায় সরলভাবে দক্ষিণাভিমুখে রাজাবাড়ি থানা পর্যন্ত বৃহৎ একটি রাজপথ সোজা দেখিতে পাওয়া যায়। উহার নাম রামপালের দরজা। উক্ত দরজার পরিসর অন্যূন ৩০ হাত হইবে। কথিত আছে, বল্লালসেন ঐ দরজা নির্মাণ করাইয়া লোকের গমনা-গমনের অসুবিধা নিবারণ করিয়াছিলেন। উহার আধুনিক অবস্থার বিষয় স্মরণ হইলে, অন্তঃকরণে দুঃখের উদ্রেক হয়। সম্প্রতি উল্লিখিত রাজবর্ত্মের দুইপাশে প্রঘোর জঙ্গলসমূহ বৃহৎ বৃহৎ অশ্বত্থ, পাকুর, তেঁতুল, শিমূল, খর্জুর প্রভৃতি বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, মধ্যস্থলে এক হাত পরিসরবিশিষ্ট যে একটু পথ আছে তাহাও আবার ইষ্টক, কণ্টক ও বৃক্ষের মোটা মোটা শিকাড়াদিতে আবৃত রহিয়াছে। ঐ স্থান দিয়াই লোকেরা গতায়াত করিয়া থাকে। আর প্রোক্ত জঙ্গল মধ্যে অনেক হিংস্র প্রাণী বাস করিয়া থাকে। এতদ্বারা জনগণের যে কি পর্যন্ত অনুবোধের সম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। যিনি একবার রামপালের পথ দিয়া গমনাগমন করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, রামপালের পথ কীদৃশ দুর্গম ও ভয়ঙ্কর। তিনি আর নির্ভাবনায় ঐ স্থান দিয়া চলাচল করিতে পারেন না। .... পল্লীগ্রামগুলি প্রায়ই গাঢ় জঙ্গলাকীর্ণ, তাহাতে প্রয়োজনীয় বায়ুর সঞ্চালন দূরে থাকুক, শারদীয় শুক্লপক্ষের রজনী ও কৃষ্ণপক্ষের তামসী নিশার ন্যায় বোধ হয়'।"

ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অবস্থায়ও বিক্রমপুর বনাকীর্ণ ছিল। এমনকি দস্যু তস্করের ভয়ও ছিল যথেষ্ট। সেইসময়ে গভীর বনাকীর্ণ গ্রাম্যপথে চলাচল অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। সেইসময় রামপাল দিয়া কেহ একাকি গমন করিতে পারিত না। এমনকি অনেক লোক একত্র হইয়া না যাইলে বিনষ্ট হইত। এখানে একটি সত্য ঘটনা বলিতেছি।—প্রায় শতবর্ষ পূর্বে এক দিবস কোনও ব্রাহ্মণ আপন একজন আত্মীয়াকে ডুলিতে আরোহণ করাইয়া রামপাল দিয়া আসিতেছিল। পথিমধ্যে পথ-গমনহেতু পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামলাভার্থ তথায় কোনও ছায়াময় স্থানে বসিয়াছিল, এমন সময়ে হঠাৎ কয়েকজন দস্যু শান্তমূর্তি পরিধান করিয়া ভদ্রবেশে

তাহাদের সমীপে উপস্থিত হয়। এবং প্রথমে ডুলি মহারত (ডুলিবাহক) দিগকে বিবিধ অনুনয় বিনয় করিয়া নৌকা উত্তোলনের ছলে কোনও গুপ্তদেশে লইয়া যাইয়া বধ করিল, পরে ব্রাহ্মণকেও কোনও কার্যের ভান করিয়া কোনও গোপনীয় স্থানে আনয়ন করিয়া বিনাশ করে। ব্রাহ্মণ-কন্যা টের পাইয়া স্বীয় প্রাণরক্ষার্থে দৌড়িতে দৌড়িতে কোনও ইক্ষুবনস্থ এক বৃদ্ধ মুসলমানের পা ধরিয়া এবং তৎবিষয়ক যাবতীয় বিবরণ অবগত করায়। ইহাতে তাহার প্রাণরক্ষা হয়। এই প্রকার অনেকানেক নিদারুণ ঘটনা ঘটিয়াছে।

বিক্রমপুরের পরগণা বিভাগ ঃ

আমরা বর্তমান সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ পারের যে ভূ-ভাগকে বিক্রমপুর নির্দেশ করিতেছি পূর্বে বহু বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ উহার সংস্থিতি ছিল, পরে উহার নানা স্থান নানা বিভিন্ন পরগণায় পরিগণিত হইয়াছে। পূর্বে কার্তিকপুর, ইদিলপুর, পারজোয়ার, ঢাকার উত্তরাংশও বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল। তিন চারিশত বৎসর পূর্বে ঐ পরগণাগুলির কোনও অস্তিত্ব ছিল না। ইদিলপুরে প্রাপ্ত সেনারাজগণের একখানা তাম্রশাসন এশিয়াটিক জার্নেলের প্রথম অংশের ৮০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে—'বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগ প্রদেশে প্রশস্ত....লতা ....ঘোড়াঘটক পূর্বে....স....একা....ধীগ্রাম সীমা দক্ষিণে শঙ্কর বসাগোবিন্দ বলান্ত ভূসীমা পশ্চিমে....ইত্যাদি।" এই তাম্রশাসনে 'লতা' ও 'ধীগ্রাম' বলিয়া যে দুটি স্থানের পরিচয় আছে, উহা যে বর্তমান ইদিলপুরের অন্তর্গত লতা ও ধীপুর গ্রাম তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্যামলবর্মার তাম্রশাসনে নাগরকুণ্ডী, সামন্তসার, লঙ্কাচুয়া ও ধীপুর নামের উল্লেখ আছে। যে সকল নাম বিক্রমপুরের অন্তর্গত বলিয়া তাম্রশাসনে রহিয়াছে, বর্তমান সময়ে কিন্তু ঐ সকল স্থান ঐ দুই পরগণার অন্তর্গত দেখা যায়।

উপরে যে দুইখানা শাসনপত্রের কথা উল্লেখ করা হইল, উহা প্রায় আট-নয়শত বৎসরের পূর্বের বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, **ইদিলপুর** ও **কার্তিকপুর** এই দুইটি পরগণা বিভাগেরও বহু পরে উৎপন্ন হইয়াছে।

সাহান্‌শাহ আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে রাজা টোডরমল্ল দ্বারা বঙ্গদেশ উনিশটি চাকলায় বিভক্ত হয়। এই সময় সরকার সোনারগাঁর অন্তর্গত চারিটি মহালের মধ্যে ইদিলপুর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস বিক্রমপুরের অংশ হইতেই অন্যান্য নূতন পরগণার ন্যায় এই সময়ে কার্তিকপুর, সুজাবাদ ও ইদিলপুর নামে দুইটি পৃথক পরগণা নির্দেশ করা হয়। এইরূপে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত প্রাচীন বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ হইতে বিভিন্ন পরগণার উৎপত্তি হইয়াছে। মিঃ বিভারেজ এই দুইটি নাম যে মুসলমান নামের সহিত সম্বন্ধ ও জড়িত তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। অতএব হিন্দুরাজত্বে উহা বিক্রমপুর বলিয়াই পরিচিত ছিল।

রাজ পরিবর্তনের সহিত দেশের বিভাগেরও পরিবর্তন হয়। সেনরাজগণের সময়ে বিক্রমপুরের পরিধি যতদুর বিস্তৃত ছিল তাহার যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। তৎপরে নবাবি আমলে এই বিক্রমপুর-মধ্যেই আবার আরঙ্গাবাদ, রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর প্রভৃতি তিন-চারটি পরগণার সন্নিবেশ হইয়াছে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮৬০ পর্যন্ত গেস্ট্রেল ও ডেলি কর্তৃক যে সার্ভে হয়, তাহাতে দেখা যায় বিক্রমপুর পরগণাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ৮/৯ নং **মকিমাবাদ**। ১০ নং **বিক্রমপুর**। ১৩/১৪ নং **রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর**। এই তিন খণ্ডের মধ্যে ৮, ৯ ও ১৪ নং এই দুই বিভাগে বিক্রমপুর ব্যতীত অপর কয়েক পরগণার জমিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৮/৯ নম্বরে মকিমাবাদ ও আরঙ্গাবাদের মধ্যে উত্তর বিক্রমপুরে দত্তপাড়া, সেকেরনগর, হাসারা, বীরতারা, ষোলঘর, দেওভোগ, শ্রীনগর, মাইজপাড়া, কামারগাঁ, পাটাভোগ, বেজগাঁ, পরাণীমণ্ডল, কয়কীর্তন, নাগরভাগ, কুমারভোগ, মেদিনীমণ্ডল,

হলদিয়া, ইছাপাশা, বাজপুর, দেড়শত, ভাওয়ার, মাওয়া, কাওয়ালীপাড়া, কোঁয়রপুর প্রভৃতি বিক্রমপুরের বহু গ্রাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কীর্তিনাশা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী স্থান সমুদয় ১৩/১৪ নম্বর রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর এই দুই বিভাগের অন্তর্গত থাকায় সর্বসাকুল্যে বিক্রমপুর নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। কীর্তিনাশার দক্ষিণ তীরস্থ স্থানগুলি সম্প্রতি ফরিদপুরের অন্তর্গত হওয়ায় উহা **'দক্ষিণ'** বিশেষণ বিশিষ্ট হইয়া **দক্ষিণ-বিক্রমপুর** নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বিক্রমপুরবাসী কেহই পরিচয় প্রদান কালে মকিমাবাদ, আরঙ্গাবাদ বা রাজনগর, বৈকুণ্ঠপুরের নাম করেন না। প্রকৃত রাজনগর গ্রামবাসীরাও বাড়ি রাজনগর, পরগণা বিক্রমপুর বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। রাজবিধান কাগজ-পত্রেই নিবদ্ধ আছে। বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বিস্তৃত বাক্‌লা (চন্দ্রদ্বীপ) পরগণার বহু খর্বতা সাধন হইলেও তত্রত্য পণ্ডিতগণ, যাহার বিভিন্ন পরগণায় বিভক্ত স্থানসমূহে বাস করিতেছেন তাহারাও সগর্বে বাক্‌লার পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন না।

দক্ষিণ-বিক্রমপুরান্তর্গত **শ্রীপুর** নগরে সুপ্রসিদ্ধ চাঁদরায় ও কেদাররায়ের রাজধানী ছিল। এতদ্ভিন্ন সঙ্কট নামক স্থানে, সমতটের সদর স্থান ছিল। সমতটকে বৈদেশিক লেখকগণ কেন সনকট কেহ কেহ সকাট লিখিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। উচ্চারণের বৈষম্যবশত বিক্রমপুরবাসীগণ উহাকে সঙ্কট বা সমকট বলিতেন। (১) সমগ্র বেহার প্রদেশ মধ্যে যেমন একটি খণ্ড স্থানের নাম বেহার, সেইরূপ সরকার খলিফেতাবাদ, ফতেয়াবাদ, পূর্ণিয়া প্রভৃতির মধ্যে কয়েকটি খণ্ড-স্থানেরও ঐরূপ নাম চিল, যাহা তৎকালীন সেই সেই বিভাগের সদর স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সমকট (সমতট) ও তদ্রূপ সমগ্র সমতটের সদর স্থান ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। একসময়ে এই সমকটের নিম্ন দিয়া সমুদ্র প্রবাহিত থাকও অসম্ভব নয়। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে মেজর জেমস্ রেনেল গঙ্গা (পদ্মা) ব্রহ্মপুত্র বা মেঘনার সার্ভে উপলক্ষে যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে এই স্থানটির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রায় একশত বৎসর অতীত হইল দক্ষিণ-বিক্রমপুরের এই প্রসিদ্ধ স্থানটি ও তন্নিকটবর্তী গোবিন্দমমঙ্গল, খাগুটিয়া প্রভৃতি গ্রামগুলি নদীপ্রবাহে ভগ্ন হইয়াছে। রেনেলের মানচিত্রে যে সকল প্রাচীন মঠ ও মন্দিরের পরিচয় আছে তাহাতে খাগুটিয়ার একটি মঠ, রাজনগরের দুইটি মঠের ও একটি জলাশয়ের চিত্র এবং জপ্‌সার একটি মঠের চিত্র আছে। জপ্‌সার মঠটির পাশে লেখা রহিয়াছে, Japsa pagoda seen in both rivers. এই মঠ পদ্মা ও মেঘনা হইতে দেখা যায়।

এতদ্ভিন্ন উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরের নিম্নলিখিত স্থানগুলি কীর্তিনাশা দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। রাজনগর, জপ্‌সা, তারপাশা' রুপটা, ভোজেশ্বর, লড়িকুল, কানারগাঁ, আকসাইল, সোনারদেউল, গঁজনাইপুর, পোড়াগাছা, মুলপাড়া, মূলনা, দেভোগ, খিলগাঁ, খারচাকা বক্‌সিবাজার, রাজপাশা, রাউতপাড়া, পশ্চিমপাড়া, নারিকেলতা, পশাইল, কান্দাপাড়া, রনক, নবিপুর, শ্যামপুর, বিলাসপুর, আমবাড়িয়া, দক্ষিণ-সিমলিয়া, পারগাঁ, গাঁগেরজোড়া, দিয়াপাড়া, হাসেরকান্দি, চণ্ডীপুর, বউলাসার, হাতার-ভোগ, গোপালপুর, মজগুন্নী, ছয়পাড়া, গোকুলগঞ্জ, গোড়াইল, করণগাঁ, মাইজপাড়া, বাসগাঁ, একান্দল, লক্ষ্মীপুরা, সাড়া, দগরি, আকিয়াধল, কাউলিপাড়া, বহর, কোমরপুর, দিঘিরপার, বাহেরক, বেহেরপাড়া প্রভৃতি বহু গ্রাম পদ্মার পা কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে ও হইতেছে। কাজেই এখনও যথার্থভাবে প্রত্যেক গ্রামের নাম বলা সুকঠিন।

বিক্রমপুরের গ্রামের নাম-রহস্য ও নাম পরিবর্তন—আমাদের দেশের গ্রামের নামোৎপত্তির ইতিহাস অনেক স্থলেই অজ্ঞাত ; এবিষয়ে কাল্পনিক সিদ্ধান্ত ব্যতীত কোনও কোনও স্থলে প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হওয়া অসম্ভব। একটা কিছু অর্থ ব্যতীত গ্রামের নাম

হয় না। কালে লোকমুখে শুদ্ধ নাম বিকৃত ও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তখন নামের অর্থ পাওয়া দুষ্কর হয়, নাম একটা সংকেত মাত্র হয়। এমন গ্রামও আছে, যাহার জন্ম অবজ্ঞায়, নামও ঘৃণায় বিকৃত, কিন্তু পরে শুদ্ধ ও সংস্কৃত হইয়াছে। (২) বিক্রমপুরের গ্রামের নাম এইভাবে নির্দেশ করায় অনেকেরই গ্রামের নামোৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিবে। সেইভাবেই কতগুলি গ্রামের নাম লিখিলাম। যথা ঃ—

গ্রাম হইতে গাঁ বা গাঁও—বালিগাঁ, মাইজগাঁও, শাসনগাঁও, দণ্ডগাঁও, কুড়িগাঁও, বেজগাঁও, পানগাঁও, কামারগাঁও, ব্রাহ্মণগাঁও, খিলগাঁও, গারুড়গাঁও, বিদগাঁও, বান্দেগাঁও, বড়সাতগাঁও, থৈরগাঁও, চাঁদগাঁও, দিয়াগাঁও, ছয়গাঁও, আটিগাঁও, পাঁচগাঁও, তিনগাঁও, হাজিগাঁও, ক্ষয়গাঁও ও পাড়াগাঁও।

নগর—রাজনগর, রাজানগর, নগর, শ্রীনগর, সেকেরনগর, বা (শেখরনগর) মালখাঁনগর, গিরিনগর, বলাইনগর, কানাইনগর, নয়ানগর।

সং দ্বীপ—মূল অর্থ দুইদিকে জল-বেষ্টিত ভূমি। চারিদিকে জল-বেষ্টিত হইলেও দ্বীপ। —পাশের ভূমি হইতে উচ্চ হইলেও দ্বীপ, এই প্রকার দ্বীপকে হিন্দীতে টিবা, বা টিলা বলে। বিক্রমপুরের 'দী' ও 'দীয়া' শব্দান্তক গ্রামসমূহ ঐ সকল দ্বীপের অস্তিত্ব প্রদান করিতেছে। যথা ঃ—

হলদিয়া, রাজদিয়া, কাঠাদিয়া, মালপদিয়া, কাঁচাদিয়া, পাউলদিয়া, রাণাদিয়া, ভোগদিয়া, বাইদিয়া, গোবরদি, শিয়ালদি, চামারদি, বিবনদি, আলদি, বয়রাগাদি, চিকনদি, কাকদি অজদি', পরাশরদি, মরিচাদি, রাউদিয়া, তিলরদি, দুশলদিয়া, শ্যামসিদ্দি, ভোজদিয়া, সিন্দুরদি, পাচলদিয়া, রামকৃষ্ণদি, লতপদী, রাজাদিয়া কাকালদিয়া, থরিয়া, ভোগদিয়া ইত্যাদি।

পর (সং) যথা—ভবানীপুর, শ্রীপুর, ধীতপুর, কাদিপুর, সমসপুর, চৈতপুর, ইছাপুর, বাপুর, কুসুমপুর, কমলাপুর, মামুদপুর, মজিদপুর, সিলিমপুর, ষোলপুর, তন্তিপুর, গৌরীপুর, লক্ষ্মীপুর, খিজিরপুর, ধীপুর, সৈদপুর, কুমুদপুর, মধুপুর, সুয়াসপুর, গোবিন্দপুর, শিবরামপুর, তাজপুর, শিকারপুর, সোন্দলপুর, গোপালপুর, মোহনপুর, ঘনশ্যামপুর, আলমপুর, শ্রীধরপুর, লস্করপুর, মামুদপুর, বিনোদপুর, উত্তররায়পুর, দক্ষিণরায়পুর, দেবীপুর, রাজপুর, কামারপুর, কাজলপুর, মসিমপুর, মহিষপুর, ক্ষুদিদাদপুর।

সার—সাগর, সায়র, বিক্রমপুরের প্রত্যেক গ্রামেই দিঘির সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। ইহার কারণ বিক্রমপুরের ন্যায় নিম্নস্থানে লোকালয় গঠনোপযোগী উচ্চভূমির অভাবমোচনার্থ এককালে বহুসংখ্যক জলাশয় খনিত হইয়াছিল। এই জলাশয়গুলি এতদঞ্চলে 'সার' নামে খ্যাত। সার নামে বিক্রমপুরে বহু গ্রামে নামোৎপত্তি হইয়াছে। যথা—কনকসার, মহীসার (মাঐসার), জৈনসার, দেওসার, পঞ্চসার, নন্দনসার, সামন্তসার, বেজনিসার, কাকইসার, কান্দনিসার, গণাইসার, ঘড়িসার, পণ্ডিতসার, অনন্তসার, মিঠুসার, ফেগুণাসার, পৌসার, কৈবর্তসার, মামাসার,[১৬] ইত্যাদি।

পাড়া—(সং পাটক) গ্রামের অর্ধভাগের নাম পাটক (হেমচন্দ্র) পাট হইতে ওড়িয়া, মারাঠি, দ্রাবিড়ি, পেট-প্রায়ই বাণিজ্যস্থান। পল্লী হইতে পাড়া নহে। পাড়াগাঁ পাটক ও গ্রাম। পল্লী-ক্ষুদ্রগ্রাম (মেদিনী) পল্লী-গ্রাম-পল্লী ও গ্রাম।

পাইকপাড়া, পুরাপাড়া, কাজিপাড়া, সাপাড়া, তেলিপাড়া, মধ্যপাড়া, নাহাপাড়া, সুরপাড়া, বড়ওপাড়া, পশ্চিমপাড়া, দ্বীপাড়া, কর্কটপাড়া, কুশারিপাড়া, বেহেরপাড়া, আটপাড়া, আরধিপাড়া, গাউপাড়া, হাটেরপাড়া, চারিপাড়া, দামপাড়া, ভাটপাড়া, করপাড়া, নপাড়া, পুরাপাড়া চৈতপাড়া, হরপাড়া, রসিতপাড়া, পোটাপাড়া, সুয়াপাড়া, মাইজপাড়া, রাড়িপাড়া, কান্দাপাড়া, খালপাড়া, কালিঙ্গিপাড়া, গণকপাড়া, কোলাপাড়া, খিদিরপাড়া, আবিরপাড়া।

তলা—(সংতল অধোভাগ-তলি) তালতলা, চাচইতলতা, বেলতলি, কাঁঠালতলি, ঘোলতলি, চাপাতলি, বৌলতলি, ছাইতানতলি, নিমতলি, আমতলি ইত্যাদি।

চর—(চড়াভূমি নদীর মধ্যে কিংবা পরে উত্থিত ভূমি) মূল-চর, চরডুমরখোলা, তিপিরচর, ইমামচর, চরবিশ্বনাথ, সাতুরচর, চরমর্দন ইত্যাদি।

খাল—(সং খল্ল-গর্ত, কিংবা সংখাত-খাই খাল ও খালা ব্যুৎপত্তিতে এক। খালবিশিষ্ট স্থান-খালি)—কেউটখালি, গোয়ালখালি, বারৈখালি, রাড়িখাল, খালপাড়, তুলসীখালি, কুমারখালি, মহেশখালি ইত্যাদি।

গঞ্জ—(সংগঞ্জ আকর, মদিরাগৃহ হেমচন্দ্র) (ফার্সীগঞ্জ অর্থে বাণিজ্য স্থান) মুন্সিগঞ্জ, ধর্মগঞ্জ।

কান্দ কান্দি—(স্কন্ধ শাখা হইতে) ভূমিখণ্ডের শাখা কান্দি।—বিক্রমপুরের কতক গ্রামের নাম কান্দা বা কান্দি নাম সংযুক্ত উহার অপর অর্থ নদী তীরস্থ উচ্চভূমিকেও বুঝায়। যথাঃ—বীরকান্দি, বেহারকান্দি, গোরকান্দা, ষোলকান্দা ইত্যাদি।

হাট বা হাটি—(সং-হট্ট) যথা—নাগেরহাট, গদিহাট, মুন্সিরহাট, মাকুহাটি, সেনহাটি, সিংহেরহাটি, রানীহাটি, বেজেরহাটি, জগন্নাথহাটি, কোরহাটি ইত্যাদি।

বাটি-বাড়ি—(সং আবৃতস্থান, ঘেরা বা জায়গা বাট-প্রাচীর। প্রাচীরবেষ্টিত স্থান ও বাট ও বাটি) বাটি হইতে বাড়ি যথা—রাজাবাড়ি, বল্লালবাড়ি, কেদারবাড়ি, দেউলবাড়ি, টংগিবাড়ি, এতদ্ব্যতীত গড়, চক, বেড়, ঘর, বাজার, খাড়া, কুল, বতী, ঘাট, বন্দ, ভোগ, আ, ইয়া, উয়া, মণ্ডল, বিল, দহ, অল্, আলি ইত্যাদি শব্দ নামের শেষে যুক্ত হইয়া গ্রামের নাম হইয়াছে।

আবার বিক্রমপুরের বহু গ্রামের নাম হইতে উহার মুসলমান প্রাধান্য বুঝা যায়। তাহারও কয়েকটির নামোল্লেখ করিলাম।—যথা—সেরাজাবাদ, সেরাজদিখা, নবীর পুকুর পাড় (নৈরপুকুর পাড়) ইসাপুর, ইছাপুর, কাজিরপাগলা, কাজিরকস্‌বা, কাজিবাড়ি। বান্দেগাঁও, মালখানগর, রাড়িখাল, আলমপুর, তাজপুর, রসুনিয়া, ইদ্রাকপুর (মুন্সিগঞ্জ), মোল্লাবাড়ি, নুরপুর, কাজিকস্‌বা, মীরকাদিম, নগরকস্‌বা, আবদুল্লাপুর, মামুদপুর ইত্যাদি। আবার কয়েকটি গ্রামের নামের মধ্যে বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন কলিকাল, পয়সা, কলিকাতা ইত্যাদি।

বিক্রমপুরের কতকগুলি গ্রামের পুরাতন নামও পরিবর্তিত হইয়াছে। উহা দ্বারা কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ হইয়াছে। পলে প্রাচীন বিলুপ্ত হইয়া ঐ সকল গ্রাম নূতন নাম ধারণ করিয়া একরূপ অপরিচিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কতিপয় গ্রামের নাম এখানে উল্লেখ করিলাম। যথা—কামারখাড়া—স্বর্ণগ্রাম, ফুরসাইল—ফুল্লশালি, চামারদি—চম্পকদি, সোনারটং—সোনাররঙ্গ, মাঐসার—মহীসার, সেকেরনগর—শেখরনগর।

আমদানি ও রপ্তানি—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, কলিকাতা, আসাম, পাবনা, ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ, ডিব্রুগড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্বদা বিস্তর পণ্যবাহী বাণিজ্য তরণীসমূহ বিবিধ নদ-নদী অতিক্রম করিয়া পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী এবং ইছামতী প্রভৃতি নদ-নদীতে পতিত হইয়া তথা হইতে বহরের খাল ধনকুনিয়ার খাল, হলদিয়ার খাল এবং মীরকাদিম প্রভৃতি বহু খাল অতিক্রম করিয়া বিক্রমপুরের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

আমদানি—কলিকাতা হইতে সোনা, রূপা, লোহা, কাপড়, ছাতা, জুতা ও মনোহারী দ্রব্য; উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ হইতে ডাইল, গুড় ও ভূষিমাল; গয়া হইতে গুড়; রেঙ্গুন ও চাটগাঁও হইতে ফারাই-কাষ্ঠ ও আতপ তণ্ডুল; আসাম-আলিপুরদুয়ার, ভাতখাওয়া, গৌরীপুর, বিলাসপাড়া, জুগিখোপা, বগ্‌রিবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চল হইতে শাল-কাষ্ঠ ও এণ্ডি, তসর, মুগা প্রভৃতি; বরিশাল ও বাকরগঞ্জ হইতে চাউল, ডাইল, নারিকেল, গুড়, শ্রীহট্ট হইতে মুলিবাঁশ,

কমলা, খলপা, ত্রিপুরা হইতে নারিকেল, সুপারি, চিকনাই, যশোহর, তারপুর, গাজিপুর ও কেশবপুর হইতে চিনি, গুড়; গোয়ালন্দ ও রাণীগঞ্জ হইতে কয়লা ; ডিব্রুগড় ও শিবসাগর হইতে বেত প্রভৃতি বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দরগুলিতে আমদানি হইয়া থাকে।

রপ্তানি—বিক্রমপুর হইতে পিতলের বাসন, জোলার কাপড়, ছিট ও লুঙ্গি, পাট, চামড়া, ঘৃত, মৎস্য ও মৃন্ময় বাসন প্রভৃতি বহুল পরিমাণে বিভিন্ন প্রদেশে রপ্তানি হয় ; লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া, ব্রাহ্মণগাঁ, দিয়াগাঁ প্রভৃতি গ্রামে পিতলের উৎকৃষ্ট বাসন প্রস্তুত হয়, প্রতিদিন লৌহজঙ্গ ষ্টেশন হইতে এই সমস্ত বাসন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। নাগেরহাট ও শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানের কুম্ভকারগণের প্রস্তুত পুতুল জন্মাষ্টমীর মিছিলের সময় ঢাকাতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। এতদ্ব্যতীত মুন্সিগঞ্জের (রামপালের) কলা মূলা ; সেরেজদিঘার পাতক্ষীর ও ঘৃত প্রভৃতি মীরকাদিম ও তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহের পান, যোলঘর, হাসাড়া, শ্রীনগরের ডেঙ্গার কই-মৎস্য পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে রপ্তানি হয়। পূর্বে রামপালের পাটালি-গুড় নানা স্থানে অপর্যাপ্ত পরিমাণে রপ্তানি হইত ; কিন্তু ইক্ষুর চাষ হ্রাস-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এখন উক্ত গুড় দ্বারা স্থানীয় অভাব পূরণ হইতেছে না। দেশীয় কুলুর ঘানিতে অল্পাধিক পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দেশান্তর হইতে গমনাগমন—বিক্রমপুরের বিদেশাগত ব্যবসায়ীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়; ইহারা বিক্রমপুরের বাণিজ্যপ্রধান স্থানে স্থায়ী এবং অস্থায়ীভাবে দোকান করিয়া থাকে।

ফরিদপুর জেলার সাহাগণ বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বন্দরসমূহে স্থানীয় দোকান করিয়া বাতাস ও কদমা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

'বাইদা' বা বেদে নামক একশ্রেণীর পার্বত্য অসভ্যজাতীয় লোক বিক্রমপুরের বাণিজ্য সমূহের নিকট নৌকাযোগে বসবাস করিয়া থাকে, ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয় সম্প্রদায়ই ব্যবসায়ে বিশেষ দক্ষ ; ইহারা হাটে-বাজারে দোকান পাতিয়া এবং 'গাওয়ালে' বহির্গত হইয়া মনোহারী দ্রব্য বিক্রয় করে। ইহারা নদী, খাল, বিল হইতে অপর্যাপ্ত পরিমাণ ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে, ধোপাগণ এই ঝিনুক-দ্বারা চুণ প্রস্তুত করে এবং শিল্পীগণ ইহার দ্বারা বোতাম, চেইন ও নানাবিধ সৌখিন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে।

প্রতি বৎসর শীতের প্রাক্কালে বিক্রমপুরের বন্দরসমূহে পশ্চিম-দেশীয় ধনুকর, চামার, ক্ষৌরকার, মাটিয়াল (যাহার মাটি কাটার কাজ করে) ও বেহারা আসিয়া থাকে; ইহারা শীতের কয়েক মাস নিজ নিজ ব্যবসার কার্য শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়া যায়। মুন্সিগঞ্জ ও লৌহজঙ্গ প্রভৃতি বন্দরগুলিতে পশ্চিমা ক্ষৌরকারগণও সর্বদাই থাকে; পশ্চিম-দেশীয় কুলিগণও সর্বদা বাণিজ্য-প্রধান স্থানে থাকিয়া ব্যবসা চালায়। বেহারাগণ বর্ষার সময় দেশে চলিয়া যায়। ২৫/৩০ বৎসর পূর্বে শ্রীহট্টের নমঃশূদ্রগণ এখানে বেহারার কার্য করিত; এখন আর নমঃশূদ্রগণ আসে না ; পশ্চিম-দেশীয় বেহারা এখন এদেশে কার্য করে।

প্রতি বৎসর বর্ষার সময় কুমিল্লা ও ত্রিপুরা অঞ্চলের বহু সংখ্যক ধীবর, শিং-মৎস্য ধরিবার জন্য বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে আসিয়া থাকে। ইহাদের শিং-মৎস্য ধরিবার প্রণালী এক অভিনব প্রকারের। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'চাই' পাতিয়া যেরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া মৎস্য ধরে সেরূপ কৌশল বিক্রমপুরের ধীবরগণ পরিজ্ঞাত নহে। ইহারা ৩/৪ মাস এই ব্যবসায় করিয়া আশ্বিন মাসে দেশে ফিরিয়া যায়। বিক্রমপুরে ইহারা **'চাইয়া'** বলিয়া পরিচিত।

পারজোয়ার অঞ্চলে নমঃশূদ্রগণ বিক্রমপুরের বন্দর-সমূহ হইতে ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে গহনার বা গহেনার নৌকা পরিচালন করিয়া থাকে। কুলিরা সাধারণত সমস্তই পশ্চিম দেশীয়।

ফসল কাটার সময় বহু সংখ্যক মুসলমান মজুর এইস্থান হইতে পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের ধান কাটিতে যায়।

বিক্রমপুরের কুম্ভকারগণের মৃন্ময় তৈজস-পত্রাদি বোঝাই করিয়া পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে "গাওয়ালে" বা গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিতে বহির্গত হয় ; ইহারা হাঁড়ি পাতিলের বিনিময়ে ধান্য সংগ্রহ করিয়া থাকে ; এখন অন্যজাতীয় লোকেও এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে।

পথ-ঘাট ও যাতায়াত—বাণিজ্য-প্রধান স্থান হইতে ঢাকা, মুন্সিগঞ্জে যাতায়াতের গহেনার নৌকা আছে ; প্রায় প্রত্যেক বন্দরেই সর্বদার জন্য 'কেরাইয়া' বা 'ভাড়াটিয়া' নৌকা থাকে। নদী তীরবর্তী স্থান-সমূহে স্টিমার-স্টেশন বা জাহাজ-ঘাটা আছে; কলিকাতা অঞ্চল হইতে সাধারণত মহাজনগণের মালপত্র, জাহাজ ও নৌকা-যোগেই আসে। সংবাদ প্রেরণের জন্য প্রায় প্রত্যেক বন্দরেই ডাকঘর আছে; তার-ঘরের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। মোট বহিবার জন্য পশ্চিমা কুলি পাওয়া যায়। মহাজনগণের মাল সরবরাহের জন্য "খরার" দিনে ঘোড়া পাওয়া যায়।

ব্যবসায়ী—বণিক, তিলি, কুণ্ডু ও সাহাগণই বিক্রমপুরের প্রধান ব্যবসায়ী। ভাগ্যকুলের কুণ্ডু পরিবার ব্যবসায়ে অর্থশালী হইয়া ক্রোড়পতি হইয়াছেন, ইহাদের নিজেদের কয়েকখানা জাহাজ কলিকাতা হইতে মাল বোঝাই করিয়া পূর্ববঙ্গের বাণিজ্য প্রধান স্থানে যাতায়াত করে।

বিক্রমপুরের এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী আছে, কোনও হাটে-বাজারে বা বাণিজ্য বন্দরে তাহাদের স্থায়ী দোকান নাই। ইহারা, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চল হইতে চাউল, ডাইল, মরিচ, হলুদ, গুড় ও তরিতরকারি প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিয়া কোনও মহাজনের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে, ইহাকে ভাসানি কাজ বলে। আর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী পরিদৃষ্ট হয়, ইহারা গাওয়ালে বহির্গত হইয়া লবণের বিনিময়ে মৌচাক সংগ্রহ করে; পানিয়া, তন্তর ও তন্নিকটবর্তী স্থান-সমূহে উৎকৃষ্ট মধু পাওয়া যায়।

বিক্রমপুরের ধীবরগণের মৎস্যের ব্যবসায় বহু দূরদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, ইহারা পদ্মানদীতে, ধলেশ্বরী ও মেঘনাতে বিবিধ প্রকারের জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরিয়া থাকে।

পৌষমাস হইতে চৈত্র-বৈশাখ মাস পর্যন্ত ইহারা পদ্মার নানাস্থানে 'জগৎবেড়' জাল ফেলিয়া যেরূপভাবে মৎস্য ধরে তাহা দর্শনযোগ্য; এই জাল ৩/৪ মাইল স্থান ব্যাপিয়া ফেলা হয় এবং সপ্তাহকাল ধরিয়া উহার মৎস্য ধরা চলিতে থাকে ; সময় সময় প্রতি বেড়ে ৩/৪ হাজার হইতে ৫ হাজার টাকা মূল্যের মৎস্য ধরা পড়ে। এই সমস্ত মৎস্য সাধারণত কলিকাতাতেই অধিক পরিমাণে প্রেরিত হয়। বর্ষার সময় ধীররগণ ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মা নদীতে ঝড়ের মধ্যেও সুকৌশলে ও অবলীলাক্রমে নৌকা পরিচালনা করিয়া ইলিশ মৎস্য ধরে, তাহা বাস্তবিকই দর্শনযোগ্য। পদ্মার ইলিশ-মৎস্য খুব সুস্বাদু।

হাট ও বাজারের বিবরণ—বিক্রমপুরের হাট ও বাজারগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানে বিশেষ বিশেষ জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বিশেষ বিশেষ হাট, বাজার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, ধানকুনিয়ার হাট, ভাওয়ারের হাট, শ্রীনগরের হাট, সেরেজাদঘার হাট, হাসারার বাজার কচ্ছপ (বা কাউটা) ও ছাগ বিক্রয়ের জন্য ; মুন্সিগঞ্জ, ভীলাকাণ্ডি, করিমগঞ্জ, ভিরুজখাঁ, দেউলভোগ, ইমামগঞ্জ, কেদারপুর প্রভৃতি হাট গরু বিক্রয়ের জন্য ; ভরাকৈর, কলমা ও আরিয়লের হাট নৌকা বিক্রয়ের জন্য ; ধানকুনিয়া, ভাওয়ার ও শ্রীনগরের হাট, ঘাস ও বাঁস বিক্রয়ের জন্য ; খরিয়া ও শিমুলিয়ার হাট কারিকরের কাপড় বিক্রয়ের জন্য ; হলদিয়া, কনকসার, দিঘিরপাড় ও তালতলা প্রভৃতি বন্দরগুলি কাঠ বিক্রয়ের জন্য, শ্রীনগর, লৌহজঙ্গ, শেখেরনগর, দেউলভোগ, ভাওয়ার প্রভৃতি বন্দর, আবগারি জিনিস বিক্রয়ের জন্য এবং হলদিয়ার বন্দর লৌহ ব্যবসায়ের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া, শ্রীনগর, রাজানগর, সেরেজদিঘা প্রভৃতি বন্দরগুলিতে পাট, পাথুরিয়া-কয়লা, লবণ ও কেরোসিন তেলের বিস্তৃত কারবার আছে ; ধানকুনিয়া বিশেষ করিয়া বাঁশ ও ধানের জন্য বিখ্যাত,

আবদুল্লাপুর ও মীরকাদিম বন্দরে আড়তদারি ক্রয়-বিক্রয়ের বিস্তৃত দোকান আছে। পূর্বে রাজানগর, সেরেজাবাদ, ইছাপুরা ও হাঁসাইল প্রভৃতি স্থানে নীলের কুঠি বিদ্যমান ছিল কিন্তু সে সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ভাগ্যকুল, লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া, বহর, হলদিয়া, আবদুল্লাপুর, ফিরিঙ্গিবাজার, রিকিববাজার বা রেকাবিবাজার, মীরকাদিম, মুন্সিগঞ্জ, দিঘিরপাড়, তালতলা ও সেরাজদিঘা প্রভৃতি বন্দরগুলি বিক্রমপুরের মধ্যে প্রধান আমদানি ও রপ্তানির স্থান।

লৌহজঙ্গের ন্যায় বাণিজ্যপ্রধান স্থান, নারায়ণগঞ্জের পর পূর্ববঙ্গের আর নাই ; কিন্তু এই প্রাচীন বন্দরটি বিগত ১৩২৬ সনের মধ্যে বর্ষার জলপ্লাবনে ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মানদীর কুক্ষিগত হওয়াতে সম্প্রতি স্থানান্তরে নূতন বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোমরপুর কাঠের কারবারের একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, এই বন্দরটিও পদ্মারগর্ভে বিলীন হইয়াছে ; এখন কোমরপুর গ্রামের অস্তিত্ব পর্যন্ত নাই। কোমরপুরের সন্নিকটবর্তী উয়াড়ি গ্রামে অল্পদিন যাবত একটি বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কতিপয় বৎসর পূর্বে বহর একটি সমৃদ্ধশালী জনপদ ছিল, এস্থানের চৌধুরীদের দোর্দণ্ড-প্রতাপ ছিল এবং বহর একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান ছিল। এই স্থানটি দশ-বারো বৎসর হয় রাক্ষসী 'কীর্তি-নাশা' নিজ বাণিজ্যপ্রধান করিয়াছে। তালতলার বন্দরটি ধলেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত, কতিপয় বৎসর যাবত ধলেশ্বরীও পদ্মার ন্যায় ভাঙ্গিয়া ইহার আয়তন অনেক খর্ব করিয়াছে।

বিক্রমপুরের প্রায় সমুদয় প্রসিদ্ধ বন্দরগুলিই নদী অথবা খালের পাড়ে অবস্থিত।

পদ্মাতীরে—ভাগ্যকুল, লৌহজঙ্গ বা তারপাশা, দিঘিরপাড় ও বহর।

ধলেশ্বরী তীরে—তালতলা, মীরকাদিম, আবদুল্লাপুর ও মুন্সিগঞ্জ।

ইছামতী তীরে—সেরেজদিঘা বা সেরাজেদিঘা, বাহিরঘাটা ও বাড়েখালি প্রভৃতি বন্দর অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ খালগুলির তীরেও বহু বন্দর রহিয়াছে।

বিক্রমপুর নগরী—রামপাল এক সময়ে বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল, ইহার সমৃদ্ধির সময় এস্থানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ও শিল্পীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট ছিল, অদ্যাপিও তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। যেমন শাঁখারিবাজার, পানহাট্টা প্রভৃতি।

দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক চাঁদ রায় ও কেদাররায়ের রাজধানী শ্রীপুরনগরী ষোড়শ শতাব্দীতে একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যবন্দর ছিল ; বিদেশি পর্যটকগণও তাহাদের স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে শ্রীপুরের উন্নতিশীল বাণিজ্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; শ্রীপুর নৌ-শিল্পের কেন্দ্রস্থান ছিল, এস্থানে একটি পোতাশ্রয় ছিল ; শ্রীপুরে আগ্নেয়াস্ত্র পর্যন্তও নির্মিত হইত। ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম অবস্থায় গভর্নমেন্টের বাণিজ্যশুল্ক আদায়ের অফিস ঐ স্থানে বিদ্যমান ছিল।

মহারাজ রাজবল্লভের রাজনগরে 'রাজসাগর' নামক একটা হ্রদের উত্তর তীরে 'রাজসাগরের হাট' নামক রাজনগরের সুবিখ্যাত বন্দর ছিল। বন্দরের ভিতের বহু রাস্তা এবং নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের দোকান ছিল; সে কালের সভ্যতা এবং রুচি অনুযায়ী এই হাটে সমুদায় দ্রব্যই পাওয়া যাইত। এই বন্দরটি সর্বদাই জনকোলাহল-মুখরিত থাকিত। এসম্বন্ধে পরেও আলোচনা করা যাইবে।

কালীপাড়া (বা কাগুলিপাড়া), নপাড়া প্রভৃতি স্থান এক সময়ে বিশেষ বিখ্যাত ছিল; উহা এখন পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে, উক্ত উভয় স্থানই তৎকালে প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র এবং শক্তিশালী জনপদ ছিল।

ওজন—বিক্রমপুরের সর্বত্র জিনিসের ওজন প্রায় সমান ; স্থানে স্থানে অন্যরূপও দেখা যায়, কিন্তু ৮০ তোলার ন্যূন কোথাও সের ধরা যায় না, তবে পাইকারি ও খুচরা ভেদে

ওজন সাধারণত ৮০, ৮২ এই দ্বিবিধ প্রকারের ; কিন্তু তাহাও সর্বত্র সমান নহে, স্থানে স্থানে ৮২½ আনা, ৮৪½ আনা এবং ৯০ তোলায়ও সের ধরা হয়, সেরেজদিঘা ও মীরকাদিম বন্দরে গুড় ক্রয়-বিক্রয়ের কালীন ৮০ তোলায় সের ধরা হইয়া থাকে। পাইকারি ক্রয়-বিক্রয় কালীনও ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আনীত জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন ওজনের ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে আনীত জিনিসের ওজন সর্বত্র ৮২ তোলায়, কিন্তু কলিকাতা হইতে আমদানি সর্বপ্রকার দ্রব্যই ৮০ তোলায় সের ধরা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পাইকারি ক্রয়-বিক্রয় কালীন কোনও কোনও জিনিসের মণ প্রতি এক পোয়া হইতে আধ সের পর্যন্ত বেশি দেওয়া হয়; ইহাকে 'চলক' বা 'লাভান' বলে ; এবং প্রতি ৫ মণ জিনিসের উপর এক পোয়া বেশি দেওয়া হয়, ইহাকে 'চাইলা' বলে। সুট্‌কি 'সোরা' মাছ বিক্রমপুরের সর্বত্রই ওজন দরে বিক্রীত হয়।

বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর ঃ

পদ্মানদীর তীরে যে সমস্ত হাট ও বন্দর অবস্থিত, সে সকলের মধ্য নিম্নলিখিত স্থান কয়েকটি প্রধান।

ভাগ্যকুল—এস্থানে পাট ও কাঠের আমদানি হয় এবং রপ্তানিও হইয়া থাকে।

যশাইলদা—জোলাদের প্রস্তুত বস্ত্রাদি প্রচুর বিক্রয় হয় এবং কাঠের ব্যবসায়ের জন্যও প্রসিদ্ধি আছে।

মাওয়া—কাঠ ও মুলিবাঁশ বিক্রয় হয়। বাজার ও হাট হিসাবেও প্রসিদ্ধি আছে।

লৌহজঙ্গ—বর্তমান সময়ে ইহা তারপাশা নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। বিক্রমপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। লৌহজঙ্গের প্রাচীন বন্দর কয়েক বৎসর হইল পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে। এখানে পাটের আড়, বেত, খলফা, তৈল, বাঁশ প্রভৃতি বিক্রয় খুব বেশি পরিমাণে হইয়া থাকে। তাছাড়া এখানে মনোহারী দোকান, মিঠাই ও কাপড়ের দোকান, মোজা, গেঞ্জি, সোডাওয়াটারের কল ঔষধালয় ও পুস্তকবিক্রয়ের দোকান আছে। যুগীদের নির্মিত বস্ত্রাদি, করোগেট টিন ও কাঠ এখানে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়।

দিঘিরপাড়—প্রসিদ্ধ হাট। পদ্মানদীর গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই প্রসিদ্ধ বন্দরটি উত্তর দিকে সরিয়া যাইয়া কান্দারবাড়ি ও মূলচর গ্রামের নিকটবর্তী পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ-তীরে অবস্থিত। এই হাটে সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া কাঠ ও মাছ। এখানে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য কলিকাতা অঞ্চলে রপ্তানি হইয়া থাকে। অধুনা ইহার নিকটবর্তী স্থানেই বহর নামক স্টিমার স্টেশন অবস্থিত।

ধলেশ্বরী নদী তীরে—অবস্থিত নিম্নলিখিত হাট, বাজার ও বন্দরগুলি প্রসিদ্ধ ঃ—

তালতলা—প্রসিদ্ধ বন্দর। এখন উহার অধিকাংশ ধলেশ্বরী নদীর কুক্ষিগত হইয়াছে। পাট, কাঠ ও অন্যান্য সমুদয় প্রয়োজনীয় জিনিসই এখানে পাওয়া যায়।

মীরকাদিম—বর্তমান সময়ে উত্তর-বিক্রমপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর। সরিষার তেলের আড়তদারি দোকান এখানে অনেক। কলিকাতার প্রায় সমুদয় তেলের কলের এজেন্সি এখানে রহিয়াছে। তেলের কারবারের শ্রেষ্ঠ বন্দর। এখানে রবি-শস্যের আড়তদারি অনেক দোকান আছে। মীরকাদিমের এই প্রসিদ্ধ বন্দরে লক্ষ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি আমদানি হয়, এখানে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী আছেন। তাহারা নানাস্থানে কারবার করেন।

ফিরিঙ্গিবাজার—প্রাচীনকালে পর্তুগিজ ফিরিঙ্গিদের একটি প্রসিদ্ধ বসতিস্থান ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

মুন্সিগঞ্জ—মহকুমা শহর। প্রাচীন নাম ইদ্রাকপুর। এখানে রামপালের বিবিধ শাকসবজি ও ফল-মূল, কলা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে।

মুন্সিরহাট—এখানে নানা প্রকার শস্যেরও আমদানি হয়। চর অঞ্চলের মুসলমান ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা খুব বেশি হইয়া থাকে।

ইছামতী নদীর তীরে—সেরাজদিঘা প্রসিদ্ধ বন্দর। পাটের আড়ত। পাথুরিয়া-কয়লা, লবণ প্রভৃতির প্রচুর-পরিমাণে আমদানি হয়।

বাড়ৈখালি—এখানে কইমাছ এবং প্রচুর শাক, আলু বিক্রয় হয়।

খালেরপাড়ের হাট-বাজার—হলদিয়া একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। পূর্বে বন্দরটি কালিপাড়ার জমিদারদের অধীনে ছিল। অধুনা ইহা গভর্নমেন্টের অধিকৃত। লৌহ ব্যবসায়, কাঠের থল, জোলাদের কাপড় ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

গয়ালি মাদ্রা—হলদিয়ার এক মাইল দূরে অবস্থিত। মহারাজ রাজবল্লভসেন গয়া যাইয়া গয়ালিদিগকে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন। এজন্য মান্দ্রার সহিত গয়ালি শব্দ সংযোজিত হইয়াছে। রাজবল্লভের তাম্রলিপিখানা এখনও গয়ালিদের নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে। এখান বহু সংখ্যাক 'রিষি' জাতির বাস। ইহাদের সংগৃহীত প্রচুর-পরিমাণে অসংস্কৃত চামড়া প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। এস্থানে আসাম হইতে আনীত শালকাঠের প্রধান বাণিজ্য স্থান।

শ্রীনগর—শ্রীনগর জমিদার বংশের স্থাপয়িতা ইতিহাস প্রসিদ্ধ লালা কীর্তিনারায়ণ শ্রীনগর গ্রামের পত্তন করেন এবং চতুর্দিকে পরিখা খনন করতঃ সুদৃঢ় বাসভান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইহার প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালা তাহার অক্ষয়-কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। শ্রীনগরের হাট প্রসিদ্ধ। এখানে রবি ও বুধবার হাট হয় এবং বহুসংখ্যক স্থায়ী দোকান আছে। এখানে থানা, ডাক ও তারঘর, রেজেস্টারি অফিস ও ফৌজদারি বিচারালয় আছে, একজন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বিচারালয়ের কার্য সম্পন্ন করেন। এখান হইতে ঢাকাতে গহেনা-নৌকা চলাচল করে। পূর্বে এই বন্দরে প্রতি বৎসরে প্রায় ৩১/২ লক্ষ টাকার পাট খরিদ বিক্রয় হইত। এখন তাহা ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে। এস্থান বর্ষায় সর্বদা পণ্যদ্রব্য-পরিপূর্ণ তরণী-সমাকীর্ণ থাকে। শ্রীনগরের "রথের মেলা', প্রসিদ্ধ। শ্রীনগর হইতে একটি রাস্তা মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত গিয়াছে। শ্রীনগর পত্তন করিয়া কীর্তিনারায়ণ স্বীয় বাসভবনের চতুর্দিকে বিপৎকালে আত্মরক্ষার্থে যে চারিটি বুরুজ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার ভগ্নাবিশিষ্ট এখনও বিদ্যমান থাকিয়া লুপ্ত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এই বুরুজে দিবারাত্র সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত থাকিত। কতিপয় বিগ্রহ স্থাপনও তাহার অন্যতম কীর্তি।

দেউলভোগ—মঙ্গলবার ও শনিবার হাট মিলে, গরু বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে আবগারি দোকানও আছে। শ্রীনগর হইতে এ অস্থানের ব্যবধান অতি অল্প মাত্র। এখানে একটি খোঁয়াড় আছে।

ষোলঘর—প্রত্যহ বাজার মিলে, ব্যবসা-বাণিজ্যে এ স্থান তত উন্নত নয়, স্থায়ী দোকান অনেকগুলি আছে। ষোলঘর, বাজারে অনেক কাঁসারির দোকান আছে। এ স্থান হইতে অনেক কাঁসার বাসন অন্যত্র রপ্তানি হয়। এখানে পিতলের বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। রথ ও মনসা পূজার দশমী উপলক্ষে খুব বড় মেলা হয়। এখানে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি অলঙ্কার প্রস্তুতের জন্য অনেক সুনিপুণ শিল্পী আছে। এ স্থানে কালীবাড়ি আছে। জাস্টিস সার চন্দ্রমাধব ঘোষ এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ষোলঘর বিক্রমপুরের একটি দির্ঘিকাবহুল গ্রাম। এই স্থানে উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ডাকঘর আছে। রেনেলের দ্বাদশ সংখ্যক মানচিত্রে এই স্থানের উল্লেখ আছে। এখান হইতে ঢাকাতে গহেনা-নৌকা চলে। ষোলঘরের 'ডাঙ্গার' কই-মৎস্য ও 'কাজিবাড়ি'র আম বাংলাদেশের সর্বত্র প্রসিদ্ধ।

হাঁসাড়া—হাঁসাড়ার বাজার খুব প্রসিদ্ধ। স্থায়ী দোকান অনেক আছে। নিকটবর্তী বহু

গ্রামের লোক হাঁসাড়ার বাজার করেন। মহাত্মা পদ্মলোচন ঘোষ মহাশয় তদীয় মাতার স্মৃতির রক্ষার্থে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া অক্ষয় কীর্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। এখানে উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয় ও ডাকঘর আছে। হাঁসাড়ার আলমগাজির দরগা ও দিঘি খুব প্রসিদ্ধ। চৌধুরীগণের স্থাপিত শিবলিঙ্গ ও পঞ্চরত্নমঠ এতদঞ্চলে বিশেষ খ্যাত।

মোহনগঞ্জ—পাটের গুদাম আছে; হাটও খুব প্রসিদ্ধ। স্থায়ী দোকান-ঘরও কম নয়। ঢাকার গহেনা নৌকা এই বন্দরের নিকট দিয়া যায় ; এজন্য এখানে স্বতন্ত্র গহেনা নৌকা নাই।

রাজানগর—এখানে দুইটি হাট। পাটের ব্যবসায়ই প্রধান ছিল। এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার পাট ক্রয়-বিক্রয় হইত। এখানে ডাকঘর আছে। রাজানগর একটি প্রসিদ্ধ ভদ্রপল্লী।

হলদিয়ার খালের শাখাপ্রশাখা অনেকগুলি; উক্ত শাখা-খালের তীরে যে সমস্ত বন্দর, হাট বা বাজার অবস্থিত আছে; দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের পরিচয় প্রদান করিলাম।

ধানকুনিয়ার খালের তীরে অবস্থিত—(একটি শাখা ধানকুনিয়া বন্দরের ঠিক দক্ষিণ দিক ঘেঁষিয়া পূর্বদিকে চলিয়া গিয়া গাউদিয়ার নিকটে তালতলার খালে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।)

গাউদিয়া—হাট প্রসিদ্ধ; রেনেলের সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্রে এই স্থানটি 'ধাউদিয়া' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে ডাকঘর আছে।

কলমা—এই হাটটি নৌকা বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ ; এই গ্রামের একটি বটবৃক্ষ 'কালাপাহাড় বৃক্ষ' বলিয়া সুপরিচিত ; জনপ্রবাদ এই যে, হিন্দুবিদ্বেষী মোস্লেম সেনাপতি কালাপাহাড় হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ধ্বংস করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়া উক্ত বৃক্ষমূলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন, তদবধি উহা 'কালাপাহাড় বৃক্ষ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয়, ডাকঘর প্রভৃতি আছে।

বেজগাঁয়ের খাল—এই খালটি ঘোড়দৌড়ের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একশাখা বেজগাঁ ও অপর শাখা ভোগদিয়া গ্রাম গিয়াছে।

বেজগাঁ—বাজার প্রসিদ্ধ ; কতকগুলি স্থায়ী দোকানও আছে। এই বন্দরে সহমরণের একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে, উহা **'সতী ঠাকুরুণের মঠ'** বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুন্সিবাড়িতে বহু দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ ও অর্ধভগ্ন মন্দির ইত্যাদি দেখা যায়। এখানে ডাকঘর আছে। এখানে একটি ব্রাহ্মমন্দির আছে, ব্রাহ্মগণ সেখানে উপাসনাদি করিয়া থাকেন। রথ উপলক্ষে এখানে একটি মেলা হয়। মেলায় বহু জনসমাগম হইয়া থাকে।

ভোগদিয়ার খান—পয়সা, মাইজগাঁও প্রভৃতি গ্রাম ভেদ করিয়া খিদিরপাড়ার মধ্যস্থিত বিলের মধ্যে যাইয়া পড়িয়াছে; ইহার পাড়ে ঃ—নিম্নলিখিত হাটগুলি প্রসিদ্ধ।

ভোগদিয়া—সোম ও শুক্রবার হাট মিলে ; ধান বিক্রয়ের প্রধান হাট ; কতকগুলি স্থায়ী দোকানও আছে। এখানে একটি খোঁয়াড় আছে।

খিদিরপাড়া—সপ্তাহে দুই দিন, মঙ্গল ও শনিবার হাট হয় ; এখানে প্রচুর পাট জন্মে। ডাকঘর আছে ; এই গ্রামের বাসুদেব জাগ্রত বিগ্রহ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

তাওয়ারের খালের তীরে—(এই খালটি হলদিয়া বন্দরের পশ্চিম দিক হইতে উৎপন্ন হইয়া শিমুলিয়া, ভাওয়ার প্রভৃতি গ্রাম ভেদ করিয়া পদ্মার নিকট কোমরপুরের খালের সহিত মিলিত হইয়াছে।)

পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে ঃ—

শিমুলিয়া—হাট খুব প্রসিদ্ধ ; সপ্তাহে একদিন,—মঙ্গলবার হাট বসে ; জোলার কাপড় বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্রস্থান। প্রতি হাটবারে কয়েক হাজার টাকা মূল্যের কাপড় বিক্রয় হয়। পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের পাইকারগণ এই হাট হইতে কাপড় ক্রয় করিয়া স্ব-স্ব জেলায় প্রেরণ করিয়া থাকে। এই হাট ভাগ্যকুলের কুণ্ড ও হলদিয়ার পোদ্দারদের অধিকারভুক্ত। শিমুলিয়ার

কৃষ্ণকিশোর পোদ্দার ব্যবসায়ে অর্থশীল হইয়া এতদঞ্চলে খুব খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন ; দাতব্য চিকিৎসালয় ও মধ্য-ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাহার অন্যতম কীর্তি। ইনি একসময়ে খুব প্রতাপশালী ছিলেন। এই হাটের পশ্চিম দিক হইতে একটি ক্ষুদ্র খাল কুমারভোগ ও কাজিরপাগলা গ্রামের মধ্য দিয়া কোলাপাড়া গ্রামে পড়িয়াছে। কালের পাড়ে ছোট-বড় গ্রাম আছে।

ভাওয়ার—রবিবার ও বৃহস্পতিবার হাট হয় ; এই হাট বাঁশ, লটাঘাস ও ছাগ ও কচ্ছপ বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ ; আবগারি দোকানও আছে। এখানে বহুসংখ্যক স্থানীয় দোকান-ঘর আছে, গোয়ালা ও সাহাগণ এই বন্দরের প্রধান ব্যবসায়ী। পদ্মার সন্নিকটে বলিয়া এই হাটে প্রচুর ইলিশ-মৎস্য পাওয়া যায়।

পোড়াগঙ্গার তীরে অবস্থিত— [হলদিয়া বন্দরের উত্তরে সীমাবদ্ধ হইয়া এই খাল নাগেরহাট, জৈনসার, শিলিমপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া তালতলার খালের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে নৌ-বাহনযোগ্য জল থাকে না।]

পশ্চিমদিক হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বদিকাভিমুখে ঃ—[নাগেরহাট, দক্ষিণ-চারিগাঁও, নওপাড়া, ভবানীপুর, জৈনসার, মধ্যপাড়া, আউটশাহি, শিলিমপুর, সুবচনী।]

নাগেরহাট—একটি প্রসিদ্ধ বাজার ; স্থানীয় দোকান আছে অনেক। এখানে জোলাগণ তাঁতে কাপড় প্রস্তুত করে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে উক্ত কাপড় রপ্তানি হয়। রথ উপলক্ষে একটি মেলার অধিবেশন হয়। মাঘীসপ্তমী দিবস একটি মেলা হয়। এই বাজারের পূর্বদিক ঘেঁষিয়া একটি খাল কনকসারের খালের সহিত মিশিয়াছে। এই গ্রামের কুম্ভকারগণ মৃৎ-শিল্প গঠনে সিদ্ধহস্ত; তিলক পালের শিল্পনৈপুণ্যের খ্যাতি প্রবাদ-বাক্যের ন্যায় যথা-তথায় শ্রুত হওয়া যায়। আধুনিক যুগে তাহার অধস্তন পুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ শিল্পের যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহা দেশের গৌরবের বিষয়। প্রসন্ন পালের নামও প্রসিদ্ধ।

দক্ষিণ-চারিগাঁও—হাট প্রসিদ্ধ, মঙ্গলবার ও শুক্রবার হাট মিলে ; ধান্যের প্রধান বাণিজ্য-স্থান। রেনেল তাহার দ্বাদশ সংখ্যক মানচিত্রে এই স্থানকে 'দক্ষিণ-চারগাঁও' বলিয়া লিখিয়াছেন। এখানকার লেবু ও তরিতরকারি দেশ-বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

নওপাড়া—সপ্তাহে দুই দিন বুধ ও শনিবার হাট হয়। এই গ্রাম দক্ষিণ-চারিগাঁও হইতে পাঁচ-সাত মিনিটের ব্যবধান মাত্র। নওপাড়ার পাট উৎকৃষ্ট ; খুব খ্যাতি আছে। এখানে খুব ভাল ফসল উৎপন্ন হয়।

ভবানীপুর—সোম ও শুক্রবার হাট হয়। **মধ্যপাড়া**—রবি ও বুধবার হাট মিলে।

আউটশাহি—দৈনিক বাজার হয়। **শিলিমপুর**—হাট প্রসিদ্ধ ; নিকটবর্তী বহু গ্রামের লোক এই হাটে আসে। এখানে কতকগুলি স্থায়ী দোকান আছে।

সুবচনী—হাট প্রসিদ্ধ। এইখানে প্রতি বৎসর একটি মেলাও হইয়া থাকে। কুকুটিয়ার খালের ধারে অবস্থিত। গয়ালি-মান্দ্রার পূর্বদিক হইতে উৎপন্ন হইয়া কুকুটিয়া গ্রামের মধ্যে যাইয়া মিশিয়াছে।

কুকুটিয়া—দুইটি হাট ; একটি পুরাণ হাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ডাকঘর ও উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয় আছে। কুকুটিয়ার বুড়াশিবের বাড়ি প্রসিদ্ধ। অনেক লোক দর্শনার্থে আসে।

কাজিরপাগলার খালের পারে অবস্থিত। গয়ালি-মান্দ্রার পশ্চিম হইতে উৎপন্ন হইয়া গ্রামের মধ্যে গিয়াছে।

কাজিরপাগলা—বাজার প্রসিদ্ধ ; স্থানীয় অনেক দোকান আছে। সাহাগণই প্রধান ব্যবসায়ী। উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় আছে। এখান হইতে ঢাকা মুন্সিগঞ্জে গহনা-নৌকা যায়।—এখানকার বাজারে স্থায়ী দোকানও আছে।

কোলাপাড়া বা ঘোষের কোলাপাড়া—গ্রামে দুইটি হাট মিলে। গ্রামের উত্তরভাগকে কোলাপাড়া এবং দক্ষিণ অংশকে ঘোষের কোলাপাড়া বলা হয়।

সমাসপুর—কয়েক বৎসর যাবত একটি নূতন হাট জমিয়াছে ; এখানে কেবল মুসলমানের বসতি। মুসলমানেরা বেশ উৎসাহের সহিত ইহার উন্নতিকল্পে যত্নবান্।

নাগরভাগের খালের পারে অবস্থিত—গয়ালি-মান্দ্রার মাইল দেড়েক উত্তরে যাইয়া একটি শাখা নাগরভাগ গ্রামের মধ্যে মিশিয়াছে। নিম্নলিখিত হাট ও বাজার প্রসিদ্ধ।

নাগরভাগ—সোম ও শুক্রবার হাট মিলে, দুধ, মাছ, তরিতরকারি প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। এ গ্রামে বহু ব্রাহ্মণের বসতি। শিক্ষিত পল্লী।

শেখেরনগরের খালের তীরে অবস্থিত—পুটিমারার নিকট হইতে এক শাখা শেখেরনগর গ্রামের পার্শ্ব দিয়া ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

শেখেরনগর—হাট প্রসিদ্ধ। দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে ; ডাকঘর আছে। রেনেলের দ্বাদশ ও ষোড়শ সংখ্যক মানচিত্রে এস্থানের উল্লেখ আছে, তিনি এই স্থানকে 'সখিনগর' বলিয়া লিখিয়াছেন। এ গ্রাম বিক্রমপুরের একটি উন্নত পল্লী।

তালতলার খালের তীরস্থ বন্দর—এই খাল ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া মালখাঁনগর, বালিগাঁও প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বহরের নিকট পদ্মার সঙ্গে মিশিয়াছে। একটি প্রকাণ্ড ইটের পুল, খালের উপরের প্রধান কীর্তি।

রায়পুরা—এই বন্দরটি খাস গভর্নমেন্টের পত্তনে; পাট ক্রয়-বিক্রয়ের বাণিজ্য স্থান ; এই বন্দরটি তালতলার খুব নিকটে। এ গ্রামে প্রাচীন কীর্তি আছে।

বালিগাঁও—হাট প্রসিদ্ধ ; রেনেলের সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্রে এই স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ডাকঘর আছে। হাটটিরও বেশ খ্যাতি আছে।

গৌরগঞ্জ বা দহরি—মীরকাদিমের খালের তীরস্থ বন্দর।—এই খাল রিকাবিবাজারের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ধলেশ্বরী নদী হইতে উৎপন্ন হইয়া মোকামখোলা নামক স্থানে মাকুহাটির খালের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই খালটিরও বোধহয় সেনবংশের কোনও রাজা খনন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না।

টংগিবাড়ি—হাট প্রসিদ্ধ, পান ও তরকারি প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। এখানে থানা ও ডাকঘর আছে। এই গ্রামটিতে অনেক প্রাচীন কীর্তি আছে।

মীরকাদিমের খালের শাখা-প্রশাখা অনেকগুলি, উক্ত শাখা-খালের পারে যে সমস্ত বন্দর, হাট বা বাজার আছে তাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মাকুহাটির খালের তীরবর্তী বন্দর—এই খালটি টংগিবাড়ির মাইলখানেক দক্ষিণে মীরকাদিমের খাল হইতে উৎপন্ন হইয়া মাকুহাটি গ্রাম ভেদ করিয়া পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদে মিশিয়াছে।

কাটাখালি—এখানে অনেকগুলি পাটের গুদাম আছে। পূর্বে প্রায় চার-পাঁচ লক্ষ টাকার পাট বিক্রয় হইত। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ ও কাটাখালি খালের সঙ্গম-স্থানে অবস্থিত।

মাকুহাটি—সেরেজাবাদ ঃ

মাকুহাটি—এখানকার বাজার ও হাট প্রসিদ্ধ ; বন্দরে অনেক স্থায়ী দোকান আছে। রেনেলের সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্রে এই স্থানের উল্লেখ আছে। উহাতে বানান করা হইয়াছে Maquady। একসময়ে এখানে প্রচুর-পরিমাণে তাঁতের 'মাকু' বিক্রয় হইত। 'মাকু' বিক্রয়ের হাট বলিয়া ইয়া মাকুহাটি নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এই হাটটির অবস্থান বড় সুন্দর। মাকুহাটির খাল ও ব্রহ্মপুত্র নদ যেখানে মিলিত হইয়াছে, ঠিক তাহারই সংযোগস্থলে এই হাটটি অবস্থিত। নদীর অপর পার, চর অঞ্চল হইতে এখানে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

সেরেজাবাদ—রেনেলের মানচিত্রে Sarajabad এইরূপ লিখিত আছে। সাধারণত এই স্থানের স্থানীয় জনসাধারণ সেরেজবাদ এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। হাটটি প্রসিদ্ধ ; এক সময়ে এখানে নীলের কুঠি ছিল। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সুধারাম বাউলের আখ্ড়া উল্লেখযোগ্য। **পুরা বা পুরুয়া** গ্রামে একটি নূতন হাট বসিয়াছে। সেরেজাবাদ ও পুরুয়া এই দুইটি গ্রামই পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত।

আরিয়ালের খালের পারে অবস্থিত বন্দর : (মীরকাদিম ও মাকুহাটি খালের সঙ্গমস্থল হইতে উৎপন্ন)।

আরিয়ল—নৌকা বিক্রয়ের প্রসিদ্ধ হাট ; এখানে পূর্বে প্রচুর-পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হইত, এখনও কাগজ তৈরি হয়। আরিয়লে পাঁচ-ছয় শত মোসলমানের বসতি। কাগজ প্রস্তুতকারক বলিয়া ইহারা 'কাগজি' নামে সুপরিচিত ; এখন ইহারা বঙ্গের নানাস্থানে দপ্তরির কার্য করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেছে। এখানে ডাকঘর আছে।

সোনারঙের খালের পারে অবস্থিত : (মীরকাদিমের খালের শাখা)

সোনারঙ—একটি বাজার ; ডাকঘর ও তার অফিস আছে। উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয়, এবং দুইটি প্রাচীন দেউলবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। সোনারঙের যুগ্মমঠ দর্শনযোগ্য। পূর্বে এখানে একটি মুদ্রাযন্ত্র ছিল। এখানে চৌদ্দহাজারি নামক একটি পল্লী আছে।

দইধার মার বাজার—শাখা-খালের পারে এই বাজারটি অবস্থিত। এখানে নিয়মিতভাবে বাজার মিলে।

ভীরুজখাঁর খালের তীরস্থ হাট ঃ

সানিহাটি গ্রামের পশ্চিম দিক হইতে আরম্ভ হইয়া ভাওয়ারের হাটের দক্ষিণপ্রান্ত ঘেঁষিয়া কোমরপুরের খালে মিশিয়াছে।

ভীরুজখাঁ—গরু বিক্রয়ের প্রসিদ্ধ হাট ; এখানে খোঁয়াড় আছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খালের তীরস্থ বন্দর বা হাট-বাজার :

হাঁসাইল—হাট প্রসিদ্ধ ; এক সময়ে নীলের কুঠি বিদ্যমান ছিল ; ডাকঘর আছে।

ভরাকৈর—স্বনামপ্রসিদ্ধ খালের তীরে অবস্থিত। ডিঙিনৌকা বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। ডাকঘর আছে। ভদ্রপল্লী। বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস।

কামারখাড়া—বাজার আছে। গৃহীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

বজ্রযোগিনী—মীরকাদিমের একটি শাখা-খালের তীরে অবস্থিত ; বাজার প্রসিদ্ধ। একটি প্রাচীন স্থান। এই গ্রামে বহু প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থানেই বৌদ্ধতান্ত্রিক অদ্বিতীয় জ্ঞান দীপঙ্করশ্রীজ্ঞান অতীশ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে তার ও ডাকঘর আছে। উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয়ও রহিয়াছে। ইহা প্রাচীন রাজধানী বিক্রমপুরের (রামপালের) অন্তর্ভুক্ত।

সানিহাটি—পদ্মা হইতে উৎপন্ন শাখা-খালের তীরে অবস্থিত ছিল ; এখানে তিনটি বাজার মিলিত। দরজি, লোহা, কাপড়, ডাইল ও চাউলের স্থায়ী দোকান ছিল। এখানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল এই গ্রাম পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে।

বড় রাস্তা কিংবা গ্রামের ভিতর যে সমস্ত বন্দর বা হাট-বাজার :

ব্রাহ্মণগাঁও—লৌহজঙের সন্নিকটবর্তী ; এইখানে পিতলের বাসন প্রস্তুত হইত। অনেক কাঁসারির বাস ছিল। প্রত্যহ বাজার মিলিত। কয়েকখানা স্থানীয় দোকানও ছিল। ব্রাহ্মণগাঁয়ের ঘোষবাবুরা একসময়ে খুব প্রতাপান্বিত ছিলেন। ইহাদের নির্মিত 'ঠাকুরদালাল' বা 'দুর্গামণ্ডপ' একটি দেখিবার জিনিস ছিল। এখানে উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয় ও ডাকঘর ছিল। কয়েক বৎসর হইল ইহা পদ্মাগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে।

কুমারভোগ—চন্দ ভূমধ্যধিকারীগণ এই বাজারের স্থাপয়িতা, হলদিয়ার মাইলখানেক পশ্চিমে অবস্থিত, এখানে চাউল, ডাল, কাপড় প্রভৃতির স্থায়ী দোকান আছে।

মাইজপাড়া—শ্রীনগর থানার অন্তর্গত, সোম ও শুক্রবার হাট হয়, হাট প্রসিদ্ধ ; মাইজপাড়ার কালীবাড়ি প্রসিদ্ধ। ডাকঘর আছে। এখানে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। রথ উপলক্ষে এখানে একটি মেলার অধিবেশন হয়।

রাড়িখাল—বাজার হয়। রেনেলের দ্বাদশ সংখ্যক মানচিত্রে এই স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও ডাকঘর আছে।

বাসাইল—খালের ধারে গ্রাম। এখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস। অনেক টোল আছে, এজন্য এস্থানকে টোলবাসাইলও বলে। ডাকঘরের মোহরে শেষোক্ত নামই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাজার প্রসিদ্ধ। রেনেলের দ্বাদশ সংখ্যক মানচিত্রে বাসাইলের উল্লেখ আছে।

বীরতারা—শ্রীনগরের সন্নিকটে। রবি ও বৃহস্পতিবার হাট মিলে। চৈত্র সংক্রান্তিতে একটি বড় মেলার অধিবেশন হইয়া থাকে। এখানে ডাকঘর আছে। প্রতিদিন বাজারও বসে।

সিংপাড়া—বাজার প্রসিদ্ধ, অনেক স্থায়ী দোকান আছে। শ্রীনগর হইতে যে সড়ক মুন্সিগঞ্জ গিয়াছে তাহার পার্শ্বে অবস্থিত।

ইছাপুরা—তালতলা হইতে যে রাস্তা শ্রীনগর গিয়াছে তাহার পার্শ্বে কয়েকখানা স্থায়ী দোকান আছে। নিত্য-প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যই মিলে। এখানে ডাক ও তার অফিস, উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয় আছে। এক সময়ে এখানে নীলের কুঠি বিদ্যমান ছিল।

তন্তর—শ্রীনগর থানার অন্তর্গত। বাজার প্রসিদ্ধ। অনেক স্থানীয় দোকান আছে। এখানে ঘানিতে উৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুত হয়।

বিবন্দি—পূর্বে এখানে হাট মিলিত ; এখন বাজার হয়। এ-গ্রামের বাসুদেব প্রসিদ্ধ। পুরোহিত-বাড়িতে রজত-নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি পূজিত হইয়া থাকে। এখানে অল্প-দিন-যাবত ডিস্ট্রিক্টবোর্ডের একটি পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে।

ইমামগঞ্জ—শ্রীনগর থানায় ; গরু বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

বেজেরহাটি—রসুনিয়ার সন্নিকটবর্তী গ্রাম। হাট প্রসিদ্ধ।

তারাটিয়া—লৌহজঙ্গের সন্নিকটবর্তী ; বাজার প্রসিদ্ধ।

ভীলাকান্দি—রাজাবাড়ির থানার অন্তর্গত ; গরু বিক্রয়ের প্রসিদ্ধ হাট।

করিমগঞ্জ—রাজাবাড়ি থানায়, (বর্তমান দিঘিরপাড়) গরু বিক্রয়ের হাট।

পঞ্চসার—মুন্সিগঞ্জের অনতিদূরে ; বাজার মিলে ; গুড় প্রস্তুত হয় ; প্রচুর পান উৎপন্ন হয়।

খালিপাশা—মুন্সিগঞ্জের সন্নিকটে ; হাট হয়। পান, তরিতরকারি প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য।

গারুরগাঁও—হাট হয়।

দক্ষিণ বিক্রমপুরের হাট, বাজার ও বন্দর :

চিকন্দি—এখানে গব্য-ঘৃত এবং ক্ষীরের আমদানি প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। গঙ্গানগরের ক্ষীর ও ঘৃতের খ্যাতি আছে।

পণ্ডিতসার—বাজারে পুস্তকের দোকান। প্রেস এবং কাঠের 'থল' রহিয়াছে। এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাস।

পালং—প্রসিদ্ধ হাট ও বাজার। এখানে অনেক দোকান-পসারি, কাঁসারিদের দোকান, মনোহারী দোকান ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্যাদির আমদানি হইয়া থাকে।

কাঞ্চনপাড়া—এখানে ধান, চাউল, খেজুর-গুড়ের প্রচুর আমদানি ও রপ্তানি হইয়া থাকে।

মাঐসার বা মহীসার—শ্রীশ্রী ৺দিগম্বরীতলা তীর্থস্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ। এখানে সপ্ত-দিবসব্যাপী একটি মেলা হয়।

সেনের বাজার—খেজুরিগুড় বিক্রয়ের জন্য বিখ্যাত।

বুড়িরহাট—বিক্রমপুরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। এই হাটে গরু, নৌকা, উলুখড়, ঘাস ইত্যাদির খুব বেশি বিক্রয় হয়।

নরিয়া—প্রসিদ্ধ হাট ও বন্দর। দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্যে ইহা একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে বহু ধনী ব্যবসায়ীর বাস।—প্রাচীন, নরিয়ার, সীমা, দৈর্ঘ্যে—উত্তরে আরাফুলবাড়িয়া হইতে দক্ষিণে খৈয়ারবিল পর্যন্ত অনুমান পাঁচ-ছয় মাইল ও পশ্চিমে মূলপাড়া হইতে পূর্বে কেদারপুর ও চণ্ডীপুরের পশ্চিম অর্থাৎ, বর্তমান মূলফৎগঞ্জের খালের পশ্চিম পাড় পর্যন্ত অনুমান সাড়ে তিন মাইল। রেনেলের মানচিত্রের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে—বর্তমান সময়ে প্রাচীন নরিয়ার আটভাগের একভাগ মাত্র ভূমি আসলিতে অবশিষ্ট আছে, বাকি সকলই পদ্মার চরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। নরিয়ার ঘটকবংশীয়দের প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ। উহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।—উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর প্রাকৃতিক বিপ্লবে, নানাভাবে দিন-দিনই বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে, তাহার ফলে হাট-বাজার ও বন্দরের, নানারূপ রূপান্তর ও স্থানান্তর ঘটিতেছে। কাজেই স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের প্রসিদ্ধিরও হ্রাস পাইতেছে।

১. মহাভারতে লিখিত আছে—মহারাজা বলি দীর্ঘতমা নামক মহর্ষির ঔরসে স্বীয় পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে পঞ্চপুত্র লাভ করেন। উহাদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। ইহাদের নামে পাঁচটি দেশের নাম হইয়াছে। দীর্ঘতমা বেদোক্ত বিখ্যাত ঋষি। দীর্ঘতমা সুদেষ্ণা দেবীকে বলিতেছেন ঃ

"অঙ্গ বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মাশ্চ তে সুতাঃ
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি।
মহাভারত, আদিপর্ব, ১০৪/৫০

এই আখ্যানটি পরবর্তীকালে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়!

মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত, দুর্যোধনের সাহায্যে গিয়াছিলেন। বাংলার অধিবাসী তাম্রলিপ্ত, পৌণ্ড্র, মৎস্য প্রভৃতির লোকেরা সে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। তাহারা অনার্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। বাংলা সে সময়ে অনার্য ভূমি। এবিষয়ে পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

২ গৌড়রাজমালা—১-২ পৃষ্ঠা—রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত।

McCrindle's Invasion of Alexander the Great (Westminister, 1893). McCrindles Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian (Calcutta, 1877). McCrindles Megas-thenes P.P. 33-34.

We learn from the Classical writers that the country of Gangaridae, i.e., Bengal, formed a part of the dominions of the king of the Prasi, i.e., Magadha, as early as the time of Agrammes, i.e., the last Nanda King. A pasage of Pliny clearly suggests that the 'Palibothri' dominated the whole tract along the Ganges. That the Magadhan kings retained their hold on Bengal as late as the time of Asoka is proved by the testimony of the Divyavadana and of Hiuentsang who saw stupas of that monarch near Tamralipti and Karnasuvarna (in West Bengal), in Samatata (East Bengal) as well as Pundravardhana (North Bengal) Kamrupa (Assam) seems to have lain outside the empire. The Chinese pilgrim saw no monument of Asoka in that country. Political History of Ancient India by Dr. H. C. Roy Chowdhury, M.A., Ph.D. Page 210-11.

৩. বৌদ্ধযুগের ভূগোল—৪২ পৃষ্ঠা। ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম. এ, বি. এল, পি. এইচ. ডি.।

৪. Imperial Gazetteer of India P. 360. 'বান্ধব'—ষষ্ঠ খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা, ১২৮৯

৫. Hunter's statistical account of Bengal. P 118.

৬. পল্লীবিজ্ঞান-প্রথমভাগ পঞ্চম সংখ্যা। ১২৭৪। জ্যৈষ্ঠ। ইংরেজি ১৮৬৭, জুন। ঢাকা কলেজের ছাত্র বাবু প্রসন্নচন্দ্র গুহ বিরচিত রামপালের বিবরণ—৯ পৃষ্ঠা।

৭ The Vihara of Vikrampuri, which according to the *Tangyur* was situated in Bengal which is to the west of Magadha *(Vihara de Vikrampuri du Bengale, dans le Magadha oriental)*. appears from the coincidence of names to have been located in Vikrampura of East Bengal (Dacca District) It also appears plausible that both the tract and the Viahara received their names from that of Dharmapala, alias Vikramsila, the only known king of Bengal with the appellation of 'Vikrama' who again had for certain execrised his imperial sway over East Bengal (Indian Culture—Buddhist Viharas of Bengal—Vol 1 No 2. Nalininath Das Gupta Page 230)

ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১, ৯৬২—৯৭০। Phayre's History of Burma P. 138 and J. A. S. B. 1868 P. 107 Patikera-ka is alone responsible for at once reminding one acquianted with the old Bengal ballads, celebrating the doings of king Gopichandra or Govichandra of the city of Patikara in Bengal. * * * Sri Arthur Phayre indentifies it with 'Vikrampura' which was near Dacca.

'দেবকুল' শব্দ হইতে 'দেউল' শব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। 'দেবকুলিকা' শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র দেউল বা মন্দির। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ 'দেবকুলিকা'কে ক্ষুদ্র দেবমন্দির (Small temple) বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।—গৌড়লেখমালা-ধর্মপালদেবের তাম্রশাসন—২৫ পৃষ্ঠা।

৮. ১২৭৬ (১৮৬৯ খ্রিঃ অঃ) সনে রাজনগর কীর্তিনাশায় প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু গভর্নমেন্ট কর্তৃক ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের সার্ভে-ম্যাপেও পদ্মার নামের পরিবর্তে কীর্তিনাশা লেখা আছে। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত Surgeon James Taylor কৃত 'A sketch of the Topography and statistics of Dacca নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিত আছে যে—' The first of these channels, which is represented as the Calligunga in Rennel's Maps, is now Called Kirtinessa, or Seripur river. অতএব বিক্রমপুরের সন্নিকটস্থ পদ্মার নাম 'কীর্তিনাশা' যে রাজবল্লভের রাজনগরের ধ্বংসের পূর্বে চাঁদরায়-কেদার রায়ের কীর্তিনাশ করায় হইয়াছে তাহাই ঐতিহাসিক সত্য।

৯. ঢাকার ইতিহাস—প্রথম খণ্ড, ১৫-১৬ পৃষ্ঠা—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

১০. পল্লীবিজ্ঞান ৫ সংখ্যা ১২৭৪ জ্যৈষ্ঠ। ইংরেজি ১৮৬৭, জুন।

১১. পূর্ববঙ্গের নদী পরিবর্তন—আনন্দনাথ রায়, প্রতিভা, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১৪৬—১৪৮ পৃষ্ঠা। Canalisation in Munshiganj by Mr. F D. Ascoli, I.C.S.

১২. বৃহদ্ধর্মপুরাণ পূর্বখণ্ড ৩১ অধ্যায়ে পদ্মা-গঙ্গা সঙ্গম তীর্থস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

১৩. Tradition states that the Taltola khal was excavated by Raja Raj Ballava in the middle of the 18th century. This is not a fact as the bridge upon it is many years older. If it was excavated by the Raja, it was clearly impossible to keep it open as it was already bolted up by the British Government to allow the passage of large boats in the river. Canalisation in Munshigunj by Mr. F. D. Ascoli, তালতলার পুল সম্বন্ধে জানিতে পারি যে—It is said to have been built by Raja Ballal Sen before the conquest of Bengal by Mahammadans. List of Ancient Manuments in the Dacca. Division Page 26. Published by authority.

১৪. V. Ball-Stone implements found in Bengal. proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1865, p.P.127-28. স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত,—বাংলার ইতিহাস—প্রথম খণ্ড।—৬—৭ পৃষ্ঠা।

১৫. Dacca-The Romance of an Eastern Capital, by F. B. Bradley Birt, Page 16.

১৬. বিক্রমপুর ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। (২) অধ্যাপক রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়বাহাদুর, এম. এ. গ্রামের নামের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিয়াছিলেন। আমরা এখানে তাহারি প্রদর্শিত পন্থানুসারে বিক্রমপুরের গ্রামের নামোৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিলাম। (৩) 'প্রবাসী' ১৩১৭, আশ্বিন। ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা। (৪) শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয় ও 'বিক্রমপুর' পত্রের ৪র্থ বর্ষের ১২শ সংখ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।

কতকগুলি সার বা জলাশয় অদ্যাপি নিজ নামে পরিচিত রহিয়াছে। অধিকন্তু তাহাদের নামের পশ্চাতে একটি দিঘি শব্দ যুক্ত হইয়া গিয়াছে। দশলঙ্গের নাদিমসার দিঘি, শিমুলিয়া-নন্দাইসার দিঘি, বিয়নীয়ার চান্দাসার দিঘি, রানিহাটির কণাসার দিঘি, সোনারঙের জয়ব্রহ্মসার দিঘি, মাঐসারের মীহসার দিঘি ইত্যাদি।

প্রাচীন ইতিহাস



প্রাচীন কথা ঃ

বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথাই সুস্পষ্টভাবে জানিবার উপায় নাই ; বর্তমান সময়ে এ বিষয়ে কিছু কিছু অনুসন্ধান চলিতেছে। স্বর্গত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত 'বাংলার ইতিহাস' দুই খণ্ড ও রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত 'গৌড়রাজমালা' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা এবং গবেষণার পরিচয় রহিয়াছে। বাংলাদেশ নদী-মাতৃক দেশ। এখানকার জলবায়ুর প্রভাবে এবং নদীর গতি পরিবর্তন হেতু এবং ধ্বংসলীলার জন্য প্রাচীন কীর্তি অধিকাংশ স্থানেই বিলুপ্ত-প্রায়। যাহা কিছু ঐতিহাসিক নির্দশন থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহাও বেশিরভাগ মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিহিত। পাহাড়পুরের স্তূপ খনন করিবার পূর্বে কেহ কি কল্পনাও করিতে পারিয়াছিলেন যে, বাংলার এইরূপ ঐতিহাসিক কীর্তি থাকা সম্ভবপর। পাহাড়পুর-স্তূপ ও মহাস্থানগড় খননের ফলে বাংলার ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে বাংলাদেশের বয়স খুব বেশি নহে। তবে কিছুদিন পূর্বে বঙ্গদেশের যে প্রদেশে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেই প্রদেশেই নব্যপ্রস্তর যুগের অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। সর্বপ্রথম সিংভূম জেলায় চাইবাসা নগরে নব্যপ্রস্তর যুগের অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে কাপ্তেন বিচিং (Captain Beching) সিংভূম জেলার চাইবাসা নগরে ও চক্রধরপুরের আটক্রোশ দূরবর্তী একটি নদীতীরে প্রস্তর নির্মিত ছুরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভিন্সেন্ট বল্ এই সমস্ত স্থান পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন যে, আবিষ্কৃত পাষাণখণ্ডগুলি মানব কর্তৃক নির্মিত ও ব্যবহৃত অস্ত্র।[১ক/খ]

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ্—ভারতে তাম্রযুগের কথার আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—In northern India the first metal to become known was Copper. Hundreds of curious implements made of pure Copper have been found in the Central proviences, in old beds of the Ganges near Cawnpore, and in other places from Eastern Bengal to Sind in the Kurram Valley.[২ক/খ] They are supposed to date from 2000 B.C. more or less.

উত্তর ভারতে, মধ্যপ্রদেশে, কানপুরের নিকটবর্তী গঙ্গার প্রাচীন খাতে, পূর্ববঙ্গে, সিন্ধুদেশে এবং করাম উপত্যকায় তাম্রযুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।[৩] পূর্ববঙ্গের কোনওস্থানে তাম্রযুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল, ভিন্সেন্ট স্মিথ তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই।

পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির সীমা ঃ

বাংলাদেশের প্রাচীন পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে বর্তমান সময়ে একটি নতুন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতেছে মহাস্থানগড়ের আবিষ্কৃত ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত একখানি শিলালিখন। মহাস্থানগড় গ্রামটি বগুড়া শহর হইতে প্রায় আট মাইল দূরে অবস্থিত। সেকালের

পৌণ্ড্রবর্ধননগর বর্তমানে মহাস্থানগড় নামে পরিচিত। বগুড়া জেলার করতোয়ার নদী প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের পশ্চিম সীমা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

কয়েক বৎসর হইল বঙ্গদেশের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদক অনেক প্রত্নচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। বগুড়া জেলার মহাস্থান, দিনাজপুর জেলার বাইগ্রাম ও হুগলি জেলার মহানাদ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খনন করিয়া অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই তিন স্থানে যে খোদিতলিপি, মন্দির ও অন্যান্য প্রত্ন-চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় ঐগুলি খ্রিস্টিয় পঞ্চম হইতে সপ্তম খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। ঐ সময় বাংলাদেশ কিরূপ সমৃদ্ধশালী ছিল ইহার দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

মহাস্থানগড়ের প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি ঃ

মহাস্থানগড়ের আবিষ্কৃত ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত শিলালেখখানি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ নভেম্বর বরু ফকির নামে এক ব্যক্তি পাইয়াছিল। সে সময়ে পূর্ব বিভাগের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ জি. সি. চন্দ্র উহা পুরাতত্ত্ব বিভাগের জন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এখন ঐ শিলালিখনখানি কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। শিলালিখনের অক্ষরগুলি মৌর্যযুগের ব্রাহ্মী। এই অনুশাসনটি যে মৌর্যযুগের তাহা নিঃসন্দেহ।

প্রথমত এই লিখনখানির বিষয় 'বঙ্গবাণী' নামক একখানা বাংলা দৈনিকপত্রে এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২২ এপ্রিল তারিখের 'Liberty' নামক ইংরেজি দৈনিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত ডি. আর. ভাণ্ডারকর (D. R. Bhandarkar) এই শিলালেখটির নাম দিয়াছেন 'মহাস্থানের মৌর্য ব্রাহ্মী লেখমালা'[৪] (Mauryan Brahmi Inscription of Mahasthan) এই অসম্পূর্ণ লিপিখানিতে লিখিত আছে—

১। নেন সংবংগীয়ান (গলদনস) দুমদিন—(মহা)
২। মাতে। সুলখিতে পুড্ডনগলতে। এতম্।
৩। নিবহিপয়িসতি। সংবংগিয়ান্ (চ দি) নে (তথা)
৪। ধানিয়ম্ (নিবহিসতি) দ (ং) গাতিয়ায়ি কে—দেবা।
৫। তিয়ায়িকসি। সুঅতিয়াইয়কসি পি গংড (কহি)
৬। ধানি (য়ি) কেহি এস কোঠাগালে কোশম্ (ভর)
৭। (নীয়)

1. nena [Sa*] va [m*] giy [a] nam [Galadanasa]| Dumadina—[maha*]
2. mate | Sulakhite Pudangalate | e[ta] m
3. [ni*] vahipayisati | Samva [m*] giyanaam [cha di*] ne [tatha*]
4. [dha*] niyam | nivahisati | da [m*] g [a*] tiyay [i*] k [e] d [eva*]
5. [tiya*] [yi] kasi | su-atiyayika [si] pi gamda [kehi*]
6. [dhani*] [yi] kehi esa kothagale kosam [bhara*]
7. [niye].

অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, মহাস্থানলিপি যে সময়ে প্রচারিত হয়, সে সময়ে সাধারণে উক্ত লিপি ব্যবহার করিতে জানিতেন। রাঢ়ি-বাংলায় ব্রাহ্মীলিপি বিশেষ প্রচলিত ছিল। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের লিপি প্রায় উক্ত প্রকার। শুশুনিয়া শৈল-লিপি বাঁকুড়া জেলায় (বর্তমান) দামোদর তীরবর্তী পোখনার (পুষ্করণানগরী) রাজা চন্দ্রবর্মা কৃত লিপি। এই চন্দ্রবর্মা ছিলেন প্রাচীন শূরভূমরাজ। পুষ্করণা-প্রভু চন্দ্রবর্মার সময়ে শূরভূম ও

মল্লভূম পুষ্করণা নামে খ্যাত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। চন্দ্রবর্মা ছিলেন প্রাচীন বাঁকুড়া (পুষ্করণা রাজ্যের) জেলার প্রধান রাজা। তাহার সহিত মাড়বারের সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় না। তবে তিনি মহাসামন্ত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এ সম্বন্ধে এখানে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই।

ডাঃ ভাণ্ডারকর মহাস্থান লিপির এইরূপ ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছেন—'To Galadana (Galardana) of the samvamgiyas... (was granted) by order. The Mahamatra from the highly auspicious Pundranagara will cause it to be carried out. (And likewise) paddy has been granted to the Samvamgiyas. The outbreak (of distress) in the town during (this) outburst of superhuman agency shall be tided over. When there is an excess of plenty, this granary and the treasury (may be replenished) with paddy and the gamdaka coins.'

এই শিলালেখখানি হইতে জানিতে পারা যায় যে, মৌর্যযুগের কোনও শাসনকর্তা, (তিনি মৌর্যবংশীয় নাও হইতে পারেন) পুণ্ড্রনগরে অধিষ্ঠিত মহামাত্রকে আদেশ দিয়াছিলেন সংবংগীয়দের (people calleed Samvamgiyas) দুর্ভিক্ষ-জনিত ক্লেশ দূর করিবার জন্য। সম্ভবত সংবংগীয়রা পুণ্ড্রবর্ধন নগরের মধ্যে কিংবা তাহার আশেপাশে বাস করিত। এই দৈব দুর্বিপাকের নিরাকরণার্থ দুইটি ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ইহাতে আছে। প্রথমটির সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বুঝিবার কোনও উপায় নাই, কেননা প্রথমটির প্রথম পংক্তিটি বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে অনুমিত হয় যে, সংবংগীয়দের নেতা গলদন (Galadana)-কে গংডক মুদ্রা ঋণ দিয়া সাহায্য করিবে। দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি হইতেছে ধানাগার বা গোলাঘর হইতে দুর্ভিক্ষ বা পীড়িত ব্যক্তিদিগকে ধান্যদান করিবে। পুণ্ড্রনগরের মহামাত্রের প্রতি এই আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য নির্দেশ ছিল। আরও লিখিত ছিল যে—যখন পুনরায় সুদিন আসিবে, তখন ঋণদানের মুদ্রা এবং ধান্য গোলাজাত করিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ, টাকা এবং ধান প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

মৌর্যযুগে বাংলাদেশের স্থান-বিশেষে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেও যে রাজারা গোলাঘর নির্মাণ করিতেন, ইহা হইতে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। এখনও ভারতে এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

মহাস্থান লিপির সাহায্যে আমরা বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের সন্ধান পাই। দুর্ভাগ্যবশত এই লিপিখানির প্রথম পংক্তিটি পাওয়া যায় নাই। সম্ভবত উহাতে যে রাজা বা শাসনকর্তা এই লিপির প্রচার করেন, তাহার নাম পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই লিপির অক্ষর ও ভাষা অশোকের অনুশাসনের অনুরূপ। সম্ভবত এই আদেশলিপির প্রচার মৌর্যবংশীয় কোনও নৃপতিই করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মাগধি প্রাকৃত প্রচলিত ছিল।

এই লিপি হইতে ইহা অনুমিত হয় যে, পুণ্ড্রবর্ধন সে সময়ে মৌর্যরাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল। এ সময়ে বঙ্গ (বিক্রমপুর) পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্ভূত ছিল না। দুইটি রাজ্যেই সমভাবে প্রসিদ্ধ ছিল।

বর্তমান সময়ে বঙ্গ বলিতে আমরা সমগ্র বঙ্গদেশকে বুঝিয়া থাকি। এখন রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ, কেহ বলে না; বঙ্গদেশ বা বাংলাদেশই বলিয়া থাকে এবং তাহা সমগ্র বিভাগকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীনকালে বঙ্গদেশ ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগকেই বুঝাইত। হেমচন্দ্র তাহার 'অভিধানচিন্তামণি' নামেক বিখ্যাত গ্রন্থে বঙ্গাস্তু হরিকেলিয় বঙ্গ বা হরিকেলিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং (Itsing) ইউহিং (Wuhing) প্রভৃতি ভারতের

পূর্বপ্রান্তস্থিত 'হরিকেল' দেশে আসিয়াছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে রক্ষিত সচিত্র 'অষ্টসহস্রপ্রজ্ঞাপারমিতা' নামক হস্তলিখিত গ্রন্থেও হরিকেলের নাম রহিয়াছে। একাদশ শতাব্দীর চোল শিলালিপি রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালই পাহাড়ের লিপি এবং চেদি কর্ণদেবের গোহারোয়া (Goharwa) লিপিতে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে,—যেমন বাংলা দেশম্। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশ 'বাংলা' নামে পরিচিত হইতে থাকে এবং মুসলমান রাজত্বকালে বাংলা নামে আখ্যাত হয়।[৫]

যে বঙ্গ এক সময়ে কেবল পূর্ববঙ্গকেই বুঝাইত, সেই বঙ্গ নাম বর্তমানে সমগ্র বঙ্গদেশকে বুঝাইতেছে। ইংরাজেরা যে Bengal বা বেঙ্গল বলেন তাহার উৎপত্তি হইতেছে বাংলা বা বাংলা শব্দ হইতে।[৬] কাজেই বঙ্গদেশের বানান সম্পর্কে বাংলা, বাঙ্গলা যে কোনও একটিই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

এখন কথা হইতেছে যে, বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাসের আরম্ভ কিরূপে করা যাইতে পারে? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিক্রমপুরের অতি প্রাচীন ইতিহাসের সহিত গৌড় ও বঙ্গের ইতিহাস বিজড়িত। আবার বাংলার ইতিহাস যে কেবল বঙ্গদেশ—এখানে বঙ্গদেশ কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতেছি। বঙ্গদেশের ইতিহাস কেবল বাংলাদেশের সীমান্তেই আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সহিত এবং ভারত সীমার বাহিরেও নানা স্থানের সহিত বাংলার ইতিহাসের নানা সম্বন্ধ বর্তমান ছিল।[৭ক-খ] বিক্রমপুরের ইতিহাসের সহিত প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের অখণ্ড যোগ রহিয়াছে। এক সময়ে বিক্রমপুর ছিল প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী, কাজেই বাংলার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা না করিলে বিক্রমপুরের ইতিহাস আলোচনা করা যাইতে পারে না। এজন্য আমরা প্রাচীন বাংলার ইতিহাসও আলোচনা করিব। সে আলোচনা যেমন সঙ্গত, তেমনি বিক্রমপুরের সহিত তাহা একসূত্রে বদ্ধ। পাঠকগণের পক্ষেও ধারাবাহিকতার দিক দিয়া তাহা বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে।

বিগত পঁচিশ বছরের মধ্যে 'তাম্রপট্টলিপি' ও 'শিলালিপি' প্রভৃতি অনেক আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাচীন ভারতেও বাংলার ইতিহাসের সম্বন্ধে অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। আমাদের দেশে লিখিত ইতিহাস নাই, এজন্য জনশ্রুতি, প্রাচীন সাহিত্য, প্রাচীন মুদ্রা প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, মূর্তি ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইতেই ইতিহাসের মূল তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে হয়।

বৌদ্ধযুগ ভারতের বাহ্য সম্পদের উন্নতির যুগ। ভারতের বিবিধ বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক বিভাগ, জাতি বিভাগ এবং প্রচলিত ধর্ম ও সমাজের পার্থক্য ও প্রভেদ দূর করিয়া দিয়া ভারতীয় সভ্যতাকে ঐক্য-সূত্রে বাঁধিবার মূলে একসময়ে বৌদ্ধধর্ম যেরূপ মহৎ কার্য করিয়াছিল, সেইরূপ কার্য এ পর্যন্ত কোনও ধর্ম পৃথিবীতে করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। এই বৌদ্ধ যুগের প্রভাবেই বৃহত্তরবঙ্গ ও বৃহত্তরভারত গড়িয়া উঠিয়াছিল।

গৌতম সিদ্ধার্থ ও বৌদ্ধধর্ম ঃ গৌতমের বুদ্ধত্বলাভ ঃ

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক মহাত্মা গৌতম, বর্তমান বাস্তিজেলার উত্তরে নেপাল-তরাইয়ে অবস্থিত প্রাচীন কপিলাবস্তু নগরের নিকটবর্তী লুম্বিনী উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন। গৌতম বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অস্ত্রবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন, কিন্তু এসকলের প্রতি তাহার অনুরাগ ছিল না। সাংসারিক বিষয়ে তিনি একান্ত উদাসীন ছিলেন। সিদ্ধার্থের পিতা শুদ্ধোদন পুত্রকে সংসারানুরাগী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং এই উদ্দেশে শাক্যদণ্ডপাণি নামে একজন ছোট রাজার যশোধারা [ইনি বিম্বা, গোপা, ভদ্দকসেনা প্রভৃতি নামেও আখ্যাত হইয়া থাকেন।] নামে এক সুন্দরী ও গুণবতী কন্যার সহিত গৌতমের বিবাহ দেন। ক্রমে তাহার একটি পুত্রও হইল, তখন সিদ্ধার্থের মনে হইল যে, তিনি ক্রমশই

সংসারের মায়াময় আকর্ষণের মধ্যে জড়াইয়া পড়িতেছেন। দুঃখময় সংসারের বিবিধ প্রকারের দুঃখ ও নির্যাতন হইতে জীবের পরিত্রাণ সাধনোদ্দেশ্যে একদিন রাত্রিকালে যখন সমুদয় জগৎ নিস্তব্ধ, প্রিয়তমা পত্নী শিশুটিকে কোলে লইয়া নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাইতেছেন, তখন ধীরে-নীরবে কাহাকেও কিছু না কহিয়া তাহার একমাত্র বিশ্বস্ত সারথি ছন্দককে সঙ্গে লইয়া বিশ্বমানবের কল্যাণ-কামনায় সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিলেন। সেই তাহার 'মহাভিনিষ্ক্রমণ'। অতঃপর তিনি কঠোর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শরীরকে যতদূর কষ্ট দিতে হয় দিলেন,—তাহার অস্থি-চর্ম সার হইল, তবু অভীপ্সিত ফল লাভ হইল না। এ সময়ে তাহার মনে হইল যে, শরীরকে কষ্ট দেওয়া বৃথা। এইরূপ অসহায় অবস্থায় তিনি একাকি ভ্রমণ করিতে করিতে গয়ার নিকটবর্তী উরুবিল্ব নামক স্থানে এক বোধিদ্রুম মূলে বসিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। এইখানে তাহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন। গৌতম দুঃখময় মানবজীবনের মুক্তির প্রকৃত সমাধান নির্বাণ লাভের সন্ধান পাইলেন। সেইদিন হইতেই তিনি 'বুদ্ধ' অর্থাৎ 'জ্ঞানী' নামে পরিচিত হইলেন। যে বোধিদ্রুম বা অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে বসিয়া তিনি বুদ্ধত্বলাভ করেন, পরবর্তীকালে সেখানে একটি সুন্দর মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। সেই মন্দির এখনও বর্তমান আছে, ঐ স্থান বুদ্ধগয়া নামে পরিচিত।

বুদ্ধদেব লোকালয়ে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহার ধর্মমত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ধ্যান ও ধারণার ফলে বিশ্বমানব বিশুদ্ধ ধর্মের উপদেশ লাভ করিল। তাহার প্রধান কথা এই যে, বাসনা ও মোহ দূর করিতে পারিলেই সকল কষ্ট দূর হইয়া যাইবে। বাসনা ও মোহ জয় করিবার যে পথ তিনি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে তপস্যার বাড়াবাড়ি ও জ্ঞানের বাগজাল ছিল না ; যোগের ঋদ্ধিরও কোনও স্থান ছিল না। তিনি লক্ষ্যকে ভুলিয়া উপায়কে লইয়াই থাকিতে চাহিতেন না। তাহার প্রধান কথা এই ছিল যে—মানুষ মাত্রেই নির্বাণ-মুক্তির অধিকারী। সেখানে জাতি বা বর্ণের কোনও ভেদ নাই। বুদ্ধদেব উপবাসাদি কঠোর ব্রতসাধন নিষেধ করিয়াছেন এবং আলস্য, আমোদ-প্রমোদ বা ভোগ-বিলাসেরও বিরোধী ছিলেন। এই উভয়ের মধ্যবর্তী পথই তাহার মতে অবলম্বনীয় ছিল। 'অহিংসা পরম-ধর্ম' এই বাণীই তাহার ধর্মের মূল সূত্র।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে বুদ্ধের দেহত্যাগ হয়। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর সময় তাহার প্রধান শিষ্য আনন্দকে তিনি বলিয়াছেন—আমার উপদেশসমূহ দ্বারাই তোমরা পরিচালিত হইও। এইজন্য বুদ্ধের মৃত্যুর পরে বৌদ্ধদের মধ্যে যাহারা প্রধান ছিলেন, তাহারা রাজগৃহে সমবেত হইয়া (রাজগীর) বুদ্ধের যে সব বচন তাহাদের স্মৃতিপথে বর্তমান ছিল, সে সমুদয় লিখিয়া ফেলিলেন। এইরূপে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। এই ধর্মগ্রন্থ (১) বিনয়পিটক, (২) সূত্রপিটক, (৩) অভিধর্মপিটক এই তিনভাগে বিভক্ত। একসঙ্গে এই তিন পিটক ত্রিপিটক নামে অভিহিত। বর্তমান সময়ে সংস্কৃত, পালি, চীন প্রভৃতি ভাষায়ও ত্রিপিটক দেখিতে পাওয়া যায়। তবে পালি-ভাষায় লিখিত ত্রিপিটকই প্রধান বলিয়া গণ্য।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ঃ

বুদ্ধদেবের সময় হইতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার আরম্ভ হইলেও সম্রাট অশোকের সময় হইতেই উহা দেশে-বিদেশে বিস্তৃত হয়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। আনুমানিক ৩২৫ খ্রিস্টপূর্বে চাণক্য নামে তিনি তক্ষশিলাবাসী এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে মগধের নন্দরাজকে পরাজিত করিয়া মগধের সিংহাসনে বসেন। চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় ক্ষমতাশালী সম্রাট ভারতবর্ষের ইতিহাসে অতি বিরল। এ সময়ে গ্রিকবীর আলেকজান্ডার পশ্চিম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি পাঞ্জাব হইতে গ্রিকদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া সমস্ত উত্তর ভারত জয় করিয়াছিলেন, সম্ভবত দাক্ষিণাত্য-প্রদেশের কতকাংশও তাহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। চন্দ্রগুপ্তের

রাজধানী পাটলিপুত্র (পাটনা) সে সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রদান সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। চন্দ্রগুপ্তের পর তাহার পুত্র বিন্দুসার প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ৩০ অব্দে সিংহাসন লাভ করেন। গ্রিক ঐতিহাসিকগণ তাহার নাম দিয়াছিলেন—অমিত্রখাদ (Amitrochades) বা শত্রুজয়ী। তাহার রাজত্বকালে রাজ্যের সর্বত্র অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল। একবার তক্ষশিলায় বিদ্রোহ হওয়ায় বিন্দুসার তাহার পুত্র অশোককে ঐ প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। অশোক সহজেই সেই বিদ্রোহ দমন করেন। পরে তিনি উজ্জয়িনীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ২৭৪ অব্দে বিন্দুসারের মৃত্যু হয়।

সম্রাট অশোক ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ঃ

বিন্দুসারের মৃত্যুর পর মহানুভব সম্রাট অশোক, মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময়ে কলিঙ্গদেশ, মৌর্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। অশোক এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। তাহার রাজ্য বর্তমান ব্রিটিশ-ভারত অপেক্ষাও বিস্তৃত ছিল। উত্তরে পারস্যের সীমান্ত প্রদেশ, দক্ষিণে মহীশূর রাজ্যের শ্রাবণ বেলগোলা (Sravana Belgola) পর্যন্ত। গ্রিসদেশীয় লেখকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, চন্দ্রগুপ্তের মগধরাজ্যের পূর্ব দিক 'গঙ্গারিডি' নামে একটি রাজ্য ছিল। তাহার মধ্য দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত। গঙ্গারিডির কথা প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই বলিয়াছি। কলিঙ্গযুদ্ধের পর অশোকের ধর্মমতের পরিবর্তন হয়। অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের পূর্বে প্রথম জীবনে দেবদেবীর উপাসক (Dava-Worshipper) ছিলেন। কি মানুয, কি জীবজন্তু হত্যা সম্বন্ধে তাহার কোনওরূপ দ্বিধা ছিল না। কিন্তু কলিঙ্গযুদ্ধের পর হাজার হাজার লোকের মৃত্যুতে তাহার মনের পরিবর্তন ঘটে, সেসময়ে উপগুপ্ত নামক একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার নিকট তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেন এবং উহা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সেসময়ে তিব্বত হইতে সিংহল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশেও সেসময়েই বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। সম্রাট অশোক বাংলাদেশের নানাস্থানে স্তূপ বা বৌদ্ধ-স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। অশোকের অনুশাসন (পর্বতগাত্রে খোদিত যে লিপি—Rock-Edicts) বা খোদিত লিপিসমূহ হইতে জানা যায় যে, তিনি কত বড় মহৎ এবং প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন।

অশোকের সময়ে যে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে এখন আর সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। মহাস্থানগড়ের মৌর্য-ব্রাহ্মী শিলালিপি হইতেও প্রমাণিত হইয়াছে যে, মৌর্যরাজগণের প্রভাব বাংলাদেশ (ব্যাপক অর্থে) পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এবং বৌদ্ধধর্ম বঙ্গ (পূর্ববঙ্গে) দেশে প্রচারিত হইয়াছিল।

এজন্যই পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অদ্যাপিও বর্তমান রহিয়াছে। সম্রাট অশোকের পরবর্তীকালেও বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃত হইয়াছিল। মৌর্য-সাম্রাজ্য আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩২১—১৭৪ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৩৬ হইতে ১৮৫ খ্রিস্টপূর্ব সময় পর্যন্ত ধীরে ধীরে মৌর্য নৃপতিগণের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। মৌর্যবংশের শেষ নৃপতি বৃহদ্রথকে তঁহার ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসনে বসিলেন। ইহার প্রতিষ্ঠাপিত রাজবংশ শুঙ্গবংশ নামে পরিচিত।

মৌর্যরাজগণের পতনের পর ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা নানারূপে পরিবর্তিত হইয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নৃপতিগণ প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিলেন। উত্তর ভারতে একে একে শুঙ্গ, কাণ্ব প্রভৃতি অনেকেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাহাদের সময়ে মৌর্যরাজাদের রাজত্বকালে দেশের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রভাব এবং সভ্যতাও অনেকটা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। মৌর্য নৃপতিরা উদারমতাবলম্বী ছিলেন। তাহারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর

কোনও অবিচার করেন নাই। কিন্তু রাজধর্ম বৌদ্ধ বা জৈন হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম খর্ব হইতে আরম্ভ করে।

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন ও বোধ হয় মৌর্যরাজাদের পুরোহিতবংশীয় ছিলেন। রাজপ্রাসাদে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ লোপ পাইয়াছিল। পুরোহিত-বংশ নামে মাত্র পুরোহিত ছিলেন। পুয্যমিত্র রাজা হইলে-পর ব্রাহ্মণেরা তাহাদের পূর্ব-গৌরব ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ঃ

পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেক কিছু ঘটনা ঘটিয়াছিল। গ্রিকেরা ভারত আক্রমণ করেন—পুষ্যমিত্র সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাহুবলের প্রভাবে পুষ্যমিত্র গ্রিকরাজকে ভারতে গ্রিক-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙক্ষা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্রের রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল। তাহার সাম্রাজ্য দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মগধ, তীরভুক্তি, কোশল, অযোধ্যা ইত্যাদি তাহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হয়ত উত্তর-পশ্চিমে জলন্ধর তাহার রাজ্যের সীমা ছিল। মনে হয়, পাঞ্জাব এবং সুরাষ্ট্র ছাড়া সমগ্র উত্তরাপথই তাহার আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল।

গ্রিকদের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়াও বিদর্ভরাজ যজ্ঞসেন বিদর্ভকে পরাজিত করিয়া পুয্যমিত্র নিজেকে সমগ্র উত্তরাপথের রাজচক্রবর্তী বলিয়া ঘোষণা করিলেন ও নিজের এই প্রাধান্য বা সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিলেন। অশোক মহারাজা যজ্ঞের পশুবিনাশ নিবারণ করিয়াছিলেন, পুয্যমিত্র অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যাজ্ঞিক-ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন।

পুয্যমিত্রের যজ্ঞাশ্ব একদল গ্রিক অশ্বারোহী-সৈন্য বলপূর্বক ধরিয়াছিল। অশ্বের রক্ষক পুয্যমিত্রের পৌত্র, বসুমিত্র তুমুল যুদ্ধ করিয়া, বুন্দেলখণ্ডের নিকট সিন্ধু-তীরে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।—পুয্যমিত্র অনেক বৌদ্ধশ্রমণদিগকে হত্যা করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া ও তাহাদের বিহারগুলিকে পোড়াইয়া দিতেন বলিয়া কথিত আছে। অতিরঞ্জিত হইলেও পুয্যমিত্র যে বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করিতেন, সে বিষয়ে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। ভারতের হিন্দুরাজাদের রাজত্বকালে এইরূপ অত্যাচার হইয়াছে।

পুষ্যমিত্র প্রায় ১৮৫ খ্রিস্টপূর্ব হইতে ১৪৯ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পরে অগ্নিমিত্র রাজা হন। শুঙ্গ বংশের নবম রাজা ভাগবত বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভাগবতের পরবর্তী নৃপতি দেবভূতি দশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর তাহার অমাত্য বাসুদেব কাণ্বর হস্তে নিহত হন। এইভাবে প্রায় ৭৫ খ্রিস্টপূর্বে শুঙ্গরাজ্যের পতন হয়।

শুঙ্গ রাজত্বের প্রভাব বঙ্গরাজ্য পর্যন্তও বিস্তৃত ছিল।—তাহার প্রমাণ আমরা পাইতেছি। তবে সে সময়ে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারাই বিভিন্ন অংশে প্রভাবান্বিত ছিলেন।

শুঙ্গ রাজাদের প্রভাব ঃ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে শুঙ্গ রাজত্বের প্রভাবে এক নবযুগের সৃষ্টি হইয়াছিল।—সে সময়ে বৈদিক ধর্মের নব-অভ্যুত্থান হইয়াছিল, সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল ও শিল্পকলার উৎকর্ষ-সাধন হইয়াছিল। পতঞ্জলি এই সময়ে তাহার মহাভাষ্য লেখেন ও ভারতের কারুশিল্পীরা পাথরে কাঠের কাজের অনুকরণ করিয়া সাঁচি ও ভরহুত স্তূপের রেলিং ও তোরণদ্বার নির্মাণ করিয়া পৃথিবীতে শিল্পনৈপুণ্যের অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। গীতার ধর্ম, জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। এমনকি গ্রিকেরাও ভারতের ভাগবতধর্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন ও তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

কাণ্ব ও আন্ধ্রবংশীয় রাজাদের বিষয়ে আমাদের বিশেষ আলোচনা করিবার নাই। —ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে শক, পহ্লব, কুষণ বা কুষাণ প্রভৃতি রাজগণের প্রভাব নানা সময়ে ভারতের নানা দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল।

মৌর্যসম্রাট অশোকের পর কুষাণ-নৃপতি কনিষ্ক ভারতবর্ষে অসাধারণ প্রভাবশালী হইয়াছিলেন। কনিষ্কের কাল লইয়াও পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকদিন ধরিয়া বিতর্ক চলিতেছে। তবে ইহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান দল আছে। প্রথম দলের মতে তিনি ৭৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াছিলেন এবং তিনিই শক-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয় দলের মতে তাহার রাজ্যের আরম্ভ ১২৫ খ্রিস্টাব্দের পরে, এমনকি ১৩৮ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছিও হইতে পারে।

কুষাণ রাজা কনিষ্ক ঃ

কনিষ্ক রাজা হইবার কিছুকাল পরেই কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করেন। কনিষ্ক এখানে অনেক বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন ও কনিষ্কপুর নামক একটি নতুন নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নগর সামান্য পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। মহারাজ কনিষ্ক পাটলিপুত্রের তদানীন্তন নৃপতিকে পরাজিত করিয়া তাহার রাজসভার রত্নস্বরূপ বৌদ্ধ শ্রমণ **অশ্বঘোষকে** লইয়া গিয়াছিলেন।—এই অশ্বঘোষ বৌদ্ধধর্মের ও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে নানাদিক দিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দার্শনিক, কবি এবং পরম বিদ্বান ও সংসারত্যাগী বৌদ্ধ-ভিক্ষু ছিলেন।

কনিষ্ক নানা দেশ জয় করেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে তাহার যে সকল উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, তাহার সুবিশাল সাম্রাজ্য পশ্চিমে সুংলিং পর্বতশ্রেণী হইতে পূর্বে পাটলিপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি তাহার রাজ্যের সীমা ছিল। খাসগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান বা ফিরিস্তান, বাহ্লীক, কাবুল, পঞ্চনদ, সিন্ধু, মথুরা, কৌশাম্বী, বারাণসী, পাটলিপুত্র ইত্যাদিও তাহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মহাযান ও হীনযান ঃ গৌতমের মূর্তি-নির্মাণ ও মন্দিরে স্থাপন ঃ

কনিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। মহারাজা অশোকের পরেই কনিষ্কের নাম বৌদ্ধ-জগতে গৌরবের সহিত উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে। তাহার অদম্য উৎসাহেই বৌদ্ধধর্ম মধ্য ও উত্তর এশিয়ায় প্রচারিত হইয়াছিল। এ সময়ে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের বিজয়বাণী আবার চারিদিকে বিঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু এ সময়ে বৌদ্ধদের মধ্যে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হইয়াছিল।—তাহার সময়ে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে **হীনযান** ও **মহাযান** এই দুইটি বিরোধী দলের সৃষ্টি হয়। মহাযান মতাবলম্বীরা প্রাচীনপন্থীদিগকে হীনযান নাম দিলেন। তাহারা নবীন পন্থাটিকে প্রাচীন পন্থা হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন।—এই মহাযান মতাবলম্বীরাই সর্বপ্রথম বুদ্ধদেবের মূর্তি নির্মাণ করিয়া তাহাকে দয়ার অবতাররূপে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাযান মতাবলম্বীরা ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দান করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে ভক্তির প্রাধান্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বকে দেবতাবোধে পূজা করা, মূর্তি-পূজার প্রবর্তন, বুদ্ধত্ব লাভ করাই জীবের চরম লক্ষ্য মনে করেন।

ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধধর্মের এইরূপ পরিবর্তনের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রভাব লক্ষ করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার ও গীতার ভাগবত-ধর্মের প্রভাব বৌদ্ধেরা শেষ পর্যন্ত কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। অশ্বঘোষও পরে মহাযানসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। এবং গ্রন্থাদিও রচনা করেন।

মহাযান ধর্মের প্রবর্তক বা শাস্ত্রকর্তা ছিলেন নাগার্জুন। ইনি অশ্বঘোষের কিছু পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'মাধ্যমকারিকা' নামক মহাযান ধর্মগ্রন্থ ইনিই প্রণয়ন করেন। কনিষ্কের সময় বৌদ্ধদের চতুর্থ বৌদ্ধসভার অধিবেশন হইয়াছিল। কাশ্মীরে রাজধানীর নিকট কুন্দলবন নামক সঙ্ঘারামে এই সভার অধিবেশন হয়। পাঁচশত বৌদ্ধশ্রমণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আলোচনার ফলে ত্রিপিটক নামক বৌদ্ধ-শাস্ত্রের প্রামাণিক ব্যাখ্যাস্বরূপ অনেক গ্রন্থাদি বিরচিত হইয়াছিল। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, এই সভার অধিবেশনের পর ঐ সকল গ্রন্থ বড় বড় তাম্রপাত্রে খোদিত হইয়া স্তূপ-সমূহের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত হইয়াছিল।

গান্ধার শিল্প ঃ

সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকালে গান্ধার-শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। গান্ধার দেশে এই শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া ইহা **গান্ধার-শিল্প** নামে পরিচিত।—ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন যে, প্রায় তিনশত বৎসর কাল—গান্ধার দেশ গ্রিকদের অধীনে ছিল। তাহারই ফলে ঐ স্থানে একটি নতুন শিল্পের প্রভাব মূর্ত হইয়া উঠে। কনিষ্কের রাজত্বকালের কতকগুলি উৎকৃষ্ট শিল্পনিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। গান্ধার-শিল্পীরা অর্থাৎ, ভাস্করেরা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের অনেক মূর্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

কনিষ্ক প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার রাজসভা শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি প্রভৃতির দ্বারা সমলঙ্কৃত ছিল। বসুমিত্র, পার্শ্ব, অশ্বঘোষ, চরক, সঙ্ঘরক্ষ, গ্রিক-পূর্তবিদ্যাবিশারদ অ্যাগিস্যাইলোস্ (Agesailos) প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ তাহার সভার গৌরব বর্ধন করিতেন।

বিশেষ আশ্চর্যের কথা এই যে, এত বড় একজন সম্রাটের সম্বন্ধে হিন্দুসাহিত্য ও ইতিহাস কোনওরূপ উদারতা দেখান নাই। কেবল কলহন 'রাজতরঙ্গিণী' নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে কনিষ্কের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় বলেন—'খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে বাংলাদেশ সম্ভবত কুষাণ রাজবংশের শাসনাধীনে ছিল। ঐ যুগের কয়েকটি মুদ্রা উত্তরবঙ্গে এবং হুগলি জেলায় মহানাদ গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে।'

বিক্রমপুরে মহাযানপ্রভাব বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। কি ভাবে কেমন করিয়া বৌদ্ধধর্মে মূর্তি-নির্মাণের ও মূর্তি-পূজার প্রথা প্রবর্তন হইল, সেকথা বলিবার জন্যই আমরা এখানে কনিষ্কের বিষয় আলোচনা করিলাম।

গুপ্তবংশ ঃ

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর, গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয় হয়। কুষণ বা কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর এবং গুপ্ত-বংশের অভ্যুদয়কাল পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যবর্তীকালের ইতিহাসের সহিত আমাদের কোনও সংস্রব নাই, কাজেই উহার সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বোধে পরিত্যক্ত হইল। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের কালকে ভারতের সুবর্ণযুগ বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। গুপ্ত-রাজত্ব হইতে অনুমান খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে বাংলার ইতিহাসের কিছু কিছু মালমসলা পাওয়া যায়।

গুপ্তরাজবংশ

খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গুপ্ত রাজবংশ নামে এক নতুন রাজবংশ মগধের সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। (আনুমানিক ৩৫০—৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) এ সময়ে অনেক শক্তিশালী নৃপতির আবির্ভাব হওয়ায় হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্মদার উপকূল পর্যন্ত সর্বত্র ইহাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়। মৌর্যযুগে ভারতবর্ষ যেমন এক বিরাট ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রীয়শক্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, এই যুগেও তেমনি ভারত আর একবার বিরাট রাষ্ট্রীয়শক্তি গঠনে অর্থাৎ, এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি, বর্ণাশ্রম ধর্মের পুনরায় অভ্যুত্থান, ললিতকলার শ্রীবৃদ্ধি ভারতের বাহিরে ভারতের জ্ঞান, বিদ্যা, সভ্যতা ও ধর্ম প্রচারিত হইয়া **বৃহত্তর ভারতের** সৃষ্টি করিয়াছিল।

ইতিহাস লিখিবার উপকরণ ঃ

গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকাল হইতে ইতিহাস লিখিবার কিছু কিছু উপকরণ পাওয়া যায়। তাহাদের উৎকীর্ণ শিলালেখ, তাম্রলিপি হইতে মুদ্রা এবং বৌদ্ধ শ্রমণ ফা হিয়ানের ভারত ভ্রমণ হইতে গুপ্ত রাজাদের কীর্তিকলাপ প্রভৃতি বিশেষরূপে জানা যায়। এই গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম **গুপ্ত**। ইহাকে গুপ্তলেখমালায় 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত দেখা যায়। ইনি মগধের কাছাকাছি ২৭৫ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্তরাজ মহারাজ শ্রীগুপ্তের সময়ে মগধেশ্বর কে ছিলেন তাহা জানা যায় না ; সম্ভবত মৌখরি, ভারশিব বা বাকাটক বংশের কেহ কেহ সেখানে রাজত্ব করিতেছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে তেমন কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ঃ

মহারাজ গুপ্তের পুত্র ঘটোৎকচ গুপ্ত পিতার ন্যায় একজন সামন্ত নৃপতি মাত্র ছিলেন। মগধ অঞ্চলে তাহার তেমন কোনও প্রভাব ছিল না। কিন্তু ঘটোৎকচগুপ্তের পুত্র **প্রথম চন্দ্রগুপ্ত** ৩২০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন এবং আপনাকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। এই প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতেই গুপ্ত বংশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। এই শ্রীবৃদ্ধির মূলে **লিচ্ছবি** জাতির নাম করা যাইতে পারে। লিচ্ছবি জাতি প্রাচীনকালে বৈশালী রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রভাব সময়ে লিচ্ছবি জাতি একটি প্রতিষ্ঠাপন্ন জাতি ছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এই লিচ্ছবি বংশের এক রাজকন্যা মহাদেবী কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। পাটলিপুত্র লিচ্ছবিজাতির অধিকারভুক্ত ছিল। কুমারদেবীর বিবাহোপলক্ষে তাহারা পাটলিপুত্র চন্দ্রগুপ্তকে যৌতুকস্বরূপ সমর্পণ করেন। এই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্মরণীয় করিবার জন্য কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রা প্রচারিত হয়, তাহাতে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও তাহার পত্নী কুমারদেবীর মূর্তি ও অপর দিকে সিংহবাহিনী লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি ও 'লিচ্ছবয়ঃ' লিখিত আছে। চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া মগধ হইতে প্রয়াগ পর্যন্ত সমগ্র গঙ্গাতীরবর্তী বিস্তৃত প্রদেশই তাহার রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন—চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের সময় হইতে একটি নতুন সংবতের প্রবর্তন হয়। ইতিহাসে উহা **গুপ্ত সংবত** নামে প্রসিদ্ধ। এই সংবৎ ৩১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। 'চন্দ্রগুপ্ত' অল্পকাল মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র **'সমুদ্রগুপ্ত'** গুপ্ত সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ৩২০ খ্রিস্টাব্দ হইতে ৩৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গণনা করা হয়। সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না, তথাপি চন্দ্রগুপ্ত তাহাকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন। সমুদ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীর গর্ভজাত ছিলেন এই

জন্যই আমরা তাহার খোদিত লিপিতে দেখিতে পাই,—তিনি আপনাকে 'লিচ্ছাব দৌহিত্র' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমুদ্রগুপ্ত একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তাহার নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি যে কেবল একজন দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন তাহাই নহে, তিনি রাজনীতিজ্ঞ, বিদ্বান ও সঙ্গীতানুরাগী নৃপতি ছিলেন। প্রাচীন ইতিহাসে যে সকল দিগ্বিজয়ী রাজার নাম দেখিতে পাই তিনি তাহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। সমুদ্রগুপ্ত নানা দেশ জয় করিয়া দিগ্বিজয় বীর বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি উত্তরভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিয়া গুপ্তসাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত করেন। তাহার রাজ্যকালের ইতিহাস এলাহাবাদ দুর্গের ভিতরে অবস্থিত অশোকস্তম্ভের গাত্রে যে খোদিত লিপি আছে তাহা হইতে জানিতে পারা যায়। এ লিপিটি অতি প্রাঞ্জল সংস্কৃতভাষায় রচিত। এইপ্রকার লিপিকে **প্রশস্তি** বলে। মহাকবি হরিষেণ এই প্রশস্তিটি রচনা করেন। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালের ঘটনাবলী ও তাহার জীবন-চরিত সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য ইহাতে আছে।

সমুদ্রগুপ্তের বঙ্গ বিজয় ঃ

উত্তর ভারত বা আর্যাবর্তে আপনার বিজয়-গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারত জয় করিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন। আমরা তাহার দক্ষিণ ভারত বিজয়ের সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করিব না। আমরা উত্তর ভারতে তাহার বিজয়বার্তার কাহিনীই আলোচনা করিব। আমরা হরিষেণের প্রশস্তি হইতে জানিতে পারি, সমুদ্রগুপ্ত তাহার রাজধানী পাটলিপুত্র হইতে বিজয়-যাত্রা করিয়া একে একে 'সমতট' (পূর্ববঙ্গ) কামরূপ, ডবাক, নেপাল, কর্তৃপুর, (বর্তমান কুমায়ুন ও গাড়োয়াল) প্রভৃতি সীমান্তরাজ্যের নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে করপ্রদান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন, কালিদাস তাহার 'রঘুবংশ' নামক কাব্যের চতুর্থ সর্গে নৃপতি রঘুর যে দিগ্বিজয়-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন তাহা সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক দিগ্বিজয়েরই রূপক বর্ণনা মাত্র। কালিদাস রঘুর বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে এই কথা একেবারে অসঙ্গত বলিয়াও মনে হয় না। কবির বর্ণনা হইতে দেখা যাইতেছে যে, 'সুহ্ম' এবং 'উৎকলের' লোকেরা সহজেই রঘুর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু বঙ্গবীরেরা তাহার সহিত অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে। আমরা রঘুবংশের ৪র্থ সর্গ ৩৪ হইতে ৩৮ শ্লোক পর্যন্ত কালিদাস রঘুর যে দিগ্বিজয় বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম :

পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী।
প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহাদধেঃ॥ ৩৪ ॥
অনম্রাণাং সমুদ্ধর্তুস্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব।
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্ ॥ ৩৫ ॥
বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌ-সাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু সঃ ॥ ৩৬ ॥
আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুরুৎখাত-প্রতিরোপিতাঃ ॥ ৩৭ ॥
স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্ব দ্ধদ্বিরদ-সেতুভিঃ ॥ ৩৮ ॥

বিজয়ী রঘু এইরূপ অপ্রতিহত পরাক্রমে প্রাচ্যদেশ সমূহ জয় করিতে করিতে ক্রমে গিয়া, তালীবনসন্নিবেশে শ্যামবর্ণ পূর্বমহোদধির বেলাভূমিতে উপনীত হইলেন। ৩৪ ॥

বেগবতী, প্রবাহিণী খরস্রোত যেমন পুরঃস্থিত উচ্ছ্রিত বৃক্ষকেই উন্মূলিত করে, কিন্তু

আনতকায় বেতসলতিকার কোনও ক্ষতিই করে না, বিজয়দৃপ্ত রঘুর প্রকৃতিও তদ্রূপ জানিয়া সুহ্মদেশীয় নৃপতিবৃন্দ তাহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিলেন। ৩৫ ॥

বঙ্গদেশের রাজন্যবর্গ রণতরীর সাহায্যে, প্রতিদ্বন্দ্বী রঘুর সহিত যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইলে, তিনি সবলে তাহাদের পরাজয় সাধনপূর্বক গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যবর্তী দ্বীপপুঞ্জে স্বীয় বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করিলেন। ৩৬॥

তাহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠাপিত করার পর, তাহার শালিধান্যের ন্যায় (রোয়াধান) বিজেতা রঘুর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বিপুল ধনরাশির দ্বারা তাহাকে পূজা করিলেন। ৩৭ ॥

তদন্তর রঘু গজনির্মিত সেতুদ্বারা কপিশা নদী পার হইয়া সসৈন্যে উৎকল-দেশে উপনীত হইলেন। তদ্দেশীয় ভূপতিগণ সাগ্রহে তাহাকে পথ দেখাইয়া দিলে, তথা হইতে তিনি কলিঙ্গভূমি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৩৮॥[৮]

[রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত কালিদাসের গ্রন্থাবলী) প্রথম ভাগ ৪৭—৪৯ পৃষ্ঠা]

কালিদাসের এই বর্ণনা হইতে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলাম, রঘু যে দিগ্বিজয় করেন সেই বঙ্গদেশ, পূর্ববঙ্গ এবং বিশেষরূপে **বিক্রমপুরকেই** বুঝাইতেছে। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এবং প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ভাওদাজির মতে ব্রহ্মপুত্র এবং পদ্মানদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডই **বঙ্গ নামে** পরিচিত। এই বঙ্গ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেও বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। তারপর আর একটা বিষয় লক্ষ করিবার আছে। রঘুর সহিত বাঙালিরা যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা বীরত্বের পরিচায়ক। বঙ্গদেশের রাজারা রণতরীর সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বী রঘুর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। বাংলাদেশ বিশেষত পূর্ববঙ্গে যেরূপ নদী আছে সেরূপ নদী আর কোথাও নেই। স্বর্গত ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"বাংলার যেরূপ বড় বড় নদী আছে, তাহাতে বাঙালিরা যে অতি প্রাচীনকালেও নৌকা গড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নৌকাও অনেকরূপ ছিল—দোলা, দুলি, ডিঙ্গি, ভেলা, নৌকা, বালাম, ছিপ, ময়ূরপঙ্খী ইত্যাদি। এই সকল ছোট ছোট নৌকা, সকল দেশেই আছে। বাংলায় কিন্তু বড় জাহাজও ছিল।"

কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন, "বাংলার রাজারা নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। পালরাজাদের যে যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা থাকিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। খালিমপুরে ধর্মপালের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ধর্মপালের যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা প্রস্তুত থাকিত এ কথা স্পষ্ট লেখা আছে। রামপাল নৌকার সেতু করিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন, এই কথা 'রামচরিতে' স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে। ইংরেজি ১২৭৬ সালে তাম্রলিপি হইতে কতকগুলি বৌদ্ধভিক্ষু জাহাজে চড়িয়া পেগানে গিয়া তথাকার বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করেন, এই কথাও কল্যাণ নগরের শিলালেখে স্পষ্ট করিয়া বলা আছে।

"কিন্তু মনসা ও মঙ্গল-চণ্ডীর পুঁথিতেই আমরা বাংলাদেশের নৌকা-যাত্রার খুব জাঁকাল খবর পাই,—চৌদ্দ, পোনের, ষোলখানি একজন সওদাগর, একজন মাঝির অধীনে ভাসাইয়া লইয়া গঙ্গা বাহিয়া সমুদ্রে পড়িতেন। সমুদ্র বাহিয়া সিংহলে যাইতেন এবং তথা হইতেও ১৫/১৬ দিন বাহিয়া মহাসমুদ্রের মধ্যে নানা দ্বীপ ও উপদ্বীপে বাণিজ্য করিতেন।[৯] কেদাররায় ও প্রতাপাদিত্য সর্বদাই নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। অনেকসময় দুর দূরান্তরেও যাইতেন।

পালবংশীয় নরপালগণের কোনও কোনও তাম্রশাসনে "নৌবাটক" এবং কোনও কোনও তাম্রশাসনে "নৌবাট" শব্দ উৎকীর্ণ আছে। বাঙালির নৌবল চিরপরিচিত। মহাকবি কালিদাস এইজন্যই বাঙালিকে "নৌসাধনোদ্যতান্" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কাজেই

রঘুর সহিত বাংলার রাজারা রণতরীসমূহ লইয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবেন কিংবা পক্ষান্তরে দিগ্বিজয় সমুদ্রগুপ্তের সহিত নৌযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বিক্রমপুর অঞ্চলে নানা শ্রেণির নৌকা এখনও প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্থানান্তরে আমরা সেই বিষয় লিপিবদ্ধ করিব। কেদাররায় ৫০০ কোষা লইয়া মোগলের বিরুদ্ধে এবং মগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা সকলেরই জানা আছে। এরূপ স্থলে আমরা নানা অনুকূল প্রমাণের দ্বারা বলিতে পারিতেছি যে, সমুদ্রগুপ্ত যে বাংলার রাজাদের নিকট বাধা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ববঙ্গের প্রতাপশালী নরপতিদিগের কাছেই হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করা সম্পূর্ণ সঙ্গত। কোনও কোনও সুপণ্ডিত ঐতিহাসিকের মতে ইউ-য়ান চুয়াঙ্গের সময়ে মেঘনাদ (মেঘনা) রামপালের নিকটই বোধ হয় সাগর দর্শন করিয়াছিলেন। সেইসময়ে বঙ্গ ও ত্রিপুরার মধ্যে সাগর-শাখা বিস্তৃত ছিল। এইরূপ স্থলে আমরা সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়-যাত্রার ফলে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা সেকালের সমুদ্রশাখা মেঘনাদের বক্ষে হওয়া অসম্ভব নহে এইরূপ অনুমান করিতে পারি। অপরপক্ষে শালিধান্য রোপণ বঙ্গদেশে, বিক্রমপুরে আড়িয়াল বিল অঞ্চলে এখনও রোপিত হইয়া আসিতেছে। কাজেই আমরা অনুমান করিতে পারি শ্রীবিক্রমপুরের অধিবাসী এবং সেকালে পূর্ববঙ্গের রাজাদের সহিতই নৌযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

এখানে আমরা একটা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। সমুদ্রগুপ্ত উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ বিজয় করিয়া 'অশ্বমেধ-যজ্ঞের' অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার আদেশে নির্মিত সেই যজ্ঞীয় অশ্বের একটি প্রস্তরময় মূর্তি হিমালয় পর্বতের পাদমূলে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উহা এখন লক্ষ্ণৌ-এর যাদুঘরে রক্ষিত আছে। সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞে দক্ষিণা দান করিবার জন্য এক নূতন সুবর্ণ মুদ্রা নির্মাণ করেন, ঐ সমুদয় মুদ্রার একদিকে 'যজ্ঞযূপে আবদ্ধ অশ্ব ও অন্যদিকে প্রধানা মহিষীর মূর্তি অঙ্কিত ছিল। সমুদ্রগুপ্তের এই মুদ্রা অধুনা অতি দুষ্প্রাপ্য। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম গৌড় ও রাঢ়া প্রদেশ সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গও গুপ্তসাম্রাজ্যের অর্ন্তভূত ছিল। সুতরাং 'বিক্রমপুর' যে সে সময়ে সমুদ্রগুপ্তের সীমান্তভুক্ত ছিল এইরূপ অনুমান করা একেবারে অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তবে আমরা ইহাও দেখিতে পাইলাম যে, সমতট-বঙ্গের অধিবাসীগণ সহজে সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তাহারা নিজদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রকৃত বীরের ন্যায় দিগ্বিজয়ী বীর সমুদ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের তিন প্রকার সুবর্ণমুদ্রা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারের মুদ্রায় ধনুর্বাণ হস্তে রাজার মূর্তি, দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় পরশু হস্তে রাজার মূর্তি, দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় পশুর হস্তে রাজার মূর্তি এবং তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় শূলহস্তে রাজার মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আর এক প্রকার স্বর্ণমুদ্রায় দেখিতে পাওয়া যায় রাজা একটি আসনে বসিয়া বীণা বাজাইতেছেন। সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র 'দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত' সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাহার মুদ্রায় বিক্রমাঙ্ক, শ্রীবিক্রম, বিক্রমাদিত্য, অজিতবিক্রম, সিংহবিক্রম এইরূপ নানা উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। এই সকল উপাধির মধ্যে বিক্রমাদিত্য উপাধিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উপাধি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে প্রচলিত ছিল। পুরাকালে উজ্জয়িনীর একজন নৃপত্তি শকদিগকে পরাজিত করিয়া 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করেন এবং বিক্রমাব্দ নামে একটি অব্দের প্রচলন করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও এই 'শকারি বিক্রমাদিত্যের' অনুকরণে শকজাতীয় ক্ষত্রপবংশের রাজ্যনাশ করিয়া উজ্জয়িনী অধিকার করিয়াছিলেন এবং 'বিক্রমাদিত্য' নাম ধারণ করিয়াছিলেন ও রাজধানী উজ্জয়িনীতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।

দিল্লির কুতুবমিনারের নিকট মেহরৌলি নামক যে গ্রাম আছে সেখানে লৌহস্তম্ভের গায়ে

একটি খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে। এই লিপিতে 'চন্দ্র' নামক এক রাজার বিজয়-কাহিনী সংক্ষেপে খোদিত আছে। এই চন্দ্র কে? ইনি প্রথম কি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কিংবা অন্য কোনও রাজা সেই বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ প্রচলিত আছে। অনেকে মনে করেন এই চন্দ্র, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ভিন্ন অপর কেহ হইতে পারেন না। মেহরৌলি লিপির চন্দ্ররাজা বঙ্গদেশের বিদ্রোহী শত্রুদলকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, 'চন্দ্র' সমুদ্রগুপ্তের পরবর্তী কোনও রাজা হইবেন, কারণ সমুদ্রগুপ্তই প্রথম বঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন।[১০] অতএব সমুদ্রগুপ্তের পরে বঙ্গবাসীগণ যে দেশের স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহী হইবেন তাহা সম্ভবপর। এখানে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। 'বিক্রমপুর' নামটি প্রাচীন তাম্রশাসনে '**শ্রীবিক্রমপুর**' নামে লিখিত রহিয়াছে। অতএব বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদে 'বিক্রমাদিত্য' রাজার নাম হইতে 'বিক্রমপুর' নামের উৎপত্তি হইয়াছে, এই সম্বন্ধে আমরা এইরূপ অনুমান করিতে পারি যে, সমুদ্রগুপ্তের বঙ্গদেশ বিজয়ের পর তাহার মৃত্যু হইলে বঙ্গবাসীগণ দেশের স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহী হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গদেশে আসিয়া বিদ্রোহ দমন করেন ও নিজের উপাধি '**শ্রীবিক্রম**' সংযুক্ত **পুর** বা **নগর** প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এইরূপ একটা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। যদিও এই বিষয়ে আমরা পূর্বে অন্যরূপ মত প্রকাশ করিয়াছি। এবং এখনও ইহাই সঠিক সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারি কিনা তাহাও বিচার্য। তবে ইহা লৌকিক প্রবাদ ও কিংবদন্তীর সহিত মিলিয়া যায়। সেজন্যই বিশেষভাবে ইহার উল্লেখ করিলাম।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা হিয়ান ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাহার বর্ণনা হইতেও চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানিতে পারিতেছি। কাজেই আমাদের মনে হয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সহিত বঙ্গদেশের বা বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ অপ্রাকৃত নহে।

শাসনের সুবিধার জন্য গুপ্ত সাম্রাজ্যকে অনেকগুলি ছোট-বড় ভাগে বিভক্ত করা হয়। সেই ভাগগুলিকে 'ভুক্তি' বলা হইত। এই ভুক্তি শব্দ পরবর্তী কালেও প্রচলিত ছিল, যেমন পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, বর্ধমানভুক্তি ইত্যাদি।

বর্তমান সময়ে ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, সৌরাষ্ট্র এবং মালবের শক রাজাদের যিনি পরাজিত করিয়াছিলেন সেই শকবিজয়ী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য অভিন্ন ব্যক্তি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাতেই কবি কালিদাস, উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ বিরাজমান ছিলেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি কালিদাস রঘুবংশ নামক কাব্যে রঘুর যে দিগ্বিজয় কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন এবং হরিষেণ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় বর্ণনা এলাহাবাদের স্তম্ভলিপিতে যাহা করিয়াছেন এই দুয়ের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় কালিদাস যেন রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা করিবার স্থলে সমুদ্রগুপ্তেরই দিগ্বিজয় বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় ভারতবর্ষের সর্বত্রই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ভারতের সহিত রোমকসাম্রাজ্যের বাণিজ্য এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, রোমের সুবর্ণমুদ্রা 'দিনেরিয়স্' এদেশে ব্যবহার হইত। গুপ্ত রাজারা রোমের মুদ্রার অনুকরণে সুবর্ণমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। এ সকল মুদ্রাকে 'দিনার বলা হইত। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত রজতমুদ্রারও প্রচলন করিয়াছিলেন। গুপ্তরাজাদের এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা নানা স্থানেই বাংলাদেশে পাওয়া গিয়াছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে প্রায় দুইশত গুপ্তমুদ্রা কালিঘাটে পাওয়া যায়। যশোহর জেলার 'মহম্মদপুর' গ্রামে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অনেক রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তাহার পুত্র 'কুমারগুপ্ত' আনুমানিক ৪১৩ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। পিতার ন্যায় কুমারগুপ্তেরও অনেকগুলি উপাধি ছিল। তিনি তাহার

মুদ্রাতে সেই সকল উপাধির ব্যবহার করিয়াছেন,—যেমন, মহেন্দ্র, মহেন্দ্রাদিত্য, সিংহমহেন্দ্র, অজিতমহেন্দ্র, গুপ্তকুলব্যোমশশি, 'অশ্বমেধ মহেন্দ্র' ইত্যাদি। আমরা এই সমুদয় উপাধি হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, কুমারগুপ্ত আপনাকে বীরত্ব ও প্রতাপের দিক দিয়া পিতার সমকক্ষ মনে করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাহার রাজ্যকালের শিলালিপি এবং মুদ্রার প্রাপ্তি-স্থান হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, তাহার অধিকার বঙ্গদেশ হইতে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত অপ্রতিহত ভাবে বিদ্যমান ছিল। তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ তাহার অমাত্য চিরাতত্ত্ব পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি অর্থাৎ, উত্তরবঙ্গ শাসন করিতেন। কিন্তু বঙ্গ, পূর্ববঙ্গ বা সমতটে কে শাসন করিতেন? তাহার কোনও উল্লেখ নাই। অতএব 'শ্রীবিক্রমপুর' কোনও অজ্ঞাতনামা রাজার অধীনে স্বাধীন ছিল, এইরূপ অনুমান ব্যতীত আমরা আর কিছুই বলিতে পারি না। পিতামহ সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় কুমারগুপ্তও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকাল ৪১৫ গৌপ্তাব্দে আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার সময়কার ছয়টি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহার রজতমুদ্রায় ১৩৬ গৌপ্তাব্দ পর্যন্ত বর্ষ অঙ্কিত পাওয়া গিয়াছে। তাহার রাজ্যকালের অবসান ঐ বর্ষ অর্থাৎ, ৪৫৬ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি হইয়াছিল।

স্কন্দগুপ্ত ঃ

কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষভাগে, গুপ্তসাম্রাজ্য পরাক্রান্ত পুষ্যমিত্র ও হূণজাতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। পুষ্যমিত্রের সহিত যুদ্ধে সম্রাটের সেনা পরাজিত হইলে যুবরাজ ভট্টারক স্কন্দগুপ্ত অসাধারণ পরাক্রমের সহিত তাহাদিগকে পরাজিত করেন। ভিটারি লিপিতে [গাজিপুর জেলায় ভিটারি নামক স্থানের স্তম্ভগাত্রে খোদিত লিপি] হইতে জানা যায় যে, যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত পিতৃকুলের বিরচিত রাজলক্ষ্মীকে স্থির করিবার জন্য এক রাত্রি ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। "অর্থাৎ, যুবরাজকে রণক্ষেত্রেই রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। আনুমানিক ৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে কুমারগুপ্ত পরলোক গমন করিলে—স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনারোহণ করেন।

স্কন্দগুপ্ত বীর রাজা ছিলেন। তিনি হূণদিগকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু হূণেরা পরাজিত হইয়াও উত্তরাপথ আক্রমণ করিতে বিরত হয় নাই। এই জন্য তাহাকে বিশেষ সতর্কতার সহিত রাজ্যের প্রান্তদেশ-সমূহ রক্ষা করিতে হইয়াছিল।

স্কন্দগুপ্তের প্রভাব—তাহার জীবিতকালে সৌরাষ্ট্র হইতে বঙ্গদেশ অবধি অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি কুমারগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তাহার মুদ্রায় তিনি পরম ভাগবতরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাহার উদারতা ছিল অসাধারণ। রাজা নিজে বৈষ্ণব হইলেও জৈন ও অন্যান্য ধর্মের প্রতি সহানুভূতির অভাব ছিল না। তিনি কোনও ধর্মেরই বিদ্বেষী ছিলেন না। আনুমানিক ৪৬৭ খ্রিস্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হয়।

গুপ্তসাম্রাজ্যের পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির শাসনকর্তা ঃ

অনেক ঐতিহাসিকের এইরূপ ধারণা যে, স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পরই গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু একথা প্রমাণসহ নহে। শিলালেখন ও সাহিত্য দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, গুপ্তসাম্রাজ্য পঞ্চম শতাব্দীর উত্তরার্ধেও **মালব হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল**। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে গুপ্তরাজাদের অধিকার **উত্তরবঙ্গ**, বিহার, প্রয়াগ, অযোধ্যা, যমুনা ও নর্মদার মধ্যবর্তী দেশ (বুন্দেলখণ্ড, বঘেলখণ্ড, জব্বলপুরের নিকটবর্তী প্রদেশ ইত্যাদি) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৫৩৩ খ্রিস্টাব্দে একজন পরমভট্টাব মহারাজাধিরাজ ও গুপ্তসম্রাটের পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি অর্থাৎ, উত্তরবঙ্গে শাসন করিয়াছিলেন এইরূপ জানিতে পারা যায়।

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা পুরগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতি অল্পকাল

রাজত্ব করিবার পর তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মহিষী বৎসদেবীর পুত্র নরসিংহগুপ্ত পিতার পর সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। নরসিংহগুপ্ত, বালাদিত্য উপাধি ধারণ করেন। আনুমানিক ৪৭৩ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। তাহার মহিষীর নাম মহালক্ষ্মী দেবী। মহালক্ষ্মী দেবীর গর্ভজাত পুত্র কুমারগুপ্ত (দ্বিতীয়) বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহার রাজত্বকাল ৪৭৫—৭৭ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সমাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে পুর, নরসিংহ ও দ্বিতীয় কুমারের রাজত্বকাল মাত্র দশ বৎসরকাল স্থায়ী ছিল।

দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের পর বুধগুপ্ত, গুপ্তসাম্রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন। ইহার পরিচয় সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে অনুমিত হয় যে, তিনি প্রথম কুমারগুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুকালে তাহার বয়স বেশি ছিল না। তিনি একে একে জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্কন্দগুপ্ত ও পুরগুপ্ত, ভ্রাতুষ্পুত্র নরসিংহগুপ্ত ও পৌত্র কুমারগুপ্ত দ্বিতীয়কে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিলেন। অবশেষে পৌত্রের মৃত্যুর পর কেহই যখন সিংহাসনের দাবি করিবার রহিল না; তখন তিনি নিজেই রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধগুপ্ত ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন, তাহার শাসনকালে **বঙ্গদেশ** হইতে মালব পর্যন্ত গুপ্তসাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাহার মৃত্যুর পর হূণেরা ক্রমশ গুপ্তসাম্রাজ্যের সীমা লঙ্ঘন করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে গুপ্তসাম্রাজ্য খণ্ড ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। হূণেরা একে একে মালব, রাজপুতানা এবং পাঞ্জাব অধিকার করিল। এইভাবে **সমুদ্রগুপ্ত** ও **দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য** প্রতিষ্ঠিত বিরাট গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

ভানুগুপ্ত নামক একজন গুপ্তরাজার নাম অরিকিনের (Eran) লিপিতে পাওয়া যায়। এই ভানুগুপ্ত ও বালাদিত্য অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনেকেই মনে করেন। লিপিতে ভানুগুপ্তকে 'পৃথিবীর বীর ও পার্থের ন্যায় শক্তিশালী নরেশ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ভানুগুপ্ত সম্ভবত মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মিহিরকুল পরাজিত হইবার পরেও নানারূপ নৃশংস অত্যাচারের দ্বারা ভারতবর্ষে এক ভীষণ ত্রাসের সঞ্চার করেন, সেই সময়ে মাণ্ডাসোরের (Mandasor) রাজা যশোধর্মদেব ৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের কিছু পূর্বে এই রক্তপিপাসু নররাক্ষসের হস্ত হইতে ভারতের উদ্ধার সাধন করেন।

যশোধর্মদেবের রাজকবি বাসুলি বিরচিত কীর্তি-গাথা হইতে আমরা যশোধর্মের ইতিহাস জানিতে পারি। মাণ্ডাসোরের (Mandasor) লিপি উৎকীর্ণ হইবার দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ৫৪৯—৫৪ খ্রিস্টাব্দে গুপ্তবংশের এক প্রতিনিধি যাহাকে একটি লিপিতে পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ, পৃথিবীপতি বলা হইয়াছে, **বঙ্গদেশের পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিতে** (উত্তরবঙ্গ) শাসন করিতেছিলেন। কালবশে লিপি হইতে তাহার নামটি বিলুপ্ত হওয়ায় ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা অন্ধকার রহিয়াছে। কোনও গুপ্ত রাজার প্রতিনিধি বঙ্গদেশে শাসন করিতেছিলেন, তাঁহার পরিচয় আমরা জানিতে পারিলাম না।

যশোধর্মদেবের মৃত্যুর পর আর্যাবর্তের শাসনভার **মৌখরি** নামক রাজবংশের নৃপতিদের হস্তে পতিত হয়। মৌখরিগণ প্রথমে মগধে বাস করিতেন। মৌখরিরা পরে কান্যকুব্জে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। মৌখরি রাজারা গুপ্তসম্রাটদের পদ ও গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন। মৌখরিদের প্রাচীন ইতিহাস বেশ ভাল করিয়া জানিবার উপায় নাই। মৌখরি নামে একটি প্রাচীন গোত্রের কথা জানা যায়। জয়াদিত্য ও বামনের কাশিকাবৃত্তি নামক পাণিনিরচিত আষ্টাধ্যায়ী নামক ব্যাকরণ-সূত্রের টীকা-গ্রন্থে মৌখরি নাম পাওয়া গিয়াছে। কাশিকাবৃত্তি খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীর বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন।

মৌখরি নামের উৎপত্তি যাহাই হউক, এই নামের দুইটি রাজবংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। একটি গয়ার নিকটে অবস্থিত বরাবর ও নাগার্জুনী নামক পর্বতমালায় অবস্থিত

"গুম্ফামন্দিরের" (Cave-Temple) ভিত্তিগাত্রে খোদিতলিপি হইতে মৌখরি-রাজ **অনন্তবর্মা,** তাহার পিতা শার্দুলবর্মা ও পিতামহ যজ্ঞবর্মার নাম পাওয়া গিয়াছে। এই তিনজনের শাসনকাল খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দী নির্ধারিত হইয়াছে। খুব সম্ভবত ইহারা গুপ্তসম্রাটদের সামন্ত ছিলেন।

এই বংশের প্রধান তিনজন রাজার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। **হরিবর্মা, আদিত্যবর্মা** এবং **ঈশ্বরবর্মা।** ঈশ্বরবর্মার সময়েই মৌখরিবংশ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঈশ্বরবর্মার পিতা আদিত্যবর্মা এবং স্বয়ং ঈশ্বরবর্মা উভয়েই গুপ্তরাজবংশের রাজকুমারীদের বিবাহ করেন। এই বিবাহের দ্বারা যে তাহাদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ঈশ্বরবর্মার উত্তরাধিকারীর নাম **ঈশানবর্মা।** ঈশানবর্মা 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।[১১ক/খ] আনুমানিক ৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে ঈশানবর্মা সম্ভবত গুপ্তরাজ তৃতীয় কুমারগুপ্তের সহিত অসিতে অসিতে সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়াছিলেন। এবং হূণদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনি **আন্ধ্র, শুলিক** ও **গৌড়দিগকে** রণে পরাজিত করিয়াছিলেন। এইরূপ বিজয়ের দ্বারা প্রভাবশালী হইয়া এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়াই তিনি 'মহারাজাধিরাজ' পদবি ধারণ করিয়াছিলেন। ঈশানবর্মার বিজয়-কাহিনী তাহার 'হারাহা' নামক গ্রামে প্রাপ্ত শিলালিপিতে বর্ণিত আছে। গৌড়দের উল্লেখ সর্বপ্রথম হারাহা লিপিতেই পাওয়া যায় এ বিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে।

ঈশানবর্মার পরে সর্ববর্মা মৌখরি রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। সেসময়ে গুপ্তবংশের দামোদর গুপ্ত রাজত্ব করিতেন। সর্ববর্মার সহিত দামোদর গুপ্তের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে সম্ভবত দামোদর গুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল। এই সর্ববর্মার রাজত্বকালেই মগধ মৌখরি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। আদিত্য সেনের অফসড় লিপি হইতে জানা যায় যে, দামোদর গুপ্ত সম্মুখসমরে প্রাণ বিসর্জন করেন। দামোদর গুপ্তের পর তাহার পুত্র মহাসেন গুপ্ত সিংহাসনারোহণ করেন। মৌখরি সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্তের রাজ্য মালবদেশে সীমাবদ্ধ ছিল। মহাসেনগুপ্তের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা, আসামরাজ সুস্থিরবর্মার সহিত তাহার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মহাসেনগুপ্ত বিজয়ী হইয়াছিলেন। অফসড়ের লিপিতে এই বিজয়-কাহিনী লিখিত আছে। মহাসেনগুপ্ত স্থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করেন। এই বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধন শ্রীকণ্ঠে (স্থানেশ্বরে) এক শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পুত্র হর্ষবর্ধন পরে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উত্তর ভারতে এক বিরাট সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মহাসেনগুপ্তের পরে দেবগুপ্ত নামক একজন মালব নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীহর্ষের রাজ্যকালে স্বাধীন গুপ্ত-রাজাদের কোনও প্রভাব ছিল না।

আমরা পূর্বে সংক্ষেপে গৌড়দেশের কথা আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু আমরা গুপ্ত রাজাদের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, সমুদ্রগুপ্ত এমন পাঁচটি রাজ্য বিজয় করিয়াছিলেন, যাহাদের রাজ্য কলিঙ্গ বাজ্যের সীমান্তভুক্ত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে শৈলোদ্ভব নামক একটি রাজবংশ কলিঙ্গদেশে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের বিষয় আমাদের আলোচনা অনাবশ্যক।

হর্ষের রাজত্বকালে বাংলাদেশে আমরা একজন অতি পরাক্রমশালী নৃপতির পরিচয় পাই। তিনি মহারাজা শশাঙ্ক। মহারাজা শশাঙ্ক গৌড়েশ্বর ছিলেন। তাহার সহিত মহারাজ হর্ষের যে কলহ হইয়াছিল, তাহা আমরা বাণভট্ট-প্রণীত হর্ষচরিত এবং চৈনিক পরিব্রাজক ইউ-য়ান্-চুয়াং-এর ভ্রমণ-বিবরণী হইতে জানিতে পারি। কয়েক-খানি খোদিতলিপি হইতেও শশাঙ্কের বিষয় অবগত হওয়া যায়। বঙ্গদেশ ও মগধের নানাস্থান হইতে শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রাদিত্য নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ইউ-য়ান্-চুয়াং লিখিয়াছেন—"বৌদ্ধধর্মের প্রবল শত্রু কর্ণসুবর্ণের নৃপতি শশাঙ্ক হর্ষবর্ধনের

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনকে নিহত করিয়াছিলেন। তিনি এতদূর বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন যে, বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ ছেদন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।" এই ভাবে চীনদেশীয় শ্রমণ শশাঙ্ককে একজন বৌদ্ধ-বিদ্বেষী এবং বৌদ্ধ-নির্যাতনকারী নৃপতিরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। হর্ষচরিতে এই রাজাকে 'দুষ্ট-গৌড়-ভুজঙ্গ" নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই শশাঙ্ক কে ছিলেন সে বিষয়ে অনেকের মতভেদ আছে। হর্ষ-চরিতের-বর্ণনানুসারে ইহাকে গৌড়াধিপতি বলিয়া মনে হয়। সেকালে গৌড় বলিতে প্রধানত উত্তরবঙ্গ বুঝাইত। অতএব আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে শশাঙ্ক মগধ গৌড় ও রাঢ় দেশের অধিকারী ছিলেন। ইহার অপর নাম নরেন্দ্রগুপ্ত। হর্ষ-চরিতের একখানা পুঁথিতে নরেন্দ্রগুপ্তের নাম উল্লিখিত আছে। সে যাহাই হউক, আমরা দেখিতে পাইলাম যে, গৌড়াধিপ শশাঙ্ক মগধ, গৌড় ও রাঢ়া দেশের অধিপতি ছিলেন—বঙ্গ রাজ্যের সহিত কোনও সম্পর্ক তাহার ছিল না। যদি ইনি বঙ্গ বা পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন তাহা হইলে সমতট বা বঙ্গের উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত। স্বর্গত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বন্ধুবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ "বাংলার ইতিহাসে" শশাঙ্কের পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"নরেন্দ্রগুপ্ত নাম দেখিলে বোধ হয় যে, তিনি গুপ্তবংশীয় নরপতি ছিলেন। গুপ্তনামধারী অভিজাত কুলজ কোনও ব্যক্তি কর্তৃক রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পরে কান্যকুব্জ অধিকারের উল্লেখ দেখিয়া পূর্বোক্ত অনুমান যথার্থ বলিয়া বোধ হয়। তাহার যে সমস্ত মুদ্রা শশাঙ্ক নামে মুদ্রাঙ্কিত, তৎসমুদায়ের একপার্শ্বে হস্তীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহাদেবের মূর্তি ও অপর পৃষ্ঠে পদ্মাসনে সমাসীনা লক্ষ্মীর মূর্তি আছে। প্রাচীন ও গুপ্তরাজবংশের সুবর্ণমুদ্রাসমূহের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুই-একটি বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও শশাঙ্কের মুদ্রার সহিত প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের সুবর্ণমুদ্রার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। প্রথমত মুদ্রার দ্বিতীয় পৃষ্ঠে কমলাত্মিকা মূর্তি, দ্বিতীয়ত মুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠে রাজার নাম লিখনের পদ্ধতি, গুপ্ত-মুদ্রার সহিত শশাঙ্কের মুদ্রার তুলনা করিলে এই দুইটি সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গুপ্তসম্রাটগণ ভাগবৎ মতাবলম্বী অর্থাৎ বৈষ্ণব ছিলেন; কিন্তু শশাঙ্ক শৈব ছিলেন সেইজন্যই বোধ হয়, তাহার মুদ্রায় বৃষভবাহন মহাদেবের মূর্তি দেখা যায়। অধিকাংশ গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের মুদ্রায় রাজার নাম লিখনকালে একটি অক্ষরের নিম্নে আর একটি অক্ষর অঙ্কিত হইত, শশাঙ্কেব মুদ্রাতেও এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যশোহর জেলার মহম্মদপুর গ্রামেও অজ্ঞাতস্থানে প্রাপ্ত যে দুইটি মুদ্রা কলিকাতার চিত্রশালায় আছে, তাহাদিগের দ্বিতীয় পৃষ্ঠে যে খোদিতলিপি আছে, কোনও পণ্ডিতের মতে তাহার প্রকৃত পাঠ 'নরেন্দ্রাদিত্য'। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নরেন্দ্রাদিত্য শশাঙ্কের "আদিত্য" নাম ছিল। সমুদ্রগুপ্ত ব্যতীত অন্যান্য গুপ্ত রাজগণের এইরূপ আদিত্য নাম ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমদিত্য, কুমারগুপ্ত, মহেন্দ্রাদিত্য, স্কন্দগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, নরসিংহগুপ্ত, বালাদিত্য, চন্দ্রগুপ্ত দ্বাদশাদিত্য ইত্যাদি। শশাঙ্কের রাজ্য ও তাহার বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইল, তাহা হইতে অনুমান হয় যে; তিনি মগধের গুপ্তবংশজাত ছিলেন এবং মহাসেনগুপ্তের পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। মগধের গুপ্তরাজবংশ সম্ভবত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কনিষ্ঠপুত্র গোবিন্দগুপ্ত হইতে উৎপন্ন।"[১২ক/খ] এ-সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরি বলেন,—"মৌখরি নৃপতিদের ন্যায় সম্ভবত বাংলাদেশের শাসনকর্তারাও খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসনাধিকারে যে ছিল সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বাংলাদেশের সীমা কতদূর—অর্থাৎ, গুপ্তরাজারা যে বাংলাদেশের উপর আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যন্ত প্রদেশের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমরা প্রয়াগের অশোকস্তম্ভ-গাত্রোৎকীর্ণ প্রশস্তি হইতে সমুদ্রগুপ্তের যে দিগ্বিজয় কাহিনির বর্ণনা পাই, তাহা হইতে

জানিতে পারিতেছি যে, সমতট এবং ডবাক ব্যতীত বাংলার অন্যান্য অংশ পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, উত্তরবঙ্গ এবং রাঢ় অর্থাৎ সমুদয় পশ্চিমবঙ্গ সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। তবে উত্তরবঙ্গ (পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি) প্রথম কুমারগুপ্তের সময়ে আনুমানিক ৫৪৩—৪৪ খ্রিস্টাব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এই বিবরণ আমরা দামোদরপুরের লিখন হইতে জানিতে পারি। সমতট বা বঙ্গরাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমার বহির্ভূত ছিল, তথাপি তাহাদের উপরে গুপ্ত রাজগণের প্রভাব বিস্তৃত ছিল না এমন কথা বলা যায় না।”

আমরা উত্তর ভারতের সম্বন্ধে এবং বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিলাম। আমরা একটি কথা বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিলাম যে, চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গৌড়দেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল; এ-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই, কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড়দেশের রাজ্যগুলি স্বাধীন হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে মালব ও গৌড়দেশের গুপ্তরাজা তাহাদের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা পুনরায় ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট হইবার উচ্চাশা অন্তরমধ্যে পোষণ করিতেন। তাহাদের এই আশা-পূর্ণের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইছিল থানেশ্বর ও কান্যকুব্জের মিত্রশক্তি। থানেশ্বরের বর্ধন নৃপতি ও কান্যকুব্জের মৌখরি রাজা উভয়েই গুপ্তদের বিশেষ শত্রু ছিলেন। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পরে গুপ্তেরা মৌখরি ও পুষ্যভূতিদিগকে প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

পূর্বে আমরা বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক বিষয়ই জানিতে পারি নাই। বর্তমান সময়ে এ-বিষয়ে আমরা কিছু কিছু জানিতে পারিতেছি। একটি বিষয়ে বিশেষভাবে গৌরব বোধ করিতেছি এজন্য যে, পূর্বে অনেকেরই এইরূপ একটা মত ছিল যে, বাংলাদেশ অতি আধুনিক; ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে ইহার দাবি চলিতে পারে না এবং পাল রাজাদের পূর্বে বাংলাদেশের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। সৌভাগ্যক্রমে বিবিধ ঐতিহাসিক আবিষ্কারের দ্বারা বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের সমৃদ্ধি দিন-দিনই আমাদের নিকট সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি রাঁচি-প্রবাসী রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের অসাধারণ চেষ্টা, যত্ন ও গবেষণায় বাংলাদেশের প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের অনেক কিছু প্রত্নচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিঃ ই. এ. মরে (E. A. Morray) টাটানগরের কাছাকাছি রুয়ানগর (Ruanagar) নামক স্থানে অনেক কিছু প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগের চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, একসময়ে বৃহত্তর বঙ্গের বিস্তৃত ভূ-ভাগ ছোটনাগপুর এবং বিহারের সভ্যতার ইতিহাস কোনওরূপে আধুনিক বলা যাইতে পারে না।

বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর নামক স্থানেও অনেক কিছু প্রাচীন প্রত্নচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজসাহি জেলায় চব্বিশ পরগণায় এবং মেদিনীপুর, হুগলী প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকা খননের সহিত ৩য়, ৪র্থ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দের এবং ২য় ও ৩য় শতাব্দীর যে সমুদয় রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় এক সময়ে বাংলাদেশের উপর কুষাণ ও নৃপতিগণেরও প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

আমরা এই অধ্যায়ে গুপ্ত রাজাদের সম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ আলোচনা করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে যদিও আমরা এখন পর্যন্ত গুপ্তরাজাদের সমকালীন বাংলাদেশের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে জানিবার সুযোগ পাই নাই, তথাপি এই কথা বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই বলিতে পারা যায় যে, খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে বাংলাদেশের ইতিহাস বেশ ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। আমরা এই অধ্যায়ে মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত মৌর্যব্রাহ্মী-লিপির কথা উল্লেখ করিয়াছি। মহাস্থানগড়ই যে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরী ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। গুপ্তরাজাদের সময়ে পুণ্ড্রবর্ধন বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। যখন মহাস্থানগড়ের নানাস্থানের খনন-কার্য সম্পূর্ণ হইবে তখন আমার আশা করিতে

পারি, গুপ্তরাজাদের সমসাময়িক ইতিহাস আরও সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারিব এবং রাঢ়া, বারেন্দ্র, বঙ্গ এই বিরাট বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস আমাদের বিশেষ গৌরবের কারণ হইবে।

এখন আমরা দেখিতে পাইলাম যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকার বাংলাদেশে বিস্তৃত ছিল, কিন্তু কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহা সঠিক জানিতে পারা যায় নাই। সম্প্রতি যে-সকল ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে, পৌণ্ড্রবর্ধন নগর গুপ্তযুগ হইতেই বাংলাদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার অবশেষ করতোয়া তীরে বগুড়ার অন্তর্গত মহাস্থানগড়ের ধ্বংস-স্তূপগুলির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মহাস্থানের ধ্বংসস্তূপগুলি প্রায় চারি মাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। ইহার কোনও কোনও স্থান খনিত হওয়ায় গুপ্তযুগ হইতে পালযুগ পর্যন্ত অর্থাৎ অনুমান পঞ্চম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত নানা প্রাচীন কীর্তির চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে, গুপ্তরাজাদের প্রভাব বারেন্দ্রভূমির পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই বারেন্দ্রভূমিই পরে গৌড় সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হয়। বাংলাদেশের অন্যান্য ভূখণ্ড এবং কামরূপ ইত্যাদি গুপ্তলিপি এবং গুপ্ত শাসনরীতি অনুসরণ করিলেও গুপ্তরাজাদের শাসনাধীনে ছিল এমন কথা বলা চলে না। এইরূপ স্থলে অনুমান করা যায় যে, কুমারগুপ্তের পূর্বে সমগ্র বাংলাদেশ কখনই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইতে পারে না।

গুপ্তরাজাদের বিষয়ে আমাদের আর বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা অনাবশ্যক। আমরা দেখিতে পাইলাম গুপ্তরাজাদের প্রভাব উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ বারেন্দ্রভূমে যেইরূপ বিস্তৃত ছিল বঙ্গদেশের অন্য কোথাও তদ্রূপ ছিল না। খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে সকল পরাক্রান্ত নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে মহারাজ শশাঙ্কের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বিহার প্রদেশে সাহাবাদ জিলার অন্তর্গত সাসারাম হইতে চব্বিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রোটাসগড় অবস্থিত। অনেকদিন পূর্বে রোটাসগড় গিরিদুর্গস্থ প্রস্তর গাত্রে খোদিত একটি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে লেখা আছে—"শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক দেবস্য"—শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেবের। ঐতিহাসিকগণের মতে ইহাই মহারাজ শশাঙ্কের সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রমাণ-লিপি। অক্ষরতত্ত্বের আলোচনার দ্বারা এই শিলালিপির কাল সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ-কালের বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এই মহারাজ শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই শশাঙ্ক করদ রাজা ছিলেন। কিন্তু ইনি কোনও্ রাজার অধীনে করদ রাজা ছিলেন তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে মৌখরি ঈশানবর্মার রাজত্বকালের হারাহা লিপি ৫৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশানবর্মার পরে একে একে সর্ববর্মা, অবন্তীবর্মা ও গ্রহবর্মা ক্রমান্বয়ে মৌখরি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ৬০৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথমভাগে গ্রহবর্মা অকালে নিহত হন। ঐতিহাসিকগণের মতে শশাঙ্ক মহারাজা গ্রহবর্মা ও অবন্তীবর্মার সময়ে রাজত্ব করিতেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন যে, মহারাজ শশাঙ্ক সাহাবাদ জেলার করদ রাজা ছিলেন। এবং তিনি সর্বপ্রথম অবন্তীবর্মা ও তাহার পুত্র গ্রহবর্মার অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন। ডাঃ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বলেন—"শশাঙ্ক সর্বপ্রথমে কর্ণসুবর্ণে স্বীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেন। তারপর তিনি ক্রমশ পুণ্ড্রবর্ধন, গয়া, রোহিতগিরি এবং চোঙ্গোদ-মণ্ডল করায়ত্ত করেন। শশাঙ্ক মৌখরিদের অধীনে মহাসামন্তরূপে রাঢ়া, গৌড় ও মগধে শাসন করিতেন বলিয়া সমীচীন বোধ হয় না। মহাসামন্ত শশাঙ্ক উক্ত দেশত্রয়ে শাসক ছিলেন ধরিয়া লইলে তাহার রাজ্য অধিরাজের রাজ্য হইতে বৃহৎ ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইবে। বস্তুত মহাসামন্ত শশাঙ্কের আধিপত্য সাহাবাদ জিলা ভিন্ন অন্য কোনও প্রদেশের উপর বিস্তৃত ছিল বলিয়া, কোনও প্রমাণ নাই। রোহিতগিরি বর্তমান রোটাসগড়, প্রাচীনকালে একটি বিখ্যাত

স্থান ছিল। ইহা পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশোদ্ভব নৃপতিগণের পূর্বপুরুষদের রাজধানী ছিল। শশাঙ্ক সর্বপ্রথমে রোটাসগড়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুতরাং, মূলত শশাঙ্ক রোটাসগড়েরই অধিবাসী ছিলেন। এমতাবস্থায় শশাঙ্ককে বাংলার সর্বপ্রথম জাতীয় বীর বলিয়া উল্লেখ করা চলে। 'শশাঙ্ক বাংলার জাতীয় বীর বলিয়া গণ্য হইলে অন্যান্য যে সমস্ত বিদেশি বাংলা জয় করিয়াছিল তাহাদিগকেও বাংলার জাতীয় বীর বলা যাইতে পারে।"

শশাঙ্ক পশ্চিম দেশে যুদ্ধাভিযানে পূর্বে মগধ, গৌড় ও রাঢ়া জয় করিয়াছিলেন। রোটাসগড় হইতে কর্ণসুবর্ণে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। প্রাচীন কর্ণ-সুবর্ণের বর্তমান নাম রাঙ্গামাটি। উহা মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। শশাঙ্কের জয়ের অব্যবহিত-পূর্বে গৌড় ও রাঢ়ার অধিপতি কে ছিলেন তাহা সঠিক নির্ণয় করার উপায় নাই। বপ্পকোষ তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে, খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে জয়নাগ কর্ণসুবর্ণের অধিপতি ছিলেন। সম্ভবত ভাস্করবর্মা জয়নাগকে পরাজিত করিয়া কর্ণসুবর্ণ আপনার অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে শশাঙ্ক গৌড়দেশ তাহার নিকট হইতে জয় করিয়াছিলেন। ইহার পরেই ভাস্করবর্মা কামরূপের সিংহাসন রক্ষা করিবার জন্য হর্ষের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

মহারাজ শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিরস্ত্র অবস্থায় রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া যে ঐতিহাসিক বিতর্ক চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহাই হোক ৬১৫—৬১৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব হইতে শশাঙ্কের রাজশক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। উক্ত বর্ষে দ্বিতীয় পুলকেশী তাহার নিকট হইতে কলিঙ্গ অধিকার করেন। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইউ-আন্-চাং মগধ পরিদর্শন করেন। তাহার মগধ ভ্রমণের কিছুকাল পূর্বেই শশাঙ্ক বুদ্ধগয়াতে বোধিবৃক্ষ ধ্বংস করিয়াছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর অশোকের শেষ বংশধর পূর্ণবর্ম মগধের রাজা হইয়াছিল। চীন পরিব্রাজক পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি রাজ্য কাহার দ্বারা শাসিত হইতেছিল তাহার কোনও পরিচয় দিয়া যান নাই। কাজেই ঐ সমুদয় দেশ কাহার দ্বারা শাসিত হইত তাহা বলা কঠিন। সে সময়ে গৌড়দেশের এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে, দেশের মধ্যে ভয়ানক অরাজকতা আরম্ভ হয়। কোনও রাজা এক সপ্তাহ, কোনও রাজা দুই সপ্তাহ, কেহ বা একমাস কাল রাজত্ব করেন।

ইউ-য়ান্-চাং বলেন শশাঙ্কের অত্যাচারেই বৌদ্ধধর্মের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। ৬১৯ খ্রিস্টাব্দের পর এবং ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে তাহার রাজত্বের অবসান হয়। বিক্রমপুর-রামপালে আবিষ্কৃত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, প্রাচীনকালে চন্দ্রবংশ রোহিতগিরিতে রাজত্ব করিত। শ্রীচন্দ্রের প্রপিতামহ ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রবংশীয় ছিলেন। উক্ত চন্দ্রবংশের সহিত শশাঙ্কের কোনও সংস্রব ছিল কি না তাহা বলা কঠিন।

এইরূপস্থলে পূর্ববঙ্গের বঙ্গরাজ্যে শশাঙ্কের কোনও প্রভাব বিদ্যমান ছিল কি না বলা সম্ভবপর নহে। কেন-না সেই সময়ে বঙ্গদেশ খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভাবেই শাসিত হইত।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, গুপ্ত রাজাদের সময় ভারতবর্ষে শিল্প ইত্যাদির দিক দিয়া যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, এবং পাহাড়পুরের দুইটি বিখ্যাত ধর্মকেন্দ্র ছিল। পাহাড়পুরে জৈন প্রভাব যে বিদ্যমান ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। ৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল চিনা-শ্রমণ আসিয়াছিলেন এবং সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থানের পর বহু প্রাচীন বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই গুপ্ত রাজাদের সময়ে নালন্দা-বিহারের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল এবং উহার সমৃদ্ধি দেশ-বিদেশে প্রচারিত হয়।

গুপ্ত রাজারা কোনও্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং কোনও্ দেব-দেবীর উপাসক ছিলেন তাহা বলা কঠিন এবং তাহাদের রাজধানীই বা কোথায় ছিল তাহাও সঠিকভাবে বলা যায় না।

কোনও কোনও ঐতিহাসিক তাহাদের মুদ্রায় লক্ষ্মীর মূর্তি খোদিত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহারা বৈষ্ণবমতাবলম্বী ছিলেন। গয়ার খোদিত-লিপিতে গরুড় চিহ্ন মুদ্রিত দেখিয়া সিদ্ধান্তে তাহারা উপনীত হইয়াছেন। অনেকে বলেন তাহাদের রাজধানী পাটলিপুত্র বা বর্তমান পাটনা নগরীতে ছিল। কালিদাসের মতে তাহাদের রাজধানীর নাম ছিল পুষ্পপুর—

অনেন চেদিচ্ছসি গৃহ্যমাণং পাণিং বরেণ্যেন কুরু প্রদেশে।
প্রাসাদ-বাতায়ন-সংশ্রিতানাং নেত্রোৎসবং পুষ্প-পুরাঙ্গনানাম্ ॥

রাজপুত্রি! এই বরণীয় মগধরাজ কর্তৃক পাণি-পীড়ন যদি তোমার অভিলষিত হয়, তবে পরিণয়ের পর শোভাযাত্রা করিয়া যখন পাটলিপুত্র নগরে মহাসমারোহে প্রবেশ করিবে, তখন তত্রত্য প্রাসাদসমূহের গবাক্ষদেশে দাঁড়াইয়া কত সুন্দরী ললনারা তোমার কমনীয়-কান্তি দর্শনে নয়ন সার্থক করিবে।" *(রঘুবংশ—ষষ্ঠ সর্গঃ ২৪ শ্লোক) বসুমতী সংস্করণ*

পালরাজগণের অভ্যুদয়

মহারাজা শশাঙ্কের পর অনেকদিন পর্যন্ত গৌড় বা বঙ্গদেশের কোনও প্রকৃত ইতিহাস জানিতে পারা যায় না। সে-সময়ে বাংলাদেশ বলিতে সমগ্র গৌড়দেশকে বুঝাইলেও উহা উত্তর ভাগকেই বিশেষরূপে বুঝাইত। এই সময়ে নানা বিদেশি রাজারা বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্মার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি তদানীন্তন গৌড়ের রাজাকে নিহত করেন এবং অসংখ্য হস্তীর অধিনায়ক বঙ্গরাজকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। এইভাবে নানারূপ বিদ্রোহ ও অশান্তির ভিতর দিয়া বাংলাদেশের শাসনকার্য চলিতেছিল। দেশের নানাস্থানে অশান্তি, বিদ্রোহ, কু-শাসন প্রভৃতির জন্য দেশে কোনওরূপ শান্তি ছিল না। অনেকে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের পুত্র জয়াপীড় গৌড়-বিজয় করিয়াছিলেন বলিয়া থাকেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের মতে জয়াপীড়ের গৌড়দেশে আগমনের কথা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত।

অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত উত্তর ভারতে এমন কোনও ক্ষমতাশালী নৃপতির আবির্ভাব হয় নাই যিনি সমগ্র উত্তর ভারতের উপর আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই সময়ে বাংলাদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। বিদেশিয় রাজগণ কর্তৃক আক্রমণে গৌড়ের প্রজারা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তারপর গুপ্তবংশের দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের মৃত্যুর পরে কোনও রাজাই গৌড়, মগধ ও বঙ্গে আপনাদের আধিপত্য দৃঢ়ভাবে স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাহারই ফলে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিরা পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া নিজেদের শক্তির অপচয় করিতেন। মিলিতভাবে দেশের কল্যাণ করিবার মত আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চ আদর্শ তাহাদের কাহারও ছিল না। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। দেশপ্রীতি বলিয়া কোনওরূপ অনুভূতি তাহাদের মধ্যে ছিল না। সেই সময়ে বাংলাদেশের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া সন্ধ্যাকর নন্দী উহা মাৎস্যন্যায়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন। মাৎস্যনায় বলিতে অরাজকতা বুঝায়। মাৎস্যন্যায় সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত একটি লৌকিক ন্যায়। তাহার অর্থ—দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার-জনিত অরাজকতা। উদাসীন শ্রীরঘুনাথ বর্ম বিরচিত "লৌকিক ন্যায়-সংগ্রহ" গ্রন্থে "মাৎস্যন্যায়" এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা—

"প্রবল-নির্ব্বল-বিরোধে সবলেন নির্ব্বল-বাধাবিক্ষায়াং তু মাৎস্যন্যায়াবতারঃ। অয়ং প্রায়ঃ ইতিহাস পুরাণাদিষু দৃশ্যতে, যথাহি বাসিষ্টে প্রহ্লাদাখ্যানে তৎসমাধিং প্রস্তুত্যোক্তিম্—

এতাবতাথ কালেন তদ্রসাতল-মণ্ডলং।
বভুবারাজকং তীক্ষ্ণং মাৎস্যন্যায় কদর্থিতম্॥

যথা—প্রবলা মৎস্যা নির্ব্বলাং স্তান্নাশয়ন্তিম্নেতি ন্যায়ার্থঃ।"

অধ্যাপক বোধিলিঙ্গ একটি কারিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। যথা :—

"পরস্পরাভিষতয়া জগতো ভিন্নবর্ত্মনঃ।
দণ্ডাভাবে পরিধ্বংসী মাৎস্যোন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে॥"

—Von Bohtlingk's–Inde Spruche.

বঙ্গদেশে একসময়ে এইরূপ মাৎস্যন্যায় প্রবর্তিত হইলে, প্রজাপুঞ্জ তাহা দূরীভূত করিয়া গোপালদেবকে রাজা নির্বাচিত করিয়াছিলেন। গোপালদেবের পুত্র ধর্মপালদেবের তাম্রশাসনের এই বিবরণটি তারানাথের গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে। ইহা বাংলার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। 'মাৎস্যন্যায়ের' ব্যাখ্যা করিতে গিয়া "রামচরিতের" ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম,-এ লিখিয়াছিলেন—"to escape from being absorbed into another kingdom or to avoid being swallowed like a fish.[১৩]

বৌদ্ধ ঐতিহাসিক লামা তারানাথ গোপালদেবের রাজ্যলাভের অব্যবহিত পূর্বে গৌড়বঙ্গের অবস্থা কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রতিদিন এক-একজন রাজা নির্বাচিত হইতেন, কিন্তু ভূতপূর্ব রাজার পত্নী রাত্রিতে তাহাদিগকে সংহার করিতেন। কিছুদিন পরে গোপালদেব রাজপদ লাভ করিয়া রাজ্ঞীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, আমরণ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তারানাথের ইতিহাস বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও ইহা হইতে গৌড়বঙ্গের অরাজকতার বিষয় বিশেষভাবে জানিতে পারা যায়।

আমরা ধর্মপালদেবের তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারিতেছি, বাংলার প্রাচীন ইতিহাসে পালরাজবংশের প্রথম রাজা গোপালদেব একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি খ্রিস্টিয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে জনসাধারণ কর্তৃক অরাজকতা নিবারণের জন্য রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাহার বিষয় আমরা ধর্মপালদেবের তাম্রশাসন হইতে যে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতে পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রিয় ইব সুভগায়াঃ সম্ভবো বারিরাশি—
শশধর ইব ভাসো বিশ্ব মাহ্লাদয়ন্ত্যাঃ।
প্রকৃতি রবনিপানাং সন্ততে রুত্তমায়া—
অজনি দয়িতবিষ্ণুঃ সর্ব্ববিদ্যাবদাতঃ॥
আসীদাসারাদুর্ব্বীং গুর্ব্বীভিঃ কীর্ত্তিভিঃ কৃতী।
মণ্ডয়ন্ খণ্ডিতারাতিঃ শ্লাঘ্যঃ শ্রীবপ্যটস্ততঃ॥
মাৎস্য-ন্যায়-মপোহিতুং প্রকৃতির্ভির্ল ক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ-শিরসাং চূড়ামণি-স্তৎসুতঃ।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতন-যশোরাশি র্দিশামাশয়ে
শ্বেতিম্না-যদি পৌর্ণমাস-রজনী জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া॥

"মনোহারীণী লক্ষ্মীর উৎপত্তিস্থান যেমন সমুদ্র, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আহ্লাদ-জনয়িত্রী কান্তির উৎপত্তিস্থান [সম্ভব] যেমন শশধর, সেইরূপ অবনিপালকুলের সর্বোৎকৃষ্ট বংশদরের বীজিপুরুষ [প্রকৃতি] সর্ববিদ্যাবিশুদ্ধ দয়িতবিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" "যিনি বিপুলকীর্তিকলাপে সসাগরা বসুন্ধরাকে বিভূষিত করিয়াছিলেন, অরাতি-নিধনকারী [সর্বকার্যে] কুশল, প্রশংসনীয়, সেই বপ্যট [দয়িতবিষ্ণু হইতে] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারমূলক] "মাৎস্য ন্যায়" [অরাজকতা] দূর করিবার অভিপ্রায়ে, প্রকৃতিপুঞ্জ

যাহাকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়া [রাজা নির্বাচিত করিয়া] দিয়াছিল, পূর্ণিমা রজনীর [দিঙ্‌মণ্ডল-প্রধাবিত] জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলতাই যাহার স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত, নরপাল-কূলচূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা বপ্যট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

এখানে আমরা দেখিতে পাইলাম এই তিনটি শ্লোকে দয়িতবিষ্ণু, বপ্যট এবং গোপাল এই তিনজনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। দয়িতবিষ্ণু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে নৃপতিগণের উত্তমবংশের প্রকৃতি বা বীজপুরুষ সর্ববিদ্যাবিশুদ্ধ দয়িতবিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে দয়িতবিষ্ণু বিদ্বান এবং রাজবংশের জনক ভিন্ন আর কিছু বলা হয় নাই। তাহার প্রপৌত্র মহারাজাধিরাজ ধর্মপালদেবের প্রশস্তিকার যখন তাহাকে সর্ব-বিদ্যাবিৎ ভিন্ন আর কোনওরূপ বিশেষণে বিশেষিত করেন নাই, তখন এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, তিনি বিশেষ প্রভাবশালী লোক ছিলেন না। পরের শ্লোকে দয়িতবিষ্ণুর পুত্র বপ্যট সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তিনি প্রশংসার যোগ্য, অরাতিনিধনকারী কুশলী এবং বহু কীর্তিকলাপ দ্বারা বসুন্ধরাকে বিভূষিত করিয়াছিলেন। আমরা অরাতি-নিধনকারী এই বিশেষণ হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, বপ্যট একজন যোদ্ধা ছিলেন এবং যে-সে যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি প্রসিদ্ধ এবং প্রশংসনীয় যোদ্ধা ছিলেন। যিনি পৃথিবীকে কীর্তির দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ, অনেক মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে—গোপালদেব এবং দেদ্দদেবী হইতে ধর্মপালদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গোপালদেব পালবংশের প্রথম রাজা। গোপালদেবের রাজত্বকাল সম্বন্ধে এবং সিংহাসনারোহণের সময় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন। তারনাথের মতে গোপালদেব প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ প্রভৃতি ঐ মতাবলম্বী। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—"গোপালদেব প্রৌঢ় বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং অতি অল্পকাল রাজ্য শাসন করিয়া পরলোক-গমন করিয়াছিলেন। গোপালদেব ৭৯০—৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।"[১৪ক/খ]

ধর্মপাল ৭৯৫-৮৩০ খ্রিস্টাব্দ

গোপালদেবের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ধর্মপাল গৌড় ও বঙ্গের সিংহাসনারোহণ করেন। গোপালদেব পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও পালবংশের প্রকৃত কীর্তিকলাপ এবং বিস্তৃত রাজ্য-সমৃদ্ধি ধর্মপালের সময়েই যে প্রতিষ্ঠালাভ করে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ধর্মপাল যেমন দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তেমনি পালরাজাদের গৌরবও তাহার দ্বারাই প্রসারিত হয়। প্রায় সমুদয় উত্তর ভারত তিনি জয় করেন। কাজেই গৌড়েশ্বর ধর্মপাল কেবল বাংলা ও বিহারের রাজা ছিলেন তাহা নহে, তিনি বঙ্গ, বিহার ও উত্তর ভারতের নৃপতি ছিলেন।

মালদহ জেলার অন্তর্গত খালিমপুর গ্রামের উত্তরাংশে হলকর্ষণ করিতে গিয়া এক কৃষক ধর্মপালের যে তাম্রশাসনখানি প্রাপ্ত হয় তাহা ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কৃষক-পত্নীর নিকট হইতে পরলোকগত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় ক্রয় করেন। সেদিন হইতেই এক নবযুগের অভ্যুদয় হইল। এই তাম্রশাসনখানিই হইতেছে পালবংশীয় দ্বিতীয় নৃপতি ধর্মপালদেবের ভূমিদানের তাম্রশাসন। এই তাম্রশাসনখানি খালিমপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া ইহা খালিমপুরের লিপি নামে পরিচিত। এই তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

নৃপতি ধর্মপালদেব কিরূপ বীরপুরুষ ছিলেন, কিরূপ দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন তাহা এই তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায়।

তাম্রশাসনখানির সপ্তম শ্লোকে আছে—"সেই রাজা (ধর্মপাল) প্রকট-লীলাচলিত-সেনাবল-সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইলে, সেনাভারাক্রান্ত বিচলিত পর্বতমালা বক্রভাব প্রাপ্ত হয়; এবং তাহাতে মস্তকস্থিত নম্রীকৃত মণি-দ্বারা মস্তকে বেদনা অনুভব করিয়া, সেই বেদনাক্রান্ত শিরঃ সমূহের সাহায্যার্থে হস্তোদগম করিয়া, অনন্তদেব অধোদেশে [সেই রাজার] অনতিদূরবর্তীরূপে ত্বরিত পদে অনুগমন করিয়া থাকেন।"

দ্বাদশ শ্লোকে রহিয়াছে—"তিনি মনোহর ভ্রূভঙ্গি-বিকাশে [ইঙ্গিতমাত্রে] ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গন্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের [সামন্ত?] নরপালগণকে প্রণতি-পরায়ণ-চঞ্চলাবনত-মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্তন করাইতে করাইতে, হৃষ্টচিত্ত পাঞ্চালবৃদ্ধকর্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করাইয়া, কান্যকুব্জকে [অভিষিক্ত করাইয়া] রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।"—ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, ধর্মপাল কত বড় বীরপুরুষ ছিলেন।

মহাবীর ধর্মপাল রাজা হইয়া প্রথমে বঙ্গদেশ ও বিহার রাজ্যের শাসনব্যবস্থার সুশৃঙ্খলা করেন। পরে তিনি এইরূপ দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন।

এই সময়ে কান্যকুব্জে বা কনৌজে ইন্দ্রায়ুধ নামে এক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। সেই সময়ে রাজপুতনার ভিল্লমাল নামক নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া নাগভট্ট নামক একজন রাজা রাজপুতনা ও মালবদেশ শাসন করিতেছিলেন। এই সময় বিন্ধ্যপর্বত ও নর্মদা নদীর দক্ষিণে রাষ্ট্রকূটবংশীয় নৃপতিরা বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই নৃপতিদের রাজধানী প্রথমে নাসিক নগরে ছিল, পরে ইহা মান্যখেত নগরে স্থানান্তরিত হয়। ধর্মপাল রাষ্ট্রকূট-নৃপতি তৃতীয় গোবিন্দের (শ্রীপরবাল) কন্যা রণ্ণাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

ধর্মপালের শাসন সময়ে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। একটি ঘটনা কান্যকুব্জাধিপতি ইন্দ্র [মহেন্দ্র] নামক নরপতির ধর্মপালের হস্তে পরাভব, অপর ঘটনা মহেন্দ্রের রাজ্যে ধর্মপাল কর্তৃক চক্রায়ুধ নামক সামন্ত নরপালের অভিষেক। মহেন্দ্র ধর্মপালকে অসংখ্য সেনাবল লইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া, যুদ্ধে পরাভব অনিবার্য মনে করিয়া, এতদূর বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, ধর্মপালের অসংখ্য সেনাবল যুদ্ধার্থে উৎসুক থাকিলেও, তাহাদিগকে রণশ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই,—ধর্মপাল রাজধানীতে উপনীত হইবামাত্রই তাহা অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।[১৫]

চক্রায়ুধ বশ্যতা স্বীকার করিলে মহানুভব নৃপতি ধর্মপাল চক্রায়ুধের উপর প্রসন্ন হইয়া কান্যকুব্জে ফিরিয়া চক্রায়ুধের অভিষেক করাইলেন। ধর্মপালের মহত্ত্ব ও বীরত্ব দর্শনে রাজপুতনা ও পঞ্জাবের নৃপতিগণ তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

ভিল্লমালের তেজস্বী রাজা নাগভট্টের কাছে ধর্মপালের এই বীরত্ব-গৌরব সহ্য হইল না। বাংলাদেশে যখন অরাজকতা ছিল, বাংলার রাজারা যখন দুর্বল ছিলেন, তখন নাগভট্টের পিতা বৎসরাজ বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া তথায় রক্তস্রোত বহাইয়াছিলেন, বাংলার দুইটি রাজছত্র কাড়িয়া আনিয়াছিলেন। সেই পদদলিত বাংলার রাজা আজ সমগ্র পূর্ব ও উত্তর ভারতের সম্রাট হইতে চলিলেন, ইহা নাগভট্টের সহ্য হইল না। নাগভট্ট প্রকাণ্ড বাহিনী লইয়া কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন, চক্রায়ুধ পরাজিত হইয়া ধর্মপালের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইবার নাগভট্টের সহিত ধর্মপালের যুদ্ধ হইল। ধর্মপালের শ্বশুর তৃতীয় গোবিন্দ যখন শুনিতে পাইলেন যে, তাহার জামাতা পূর্বভারতপতি ধর্মপাল প্রতিহার-রাজ নাগভট্টের আক্রমণে বিপন্ন, তখন তিনি বহু সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া উত্তরা-পথে অগ্রসর হইলেন। নাগভট্ট তখন বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। সম্মুখে ধর্মপালের সৈন্য আর পশ্চিমদিকে রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দের সৈন্য। নাগভট্ট এইবার পরাজিত হইলেন এবং কোথায় যাইয়া যে লুকাইলেন তাহার আর সন্ধান মিলিল না। নাগভট্টের পরাজয়ের পর যুদ্ধের উপদ্রব নিবৃত্ত হইল।

ধর্মপাল দীর্ঘকাল উত্তর ভারতের উপর প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে বাংলা ও বিহারের সর্বত্র অপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল।[১৬] মহারাজা ধর্মপাল ও পরবর্তী পালরাজগণ প্রস্তরলিপি ও তাম্রশাসনে 'গৌড়াধিপ' ও 'গৌড়েশ্বর' বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। প্রতিহাররাজ ভোজের সাগরতালের শিলালিপিতে ধর্মপালকে **"বঙ্গপতি"** বলিয়া এবং তাহার সৈন্যগণকে **'বঙ্গান'** অর্থাৎ বাঙালি বলা হইয়াছে। **বঙ্গ** পালরাজগণের সাম্রাজ্যভুক্ত না হইলে এইরূপ উক্তির কোনও মূল্য থাকে না।[১৭] স্বর্গত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র গরুড়স্তম্ভ-লিপির আলোচনা করিতে যাইয়া পাদটীকায় লিখিয়াছেন—"পালবংশীয় নরপালগণ প্রথমে বঙ্গদেশে অধিকার লাভ করিয়া, পরে মগধ জয় করিবার যে কিংবদন্তী তারকনাথের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, (তদধিপ) শব্দে তাহা সমর্থিত হইতেছে। **পাল নরপালগণ যে বাঙালি ছিলেন,** এই বিশেষণ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।"

তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের মতে ধর্মপাল প্রথমে বঙ্গদেশে প্রভাব বিস্তার করেন পরে গৌড় প্রভৃতি অঞ্চলে তাহার আধিপত্য বিস্তার হইয়াছিল। 'ঢাকার ইতিহাস' লেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন,—"এই সব কারণে মনে হয় ধর্মপাল হয়ত গোপালের জীবিতাবস্থায় **বঙ্গের** শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" বঙ্গ বলিতে যে সমুদয় পূর্ববঙ্গকে বুঝাইত সে বিষয়ে আমরা পূর্বেও অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।[১৮ক-গ]

আমাদের মনে হয় যতীন্দ্রবাবুর এই অনুমান সত্য। এই প্রসঙ্গে আমরা বিক্রমপুরের নামোৎপত্তির বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া বিস্তারিতভাবে ইহা আলোচনা করিয়াছি।

ধর্মপাল বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি মগধ, বারেন্দ্র ও বঙ্গে তিনটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় তাহার পিতা গোপালদেবের জীবিতকালে তিনি যখন বঙ্গে [বিক্রমপুরে] শাসনকার্যে ব্রতী, তখনই হয়ত **'বিক্রমপুরী-বিহার'**-নির্মাণ করিয়া থাকিবেন। রাজশাহি জেলার পাহাড়পুরেব ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে যে সকল প্রত্ন-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে, পাহাড়পুরের মন্দির ও বিহার এক সময়ে ধর্মপালদেবের সোমপুর মহাবিহার নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী নৃপতি ধর্মপাল জীবনের প্রথম অবস্থায় যখন বঙ্গে [বিক্রমপুর] শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন তখন বিক্রমপুরী-বিহার নির্মাণ করিয়া থাকিবেন।

তিব্বতদেশীয় ইতিহাসকার লামা তারনাথের মতে ধর্মপাল প্রথমে **বঙ্গদেশে আধিপত্য করেন এবং পরে গৌড় প্রভৃতি অঞ্চলে তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।** তারনাথের মতে ধর্মপাল চৌষট্টি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান কালের ঐতিহাসিকগণ তারনাথের এই উক্তি সমর্থনযোগ্য মনে করেন না। তাহারা অনুমান করেন ধর্মপাল দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল রাজত্ব করেন (৭৭০-৮১৫ খ্রিস্টাব্দ)[১৯]।

ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। গঙ্গাতীরে নির্মিত তাহার বিক্রমশীলার বিহারের খ্যাতি পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন—ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন; তিনি মহাযানমতাবলম্বী বৌদ্ধ ছিলেন।

ধর্মপাল ও তাহার পুত্র দেবপালের রাজত্বকালে প্রাচীন নালন্দা-মহাবিহার ও **ধীমান্** ও তাহার ছেলে **বীতপাল** নামে দুইজন শিল্পী বিশেষ খ্যাতিমান্ হইয়া উঠেন এবং তাঁহাদের নির্মিত দেব-দেবীর মূর্তি সেকালের লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিত।

ধর্মপাল বাঙালিজাতির গৌরব সেকালে যে-ভাবে বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহাতে বাঙালি জাতির অতীত ইতিহাস চিরসমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। এই বীর সম্রাটের রাজশক্তি সুদূর উত্তর-পশ্চিমের সীমা গান্ধার পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

ধর্মপালের কীর্তি-কথা সেকালের লোকের মুখে মুখে পরিকীর্তিত হইত। খালিমপুরের তাম্রশাসনের ১৩ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—"সীমান্তদেশে গোপগণ কর্তৃক, বনে বনচরগণ কর্তৃক, গ্রাম সমীপে জনসাধারণ কর্তৃক, [গৃহ] চত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্তৃক, প্রত্যেক ক্রয়-বিক্রয় স্থানে বণিকসমূহ (?) কর্তৃক, এবং বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত শুকগণ কর্তৃক গীয়মান আত্মস্তব শ্রবণ করিয়া [এই নরপতির] বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্রভাবে বিনম্র হইয়া রহিয়াছে।[২০]

সুপ্রসিদ্ধ 'গৌড়রাজমালা' প্রণেতা বলেন—'এই শ্লোকটি স্তাবকোক্তি বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। কারণ, আর কোনও প্রশস্তিতে রাজার সম্বন্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রকার অভিমত এরূপভাবে উল্লিখিত হইতে দেখা যায় না, এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত, এরূপ বিশেষোক্তি ধর্মপালের প্রশস্তিতে স্থান পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রজাপুঞ্জ যাহার পিতাকে রাজলক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করাইয়াছিলেন, সেই ধর্মপাল যে প্রজারঞ্জনে যত্নবান হইবেন, এবং তাহার যে প্রতিভা এক সময় তাহাকে উত্তরাপথের সার্বভৌম পদলাভে সমর্থ করিয়াছিল, সেই প্রতিভাবলে তিনি যে প্রজারঞ্জনে সফলমনোরথ হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি?"[২১]

পালবংশীয় নৃপতিদের সহিত 'বঙ্গ' পূর্ববঙ্গের ও বিক্রমপুরের যে বিশেষ সম্বন্ধ ছিল তাহা জানিতে পারা যায়। 'বঙ্গপতি' ধর্মপাল বঙ্গরাজ্যের উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়াই ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। এজন্যই পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে পালবংশীয় নৃপতিদের নানা শাখার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা প্রচলন আছে, এবং তাহারা ভূ-স্বামী বা ভূঁইয়া নামেও জনগণমধ্যে পরিচিত হইয়াছিলেন।[২২]

দেবপালদেবের "মুঙ্গেরলিপি" [১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে মুঙ্গের নগরে কর্নেল ওয়াট্‌সন কর্তৃক এই তাম্রপট্টলিপি আবিষ্কৃত হয়। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এই তাম্রপট্টলিপির একটি লিথোগ্রাফ মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে চার্লস উইল্‌কিন্স এই প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন।] এই লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, দেবপালদেব—"নির্মলচেতা সংযতবাক্ পবিত্রকায়-কর্মনিরত, বোধিসত্ত্ব যেমন নিরুপদ্রব বুদ্ধপদ লাভ করেন নির্মলচেতা সংযতবাক্ পবিত্রকায়-কর্ম-নিরত দেবপালদেবও সেইরূপ নিরুপদ্রব পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

একদিকে হিমালয়, অপরদিকে কীর্তিচিহ্ন সেতুবন্ধ,—একদিকে বরুণ-নিকেতন অপরদিকে লক্ষ্মীর জন্ম-নিকেতন [ক্ষীরোদ সমুদ্র] এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমগ্র ভূমণ্ডল সেই রাজা নিঃসন্তপ্তভাবে উপভোগ করিয়াছেন।"

আজ পর্যন্ত দেবপালদেবের একখানি শিলালিপি ও একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কথিত আছে, দেবপালের সেনাপতি **লাউসেন** বা **লবসেন** আসাম ও কলিঙ্গরাজ্য পাল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। দেবপাল **বিহার, বঙ্গ** এবং আসামের উপর যে আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা সুবিদিত।

"অরিনৃপতিমুকুটঘটিত চরণঃ সকল ভুবনবন্দিত শৌর্য্যঃ।
বঙ্গাঙ্গ মগধ মালব বেঙ্গীশৈরর্চ্চিতোঽতিশয় ধবলঃ॥

রাষ্ট্রকূট-নৃপতি প্রথম অমোঘবর্ষের সিরুর ও নীলখণ্ডে আবিষ্কৃত শিলালিপিদ্বয় হইতে জানা যায় যে, অঙ্গ-বঙ্গ, মগধ ও বেঙ্গীর অধিপতিগণ তাহার অর্চনা করিয়াছিলেন।[২৩]

কাজেই ইহা, সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, **বঙ্গ—পূর্ববঙ্গ** বা **বিক্রমপুর** ও দেবপালের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

দেবপালের মন্ত্রীর নাম ছিল দর্ভপাণি। দর্ভপাণির নীতি-কৌশলেই দেবপাল হিমালয়

হইতে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত সমস্ত ভূমি দেবপালের অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই এইরূপ অনুমান করা যায় যে, মান্যখেট বা খেতের রাষ্ট্রকূটবংশ এবং ভিল্লমালের গুর্জর-প্রতিহারবংশ এই দুই বংশের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেবপাল আপনার পৈত্রিক-রাজ্য সগৌরবে সুরক্ষিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[২]

দেবপাল প্রায় উনচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মানুরাগী ছিলেন।

দেবপালের মৃত্যুর পর ক্রমশ পালবংশের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। গুর্জর-প্রতিহার নৃপতিরা প্রবল হইয়া উঠেন এবং ক্রমশ মগধ, ত্রিহুত এমন কি বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

পাহাড়পুরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে গুর্জর-প্রতিহার রাজ মহেন্দ্রপালের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেও এ-কথা সপ্রমাণ হয়।

দেবপালের পর বিগ্রহপাল প্রথম গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি শূরপাল নামেও পরিচিত।

"নৃপতি প্রথম বিগ্রহপাল বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার পরে—তদীয় পুত্র—নারায়ণ পালদেব গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন।—সমুদ্র-পত্নী [জহ্নুকন্যা] জাহ্নবীর ন্যায় হৈহয় [রাজ] বংশ ভূষণস্বরূপা লজ্জানাম্নী [কন্যা] তাহার [বিগ্রহপাল] পত্নী হইয়াছিলেন। [সেই লজ্জাদেবীর] বিশুদ্ধ চরিত্র তদীয় পিতৃবংশের এবং পতিবংশে পরম "পাবন-বিধি" বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।" বিগ্রহপাল—"আমার পক্ষে তপস্যা এবং তোমার পক্ষে রাজ্য"—এইরূপ বলিয়াই তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক পুত্র বিগ্রপালকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন।"

নারায়ণদেব দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার প্রদত্ত একখানা তাম্রশাসন ভাগলপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া উহা 'ভাগলপুরলিপি' নামে সুপরিচিত। এই তাম্রশাসন কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। নারায়ণপালের রাজত্বের সপ্তদশবর্ষ রাজত্বকালে এই তাম্রশাসনখানি প্রদত্ত হইয়াছিল। এবং উহা—**"সৎসমতট-জন্মা-শুভদাস-পুত্র শ্রীমান্ মংখদাস** নামক শিল্পী কর্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় **সমতট নামে নগর যে বিদ্যমান** ছিল তাহা নিঃসন্দেহে এবং সমতটনগর নাম হইতে এক বিস্তৃত ভূ-ভাগের নাম **সমতট** হওয়া অসম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে অনুসন্ধিৎসু পাঠককে ডাক্তার শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক লিখিত **"সমতটের রাজধানী"** শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। [সাহিত্য ২৫শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা। আশ্বিন ১৩২১]

দেবপালের মৃত্যুর পর বিগ্রহপাল এবং নারায়ণপালের সময় হইতেই পালরাজবংশের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর মহীপালদেব যখন সিংহাসনে বসিলেন, তখন উত্তরবঙ্গ পালরাজগণের হস্তে ছিল না। **দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি** জেলায় তখন পালরাজগণের রাজত্ব মাত্র বিদ্যমান ছিল। এক কথায় কেবলমাত্র সমতটের আধিপত্যই লাভ করেন।

মহীপালদেব বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে নিজশক্তি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাণগড়-লিপি হইতে জানিতে পারি 'বিগ্রহপাল তদীয় অভ্রতুল্য সেনা-গজেন্দ্রগণ [প্রথমে] জল প্রচুর পূর্বাঞ্চলে স্বচ্ছ সলিল পান করিয়া, তাহার পর [তদনু] মলয়োপত্যকার চন্দনবনে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া, ঘনীভূত শীতল-শীকরোৎক্ষেপে তরু-সমূহের জড়তা সম্পাদন করিয়া, হিমালয়ের কটকদেশ উপভোগ করিয়াছিলেন।" তাঁহার পুত্র শ্রীমহীপালদেব

রণক্ষেত্রে বাহুদর্প-প্রকাশে সকল বিপক্ষ নিহত করিয়া 'অনধিকৃত বিলুপ্ত' পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া, রাজগণের মস্তকে চরণপদ্ম সংস্থাপিত করিয়া, অবনীপাল হইয়াছিলেন।

মহীপালদেব আপনার পূর্বপুরুষগণের হস্তচ্যুত রাজ্য পুনরায় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গৌড়, মগধ প্রভৃতি অধিকার করিয়া এমন কি কাশী পর্যন্তও আপনার রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার এই পুনরাধিকৃত এই রাজ্য বিদেশিয়েরাও সময় সময় আক্রমণ করিতে ইতস্তত করেন নাই।[২৪]

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে—"মহীপালদেবের পিতার কোনওরূপ বীরকীর্তির উল্লেখ নাই। তাহাকে সূর্য হইতে 'চন্দ্র' রূপে উদ্ভূত বলিয়া এবং তজ্জন্য তাহাতে "কলাময়"ত্বের, আরোপ করিবার সুযোগ পাইয়া, কবি ইঙ্গিতে তাহার ভাগ্যবিপর্যয়ের আভাস প্রদান করিয়া থাকিবেন। তাহার সেনা-গজেন্দ্রগণের [আশ্রয়-স্থানাভাবে] নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, শিশির-সংক্ষুব্ধ হিমাচলের অধিপত্যকায় আশ্রয় লাভের কথায়, এবং তৎপরবর্তী শ্লোকে মহীপালদেবের "অনধিকৃত বিলুপ্ত" পিতৃরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির কথায়, দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসন সময়েই পাল-সাম্রাজ্যের প্রথম ভাগ্যবিপর্যয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।[২৫] স্বর্গত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে লিখিয়াছেন— "মৈত্রেয় মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান-সম্মত।[২৬] তাহার মতে "প্রথম মহীপালদেব পালরাজবংশের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মহীপালের পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গ কম্বোজ-জাতি কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল এবং সম্ভবত চন্দেল্লবংশীয় যশোবর্মার সাহায্যে গুর্জর-রাজ মহীপাল মগধ পুনরধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং মহীপালদেব, পিতার মৃত্যুর পরে, রাঢ় ও বঙ্গদেশের কিয়দংশের অধিকার মাত্র, উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহীপাল স্বয়ং বরেন্দ্রী, মগধ ও তীরভুক্তি, এমনকি বারাণসী পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। মহীপালদেবের রাজত্বের তৃতীয়বর্ষের পূর্বে **বঙ্গ বা সমতট** অধিকৃত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গৌড় হইতে তাড়িত হইয়া পালরাজগণ সমতটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[২৭] আমার এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে, **গৌড়বঙ্গাধিপ** পাল নৃপতিরা ধর্মপাল হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই শাসনকর্তারূপে বা বিপদগ্রস্ত হইয়া নিরাপদে বাস করিয়া শক্তিসঞ্চয়ের জন্য প্রচুর পূর্বাঞ্চলে [বিক্রমপুরে] রাজধানীতে বাস করিয়াও শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেন।

মহীপালদেব প্রথম ৯৮০ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১০৩০ খ্রিস্টাব্দ ঃ

মহীপালদেব প্রথম আনুমানিক ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। পালরাজাদের মধ্যে মহীপাল বেশ জনপ্রিয় নৃপতি ছিলেন। তাহার সম্বন্ধে বিবিধ গীতাবলী আজও শ্রুত হওয়া যায়।[২৮]

রাজেন্দ্রচোলের বঙ্গালদেশ আক্রমণ [১০২০-১০২৪ খ্রিস্টাব্দ] ঃ

প্রথম রাজেন্দ্রচোলদেব ১০১১ খ্রিস্টাব্দে চোল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচোল তাহার রাজত্বের নবম ও ত্রয়োদশ বৎসরে [১০২০ হইতে ১০২৪ খ্রিস্টাব্দের] মধ্যে ওড্ড-বিষয়, কোশল-নাড়ু **বঙ্গালদেশ** প্রভৃতি আক্রমণ করিয়াছিলেন। সারনাথের শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে গৌড়াধিপ মহীপাল ১৮০৩ সম্বতে [১০২৬] জীবিত ছিলেন। সুতরাং, প্রথম রাজেন্দ্রচোল 'ওড্ড-বিষয়' বা উড়িষ্যা তক্কণলাড়স্ বা দক্ষিণরাঢ় এবং "**বঙ্গালদেশ**" বা বঙ্গ আক্রমণ করিতে গিয়া যে মহীপালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই মহীপাল অবশ্য পালবংশীয় মহীপাল। তিরুমলয়ের লিপিতে যে-ভাবে প্রথম রাজেন্দ্রচোলের দিগ্বিজয়-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে' তাহা পাঠে মনে হয় তিনি গৌড়রাজ্যের

দক্ষিণাংশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তারনাথ লিখিয়া গিয়াছেন,—উড়িষ্যার রাজা মহীপালকে কর প্রদান করিতেন। চোলরাজ সম্ভবত উড়িষ্যার, বঙ্গ এবং রাঢ়ের সামন্তগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন; এবং মহীপালের সহিত সম্মুখযুদ্ধের পরেই হউক, বা পূর্বেই হউক, আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা না করিয়া, স্বরাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী চোলরাজ গৌড়রাজ্যের কোনও অংশ স্থায়ীভাবে অধিকার করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

"পরকেশরী বর্মা বা শ্রীরাজেন্দ্র-চোলদেবের (রাজত্বের) ত্রয়োদশ বৎসরে—যিনি ...... তাহার মহান সমর-পুট সেনা দ্বারা (নিম্নোক্ত দেশ সকল) অধিকার করিয়াছেন—দুর্গম ওড্ড-বিষয়, (যাহা তিনি) প্রবল যুদ্ধে (পদানত করিয়াছিলেন); মনোরম কোশলনাড়ু, যেখানে ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়াছিল; মধুকর-নিকর-পরিপূর্ণ-উদ্যানবিশিষ্ট তন্দবুত্তি ভীষণ যুদ্ধে ধর্মপালকে নিহত করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন; সকল দিকে প্রসিদ্ধ তক্কণলাড়ম্, সবেগে রণশূরকে আক্রমণ করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন; **বঙ্গালদেশ,** যেখানে ঝড়বৃষ্টির কখনও বিরাম নাই, এবং গজ-পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যেখান হইতে গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন; কর্ণভূষণ চর্মপাদুকা এবং বলয় বিভূষিত মহীপালকে ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া তিনি তাহার অদ্ভুত বলশালী করিসমূহ এবং রত্নোপমা রমণীগণকে হস্তগত করিয়াছিলেন; সাগরের ন্যায় রত্নসম্পন্ন উত্তিরলাড়ম্; বালুকাময়-তীর্থ-ধৌতকারিণী গঙ্গা।

মহীপাল গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিবার কিছুকাল পরেই মুসলমানগণের উত্তরাপথ বিজয়ের সূত্রপাত হইতে থাকে।

সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ-ফলে যখন উত্তর-ভারতের প্রসিদ্ধ নৃপতি জয়পাল, আনন্দপাল প্রভৃতি অনেকেই রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, যখন একে একে কান্যকুব্জ, গোয়ালিয়র, কালঞ্জর, সোমনাথ প্রভৃতি স্থান বিজয়ী আক্রমণকারীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতেছিল, সে সময়ে গৌড়ের নৃপতি মহীপাল যে কোনও যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন এইরূপ কিছুই জানা যায় না।

মহীপালকে সেই সময়ে পরের মঙ্গলমন্দিরে জীবনোৎসর্গ করিতে দেখা গিয়াছিল। সেই সমুদয় অতুলনীয় কীর্তি আজিও পুণ্যশ্লোক নৃপতি মহীপালের নাম গৌরবের সহিত স্মরণ করাইয়া দিতেছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় [রাঢ়দেশে] খনিত তাহার "সাগরদিঘি", এবং বরেন্দ্র (দিনাজপুর জেলায়) "মহীপালদিঘি" আজিও মহীপালের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।[২৯] এতদ্ব্যতীত তিনটি বৃহৎ নগরের ভগ্নাবশেষ—বগুড়া জেলায় অন্তর্গত **"মহীপুর"**, দিনাজপুর জেলায় **"মহীসন্তোষ"** এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় **"মহীপাল"**, মহীপালের নামের সহিত জড়িত রহিয়াছে। গৌড়াধিপ মহীপালের বারাণসীধামেও অনেক কীর্তি রহিয়াছে। সারনাথের প্রাপ্ত একখানা লিপি হইতে জানা যায় যে—"গৌড়াধিপ মহীপাল বারাণসীধামে, স্থিরপাল এবং বসন্তপালের দ্বারা ঈশান (শিব) ও চিত্রঘণ্টার (দুর্গার) মন্দিরাদি [কীর্তিরত্নশতানি] প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন, মৃগদাবের (সারনাথের) "ধর্মরাজিকা" বা অশোকস্তূপ এবং অশোকের স্তম্ভোরপস্থিত "সাঙ্গ-ধর্মচক্রের' জীর্ণ-সংস্কার করাইয়াছিলেন এবং অভিনব "শৈলগন্ধকূটী" নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সারনাথের লিপিতে মনে হয় যে—"বারাণসী তখন গৌড়রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।"

মহীপালের রাজত্বকালেই গৌড়রাষ্ট্রে বৌদ্ধশ্রমণদের একটি সম্মেলন হইয়াছিল এবং তদুপলক্ষে তিব্বত হইতেও অনেক বৌদ্ধশ্রমণ আসিয়াছিলেন। সম্ভবত ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে এই মিলন-সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নয়পালদেব গৌড়, মগধ, বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি—"সমস্ত নরপালগণের মস্তকে পদ-বিন্যাস করিয়া, সকলদিকেই প্রতাপ বিস্তৃত করিয়া অজ্ঞানান্ধকারবিনাশী স্নিগ্ধ প্রকৃতি লোকানুরাগভাজন ছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। নৃপতি নয়পাল পিতৃরাজ্য সুরক্ষিত রাখিতে পারিয়াছিলেন।

নয়পাল, বিক্রমপুরবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত **দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে** (অতীশ) বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই দীপঙ্কর তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের জ্ঞানের জ্যোতি বহন করিয়া গিয়াছিলেন।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ) ঃ

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যখন বিক্রমশীলা-বিহারের অধ্যক্ষ, সে সময়ে গৌড়েশ্বর নয়পালের সহিত কর্ণ্যদেবের যুদ্ধ হইয়াছিল।—"দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যখন বজ্রাসনে অর্থাৎ মহাবোধিতে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে মগধরাজ নয়পালের সহিত তীর্থিকধর্মাবলম্বী কর্ণ্যরাজের বিবাদ হইয়াছিল। কর্ণ্যরাজ মগধ আক্রমণ করিয়াচিলেন, কিন্তু তিনি নগর অধিকার করিতে না পারিয়া কতকগুলি বৌদ্ধ-বিহার মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়াছিলেন। পরে নয়পালের সেনা জয়লাভ করিলে কর্ণ্যরাজের সেনাগণ যখন নিহত হইতেছিল, তখন শ্রীজ্ঞান তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টায় যুদ্ধ স্থগিত হইয়া সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল।"

এ প্রসঙ্গে 'গৌড়রাজা-মালা"[৩০] লেখক বলেন যে—নয়পাল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে বিক্রমশীলার-বিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রথম যুদ্ধে গৌড়-সেনা 'কর্ণ্যরাজের সেনা কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, এবং শত্রুগণ রাজধানী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু নয়পালই জয়লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞানের যত্নে উভয়পক্ষে মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল। দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞানের জীবন-চরিতকার বুস্তন তাহার নিজের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং বুস্তনের প্রদত্ত মগধ-আক্রমণ-বিবরণ অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু কোনও্ রাজ্যকে যে বুস্তন "কর্ণ্য" নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। "কর্ণ্য" শব্দ যদি রাজ্যের নাম রূপে গ্রহণ না করিয়া রাজার নাম মনে করা যায়, তবে এই সমস্যা পূরণ করা যাইতে পারে। চেদির কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেবের পুত্র "কর্ণ্য" নয়পালের জীবদ্দশায়, [১০৩৭ হইতে ১০৪২ খ্রিস্টাব্দ] মধ্যে পিতা-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কর্ণ্যের পৌত্রবধূ অহুনা দেবীর [ভেরঘাটে প্রাপ্ত] শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে, কর্ণ্যের ভয়ে "কলিঙ্গের সহিত বঙ্গ কম্পমান ছিল।" অহুনাদেবীর পুত্র জয়সিংহদেবের [কর্ণ্য বলে প্রাপ্ত] শিলালিপিতে সূচিত হইয়াছে—গৌড়াধিপ গর্ব ত্যাগ করিয়া কর্ণ্যের আজ্ঞা বহন করিতেন। কর্ণ্য চিরজীবন প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের সহিত বিরোধ-রত ছিলেন। সুতরাং নয়পালের সময়ে মগধ-আক্রমণ তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। এবং সেই আক্রমণের পরিণাম সম্বন্ধে বুস্তন যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হয়ত ঠিক্[৩০ক] নয়পালদেব সম্ভবত কুড়ি বৎসর কাল গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং আনুমানিক ১০৪৫ খ্রিস্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

স্বর্গত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন,—"নয়পালদেবের রাজ্যকালে বৈদ্যজাতির প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল; বৈদ্য গ্রন্থকার চক্রপাণিদত্ত নয়পালদেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। জনার্দন-মন্দিরের প্রশস্তি বাজীবৈদ্যসহদেব কর্তৃক এবং গদাধর-মন্দিরের প্রশস্তি বৈদ্যবজ্রপাণি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই খোদিত লিপিদ্বয়ের শিল্পী অনবধানতা-প্রযুক্ত বহু ভুল সত্ত্বেও রচয়িতৃগণের বিদ্যার ও রচনা-কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নয়পালদেবের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল গৌড়-মগধ-বঙ্গের অধিকার লাভ

করিয়াছিলেন। **নয়পালদেবের-রাজ্যকালে বিক্রমপুরবাসী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নালন্দা মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিব্বতরাজের অনুরোধে শ্রীজ্ঞান তথায় গমন করিয়াছিলেন।**[৩১]

বৌদ্ধ-জগতে দীপঙ্কর ঃ

বৌদ্ধদের নিকট দীপঙ্করের নাম সুপ্রসিদ্ধ। বঙ্গদেশের একান্ত সৌভাগ্যবশত তিনি বঙ্গদেশে বাঙালির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার কথা বাঙালিদের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই জানেন। যে মহাপুরুষ তিব্বতের আদি ও শ্রেষ্ঠ ধর্মপাল মহাত্মা ব্রহ্মতনের দীক্ষাগুরু, যাহার নাম শুনিবামাত্র প্রধান লামা ও চীনের সম্রাট একসময়ে সসম্ভ্রমে আসন পরিত্যাগ করিয়া তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করিতেন, তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এ কথা ভাবিলেও আনন্দ হয়।"

আমরা বৌদ্ধ গ্রন্থাদি হইতে জানিতে পারি যে, দীপঙ্কর আনুমানিক ৯৮০ কিংবা ৯৮২-৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ান্তঃর্গত বাংলাদেশের বিক্রমপুর-বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আমি "বিক্রমপুরের ইতিহাসের" প্রথম সংস্করণে লিখিয়াছিলাম—"বিক্রমপুরস্থ বজ্রযোগিনী গ্রামে বৌদ্ধ মহাতান্ত্রিক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ জন্মগ্রহণ করেন।" প্রাচীন বিক্রমপুর নগরীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। দীপঙ্করের জীবনী-লেখক বলেন—"He was born in the central palace called Suvarnadhvaja [Dhvaja-ensigns or royalty] of the city of *Vikrampuri* in Bangla. পাগ্-সাম্-জাঙ্গ-এর মতে তাহার জন্মভূমি বিক্রমপুর বজ্রাসনের পূর্বদিকে। (১) অনেকে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামের পশ্চিমে বজ্রাসন বিহার ছিল বলিয়া অনুমান করেন। বজ্রাসন বলিতে সাধারণত বুদ্ধগয়াকে বুঝায়। 'বজ্রাসন' শব্দের অপভ্রংশ হইতেছে বাজাসন। পশ্চিমে ঢাকা জেলার নাম্না ও সুয়াপুর নামে দুইটি গ্রাম আছে, এই দুই পল্লীর সন্ধিস্থলে একটি বড় রকমের বিহার ছিল। তাহা এখন উচ্চ ঢিপিতে পরিণত হইয়াছে। ঐ ঢিপিগুলির নাম 'বাজাসনের ভিটা'।

দীপঙ্করের পিতার নাম ছিল কল্যাণশ্রী (তিব্বতীয় নাম Dge-vahi) এবং তাহার মাতার নাম ছিল প্রভাবতী। বাল্যকালে পিতামাতা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন চন্দ্রগর্ভ। দীপঙ্কর যখন বালক মাত্র তখন তাহাকে শিক্ষার জন্য জেতারি নামক একজন অবধূতের নিকট প্রেরণ করা হয়। জেতারির নিকট দীপঙ্কর বর্ণ-শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া পরে পঞ্চ বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য মনোযোগী হইলেন।

এই জেতারি কে ছিলেন তাহার সম্বন্ধে সঠিক ভাবে বলা কঠিন। পাগ-সাম্-জন-জাঙ্গের মনেত জেতারি বরেন্দ্রের সনাতন নামক এক রাজার ঔরসে ও জনৈকা যোগিনী উপপত্নীর [*Yogini cocubien*] গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম ছিল গর্ভবাদ। পাল রাজাদের অধীনে সনাতন ছিলেন একজন সামন্ত নৃপতি। আর জেতারি ছিলেন তাহারই সভার একজন সভাসদ্। খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, বরেন্দ্র নৃপতি সনাতন একজন ব্রাহ্মণজাতীয় বৌদ্ধ [Brahman-Buddhist] আচার্যের নিকট তান্ত্রিক দীক্ষালাভ করেন এবং তৎ-সম্বন্ধে সিদ্ধি লাভের জন্যই রাজা যোগিনীকে উপপত্নীরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন।[৩২ক/খ]

অনেকের মতে এই দুইটি উক্তির একটিও সত্য নহে। জেতারির নিজের লিখিত একখানি তন্ত্রগ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি গগন ঘোষ নামক একজন ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। তবে তিনি যে বাঙালি ছিলেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই।

এখানে একটি কথা এই যে, দীপঙ্করের প্রাথমিক শিক্ষা কোথায় হইয়াছিল? জেতারি যদি বরেন্দ্রভূমের অধিবাসী হইয়া থাকেন, তবে তাহাকে নিশ্চয়ই উত্তর বঙ্গে যাইতে হইয়াছিল।

এ বিষয়ে এমন কোনও প্রমাণ নাই যাহার সাহায্যে আমরা বলিতে পারি যে, দীপঙ্কর প্রাথমিক শিক্ষা জেতারির নিকটই লাভ করিয়াছিলেন।

দীপঙ্কর তাহার আত্মকথা বলিতে যাইয়া বলিতেছেন—"আমাদের দেশে (ভারতে) রাজ্য এবং রাজবংশীয় লোকেরা বাস করেন। সে সময়ে বাংলাদেশে ভূ-ইন্দ্রচন্দ্র [Bhu-Indrachandra] নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। রাজবংশীয়দের দেহে রাজরক্ত থাকিলেও তাহারা রাজ্য বা সিংহাসনের অধিকারী নহেন। আমি রাজবংশে জন্মলাভ করিয়াছিলাম। আমার পিতার নাম তিব্-নাম খা হি-দান-পগ্ [Tib-Nam-mkhani hi-dvan-phyug], অর্থাৎ স্বর্গের অধিপতি [Lord of heaven]। আমার পিতা গৃহস্থ উপাসক এবং বিখ্যাত বোধিসত্ত্ব ছিলেন। আমার পিতার দুই পত্নী ছিলেন। একজন ব্রাহ্মণী এবং অপর ছিলেন ক্ষত্রিয়াণী। আমি ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলাম। ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে একটি মূর্খ পুত্র জন্মলাভ করে। আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর আমার সেই মূর্খ বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি তাহাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই। ইহার পর আমার সহিত আর তাহার দেখা হয় নাই।"[৩৩]

দীপঙ্করের আত্মকথা হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে, তাহার মাতা বিদুষী মহিলা ছিলেন। অতীশের জীবন-চরিত-রচয়িতা কল্যাণমিত্র [Phyg-Sarpa] দীপঙ্করের সহিত উনিশ বৎসরকাল এক সঙ্গে শিষ্যরূপে বাস করিয়াছিলেন—তিনি দীপঙ্করের যে জীবনচরিত রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। কল্যাণ মিত্র একদিন তিব্বতে দীপঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :—"আপনি বেদ সম্বন্ধে এইরূপ সুপণ্ডিত হইলেন কিরূপে?—তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন,—"আমার মা ব্রাহ্মণী ছিলেন, তিনি শৈশবকালে আমাকে বেদ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন।' কাজেই দীপঙ্করের বাল্যজীবনে প্রাথমিক শিক্ষা যে উত্তমরূপে তাহার মাতার নিকট হইতে হইয়াছিল তাহা আমরা দীপঙ্করের নিজের এই উক্তি হইতেই বুঝিতে পারিতেছি। এবং এই কারণেই জেতারি নামক অবধূতের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন কিনা তাহা সন্দেহজনক বলিয়া মনে হয়।

হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনে পারদর্শিতা ঃ

দীপঙ্করের বাল্যজীবনেই তাহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। যেমন বয়স বাড়িতে লাগিল, তেমনি তাহার প্রতিভার বিকাশ পাইতে লাগিল। জেতারি তাহার অদ্ভুত মেধা ও গভীর অভিনিবেশ দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণগিরি-বিহারের রাহুল গুপ্তের (Rahul Gupta) নিকট বৌদ্ধদিগের ত্রিশিক্ষা নামক তত্ত্বগ্রন্থে জ্ঞান লাভের জন্য গমন করেন। সেখানে তিনি বজ্র নামক সাধনমার্গেও দীক্ষা লাভ করেন। উনিশ বৎসর বয়সে দীপঙ্কর ওদন্তপুরী-বিহারের আচার্য পরম পণ্ডিত শীলরক্ষিতের নিকট হইতে ভিক্ষুব্রতে দীক্ষা লাভ করেন।

উপাধি লাভ ঃ

অল্প সময়ের মধ্যেই দীপঙ্কর অনেকগুলি হিন্দু ও বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তাহার যশ দেশ-বিদেশে বিস্তৃতি লাভ করিল। দীপঙ্করের সহিত তর্ক করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিবার জন্য পণ্ডিতেরা সব আসিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই তাহাকে তর্কে পরাস্ত করিতে না পারিয়া 'অবনত মস্তকে' দেশে প্রত্যাগমন করেন। দীপঙ্করের বয়স যখন পঁচিশ বৎসর তখন তিনি একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া অসীম গৌরব লাভ করেন। ইহার পরেই দীপঙ্কর ওদন্তপুরী বা পুরের বৌদ্ধাচার্য শীলরক্ষিতের নিকট হইতে "শ্রীজ্ঞান" উপাধি লাভ করেন।

একত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি ভিক্ষু আশ্রমের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন এবং বোধিসত্ত্বের

কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হইলেন। সুপ্রসিদ্ধ ধর্মরক্ষিত এ বিষয়ে তাহার দীক্ষাগুরু। অতঃপর দীপঙ্কর মগধের প্রসিদ্ধ ও পারদর্শী বৌদ্ধ-আচার্যগণের নিকট সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। প্রাচীন মগধ বর্তমান রাজগীরের নিকট প্রসিদ্ধ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটস্থ একটি পল্লী আজিও **"দীপনগর"** নামে পরিচিত হইয়া দীপঙ্করের পুণ্যস্মৃতি বহন করিতেছে। তিব্বতীয় ভাষায় দীপঙ্কর না লিখিয়া দীপঙ্গর লেখা হয়। অতএব দীপঙ্কর বর্তমানে 'দীপনগরে' পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে।

সুবর্ণদ্বীপ যাত্রা ঃ

ভিক্ষু হইবার পরে দীপঙ্কর বিক্রমশীলা-বিহারে যাইয়া আশ্রয় লাভ করেন। সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই সকলের নিকট প্রধান পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। তাহার জ্ঞানতৃষ্ণা দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াও তাহার জ্ঞানস্পৃহা নিবৃত্ত হইল না, বরং দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আরও অধিক শিক্ষালাভের জন্য এবং ধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তাহার চিত্ত ব্যাকুল হইল। কিছুতেই যেন তিনি অন্তর-মধ্যে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছিলেন না।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—'সে সময় মঠের' "বিক্রমশীলার অধ্যক্ষ তাহাকে সুবর্ণদ্বীপে প্রেরণ করেন। তিনি সুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম সংস্কার করিয়া প্রসিদ্ধ হন।"

মগধে প্রত্যাবর্তন ঃ

তিব্বতী পর্যটক শরৎচন্দ্র দাশ লিখিয়াছেন—"তৎকালে সুবর্ণদ্বীপ (ব্রহ্মদেশ) প্রাচ্যজগতে বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। আচার্য চন্দ্রকীর্তি তথাকার প্রধানতম যাজক। দীপঙ্কর অবশেষে তাহারই নিকটে যাইতে মনস্থ করিলেন। এবং কতিপয় বণিকের সমভিব্যহারে বৃহৎ নৌকারোহণে সুবর্ণদ্বীপের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভীষণ সমুদ্রবক্ষে প্রকাণ্ড তরণী, প্রচণ্ড ঝটিকা ও তুফানের ক্রীড়াপুত্তলিকা স্বরূপ ভাসিয়া চলিল; পথিমধ্যে কত কষ্ট, কত বিঘ্ন, পদে পদে তাহার মঙ্গল-যাত্রায় নানা অমঙ্গলের সূচনা করিল। অবশেষে তের মাস পরে নৌকা সুবর্ণদ্বীপের উপকূলে উপনীত হইল। তথায় দ্বাদশবর্ষ অবস্থিতিপূর্বক তিনি অভীষ্ট বিদ্যালাভ করিয়া কতকগুলি বণিকের সহিত একখানি পোতারোহণে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। আসিতে আসিতে পথিমধ্যে তিনি তাম্রদ্বীপ ও অরণ্যদ্বীপ দেখিয়া আসিয়াছিলেন। অতঃপর মগধে প্রতিগমন করিয়া শান্তি, নরোপান্ত, কুশল, অবধুত, তম্ভী প্রভৃতি যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।"

দীপঙ্কর যখন সুবর্ণদ্বীপে যাত্রা করেন, তখন তাহার বয়স মাত্র একত্রিশ বৎসর ছিল। কাজেই তিনি যখন মগধে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাহার বয়স ছিল মাত্র ৪৩ বৎসর।

দীপঙ্কর "ধর্মপাল" ঃ

মগধে ফিরিয়া আসিলে পর মগধের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ দীপঙ্করের অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাহারা দীপঙ্করের প্রতিভার ও বৌদ্ধশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান দেখিয়া তাহাকে তথাকার 'ধর্মপাল' রূপে মনোনীত করিলেন। বৌদ্ধদের মধ্যে এ অতি শ্রেষ্ঠ সম্মান। দীপঙ্কর যে শুভমুহূর্তে সেইখানে ধর্মপাল রূপে মনোনীত হইলেন, সেইদিন হইতেই মগধে বৌদ্ধধর্ম দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইল। ভারতীয় বৌদ্ধপণ্ডিতগণের মধ্যে তিনিই শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। এ সময়ে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মহাবোধি-বিহারে বজ্রাসনে (Vajrasana) বাস করিতেছিলেন। এখানে তাহার সহিত তীর্থিক-ধর্মাবলম্বী (ভিক্ষাজীবী) হিন্দু পণ্ডিতগণের ধর্মবিষয়ক তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হয়, প্রত্যেকবারই পণ্ডিতগণ তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার

করেন। এ সময়ে দীপঙ্করের কীর্তি-সূর্য মধ্য গগনে আরোহণ করিয়াছে, ভারতে ও বহির্ভারতে তাহার জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ ঃ

দীপঙ্কর যখন বজ্রাসনে বাস করিতেছিলেন, সে সময়ে বাংলাদেশের পালবংশীয় নরপতি মহীপালদেব দীপঙ্করকে তাহার বিক্রমশীলা-বিহারে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। মহীপালদেব বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন এবং বৌদ্ধকীর্তি রক্ষা ও সংস্কারের জন্য তাহার অসাধারণ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। মহীপালদেবের সারনাথ প্রস্তরলিপির প্রথম পংক্তিতে 'গৌড়াধিপ' মহীপালের আদেশে, কাশীধামে 'ঈশান চিত্র ঘণ্টাদির' শত কীর্তিরত্ন নির্মিত হইবার এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে 'ধর্মরাজিকা ও সাঙাগ ধর্মচক্র' সংস্কৃত হইবার এবং 'অষ্ট মহাস্থান শৈলগন্ধ কুটি' পুনরায় নতুন করিয়া নির্মিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ এই সকল কার্য সম্পাদনের কাল বলিয়া, ইহাতে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এইসময়ে, [মহীপাল দেবের শাসনকালের একাদশ সংবৎসরে] নালন্দার বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্নিদাহ-বিনষ্ট মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার সাধিত হইবার পরিচয় [নালন্দা-লিপিতে] প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কাজেই মহীপালদেব দীপঙ্করের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইয়া অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিবেন তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং তাহার ন্যায় একজন বৌদ্ধধর্মানুরাগী নৃপতির পক্ষে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত বলিতে হইবে।[৩৪]

দীপঙ্কর মহীপালের আমন্ত্রণে বিক্রমশীলা-বিহারে গমন করেন। প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নয়পালদেব "গৌড়-মগধ বঙ্গের" সিংহাসনে আরোহণ করেন। নয়পালদেব দীপঙ্করের গুণ-গরিমায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিক্রমশীলের প্রধান যাজকের পদে বরণ করিতে ইচ্ছা করিলে, দীপঙ্কর তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। এই সময়ে কার্ণদেশের [কনৌজের] রাজা মগধ আক্রমণ করেন। নয়পালের সেনাদল বারবার যুদ্ধে পরাজিত হইল এবং শত্রুসেনা রাজধানীর নিকটে অগ্রসর হইতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া নয়পাল কর্ণ রাজার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। দীপঙ্করের চেষ্টা ও যত্নে সন্ধি স্থাপিত হইল। তখন উভয় রাজা বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।—এ বিষয়ে পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। স্বর্গত শরৎচন্দ্র দাস সর্বপ্রথমে ইহার উল্লেখ করেন। পরে স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু এবং ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, শরৎচন্দ্র দাস ও মনোমোহনবাবুর মতই সমর্থন করিয়াছিলেন।

সে সময়ে বিক্রমশীলা-বিহারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি নালন্দা-বিহারের চেয়েও অধিক ছিল। 'অনেক বড় বড় পণ্ডিত, বিক্রমশীলা হইলে লেখাপড়া শিখিয়া, শুধু ভারতবর্ষে নয়, তাহার বাহিরেও গিয়া বিদ্যা ও ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বিক্রমশীলা-বিহারের রত্নাকর শান্তি একজন খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক ছিলেন। প্রজ্ঞাকরমতি, জ্ঞানশ্রীভিক্ষু প্রভৃতি বহুসংখ্যক গ্রন্থকার ও পণ্ডিতের নাম বিক্রমশীলার মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। এরূপ বিহারের অধ্যক্ষ হওয়া অনেক সৌভাগ্যের কথা।'

দীপঙ্কর যখন বিক্রমশীলা-বিহারের অধ্যক্ষ হইলেন সে সময়ে সেখানে ৫৭ জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাস করিতেন। বিক্রমশীলা-বিহার যেরূপ বৃহৎ ছিল, তেমনি তাহার ব্যবস্থাও ছিল অত্যন্ত চমৎকার। এই বিহারের সম্মুখস্থিত প্রাচীর-গাত্রের দক্ষিণদিকে নাগার্জুনের মূর্তি চিত্রিত ছিল এবং বামপার্শ্বে স্বয়ং দীপঙ্করের মূর্তি অঙ্কিত ছিল। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, দীপঙ্করকে তৎকালের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ, নাগার্জুনের সহিত সমান মর্যাদা দিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। এবং তিনি সাধারণের নিকট কিরূপ সম্মানিত ছিলেন তাহাও ইহা হইতে

জানিতে পারা যায়। সেই বিহারের আর-এক দিকের প্রাচীর-গাত্রে প্রাচীনকালের পণ্ডিতগণের আলেখ্য অঙ্কিত ছিল, এবং সিদ্ধাচার্যগণের মূর্তির চিত্রও তাহাতে ছিল।

দীপঙ্কর অতীশ যখন বিক্রমশীলা-বিহারে বাস করিতেন সে সময়ে তিনি বিহার ও মন্দিরের চাবি নিজের কাছে রাখিতেন। অতীশের আঠারোটি চাবি রক্ষা করিতে হইত। ইহা হইতে মনে হয় যে, সে সময়ে অষ্টাদশটি বিহার ও মন্দির বিক্রমশীলা-বিহারের অন্তর্ভূক্ত ছিল। দীপঙ্কর---আঠারোজন বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীকে অধ্যাপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছিলেন।

দীপঙ্করের তিব্বত গমন ঃ

বিক্রমশীলা-বিহারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিবার পরও তাহাকে কার্যোপলক্ষে মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন বিহারে যাতায়াত করিতে হইত বলিয়া মনে হয়। অন্তত সোমপুরী-বিহারে কিছুদিনের জন্য বাস করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। তেঙ্গুরের ক্যাটাগল হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

এই সময়ে হিমালয়ের উত্তর প্রান্তে সুদূর তিব্বতে দীপঙ্করের অমরত্ব লাভের পথ ধীরে ধীরে পরিষ্কৃত হইতেছিল। সমগ্র বৌদ্ধ-শাস্ত্রে গভীর পারদর্শিতা এবং বৌদ্ধজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াও তিনি কখনও স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, একদা তিব্বতের অধিপতি লামাও তাহাকে 'অতীশ' (সর্বশ্রেষ্ঠ) বলিয়া পূজা করিবেন। তৎকালে থোলিং নগরে লামার প্রধান রাজপীঠ ছিল। তদীয় রাজত্বকালে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তিনি বৌদ্ধনীতির সংস্কার করিবার অভিপ্রায়ে ভারতের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ-বিহারে কতিপয় নবীন সন্ন্যাসীকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা কাশ্মীর প্রভৃতি নানাস্থানে বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া অবশেষে বিক্রমশীলায় উপনীত হইলেন। তথায় দীপঙ্করের যশোগৌরব তাহাদের শ্রুতিগোচর হওয়াতে তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজসকাশে তাহার সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। রাজার কৌতূহল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। এইরূপ অদ্বিতীয় বৌদ্ধ আচার্যকে তিব্বতে আনয়ন করিবার জন্য তিনি নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন এবং প্রভূত সুবর্ণ ও একশত পরিচারকের সহিত একজন বিশ্বস্ত রাজপুরুষকে মগধে প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে অসীম কষ্ট ও যাতনা সহ্য করিয়া, রাজদূত বিক্রমশীলায় উপনীত হইল এবং দীপঙ্করের সম্মুখে সেই প্রকাণ্ড স্বর্ণপিণ্ড স্থাপন করিয়া রাজার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। দীপঙ্কর তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। শত শত অনুনয় বিনয়, সহস্র প্রলোভন সেই তেজস্বী মহাপুরুষকে ভুলাইতে পারিল না। দীপঙ্কর কিছুতেই তিব্বতে যাইতে চাহিলেন না। তিনি বিনীতভাবে বলিলেন---'আমার সোনা-দানার কোনও প্রয়োজন নাই। আমি সোনা দিয়া কি করিব?" তিনি আরও বলিলেন, আমাকে দুইটি কারণে তোমরা তিব্বতে লইয়া যাইতে চাহিতেছ—প্রথমত সুবর্ণপ্রাপ্তির লোভ, দ্বিতীয়ত সিদ্ধ দেবতারূপে পরিগণিত হইবার জন্য—ইহার একটির প্রতিও আমার আকর্ষণ নাই। কাজেই আমি আমার তিব্বত-যাত্রার কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করি না। রাজদূত দীপঙ্করের এইরূপ উক্তি শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

রাজা লামা জে-সে—হোড (Lha-bla-ma-ye-she-'od) রাজদূতের মুখে দীপঙ্করের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া দীপঙ্করকে আনিয়া তিব্বতের ধর্ম-সংস্কার করিবার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। রাজা লা-লামা বৃদ্ধ ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র চ্যাং-চুব রাজা হইলেন। চ্যাং-চুব রাজপদ গ্রহণ করিলেও তিনি সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুর ন্যায়ই জীবন-যাপন করিতেন।—চ্যাং-চুব রাজা হইয়াই এক ধর্মসভার আহ্বান করিলেন। সেই সভায় তিব্বতের ঐ অঞ্চলের যতসব ধার্মিক শ্রমণগণ আসিয়া মিলিত হইলেন। রাজা তাহাদিগকে

সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আপনারা প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাইতেছেন যে আমাদের দেশে ধর্মের বিশেষ অবনতি হইয়াছে। ভিক্ষুদের মধ্যে মতভেদ চলিতেছে। একদল ভিক্ষু নীলবর্ণানুরঞ্জিত আল্ল-খোল্লা পরিয়া তান্ত্রিক ব্যাভিচার শিক্ষা দিতেছে। স্বর্গত মহারাজ ধর্মের সংস্কারের জন্য পূর্বে যে তেরোজন পণ্ডিত আনাইছিলেন তাহারাও এখানে ধর্ম-সংস্কার সম্বন্ধে কোনও কার্য করিতে পারেন নাই। এইরূপ স্থলেই যেরূপেই হয়, স্বর্গীয় মহারাজার আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে। এ বিষয়ে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করুন। উপস্থিত শ্রমণগণ সকলেই নৃপতি চ্যাং-চুবের এই ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

এই সভায় বিনয়ধর নামক একজন বৌদ্ধ শ্রমণ উপস্থিত ছিলেন। ইনি পূর্বেও কয়েকবৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহার পরিচয় ছিল। বিনয়ধরের বয়স তখনও সাতাইশ বৎসর মাত্র ছিল। রাজা চ্যাং-চুব বা বানচুর বিনয়ধরকে বলিলেন—"তুমি পূর্বে ভারতবর্ষে বাস করিয়াছ। সে দেশের উষ্ণ জলবায়ুর সহিত তুমি পরিচিত, অতএব তুমিই দীপঙ্করকে তিব্বতে আনয়ন করিবার জন্য গমন কর। যদি তিনি একান্তই না আসেন তবে তাহার পরবর্তী যিনি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিও।"

তিব্বত-রাজা চ্যাং-চুবের দীপঙ্করকে তিব্বতে আনিবার জন্য বিনয়ধরকে প্রেরণ ঃ

বিনয়ধর পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নির্জনে মঠে বসিয়া ধর্মশাস্ত্র পাঠ করা এবং ধ্যান-ধারণার ভিতর দিয়া জীবন অতিবাহিত করাই শ্রেয় জ্ঞান করিয়াছিলেন, কাজেই তাহার ইচ্ছা ছিল না যে ভারতবর্ষে আসেন। কিন্তু নৃপতি চ্যাং-চুব বিশেষ ভাবে অনুজ্ঞা দেওয়ায় তিনি রাজাদেশ পালন করিতে বাধ্য হইলেন। রাজা তাহার সহিত ১০০টি অনুচর দিতে চাহিলেন, কিন্তু বিনয়ধর মাত্র পাঁচটি সঙ্গী লইলেন। রাজা তাহাকে অনেক স্বর্ণ দিলেন। সেই স্বর্ণের মধ্য হইতে কতক দীপঙ্করকে উপঢৌকন স্বরূপ, কতক বিনয়ধরের পারিশ্রমিক, কতক বিনয়ধরের যাতায়াতের ব্যয়বাবদ এবং কতক একজন দোভাষীর জন্য।

বিনয়ধর নানারূপ ক্লেশ সহ্য করিয়া দুর্গম-পার্ব্বত্য-পথে ভারতের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহাদের দস্যু-তস্করের হাতে বিড়ম্বিত হইয়া নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রমপূর্বক বিক্রমশীলা-বিহার আসিতে হইয়াছিল।[৩৫]

সে সময়ে বিনয়ধরের অধ্যাপক তিব্বতদেশীয় গ্যায়ৎসনে তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। বিনয়ধর দীপঙ্করকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য বিক্রমশীলা আসিয়াছেন সে কথা তাহার নিকট বলিলেন। তখন গ্যায়ৎসনে তাহাকে বলিলেন যে—একথা এই বিহারের কাহারও নিকট কোনও ক্রমেই এখন প্রকাশ করিবেন না। কেন না দীপঙ্কর এই বিহারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তিনি এই বিহার পরিত্যাগ করিয়া যান তাহা এখানকার কাহারও অভিপ্রেত নহে। আপনারা এ বিষয়টি গোপন রাখিয়া এই বিহারে অবস্থান করুন এবং মহাস্থবির রত্নাকরকে যথোপযুক্ত স্বর্ণদক্ষিণা প্রদান পূর্বক এই বিহারের শিষ্যরূপে অবস্থান করিতে থাকুন। তারপর যদি আপনাদের ব্যবহার দ্বারা মহাস্থবিরকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদের পক্ষে অতীশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার সুযোগ ও সুবিধা হইবে। বিনয়ধর গ্যায়ৎসনের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং অল্পসময়ের মধ্যেই বিক্রমশীলা-বিহারের অধ্যাপকগণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিলেন।

বিক্রমশীলা-বিহারে এক মহাসভার অধিবেশন হইল। সেখানে প্রায় আটহাজার ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিল। সেইখানে বিনয়ধর তেজঃপুঞ্জ কলেবর দীপঙ্করকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তারপর কয়েকদিন পরে সুযোগক্রমে দীপঙ্করের নিকট ভক্তি-প্রণত-মস্তকে বিনয় সহকারে তাহাদের রাজার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

দীপঙ্কর ধৈর্যসহকারে সব কথা শুনিলেন। তিব্বত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের নানা অবনতির

বিষয় অবগত হইয়া তাহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, কিন্তু কি যে করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না—তিব্বত যাইবেন কিনা, সে বিষয়ে মন স্থির করিবার পূর্বে এবং সম্মতি দিবার পূর্ব্বের রজনীতে তিনি বিক্রমশীলা-বিহারের মধ্যস্থিত তারাদেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। মণ্ডল (Cycle of offerings) স্থাপন করিয়া তিনি দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন—"দেবী! আমি যদি তিব্বত গমন করি তবে আমার দ্বারা কি তিব্বতের দূষিত বৌদ্ধধর্মের কোনওরূপ সংস্কার হইতে পারিবে? ধর্মপরায়ণ মৃত তিব্বতের মহারাজার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল আমি তিব্বতে যাইয়া ধর্মের সাধন করি। এই প্রবীণ বয়সে আমার পক্ষে কতদূর তাহা সম্ভবপর হইবে তাহা দেবী আপনি আপনার উপাসিকা যোগিনীর মুখে ব্যক্ত করুন।"[৩৬]

দীপঙ্করের এইরূপ সুযুক্তিপূর্ণ প্রার্থনার পর যোগিনী উত্তর করিলেন—"তুমি যদি তিব্বতে গমন কর, তবে সেখানে মহদ্ধর্মের বিবিধ কল্যাণ সাধিত হইবে। বিশেষত উপাসক (দলাই লামা) পরম উপকৃত হইবেন। দলাইলামা তোমার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের সংস্কার ও উন্নতি করিতে সমর্থ হইবেন। তিব্বত গমন করিলে তোমার জীবনের আয়ু কুড়ি বৎসর হ্রাস পাইবে। আর যদি তিব্বতে গমন না কর তাহা হইলে তুমি বিরানব্বই বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকিবে।"

দীপঙ্করের তিব্বত যাত্রা ঃ

এইবার দীপঙ্কর মনঃস্থির করিয়া তিব্বত-যাত্রা করিতে উদ্যোগী হইলেন। প্রথমে তিনি বিক্রমশীলা-বিহারের মহাস্থবির রত্নাকরের নিকট বলিলেন—"আমি তিব্বতীয় শিষ্যগণের সহিত তীর্থদর্শনে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আপনি আমার প্রত্যাগমন পর্যন্ত সুস্থ ও সবল থাকেন ইহাই ভগবান তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।" রত্নাকরও তাহার সহিত তীর্থ-যাত্রার অভিলাষী হইলেন। রত্নাকরের এই কথায় দীপঙ্কর নীরব রহিলেন। রত্নাকর বলিলেন —"দীপঙ্কর" আমি তোমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি অষ্ট পুণ্যস্থান দেখিবার ছল করিয়া বিনয়ধর (নাগ-চো), গ্যায়ৎসন এবং তাহাদের সঙ্গী অন্য পাঁচজন শ্রমণের সহিত তিব্বত-যাত্রার অভিলাষী হইয়াছ। একবার আমি তোমার যাইবার পক্ষে বাধা-স্বরূপ হইয়াছিলাম। এইবারও যদি তোমার যাইবার কথা কোনওরূপে নৃপতির কর্ণে যাইয়া পৌঁছায় তাহা হইলে তোমার যাওয়া সম্ভবপর হইবে না, বিশেষ এই দুইজন তিব্বতীয় ভিক্ষুরও জীবন সংশয়াপন্ন হইবে। কিন্তু আমি ইহাদিগকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছি, অতএব ইহাদের প্রতি কোনওরূপ বিরুদ্ধাচরণ করা কর্তব্য নহে। তারপর ইহারা তিব্বতীয় মহারাজার নিকট হইতে যে মহদুদ্দেশ্যের বার্তা লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, এইরূপ স্থলে আমি সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িয়াছি, কি করিব, তবে আমি তিন বৎসরের জন্য তোমাকে যাইতে দিতে পারি।"

মহাস্থবির রত্নাকরের এই অভিপ্রায় অল্প সময়ের মধ্যেই বিক্রমশীলা-বিহারের সর্বত্র প্রচারিত হইল। বিহারের ভিক্ষুগণ-অধ্যাপকগণ সকলেই দীপঙ্করের তিব্বত-যাত্রা সম্পর্কে বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু দীপঙ্করের প্রাণে নবীন উৎসাহ উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিব্বতের মৃত মহারাজার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির কথা স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছিল। তিনি তিব্বত-যাত্রার জন্য আয়োজন ও উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিব্বতের রাজার প্রেরিত স্বর্ণ, দীপঙ্কর চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক ভাগ দিলেন বিক্রমশীলার অধ্যাপকদিগকে, অপর এক ভাগ দিলেন স্থবির রত্নাকরের হাতে, তৃতীয় ভাগ তিনি বজ্রাসন-বিহারের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন, আর চতুর্থ ভাগ রাজভাণ্ডারে দেওয়ার জন্য যথোপযুক্ত উপদেশ দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, যেন এই স্বর্ণ বৌদ্ধ-ভিক্ষু সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে ব্যয়িত হয়।

তারপর আসিল একদিন বিদায় মুহূর্ত। সে সময়ে বিক্রমশীলা-বিহারের শ্রমণগণ ও অধ্যাপকগণ, শিষ্যগণ সকলে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে দীপঙ্করের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দীপঙ্কর সেই স্তব্ধ ও শোকাকুল জনতার দিকে চাহিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন।

দীপঙ্করের প্রভাব ও ন্যায়নিষ্ঠা ঃ

দীপঙ্করের মনে পড়িল—বিক্রমশীলা-বিহারের শত স্মৃতি। প্রতিদিন প্রত্যুষে তিনি যখন বিহারে আসিতেন, তখন ভিখারি বালকগণ করুণ-নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া ছোট ছোট হাতগুলি বাড়াইয়া বলিত "বাবা, ভিক্ষা দে! বাবা ভিক্ষা দে!" মনে পড়িল কিরূপ ন্যায়নিষ্ঠার সহিত তিনি এই বিহারের প্রধান আচার্যরূপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। এমনকি দিবাকর চন্দ (Devakar Chanda), রামপাল প্রভৃতির ন্যায় শিষ্যদিগকেও বিক্রমশীলা-বিহার হইতে তাহাদের অপরাধের জন্য বিতাড়িত করিতে ইতস্তত করেন নাই।[৩৭]

আজ সেই কীর্তিক্ষেত্র বিক্রমশীলা-বিহার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে তাহার প্রাণে যে কত বড় ক্লেশ বোধ হইতেছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

দীপঙ্কর বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিহারের শ্রমণগণ, শিষ্যগণ, কেহই তাহাকে তিব্বতের ন্যায় দুর্গম প্রদেশে যাইতে দিতে সম্মত হইবেন না। এই জন্যই "অষ্ট মহাস্থান"[৩৮] দেখিবার ছল করিয়া তাহাকে বিহার হইতে বাহির হইতে হইয়াছিল। তাহার এই তীর্থযাত্রা যে তিব্বত-যাত্রা তাহা বিক্রমশীলা-বিহারের সকলেই কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছিল। কাজেই তাহার যাত্রাকালে সকলেই প্রাণেই এরূপ গভীর বেদনা ও দুঃখ সঞ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু মহাপ্রাণ দীপঙ্কর তাহার বয়স ও পথের দারুণ ক্লেশের কথাও বিস্মৃত হইলেন, যখন তাহার মনে পড়িল পবিত্র বৌদ্ধ-ধর্মের তিব্বতে কি দারুণ অবনতিই না হইয়াছে! তখন তাহার মনে হইল—ধর্মপ্রাণ রাজ-সন্ন্যাসী জে-সে-হোড্ তাহাকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্যই প্রাণ-বিসর্জন দিয়াছেন। ধর্ম-সংস্কারের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইবে। সেই অর্থ কিরূপে সংগ্রহ হইতে পারে, সে চিন্তায় জে-সে-হোড্ যখন ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন, সে সময়েই তাহার মন্ত্রী কর্তৃক একটি স্বর্ণখনি আবিষ্কারের কথা জানিতে পারিলেন। সেই খনির নিকটে গেলে-পর গ্যারলোগ্ (Garlog) নামক স্থানের মুসলমান নৃপতি তাহাকে বন্দী করেন। গ্যারলোগ তুর্কিস্থানে অবস্থিত। গ্যারলোগের মোশ্লেম নৃপতি তিব্বতীয়দিগকে বলিলেন—"আমি তোমাদের রাজাকে মুক্তি দিতে পারি, যদি তোমরা রাজার আকৃতির পরিমাণ ও দেহের ওজনানুরূপ স্বর্ণ দান করিতে পার। তখন তারা সারা তিব্বতে স্বর্ণ-সংগ্রহের জন্য লোক ছুটিল। সুবর্ণ সংগৃহীত হইল, মূর্তিও নির্মিত হইল, কিন্তু রাজার মাথা তৈরি করিবার পরিমাণ সোনা কম পড়িল। গ্যারলোগের রাজার ইহাতে তৃপ্তি হইল না। তিনি রাজা জে-সে-হোডকে এক গভীর অন্ধকারময় কারাগৃহে বন্দী করিলেন। ঐ সময়ে নূতন রাজা বান্-চুব বা চ্যাং (Bang-Chub) হোড্ রাজা জে-সে হোডের মুক্তি-কামনয় তখনও তিব্বতের স্বর্ণ সংগ্রহের জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি তাহার খুল্লতাতের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। জে-সে-হোডের সহিত তিনি যখন সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, সে সময়ে জে-সে হোড্ তাঁহাকে বলিলেন,—'বৎস! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। মৃত্যু আমার সন্নিকটবর্তী। আমার মনে হয় আমার পূর্বজন্মে আমি কখনও বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে জীবন বিসর্জন দিই নাই। এইবার এই জন্মে আমার পূর্বজন্মে সেই সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছে, আমাকে মহদ্ধর্মের জন্য প্রাণত্যাগ করিবার সুযোগ দাও। আমাকে মুক্ত করিবার জন্য এই সযত্ন সংগৃহীত স্বর্ণের অপব্যয় না করিয়া তুমি ভারতবর্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়া অধঃপতিত তিব্বতীয়দিগের মধ্যে পুনরায় মধ্যে পুনরায় বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করিয়া দেশে পবিত্রতা আনয়ন কর। বৌদ্ধধর্মের পবিত্র মহদ্বাণী প্রচারে ব্রতী হও।" চ্যাং-চুব্ নত মস্তকে খুল্লতাতে

এই বাণী শিরোধার্য করিয়া লইলেন।—নৃপতি জে-সে হোড় কারাগারেই প্রাণত্যাগ করিলেন।[৩৭]—দীপঙ্করের চক্ষের সমক্ষে সেই মৃত্যুদৃশ্য প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের জন্য তিনি এমন করিয়া আত্মবিসর্জন করিতে পারেন, তাহার আকাঙ্ক্ষা কি অপূর্ণ থাকিবে? তাই দীপঙ্কর দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয়ের পথকে গ্রাহ্য করিলেন না— নিজের বয়স মানিলেন না—ধর্মের জন্য বাঙালির গৌরবগরিমা ভারতীয় পণ্ডিতের মহত্ত্ব বিকাশের জন্য বাঙালি দীপঙ্কর বিক্রমপুরের এই বিক্রমশালী সন্তান তিব্বত-যাত্রা করিলেন।

তিব্বতে যাত্রাকালে দীপঙ্করের বয়স ঃ

দীপঙ্করের তিব্বত যাত্রাকালে তাহার বয়স কত ছিল, সে বিষয়ে বিভিন্নরূপ মত দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে তিনি ১০৪২ খ্রিস্টাব্দে ৫৯ বৎসর বয়সে তিব্বত-যাত্রা করেন।[৩৯] এল. এ. ওয়াডেল [L. A. Waddel] সাহেবের মতে দীপঙ্কর ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতে গমন করেন। সে সময়ে তাহার বয়স ৫৮-৫৯ বৎসর ছিল। রক্‌হিল সাহেবও দীপঙ্কর ৫৯ বৎসরে তিব্বতে গমন করেন সেই কথা বলিয়াছেন। ... তবে তাহার হিসাব মানিয়া লইতে হইলে দীপঙ্করের জন্ম ৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ হইয়াছিল বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু আমরা তিব্বতের ইতিহাস এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের লেখা হইতে সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারিতেছি যে, দীপঙ্কর ৫৯ বৎসর বয়সে অর্থাৎ, আসন্ন ষাট বৎসর বয়সে তিব্বত-যাত্রা করেন তাহাই প্রামাণিকরূপে পাইতেছি। তাহার জন্মের বৎসর স্বর্গত শরৎচন্দ্র দাসের মতে ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে হইয়াছিল, ইহাই এতদিন কিন্তু প্রামাণিকরূপে গৃহীত হইয়াছিল।[১] অতীশের জন্ম ৯৮২ বা ৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে হউক না কেন, তিনি যে ৫৯ বৎসর বয়সে তিব্বত-যাত্রা করেন, সে বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহের কারণ নাই। তবে কোনও্ সময়ে গিয়াছিলেন, তাহা লইয়াই তর্ক উপস্থিত হয়। আমাদের মনে হয় অধিকাংশ লেখকই যখন অতীশ ১০৪২ খ্রিস্টাব্দে তিব্বত গমন করিয়াছিলেন বলিয়া বলিতেছেন, তখন আমরাও ১০৩৮ খ্রিস্টাব্দ-এর পরিবর্তে ১০৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি তিব্বত গিয়াছিলেন সে কথাই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

দীপঙ্করের তিব্বত-যাত্রার পূর্বে বৌদ্ধধর্মের সংস্কারের জন্য তিব্বতের বৌদ্ধ নৃপতিগণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং ১০১৩ খ্রিস্টাব্দ হইতেই এই প্রচেষ্টা চলিতেছিল। লামা জে-সে-হোড [Lha Lama Yeces HOd-the Royal Lama] তিব্বতের প্রচলিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠানে বিরক্ত হইয়াই উহার সংস্কারের উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাহারই উদ্যোগে—প্রাচ্য বা পূর্বদেশ হইতে কাশ্মীরের রত্নবজ্র, মগধের ধর্মপাল প্রভৃতি গিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের সহিত তাহার যে কয়জন শিষ্য গিয়াছিলেন, তাহাদের সকলের পশ্চাতেই 'পাল' শব্দ যুক্ত ছিল। ইহাদের সহায়তায় রাজসন্ন্যাসী জে-সে-হোড় তাহার রাজ্যমধ্যে ধর্ম, শিল্প প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের দিক্ দিয়া কতকটা সংস্কার করিতে পারিয়াছিলেন। ধর্মপালের পর দীপঙ্কর তিব্বতে গমন করেন।[৪০/৪১/৪২]

তিব্বতের যাত্রা-পথে ঃ

অতীশের তিব্বত-যাত্রার সঙ্গী হইলেন পণ্ডিত ভূমিসঙ্ঘ (Bhumisangha), বীর্যচন্দ্র, নাগ-ছো, গ্যায়ৎসেন এবং অনুচর ও ভৃত্যমণ্ডলী। তাহারা যাত্রাপথে প্রথমে মিত্রবিহারে আসিলেন। সেই বিহারের শ্রমণগণ এই যাত্রীদলকে পরম সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহারা অতীশকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। এই বিহার হইতেই তাহারা তিব্বতের উদ্দেশে চলিতে লাগিলেন। গ্যায়ৎসেনের সঙ্গে ছিল দুইজন ভৃত্য, নাগ্-ছোর সহিত ছিল ছয়জন এবং অতীশের সঙ্গে ছিল কুড়িজন অনুচর। তাহারা চলিতে

চলিতে ক্রমে ভারতের সীমান্ত-প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটি ছোট বিহার ছিল—সেই বিহারের শ্রমণগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে অতীশ এবং তাহার সঙ্গীগণকে পরম শ্রদ্ধার সহিত আশ্রমের অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন। ভারতের সীমান্ত প্রদেশস্থিত এই শ্রমণগণ আপনাদের মধ্যে এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন : "যদি অতীশের এই তিব্বত-যাত্রা আমরা প্রতিরোধ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে খুবই ভাল হইত, কেন না আমরা ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছি যে, অতীশের ন্যায় একজন মহাপণ্ডিতের ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্মের গৌরবসূর্য অস্তমিত হইবে। অতএব আমাদের কর্তব্য হইতেছে মহাপণ্ডিত আচার্য অতীশকে তাহার তিব্বত-যাত্রার অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করা। আবার সঙেঘর অন্যান্য শ্রমণেরা বলিলেন : "বিক্রমশীলা-বিহারের আচার্যগণ যখন তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই তখন আমাদের এইরূপ চেষ্টা করা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ।"

বিহারের শ্রমণগণ অশ্রুপূর্ণ-লোচনে অতীশ ও তাহার সঙ্গীগণকে পর্বতে আরোহণ করিতে দেখিলেন।

অতীশ এবং তাহার সঙ্গীগণ ভারতের সীমান্ত-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া তীর্থিকদের গন্তব্যস্থলে অতি পবিত্র একটি বিহারে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেস্থানে অতীশের মতাবলম্বী পঞ্চদশজন বৌদ্ধাচার্য বাস করিতেছিলেন। এই আশ্রমের আচার্যগণ তাহার সহিত পরিচিত হইয়া ধন্য মনে করিলেন। সারাদিন অতীশের সহিত তাহার ধর্মালোচনা করিলেন। অতীশ তাহাদিগকে এইরূপ সরলভাবে বৌদ্ধধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব-সমুদয় বুঝাইয়া দিলেন যে, সেই আশ্রমবাসী শ্রমণগণ অতীশের পাণ্ডিত্য ও অমায়িক ব্যবহারে একান্ত প্রীত হইয়া প্রত্যেকে তাহাকে একটি ছত্র উপহার দিলেন। তাহার অতীশের সহিত একান্ত অনুগতের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাহারা ক্রমশ পার্বত্য-পথে চলিতে লাগিলেন। এই পথে অনেক তীর্থিকেরা ও তাহাদের সঙ্গী ছিল। তীর্থিকদলের মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব, কপিলাশ প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোক ছিল, তাহারা বৌদ্ধধর্ম-বিদ্বেষী ছিল। ইহারা তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই তীর্থিকদলের মধ্যে কেহ কেহ অতীশকে হত্যা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। একবার তাহারা আঠারোজন দুর্দান্ত দস্যুকে এই কার্যে প্ররোচিত করে, কিন্তু সেই দস্যুগণ অতীশের সৌম্য, শান্ত ও জ্যোতিষ্মান্ মুখশ্রী দেখিয়া এমনভাবে অভিভূত হইয়া পড়িল যে, তাহাদের হাতের অস্ত্র হাতেই রহিয়া গেল—প্রস্তর-মূর্তির মত সকলে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অতীশ কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বলিলেন —"আমার এই হতভাগ্য দস্যুদের জন্য দুঃখ হইতেছে!" এইরূপ বলিয়া তিনি মাটির উপর কয়েকটি মূর্তি অঙ্কিত করিয়া যেমন মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন, অমনি নির্বাক ও অচল দস্যুদল আবার বাক্‌শক্তি লাভ করিল এবং চলিতে সক্ষম হইল।

অতীশের দয়া ও মহত্ত্ব ঃ

একদিন পথিমধ্যে এক স্থানে অতীশ দেখিতে পাইলেন, তিনটি কুকুরের বাচ্চা শীতে জড়সড় হইয়া কষ্ট পাইতেছে। কেহ তাহাদের দিকে ফিরিয়াও তাকাইতেছে না। অতীশ কুকুরের বাচ্চা-তিনটিকে তুলিয়া তাহার গাত্রাবরণের মধ্যে লইলেন এবং বলিলেন—আহা! বাছারা, তোমরা বড় কষ্ট পাইতেছ। এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। এমনি ছিল তাহার দয়া ও মহত্ত্ব।

এ স্থানের রাজা (জমিদার) এই যাত্রীদলের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন। অতীশের সহিত চন্দনকাঠের একটি ছোট টেব্‌ল (Table) ছিল। রাজা দীপঙ্করের নিকট সেই টেবলটি অভদ্রভাবে দাবি করিলেন। অতীশ বলিলেন : "আমি তিব্বতের রাজাকে উপহার

দিবার জন্য এই টেবলটি লইয়া যাইতেছি। আমি ইহা কোনও প্রকারেই হস্তান্তরিত করিতে পারিব না। রাজা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাকে বিপন্ন করিবার জন্য পথে এক দস্যুদলকে পাঠাইয়া দিলেন, যেন তাহারা পরদিন প্রত্যুষে অতীশ ও তাহার সঙ্গীগণ যেমন এ পথ দিয়া যাইবেন, সে সময়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সমুদয় দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে এবং তাহাদের প্রাণনাশ করে।

পরদিন প্রত্যুষে রাজা যেমন-যাত্রীদলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গেলেন, তখন দীপঙ্কর তাহার সঙ্গীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমরা সতর্ক থাকিবে। আজ পথে পাহাড়িয়া দস্যুরা আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে।" তাহাই হইল,—কিন্তু অতীশের মন্ত্রপ্রভাবে তাহারা নির্বাকভাবে যন্ত্রচালিত পুতুলের ন্যায় চলিয়া গেল। এইরূপে অতীশের আরাধ্যাদেবী তারার শুভ সিদ্ধি প্রভাবে তাহাদের দস্যুভীতি আর রহিল না।

এইবার তাহার নেপালের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন। দূর হইতে পুণ্য-পীঠস্থানের আর্য স্বয়ম্ভুর মন্দির দেখিয়া তাহাদের মন ও প্রাণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাহারা সকলে একটি শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট শ্যামল-পত্ররাজি-শোভিত বিরাট বৃক্ষের নীচে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এইখানে ভারবাহী জন্তুর পৃষ্ঠ হইতে মালপত্র নামানো হইল। আর্য স্বয়ম্ভুর মন্দির দর্শনে দীপঙ্করের প্রাণ এতদূর আনন্দে বিভোর হইয়াছিল যে, তিনি অপলকনেত্র সেই দিকে তাকাইয়াছিলেন। অতীশ বৃক্ষের শীতল ছায়ায় উপবেশন করিলেন। তাহার দক্ষিণ দিকে গ্যায়ৎসন এবং বাম দিকে বসিয়াছিলেন তাহার ভ্রাতা বিজয়চন্দ্র। আর মধ্যস্থলে একটি উচ্চ আসনে বসিয়াছিলেন রাজসন্ন্যাসী মহারাজ ভূমিসঙ্ঘ। এই ভূমিসঙ্ঘ অতীশের প্রিয়তম শিষ্য।

স্বয়ম্ভুর নৃপতি অতীশকে সদলবলে রাজসম্মানে অভ্যার্থনা করিলেন। তাহার ও তাহার সঙ্গীগণের সর্ববিধ সুব্যবস্থার জন্য রাজকর্মচারীদিগের উপর ভার দিলেন। মগধের শ্রেষ্ঠ আচার্যকে নৃপতি অনন্তকীর্তি অনেকদূর হইতেই পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া রাজপ্রসাদে আনিয়া তাহার থাকিবার সর্ববিধ সুব্যবস্থা করিলেন। তিনি নিজে সম্মুখে উপবেশন করিয়া আচার্য অতীশের উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

গ্যায়ৎসনের মৃত্যু ঃ

এই স্থানে গ্যায়ৎসনের মৃত্যু হইল। গ্যায়ৎসন রাহু নামক একজন তীর্থিকের নিকট হইতে 'নবসন্ধি' নামক বিষয়ে সিদ্ধি-লাভ করিতে যাইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন। মুমুর্ষু অবস্থায় গ্যায়ৎসো অতীশের নিকট এই তান্ত্রিক অভিচারের বিষয় বর্ণনা করিলে, অতীশ তাহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া বলিলেন,—"তুমি অত্যন্ত গর্হিত কার্য করিয়াছ গ্যায়ৎস! এই তীর্থিক সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক ক্রিয়ানুষ্ঠানকারীরা নানারূপ মন্দ অভিপ্রায় লইয়া কার্য করে। এখন তোমার জন্য আমার অত্যন্ত চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে।"

গ্যায়ৎসনকে আরোগ্য করিবার সমুদয় চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। গভীর রাত্রিতে গ্যায়ৎসোর মৃত্যু হইল। অতীশের অনুচরগণ অতি গোপনে রাত্রিকালেই নদীর তীরে লইয়া যাইয়া তাহার দেহের সৎকার করিল। পরদিন প্রত্যুষে যাত্রাকালে গ্যায়ৎসোর পরিত্যক্ত শয্যা দ্রব্যাদি একটা ডুলির মধ্যে এমন ভাবে সাজানো হইল যেন লোকে মনে করে যে, পীড়িত গ্যায়ৎসো ডুলিতে চড়িয়া যাইতেছেন। পাছে নেপাল সরকার কোনওরূপ অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে বিপন্ন করে এজন্যই তাহার এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নতুবা অনাবশ্যক ভাবে যাত্রা-পথে বিলম্ব ও বিঘ্ন ঘটিত।

নেপালে অবস্থানকালে অতীশ, নৃপতি নয়পালকে একখানি উপদেশপূর্ণ লিপি প্রেরণ করেন। ঐ লিপিখানি 'বিমলরত্নলেখ' নামে পরিচিত। অতীশ তাহার সঙ্গীয় দ্বিভাষীর *(Lochava) সাহায্যে ঐ সুন্দর উপদেশপূর্ণ পত্রখানি তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন।*

হোল্কা-বিহার ঃ

এইবার পুনরায় অতীশ ও তাহার সহযাত্রীগণ নেপাল পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন। তাহার হোল্কা (Holka) নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হোল্কার মঠে অতীশের এক বন্ধু প্রধান আচার্যরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। ইনি বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বার্ধক্যের দরুণ তিনি বধির হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া সকলের নিকট তিনি বধির স্থবির (Deaf Sthavir) নামে পরিচিত ছিলেন। অতীশ তাহার পুরাতন বন্ধু এই বধির স্থবিরের নিকট একমাস কাল ছিলেন। এখানকার শ্রমণগণ তাহাকে ও তাঁহার সঙ্গীগণকে পরম সমাদরে সেবা ও যত্ন করিয়াছিলেন। অতীশের সহিত এখানে প্রায় এক সপ্তাহকাল বৃদ্ধ স্থবিরের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। বধির স্থবির মন্ত্র সম্বন্ধে অবিশ্বাসী ছিলেন, অতীশ তাহাকে সে বিষয়ে বলিতে যাইয়া বলিলেন— 'বদ্ধত্ব' প্রাপ্তির জন্য মন্ত্র এবং পারমিতার (Paramita) দুইয়েরই আবশ্যকতা আছে। তিনি এ সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বোধগম্যের নিমিত্ত 'চার্য-সঙ্ঘ-প্রদীপ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। লোচ্ছবা বা দোভাষী অতীশের উপদেশে উহা তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিলেন।

প্যালপোইথান ঃ

হোল্কা হইতে অভিযাত্রীদল পালপোইথান (Palpoi Than) নামক স্থানে আসিলেন। এসময়ে নেপালের রাজা অনন্তকীর্তি সেই স্থানে দরবার করিতেছিলেন। তিনি অতীশকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমাদরের সহিত অভিনন্দিত করিলেন। অতীশ নৃপতি অনন্তকীর্তিকে "দৃষ্টৌযধি" (Drishta Ushadhi) নামক একটা হস্তী উপহার দিলেন এবং এই হস্তীটিকে কি ভাবে পরিচালনা করিতে হইবে সে বিষয়েও বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন। অতীশ বলিলেন,— "মহারাজ, আপনি যুদ্ধাস্ত্র বহন করিবার জন্য কখনও এই হস্তী প্রয়োগ করিবেন না। কিংবা ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কাহাকেও যুদ্ধ করিতে দিবেন না। এই হস্তীটিকে *আপনি পূজাপকরণ, ধর্মগ্রন্থ এবং দেবমূর্তি প্রভৃতি বহন করিবার জন্য নিযুক্ত করিবেন।* আপনাকে আমি যেমন এই হস্তীটি উপহার দিলাম, তেমনি আমি এই হস্তীর বিনিময়ে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি এই স্থানে একটি বিহার নির্মাণ করিয়া দিবেন। সেই বিহারের নাম হইবে **থান-বিহার** (Than Vihara)।

পদ্মপ্রভ ; থান-বিহার ঃ

রাজা অনন্তকীর্তি অতীশের এই নিবেদন পরম শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিলেন এবং বিহার নির্মাণের সম্পূর্ণ ভার তাহার পুত্র পদ্মপ্রভের (Padma-prabha) উপর অর্পণ করিলেন। পদ্মপ্রভ অতীশের শ্রমণ-শিষ্যরূপে পরিগৃহীত হইলেন। ভারত পরিত্যাগের পর একমাত্র পদ্মপ্রভই অতীশের নিকট সর্বপ্রথম শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। থান-বিহার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হইলে-পরে অতীশ পুনরায় তিব্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহার সঙ্গীয় 'লোচ্ছবা' দো-ভাষী রাজপুত্রকে তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য সেখানে রহিয়া গেলেন।

তিব্বতে প্রবেশ ঃ

অতীশ ও তাহার অভিযাত্রীরা যখন তিব্বতে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহারা দেখিতে পাইলেন রাজা চ্যাং-চুবের (Chan-Chub) প্রেরিত একশত অশ্বারোহী পুরুষ কারুকার্য-পরিশোভিত শ্বেতপরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া অতীশ ও তাহার সঙ্গীগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। ইহারা চারিজন সৈন্যাধ্যক্ষের নেতৃত্বাধীনে আসিয়াছিল। তাহাদের নাম লা-ওয়াংপো (Lhai Wanpo) লা-লো দোই (Lhai-Lo-doi) লা সিরাব (Lha Serab) এবং লা শে জোন্ (Lhai-Sei-zon) ইহাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল ষোলটি করিয়া বর্শা।

বর্শার উপরে ছিল শ্বেত পতাকা। অশ্বারোহীদের প্রত্যেকের হস্তে ছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতপতাকা এবং কুড়িটি শ্বেত সাটিনের ছত্র। ইহারা বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে চারিদিক নিনাদিত করিয়া— "ও মণিপদ্মে হুম" এই পবিত্র মন্ত্র গান করিতে করিতে মগধের বিখ্যাত আচার্য দীপঙ্করকে রাজা চ্যাং-চুবের নামে আসিয়া প্রণতিপূর্বক সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। সেদিনকার সেই অভিনন্দন, তিব্বতীয়দের ভক্তি-প্রণতভাব অতীশের চিত্তকে বিশেষরূপে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহার হৃদয় তখন আনন্দে অভিষিক্ত হইয়াছিল। দেবী তারা যে তাহার এই তিব্বত আগমনকে সার্থক করিয়া তুলিলেন তাহা হৃদয়সঙ্গম করিয়া তিনি পুলকিত হইয়াছিল। তিব্বতের গু-জে (Gu-ze) নামক স্থানেই তাহাকে এইরূপ অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।

এই গু-জেতেই অতীশ সর্বপ্রথম চা পান করেন। তিনি গুজেতে আসিয়া পৌঁছিলে পর এবং বিশ্রামাদি করিবার সময় গুজের অভিনন্দনকারীগণ তাহার নিকট তিব্বতীয় রীতিতে চা প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত করিলেন এবং বলিলেন—"মহাত্মন্! আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আপনাকে আমাদের দেশের এই স্বর্গীয় পানীয় পান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।" অতীশ বলিলেন,—"এই পানীয়ের কি নাম? তোমরা যার এত সুখ্যাতি করিতেছ। তিব্বতীয়েরা বলিলেন,—মহাত্মন্! ইহার নাম চা। এই গাছের ছাল খাইতে নাই, কিন্তু ইহার পাতা চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জলে ভিজাইয়া পান করিতে হয়। এই পানীয়ের অনেক কিছু গুণ রহিয়াছে।" অতীশ তাহাদের কথা শুনিয়া বলিলেন—"এমন উত্তম পানীয় নিশ্চয়ই তিব্বতীয় ভক্ত শ্রমণগণের প্রার্থনার ফলে বিধাতা দান করিয়াছেন। আমি ইহা পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম।"

মানস-সরোবর ঃ

গু-জে হইতে এই যাত্রীদল একে একে নানাস্থান অতিক্রম করিয়া ডোক্ (Dok) নামক স্থানে আসিলেন। এই স্থানটি মানস-সরোবর নামক হ্রদের অল্প দূরে অবস্থিত। এই স্থানে দলে দলে গ্রামবাসীগণ আসিয়া অতীশকে বিবিধ উপহার দিয়া পরিতুষ্ট করিতে লাগিল। ডোক্ নামক স্থানে প্রাতঃভোজন ইত্যাদি সমাপন করিয়া তাহারা মানস-সরোবরের তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। মানস-সরোবরের নির্মল সলিলরাশি এবং চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া দীপঙ্কর এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি এইস্থানে এক সপ্তাহকাল অবস্থান করেন। এই স্থানের সৌন্দর্য তাহার চিত্তশতদল নবারুণ-দীপ্তিতে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল। অতীশ যখন মানস-সরোবরের তীরে বাস করিতেছিলেন, ঠিক্ সেই সময়ে নাগ-ছোও এখানে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন। অতীশ একদিন যখন মানস-সরোবরের পবিত্র জলের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে তর্পণ করিতেছিলেন, সে সময়ে নাগ-ছো জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি জলে দাঁড়াইয়া কি করিতেছেন?" অতীশ বলিলেন,—"আমি পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করিতেছি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে স্তুতি জানাইয়া পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। কেন, তোমাদের তিব্বতীয়দের মধ্যে কি তর্পণের রীতি প্রচলিত নাই?" নাগ-ছো কহিল—"হাঁ, আমাদের দেশে মঞ্জুশ্রী দেবী এবং অন্যান্য দেব-দেবীর উদ্দেশে অর্চ্চনা করিবার মন্ত্র রহিয়াছে।" অতীশ নাগ-ছোকে তর্পণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন।

অতীশ মানস-সরোবরের তীর পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, ইতিমধ্যে এই সংবাদ দিকে দিকে প্রচারিত হইয়াছিল। মানস-সরোবরের তীরবর্তী তিনটি দেশ হইতে দলে দলে লোক তাহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিল। তিব্বতের ধর্মবিপ্লবের ও অবনতির যুগে ভারতীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের আগমন তাহাদের নিকট এক নূতন উৎসাহ ও আনন্দের প্রেরণা আনিয়া দিয়াছিল।

এ সময়ে অতীশকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য ৩০০ শত অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের সকলেই ছিল শ্বেত-পরিচ্ছদ পরিহিত। তিন শতাব্দী পূর্বে আচার্য শান্তিরক্ষিতকে যেমন তিব্বতীয়েরা অভ্যর্থিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন—অতীশকেও তেমনি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত পরম ভক্তি-সহকারে আজ আবার রাজার অনুচরবর্গ অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তাহারা অতীশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—"হে পরম প্রবীণ, ভারতীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, দেবতা যেমন ভক্তের প্রার্থনায় ভক্তের বাঞ্ছাপূর্ণ করিবার জন্য আসিয়া দর্শন দেন, তেমনি হে মহাপ্রাণ! মহাপুরুষ, আপনি তিব্বতীয়গণের সনির্বন্ধ অনুরোধে দয়া করিয়া তিব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি 'চিন্তামণি',—আপনি পরশমণি, যাহার স্পর্শে লৌহও স্বর্ণ হয়, যাহার নিকট প্রার্থনা করিলে কোনও কিছুই অপূর্ণ থাকে না তেমনি জানি আপনি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছেন। আমরা জানি, আমাদের এই দেশ ধর্ম সম্বন্ধে হীন—যে ধর্ম-গৌরবে ভারত গরীয়ান্, তবু আমাদের দেশের প্রতি বিশ্ব প্রকৃতির অশেষ-রূপ করুণা ধারা বর্ষিত হইয়াছে। আমাদের দেশে সূর্যের প্রখর প্রতাপ নাই, আমাদের দেশ শীতল ও শান্তিপ্রদ। আমাদের দেশে নীলসলিলপূর্ণ হ্রদ এবং নির্ঝরিণী রহিয়াছে অসংখ্য। তিব্বতের জলবায়ু মানুষকে সজীব করিয়া তোলে। তিব্বতের পার্বত্য প্রদেশ পর্বতান্তরালে অবস্থিত বলিয়া শীতের প্রখরতা সেখানে উপলব্ধি হয় না। সেখানকার উষ্ণতা শরীর ও মনকে কর্মঠ এবং উৎসাহী করিয়া তোলে।

যখন বসন্ত ঋতুর সমাগম হয়, তখন আমাদের দেশে খাদ্যের কোনওরূপ অপ্রাচুর্য থাকে না। তখন আমাদের দেশে জননী লক্ষ্মীর শুভদৃষ্টিতে সমুদয় শস্যক্ষেত্র স্বর্ণশস্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ হয়। শরৎ ঋতুতে তিব্বতের প্রকৃতি সবুজ সৌন্দর্যে হাস্যময়ী হয়। মাঠে-মাঠে, বনে-বনে, পর্বতে পর্বতে শ্যামলশ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। হে পরম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত! আমাদের দেশ প্রত্যেক বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। আমাদের জন্মভূমি আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। আজ আপনার শুভাগমনে আমাদের দেশ পবিত্র হইয়াছে। আপনি আমাদের রাজার পক্ষ হইতে আমাদের মুখে সর্বপ্রথম সাদর স্বাগত-বাণী শ্রবণ করুন। যদিও আমাদের বৃদ্ধ নৃপতি লা-জে-শে হোড় পরলোক গমন করিয়াছেন, তথাপি আমাদের বর্তমান নৃপতি চ্যাং-চুব বিচক্ষণ ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি প্রজাদের কল্যাণের জন্য, ধর্মের সংস্কারের জন্য, হে মহানুভব ভারতীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত! আপনাকে আমাদের তিব্বতে আনয়ন করিয়াছেন। আপনি যখন আমাদের দেশে শুভাগমন করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনার মহৎ উপদেশে আমরা ধন্য হইব। আমাদের নৃপতি যেমন আপনার শুভাগমনে প্রীতিলাভ করিয়াছেন, তেমনি আমরা সকলে আপনার আদেশ ও উপদেশ মান্য করিয়া কৃতার্থ হইব। তিব্বতের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা পুনরায় সর্বত্র ব্যাপ্ত হইবে। আমরাও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া আপনার মহিমাগতিতে ধন্য হইব।"

এইবার অতীশ রক্ষীদল-পরিবেষ্টিত হইয়া চ্যাং-চুবের রাজধানী থেডিং নগরের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহারা 'লো আ. লোমা, লোলা' গীতে চারিদিক মুখরিত করিতে করিতে চলিল।

অতীশের বয়স প্রায় ষাট বৎসর হইলেও তাহার শারীরিক সৌন্দর্য, মধুর হাস্যময় মুখমণ্ডল, স্নেহপূর্ণ ব্যবহার সঙ্গীগণকে প্রীতিমুগ্ধ করিয়াছিল। এই দেব-প্রকৃতির ভারতীয় পণ্ডিতকে দেখিয়া তিব্বতীয় অনুচরবৃন্দ পরম প্রীতি ও আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তাহার সহাস্য মুখমণ্ডল হইতে সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি বড় মধুর শুনাইত। তিনি চলিবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে চলিতেন। এই যে অজ্ঞাত দুর্গম গিরিপথে চলিতেছেন, বৃদ্ধ বয়সে বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিতেছেন তবু সকলের সঙ্গে সুমিষ্টভাবে কথাবার্তা বলিতেছেন,—"অতি ভালো! অতি ভালো! অতি ভালো! অতি মঙ্গল! অতি ভালো হে!

মহাকরুণিকা তারা! শাক্যমুনি দেখ!" এই কয়েকটি কথা প্রতি-নিয়ত তাহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইতেছিল।

চ্যাং-চুবের প্রেরিত লোকজনের প্রতি প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া অতীশ বলিতেছিলেন—"এই রাজকর্মচারীগণ আনন্দে ও হাস্য-কৌতুকে গন্ধর্ব-নৃপতি প্রমোদকেও হার মানাইয়াছে। ইহারা দেখিতে রক্ষ-জাতীয় যক্ষ-সদৃশ। সত্য সত্যই হিমাবৎ প্রদেশ অবলোকিতেশ্বর দেবের লীলা নিকেতন। তাঁহারই কৃপাবলে তিব্বতীয়দের ন্যায় দুর্ধর্ষ-প্রকৃতির "পার্বত্যজাতীয় লোকেরা' মহদ্ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। এই দুর্দান্ত জাতীয় লোকেরা দেখিতে কদাকার ও ভীষণাকৃতি হইলেও ইহাদের প্রকৃতি দিব্য বিনয়পূর্ণ এবং ভক্তি অনুগত। ইহারা সত্য সত্যই দেব অবলোকিতশ্বরের অনুগত সেবক। মনে হইতেছে ইহাদের যিনি নৃপতি, তাহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য হইবে।"

থোলিং-এর পথে ঃ

এই ভাবে আনন্দ-অভিযান করিতে করিতে দীপঙ্কর যখন রাজধানী থোলিং-এর (Tholin) নিকটবর্তী হইলেন, তখন নৃপতি চ্যাং চুবের প্রধান অমাত্য ওয়ান্ চুগ্ (Hhai-wan-chug) অতীশকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। মন্ত্রী ওয়াংচুগ্ অতীশের দুইখানি হস্ত নিজ হস্তমধ্যে ধারণ করিয়া বলিলেন,—"হে প্রভু! আমরা আপনাকে রাজনির্দেশ মত অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আপনি বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ। আপনি দয়া করিয়া আমাদের দেশে আগমন করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। আপনি দারুণ পথ-ক্লেশ করিয়াও যে আমাদিগকে মুক্তি-পথে সন্ধান দেখাইতে আসিয়াছেন, সেজন্য আমাদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সাদর অভিনন্দন গ্রহণ করুন।" মন্ত্রী এই কথা বলিয়া একটি চিত্র-পট (Tapestary) উপহার দিলেন। ঐ পটে অবলোকিতেশ্বর দেবের মূর্তি অঙ্কিত ছিল। এই পটটি প্রায় চল্লিশ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ ছিল। এবং উহা অতি সুন্দর ভাবে স্বর্ণ সূত্রদ্বারা কারুকার্য খচিত ছিল। অতীশ ঐ প্রতিমূর্তির চিত্রপট পাইবা-মাত্র তাহা অভিষিক্ত করিয়া লইলেন।

রাজা চ্যাং-চুবের নিকট, দীপঙ্কর তিব্বতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এই সংবাদ যাওয়া মাত্র ন্যাহারি (Nahari) নামক স্থানের লোকেরা দলে দলে তাহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। এই ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতীয়গণের একমাত্র আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রত্যেক গ্রামবাসী, প্রত্যেক নাগরিকের মুখেই এই মহাপণ্ডিতের কথা শুন যাইতে লাগিল। উচ্চ, নীচ এবং সাধারণ জনগণেরও তাহার মুখে ম্যা-ফ্যাম্ (Ma-Pham) বা মানস-সরোবরের বিষয় অবগত হইবার জন্য আগ্রহ দেখা গেল। রাজা যে মহামানবকে তিব্বতে আনয়ন করিবার জন্য এত অর্থব্যয় করিলেন, যাহাকে আনিবার চেষ্টায় বহু লোকের অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছে, না জানি সেই শ্রেষ্ঠ ভারতীয় পণ্ডিত কিরূপ দেখিতে, কিরূপ তাহার পাণ্ডিত্য, কিরূপ তাহার বাক্য ও উপদেশ। এইরূপ ব্যগ্রতা যে জনসাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সেকথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। রাজা চ্যাং-চুব ও তাহার কর্মচারীদের প্রমুখাৎ দীপঙ্করের সম্বন্ধে নানা বিষয়ে জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়াছিলেন।

রাজা চ্যাং-চুব যখন ব্যগ্রভাবে দীপঙ্করের বিষয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাহার মন্ত্রী লা-লোদোই (Lha lodi) দশজন অশ্বারোহী শরীররক্ষীসহ নৃপতিসকাশে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং বলিলেন,—"মহারাজ! যে মুহূর্তে বহু শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত দীপঙ্কর' পাল্‌পো (Palpa) নেপালে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন, সে সময়ে নেপালের মহারাজ অতি বিপুল ভাবে তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন, এমন কি তাহার পুত্র পর্যন্ত অতীশের নিকট দীক্ষিত হইয়া "দেবেন্দ্র" নামে অভিহিত হইয়াছেন। অতীশের সহিত সমগ্র পশ্চিম ভারতের একজন রাজ-শ্রমণও আসিয়াছেন, তাহার নাম ভূমিসঙঘ। ভূমিসঙঘ নানা

গুণে গুণান্বিত, সসাগরা ধরণীর মহারাজচক্রবর্তী সম্রাট হইবার যোগ্য। ধর্মের জন্য পৃথিবীর সমুদয় বিলাস-শুক ও ধনৈশ্বর্যের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, তিনি জ্ঞানী মহাপুরুষ দীপঙ্করের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া শ্রমণ-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অতীশের একান্ত অনুগত বলিয়াই আমাদের তিব্বতে আগমন করিয়াছেন। মানস-সরোবরের তীর পর্যন্ত প্রায় ৪২৫ জন নেপাল-রাজ-অনুচর দীপঙ্করের অনুগামী হইয়াছিলেন। সেখানে হাজার হাজার কৃষক ও রাখালেরা আসিয়া মহামতি দীপঙ্করকে বন্দনা করিয়া গিয়াছে এবং তাহাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছে।"

রাজপ্রাসাদে অভ্যর্থনা ঃ

মন্ত্রীর মুখে দীপঙ্কর তাহার যাত্রা-পথে যে সর্বত্র বিশেষ ভাবে সম্মানিত হইয়াছেন এমন কি নেপাল-রাজও যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন ইহাতে নৃপতি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। দীপঙ্কর যখন থোডিং রাজদরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন স্বয়ং নৃপতি এবং রাজদরবারের সকলে দণ্ডায়মান হইয়া অতীশকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু একজন বৃদ্ধ লামা দীপঙ্করকে দণ্ডায়মান হইারা অভ্যর্থনা করিলেন না, সম্ভবত বার্ধক্যের দরুণই তিনি দণ্ডায়মান হইতে পারেন নাই। এই বৃদ্ধ লামার নাম ছিল রিন্-চেন্-জং-পো। রিন্-চেন্-জংপোর প্রতি (Rinchen-zanpo) এক সময়ে রাজা (Lha-sde-btsan) কর্তৃক তিব্বতের পুরাণ (Phuran) এবং রং (Rong) প্রদেশের উপর ধর্মনেতৃত্ব ভার প্রদত্ত হইয়াছিল। রিন্-চেন্-জংপো তিব্বতের ঐ সকল প্রদেশে অনেক মঠ; মূর্তি ও বিদ্যা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহার শিষ্যগণ মধ্যে দশজন সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিল। এবং তাহারা "লোচবা" (Lochava) বা দ্বিভাষী নামে পরিচিত ছিল। রিন্-চেন্-জংপো সংস্কৃত ও তিব্বতীয় ভাষায় একখানি অভিধান প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠাপিত তান্ত্রিক ধর্মাচার তিব্বতে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গল্প আছে যে, একবার রিন্-চেন্-জংপো একটা দুরন্ত দৈত্যকে দমন করিয়াছিলেন।

দীপঙ্করের সহিত রিন্-চেন্-জংপোর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল তখন তাহার বয়স ছিল ৮৫ বৎসর।। দীপঙ্কর তাহার বয়ঃকনিষ্ঠ, এজন্য রিন-চেন-জংপো ভারতীয় পণ্ডিতকে দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন না, কিন্তু পরে দীপঙ্করের মুখে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবিধ দেবতাগণের স্তোত্র প্রভৃতি শুনিয়া তিনি একান্ত মুগ্ধ হইলেন। সর্বোপরি দীপঙ্করের তাহার প্রতি বিনয়পূর্ণ ব্যবহার তাহাকে একান্ত মুগ্ধ করিল। অবশেষে বৃদ্ধ রিন্-চেন্-জংপোও বিনীত ভাবে দীপঙ্করের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন। বৃদ্ধ রিন্-চেন্-জংপো ৯৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

এইভাবে তিব্বত-রাজ দীপঙ্করকে পরম সমাদরের সহিত আপনার দেশে অভ্যর্থনা করিয়া হইলেন। রাজা, প্রজাদের প্রতি এইরূপ অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন যে :—"তাহাদের দীপঙ্করের আদেশ ও উপদেশ অনুযায়ী ধর্মপথে পরিচালিত হইতে হইবে।" ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে দীপঙ্কর যে অতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাহা নিজে সহজেই বুঝিতে পারিলেন। রাজা দীপঙ্করের বিদ্যাবত্তা ও বিবিধ গুণ দেখিয়া তাহাকে জোব-বো-জে (Jovo-Je) অর্থাৎ, প্রভুস্বামী বা স্বামী ভট্টারক (Supreme Lord) উপাধি প্রদান করিলেন।

দীপঙ্কর থোলিং (Tholin) উপনীত হইয়া তিব্বতে মহাযান মত প্রচার করিলেন। এবং তাহার প্রস্তাবিত মত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করিলেন। তিনি ক্রমশ তিব্বতের ধর্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার সংস্কার করিতে সমর্থন হইলেন। অতীশের চেষ্টা ও যত্নে তিব্বতের লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্মের গরিমা পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

দীপঙ্করের উপদেশানুসারে চলিয়া তিব্বতীয় লামারা বৌদ্ধ-ধর্মের প্রকৃত মর্ম কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতীশ প্রায় বারো বৎসরকাল তিব্বতে বাস করেন, এই

সময়ের মধ্যে তিনি তিব্বতের বিভিন্ন প্রদেশে পর্যটন করিয়া বৌদ্ধধর্মের পবিত্রতা এবং প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব জনগণ-মধ্যে প্রচারিত করিয়াছিলেন। তাহার উপদেশ, ধর্মজীবন, গ্রন্থ প্রণয়ন ইত্যাদি এবং অমানুষিক কঠোর পরিশ্রমের কাজ দেখিয়া তিব্বতবাসী তাহাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দীপঙ্কর কি ভাবে তিব্বতবাসীদিগের মধ্যে ধর্ম প্রচার করিয়া নৈতিক উন্নতি ও মঙ্গল বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে কথা পরে উল্লেখ করিলাম।

দীপঙ্করের মৃত্যু ঃ

লাসার নিকটবর্তী ন্যাথ্যাং (Nethan) নামক স্থানে ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে ৭২ বা ৭৩ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। এই গ্রামটি নেতাং (Nethan) নামে পরিচিত। কেহ কেহ এই স্থানের নাম নের্তাম্ (Nyertam) বলেন। চীনারা বলে ই-তাং (Yettang)। এশিয়ার সর্বত্র, তিব্বতের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহে যেখানে যেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত আছে সেই স্থানে তিনি দেবতার ন্যায় পূজা পাইয়া আসিতেছেন। সকলের হৃদয়-মন্দিরে তাহার স্মৃতি পরম শ্রদ্ধার সহিত ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি লাভ করিয়া আসিতেছে। তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের অন্যতম ধর্ম-নেতা ব্রোমতোনের (Bromton) ছিলেন তিনি ধর্মাচার্য।

দীপঙ্কর বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এবং তিনি একশতটি মহাযান ধর্ম-সম্পর্কিত উপদেশ দিয়াছেন। এখানে আমরা তাহার লিখিত কতিপয় পুস্তকের নাম দিলাম,—(১) বোধিপথপ্রদীপ, (২) চর্যা সংগ্রহ-প্রদীপ, (৩) মধ্যমোপদেশ, (৪) সংগ্রহগর্ভ, (৫) মহাযান পথসাধন বর্ণ সংগ্রহ, (৬) মহাযান পথ সাধন-সংগ্রহ, (৭) দশ কুশল কর্মোপদেশ, (৮) বর্ণ বিভঙ্গ, (৯) সূত্রার্থ সমুচ্চয়োপদেশ, (১০) সপ্তকবিধি, (১১) গুরুক্রিয়াক্রম, (১২) সরঙ্গতায়দেশ। দীপঙ্কর নয়পালকে উপদেশপূর্ণ যে পত্র লেখেন, তাহা 'বিমল-রত্ন-লেখ' নামে পরিচিত। তিব্বতে দীপঙ্কর ক-দং (Kah-dam) নামক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

অতীশের সমাধি মন্দির ঃ

অতীশের সমাধি-মন্দির গ্রো-ম (Sgro-ma) নামে পরিচিত। নাম (Nam) নামক গ্রামের যে স্থানে অতীশের সমাধি-মন্দিরটি অবস্থিত, সে স্থানটি অতি নির্জন। যে দীপঙ্কর তিব্বতীয়দের ধর্ম-সংস্কারের জন্য জীবন আহুতি দিয়াছিলেন, তাহারা কিন্তু অতীশের সমাধি-মন্দিরটির রক্ষার দিকে একান্ত উদাসীন। ওয়াডেল্ সাহেব অতীশের সমাধি-মন্দিরটি দেখিয়া লিখিয়াছেন :—"আমি নাম গ্রামে দীপঙ্করের সমাধি-মন্দিরটির ধ্বংসপ্রায় অবস্থা দেখিযা অবাক্ হইলাম। যে ধর্মপ্রাণ সাধু-মহাত্মা তিব্বতের ধর্ম-সংস্কারের জন্য সুদূর তিব্বতের নির্জন প্রান্তরে জীবন বিসর্জন দিলেন, অকৃতজ্ঞ তিব্বতীয়েরা কিনা তাহার সমাধি-ভবনটিকে রক্ষা করিবার প্রতি একান্ত উদাসীন। যে গৃহের মধ্যে অতীশের দেহাবশেষ রক্ষিত, তাহা একটা গোলাঘরের ন্যায় কক্ষ মাত্র। বাহিরের দিক্‌টা পীতবর্ণানুরঞ্জিত, উহার চারিদিকে কতকগুলি প্রাচীন উইলো (Willow-trees) তরু মাথা তুলিয়া একটি বীথি রচনা করিয়াছে। মন্দিরটির আকার অনেকটা চুবতেনের (chorten) মত। উহার উচ্চতা ১৪ ফিট পরিধিও তদনুরূপ। ইহার উপরটা বালিচুনের কাজ করা এবং মন্দিরের প্রাচীরের গাত্র অপটু চিত্রকরের অঙ্কিত কয়েকটি বুদ্ধ এবং অতীশের নিজেরও কয়েকটি চিত্র দ্বারা শোভিত রহিয়াছে। দীপঙ্করেব চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। নিম্ন ভাগে শ্বেতহস্তী, শ্বেতছত্র প্রভৃতি পবিত্র সপ্তচিহ্ন রহিয়াছে। ছয়জন অশিক্ষিত লামার উপর এই সমাধি মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের ভার রহিয়াছে। ইহারা সমাধি-মন্দিরের ২০০ শত গজ দূরে একটি তরুলতা-গুল্মহীন প্রস্তরাকীর্ণ পর্বতের নিম্নভাগে বাস করে। এই ছয়জন লামার মধ্যে মাত্র একজন সামান্যভাবে কিছু লিখিতে-পড়িতে জানে। এখানকার পর্বত-গাত্রে খোদিত মূর্তি ও নিকটবর্তী স্থানের স্থাপত্য ও

ভাস্কর্যরীতি দেখিয়া মনে হয় যে, অতীশ ও তাহার সঙ্গীগণ এই স্থানের কাছাকাছি কোথাও হয়ত বা বাস করিতেন।[৮৩]

ন্যাথাং-বিহার ঃ

দীপঙ্কর ন্যা-থ্যাং (Nye-thang) নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ-বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ন্যা-থ্যাং লাসা হইতে অল্প দূরে অবস্থিত। ন্যা-থাংয়ের বিহারটি বর্তমান সময়েও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। এখানে এখনও প্রায় পঞ্চাশজন লামা বাস করেন। আজ পর্যন্ত বংশপরম্পরাগত ভাবে তিব্বতীয় গল্পপ্রিয় লামাগণ ভারতীয় মহাপুরুষ দীপঙ্কর ও তাহার সঙ্গীগণের মহানুভবতার কথা বলিয়া থাকেন।[৪৪]

"খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীজ্ঞান অতীশ বাংলাদেশ (বিক্রমপুর) হইতে তিব্বতে গমন করেন। তিনি তথায় একটি স্থান লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই স্থানে পরবর্তীকালে ক্রেডিং বিহার প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং উহাতে ষোড়শ স্থবিরের পূজা হইবে। আমি দিব্যচক্ষুতে এই স্থানে ষোড়শ স্থবিরের মূর্তি দেখিতেছি।'

এইরূপে নানা দিক্ দিয়াই আমরা দীপঙ্করের প্রতিভা ও তিব্বতে তাহার শ্রদ্ধা ও সমাদর এবং ভবিষ্যদ্বাণীর পরিচয় পাইয়া থাকি। অতীশ দীপঙ্করই প্রকৃতপক্ষে তিব্বতে তান্ত্রিক বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার পথ নির্দেশ করেন। দীপঙ্করের বিরচিত গ্রন্থ-নিচয় নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে [He wrote a great number of works which may be found in the Bstan-hgyur, and translated many others, relating principally to Tantrik theories and practices]।

দীপঙ্করের ভাবে ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং তাহার উপদেশে তদীয় প্রিয়শিষ্য বুস্তন্ (Bustan) একখানি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন—[The jewel of the manifestration of the Dharma, or Tchos-hbyung rin-Tchen' is one of the principal authorities in Tibetan History]।

দীপঙ্করের গ্রন্থাগার ঃ

অতীশ দীপঙ্কর যখন তিব্বতে আগমন করেন, সে সময়ে ইউ-ৎসি (Wu-tse) (অমিতাভ) নামক স্থানে তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার দেখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহার সেই প্রাচীন গ্রন্থাগারটি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই বৃহৎ পাঠাগার হইতে দীপঙ্কর নানা বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এবং তিনিও নানা গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া ঐ গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছিলেন।[৪৫]

তাবোর-বিহার ঃ

স্পিতি (Spiti) নামক স্থানে একটি বিহার আছে। সেই বিহারটির নাম তাবো (Tabo)। ঐ বিহারের মধ্যে একটি খোদিত-লিপি আছে। উহা গুজের (Guze) রাজ্য চ্যাং-চুব-হোডের সমকালীন। এই নৃপতিই অতীশকে তিব্বতে আনিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাবো-বিহারের প্রধান হলটির নাম "নাম-পার-স্রাঙ্গ-জ্যাড্" (Nam-par-srang-mdzad) নামে আখ্যাত। এই হলটি অতীশের সময় যেমন ছিল এখনও তেমনি রহিয়াছে, উহার কোনওরূপ পরিবর্তন হয় নাই। এই কক্ষের মধ্যে যে সব সুন্দর সুন্দর প্রাচীন-চিত্র এবং দেবতাদের মূর্তি আছে তাহা দেখিবার মত। এই সমুদয় চিত্র ও মূর্তি দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া দর্শন করিলে এবং গবেষণা করিলে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই বিহারে প্রজ্ঞাপারমিতার একখানি তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি আছে, ঐ পাণ্ডুলিপিখানা একাদশ শতাব্দীর।

এই বিহারের দুইটি খোদিত-লিপি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই লিপি-দুইটি মেঝের (Floor) অতি অল্প উপরে খোদিত। ইহাতে এইরূপ অনুমিত হয় যে, যাহারা এখানে পদ্মাসনে বসেন তাহাদের পড়িবার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে বলিয়াই এত নিম্নে দেয়ালের গায়ে কালির দ্বারা উহা লিখিত হইয়াছে। একটি লিপিতে এই বিহার প্রতিষ্ঠাতার নাম রহিয়াছে, সে প্রায় ৯০০ বৎসর পূর্বের কথা, সে সময়ে এই বিহার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যাহারা যাহারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহাদের নামও রহিয়াছে। অপর লিপিটি হইতে জানা যায় যে, গুজের রাজ-সন্ন্যাসী চ্যাং-চুব-হোড এই বিহারটির সংস্কার করেন। এবং উহাতে সেকালের দুইজন প্রধান লামার নাম উল্লেখ রহিয়াছে, একজনের নাম রিন্-চেন্-জঙ্গ-পো (Rinchen-zanpo) অপর জন হইতেছেন অতীশ। অতীশের বা অতীশার তিব্বতীয় নাম হইতেছে ফুল-ইয়াং (Phul-byung)।

আমরা ঐ লিপি হইতে জানিতে পারি যে, অতীশের সাহায্যে রিন্-চেন্-জঙ্গ-পো জ্ঞানের আলো (Light of wisdom) লাভ করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বে বৃদ্ধ পণ্ডিত রিন্-চেন্-জঙ্গপোর কথা বলিয়াছি। এই লিপি হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, এই বৃদ্ধ পণ্ডিত প্রকৃতভাবেই দীপঙ্করকে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া পরে মানিয়া লইয়াছিলেন।[৪৬]

এই খোদিত-লিপি দুইটি যখন রাজা চ্যাং-চুব-হোডের সময়ে সংস্কৃত হয় তখন আনুমানিক ১০৫০ খ্রিস্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। গুজে প্রদেশের প্রাচীন রাজধানী থো-লিং (Thol-ding)-এর নিকটবর্তী 'পু' (Poo) নামক স্থানে রাজা জে-শে হোডের যে খোদিত-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও অতীশের বিষয় অবগত হওয়া যায়।[৪৭]

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে মিঃ পি. ইগারটন [Mr. P. Egerton, of the civil service] (A. H. Heyde)-এর সহিত স্পিতি-বিহার দেখিতে গিয়াছিলেন। তাহাদের এই পর্যটনের ফলে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, সেই গ্রন্থে স্পিতি-বিহারের বহু ফোটোগ্রাফ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের মতে স্পিতি-বিহার সম্ভবত অতীশের শিষ্য ব্রোমেতোন্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল।[৩] সে যাহা হউক, ইহা সুস্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে যে, অতীশ গুজে প্রদেশের একটি বিহারে প্রায় দুই বৎসরকাল অবস্থান করেন। এই বিহারটির নাম 'নিরাভোগ-মহাবিহার'। এই বিহারে থাকিবার সময় তিনি লোকাতিত-সপ্তাঙ্গবিধি নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এখান হইতে তিব্বতে গমন করেন।[৪৮/৪৮ক]

অতীশ দীপঙ্করের চিত্র ঃ

আমরা হ্যাকিন সাহেবের লিখিত Asiatic Mythology নামক গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, মুজে গীমে (Muse Guiemet)-র বাকোট সংগ্রহাগারে অতীশের একখানি চিত্র আছে। সেই চিত্রে অতীশ এবং তাহার একজন শিষ্য—Rta-nag-gos-lo-tsa-ya-khugda-L. lhasirtis, এবং বজ্রসত্ত্ব শক্তিকে আলিঙ্গন করিতেছেন, এইরূপ ভাবে অঙ্কিত চিত্র ও যমের চিত্র রহিয়াছে। এই চিত্রখানি অতি সুন্দর।[৪৯]

হয়গ্রীব মূর্তির প্রকাশ ঃ

কথিত আছে, দীপঙ্করের ধ্যান-প্রভাবে হয়গ্রীব মূর্তির রূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। [The horse-necked one] হয়গ্রীবের ঘোড়ার মত গলা, তিনটি মাথা, চারটি হাত এবং চারটি পা। মাথার চুল উস্কখুস্ক, মড়ার মাথার খুলির দ্বারা গঠিত মুকুট, মৃতমুণ্ড দ্বারা গ্রথিত কোমরবন্ধ, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম। উর্ধ্বদিকের হস্তে তীর-ধনু। পদতলে দৈত্য বা রাক্ষস।[৫০]

এইভাবে নানাদিক দিয়াই আমরা জানিতে পারিতেছি যে, দীপঙ্করের সেকালে ভারতবর্ষের

পণ্ডিতসমাজেও যেমন, তেমনি তিব্বতেও তাহার অসাধারণ প্রভাব বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তিনি যখন তিব্বত গমন করেন, তখন বিক্রমশীলা-বিহারের প্রধান আচার্য রত্নাকরের সহিত এইরূপ কথা ছিল যে, তিনি তিন বৎসর পরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবেন, কিন্তু তিব্বতীয়েরা তাহার প্রতি এতদূর অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাহার পক্ষে ঘটনাচক্রে পড়িয়া আর ফিরিয়া আসা সম্ভবপর হইল না। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি তিব্বতে কিরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং জনপ্রিয় ছিলেন।

বরদা তারা ও ষোড়শ মহাস্থবির ঃ

দীপঙ্কর বরদা, তারা এবং ষোড়শ মহাস্থবিরের ভক্ত ছিলেন এবং তিব্বতে উহার পূজা প্রবর্তন করেন। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন : স্থবির শব্দের অর্থ বৃদ্ধ। মনু বলেন :

ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানমন্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ।। মনু, ২।১৫৬।

"যাহার কেশ পক্ক হইয়াছে, তাহাকেই স্থবির বলে না। যিনি যুবক হইয়াও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, দেবগণ তাহাকেই স্থবির বলিয়া জানেন। অতএব, মহাস্থবির শব্দের অর্থ,—পরমশাস্ত্রজ্ঞ। পালি ভাষায় স্থবিরকে থেব্ বলে। থেব্ বৌদ্ধ ভিক্ষুর এক সম্মান-সূচক উপাধি। যে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণ করিবার পর অন্তত দশ বৎসর কাল নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করিয়াছেন, তিনি থেব্ পদবাচ্য। এইরূপ যে ভিক্ষু অন্তত বিশ বৎসর কাল পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন, তাহাকে মহা থেব্ বলে। তিব্বতীয় ভাষায় মহাস্থবির বা মহাথেব্-কে, নে-তেন্-ছেম্-পা বলে। এ শব্দের আবয়বিক অর্থ মহা-আসন-স্থির।"

খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত সাতশত বৎসর মধ্যে ষোলজন মহাস্থবির আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যদিও তাহারা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাদের চরিত্রের উৎকর্ষ ও পরোপকারিতায় বিস্মিত হইয়া পরবর্তী বৌদ্ধগণ এই 'ষোলটি নাম একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ভাষায়, ষোড়শ স্থবিরকে নেতেনচুরুক্ বলে। তিব্বতের সর্বোত্তম বিহার-সমূহে অদ্যাপি মহাআড়ম্বরে নেতেন্-চুরুকের পূজা হয়। 'পাগ্সাম্ জোন্ জাঙ্গ' নামক সুপ্রসিদ্ধ তিব্বতীয় ইতিহাসে ৩২৭—৩৩০ পৃষ্ঠায় স্থবির পূজার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইয়াছে।[৫১]

তিব্বতে দীপঙ্করের শিক্ষা ও প্রভাব ঃ

আমরা দীপঙ্করের তিব্বত-যাত্রার ইতিহাস বলিলাম। কিন্তু বাংলাদেশের এই মহাসাধক তিব্বতে যাইয়া, সেখানকার ধর্ম সম্বন্ধে কিরূপ সংস্কার করিয়াছিলেন এইবার যে বিষয়ে কিছু বলিতেছি। আমাদের দেশে মহাপুরুষগণের সম্পর্কে নানারূপ অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত হইয়া থাকে। দীপঙ্করের সম্পর্কেও তাহার সমসাময়িক জীবন-চরিত লেখকগণ বলিয়া থাকেন যে, তাহার এক অসাধারণ শক্তি ছিল, তাহা হইতেছে 'পূর্বজন্মানুস্মৃতি' অর্থাৎ, পূর্বজন্মের সমুদয় কথা তাহার এজন্মেও স্মরণ ছিল। এককথায় তিনি জাতিস্মর ছিলেন।

দীপঙ্কর তিব্বতে আসিয়া বারো বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। এই বারো বৎসরকাল তিনি তিব্বতের প্রায় সমুদয় প্রধান প্রধান নগরী এবং পুণ্যপীঠসমূহ পর্যটন করিয়া ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। একজন বাঙালি ধর্মাচার্যের পক্ষে বিদেশি তিব্বতীয়দিগকে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত মর্ম বুঝাইয়া দেওয়া যে কত বড় গুরুতর কাজ তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। দীপঙ্কর কিন্তু এই কার্যটি অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব যেমন জাতকের গল্প বলিয়া শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন, দীপঙ্করও তাহারই

আদর্শে প্রত্যেকটি বক্তৃতা বা উপদেশের পর তাহার পূর্বজন্মের এক একটি গল্প বলিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করিতেন। তিব্বতীয়েরা শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং বিস্ময়ের সহিত তাহার বর্ণিত গল্প এবং উপদেশগুলি অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতেন। দীপঙ্করের পবিত্র জীবন, তাহার সুমধুর ব্যবহার ও তিব্বতীয়দের প্রতি তাহার স্নেহ ও ভালবাসা অতি সহজেই তিব্বতবাসীদিগকে ধীরে ধীরে ধর্মের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিবার জন্য আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। অনেকে বলেন, দীপঙ্করের শিক্ষা ও জাতকের গল্প বলার জন্যই তিব্বতের ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার গল্প বলিবার ক্ষমতা এইরূপ অসাধারণ ছিল যে, বালক, বৃদ্ধ, তরুণ, তরুণী সকলেই তাহার গল্প শুনিবার জন্য সমবেত হইতেন। অতীশও তাহার শিষ্যগণের সাহায্যে তিব্বতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধিবাসীদের মন হইতে অনেক অন্ধ সংস্কার দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নরহত্যা, পশুবলি, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস, ব্যাভিচার এইসকল দূষিত কার্য তাহার প্রভাবে বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল।

তিনি ধর্ম কি? কর্ম বলিতে কি বুঝায়, এবং বৌদ্ধধর্মের মূল আনন্দ, পরমপ্রার্থিত 'নির্বাণ' কাহাকে বলে এ-সমুদয় ধীরে ধীরে তিব্বতীয়দের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং তাহারা সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়াই বৌদ্ধধর্মের মূল সত্যকে প্রকৃতভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকের মতে ; 'He gave a throughly spiritual turn to the minds to the Tibetan People'.

অতীশের শিষ্য-সম্প্রদায় ঃ

তিব্বতের শত শত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অতীশের নিকট বৌদ্ধধর্মে যেমন দীক্ষালাভ করেন তেমনি জ্ঞানানুশীলন দ্বারা ও বিবিধ ধর্মশাস্ত্রের মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এইসকল শিষ্যদের মধ্যে জীনকর প্রধান ছিলেন। তাহার পারিবারিক নাম হইতেছে ব্রোমতোন্। ব্রোমতোন্ অতীশের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। অতীশ যখন যে স্থানে গমন করিতেন জীনকরও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। এইজন্য ব্রোমতোন্‌কে বুদ্ধদেবের নিত্যসঙ্গী আনন্দের সহিত তুলনা করা হইত। অতীশ ও ব্রোম্‌তোন জার্পা (Yerpa) নামক বিহারে তিন বর্ষা (তিন বৎসর) অর্থাৎ, বর্ষাকাল বাস করিয়াছিলেন। এই বিহারটি তুষার-ধবল-শৃঙ্গরাজি পরিবেষ্টিত একটি অতি সুন্দর উপত্যকায় অবস্থিত। তিব্বতের এই স্থানটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। এইস্থানে দীপঙ্কর তাহার প্রিয় শিষ্য ব্রোমতোন্ সম্বন্ধে অপর একজন শিষ্যের নিকট বলিয়াছিলেন : 'ব্রোমতোন্ অবলোকিতেশ্বর দেবের অবতার স্বরূপ। তাহার জ্ঞান, তাহার ভক্তি এবং ধর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞান ও সিদ্ধি দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। সে শুধু তিব্বতের নয়, বৌদ্ধজগতের উজ্জ্বল মণি। আমি তোমাদের নিকট এক সময়ে ব্রোমতোনের পূর্বজন্মের কাহিনী বলিব। ধর্ম সম্বন্ধে ব্রোমতোন্ এতদূর উন্নত যে, তাহা একটি রত্নখনির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।" দীপঙ্করের এইরূপ উক্তি শুনিয়া যে শিষ্য ব্রোমতোন্ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তিনি বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বিনয়ী ব্রোমতোন্ বলিলেন : "হে পূজনীয় গুরুদেব, আমি আপনার চরণতলে বসিয়া যে বিদ্যা ও জ্ঞানলাভ করিয়াছি, তাহার জন্য আপনার এইরূপ প্রশংসা পাইবার যোগ্যতা আমার নাই।"

আমরা এইভাবে দেখিতে পাইলাম দীপঙ্কর কিরূপভাবে তিব্বতীয়দিগের মনোরঞ্জন করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের জীবনে পবিত্রতার পুণ্যধারা প্রবাহিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

লামাদের ত্রিকোণাকার উষ্ণীশ ঃ

খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহাত্মা অতীশের (শ্রীজ্ঞান দীপঙ্করের) জনৈক প্রসিদ্ধ শিষ্য তাহার জীবন-চরিত রচনা করিয়াছিলেন। সেই জীবন-বৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সেকালের বৌদ্ধ-লামারা ও শ্রমণেরা কিরূপ উষ্ণীশ (শিরোস্ত্রাণ) ব্যবহার করিতেন। ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে বিক্রমশীলার মঠে বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের এক অধিবেশনে তিব্বত রাজদূত নাগটাহো নাচোড়া উপস্থিত ছিলেন। তিনি তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পুরোহিত স্থবির রত্নাকরের নিকট সংস্কৃত শিখিবার জন্য মগধে আসিয়াছিলেন। নাগটাহো এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে যে, উপাসনার সময়ে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ টুপি বা উষ্ণীশ ব্যবহার করিতেন। তাহাদের ব্যবহৃত টুপি ত্রিকোণাকার ছিল। কথিত আছে, তিব্বতের লামার যে ত্রিকোণাকার টুপি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা দীপঙ্কর কর্তৃকই তিব্বতে প্রবর্তিত হইয়াছিল। তিব্বতে অতীশের যে মূর্তি অঙ্কিত আছে, তাহার মস্তক যে রক্তবর্ণ উষ্ণীশে পরিশোভিত, তাহা ত্রিকোণাকার। এই ত্রিকোণাকার টুপিই লামারা শিরস্ত্রাণরূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

অতীশের জীবন-চরিত ঃ

অতীশ দীপঙ্করের তিব্বতীয় ভাষায় অনেক জীবন-চরিত আছে। সে সমুদয় গ্রন্থ আলোচনা করিয়া বিস্তারিতভাবে দীপঙ্করের জীবনী লিখিতে গেলে তাহা একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন : "তিব্বতে দীপঙ্করের জীবন-চরিত—অনেক আছে। আমরা কেহই তাহার সন্ধান করি নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক লামা দাউস্নদুপ কাজি মহাশয়ের নিকট প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠ্যাব্যাপী দীপঙ্করের জীবনীর একখানি তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত পুঁথি আমি দেখিয়াছিলাম, তাহার সাহায্যে সেই পুস্তকের খানিকটা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আশা ছিল অবসর হইলে তাহারই সাহায্যে পুস্তকখানি অনুবাদ করিব। কিন্তু তাহার অকালমৃত্যুতে সে আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। বইখানি যে কোথায় গেল, তাহাও জানিনা। তিব্বতে সন্ধান করিলে আরও এরূপ পুঁথি পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। ব্রমটন্ লিখিত (১০৫৫ খ্রিঃ) দীপঙ্করের জীবনচরিতে অনেক কথা পাওয়া যায়। এই একজন পূর্ববঙ্গের বাঙালি ছিলেন যিনি তৎকালীন জগতে অদ্বিতীয় যশ অর্জন করিয়াছিলেন।[৫২]

দীপঙ্করের জন্মভূমি ঃ

আমরা দীপঙ্করের সম্পর্কে তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত সমুদয় জীবন-চরিত হইতেই জানিতে পারি যে, তিনি বাংলাদেশের অন্তর্গত বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন। বিক্রমপুর, অর্থাৎ শ্রীবিক্রমপুর নামক সুবৃহৎ রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত ব্রজযোগিনী নামক অংশে দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। আমি এ-বিষয়ে মৎ প্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস'-এ সর্বপ্রথম উল্লেখ করিয়াছিলাম। তখন অনেকেই আমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, এমন কি আমার গ্রন্থের ভূমিকা-লেখক পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও লিখিয়াছিলেন—"বিক্রমপুর অদ্বিতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মভূমি। তাহার ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষী তখন ভারতবর্ষে ও তিব্বতে ছিল না। তিব্বত হইতে সময় সময় বৌদ্ধগণ দীপঙ্করের জন্মভূমি দর্শনেচ্ছায় বিক্রমপুরে আসিয়া থাকেন। কিন্তু বিক্রমপুরের কোনও স্থানটি তাহার জন্মস্থান তাহার মীমাংসা বিষয়ে বড়ই গোলযোগে পড়েন।' * * * যোগেন্দ্রবাবু বজ্রযোগিনীকেই দীপঙ্করের জন্মস্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের এ-বিষয়ে যথার্থ নির্ণয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত।"[৫৩]

এই বিষয়টি লইয়া এবং আমার লিখিত 'বাংলায় নটরাজ' শীর্ষক প্রবন্ধ লইয়া একটু আন্দোলনের পর দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞানকে আমি কোনও কোনও প্রমাণবলে বজ্রযোগিনীর অধিবাসী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহানুভব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এখানে তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল :

My dear Jogendra Babu,

I am glad to hear that you have discovered two images of Nataraja from Eastern Bengal, your discovery confirms my theory that the worship of Nataraja was very common in early times but has almost disappeared from Bengal at the present day. *As regards Dipankar I long ago gave out my view that he was a native of Vajrajogini in Vikrampur.*

He flourished during the reign of the Pal kings and belonged to the Vajra sect of Mahajan Buddhist. That sect still exist in Tibet. Their Tantrik Practice called Mahasiddhi requires the Company of women called Yoginis * * *

Three Lamas from Tibet came a invite Dipankara at Vikrampur where they resided for two years. There was a Buddhist University at Vikrampur.

এখানে মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিক্রমশীলা বিহারের সহিত বিক্রমপুরের নাম সংযোজিত করিয়াছেন। এই ভুল অনেকেই করিয়া থাকেন। * * * বিক্রমপুরে বৌদ্ধ প্রভাব যে বিশেষভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব। সে সময়ে বিক্রমপুরে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল কিনা তাহার কোনও প্রমাণ আমাদের হাতে নাই। তবে দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞানের জন্মভূমি বজ্রযোগিনীর একটি স্থান এখনও 'টোলবাড়ির ভিটা' নামে পরিচিত।[৫৪]

এক সময়ে বিক্রমশীলা-বিহার সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিয়াছিল তাহাতে কেহ কেহ বিক্রমপুরের সহিত বিক্রমশীলা-বিহারকে জড়িত করিয়াছিলেন। স্বর্গত অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—"আজকাল একটা প্রশ্ন শোনা যাচ্ছে বিক্রমশীলা-বিহার কোথায় ছিল? কেহ কেহ বিক্রমশীলাকে বিক্রমপুরের সঙ্গে জড়িত করেছেন, তাঁরা ব'লতে চান যে, বিক্রমপুরে বিক্রমশীলার মঠ ছিল। এখানে নামের সামঞ্জস্য খুব আছে বটে। কিন্তু সেইটেই মুখ্য প্রমাণ হতে পারে না। এ বিষয়ে লামা তারনাথের কথা আমি অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করি। লামা তারনাথ তাঁর 'ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে' এই বিক্রমশীলার মঠকে মগধে গঙ্গার তীরে এক পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে নির্দেশ করেন। [জার্মান পণ্ডিত Schiefner-এর অনুবাদ Taranath পৃঃ ২১৭ দ্রষ্টব্য] এই প্রমাণ অগ্রাহ্য করে আমরা বিক্রমশীলাকে বিক্রমপুরে নিয়ে যেতে পারিনে * * * যতদিন না এই স্থানটি বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে খনন করা হচ্ছে, ততদিন এ প্রশ্নের চরম মীমাংসা হবে না। পণ্ডিত অভয়কর দীপঙ্কর নালন্দা এবং বিক্রমশীলা দুই জায়গারই বই রচনা করেছিলেন।"

বৌদ্ধধর্মালম্বী যোগিনীগণের ও তান্ত্রিকগণের বাস-হেতু তাহাদের উপাস্যা দেবী বজ্রযোগিনীর নামের অনুযায়ী যে এই গ্রামের নাম বজ্রযোগিনী হইয়াছে, ইহাই প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মনে হয়।[৫৫]

নেপালের সাঙ্কু (Sanku) নামক স্থানে বজ্রযোগিনীর একটি মন্দির আছে। সেই মন্দির-মধ্যে উগ্রতারা দেবীর (Ugra-Tara) মূর্তি — প্রতিষ্ঠিতা আছেন। আমাদের মনে হয় বজ্রযোগিনী গ্রামেও বজ্রযোগিনী দেবীর কোনও মন্দির থাকা সম্ভবপর এবং তদনুসারে বজ্রযোগিনী নামটি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। গ্রাম্য লোকেরা সাধারণত এ গ্রামের নাম "বদর যোগিনী" এইরূপ বলিয়া থাকেন।

অনেক দিন পূর্বে বজ্রযোগিনী গ্রাম নিবাসী 'হেলেনা কাব্য' প্রণেতা স্বর্গত কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয় লৌকিক কিংবদন্তী-মূলক "রাজকুমারী" নামক উপন্যাসে এই গ্রামের নাম "বরদা যোগিনী" উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার কাল্পনিক যুক্তি এই যে, "পালবংশীয়া বরদা নাম্নী কোনও রাজকন্যা যোগিনীবেশে এই গ্রামে বাস করিতেন বলিয়াই ইহা 'বরদা যোগিনী' বা বজ্রযোগিনী নামে অভিহিত হইয়াছে। এই যোগিনী মুন্সিগঞ্জের পূর্বধারে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদের সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়াছেন বলিয়াই ঐ ঘাট 'যোগিনী ঘাট' বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর অষ্টমী স্নানোপলক্ষে এই ঘাটে পূর্বে বহু যাত্রীর সমাগম হইত।" ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তনুযায়ী আনন্দবাবুর লিখিত এই কিংবদন্তী সত্য নহে। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিত দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞান এ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বজ্রযোগিনী দেবীর উপাসক ছিলেন। বজ্রযোগিনী দেবীর অধিষ্ঠান-ভূমি বলিয়াই ইহা বজ্রযোগিনী নামে খ্যাত।[৫৬]

বজ্রযোগিনী বিক্রমপুরের একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহার আয়তন প্রায় চারিবর্গ মাইল। এই-গ্রাম মুন্সিগঞ্জ মহকুমার সমীপবর্তী। ইহা যে প্রাচীন শ্রীবিক্রমপুর নগরীর (বর্তমানে রামপাল নামে পরিচিত অন্তর্ভূত একটি অংশ ছিল তাহা পূর্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রাম পূর্বে নিম্নলিখিত কতকগুলি পাড়ায় বিভক্ত ছিল। (১) আট পাড়া, (২) পানহাট্টা, (৩) আচার্যপাড়া, (৪) বরলিয়া, (৫) ধামদ, (৬) মামাসার, (৭) আজিমপুরা, (৮) ধামারণ, (৯) কল্যাণসিংহ, (১০) ড়েকরাপাড়া, (১১) চুড়াইন, (১২) নাহাপাড়া, (১৩) ভট্টাচার্যপাড়া, (১৪) সোমপাড়া, (১৫) পুকুর পাড়া, (১৬) গুহপাড়া, (১৭) পুরোহিত পাড়া, (১৮) বসুপাড়া, (১৯) শঙ্করবাঁদ, (২০) সুখবাসপুর, (২১) সরস্বতী, (২২) রামসিংহ, (২৩) মহাকালী, (২৪) দেওসার, (২৫) রঘুরামপুর, (২৬) ধলগাঁ।

ইহা হইতেই এই গ্রামটি যে কত বড় বিস্তৃত ছিল তাহা অনুমিত হইবে। এই গ্রামের মৃত্তিকা খননে বহু প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ ও বিবিধ দেবমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি সরস্বতী মূর্তির কথা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই মূর্তিটি বজ্রযোগিনী গ্রামের যে স্থানে পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থানের নিকটবর্তী উচ্চ মৃত্তিকা-স্তূপ "নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা" নামে অদ্যাপি পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ঐ ভিটার বা বাড়ির সংলগ্ন তিনটি প্রাচীন দিঘি পরস্পর কোণাকোণি ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে। ঐ দিঘি তিনটি লালমতি, বোলমতি এবং ইছামতি নামে পরিচিত। সেই প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমি যখন প্রথম এ ভিটা-সংলগ্ন নানা স্থান পর্যবেক্ষণ করি, তখন যেখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন ছিল সেই স্থানটিও দেখিয়াছিলাম। ঐ স্থানের সহিত একটি অংশ টোলবাড়ির ভিটা'টিও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। পরবর্তীকালে ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ও এ বিষয়ে আমাদের মতেরই সমর্থন করিয়াছেন।[২] এ পর্যন্ত বাংলাদেশের, কি বাংলার বাহিরের, কি ইউরোপীয় পণ্ডিত যে-কেহ দীপঙ্করের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা সকলেই তিব্বতীয় ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ করিয়া একবাক্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, দীপঙ্কর বাংলার অধিবাসী (বিক্রমপুর) ছিলেন। দীপঙ্কর আপনাকে রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, একথাও অপ্রকৃত নহে। তিব্বতদেশীয় লামা তারনাথ তাহার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, সে সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য নিজ নিজ

অধিকারে রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিকারে রাজত্ব করিতেন, কিন্তু সমগ্র দেশে কেহ একচ্ছত্র নৃপতিরূপে আধিপত্য করিতে সক্ষম হয় নাই। কাজেই দীপঙ্কর আপনাকে যে রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত নহে। তাহার পিতা ঐরূপ কোনও রাজবংশের লোক ছিলেন ইহাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

দীপঙ্কর তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে সংস্কার করিয়াছিলেন, সে বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী পণ্ডিতেরাই নিজ নিজ গ্রন্থে শ্রদ্ধার সহিত তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিব্বতের ইতিহাসে সগৌরবে উহা উল্লিখিত আছে।

দীপঙ্কর বাঙালির গৌরব ঃ

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"দীপঙ্কর বৃদ্ধ বয়সেও তিব্বতে গিয়া অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তথাকার অনেক লোককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে তিব্বতে নানা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদয় হইয়াছে। তিব্বতে যে কখন বৌদ্ধধর্মের লোপ হইবে এরূপ আশঙ্কা আর হয় নাই। তিনি তিব্বতে মহাযান মতেরই প্রচার করেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, তিব্বতীরা বিশুদ্ধ মহাযান অধিকারী নয়; কেননা, তখনও তাহারা দৈত্য-দানবের পূজা করিত; তাই তিনি অনেক বজ্রযান ও কালচক্রযানের গ্রন্থ তর্জমা করিয়াছিলেন ও অনেক পূজাপদ্ধতি ও স্তোত্রাদি লিখিয়াছিলেন। তেঙ্গুর ক্যাটালগের প্রতি পাতেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতিশার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও সহস্র সহস্র লোকে তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। অনেকে মনে করেন, তিব্বতীয়দিগের যা কিছু বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা ও সমুদায়ের মূল কারণ তিনিই। এরূপ লোককে যদি বাঙালির গৌরব মনে না করি, তবে মনে করিব কাহাকে?"[৫৭]

দীপঙ্করের জন্মস্থান ঃ

দীপঙ্করের জন্মস্থান যে বাংলাদেশের বিক্রমপুর অঞ্চলে ছিল তৎ সম্বন্ধে আমরা বিবিধ প্রমাণ সহকারে আলোচনা করিয়াছি। যাহারা ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়া থাকেন, তাহাদের নিকট ইহা বিশেষভাবেই জানা আছে যে, খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দী ও তাহার পূর্ব হইতেই সমতট বিক্রমপুরে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। দীপঙ্করের সমকালে এবং তাহার পূর্ববর্তী কালে বিক্রমপুরে বৌদ্ধ প্রভাবের বিবিধ পরিচয় নানারূপে পাওয়া যাইতেছে। সেই সব প্রমাণ একেবারে যাহাকে বলে 'পাথুরে প্রমাণ'। বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামে প্রাপ্ত শ্রীমূর্তি সমূহই তাহার প্রধানতম সাক্ষী। আমরা পরে যখন মূর্তিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিব তখনই উহা পাঠকবর্গ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কিছুদিন পূর্বে রাহুল সাংকৃত্যায়ন নামক একজন লেখক দীপঙ্করকে বিহারের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে দীপঙ্কর বিহারের সহোর নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে কোনও যুক্তি বা তর্কের অবতারণা করেন নাই। আমাদের দেশে অনেকেই নিজ নিজ কল্পিত সিদ্ধান্তের অনুরূপ বিষয়ের অবতারণা করিয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ভাবে একটা তর্কের সৃষ্টি করেন। রাহুল সাংকৃত্যায়নও তাহাই করিয়াছেন।[৫৮]

রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয় সহোর মাণ্ডলিক রাজ্যের কথা বলিয়াছেন ও সহোর প্রদেশে দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াছেন, আমরা সেই সহোর সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র দাশ মহাশয়ের লেখা হইতে যাহা জানিতে পারি, তাহাও সাংকৃত্যায়ন মহাশয়ের মতের পরিপোষক নহে। এমন কি সহোরও বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই উল্লিখিত আছে — To the East of vajrasana [Buddha Gaya] lies the great country of Bangala in which there was the place called Das-hor containing twenty hundred thousands habitations. At its centre was situated the capital which was prosperous,

opulent, spacious, filled with a large population, well swept and kept clean. The Kings palace stood at the middle of city, furnished with many golden Dhwaja (ensigns of royalty). It will be seen that the name Das-hor has been elsewhere confounded with the name of a Khetria tribe. According to Cosma de Koros the name Dos-hor, is same as *sahor* the common name for a city, but it remains to be shewn if the name *sahor* is derived from Maghhadi or Bengali. It is considered, I believe, by same as derived from Urdu. [Buddhist Text society, Volume I. Page 8] অর্থাৎ, বজ্রাসনের (বুদ্ধগয়া) পূর্বে বিখ্যাত বাংলাদেশে অবস্থিত। বঙ্গদেশে সহোর নামক একটি স্থান আছে। ঐ স্থানে দুই লক্ষ লোকের বাস। ঐ শহরের মধ্যবর্তী স্থানে রাজধানী বিরাজিত। রাজধানীতে বহু লোকের বাস এবং নগরীটি বহু স্বর্ণ-ধ্বজ [রাজ-চিহ্ন] সমন্বিত বাড়িঘরে সুশোভিত। শহরটি সমৃদ্ধ, জনতাবহুল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রাজপ্রাসাদ নগরীর মধ্যস্থলে বিদ্যমান। রাজপ্রাসাদের উপর বহু কাঞ্চন-ধ্বজ শোভমান। অনেকে এক ক্ষত্রিয় জাতির নামের সহিত এই স্থানের নামের গোল করেন। Cosma de Koorosi-এর মতে—শহোর নামটি হইতেছে সহর বা সহোর অর্থাৎ, নগর অর্থবোধক। অনেকের মতে সহোর শব্দ মাগধি বা বাংলা শব্দ হইতে উদ্ভুত। আবার অনেকে মনে করেন উহা উর্দু হইতে উদ্ভুত। কাজেই রাহুল সংকৃত্যায়ন যে সহোর মাণ্ডলিক রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যে বাংলাদেশেরই অন্তর্গত ছিল, বিহারে নহে।[৫৯]

অতীশের জীবন-চরিত লেখকগণ ঃ

তিব্বতীয় ভাষায় দীপঙ্কর অতীশের অনেকগুলি জীবন-চরিত রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কল্যাণমিত্র —(Phyag-sorpa), নাগ-সো-(H Borm-Ston-Pa), বুস্তন-(Bu-Ston), এবং "অতিশাই নামথর" নামক দীপঙ্করের জীবনীখানি বিশেষরূপে প্রামাণিক বলিয়া গণ্য। আমরা এই সমুদয় গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, দীপঙ্কর বাংলাদেশের বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। "অতীশাই নামথরের" ইংরেজিতে কিংবা পাশ্চাত্য অন্য কোনও ভাষায় কোনওরূপ অনুবাদ হইয়াছে কিনা তাহা আমরা জানিনা। বিখ্যাত পর্যটক স্বর্গত শরৎচন্দ্র দাশ মহাশয় বলেন—"আমি তিব্বতীয় ভাষায় অভিধান সঙ্কলনকারী বহুতর প্রাচীন হস্তলিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম। উক্ত পাণ্ডুলিপি সমূহের মধ্যে "অতীশাই নামথর" নামক অতীশের জীবনী-গ্রন্থে আমি "পান্‌সা" বা পণ্ডিতের টুপি ধারণ বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। মহাত্মা অতীশ তিব্বত-যাত্রাকালে মস্তকে টুপি পরিয়াছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম তিব্বতীয় লামাদিগের মধ্যে মস্তকাবরণ ধারণ করিবার পদ্ধতি প্রচলিত করেন। পাগ্‌-সাং জোং-জাঙ্গ নামক তিব্বতীয় গ্রন্থে পণ্ডিতদিগের শিরোস্ত্রাণ ধারণের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ভারতবর্ষ ও তিব্বতের প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ"।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জীবনচরিতকার বুস্তন তাহার প্রিয় শিষ্য ছিলেন। বুস্তন দীপঙ্করের জীবন-চরিত লিখিতে যাইয়া তাহার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম,—"প্রাচীনকালে বুদ্ধ যখন জন্মগ্রহণ করেন সে সময়ে রাজগৃহ নামক স্থানে জিনপুত্র ভদ্রাচার্য নামে একজন গৃহস্থ বাস করিতেন। পরবর্তীকালে তিনি বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ১৮১৫ বৎসর পরে পূর্বভারতের বঙ্গদেশে বিক্রমপুর নগরে অতীশরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজবংশেই শান্তি বা শান্তরক্ষিতও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দীপঙ্কর রাজধানীর মধ্যবর্তী প্রাসাদে জন্মলাভ করেন। ঐ প্রাসাদ "সুবর্ণধ্বজ" নামে পরিচিত ছিল। ইহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী এবং মাতার নাম পদ্মপ্রভা। ইহাদের তিন পুত্র ছিল। দীপঙ্কর মধ্যম এবং তাহার নাম চন্দ্রগর্ভ রাখা হয়। দীপঙ্করের অতি অল্পবয়সে বিবাহ হয়। তাহার পাঁচটি স্ত্রী ছিল।

ইহাদের গর্ভে নয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এক পুত্রের নাম পুণ্যশ্রী" [In ancient time when the Buddha had come to this world, there was a householder in Rajagriha named Jinaputra. In later time he was born as Atica according to Bu-Ston, 1815 years after the death of the Buddha, at the city of Vikrampur in Bengal, in Estern India, in the Royal house from which the great Sage Canti Raksita had sprung. His birth took place in the central palace called Suvarnadhvaja. H is father was King Kalyan Cri and mother Queen Padma-Prabha, He was the second of the three sons they had and was named Chandragarbha. He was married while young to five wives by whom he had nine sons, one of whom was PunyaCri][৬০]

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরি বলেন—"পাল-রাজগণের আনুকূল্যেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রমুখ বাঙালি প্রচারকেরা তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন।"

পাগ্‌-সাম্‌-জোন্‌-জাঙ্গে বঙ্গের নানাস্থানে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণের পরিচয় লিখিত আছে। আমাদের মনে হয় সে-সময়ে যাহারা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইতেন তাহারা নিজেদের বংশ বা জাতির পরিচয়ও সঙ্গে সঙ্গে দিতেন। এইজন্য আমরা তিব্বতের ইতিহাসে যে-সকল বাঙালি বৌদ্ধের পরিচয় পাই, তাহাতে "ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ" এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাইয়া থাকি।

ধীমপা ব্রাহ্মণ-শ্রমণ বিক্রমপুর ঃ

আমরা এইখানে বিক্রমপুরের আর একজন ব্রাহ্মণ-শ্রমণের পরিচয় দিতেছি, ইঁহার নাম ধীমপা। ইনি কৃষ্ণাচার্যের শিষ্য ছিলেন। [Dhimapa a Brahman Buddhist of Vikrampure, a novice monk who served Krishnacarya.]

আমরা দীপঙ্করের কথা এইখানেই শেষ করিলাম। তাহার জন্মস্থান, বংশ-পরিচয়, পাণ্ডিত্য এবং তিব্বত-যাত্রা এবং তথায় তিনি যে ভাবে ধর্ম সংস্কার করিয়া তিব্বতবাসীর নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন—তাহা বাঙালি মাত্রেরই গৌরবের কারণ। বাঙালি দীপঙ্করকে স্মরণ করিয়া আজ আমরা বাঙালি মাত্রেই গর্ব অনুভব করিতেছি।

পালরাজাদের শেষকথা ঃ

আমরা প্রসঙ্গক্রমে পালরাজাদের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, পূর্ববর্তী পালরাজাগণের অর্থাৎ, ধর্মপাল, দেবপাল প্রভৃতি নৃপতিগণের গৌড়-বঙ্গ-মগধ পর্যন্ত যে প্রভাবের বিষয় জানিতে পারি, পরবর্তী পালরাজাগণের সেই প্রভাব ছিল না।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক বলেন—"অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে বাংলা দেশকে আমরা কেবল দুইটি বিভাগে বিভক্ত মনে করিয়া ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বুঝিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইব, উত্তরে "গৌড়" বা "পুণ্ড্রবর্দ্ধন" এবং পশ্চিমে, দক্ষিণে ও পূর্বে 'বঙ্গ'। এই সময়ে 'বঙ্গ' বলিলে পূর্বকালের 'সুহ্ম' 'বঙ্গ' ও 'সমতট' এই তিনদেশের অংশ-বিশেষ লইয়া গঠিত বিভাগ মনে করিতে হইবে এবং সম্ভবত তখন 'বর্ধমানপুর' হরিকেলের একটি স্কন্ধাবার (রাজধানী বা সেনানিবেশ স্থান) ছিল। এই যুগের উত্তর বাংলার নরপতি 'গৌড়াধিপ'—'গৌড়েশ্বর' প্রভৃতি উপাধিতে পরিচিত হইতেন। দশম-একাদশ শতাব্দীতে হরিকেল বা বঙ্গদেশের রাজধানী পূর্ববাংলা বিক্রমপুরে অবস্থিত ছিল, একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর 'বঙ্গপতি' গণও বিক্রমপুর রাজধানী হইতেই শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন।" কাজেই দীপঙ্করের রাজধানী বিক্রমপুরের অন্তর্ভূত বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করা যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাহা সহজেই অনুমেয়।

স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য ঃ

"খ্রিস্টিয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে গৌড়াধিপগণ ও বঙ্গপতিগণ সর্বদাই পরস্পর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নরপতিরূপে নিজ নিজ রাজ্য শাসন করিতেন। পরস্পরের মধ্যে সময়ে সময়ে যে যুদ্ধবিগ্রহ বা অন্য কোনওরূপ রাজনীতিক সম্বন্ধ বা সম্পর্ক ঘটে নাই তাহা বলিলে ইতিহাসের মর্যাদা অতিক্রম করা হয়। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেই গৌড়েশ্বর পাল-নরপতিগণের রাজত্বের সময়ে, বিশেষত তাহাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ও তদ্বিস্তারের প্রথম যুগে, বঙ্গরাজ্যকে পাল সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত ও পাল রাজগণের শাসনাধীন মনে করিয়া থাকেন। .... কেবল বাংলাদেশের বিভাগসমূহের কথা বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, উত্তরবঙ্গই গৌড়েশ্বরগণের অপরোক্ষ অধিকারে ছিল এবং অনুত্তর-বঙ্গ অর্থাৎ, পশ্চিম দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ বঙ্গপতিগণের শাসনাধীনে ছিল।[৬১]

তৃতীয় বিগ্রহপাল ঃ

আমরাও ডাক্তার বসাক মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে করি। নয়পালের পরবর্তী রাজগণের বিষয় বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা আমরা অনাবশ্যক মনে করিতেছি। কেন-না তাহাদের প্রভাব বঙ্গরাজ্যে ছিল না। নয়পালের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"তৃতীয় বিগ্রহ গৌড়, মগধ এবং বঙ্গের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।"[৬২] একথা যে প্রমাণসহ নহে তাহা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে যখন স্বাধীন বঙ্গরাজ্য ও রাজধানী বিক্রমপুর সম্বন্ধে আলোচনা করিব তখন উল্লেখ করিব। এই তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের সময় হইতে পালসাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তিন পুত্র মহীপাল, শূরপাল ও রামপাল। ইহারা সকলেই একে একে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপাল জীবিতকালে অথবা তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বরেন্দ্রভূমে [উত্তরবঙ্গ] কৈবর্তগণ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিত 'রামচরিতে' এই বিদ্রোহের বর্ণনা রহিয়াছে, কাজেই মহীপাল রাজা হইয়া যে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন তাহা সেইরূপ বিস্তৃত ছিল না।

দ্বিতীয় মহীপাল ঃ কৈবর্ত্য বিদ্রোহ ও মহীপালের মৃত্যু ঃ

মহীপাল রাজা হইয়া মন্ত্রীগণের পরামর্শে অনেক গর্হিত কার্য করিয়াছিলেন বলিয়া "রামচরিতে" লেখা আছে। তিনি তাহার ভ্রাতা শূরপাল এবং রামপালকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, এই ভয়ে যে—তাহারা তাহাকে সিংহাসন চ্যুত করিবে। কিন্তু মহীপাল বিদ্রোহী কৈবর্তগণকে দমন করিতে যাইয়া নিহত হইলে-পর রামপালদেব কারামুক্ত হইয়াছিলেন। অনেকের মতে মহীপালদেবের মৃত্যুর পর শূরপালদেবও সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকরনন্দী কিন্তু এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নাই।

রামপাল ঃ রামপালের জনক-ভূ উদ্ধার ঃ

মহীপালদেবের মৃত্যুর পর রামপাল কারামুক্ত হইলেন, কিন্তু সে সময়ে তাহাদের রাজ্য শত্রু-করতলগত। রামপাল কি ভাবে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবেন সেজন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, অবশেষে তিনি বরেন্দ্রী ত্যাগ করিয়া গৌড়রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের সামন্তগণকে একত্রিত করিবার জন্য রাঢ়, অঙ্গ, মগধ প্রভৃতি পর্যটন করেন এবং সামন্তগণের সহায়তা প্রার্থনা করেন। তাহারা রামপালকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তৎপর রামপাল এক মহাবাহিনী লইয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইলেন। পালরাজের সেনার সহিত কৈবর্ত-রাজের সেনার ভীষণ যুদ্ধ হইল, কারিপৃষ্ঠে অবস্থিত কৈবর্তরাজ ভীমবন্দী হইলেন। এই উপলক্ষ্যে সন্ধ্যাকর নন্দী

একপক্ষে রামের এবং অপরপক্ষে ভীমের চরিত্রের বর্ণনা করিয়াছেন।[৬৩] রামচন্দ্র যেমন রাক্ষস রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তেমনই মহারাজ রামপাল 'যুদ্ধ-সাগর' লঙ্ঘন করিয়া, ভীমরূপ রাবণ বধ করিয়া, জনক-ভূ উদ্ধার করিয়া, রামপাল ত্রি-জগতে দাশরথি রামের ন্যায় যশোবিস্তার করিয়াছিলেন। রামপালকে রামচরিকার রামচন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। 'জনক-ভূ' বরেন্দ্র অর্থে গ্রহণ করিলে এই শ্লোকেও কৈবর্ত-বিদ্রোহের প্রমাণ পাওয়া যায়। জনক-ভূর এক অর্থ সীতা-জনক হইতে যিনি উদ্ভূত হইয়াছেন, আর এক অর্থ জনকের অর্থাৎ, পিতার ও জন্মভূমি অর্থাৎ, পিতার রাজ্য বরেন্দ্রী দেশ।

রামাবতী ঃ

ভীম রামপালের সহিত যুদ্ধে বিশেষ পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন। ভীম যখন হস্তী-পৃষ্ঠে ধৃত হন তখন তাহার বন্ধু হরি, কৈবর্ত্য-সৈন্যদিগকে লইয়া যুদ্ধ করেন। সম্ভবত ভীম ও হরি উভয়েই এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। রামপাল এইভাবে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া বরেন্দ্রীতে 'রামাবতী' নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 'রামাবতী' পাল রাজবংশের শেষ রাজধানী। রামপাল দেব এই নগরে 'জগদ্দল-মহাবিহার' নামে একটি বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 'রামাবতী' রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের সময়েও গৌড়রাজ্যের রাজধানী ছিল। আবুলফজল তৎপ্রণীত 'আইন-ই-আকবরি'তে 'রমৌতি' নগরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। স্বর্গত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—"লক্ষ্মণাবতী হইতে যেমন লক্ষ্মৌতি হইয়াছে, সেইরূপ রামাবতী পারস্য ভাষায় রমৌতি রূপ ধারণ করিয়াছে।"[৬৪] রামাবতী নগরী প্রতিষ্ঠার পর রামপাল দেব উৎকল ও কলিঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন। রামপালের পর অল্পদিনের মধ্যেই পাল রাজবংশের অবনতি ঘটে এবং তৃতীয় বিগ্রহ পালের সময় হইতেই যে তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, 'শ্রীবিক্রমপুর' বা 'বঙ্গরাজ্য' দশম-একাদশ শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর পাল রাজগণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—এবং স্বাধীন ছিল এবং গৌড়াধিপগণ ও বঙ্গপতিগণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য ও রাজধানীতে অবস্থান করিয়া নিজ নিজ রাজ্য শাসন করিতেন। **স্বাধীন বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল বিক্রমপুর** এবং সেই স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের গৌরব-কাহিনী আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

১. ক. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাংলার ইতিহাস।
খ. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1868 P. 177
২. ক. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাংলার ইতিহাস।
খ. Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1868 P. 177
৩. The Oxford students History of India, Page, 24.
৪. Epigraphica India vol. XXI. Page 84-85. April 1931. Mauryan Brahmi Inscription of Mahasthan by D. R. Bhandarkar.
৫. The Vangas By B. C. Law Page 57 : Indian culture, July 1934.
৬. Vanga which at one time meant Eastern Bengal has thus now given its name to the entire provience of modern Bengal, and the English rendering of the name is certainly to be derived from old Bangala of Bangla.
৭. ক. In a Nalanda inscription recently edited by Mr. N. G. Majumder (E. P. Ind vol. XXI. Pt. P.P. 91 foll. the name *Vangala desa* appears.
খ. For early references to Vanga, see Leir. Pre Dravidian dans-Inde.

গ. History of the Bengali Language by B. C. Majumder P P 38-41

ঘ. Glimpses of the ancient relation of Bengal with the Tamils are reflected in atleast one place name of ancient Bengal-Tamralipti which was also called Damalipti of Damilitti, i.e. the city of the Damala people. The Damalas are the same as the Tamala people or the Tamila and Bengal must have once in ancient days been a home of those people.

H. P. Sastri, Manasi, Vaisakh. 1321, Indian Culture—July 1934. Page 58.

৮. Some scholars are of opinion that it is really the Guptas who under the poetic disguise of Raghus form the theme of Kalidasa's Raghuvansa, and that Canto IV of the poem is a disguised version of the conquering tour of ***Samudra Gupta*** a record of whose conquest is inscribed on the pillar now in Allahabad fort but originally at Kausambi, 30 miles westward on the Jumna. With regard to the eastern powers of the age, this inscription describes Samudragupta as *Samatata Davaka-Kamarup-Nepala-Karttrpuradi, pratyanta, nrpatibhih. pranamagamana, paritosita-pracanda-sasanasya* (Fleet, P. 8). It may be noted incidentally that Karttipura is identified with present Kumaon (V. smith, J.R.A.S. 1897, P. 881). The Indian Historical Quarterly Vol. VII No 3 September 1931 page 440.

৯. য়ুয়ন্-চয়ঙের সময়ে মেঘনাদ (মেঘনা) নদ রামপালের নিকটেই বোধ হয় সাগর দর্শন করিয়াছিলেন। সে সময়ে বঙ্গ ও ত্রিপুরার মধ্যে সাগর-শাখা বিস্তৃত ছিল। য়ুয়ন্-চয়ঙের অনূন্য এক শতাব্দী পরে যখন শ্রীহর্ষ আদিশূরের রাজবাটিতে উপস্থিত হন তখনও তিনি রাজধানীর নিকটেই সমুদ্র দর্শন করিয়াছিলেন। নচেৎ তিনি কখনই অর্ণব বর্ণনা করিতেন না। বান্ধব, ষষ্ঠখণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা ১২৮৯।

১০. Eastern Bengal or at least greater part of it probably remained as an independent Kingdom or more properly a confederacy of independent Kingdoms till the middle of the fourth century A. D. About this time we hear of a great fight put up by a confederacy of states in Vanga against a hero Called *Chandra* who conquered the whole of Norther India from Bengal in the east of Bahlika beyond the Indus to the west. There is much dispute among historians about the identity of this king Chandra. Some have identified him with Chandra Gupta I or Chandra Gupta II of the Imperial Gupta dynasty while others have identified him with Chandra varman of the susunia inscription. The Early History of Bengal by Dr. R. C. Majumder, M. A. Ph. D. page 13(1) Meherauly Pillar inscription of Chandra : Fleet, Gupta Inscriptions, p. 139(2) E. G Mr. R. G. Basak in (3) Ind. Ant. 1919 p. 98 ff. Ep. Ind. Vol. XIII p. 133; vol. XII p. 318. (4) Dacca Review vol. X. 1920-21, Nos. 2, 3, 4, 5.

১১. ক. In or about the year A. D. 554, however, Isaanvarman Maukhari ventured to measure swords with the Guptas, and probably also with Huns, and assumed the Imperial title of Maharajadhirja. For a period about a quarter of century (A. D. 554—cir, A. D. 580) the Maukharis were beyond questions the strongest political power in the upper Ganges valley. (Political History of Ancient India, Page 429 by Dr. H. C. Roy Chaudhury, M. A. Ph. D.)

খ. From an inscription of his son, Suryavarman, we learn that Isanvarman was ruling in 661 (I. e. A. D. 554) and that he had conquered the land of Andhra, defeated the sulikas, otherwise unknown, and caused the *Gaudas* to cease their raids and remain within their own territory. (Page 102, The Cambridge shorter History of India.)

১২. ক. Like the Maukharis, the rulers of Bengal, too, seem to have thrown off the Gupta yoke in the second half of the sixth century A. D. In the fourth and the fifth centuries Bengal undoubtedly acknowledge the suzerainty of the Gupta Empire. The reference to Samatata in Eastern Bengal as a Pratyanta or border state in the Allahabad Pillar inscription of the emperor Samudra Gupta proves the the Imperial dominions must have embraced the whole of western Bengal, while the inclusion of Northern Bengal (Pundravardhana bhukti) within the empire from the days of Kumar Gupta I to A. D. 543–4 is sufficiently indicated by the Damodarpur plates, Samatata through outside

the limits of the Imperial provinces, had, nevertheless, been forced to feel the irresistible might of the Gupta arms.

খ. From the fact that the plates found in west Varendra refer to Gupta emperors while those found elsewhere in Bengal refer to kings of other lines, it appears that the Gupta sway in Bengal was confined to west Varendra or what was afterwards known may as the kingdom of Gauda, while the rest of Bengal and Kamarupa merely adopted the Gupta script and the Gupta system of administration but were not under their sway. From the fact none of there inscriptions go beyond Kumargupta's line of we may conclude that Bengal was included in the gupta empire when it reached its palmy days under tha emperor, as the poet Vatsa-Bhatti puts it in the verse ...... Samudranta etc. (Fleet, P. 82.).

১৩. গৌড়লেখমালা—ধর্মপালদেবের তাম্রশাসন ১৯ পৃষ্ঠা।

১৪. ক. বাংলার ইতিহাস—প্রথম খণ্ড ১৫৪ পৃষ্ঠা। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

খ. Bengal suffered from prolonged anarchy which became so intolerable that the people (C.A.D. 750) elected as their king one Gopala, of the race of the of the sea, in order to introduce settled government. The oxford History of India—By Vincent A. Smith. C.I.E. page 185.

১৫. গৌড়লেখমালা—২১ পৃষ্ঠা।

১৬. ধর্মপালের পিতা গোপালদেব প্রকৃতিপুঞ্জ কর্তৃক "মাৎস্যন্যায়" দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে, সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা ধর্মপালের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [৩য় শ্লোকে] উল্লিখিত আছে। তারনাথের গ্রন্থেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দিনাজপুরের বাদাল প্রস্তর লিপির (গরুড়স্তম্ভলিপির দ্বিতীয় শ্লোকে আছে—সেই গর্গ এই বলিয়া বৃহস্পতিকে উপহাস করিলেন যে,—[শক্র] ইন্দ্রদেব কেবল পূর্বদিকেরই অধিপতি, দিগন্তরের অধিপতি ছিলেন না; [কিন্তু বৃহস্পতির ন্যায় মন্ত্রী থাকিতেও] তিনি সেই একটি মাত্র দিকেও [সদ্যঃ] দৈত্যপতিগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন; [আর] আমি সেই পূর্বদিকের অধিপতি ধর্ম" [নামক] নরপালকে অখিল দিকের স্বামী করিয়া দিয়াছি!—এই শ্লোকোক্ত ধর্ম নামক রাজা ইতিহাস বিখ্যাত ধর্মপাল। তাহার [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসন তদীয় বিজয় রাজ্যের [দ্বাত্রিংশদ্বর্ষীয় দ্বাদশ মার্গ দিনে] পাটলিপুত্রের জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার পূর্বে আর কখন পালবংশীয় নরপালগণের শাসনক্ষমতা মগধে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। গৌড়লেখমালা ৭৭ পৃষ্ঠা

১৭. ঢাকার ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড।
গৌড়লেখমালা ৭৭ পৃষ্ঠা। পাদটীকা।

১৮. ক. Banga the country to the east of and the beyond the delta J.A.S.B. 1873, No III and H. Blochman's History and Geography of Bengal.

খ. Banga or the territory east from the Karataya towards the Brahmaputra. The capital of Bengal both before and afterwards, having long be near Dacca in the province of Banga, the name is said to have been communicated to the whole. [Hamiltons' Hindusthan vol. I]

গ. There can be little doubt that the portion, at any rate, of the district of Dacca was included in the ancient kingdom of Pragjyotisha or Kamrup--a passage in the Yogini Tantra distinctly stating that the southern boundary of the kingdom was the junction of the Brahmaputra and Lakshya, which is situated near the modern town of Narayanganj. The early traditions that have come down to us indicate that Dacca and several of the neighbouring districts were originally under the sway of Buddhist kings. Accroding to the Tibetan legends a Buddhist king named Vimala was master of Bangala and Kamrup, and therefore of Dacca. Hiuentsiang who visited Kamrup in the second half of the seventh century states the Samatata, which probably included the Pargana of Bikrampur, was a Buddhist kingdom although the king was Brahman by caste. In the Raipura thana brass images of Buddhist origin have been discovered and two copperplates with inscriptions of Buddhist kings. These have been assigned by experts

to the end of the eighth and begining of the ninth century and a copper-plate found in the Faridpur district, which is ascribed to the same period, proves that the Bikrampur pargana was also under Buddhist rule. District Gazetter of Dacca. Page 19.

১৯. Dharmapala was a Buddhist, and built a celebrated monastery at Vikramsila, on the bank of the Ganges. He seems to have enjoyed a very long reign probably of forty five years. (A. D. 770-815). [The Cambridge shorter History of India. Page 143.]

Dharmapala, like all the members of his house, was zealous Buddhist. He founded the famous monastery and college of Vikramsila, which probably stood at Patharghata in the Bhagalpur District. The Buddhism of the Pals was very different from the religion or philosophy taught by Cautama, and was corrupt from of Mahayana doctrine. [The Oxford History of India By Vincent A. Smith, C.I.E. pp. 185.]

২০. স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন—ধর্মপাল কিরূপ লোকপ্রিয় ছিলেন, এই শ্লোকে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরবর্তীকালে বরেন্দ্র মণ্ডলের ঘরে ঘরে মহীপালের গীত প্রচলিত হইয়াছিল। হয়ত একসময়ে ধর্মপালের গীতও সেইভাবে সকল স্থানেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই শ্লোক ভিন্ন, তাহার অন্য কোনওরূপ উল্লেখ সাহিত্যে বা জনশ্রুতিতে বর্তমান নাই।—গৌড়লেখমালা ২২ পৃষ্ঠা।

২১. রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত 'গৌড়লেখমালা' দ্রষ্টব্য

২২. .. The next ruler we hear of belonged to the Boonheas or Buddhist Rajahs. Three of the Boonnea Rajahs took up their abode in this district, (Dacca) and in that portion of it lying to the north of the Boorganga and Dulleserry where the sites of the capitals are still to be seen. Justpal resided at Moodabpore in the Purgunnath of Toolipabad. Harischandra as Cotabary near Sabar and Sesoopal at eopassia in Bhowul .... (Taylors Topography of Dacca).

"The Bhuya or Buddist Rajas (founders of the Pal dynasty of the kings of Bengal) are the next rulers spoken of. Three of them took their abode in this district, ot the north Boonganga and Dhaleswary, where the sites of their Capital are still to be seen." Hunters' statistical Account of Dacca, p. 118.

২৩. The Sirur inscription claims that worship was done to him by the kings of *Anga, Vanga, Magadha, Malava* and *Vangis*. As regards *Anga, Vanga* and *Magadha* places which lay very far to the East, in the directions of Bengal,–the assertion is doubtless hyperbolical." Bombay Gazetteer. vol I part II page 402(1) Epigiaphica Indica for V.P. 211 (2) Epigraphica Indica vol IX p, 5

গরুড়স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায় যে, দর্ভপাণি দেবপালের প্রধান অমাত্য ছিলেন। দেবপাল, মন্ত্রী দর্ভপাণিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। উহার ষষ্ঠ শ্লোকে লিখিত আছে—'নানা-মদমত্ত-মতঙ্গজ-মদবারি-নিষিক্ত-ধরণীতল-বিসর্পি-ধূলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন করিয়া, দিক্‌চক্রাগত-ভূপালবৃন্দের চিরসঞ্চরমান-সেনাসমূহ যাহাকে নিরন্তর দুর্বিলোক করিয়া রাখিত, সেই দেবপাল [নামক] নরপাল [উপদেশ গ্রহণের জন্য] দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন। গৌড়লেখমালা। গরুড়স্তম্ভলিপি ৭৮ পৃষ্ঠা।

২৪. গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা—১০০।

২৫. বাংলার ইতিহাস-রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৬. The Dacca Review, May, 1914, page 55.

২৭. Of all the Pala kings he is the best remembered, and songs in his honour, which used to be sung in many parts of Bengal until recent times, are still to be heard remote corners of Orissa and Kuchbihar." Dt Gazetteer Rajshani, page 26.

বঙ্গদেশের সুবিখ্যাত মহীপাল দিঘি এখনও সেই নিশ্চিন্ত জনপ্রিয় রাজার প্রধান-কীর্তি-স্বরূপ বিদ্যমান আছে। এই দিঘি রঙ্গপুরের অতি সন্নিহিত। তিনি প্রজাদিগকে স্বীয় চরিত্রের নানা গুণে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে পল্লীগাথা এখনও উত্তর-বঙ্গে গীত হইয়া থাকে। "ধান ভানতে মহীপালের গীত" এই প্রবাদ বাক্য বাংলার ঘরে ঘরে প্রচলিত। ষোড়শ শতাব্দীতে বৃন্দাবন দাশ চৈতন্যের পূর্বে বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন :

"যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত
ইহা শুনিতে যে লোকে আনন্দিত।"

বৃহৎবঙ্গ—ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।—তিরুমালয়-পর্বত মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সির উত্তর-আর্কট জেলার অন্তর্ভুক্ত। এই লিপির মূল উদ্ধৃত করা অসম্ভব। তৎ-পরিবর্তে উদ্ধৃত অংশের ডাঃ হল্‌ক্‌ (Hultz Scle) কৃত ইংরাজি অনুবাদ প্রদত্ত হইল। .... In the 13th year (*of the reign*) of king. Parakesarivarman *alias* the lord Sri-Rajendra-Choladeva, Who .... seized by (his) great, warlike army (the following) ..... odda-vishaya which was difficult to approach, (*and which he subdued in*) close fights; the good Kosalainadu, where Brahmans assembled; Tandubutti, in whose gardens bees abounded (*and which he acquired*) after having destroyed Dharmapala (in) a hot battle; Takkanaladam whose fame reached (all) direction, (*and which he occupied*) after having forcibly attacked Ranasura; *Vangaladesha*, where the rain-wind never stopped, (*and from which*) Govindachandra fled, having descended from his male elephant; elephants of rare strengths and treasures of women, (*which he seized*) after having been pleased to put to flight on a hot battle-field Mahipala, decked (*as he was*) with ear-rings, slippers, and bracelets; Uttiraladam, as rich in pearls as the ocean; and the Ganga, whose waters dashed against bathing places covered with sand" Epigraphica Indica, vol. VII, Appendix, List of Ins. of also see No 727-728 India No 729-গৌড়রাজমালা ৩৯-৪১ দ্রষ্টব্য।

২৮. Mahipal-dighi, This is a large tank by the side of the Malda road about 18 miles southwest of Dinajpur in the Bansihari thana. It is thus described by Buchanan Hamilton :- "In the North-East part of this division is a very large tank, supposed to have been dug by Mohipal Raja and called after his name. The sheet of water extends 3,800 feet from north to south and 1,100 feet from east to west. Its depth must be very considerable, as the banks are very large. On the banks are several small places of worship, both Hindu and Moslem, but none of any consequence; nothing remains to show that Mohipal ever resided either at the tank or at Mohipur, near it, but there is a vast number of bricks, and some stones, that probably belonged to religious buildings that have been erected by the person who constructed the tank. One of the stones is evidently the lintel of a door and of the same style as those at Bannagar and may have been brought from the ruins of that city. The people in the neighbourhood have an idea that there has been a building in the centre of tank: but there is probably devoid of truth, as there is no end to the idle stories which they relate concerning the tank and Mohipal. Both are considered as venerable or rather awful and the Raja is frequently invoked in times Danger." District Gazetteers, Dinajpur, page 138.

২৯. Journal of the Buddhist Text Society vol. I, 1903, pp 9-10, Edited by Rai Saratchandra Das Bahadur,

৩০. (1) Epigraphica Indica vol. VIII, App. I.
(2) I bid' vol II, p. 11 (3) Indian Antiquary, vol, XVII p. 27.

৩১. (১) গৌড়লেখমালা ৪৫ পৃষ্ঠা (২) Indian Pandits in the land of snow, by Rai Bahadur Sarat Chandra Das C. I. E. pp. 51-71. বাংলার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। Memoirs of Asitatic Society Bengal, vol. V. P. 77-79. শিবদাস সেন, সম্পাদিত চক্রদত্ত, ১৩০২ সাল, ৪০৭ পৃষ্ঠা। Pag-Sam-jon-zang X. C. VII. Index. p. : 97.

৩২. Dipankar was born A. D. 980 In the royal family of Gour at Vikrama (nl) pur in Bangala, a country lying to the east of Vajrasana. His father called Dge-Vahi dpal in Tibetan i.e. "Kalyana Sri" and his mother prabhabati gave him the name of Chandra gurbha, and sent him while very young to the sage Jetari an Avadhuta adept for his education. Under Jetari he studied the five kinds of minor sciences, and thereby paved his way for study of philosophy and religion.

ক. "বৃহৎ বঙ্গ" প্রণেতা ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বাজাসন সম্বন্ধে বলেন—যে সমস্ত প্রমাণ দেখিয়া স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, সম্ভবত এই বাজাসন বিহারেই দীপঙ্করের

প্রাথমিক শিক্ষা হয়। তিনি সম্ভবত এক প্রবন্ধেও এ বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার স্মরণ হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র দাস মহাশয় সেটলমেন্ট অফিসার স্বরূপ এই অঞ্চলটি জরিপ করেন। তিনি বাজাসন-বিহারের বড় ঢিবি খানিকটা খনন করাইয়াছিলেন। যাহারা সেই খনন কার্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন তাহারা আমাকে লিখিয়াছেন—"অনুমান ৪/৫ হাত গর্ত করার পর দালানের ভিত্তি (foundation) পাওয়া যায়। তাহার পর আরও কয়েক হাত খোঁড়া হইয়াছিল। উক্ত foundation নাকি দুই হাত প্রস্থে ৩৫ হাত লম্বা ছিল। ইটগুলি বেশ বড় বড় ১২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যে ৬ ইঞ্চি প্রস্থে এবং উচ্চতায় তিন ইঞ্চি হইবে। স্থানীয় ডাক্তার নরেন্দ্রমোহন আচার্য মহাশয় বলিয়াছেন—খোদাই করা কতকগুলি বাসন, পুষ্পপাত্র, কোসাকুসি, টাট, থালা, ঘণ্টা, শঙ্খ এবং একটি বাসুদেব মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল এবং নানা রকমের কতকগুলি পাথর পাওয়া গিয়াছে। জিনিসগুলি একটা থলিয়া ভরিয়া কে লইয়া গিয়াছে বলিতে পারিলেন না। বাসুদেব মূর্তিখানা শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যপ্রকাশ দাশগুপ্ত স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। নান্নারবাসী প্রাচীন জমিদার শতবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন—"বাজাসনে ১৩/১৪টি ভিটা ছিল। দক্ষিণে রোউয়া, পূর্বে নান্না, পশ্চিমে মলঙ্গী ও কৈকেয়ী নামক বিল পর্যন্ত ভিটাগুলি বিস্তৃত ছিল। এই স্থান প্রায় ৩/৪ মাইল লম্বা। তিনি বলেন, আজ ৩০০/৪০০ বৎসরের মধ্যে এখানে কোনও বসবাস নাই আরও নান্নার ও ভাদাউদিয়ার লোকদের বাজাসনের লোক বলিয়া থাকে। তিনি এখনও বলেন যে, বাজাসেন হইতে ৬ মাইল দূরবর্তী সাভার পর্যন্ত একটি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ ছিল, তাহাতে সাভারের লোক অনায়াসে এই বাজাসনের বিহারে যাতায়াত করিতে পারিত। যখন ধীমন্তসেনের পুত্র রণবীরসেন সাভারে প্রাসাদ নির্মাণ করেন তখন বহু যোদ্ধা ও সেনাপতি তাহার সাহচর্য করিয়া সমস্ত কিরাতদেশ অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া শিলালিপিতে উক্ত আছে। আমরা এই অঞ্চলের দাশবংশের কুলজিতে দেখিতে পাই যে, এই সময় নীলাম্বর, দিগম্বর ও বিষ্ণুদাশ ফৌজদার বাজাসনে আসিয়া উপনিবেশ স্থান করেন। "আইন-ই-আকবরিতে" দেখিতে পাই যে, ৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের কর্তাকে ফৌজদারি উপাধি দেওয়া যাইত। বিষ্ণুদাস বল্লালের প্রধান সেনাপতি পদ্মদাস হইতে ষষ্ঠস্থানীয় ছিলেন। সুতরাং চর্তুদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তিনি বিদ্যমান ছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এদিকে ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দে সাভারের মঠ নির্মিত হয়। রণবীর সেনের পৌত্র এবং রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র এই মঠের স্থাপয়িতা। সুতরাং দেখা যায় যে, বিষ্ণুদাস ফৌজদারি এবং রণবীর ইহারা সমসাময়িক। শিলালিপিতে যে সব যোদ্ধবর্গের কথা উল্লিখিত আছে তাহাদের মধ্যে বিষ্ণুদাস ফৌজদার যে একজন ছিলেন তৎসম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এখনও তাহাদের বংশধরদিগকে প্রাচীন লোকে বাজাসনের দাস বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। এই বৌদ্ধবিহারের সঙ্গে সংস্রবের হেতু দাসবংশের প্রাচীনরা এই নামে অভিহিত হওয়া পছন্দ করিতেন না। এখনও ঐ অঞ্চলের নাম—"সুয়াপুর নান্না মদে ভাতে পান্না" এই দুর্নাম আছে। সম্ভবত পরে বৌদ্ধ তান্ত্রিক কদাচারের ফলে এই দুর্নাম রটিয়াছিল।

কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় আরও বলেন—অনেকদিন পূর্বে একজন সন্ন্যাসী নান্নাগ্রামে আমার নিকট আসিয়াছিলে, সে সন্ন্যাসী ঐ বাজাসনেই থাকিতেন। তাহার তিন-চারি বৎসর পর আবার এক কাপালিক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি কিছু খাইতেন না বা কাপড় পারিতেন না। জোর করিয়া খাওয়াইলে খাইতেন ও কাপড় পরিতেন। এবং তিনি রাত্রিতে বাজাসনে বসিয়া ধ্যান করিতেন। বয়স জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন ৩৫০ বৎসর! আমরা তাহাকে পাগল বলিতাম কিন্তু একদিন রঘুনাথপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সার্বভৌম মহাশয় আসিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলিলে তিনি অনর্গল সংস্কৃত ধর্মকথা বলিয়া আমাদের চমৎকৃত করেন। তিনি বলিতেন, তোমার এই ভিটা খনন কর, এখানে পঞ্চমুণ্ড শিব আছেন আরও অনেক কিছু আছেন। অনেক বৎসর পর গভর্নমেন্ট হইতে এই স্থান খনন করা হয়, তখন ঐ স্থান হইতে নানান রকমের পাথর পাওয়া গিয়াছিল।

৩৩. (1) During my time the king called Bhu Indra Chandra reigned in Bangala. The extent of his Raj was what could be traversed by a Bal-lan-mo, she-elephant, in seven days. A Bal-lan-mo' she-elephant is very swift. She walks a great distance, only taking a short respite at mid-day.

Rnal-hbyor-pa-chen-po relates the following as having been related by Atisa himself:- "In our (country) India there are are Royalty and Royal race. The former owns kingdom. The latter, though royalty in blood, has no Raj. I belong to the Royal race. My father called (in Tib-Nam mkhahi dvan-phyng. the lord of heaven) was a householder upasaka (lay devotee). He was a great Bodhisattva. He practised the Tantra of the Matri

class. I obtained an Abhishek, consecration of one (of the Tantras) from him, There were two wives to my father, one a Brahmani and the other a khatriyani. I am the son of the former. Buddhist Text Society volume 1. Edited by Sarat Chandra Das.

৩৪. (১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২১, ২৬৩ পৃষ্ঠা (২) গৌড়লেখমালা—১০৯ পৃষ্ঠা
Acharya Dipankara Cri-Jnana, alias Atica was contemporary of Naypala Deva, and Buston's Choshybny gives the following relevant facts. Atica residing at Vajrasana (Bodh Gaya) when the king of the Karnya in the west invaded Magadha, and a war ensued between him and Nayapala. The invaders sacked several towns at first, but were ultimately defeated. Atica meditated and succeeded in bringing about a treaty between the two kings. Apparently some time before this he had been appointed by Nayapala, as high priest of Buddhist vihara at Vikramsila.
Inscription of Nayapala Deva by M. M. Chakravarty J. A. S. B. 1900 Pl. 1P. 192.

৩৫. Rgya-tson-gru grusenge, a native of Tag-t shal in Tsan to proceed to Vikramsila, taking with him one hundred attendants and a large quantity of gold. After encountering immense hardship and privation in the journey, the traveller reached Magadha. Arrived at Vikramsila, he presented to Dipankara the king's letter with a large piece of bar gold as present from the soverign and begged him to honour his country with a visit. Hearing this, Dipankar replied :- "Then it seems to me that my going to Tibet would be due to two causes :- first, the desire of amassing gold, and second the wish of gaining sainthood by the loving others, but I must say that I have no necessity for gold, nor any anxiety for the second at present, So saying he declined to accept the present * * * Thinking that it was hopeless to bring Dipankara .... The king of Tibet dies in captivity, Journal of the Buddhist Text society, vol 1. Page 13.

৩৬. That night Atisa made preparations for conducting a religious service before the image of the goddess Tara. Placing the Mandala (Cycle of offerings). "He made the prayers: If I could go to Tibet, would I be of great service to the religion of Buddha, whether there by the wishes of the saintly king of Tibet would be fulfilled, and least of all if there would any risks to my person and life. ***
Yogini replied, yes, if you go to Tibet will be of great service to there and particularly to an upasaka (Dalai Lama) by devotion and through him to the whole country, but your life would be shortend by twenty years. If you do not go to Tibet, you will live 92 years. In Tibet you would live nay up to 72 year. Indian Pandits in the Land of Snow.

৩৭. দিবাকর চন্দ্র একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শিষ্য। পরে ইনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। নৃপতি নয়পালের রাজত্বকালের লোক। দীপঙ্কর ইহাকে বিক্রমশীলা-বিহার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। (২) রামপাল হস্তীপালের পুত্র। বিক্রমশীলা-বিহারের একজন ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধের শিষ্য ছিলেন। দীপঙ্কর ইহাকেও বিহার হইতে বিতাড়িত করেন। Pag-sam Jon zang-Index XIVI and Index CIX.

৩৮. বৌদ্ধদের অষ্ট 'মহাস্থান' বা তীর্থস্থান হইতেছে (১) লুম্বিনী উদ্যান (Modern Rumnidei in Nepal Terci) বুদ্ধদেব যেখানে জন্মগ্রহণ করেন। (২) বুদ্ধগয়া (Budh Gaya) এই স্থানে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব (সম্যক্ সম্বুদ্ধ) লাভ করিয়াছিলেন। গয়া শহর হইতে ছয় মাইল দূরে বুদ্ধগয়া অবস্থিত। (৩) মৃগদাব (Deer-park-modern Sarnath) সারনাথ। বুদ্ধদেব 'সম্যক্ সম্বুদ্ধ' এই পদ প্রাপ্তির পর ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে, এক্ষণে তাহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্বেকার পাঁচজন শিষ্য মৃগদাবে (সারনাথে) আছেন। ইহা জানিয়া তিনি সারনাথে আসিয়া আপনার ধর্মোপদেশ প্রথমে ঐ পাঁচজনকে প্রদান করেন। বুদ্ধদেবের জীবনের এই ঘটনা "ধর্মচক্রপ্রবর্তন" নামে প্রসিদ্ধ। কেননা এইখানেই তিনি তাহার সেই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। সারনাথের প্রাচীন নাম ইসিপতন মিগদাব।' সারনাথের মাটি খুঁড়িয়া অনেক প্রাচীন কীর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে একটি যাদুঘরও প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। (৪) কুশীনারা (বর্তমান কাশিয়া বা কুশীনগর। ইহা মল্লদিগের নগর ছিল। মল্লদের শালবনে বুদ্ধদেব মহাপরিনির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। (৫) জেতবান-শ্রাবস্তীর নিকট (Modern-Sahreth Maheth) এখানে বুদ্ধদেবের অলৌকিক লীলা-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছিল। (৬) বৈশালী (Modern-Baisali) এখানে একটি হনুমান বুদ্ধদেবকে ভোজন করাইয়াছিল। (৭) সমকাস্য (Modern Sankisa) এখানে

তিনি বিমান হইতে অবতরণ করেন। (৮) রাজগৃহ, বর্তমান-রাজগির এখানে তিনি একটি বন্য হস্তীকে দমন করিয়াছিলেন।

৩৯. Antiquities of Indian Tibet Pt I, By A. H. Francke, Ph. D. Page 50-52.

In A. D. 1013, The Indian Pandit Dharmapala came to Tibet with several of his disciples, and in 1042 the famous ATISHA, a native of Bengal, who is known in Tibet as Jo-Vo-rje or Jo-Vo-rtishe, also came here. The Life of Buddha. Translated by W. W. Rock Hill. Page 227. 1884.

৪০. Indian Monk Atisa (His proper name was Dipankar Srijnana) who came to Tibet in 1038 A. D. Lhassa and its Mysteries by L. A. Waddell L. L. D. P. p. 320.

৪১. .... He quitted his monastery Vikramsila, for Tibet in the year 1042 A. D. at the age of 59. J. A. S. B. 1881. P. 23.

৪২. In 1042 A. D. Atisa proceeded to Tibet, J. A. S. B. 1900. Part I. 192. Manomohan Chakravatty, M.A.B.L.M.R.A.S. আচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাংলার নৃপতি নয়পালের সমসাময়িক ছিলেন। তাহার একখানি শিলালেখ হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, নয়পাল ১০৩৭—১০৪১ খ্রিস্টাব্দ-মধ্যে সিংহাসন লাভ করেন। এবং তাহার মৃত্যু ১০৫৩ খ্রিস্টাব্দে হয়। অতএব, অতীশ ১০৪২ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতযাত্রা করেন! ইহাই বিবিধ প্রমাণের সাহায্যে বুঝা যাইতেছে। স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্তীর মতেও অতীশের তিব্বত-যাত্রা ১০৪২ খ্রিস্টাব্দ।

৪৩. Lhasa and Mysteries by L. A. Waddell. Page 321-322.

৪৪. Atisha founded A monastery at Nye-thang, a few miles, from Lhasa an institution which still flourished, with fifty resident Lamas. The Land of Lama by David Macdonald Page. 40. (১) সাহিত্য ১৬শ, ১ম সংখ্যা, ষোড়শ মহাস্থবির ৩০ পৃষ্ঠা—সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। The life of Budha translated by W. W. Rockhill 1884.

৪৫. Journey of Lhasa and Central Tibet by Sarat Chandra Das, P. 222.

৪৬. Archaeological Survey of India, Annual Report 1909-10.

৪৭. Antiquities of Indian Tibet, by A. H. Francke, Pages 1, 19, 23, 41, 42, 50, 51, 52.

৪৮. Monastery of spiti was probably founded by Brom-ston, the famous pupil of the famous teacher Atisa, in the 11th century, Antiquities of Indian Tibet, by A. H. Francke, Part I 1914 cal. Page 45.
Cordier, 11. P. 251.

৪৯. দীপঙ্কর সম্বন্ধে Asiatic Mythology-তে এই চিত্রের বিষয় লিখিত আছে এবং দীপঙ্কর ও তাহার শিষ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ মন্তব্য রহিয়াছে, Rta-nag-gos-lo-tsa-ya-khug—A scholar and translator of high repute, people of the great master Atisa (Eleventh century) head of a school of copyists. In a painting in Bacot collection, he is denpicted with the reformer Atisa (Dipangkara Srijnana) on his right, on the left Vajrasattva embracing his sakti, then to the right again Yama, the king of the hells. Page 173, Asiatic Mythology by J. Hackin, Clement Huart & and translated by F. M. Atkinson.

৫০. The Gods of Northern Buddhism by Alice Getty, oxford. 1928. Page 163.

৫১. তিব্বতের ষোড়শ-মহাস্থবির—(১) দ্বিভুজ, (২) অঙ্গনিক, (৩) অজিত, (৪) বনবাসী, (৫) কালিক, (৬) বজ্রায়ণী পুত্র, (৭) ভদ্রিক, (৮) কনকবৎস, (৯) ভরদ্বাজ, (১০) বাকুল, (১১) ধৃতবর্ম্ম, (১২) পিণ্ডোল ভরদ্বাজ, (১৩) নাগসেন, (১৪) ভবিক বা সিবক, (১৫) ধর্মত্রাত বা ধর্মাত, (১৬) রাহুল। সাহিত্য ১৬শ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩২২। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ লিখিত তিব্বতের ষোড়শ-মহাস্থবির নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৫২. বৃহৎবঙ্গ, প্রথম খণ্ড।

৫৩. বিক্রমপুরের ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ।

৫৪. বিক্রমপুরের প্রাপ্ত নটরাজ শিবমূর্তি-শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-ভারতবর্ষ ১ম বর্ষ ২য় খণ্ড পৌষ ১৩২০
(১) বিক্রমশীলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, প্রবাসী, কার্তি ১৩৩০, ২৩ ভাগ, ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা। ৮৭ পৃষ্ঠা

ফণীন্দ্রনাথ বসু। (২) Index pag-sam Jon-Zang.

৫৫. [Vajrajogini, the chief Tantric ascetical Goddess, at whose request Buddha, in his terrific form of Vajra Bhairava, had delivered the Mula Tula Tantra scriptures.]

Vajrajogini, Consort of Heruka. Buddhist Iconography—Binoytosh Bhattacharjya pages 155. 156

৫৬. সত্তর বৎসর পূর্বে মুন্সিগঞ্জের পূর্বদিকস্থ যোগিনীঘাটে অষ্টমী-স্নান করণার্থ যাত্রী সমাগত হয়। স্নান ও তৎসঙ্গে আপন আপন ধর্ম-কর্ম সমাপনান্তে অনেক যাত্রীকে বল্লাল রাজার কীর্তিকদম্ব সন্দর্শন জন্য রামপালেউপস্থিত হয়। সেই উপলক্ষে নানাবিধ দ্রব্যাদি বিক্রিত হইয়া থাকে। পল্লীবিজ্ঞান ১২৭৩-৭৫। বিক্রমপুরের বিবরণ, প্রথম খণ্ড—শ্রী যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ১৩২৬ বঙ্গাব্দ।

Iconography of Buddhist and Bramanical sculptures in the Dacca Museum Page 190.

৫৭. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৪র্থ সংখ্যা ১৩২১ সন ২৬৩ পৃষ্ঠা। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত—Modern Buddhism and its Followers in Orissa নামক গ্রন্থে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য। (১) Encyclopaedia of Religion and Ethics. Volume II. page 194. Edited by James Hastings.(২) During the reign of Mahipal's successor Nayapala, and headed by Atisa, from the Vikramsila monastery in Magadha, continued the work and firmly re-established Tibetan Buddhism. The Early History of India—Vincent A. Simth, page 400-402.

৫৮. পণ্ডিতবর রাহুল সাংকৃত্যায়ন দীপঙ্কর সম্বন্ধে "প্রবাসী" মাসিক পত্রে লিখিয়াছিলেন ঃ—"ভোট দেশে ভারতীয় আচার্যদের মধ্যে শান্তরক্ষিত ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সমধিক সম্মানিত। দীপঙ্করের তিব্বতীয় নাম "অতীশা" জোবো (স্বামী) বা "জোবো-জে (স্বামী ভট্টারক)। ইঁহারা দুই জনেই সহোর প্রদেশের রাজবংশে উদ্ভূত। বাঙালি পণ্ডিতগণ "অতীশকে" বাঙালি বলিয়া প্রমাণ করেন। "বৌদ্ধগান ও দোঁহা" নামক পুস্তকের ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এইরূপে জালন্ধরী কাহ্ন সরজ আদি কবিদের দাঁড় করাইয়াছিলেন। যাহা হৌক, সহোর বঙ্গদেশে নয় বিহারে, বিক্রমশিলার নিকটবর্তী অঞ্চলে, মুসলমানদিগের আগমনের পূর্বে ও এ অঞ্চলে "ভাগল" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সহোর মাণ্ডলিক রাজ্য ছিল, উহার রাজধানী ছিল বর্তমান কহল গ্রামের নিকটস্থ কোনও স্থানে; দশম শতাব্দীতে রাজা কল্যাণশ্রী তাঁহাদের অধীন ছিলেন। ঐ সময়ে বঙ্গের পালবংশের বিজয়ধ্বজা বঙ্গ ও বিহার উভয় প্রদেশেই উড়িতেছিল, রাজা কল্যাণশ্রী তাহাদের অধীন ছিলেন। তাহার রানী শ্রীপ্রভাবতী "কাঞ্চনধ্বজ" রাজপ্রসাদে ভোটীয়-জল-পুরুষ-অশ্ব বর্ষে (৯৮২ খ্রিঃ) এক পুত্ররত্নের জন্মদান করেন। উত্তরকালে ইতিহাসে ইনিই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে প্রসিদ্ধ হন। রাজা কল্যাণশ্রীর পদ্মগর্ভ, চন্দ্রগর্ভ, ও শ্রীগর্ভ নামক তিন পুত্রের মধ্যে ইনি মধ্যম।—নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর। রাহুল সাংকৃত্যায়ন, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৫ সন ১০৪ পৃষ্ঠা।

দীপঙ্করের জন্মস্থান সম্বন্ধে রাহুল সাংকৃত্যায়ন যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে তিনি কোনওরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি তিনি যে কটাক্ষপাত করিয়াছেন তাহাও সমীচীন হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ সম্বন্ধে নানারূপ নতুন তথ্য দিয়া গিয়াছেন এবং তাহার মত একজন ঐতিহাসিকের পক্ষে বিনা প্রমাণ-প্রয়োগে কোনও কথা বলা সম্ভবপর নহে। বিশেষত আমরা নানা দিক দিয়া নানা ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমুদয় লেখকগণই একবাক্যে দীপঙ্কর যে বঙ্গদেশের অর্থাৎ,পূর্ববাংলার অধিবাসী ছিলেন তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পূর্বেই এবিষয়ে পাশ্চাত্য লেখকগণ ও শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে দীপঙ্কর যে বাংলার অধিবাসী ছিলেন সে কথা বলিয়াছেন, কাজেই এজন্য সাংকৃত্যায়ন মহাশয়ের মন্তব্য একেবারেই সমীচীন হয় নাই। এ বিষয়ে অনাবশ্যক এবং অহেতুক বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। আমরা এখানে রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতবাদের উপর শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত 'প্রবাসী' পত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহাও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিলাম—"অতীশ দীপঙ্কর সহোরে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, একথা নিতান্তই নূতন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয় এই তথ্য কোনও গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং সেই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য কি সেকথাও বলেন নাই। বাঙালি পণ্ডিতগণ কোনও বাঙালির রচিত পুস্তক দেখিয়া অতীশকে বাঙালি প্রতিপন্ন করেন নাই, এ বিষয়ে তাহাদের উপজীব্য একাধিক তিব্বতীয় ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ।

সকল গ্রন্থের উক্তি হয়তো বিশ্বাসযোগ্য নাও হইতে পারে, কিন্তু ত্যেঙ্গুরের ক্যাটালগে 'বোধিমার্গ-প্রদীপ-পঞ্জিকা নাম' বলিয়া অতীশের স্বরচিত একখানি গ্রন্থে যে বিবরণ আছে, তাহাতে অতীশের বর্ণনায় স্পষ্ট লেখা আছে যে, তিনি "বাংলার রাজপরিবারে" জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন [Dipankara Srijnana de souche royale Bengalie-Catalogue du Fonds Tibetain de la Bibliotheque Nationale,Troisieme Partie, par p. Cordier P 327] ত্যেঙ্গুরের ক্যাটালগে 'একবীর সাধন নাম' বলিয়া অতীশের যে অপর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তাহাতেও আচার্য পৈশুপাতিক শ্রীদীপঙ্করকে 'বাংলার' (du Bengale) বলিয়া উক্ত হইয়াছে (Ibid, Deuxieme Partie P, 46) "প্রবাসী" আশ্বিন ১৩৪৪, অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান, ৮৯০ পৃষ্ঠা।

৫৯. Alex Cosma de Koorosi-a native of Hungary, who, to follow out philological researches, resorted to the east, and for years passed under privation, such as seldom has been endured, and patient labour in the cause of science, compiled a Dictionary and Garmmer of the Tibetan language, his lasting and real monument. On his road to H'lasa to resume his labours he died at Darjeeling on the 11th : April, 1842, Aged 44 years. Darjeeling Past and present by E. C. Dozey P. 147.

৬০. (১) Pag-Sam-Jon Zang, Part II XVIII. (২) ভারতবর্ষের ইতিহাস, সেন রায়-চৌধুরী ৯৪ পৃষ্ঠা। Pag-Sam Jon-Zang. Part I Cx liv Index.

সাহিত্য ১৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩১২ সাল, "বৌদ্ধ-লামার শিরোস্ত্রাণ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ১৮৯ পৃষ্ঠা।

৬১. ডাক্তার শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক এম. এ. পি. এইচ-ডি, বঙ্গসমতটের কয়েকটি প্রাচীন বৌদ্ধ রাজবংশ। প্রাচী ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা ৪১—৪২ পৃষ্ঠা।

৬২. বাংলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম খণ্ড।

৬৩. রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া, রাবণ বধান্তে জনকনন্দিনী লাভ করিয়াছিলেন; রামপালদেবও [যথাবৎ] এইরূপ যুদ্ধার্ণব সমুত্তীর্ণ হইয়া, ভীমনামক ক্ষৌণী-নায়কের বধ সাধন করিয়া, জনক-ভূমি (বরেন্দ্রী) লাভে ত্রিজগতে [শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়] আত্মযশঃ বিস্তার করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক ভিনিস্ এই শ্লোকোক্ত 'জনক-ভূ"—শব্দের মিথিলা অর্থ গ্রহণ করিয়া, রামপাল কর্তৃক ভীম নামক মিথিলাধিপতির পরাজয়-সাধনের-ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়াছেন—I cannot identify the name। এই শ্লোকের সহিত মিথিলার সম্পর্ক নাই। জনক-ভূ" শব্দে পাল রাজগণের জন্মভূমি "বরেন্দ্রী" সূচিত হইয়াছে। তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের পরলোকগমনের পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় মহীপাল দেবের যথেচ্ছ শাসনে সংক্ষুব্ধ হইয়া প্রজাপুঞ্জের নায়ক কৈবর্ত-জাতীয় দিব্য তাহাকে সিংহাসনচ্যুত ও নিহত করিলে কিছুকালের জন্য পালরাজগণের "জনক-ভূ" [বরেন্দ্রী] তস্য ভ্রাতা রুদোক এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম নামক ক্ষৌণী-নায়কের করতলগত হইয়াছিল। রামপাল বহু চেষ্টায়, বহু ক্লেশে সেই 'জনক-ভূ'র উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন বলিয়া, [স্বনাম-সাদৃশ্যে এবং স্বকার্য-সাদৃশ্যে] দ্বিতীয় রামচন্দ্র রূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। রাজকবি এই ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত করিবার অভিপ্রায়ে, রামপক্ষে এবং রামপাল-পক্ষে তুল্যরূপে প্রযোজ্য 'জনক-ভূ লাভাৎ' 'ভীম—রাবণ-বধাৎ' এবং 'যুদ্ধার্ণবোল্লঙ্ঘনাৎ' এই তিনটি শিষ্ট পদের ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সন্ধ্যাকর-নন্দী-বিরচিত 'রামচরিত' কাব্যে এই ঐতিহাসিক ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার কোনও কোনও স্মৃতি-চিহ্ন বরেন্দ্রভূমিতে অদ্যাপি বর্তমান আছে। এই প্রশস্তিতে কৈবর্তরাজ ভীম 'ক্ষৌণী নায়ক' বলিয়া উল্লিখিত—রাজকবি তাহাকে নায়ক মাত্রই বলিয়াছেন, রাজা বলেন নাই। গৌড়লেখমালা-অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১৩৮ পৃষ্ঠা।

৬৪. রামপাল রামাবতী নামে যে নগর বসান, 'জগদ্দল-মহবিহার' তাহার কাছেই ছিল। উহা গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমের উপরেই ছিল। এখন করতোয়া গঙ্গায় পড়ে না—পড়ে যমুনায়; গঙ্গাও একসময়ে বুড়িগঙ্গা দিয়া যাইত। তাই ভাবিয়াছিলাম, রামপাল নামে মুন্সিগঞ্জে যে এক পুরান গ্রাম আছে, হয়ত সেই রামাবতী ও জগদ্দল উহারই নিকটে হইবে। আমি একথা প্রকাশ করার পর, অনেকেই জগদ্দল খুঁজিতেছেন, কেহ মালদহে, কেহ বগুড়ায়; কিন্তু খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নাই, পাওয়া কিন্তু নিতান্ত দরকার। কারণ, মগধে যেমন নালনাদ, পেশোয়ারে যেমন কনিষ্ক-বিহার, কলম্বোতে যেমন দীপদন্তম-বিহার, সেইরূপ বাংলায় মহাবিহার জগদ্দল। তেঙ্গুরে কোথাও লেখে উহা বরেন্দ্রে ছিল, কোনও কোনও

জায়গায় লেখে বাংলায়, কোনও কোনও জায়গায় লেখে পূর্ব ভারতে। যাহা হউক, উহা একটি প্রকাণ্ড বিহার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। * * রামপালই যে ঐ বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এমন বোধহয় না। [মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৪র্থ সংখ্যা সন ১৩২১] স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শব্দগত সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া ঢাকা জেলার অন্তর্গত রামপালকে রামাবতী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের নিকট রামপুরা নামক স্থানে রামাবতীর অবস্থান নির্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন রামাবতী সরকার জন্নতাবাদ বা গৌড়ের সীমা-মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং তাহার ধ্বংসাবশেষ কখনই ঢাকা অথবা বগুড়া জেলায় আবিষ্কৃত হইতে পারে না। বগুড়া সরকার ঘোড়াঘাটে এবং সরকার বাজুহায় অবস্থিত এবং রামপাল সরকার সোনারগাঁয়ে অবস্থিত। বাংলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বাধীন বঙ্গ-রাজ্য—
রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর



বঙ্গ নামের প্রাচীনত্ব ঃ

বঙ্গ নামটি অতি প্রাচীন। এ বিষয়ে পূর্বে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। এই নাম বৈদিক সাহিত্যে, বৌদ্ধগ্রন্থে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, পুরাণে, মহাকবি ভাসের নাটক প্রভৃতিতে উল্লিখিত আছে। কিন্তু সেকালের বঙ্গদেশের সীমা কিরূপ ছিল, সে-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের নাই, এজন্য এখানে ভৌগোলিক বৃত্তান্তও কিছু আলোচনা করিব।

প্রত্যেক দেশেরই প্রাকৃতিক সীমা নানারূপে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। প্রথমত নদী-মাতৃক-দেশে, নদীর গতি-পরিবর্তন হেতু, দেশের সীমার পরিবর্তন ঘটে। রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনেও দেশের সীমার পরিবর্তন হয়। অতীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি বর্তমান সময়ের কথাই বলি, তাহা হইলেও বর্তমান ইংরাজ-রাজত্বে বঙ্গদেশের সীমা কতবার কতরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা সকলেরই সুবিদিত।

বঙ্গ, সমতট ঃ

আমরা খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে বঙ্গদেশের যে পরিচয় পাই, তাহা যে সমতট প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র এবং পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত দেশ-সমূহের মধ্যে পরিগণিত হইত, তাহা সমুদ্রগুপ্তের প্রয়াগস্তম্ভলিপি হইতেই জানিতে পারি। তখন বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও সমতট প্রত্যন্ত দেশ রূপে পরিগণিত ছিল।

বঙ্গ ও উপবঙ্গ ঃ

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বলেন—"ষষ্ঠ শতাব্দীর জ্যোতির্বিদ গণিতাচার্য বরাহমিহির পূর্বদিকের মগধ, মিথিলা, প্রাগজ্যোতিষাদি দেশ-সমূহের মধ্যে সুহ্ম, সমতট, গৌড়ক, পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্তিক ও বর্ধমান এই কয়টি দেশের নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং অগ্নিকোণে অঙ্গ-কলিঙ্গাদি দেশ-সমূহের মধ্যে বঙ্গ ও উপবঙ্গের নামও নির্দেশ করিয়াছেন। বরাহমিহিরের পূর্বে ও তাহার সমসময়ে দেশবিভাগ সমূহের নাম ছিল গৌড়ক ও পৌণ্ড্র—তাহাই কোটিবর্ষ প্রভৃতি 'বিষয়' লইয়া গঠিত 'পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি' নামে, আবার কখনও 'বরেন্দ্রী' নামেও আখ্যাত হইত, এবং তাহাই মোটামুটিভাবে বর্তমান সময়ের 'উত্তর বঙ্গ', অর্থাৎ, রাজসাহি, পাবনা, বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও মালদহ জেলা-সমূহের সম্পূর্ণ ভাগ বা অংশবিশেষ লইয়া গঠিত বিভাগ। আর যে দেশবিশেষের নাম ছিল 'সমতট', তাহাই মোটামুটিভাবে বর্তমান সময়ের "পূর্ববঙ্গ" অর্থাৎ, বাকরগঞ্জ, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, ঢাকা ও ফরিদপুর জেলা-সমূহের সম্পূর্ণ ভাগ বা অংশবিশেষ লইয়া গঠিত বিভাগ, কিন্তু খুলনা ও চট্টগ্রামের সমুদ্রতট সংলগ্ন অংশবিশেষ ইহাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না, এইরূপ কথা কেহ শপথ করিয়া বলিতে পারিবেন না।[১] "ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন, —"সমুদ্র পর্যন্ত সম্প্রসারিত পূর্ববঙ্গই প্রাচীনকালে সমতট, বঙ্গ বা হরিকেল প্রদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল।"

ইউয়ান্ চোয়াং (৬৩০—৬৪৪ খ্রিঃ অঃ) ঃ

চিনদেশীয় পর্যটক ইউয়ান্ চোয়াং [হিউয়েন সাঙ] বাংলাদেশ পর্যটন করেন। তিনি তাহার ভ্রমণে পৌণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি বঙ্গ ও সমতট এই উভয় স্থানকেই 'সমতট' শব্দ দ্বারা বুঝাইয়াছেন কিনা তাহার লিখিত বিবরণী হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

চৈনিক পর্যটক ইৎসিং (৬৭১—৬৯৫ খ্রিঃ অঃ) ঃ

ইউয়ান চোয়াংয়ের পর খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পর্যটক ইৎসিং ভারতে আসেন। হরিকেল অর্থাৎ, বঙ্গে ["বঙ্গাস্ত হরিকেলিয়া" ইতি হেমচন্দ্র] এ নামের উল্লেখ করিয়াছেন। হরিকেল হইতেছে পূর্ববঙ্গের [বঙ্গের] প্রাচীন নাম। তিনি হরিকেল পূর্ব ভারতের পূর্ব সীমায় অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি হরিকেলকে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এখানকার শিললোকনাথ বিশেষ বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থে তাহার চিত্র আছে। ফরাসি পণ্ডিত ফুশেও তাঁহার লিখিত Etude sur L' Iconographic Bouddhique de-L' Inde, P. 200 নামক গ্রন্থে একখানি চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এবং তাহার পূর্ববর্তী "সেঙ্গাচি নামক অন্য একজন চিন-দেশীয় পর্যটক যে সমতট দেশে রাজভট্ট নামক একজন নরপতিকে সিংহাসনারূঢ় দেখিতে পাইয়াছিলেন, তিনি একথার উল্লেখ করিয়াছেন। ইৎসিঙ্গের সময়ে এই দুটি নাম যে এক দেশকে বুঝাইত তাহাও বলা কঠিন।

গৌড় বা পুণ্ড্রবর্ধন ও বঙ্গ ঃ

অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে বাংলাদেশ দুইটি ভাগে বিভক্ত ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তখন—বঙ্গ বলিলে পূর্বকালের সুহ্ম, বঙ্গ ও সমতট এই তিন দেশের অংশবিশেষ লইয়া গঠিত বিভাগ মনে করিতে হইবে এবং সম্ভবত তখন "বর্ধমানপুর" হরিকেলের একটি স্কন্ধাবার (রাজধানী বা সেনানিবেশ স্থান) ছিল। এই যুগে উত্তর-বাংলার নরপতি "গৌড়াধিশ"—"গৌড়েশ্বর" প্রভৃতি উপাধিতে পরিচিত হইতেন।

রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর ঃ

দশম ও একাদশ শতাব্দীতে হরিকেল বা বঙ্গদেশের রাজধানী পূর্ববাংলার বিক্রমপুরে অবস্থিত ছিল। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গপতিগণও **বিক্রমপুর** রাজধানী হইতে বঙ্গদেশ শাসন করিতেন। প্রাচীন [বিক্রমপুর নগরীতে] রামপালে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে, "আধারো **হরিকেল** রাজ-ককুদচ্ছত্র স্মিতানাং শ্রিয়াম্" উক্তিতে **হরিকেল** শব্দ রহিয়াছে। বল্লাল-চরিতে আছে, মহারাজ বল্লালসেন সুবর্ণবণিক জাতীয় শ্রেষ্ঠী বল্লভানন্দের নিকট দেড় কোটি মুদ্রা ঋণ প্রার্থনা করিলে, বল্লভানন্দ বলিয়াছিলেন যে—যদি মহারাজা বল্লালসেন হরিকেলীয় প্রদেশ তাহার অধিকারে রাখেন, তাহা হইলে তিনি ঋণ দিতে সম্মত আছেন। কাজেই 'হরিকেল' শব্দ-দ্বারা যে বঙ্গরাজ্যকে বুঝাইত, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহেরই কারণ নাই।[১]

চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চাং সমতট-রাজ্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—"সমতট রাজ্য চক্রাকারে ৩০০০ লি বা ৬০০ মাইল এবং সমুদ্রের তীরবর্তী ; ভূমি নিম্ন ও উর্বরা। রাজধানী চক্রাকারে ২০ লি বা ৪ মাইল। প্রচুর-পরিমাণে শস্য জন্মে। সর্বত্র ফল ও ফুল পাওয়া যায়। জল-বায়ু স্বাস্থ্যকর, এবং লোকের আচার-ব্যবহার প্রীতিপ্রদ। সমতটবাসীরা স্বভাবত কষ্টসহিষ্ণু, ক্ষুদ্রকায় ও কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা বিদ্যানুরাগী, সকলে যত্নসহকারে বিদ্যা উপার্জন করে। সমতট রাজ্যে সত্যধর্ম (বৌদ্ধধর্ম) ও অপধর্ম (হিন্দুধর্ম) উভয়ধর্মের বিশ্বাসীগণই বাস করে। এখানে ন্যূনাধিক ত্রিশটি সংঘারাম বিদ্যমান রহিয়াছে। এই-সকল মঠে প্রায় দুই হাজার পুরোহিত অবস্থিতি করেন। ইহারা সকলেই স্থবির নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত। সমতট রাজ্যে

ন্যূনাধিক একশত দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। ইহার প্রত্যেক দেব-মন্দিরেই নাগা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকসমূহ উপাসনা করে। নির্গ্রন্থ নামক অসংখ্য উলঙ্গ সন্ন্যাসী এই রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। নগর হইতে অনতিদূরে অশোক নির্মিত স্তূপ। এই স্থানে পুরাকলে তথাগত এক সপ্তাহ দেবগণের হিতকল্পে সুগভীর ও রহস্যপূর্ণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহার পার্শ্বে যেখানে চারিজন বুদ্ধ উপবেশন ও ভ্রমণ করিতেন, তাহার চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে। এই স্তূপের অনতিদূরে একটি সংঘারামে হরিত-প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মূর্তি আট ফিট উচ্চ। সমতট হইতে ৯০০ লি বা ১৮০ মাইল পশ্চিমে তাম্রলিপ্তি দেশ"—ইউয়ান-চোয়াং এর বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় সে সমস্ত বঙ্গ, উপবঙ্গ বা গাঙ্গেয় বদ্বীপ সমতট রাজ্যভুক্ত ছিল। আমরা পূর্বে ও বিষয়ে বলিয়াছি।

সমতটের সীমা সম্বন্ধে নানারূপ তর্ক ও আলোচনা আজ পর্যন্তও সমানভাবে চলিয়া আসিতেছে। তবে এবিষয়ে বিশেষরূপ তর্কের প্রয়োজন নাই। কেন-না বঙ্গ-সমতটে প্রাপ্ত মূর্তি ইত্যাদি হইতেই তাহার বিস্তৃতি সম্বন্ধে আমরা উপযুক্ত প্রমাণ যুক্তিযুক্ত ভাবে জানিতে পারিতেছি। বঙ্গ-সমতট রাজ্যের বিবিধ স্তূপ ইত্যাদি খনিত হইলে একদিন অশোকস্তম্ভ কিংবা বৃহত্তম বুদ্ধদেবের মূর্তি আবিষ্কৃত হওয়া বিচিত্র নহে।

সমতট বর্তমান সময়ের বাকরগঞ্জ, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, ঢাকা ও ফরিদপুর জেলা-সমূহের সম্পূর্ণ ভাগ লইয়াছিল, কিন্তু খুলনা ও চট্টগ্রামের সমুদ্র-তট-লগ্ন অংশ-বিশেষ ইহার অন্তর্ভূক্ত ছিল না এমন কথা বলা যায় না। তবে কতকটা যে ছিল তাহা সুনিশ্চিত।

'যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস' প্রণেতা স্বর্গত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বলেন ঃ—"সমতট বিস্তীর্ণ রাজ্য। আমাদের আলোচ্য যশোহর-খুলনার বাহিরে সমতটের অনেক অংশ ছিল। ইউয়ান-চোয়াং-এর বর্ণিত ৩০টি সংঘারাম ও ১০০টি দেবমন্দিরের মধ্যে কয়টি এ প্রদেশে ছিল এবং কয়টি বাহিরে ছিল, তাহা নির্ধারণ করিবার উপায় নাই। একস্থানে সমতটের রাজধানী ছিল বলিয়া আমরা কতকগুলি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছি ; সে প্রমাণ যে পর্যাপ্ত নহে, তাহা আমরাই সর্বাপেক্ষা ভাল বুঝি। হয়ত সেখানে একটি সংঘারাম মাত্র ছিল এবং সমতটের রাজধানী প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গে ছিল। যতদিন অকাট্য প্রমাণ বলে এই বিপ্লব-বহুল দেশের পুরাতত্ত্ব মীমাংসিত না হয়, ততদিন শুধু মানসিক সন্তারণে পরকে নিজের মতাবলম্বী হইতে বলা যায় না।"[৩] সতীশবাবুর এ উক্তি প্রকৃত ঐতিহাসিকের মতই হইয়াছে। শিববাড়ির বুদ্ধমূর্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি আরও বলিয়াছেন যে "যে প্রদেশে বৌদ্ধ প্রভাবের চাক্ষুষ নিদর্শন অতীব বিরল, সেখানে এমন মূর্তির আবির্ভাব বিস্ময়কর," কিন্তু পূর্ববঙ্গ-বিক্রমপুরে চাক্ষুষ নিদর্শনও যেমন বহু রহিয়াছে। তেমনি মৃত্তিকার অভ্যন্তরেও অনেক কিছু নিদর্শন রহিয়াছে।

এখানে একটি বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। বাঘাউরা গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণু-মূর্তির পাদপীঠে খোদিত-লিপি হইতে জানা যায় যে, নৃপতি মহীপাল সমতট প্রদেশের রাজা ছিলেন। পাল বংশে দুইজন মহীপাল ছিলেন। প্রথম মহীপাল দেব ছিলেন পাল রাজবংশের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম মহীপাল ছিলেন প্রথম বিগ্রহ পালের পুত্র। 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা—যতীন্দ্র বাবু বলেন—"বাঘাউরা লিপির দ্বিতীয় মহীপাল কে? দ্বিতীয় মহীপাল কখনও সমতটে রাজ্য বিস্তৃত করিতে পারেন নাই। তৎকালে সমতট-বঙ্গে বর্মবংশীয় রাজগণের আধিপত্য ছিল। সুতরাং বাঘাউরা লিপির লিখিত মহীপাল দ্বিতীয় মহীপাল হইতে পারেন না। বিশেষত প্রথম মহীপালের রাণগড় লিপির সহিত বাঘাউরা লিপির অক্ষরের তুলনা করিলে উভয় লিপিমালা এক সময়ের বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।" [ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড ২২৩ পৃষ্ঠা] স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "প্রথম মহীপাল রাজবংশের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মহীপালের পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে বরেন্দ্রী বা উত্তরবঙ্গ কম্বোজ জাতি কর্তৃক

অধিকৃত হইয়াছিল এবং সম্ভবত চন্দেল-বংশীয় যশোবর্মার সাহায্যে গুর্জররাজ মহীপাল মগধ পুনরাধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং মহীপাল দেব, পিতার মৃত্যুর পরে রাঢ় ও বঙ্গদেশের কিয়দংশের অধিকার মাত্র, উত্তরাধিকার—সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহীপাল স্বয়ং বরেন্দ্রী, মগধ ও তীরভুক্তি, এমন কি, বারাণসী পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। মহীপালদেবের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে পূর্ববঙ্গ বা সমতট অধিকৃত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গৌড় হইতে তাড়িত হইয়া পালরাজগণ সমতটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। * * রাখালবাবুর মতে নারায়ণপালের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ গরুড়স্তম্ভ-লিপি ও কুমিল্লা জেলার বাঘাউরা গ্রামে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্তির পাদ পীঠস্থ খোদিত লিপির অক্ষরগুলির সহিত বাণগড়ের স্তম্ভলিপির অক্ষরগুলির তুলনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বাণগড় লিপি গরুড়স্তম্ভ লিপির পরে এবং বাঘাউরা লিপির পূর্বে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অক্ষর-তত্ত্ব হইতে কল্পনার ইতিহাসে কম্বোজ জাতির আক্রমণের কাল স্থির-নির্দেশ করা যায়। যাহারা অক্ষর-তত্ত্বের প্রামাণিকতার সম্বন্ধে সন্দিহান, তাহাদিগের সহিত বিশুদ্ধ প্রত্ন-বিদ্যামূলক ইতিহাসের মতদ্বৈধ বিচিত্র নহে। বাণগড় স্তম্ভ-লিপিতে কম্বোজ জাতীয় গৌড়েশ্বরের নামোল্লেখ নাই। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, বিদেশীয় ও বিজাতীয় গৌড়েশ্বর শিবেপাসক হইলেও গৌড়রাজ্যে তাহার মান সুপরিচিত হয় নাই। * * * এইমাত্র নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বাণগড়ের শিবমন্দিরনির্মাতা কম্বোজজাতীয় গৌড়েশ্বর প্রথম মহীপালদেবের সুদীর্ঘ রাজ্যকালের প্রথম ভাগে সমতট তাহার অধিকারভুক্ত ছিল; কারণ, তাহার তৃতীয় রাজ্যাঙ্গে লোকদত্ত নামক বৈষ্ণব মতাবলম্বী জনৈক বণিক সমতটে একটি নারায়ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।" [বাংলার ইতিহাস প্রথম খণ্ড ২১৬ পৃষ্ঠা] বিষ্ণুমূর্তির পাদপীঠে খোদিত লিপির কথা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি।[৪]

সমতট রাজ্য ঃ

কাজেই আমরা নিরপেক্ষ ভাবে সমতটের যে ভৌগোলিক পরিচয় দিয়াছি তাহাই প্রকৃতভাবে যথার্থ বলিয়া মনে হয়। চৈনিক পরিব্রাজক বলিয়াছেন যে,—সমতটে ৩০টির অধিক বৌদ্ধ সংঘারাম এবং বৌদ্ধ স্থবির সম্প্রদায়ের ২০০০-এর অধিক শ্রমণ ছিল। একথা অপ্রকৃত নহে। তাহা না হইলে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র এত মূর্তি আসিল কোথা হইতে? মূর্তি যখন ছিল, তাহাদের উপাসকও ছিল। কেননা যাহারা সামান্য ভাবেও পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাহারা এই সত্যটা চাক্ষুষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিক্রমপুর, ঢাকা, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতির বহু গ্রামেই নানাশ্রেণীর মূর্তি পাওয়া যাইতেছে। কত যে স্তূপ, কত যে বৌদ্ধ দেব-দেবী ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি অযত্নবিন্যস্তভাবে পড়িয়া আছে তাহার সংখ্যা নির্দেশ করাও বড় সহজ ব্যাপার নহে। এবং "সমতটে 'বুদ্ধারধি ভগবতী তারা' এইরূপ A. S. B. Manuscript No A. 15. উল্লিখিত আছে।[৫] কোনও কোনও প্রস্তর মূর্তির পাদপীঠেও সমতট নামের উল্লেখ রহিয়াছে। পরবর্তীকালের প্রাচীন লিপিতেও সংস্কৃত সাহিত্যে 'বঙ্গ' শব্দটির অধিক প্রচলন হইলেও সমতট শব্দটিও সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যক্ত হয় নাই, তাহার প্রমাণ রূপে আমরা ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপাল দেবের তাম্রশাসনের "সৎ সমতট জন্মা" শিল্পীর এবং ত্রিপুরা জেলার বাঘাউরা গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির পাদপীঠে খোদিত প্রথম মহীপালদেবের রাজ্যসম্বত সমন্বিত ৩য় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ লিপির উল্লেখ করিতে পারি যথা—"সমতটে বিলকীন্নকীয় পরম বৈষ্ণবস্য" ইত্যাদি কাজেই নানা দিক দিয়াই দেখিতে পাইতেছি যে সমতট রাজ্য সম্পর্কে—এই সিদ্ধান্তই ঠিক যে, পূর্ববঙ্গই সমতট রাজ্য ছিল। এবং যে যে জেলা উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহাও বলা হইয়াছে। এবং প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ সহকারেও তাহাই সপ্রমাণ হইয়াছে।

বঙ্গ ও উপবঙ্গ ঃ

বরাহমিহির—যে দেশগুলিকে 'উপবঙ্গ' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকপক্ষে দক্ষিণ ও মধ্য বাংলার দেশসমূহ অর্থাৎ, যশোহর, খুলনা, (সুন্দরবনসহ) চব্বিশ পরগণা, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ দেশসমূহের ভাগ বা অংশ-বিশেষ লইয়া গঠিত ছিল বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

একটা কথা প্রণিধানযোগ্য এই যে, ইউ-য়ান-চোয়াং তাহার বর্ণনায় বঙ্গদেশের নাম উল্লেখ করেন নাই। কাজেই এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন—"It is very curious that the pilgrim does not mention the country of Vanga. It can be specified as the country lying between the Mehgna river on the east, the sea on the south and the old Budi-ganga course of the Ganges on the north. The western boundary of Vanga appears always to have been indefinite. Yuan Chuang must have passed over Vanga in going from Samatata to Tamralepti'. The reason of his silence appears to have been the fact that owing to general subsidence of the country towards the end of the 6th century. A. D. It had rapidly sank very low in geographical and political importance and did not recover from this set back for some centuries. When the pilgrim passed over this tract by the middle of the 7th century A. D., there was nothing to attract and detain him there."

সমতট সম্পর্কে এবং উহার সীমা নির্দেশ সম্বন্ধে সকলেই আমাদের সহিত একমত। উহা একটি বৃহৎ রাজ্য ছিল এবং ত্রিপুরা, নোয়াখালি, বরিশাল, ফরিদপুর এবং ঢাকা জেলার অধিকাংশও উহার অঙ্গীভূত ছিল। সমতট ক্ষুদ্র ভূখণ্ড ছিল না।

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ বসাক মহশয় বঙ্গ ও সমতট দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া মনে করেন এবং 'বঙ্গাধিপ' বা বঙ্গপতি বলিলে তাহার অধিকার 'সমতট' প্রদেশেও বিস্তৃত ছিল বলিয়া বুঝিতে হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, 'বঙ্গ' শব্দটি 'সমতট' দেশকে লইয়াও প্রযুক্ত হইত। এই বুঝাইত যে—সমতট প্রদেশ তাহার রাজ্য পর্যন্ত।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গ, সমতট-পূর্ববঙ্গ ঃ

খ্রিস্টিয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর-ভারতের উত্তর ভাগ এবং মধ্যভাগ গুপ্তবংশীয় রাজাদের বিভিন্ন শাখা কর্তৃক শাসিত হইত। এবং এক সময়ে গুপ্তদের সামন্ত নৃপতি রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহারাই গুপ্তদের প্রভাব হ্রাস পাইলে স্বাধীন হইলেন। আদি গুপ্তবংশীয়দের শাখার একমাত্র পুরগুপ্ত মগধের কিয়দংশ এবং অঙ্গরাজ্য লইয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। পূর্ববঙ্গ—বঙ্গ-সমতট রাজ্য ও গুপ্তদের প্রাধান্য সময়ে সামন্তরাজ্য ছিল।

সমতট, [প্রত্যন্ত দেশ] ডবাক (১) কামরূপ নেপাল প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের নৃপতিরাও গুপ্ত নৃপতিগণের আনুগত্য স্বীকার করিতেন। খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত তাহারা গুপ্তদের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। হূণদের আক্রমণে এবং মালব নৃপতি যশোবর্ধনের প্রভাববশত গুপ্তরাজাদের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইয়াছিল।

কোটালিপাড়া গুপ্তরাজাদের মুদ্রা, মুলচর ও সাভারে প্রাপ্ত ঃ

বঙ্গ-সমতট প্রদেশে অর্থাৎ, পূর্ববঙ্গে যে আদি গুপ্ত রাজাদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল, সেকথা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। [৮২-৯৯] দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের এবং স্কন্দগুপ্তের

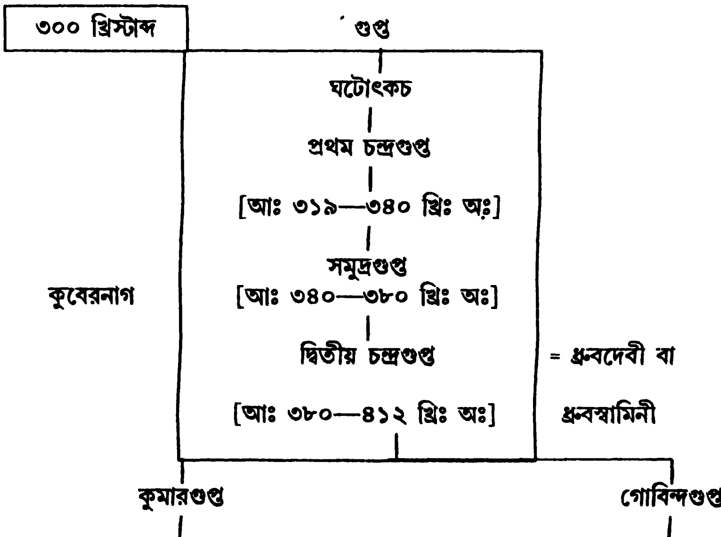
সুবর্ণমুদ্রা এবং ময়ূরাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া গ্রামের নিকটে পাওয়া গিয়াছে। আমি মূলচর গ্রামেও মৃত্তিকার নীচ হইতে একটি সুবর্ণমুদ্রা পাইয়াছিলাম। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একদিন বৃষ্টির পর আমাদের বাড়ির পথের মাটি সরিয়া যাওয়ায় একটি প্রাচীনা রমণী এই মুদ্রাটি কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। ঐ মুদ্রাটি আমি বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিতে প্রদান করিয়াছি। ঐ সুবর্ণমুদ্রাটির চিত্র মৎপ্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত করিয়াছিলাম।[৬] এই বারও মুদ্রিত হইল। কাজেই পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ, বঙ্গ ও সমতট রাজ্যে গুপ্তরাজাদের যে প্রভাব বিদ্যমান ছিল তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কোটালিপাড়ার ন্যায় মূলচর গ্রামে প্রাপ্ত এবং সাভারে প্রাপ্ত গুপ্তরাজাদের স্বর্ণমুদ্রা হইতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, পূর্ববঙ্গ বিশেষ বিক্রমপুর অঞ্চল দিগ্বিজয়ী বীর সমুদ্রগুপ্ত এবং তাহার পরবর্তী বংশধরগণের অধীনে কিছুকাল ছিল।

বাংলার ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, মগধের শেষ গুপ্ত-রাজবংশের শেষ নরপতি দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তই কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্মা কর্তৃক নিহত গৌড়-মগধ-নাথ। আবার অনেকে এইরূপ মতও পোষণ করেন যে, এই নৃপতি আর কেহই নহেন, খড়গবংশীয় নৃপতি বঙ্গ এবং সমতটের অধিপতি রাজরাজভট্ট। এই রাজরাজভট্টের কথাই আমরা চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং-এর বিবরণ হইতে জানিতে পারিয়াছি।

আমাদের এই স্থানে বাধ্য হইয়াই নানা কারণে একটু পূর্বানুবৃত্তি করিতে হইতেছে। আমরা—পূর্বে গুপ্তরাজবংশের আলোচনা করিতে যাইয়া তাহাদের প্রভাব এবং কতদূর পর্যন্ত তাহাদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল, সে-কথাও বলিয়াছি। গুপ্তরাজবংশ বিধ্বস্ত হইলে পর বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা সম্পূর্ণভাবে আমরা জানিতে না পারিলেও ইহা জানা যায় যে, তাহাদের অধঃপতনের পর বঙ্গরাজ্যের অর্থাৎ, পূর্ববঙ্গে স্থানীয় নৃপতিগণ, স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এখানে আমরা গুপ্ত রাজাদের একটি বংশলতা প্রদান করিলাম। আদিগুপ্তরাজবংশের যে শাখা **বঙ্গ-সমতট** রাজ্যে রাজত্ব করেন, এই বংশলতা হইতে তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে।

আদি গুপ্ত সম্রাটদের ও বঙ্গে গুপ্ত নৃপতিগণের বংশলতা :



[আঃ ৪১৩—৪৫৫ খ্রিঃ অঃ]
|
স্কন্দগুপ্ত
|
[আঃ ৪৫৫—৪৬৭ খ্রিঃ অঃ]
|
দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত

[আঃ ৪৬৭—৪৭৬ খ্রিঃ অঃ]
|
বুদ্ধগুপ্ত

[আঃ ৪৭৬—৫০০ খ্রিঃ অঃ]
|
ভানুগুপ্ত
[আঃ ৫০০—৫৪৩ খ্রিঃ অঃ]

গুপ্ত রাজাদের শাখা
|
পুরগুপ্ত
|
নরসিংহগুপ্ত
|
দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত

[আঃ ৫৩০ খ্রিঃ অঃ]

বঙ্গ ও সমতট রাজ্যের গুপ্ত রাজগণ

বৈন্য গুপ্ত [Vainya Gupta]
|
[আঃ ৫০৭—৫২৪ খ্রিঃ অঃ]
|
ধর্মাদিত্য
|
[আঃ ৫২৫—৫৫০ খ্রিঃ অঃ]
|
গোপচন্দ্র
|
[আঃ ৫৫০—৫৭৫ খ্রিঃ অঃ]
|
সমাচার দেব
|
[আঃ ৫৭৫—৬০৭]
|
(?) নাথ

শ্রীনাথ
|
ভবনাথ — ভ্রাতা
|
লোকনাথ

[আঃ ৬৬৩—৬৬৪ খ্রিঃ অঃ]

এই বংশলতা হইতে পাঠকগণ পূর্ববঙ্গের [বঙ্গ-সমতট রাজ্যের] গুপ্ত নৃপতিগণের পরিচয় পাইবেন এবং সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত যে তাহাদের প্রভাব বঙ্গ সমতট রাজ্যে বিদ্যমান ছিল তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বিক্রমপুরে বা বঙ্গ-সমতট রাজ্যে যে তাহাদের প্রতাপ বিশেষভাবে বিস্তৃত ছিল এ সম্বন্ধে আমাদের অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। এজন্যই কিংবদন্তী-মূলক বিক্রমাদিত্যের কথা একেবারে অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

গুপ্ত রাজাদের প্রভাব সম্বন্ধে ইহার অধিক আমাদের কিছু বলার নাই। তাহাদের সমসাময়িক কোনও প্রাচীন মূর্তি পূর্ববঙ্গের কোনও স্থানে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। উত্তরবঙ্গের কোনও স্থানে গুপ্তযুগের কিছু নিদর্শন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা প্রায় সকলই পালরাজাদের সময়ের।[৭]

রামপালের রাজত্ব ঃ

আমরা রামপালের বিষয় প্রসঙ্গত উল্লেখ করিয়াছি। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথ বলেন যে, রামপাল বহুদূর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভীমকে পরাজিত করিয়া তিনি মিথিলা বা উত্তর বিহার, চম্পারণ এবং দ্বারভাঙ্গা জেলা, এমন কি, কামরূপ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র কুমারপাল প্রধান মন্ত্রী বৈদ্যদেবের উপরে কামরূপের শাসনভার সমর্পণ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের বা হিন্দুস্থানের সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের ক্রমিক অবনতি ঘটিলেও রামপালের সময়ে মগধ এবং বঙ্গদেশের প্রায় সর্বত্র বৌদ্ধ অধিবাসীদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল।

উত্তরবঙ্গে কম্বোজীয়দের অধিকার ঃ

দিনাজপুরের মহারাজের উদ্যানে একটি কারুকার্য-খচিত শিলাস্তম্ভ আছে। সেই স্তম্ভটি বাণগড় হইতে আনীত হইয়াছিল। উহার গায়ে যে খোদিত-লিপি আছে তাহা হইতে জানা যায় যে, কম্বোজবংশীয় অজ্ঞাতনামা জনৈক গৌড়পতি কর্তৃক একটি শিবালয় নির্মিত হইয়াছিল এবং ঐ স্তম্ভটি সেই শিবালয়ের সংলগ্ন ছিল। এই শিবমন্দির বাণগড়ের কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল তাহা এখন পর্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই। শিলালিপির অক্ষর দেখিয়া—অনেকে মনে করেন, খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দীতে কম্বোজবংশীয় কোনও নৃপতি এই অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। অতএব, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গ পালরাজবংশের হস্তচ্যুত হইয়া কম্বোজ বংশের হস্তগত হইয়াছিল। এই কম্বোজবংশীয়েরা কোথা হইতে আসিলেন সে-বিষয়ে নানারূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

কিছুদিন হইল উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত ইর্দা (Irda) গ্রামে কম্বোজবংশের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে [১৯৩৪—৩৫ খ্রিঃ অঃ]।[৮] এই তাম্রফলকে কম্বোজবংশীয় নৃপতিদের উল্লেখ আছে। এই বংশীয় নৃপতি নয়পাল দেবের একাধিক্রম দানের বিষয় উল্লিখিত আছে। এই তাম্রলিপিতে রাজ্যপাল, নারায়ণপাল, নয়পাল প্রভৃতি রাজার নাম রহিয়াছে। অনেকে এই নৃপতিদের সহিত, বাংলার পালরাজাদের সংশ্রব রহিয়াছে মনে করেন। কিন্তু বিশেষভাবে পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, কম্বোজবংশীয়দের সহিত বাংলার পালরাজাদের কোনও সংশ্রব নাই। পালরাজাদের পরে কম্বোজীয় নৃপতিরা উত্তর বাংলায় আধিপত্য করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাণগড়ে খনন-কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই খননের ফলে আশা করা যায় যে, হয়তো এই কম্বোজবংশ সম্বন্ধে আমরা আরও অনেক নতুন কথা জানিতে পারিব। তবে এই কথা বিশেষ দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারা যায় যে, কম্বোজবংশীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে পাল রাজাদের

প্রভাব হ্রাস পাইয়াছিল এবং উহা কম্বোজবংশের অধিকারভুক্ত হয়। একাদশ শতাব্দীতে কৈবর্ত—বিদ্রোহের দরুণ পালরাজাদের যাহা কিছু প্রতিপত্তি ছিল তাহাও হ্রাস পায়, তাহারই ফলে সেনরাজগণ আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া বঙ্গদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন।

এই প্রসঙ্গে ভট্টশালী মহাশয় আসরফ পুর তাম্রশাসনের ব্যবহৃত অক্ষরের সহিত শ্রীহর্ষের তাম্রশাসনদ্বয়ের ও সম্রাটের কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালের রাজা আদিত্যসেনের সাহাপুর ও অপসড় শিলালিপির অক্ষর-সাদৃশ্য আছে বলিয়া, যেরূপ দৃঢ়তার সহিত বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, এবং তৎপ্রসঙ্গে রাজেন্দ্র লাল মিত্রও 'গঙ্গামোহনের উপর যেরূপ কটাক্ষপাত করিয়াছেন তাহা সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।" ডাঃ রাধাগোবিন্দবাবুর এই উক্তি আমরা সমর্থন করি।

আমাদের মনে হয় মহারাজাধিরাজা শ্রীহর্ষের মৃত্যুর পর যখন বঙ্গদেশে নানারূপ বিপ্লব ও অশান্তির আবির্ভাব হইল এবং প্রত্যেকেই আপনার প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য ব্যস্ত হইলেন—সেই "মাৎস্যন্যায়ের" যুগেই সম্ভবত আসরফপুর তাম্রশাসনের প্রতিপাদয়িতা দেবখড়গ ও তদ্বংশীয় বৌদ্ধ রাজগণ, পূর্ববঙ্গের পূর্বাঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। খড়গবংশীয় নৃপতিদের নামের বিশেষণরূপে পরম ভট্টারক পরমেশ্বর" প্রভৃতি সার্বভৌমত্ব সূচক কোনও উপাধি দেখা যায় না, এজন্যই রাধাগোবিন্দবাবুর ভাষায় বলিতে হয় যে—"ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, তাহারা স্বল্প-বিস্তর স্থান লইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন।" স্বর্গত গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয়ও লিখিয়াছেন যে, These kings were local kings of no very extensive dominion. কাজেই ভট্টশালী মহাশয়ের কল্পিত সিদ্ধান্ত রাজভট্ট ও তাহার পিতা ও পিতামহ দেবখড়গ ও জাতখড়গ প্রভৃতি বৌদ্ধ নৃপতিগণ সকলেই সমতটের রাজা ছিলেন, ইহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কেন না তাহার মূলে তেমন কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বিদ্যমান নাই।

স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয়ও ভট্টশালী মহাশয়ের মতাবলম্বী। তিনিও বলিয়াছিলেন যে—খড়গবংশীয় দেবখড়েগর পুত্র রাজরাজভট্ট এবং চীনা পরিব্রাজক বর্ণিত "সমতটরাজ রাজভট্ট একই ব্যক্তি।"

আসরফপুরের লিপিকলা ও খড়গবংশের কাল-নির্দেশ ঃ

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, "ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রভৃতি অনেকেই অক্ষর-তত্ত্বের প্রমাণানুসারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, 'দেবখড়গর পুত্র রাজরাজভট্ট কখনই খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীর ব্যক্তি হইতে পারেন না। তাহারা বলেন শ্রীহর্য, ভাস্করবর্মা, আদিত্য সেন, কোনওাথ প্রভৃতির লিপিসমূহ হইতে দেবখড়েগর লিপিতে মাত্রার ক্রমিক-বিকাশ অধিকতর। এই সমস্ত কারণেই আসরফপুরের লিপিকাল সপ্তম শতাব্দীর না হইয়া কিছু পরবর্তীকালেরই হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।"—অনেকের মত এই যে—"কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্মার সাম্রাজ্য ধ্বংসের বহুকাল পরে নবম শতাব্দীর প্রথম পাদে খড়েগাদ্যম এবং ঐ শতাব্দীর শেষপাদে দেবখড়গ ও রাজরাজভট্টের আবির্ভাবকাল অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং, ইৎসিং কথিত সমতটরাজের সহিত দেবখড়েগর তনয় রাজরাজভট্টের একত্ব প্রতিপাদন নিষ্ফল।"

বৌদ্ধধর্ম ও খড়্গারাজ বংশ ঃ

খড়গ রাজবংশীয়েরা যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন তাহা তাহাদের "সর্বলোকবন্দ্য ত্রৈলোক্য খ্যাতকীর্তি ভগবান সুগত এবং তৎ প্রতিষ্ঠিত শান্ত, ভব—বিভব-ভেদকারী, যোগীগণের যোগগম্য ধর্ম" এবং তদীয় "অপ্রমেয় বিবিধগুণসম্পন্ন সংঘের পরম ভক্তিমান উপাসক"

প্রভৃতি বিশেষণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। নৃপতি খড়্গোদ্যমের পর 'পরম সৌগতোপাসক' জাতখড়্গ পরে "অশেষ-ক্ষিতি-পাল-মৌলি-মালা-মণি-দ্যোতি-পাদ-পীঠ" অরিজিৎ দেবখড়্গ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং এই নৃপতিই আসরফপুর তাম্রশাসন দ্বয়ের প্রতিপাদয়িতা।

প্রথম তাম্রশাসন খানি দ্বারা দেবখড়্গ দশদ্রোণাধিক নব পাটক ভূমি কুমার রাজরাজভট্টের আয়ুষ্কামনার্থে আচার্যবন্দ্য সংঘমিত্রের বিহার-বিহারিকা চতুষ্টয়ে দান করিয়াছেন। দেবখড়্গের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে, ১৩ই বৈশাখ তারিখে, পরম-সৌগত পুরদাস কর্তৃক প্রশস্তি লিখিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় তাম্রশাসন দ্বারা দশদ্রোণাধিক ষট্‌পাটক ভূমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের উদ্দেশ্যে শালিবর্দকস্থিত আচার্য সংঘমিত্রের বিহারে প্রদত্ত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় তাম্রশাসনখানিও দেবখড়্গের এয়োদশ রাজ্যাঙ্কে ২৫শে পৌষ তারিখে পরম-সৌগত পুরদাস কর্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

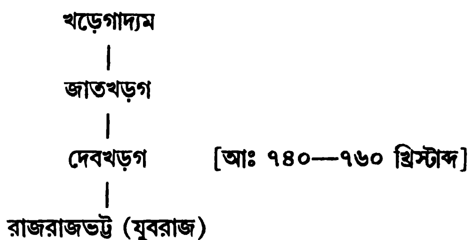
সুবর্ণগ্রামের বুদ্ধমণ্ডপ ও শালিবর্ধক-বিহার ঃ সুবর্ণগ্রাম বর্তমান সোনারগাঁ ঃ

পূর্ববঙ্গে [বঙ্গদেশে] বৌদ্ধ প্রভাব যে কিরূপভাবে বিস্তৃত ছিল তাহা এই তাম্রশাসনদ্বয় হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। দেবখড়্গের শাসনকালে সুবর্ণগ্রামের কোনও স্থলে একটি বুদ্ধ-মণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর ইহাও জানিতে পারা যায় যে, সংঘমিত্র শালিবর্ধক-নামক বিহারের আচার্য ছিলেন। 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন যে,—"তাম্রশাসন এবং চৈত্যের প্রাপ্তিস্থান রায়পুর থানার অন্তর্গত আসরফপুর গ্রাম; সুতরাং বুদ্ধ-মণ্ডপটি যে আসরফপুরের অনতিদূরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।"—আমরা ইহা প্রমাণ-সহ মনে করি না। আমরা মনে করি 'বুদ্ধ-মণ্ডপ' ও বিহার সুবর্ণগ্রামেরই কোনও না কোনও স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সম্বন্ধে আমরা তিব্বতের ইতিহাস পাগ্‌-সম-জঙ্গ-জংয়ের হইতে জানিতে পারি যে,—বিক্রমপুরের ন্যায় সুবর্ণগ্রাম সেসময় পূর্বভারতে বঙ্গদেশের একটি শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ-কেন্দ্র ছিল। ঐ গ্রন্থের বহুস্থানে সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁয়ের উল্লেখ আছে যথা—Svanargaon (sonargaon) a city in Bengala where a Brahman named Kacijita established a religious institution in which every ten house-holders supplied food to a Bhikhu.[১]

বাংলাদেশে সোনারগাঁ শহর। সেখানকার কাশীজিৎ নামক একজন ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং এইরূপ রীতি প্রবর্তিত ছিল যে দশজন গৃহস্থ একজন ভিক্ষুকে প্রতিপালন করিবেন।' ইহা হইতে সুস্পষ্ট ভাবে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, সুবর্ণগ্রাম বৌদ্ধগণের কেন্দ্রস্থান ছিল। যতীন্দ্রবাবু শালিবর্ধক-বিহারকে শাবর্দিয়া মৌজা বা গ্রাম বলিতে চাহেন। এ-বিষয়ে কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে ঐ বিহারটি যে একটি শ্রেষ্ঠ বিহার ছিল এবং তাহার ভার আচার্য বন্দ্য সংঘমিত্রের হস্তে ন্যস্ত ছিল, কাজেই বিহারটির সম্বন্ধে বিশেষভাবে তত্ত্বানুসন্ধান আবশ্যক । আমাদের মনে হয়, খনন-কার্য ব্যতীত এ বিষয়ে কোনওরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত হইবে না।

পালরাজাদের পতনের সমকালে পূর্ববঙ্গে এই স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। সম্ভবত নারায়ণপালের রাজ্যের শেষভাগে এই রাজ্য খড়্গোদ্যম কর্তৃক স্থাপিত হয়। খড়্গোদ্যমের পর তাহার পুত্র জাতখড়্গ পৌত্র দেবখড়্গ পূর্ববঙ্গে অধিকার লাভ করেন। আমরা দেবখড়্গের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ দুইখানি তাম্রশাসন হইতে এই রাজবংশের বিষয় জানিতে পারি। ইহারা দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বঙ্গের খড়্গরাজ বংশ—



খড়্গরাজাদের লাঞ্ছন ঃ

খড়্গরাজাদের দ্বিতীয় তাম্রশাসনখানির মধ্যস্থলে একটি রাজ-মুদ্রা সংযুক্ত রহিয়াছে। উহার মধ্যে "শ্রীমদ্দেবখড়্গ" এই নামটি উৎকীর্ণ আছে। অর্হৎগণের ধ্বজা ও বাহন মধ্যে বৃষ অন্যতম ; ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, বৃষ খড়্গ-নৃপতিদের লাঞ্ছন ছিল। তাহারা [খড়্গরাজগণ] সম্ভবত বৃষভলাঞ্ছিত ধ্বজা ব্যবহার করিতেন।

খড়্গরাজগণের রাজ্য বিস্তার ঃ

খড়্গ-রাজগণের রাজধানী কোথায় ছিল এবং তাহাদের রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'প্রতিভা' পত্রিকায় এবং এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় 'পূর্ববঙ্গের বিস্মৃত জনপদ' A Forgotten Kingdom of East Bengal' নামক প্রবন্ধে সিদ্ধান্ত করেন যে—"খড়্গরাজগণ সমতটের রাজা ছিলেন, এবং কুমিল্লার অনতিদূরবর্তী বড়কাম্‌তা বা কর্মান্তনগর খড়্গরাজাদের রাজধানী ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার যুক্তির মূলে কুমিল্লার নর্তেশ্বর মূর্তির পাদ-পীঠ লিপিতে উৎকীর্ণ শিলালিপির পাঠ—যথা—

[পাঠ] ১। ওঁ। (?) হচন্দ্র দেব পাদীয়-বিজয় রাজ্যে অষ্টা...ঞ্চ চতুর্দশ্যা (ং) তিথৌ বৃহস্পতিবারেষু (পু) ষ্যা-নক্ষত্রে কর্মান্ত পালশ্রী

[পাঠ] ২। কুসুম-দেব-সুত-শ্রীভাবুদে [ব] কারিত-শ্রীনর্তেশ্বর ভট্টা...[চন্দ্র শর্মা?] আষাঢ় দিনে ১৪।। খনিতঞ্চ রাতাকেন সর্বাক্ষরঃ [বং] খনিতঞ্চ শ্রীমধুসূদনেতি।।

আসরফপুর শাসন-দ্বয়ে এবং কুমিল্লার শিলালিপিতে 'কর্মান্ত' শব্দটির উল্লেখ দেখিয়া ডাঃ ভট্টশালী মহাশয় খড়্গবংশীয় রাজাদের কাল নির্ণয় এবং তাহাদের রাজধানী কর্মান্তনগর বা বর্তমান বড়কাম্‌তা নামক স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন।

সমতটের রাজধানী ঃ সমতট রাজ্য ঃ

আসরফপুর তাম্রশাসনের প্রথম শাসনের শেষ পংক্তিতে লিখিত আছে,—"লিখিতং জয়-কর্মান্ত বাসকে পরম-সৌগতোপাসক-সূরদাসেন 'এবং দ্বিতীয় শাসনের ধর্মানুশংসিনী শ্লোকাবলির পর লিখিত আছে,—জয়-কর্মান্ত বাসকাৎ লিখিতং পরমসৌগত সুর দাসেনিতি।" *"জয়-কর্মান্ত বাসকে" [এবং তথা হইতে] লিপিদ্বয় লিখিত হইয়াছিল মাত্র। লেখক সৌগত* সূরদাস। কোনও রাজধানী বা নগর হইতে রাজা "সমাজ্ঞাপয়তি"—আদেশ করিতেছেন, —লিপিদ্বয়ে আদৌ তাহার উল্লেখ নাই। স্বর্গত গঙ্গামোহন বাবু ভ্রান্তভাবে মনে করিয়াছিলেন যে, "Bothe the charters were issued (?) in the same year [Sambat 13] from the place *Jaya-Karmanata-Vsaka*"— *অর্থাৎ, "রাজ্যের ত্রয়োদশ বর্ষে, রাজা "জয় কর্মান্ত-বসাক" (স্থান) হইতে দানাদেশ করিয়াছিলেন।"* ইহা হইতেই ভট্টশালী মহাশয়ও মনে করিয়া

লইয়াছেন যে, খড়গবংশীয়গণ "কর্মান্ত নামক নগর" হইতে সমতটের রাজ্য পরিচালনা করিতেন। কুমিল্লার অনুসন্ধান-কার্যে ব্যাপৃত থাকায় সময়ে, হঠাৎ নটেশ শিবমূর্তির পাদ-পীঠ-লিপিতে সেই "কর্মান্ত" নগরটি ও তাহার "রাজার" নাম পাইবামাত্রই তিনি "কর্মান্তের খড়গবংশীয়" রাজগণের সহিত কুমিল্লার খোদিত লিপিতে উল্লিখিত 'কর্মান্ত-রাজগণের সম্বন্ধ স্থাপন কার্যে ব্রতী হইয়া থাকিবেন। এ-বিষয়ে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক বিশেষ যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে "কর্মান্ত" শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়া এবং অতি সুন্দর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে—"যেহেতু বড়-কামতার নিকট প্রাপ্ত এই প্রাচীন নর্তেশ্বর মূর্তির পাদ-পীঠ-লিপিতে একটি "কর্মান্ত" শব্দের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, এতএব বড়-কামতাই কর্মান্ত-নগর। এদিকে আবার কুমিল্লার অপর পারে আসরফপুরে প্রাপ্ত খড়গ-বংশীয় বৌদ্ধ রাজা দেবখড়েগর সময়ে তাম্রশাসন লিপিতেও যখন "কর্মান্ত বাসকের" উল্লেখ পাওয়া যায়, তখন সেই কর্মান্তও বড়-কামতাই হইবে। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কামতা বা কুমিল্লার অংশবিশেষই সে কালের সমতটের রাজধানী ছিল। এবং লোকে এই স্থান বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া, তিনি তাহার প্রবন্ধের নাম রাখিয়াছিলেন, —"পূর্ববঙ্গের একটি বিস্মৃত জনপদ।" সুধীগণই এইরূপ বিচার-পদ্ধতির বিচার করিবেন। যদি বা কালে ইউয়ান্-চোয়াঙ-বর্ণিত সমতটের রাজধানী বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তথাপি ইহা "কর্মান্ত" নামক নগর বলিয়া গণ্য হইবে না।"[১০]

সমতটের রাজধানী কোথায়?

এখন কথা হইতেছে যে, সমতটের রাজধানী কোথায় ছিল? এবং খড়গদের রাজধানীই বা কোথায় ছিল? খড়গদের সম্বন্ধে স্বর্গত গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয় বলিয়াছেন ঃ "These kings were local kings of no very extensive dominion." অর্থাৎ, খড়গ-নৃপতি ছিলেন, তাহাদের রাজ্য তেমন বিস্তৃত ছিল না, তাহারা সমগ্র সমতটের অধিপতি ছিলেন। তাহার এই উক্তি প্রমাণ সহ নহে। খড়গ-নৃপতিগণের ভূমিদান বিষয়ে এই তাম্রশাসন হইতে জানা যাইতেছে যে, তাহারা 'বিভিন্ন রাজ-কর্মচারীবৃন্দ জানাইয়া কিংবা রাজাদেশও প্রচারিত হয় নাই, কেবলমাত্র 'বিষয়পতি' এবং 'কুটুম্ব' গণকেই দানের বিষয় বলা হইয়াছে। এইজন্যই গঙ্গামোহন বাবু প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, খড়্গারাজগণের রাজ্য স্থানীয় কতকগুলি গ্রাম লইয়া সীমাবদ্ধ ছিল। তাম্রশাসনদ্বয়ের প্রাপ্তিস্থান এবং তাম্রশাসনোক্ত উল্লিখিত স্থানসমূহের পরিচয় হইতে এইরূপ অনুমান করা বোধ হয় সঙ্গত নহে যে, সুবর্ণগ্রাম (সোনারগাঁ) এবং ভাওয়ালের কতকাংশ লইয়াই খড়গরাজগণের রাজ্য বিস্তৃত থাকা সম্ভবপর। ইৎসিংয়ের সমতটের বর্ণনা হইতে ইহা অনুমিত হয় যে, সমতটের যিনি নৃপতি ছিলেন, তিনি বিশেষ ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন এবং সেই নৃপতি খড়গবংশোদ্ভব রাজরাজভট্ট যে নহেন, তাহ সুনিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। খড়গবংশীয় নৃপতিদের রাজধানী কোথায় ছিল তাহা আজ পর্যন্তও স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে ইহা বিশেষভাবে জানা গিয়াছে যে, তাহারা পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীবিক্রমপুরের সহিত তাহাদের কোনওরূপ সংশ্রব ছিল কিনা তাহাও জানা যায় না।

ডাঃ ভট্টশালী *"কর্মান্তকে" একটি নগরের নাম স্থির করিয়া 'কুসুমদেবকে' তথাকার* রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন এবং তিনি আসরফপুরের উৎকীর্ণ লিপিদ্বয়ের জয়-কর্মাণ্ড বাসক" এ কামতা শিলালিপির 'কর্মান্তকে' অভিন্ন স্থান বিবেচনা করিয়া, ইৎসিং কথিত সমতট রাজ্যের নৃপতি রাজরাজভট্ট এবং তাহার রাজধানী কর্মান্তনগরকে যে সমতটের রাজধানী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং কুমিল্লা যে কমলাঙ্ক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, কিছুতেই ইহা হইতে পারে না, কেননা 'শ্রীক্ষেত্র' বা শ্রীক্ষত্র-দেশ ত্রিপুরা জেলার অধিকাংশ

স্থান লইয়া বিস্তৃত, ইহাই পণ্ডিতগণ চিনা পরিব্রাজকগণের লিখিত বিবরণী হইতে নির্দেশ করিয়াছেন, অতএব সমতটের রাজধানীর সন্ধান করিতে হইলে অন্যদিকে অনুসন্ধান করিতে হইবে।[১১]

বিক্রমপুরের সমতট নগরী ঃ

আমি 'বিক্রমপুরের ইতিহাসের' প্রথম সংস্করণেও বলিয়াছি এবং এইবারও বলিতেছি যে, সমতট নামে একটি স্বতন্ত্র নগরী ছিল, তাহাই ছিল সমতট প্রদেশের রাজধানী। [১১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] সেই সমতট নগরী কোথায় ছিল?—রেনেলের দশম সংখ্যক মানচিত্রে সমকুট [somokoot] নামক একটি স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। বহু প্রাচীন কীর্তিকলাপের ধ্বংস-চিহ্ন সহ উহা কীর্তিনাশার বুকে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমাদের অনুমান হয় য়ে, এই 'সমকূটই' ছিল সমতটের রাজধানী সমতট নগরী। উহাই কালক্রমে 'সমকূট' নামে পরিণত হইয়াছিল। এই সমতটের রাজধানী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকগণ বিভিন্নরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। ফার্গুসনের মতে সোনারগাঁ বা সুবর্ণগ্রাম, ওয়াটার্সের মতে ফরিদপুর জেলার দক্ষিণাংশে [সমকূট বলা যাইতে পারে] কার্নিংহামের মতে যশোহরে সমতটের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে আমরা বিবিধ প্রমাণ-প্রয়োগ-বলে এবং তাম্রশাসনাদি হইতে এবং খোদিত লিপি হইতেও সমতটের অস্তিত্বের কথা জানিতে পারি। নারায়ণপাল দেবের 'ভাগলপুর লিপির' [৫০—৫৪ পংক্তি] সৎ সমতট জন্মা শুভদাস পুত্র শ্রীমান মংখদাস নামক শিল্পী-কর্তৃক ইহা উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ত্রিপুরা জেলার বাঘৌরা বা বাঘাউরা গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির পাদ-পীঠে সমুৎকীর্ণ মহীপাল দেবের রাজ্যসংবৎ সমন্বিত লিপিতেও সমতটের উল্লেখ আছে, "সমতটে বিলকীন্নকীয় পরম বৈষ্ণবস্য" ইত্যাদি। কিছুদিন হইল দ্বিতীয় গোপালদেবের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও শ্রীমদ্বিমল দাসেন মদ্যদাসস্য সূনুনা। ইদং শাসনমুৎকীর্ণং সৎসমতটজন্মনা লিখিত আছে। অর্থাৎ, সৎসমতট জন্মা মদ্যদাসের পুত্র শ্রীমান বিমল দাস কর্তৃক এই শাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে। 'মদ্যদাস' কে কেহ কেহ 'মন্মদাস' ও পড়িয়া থাকেন।[১২]

বিক্রমপুরের চন্দ্ররাজগণ

বিক্রমপুরের চন্দ্র ও বর্ম রাজবংশ ঃ

আমরা যখন "বিক্রমপুরের ইতিহাস" [প্রথম সংস্করণ] প্রকাশ করি, তখন দুইটি নূতন রাজবংশের পরিচয় জানিতে পারি নাই। এই দুইটি নূতন রাজবংশ হইতেছে—চন্দ্রবংশ ও বর্মবংশ। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রথম সংস্করণ ১৩১৬ সালে প্রকাশিত হয়, রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের 'গৌড় রাজমালা' ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হয়। স্বর্গত বন্ধুবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "বাংলার ইতিহাস" প্রথম খণ্ড ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় এবং 'ঢাকার ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড ১৩২২ বঙ্গাব্দে বাহির হইয়াছিল। কাজেই রমাপ্রসাদ বাবু, রাখাল বাবু এবং যতীন্দ্রবাবুর ও স্বর্গত 'বিশ্বকোষ' সঙ্কলিয়তা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ডে' চন্দ্র-রাজ বংশ ও বর্ম রাজবংশের উল্লেখ করিতে পারিয়াছেন, আমার পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয় নাই। এ প্রসঙ্গে রাখালবাবু বলেন,—খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দীতে যখন গৌড়-বঙ্গ-মগধ বারংবার বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইতেছিল, তখন বঙ্গে দুইটি নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে তিন খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজবংশদ্বয়ের কথা জনসমাজে সুপরিচিত করিয়াছে। নূতন রাজবংশদ্বয় বর্মবংশ ও চন্দ্রবংশ নামে পরিচিত হইয়াছে।"

ইদিলপুর ও রামপাল লিপি ঃ

"ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা চন্দ্ররাজগণ প্রসঙ্গে লিখিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"কোনও সময়ে কিরূপ ঘটনাচক্রের মধ্যে বঙ্গ পাল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। বরেন্দ্র ও মগধে মহীপাল দেবের সমর-বিজয় যাত্রার সুযোগেই সম্ভবত চন্দ্রদ্বীপের সামন্তরাজ শ্রী হরিকেন বা পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিয়া পাল রাজগণের সংশ্রব ছিন্ন করিয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রে তাম্রশাসনে যে রাজমুদ্রা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পালগণের রাজমুদ্রা। সুতরাং, ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, 'চন্দ্ররাজগণ পালরাজগণের সামন্ত রাজা ছিলেন।" এ-প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করিব।

পূর্বে জনসাধারণ, সেনরাজবংশের রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর ছিল তাহাই জানিত। কিন্তু শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন তিনখানি আবিষ্কারের পর বিক্রমপুর অঞ্চলে যে চন্দ্রবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রবংশীয় নৃপতিদের আজ পর্যন্ত তিনখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। একখানি তাম্রশাসন ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী ইদিলপুর নিবাসী কোনও জমিদারের গৃহে আছে। স্বর্গত গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয় তাহার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা 'ঢাকা রিভিউ' [১৯১২ সালের অক্টোবর সংখ্যায়] পত্রিকায় মিঃ জে. টি. র‍্যাঙ্কিন কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ র‍্যাঙ্কিনের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। ইনি প্রথম জীবনে ঢাকা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, পরে ঢাকা বিভাগের কমিশনার হন। র‍্যাঙ্কিন সাহেব ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। বিলাত হইতে বিখ্যাত ভাওয়াল মামলার সাক্ষ্য দিতে আসিয়া কলিকাতা নগরীতে তাহার মৃত্যু ঘটে। র‍্যাঙ্কিন সাহেবের প্রবন্ধ হইতে জানা যায় এবং লস্কর মহশয়ের ক্ষুদ্র টীকাকারে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতেও জানা গিয়াছে যে, তিনি ইদিলপুরের তাম্রশাসনখানির ছাপ মাত্রই আনিতে পারিয়াছিলেন; মূল ফলকখণ্ড স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে কোনও প্রকারেই হস্তগত করিতে পারেন নাই। একান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এই তাম্রশাসনখানি এখনও অপঠিত অবস্থায় ইদিলপুরের একটি উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত জমিদার-ভবনে রক্ষিত আছে। এই তাম্রশাসনখানি (১) **'ইদিলপুর লিপি'** নামে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। অপর লিপিখানি (২) **রামপাল লিপি** [Rampal Copperplate of Sri Chandra] নামে পরিচিত। এই লিপিখানির উদ্ধারকর্তা এবং ইহার পাঠোদ্ধার-কার্য ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। (৩) **কেদারপুর লিপি**, এই লিপিখানি দক্ষিণ বিক্রমপুরের কেদারপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই তিনখানি লিপির বিষয়েই আমরা আলোচনা করিব।

বিক্রমপুরের ইতিহাসের দিক দিয়া চন্দ্রবংশীয় নৃপতিদের তাম্রশাসনের মূল্য খুব বেশি। আমরা প্রথমে রামপালে প্রাপ্ত লিপিখানার বিষয় বলিতেছি। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের ভাষায় তাম্রশাসনখানির প্রাপ্তির ইতিহাস বলিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন ঃ 'বঙ্গের বর্মরাজবংশের ও সেনরাজবংশের রাজধানী বিক্রমপুর অঞ্চলে মধ্যযুগের বঙ্গেতিহাস—সঙ্কলনোপযোগী তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভব করিয়া, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি আমাকে [বর্তমান সালের গ্রীষ্মবকাশে] পূর্ববঙ্গে পরিভ্রমণ করিতে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। সেই উপদেশ-ক্রমে আমি রাজসাহি হইতে জন্মভূমি ঢাকা নগরীতে আসিয়া বিগত ২৯শে এপ্রিল ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে [১৬ বৈশাখ ১৩২০] তারিখে, কতিপয় বন্ধুসহ তথ্যানুসন্ধানে বহির্গত হই। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী মুন্সিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পঞ্চসার গ্রাম নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত [বর্তমানে স্বর্গত] যোগীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তদীয় অনুজ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের নিকট শুনিতে পাই যে, সেই গ্রামনিবাসী "যদুনাথ বণিক্যের বাড়িতে বহু বৎসর যাবত একখণ্ড তাম্রশাসন যত্নসহকারে রক্ষিত হইতেছে,—এপর্যন্ত কেহই তাহার পাঠোদ্ধার

করিতে সমর্থ হন নাই।" এই সন্ধান লাভ করিয়া, আমরা বণিক্য-বাড়িতে গিয়া, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে তাম্রফলকখানি ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। যদুনাথের নিকট শুনিয়াছি যে, প্রায় ৭৫/৭৬ বৎসর পূর্বে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রামপাল নামক স্থানে কোনও এক মোসলমান মৃত্তিকা খনন করিবার সময় এই তাম্রপট্ট প্রাপ্ত হইয়া, যদুনাথের পিতা স্বর্গীয় জগবন্ধু বণিক্যকে প্রদান করিয়াছিল। জগবন্ধু প্রায় ৪৫/৪৬ বৎসর নিজগৃহে উহা সযত্নে রক্ষা করিয়া, পরলোক প্রাপ্ত হইলে, তদীয় পুত্র যদুনাথ বিগত ৩০ বৎসর যাবত পিতৃদেবের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই তাম্রশাসনখানি ভক্তি-সহকারে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। ইহা এখন বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।"

লিপি-পরিচয় ঃ

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারের ভারও বসাক মহাশয়ের উপর ন্যস্ত করেন। কালপ্রভাবে যদিও তাম্রফলকখানির কোনও অনিষ্ট হয় নাই, তথাপি প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে যদুনাথ বণিক্য উহার অক্ষর-পাঠে সুবিধা হইবে মনে করিয়া তাম্রফলকখানির উপরে তাম্র-দ্রাব অর্থাৎ [নাইট্রিক এ্যাসিড] প্রয়োগ পূর্বক তাম্রফলকের উভয় পার্শ্ব সংঘর্ষণ করিয়া কোনও কোনও স্থানের অক্ষর বিলোপের সহায়তা করিয়াছিল। এই তাম্রশাসনখানির আয়তন ৯১/২ ৮ ইঞ্চি। ইহার শীর্ষদেশে [মধ্যস্থলে] একটি রাজমুদ্রা সংযুক্ত আছে। তন্মধ্যে " শ্রী —শ্রীচন্দ্র দেবঃ" এই নামটি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। রাজার নামের উপর বৌদ্ধমত বিজ্ঞাপক "ধর্ম-চক্র-মুদ্রা।" ধর্মচক্রের উভয় পার্শ্বে সমাসীন দুইটি মৃগমূর্তি। রাজার নামের নিম্ন ভাগে [মধ্যস্থলে] অর্ধচন্দ্র চিহ্ন;—তাহার উভয়পার্শ্বে ও নিম্নভাগে ফুলপাতার সাজ। এই রাজবংশ চন্দ্রবংশীয় ছিল বলিয়াই, রাজকীয় মুদ্রায় অর্ধচন্দ্র মূর্তির লাঞ্ছন সংযুক্ত হইয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য, পাল-রাজগণের তাম্রশাসনেও উভয় পার্শ্বে মৃগ-মূর্তি-লাঞ্ছিত এই প্রকার "ধর্ম-চক্র-মুদ্রা" সংযুক্ত আছে। এই তাম্রশাসনের প্রথম পৃষ্ঠায় ২৮ পংক্তিতে এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ১২ পংক্তিতে পদ্য-গদ্য-ময় সংস্কৃত ভাষায় রচিত দানলিপি উৎকীর্ণ আছে। এই তাম্রফলকটি ৫০টি পংক্তিতে পূর্ণ। প্রথম পৃষ্ঠায় ১৩ পংক্তি পর্যন্ত আটটি শ্লোকে রাজকবি নিজ প্রভুর বংশ বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপর ৩৪ পংক্তি পর্যন্ত লিপির গদ্যাংশ, এবং সর্বশেষে ধর্মানুশংসী শ্লোক পঞ্চক। তাম্রশাসন-সম্পাদন সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লিখিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে,—রাজা ["স্ব-হস্ত-কাল সম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্"] তাম্রশাসনে নিজ স্বাক্ষর ও সন-তারিখ সংযুক্ত করিবেন; —কিন্তু এই তাম্রশাসনে সন-তারিখ সন্নিবিষ্ট হয় নাই, এবং রাজার কিংবা তাহার কোনও প্রধান কর্মচারীর স্বাক্ষরও ইহাতে সংযুক্ত দেখা যায় না। লিপিকরের-শিল্পীর নামোল্লেখের অভাবও পরিদৃষ্ট হইতেছে। যে অক্ষরে এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের বঙ্গাক্ষর বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুকৌশলে উৎকীর্ণ হইলেও স্থানে স্থানে লিপিকরের বা শিল্পীর অনবধানতায় কিছু কিছু ভ্রম-প্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে। কোনও কোনও স্থানে অবগ্রহচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। [৪র্থ ২১, ৩১ পংক্তি] কোনও কোনও স্থানে হয় নাই [১ম, ৭ম, ৩০শ পংক্তি] রেফ-সংযোগে ষ, হ, প্রভৃতি কতিপয় বর্ণ ভিন্ন প্রায় অনেক ব্যঞ্জন বর্ণেরই দ্বিত্ব সাধিত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন রামপাল নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া, ইহা "রামপাল-লিপি" নামে অভিহিত হইল।

স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার বলেন—The *characters* are a type of Northern Nagari which is allied to the alphabet found in the copper-plates of the Later Palas and was current in North-eastern India towards the close of the tenth and begining of the eleventh century A. D. The *language* is Sanskrit.

বিক্রমপুর-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে, ধর্ম-চক্র-মুদ্রা-সংযুক্ত এই তাম্রশাসন সম্পাদিত করাইয়া চন্দ্রবংশীয় পরম সৌগত, মহারাজাধিরাজ শ্রীমত্রৈলোক্যচন্দ্র দেবপাদানুধ্যাত, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ শ্রীমান শ্রীচন্দ্রদেব [১৫-১৬ পংক্তি মক্করগুপ্তের প্রপৌত্র, বরাহগুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গল গুপ্তের পুত্র, শান্তি-বারিক পীতবাস গুপ্ত-শর্মাকে [ভগবান বুদ্ধ ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া] মাতাপিতার ও নিজের জন্য পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত [২৬-৩১ পংক্তি] সমস্ত রাজা-পাদোপ-জীবী ও অন্যান্য প্রজাবর্গকে বিজ্ঞাপিত করিয়া, যাবচ্চন্দ্র সূর্য ও ক্ষিতি সমকাল পর্যন্ত, যথাবিধি উদক-স্পর্শ পূর্বক পৌণ্ড্র-ভুক্তির অন্তঃপাতী নান্যম-মণ্ডলস্থিত নেহকাষ্ঠি গ্রামে পাটক পরিমিত ভূমি দান করিয়াছিলেন।

আমরা এখানে শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনের প্রশস্তি-পাঠ মুদ্রিত করিলাম। এই পাঠ ডাঃ বসাক মহাশয়ের কৃত। ডাঃ বসাক মহশয় ১৩২০ সনের শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যার 'সাহিত্য' মাসিক পত্রে এবং পরে Epigraphia Indica Vol. XII, PP. 836-42-চিত্র-সহ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচন্দ্রদেবের এই তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধারের পর ঐতিহাসিকগণ নানারূপ বিতর্ক এবং আলোচনা করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক না কেন, আমরা এই লিপি হইতে যেরূপ ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতেছি, তাহা দ্বারা ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, চন্দ্রবংশীয় রাজগণের রাজধানী শ্রীবিক্রমপুরে অবস্থিত ছিল।

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্র-শাসন

প্রশস্তি-পাঠ[১৩]

(সম্মুখের পৃষ্ঠা)

১। ওঁ স্বস্তি
বন্দ্যো জিনঃ স ভগবান করুণৈ-[ক]-পাত্রং
ধর্ম্মোপ্য সৌ

২। বিজয়তে জগদেক—দীপঃ।
যৎ-সেবয়া-সকল এব মহানুভাবঃ
সং

৩। সার-পার মুপ গচ্ছতি। ভিক্ষু—সঙ্ঘঃ।। [১।।]
চন্দ্রাণামিহ রোহিতা—[গি] র শ্বি (?) ভুজাম্বঙশে

৪। বিশাল-শ্রিয়া
স্বিখ্যাতো ভুবি পূর্ণ্ণ চন্দ্র-সদৃশঃ শ্রীপূর্ণ্ণ চন্দ্রোহভবৎ
অর্চ্চা

৫। নাম্পদ—পীঠিকাসু পঠিতঃ সন্তানিনামগ্রত—
ষ্টঙ্কোৎকীর্ণ্ণ—নবপ্রশস্তিষু জয়-স্তম্ভেষু তাম্রেষুচ।। [২।।]

৬। বুদ্ধস্য যঃ শ—
শক-জাতক-মঙ্ক সংস্থং
ভক্ত্যা বিভর্ত্তি ভগবানমৃতা করাণ্ডশুঃ।
চন্দ্রস্য তস্য কুল-জাত ইতীব বৌদ্ধ [ঃ]
পুত্রঃ

৭। শ্রুতো জগতি তস্য **সুবর্ণ চন্দ্রঃ**।। [৩।।]
[দর্শে] স্য মাতা কিল দোহদেন
দিদৃক্ষমাণোদয়িচন্দ্র—বিম্বং।

৮। সুবর্ণ-চন্দ্রেণ হি তোষিতেতি
সুবর্ণ চন্দ্রং সমুদাহরন্তি।। [৪।।]
পুত্রস্তস্য পবিত্রিতোভয়-কুলঃ কৌলীন—

৯। ভীতাশয়ে—
স্ত্রৈলোক্য বিদিতো দিশামতিথিভি **স্ত্রৈলোক্যচন্দ্র** গুণৈঃ

১০। রা—জ-ককুদ-চ্ছত্র-স্মিতানাং শ্রিয়াং
যশ্চন্দ্রোপপদে বভূব নৃপতি দ্বীপে দিলীপোপমঃ।। [৫।।]
জ্যোৎস্নেব চন্দ্রস্য

১১। শচীব জিষ্ণো
গৌগ্ রী হরস্যেব হরেরিব শ্রীঃ।
তস্য প্রিয়া কাঞ্চন-কান্তি রাশী
চ্ছ্রী (শ্রী) কাঞ্চনেত্যঞ্চিত-

১২। শাসনস্য।। [৬।।]
স রাজ-যোগেন শুভে মুহূর্তে
মৌহূর্ত্তিকৈঃ সূচিত রাজ-চিহ্নং।
অবাপ তস্যাং তনয়ং

১৩। নয়জ্ঞঃ
শ্রীচন্দ্রমিন্দ (ন্দু) পমমিন্দ্র—তেজাঃ।। [৭।।]
একাতপত্রাভরণাং ভুবং যো
বিধায় বৈধেয় জনাবিধে—

১৪। য়ঃ।
চকার কারাসু নিবেশিতারি—
র্যশঃ-সুগন্ধীনি দিশাং মুখানি।। [৮।।]
স খলু শ্রী বিক্রমপু—

১৫। **র-সমাবাসিত—শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবারাৎ পরম-সৌগতো**
মহারাজাধিরাজ-শ্রীমত্রৈলোক্য চন্দ্র দে

১৬। **ব-পাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরম-ভট্টারকো মহারাজধিরাজঃ**
শ্রীমান শ্রীচন্দ্রদেব কুশঃ—

১৭। লী।। শ্রী পৌণ্ড্র- ভুক্ত্য-ন্তঃপাতি-নান্যমণ্ডলে।
নেহকাষ্টি-গ্রামে পাটক-ভূমৌ।। সমুপগতাশে—

১৮। য—রাজপুরুষ-রাজ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্য
—মহব্যূহপতি-মণ্ডলপতি মহাসান্ধি—

১৯। বিগ্রহিক। মহসেনাপতি। মহাক্ষপটলিক।
মহাসর্ব্বাধিকৃত। মহাপ্রতীহার। কোট্টপাল। দৌঃ

২০। সাধ-সাধনিক। চৌরোদ্ধরণিক। নৌবল হস্ত্যশ্ব-গো
মহিষাজাবিকাদি-ব্যাপৃতক। গৌল্মিক শৌ-

২১। ল্কিক-দাণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষয়পত্যাদি (ত্যাদি)
১
নন্যাংশ্চ সকল-রাজ-পাদো [প] জীবনোহধ্যক্ষ প্র-[১৪]
২

২২। চারোক্তানিহাকীর্ত্তিতান। চাটভ [ট] জাতীয়ান্
ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মান—

২৩। য়তি বোধয়তি সমাদিশভি চ। মতমস্ত্ত ভবতাং।
যথোপরি-লিখিত ভূমিরিয়ং। স্ব-সীমাবচ্ছী (চ্ছি)

২৪। ন্না। তৃণ-পূতি-গোচর-পর্য্যন্ত। সতলা।
সোদ্দেশা। সাম্র-পনাসা। সগুবাক-নালিকেরা সলবণা স—

২৫। জল-স্থলা। সগর্ত্তোষরা সদশাপরাধা। সচৌরোদ্ধরণা
পরিহৃত-সর্ব্বপীড়া অচাট-ভট-প্র—

২৬। বেশা অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যা। সমস্ত-রাজভোগ—
৩
কর-হিরণ্য-প্রত্যায়-সহিতা। শখল্য-(শাণ্ডিল্য) স্য (স) গো—

২৭। ত্রায় এ [র্ষি] প্রবরায়। মক্করগুপ্তস্য প্রপৌত্রায়
বরাহগুপ্ত-পৌত্রায়
সুমঙ্গলগুপ্তস্য পুত্রা—

২৮। য়। শান্তি-বারিক—শ্রীপীতবাসগুপ্তশর্ম্মণে।
বিধিবদুদক-পূর্ব কং কৃত্বা
৪
কোটিহোমি (?) দগ (ঙ্গ)
[পশ্চাতের পৃষ্ঠা]
৫

২৯। তবতে ভগবন্তং বুদ্ধভট্টা [র] কমুদ্দিশ্য
মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ
৬

৩০। পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে। আচন্দ্রার্ক্ক [?] ক্ষিতিসমকালং
৭
যাবৎ ভূমি [চ্ছি]—

৮

৩১। দ্র-ন্যায়েন। শ্রীমদ্ধর্ম্ম [চ] ক্র-মুদ্রয়া
তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ অতো ভবদ্ভিঃ সর্বৈঃ

৩২। রানুমন্তব্যং। ভাবিভিরপি ভূপতিভির্ভূমের্দ্দান-ফল

৯

গৌরবাদপরহরণে মহা-নরক-পা—

৩৩। ত—ভয়াচ্চ দানমিদমনুমোদ্যানুপালনীয়ম্ [প্র]
তিবাসিভিঃ ক্ষেত্রকরাং (রৈ) শ্চাজ্ঞাশ্রাবণ-বিধে

১০

৩৪। য়ী-ভূ [য়] যথোচিত-প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য্য ইতি।।
ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ।।

ভূমিং যঃ

৩৫। প্রতিগৃহ্নাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি [।]
উভৌ-তৌ-পুণ্য-কর্ম্মাণৌ-নিয়তং স্বর্গ গামিনৌ।।

ষষ্টিম্বর্ষ-সহস্রা—

৩৬। নি স্বগ্র্গে মোদতি ভূমিদঃ।

১১

আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকং বসেৎ [ত্]
স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো হ-

৩৭। রেত বসুন্ধরম্।

১২

স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ [সহ পচ্যতে]।।

১৩

বহুভি র্ব [সু] ধা দত্তা রাজভিঃ সগ—
রাদিভিঃ [।]
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলম্।।

১৪

ইতি কমল-দা (দ) [লা] ম্বু-বিন্দু-লোলাং

৩৯। শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।
সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা
ন হি পুরুষৈঃপর—

১৫

৪০। কীর্ত্তয়ো বি [লো] প্যাঃ।।

বঙ্গানুবাদ

১। করুণার একমাত্র আধার, বন্দনার্হ সেই ভগবান (১) জিন [বুদ্ধদেব] এবং জগতের একমাত্র দীপ-সদৃশ তাহার ধর্ম (উভয়েই) বিজয়-লাভ করুন। সকল মহানুভব ভিক্ষু-সংঘই তাহাদের [বুদ্ধ ও ধর্মের] সেবা করিয়া সংসার [সাগর] পারে উপস্থিত হন।

২। বিপুল লক্ষ্মীক, রোহিত .... ভোগকারী, চন্দ্রদিগের বংশে, পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ পূর্ণচন্দ্র-নামক [ব্যক্তি] পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রতিমার পাদপীঠিকাতে সন্তানির অগ্রভাগে এবং টঙ্কোৎকীর্ণ (২) নব-প্রশস্তি-সমন্বিত জয়স্তম্ভে ও তাম্রপট্টে তাহার নাম পঠিত হইত।

৩। যে ভগবান অমৃত-রশ্মি [চন্দ্রমা] ভক্তিবশত [বুদ্ধস্য] বুদ্ধরূপী শশক-শিশুকে (৩) অঙ্কে ধারণ করিতেছেন,—সেই [চন্দ্রমার] কুল-জাত বলিয়াই যেন তাহার [পূর্ণচন্দ্রের] পুত্র সুবর্ণচন্দ্র জগতে (৪) "বৌদ্ধ" বলিয়া বিশ্রুত ছিলেন।

৪। (৫) জনশ্রুতি এইরূপ যে, এক (৬) অমাবস্যা-রজনীতে তাহার [সুবর্ণচন্দ্রের] মাতা [গর্ভাবস্থায়] (৭) স্পৃহাবশত উদয়ি-চন্দ্র বিম্ব-দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে [স্বামী কর্তৃক] সুবর্ণ নির্মিত চন্দ্র দ্বারা পরিতোষিতা হইয়াছিলেন,—এই নিমিত্ত লোকে [তাহার পুত্রকে] সুবর্ণ-চন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিত।

৫। [মাতৃ-পিতৃ] উভয়-কুল-পাবন, [সুবর্ণ-চন্দ্রের] পুত্রের অপবাদ-ভীরু (৮) গুণাবলী চতুর্দিকে অতিথিরূপে ভ্রমণ করিত বলিয়া, সেই পুত্র ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে বিদিত হইয়াছিলেন। হরিকেল-রাজ্যের (৯) রাজ-চিহ্নসূচক পুত্র যে রাজ্যলক্ষ্মীর হাস্যরূপে উদ্ভাসিত হইত, সেই রাজলক্ষ্মীর আধার, দিলীপোপম এই পুত্র চন্দ্রদ্বীপে (১০) 'নৃপতি' হইয়াছিলেন।

৬। চন্দ্রের কান্তা জ্যোৎস্না, (১১) ইন্দ্রের কান্তা শচী, হরের কান্তা গৌরী এবং হরির কান্তা স্ত্রীর ন্যায়, পূজিত-শাসন এই নৃপতিরও শ্রীকাঞ্চনা-নাম্নী কাঞ্চন-কান্তি কান্তা ছিলেন।

৭। ইন্দ্রতেজা নীতিজ্ঞ এই নৃপতি [ত্রৈলোক্যচন্দ্র] (১২) রাজযোগোপলক্ষিত শুভ মুহূর্তে প্রিয়ার [শ্রীকাঞ্চনার] গর্ভে (১৩) জ্যোতিষিক-সূচিত-রাজ-চিহ্নধারী ইন্দুপম তনয় শ্রীচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৮। মূর্খ-জনের অবাধ্য (১৪) এই [শ্রীচন্দ্র] রাজ্যকে একতাপত্র সুশোভিত করিয়া এবং অরিগণকে কারা-নিবদ্ধ করিয়া দিঙ্মণ্ডল যশ-সৌরভে আমোদিত করিয়াছিলেন।

শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত (সংস্থাপিত) জয়স্কন্ধাবার হইতে—মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেব পাদানুধ্যাত, পরমসৌগত (বৌদ্ধ), পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ, কুশলময়; সেই শ্রীমান শ্রীচন্দ্রদেব—শ্রীপৌণ্ড্রভুক্ত্যন্তঃপাতী—নান্য-মণ্ডলে, নেহকাষ্ঠি গ্রামে পাটক-পরিমিত ভূমিতে, সমুপগত—(সংবিদিত) সমস্ত (১৬) রাজপুরুষদিগকে রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজমাতা, (১৭) মহাব্যূহপতি, (১৮) মণ্ডলপতি, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহাক্ষপটলিক (লেখ্যরক্ষক), (১৯) মহা-সর্বাদিকৃত মহাপ্রতীহার (~~দৌবারিকশ্রেষ্ঠ~~), (২০) কোট্টপাল (দুর্গ-রক্ষক), দৌঃসাধ-সাধনিক (দ্বারপাল বা গ্রামপরিদর্শক) চৌরোদ্ধরণিক (দস্যু-তস্করাদির হস্ত হইতে উদ্ধারক পুলিশকর্মচারীবিশেষ) নৌবল-ব্যাপৃতক (নৌ-সেনাধিকৃত পুরুষ) হস্তিব্যাপৃতক (গজাধ্যক্ষ), অশ্ব-ব্যাপৃতক (অশ্বাধ্যক্ষ), গো-ব্যাপৃতক (মেষ প্রভৃতির অধ্যক্ষ) 'গৌল্মিক ('গুল্ম' নামক সেনামণ্ডলীর অধিনায়ক, (২১) শৌল্কিক (শুল্ক-সংগ্রহকারী), দাণ্ডপাশিক (বধাধিকৃতক পুরুষ), দণ্ডনায়ক (চতুরঙ্গবলাধ্যক্ষ) বিষয়পতি (জেলাধিপতি)

প্রভৃতি [রাজকর্মচারীদিগকে] এবং অধ্যক্ষ-প্রচারোক্ত (অধ্যক্ষতালিকাভুক্ত) কিন্তু বর্তমানশাসনে [পৃথক্ ভাবে] অনুল্লিখিত অন্যান্য সমস্ত রাজপাদোপজীবীদিগকে, চাট-ভাট-জাতীয়গণকে ক্ষেত্রকরদিগকে এবং ব্রাহ্মণোত্তমদিগকে, যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, বিজ্ঞাপন করিতেছেন, এবং ব্রাহ্মণোত্তমদিগকে, যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, বিজ্ঞাপন করিতেছেন, এবং আজ্ঞা করিতেছেন। [নিম্নোল্লিখিত বিষয়ে] আপনাদের সকলের অভিমত হউক। যথা, স্বসীমাবচ্ছিন্ন, তৃণপূতিগোচর পর্যন্ত, সতল, সোদ্দেশ আম্র-পনস-গুবাক-নারিকেল-বৃক্ষ সমেত, (২২) লবণোৎপাদক ভূমিসহ, জল-স্থল-গর্ত-উষর ভূমির সহিত, যাহার (অর্থাৎ যে ভূমি সম্বন্ধে প্রতিগ্রাহীতার) দশটি অপরাধ (রাজার) সহ্য হইবে, সচৌরোদ্ধরণা, সর্বপ্রকার করাদি গৃহীত হইবে না (অর্থাৎ নিষ্কর করিয়া) রাজপ্রাপ্য কর ও হিরণ্যাদি [সর্বপ্রকার] আয়ের সহিত, উপরি-লিখিত এই ভূমি মঙ্করগুপ্তের প্রপৌত্র বরাহ গুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গলগুপ্তের পুত্র, শাণ্ডিল্য (?) সগোত্র, ত্র্যর্ষিপ্রবর, (২৩) শান্তি-বারিক, (২৪) কোটি-হোম-সম্পাদনকারী (?) শ্রীপীতবাস গুপ্তশর্মাকে যথাদিধি উদক-স্পর্শ পূর্বক ভগবান বুদ্ধ-ভট্টারককে উদ্দেষ করিয়া, পিতা-মাতার এবং নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য, যাবৎ-সূর্য-চন্দ্র, এবং ক্ষিতিসমকাল-পর্যন্ত, ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়ানুসারে শ্রীমদ্-ধর্মচক্র-মুদ্রাদ্বারা তাম্রশাসন করিয়া প্রদান করিলাম। অতএব, আপনারা সকলেই ইহার অনুমোদন করুন। ভাবি ভূপতিগণও ভূমিদান-ফল-গৌরব ও তদপহরণে মহানরক-পাত ভয় [স্মরণ করিয়া] এই দান অনুমোদনপূর্বক পরিপালন করিবেন, এবং প্রতিবাসী ক্ষেত্রকরগণও এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া যথোচিত প্রত্যায় [প্রতিগ্রহীতার নিকট] নিকট উপস্থিত করিবে। এই অভিপ্রায়ে ধর্মানুশাসনের শ্লোকও আছে [যথা]—

১। যিনি ভূমির প্রতিগ্রহ করেন, এবং যিনি ভূমি-দান করেন, তাহারা উভয়েই পুণ্যকর্মা এবং উভয়েই নিয়ত স্বর্গগামী হন।

২। ভূমিদাতা যষ্টি-সহস্র বৎসর স্বর্গভোগ করেন, এবং ভূমির অপহর্তাও [অপহরণের] অনুমোদনকারী তৎপরিমিত কাল নরকে বাস করেন।

৩। ভূমি স্বদত্তই হউক, আর পরদত্তই হউক, যিনিই ইহা হরণ করিবেন, তিনিই বিষ্ঠার (২৫) কৃমি হইয়া পিতৃগণ সহ পচিতে থাকিবেন।

৪। সগরাদি অনেক নৃপতিগণ ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যখন যাহার (যে নৃপতির) ভূমি, তখন [ভূমিদানের] ফল তাহারই হইয়া থাকে।

৫। লক্ষ্মীকে এবং মনুষ্য-জীবনকে পদ্ম-পত্রস্থিত জলবিন্দুবৎ চঞ্চল মনে করিয়া, এবং [উপরি] উদাহৃত সমস্ত বিষয় স্মরণ রাখিয়া কোনও ব্যক্তিরই পরকীর্তির লোপসাধন কর্তব্য নয়। (২৬)।।

(১) *জিন*— "সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান মারজিৎ লোকজিৎ জিনঃ।। ইত্যমরঃ।
এই শ্লোকে রাজকবি বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘাখ্য ত্রি-রত্নের উল্লেখ করিয়া নিজ প্রভুকে বৌদ্ধমতালম্বী বলিয়া সূচিত করিয়াছেন।

(২) অর্চ্চা—প্রতিমা। "টঙ্কঃ পাষাণ-দারণঃ ইত্যমরঃ। "টঙ্কৈমনঃ শিলগুহেব বিদার্য্যমাণা" ইতি মৃচ্ছকটিকে ১/২০ "পীঠমাসনম্" ইতি চামরঃ সন্তানি-শব্দ পারিভাষিক বলিয়া বোধ হয়।

(৩) বুদ্ধদেব শশকরূপে একবার ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এইরূপ এক পৌরাণিক কাহিনী বৌদ্ধ-জাতকমালায় বর্ণিত আছে। যব-দ্বীপের বোর-বুদুরের স্থাপত্য-শিল্পে বুদ্ধদেবের "শশক-জাতক" উৎকীর্ণ রহিয়াছে। "Monumental Java" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(৪) সুবর্ণচন্দ্রকুলজাত, এবং চন্দ্রের সঙ্গে বুদ্ধদেবের [উপর্য্যুক্ত টীকাতে উল্লিখিতরূপে] সম্বন্ধ আছে-এই নিমিত্তই লোকে সুবর্ণচন্দ্রকে "বৌদ্ধ" বলিত।

(৫) কিল—ঐতিহ্যে।

(৬) দর্শ—"অমাবাস্যাত্বমাবস্যা দর্শঃ সূর্য্যেন্দুমসঙ্গম" ইত্যমরঃ। একত্র-স্থিতচন্দ্রার্ক-দর্শনাদ্দর্শ উচ্যতে।

(৭) দোহদ—"অথ দোহদং ইচ্ছাকাঙ্খা-স্পৃহেহা-তৃড্বাঞ্ছা-লিপ্সা-মনোরথঃ, কামোহভিলাযস্তর্ষশ্চ ইত্যমরঃ। গর্ভাবস্থায় স্পৃহার্থেই 'দোহদ' শব্দের প্রয়োগ। যথা, "প্রজাবতী দোহদ-শংসিনীতে"—রঘু, ১৪।৪৫। কিঞ্চ,—"যঃ কশ্চিদ্ গর্ভদোহদোহস্যাঃ সোহবশ্যমচিরাসম্পাদয়িতব্য ইতে"—উত্তর-চরিতে ১ম অঙ্ক।

(৮) "স্যাৎ কৌলীনং লোকবাদে" ইত্যমরঃ। যথা, [রঘু, ১৪।৮৪] "কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা নতেন বৈদেহসুতা, মনস্তঃ। নিন্দা-অর্থেপ্রয়োগ—[বঘু, ১৪।৩৬] "কৌলীনমাত্মাশ্রয়মচচক্ষে তেভ্যঃ পুনশ্চেদমুবাচ বাক্যম্।"

(৯) হরিকেল—বঙ্গের প্রাচীন নাম। "বঙ্গান্ত হরিকেলীয়া অঙ্গাশ্চম্পোলক্ষিতাঃ "ইতি হেমন্দ্রঃ। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র পরে বঙ্গরাজ হইয়াছিলেন বলিয়াই রাজকবি তাহার পিতাকে "হরিকেলরাজ ককুদচ্ছত্রস্মিতানাং শ্রিয়াং আধারঃ" রূপে বণ:না কবিয়া থাকিতে পারেন।

(১০) চন্দ্রদ্বীপ—মধ্যযুগে এই প্রদেশ বর্তমান বাকরগঞ্জ, খুলনা ও ফরিদপুর জেলার অংশ-বিশেষ লইয়াই সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মোগল-সাম্রাজ্যে এই চন্দ্রদ্বীপই 'বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ' পরগণা নামে অভিহিত হইত। বিশ্বকোষ (ষষ্ঠ ভাগ, ১৪৫ পৃঃ) ব্রজসুন্দর মিত্র প্রণীত "চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ" নামক গ্রন্থের প্রমাণে লিখিত হইয়াছে,—"বিক্রমপুর হইতে সমগত দনুজমর্দনদেবই চন্দ্রদ্বীপে প্রথম রাজা।" বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

(১১) জিষ্ণু—এই স্থলে ইন্দ্র-সমানার্থক। যথা, 'জিষ্ণুর্লেখর্ষভঃ শক্রঃ শতমন্যুর্দ্দিবস্পতিঃ ইতে ইন্দ্র-পর্যায়ে অমর। পুরুষোত্তম, সূর্য ও অর্জুন অর্থেও 'জিষ্ণু' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

(১২) রাজযোগ—গ্রহনক্ষত্রাদির যে শুভযোগ-সময়ে জন্ম-গ্রহণ করিলে ভূমিষ্ঠ শিশুকাল 'রাজা হইবে বলিয়া সূচিত হয়, সেই যোগকে 'রাজযোগ' বলে। 'শ্রীচন্দ্র' বঙ্গের 'রাজা' হইবেন ইহাই শ্লোকে ইঙ্গিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আপ্তের অভিধানে এই শব্দটি এই ভাবে ব্যাখ্যাত" —"a configuration of planets, asterisms etc. at the birth of a man. which indicates that he is destined to be a king.

(১৩) মৌহূর্ত্তিক— "সাংবৎসরো জ্যোতিষিকো দৈবজ্ঞ-গণকাবপি।
স্যুর্মৌহূর্ত্তিক-মৌহূর্ত্ত-জ্ঞানি-কার্ত্তান্তিকা অপি।।" ইত্যংরঃ।

(১৪) বৈধেয়—"অজ্ঞ-মূঢ়-যথাজাত মূর্খ-বৈধেয়-বালিশাঃ" ইত্যমরঃ। শ্রীচন্দ্র সর্বদাই পণ্ডিতমণ্ডল পরিবেষ্টিত থাকিতেন, এবং তাহাদেরই 'বিধেয়' ছিলেন।

(১৫) এ স্থলে কোনও 'অরি' সূচিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়না। হয়ত বর্ম-বংশের শেষ রাজাই শ্রীচন্দ্র কর্তৃক কারা-নিবদ্ধ হইয়া থাকিবেন; এবং বৌদ্ধ শ্রীচন্দ্র এই ঘটনার পরেই বঙ্গের রাজসিংহাসন বর্ম-রাজের হস্ত-ভ্রষ্ট করিয়া বিক্রমপুর রাজধানী হইতে রাজ্য-শাসন-পরিচালন আরম্ভ করিয়া থাকিবেন।

(১৬) 'মহাব্যূহপতি'—শব্দটি বেলাব লিপিতে ও হরিবর্মদেবের তাম্রশাসনেও পাওয়া গিয়াছে।

(১৭) মণ্ডলপাত—শব্দটি অশেষ-শ্রদ্ধা-ভাজন স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের "মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন" প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'মণ্ডল' শব্দ হইতে 'মহমাণ্ডলিক' শব্দ পারিবারিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বিশ্বে' মণ্ড-শব্দের বিবিধার্থ বিজ্ঞাপনার্থ যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সেকালের 'মণ্ডল' নামক বিভাগের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা দ্বাদশ রাজক নামক কথিত হইতে যথা,—

সাম্মণ্ডলে দ্বাদশ রাজকে চ।
দেশে চ বিম্বে চ কদাম্বকে চ।।

ভরত অমর ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মেদিনি কোষেও মণ্ডল "দ্বাদশ রাজক" বলিয়া উল্লিখিত আছে। মণ্ডলের শাসনকর্তা 'মণ্ডলেশ, "মণ্ডলাধিপতি "মণ্ডলেশ্বর" প্রভৃতি নামে কথিত হইতেন; অভিধানে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কামন্দকীয় নীতিসারে দেখিতে পাওয়া যায়, মণ্ডলাধিপেরও কাষদণ্ড অমাত্য মন্ত্রি দুর্গাদি সহায় ছিল। যথা,— সাহিত্য, ১৩২০ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

উপেতঃ কোষ দণ্ডাভ্যাং সামাতঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
দুর্গস্থ শ্চিন্তয়েৎ সাধু মণ্ডলং মণ্ডলাবিপঃ।।

ইহাই মণ্ডলাধিপতি "দুর্গস্থ" থাকিয়া মণ্ডল শাসন করিতেন বলিয়া পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মকৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম খণ্ডে [৮৬ অধ্যায়ে] দেখিতে পাওয়া যায়, "মণ্ডলেশ্বরের" পদমর্যাদা নৃপ-শব্দবাচক সাধারণ রাজ-রাজন্যকের পদমর্যাদা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। যথা—

চতুর্থোজন পর্য্যন্ত মধিকারং নৃপস্য চ।
যো রাজা তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বর।।

এই বচনের প্রমাণে মণ্ডলেশ্বরও "রাজ" পদবাচ্য ছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু তাহার অধিকার সাধারণ "রাজ" পদবাচ্য ব্যক্তির অধিকার অপেক্ষা শতগুণ অধিক ছিল। "মণ্ডলাধিপতিগণ" পমমেশ্বর পরম ভট্টাকর রাজাধিরাজের "সামন্ত" মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। সেকালের শাসন-ব্যবস্থায় রাজাধিরাজ "পরম ভট্টাকর" ছিলেন ; তাহার পরেই মণ্ডলাধিপতির স্থান নির্দিষ্ট ছিল।

মণ্ডলিক-শব্দ এই মণ্ডলাধিপতি শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। মধ্যযুগের গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে "মাণ্ডলিক" ও "মহামাণ্ডলিক" শব্দ যে সত্য সত্যই প্রচলিত ছিল, "রামচরিত" কাব্যের যে অংশের টীকা প্রাপ্ত হওয় গিয়াছে, তাহাতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। "কয়ঙ্গলীর মঙ্গলাধিপতি" প্রভৃতি রাজপুরুষণ [টীকায়] "সামন্ত" বলিয়া স্পষ্ট উল্লিখিত থাকায়, বুঝিতে পারা যায়—তৎকালে "মণ্ডলাধিপতিগণ বা "মাঙ্গলিকগণ" রাজাধিরাজ "সামন্ত" মধ্যেই পরিগণিত হইতেন।

(১৮) "মহাসর্বাধিকৃত"—শব্দটিও হরিবর্মার ও ঈশ্বর ঘোষের তাম্র-শাসনে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, 'সর্বাধিকারী' উপাধির সৃষ্টি, বোধহয় এই শব্দ হইতেই সাধিত হইয়া থাকিবে।

(১৯) 'কোট্টপাল' শব্দটি পৃথীপালগণের তাম্রশাসনে বহুবার পাওয়া গিয়াছে।

(২০) 'শৌল্কিক' শব্দটি আধুনিক 'Custom officer'-এর পদ-বিজ্ঞাপক বলিয়া প্রতিভাত হয়।

'সলবণা'—ভূমির এই বিশেষণটি বেলাব-লিপিতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উৎসৃষ্ট ভূমিখণ্ড সমুদ্র তীরবর্তী ছিল, ইহাই কি এই বিশেষণের সার্থকতা? আমাদেরও তাহাই মনে হয়।

(২১) 'শান্তি-বারিক'—যজ্ঞের শান্তি—জলাধিকৃত ব্রাহ্মণকে লক্ষিত করিয়া থাকিবে।

(২২) 'হোমি'—এই শব্দটি ঘৃত, জল, বতি ও চিত্রক-বৃক্ষ অর্থে প্রযুক্ত। এই স্থলে ইহার অনলার্থ গ্রহণ করিয়া 'কোটি-হোম'কে 'কোটি-হোমি'-সমানার্থক ধরা যাইতে পারে।

(২৩) 'ক্রিমি'—'কৃমি' রূপেও গঠিত হয়।

(২৪) এই ● কেন্দ্র-চিহ্নটি কি সূচিত করিতেছে, তাহা ঠিক বলা যায় না। লিপি-শেষ-বিজ্ঞাপক চিহ্নও হইতে পারে; ইহার দ্বারা বৌদ্ধ দিগের শূন্য-বাদও সূচিত হইয়া থাকিতে পারে। ইহা তাম্রশাসন সম্পাদন বিজ্ঞাপক শ্রীচন্দ্রের সাঙ্কেতিক স্বাক্ষর বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে।

শ্রীচন্দ্রদেবের কেদারপুরলিপি

আমরা রামপাল লিপির বিষয় বলিয়াছি, এইবার শ্রীচন্দ্রদেবের কেদারপুরের তাম্রশাসন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কেদারপুরের তাম্রশাসনখানি ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের যত্নে ও শ্রমে পাঠোদ্ধার হইয়াছে এবং জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে।

এই তাম্রফলকের পাঠোদ্ধারকারী এবং আবিষ্কারক ডাক্তার ভট্টশালী মহাশয় বলেন ঃ— তাম্রশাসনখানি শ্রীচন্দ্রদেবের তৃতীয় তাম্রশাসন। উহা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর মহকুমার অন্তর্গত কেদারপুর গ্রামে মৃত্তিকা-খনন-কালে পাওয়া গিয়াছে। কেদারপুর মধ্য-ইংরেজি স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উহা সংরক্ষিত হয়। আমি জনৈক বন্ধুর নিকট ইহা অবগত হই। ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জে. এন. রায়, আই-সি-এস ও মাদারিপুরের মহকুমা হাকিম মিঃ এন. সেন মহোদয়দ্বয়ের সৌজন্যে মাননীয় মিঃ টি ইমারসন, সি-আই-ই, আই-সি-এস মহোদয় কর্তৃক ঢাকা যাদুঘরের জন্য উহা সংগৃহীত হয়।

কেদারপুর লিপির পরিচয় ঃ

এই তাম্রশাসনখানি ৭$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৯$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি প্রস্ত, রামপালে প্রাপ্ত তাম্রশাসনখানি ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৮$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি প্রশস্ত, সুতরাং ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এই তাম্রফলকের শীর্ষদেশের ঠিক মধ্যভাগে চন্দ্র রাজগণের রাজকীয় মোহর অঙ্কিত আছে। ইহার উভয়পার্শ্বে দুইটি শায়িত উন্নত-শীর্ষ মৃগ "ধর্মচক্র" সূচনা করিতেছে এবং উহা ডিয়ার-পার্কের (মৃগদাব) কাশীর অন্তর্গত বর্তমান সারনাথের "ধর্মচক্রের প্রথম ঘূর্ণনের" নিদর্শনস্বরূপ। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, চন্দ্রদেবের পূর্ববর্তী বঙ্গের "পালবংশের" রাজগণেরও অনুরূপ মোহর ছিল এবং এই পালরাজগণও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এই চক্রের নিম্নদেশে 'চন্দ্রদেবের' নাম গ্রথিত আছে।

এই তাম্রশাসনখানি অসমাপ্ত এবং দেখিয়া বোধ হয় ইহার দ্বারা কোনও "দান" সম্পাদিত হয় নাই। ইহাতে কেবল দানের মঞ্জুরীকৃত অংশগুলি খোদিত হইয়া বক্রী অংশ অবস্থানুযায়ী অনুশাসন দ্বারা পূর্ণ করিবার অপেক্ষায় মুদ্রা-গৃহে সংরক্ষিত হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনখানি মুদ্রাকরের গুরুতর ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, কেদারপুর গ্রাম, যেখানে এই তাম্রফলকখানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেখানে প্রশস্ত পরিখা বেষ্টিত রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ

ও বিনষ্টপ্রায় এক বিশাল দির্ঘিকার চিহ্ন বর্তমান। দির্ঘিকাটি মোগল শাসনের প্রাক্কালে যে পরাক্রান্ত দ্বাদশ ভৌমিকগণ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছেন, তাহাদের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কেদাররায়ের স্মৃতির সহিত বিজড়িত।

এই তাম্রফলকের কেবল একদিক মুদ্রিত এবং নিম্নদেশে প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমিত স্থান শূন্য। ইহাতে ১৮ পংক্তি খোদিত লিপি আছে। এই অক্ষরগুলি ৩৪ হইতে ৪০ ইঞ্চি উচ্চ, এবং অধিকাংশ স্থলেই সুস্পষ্ট রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। অক্ষর-খোদাইকার বা লেখকের ভ্রম প্রচুর-পরিমাণেই পরিলক্ষিত হয় এবং তদ্দরুণ পরিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধারকার্যও বিষম কষ্টকর ব্যাপারে পর্যবসিত হইয়াছে।

এই অনুশাসনে চন্দ্ররাজ বংশোদ্ভব-শ্রীচন্দ্রদেবের রাজত্বের উল্লেখ আছে। উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে বর্ম ও সেন রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্বে ইহারা পূর্ববঙ্গে কতিপয়-শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহা দশম-একাদশ শতাব্দীর বাংলা অক্ষরে খোদিত। কেবল মুদ্রাকরের ভ্রমাত্মক অংশ ব্যতীত সমুদয় উৎকীর্ণ বিবরণটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় পদ্যে লিখিত। শেষ তিন পংক্তি গদ্যে লিখিত।

বর্ণাশুদ্ধি-বিদ্যা সম্বন্ধে ইহাতে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই। পূর্ব ভারতীয় গৃহগাত্রোৎকীর্ণ লিপিতে "র" -এর পরিবর্তে "ব"লেখাই একরূপ রীতি ছিল এবং আধুনিক বাংলা ভাষার ন্যায় এতদুভয়ের ব্যবহারে তখন কোনও বৈষম্য—করা হইত না। "অবগ্রহ" কখনও ব্যবহৃত কখনও বা পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনুস্বার সম্বলিত "নিস্ত্রিংশ" শব্দের বর্ণবিন্যাসে উল্লেখযোগ্য। (রেফ) অধিকাংশ স্থলেই ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিত্ব করিয়াছে।

"ঢাকা রিভিউ"-তে প্রকাশিত ইদিলপুরের শ্রীচন্দ্র দেবের তাম্রশাসনের সহিত বর্তমান তাম্রশাসনের তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উভয় তাম্রফলক একই মুসাবিদার প্রতিলিপি। ইদিলপুর তাম্রশাসনের শেষভাগে শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসন হইতে গৃহীত একটি শ্লোক অতিরিক্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত উহার প্রতিলিপি ইদিলপুর ও কেদারপুর তাম্রশাসন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এস্থলে ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, তিনখানি তাম্রশাসনেরই আবাহন-শ্লোক অভেদাত্মক।

এ পর্যন্ত চন্দ্ররাজগণের যে তিনখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার প্রত্যেক-খানিই শ্রীচন্দ্রের নামাঙ্কিত, কাজেই মনে হয় তিনিই চন্দ্র বংশের একমাত্র প্রতাপশালী রাজা; যিনি তাম্রশাসন প্রদানের অধিকারী ছিলেন। তাহার ইতিহাস সঙ্কলনের নিমিত্ত যে সমস্ত অনুলিপি উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা একত্র সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে 'ঢাকা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত বাবু গঙ্গামোহন লস্করের ইদিলপুর, অনুশাসনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে আবশ্যক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাম্রশাসনখানি এখনও বর্তমান আছে বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু উহা যাহাদের হেপাজতে আছে, তাহারা উহা অন্য কাহাকেও দেখাইতে অনিচ্ছুক।

"অনুশাসনে তিনজন রাজার নাম খোদিত আছে— (১) **সুবর্ণচন্দ্র**। (২) তাহার ছেলে **ত্রৈলোক্যচন্দ্র** (৩) ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র **(শ্রী) চন্দ্রদেব**। এই রাজাদের মধ্যে শেষোক্ত রাজা সতত **পদ্মাবতী ভুক্তির** অধীন কুমার তালিকা মণ্ডলে অবস্থিত লেলিয়া গ্রামে কতকগুলি জমিদানের আদেশ **বিক্রমপুর ছাউনি** হইতে প্রদান করেন। সতত পদ্মাবতীর আক্ষরিক অর্থ তীর সমাহিত পদ্মার ঘর এবং খুব সম্ভবত পদ্মার তীরে অবস্থিত কোনও ভুক্তির নাম ছিল। কোনও কোনও দানে গৃহীতার নাম এখনও পড়া যায় এবং আসরফপুর অনুশাসনের ন্যায় পরিমাপ কাঠিকে দানের ভূমির দ্রোণ এবং পাটক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সার্ব-ভৌমিকত্ব সূচক উপাধি, যথা—পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক এবং মহারাজাধিরাজ (শ্রী) চন্দ্রদেবের নামের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। পরম সৌগত (সৌগত বুদ্ধের পরম ভক্ত

পূজক) উপাধি দাতার নামের পূর্বে ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুশাসনের উর্ধ্বভাগের মোহর বঙ্গদেশের পালরাজাদের অনুশাসনের মোহরের অনুকৃতি।

মুসলমান কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইবার কিছু পূর্বে বৌদ্ধ রাজত্ব যে পূর্ববঙ্গে বর্তমান ছিল, আসরফপুরের দেবখড়গ অনুশাসনের ন্যায় বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত অনুশাসনখানি তাহার পরিচয় দেয়, তজ্জন্য এই অনুশাসনখানি অতি প্রয়োজনীয়।

অনুশাসনখানি একদিকে সম্পূর্ণভাবে খোদিত, বিপরীতদিকে কতকাংশ খোদিত। বিপরীত দিকের লেখা প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। লুপ্তপ্রায় অংশে দান-গৃহীতার নাম ও জমির পরিচয়। সর্বসাকুল্যে ৩৬ লাইন লেখা ইহাতে আছে।

পংক্তি ১-৪—সম্ভবত বুদ্ধের সম্মানের জন্য এক পংক্তি পদ্য।

পংক্তি ৪-৫—সুবর্ণচন্দ্র নামে এক রাজা যাহাকে অগ্নি দ্বারা পবিত্রীকৃত কিংবা তুলাদণ্ডে ওজন করা হয় নাই, যিনি প্রকৃতি কর্তৃক মহত্ব দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন, যাহার কার্যসকল সাধু ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

পংক্তি ৫-৬—রাজাকে কেন সুবর্ণচন্দ্র বলা হইত, ইহা পদ্যে বলা হইয়াছে।

পংক্তি ৬-৯— উপরিল্লিখিত রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, তিনি পবিত্র দর্শন ছিলেন—তাহার পরলোকের ভয় ছিল। তিনি জীব-জগতের সান্ত্বনা-স্বরূপ ছিলেন। ত্রিভুবনে তাহার যশস্বী কার্যাবলীসকল সর্বত্র বিদিত ছিল।

পংক্তি ৯-১০—সেই রাজা সম্বন্ধে আরও কতকগুলি শব্দ—তিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া আশা পূরণ করিয়াছিলেন। এবং তাহার শত্রুদের অগ্নি নির্বাপণ করিযাছিলেন।

পংক্তি ১১-১৩—ত্রৈলোক্য দেব সম্বন্ধে আরও কতকগুলি প্রশংসাসূচক (শব্দ) বাক্য।

পংক্তি ১৪-১৫—উপরিউল্লিখিত রাজার (শ্রী) চন্দ্র নামে এক পুত্র ছিল। তিনি ইন্দ্রের সমতুল্য ছিলেন এবং তাহার বীর্য ইন্দ্রের ন্যায় ছিল এবং তিনি শুভমুহূর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার জন্ম-সময়ে শুভ-চিহ্নসকল রাজৈশ্বর্য দ্যোতক ছিল।

পংক্তি ১৫-১৮—(শ্রী) চন্দ্রদেব সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশংসা-বাক্য।

পংক্তি ১৮-১৯—বিক্রমপুরস্থিত বিজয়-বাহিনী ছাউনি হইবে।

পংক্তি ২০—সৌগতের (বুদ্ধের ঐকান্তিক পূজক পরম ভট্টারক পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেবের পাদপদ্ম ধ্যানকারী পুত্র।

পংক্তি ২১—মহারাজাধিরাজ শ্রীমান শ্রীচন্দ্রদেব সুস্থ শরীরে লেলিয়া গ্রামে সমবেত নিম্নলিখিত রাজকীয় কর্মচারীবৃন্দকে ও গ্রামবাসীদিগকে সম্মান করিয়া—

পংক্তি ২২—সতত পদ্মভূক্তিতে অবস্থিত কুমার তালিকা মণ্ডলে।

পংক্তি ২২—এইরূপে উপরিউল্লিখিত কর্মচারীবৃন্দকে আদেশ দিতেছেন।

পংক্তি ২৯-৩০—দান গৃহীতাদের নাম লেখা আছে।

বর্তমান কেদারপুর অনুশাসনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই :—বৌদ্ধমতাবলম্বীদের ত্রিরত্ন বুদ্ধ, ধর্ম সঙ্ঘ অভিবাদন প্রণাম (নমস্কার) করিয়া অনুশাসনখানি আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পর বর্ণিত হইয়াছে পূর্ণচন্দ্র নামে একজন লোক ছিলেন—তাহার বহু সৈন্য-সামন্ত ছিল। তিনি রাজবংশ-সম্ভূত ছিলেন না, কিন্তু কোনও উচ্চ বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুবর্ণচন্দ্র (স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল) পবিত্র নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। সুবর্ণচন্দ্র ধার্মিক লোক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র ছিল। ত্রৈলোক্যের দেশ জয় বহুদূর বিস্তৃত ছিল এবং তিনি তাহার শত্রুগণের ভীতি উৎপাদক ছিলেন। ত্রৈলোক্যের পুত্র শ্রীচন্দ্র—তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ বিজয়ী ছিলেন—তাহার যুদ্ধ-খ্যাতি স্বর্গে পৌঁছিয়াছিল। এই শেষ

রাজা শ্রীচন্দ্রদেব—যাহার শ্রীবিক্রমপুরের বিজয় ছাউনি হইতে এই অনুশাসনখানি প্রদান করিবার কথা ছিল—এই পর্যন্ত আসিয়া অনুশাসন-লিপি সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রদেবের এই তাম্রশাসনখানির বিষয়ে ডাক্তার ভট্টশালী মহাশয় তাম্রলিপির চিত্র ব্যতীত একটি প্রবন্ধও Epigraphia Indiva. Vol XVIII P. P. 188-92-তে প্রকাশ করেন। স্বর্গত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ননীগোপাল মজুমদার এম. এ. মহাশয় তৎসম্পাদিত Inscriptions of Bengal. Vol III-এর ১০-১৩ পৃষ্ঠায়ও এই লিপিখানির প্রতিলিপি ও পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ডাক্তার ভট্টশালী মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য—"এই তাম্রশাসনখানি অসমাপ্ত এবং দেখিয়া বোধহয় ইহার দ্বারা কোনও 'দান' সম্পাদিত হয় নাই—ইহাতে কেবল দানের মঞ্জুরীকৃত অংশগুলি খোদিত হইয়া বক্রী অংশ অবস্থানুযায়ী অনুশাসন স্বরা পূর্ণ করিবার অপেক্ষায় মুদ্রাগৃহে সংরক্ষিত হইয়াছিল।" এ সম্বন্ধে বলেন—

"Mr Bhattasali thinks that it is no grant at all, but only a plate kept ready, with the stereo-typed portion of the grant inscribed in the office of issue to be filled in with the necessary remaining portions as occasion arose (Loc. cit. p. 188) -How far this view is tenable it is not possible to say. But other explanations such as the collapse of the power of the Chandras under Srichandra or the death of the donee, just when the plate was being engraved, may not be altogether unworthy of Consideration.

তাম্রশাসনখানির পাঠ সম্পর্কেও ডাঃ ভট্টশালী মহাশয়ের পাঠের সহিত অন্য পাঠের কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভট্টশালী মহাশয় প্রথমে আরম্ভ করিয়াছেন—ওঁ স্বস্তি। মূল লিপি দৃষ্টে মজুমদার মহাশয়ের পাঠই বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। আমরা নিম্নে শ্রীচন্দ্রদেবের কেদারপুর গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের যে-পাঠ উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে ডাঃ ভট্টশালী মহাশয়ের পাঠ এবং ননীবাবুর পাঠ মিলাইয়া প্রকাশিত হইল।

শ্রীচন্দ্রদেবের কেদারপুর তাম্র-শাসন

প্রশস্তি-পাঠ

১। ওঁ স্বস্তি। বন্দ্যো জিনঃ স ভগবান করুণৈকপাত্রং।

২। ধর্ম্মোচ্যসৈ বিজয়তে জগদেকদীপঃ যৎসেবয়া।

৩। সকল এব মহানুভাবঃ সংসারপারমুপগচ্ছতি ভিক্ষুসঙ্ঘঃ।। পূর্ণ

৪। চন্দ্র ইতি শ্রীমানাসীন্নাসীরজং রজঃ। যস্যো যবমাত পত্র মপত্র
য়োষৎ বৃ-

৫। পাঃ।। নাগ্নৌ বিশুদ্ধো ন তুলাধিরূঢ় কিন্তু প্রকৃত্যৈব যুতো গরিমণা।
তথাপি ক-

৬। ল্যাণ সুবর্ণকল্পঃ সুবর্ণচন্দ্রস্মকৃতী ততোভূত্।। পূণ্যাবলোকঃ
পরলো-

৭। কণ্ডীরোর্লোক্যঃ সমাশ্বাসিত জীবলোকঃ ত্রৈলোক্যসংকীর্ত্তিত পূণ্যকীর্ত্তে

৮। লোক্যচন্দ্রোহস্য [র] ভুব পুত্রঃ। চতুঃপয়োরাশিসমাপ্ত পৃথ্বীজয়া
ভিলাষী বি-

৯। ষয়েষবলুব্ধঃ যুদ্ধেষু নিস্ত্রিংশলতাজলেন যো বৈরিবহ্নি সময়াঞ্চকার।

১০। শ্রীমান শ্রীচন্দ্রদেবঃ সমজনি তনয়স্তস্য মদ্বর্থ্বব (র) ষ্ক্যোঃ ক্রুরারম্বে
(দ) য়ালুঃ
১১। পরগুণমুখরো দোষবাদেকমূকঃ প্রেক্ষ্যঃ পীনো গুণানাং নিধিরিতি
১২। বিষায়াসক্তিপক্ষাদ্বিপক্ষে যম্মিমা (ম্না) ধত্ত বেধা (ঃ) শ্রিয়মতিরভসা
দর্থ তো না-
১৩। মতশ্চ। স্পৃষ্টঃ পার্থিবপাংসুদোহরসগ্নঘাঘনগ্ গজৈ র্নেত্রাণা-মণিমে-
১৪। ষতঃ পরিহ্নতো দূরেণ বৃন্দারকৈঃ কেশেষবপ্সরসামপূর্ব্বপলিতভ্রান্তং
১৫। সমারোপয়ন্ সন্তানো রজসাং রণেসুষু জয়িনো যস্য দ্যুমাগর্গৎ গতঃ।
১৬। স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাত্ পরমসৌগতো।
১৭। মহারাজাধিরাজঃ শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্রদেবপদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ প-
১৮। রমভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমান শ্রীচন্দ্রদেবঃ কুশলী।

অনুবাদ

১। সিদ্ধি লাভ হউক। মঙ্গল হউক;
করুণার একমাত্র পাত্র, ভগবান জিন বন্দ্যনীয়। জগতে একমাত্র আলোক-ধর্মেরই জয় হয়। ইহাদের উপাসনা করিয়া উদারচেতা ভিক্ষু-সঙঘ পরপারে চলিয়া যান।

২। ভাগ্যদেবীর বরপুত্র পূর্ণচন্দ্র নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাহার যুদ্ধ-বাহিনী উত্থিত ধূলিকণায় চন্দ্রাতপের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই পূর্ণচন্দ্রকে সূর্যদেবের পত্নী সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

৩। (সুবর্ণ ও রাজার ন্যায়) অগ্নিদ্বারা শুদ্ধিকৃত অথবা তুলাদণ্ডে তৌলিত না হইয়াও প্রকৃতি-দত্ত মহত্ত্ব থাকায় তাহা হইতে সুবর্ণ-দীপ্তি-বিশিষ্ট সুবর্ণচন্দ্রের উদ্ভব হইল।

৪। পরলোক-পাপভীত, ত্রিভুবনবিদিত যশস্বী সুবর্ণচন্দ্রের পুণ্যদর্শন, সুশ্রী ও মানব জাতির সান্ত্বনাদায়ক ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে এক পুত্র ছিল।

৫। বিষয়ে অনাসক্ত হইলেও চতুঃসাগর বেষ্টিত এই পৃথিবী জয়াভিলাষী হইয়া তিনি জলদ্বারা অগ্নিনির্বাপণের ন্যায় যুদ্ধে তরবারিদ্বারা শত্রু নিপাত করিয়াছিলেন।

৬। সাধুজনের বন্ধু এই ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শ্রীচন্দ্রদেব নামে মহা সৌভাগ্যশালী এক পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি সকলের প্রতি এমন কি ক্রুরকর্মাদের প্রতিও দয়ালু, পরগুণ কীর্তনকারী, পরের দোষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বাক ছিলেন। তাহার প্রিয়দর্শন সুগঠিত দেহ সর্বগুণের আধার ছিল। জাগতিক সর্ববিষয়ে অনাসক্ত ইহাকে সৃষ্টিকর্তা ভগবান নামেও কার্যত "শ্রী" অর্থাৎ লক্ষ্মীযুক্ত করিয়াছিলেন।

৭। সমরজয়ী সেই নৃপতি যে ধূলিরাশি উত্থিত করিয়াছেন, দিঙ্নাগগণ সেই ধূলিপটলের সংস্পর্শ লাভ-জনিত গর্ব অনুভব করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। দেবতাগণ দূর হইতেই সেই পাংশুজাল পরিহার করিয়াছিলেন,—কেন-না, তাহাদের লোচন নিমেষ শূন্য (সুতরাং তাহারা লোচন নিমীলিত করিতে অসমর্থ)। সেই রজোরাশি আকাশ-মার্গে উত্থিত হইয়া অপ্সরোগণের কেশে সংলগ্ন হইয়াছিল। এবং বার্দ্ধক্যবশত তাহাদের কেশ শুভ্রবর্ণ হইয়াছে, এই অপূর্ব ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছিল।

১৬-১৮ পংক্তিঃ—পরম সৌগত (সৌগত—সুগতের উপাসক, বৌদ্ধ) মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর, পরমভট্টারক (প্রজাগণের রক্ষাকর্তা), শ্রীমান, কুশলী চন্দ্রদেব শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্র দেবের পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া থাকেন। তাহার সমৃদ্ধিশালী (শ্রীমৎ) রাজধানী

শ্রীবিক্রমপুর হইতে—[Now from the illustrious 'camp of victory' situated in *Vikrampura*, the devout worshipper of Sugata (i.e. Buddha) the *Paramesvara, Paramabhattarak*, Maharajadhiraja the illustriours *Srichandradeva*, meditating on the feet of the *Maharajadhiraja* Trailokyachandra deva being in good health]

আমরা বিক্রমপুরের এই স্বাধীন বৌদ্ধ নৃপতিগণের যে বংশাবলি তাহাদের লিপি হইতে জানিতে পারিতেছি তাহা এইরূপ—

রামপাল-লিপি	ইদিলপুর-লিপি	কেদারপুর-লিপি
পূর্ণচন্দ্র	সুবর্ণচন্দ্র	পূর্ণচন্দ্র
।	।	।
সুবর্ণচন্দ্র	ত্রৈলোক্যচন্দ্র	ত্রৈলোক্যচন্দ্র
।	।	।
ত্রৈলোক্যচন্দ্র	শ্রীচন্দ্রদেব	শ্রীচন্দ্র
।		
শ্রীচন্দ্রদেব		

আমরা ইদিলপুর, রামপাল কেদারপুর-লিপি হইতে সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারিতেছি যে, বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রের রাজধানী ছিল এবং তিনি বঙ্গপতি ছিলেন। বিক্রমপুরে দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত চন্দ্রবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন। বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রই মধ্যযুগে বৌদ্ধনরপতি ছিলেন।

বিক্রমপুর রাজধানী ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ ঃ

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, কি ভাবে কেমন করিয়া কোনও অবস্থায়, ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়াছিলেন এবং তাহার পুত্র চন্দ্রই বা কোনও সময়ে কিরূপ ঘটনা-চক্রের আবর্তে পড়িয়া বিক্রমপুর রাজধানী হইতে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। এ বিষয়ে নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়। এসম্বন্ধে আনুমানিক সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য কোনওরূপ কারণ নির্দেশ করিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। তখন বাংলার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহারই আলোচনা করিয়া আমরা কোনও একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছি।

স্বর্গত ঐতিহাসিক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় রামপালের তাম্রশাসন হইতে এবং ময়নামতীর গোপীচাঁদের গানের পুঁথি হইতে চন্দ্রবংশের নিম্নলিখিতরূপ বংশতালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন—

পূর্ণচন্দ্র	সুবর্ণচন্দ্র
।	।
সুবর্ণচন্দ্র	ধাড়িচন্দ্র
।	।
ত্রৈলোক্যচন্দ্র	মাণিকচন্দ্র
।	।
শ্রীচন্দ্র	গোবিন্দচন্দ্র

নগেন্দ্রবাবু এই বংশলতা হইতে শ্রীচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রকে এক বংশোদ্ভব মনে করেন। তাহার মতে—"যদি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ডাক নাম ধাড়িচন্দ্র হয়, তাহা হইলে শ্রীচন্দ্রকে সম্পর্কে

গোবিন্দচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত বা খুল্লতাত বলিয়া ধরা যায়। কিন্তু উত্তরবঙ্গে ও দক্ষিণভারতে প্রচলিত ময়নামতীর গানে গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ময়নামতীর রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের বা তিলকচাঁদের কন্যা বলিয়াই পরিচিতা হইয়াছেন। উভয় ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে যদি অভিন্ন বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ত্রৈলোক্যচন্দ্র মাণিকচন্দ্রের পিতা না হইয়া শ্বশুর হইয়া পড়েন।" [বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ২৬১] গোবিন্দচন্দ্র গীতে লিখিত আছে ঃ

"সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা।"

"বৃহৎ বঙ্গ" প্রণেতা ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার গ্রন্থে এই চন্দ্র রাজবংশীয়দের বিষয় লিখিয়াছেন ঃ—"বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশ। ইহাদের পূর্বপুরুষ পূর্ণচন্দ্র আধুনিক রোটাস্-নগরের রাজা ছিলেন। তৎপরবর্তী রাজা সুবর্ণচন্দ্র বিক্রমপুর অঞ্চলের রাজা হন। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানের অধিপতি হইয়াছিলেন। ইহার পুত্র শ্রীচন্দ্র তৎপরে সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়ে তিনি মিহিরকুলের [ত্রিপুরা] রাজা তিলকচন্দ্রের কন্যা ময়নামতীর পাণিগ্রহণ করিয়া ত্রিপুরদেশের এক বিস্তৃত অংশের অধিকারী হন। তাহার রাজধানী ছিল পটিজায়,—আধুনিক পটিকারতে। এখনও তথায় মাণিকচন্দ্রের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। মাণিকচন্দ্রের পত্নী ময়নামতী পরমা সুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। অনেকে এই গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রকে রাজেন্দ্র মেলের শিলালিপির বঙ্গাধিপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।"

স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ও ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি ময়নামতীর বা গোপীচাঁদের গানের উল্লিখিত রাজগণের সহিত বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশীয়গণের ঐক্যতা সম্পাদনের অনুরাগী। তবে সেন মহাশয় এ বিষয়ে আলোচনা করিতে যাইয়া ইহাও লিখিয়াছেন যে, "আমি কতকগুলি কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু আমার মনে এখনও সে সম্বন্ধে ভালরূপ সমাধান হয় নাই। ১। গোরক্ষনাথ ও গোবিন্দচন্দ্রের সময়। ২। গোপীচন্দ্রের (গোবিন্দচন্দ্রের) সম্বন্ধ এবং তাহাদের কাল। ৩। গোবিন্দচন্দ্র এবং রাজেন্দ্রচোলের সময়ের গোবিন্দচন্দ্র এক ব্যক্তি কি না?" আমরা এ বিষয়ে একমত নহি। রাখালবাবুর কথায় বলা যাইতে পারে—"বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অনুসারে চন্দ্রবংশের সহিত ময়নামতীর বা গোপীচাঁদের গানে উল্লিখিত রাজগণের কোনও সম্পর্কই এখন পর্যন্তও স্বীকার করা যাইতে পারে না।" আমরাও এই মতের পরিপোষক।

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন সম্পর্কে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক বলেন—"শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন হইতে আমরা কি কি ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা কিঞ্চিৎ বিচার আবশ্যক। লিপি-প্রারম্ভে [প্রথম শ্লোকে] রাজ-কবি, বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ-এই "ত্রিরত্নের"—উল্লেখ করিয়া, রাজবংশের বৌদ্ধ মতানুরক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, বংশ-বিবৃতি-বিজ্ঞাপক দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে, চন্দ্রবংশে পূর্ণচন্দ্র নামক কোনও সুপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রবংশে জন্ম বলিয়া, এই অভিনব রাজবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় ছিলেন,—এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।"

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনের ব্যাখ্যা-পরিচয় / শ্রীচন্দ্রদেবের উদারতা ও মহত্ত্ব বিক্রমপুর রাজধানী /শ্রীচন্দ্রদেব বঙ্গাধিপতি রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর ঃ

পূর্ণচন্দ্র কোনও স্থানের রাজা ছিলেন বলিয়া উল্লেখ নাই, তিনি একজন বীর মাত্র ছিলেন। ইহাই দ্বিতীয় শ্লোকের আভাস। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে পূর্ণচন্দের পুত্র সুবর্ণচন্দ্রের উৎপত্তি ও নামকরণ-কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র অশেষ-গুণ-বিভূষিত বলিয়া ত্রৈলোক্যে

ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে বিদিত হইয়াছিলেন। তিনি 'হরিকেল' রাজলক্ষ্মীর আধার রূপে চন্দ্রদ্বীপে 'নৃপতি' হইয়াছিলেন। এই 'হরিকেল' শব্দটি বঙ্গ-দেশেরই নামান্তর। "বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়া"—হেমচন্দ্রেই এই বাক্যই ইহার প্রমাণ। বর্তমান খুলনা, বাকরগঞ্জ ও ফরিদপুরের অংশ-বিশেষ লইয়াই সেকালের 'চন্দ্রদ্বীপ' দক্ষিণে সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই স্থানই পরবর্তীকালে [মোগল-সাম্রাজ্যে] বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ নামেও কথিত হইয়াছিল। "দিগ্বিজয়-প্রকাশ-বিবৃতি" নামক গ্রন্থে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের ভৌগোলিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চন্দ্রদ্বীপের কুলীন কায়স্থ বলিয়া এক শ্রেণীর কায়স্থ এখনও কৌলীন্যমর্যাদা লাভ করিতেছেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শ্রীকঞ্চনা নাম্নী পত্নীর গর্ভে রাজ-যোগ-মুহূর্তে শ্রীচন্দ্রের জন্ম-বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছেন মাত্র। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ভার্যাকে রাজকবি 'প্রিয়া' মাত্র বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন মাত্র 'মহিষী' বলেন নাই। এই কারণে এবং ত্রৈলোক্যচন্দ্রের নৃপতি-মাত্র উপাধি-দর্শনে, মনে হয়, —তিনি কোনও প্রবল-পরাক্রমশালী রাজাধিরাজের সামন্ত শ্রেণী ভুক্ত হইয়া, 'নৃপতি' উপাধি লইয়াই চন্দ্রদ্বীপ শাসন করিতেছিলেন, তাহার পুত্র শ্রীচন্দ্র ভবিষ্যতে 'রাজা' হইবেন, ইহাই জ্যোতিষীগণ তাহার জন্ম-সময়ে সূচিত করিয়াছিলেন, অষ্টম শ্লোকেও আমরা কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারি। এই শ্রীচন্দ্র সতত বিবুধ মণ্ডল পরিবেষ্টিত থাকিয়া, এবং দেশকে একচ্ছত্রাধিপত্যে বিভূষিত করিয়া, অরাতি-কুলকে কারা-নিবদ্ধ করিয়া, আত্মযশে দিকমণ্ডল সৌরভ-যুক্ত করিয়াছিলেন। **বৌদ্ধ শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরস্থিত** রাজধানী হইতে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। সর্ববর্ণের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি,—সে কালের রাজগণ ইহা বুঝিতেন, নচেত বৌদ্ধ নরপতি শ্রীচন্দ্র ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবেন কেন? **বিক্রমপুরই শ্রীচন্দ্রের রাজধানী ছিল। ইহাতে তিনি বঙ্গপতি ছিলেন, এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রই মধ্য যুগের বৌদ্ধ নরপতি বলিয়া প্রতিভাত।** শ্রীচন্দ্রের পর তাহার বংশধর অন্য কেহ বঙ্গরাজ ছিলেন কিনা, তাহা বর্তমান অবস্থায় [অন্য কোনও প্রমাণ না থাকায়] নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

শ্রীচন্দ্রদেবের রাজ্যকাল নির্ণয় ঃ বিক্রমপুরে বৌদ্ধমূর্তি ঃ

এখন জিজ্ঞাস্য—কোনও সময়ে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপে 'নৃপতি' হইয়াছিলেন, এবং কোনও সময়ে কিরূপ ঘটনা-চক্রে, তৎপুত্র শ্রীচন্দ্র বঙ্গে রাজ্য-স্থাপন করিয়া বিক্রমপুর হইতে শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন,—এবং কোনওসময়ে, কিরূপ ঘটনা-চক্রেই-বা এই অভিনব চন্দ্র বংশীয় বৌদ্ধ নরপতির [বা নরপতিগণের] রাজ্য পতন সংঘটিত হইয়াছিল? এই প্রশ্ন ঐতিহাসিক সমস্যার আধার। লিপি-কাল—বিচার ও সমসাময়িক অন্যান্য ঘটনার সমালোচনা করিয়া এই সমস্যার যথাযোগ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না। অক্ষর হিসাবে এই লিপির স্থান দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। এই শাসনের 'ত' 'ন' ও 'ম' বর্ম বংশীয় ভোজবর্মদেবের বেলাব-লিপি ও হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তির 'ত' 'ন' ও 'ম' এর অনুরূপ। কিন্তু আলোচ্য শাসনে 'প' এবং 'খ' কিছু বেশি আধুনিক। 'র' বিজয়সেন দেবের দেবপাড়া-লিপির অনুরূপ। বেলাব-লিপিতে ও ভট্ট-ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে অবগ্রহ চিহ্ন—আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু শ্রীচন্দ্রের শাসনে কোনও কোনও স্থানে অবগ্রহ চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, কোনও কোনও স্থানে হয় নাই। এই সমস্ত কারণে, এই লিপির-কাল যেন বর্ম রাজগণের লিপি-কালের অব্যবহিত পরে এবং সেনরাজগণের লিপি-কালের পূর্বে নির্দেশ করা যাইতে পারে; অর্থাৎ সেনরাজ বিজয়সেনদেবের বিক্রমপুর অধিকারের পূর্বে এবং বর্মরাজ হরিবর্মদেবের পুত্রের রাজ্যনাশের পরেই কোনও সুযোগে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনপূর্বক কিছুকালের জন্য এক অভিনব

বৌদ্ধরাজ্য সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বিক্রমপুরে যে সমস্ত বৌদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা মধ্যযুগের এইকালেরই পরিচয়প্রদান করে। বেলাব-লিপির সাহায্যে আমরা বিক্রমপুরে বর্মরাজগণের অভ্যুত্থানের কথা আলোচনা করিতে যাইয়া দেখিতে পাইয়াছি যে, ভোজ বর্মদেব এবং তৎপরবর্তী বর্মরাজগণ শেষ পাল রাজগণের সময়েই বিক্রমপুর হইতে বঙ্গরাজ্য শাসন করিতেন। এদিকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামপালদেবের তনুত্যাগের পর তৎপুত্র[১৫] কুমারপাল দেব বরেন্দ্র ভূমিতে (রামবতীর নগর হইতে) রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কুমার-পালদেবের সময় হইতেই পাল সাম্রাজ্যের বন্ধন বিঘটিত হইয়া আসিতেছিল। কুমারপালদেবের প্রধান সহায় ছিলেন তাহার সচিব ও সেনাপতি বৈদ্যদেব। এই সময়ে রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, বৈদ্যদেবই "অনুত্তর-বঙ্গে" অর্থাৎ দক্ষিণ বঙ্গে, নৌ-বল লইয়া বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক তথ্য আমরা তদীয় [কমৌলিতে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে উল্লিখিত দেখিতে পাই। বৈদ্যদেব কর্তৃক এই দক্ষিণ-বঙ্গের বিদ্রোহ-বহ্নি নির্বাপিত হইলেই হয়ত পাল-রাজ সর্ব-গুণ-বিমণ্ডিত বৌদ্ধ ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া, চন্দ্রদ্বীপের সামন্ত-রূপে নিযুক্ত করিয়া 'নৃপতি' উপাধিতে বিভূষিত করিয়া থাকিবেন। এই বিদ্রোহ সময়েই হয়ত চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গ-রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এই সময় হইতেই হয়ত বর্মরাজগণের দুর্দিন উপস্থিত হইয়া থাকিবে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজকবি ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে 'হরিকেল' (বঙ্গ) রাজলক্ষ্মীর আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সময়েই ভট্ট-ভব-দেব-মন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত হরিবর্মা-তদাত্মজ [অজ্ঞাতনামা রাজার] অধিকার হইতে বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপ হস্তচ্যুত হইয়াছে। তৎপর বৈদ্যদেব যেমন তিনি সামন্ত রূপে চন্দ্রদ্বীপকে সিংহাসন ভ্রষ্ট করিয়া স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, সেইরূপে বোধহয়, পাল-রাজাগণের ও বর্মরাজগণের দুর্বলাবস্থা অবলোকন করিয়া, ত্রৈলোক্যচন্দ্র-পুত্র শ্রীচন্দ্রও বর্ম বংশীয় শেষ নরপতিকে কোনও কারণে সিংহাসন ভ্রষ্ট করিয়া স্বয়ং 'পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গে সার্বভৌম নরপতি সাজিয়া বসিয়াছিলেন অথবা, বর্মরাজ্য অন্য কোনও কারণে উন্মুলিত হইলে, শ্রীচন্দ্রই বঙ্গে একচ্ছত্রাধিপত্য বিস্তৃত করিয়া, শত্রুকুলকে কারানিবদ্ধ করিয়া, বিক্রমপুর হইতে শাসন পরিচালনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য শাসনের অষ্টম-শ্লোকে এইরূপ ঐতিহাসিক তথ্য ইঙ্গিতে সূচিত হইয়া থাকিবে। অপরদিকে এই সময়েই বিজয়সেন পাল সাম্রাজ্যের দুরবস্থা ও দুর্বলতা দেখিয়া, বরেন্দ্রীতে রাজ্য পাতিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এবং পরে সেই বিজয়সেন কর্তৃকই হয়ত বৌদ্ধ শ্রীচন্দ্রের সংস্থাপিত রাজ্যের বিনাশ সাধিত হইয়া থাকিবে। বিজয়সেন যে বিক্রমপুরের রাজধানী হইতে দানাদেশ করিয়াছিলেন, এই সংবাদ স্বর্গত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. মহাশয় এক প্রবন্ধে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। লিপিখানি বিজয়সেন দেবের একত্রিংশদ্বর্ষীয়-লিপি বলিয়া জানিতে পারা যাইতেছে।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যখন বরেন্দ্রীতে কুমারপালদেব এবং বঙ্গে হরিবর্মদেব ও তদীয় পুত্র সিংহাসনারূঢ় ছিলেন এবং বিজয়সেন গৌড়ে রাজ্যস্থাপনের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, এবং কুমারপালদেবের দক্ষিণ-বাহু-রূপী প্রধান সচিব বৈদ্যদেব তিগ্মদেবকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া কামরূপে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখনই চন্দ্রদ্বীপ নৃপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র, বর্মরাজাকে বিতাড়িত করিয়া, অথবা অন্য কারণে বর্ম রাজ্যের নাশ ঘটিলে পর, বঙ্গে স্বাতন্ত্র্যাবলম্বম পূর্বক বিক্রমপুর রাজধানী হইতে দেশ শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত সর্বাংশে সমর্থিত হইবে কিনা, তাহা বলা যাইতে পারে না।"

আমরা ডাক্তার বসাক মহাশয়ের এই মত সমর্থন করি না। আমাদের মতে শ্রীচন্দ্ররাজগণের পরে বিক্রমপুরে বর্মরাজবংশীয়দের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে

বর্মরাজগণের বিষয়ে আলোচনা করিতে যাইয়া বিস্তারিতভাবে বলিয়াছি। একথা সত্য যে, শ্রীচন্দ্রদেবের যে তিনখানি তাম্রফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে উহাতে সন-তারিখ না থাকিলেও তাম্রফলকের অক্ষর দেখিয়া বিশেষজ্ঞেরা প্রায় সকলেই উহার লিপিকাল দশম কি একাদশ শতাব্দীর লিপি বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। আমরা নানাদিক দিয়া এবং বিক্রমপুরের অসাধারণ বৌদ্ধ প্রভাব এবং অসংখ্য বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি দেখিয়া ডাক্তার রাধাগোবিন্দ বসাকের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়াই মনে করি। অতি অল্পদিন হইল বিক্রমপুর মধ্যপাড়া গ্রামের একটি খাল খনন করিতে যাইয়া অবসর-প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার রায়সাহেব শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার সেন মহাশয় একটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কার করিয়াছেন, ঐ মূর্তিটির পাদ-পীঠে একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত আছে—"দানপতি শ্রীনিরুপমস্য" কাজেই বৌদ্ধ নৃপতি শ্রীচন্দ্রদেবের সমকালে বিক্রমপুরে বিশেষ ভাবে বৌদ্ধ-প্রভাব বিদ্যমান ছিল এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করিয়া বিহার বা মন্দিরে বোধ হয় তাহার প্রতিষ্ঠাও করিতেন।

শ্রীচন্দ্রের অধিকৃত বঙ্গরাজ্য ঃ

এখানে একটা কথা বিবেচনা করিতে হইবে, তাহা এই যে, শ্রীচন্দ্রদেব বিক্রমপুর রাজধানী হইতে যে বঙ্গরাজ্য শাসন করিতেন, সেই বঙ্গরাজ্য কত দূর বিস্তৃত ছিল। তাহা জানিবার জন্য সকলের মনেই একটা কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় সে কালের বঙ্গরাজ্য কিরূপ বিস্তৃত ছিল, তৎসম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এবং সেই সঙ্গে আমাদের মতবাদও আলোচিত হইয়াছে।

বঙ্গ কোনও দেশ ঃ

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাক্তার হেমচন্দ্র রায়-চৌধুরীর "বঙ্গ কোনও দেশ" নামক সুলিখিত প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। ইহা পুনরাবৃত্তি বিবেচিত হইলেও একটি অমীমাংসিত বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বোধেই উহা উল্লেখ করিলাম। ইহার দ্বারা পাঠকগণ সহজেই সে কালের **বিক্রমপুর বা স্বাধীন বঙ্গরাজ্য** সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করিতে পারিবেন।[১৬]

প্রকৃতপক্ষে বঙ্গের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে বঙ্গ নামে কোনও জনপদ বিশেষ ভাবে সূচিত হইত তাহা বুঝা কর্তব্য। শক্তি-সঙ্গম-তন্ত্রে লিখিত আছে—

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্ম পুত্রান্তগঃ শিবে
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ।[১]

অর্থাৎ, সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডই বঙ্গ বলিয়া কথিত। এই শ্লোকে বঙ্গ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বভাগে কি পশ্চিমভাগে অবস্থিত তাহা ঠিক বুঝা গেল না। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের টীকাকার যশোধর লিখিয়াছেন,—"বঙ্গা লোহিত্যাৎ পূর্বেণ"?

অর্থাৎ, বঙ্গদেশবাসীরা (লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বতীরবাসী। বর্তমানকালেও ব্রহ্মপুত্র যমুনার পূর্বকূলে অবস্থিত মৈমনসিংহ, ঢাকা, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীগণই বিশেষ ভাবে "বাঙ্গাল"বলিয়া অভিহিত হন। যশোধর খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। তাহার পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমেও যে বঙ্গদেশ বিস্তৃত ছিল সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, মধ্যম পাণ্ডব গিরিব্রজ, মোদাগিরি, পুণ্ড্র, কৌশিকী—কচ্ছ জয় করিয়া বঙ্গরাজকে আক্রমণ করিয়াছিলেন—"**বঙ্গরাজ মুপাদ্রবৎ।**" পরে তাম্রলিপ্ত কর্বট, সুহ্ম, এবং সাগরতীরবর্তী ম্লেচ্ছগণকে বশীভূত করিয়া লৌহিত্য তীরে উপনীত হন। তিনি লৌহিত্য অতিক্রম করিয়া তাহার পূর্বতীরবর্তী ভূখণ্ডে গিয়াছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং, মহাভারত রচনার যুগে বঙ্গ যে লৌহিত্যের পশ্চিম বিস্তৃত ছিল ইহা সুনিশ্চিত।"

"মহাভারত, রঘুবংশ, প্রজ্ঞাপনা এবং যশোধর-কৃত জয়মঙ্গলা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে স্পষ্টই মনে হয় যে, "বঙ্গ" দুই অর্থে ব্যবহৃত হইত, একটি ব্যাপক, অপরটি সঙ্কীর্ণ। ব্যাপক অর্থে বঙ্গ বলিতে সময়ে সময়ে লৌহিত্যের পূর্ব হইতে কপিশা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বুঝাইত। সঙ্কীর্ণ বঙ্গ—মগধ, মোদাগিরি, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত কর্বট, সুহ্ম এম ন-কি সাগরানুপ হইতেও পৃথক বলিয়া মহাভারতে নির্দিষ্ট হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনের 'বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে এবং যশোধরের টীকার বহ্গা লোহিত্যাৎ পূর্বেণ' প্রভৃতি বাক্যে মনে হয় বিক্রমপুরও তৎসন্নিহিত ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব কূলস্থিতভূখণ্ডই এই সঙ্কীর্ণ বঙ্গ। উত্তরকালে বঙ্গ যে সাগরানূপ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, "শক্তি সঙ্গম-তন্ত্রই" তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির কর্তৃক রচিত বৃহৎসংহিতায় কূর্মবিভাগ নামক চতুর্দশ অধ্যায়েরও সমুদ্রকূলবর্তী "সমতট" ভূমি বঙ্গ হইতে পৃথক ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।"

"রাজেন্দ্র চোল দেবের তিরুমলয়-লিপিও চেদিপতি কর্ণদেবের গোহেরবা-লিপিতে "বঙ্গাল" নামক দেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই অভিনব নামটি কোনও সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা বলা দুরূহ। প্রাচীন সাহিত্য, শিলালেখ বা তাম্রপট্টে "বঙ্গ" নামেরই ব্যবহার ও প্রসিদ্ধি দেখা যায়। অদ্যাবধি আবিষ্কৃত প্রমাণ-দৃষ্টে মনে হয় যে, দক্ষিণাপথ ও তুরস্ক দেশাগত ভূপতিগণই মধ্যযুগে "বাঙ্গাল" বা বাংলা এই অভিনব নামের প্রয়োগ আরম্ভ করেন (১) আইন-ই-আকবরি প্রণেতা আবুল ফজল লিখিয়াছেন যে বাংলা প্রাচীন বঙ্গের নামান্তর মাত্র। পুরাকালে এতদঅঞ্চলের রাজন্যবর্গ সমগ্র প্রদেশে দশগজ ঊর্ধ্ব ও বিংশ গজ আয়ত এক-একটি আল অর্থাৎ, মৃত্তিকা-স্তূপ প্রস্তুত করিয়া জলপ্লাবন নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বঙ্গ + আল এই দুই শব্দের যোগে বাঙ্গাল শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।"

"আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কলচুর্য্য-বংশোদ্ভব বিজ্জলের অবলূর-লিপিতে বঙ্গ ও বঙ্গাল পৃথক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। (১) অভিধান-চিন্তামণি-প্রণেতা জৈন হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"বাঙ্গাস্তু হরিকেলিয়া"। বঙ্গের সহিত অভিন্ন এই হরিকেল যে "বঙ্গাল" দেশ নহে, পরন্তু একটি স্বতন্ত্র ভূখণ্ড, ডাকার্ণব গ্রন্থে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। (২) অতএব, আবুল ফজলের গ্রন্থে বঙ্গ ও বঙ্গাল একদেশেরই ভিন্ন নাম বলিয়া লিখিত হইলেও পূর্বে যে ঐ দুই নামে দুইটি পৃথক দেশ সূচিত হইত, তাহা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। বঙ্গ বা হরিকেল হইতে স্বতন্ত্র "বঙ্গাল" বলিতে কোনও রাজ্য বুঝাইত এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না—বঙ্গাল যে দক্ষিণ ও উত্তর রাঢ়া হইতে বিভিন্ন এবং চন্দ্রোপধি বিশিষ্ট গোবিন্দ নামক নরপতির অধীন ছিল, তিরুমলয়-লিপিই—তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অধ্যাপক ব্লকম্যান লিখিয়াছেন যে,—সুলতান সুজার রাজত্বকালে রঙ্গপুর ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড "বঙ্গাল ভূম" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু Blaev, Sansson, Purchas প্রমুখ লেখকগণের মানচিত্র ও গ্রন্থে চট্টগ্রামের অভিমুখে অবস্থিত সাগরতীরবর্তী ভূখণ্ডে Bengala নগরীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ব্লকম্যান এই নগরীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন, (৩) কারণ ইবন বতুতা, সিজার ফ্রেডারিক, De Barros' প্রভৃতি পর্যটক ও লেখকগণ ইহার কথা লিখিয়া যান নাই। ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত Gsatalke-র মানচিত্রে কিন্তু Bengala-র স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং, সাগরানুপে সত্য-সত্যই এই নামে একটি নগরী ছিল এইরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে।"

আমি The 'Travels of Cornelius Le Bruyan নামক একজন ভ্রমণকারীর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট Route Exacte De Gramron a Batavia Gramron-এর মানচিত্রে বাংলা দেশের একটি নগরী "Bengale"-র নাম দেখিতে পাই। উহার অবস্থান বঙ্গোপসাগরের উপকূলে নির্দিষ্ট আছে। এই বইখানি মদীয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আছে। বইখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর [১৭০১ খ্রিস্টাব্দ]। এই বইখানিতে ভারতের আরও মানচিত্র আছে।[১৭]

ডাক্তার রায়চৌধুরি বলেন—

এই Bengala নগরীর চতুস্পর্শস্থিত রাজ্যই কি চন্দ্রোপাধিক নরপতি-শাসিত বঙ্গালদেশ? শ্রীচন্দ্রের রামপাললিপি পাঠে কিন্তু তাহাই মনে হয়। উক্ত লিপিতে শ্রীচন্দ্রের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে চন্দ্রদ্বীপের নৃপতি এবং **"হরিকেল রাজ ককুদচ্ছত্রস্মিতানাং শ্রিয়ামাধারঃ"** বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপ বলিতে সমুদ্রতীরবর্তী বর্তমান বরিশাল এবং তৎসন্নিহিত ভূখণ্ড বুঝাইত। ইহাই শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের স্বরাজ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। হরিকেল অর্থাৎ বঙ্গ ইহা হইতে স্বতন্ত্রভাবে উলিলিখিত হইয়াছে। চিনা পরিব্রাজক ইৎসিং লিখিয়াছেন যে, হরিকেল ভারতের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। রাজশেখর রচিত কর্পূর মঞ্জরী নামক গ্রন্থে পূর্ব দিগঙ্গনাগণের সম্পর্কে চম্পা, রাঢ়া, কামরূপ ও হরিকেলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই সকল উক্তির সহিত লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন ও যশোধরের টীকা মিলাইয়া লইলে মনে হয় যে, **বিক্রমপুর লৌহিত্যের পূর্বতীরস্থ ভূখণ্ডই সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত "বঙ্গ" বা হরিকেল নামে প্রসিদ্ধ ছিল।** সাগর-তীরবর্তী "সাগরানূপ" বা "সমতট" যে ইহার বহির্ভূত ছিল মহাভারত ও বৃহৎসংহিতা বিচার করিলে এই দুই দেশ যে অভিন্ন বা পরস্পর সংশ্লিষ্ট ইহা অনুমান করিয়া বোধহয় নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।"

বিজ্জন বা বিজ্জল দেবের অবলূর-লিপি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীচন্দ্রদেবের বিক্রমপুর বিজয় সত্ত্বেও খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষপর্যন্ত বঙ্গ এবং বাঙ্গলা সম্পূর্ণ ভাবে একীকৃত হয় নাই। "রাঢ়" ও "বরেন্দ্র" ও স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুসলমান লেখকগণ "বঙ্গ" শব্দ সঙ্কীর্ণ অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। "তবকাৎইনাসিরি" গ্রন্থে বঙ্গ-স্পষ্টত যাজনগর, কামরূপ, ও ত্রিহুতের ন্যায় লক্ষ্মণাবতী হইতে বিভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু রাল (রাঢ়) ও বরিন্দ (বরেন্দ্র) লক্ষ্মণাবতীর অন্তর্গত ছিল। ব্লকম্যান দেখাইয়াছেন যে, তুঘলুক শাহের রাজত্বকালেই (১৩২০ খ্রিস্টাব্দে) লক্ষ্মণাবতী, সপ্তগ্রাম ও সুবর্ণগ্রাম মিলিত হইয়া অখণ্ড বাংলাদেশ গঠিত হইয়াছে। জৈন প্রজ্ঞাপনায় এই মিলনের সূচনা দেখা যায়। বঙ্গপতি পালরাজগণ এবং প্রৌঢ়া রাঢ়ার অধীশ্বর সেন-নৃপতিবৃন্দ রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র ও বঙ্গে একচ্ছত্র রাজ্য স্থাপন করিয়া ভাবী মিলনের পথ আরও সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। মুসলমানগণ-কর্তৃক লক্ষ্মণাবতী জয়ের ফলে এই মিলন সুদৃঢ় হইতে পারে নাই। কিন্তু তুঘলুকশাহ পুনরায় একচ্ছত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্থায়ী ঐক্যবিধান করেন। পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে।

সম্রাট আকবরের সময়ে সুবা-বাংলা সুরমা-তীরবর্তী-শ্রীহট্ট হইতে কৌশিকী-ধৌত পূর্ণিয়া ও গঙ্গার দক্ষিণাস্থিত Kankjol কোঁকজল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মেদিনীপুর, হিজলি, চট্টগ্রাম এবং কোচবিহার তখনও এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। মেদিনীপুর ও হিজলা উড়িষ্যার এবং চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কোচবিহার সীমান্তবর্তী স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। সম্রাট শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ক্রমে ক্রমে এই সকল ভূখণ্ড বাংলার অন্তর্নিবিষ্ট হয়। প্রত্যেক শ্বেতদ্বীপের মহামাত্রগণ বাংলার উত্তর সীমা হিমবন্ত প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু লৌহিত্য ও কৌশিকীর পূর্বতীরবস্থিত শ্রীহট্ট, পূর্ণিয়া প্রভৃতি কতকগুলি দেশ বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহাকে সুবা-বাংলা অপেক্ষা হ্রস্বায়ত করিয়াছেন।"

চন্দ্ররাজগণের তাম্রশাসন হইতে আমরা স্বাধীন বঙ্গ-রাজ্য বলিতে যে বঙ্গ-রাজ্য এবং রাজধানী শ্রীবিক্রমপুরের পরিচয় পাইতেছি, তাহা হইতে সেকালের শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী ও তাহা হইতে শাসিত বৃহৎ বঙ্গ-রাজ্যের যে পরিচয় পাইলাম, তাহা যে কত বড় গৌরব-ব্যঞ্জক এবং বাঙালি মাত্রেরই গৌরবের কারণ তাহা সকলেরই বোধগম্য।

চন্দ্ররাজগণের তাম্রশাসন তিনখানি আবিষ্কৃত হওয়ায় বিক্রমপুরের ইতিহাসের পৃষ্ঠা গৌরবোজ্জ্বল হইয়াছে।

চন্দ্র রাজাদের সম্বন্ধে অন্যান্য কথা ঃ

চন্দ্ররাজবংশীয়েরা বাংলার আদি অধিবাসী নহেন। শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনের দ্বিতীয় শ্লোক হইতে জানিতে পারিতেছি যে, বিপুল লক্ষ্মীক, রোহিত...ভোগকারী, চন্দ্রদিগের বংশে, পূর্ণচন্দ্র সদৃশ পূর্ণচন্দ্র নামক [ব্যাক্তি] পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।" ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, চন্দ্রেরা পূর্বে বিহারের অন্তর্গত সাহাবাদ জেলার রোটাসগড়ে রাজত্ব করিতেন। তাহারা সম্ভবত পাল নৃপতিগণের ক্ষমতা হ্রাস দেখিতে পাইয়া তাহাদের শক্তিহীনতার সুযোগ পাইয়া বঙ্গে [পূর্ববঙ্গে] একটি রাজ্য সংস্থাপনের জন্য মনোযোগী হইয়াছিলেন। এবং [মাতৃ-পিতৃ] উভয়-তুল-পাবন, [সুবর্ণচন্দ্রের] পুত্র অপবাদ-ভীরু গুণাবলি চতুর্দিকে অতিথিরূপে ভ্রমণ করিত বলিয়া, সেই পুত্র ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে বিদিত হইয়াছিলেন * * দিলীপোপম এই পুত্র চন্দ্রদ্বীপে নৃপতি হইয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের মহারাজাধিরাজ উপাধি হইতে উপলব্ধি হয় যে, ত্রৈলোক্যচন্দ্রই পূর্ববঙ্গে চন্দ্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার রাজ্য হরিকেল—পূর্ববঙ্গের [প্রাচীন নাম] এবং সমুদয় চন্দ্রদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

"The Chandras do not seem to have originally belonged to Bengal. In verse 2 it is stated that they were rulers of Rohitagiri, which is identifiable with Rohtagudh in the sahabad district of Bihar. They emigrated to Eastern Bengal, and most probably taking advantage of the weakness of the declining Pala power carved out kingdom for themselves. Trilokya Chandra, to whom the title of Maharajadhiraj has been assigned, was very likely responsible for the rise of this new power in Eastern Bengal. His kingdom was Harikel i e Eastern Bengal. Including Chandradipa, which was the home territory of this dynasty. Inscription of Bengal N. G Mazumdar.

চন্দ্রদ্বীপ যে অতি প্রাচীন স্থান তাহা সহজেই সপ্রমাণ হয়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত পুস্তাকাগারে "অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা" নামক একখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে, ঐ গ্রন্থখানা ১০১৫ খ্রিস্টাব্দে নকল হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে চন্দ্রদ্বীপস্থ 'ভগবতী তারা' নামক এক দেবীর চিত্র আছে। ভগবতীতারাকে দেখিবার জন্য নানাস্থান হইতে যাত্রীগণ আসিতেন। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, চন্দ্রদ্বীপ একাদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্র ব্যাকরণ রচয়িতা চন্দ্রদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিব্বতের জ্ঞানভাণ্ডার টেঙ্গুর গ্রন্থে লিখিত আছে, বরেন্দ্রের ক্ষত্রিয় বংশে চন্দ্রগোমির জন্ম। আচার্য স্থিরমতির নিকট ইনি সূত্র ও অভিধর্মপিটক অধ্যয়ন করেন এবং বিদ্যাধরাচার্য অশোকের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি অবলোকিতেশ্বর ও তারার বড় ভক্ত ছিলেন। * * চন্দ্রগোমির নামানুসারে এই ভূ-ভাগ চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছিল।[৭]

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনখানি আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধে যে সকল আখ্যান প্রচলিত ছিল তাহা এখন অলীক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

১. বঙ্গ-সমতটের কয়েকটি প্রাচীন বৌদ্ধ রাজবংশ—ডাক্তার শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক এম. এ.—'প্রাচী' প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা—১৩৩০, আষাঢ় ৪০—৪২ পৃষ্ঠা।

২. (১) সাহিত্য, ১৩২৫, পৌষ সংখ্যা, (২) Indian Antiquary, 1919, P. P. 98-101 (৩) বৃহৎ-সংহিতা—১৪শ অধ্যায়, (৪) Takakusu's Itsing, Oxford, 1896, XI V. I. (৫) Beal's "Life of Hiuen-Tssiang," London 1911, Introduction, P. XI. (৬) ঢাকার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়। (৭) Memoirs of the Asiativ Society of Bengal. Vol I. P. 86. (৮) প্রতিভা ১৩২০ চৈত্র সংখ্যা (৯) J. A. S. B. 1914. P. P. 86-87 (১০) শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন-৫ম শ্লোক, সাহিত্য ১৩২০ ভাদ্র।

৩. যশোহর-খুলনার ইতিহাস 'প্রথম খণ্ড—সতীশচন্দ্র মিত্র।

৪. Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum-Plate II. Page 14.

৫. বিষ্ণুমূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ শিলালিপি
(১ম) ওঁ সম্বত ৩ মাঘ দিনে ২৭? (১৪?) শ্রীমহীপাল দেবরাজ্যে
(২য়) কীর্তিরিয়ং নারায়ণ ভট্টারাখ্য সমতটে বিলকীন্ন।
(৩য়) কীয় পরম বৈষ্ণবস্য বণিক লোকদত্তস্য ব সুদত্তসুত
(৪র্থ) স্যমাতা পিত্রোরত্মনশ্চ পুণ্যযশো অভিবৃদ্ধয়ে।

"The discovery of gold coins of Chandra Gupta II and Skanda Gupta, and also silver coins with the peacock symbol in or near Kotalipara in the Faridpur district is an evidence in point, for supporting the theory that the Eastern Bengal Kingdom remained under the paramount power of the early Guptas," The History of North-Eastern India—by Radha Govinda Basak M. A. Ph. D. Chapter IX Page 181.

৬. বিক্রমপুরের ইতিহাস—প্রথম সংস্করণ।

৭. The rise of the Gupta dynasty in Northern India in the 4th century A. D. ushered in the golden age of Indian art in every branch of fine arts. * * * The best sculptures of this period have been found at Sarnath, Mathura and Deogarh in the United Provinces, while examples of terra-cotta and minor arts have been found practically in all the excavations in North India. An out-line of Archaeology in India by Rai Bahadur K. N. Dikshit, M. A. F. R. A. S. B. Director General of Archaeology in India [An outline of the Field Sciences in Indis Page 166.

৮. Progress of science in India, Page 273.

৯. Pag sam-Jan-zang—Index cxx vii.

১০. Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol I. PD-85P.9.

১১. ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় ১৩২১ সালের আশ্বিন সংখ্যায় 'সাহিত্য' পত্রে সমতটের রাজধানী শীর্ষক প্রবন্ধে ভট্টশালী মহাশয়ের সিদ্ধান্তের বিবিধ যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে প্রতিবাদ করিয়াছেন। "ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে খড়গরাজগণ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া ভট্টশালী মহাশয়ের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, বড়-কামতা কর্মান্তনগর নহে। আমাদের এ-বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, তবে প্রয়োজনবোধে সামান্য ভাবে উল্লেখ করিলাম মাত্র। অনুসন্ধিৎসু পাঠক রাধাগোবিন্দ বাবুর প্রবন্ধ ও রায় মহাশয়ের ইতিহাস পাঠ করিতে পারেন।

১২. দ্বিতীয় গোপালদেবের তাম্রশাসন [জাজিলপাড়া লিপি] শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বর্মণ এম-এ. ভারতবর্ষ ২৫ শ বর্ষ-১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৪৪।

১৩. শিল্পীর অনবধানতায় যে সকল অক্ষর তাম্রপট্টে খোদিত হয় নাই, এবং উৎকীর্ণ হইলেও যে সকল অক্ষর কাল-প্রভাবে বা অন্য কারণে বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছে, তাহা [ ] প্রকার বন্ধনী মধ্যে প্রদর্শিত হইল। বর্ণাশুদ্ধি ও অতিরিক্ত অক্ষর ( ) এইরূপ বন্ধনী মধ্যে সংশোধিত হইয়াছে। ১। বসন্ত-তিলক। এই শ্লোকের প্রথম চরণে 'একপাত্রং' পদের 'ক' অক্ষরটি উৎকীর্ণ হয় নাই।

২. শার্দ্দূল বিক্রীড়িত। এই শ্লোকে প্রথম পাদে "রোহিতা" অক্ষর-ত্রয়ের পর একটি অক্ষর উৎকীর্ণ হয় নাই এবং তাহার পরবর্তী যে অক্ষরটি পরিদৃষ্ট হয় তাহা "খি" বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এই পাঁচটি অক্ষর 'ভূজাং অক্ষরদ্বয়ের সঙ্গে সমাসাবদ্ধ থাকিয়া 'চন্দ্রাণাং পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।'

"রোহিতাবনি ভুক্তাং" অথবা ঐরূপ কোনও জনপদ-ভোগের কথা উৎকীর্ণ কর্মে সূচিত হইয়াছে কি না, সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

৩. বসন্ত তিলক। এই শ্লোকে তৃতীয় পাদে "বৌদ্ধ" শব্দের পর বিসর্গ-চিহ্নের অভাব দৃষ্ট হয়। তদভাবেও অর্থ-সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে।

৪. উপজাতি। এই শ্লোকের "দর্শে" অক্ষরদ্বয় একটু অস্পষ্ট।

৫. শার্দ্দুল বিক্রীড়িত।

৬. ইন্দ্র বজ্রা। এই শ্লোকের চতুর্থ চরণে "শ্রী" শব্দ দুইবার উৎকীর্ণ হওয়াতে ছন্দোভঙ্গ দোষ ঘটিয়াছে। একটিকে অতিরিক্ত ধরিতে হইবে।

১৪. এই স্থানের (প) অক্ষরটি তাম্র-পট্টে ক্ষোদিত দেখা যায় না।

২. এই স্থানের 'ট' অক্ষরটিও উৎকীর্ণ নাই।

৩. 'শথলা' কোনও ঋষির নাম বলিয়া বোধ হয় নাষ এই নিমিত্ত "শাণ্ডিল্য" পাঠ শুদ্ধ হইবে বলিয়া গৃহীত হইল।

৪. এই স্থলে অর্থ-সঙ্গতির জন্য "কোটি-হোমিঙ্গতবতে" পাঠ ধৃত হইল। তাম্রপট্টে "হোমেদগ" পরিদৃষ্ট হয়। 'হোমি'র ইকারের উপরের টানটি এবং 'ঙ' শূন্যচিহ্নটি বিলুপ্ত বলা যাইতে পারে।

৫. এই স্থলের 'র' অক্ষর তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ হয় নাই।

৬. এই শব্দটি তাম্রপট্টং—চিহ্ন-বিহীন।

৭. এই শব্দের চ্ছি' অক্ষরটি তাম্রফলকে খোদিত নাই।

৮. 'চক্রের' 'চ' অনুৎকীর্ণ।

৯. এই স্থলের 'প্র' অক্ষরটি খোদিত নাই।

১০. এই স্থলের 'য়' টি উৎকীর্ণ হয় নাই।

১১. 'নরকে' হওয়া উচিত ছিল।

১২. এই শব্দদ্বয় অস্পষ্ট।

১৩. 'বসুধা' শব্দের 'সু' খোদিত নাই।

১৪. 'দলাম্বুর 'লা' অক্ষর উৎকীর্ণ দেখা যায় না।

১৫. 'বিলোপ্যা' শব্দের 'লো' ক্ষোদিত হয় নাই।

১৬. এই স্থলের ০ এই চিহ্নটি টীকাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

১৫. গৌড় রাজমালা ৫২-৫৩ পৃঃ।

১৬. শব্দকল্পদ্রুমে "বঙ্গ"শব্দ দ্রষ্টব্য।

২. Kamasutra, Published by the Proprietor of the Chowkhamba Sanskrit Book Depot P 295.

৩. Keith-Sanskrit literature P 459.

৪. Ind Ant 1891, 357, J A S B 1908, 290.

১৭. অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ণ দেবের Gohaswa Plate-এর প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। উক্ত লিপিতে কর্ণদেবের বৃদ্ধ প্রপিতামহ লক্ষ্মণরাজ "বঙ্গাল ভঙ্গ নিপুণ" বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মণ রাজও উত্তরাপথের রাজা ছিলেন।

(১) Ep Ind, v 257 of Elliot, iii 295 (As if) (২) Majumdar Inscriptions of Bengal P 61 (৩) J A S B, 1873, 233.

স্বাধীন সেনরাজবংশ—বিজয়সেন—বিক্রমপুর



বিক্রমপুরের ইতিহাসের সহিত সেনরাজবংশের নাম বিশেষ ভাবে বিজড়িত। আমরা বাল্যকালে পাল, চন্দ্র, বর্ম-বংশীয় রাজাদের কথা শুনি নাই, কিন্তু সেনরাজাদের কথা শুনিয়াছি; বিশেষ করিয়া নৃপতি বল্লালসেনের সম্বন্ধে প্রাচীন ও প্রাচীনাদের মুখে কতরূপ অদ্ভুত গল্পই না শুনা গিয়াছে। কতদিন আষাঢ়ের সন্ধ্যায় দিদিমার মুখে বল্লালের নানা অদ্ভুত কীর্তি-কাহিনীর কথা, কত যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা শুনিয়াছি। বল্লালসেনের নাম বিক্রমপুরবাসীর কাছে কত না বিচিত্র স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে।

ঐতিহাসিকেরা বলেন—সেনবংশীয় রাজগণের পূর্ব-পুরুষ কবে কোনও শুভমুহূর্তে বাংলা দেশে আসিয়াছিলেন, তাহা আজ পর্যন্তও সঠিক ভাবে জানা যায় নাই। সেন রাজগণের যে সমুদয় তাম্রলিপি ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে—তাহারা কর্ণাট দেশবাসী চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন।

সেনরাজাদের পূর্বকথা ঃ

স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "গৌড়রাজমালার" উপক্রমণিকায় সেন রাজাদের কথা লিখিতে যাইয়া লিখিয়াছেন"—সেনরাজ-বংশ বাংলার শেষ হিন্দু রাজবংশ হইলেও, কিরূপে সে রাজবংশ এদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহা এখনও তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অন্ধকার ভেদ করিয়া, ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কার-সাধন করিবার উপযোগী অধিক প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। জনশ্রুতি, এই রাজবংশকে নানা কল্পনা-জল্পনার আধার করিয়া তুলিয়াছে। এই রাজবংশের অধঃপতন-কাহিনীর ন্যায় ইহার অভ্যুদয়-কাহিনীও প্রহেলিকাপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।"

কথাকয়টি অতি সত্য।

সেনরাজ-বংশের প্রকৃতপক্ষে প্রতাপশালী প্রথম রাজা বিজয়সেনদেবের [রাজসাহির অন্তর্গত দেবপাড়ায় প্রাপ্ত] প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়—

বংশে তস্যামরস্ত্রীবিতরতকলা সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্যে—
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেন প্রভৃতিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্ব্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচর্য্যের শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারাঃ
পারাশর্য্যেণ বিশ্ব শ্রবণপরিসর প্রীণনায় প্রণীতাঃ।।

উমাপতি ধরের এই বাক্যে জানা যাইতেছে—সেন বংশ, কৌরব বা পাণ্ডব-বংশ হইতে উৎপন্ন।

লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন হইতেও জানিতে পারি—

"পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিত গুণর্গণে বীরসেনস্য বংশে
কর্ণাট ক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদাম সামন্ত সেনঃ।।
কৃত্বা নির্বীর মুর্ব্বীতল মধিকতরাস্তৃ প্যতানাক নদ্যাং
নির্ম্মিক্তো যেন যুব দ্রি পুরুধিরকণা কীর্ন্নবীরঃ
কৃপাণঃ।।"

এই কয়েকটি শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে, সেনরাজারা "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র বীরসেনের বংশ-সম্ভূত।" 'বল্লাল-চরিতের' দ্বাদশ অধ্যায়ে এই বীরসেনের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।[১]

বীরসেন ঃ

'গৌড়ের ইতিহাস' প্রণেতা সেনরাজবংশের প্রবর্তকের নাম বীরসেনের কথা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"বীরসেন দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র ছিলেন, এবং চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন।"

স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রি খণ্ডে বীরসেন নামক এক দাক্ষিণাত্য বীরের নাম আছে, যথা—

"সৌমিনীদেবতাভক্তঃ শাণ্ডিলাখ্য-ঋষেঃ কুলে।
মহারাজ ইতি খ্যাতস্ত তোহভূত্তব শঙ্করঃ।
তদন্বয়ে চক্রবর্ত্তী দ্যুমৎসেন ইতীরিতঃ।
তদন্বয়ে বীরসেনঃ কান্তিমালী ততোহপি চ।।"

সহ্যাদিরে খণ্ডে পূর্ব্বার্দ্ধে ৩৪।২৫-২৬ শ্লোঃ।

হাণ্টার সাহেব মনে করেন, বীরসেন অযোধ্যা হইতে বাংলায় আগমন করেন। দেবীপুরাণে "অযোধ্যায়" বীরসেন নামক রাজার নাম আছে। আনন্দভট্টের "বল্লাল-চরিতে" আছে—বীরসেন কর্ণের বংশে জন্ম-পরিগ্রহ করেন, এবং অঙ্গদেশ হইতে গৌড়ে আগমন করেন।[২] ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বীরসেন নামক অনেক রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। "হর্ষ-চরিতে" আছে-রাজ-গজাধ্যক্ষ স্কন্দগুপ্ত হর্ষবর্ধনকে বলিতেছেন, মহাদেবীর গৃহের গূঢ় ভিত্তিতে লুক্কায়িত থাকিয়া মহাদেবীর ভ্রাতা বীরসেন স্ত্রী-বিশ্বাসী কলিঙ্গ-রাজের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। "হর্ষচরিতেই" সৌবীরপতি অন্য এক বীরসেন নাম পাওয়া যায়। এই সকল বীরসেন—সেনবংশের পূর্বপুরুষ নহেন; উমাপতি ধর স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—"বীরসেন দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র ছিলেন। সেন রাজবংশীয় অনেক রাজা শঙ্কর গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করিতেন; ইহাতে বোধ হয়, সহ্যাদ্রি খণ্ডে যে বীরসেনের নাম আছে, তিনিই সেনবংশের পূর্বপুরুষ।" বলা বাহুল্য ইহা বিচারসহ নহে, অনুমান মাত্র।

সামন্তসেন ঃ

বীরসেনের বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবত সামন্তসেনের পূর্ববর্তী সেন নৃপতি রাঢ়দেশে বাস করিতেন। কাটোয়া হইতে ছয় মাইল দূরবর্তী সীতাহাটি গ্রামে আবিষ্কৃত বল্লাল সেন দেবের তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাহার (সেই চন্দ্রদেবের) সমৃদ্ধ বংশে অনেক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বিশ্বনিবাসীগণকে নিরন্তর অভয় দান করিয়া বদান্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন; এবং ধবল কীর্তিতরঙ্গে আকাশ-তলকে বিধৌত করিয়াছিলেন। তাহারা সদাচার পালন-খ্যাতি গর্বে গর্বান্বিত রাঢ় দেশকে অননুভূত [অশ্রুতপূর্ব] প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন।"

"তাহাদিগের বংশে,—প্রবল প্রতাপান্বিত, সত্যনিষ্ঠ, অকপট, করুণাধার, শত্রু-সেনা সাগরের প্রলয়-তপন, সামন্ত সেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কীর্তি-জ্যোৎস্নায় সমুজ্জ্বল শোভাপ্রাপ্ত হইয়া প্রিয়জনরূপে কুমুদ-বনের উল্লাস-লীলা সম্পাদক শশধর রূপে প্রতিভাত হইতেন; এবং আজন্ম স্নেহপাশ-নিবদ্ধ বন্ধুগণের মনোরাজ্যে সিদ্ধি প্রতিষ্ঠার শ্রীপর্বতের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন।

আমরা পূর্বে দেবপাড়া গ্রামে আবিষ্কৃত প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের শিলালিপি হইতে জানিতে পারি যে, "সামন্ত সেন কর্ণাট লক্ষ্মীর লুণ্ঠনকারী দস্যুগণকে একাকি বধ করিয়াছিলেন। সামন্ত সেন বৃদ্ধবয়সে গঙ্গাতীরে হোমধূম-সুগন্ধী ঋষিগণের বাসস্থানে বিচরণ করিতেন। সামন্ত

সেনের কোনও খোদিত লিপি বা তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার পত্নীর নামও সেন রাজগণের কোনও লিপিতে দেখা যায় না।

সামন্তসেন শেষ বয়সে গঙ্গা-পুলিনে আসিয়া বাস করেন যথা ঃ—

"উদ্‌গন্ধীন্যাজ্য ধূমৈর্মৃগ শিশুরপীতখিন্ন বৈথানসস্ত্রী
স্তন্য ক্ষীরাণি কীর-প্রকর-পরিচিত ব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনাসেব্যন্তে শেষ বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গহ্‌গাপুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যশ্রমাণি।।

সামন্ত সেনকে "ব্রহ্মপারায়ণানি" বা ব্রহ্মবাদী বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সম্ভবত তিনি কর্ণাট হইতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আসিয়া, গঙ্গাতীরে বাস-পূর্বক শেষ বয়স ধর্মচিন্তায় অতিবাহিত করেন। প্রথম ভবদেবভট্ট সামন্তসেনের মন্ত্রী ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, সামন্তসেন হইতে নবদ্বীপের পত্তন হয়।"

হেমন্তসেন ঃ

সামন্তসেন হইতে হেমন্তসেন দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃষভলাঞ্ছন মহাদেবের পদপঙ্কজে ভ্রমরবৎ [লীন] থাকিতেন। গুণগ্রামই তাঁহার অহঙ্কার ছিল। তিনি [সরোবর-শোভা বিধ্বংসী] হেমন্তকালের ন্যায়-মাত্র সরোবরের প্রলয় বিধান করিতেন।" দেবপাড়ার শিলা-লিপিতে হেমন্তসেন সম্বন্ধেও এইরূপ লিখিত আছে যে, তিনি—

"অচমপরমাত্মজ্ঞানভীষ্মাদমুষ্মা-
ন্নিজভুজমদমত্তা রাতিমারঙ্কবীরঃ।
অভবদন বসানোন্তিন্ন নির্নীক্ত তত্তদ্
গুণনিবহমহিয়ম্বাং বেষ্ম হেমন্ত সেনঃ।

নিজ ভুজমদমত্ত অরাতিগণকে বিনাশ করিয়া তিনি বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হেমন্ত সেনের পত্নীর নাম ছিল যশোদেবী। যথা—

"ম-হারাজ্ঞী যস্য স্বপর নিকিলান্তঃ পুরবধূ—
শিরোরত্ন শ্রেণী কিঁরণ সরণি স্মের চরণা।
নিধিঃ কান্তেঃ সাধ্বী-ব্রতবিতত নিত্যোজ্জ্বল বশা
যশোদেবী নাম ত্রিভুবনমনোজ্ঞাকৃতিরভূৎ।

কুলজিগ্রন্থে লিখিত আছে যে, হেমন্ত সেন,— সুবর্ণরেখাতীরে কাশীপুরীতে রাজত্ব করিতেন। সেখান হইতে দক্ষিণ-বঙ্গ দিয়া আসিয়া পূর্ববঙ্গাধিকার করেন। মেদিনীপুর জেলার কাশীয়াড়ির প্রাচীন নাম কাশীপুরী। ঈশ্বরের বৈদিক কুলপঞ্জি হইতে জানা যায়, হেমন্তসেনের নামান্তর ত্রিবিক্রম। রামদেবের বৈদিক কুলমঞ্জরাতে হেমন্তসেন ত্রিবিক্রম নামে অভিহিত হইয়াছেন।[২]

হেমন্ত সেন হইতে বিজয়সেন নামধেয় পৃথ্বীপতি জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। তিনি সমগ্র নরপালগণের রাজচক্রবর্তী হইয়া অকৈতব [ছল শূন্য] বিক্রমে সাহসাঙ্ক [বিক্রমাদিত্যকে] তিরস্কৃত করিয়াছিলেন; তাহার যশোগীতি দিকপালগণের রাজনগরীতে কীর্তিত হইত"।

বিজয়সেন—শ্রীবিক্রমপুর

বিজয়সেন কর্তৃক পূর্ববঙ্গ অধিকার ঃ

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"বিজয়সেনই সেনরাজ বংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি। অনুমান হয় যে, বিজয়সেন প্রথমে রাঢ়দেশের অংশ-বিশেষের এবং পরে সমগ্র রাঢ়দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। উৎকলরাজ অনন্ত বর্মা চোড়গঙ্গ যখন গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন বিজয়সেন বোধ হয় পালবংশীয় গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে বোধ হয় সমগ্র উত্তর-রাঢ়া ও দক্ষিণ-রাঢ়া তাহার করতলগত হইয়াছিল। বিজয়সেনই বোধ হয় পূর্ববঙ্গে বর্ম-বংশীয় ভোজবর্মা অথবা তাহার উত্তরাধিকারীর অধিকার লোপ করিয়াছিলেন। পাল-বংশীয় গৌড়েশ্বর-গণের সহিত সেন-বংশীয় রাজগণের প্রীতি-বন্ধন ছিল না, কারণ রামপাল যখন দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া সাহায্যভিক্ষার জন্য দেশ-ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন সেনরাজগণ তাহাকে সাহায্য করেন নাই। তাহারা কৈবর্তবিদ্রোহ দমনে যোগদান করিলে সন্ধ্যাকর নন্দী অবশ্যই রাম-চরিতের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহাদিগের নামোল্লেখ করিতেন।"

বিজয়সেন বীরপুরুষ এবং দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। বল্লালসেন দেবের তাম্রশাসন হইতে তাহা বেশ সুস্পষ্ট ভাবে জানিতে পারা যায়। "তাঁহার শত্রু বনিতাগণ বিধবা হইয়া পলায়নার্থ বনান্তে ভ্রমণ করিতে নয়ন-জল-মিশ্রিত কজ্জ্বল-চিহ্নিত হার-মুক্তাদল সমূহ ছিন্ন করিয়া (ইতস্তত) ভূমিতলে বিক্ষিপ্ত করিলে, তাহাদিগের কুশবিক্ষত চরণতলের রুধির লিপ্ত (সেই) মুক্তাফল-সমূহ, গুঞ্জামালাধারিণী রমণীয় রমণীগণের স্তনকলসে ঘনালিঙ্গন লোলুপ পুলিন্দগণ (গুঞ্জা-ভ্রমে-লালকুঁচ) সযত্নে চয়ন করিয়া লইত।"

[এই] রাজা অবিনয়ের নিরাকরণ মানসে [স্বয়ং] ধনুর্বাণ হস্তে, কার্তবীর্যের ন্যায় প্রতি গৃহে ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়ায় [উচ্চারিত] মন্ত্রপদ সকল জীব-লোককে [সর্ব প্রকার] ঈতি শূন্য করিয়া বিনয় মার্গে সংস্থাপিত করিয়াছি ।"

গৌড়েশ্বরের পরাজয় ঃ

দেবপাড়া-লিপি হইতে জানা যায় যে, বিজয়সেন সমগ্র বরেন্দ্রভূমি স্বীয় করতলগত করিয়াছিলেন। বিজয়সেন গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়া কামরূপাধিপতিকে দমন করিয়াছিলেন এবং কলিঙ্গ নৃপতিকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। কামরূপ ও কলিঙ্গ বিজয়ের পরে বিজয় সেন রাজা, বীর, রাঘব ও বর্ধন নামধেয় নরপতিগণকে পরজিত করিয়াছিলেন। বিজয়সেন মিথিলার রাজা নান্যদেবকেও পরাজিত করিয়াছিলেন।[৩]

বিজয়সেন—"পুরুষোত্তমের [বিষ্ণুর] কান্তা পদ্মালয়ার [লক্ষ্মীর] ন্যায় চন্দ্রশেখরের [মহাদেবের] কান্তা গৌরীর ন্যায়, এই জগদ্বীশ্বরের [বিজয়সেন দেবের] অন্তঃপুর চূড়ামণি প্রধানা মহিষী **বিলাসদেবী** দীপ্তিলাভ করিতেন। তিনি সুতপস্যার পূণ্য ফলে গুণ-গৌরবে অতুলনীয় **বল্লাল সেন** [নামক] পুত্রকে প্রসব করিয়াছিলেন।

বিজয়সেন শূরবংশের কন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করেন, তাহার পুত্রের নাম বল্লাল সেন। বিজয়সেন প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর-কাল রাজত্ব করেন।

তাম্রশাসনের পরিচয় ঃ

বিজয় সেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তাম্রশাসনখানি প্রচারের জন্য স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহাসিক মহাশয়ের নিকট বাঙালি মাত্রেই ঋণী থাকিবেন। তিনি এই তাম্রশাসনের বিবরণ ১৩১৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যার "প্রবাসী" পত্রিকায় এবং ১৩২০

সালের আষাঢ় সংখ্যা "মানসী" পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। রাখালবাবু লিখিয়াছেন—বিজয় সেনের ৩১শ রাজ্যাঙ্গে সম্পাদিত একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজয়সেন স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, এবং বিলাস দেবীর গর্ভজাত তাহার পুত্র বল্লাল সেন পিতৃরাজ্যের অধিকার-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিজয়সেনদেবের একখানি শিলালিপি ও একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিলালিপিখানি পূর্বোক্ত দেবপাড়ার শিলালিপি। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিজয়সেন প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের জন্য একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার সম্মুখে একটি বৃহৎ হ্রদ খনন করিয়াছিলেন। রাজসাহি জেলার দেবপাড়া গ্রামে এই বৃহৎ হ্রদ-তীরে পাষাণ নির্মিত প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। প্রসিদ্ধ কবি উমাপতি ধর কর্তৃক এই প্রশস্তি রচিত হইয়াছিল এবং ইহা বারেন্দ্রক শিল্পী-গোষ্ঠীচূড়ামণি রাণক শূলপাণি কর্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বিজয়সেনের তাম্রশাসনখানি কোনও স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। কয়েক বৎসর পূর্বে জনৈক ভদ্র ব্যক্তি ইহা পাঠোদ্ধারের জন্য আমার নিকট আনিয়াছিলেন। পাঠোদ্ধার শেষ হইলে তিনি উহা লইয়া গিয়াছেন এবং প্রতিশ্রুত হইয়াও আমাকে উহার উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিবার অবসর প্রদান করেন নাই। এখন শুনিতেছি, ইহা সুমেকার (Schumacher) নামক জনৈক বিদেশীয় ভদ্রলোকের সম্পত্তি, তৎকালে এই তাম্রশাসন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম তদবলম্বনেই নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই তাম্রশাসনখানির দ্বারা বিজয়সেনদেব তাহার মহিষী বিলাসদেবীর কনকতুলা-পুরুষ মহাদানের হোমের দক্ষিণাস্বরূপ পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির খাড়ি বিষয়ের ঘাসসম্ভোগভাট্ট বড়া গ্রামে চারিটি পাটক, কান্তিজোঙ্গী নিবাসী মধ্যদেশবিনির্গত রত্নাকর দেবশর্মার প্রপৌত্র, রহস্কর দেবশর্মার পৌত্র, ভস্কর দেবশর্মার পুত্র বাৎস্যগোত্রীয়, ঋগ্বেদের আশ্বলায়নশাখাধ্যায়ী ষড়ঙ্গের অনুশীলনকারী উদয়কর শর্মাকে তাহার একত্রিংশ রাজ্যাঙ্কে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন "বিক্রমপুরোপকারিকামধ্যে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিলাসদেবী শূরবংশজাতা।"[৪]

বিজয়সেন রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর ও বিক্রমপুর রাজ্য ঃ

আমরা ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করিতে পারি যে, বিজয়সেনের ৩১ রাজ্যাঙ্কের পূর্বেই বিক্রমপুরে বিজয়সেনের রাজ্য এবং রাজধানী সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এবং বর্মারাজগণের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, বিজয়সেনই বর্মবংশীয় ভোজবর্মা বা তাহার উত্তরাধিকারীর হাত হইতে বঙ্গের আধিপত্য হস্তগত করিয়াছিলেন। 'গৌড়রাজমালা' প্রণেতা বলেন,—"বর্মবংশের অভ্যুদয় এবং মদনপালের দুর্বলতা-নিবন্ধন গৌড়রাষ্ট্র যখন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সামন্ত সেনের পৌত্র [হেমন্ত সেন ও রাজ্ঞী যশোদাদেবীর পুত্র] বিজয়সেন বরেন্দ্রভূমিতে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হেমন্তসেন একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি বাহুবলে গৌড় রাজ্যের কোনও অংশ করতলগত করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, বলা যায় না। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয়সেন, রাঢ়ে এবং বঙ্গে, বর্মরাজ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়াই সম্ভবত স্বীয় অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য বরেন্দ্র অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। অথবা হেমন্তসেনই হয়ত বরেন্দ্রে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এবং পরে সুযোগ পাইয়া, বিজয়সেন তথায় স্বতন্ত্র রাজ্যস্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন।"[৫] "গৌড় রাজমালার" এই মত নির্বিবাদে গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা হেমন্তসেন যে বরেন্দ্রে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

বিজয়সেনের আবির্ভাব কাল ঃ

বিজয়সেন, সেনবংশের প্রধান নৃপতি এবং তাহার সময় হইতেই যে রাজ্য বিস্তৃত হয় সেকথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অনেক রাজাই তাহার অধীনতা স্বীকার করেন। বল্লাল সেন স্বকৃত "দানসাগর" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীন্নরেন্দ্রো
দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বম্।
শিখরবিনিহিতাজ্ঞা বৈজয়ন্তীং বহন্তঃ
প্রণতিপরিগৃহীতা প্রাংশবো রাজবংশাঃ।।

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অতি প্রাচীন কুলগ্রন্থোক্ত রাঢ়ীর-বারেন্দ্র-দোষ নামক কারিকায় আছে,— অনেক বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বন করিয়াছিলেন; —বিজয়সেনের গৌড়াধিকারের পর বৈদিক ব্রাহ্মণদের চেষ্টায় হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হন।

উমাপতিধর লিখিয়াছেন,—বিজয়সেনের কীর্তিমালা প্রাচেতম্ অর্থাৎ, বাল্মীকি কিংবা পরাশরনন্দন বর্ণনা করিতে পারেন,—আমি কেবল বাক্য পবিত্র করিবার জন্য কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম। উমাপতিধর কৃত এই প্রশস্তি-পত্র বারেন্দ্র-শিল্পী-কুলচূড়ামণি রাণক শুলপাণি খনন করিয়াছিলেন [চখান] শুলপাণি, ধর্মোপনপ্তা মদন দাসের নপ্তা ও বৃহস্পতির পুত্র ছিলেন। এখন যেমন দলিলে লেখকের নাম থাকে, তখনও সেইরূপ তাম্রশাসনে খনকের নাম থাকিত।

বিজয়সেনের রাজত্বকালে মহাপ্রতাপশালী চোড়গঙ্গদেব কলিঙ্গাধিপতি ছিলেন। চোড়গঙ্গাদেব ৯৯৯ শকে কলিঙ্গের রাজা হন। বিজয়সেনের প্রশস্তিতে লিখিত আছে, বিজয়সেন কলিঙ্গরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। বিজয়সেনের সহ চোড়গঙ্গের বন্ধুত্ব ছিল। বিজয়সেন কলিঙ্গ রাজ্য জয় করিয়া বন্ধু চোড়গঙ্গকে প্রদান করেন, ইহাই সম্ভব। ৯৯৯ শকে বিজয়সেনের বয়স ৪৮ বৎসর ছিল। নীলকণ্ঠ রচিত "যশোধর বংশমালা" নামক বৈদিককুলগ্রন্থ মতে বিজয়সেন ৯০৪ শকে গৌড়ে রাজা হন। বিজয়সেনের নামান্তর ধীসেন, যথা—

"ধিয়া ধীসেনসংজ্ঞোহসৌ বিজিতারাতি সংহতিঃ।
বিজয়নামকশ্চাসীৎ সর্ব্বভূমিভুজাং বরঃ।।
[সাতকড়ি ঘটক কৃত কুলপঞ্জী]

বিজয়সেনের [**বৃষভশঙ্করগৌড়েশ্বর**] উপাধি ছিল, উপাধি দেখিলে বোধ হয় তিনি শৈব ছিলেন। "সেকশুভোদয়ায়" লিখিত আছে, তিনি শিবপূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। ১০৪১ শকে ৯০ বৎসর বয়সে বিজয়সেনের মৃত্যু হয়।

'গৌড়রাজমালার' লেখক রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ডাঃ কিলহর্ণের মতানুসরণ করিয়া সামন্ত সেনকে খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে হেমন্ত সেনকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এবং বিজয়সেনকে দ্বিতীয়পাদে [আনুমানিক ১১২৫-১১৫০ খ্রিস্টাব্দ] স্থাপিত করিতে চাহেন।

বিজয়সেনের নৌবিতান ঃ

বিজয়সেন যে অমিতবিক্রমশালী বীরপুরুষ ছিলেন সে বিষয় পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রশাসনে বিজয় সেনের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে —"সেই [হেমন্তসেনদেব হইতে বিজয়সেন নামধেয় পৃথ্বিপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র নরপালগণের রাজচক্রবর্তী হইয়া অকৈতব [ছল শূন্য] বিক্রমে সাহসাঙ্ক বিক্রমাদিত্যকে তিরস্কৃত করিয়াছিলেন, তাহার যশোগীতি দিকপালগণের রাজনগরীতে কীর্তিত হইত।"[৬]

দেবপাড়া প্রশস্তি হইতে ইহাও জানিতে পারা যাইতেছে যে, বিজয় সেনের নৌ-বিতান বা নৌ-বিহার ছিল। যথা—

"পাশ্চত্য জয়-চক্র কেলিষু যস্যযাবদ্
গঙ্গা প্রবাহ মনুধাবতি নৌবিতানে
ভর্গস্য মৌলি সরিদম্ভাসি ভস্মপঙ্ক
লগ্নোজ্ঝিতেব তরিরিন্দুকলা চকাস্তি।।
[দেবপাড়া প্রস্তরলিপি ২২ শ্লোক]

অনেকে অনুমান করেন যে, বিজয়সেন সাহসাঙ্ক নামক একজন নৃপতির সহিত যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী হইয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। আমাদের মনে হয় প্রশস্তিকার ভারত প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের সহিত তুল্যজ্ঞান করিয়া সাহসাঙ্ক নামে পরিচিত করিয়াছেন।

[In verse 7, Vijayasena is qualified by the phrase Nirvayaja Vikrama tiraskrita-Sahasanaka which according to Mr. Banerji means "Vijayasena defeated a king named Sansanka (Sahasanka). He concludes that Sahasanka is to be identified with a prince called Salvahandndeva, mentioned in a grant of his son Somavarmadeva, which the late Professor Keelhorn referred to about 1050 A. D. But it is doubtful whether the passage in question has any historical bearing at all. The poet seems to indicate by means of a rhetoric that Vijayasena weilded great power (Vikrama) which eclipsed even that of Vikramaditya. This most probably bears an allusion to the mythical hero of that name and not to any of Vijayasena's contemporaries. See *Inscriptions of Bengal* N. G. Majumdar, Rajshahi, 1929].

অর্থাৎ, "পাশ্চাত্য চক্র জয় করিবার জন্য ক্রীড়াচ্ছলে তিনি গঙ্গা-প্রবাহ-পথে যে নৌ-বিতান প্রেরণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একখানি ভর্গের মৌলিস্থিত গঙ্গার পঙ্কে [মহাদেবের শিরস্থিত] নিমজ্জিত হইয়া ভস্মে ইন্দুকলার ন্যায় জ্বলিতেছে।"

এই নৌ-বিতান বিজয়সেন গঙ্গার বীচিমালা বিক্ষুব্ধ করিয়া কোনও রাজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই।—'গৌড়রাজমালা' প্রণেতার মতে "গৌড়রাষ্ট্রের পশ্চিমাংশ [পাশ্চাত্য চক্র] জয় করিবার জন্য, তিনি যে 'নৌ-বিতান' প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। দক্ষিণ দিকে, বঙ্গে এবং রাঢ়ে, বর্ম্মরাজ" কর্তৃক বিজয়সেনের গতি রুদ্ধ হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে হয় যে, পাশ্চাত্য চক্র জয় করিবার জন্য বিজয়সেনের যে নৌ-বিতান গঙ্গার প্রবাহ পথে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইবার কোনওই প্রয়োজন নাই। বিশেষত বর্ম্মরাজগণের প্রভাব প্রতিহত হইবার পরেই **বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার** হইতে সম্ভবত এই নৌ-বিতান প্রেরিত হইয়াছিল। 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা যতীন্দ্রবাবুর এই অনুমান আমরা সমর্থন করি। আমাদেরও মনে হয় যে, নদীমাতৃক-দেশ **বিক্রমপুর হইতেই পরবর্তীকালে এই নৌ-বিতান প্রেরিত হইয়াছিল।**

একথা সম্পূর্ণ সত্য যে—

"It was Vijaya Sen who once for all established the supremacy of the Senas, and practically brought the whole of Eastern India under his sway. It was he who conquered Varendra and Pundra from a Pala king described as Gaudendra in Sena Epigraphas."

বিজয়সেন যে পূর্ব-ভারতের বহুস্থান জয় করিয়াছিলেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ বিদ্যমান নাই। এই নৃপতি বিজয়সেনই গৌড়েন্দ্র উপাধিক একজন পাল-নৃপতির হস্ত হইতে বারেন্দ্র এবং পৌণ্ড্র অধিকার করিয়াছিলেন।[৭]

দায়ভাগ রচয়িতা জীমূতবাহন, বিজয়সেনের অমাত্য ও প্রাড়বিপাক ছিলেন। বিজয়সেনের এক নাম ছিল বিস্মক্সেন। এড় মিশ্রের কারিকায় আছে ঃ—

"পঞ্চ গৌড়ে তদা সম্রাট বিষ্মকসেনো মহাব্রতঃ।
জীমুতোহপি নৃপামাত্যঃ স প্রাড় বিবাক ঈরিতঃ।।

বিজয়সেনের রাজধানী বিজয়পুর ও শ্রীবিক্রমপুর ঃ

"গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেন—"বিজয়সেন, ভূরশুটে **বিজয়পুর** নামক একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন।" অনেকে অনুমান করেন যে, রাজসাহির নিকটবর্তী বিজয়নগর গ্রামই প্রাচীন বিজয়পুর। দেবপাড়া প্রশস্তি অর্থে বিজয়সেনের স্তুতিপূর্ণ শ্লোকসমূহ হইতে বিশেষ করিয়া বিজয়সেন কর্তৃক প্রদ্যুম্নেশ্বর দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠার বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। দেবপাড়া লিপির পরে আমরা বিজয়সেনদেবের যে তাম্রশাসনখানা [বারাকপুর] পাই, তাহার ২২-২৩ পংক্তিতে সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত আছে—

"শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ"

কাজেই ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, বিজয়সেন বিজয়পুর নামক নগর প্রতিষ্ঠা করিলেও তাহার প্রকৃত রাজধানী স্কন্ধাবার শ্রীবিক্রমপুরেই ছিল। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে তাহার পত্নী বল্লালসেন দেবের জননী বিলাসদেবী "কনক-তুলা-পুরুষ মহাদান" বিক্রমপুরোপকারিকা মধ্যে, করিবেন কেন?

'জয়স্কন্ধাবার' শব্দে যে রাজধানী বুঝায় তাহা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি। ডাক্তার কিলহর্ণের (Dr. Kielhorn) মতে স্কন্ধাবার [Skandhavara] শব্দে রাজধানীকেই বুঝায়। হেমচন্দ্র কৃত 'অভিধানচিন্তামণিতে'[৮] আছে—

স্কন্ধাবারঃ রাজধানী কোট্ট দুর্গেঃ পুনঃ সমে।।
গয়াযু গয়ারাজর্ষৈ কন্যা কুব্জং মহেদয়ম্।।

হলায়ুধ বলেন—

স্কন্ধাবারঃ ইতি প্রাক্তৈঃ রাজধানী নিগদ্যতে।
শানানগরমাখ্যাতং তথোপনগরংবুধৈ।।

'স্কন্ধাবার' শব্দ যে চন্দ্র, বর্ম ও সেন রাজগণের তাম্রশাসনেও 'সখলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ বলিতে 'সেনানিবাস' বিক্রমপুরকে না বুঝাইয়া রাজধানী বিক্রমপুরকেই' বুঝাইতেছে, তদবিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ নাই। বিজয়সেনের বারাকপুর তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে—

"বিক্রমপুরোপকারিকামধ্যে সতি সোমগ্রহে অস্মন্মহাদেবী শ্রীমদ্বিলাসদেব্যা কনকতুলপুরুশমহাদানে হোকর্ম দক্ষিণা . . . . "

স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হইল—

To this Mr. Majumder had added a lengthy note, suggesting that this passage makes it highly probable that *Vikrampura* was one of the Capitals, if not the capital of Vijayasena ; and in our opinion he is right when he says, that *The word upakarika*, it may be argued, means only a temporary camp for royal residence, and not a fixed palace, But the very fact that the queen performed and elaborate *tulapurusha-maha-dana* within the *Vikrampura-upakarika* is itself sufficient to show that Vijayasena had something like permanent residence, and not a temporary camp at Vikramapura.*This together with the fact that the Sena inscriptions invariably mention Vikramapura as the Skandhavara, uumistakably demonstrates, that it was Vikrampura which was the capital of the Sena kings of Bengal.*

বল্লালসেন

বিজয়সেনের পর তাহার পুত্র বল্লালসেন রাজা হইলেন। তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে —পুরুষোত্তমের [বিষ্ণুর] কান্তা পদ্মালয়ার [লক্ষ্মীর] ন্যায়, চন্দ্রশেখরের [মহাদেবের] কান্তা গৌরীর ন্যায়, এই জগদীশ্বরের [বিজয়সেন দেবের] অন্তঃপুর-চূড়ামণি প্রধানা মহিষী বিলাসদেবী দীপ্তি লাভ করিতেন।"

"তিনি সুতপস্যার পূণ্যফলে গুণগৌরবে অতুলীয় বল্লালসেন [নামক] পুত্রকে প্রসব করিয়াছিলেন। সেই অদ্বিতীয় বীর, নরদেব সিংহ পুত্র পিতার অব্যবহিত পরেই সিংহাসনাদ্রিশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন।"

বল্লালসেনের নাম ইতিহাসে অমর হইয়া আছে। তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তাহার জন্ম সম্বন্ধে নানা অলীক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সে সমুদয় যে বিশ্বাসযোগ্য নহে তাহা সুধী ব্যক্তিমাত্রে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আমাদের দেশে যাহারা বড় হন, তাহাদিগকে 'অবতার' করিয়া তোলা এবং তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া নানারূপ অলৌকিক কাহিনী রচনা করা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, কাজেই আমরা ঐ সমুদয় কিংবদন্তী ও কুলপঞ্জির উপন্যাস সযত্নে পরিহার করিলাম।[১০]

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"বল্লালসেনের রাজ্যকালের কোনও ঘটনাই অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই।" একথা সত্য। তাঁহার লিখিত দানসাগরে লিখিত সেনবংশ-বর্ণনা হইতে জানা যায়—

"ধর্ম্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিক পাদোচ্ছেদায় জাতঃকলৌ।
শ্রীকান্তোহোপি সরস্বতীং পরিবৃতঃ প্রত্যক্ষ নারায়ণঃ

বল্লালসেন সম্বন্ধে বিবিধ কিংবদন্তীর মূলে 'প্রত্যক্ষ নারায়ণ' এই শব্দ দুইটি যে অনেক কাজ করিয়াছে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যিনি 'প্রত্যক্ষ নারায়ণ' তাঁহার জন্মের ইতিহাসে অলৌকিকত্ব আরোপিত হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

বল্লালসেনের আবির্ভাব-কাল ঃ

বল্লালসেনের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে নানারূপ তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা চলিয়াছে। বর্তমান সময়ে পণ্ডিতগণ বিবিধ গবেষণার দ্বারা সেনরাজাদের একটা কাল-নির্দেশ করিয়াছেন। তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "দান-সাগরের" এবং "অদ্ভুতসাগরের" রচনা-কাল বিজ্ঞাপক শ্লোকগুলিকেও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান করেন। বিক্রমপুর ধলছত্র গ্রামনিবাসী বৈদিক-ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত ও বাগ্মী স্বর্গত তারকচন্দ্র সংখ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়িতে বল্লালসেন-কৃত একখানি 'দানসাগরে' গ্রন্থ ছিল, সেই বইখানা ঢাকার তদানীন্তন কমিশনার মিঃ টি. র্যাঙ্কিন মহাশয় উক্ত সংখ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই মূল গ্রন্থখানা বর্তমানে কোথায় আছে তাহা আমরা অবগত নহি, সে বইখানার অনুসন্ধান আবশ্যক, তাহা হইলে হয়ত-বা প্রকৃত সত্য কিছু পাইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে।

বর্তমান সময়ে সেনরাজগণের বংশলতা নিম্নলিখিত রূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে :

সেনরাজ বংশলতা

সামন্তসেন [আনুমানিক ১০৫০-১০৭৫ খ্রিঃ]
|
হেমন্তসেন [১০৭৫-১০৯৭]
|
বিজয়সেন [১০৯৭-১১৫৯]
|
বল্লালসেন [১১৫৯-১১৮৫]
|
লক্ষ্মণসেন [১১৮৫-১২০৬]
|
বিশ্বরূপসেন [১২০৬-১২২৫] কেশবসেন [১২২৫-১২৩০]

এ বিষয়ে বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। সেন-নৃপতিরা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে গৌড়-বঙ্গে প্রতিষ্ঠালাভ করেন।[১] "দানসাগর" রচনা-কাল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া সুপণ্ডিত ও বিচক্ষণ ঐতিহাসিক রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ 'গৌড়রাজমালায়' লিখিয়াছেন—"দানসাগর স্মৃতি নিবন্ধ এবং "অদ্ভুতসাগর" জ্যোতিষের নিবন্ধ। যাহারা স্মৃতি ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন, তাহারাই এই সকল পুস্তকের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতেন বা করাইতেন। স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলনকারীগণ, গ্রন্থকারের জীবনী সম্বন্ধে বা গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে চিরকালই উদাসীন। সুতরাং কোনও কোনও লিপিকর, অনাবশ্যক বোধে, আদর্শ পুস্তকের কাল-বিজ্ঞাপক রচনা পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন।"[১১]

আমাদের নিকট 'গৌড়রাজমালা' প্রণেতার এই মত সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

বল্লালের রাজ্য-শাসন দক্ষতা ঃ

বল্লালসেন শাসন-দক্ষ নৃপতি ছিলেন। তাঁহার নাম বর্তমানকাল পর্যন্তও সমভাবে উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে। 'গৌড়ের ইতিহাস' প্রণেতা বলেন—"বাংলার কোনও হিন্দু রাজা বল্লাল সেনের ন্যায় প্রসিদ্ধ হন নাই। তাহার সম্বন্ধে এইজন্যই নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কথিত আছে, তিনি বাংলাদেশের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বারেন্দ্র[২], বঙ্গ[৩], বাগড়ি[৪], রাঢ়[৫], মিথিলা[৬] সমগ্র বঙ্গদেশকে এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

নৃপতি বল্লাল শাসন-শৃঙ্খলার জন্য প্রত্যেক বিভাগে এক-একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে হেমিল্টনের গ্রন্থ হইতে ঐ বিভাগের বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম। তুর্কিগণ কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত যে এই বিভাগ অব্যাহত ছিল, তদবিষয়ে সন্দেহ নাই বলিয়া ব্লকম্যান সাহেব নির্দেশ করিয়াছেন।" একথা সত্য যে, বল্লালের অনেক পূর্ব হইতেই রাঢ়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, উপবঙ্গ প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত ছিল, এবিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। "ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা বলেন—"সুতরাং বল্লালসেনকে এই বিভাগের কর্তা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। হেমিল্টন সাহেব কোনও প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা জানা যায় না। বল্লালসেন 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করিয়া গৌড়বঙ্গে একাধিপত্য লাভ করিলে তিনি যে শাসনসৌকর্যার্থ বিভিন্ন প্রদেশের জন্য পৃথক শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব না হইলেও অদ্যাপি তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এ-বিষয়ে আনন্দভট্ট কর্তৃক বিরচিত 'বল্লাল-চরিতের' পরিশিষ্টে লিখিত আছে ঃ—

"দানসাগর গ্রন্থস্য প্রণেতা লিখিতস্তথা।
বিজয়সেনাত্মজশ্চৈব হেমন্তসেন পৌত্রকঃ।।
বিখণ্ডিতং তেন রাজ্যং পঞ্চখণ্ডেন্ তদ্ যথা।
বঙ্গ বাগড়িবারেন্দ্র রাঢ়াশ্চ মিথিলা তথা।।

"গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেন-"বল্লালসেন রাজা হইয়া আপনার রাজ্য রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ বাগড়ি ও মিথিলা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, এবং প্রত্যেক ভাগে এক-একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। লক্ষ্মণ সেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পূর্ববঙ্গের ভার পান। পূর্ব হইতে গৌড় রাজ্য রাঢ়, বঙ্গ, পুণ্ড্র ও উপবঙ্গ এই কয়টি ভাগে বিভক্ত ছিল। শূর বংশের রাজত্বকালে পুণ্ড্র দেশের বারেন্দ্র নাম হয়। পরবর্তীকালে উপবঙ্গের বাগড়ি নাম হয়।[১] "দিগ্বিজয়প্রকাশ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে আছে ;—

ভাগীরথ্যাঃ পূর্বভাগে দ্বিযোজনতঃ পরে
পঞ্চমযোজন পরিমিতোহ্য পবঙ্গোহি ভূমিপ।
উপবঙ্গে যশোরাদিদেশাঃ কাননসংযুতাঃ
জ্ঞাতব্য নৃপ-শার্দ্দুলবহুলাসু নদীষু চ।।"

বল্লালসেনের পক্ষে রাজ্য-শাসনের সুবিধার জন্য এইরূপ বিভাগ করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই। বল্লালসেন রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলার জন্য রাজ্যকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়াছিলেন, ইহা করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

এই উপবঙ্গ নদী ও জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। বোধ হয় বাগুরি বা বাউরি জাতির নামানুসারে বাগড়ি নাম হইয়াছে। উপবঙ্গের গঠনকালে বারংবার আগ্নেয়-উৎপাত ঘটিয়াছিল। কলিকাতা অঞ্চল খনন করিয়া দেখা গিয়াছে—সে-প্রদেশের অরণ্য, অরণ্য-জন্তু সহ বারংবার বসিয়া গিয়াছিল। বঙ্গ ও উপবঙ্গ ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদ (মেঘনা) ও গঙ্গার বদ্বীপে গঠিত। রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও মিথিলা পূর্ব হইতেই ধন-জনপরিপূর্ণ ছিল ; কিন্তু বাগড়িতে মনুষ্যের বাস ছিল না ; এই স্থান সমুদ্র-গর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিতেছিল। আকবরনামায় ইহার ভাটি নাম দেখা যায়। বাগড়ির দৈর্ঘ্য ৫৫০ মাইল ও বিস্তার ৩১২ মাইল। পূর্বে বিক্রমপুর পদ্মার দক্ষিণে ছিল ; তখন ধলেশ্বরী দিয়া পদ্মা প্রবাহিত হইত ; অতএব বিক্রমপুর, পূর্বে বাগড়ির অন্তর্গত ছিল। এখন উহা বঙ্গের অন্তর্গত হইয়াছে। বাগড়ির এই অংশই প্রাচীন সমতট।" তাহার এই উক্তি প্রমাণসহ নহে।

'যশোহর খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা বলেন—

"বল্লালসেনের সমগ্র রাজ্য পাঁচটি প্রধান "ভুক্তি" বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল, যথা—বঙ্গ, মিথিলা, বারেন্দ্র, রাঢ় ও বাগড়ি ; মিথিলার পূর্ব নাম তীরভুক্তি। এই ভুক্তিগুলি পুনরায় "মণ্ডল" বা মণ্ডলিকায় বিভক্ত ছিল। মণ্ডল অতি প্রাচীন হিন্দু শব্দ। ভাগবতাদি পুরাণেও মণ্ডলের কথা আছে। মুসলমান যুগ হইতে মহল বা জেলা শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রত্যেক জেলার যেমন এক্ষণে কতকগুলি করিয়া সাবডিভিসন বা উপবিভাগ আছে, সে রাজত্বে মণ্ডলসমূহও সেইরূপ কতকগুলি "বিষয়" বা শাসনে বিভক্ত ছিল। এখনও 'বিষয়' কথা চলিয়া আসিতেছে, ক্ষুদ্র জমিদার বা তালুকদার প্রভৃতি "বিষয়ী" লোকে বিষয়-কার্য দেখে এবং বিষয় রক্ষা করে। দেশে কুশাসন থাকিলেও এখন আর "শাসন" কথার পূর্ব অর্থ নাই, ব্রহ্মশাসন প্রভৃতি গ্রামের নাম পূর্ব-শাসনের নাম চিহ্ন রাখিয়াছে।" বিক্রমপুরে 'শাসন' সংযুক্ত অনেক গ্রাম আছে। এখানে শুধু একটি গ্রামের নাম করিলাম, যেমন—'শাসন গাঁ'।

বল্লালসেনের পূর্বেও এইরূপ বিভাগ ছিল এবং তাহা স্বাভাবিক, কেননা শাসন সৌকর্যার্থে

এইরূপ বিভাগ ভারতের সর্বত্রই নৃপতিরা করিয়া আসিয়াছেন, কাজেই বল্লালসেনের ন্যায় একজন নৃপতির পক্ষে এইরূপ বিভাগ করিয়া বিভিন্ন খণ্ডরাজ্য বা ভুক্তির জন্য স্বতন্ত্র রাজধানী এবং শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া স্বাভাবিক, ইহাতে বল্লালের কৃতিত্বেরই কারণ রহিয়াছে, অকৃতিত্বের কোনও কারণ বিদ্যমান নাই।

কৌলীন্য প্রথা ঃ

বল্লালের নাম একটি কারণে বাংলাদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে, তাহা হইতেছে তৎকর্তৃক কৌলীন্য, বা আভিজাত্য সংস্থাপন। একসময় বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ-সমাজে কৌলীন্যের নিদারুণ পীড়নে সমাজ যখন বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তখন বিক্রমপুরের গ্রামে-গ্রামে, মাঠে-মাঠে গীত হইত—

"ভাল ফললো বল্লালীতে,
মিললো বর এক কচমা ছেলে!"

কিংবা—

বল্লালী তুই যারে বাংলা ছেড়ে।
ডুবলো ভারত কদাচারে, সোনার বাংলা যায়রে ছারেখারে!

ইত্যাদি গীত শুনা যাইত—এজন্য বল্লালের নাম বিক্রমপুর অঞ্চলে বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া আছে। কৌলিন্যের প্রবর্তক বল্লালসেনের নাম বংশপরম্পরাগত পরিকীর্তিত হইয়া আসিতেছে।

বল্লালসেন ও কৌলীন্য-প্রথা ঃ

কোনও কোনও ঐতিহাসিক বল্লালসেন কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্তক কিনা সে-বিষয়েই সন্দেহ করেন। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই এই সংশয় উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন—"বল্লালসেনের রাজ্যকালের কোনও ঘটনাই অদ্যাবধি নির্ধারিত হয় নাই। কুলশাস্ত্র-সমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বল্লালসেন কৌলীন্য-প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং, তাহার পুত্র লক্ষ্মণসেন এবং পৌত্র কেশবসেন ও বিশ্বরূপ তাহাদিগের তাম্রশাসন-সমূহে নব প্রচলিত আভিজাত্য বিধির কোনও উল্লেখ করেন নাই। এবং শাসন-গ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের নামোল্লেখ কালেও তাহাদের নূতন পদমর্যাদা উল্লিখিত হয় নাই, এই কারণে কৌলীন্য-প্রথা বল্লালসেন কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল কিনা, সে-বিষয়ে সন্দেহ জন্মে।"

এ সম্বন্ধে আমরা রাখালবাবুর অভিমত গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বংশপরম্পরা গত প্রবাহ ও বিবিধ কুলগ্রন্থ হইতে আমরা এই কৌলীন্য সংস্থাপনের প্রমাণ পাই। সেনরাজগণের তাম্রশাসনে ইহার উল্লেখ নাই বলিয়াই যে ইহা অবিশ্বাস্য এবং কুলশাস্ত্রে অনেক সময়ে অতিরঞ্জিত কথা থাকে বলিয়াই যে তাহার সমুদয় অংশই পরিত্যজ্য তাহা নহে।

"বল্লালী কুলপ্রথা বলিতে কোনও জিনিস ছিল না, এরূপ বলা যায় না। দেশশুদ্ধ পণ্ডিত-ঘটকেরা একেবারে বায়বীয় মন্দির গঠন করিয়াছেন, এরূপ কল্পনা করা অন্যায়। বিশেষত এই কৌলীন্য সম্বন্ধীয় প্রবাদ-কথা এরূপ ভাবে বাঙালির অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, এবং বাঙালির আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই বল্লালী আভিজাত্যের সহিত পরিচিত যে, ইহাতে অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না। প্রবাদ বাদ দিয়া বোধ হয় জগতের কোনও দেশের ইতিহাস রচিত হয় নাই। প্রবাদে রঞ্জিত পল্লবিত কাহিনী থাকিলেও সকল ঐতিহাসিকের নিকট ইহার মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে। বাংলাদেশে বল্লালসেনের মত পরিচিত কোনও হিন্দু রাজা নাই ; বল্লালের ইতিহাস বাদ দিলে বঙ্গের হিন্দুর ইতিহাসে কিছু থাকে না, আর সেই বল্লালী ইতিহাসের নির্যাস এই আভিজাত্য।"

ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তদ্‌ রচিত 'বৃহৎ বঙ্গে' রাখালবাবুর কৌলীন্যপ্রথার মন্তব্য সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"বল্লালসেন কর্তৃক স্থাপিত কৌলীন্য সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কৌলীন্য যে বল্লালকৃত তাহাতে সন্দেহ করেন। কিন্তু আমাদের মতে এই বিষয়টিতে সন্দেহ করিবার কোনও অবকাশ নাই। তিনি বলেন, তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ নাই। * তাম্রশাসনে কোনও রাজার সম্বন্ধে যাবতীয় কথা উল্লেখ থাকিবার কথা নয়। * * যদি বল্লাল সেন এই প্রথা প্রবর্তিত না করিয়া থাকেন, তবে এই অদ্ভুত কৌলীন্য-প্রথার উদ্ভাবক অন্য কেহ অবশ্যই থাকিত, অন্তত জনশ্রুতিতেও তাহার নাম পাওয়া যাইত। কিন্তু সমস্ত বঙ্গদেশে, সর্বশ্রেণীর মধ্যে প্রাচীন শত শত কুলীন গ্রন্থে এই কথাটি পাওয়া যায়—কৌলীন্য-প্রথা বল্লালসেন প্রবর্তিত। যাহারা এই কৌলীন্য-লাভ করিয়াছিলেন তাহাদেরই বংশধরগণ এই কথা পুরুষানুক্রমে জানিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের কুলজি-পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন। দান-সম্বন্ধীয় পুস্তকে কিংবা জ্যোতিষের গ্রন্থে বল্লালসেন কেনই-বা সমাজ-সংস্কারের মত অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিবেন। সুতরাং, দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরে কৌলীন্যের অনুল্লেখ অগ্রাহ্য হইতে পারে না।" রায়বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্রের এই মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।[১২]

চাকুরে বল্লালসেন সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"কাহকে কুলীন পদ দিয়া বাড়াইল
কাহার কুলীন পদ কাড়িয়া লইল।"

বৈদ্যকুল গ্রন্থকার চতুর্ভুজ বলিয়াছেন—

"তেন হি ভূমি পালেন বল্লালসেন মাহাত্মনা।
স্থাপিতা কুল মর্য্যাদা সিদ্ধাদিবংশজন্মনাং।।

"গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেন—"বল্লালসেনের সময় রাঢ়, বরেন্দ্রে কান্যকুব্জা-গত ব্রাহ্মণগণ প্রাধান্য লাভ করেন। বল্লালসেন ইহাদিগকে রাজসংসারের সহ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংবদ্ধ করিবার জন্য ইহাদের সংখ্যা গ্রহণ করেন, ও গুণানুসারে ইহাদের মধ্যে পদমর্যাদার প্রতিষ্ঠা করেন। মর্যাদা-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কুলীন নামে খ্যাত হন। এই কার্যের জন্য বল্লালসেনের নাম বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বল্লালসেন যে সম্মান দান করেন, তাহা বংশগত নয়—ব্যক্তিগত, এখন কৌলীন্য বংশগত হওয়ায়, বিবিধ বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে। বিজয়সেন বৈদিক মার্গানুগত ছিলেন, বল্লাল সেন তান্ত্রিক মতের সমাদর করিতেন। যাহারা বল্লাল সেনের তান্তিক কুলাচারের সমর্থন করিয়াছিলেন, বল্লাল সেন তাহাদেরই সম্মান বাড়াইয়া তাহাদিগকে কৌলীন্য-মর্যাদা প্রদান করেন। তন্ত্রের যে নববিধ আচার আছে, বল্লালসেন সেই আচার লক্ষ করিয়া কুলীনত্ব দেওয়ার নিয়ম করেন। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, বল্লালসেনের পূর্বেও সমাজে কৌলীন্য-প্রথা প্রচলিত ছিল।"[২]

বল্লালসেন নিয়ম যে, প্রতি ছত্রিশ বৎসর অন্তর, কুলীনদের নির্বাচন হইবে। এই সময়ে কৌলীন্যপদপ্রাপ্ত দুঃশীল ব্যক্তিগণ কৌলীন্যভ্রষ্ট এবং অকুলীন সদাচার ব্যক্তিও কৌলীন্য পাইতে পারিবেন। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের সময় ইহার নির্বাচনের সময় অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি নির্বাচন-প্রথা উঠাইয়া দেন, এবং নিয়ম করেন যে, কৌলীন্য-মর্যাদা বংশানুগত হইবে।

আদিশূর-নৃপতি শকাব্দ সহস্র শতাব্দের মধ্যভাগে কান্যকুব্জ দেশ হইতে গৌড়দেশে ব্রাহ্মণ আনেন। কান্যকুব্জগত বিপ্র-সন্তানেরা বারেন্দ্র এবং রাঢ়দেশে বসতি করিয়া বংশবিস্তার করেন। আদিশূরের ৭।৮ পুরুষ পরে যখন বল্লালসেন রাজা হইয়াছিলেন, তখন তিনি কান্যকুব্জাগত

বিপ্র-সন্তানগণকে অসদাচারপরায়ণ এবং বেদজ্ঞানী-বিমূঢ় দেখিয়া তাঁহাদের উন্নতির মানসে তাহাদিগকে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র, এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া, রাঢ় দেশবাসী রাঢ়ীয়গণের মধ্যে আদিশূরের প্রপৌত্র ধরাশূর কর্তৃক স্থাপিত কৌলীন্য-মর্যাদার উৎকর্ষ-বিধান তথা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য-মর্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন। বল্লালসেন ঐরূপ কৌলীন্য-মর্যাদার উৎকর্ষ-বিদান করিয়াই নিরস্ত হন নাই, যাহাতে কুলীনগণ সদাচারপরায়ণ থাকেন, তদর্থে ঘটক নিয়োগ করিয়াছিলেন। যথাঃ—

"বংশাংশভাবগুণদোষবিচারকর্ত্তা, ন্যূনাতিরিক্রপরিণামযথার্থবক্তা।
পর্য্যাংবিপর্য্যগণনঞ্চ করোতি যশ্চ, শশ্বন্নৃপেন গদিতো ঘটকঃ স এব।।

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতা শ্রীমহিমাচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রণীত ২।৭ কৌলীন্য-প্রথা, লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত 'সম্বন্ধ নির্ণয়' ও 'গৌড়ের ইতিহাস' প্রণেতা পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী, এবং 'ঢাকার ইতিহাস প্রণেতাও বিস্তারিত ভাবে কৌলীন্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

বল্লালসেন কর্তৃক শ্রেণী বিভাগ এবং ঘটক নিয়োগ হইবার পূর্বে রাঢ় দেশগমী শ্রীহর্ষ তনয় শ্রীনিবাস গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন বিষয়ে, একখানি গ্রন্থ লেখেন। পরে উদায়নচার্য ভাদুড়ি বারেন্দ্রকুল বর্ণনা করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল প্রাচীন কুলগ্রন্থ এখন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। কুলঘটিত প্রাচীন পুস্তক প্রাপ্ত হইবার আশা করা বৃথা। বর্তমান সময়ে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ঘটকদিগের যে সকল কুলগ্রন্থ দেখা যায় ; তাহার কোনওখানিই শকাব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বের লিখিত বলিয়া বোধ হয় না।

কাহারও কাহারও মতে যাহারা বল্লালসেনের তান্ত্রিক কুলাচারের সমর্থন করিয়াছিলেন, বল্লালসেন তাহাদেরই সম্মান বাড়াইয়া তাহাদিগকে কৌলীন্য-মর্যাদা প্রদান করেন।

আচারো বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনম।
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপো দানং নবধাকুললক্ষণম্।।

সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত ঃ

রাঢ়ীয় ঘটকদিগের নিকট, ধ্রুবানন্দ মিশ্রকৃত মহাবংশাবলি, মিশ্রাচার্যকৃত মিশ্রগ্রন্থ, [সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত] শ্লোকসংখ্যা ২১২০। ইহাকে মিশ্রগ্রন্থ কহে। ইহা হইতেই রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের নাম মিশ্রগ্রন্থ হইয়াছে, গোপাল শর্মা কৃত ধ্রুবানন্দমতব্যখ্যা। ফুলিয়া কুল বর্ণনা। বাচষ্পতি মিশ্র ঘটক-কৃত কুলরাম। রামহরি তর্কালঙ্কার কৃত মেলমালা [বাংলা পদ্যে লিখিত, মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকও আছে। কুলার্ণব-সাগর-প্রকাশ, কুলচন্দ্রিকা, কুলদিঘিপকা প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থে কৌলিন্যের নানা কথা আছে। রাঢ়িয় কুলগ্রন্থের অধিকাংশ সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত। ঘটকের কার্য দোষাবহ বিবেচনায় বারেন্দ্র অধ্যাপকগণ ঘটকের কর্মে না যাওয়াতে বারেন্দ্র কুলের কুলগ্রন্থ বাংলা ভাষায় লিখিত হইয়াছে, এখনও রাঢ়িয় ঘটকদের মধ্যে বিদ্বান ও সংস্কৃতজ্ঞ লোক পাওয়া যায়। বারেন্দ্র ঘটকদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। তাহারা সংস্কৃতজ্ঞ ইহা মনে করা দুরাশী মাত্র, অনেকে বাংলাভাষাই ভালোরূপ জানেন না।—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, উপক্রমণিকা ৫।৬ দ্রষ্টব্য।

প্রত্যেক ঐতিহাসিকই একবাক্যে বল্লালসেনের দ্বারা কৌলীন্য-প্রথা প্রবর্তনের কথা স্বীকার করিয়াছেন।[১৩]

বল্লালসেনের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা ঃ পুরাণ ঃ

বল্লালসেন প্রতিভাশালী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাহার রচিত "দানসাগর" ও "অদ্ভুত সাগর" বিখ্যাত গ্রন্থ। 'দানসাগর' গ্রন্থ ৭০ অধ্যায়ে বিভক্ত। এই গ্রন্থে ১৩০৫ প্রকার দানের

বিষয়, সময় ও পত্রাদির আলোচিত হইয়াছে। "অদ্ভুত সাগরে"—বৃদ্ধগর্গ, পরাশর, বশিষ্ঠ, বরাহমিহিরাচার্য, আর্য ভাগবত, আগ্নেয়, মৎস্যপুরাণ, রামায়ণ, ভারতাখ্যান, হরিবংশ, বিষ্ণুধর্মোত্তর প্রভৃতি উপপুরাণ ও শাস্ত্রসমূহ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। বল্লালসেনের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা বলেন ঃ He was celebrated for his learning. several compilations being attributed to him. He reigned from about 1165 to 1185.

১০৯১ শকে "দানসাগর" এই গ্রন্থ বিরচিত হয় ;—নিখিল নৃপচক্রতিলক শ্রীমদ বল্লাল সেনের পুর্ণশশী নবদশমীতে শক বর্ষে 'দানসাগরো রচিতঃ। রচনায় দুই বৎসরকাল লাগিয়াছিল। এই গ্রন্থ অদ্যাপি পণ্ডিতসমাজে সবিশেষ সমাদৃত।

বল্লালসেন "দানসাগর" গ্রন্থে নিজ বংশের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। ইহা হইতেই বল্লালসেন কিরূপ সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাহা বুঝা যাইতেছে।

ছন্দোভিশ্চৈকবন্দ্যেশ্রুতিনিয়মগুরু ক্ষত্র চারিত্র চর্য্যা
মর্য্যাদা গোত্র শৈলঃ কলিচকিত সদাচার সঞ্চার সীমা।
সদ্বৃত্ত স্বচ্ছ বর্ণোজ্জ্বল পুরুষ গুণাচ্ছিন্ন সন্তানধারা
বন্দ্যোমুক্তামরশ্রীনিরগমদবনের্ভূষণং সেনবংশঃ।
তত্রালঙ্কৃত সৎপথঃ স্থিরঘনচ্ছায়াভিরামঃ সতাং
স্বচ্ছন্দ প্রণয়োপভোগ সুলভ কল্পদ্রুমো জঙ্গমঃ।
হেমন্ত পরিপন্থি পঙ্কজসরঃ স্যান্দস্যনৈঃ সিদ্ধৈকৈ—
রুদগীত স্বগুণৈরুদাত্ত মহিমা হেমন্ত সেনোহজনি।
তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীন্নরোন্দ্রো—
দিশিবিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বং।
শিখর বিনিহিতাজ্ঞা বৈজয়ন্তীং বহন্তং
প্রণতি পরিগৃহীতাঃ প্রাংশবোরাজ বংশাঃ।।
সর্ব্বাশাঃ পরিপূরয়ন্নুপচিত শ্রীর্দ্দানবায়াং ঘনৈ
রাসারৈরভিষিক্ত নির্ম্মল যশঃ শালেয় ভূমণ্ডঃ।
দৈন্যোত্তাপভৃতা মকালজলদ সর্ব্বোত্তরক্ষ্মাভৃতাং
শ্রীবল্লাল নৃপস্ততোহজনি গুণাবির্ভাব গর্ব্বেশ্বরঃ।।
বেদার্থ স্মৃতি সঙ্কলাদি পুরুষঃ শ্লাঘ্যোবরেন্দ্রীতলে
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বলবীচিলাস নয়নঃ সারস্বতং ব্রহ্মণি।
ঘট্ কর্ম্মাভবদার্য্য শীল মলয়ঃ প্রক্যাত সত্যব্রতো
বৃত্রারেরিব গীষ্পাতির্ণরপতেরস্যানিরুদ্ধো গুরুঃ।।
বিদ্বৎসভা কমলিনী রাজহংসেন ভূভুজা।
শ্রীমদবল্লালসেন কৃতোহয়ং "দানসাগরঃ।"

'সময়প্রকাশ' গ্রন্থকার ও স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য 'দানসাগর', গ্রন্থ হইতে প্রভুত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বল্লালসেনের রচিত শ্লোক 'সদুক্তি কর্ণামৃত' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে—

বিরম তিমির সাহসাদমুষ্মা—
দ্দিনমমণি নিরস্ত মুপগতস্ততঃ কিং।
কলয়সি ন পুরোমহো মহোর্ম্মি—
প্লাত বিয়দভ্যুদয়ত্যয়ং সুধাংশু।"

বল্লালসেন অদ্ভুত সাগর গ্রন্থের আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পরিসমাপ্ত করিয়া যাইতে

পারেন নাই। ১০৯১ শকে এইগ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাভিষেক ব্যাপারে ব্যস্ত থাকার দরুণ বল্লালসেন ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। লক্ষ্মণসেনকে নিজকৃতি নিস্পত্তির জন্য আজ্ঞা দিয়া যান, লক্ষ্মণসেন উহা পরিসমাপ্ত করিয়াছিলেন। বল্লালসেন, 'দানসাগর' গ্রন্থে আপনাকে **"নিঃশঙ্ক-শঙ্ক-গৌড়েশ্বর"** বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন।

বল্লালসেনের তাম্রশাসন ঃ

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বল্লালসেনের একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়ায় নৃপতি বল্লাল সেন সম্বন্ধে আমরা অনেক নূতন কথা জানিতে পারিয়াছি। এই তাম্রশাসনখানি প্রাপ্তির ইতিহাস এইরূপ—'সীতাহাটির জমিদার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় স্বগ্রামের একটি রাস্তা সংস্কারের জন্য কয়েকজন মজুর নিযুক্ত করেন। রাস্তাটি ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত। তাহার অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তীর হইতে অনুমান একশত গজ দূরে মাটি কাটিবার সময়ে মজুরেরা দুই হাত মাটির নিম্নে একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হয়। ভূস্বামী বৈদ্যনাথ বাবু মজুরদিগের নিকট হইতে উহা সংগ্রহ করেন। সীতাহাটি কাটোয়া হইতে দু'মাইল মাত্র ব্যবধান। "প্রসূন"—সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ তাম্রশাসন প্রাপ্তির সংবাদ অবগত হইয়া সীতাহাটি গমন করেন এবং বৈদ্যনাথবাবুর নিকট হইতে উহা সংগ্রহ করেন। জ্যোতিবাবু শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয়কে তাম্রশাসনখানা দেখিতে দেন। উহা প্রাপ্তির পর কাটোয়ার তদানীন্তন মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু বনোয়ারীলাল গোস্বামী ও তারকচন্দ্র রায় মহাশয় উহার পাঠোদ্ধার কার্যে ব্রতী হন। এবং অবশেষে সন ১৩১৭ সালের 'প্রবাসী' পত্রের ৫৩০-৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেন। স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩১৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রে উহার একটি বিশুদ্ধ পাঠ প্রকাশ করেন। অতঃপর স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় Epigraphia Indica পত্রে Vol XIV pp. 156-63 পৃষ্ঠায় প্রতিলিপি সহ প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপর স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় নূতন করিয়া ছাপ লইয়া ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। বর্তমান সময়ে এই তাম্রলিপিখানি কলিকাতা যাদুঘরে [Indian Museum] সুরক্ষিত আছে।

তাম্রশাসনখানির আকার হইতেছে ১৩$\frac{৫}{৮}$ × ১৫ ইঞ্চি। শীর্ষদেশে সদাশিব মূর্তি সংযোজিত। এই তাম্রফলকে মোট ৬৪টি পংক্তি রহিয়াছে। একদিকে বত্রিশ অপরদিকে বত্রিশটি পংক্তি। অক্ষরের আকার ৩" ইঞ্চি পরিমিত। সংস্কৃত ভাষায় এই দানপত্র খোদিত। স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের মতে [The characters belong to a variety of the Northern alphabets, which may be called the precursors of the modern Bengali, as current in North-Eastern India in the 12th century A.D.] এই তাম্রশাসনখানি গদ্যে ও পদ্যে বিরচিত। শার্দুল বিক্রীতা, মন্দাক্রান্তা, শ্রগধারা, আর্যা, বসন্ততিলক এবং শিখরিণী প্রভৃতি বিবিধ ছন্দে বিরচিত।

শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার [রাজধানী] হইতে মহারাজাধিরাজ শ্রীবিজয়সেন দেব পাদানুধ্যাত, পরমেশ্বর পরম মাহেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ কুশলময় [সেই] শ্রীমদ বল্লালসেন দেব "সমুপগত" [সংবিদিত] সমস্ত রাজা, রাজন্যক রাজ্ঞী, রাণক, ইত্যাদিকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন। অন্যান্য দানলিপিতে যেরূপ থাকে ইহার পরবর্তী অংশেও তদ্রূপ রহিয়াছে—"নিম্নলিখিত বিষয়ে আপনাদের সকলের অভিমত হউক।" ইত্যাদি।

বল্লালসেনের তাম্রশাসন

প্রশস্তি-পাঠ

১। ওঁ নমঃ শিবায়।। সন্ধ্যা-তাণ্ডব-সন্বিধান—
বিলসন্নান্দী-নিদোর্ম্মিভি-নিম্নোর্য্যাদর—

২। সার্ন্নবো দিশতু বঃ শ্রেয়োহর্দ্ধনারীশ্বরঃ। যস্যার্দ্ধে
ললিতাঙ্গহার-বলনৈরর্দ্ধে চ
ভীমো—

৩। ত্তটে ন্নাট্যারম্ভ-রয়ের্জ্জয়ত্যভিনয়-দ্বৈধানুরোধশ্রমঃ।।
হর্ষোচ্ছালপরিপ্লাবো নিধির পাং

৪। ত্রৈলোক্যবীরঃ স্মরো নিস্তন্দ্রাঃ কুমুদাকরা মৃগদৃশো
বিশ্রান্তমানাধয়ঃ। যস্মিন্নভ্যুদিতে—

৫। চকোরনগরাভোগে সুভিক্ষোৎসবঃ স শ্রীকণ্ঠশিরোমণি—
র্ব্বিজয়তে দেবস্তমীবল্লভঃ।। বংশে

৬। তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচার-চর্য্যা-নিরুঢ়ি-প্রৌঢ়াং
রাঢ়ামকলিতচরৈ র্ভূষয়ন্তোহনুভাবৈঃ। শশ্ব—

৭। দ্বিশ্বাভয়-বিতরণ-স্থূললক্ষ্যাবলক্ষৈঃ কীর্ত্ত্যুল্লো—
লৈঃ স্নপিত বিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ।। তেষম্বং

৮। শে মহোজাঃ প্রতিভট-পৃতনাম্ভোধি-কল্পাপ্তসূরঃ
কীর্ত্তিজ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রীঃ প্রিয়কুমুদবনোল্লা—

৯। সলীলামৃগাঙ্কঃ। আসীদাজন্মরক্তপ্রণয়িগণ-মনোরাজ্য—
সিদ্ধিপ্রতিষ্ঠা-শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নি—

১০। রুপধিকরুণাধাম সামন্তসেনঃ।। তস্মাদজনি
বৃষধ্বজচরণাম্বুজষট্পদো গুণাভরণঃ।

১১। হেমন্তসেনদেবো বৈরিসরঃ—প্রলয়হেমন্তঃ।। লক্ষ্মীস্নেহার্দ্র—
দুগ্ধাম্বুধিবলনরয়-শ্রদ্ধায়া মা—

১২। ধবেন, প্রত্যাবৃত্ত-প্রবাহোচ্ছলিত-সুরধুনীশঙ্কয়া-শঙ্করেণ।
হংসশ্রেণী-বিলাসোজ্জ্বলিত—

১৩। নিজপদাহংযুনা বিশ্বধাত্রা, সুত্রামারামসীমাবিহরণ-ললিতাঃ
কীর্ত্তয়ো যস্য দৃষ্টাঃ।।—

১৪। স্মাদভূদখিল-পার্থিব-চক্রবর্ত্তী, নির্ব্যাজ-বিক্রম-তিরস্কৃত—
সাহসাঙ্কঃ। দিক্পালচক্রপু—

১৫। ট—ভেদন-গীত-কীর্ত্তিঃ পৃথ্বীপতির্ব্বিজয়সেন-পদপ্রকাশঃ।।

ভ্রাম্যন্তীনাম্ব-নান্তে যদরি-মৃ—

১৬। গ-দৃশাং হারমুক্তাফলানি চ্ছিন্নাকীর্ণানিভূমৌ নয়নজলমিলৎ—
কজ্জলৈ—ৰ্লাঞ্ছিতানি। যত্মাচ্চি—

১৭। স্বস্তি দর্ভক্ষতচরণতলাসৃগ্বিলিপ্তানি গুঞ্জা-স্রগ্ভূষা-রম্য-রামা-
স্তনকলশঘনা-শ্লেষলোলাঃ

১৮। পুলিন্দাঃ।। প্রত্যাদিশন্নবিনয়ং প্রতিবেশ্ম রাজা
বভ্রাম কার্ম্মুকধরঃ
কিলকার্ত্তবীর্য্যঃ অস্যা—

১৯। ভিষেক-বিধিমন্ত্রপদৈর্ন্নিরীতি- রারোপিতো বিনয়বর্ত্মনি জীবলোকঃ।।
পদ্মলয়ের দয়ি—

২০। তা পুরুষোত্তমস্য গৌরীব বাল—রাজনীকর-শেখরস্য।
অস্য প্রধানমহিষী জগদীশ্বর—

২১। স্য শুদ্ধান্তমৌলিমণিরাস **বিলাসদেবী** এষা সুতং সুতপসাং
সুকৃতৈরসুত বল্লালসেনম—

২২। তুলং গুণগৌরবেন অধ্যাস্ত যঃ পিতুরনন্তরমেকবীরঃ সিংহাসনা—
দ্রি—শিখরং নরদেব—

২৩। সিংহঃ। যস্যারিরাজ-শিশবঃ শবরালেষু বালৈরলীক—
নরনাথ পদেহভিষিক্তাঃ দৃপ্তাঃ প্রমোদ—

২৪। তরলেক্ষণয়া জনন্যা নিশ্বস্য বৎসলতয়া সভয়ং নিষিদ্ধাঃ।
ক্রীতাঃ প্রাণতৃণব্যয়েনরভ—

২৫। সাদালিঙ্গ্যং বিদ্যধরী-রাকল্পং বিহরন্তি নন্দবনাভোগেষু
সংসপ্তকাঃ। ইত্যালোচ্য নৃপৈঃ

২৬। স্মর-প্রণয়িতা-ভীকৈঃ শ্রিতঃ সর্ব্বধুনেত্রেন্দীবরতোরণাবলিময়ো
যস্যাসি-ধরাপথঃ।।

২৭। দদানা সৌবর্ণঃ তুরগমুপরাগেম্বরমণের্যদস্যোদস্রাক্ষীদহনি
জননী শাসনপদম্।

২৮। নৃপস্তাম্রোৎকীর্ণঃ তদয়মদিতো [তৈ] বাসুবিদুষে সতাং দৈন্যোত্তাপ-
প্রশমন-ফলাগকালজলদঃ।।

২৯। **সখলু শ্রীবিক্রমপুর**-সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ।
মহারাজাধিরাজ শ্রীবিজয়—

৩০। সেন-দেবপাদানুধ্যাৎ পরমেশ্বর—পরমমাহেশ্বর—পরমভট্টারক-
মহারাজাধিরাজ শ্রী—

৩১। **মল্লালসেনদেবঃ কুশলী**। সমুপাগতাশেষ রাজরাজন্যক—
রাজ্ঞী—রাণকরাজপুত্ররাজা—

৩২। মাত্য-পুরোহিত-মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ-মহাসান্ধিবিগ্রহিক—
মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত—ইত্যাদি

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পাঠ অপ্রয়োজনবোধে উদ্ধৃত হইল না। এই তাম্রফলকের অনুবাদ, প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই বহু স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই তাম্রশাসন দ্বারা বল্লালসেনদেবের জননী সূর্যগ্রহণবাসরে "হেমাশ্ব" দানকালে [দক্ষিণারূপে যে শাসনপদ [ভূমি] উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার কথা তাম্রোৎকীর্ণ করিয়া সজ্জনগণের দৈন্যোত্তাপনিবারক অকালজরদরূপী এই রাজা বল্লালসেনদেব তাহা পণ্ডিত ও বাসুকে দান করিয়াছিলেন।

শ্রীবর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত উত্তররাঢ়া-মণ্ডলে স্বল্প-দক্ষিণ বীথিতে,—খাণ্ডয়িল্লা শাসনের উত্তরাস্থিত সিঙ্গটিয়া নদীর উত্তর, নাড়ীচ-শাসনের উত্তরস্থিত সিঙ্গাটিয়া নদীর পশ্চিমোত্তর, অম্বয়িল্লা-শাসনের পশ্চিমস্থিত সিঙ্গাটিয়া (নদীর) পশ্চিম, কুডুম্বমার দক্ষিণ সীমালির দক্ষিণ, কুডুম্বমার পশ্চিমে পশ্চিমগড্ডি সীমালির দক্ষিণ, আউহাগড্ডিয়ার দক্ষিণ গোপথের দক্ষিণ, আবার আউহাগড্ডিয়ার উত্তর গোপথ-নিঃসৃত পশ্চিমগতি সুরকোলাগড্ডিআকীয়ের উত্তরালি পর্যন্ত গত সীমালির দক্ষিণ, লাড্ডিনা-শাসনের পূর্বসীমালির পূর্ব, জলসোথী-শাসনের পূর্বস্থিত গোপথার্ধের পূর্ব, মোলাড়ন্দি-শাসনের পূর্বস্থিত সিঙ্গটিয়া (নদী) পর্যন্ত (গত) গোপথার্ধের পূর্ব,—এই চতুঃসীমায় বেষ্টিত, **'শ্রীবৃষভশঙ্কর নলের'** পরিমাণে বাস্তুভূমি, মালভূমি ও খিলভূমির সহিত, নবদ্রোণ এক আঢ়ক, চত্বারিশৎ উন্মান ও তিন কাক পরিমিত সপ্তভূপাটকে বিভক্ত প্রতিবর্ষে পঞ্চশত কপর্দকপুরাণ-আয়-বিশিষ্ট ঝাট [কান্তার বা নিবিড়ারণ্য] ও বৃক্ষসমেত গর্ত ও ঊষরভূমির সহিত, জল ও স্থলের সহিত, গুবাক ও নারিকেল সমেত, যাহার (অর্থাৎ, যে গ্রাম সম্বন্ধে প্রতিগ্রহীতার) দশটি অপরাধ (রাজার) সহ্য হইবে, সর্বপ্রকার উৎপীড়ন-রহিত তৃণ-যুতি-গোচর পর্যন্ত চট্টভট্টের প্রবেশাধিকার-বিরহিত যাহা হইতে কোনও প্রকারের (করাদি) গৃহীত হইবে না। রাজভোগ্য কর ও হিরণ্যাদির (সর্বপ্রকারের) আয়ের সহিত যে বাল্লাহিটা নামক গ্রাম আমার মাতা শ্রীবিলাসদেবী গঙ্গাতীরে সূর্যগ্রহণকালে সুবর্ণাশ্ব-মহা-দানের দক্ষিণাস্বরূপে, বরাহদেবশর্মার প্রপৌত্র, ভদ্রেশ্বর দেবশর্মার পৌত্র, লক্ষ্মীধর দেবশর্মার পুত্র, ভরদ্বাজ গোত্রোৎপন্ন, ভারদ্বাজ-আঙ্গিরস-বার্হস্পত্য-প্রবর, সগমবেদেব কৌথুমশাখাচরণোক্ত (ক্রিয়াকলাপের) অনুষ্ঠাতা, আচার্য শ্রীওবাসুদেবশর্মাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন;—সেই গ্রামেই আমার দ্বারা মাতাপিতার এবং নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যাবৎ-সূর্য-চন্দ্র এবং ক্ষিতি-সমকাল পর্যন্ত যত দিন ভূমিতে ছিদ্র থাকিবেক, ততদিনের জন্য, তাম্রশাসন করিয়া প্রদত্ত হইল। অতএব ইহা আপনাদের সকলেরই অনুমোদিত হউক; এবং ভাবী নরপতিগণও (ভূমি) অপহরণের নরকপাতের ভয়, এবং তৎপাসনে ধর্মগৌরবের কথা স্মরণ রাখিয়া, ইহা পালন করিবেন। (এই অভিপ্রায়ে) ধর্মানুশাসনের শ্লোকও আছে—"সগরাদি অনেক নৃপতিগণ ভূমিদান করিয়াছেন, কিন্তু যখন যাহার (যে নৃপতির) ভূমি, তখন (ভূমিদানের) ফল তাহারই হইয়া থাকে। যিনি ভূমির প্রতিগ্রহ করেন, এবং যিনি ভূমিদান করেন, তাহারা উভয়েই পুণ্যকর্মা, এবং উভয়েই (সেই হেতু) নিয়ত স্বর্গ-গামী হয়েন। "আমাদের বংশে ভূমিদাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, (এবং) তিনিই আমাদের ত্রাণকর্তা হইবেন, "এই মনে করিয়া পিতৃগণ করবাদ্য করিতে থাকেন, এবং পিতামহগণ (আনন্দে) উল্লম্ফন (নৃত্য) করিতে থাকেন। ভূমিদাতা যষ্টি-সহস্র বৎসর স্বর্গে

বৎসর স্বর্গে বাস করেন, এবং ভূমির অপহর্তা ও.(অপহরণের) অনুমোদনকারী তৎপরিমিত (৬০০০০ বৎসর) নরকে ভ্রমণ করেন। ভূমি স্ব-দত্তই হউক, আর অন্যদত্তই হউক, যিনিই ইহা হরণ করিবেন, তিনিই বিষ্ঠার কৃমি হইয়া পিতৃগণ সহ পচিতে থাকিবেন।' ইতি। লক্ষ্মীকে এবং মনুষ্য জীবনকে পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল মনে করিয়া, এবং (উপরি) উদাহৃত সমস্ত বিষয় বুঝিয়া, কোনও ব্যক্তিরই পরকীর্তির লোপবিধান উচিত নয়। নিখিল-ক্ষিতিপালের জেতা ভূপাল শ্রীমদ্ বল্লালসেন ও বাসুশাসনে সান্ধিবিগ্রহিক হরিঘোষ (নামক ব্যক্তিকে) দূত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সাং (সাল) ১১, বৈশাখ মাসের ১৬ই তারিখ। শ্রী নি (বদ্ধ) মহাসাং (ধিবিগ্রহিক) করণ (কায়স্থ) নি (বদ্ধ)।

এই তাম্রশাসনে "শ্রীবৃষভশঙ্কর নলের" উল্লেখ আছে। মদনপাড়া প্রাপ্ত বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে বল্লালসেনদেবের পিতা বিজয়সেনদেব 'অরিরাজ-বৃষভ-শঙ্কর-গৌড়েশ্বর' নামে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বল্লালসেনদেবের সময়েও ভূমি পরিমাপকালে তাহার পিতার নামই প্রচলিত ছিল এবং তাহাই 'শ্রীবৃষভশঙ্কর নলিন' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনদেবের আনুলিয়ায় প্রাপ্ত শাসনেও 'বৃষভশঙ্কর নলেন' কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বল্লালসেনের ধর্মমত ঃ

বল্লালসেনের দানলিপির দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, আদি সেনরাজগণ রাঢ়দেশেও রাজত্ব করিতেন। বিক্রমপুরে তাহাদের রাজধানী বিজয়সেনের সময় হইতেই সংস্থাপিত হইয়াছিল। কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন যে—"প্রথম হইতেই পূর্ব্ববঙ্গ তাহাদের অধিকারে থাকিলে, রাঢ়দেশকে ভূষিত করিয়াছিলেন, কেবল এই কথা থাকিত না।"[১৫] ইহার কোনও অর্থ হয় না, কেননা সেনরাজারা যে পরবর্তীকালে বিজয়সেনের সময় বঙ্গরাজ্য (পূর্ব্ববঙ্গ) অধিকার করেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

সেন নৃপতিরা শৈব ছিলেন। বল্লালসেনের তাম্রশাসনের প্রারম্ভেই দেখিতে পাইতেছি, "ওঁ নমঃ শিবায়[১৬]।। যাহার একার্ধের মনোহর অঙ্গ-সঞ্চালনে এবং অপরার্ধের ভীমোৎকট নৃত্যারম্ভ বেগে বিবিধ অভিনয়সঞ্জাত কায়ক্লেশ জয়যুক্ত হইতেছে ; সন্ধ্যা-তাণ্ডবনৃত্যে বিকশিত আনন্দ-নিনাদ লহরী-লীলার অকূল রসসাগর সেই অর্ধনারীশ্বর (মহাদেব) আপনাদের মঙ্গল বিধান করুন।"

যাহার তাম্রশাসনের উপরে সদাশিব মূর্তির রাজমুদ্রা, এবং যিনি অর্ধনারীশ্বর মহাদেবের বন্দনা করিয়াছেন, তিনি যে শৈব ছিলেন, তদবিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ আছে কি?

বল্লালসেন এই তাম্রশাসনখানি রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর হইতে প্রদান করিয়াছেন। বল্লালসেনের সর্বপ্রধান রাজধানী যে শ্রীবিক্রমপুরে ছিল তাহার কতকগুলি প্রমাণ বিশেষভাবে বিক্রমপুর হইতে উপস্থিত হইয়াছে। কিছুদিন হইল বিক্রমপুরের অন্তর্গত আপরকাঠি নামক গ্রামে একটি প্রস্তর-নির্মিত সদাশিব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটি এখন বিক্রমপুর চিত্রশালায় [অড়িয়াল গ্রামে] আছে।

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত সদাশিব মূর্তি ঃ

বল্লালসেনের মুদ্রামধ্যস্থ সদাশিব মূর্তির সহিত বিক্রমপুরের প্রাপ্ত সদাশিব মূর্তির সাদৃশ্য সহজেই অনুভূত হইবে। সদাশিব মূর্তির ধ্যান নানারূপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার হস্তস্থিত আয়ুধ সমূহও বিভিন্নরূপ থাকে। মুদ্রামধ্যস্থ সদাশিব মূর্তির ধ্যান এইরূপ—

মুক্তাপীতপয়োদমৌক্তিকজবাবর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভিঃ
ত্র্যক্ষৈরঞ্চিতমীশমিন্দুমুকুটং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভম্।

শূলং টঙ্ক-কৃপণ-বজ্র দহনান্ নাগেন্দ্র ঘন্টাঙ্কুশান্
পাশং ভীতিহরং দধানমমিতা কল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে।।

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও তাঁহার "Elements of Iconography, vol II pt. ii app.p. 187-এ সদাশিবের যে ধ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এইরূপ—

বদ্ধপদ্মসনং শ্বেতং স্থিতং পঞ্চাস্য সংযুতম্।
পিঙ্গলাভ জটা চূড়ং দশ দোর্দণ্ড মণ্ডিতম্।।
অভয়ং চ প্রসাদং চ তথাশক্তিং ত্রিশূলকম্।
খট্টাঙ্গং দক্ষভাগস্থৈর্বহস্তং করপল্লবৈঃ।।
ভূজঙ্গং চাক্ষমালা চ ডমরু নীলপঙ্কজম্।
বীজাপুরা চ বামস্থৈর্ব হস্তং সুপ্রসন্নকম্।।

"বায়ুপুরাণে" রহিয়াছে,—

পঞ্চবক্তো বৃষারূঢ় প্রতি বক্তং ত্রিলোচনঃ।
কপালশূলখট্টাঙ্গী চন্দ্রমৌলিঃ সদাশিব।

ধ্যানে আছে সদাশিবের পঞ্চস্য থাকিবে, কিন্তু আমরা যে মূর্তিটির চিত্র প্রকাশ করিলাম তাহাতে পঞ্চমুখ নাই।

"গরুড় পুরাণে" সদাশিব মূর্তির ধ্যান এইরূপ—

বদ্ধপদ্মাসনাসীনঃসিত ষোড়শবর্ষকঃ।
পঞ্চবক্ত্রঃ করাগ্রেঃ স্বৈর্দশাভিশ্চৈব ধারয়ন্।।
অভয়ং প্রসাদং শক্তিং শূলং খট্টাঙ্গমীশ্বরঃ।
দক্ষৈঃ করোবামকৈশ্চ ভুজগঞ্চাক্ষসূত্রকং।।
ডমরুকং নীলোৎপলং বীজপূয়ক মুত্তমং।
ইচ্ছাজ্ঞান ক্রিয়াশক্তি স্ত্রিনেত্রোহি সদশিবঃ।

[গরুড়পুরাণ পূর্বার্ধ ২৩ শ অধ্যায়]

"মহানির্বাণ তন্ত্রে" ও সদাশিবের ধ্যান দৃষ্ট হয়—

ব্যাঘ্র-চর্ম্ম পরিধানং নাগ যজ্ঞোপবীতন্ম্।
বিভূতি লিপ্ত সর্বাঙ্গং নাগালঙ্কার ভূষিতম্।।
ধূম্রপীতারুণ শ্বেতকৃষ্ণৈ পঞ্চাভিয়াননৈঃ।
যুক্তং ত্রিনয়নং বিভ্রজ্জটাজুট ধরং বিভুম্।।
গঙ্গাধরং দশভূজং শশিশোভিত মস্তকম্।
কপালং পাবকং পাশং পিনাকং পরশুং করৈঃ।।
বামৈ র্দধানং দক্ষৈশ্চ শূলং বজ্রাঙ্কুশং শরম্।
বরঞ্চ বিভ্রতং সর্বৈ র্দেবৈ মুনিবরৈঃ স্তুতম্।।
পরমানন্দ সন্দোহোল্লসৎ-কুটিল-লোচনম।
হিম-কুন্দেন্দু-সঙ্কাশং বৃষাসন বিরাজিতম্।।
পরিতঃ সিদ্ধ গন্ধর্বৈরপ্সরোভিরহর্নিশম্।
গীরমানমুমাকান্তমেকান্ত শরণম্ প্রিয়ম্।।

সদাশিব মূর্তি দশভুজ এবং দ্বাদশভুজ হইয়া থাকেন। তাঁহার দশভুজে যথাক্রমে শূল, টঙ্ক, কৃপাণ, বজ্র, ঘন্টা অঙ্কুশ, পাশ অক্ষমালা এবং অভয় মুদ্রা প্রভৃতি রহিয়াছে। মূর্তির

মস্তকোপরি জটা-মণ্ডিত-মুকুট। ললাটে ত্রিনয়নের এক নয়ন। অপর দুই নয়ন অকর্ণ-বিস্তৃত। সদাশিব পদ্মের উপর পদ্মাসনে বা বদ্ধপর্যঙ্কসনে ধ্যানমগ্ন। প্রসন্ন নতদৃষ্টি। কণ্ঠে মালা দোদুল্যমান। ঊর্ধ্বে চালচিত্রের উভয় পার্শ্বে কিন্নর বা অপ্সর-যুগল। সদাশিবের মুখমণ্ডলে সুগম্ভীর ধ্যানের ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সদাশিব মূর্তি তান্ত্রিকদের 'ষট্চক্র' অনুভূতির অঙ্গীভূত। সদাশিব ষট্‌শিবের একশিব। ব্রাহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব এবং পরশিব।

[রুদ্র যামলতন্ত্র—রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। ৫৬,৮৮,১২৮ পৃষ্ঠা] সদাশিব পঞ্চ মহাপ্রেতের একজন। [Avalon, principles of Tantra, Vol II, P. 390, n-4 and p. 392] এই প্রসঙ্গে স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—"A description corresponding to the figure on the seals is according to A. K. Moitra, found in *Mahanirvan Tantra*, ullasa XIV. [See Banerjee, EP. Ind. Vol. XII p.p. 6-7] But it must be observed that some of the attributes assigned to the deity are not traceable on the seals and in the stone images deposited in the Museums of the Varebdra Research Society, Rajshahi and the Calcutta Shitya Parishad. Insciptions of Bengal-p. 81.]

বল্লালসেনের তাম্রশাসনের মূদ্রার লাঞ্ছন **সদাশিব** এবং ইষ্টদেবতা **অর্ধনারীশ্বর** দেব দুইয়েরই উল্লেখ আছে। সদাশিব মূর্তি এবং অর্ধনারীশ্বর মূর্তি বাংলাদেশে কেন ভারতবর্ষেই খুব কম পাওয়া গিয়াছে। সৌভাগ্য-ক্রমে আমরা **সদাশিব মূর্তি** এবং **অর্ধনারীশ্বর** মূর্তি দুই মূর্তিই বিক্রমপুরে পাইতেছি।

আমি প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে বিক্রমপুরের পুরাপাড়া গ্রাম হইতে একটি অর্ধনারীশ্বর মূর্তি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ঐ মূর্তিটি এক্ষণে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি প্রতিষ্ঠিত রাজসাহি চিত্রশালায় আছে।[১৭]

বিক্রমপুরের ও বাংলার সর্বপ্রথম অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ঃ

বল্লালসেন দেব যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির উপাসক ছিলেন তাহা তাহার তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোক হইতেই সূচিত হইয়াছে। যিনি অর্ধনারীশ্বর দেবের উপাসক ছিলেন, তিনি কি রাজধানীতে অর্ধনারীশ্বর দেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন নাই। এইরূপ একটি প্রশ্ন আপনা হইতেই মনে আসে। কিন্তু সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন এই মূর্তিটি বিক্রমপুর হইতে আবিষ্কৃত হইল, তখন হইতেই বোধ হয় এই প্রশ্ন সমাধানের সুযোগ ঘটিয়াছিল।

এইখানে নৃপতি বল্লালসেনদেবের বিষয় আলোচনা-প্রসঙ্গে যদি অর্ধনারীশ্বর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি, তাহা হইলে উহা বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে করিনা। আমি একথাটা বিশেষ গৌরবের সহিত বলিতে পারি যে, আমার পূর্বে কেহ অর্ধনারীশ্বর মূর্তি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং তৎসম্বন্ধে কেহ কোনও প্রবন্ধও লেখেন নাই।

অর্ধনারীশ্বর মূর্তি সংগ্রহের ইতিহাস ঃ

সে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একবার বর্ষার সময় যখন বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য নৌকাযোগে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলাম, তখন একদিন বেলা-শেষে শ্রাবণের অশ্রান্ত বারিবর্ষণের মধ্যে পুরাপাড়া নামক গ্রামের খালটি দিয়া যাইবার সময় এক বাড়ির পাশের একটি ডোবার নিকট অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় সুন্দর একটি মূর্তি দেখিতে পাইলাম। আমি নৌকা ভিড়াইয়া সেই বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গৃহস্বামী-সেই অযত্ন-বিক্ষিপ্ত শ্রীমূর্তিখানি আমাকে প্রদান করিতে এতটুকুও ইতস্তত করিলেন না।

দেখিবামাত্রই মূর্তিখানি যে অর্ধনারীশ্বর দেবের তাহা চিনিতে পারিলাম। কি সর্বাঙ্গ সুন্দর

গঠন, কি সুন্দর মসৃণ অবয়ব, কি কোমলতা, কি শিল্প-নৈপুণ্য, দেখিবামাত্রই আনন্দে অভিভূত হইলাম। বিক্রমপুরে বাঙালির একটা নিজস্ব শিল্পধারা ছিল। বারেন্দ্রভূমের ধীমান্ ও বীতপালের ন্যায় বিক্রমপুরেও একটি শিল্পীসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহারা পাথর সংগ্রহ করিয়া বিক্রমপুরেই এই সকল মূর্তি গড়িত। সেই শিল্পীগণ রাজধানী শ্রীবিক্রমপুরের আশেপাশেই বাস করিত। আমি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি। সে বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করিব।

হেমাদ্রিকৃত "চতুর্বর্গচিন্তামণি" নামক গ্রন্থের ব্রতখণ্ডেও অর্ধনারীশ্বর মূর্তির বর্ণনা আছে। তাহা এই—

"অর্দ্ধং দেবস্য নারী তু কর্ত্তব্যা শুভলক্ষণ।
অর্দ্ধন্তু পুরুষঃ কার্য্যঃ সর্ব্বলক্ষণভূষিতঃ।।

এক সময়ে বাংলাদেশে অর্ধনারীশ্বর মহাদেবের পূজাবিধি প্রচলিত ছিল। আজ পর্যন্ত বাংলার অন্য কোনও স্থান হইতেই অর্ধনারীশ্বর মূর্তি আবিষ্কৃত হয় নাই।[১৮]

বিক্রমপুরে যে সকল দেউলবাড়ি আছে, তাহার মধ্যে পুরাপাড়ার দেউল বাড়িটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই দেউলবাড়ির নিকটেই "তাম্রকুণ্ড" নামক গভীর কুণ্ডের বা ডোবার পাশে এই মূর্তিটি ছিল। আমি তাম্রকুণ্ডের পাশে দণ্ডায়মান অবস্থায় মূর্তিটি দেখিতে পাইয়া উহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম একথা প্রথমেই বলিয়াছি। আজ কয়েক বৎসর হইল পুরাপাড়ার দেউলবাড়ি হইতে একটি উমামহেশ্বর মূর্তিও পাওয়া গিয়াছে।

"মৎস্যপুরাণে" যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির স্তব আছে। তাহা এইরূপ—

অর্দ্ধেন দেবসেবস্য নারী রূপং সুশোভনম্।
ঈশার্দ্ধে তু জটাভারো বালেন্দকলয়া যুতঃ।।
উমার্দ্ধে তু প্রদতয়ৌ সীমন্ততিলকাবুভৌ।
ত্রিশূলং বাপি কর্ত্তব্যং দেবদেবস্য শূলিনঃ।।
বামতো দর্পণং দদ্যাদুৎপলং বা বিশেষতঃ।
স্তনভারময়ার্দ্ধে তু বামে পীনং প্রকল্পয়েত।।
ইত্যাদি।

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত এই মূর্তিটির দিকে লক্ষ্য করুন। একবার ভাল করিয়া দেখুন—ঊর্ধ্বে বামদিকে ফণিময়—বিলম্বিত জটাজাল, কাঁধের উপর দিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। ললাটে অর্ধ চন্দ্র। বামদিকে সিন্দুরবিন্দু, আকর্ণ-বিস্তৃত-নয়ন, কর্ণে, কর্ণ-ভূষা। অনেকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তবু কি তার বিচিত্র গঠন-নৈপুণ্য। আর দক্ষিণে ফণি-কুণ্ডল। কণ্ঠে নরকপাল-মালা—বামে মণিময়-মালিকা। দক্ষিণে স্থূল যজ্ঞোপবীত, বাম কণ্ঠে পার্বতীর লম্বিত দোদুলমান মণিমালার সহিত জড়াইয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন। যদি অভঙ্গ থাকিত, তাহা হইলে সে হাতে থাকিত ত্রিশূল। বাম হস্তটিও সম্পূর্ণ ভগ্ন। যদি ইহা অভগ্ন থাকিত তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম বাজু ও বলয় এবং অন্যান্য অলঙ্কার। বামে পীন স্তন। সূক্ষ্ম বস্ত্রাবরণে আবৃত। দক্ষিণে মুক্ত ও বিশাল বক্ষস্থল, পুরুষোচিত দৃঢ়তার সহিত খোদিত। আর পরিধানে বাঘছাল। কটিতে নরহস্তবন্ধ। ঊর্ধ্ব লিঙ্গ। বামে স্তরে স্তরে মাল্যাকারে ভূষণসমূহ দোলায়মান।

মূর্তিটির পদদ্বয় ভগ্ন। যদি মূর্তিটির পদযুগল অভগ্ন থাকিত, তাহা হইলে দেখা যাইত যে, দক্ষিণ পদখানি বিকশিত শতদলোপরি সুরক্ষিত আর বামপদখানি থাকিত লোহিত-রাগরঞ্জিত-পদলঙ্কার-শোভিত শতদলের উপর।

কবি ভারতচন্দ্রের অর্ধনারীশ্বরের বর্ণনার সহিত মিলাইয়া এই মূর্তিটি দেখিলে পাঠকগণ আনন্দ উপভোগ করিবেন।

মূর্তির বর্ণনা ঃ

আমার সংগৃহীত "অর্ধনারীশ্বর" মূর্তির বদনমণ্ডলও নানাভাবে ক্ষত-বিক্ষত। এজন্য মুকমণ্ডলের অনেকখানি শোভা হ্রাস পাইয়াছে। তবু কি মসৃণ, কি কোমল! এই মূর্তিখানি যদি অভগ্ন থাকিত তাহা হইলে এই মূর্তিখানি সৌন্দর্য-শিল্পানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই আনন্দের কারণ হইত। এখনও এই মূর্তির উভয় পার্শ্বের সৌন্দর্য ভাস্কর-শিল্পানুরাগী ব্যক্তিরই চিত্ত মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে। বঙ্গের ভাস্কর্যশিল্প যে কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, এই মূর্তিই ছিল তাহার প্রমাণ এবং এই মূর্তি গঠনের জন্য বিক্রমপুরের কোনও অজ্ঞাত শিল্পীর উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

পুরাপাড়া দেউল ঃ

শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী বর্তমানে পরিচিত রামপালের বিস্তৃত সীমা-মধ্যে পুরাপাড়া দেউল অবস্থিত। দেউল বলিতে দেবালয় বুঝায়। "দেবকুল শব্দ হইতে 'দেউল' শব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। "দেবকুলিকা" শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র দেউল বা মন্দির। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ "দেবকুলিকাকে" ক্ষুদ্র দেব মন্দির (small temple) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 'দউল' বলিতে বৃহদাকার দেবমন্দিরকেও বুঝাইয়া থাকে। বোধ হয় এই কবিতাটি অনেকেরই কণ্ঠস্থ আছে, "আছিল দেউল এক পর্বত-প্রমাণ"। কাজেই দেউল বলিতে বৃহদাকারের দেবমন্দিরও বুঝাইতে পারে।

দেউলবাড়ি ঃ

শ্রীবিক্রমপুর রামপালের চারিদিকেই দেউল আছে। পূর্বে পুরাপাড়ার দেউল বেশ বৃহদাকারের স্তূপ ছিল। এখন বিলীয়মান হইয়া আসিয়াছে। ঐ দেউল বা দেবালয়ের কাছেই ছিল বৃহৎ তাম্রকুণ্ড। তাম্রকুণ্ড শব্দের অর্থ সকলেরই জানা আছে। দেবপূজার জন্য যে তাম্রপাত্র ব্যবহৃত হয় তাহাই তাম্রকুণ্ড নামে অভিহিত হয়। পূজাশেষে বিল্বপত্র ও পুষ্প ইত্যাদি ঐ কুণ্ডটির মধ্যে সম্ভবত ফেলা হইত, ঐ জন্য আজও ঐ স্থানটি তামাকুণ্ড নামে পরিচিত।

একথা সহজেই অনুমিত হয় যে, রাজধানী শ্রীবিক্রমপুরে যখন সেনরাজাদের অসাধারণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি সে সময় অর্ধনারীশ্বর দেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ নৃপতি বল্লাল অর্ধনারীশ্বর দেবের এই সুন্দর শ্রীমূর্তিটি গঠন করিয়া উহার জন্য একটি বিরাট মন্দির নির্মাণ করিয়া উহাতে তাহার আরাধ্যদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দেবতার অর্চনার জন্য পুরোহিতগণের বাসস্থানও সেখানেই নির্দিষ্ট ছিল, সেই পুরোহিতপাড়াই কালবশে পুরাপাড়া নামে রূপান্তরিত হইয়াছে। তারপর কে জানে কোনও এক দুর্দিনে হয় কোনও এক দুর্দিনে হয় মানুষের হাতে কিংবা কোনও দৈব দুর্বিপাকে [মানুষের হাতেই সম্ভবত] ঐ মন্দির ভূমিসাৎ হইল,—মূর্তি পাদপীঠ হইতে ভূলুণ্ঠিত হইল,—কে জানে কি-ভাবে দেব-মূর্তির শরীরের বিভিন্ন অংশ কে বা কাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। শৈব সেনারাজগণের ধ্যানধারণার আশ্রয় এই অর্ধনারীশ্বর মূর্তির এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়।

আমরা ভক্ত নৃপতি বল্লালের তাম্রশাসনের এই জন্যই নৃত্যোৎফুল্ল অর্ধনারীশ্বর দেবের স্তুতি দেখিতে পাই।

বল্লাল সেনের সর্বপ্রধান রাজধানী জয়স্কন্ধাবার যে শ্রীবিক্রমপুরে অবস্থিত ছিল, এই মূর্তিটিও তাহার একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

বাংলাদেশে এই একটি মাত্র 'অর্ধনারীশ্বর' মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে হয়ত আরও পাওয়া যাইতে পারে। আমি খিচিং (ময়ূরভঞ্জ) যাদুঘরে অকটি অর্ধ-ভগ্ন অর্ধনারীশ্বর মূর্তি দেখিয়াছি।

অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ধ্যান-ধারণার সামগ্রী। নৃতত্ত্ববিশারদ কোনও কোনও পণ্ডিত ইহার আদর্শকে যৌন-মিলনের বা দাম্পত্য মিলনের শ্রেষ্ঠ কল্পনা বলিয়া থাকেন।

আমার লিখিত "বিক্রমপুর ও বাংলার সর্বপ্রথম অর্ধনারীশ্বর মূর্তি" শীর্ষক প্রবন্ধ "ভারতবর্ষ" ষড়বিংশ বর্ষ প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা—আশ্বিন ১৩৪৫-এ প্রকাশিত হইলে-পর উহা পাঠ করিয়া আমাকে পাটনার পুরাতত্ত্ব বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমলানন্দ ঘোষ মহাশয় নিম্নলিখিতরূপ পত্র লিখেন—

"প্রিয় যোগেন বাবু,

ভারতবর্ষে আপনার "অর্ধনারীশ্বর" সংক্রান্ত প্রবন্ধ আগ্রহসহকারে পড়িলাম। আপনি যে সমস্ত পৌরাণিক উল্লেখ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে "মৎস্যপুরাণই" প্রাচীনতম। "মৎস্যপুরাণের" সমসাময়িক অথবা তদপেক্ষা কিছু প্রাচীন একটা উল্লেখ পাইয়াছি, আপনাকে তাহা জানাইতেছি—

"The earliest authentic allusion to it seems to be that of the Indian ambassador to Bardisanes [Birca A. D. 220] who described a cave in the north of India which contained an image of a god, *half-man, half-woman* [Fergussion, *History of Indian and Eastern architecture* Vol. I. 427.]

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য তদ্‌রচিত "*Indian Images*" নামক গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন— A type of Siva and Parvati in amorous Posture is known as *Ardhanariswar.* Its descriptions is—one half of Siva has the form of a goddess. The part representing siva has plaited hair, a crescent, and a trident. The other part respresenting Uma should have parted hair, a cobra in the right ear, a mirror or a lotus, and thick breast][১৯]

"গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেন—"ইংরাজবাজারের তিন মাইল পশ্চিমে বাগবাড়ি নামক স্থানে বল্লালের একটি উদ্যানবাটিকা ছিল। শুনা যায়, উহার দরজায় অর্ধনারীশ্বর শিব মন্দির ছিল ; এখন ঐ মন্দির বৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হইয়াছে।" ইহা অনুমান মাত্র, আজ পর্যন্তও বরেন্দ্রের কোনও স্থান হইতে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির অর্চনা বাংলার নানাস্থানে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

বল্লালসেন হিন্দুধর্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মগধ, ভুটান, চট্টগ্রাম, আরাকান, উড়িষ্যা এবং নেপালে হিন্দুধর্ম-প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তান্ত্রিক মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া কথিত আছে।[২০]

বল্লালসেনের চরিত্র ঃ

বল্লালসেনের চরিত্র সম্বন্ধে আনন্দভট্ট রচিত "বল্লাল-চরিতে" অনেক কথা আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, বল্লালের চরিত্র ভাল ছিল না। তিনি প্রথমে শৈব ছিলেন, পরে সিংহগিরি নামক ব্যক্তির প্রবর্তনায় ঘোর তান্ত্রিক হইয়া পড়েন। বল্লাল ডোমজাতীয় একটি স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হন এবং সেই ডোমকন্যাকে সমাজে চালাইবার চেষ্টা করেন; তজ্জন্য অনেকে বিরক্ত হইয়া বল্লালের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যায়। ময়মনসিংহের অষ্টগ্রাম প্রভৃতির দত্তদিগের কুর্চিনামায় আছে—

চন্দ্রর্তুশূন্যাবনি-সংখ্য শাকে বল্লালভীতঃ খলুদত্তরাজঃ।
শ্রীকণ্ঠনাম্না গুরুণা দ্বিজেন শ্রীমাননন্তস্তু জগম বঙ্গম্।।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও আনন্দভট্ট বিরচিত 'বল্লাল-চরিতের' উপর

নির্ভর করিয়া বল্লালের চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছেন।[৩] বলা বাহুল্য যে, "বল্লাল-চরিত" নৃপতি বল্লালসেনের মৃত্যুর প্রায় তিনশত বৎসর পরে বিরচিত হইয়াছিল। কাজেই বল্লাল-চরিতের লিখিত বিবরণী বা কাহিনী-সমুদয়, কোনও সুধী-ব্যক্তিই বিশ্বাস করিতে পারেন না— এজন্য আমরা বল্লালসেন সম্বন্ধে প্রকাশিত কিংবদন্তী ইত্যাদি সযত্নে পরিহার করিলাম।

বল্লালসেনের চরিত্র সম্বন্ধে কোনও তাম্রশাসনেই কোনওরূপ নিন্দার উল্লেখ নাই বরং তাহাকে গুণ-গৌরবে অতুলনীয়, অদ্বিতীয় বীর বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার নামের পূর্বে পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ, কুশলময় ইত্যাদি বিশেষণ সংযুক্ত থাকায় বরং তাহার মহত্ত্বই সূচিত হইতেছে। বল্লালসেন বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন। বৌদ্ধরা তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন না, অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকেন।[২১]

বল্লালসেন আনুমানিক ১১৮৫ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন গৌড় বঙ্গের সিংহাসনারোহণ করেন।

তপন-দিঘির তাম্রশাসন ঃ

লক্ষ্মণসেন দেবের যে-সমুদয় তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে **তপনদিঘির** তাম্রশাসনখানিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহার পূর্বে লক্ষ্মণসেন দেবের কোনও খোদিতলিপি বা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই। খ্রিস্টিয় ১৮৭৫ অব্দে দিনাজপুর জেলার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত ওয়েস্টমেকর্ট সাহেব [E. V. Westmacott] উক্ত জেলার গঙ্গারামপুর থানার অধীন তপনদিঘি গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় পুষ্করিণী খননকালে আবিষ্কৃত এই তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধার করিয়া এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রে প্রকাশ করেন। এই তাম্রশাসনখানি প্রকাশিত হইবার পর সেই প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে ঐতিহাসিক মহলে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় এই তাম্রশাসন খানি নানা হাত ঘুরিয়া অবশেষে স্বর্গত কাশিমবাজারের মহারাজা বদান্যবর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অর্থব্যয়ে "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে" র চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ওয়েস্টমেকট সাহেবের পাঠ প্রকাশিত হইবার পর স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকায়" ইহার একটি পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন।[২১]

লক্ষ্মণসেন দেবের যে কয়খানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে আমরা এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম।

১। **তপনদিঘির তাম্রশাসন**—এই তাম্রশাসনখানি **শ্রীবিক্রমপুরের জয়স্কন্ধাবার** হইতে প্রদত্ত। ইহার দ্বারা হুতাশন দেবশর্মার প্রপৌত্র, মার্কণ্ডেয় দেবশর্মার পৌত্র, লক্ষ্মীধর দেবশর্মার পুত্র, ভরদ্বাজগোত্রীয় ঈশ্বর দেবশর্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্ত্যান্তঃপাতী বেলহিষ্টি [কেহ কেহ বিল্বষ্টী পাঠ করিয়াছেন] গ্রামখানি "পুণ্যেযশোহভিবৃদ্ধয়ে দত্তহেমাশ্দথ মহাদানের সময় দক্ষিণা-স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই ভূমিতে সংবৎসরে দেড় শত কপর্দক পুরাণমূল্যের শস্য উৎপন্ন হইত।" এই তাম্রশাসনে লক্ষ্মণসেন পরমেশ্বর-পরমবৈষ্ণব-পরভট্টারক মহরাজাধিরাজ উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইয়াছেন।

তপনদিঘির তাম্রশাসনের প্রথম দুইটি শ্লোকে সেনবংশের আদি পুরুষ চন্দ্রের প্রশংসা রহিয়াছে। তাহার পরের সাতটি শ্লোকে সামন্তসেন হইতে লক্ষ্মণসেন পর্যন্ত সেনরাজগণের পরিচয় রহিয়াছে। এই তাম্রশাসনে রাজরাজন্যক, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, পুরোহিত, মহাধর্মাধ্যক্ষ, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত, অন্তরঙ্গ, বৃহদুপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতীহার, মহাভোগিক, মহাপিলুপতি, মহাগণস্থ, দৌসসাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, নৌ-বলহস্তশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডনায়ক,

বিষয়পতি প্রভৃতি। এই সব বিভিন্ন রাজপুরুষগণের নাম যেমন আছে, পূর্বে যে-সমুদয় তাম্রশাসনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতেও তেমনি আছে।

প্রদত্ত ভূমি হইতে বৎসরে পঞ্চাশৎকপর্দক করস্বরূপ রাজকোষে আসিত। ইহার চতুঃসীমা—

পূর্বে বুদ্ধবিহারীদেবতানিকরদেয়াম্মণ ভূম্যাটাবাপপূর্বালীঃ সীমা। দক্ষিণে নিচডহার পুষ্করিণী সীমা। পশ্চিমে নন্দীহরিপাকুণ্ডী সীমা। উত্তরে মোল্লাণখাড়ি সীমা। এই তাম্রফলকে অনেকগুলি শব্দ ভুল লিখিত আছে।

এই তাম্রশাসনখানির আকার ১৩$\frac{১}{২}$ × ১১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। শীর্ষদেশে সদাশিব মুদ্রা-সংযুক্ত। তাম্রফলকখানিতে ৫৬ পংক্তি খোদিত লিপি আছে। ভাষা সংস্কৃত। দ্বাদশ শতাব্দীর উত্তর ভারতে প্রচলিত দেবনাগরী অক্ষরের অনুরূপ। বাংলা হরফের পূর্বাবস্থা।

এই তাম্রফলকে যে যে গ্রামের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, আজ পর্যন্তও তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। এই তাম্রফলকের তেমন কোনও বিশেষত্ব নাই। আনুলিয়া এবং গোবিন্দপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের অনুরূপ সাতটি শ্লোক রহিয়াছে। স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় বলেন : The document was issued from the "Campt of Victory" situated at VIKRAMPURA. এই তাম্রফলকে 'বুদ্ধবিহারের' উল্লেখ আছে। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গে ও উত্তর বঙ্গে [বারেন্দ্রে] বুদ্ধ প্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

২। **জয়নগর তাম্রশাসন**—চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে এই তাম্রশাসনখানি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। স্বর্গত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহার লিখিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থের শেষভাগে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহার "সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের প্রথম সংস্করণে লিখিয়াছেন"—

তাম্রশাসনের ইতিহাস ঃ

বাংলা অক্ষরের সময় নিরূপণ প্রসঙ্গে রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত যে তাম্রশাসনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তদঙ্কিতই সমগ্র বিষয়টি লিথোগ্রাফে মুদ্রিত করিয়া এক এক খণ্ড এই পুস্তক-মধ্যে নিবেশিত করিতে আমাদের অতিশয় ইচ্ছা ছিল, কারণ তাহা হইলে, সেই সময়ে এদেশে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা পাঠকগণ স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও সে তাম্রশাসনখানি আর একবার হস্তগত করিতে পারিলাম না। মজিলপুরের জমিদার শ্রীহরিদাস দত্ত মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া বাংলা অক্ষরে লিখিত উহার একটি প্রতিলিপি আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষভাগে আমরা উহা অবিকল মুদ্রিত করিলাম। ত্রিবেণীর হলধর চূড়ামণি মহাশয় বিস্তর পরিশ্রম করিয়া ঐ সনন্দের লিপি পাঠ করিয়াছিলেন। তিনিও সমুদয় অক্ষর বুঝিতে পারেন নাই।—অবুদ্ধ স্থলে স্বয়ং যোজনা করিয়া দিয়াছেন। সন-তারিখের স্থল অস্পষ্টই রহিয়াছে। এইরূপে উহার রচনা অনেক বিকৃত হওয়ায় স্থানে স্থানে স্পষ্টরূপ অর্থ বুঝিতে পারা যায় না।—এইজন্য আমরা উহার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিলাম না, সংস্কৃত পাঠকগণ যতদূর পারেন, উহার অর্থ করিয়া লইবেন। ঐ তাম্রশাসনে "খাড়ি-মণ্ডলী" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাপি সুন্দরবন-মধ্যে ঐ খাড়ি পরগণা ও খাড়িগ্রাম বর্তমান আছে।"

এই তাম্রশাসনের প্রতিলিপি কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। ওয়েস্টমেকট সাহেব ১৮৭৫ সালের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার ২য় পৃষ্ঠায় ন্যায়রত্ন মহাশয় দত্ত এই তাম্রশাসনের উল্লেখ করিয়াছেন।

সুন্দরবনের এই তাম্রশাসনখানিও শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারা মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লাল সেন পাদানুধ্যানাৎ পরমেশ্বর পরমবীরসিংহ—পরমবৈষ্ণব-

মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেব :—জয়দ্ধর দেবশর্মার প্রপৌত্র নারায়ণ দেবশর্মার পৌত্র, নরসিংহ দেবশর্মার পুত্র, গার্গ-গোত্রীয় অঙ্গিরা-বৃহস্পতি-শীলগর্গ-ভরদ্বাজ-প্রবর-ঋগ্‌-বেদাশ্বলয়ানশাখাধ্যায়ী, শ্রীধর দেবশর্মাকে দেওয়া হইয়াছিল। প্রদত্ত ভূমি পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্ত্যন্তঃ-পাতী খাড়িমণ্ডলিকার মধ্যস্থ শান্ত্যশাবিক গ্রামে ছিল। বোধ হয়, কৃষ্ণধর দেবশর্মা শান্ত্যশাবিক গ্রামবাসী ছিলেন, শান্ত্যশাবিক, কৃষ্ণধরের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ভূমি নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা তিন দ্রোণ পরিমিত ভূমিতে পঞ্চাশৎ পুরাণ মূল্যের শস্যোৎপাদন করিত। পূর্ববাংলায় এখনও দ্রোণ পরিমাণ প্রচলিত আছে, ৪৬$\frac{১}{২}$ × ২$\frac{১}{২}$ হাতে দ্রোণ জমি হয়।

প্রদত্ত ভূমি পৌণ্ড্রবর্ধন খাড়িমণ্ডলিকার মধ্যবর্তী তল্পপুর চতুরক গ্রামে পূর্বে শান্ত্যশাবিকপ্রভা শাসন সীমা, দক্ষিণে চিতাড়ি খাতার্ধ সীমা, পশ্চিমে শান্ত্যশাবিক-রামদেবশাসনপূর্ব সীমা, উত্তরে শান্ত্যশাবিক বিষ্ণুপাণিগড়োলি কেশবগড়োলি ভূমি সীমা, ইথং চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূমি নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশ্যে মাতাপিতা এবং স্বীয় পুণ্য ও যশোবৃদ্ধি কামনায় প্রদত্ত হইয়াছে। শাসনভূমি উগ্রমাধব নামীয় স্তম্ভাঙ্কিত দ্বাদশাধিক হস্তদ্বারা মাপ করা হইয়াছিল।[২৩]

৩। **আনুলিয়ার তাম্রশাসন**—এই তাম্রশাসনখানি রাণাঘাটের অন্তর্গত আনুলিয়া গ্রামে পাওয়া গিয়েছিল।

এই তাম্রশাসনখানি সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্তী "ঐতিহাসিক চিত্রে" ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন ও স্বর্গত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তাম্রশাসনখানি-সহ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[২]

এই তাম্রশাসন দ্বারা বিপ্রদাস শর্মার প্রপৌত্র, শঙ্কর দেবশর্মার পৌত্র, দেবদাস দেবশর্মার পুত্র কৌশিক গৌত্রীয় বিশ্বামিত্র-বন্ধুল কৌশিক-প্রবর যজুর্বেদ কাণ্ব-শাখাধ্যায়ী পণ্ডিত রঘুদেব শর্মাকে শ্রীপুণ্ড্রবর্ধনভুক্ত্যন্তপাতি ব্যাঘ্রতটিস্থিত পূর্বে অশ্বত্থবৃক্ষ সীমা, দক্ষিণে জলপিল্লী সীমা। পশ্চিমে শান্তিগোপশাসন সীমা, উত্তরে মালামঞ্চ-বাটি সীমা। এই চতুঃসীমাচ্ছিল মাথুরিয়া-খণ্ড ক্ষেত্রনারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশ্যে মাতাপিতা ও স্বীয় পুণ্য যশোবৃদ্ধি কামনায় প্রদত্ত হইয়াছে। শাসনভূমিতে সম্বৎসরে একশত কপর্দক পুরাণ ও মূল্যের শষ্য উৎপন্ন হইত।

ইহার অক্ষর দেবনাগরী ও বঙ্গাক্ষরের মধ্যবর্তী। এই তাম্রশাসনখানির আকার ১৩$\frac{১}{২}$ × ১১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি পরিমিত। উর্ধ্বে দশভুজসমন্বিত সদাশিব মূর্তি সংযোজিত। ৫৬ পংক্তি খোদিত। এই লিপি সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত।

আনুলিয়ার তাম্রশাসনখানিও শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল।

৪। **মাধাইনগর তাম্রশাসন**—এই তাম্রশাসনখানা পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মাধাইনগরে পাওয়া গিয়াছে। মাধাইনগরের নিকটবর্তী নিমগাছি জঙ্গলে রঘুনাথ বুনিয়া নামক এক ব্যক্তি উহা পায়। পাবনার সরকারি উকিল প্রসন্ননারায়ণ রায়চৌধুরি মহাশয় "ঐতিহাসিক চিত্রে" ইহার পাঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত পাঠ প্রকাশিত হইবার পর উহা স্বর্গত গঙ্গামোহন লস্করের হাতে আসে। তাহার মৃত্যুর পর এশিয়াটিক সোসাইটির অধিকারভুক্ত হয়। কিছুদিন পরে এই তাম্রশাসন সম্পর্কে প্রবন্ধ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রতিলিপি ও পাঠ সহ প্রকাশিত হইয়াছে।[২৪]

৫। **শক্তিপুর শাসন**—মুর্শিদাবাদ সদরের অন্তর্গত শক্তিপুর গ্রামের এক বিধবা এই তাম্রশাসনখানিক স্বত্বাধিকারিণী ছিলেন, তাহার মৃত্যুর পর সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ইহা "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের" চিত্রশালায় সংগৃহীত হইয়াছে। এই তাম্রশাসনখানি শক্তিপুর গ্রামে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া উহা "**শক্তিপুর তাম্রশাসন**" নামে পরিচিত। বঙ্গীয়-

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের চতুর্থ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রমেশ বসু মহাশয় সর্বাগ্রে এই তাম্রশাসনখানির পাঠ প্রকাশ করেন। ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে এই শাসনের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধটির নাম—'লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ।' ডাক্তার ভট্টশালী মহাশয় তাহার প্রবন্ধে তাম্রশাসনোক্ত ভূ-ভাগের স্থান নির্দেশ করিতে যাইয়া পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির সীমা নির্ণয় করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এবং তৎসম্পর্কে গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন।

শাসন-পরিচয় ঃ

এই তাম্রফলকখানির দুইদিকেই খোদিত লিপি আছে। শাসনখানি অন্যান্য লেখারই অনুরূপ। সেনরাজগণের মুদ্রা সদাশিব, ইহার ঊর্ধ্বভাগে সংযোজিত রহিয়াছে। শাসনখানি মোট ৫৮ পংক্তিতে সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রত্যেক দিকে ২৯ পংক্তি করিয়া লিপি রহিয়াছে। এই তাম্রশাসনের অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট। পড়িতে কোনওরূপ অসুবিধা হয় না।

শাসনখানির ভাষা সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যে বিরচিত। তাম্রশাসনখানা হইতে জানা যায় যে, হেমন্ত সেনের প্রপৌত্র বিজয়সেনের পৌত্র এবং বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন সূর্যগ্রহণোপলক্ষে কুবের নামক ব্রাহ্মণকে ৮৯ দ্রোণ পরিমিত ভূমি দান করিয়াছেন। সেই ভূমি কঙ্ক গ্রামভুক্ত্যন্তঃপাতি দক্ষিণবীথ্যামৃত্তর রাঢ়ায় অবস্থিত। অর্থাৎ, এই শাসনদত্ত ভূমিগুলি কঙ্কগ্রাম ভুক্তির দক্ষিণাংশে উত্তর-রাঢ় প্রদেষে কুম্ভীনগর (বিষয়ে?) মধুগিরি মণ্ডলে কুমারপুর চতুরকে অবস্থিত ছিল। প্রদত্ত জমি দুই খণ্ডে মোট ৮৯ দ্রোণ পরিমিত ছিল। প্রথম খণ্ড ৩৬ দ্রোণ, দ্বিতীয় খণ্ড ৫৩ দ্রোণ।

এই তাম্রশাসনে দূতকের নাম "সান্ধিবিগ্রহিক ত্রিপুরিনাথ। গোবিন্দপুর শাসনের সংবতের অঙ্ক ২, ২৮শে ভাদ্র, আনুলিয়ার সংবত ৩, ৯ই ভাদ্র, তপনদিঘির ও মজিলপুর শাসনগুলি দ্বিতীয় সংবৎসরের। এই চারিখানি শাসনেই দূত মহাসন্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত। কিন্তু এই শক্তিপুর শাসনখানির মধ্যে সান্ধিবিগ্রহিকের নাম ত্রিপুরারি রহিয়াছে। সম্ভবত ইনি নারায়ণ দত্তের পরে সান্ধিবিগ্রহিকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন-খানিও **শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার** হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। যথা—"সখলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত জয়স্কন্ধাবারাত। মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেন দেবপাদানুধ্যাত। পরমেশ্বর পরম-ভট্টারক-পরম-বৈষ্ণব মহারাজাধিরাজ শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ শ্রীলক্ষ্মণ সেন দেবঃ কুশলী ইত্যাদি। দেখা যাইতেছে যে, লক্ষ্মণসেন দেবের পাঁচখানি তাম্রশাসনই **শ্রীবিক্রমপুর** জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

৬। **গোবিন্দপুর শাসন**—এই তাম্রশাসনখানি ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরের নিকটবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামে পুষ্করিণী খনন-কালে উক্ত গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাপ্ত হন। তৎপরে ঐ শাসনখানি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হয়। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুরোধক্রমে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের এক মাসিক অধিবেশনে এই তাম্রশাসনখানি প্রদর্শন করেন।

তাম্রশাসনখানির আয়তন ১৩$\frac{১}{২}$ × ১২$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। ইহার শিরোদেশে দশভুজ-সমন্বিত সদাশিব মূর্তি তাম্রফলকের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে। এই মূর্তিটি খোদিত নয়—ছাঁচে ফেলা বলিয়াই বোধ হয়। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনেও এইরূপ রাজমুদ্রা আছে, তাহাতে "**শ্রীসদাশিব মুদ্রয়া মুদ্রয়িত্বা**" বাক্যে রাজমুদ্রার পরিচয় দেওয়া আছে। এই তাম্রশাসনের রাজমুদ্রা রাসায়নিক পরীক্ষায় বিশুদ্ধ তাম্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এই তাম্রশাসনখানি "পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেনের পাদানুধ্যান তৎপর পরমেশ্বর পরমভট্টারক **পরমনারসিংহ** (নরসিংহদেবের উপাসক) মহারাজাধিরাজ কুশলী **শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত** (স্থাপিত) শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার (রাজধানী) হইতে শ্রীবর্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী পশ্চিমবাটিকাতে বেঠড্ডচতুরকে পূর্বে জাহ্নবী অর্ধ সীমা, দক্ষিণে লেঘদেবমণ্ডপী সীমা, পশ্চিমে জালিম্ব-ক্ষেত্র সীমা, উত্তরে ধর্মনগর সীমা, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন তদ্দেশীয় ব্যবহারিক ৫৬ হস্ত পরিমিত নল দ্বারা সপ্তদশ উম্মানাধিক, ৬০ দ্রোণ পরিমিত এক প্রত্যেক দ্রোণে ১৫ পুরাণ উৎপত্তি নিয়মে বৎসরে ৯০০ উৎপত্তিবিশিষ্ট বিড্ডরশাসন, সসাটবিটপ, জল ও স্থলের সহিত, খাত ও উষর অর্থাৎ, অনুর্বর ভূমির সহিত গুবাক, নারিকেল ইত্যাদি বৃক্ষসম্পন্ন সহ্যদশাপরাধসর্বলোকের পীড়ারহিত অচট্টভট্ট প্রবেশ অকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্য স্তৃণপ্লুত গোচর পর্যন্ত, গোস্বামী দেবশর্মার প্রপৌত্র হলদেব শর্মার পৌত্র, শ্রীনিবাস দেবশর্মার পুত্র বাৎস্য গোত্র বাৎস্য আপ্লুবান্ ঔর্ব জামদগ্ন্যপ্রবর সামবেদের কৌথুম শাখাচরণানুষ্ঠানপর উপাধ্যায় শ্রীব্যাসদেবশর্মাকে পুণ্যদিনে বিধিবৎ উদকস্পর্শ পূর্বক ভগবান্ নারায়ণ ভট্টারককে উদ্দেশ্য করিয়া মাতা-পিতা ও নিজের পুণ্য ও যশ বৃদ্ধির জন্য রাজ্যাভিষেককালে উৎসর্গীকৃতত্বহেতুক, চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর অস্তিত্বকাল যাবৎ, ভূমিছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসন করিয়া তাহাদিগের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে আপনারা সকলে অনুমতি করুন। ইত্যাদি।

গোবিন্দপুরের তাম্রশাসনখানিও **শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার** হইতেই প্রদত্ত হইয়াছে।

এই তাম্রফলকখানি ক্ষৌণীন্দ্র (পৃথিবীপতি) শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ব্যসশাসনে সান্ধিবিগ্রহিক **নারায়ণ দত্তকে** দূত করিয়াছিলেন।

গোবিন্দপুরের শাসনেও আমরা লক্ষ্মণসেনের বীরত্বের পরিচয় পাই। যথা :—"ক্ষাত্রধর্মের আশ্রয়স্বরূপ সুজনগণনাপ্রগণ্য শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন বল্লালসেনের অপত্য। ইনি বাহুবলে শত্রুগণের সমরস্পৃহা নিবারণ করিয়াছিলেন ; ইনি এমন শক্তিসম্পন্ন যেন মনে হয় দিগীশবৃন্দ স্ব স্ব অধিকৃত দিগাঙ্গনাগণের সম্ভোগ-লালসায় আপনাদিকের অংশ প্রদান করিয়া এই লক্ষ্মণসেনকে নির্মাণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ, সমস্ত দিক ইহার বীর্যে বশীভূত ছিল।"[১]

এই ফলকখানারও প্রথম শ্লোক—ওঁ নামোনারায়ণায়। বিদ্যুদ্যত্র মণিদ্যুঃতি পণিপতের্ব্বালেন্দু-রিন্দ্রয়ুধং।। ইত্যাদি।

আমাদের এই সমুদয় তাম্রশাসন সম্পর্কে আর অধিক বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ নানাভাবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পত্র ও পত্রিকাতে আলোচনা করিয়াছেন এবং বিভিন্নরূপ মতামতও প্রকাশ করিয়াছেন।

১। তপনদিঘির তাম্রশাসন, ২। সুন্দরবনের নিকটে প্রাপ্ত শাসন, ৩। আনুলিয়ার প্রাপ্ত শাসন, ৪। শক্তিপুর তাম্রশাসন[২], ৫। গোবিন্দপুর শাসন এই পাঁচখানি তাম্রশাসনই বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। কেবল মাধাইনগর তাম্রশাসন শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই শাসনে লক্ষ্মণসেন গৌড়েশ্বর বিশেষণ বিশেষিত হইয়াছেন।

লক্ষ্মণ সেন পরম বৈষ্ণব বিশেষণে বিশেষিত ঃ

লক্ষ্মণদেবের তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোকটি প্রায় প্রত্যেক তাম্রশাসনের প্রথম ভাগে দেখা যায়। শ্লোকটি এই—

"বিদ্যুদযত্র মণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
বারি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালাবলাকাবলীঃ।
ধ্যানাভ্যাস সমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
ভূয়াদ্বঃস ভবার্ত্তিতাপভিদুরং শম্ভোঃ কর্পদ্দাম্বুদঃ।। ইত্যাদি[২৫]

বল্লালসেন দেবের তাম্রশাসন আরম্ভ হইয়াছে—"ওঁ নমঃ শিবায়" বলিয়া। আর লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন আরম্ভ হইয়াছে—"ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া। তপনদিঘির তাম্রশাসন, সুন্দরবনের তাম্রশাসনে, আনুলিয়ার তাম্রশাসনে, শক্তিপুরের তাম্রশাসন প্রভৃতিতে তাহাকে "পরমবৈষ্ণব" বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। কাজেই লক্ষ্মণ সেন যে পরম বৈষ্ণব ছিলেন, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি।

সেনরাজবংশ ও লক্ষ্মণসেন ঃ

"লক্ষ্মণসেন দেবের রাজত্বকালে সেন রাজবংশের চরম উন্নতির সময়। ডাঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী বলেন,—"বল্লালসেনের পরে তাহার পুত্র লক্ষ্মণসেন রাজা হন। কাহারও মতে ১১১৯ খ্রিস্টাব্দে যে লক্ষ্মণ সম্বৎ প্রচলিত হইয়াছিল, লক্ষ্মণসেনই তাহার প্রবর্তক। তিনি কাশীর রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কামরূপের রাজাও পরাজিত হইয়া তাহার বশ্যতা স্বীকার করেন। অবশেষ প্রভুত্বের চিহ্নস্বরূপ দক্ষিণ সমুদ্রতীরে তিনি একটি বিশাল জয়স্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন।"[২৬]

কেশবসেনের তাম্রশাসনে আছে—

বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপালমৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্ববন্দ্যো নৃপঃ।
ন গগনতলে এব শীতরশ্মির্নকনক ভূধর এব কল্পশাখী।
ন বিবুধপুর এব দেবরাজা বিলসতি যত্র ধরাবতারভাজি।
বহুবারণহস্তকাণ্ডসদৃশৌ বক্ষঃ শিলাসংহতং
বাণাঃ প্রাণহরা দ্বিষাং মদজলপ্রস্যন্দিনো দন্তিনঃ।
যস্যৈতাং সমরাঙ্গন প্রণয়িনীং কৃত্বা স্থিতিং বেধসা
কো জানাতি কুতঃ কুতো ন বসুধাচক্রে হনুরূপোরিপুঃ।।

লক্ষ্মণসেন বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। বিশ্বের বন্দনীয় ছিলেন তিনি। পৃথিবীতলে কল্পশাখা সদৃশ এমন দানবীর কোথায়! তিনি দেখিতে কিরূপ ছিলেন?—

লক্ষ্মণসেনের বাহুদ্বয় ছিল রাবন-হস্তকাণ্ড সদৃশ, বক্ষঃদেশ ছিল শিলাবৎ সংহিত, বাণ ছিল তাহার শত্রু প্রাণহর, লক্ষ্মণসেনের হস্তীগণ মদজল ক্ষরণ করিত। বিধাতা এ সকলকে সময়োপযোগী করিয়া তাহার অনুরূপ রিপু যে কোনও স্থানে সৃষ্টি করিয়াছিলেন কে জানে!"

লক্ষ্মণসেন যে ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ নিপুণ ছিলেন, তাহা "সেক শুভোদয়া" গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে। তিনি গঙ্গাতীরে যাইয়া শরাভ্যাস করিতেন। তাহার নিক্ষিপ্ত শর অপর তীরে যাইয়া পড়িত।[২৭]

লক্ষ্মণসেন কামরূপ এবং আরাকানরাজকে যে পর্যুদস্ত করিয়াছিলেন তাহার পরিচয়ও আমরা শাসন-লেখ হইতে পাইতেছি। লক্ষ্মণসেনের এবং বিশ্বরূপ সেনের প্রশস্তিকার, লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক কাশীরাজের [কান্যকুব্জ রাজের] পরাজয়ের বিষয়ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে জানিতে পারি যে, বীরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণসেন—

বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্মুষলধরগদাপাণি সংবাসবেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসিবরুণাশ্লেষগঙ্গোর্মিভাজিং।
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেস্যাঃ কমলভবমখারম্ভ নির্ব্যাজপূতে।
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযুপৈঃ সহ সমরজয়স্তম্ভ মালান্যধায়ি।।

লক্ষ্মণসেনের দিগ্বিজয় সমর জয়স্তম্ভ ঃ

ইহা হইতে জানিতে পারিতেছি যে, লক্ষ্মণসেন দক্ষিণ সমুদ্রের বেলাভূমিতে মুষলধর ও

গদাপাণির সংবাসবেদিতে, অসি বরুণার গঙ্গ-সঙ্গম বারাণসীক্ষেত্রে ব্রহ্মার পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র ত্রিবেণীতে, যজ্ঞযূপের সহিত সমর বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, লক্ষ্মণসেন একদিকে ত্রিবেণী এবং বিশ্বেশ্বরের ক্ষেত্র [বারাণসী] এবং অপর দিকে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরস্থিত জগন্নাথ ক্ষেত্র [মুষলধর গদাপাণি সংবাস বেদ্যাং] পর্যন্ত তদীয় বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[২৮]

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল ঃ

লক্ষ্মণসেন যেমন পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন, তেমনি তিনি গুণগ্রাহী এবং বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। লক্ষ্মণসেন নিজে সুপণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তাহার সভার গৌরব-বর্ধন করিয়াছিলেন—গোবর্ধন, শরণ, জয়দেব, উমাপতি, ধোয়ী এই পঞ্চরত্ন। লক্ষ্মণসেনের অমাত্য বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস কর্তৃক সংগৃহীত "সদুক্তিকর্ণামৃতে" তাহার রাজত্বকালের কবিগণের বহু শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। রামপাল দেবের রাজত্বকাল হইতে গৌড়ীয়-শিল্প উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। এই যুগের নিদর্শনগুলি এখন পালসাম্রাজ্যের শিল্প-নিদর্শন-সমূহের সমতুল্য না হইলেও তদপেক্ষা অধিক হীন নহে। লক্ষ্মণসেনদেব প্রায় ত্রিংশবর্ষ-কাল গৌড়সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ১১৭০ খ্রিস্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

উমাপতিধর দাক্ষিণাত্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বিজয়সেন প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরস্থিত যে প্রশস্তি রচনা করেন, তাহার বিষয় আমরা প্রসঙ্গ-ক্রমে পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জয়দেবের সুবিখ্যাত "গীতগোবিন্দের" তৃতীয় শ্লোকে আছে,—

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরয়াং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধন—
স্পর্দ্ধী কোহপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়িকবিস্মপতি।

লক্ষ্মণসেন দেবের রাজত্বের প্রথম অবস্থায় জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" এবং ধোয়ী কবির 'পবনদূত' বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

পবনদূত ঃ

ধোয়ী কাশ্যপগোত্রীয় পালধি গ্রামীণ ছিলেন। তিনি কালিদাসের "মেঘদূতের" অনুকরণ করিয়া পবনদূত রচনা করেন। কবির কাব্যের বিষয়-বস্তু এই—লক্ষ্মণসেন দিগ্বিজয় করিতে যাইয়া ভারতের দক্ষিণভাগে মলয় পর্বতে যাইয়া উপস্থিত হন। তাহার অপূর্ব রূপ-লাবণ্য দর্শনে কুবলয়বতী নামক এক গন্ধর্ব-কন্যা মুগ্ধা হন। তিনি পবনকে দূত করিয়া লক্ষ্মণসেনের নিকট পাঠাইয়াছিলেন ও পথের নির্দেশ করিয়া দিতেছেন। ধোয়ী কবির পবনদূতে সুম্মের বর্ণনা আছে।

গৌড়দেশের বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি লিখিয়াছেন—"সেখানে মহাদেবের নগর শ্বেত অট্টালিকাবলীতে কৈলাস পর্বতের ন্যায় শোভমান। সেখানে গঙ্গানদীর তীরে অর্ধগৌরীশ্বর মূর্তি বিরাজমান। মহাদেবের ক্ষেত্র হইতে গঙ্গা অল্পদূরস্থ।" অর্ধ গৌরীশ্বরমূর্তির উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, সে সময়ে অর্থাৎ, সেন রাজাদের রাজত্বকালে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির পূজা বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন ও পবনদূতের বর্ণনা হইতে তৎকালীন দেশের অবস্থা অবগত হইতে পারি।

লক্ষ্মণসেনের সময় রাজ্যের অবস্থা ঃ

লক্ষ্মণসেনের সময়ে বঙ্গের রাজধানীর রাজপথ সায়ংকালে বারবিলাসিনীগণের মঞ্জীর-

নিক্বণে চমকিত হইত। * * * নিশীথে স্বেচ্ছাবিহারিণী অভিসারিকাগণের অব্যাহত গতিতে মুখরিত হইত! প্রেমালিঙ্গ কামিনীগণের প্রেমালাপে সমস্ত বিভাবরী উদ্‌ভ্রান্ত হইত। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, সেকালে কিরূপ বিলাস-স্রোতে নগরী ভাসমান ছিল।

লক্ষ্মণসেন যে শ্রীবিক্রমপুরের [বঙ্গে-পূর্ববঙ্গে] রাজধানীতে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা নানারূপ প্রমাণ পাইয়া থাকি। লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র মহামাণ্ডলিক শ্রীধর দাসের "সূক্তিকর্ণামৃতে" আছে—

শাকে সপ্তবিংশত্যাবিকশতোপেত দশশতে শরদাম্
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবক্ষিতিপস্য রসৈকত্রিংশে।
সবিতুর্গত্যা ফাল্গুনবিংশেষু পরার্থহেতাবকুতুকাৎ।
শ্রীধরদাসেনেদং "মুক্তিকর্ণামৃত চক্রে"।।

অর্থাৎ, শ্রীধরদাস ১১২৭ শকের ২০শে ফাল্গুন "সূক্তিকর্ণামৃত" রচনা করেন। তখন লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের আনুমানিক ৩৭ বৎসর অতীত হইয়াছিল এবং তিনি পূর্ববঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন। সমগ্র গৌড়রাজ্যের কিয়দংশ হস্ত-বহির্ভূত হইলেও, তিনি তাহার দাবি পরিত্যাগ করেন নাই। সম্ভবত ১১১৯ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মণসেন সিংহাসনাধিরোহণ করেন। সচরাচর ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে গৌড় নগর মুসলমানদের অধিকৃত হয়, এইরূপ বলা হয়। মুসলমানেরা ঐ অব্দে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করে। লক্ষ্মণসেনের কোনও পুত্র গৌড়ে অবস্থান করিয়া দীর্ঘকাল মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে (৬০২-৩ হিজারায়) গৌড়নগর সম্পূর্ণ রূপে মুসলমানদের অধিকৃত হয়।

হলায়ুধ লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকারী ছিলেন। তিনি স্বকৃত "ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব" লিখিয়াছেন,— লক্ষ্মণসেন তাহাকে বাল্যে রাজ পণ্ডিতের পদ ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্মাধিকারীর পদ প্রদান করেন। যথা—

"বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশু বিম্বোজ্জ্বল-
চ্ছত্রোৎসিক্ত—মহামহত্বানুপদং দত্তনবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষ যোগ্যমখিল-ক্ষ্মাপালংনারায়ণঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেব নৃপতি ধর্মাধিকারং দদৌ।।

এইরূপ হইলে লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব অতি দীর্ঘ হইয়া পড়ে। বোধহয়, লক্ষ্মণসেনের যৌবরাজ্য-সহ রাজত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। লক্ষ্মণসেন, গৌড় ও নবদ্বীপ হইতে তাড়িত হইয়া পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বহু ব্রাহ্মণ পরিবার গৌড় ও নবদ্বীপের সন্নিহিত স্থান ত্যাগ করিয়া রাজার সঙ্গী হন। এইজন্য বিক্রমপুর অঞ্চলে সদ্‌ব্রাহ্মণের সংখ্যা এত বেশি। লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে কতদিন রাজত্ব করেন, তাহা জানা যায় না। সে সময়ে লক্ষ্মণসেনের যতটুকু রাজ্য ছিল, হলায়ুধকে তাহার ধর্মাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। হলায়ুধ আপনাকে "গৌড়েন্দ্র ধর্মাপরাধিকারী" বলিয়াছেন। গৌড় হইতে তাড়িত হইলেও, সেন-বংশ গৌড়েন্দ্র পদবি হইতে শীঘ্র বঞ্চিত হন নাই।

হলায়ুধ পণ্ডিত ঃ

হলায়ুধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ধনঞ্জয় ও মাতার নাম ছিল উজ্জ্বলা। তিনি বাৎস্যগোত্রীয় ছিলেন। মহাপণ্ডিত হলায়ুধ, শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া "মৎস্যসূক্ত" রচনা করেন। সেসময় গৌড়বঙ্গ তান্ত্রিকায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। যাহাতে হিন্দু সদাচার রক্ষা হয়, তান্ত্রিকতারও প্রতিকূল না হয়, ইহার ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়েই "মৎস্যসূক্ত" রচিত হইয়াছিল। "মীমাংসা-সর্বস্ব", "বৈষ্ণব-সর্বস্ব", "শৈব-সর্বস্ব", "পুরাণ-সর্বস্ব", "পণ্ডিত-সর্বস্ব" হলায়ুধের রচিত। হলায়ুধের জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম পশুপতি। ইনি

লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। পশুপতির "পশুপদ্ধতি" নামক স্মৃতি-গ্রন্থ বিখ্যাত। হলায়ুধের অপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশান, স্মৃতি ও মীমাংসা-শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। "আহ্নিক পদ্ধতি" প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই তিন ভ্রাতাই বিবিধ শাস্ত্রে বিশারদ পরম পণ্ডিত ছিলেন।

শূলপাণি ঃ

সে সময়ে শূলপাণিও একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি "দীপকলিকা" নামক যাজ্ঞবলক সংহিতার টীকা সম্পাদনা করেন।

পুরুষোত্তম দেব ও "ত্রিকাণ্ড শেষ" ঃ

পুরুষোত্তম দেব নামক বিখ্যাত পণ্ডিত "ত্রিকাণ্ড শেষ" নামক অভিধান রচনা করেন। পুরুষোত্তমদেব বৌদ্ধ ছিলেন। লক্ষ্মণসেন তাহাকে পাণিনি ব্যাকরণের বৈদিক প্রয়োগাংশ বাদ দিয়া ভাষাবৃত্তি রচনা করিতে আদেশ করেন। পুরুষোত্তম দেবের রচিত এই বৃত্তির নাম "লঘুবৃত্তি।" জয়দেব, গোবর্ধন, শরণ, উমাপতিধর ও ধোয়ী কবিরাজ প্রভৃতির কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি।

তাম্রশাসন ও লক্ষ্মণসেন ঃ

লক্ষ্মণসেন দেবের মাতার নাম ছিল রামদেবী। রামদেবী চালুক্যবংশের কন্যা ছিলেন। মাধাইনগরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে লিখিত আছে—

ধরাধরান্তঃপুরমৌলিরত্নচালুক্যভূপালকুলেন্দুরেখা
তস্য প্রিয়াভুদ্বহমানভূমির্লক্ষ্মী পৃথিব্যোরপি রামদেবী।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, সেনবংশীয় নৃপতিগণের সহিত দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের নৃপতিগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ বরাবরই অক্ষুণ্ণ ছিল। মাধাইনগরের তাম্রশাসনে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে—

কর্ণাটক্ষত্রিয়াণমজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ ইত্যাদি। ইহার দ্বারা লক্ষ্মণসেন আপনার বংশকে কর্ণাট ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

তাম্রশাসনের কাল-নির্দেশ ঃ

লক্ষ্মণসেনের, ১। সুন্দরবনের তাম্রশাসনখানি তাহার রাজ্যাব্দের দ্বিতীয় বর্ষে মাঘ মাসের দশমদিনে প্রদত্ত হইয়াছিল। ২। লক্ষ্মণসেন দেবের দিনাজপুরের তপনদিঘির তাম্রশাসনখানি তাহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে ভাদ্রমাসের তৃতীয় দিবসে হেমশ্বরথ দানের দক্ষিণা-স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। ৩। আনুলিয়ার তাম্রশাসনখানিও বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে তাহার তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের ভাদ্রমাসের নবম দিনে প্রদত্ত হইয়াছিল। ৪। মাধাইনগরের তাম্রশাসনখানি ৫৭।৫৮ পংক্তি অস্পষ্ট থাকায় কোনও বৎসরে উহা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা অবগত হওয়া যায় না। ৫। গোবিন্দপুরের তাম্রশাসনখানি তাঁহার রাজত্বের ৩য় সংবৎসরে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ঢাকা নগরের ডাল বাজারে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের ্য় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীমূর্তি ঃ

আমরা বাল্যকালে যখন ঢাকা বাংলাবাজারের মেসে কিছুদিন ছিলাম, তখন প্রতিদিন বুড়িগঙ্গা নদীতে স্নান করিবার জন্য জীবনবাবুর প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দিরে এক দেবী-মূর্তি প্রতিষ্ঠিতা দেখিয়াছি। সুন্দর কারুকার্যখচিত প্রস্তরনির্মিত তোরণের ভিতর দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইত। কতবার এ মূর্তি দেখিয়াছি, কিন্তু তখন কিই বা বুঝিতাম! কিন্তু একদিন পাষাণের ঘুম ভাঙ্গিল! পাষাণ কথা কহিল। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একবার ঢাকায় আসিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টিতে পাষাণময়ী-দেবী আত্মপ্রকাশ করিলেন, অন্ধ ঢাকাবাসীর চোখ খুলিল, তাহারা দেখিল দেবী পাষাণের মুখ দিয়া কথা বলিতেছেন! এই দেবী চণ্ডীর মূর্তি, লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে বঙ্গে নারায়ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রাখালবাবু এবং ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই লিপিখানির পাঠোদ্ধার করেন। তাহা এই—প্রথম পংক্তি—শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেবস্য সং ৩

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তি :

২। মালদেই সুতঅধিকৃত শ্রীদামোদ্র

৩। ণ শ্রীচণ্ডীদেবী সমবণা তদ্‌ব্রাদকদ্ধা"

তৃতীয় অংশ প্রথম পংক্তিতে আছে—শ্রীনারায়ণেন প্রতিষ্ঠিতেতি ৪র্থ।।

অর্থাৎ, শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেবের [রাজত্বের] তৃতীয় সংবৎসরে মাল দেই [দেব?] সুত অধিকৃত দামোদর চণ্ডীদেবীর [মূর্তি] আরম্ভ করেন এবং নারয়ণ কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] এই মূর্তিটি শ্রীবিক্রমপুর [রামপাল] হইতে আনীত হইয়াছিল।[২৯]

এই লিপি সম্বন্ধে নানারূপ বিতর্ক চলিয়াছে, তবে আমরা ঢাকার এই লিপিখানি যে তাঁহার জীবিতকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তাহার যে কয়খানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই তদীয় তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব, লক্ষ্মণসেন দেবের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে এমন কোনও কিছুও ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেজন্য নৃপতি লক্ষ্মণসেন আনন্দে ও উৎসাহে দান-ধ্যান কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

লক্ষণ সংবৎ : "লক্ষ্মণসেন দেবের রাজ্যাভিষেক-কাল হইতে একটি নূতন অব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, **'লক্ষ্মণাব্দ' 'লক্ষ্মণ সংবৎ'** নামে পরিচিত। এই অব্দটি সম্বন্ধে স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তৎপ্রণীত "বাংলার ইতিহাসের" একাদশ পরিচ্ছেদে [২৯৯-৩০১ পৃষ্ঠা] আলোচনা করিয়াছেন। 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা যতীন্দ্রবাবু—'পরিগনাতি সন, সন বল্লালি ও লক্ষ্মণ সম্বৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিক্রমপুর অঞ্চল হিন্দু নরপতিগণের শাসনাধীনে ছিল। সুতরাং, এই অব্দটি কেশবসেনের পরবর্তী কোনও সেনরাজা কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। পরগণা যদি "পারসি শব্দ হয়, তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, পরগণা-বিভাগ সময়ে এই সনটিকে পরগণাতি সন বলিয়াই পরিচিত করা হইয়াছিল।" ডাঃ ভট্টশালী মহাশয়ের মত এই যে, দ্বিতীয় লক্ষ্মণাব্দ বর্তমান সময়ে পরগণাতিসন নামে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত আছে।" আমরা সম্ভবত সকলের আগে 'আরতি' পত্রে ও 'বিক্রমপুরের ইতিহাসের' প্রথম সংস্করণে পরগণাতি সন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলাম।

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, জগদ্‌বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ স্বর্গত ডাঃ কিলহর্ণের মত গ্রহণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে; এই অব্দ ১১১৮-১৯ খ্রিস্টাব্দ হইতে গণিত হইতেছে। লক্ষ্মণাব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মতভেদ আছে। ডাঃ কিলহর্ণের মতই সমীচীন বোধ হয়। তাঁহার মত অনুসারে লক্ষ্মণসেন দেবের অভিষেককাল হইতে লক্ষ্মণাব্দ গণিত হইয়াছে।[৩০]

বিক্রমপুরের ইতিহাস :

লক্ষ্মণ সংবতের সূচনা ও প্রচলন সম্পর্কে নানারূপ মতামত চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু লক্ষ্মণসংবতের আরব্ধ-কাল সম্বন্ধে পূর্বে মতভেদ থাকিলেও মিঃ বিভারিজ ও ডাক্তার কিলহর্ণ মনীষীগণ 'আকবরনামার' উল্লিখিত একখানি ফারমানের তারিখ হইতে স্থির করিয়াছেন, যে, লক্ষ্মণ সংবৎ ১১১৯ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভকাল হইতেই গণিত।

আবার কেহ কেহ বলেন, বল্লালসেনের মিথিলা আক্রমণ-কালে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের জন্ম এবং বিজয় এই উভয় ঘটনা স্মরণীয় করিবার নিমিত্ত তিনি পুত্রের নামে লক্ষ্মণ সংবত নামে একটি অব্দ প্রচলন করেন। কাহারও কাহারও মত এই যে,

মিথিলা বিজয়-কালে চতুর্দিকে বল্লালের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল এবং সেই নিমিত্ত নবজাত লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিতও হইয়াছিলেন; এজন্যই উক্ত অব্দ বল্লালের নামে প্রচলিত না হইয়া তদীয় পুত্রের নামে প্রচলিত হয়। "লঘুভারতকার" বলেন—

প্রবাদঃ শ্রূয়তে চাত্র পারম্পরীণ বার্ত্তয়া।
মিথিলে যুদ্ধ যাত্রায়াং বল্লালে হ ভুন্মৃতধ্বনিঃ।।
তদানীং বিক্রমপুরে লক্ষ্মণো জাতবানসৌ।। লঘুভারত ২য় খণ্ড ১৪০ পৃঃ।

লক্ষ্মণাব্দ যেরূপেই উদ্ভাবিত হইয়া থাকুক না কেন তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণ যেরূপ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার পর আর আমাদের পক্ষে ঐ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কৌতূহলী পাঠকগণ আমাদের পাদটীকায় লিখিত গ্রন্থাবলি আলোচনা করিলেই নিজ নিজ মতামত সংগঠন করিতে পারিবেন। আমরা যে মত গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছি তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

"লক্ষ্মণাব্দ", "লক্ষ্মণ সংবৎ", "ল সং" নামে পরিচিত। মুসলমান-বিজয়ের পরেও ঐ অব্দ বহুকাল পর্যন্ত মিথিলায় ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং বর্তমান সময়েও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাজেই এই অব্দ সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা করা আবশ্যক।

"লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কলঙ্ক"

লক্ষ্মণসেন পরাক্রমশালী ছিলেন এবং নানা যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিলেন, আমরা তাম্রশাসনের খোদিত-লিপি হইতে তাহাই জানিতে পারিতেছি। আমরা তাম্রশাসনে তাহাকে বিক্রম-বশীকৃত-কামরূপ' রূপে বর্ণিত হইতে দেখিতে পাইতেছি, আবার তাঁহাকে' 'কাশীরাজ বিজেতা' রূপেও দেখিতে পাইতেছি। "লক্ষ্মণসেন যখন গৌড়ের অধিপতি, তখন কান্যকুব্জের সিংহাসনে গাহড়-বাল-রাজ-জয়চন্দ্র এবং কলিঙ্গের সিংহাসনে দ্বিতীয় য়াজরাজ, এবং তৎপরে দ্বিতীয় অনঙ্গভীম, সমাসীন ছিলেন। ইহারা কেহই গৌড়াধিপের তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন না। সুতরাং, ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে গৌড়াধিপের জয়লাভ অসম্ভব নহে। কিন্তু লক্ষ্মণসেন গৌড়রাষ্ট্রের বহিঃশত্রু দমনে সমর্থ হইয়া থাকিলেও, প্রজাপুঞ্জের সহযোগিতার অভাবে, অভ্যন্তরীণ ঐক্য-সাধনে, এবং বিভিন্ন অংশের রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। সেই জন্যই মহম্মদ-ই-বখতিয়ার অবাধে মগধ ও বরেন্দ্র অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।[৩১]

আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি লক্ষ্মণসেন মুসলমান আক্রমণে ভীত হইয়া পলায়ন করেন। বাল্যকালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়িবার সময় আমরা নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটি মুখস্থ করিয়াছিঃ

"তুমি কেহে নবদ্বীপ অন্তঃপুর দ্বারে,
রমণী অঞ্চল ধরি কম্প থরে থরে
কালামুক ভীরু বৃদ্ধরাজ কুলাঙ্গার
চঞ্চল হৃদয় তার বাকশক্তিহীন
গাঢ় অমা—অন্ধকারে বদন মলিন
নিশ্বাসে প্রবল বায়ু নয়নে আসার।
কে তুমি গঙ্গার এই গভীর উরসে
তরি যোগে পলাইছ ঘন উর্ধ্বশ্বাসে
চাহিয়া পশ্চাৎ পানে তিলে শতবার

একি ঘোর কোলাহল তোরণ দুয়ারে
গরজে কি কাল মেঘ প্রলয় সঞ্চরে?
* * * * *
দাঁড়াও দাঁড়াও বৃদ্ধ ভয় অকারণ
এ কলঙ্ক ধৌত তব না হবে কখন
করি সর্বনাশ বঙ্গে জীবনের আশ
অশীতি বৎসর পুনঃ বাঁচিতে প্রত্যাশ।
ভীমবল বল্লালের তুমি কুলধর
বারেক * * সহ করহ সমর।
একি মন্ত্রী পশুপতি তোমার উচিত
নারকি বিশ্বাসঘাতী জেনিছি নিশ্চিত।
ডাকি আনি দস্যুগণে নিজ গৃহ দ্বার
খুলে দেয় শুনি নাই জানিলাম তবে,
এখনি সে প্রতিফল পদে পদে হবে
ইতিহাসে এ কলঙ্ক ঘুষিবে তোমার।
হলায়ুধ পণ্ডিতের মিথ্যা অভিমান,
ভীরুতার পরিচয় করি শাস্ত্র জ্ঞান,
একি উপদেশ হায়, স্বাধীনতা নাশে
* * হস্তগত বঙ্গ ভূমি হবে?
রাজ অন্ন খেয়ে একি ব্যবহার তবে?
হিন্দু লক্ষ্মী ছেড়ে দিলে কোনও সুখ আশে?
চিরদিন তরে বঙ্গ সুখ রবি গত,
উদিবে কি; রাহুগ্রাসে হইলে পতিত।
অধীনতা তমোজাল ক্রমেতে ঢাকিল
হায়রে বঙ্গের লক্ষ্মী.........করে
স্বপ্তদশ জন মাত্র স্বাধীনতা হরে
ধন্যমানি বক্তিয়ার তব ইন্দ্রজাল।[৩২]

ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কলঙ্কের কথা কিভাবে জনসমাজের কাছে প্রচারিত হইয়া আসিয়াছিল।

লক্ষ্মণসেন যখন নিশ্চিন্ত মনে পণ্ডিতগণ পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে মুসলমানেরা ধীরে ধীরে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিতেছিলেন।

১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে মুইজউদ্দিন ঘুরী দ্বিতীয়বার বহু সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তরাইন নামক স্থানে ঘুরীর সহিত পৃথ্বীরাজের যুদ্ধ হইল, সেই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ বন্দি হইলেন।

পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর ঘুরী আজমীর অধিকার করিলেন। একজন হিন্দু, করদ নৃপতিরূপে আজমীরের শাসনকার্যে নিযুক্ত হইলেন। ঘুরী এই বিজয়ের পর গজনীতে ফিরিয়া গেলেন। তাহার তুরস্ক ক্রীতদাস কুতুবদ্দিন আইবককে ভারতবর্ষ শাসন করিবার জন্য রাখিয়া গেলেন।

লক্ষ্মণসেন ও বক্তিয়ার ঃ

কুতুবদ্দিন স্বীয় রণনৈপুণ্য-প্রভাবে শীঘ্রই দিল্লি এবং অন্যান্য অনেক স্থান জয় করিলেন। (১১৯৩ খ্রিস্টাব্দ)। এই বৎসরই কুতুবদ্দিন, কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রকে চন্দাবারের যুদ্ধে

পরাজিত ও নিহত করেন। এইরূপে ইসলামের বিজয়-গৌরব বারাণসী পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বিজয়ের অত্যল্পকাল পরেই, কুতুবদ্দিনের জনৈক কর্মচারী বক্তিয়ারের পুত্র মুহম্মদ বঙ্গ ও বিহার জয় করেন। এই সময়ে বিহারের পালবংশের একজন রাজা রাজত্ব করিতেন এবং বঙ্গদেশে সেন বংশীয় নৃপতি লক্ষ্মণসেন (আঃ ১১৮৫-১২০৬ খ্রিস্টাব্দে) রাজত্ব করিতেছিলেন। লক্ষ্মণসেন বক্তিয়ার কর্তৃক পরজিত হইয়াছিলেন। ইহাই জনপ্রবাদ।[৩৩]

মহম্মদ-ই বখতিয়ার কর্তৃক যে ভাবে বঙ্গ-বিজয়-কাহিনী লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, মাত্র সপ্তদশ জন অশ্বারোহী বঙ্গ-বিজয় করিয়াছিল! ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"সপ্তদশ অশ্বরোহী-লইয়া-বক্তিয়ার খিলজি বাংলা জয় করিয়াছিলেন, একথা যে বাঙালি বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার!"

এতদিন পর্যন্ত ঐতিহাসিকগণ মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ কর্তৃক লিখিত "তবাকাৎ-ই"—নাসেরি নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থকে প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়া বীর্যবান লক্ষ্মণসেনকে পলায়ন-কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া আসিতেছিলেন। স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রের মহাশয় স্বীয় অতুল্য গবেষণা দ্বারা সে কলঙ্ক অপনোদন করিয়াছেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের পরে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তৎপ্রণীত "গৌড় রাজমালা" নামক গ্রন্থে, স্বর্গত ঐতিহাসিক বন্ধুবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তৎপ্রণীত "বাংলার ইতিহাস" প্রথম ভাগে, এবং আমি মৎপ্রণীত "বিক্রমপুরের ইতিহাসেও" লক্ষ্মণসেনের এই পলায়ন-কলঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম এবং "ঢাকা ইতিহাসেও" যতীন্দ্রবাবু এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আমরা এই স্থানে এই বিষয়ে তাহাদের মতামত উদ্ধৃত করিলাম। দীর্ঘ হইলেও এ বিষয়টি সম্বন্ধে জানা একান্ত আবশ্যক।

স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কলঙ্ক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গগমনের ষষ্ঠবর্ষ পরে' সুবিখ্যাত মুসলমান ইতিহাস লেখক "মিনহাজ-ই-সিরাজ" এদেশে উপনীত হইয়াছিলেন, তিনি 'তাবকাৎ-ই-নাসেরি নামক দিল্লি-সাম্রাজ্যের যে ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিংশ পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গভূমির কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে, বক্তিয়ার সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া "নওদিয়া" নামক রাজধানীতে উপনীত হইবা মাত্র, রায় লছমানিয়া' নামক হিন্দু নরপতি পলায়ন করিয়াছিলেন। * * ইহার মূল প্রমাণ, মিনহাজের গ্রন্থে, তাহার একমাত্র প্রমাণ বৃদ্ধ সৈনিকের পুরাতন আখ্যায়িকা! বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গ-গমনের ষষ্ঠবর্ষ পরে এদেশে আসিয়া, মিনহাজ যে বৃদ্ধ সৈনিকের নিকট এই অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি তখন অশীতিপর বৃদ্ধ, তাহার সত্যনিষ্ঠা বা আত্মগৌরব ঘোষণার প্রবল প্রলোভন কতদূর প্রবল ছিল, এতকাল পরে তাহার মীমাংসা করিবার সম্ভাবনা নাই। মুসলমানগণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগে যাহারা এদেশের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, সেই সকল সুগৃহীতনামা নরপালগণের নানা শাসন-লিপি আবিষ্কৃত হইয়া আমাদিগের নিকটে যে-সকল পুরাতত্ত্বের দ্বার উদঘাটিত করিয়া দিয়াছে, তাহা সপ্তদশ অশ্বারোহীর অলৌকিক দিগ্বিজয় কাহিনীর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না।

* * * বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গাগমন সময়ে রাঢ়, মিথিলা, বারেন্দ্র, বঙ্গ এবং বাগড়ি নামক ভাগ-পঞ্চকে বিভক্ত থাকিবার কথা আমরা মুসলমান লেখকদিগের গ্রন্থেই দেখিতে পাই। তৎকাল এই পঞ্চবিভাগ গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও এক রাজার অধীন ছিল। বিক্রমপুর, লক্ষ্মণাবতী এবং লক্ষ্মৌর নামে তিন স্থানে তিনটি রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বর্ণনায় "নওদিয়া" নামক স্থানে কোনও রাজধানী সংস্থাপিত থাকিবার উল্লেখ নাই। "নওদিয়া" কোথায়

ছিল, তাহা রাজধানী হইলে, তৎপ্রদেশে মুসলমান জায়গির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা—রায় লছমনিয়াই বা কাহার নাম—এ সকল প্রশ্নের কোনও সদুত্তর প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। লক্ষ্মণসেন পশ্চিমে কাশী এবং পূর্বে কামরূপ পর্যন্ত বিজয় লাভ করিয়া, বীর-কীর্তির জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাস-লেখকগণ বলেন—এই নরপতির নামানুসারেই পুরাতন গৌড়নগরের নাম "লক্ষ্মণাবতী" বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকদিন পর্যন্ত এদেশের মুসলমান রাজ্য দিল্লির ইতিহাস লেখকদিগের গ্রন্থে "লক্ষ্মণাবতীরাজ্য" বলিয়াই উল্লিখিত আছে। লক্ষ্মণসেনের বীরপুত্র বিশ্বরূপ সেনের শাসন-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি বাহুবলে আত্মরক্ষা করিয়া গর্গযবনান্বয়প্রলয়কালরুদ্র নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। মিনহাজ যখন এদেশে পদার্পণ করেন, তখনও (বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গে গমনের ষষ্ঠবর্ষ পরেও) পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণসেনের পুত্রগণের অক্ষুণ্ণ অধিকার বর্তমান ছিল, তদ্দেশে তখনও পর্যন্ত মুসলমান শাসন বিস্তৃত হইতে পারে নাই। শাসনলিপির ও মুসলমান লেখকের এই সকল উক্তির সমালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, বক্তিয়ার সহজে এদেশে অধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই,—তিনি কোনও স্থানে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্মণাবতীর নিকটবর্তী কয়েকটি পরগণা মাত্র, এবং সেখানেই মুসলমানদিগের সর্বপ্রথম জায়গির লাভের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধ্যাপক ব্লকম্যান লিখিয়া গিয়াছেন—"দিনাজপুরের অন্তর্গত দেবকোট নামক স্থানে একটি সেনানিবাস সংস্থাপিত করিয়া, বক্তিয়ায় যুদ্ধ-কলহে লিপ্ত ছিলেন, এবং সেই সেনানিবাসই তাহার বিজয় রাজ্যের পূর্বোত্তর সীমা বলিয়া পরিচিত ছিল।"

মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ লক্ষ্মণসেনকে পলায়ন কলঙ্কে কলঙ্কিত করেন নাই; তদীয় রাজ্যাব্দের অশীতিবর্ষে দিগ্বিজয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; আমরাই অর্থ নির্ণয়ে অগ্রসর না হইয়া অনুমান বলে "রায়লখ-মণিয়াকে" লক্ষ্মণসেন বলিয়া ধরিয়া লইয়া, অযথা কলঙ্কে স্বদেশের ইতিহাস মলিন করিয়া তুলিতেছি।"

'গৌড়রাজমালা' প্রণেতা এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ, 'নোদিয়া বিজয়ের' কথা আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"লক্ষ্মণসেনের কাপুরুষতায় বাংলা তুরস্কের পদানত হইল, ইদানীং অনেকেই এ কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু মিনহাজুদ্দিন যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতি অক্ষরও যদি সত্য হয়, তাহা হইলে লখমনিয়াকে বা লক্ষ্মণসেনকে "কাপুরুষ" না বলিয়া বীরাগ্রগণ্য বলাই সঙ্গত। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, সকলে নোদিয়া ছাড়িয়া সুদূর কামরূপে ও বঙ্গে পলায়ন করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ বীর লখমনিয়া নোদিয়া ছাড়িয়া একপদও নড়িলেন না, একটি জনশূন্য রাজধানীতে একটি বৎসর শত্রুর প্রতীক্ষায় রহিলেন। যখন শত্রু আসিল, তখন যে অপাত্রের হস্তে নগর দ্বার রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিলে, তাহারা তুরস্ক সওয়ারগণকে ঘোড়ার সওদাগর ভ্রমে বাধা দিল না। সতত শত্রুর প্রতীক্ষাকারী নগরদ্বার রক্ষকগণ সশস্ত্র অশ্বারোহীদিগকে ঘোড়ার সওয়দাগর ভ্রমে নগরে প্রবেশ করিতে দেয়, মিনহাজুদ্দিন ভিন্ন আর কোনও ঐতিহাসিক এরূপ অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনার অবসর পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যখন রাজভবনে প্রবেশ করিয়া, মহম্মদ-ই-বখতিয়ার হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন খবর পাইয়া, যদি রক্ষকহীন অশীতিবর্ষের বৃদ্ধ রাজা সরিয়া যাওয়া সঙ্গত মনে করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে কাপুরুষ বলা যায় না।"

"লক্ষ্মণসেনের "নোদিয়া" হইতে পলায়ন-কাহিনী প্রকৃত ঘটনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না—তাহা অজ্ঞ লোকের পরিকল্পিত উপকথা মাত্র। বিশ্বরূপ এবং কেশব নামক লক্ষ্মণসেনের অন্যান্য দুইটি পুত্র ছিল; তিনি যাহাকে বাল্যে রাজপণ্ডিত পদ, যৌবনে প্রধানমন্ত্রীপদ, এবং যৌবনান্তে যৌবনশেষ যোগ্য ধর্মাধিকারীর পদ প্রদান করিয়াছিলেন, হলায়ুধের ন্যায় এরূপ হাতে-গড়া অমাত্য ছিল; এবং তিনি যাহাদিগকে লইয়া কাশী হইতে কামরূপ পর্যন্ত যুদ্ধ-যাত্রা

করিয়াছিলেন, এরূপ সৈন্যসামন্তও ছিল। মিনহাজ লখমনিয়াকে যেরূপ প্রজারঞ্জনকারী এবং দানশীল রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, তিনি অনেকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সুতরাং, এরূপ নৃপতিকে বার্ধক্যে সকলে দল বাঁধিয়া শত্রুর দ্বারা পদদলিত হইবার জন্য "নোদিয়ায়" ফেলিয়া আসিবে, এবং এক বৎসর পর্যন্ত তাঁহার কোনও খোজখবর লইবে না; ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অনুমান হয়—যখন "ব্রাহ্মণগণ" এবং ব্যবসায়ীগণ নোদিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন, "নোদিয়ার" অধীশ্বরও তখনই রাজধানী ত্যাগ করিয়া বঙ্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মহম্মদ-ই-বখতিয়ার কর্তৃক এরূপ নির্বিবাদে পশ্চিম বরেন্দ্র অধিকারের প্রকৃত কারণ এই যে,—যখন মহম্মদ-ই-বখতিয়ার কর্তৃক মগধ আক্রমণের সংবাদ বিজয়পুরে পৌঁছিয়াছিল, তখনই হয়ত ভয়াতুর মন্ত্রীবর্গের উপদেশে লক্ষ্মণসেন (পূর্ব) বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এবং তাহার অনতিকাল পরে [তুরুস্ক নায়কের "দোয়াম সালে", নোদিয়া আক্রমণের পূর্বে] পরলোক গমন করিয়া থাকিবেন। লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণের যে দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার একখানিতে লক্ষ্মণসেন পাদানুধ্যাত বিশ্বরূপসেনের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে, এবং আর একখানিতে অপর একটি নাম বিলুপ্ত করিয়া, লক্ষ্মণসেন—পাদানুধ্যাত কেশবসেনের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ইহাতে মনে হয়,—লক্ষ্মণসেনের অভাবে, সিংহাসন লইয়া পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিলে। লক্ষ্মণসেনের পরলোকগমনের অব্যবহিত পরে, এই ভ্রাতৃবিরোধ-বহ্নি প্রধূমিত হইবার সময়ে, —মহম্মদ-ই-বখতিয়ার পশ্চিম বরেন্দ্র অধিকার করিবার অবসর পাইয়া থাকিবেন।"

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন— "মগধজয়ের পরে মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের যশ, বঙ্গ ও কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তিনি দিল্লির সুলতান কুতবউদ্দিন কর্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। "দিল্লি হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মহম্মদ-ই-বখতিয়ার সেনা সংগ্রহ করিতে আরম্ব করিয়াছিলেন। তিনি অষ্টাদশ অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নোদিয়া নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নগরবাসীগণ প্রতমে তাহাকে অশ্ববিক্রেতা বণিক মনে করিয়াছিল। তিনি প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে রায় লখমনিয়া আহার করিতেছিলেন। তিনি মুসলমানগণের আগমন শ্রবণ করিয়া পুরমহিলাগণ, ধনরত্ন-সম্পদ; দাস-দাসী পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া বঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন।" ইহাই ইতিহাসবেত্তা মিনহাজ-উস-সিরাজের বিবরণ। মিনহাজ গৌড় বিজয়ের চত্বারিংশৎ বর্ষ পরে নিজামউদ্দিন এবং সমসামউদ্দিন নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকটে বখতিয়ারের বিজয়-কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। মিনহাজ ৬৪১ হিজিরাব্দে (১২৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দে) লক্ষ্মণাবতী নগরে অর্থাৎ গৌড়ে সমসাউদ্দিনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।

মহম্মদ-ই-বখতিয়ার কর্তৃক গৌড়ে ও রাঢ়ে সেনরাজগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয়; কিন্তু যে ভাবে বিজয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। প্রথম কথা, নদিয়া কোথায়? নদিয়া যদি নবদ্বীপ হয়, তাহা হইলে বোধ হয়, যে মহম্মদ-ই-বখতিয়ার লুণ্ঠনোদ্দেশে আসিয়া সেনরাজের জনৈক সামন্তকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কারণ নবদ্বীপে যে সেন বংশের রাজধানী ছিল, ইহার কোনও প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। দ্বিতীয় কথা, আগমনের পথ কান্যকুব্জের নিকট হইতে মগধ লুণ্ঠন যত সহজ, মগধ হইতে সেনা লইয়া গৌড় বা রাঢ় তত সহজে নহে। মহম্মদ-ই-বখতিয়ার কোনও পথে নদিয়া আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তিনি যদি রাজমহলের নিকট দিয়া গঙ্গার দক্ষিণ কূল অবলম্বন করিয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কখনও অল্প সেনা লইয়া আসিতে পারেন নাই এবং রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী অধিকার না করিয়া আসেন নাই। তখন ঝাড়খণ্ডের বনময় পর্বতসঙ্কুল পথ সামান্য সেনার পক্ষে অগম্য ছিল। এই সকল কারণে অষ্টাদশ অশ্বারোহী লইয়া মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের

গৌড় বিজয় কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। গৌড়জয়ের প্রকৃত ঘটনা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন আছে। তাহা নূতন আবিষ্কারের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া না উঠিলে আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না। তৃতীয় কথা, লক্ষ্মণসেন তখন জীবিত ছিলেন না। লক্ষ্মণসেনের পুত্রত্রয়ের মধ্যে তখন কে গৌড়রাজ্যের অধিকারী, তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই। সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ হইয়াছিল কিনা, তাহাও অদ্যাপি স্থির হয় নাই। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের নদিয়া বিজয়-কাহিনী অলীক। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, নদিয়া পুনর্বার হিন্দুরাজগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল; কারণ, মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের অর্ধ শতাব্দী পরে বাংলার স্বাধীন সুলতান মুগিসউদ্দিন য়ুজবক নদিয়া বিজয়-কাহিনী স্মরণার্থ মূতন মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন।"

ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাসে বিজয়-কাহিনী স্মরণার্থ নূতন মুদ্রার মুদ্রাঙ্কণের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পূর্বে কথিত হইয়াছে, কান্যকুব্জ বিজয়ের পরে সুলতান শমসুদ্দিন আলতামস এইরূপ মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন। এবং বাংলার স্বাধীন সুলতান সিকন্দর শাহ কামরূপ বিজয়ের পরে স্মরণার্থ মুদ্রায় বিজয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই তমসাচ্ছন্ন যুগে গৌড়ে সেন বংশের অধিকার লোপ হইয়াছিল; কোনও সময়ে কিরূপে গৌড়দেশ মুসলমান বিজেতার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। গৌড়রাজ্য বিজয়ের পরে লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ যে বঙ্গদেশে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, ইতিহাসবেত্তা মিনহাজ-উস-সিরাজ স্বয়ং সে কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।"[৩৪]

লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেনের বিক্রমপুরে পলায়ন ঃ

এ প্রসঙ্গে "গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেন,—মগধ অধিকার পূর্বক মুসলমানগণ গৌড়রাজ্যে দেখা দিল। লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় পুত্র বিশ্বরূপসেন গৌড়ে অবস্থান করিয়া "গর্গ যবনান্বয়" দিগকে বারংবার পরাজিত করেন। অবশেষে হিন্দু সেনাগণ পরাস্ত হইয়া যায়। মুসলমানেরা গৌড় অধিকার করে। **কেশবসেন বিক্রমপুরে** পালয়ন করেন। মুসলমান সেনা নবদ্বীপাভিমুখে ধাবিত হয়। গদাপানি মুহম্মদ-বিন-বক্তিয়ার-খিলজি নবদ্বীপের নিকটবর্তী জঙ্গলে অধিকাংশ সেনা লুক্কায়িত রাখিয়া অত্যল্প সেনাসহ নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুরী আক্রান্ত হইলে নগরমধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়। রাজা রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরে পলায়ন করেন। কেহ কেহ বলেন রাজবংশীয়েরা 'নীলাচল' গমন করেন। মেল মালা নামক গ্রন্থে আছে—

"যে কালে লক্ষ্মণসেন নীলাচলে চলে।
হিন্দু রাজ্য শেষ হইল যবনের বলে।"

'তবকৎ-ই-আকবরির' মতে রাজা জগন্নাথক্ষেত্রে পলায়ন করেন। ইহা কল্পিত-কাহিনী মাত্র।

এ সম্বন্ধে রিয়াজ-উস-সলতিন, 'তবকৎ-ই-নাসিরি' এবং 'তবকৎ-ই-আকবরি' ভিন্ন ভিন্ন রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলেন,—"রাজা যখন আহার করিতে বসিয়াছিলেন, এমন সময় বক্তিয়ার কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া লক্ষ্মণসেন ধন-রত্নাদি পরিত্যাগ পূর্বক অনাবৃত পদে গুপ্তপথে পলায়ন করেন।" ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন—

Probably in A. D. 1199 not long after his facile conquest of Bihar, Muhammad the son of Bakhtyar equipped an army for the subjugation of Bengal. Riding in advance of the main body of his troops, he suddenly appeared before Nudiah with a slender following of eighteen horsemen, and boldly entered the city. the people supposing him to be a horse dealer. But

when he reached the gate of the Rai's palace, he drew his sword and attacked the unsuspecting house-hold. The Rai who was at dinner, was completely taken by suprise. Rai Lakhmaniya as the author calls him, fled to Bikrampur in the Dacca district where he died, and the conqueror presently destroyed the city of Nudiah, establishing the seat of his government at the ancient Hindu city of Lakhnauti, or Gour," *Early History of India Page* 405.

বলাবহুল্য যে, ইংরেজ লেখকগণও সেই একই সূত্র অবলম্বন করিয়া বিনানুসন্ধানে এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। কেহই লক্ষ্মণসেনের নাম করেন নাই। এবং Rai Lakhmaniya as the author calls him! বলিয়াছেন।

সে যাহাই হউক না কেন—লক্ষ্মণসেনের নামে যে পলায়ন-কলঙ্ক বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে, কবি যাহা লইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, চিত্রকর যে পলায়ন-কলঙ্কের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা যে কতখানি সত্য তাহা পাঠকমাত্রেই উল্লিখিত বিবরণী-সমূহ পাঠ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহা সম্পূর্ণভাবে অলীক কাহিনী মাত্র!

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়ের মতে বক্তিয়ারের 'নদিয়া' আক্রমণ কালে লক্ষ্মণসেন জীবিত ছিলেন না। আমরা রাখালবাবুর এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমারের মত সমর্থন করি এবং উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করি যে—"গৌড়জয়ের প্রকৃত ঘটনা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন আছে। তাহা নূতন আবিষ্কারের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া না উঠিলে আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না। তৃতীয় কথা, লক্ষ্মণসেন তখন জীবিত ছিলেন না। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের নদিয়া-বিজয়-কাহিনী সম্ভবত অলীক।"

আমরা ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা ইহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে গ্রহণ করিতে পারি যে, লক্ষ্মণসেনের নগ্নপদে পলায়ন ইত্যাদি কাহিনী মাত্র। ঐতিহাসিক সত্য নহে। এইরূপ কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া আমরা অন্যায়ভাবে একজন স্বাধীন বীর নৃপতির ললাটে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়া আসিয়াছি। ভবিষ্যতবংশীয় বাঙালি ও ভারতীয়গণ এই মিথ্যাকে আর গ্রহণ করিবেন না বলিয়া বিশ্বাস করি।

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন—"৫১ লক্ষ্মণাব্দের পূর্ব কোনও সময়ে লক্ষ্মণসেন দেবের দেহান্তর সংঘটিত হয়। মুসলমান ইতিহাস লেখক লক্ষ্মণসেনকে পলায়ন-কলঙ্কিত করেন নাই। তদীয় রাজ্যাব্দের অশীতিবর্ষে দিগ্বিজয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমরাই তথ্য নির্ণয়ে অগ্রসর না হইয়া অনুমান বলে "রায় লছমনীয়াকে" লক্ষ্মণসেন ধরিয়া লইয়া অযথা কলঙ্কে স্বদেশের ইতিহাস মলিন করিয়া তুলিয়াছি।

লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল তাম্রলিপি—ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে Indian Historical Quaterly Vol. III Page 88-96 "Lost Bhowal Copper-plate of Laksman Sena Deva of Bengal" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার লিখিত প্রবন্ধ হইতে জানা গিয়াছিল যে, তিনি ঐ তাম্রলেখের সহিত লক্ষ্মণসেন দেবের মাধাইনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। সম্প্রতি 'The Indian Historical Quarterly Vol XV. No. 2. June, 1939 সংখ্যায় Mr. H. N. Randle "The Lost Bhowal Copper plate of Laksman Sen" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে India office লাইব্রেরির কার্যে যোগদান করিবার পরে আমি একটি আলমিরা হইতে ২৪ খানা তাম্রশাসনের সন্ধান পাই। অনুসন্ধানে

দেখিলাম যে, তাহার মধ্যে ৪ খানা ছাড়া আর সব কয়খানির সম্বন্ধেই প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। [I found that three of them at least had never been noticed so far as I have been able to ascertain] তাহার একখানি লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন [a complete inscription on a single copperplate] মাধাইনগর তাম্রশাসনের-সহিত ইহার প্রায় হুবহু মিল দেখা যায়। রাজ্যাঙ্ক ২৭...কা দিনে ৬। প্রথম ২৪ পংক্তি পদ্যে লিখিত প্রশস্তি। ঠিক মাধাইনগর-লিপির অনুরূপ। ২৫-২৮ পংক্তিতে লক্ষ্মণসেনের নাম এবং উপাধি রহিয়াছে এবং **পরম নরসিংহ** এবং বল্লালসেন দেবপাদানুধ্যাত [Lines 26-29 give Laksman Sen's name and titles-the latter including Parama-Narasinha-and describe him "meditating on the feet of Vallalsena-deva"] **পরম বৈষ্ণব** কথাটিও খোদিত আছে। ২৯-৩৩ পংক্তিতে দানোক্ত গ্রামের নাম, সীমা ইত্যাদি। ৪৫-৮৭ পংক্তিতে দানগ্রহীতার পরিচয় আছে, তাহা এইরূপ ঃ—"সামবেদকৌথুমশাখার ঔর্ব, চ্যবন ভার্গব এবং জামদগ্ন্য [অন্য শব্দ অস্পষ্ট] প্রবর গোত্র-অস্পষ্ট-সম্ভবত মৌদগল্য বুদ্ধদেব শর্ম্মার প্রপৌত্র জয়দেব শর্ম্মার পৌত্র, মহাদেব শর্ম্মার পুত্র পদ্মনাভদেব শর্ম্মন। এই দান [৪৮ পংক্তি] দুইজন মহদেবী, একজনের নাম কল্যাণদেবী। ৫০-৫৭ পংক্তিতে এই দান সম্বন্ধে কেহ যাহাতে কোনওরূপ স্বত্ব বিলোপ না করেন তৎ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যেমন অন্যান্য তাম্রশাসনে আছে। (৫৮-৫৯ পংক্তিতেও ঐ সমুদয় উক্তিতেই পূর্ণ) ৫৮ পংক্তিতে লক্ষ্মণসেন অরি-রাজ-মদন-শঙ্কর-নরপতি এবং গৌড়-মহা-সান্ধি-বিগ্রহিক শঙ্করধর-দূত রূপে পরিচিত আছেন। ৫৯ পংক্তিতে রাজপরিচয়, দূত' কথা এবং তারিখ আছে।

এই তাম্রশাসনখানির আকার ও অন্যান্য তাম্রশাসনেরই অনুরূপ। দশভুজ-সমন্বিত সদাশিব মূর্তি শীর্ষদেশে সংযোজিত আছে। এই তাম্রলেখখানির অপর পৃষ্ঠার অক্ষর ইত্যাদিও বেশ সুস্পষ্টই রহিয়াছে। স্থানে স্থানে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় কোথাও কোথাও অক্ষর পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় না। উপরের দিকে ও নীচের দিকে ততটা না হইলেও মাঝামাঝি একটু বেশি ক্ষয় পাইয়াছে কিন্তু ইহার পাঠোদ্ধার এবং সম্পাদন সম্পর্কে কোনওরূপ অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। যে সকল গ্রামের নাম ও সীমা ইত্যাদি রহিয়াছে তৎ-সম্বন্ধে Mr. Randle বলেন ঃ "Unknown place-names, however must remain dubious : and so far I cannot feel certain of my tentative readings of any of the place-names with the exception of Paundravardhana". তাঁহার মতে এই তাম্রশাসনখানাই ডাক্তার ভট্টশালী লিখিত "Lost Bhowal plate"—আমরা লক্ষ্মণসেনের এই হারানো তাম্রশাসনখানা সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারিয়াছি এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম। ভবিষ্যতে এই তাম্রশাসনখানার পাঠোদ্ধার হইলে এবং উহার বিবরণ প্রকাশিত হইলে সেনরাজাদের সম্বন্ধে হয়ত আরও কিছু না কিছু নূতন কথা জানিতে পারিব।

লক্ষ্মণসেনের চরিত্র ঃ

লক্ষ্মণসেন অতি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। একথা মুসলমান ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করিয়াছেন। তাহারা লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"এই নৃপতি ব্যক্তিগত হিসাবে নানা সদগুণে ভূষিত ছিলেন। হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ নৃপতি, ভূম্যধিকারী ও প্রধান প্রদান ব্যক্তিগণ এই সেনবংশীয় নরপতিকে বিশেষ সম্মান করিতেন। তিনি খলিফাদের ন্যায় ধর্মজগতের নেতা ছিলেন।" ঐতিহাসিকেরা বলেন—"লক্ষ্মণসেনের নিকট কেহ নির্যাতিত কিংবা বিচারে কেহ কোনও অবিচার লাভ করেন নাই। তাহার দানশীলতা জনপ্রবাদের মত প্রচলিত ছিল"।[৩৫]

লক্ষ্মণসেন পিতৃপ্রবর্তিত কুলবিধির উৎসাহদাতা ছিলেন বলিরা কুলপঞ্জিতে লিখিত আছে। সেনরাজবংশের কোনও তাম্রশাসনে কৌলীন্য প্রথার কথা নাই। তিনি প্রথম বয়সে ও শেষ বয়সে বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিলেন। তপনদিঘি, সুন্দরবন, আনুলিয়া, মাধাইনগর, শক্তিপুর, এবং গোবিন্দপুরের ও ভাওয়ালের তাম্রশাসনে তিনি **"পরমবৈষ্ণব"** ও **"পরম নরসিংহ"** বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন, তবে আশ্চর্যের কথা এই যে, তাহার প্রত্যেক তাম্রশাসনের প্রারম্ভেই আমরা মহাদেবের বন্দনা দেখিতে পাই। **পরম-নারসিংহ** শব্দ দ্বারা তিনি নরসিংহ বা নৃসিংহ দেবের উপাসক ছিলেন বলিয়াও অনুমান করা অসঙ্গত হইবেনা, কেননা বিক্রমপুরের নানা গ্রামে অনেক নৃসিংহ মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে।

মাধাইনগরের তাম্রশাসনখানির প্রারম্ভে লিখিত আছে "ওঁ নমো নারায়ণায়" আর প্রথম শ্লোকটি রহিয়াছে—

যস্যাঙ্কে শরদম্বুদোরসি তড়িল্লেখেব গৌরীপ্রিয়া
দেহার্দ্ধেন হরিং সমাশ্রিতমভূদ্‌যস্যাতি চিত্রংবপুঃ।
দীপ্তার্কদ্যুতিলোচনত্রয়রুচা ঘোরং দধানোমুখং
দেবত্রাসনিরস্ত দানবগজঃ পুষ্ণাতু পঞ্চাননঃ।।

এই তাম্রশাসনেরও প্রথম দিক দিয়া মহাদেবেরই বর্ণনা রহিয়াছে। কাজেই লক্ষ্মণসেন পৈত্রিক শৈবধর্মকেও কোথাও অশ্রদ্ধা করেন নাই। তাহার তাম্রশাসনগুলিতে প্রথমে মহাদেবের বর্ণনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। লক্ষ্মণসেনের বিদ্যানুরাগের বিষয় পূর্বেই বলিয়াছি।

লক্ষ্মণসেনের অনুরোধে [অনেক পণ্ডিতের মতে] বিক্রমপুরের অধিবাসী "ব্রাহ্মণসর্বস্ব"-প্রণেতা বৈদিক ব্রাহ্মণ হলায়ুধ তান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন গৌড়বঙ্গের সমাজ-সংস্কারের নিমিত্ত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রে সারসংগ্রহ পূর্বক "মৎস্যসুক্ত" নামক গ্রন্থ প্রচার করিয়া তৎকালীন কদাচারাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

'কুলপঞ্জির' মতে লক্ষ্মণসেন বিত্রমপুরে আসিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসমাজের সমীকরণ করেন। লক্ষ্মণসেন সম্ভবত ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

মাধবসেন ঃ

লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র **মাধবসেন** রাজা হন। মাধবসেন সম্বন্ধে প্রামাণিক কোনও বিবরণ অবগত হওয়া যায় না। কাজেই এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহভাবে কিছু বলা অসম্ভব। "গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা মাধবসেন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"লক্ষ্মণসেনের পরলোকের পর মাধবসেন রাজা হন। মুসলমানদের হস্ত হইতে অবশিষ্ট রাজ্যের রক্ষার জন্য তাহাকে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইত। হরিমিশ্রের কারিকা পাঠ করিলে জানা যায়—মাধাবসেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের চারিবার সমীকরণ করেন। মাধবসেন-ভ্রাতা কেশবসেনকে রাজ্য দিয়া হিমালয় প্রদেশে গমন করেন। কুমায়ুনের আলমোড়ার নিকটবর্তী যোগেশ্বর মন্দিরের গাত্রে শিলালিপিতে মাধবসেনের কীর্তি ঘোষিত হইয়াছে। মাধবসেনের সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণও তীর্থ-ভ্রমণে যান। কেদারভূমির বাণেশ্বর মন্দির-মধ্যস্থ তাম্রশাসনে ভট্টনারায়ণের বংশীয় রুদ্রশর্মার নাম দৃষ্ট হয়। "সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থে মাধবসেনের রচিত কবিতা পাওয়া যায়। মাধবসেন দশ বৎসর রাজত্ব করেন এইরূপ শুনা যায়"।

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তৎ-প্রণীত "বাংলার ইতিহাসের" পরিশিষ্ট [ঞ] ভাগে সেনরাজবংশের একটি বংশলতা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও মাধবসেনের নাম রহিয়াছে।

সেনরাজ বংশ—



রাখালবাবু বলেন,—১১৭০ খ্রিস্টাব্দের পরে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে লক্ষ্মণসেনের পুত্রত্রয় গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইহাদিগের প্রত্যেকের এক-একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন—"কুমায়ুনে মাধবসেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে।" রাখালবাবু বলেন— 'Atkinson' রচিত N. W. P. Gazetter, Vol XII Himalayan Districts. ৫১৬ পৃষ্ঠায় ঐরূপ তাম্রশাসনের কোনও উল্লেখ নাই।

মাধবসেনের রচিত কয়েকটি কবিতা "সদুক্তিকর্ণামৃত" গ্রন্থে উর্দ্ধত হইয়াছে। মাধব সেন এবং মাধব এই দুই নামই উহাতে রহিয়াছে। কাজেই মাধবসেন একই ব্যক্তি কিনা তাহা বিচারসহ।

বিশ্বরূপসেন ঃ বিশ্বরূপের মদনপাড় তাম্রশাসন ঃ

বিশ্বরূপসেন লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি রাজ্ঞী বসুদেবীর গর্ভজাত। তাম্রশাসন হইতেই তাহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। ফরিদপুর জেলার মদনপাড় গ্রামে বিশ্বরূপ সেনের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। আমরা এই তাম্রশাসনখানি হইতে অবগত হই যে—তিনি "শিবপুরাণোক্ত" ভূমিদান ফলপ্রাপ্ত কামনায় বৎসগোত্রীয়, ভার্গবচ্যবন-আপ্নুবৎ ঔর্ব্বজামদগ্ন্য প্রবর পরাশর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, গর্ভেশ্বর দেবশর্ম্মার পৌত্র, বনমালি দেবশর্ম্মার পুত্র, শ্রুতিপাঠক বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মাকে শিবপুরাণোক্ত ভূমিদান ফল কামনায় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে পূর্ব্বে অঠপাগ গ্রাম জঙ্গালভূঃসীমা, দক্ষিণে বারয়ীপাড়া গ্রামভূঃসীমা পশ্চিমে উঞ্চোকাপ্‌বী জঙ্গালাসীমা এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ পোঞ্জীকাপ্‌বী গ্রামমধ্যোৎ কন্দর্পা শঙ্করাস ভূমি ও নারান্তর্প গ্রামে স্থিত ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে। প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ ৬০০ ও ৫৪৬ বা ৫৪৭। এই তাম্রশাসনে গৌড় মহাসান্ধিবিগ্রহিকের নাম রহিয়াছে শ্রীকোপিবিষ্ণু।[৩৬]

তাম্রশাসনে বিশ্বরূপ সেনের বিশেষণ ঃ

এই তাম্রশাসনে বিশ্বরূপ সেনের বিশেষণ অতি চমৎকার। * * সত্যব্রত গাঙ্গেয়শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর-পরমভট্টারক পরম-সৌর-মহারাজাধিরাজ অরিরাজ মদনশঙ্কর গৌড়েশ্বর

শ্রীমল্লক্ষ্মণ-সেনদেবপাদানুধ্যাত-অশ্বপতি-গজপতি রাজ্য-ত্র-য়াধিপতি-সেনকুলকমলবিকাশ-ভাস্করসোমবংশ- প্রদীপ-প্রতিপন্ন কর্ণসত্যব্রত-গাঙ্গেয়-শরাণাগত-বজ্রপঞ্জর-পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক পরমসৌর মহারাজাধিরাজ-অরিরাজবৃষভাঙ্কশঙ্কর-গৌড়েশ্বর শ্রীমদবিশ্বরূপসেনপাদা বিজয়িনঃ। ইত্যাদি।

বিশ্বরূপ সেনের সহিত তুরস্কগণের-যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছিল তাহা কেশবসেন প্রদত্ত ইদিলপুর তাম্রশাসন হইতেও অবগত হওয়া যায়, তাম্রশাসনে বিশ্বরূপসেন "গর্গ যবনান্বয়ঃ প্রলয়কাল রুদ্রো নৃপঃ" বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন ও বিশ্বরূপসেনের মদনপুরের তাম্রশাসন হইতে ইহা সুস্পষ্ট অনুভূত হয় যে, বিশ্বরূপ সেন কেশব সেনের অগ্রবর্তী ছিলেন। [The Edilpur grant contains several additional verses, consequently it might be stated that Visvarupasena was Kesavsenas Predecessor] মদনপুর তাম্রলেখ বিশ্বরূপের ১৪শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহার দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, বিশ্বরূপ সেন কিছু বেশিদিনই রাজত্ব করিয়াছিলেন।[৩৭]

বিশ্বরূপসেনের মদনপাড় তাম্রশাসন ঃ

বিশ্বরূপ সেনের দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। একখানি মদনপাড় নামক গ্রামে। স্বর্গত ঐতিহাসিক নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের [pt 1. page 6-15] Journal of the Asiatic Society of Bengal-এ উহার পাঠ প্রকাশিত করেন। তাহাতে তিনি এই তাম্রশাসনখানার প্রাপ্তির ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—"কোটালিপাড় পরগণার অন্তর্গত মদনপাড় হইতে আবিষ্কৃত বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনখানি ঈশ্বর দেবশর্মার ভ্রাতা বিশ্বরূপ দেবশর্মাকে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ ৬০০ ও ৫৪৭। ইহা দ্বারা এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, দুইখানি ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রদত্ত গ্রামের নাম পিঞ্জকাঠি। মদনপাড় তম্রলেখ বিশ্বরূপের ১৪ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পিঞ্জকাটি গ্রামের বর্তমান নাম পিঞ্জরী। ইহা ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত।"

এই তাম্রশাসনখানির প্রাপ্তির ইতিহাস সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন ঃ—"In the village MADANPADA Post office pinjuri. Parganah Kotalipada of the Faridpur district a peasant whilst sigging his field found a copper plate and made it over to the land-holder who kept it in his house. This plate was made over to me by Pandita Lakshmi Chandra Sankhyatirtha in 1892. এই তাম্রশাসনখানির কোনও সন্ধান এখন মিলে না।

এই ফলকখানির আকার ১২$\frac{১}{২}$ × ১০ ইঞ্চি। শীর্ষদেশে সদাশিব মূদ্রা সংযোজিত। ইহাতে ৬০ পংক্তি খোদিতলিপি আছে। একদিকে ৩০ পংক্তি এবং বিপরীতদিকে ৩০ পংক্তি। লিপির ভাষা সংস্কৃত। "ওঁ ওঁ নমো নারায়ণায়" প্রারম্ভ-ভাগে লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রশস্তি শ্লোকগুলি কেশব সেনের তাম্রশাসনের অনুরূপ।

এই তাম্রশাসনে সান্ধিবিগ্রহিকের নাম হইতেছে কোপিবিষ্ণু। ইনি কেশব সেনেরও মহাসান্ধিবিগ্রহিক। ইহার পূর্ব-পুরুষের নাম লোমপাদ বিষ্ণু। বিশ্বরূপের রাজত্বের সং ১৪।১ আশ্বিন দিনে এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হয়। শুনা যায় বিশ্বরূপ সেন অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তিনি প্রায় বারশত খানি গ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন।

তাম্রশাসনের প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, বিশ্বরূপ ও কেশব সেনের রাজধানী ছিল—বঙ্গে [পূর্ববঙ্গে] শ্রীবিক্রমপুরে। আর যে ভূমি দান করিয়াছেন তাহাও (পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপতি বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে। [The village was situated in the VIKRAMPUR division (ভাগ) of Vanga which lay within the Panundravardhan-bhukti.]

এই প্রসঙ্গে স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন—Of the localities mentioned in the inscription Mr. Vasu' identifies pinjokshthi with Pinjari a postal village in the Parganah Kotalipada, near the village of Mandanpada, where the grant was found. *In view of this identification it is impossible to agree with those who regard Vikrampur of the copper plates as different from the modern Vikrampura in Eastern Bengal and propose to locate it elsewhere.* ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের এই কথা যে কতদূর যুক্তিসঙ্গত ঐতিহাসিক সত্য তাহ যে-কোনও সুধীপাঠক সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

বিশ্বরূপসেনের মধ্যপাড়া তাম্রশাসন ঃ

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে বিক্রমপুর মধ্যপাড়া গ্রাম হইতে বিশ্বরূপ সেনের আর একখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। উহা সুসঙ্গ রাজপরিবারের হস্তগত হয় এবং তাহারা উক্ত তাম্রশাসনখানি সাহিত্য-পরিষদ-চিত্রশালায় দান করিয়াছেন। বর্তমানে এই শাসনখানি "সাহিত্য-পরিষদ চিত্রশালায়" সংরক্ষিত আছে। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় Indian Historical Quarterly, Vol II. No 1(March 1926) p. p. 77-86.-এ এই শাসনখানির পাঠ প্রকাশ করেন। তৎপরে স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহোদয় Inscriptions of Bengal vol III. p. 147. প্রকাশ করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনখানির আকার ১০ × ১২ $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। উভয়দিকেই খোদিতলিপি সংযুক্ত। মোট ৬০ পংক্তি লিপি আছে। ভাষা সংস্কৃত। অক্ষর বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের তাম্রলিপি অক্ষর-অপেক্ষা অধিকতর বঙ্গাক্ষর সদৃশ। প্রারম্ভভাগে "ওঁ ওঁ নমো নারায়ণায়" লিখিত।

সদাশিব মুদ্রা যে শীর্ষদেশে সংযোজিত ছিল তাহা বেশ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু [The seal of Sadasiva, which was affixed to it is missing] উহা বিলুপ্ত হইয়াছে।[৩৮]

মদনপাড় তাম্রশাসন ও মধ্যপাড়া শাসনে বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক পরমসৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ বিশ্বরূপসেন পাদ বিজয়িনঃ রহিয়াছে। ইহার দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, সেনরাজগণ পরবর্তীকালে পরম সৌর—সূর্যের পরম উপাসক ["The devout worshipper of the sun"] নামে বিঘোষিত হইয়াছেন।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিক্রমপুর বঙ্গে [পূর্ববঙ্গে] বৌদ্ধধর্ম বিশেষ ভাবে আপনার প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। এইজন্যই বিক্রমপুরের সর্বত্র বিবিধ বৌদ্ধমূর্তির প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন,—বেঙ্গল গভর্নমেন্ট সংগৃহীত একখানি প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি হইতে জানা যায় যে, "পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমসৌগত মধুসেন ১১৯৪ শকে এবং ১২৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গে আধিপত্য করিয়াছিলেন।

এই মধুসেনের পরিচয় হইতে বুঝিতেছি যে, সেনবংশ বৌদ্ধ সমাচ্ছন্ন পূর্ববঙ্গে গিয়া কিছুকাল পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেনবংশ প্রথমে **পরম মাহেশ্বর** বা গোঁড়া শৈব ছিলেন। লক্ষ্মণসেন মধ্যে বৈষ্ণব হইয়া পরিয়াছিলেন, কিন্তু ইদিলপুর ও মদনপাড় হইতে আবিষ্কৃত গিয়া লক্ষ্মণসেন "পরম সৌর" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। যথা ঃ—পরমসৌর-মহারাজাধিরাজ-অরিরাজ-মদনশঙ্কর-গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ইত্যাদি। বলাবাহুল্য মাধব, কেশব ও বিশ্বরূপ এই তিন জনেই শ্রুতি-পাঠককে ভূমিদান করিলেও স্ব স্ব তাম্রশাসনে **'পরম সৌর' বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন। সম্ভবত এ সময় তাহার কোনও প্রকার রাজনীতিক কারণে পালরাজ সম্মানিত সৌর-ব্রাহ্মণগণের নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকিবেন।"**

পালবংশ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, সৌর-ব্রাহ্মণগণ কেবল মন্ত্রিত্ব বা সেনাপতিত্ব বলিয়া নহে, বৌদ্ধ-পাল নৃপতিগণের পৌরোহিত্যও করিতেন। সম্ভবত পালবংশ ধ্বংসের পর ঐ সকল ব্রাহ্মণ পূর্ববঙ্গে আসিয়া পূর্ববৎ কেহ কেহ সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধগণের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিছুকাল সৌর ও সৌগত সংশ্রবে থাকিয়া ঐরূপ বৌদ্ধ পুরোহিত ও বৌদ্ধ-প্রজা সাধারণের প্রভাবে অবশেষ সেনবংশও 'সৌগত' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। মনে হয় পূর্ববঙ্গের বৌদ্ধ সমাজের আনুকূল্যে সেনবংশ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানগণের সহিত বিরোধ করিয়াও বঙ্গাধিপত্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" এই অনুমান একেবারে অসঙ্গত বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

তবে বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রাম হইতে যে সমুদয় বিরাটাকার বৃহৎ এবং সুন্দর ক্ষুদ্র ও অপূর্ব কারুকার্য-সমন্বিত সূর্য-মূর্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা হইতে এবং বিক্রমপুর বঙ্গে [পূর্ববঙ্গে] সর্বত্র যেরূপ সূর্যব্রত এবং সৌর-প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাহা হইতে মনে হয় যে, রাজাদের প্রভাব ব্যতীত কখনই সৌর-প্রভাব ঐরূপভাবে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে না। 'মাঘমণ্ডলের' ব্রত ও তাহার ছড়াগুলি এখনও বিক্রমপুরের সৌর-প্রভাব যে জনসাধারণের মধ্যে যে কত দূর অন্তপ্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। এজন্যই পরমসৌর উপাধি গ্রহণে মনে হয় যে, নগেন্দ্রবাবুর অভিমত কতকাংশে প্রণিধানযোগ্য।

বিক্রমপুরের এমন গ্রাম অতি বিরল বিশেযত শ্রীবিক্রমপুর রাজধানীর [বর্তমান রামপাল] সমীপবর্তী স্থান-সমূহে অনেক সূর্য-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন—"Most of the sena kings called themselves great devotees of the sun-god(parama-saura) and Siva (Param-Saiva) but Laksmana Sena was particularly a worshipper of Vishnu."

পরবর্তীকালে পরম সৌর সেন নৃপতিগণের উৎসাহেই যে সূর্যদেবতা তাহার পূজার আসনখানি বিক্রমপুর-বঙ্গের গ্রামে গ্রামে এবং গৃহে গৃহে প্রতিস্থাপিত করিতে পারিয়াছিলেন তৎ-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নাই।

আমরা বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড় ও মধ্যপাড়া তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি যে, বিশ্বরূপ সেন ও কেশবসেন "**শ্রীবিক্রমপুর** জয়স্কন্ধাবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া [মুসলমান অভিযানের প্রথম প্রকোপ প্রতিহত করিয়া] পূর্ববঙ্গের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

আমরা বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেনের তাম্রশাসন হইতে ইহাও জানিতে পারিতেছি যে, "বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেনের রাজধানী ছিল পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরে এবং উভয়েই "গর্গযবনান্বয়—প্রলয়-কালরুদ্র' এবং "গৌড়েশ্বর" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"কেশবসেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাহারা উভয়ে মুসলমানগণের *[গর্গযবন]* সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কান্যকুব্জ রাজ্যের অধঃপতনের পরে দলবদ্ধ মুসলমান সেনা যখন মগধ, অঙ্গ ও গৌড়ে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত তখন তহাদিগেরই একদল বোধহয়, সেনবংশীয় গৌড়রাজা কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল।"[১]

বিশ্বরূপসেনের রাজত্বকাল ঃ

বিশ্বরূপসেন আনুমানিক চৌদ্দ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। [১২০৬-১২২০] এবং তাহার পর কেশবসেন প্রায় তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। —বিশ্বরূপসেন যখন শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী হইতে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন সে সময়ে 'লক্ষ্মণাবতীর তুর্কি মালিক ছিলেন

গিয়াসউদ্দিন ইউয়জ। ইনি হিজরা ৬০৮-৬২৪ এবং খ্রিঃ ১২১১-১২২৬ পর্যন্ত লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি বঙ্গের [পূর্ববঙ্গের নৃপতি] বিশ্বরূপসেনের এবং কেশবসেনের সমসাময়িক ছিলেন।

"তবকাৎ-ই-নাসিরি" পাঠে জানিতে পারা যায় যে, গিয়াসউদ্দিনের রাজত্বকালে লক্ষ্মণাবতীর চতুর্দিকস্থ রাজ্যসমূহের অধিপতিগণ তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সমস্ত গৌড়মণ্ডল তাহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। জাজনগর (উড়িষ্যা), বঙ্গ পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ, বিক্রমপুর-সুবর্ণগ্রাম, কামরূপ এবং তিরহুতের [তীরভুক্তি বা মিথিলার] রাজগণ তাহাকে কর প্রদান করিতেন।"[৩৯]

সুলতান গিয়াসউদ্দিন ঃ

কেহ কেহ বলেন—"মিনহাজের এ উক্তি যদি সত্য হয়, তবে অনুমান করিতে হয় যে, লক্ষ্মণাবতীর গিয়াসউদ্দিনের সহিত বিক্রমপুরের বিশ্বরূপ সেনের সংগ্রাম হইয়াছিল। অনুমান যদি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা হয়, তবে বিশ্বরূপসেনের "গর্গযবনান্বয়-প্রলয়-কালরুদ্র" এই বিশেষণের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই বিশেষণ হইতে মনে হয়, বিশ্বরূপসেন স্বীয় রাজত্বের চতুর্দশ বছরেও [আনুমানিক ১২২০ খ্রিঃ] তুর্কির সহিত যুদ্ধে নিজেকে জয়ী বলিয়া দাবি করিতেছেন। পক্ষান্তরে, মিনহাজের উক্তিতে গিয়াসউদ্দিনকেই জয়ী বলিয়া দাবি করা হইতেছে। এই দুই বিরোধী উক্তি হইতে মনে হয় যে, কোনো পক্ষেই নিশ্চিত-রূপে জয় লাভ ঘটে নাই। বিশ্বরূপ যদি সত্যই পরাজিত হইতেন তাহা হইলে বোধ করি নিরর্থক ভাবে অত বড় বিশেষণ ব্যবহার করিতে ভরসা পাইতেন না। আবার পক্ষান্তরে গিয়াসউদ্দিন যদি সত্যই বঙ্গরাজ্যের উপর স্থায়ী ভাবে জয়ী হইয়া থাকেন তবে কয়েক বছর পরেই আবার বঙ্গ রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইত না; কারণ মিনহাজ অন্য স্থানে আবার বলিতেছেন যে, গিয়াসউদ্দিন স্বীয় রাজত্বের শেষ বছর [৬২৪ হিঃ ১২২৬ খ্রিঃ] বঙ্গরাজ্যের অভিমুখে সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গরাজ্যের সহিত গিয়াসউদ্দিনের কোনো সংঘর্ষ হইয়াছে কিনা তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। তবে তবকাৎ হইতে এই ধারণা হয় যে, এই দ্বিতীয় অভিযানে বঙ্গরাজ্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার পূর্বেই গিয়াসউদ্দিনের লক্ষ্মণাবতীর দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল, কারণ ঠিক এই সময়েই দিল্লির সুলতান আলতামাসের [ইলতুৎমিস] জ্যেষ্ঠপুত্র নাসিরউদ্দিন মহমুদ গিয়াসউদ্দিনের অনুপস্থিতির সময়েই লক্ষ্মণাবতী দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। নাসিরউদ্দিনের সহিত যুদ্ধে গিয়াসউদ্দিনের অনুপস্থিতির সময়েই লক্ষ্মণাবতী দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। নাসিরউদ্দিনের সহিত যুদ্ধে গিয়াসউদ্দিন পরাজিত ও অবশেষে নিহত হইয়াছিলেন [১২২৬ খ্রিঃ] * * * যাহা হোক, গিয়াসউদ্দিনের দ্বিতীয় অভিযানের সময় বঙ্গদেশে কে রাজা ছিলেন তাহা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বিষয়। আমাদের মনে হয় যে, ঐ দ্বিতীয় অভিযানের সময় [১২২৬ খ্রিঃ] লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেনই বিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যদিও সে-সময় পর্যন্ত বিশ্বরূপ সেনের পক্ষেও বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব নয়। মনে রাখিতে হইবে বিশ্বরূপের ন্যায় কেশবসেনেরও "গর্গযবনান্বয়" ইত্যাদি বিশেষণ আছে এবং বিশেষণ নিতান্ত অর্থহীন নয় বলিয়াই মনে হয়।[৪০]

কেশবসেন

কেশবসেনের ইদিলপুরের তাম্রশাসন ঃ

কেশবসেন সম্ভবত বিশ্বরূপসেনের পরে শ্রীবিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেশবসেনের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই শাসনখানি বাকরগঞ্জ জেলার কানাইলাল ঠাকুরের জামিদারি ইদিলপুর পরগণায় এক কৃষক মৃত্তিকা খননের সময় প্রাপ্ত হয়। কানাইলাল ঠাকুর উহা আনিয়া প্রিন্সেপ সাহেবকে দেন, পণ্ডিত গোবিন্দরাম উহার পাঠোদ্ধার করেন। সে যাহা হউক, ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জেমস প্রিন্সেপ সাহেব [Jams Prinsep] ইহার প্রশস্তির পাঠ এবং পণ্ডিত সারদাপ্রসাদ কৃত অনুবাদ প্রকাশ করেন। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে যে 'গর্গযবনান্বয় প্রলয়-কালরুদ্র' বলিয়া তাহাদিগকে বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া স্বর্গত মিঃ জয়সোয়াল বলিয়াছেন— কেশবসেন গরঝা (Garjha) নামক ঘার্জিস্থানের একটা জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার তাম্রশাসনে "গর্গযবনান্বয় প্রবল-কালরুদ্র" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। [Mr Jayswal equates garga with Garjha. Gharjisthan and is of opinion that this verse records a victory of Kesavsena over a party of raiders led by Muhammad Ghori. But there is nothing else in support of the statement.] স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের এ মন্তব্য গ্রহণযোগ্য। প্রকৃতপক্ষেই জয়সোয়ালের এই যুক্তি প্রমাণসহ নহে।

বিক্রমপুরে কুলীন ব্রাহ্মণদের সংখ্যা বেশি কেন? ঃ

অনেকে বলেন—"কেশবসেন গৌড় রক্ষা করিতে না পারিয়া পূর্ববঙ্গে প্রস্থান করেন। কেশবসেনের সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণ গৌড় প্রদেশ ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরে গমন করেন। তাঁহার সভাসদ এডুমিশ্রের গ্রন্থে আছে, মুসলমানেরা গৌড় ও নদিয়া অধিকার করিলে, কেশবসেনের পিতামহ প্রতিষ্ঠিত কুলীনগণকে সঙ্গে লইয়া বিক্রমপুরে এক সেন-রাজার সভায় পলায়ন করেন। এডুমিশ্র সেই রাজা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বল্লালী কুল-নিয়ম প্রণয়ন করেন, কিন্তু সেই রাজার নাম কি—তাহা এ-পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই।

কেশবসেন কোনও রাজার সময়ে বিক্রমপুরে আসিয়াছিলেন, এসম্বন্ধে আমরা "বিক্রমপুরের ইতিহাসের" প্রথম সংস্করণে লিখিয়াছিলাম—বিশ্বরূপসেন উদার চরিত্র, দানশীল এবং ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। * * কেশবসেন বিক্রমপুরে বিশ্বরূপের সভায় উপস্থিত হইলে মহারাজ বিশ্বরূপ জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত গ্রহণ করেন। ইত্যাদি। "যশোহর-খুলনার ইতিহাস" প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্র বলেন—"এডুমিশ্রের কারিকা হইতে জানিতে পারি যে, কেশবসেন সৈন্যসামন্তসহ পূর্ববঙ্গে এক রাজার নিকট আশ্রয় লন। সে রাজার নাম পাওয়া যায় নাই। কেহ বলেন তিনি বিশ্বরূপ সেন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ এই রাজা, কেশবের নিকট বল্লালী কৌলীন্য সম্বন্ধে তথ্য জানিতে চাহিয়াছিলেন। বিশ্বরূপের সে তথ্য অবিদিত থাকিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মণসেনের সময়ে জ্যোতিবর্মা সেনরাজগণের সামন্তস্বরূপ চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র হরিবর্মদেব। এই হরিবর্মার মন্ত্রী ছিলেন ভবদেব-বালবল্লভীভুজঙ্গ। সম্ভবত কেশবসেন এই হরিবর্মার রাজধানীতে আসিয়াছিলেন। আমাদের নিকট এই সিদ্ধান্ত একেবারেই গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া মনে হয়, কেননা বিজয়সেনের বঙ্গাধিকারের বহু পূর্বেই হরিবর্মদেব পরলোকগমন করিয়াছিলেন।

তাম্রশাসনে লিখিত ভূমি ঃ সেনরাজগণের রাজ্য সীমা ঃ

কেশবসেনের তাম্রশাসনে লিখিত ভূমি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতী বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে ছিল। আমরা পালরাজাদের তাম্রশাসনে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, তীরভুক্তি ও শ্রীনগরভুক্তি এই এই তিনটি নাম পাই। সেনরাজগণের তাম্রশাসনে পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ও বর্ধমানভুক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এবং কঙ্কগ্রামভুক্তি, নাম পাওয়া যায়।[৪১] ইহা হইতে অনুমান হয় সেনরাজগণের রাজ্য ও পালরাজগণের ন্যায় তিনটি ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। এ বিষয়ে সেনরাজগণের আবিষ্কৃত বিভিন্ন তাম্রশাসনগুলির আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারি। এবং সেনরাজগণ প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে স্বীয় বংশের গৌরব বিশেষভাবে যে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন তাহারও বহু নিদর্শন রহিয়াছে। কেশবসেনের ইদিলপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে তিনি "গর্গযবনান্বয়প্রলয়কালো রুদ্রো নৃপঃ" নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহার সহিতও তুর্কিদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল।

অনেকে অনুমান করেন যে, কেশবসেনের সময় কেবল বিক্রমপুর প্রদেশ সেনরাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল ; অন্য অংশ মুসলমানেরা করায়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। ইহাও সত্য নহে।

হরিমিশ্রের কারিকায় আছে—কেশবসেন সর্বদা তুর্কিদের ভয়ে ভীত থাকিতেন। তজ্জন্য তিনি পূর্বপরুষগণের কুল-বিধির কোনও উন্নতি করিতে পারেন নাই। আমাদের নিকট কুল-বিধির এই উক্তি গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। যদি তিনি তুর্কিদের ভয়ে ভীত হইতেন তাহা হইলে কখনই 'গগযবনান্বয়' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইতেন না। নানারূপ কিংবদন্তীর সহিত কুল-পঞ্জিকার কাহিনী এমন ওতপ্রোত ভাবে মিলিত হইয়া গিয়াছে যে, উহা হইতে প্রকৃত সত্য বাহির করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া উঠে।

কেশবসেনের কবিত্ব ঃ

কেশবসেন সুকবি ছিলেন। "সদুক্তিকর্ণামৃত" গ্রন্থে তাঁহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা এখানে তাহার রচিত দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

(১) "কৈলাসো নিহ্নুতশ্রীঃ পরিমিলিতবপুঃ পার্বণঃ শ্বেতভানুঃ
শেষঃ প্রচ্ছন বেশঃ কলয়তি ন রুচিং জাহ্নবী বারি বেণিঃ।
পীতঃ ক্ষীরাম্বু রাশি প্রসভমপহৃতঃ কুঞ্জরো দেবভর্ত্তু
যৎ কীর্ত্তিনাং বিবর্ত্তে রজনি স ভগবানেকদন্তোহপ্যদন্তঃ।।

(২) লীলা সদ্ম প্রদীপ স্ত্রিপুরবিজয়িনঃ স্বর্ণদা কেলিহংসঃ
কন্দর্পোল্লাস বীজং রতিরসকলহ ক্লেশ বিচ্ছেদ চক্রম।
কহ্লারা দ্বৈত্যবন্ধুস্তিমির জল নিধেরুচ্ছিখো বাড়বাগ্নি
র্লক্ষ্যাঃ ক্রীড়ারবিন্দং জয়তি ভুজভুবাংবংশ কন্দঃ সুধাংশু।

১. Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. Vol. V. New series P. 471.

২. About the time of the Kaivarta rebellion (C. A. D 1080) or a few years later, Chorganga the powerful king of Kalinga (A.D. 1076), extended his conquests to the extreme north of Orissa. Either a chief named Samanta Deva who came from the Deccan, and probably was an officer of Choraganga, or Samanta Deva's son Hemantasen, founded a principality at Kasipuri, now Kasiari in the Mayurbhanja State. Neither of those chiefs seems to have acquired extensive power. V. A. Smithis Early History of Northern Inda, P. 403, গৌড়ের ইতিহাস, প্রতিভা, ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ৪৬৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩. The real founder of the Sena kingdom was Hemanta sen's son, Vijayasena who reigned from about 1100 to 1165. His wife was a member of the Sura family, and this alliance may have increased his prestige. * * He defeated Navya and Vira, attacked the lord of Gauda, humbled the King of Kamrupa, protected the king of Kalinga, made many lesser rulers captive and sailed his fleet up the Ganges. Of these the lord of Gauda has been identified as Madanapala, who was driven out of Bengal by the Senas * * Vijayasena found Pala territory divided up among a number of Petty dynasties, of which till his time the Senas had themselves been one. Cambridge shorter History Page 148.

৪. বাংলার ইতিহাস।

৫. গৌড়রাজমালা ৬৯ পৃষ্ঠা।

৬. গৌড়ের ইতিহাস। Epigraphia Indiva Vol. I, Page 309

৭. Samantasen's grandson, Vijayasena, certainly raised himself to the rank of an independent sovereign early in the twelfth century (? A. D. III) and wrested a large part of the Bengal province from the Palas, thus firmly establishing the Sena dynasty. He also carried on successful wars with other powers, and enjoyed a long reign of about forty years, more or less. He kept on terms of friendship with Choragang of kalinga who ruled that Kingdom for the extraordinary term of seventy one years. *The Early History of India of Vincent A. Smith, Page 103.*

৮. *Abhidhan chintamani* by Hemchandra, edited by N. G. Bhattacharjya Calcutta P. 25.
Abhidhanaratnamala by Halayudha, edited by Thomas Autrecht 1861.

৯. The Capital of the sena kings of Bengal. Indian Culture Vol. II NO. 9 Adris Banerji.

১০. "বল্লালসেনের জন্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহারা কিংবদন্তী ইত্যাদি জানিতে সমুৎসুক তাহারা স্বরূপচন্দ্র রায় মহাশয়ের "সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস," 'গৌড়ের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড রজনীকান্ত চক্রবর্তী, 'ঢাকার ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড—যতীন্দ্রমোহন রায়, সেনরাজ বংশ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, প্রতিভা, ১৩১৮, ৪৬২-৪৭৮ পৃষ্ঠা। বিবিধ কুলপঞ্জি, ঢাকুর, রামজয় কৃত বৈদ্যকুল-পঞ্জি, প্রভৃতি দেখিতে পারেন।

১১. গৌড়রাজমালা, ৬২ পৃষ্ঠা। (1) The Chandra dynasty ruled over the entire realm of Vanga including Samatata, Harikela and Chandra dwipa (Mod. Backergonj District). But they were supplanted by the Varmans in the beginning of the 11th century who in their turn were very soon ousted by the senas. During their rule Vanga was included in Pundravardhan bhukti. Dr. B. C. Law, *Indian Culture*. July 1934. Page 63.

১. Barendra-bounded by the Mahananda on the west ; by Padma, or great branch of Ganges, on the south ; by the Korotoya on the East by adjacent Governments on the North.

২. Banga-or the territory east from Krotoya towards the Brahmaputtra. The capital of Bengal both before etc. afterwards, * * ' in the province of Banga, the name is said to have been communicated to the whole.

৩. Bagri-or the Delta called also Dwipa, or the island bounded, on the one side by the Padma, or the great branch of the Ganges ; on another by sea and other bounded by the Hughly River or Bhagirathi.

৪. Rarhi-bounded by the Hughli and Padma on the north and east and by adjacent kingdoms on the West and South.

৫. Maithila-bounded by the Mahananda and Gour on the east, the Hughli or Bhagirathi on the south and on the west.

Hamilton's Hindusthan Vol No. I, P 114.

১২. বৃহৎ-বঙ্গ প্রথম খণ্ড।
যশোহর খুলনার ইতিহাস প্রথম খণ্ড।

১৩. ডাক্তার হেমচন্দ্র রায়-চৌধুরী ও ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেন : (১) বিজয়সেন বঙ্গদেশে যে নূতন রাজবংশ স্থাপন করিলেন তাহা সেনবংশ নামে পরিচিত। সেনরাজারা ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এই বংশটি দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট দেশ হইতে বাংলায় আগমন করিয়াছিল। সামন্ত সেন নামক এক ব্যক্তির অধিনায়কত্বে ইহারা পশ্চিম বঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সামন্ত সেনের পৌত্র বিজয়সেন শূরবংশের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাংলায় প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিজয়সেনের পুত্র বল্লাল সেন বঙ্গদেশে কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্তক। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস,'৯৪ পৃষ্ঠা।

The dominions acquired by Vijayasena were transmitted (C.A.D. 1158) to his son Vallalsena, famous in Bengal tradition as Ballalsen, who is credited with having reorganized the caste system and introduced the practice of Kulinism among Brahmans, Baidyas, and kayasthas. *Early history of India,* V A. smith P. 403

বল্লালসেন [আনুমানিক ১১৫৯-৮৫]—বিজয়সেনের শূরবংশীয়া রাণীর গর্ভজাত পুত্র বল্লালসেন। সেন বংশের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নরপতি। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে বল্লালের স্থান অতি উচ্চে। তিনি এদেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণের মধ্যে কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস ৮১ পৃষ্ঠা। *গৌড়বঙ্গের সেনবংশ।* অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার ৮১ পৃষ্ঠা।

১৪. The sena kings were Saivas. Their seal bore an image of Sadasiva and as the Gupta Emperors had *Virudas* ending with *aditya*, they had virudas ending with sankara : thus Vijayasena was Vrasabha-Sankara, *Vallalsena was Nihasanka Sankara* and so on. It is curious to note that some Vaidya families of Bengal affect this sort of name even at the present day. Finger posts of Bengal History P. 455. Bijoy Nath Sarker. *The Indian Historical quarterly*, Vol. VII. No 3 September,1931.

The Cambridge shorter History of India Cambridge P. 148.

১৫. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৭, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

১৬. The record opens with the auspicious formula *om om namah sivaya* followed by an invocation to Siva as Ardhanariswara. *Inscription of Bengal*. N. G. Majumder. Page 69.

১৭. *সদাশিব মূর্তি বাংলাদেশে খুব বেশি পাওয়া যায় নাই।* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-চিত্রশালায় এবং বরেন্দ্র *অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায়ও সদাশিব মূর্তি আছে।* স্বর্গত সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—Eastern Indian School of Me-di-eval sculpture p. 10.9 বন্ধুবর রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের নিকট ধাতু-নির্মিত একটি অতি সুন্দর ক্ষুদ্র সদাশিব মূর্তি আছে। তাহার সংগৃহীত কিংবা পরিষদের সংগৃহীত মূর্তির সহিত আমাদের এই চিত্রের মূর্তিটির বিশেষ প্রভেদ নাই। বিক্রমপুরে প্রাপ্ত সদাশিব মূর্তি—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—পৌষ ১৩৪৩।

১৮. Up to now however, so far as known, only one image of Ardhanariswara has been discovered in East Bengal, Iconography of Buddhist and Brahmanical sculptors in the Dacca Museum. p.—130 N. K. Bhattasali, M. A.

১৯. মূল কথাগুলি বোধ হয় Mc crindles *Ancient India as described in Classical Literature* নামক গ্রন্থে আছে। Half man, Half woman অন্য কোনও দেবতার মূর্তি হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বলিয়া অবগত নহি, সেইজন্য এখানে অর্ধনারীশ্বরের মূর্তি উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। অমলানন্দ ঘোষ। Archaeological Survey-Central circle, Patna. 14.9.38.

২০. ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় তদ রচিত—"*Icnography of Buddhist and Brahmanical sculptors in the Dacca Museum* নামক গ্রন্থের ১৩০-১৩১ পৃষ্ঠায় অর্ধনারীশ্বর মূর্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৭ম ভাগ ২৩৭-২৩৮ পৃষ্ঠা।

২১. The Hinduism of Ballal Sen was of the tantric kind. The Brahman genealogists assert that he sent numerous missionaries, all Brahmans, to Magadha, Bhotan, Chittagong, Arakan, Orissa and Nepal. V. A. Smiths-*Early History of India*, P. 403

২২. *Journal of the Asiatic Society of Bengal* Vol. XIIV part I. P. 128-154.18. 75 *Epigraphia Indica*, Vol I 303-315. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা সপ্তদশ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৫-১৮০ পৃষ্ঠা।

২৩. "গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেন—উগ্রমাধব এক দেবতার নাম। বোধ হয় তাহার মন্দিরের নিকটবর্তী কোনও উচ্চতা পরিমিত প্রমাণদণ্ড দ্বারা ভূমির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপা হইত। ভূমি-মাপক রাজকর্মচারীগণের কোনওরূপ প্রবঞ্চনা করিবার উপায় ছিল না, নিতান্ত মূর্খ প্রজাও উগ্রমাধব সংলগ্নস্তম্ভ সমান দীর্ঘ মাপদণ্ড দ্বারা আপনাদের ভূমির পরিমাণ হইল কিনা, তাহা পরীক্ষা করিতে পারিত।

২৪. *ঐতিহাসিক চিত্র*, ১ম বর্ষ, খ্রিঃ ২৮৭, *Journal of the Asiatic Society of Bengal* Vol. 1907 Part I P. 61 J. A. S. B. Vol. VII, Part II P. 43 *Epigraphia Indica* Vol. X. J. A. S. B. Vol. 1896 Pt. I P. 6.

২৫. *লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন*। অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। ভারতবর্ষ ১৩শ বর্ষ, ২য় খণ্ড—৩য় সংখ্যা ৪৪১—৪৪৫ পৃষ্ঠা। ফাল্গুন ১৩৩২।

২৬. Saktipur Copper Plate of Lakshmansena Epigraphia Indica Vol. XI. No. 37 Page 211-213.

২৭. (১) *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, ডাঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরি ও ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন।

(২) Lakshmanasena, to whom the inscriptions give imposing titles which suggest great military achievments, A literary source states he reached the hills of Malaya (Travancore) in his "conquest of the world". Inscription also record that he erected pillars of victory at Puri, Benares, and Prayaga, to mark the limits of his conquests, and that he overcame Kamarupa ....He seems to have swept away the last remnants of Pala power, and so to have come into contact with the Gahadavalas, who, in the twelfth century, had been advancing gradually into Magadha. *The Cambridge shorter History of India*. P. 148.

(১) *J. A. S. B. 1896*, P. I. P. II.

(২) জয়দেব, শরণ, গোবর্ধনাচার্য, উমাপতিধর ও ধোয়ী কবিরাজ, লক্ষ্মণসেন সভায় বিরাজ করিতেন। রূপ ও সনাতন লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপ দ্বারে—

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চেতে লক্ষ্মণস্য চ।"

২৮. J. A. S. B. 1906. P. 174.

২৯. The unique four armed image of Chandi * * was found in the ruins of Rampal in the Dacca District. It was obtained by the late Babu Baikunthanath Sena along with a number of other images, and presented to the late Babu Jivana Chandra Raya who erected a temple for this fine image and installed it there.

Iconograply of Buddhist and Brahmanical Sculpture. Page 202-4 *বাংলার ইতিহাস*, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড। *Journal & proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, New Series Vol IX. P. 299 P. I. XXII-&c.

৩০. (1) *Indian Antiquary*, Vol XIX. P. I (2) *The Era of Lachman Sen*-H. Beveridge, J.A.S.B. Pt. I. Page 2. (3) *Indian Antiquary* vol. XIX. P. I.

রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তৎ প্রণীত "গৌড়রাজমালা" গ্রন্থে ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠায় লক্ষ্মণাব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। *বিক্রমপুরের ইতিহাস*'—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত দ্রষ্টব্য। "ফরিদপুরের ইতিহাস" প্রণেতা আনন্দনাথ রায় মহাশয়ও একই সময়ে পরগণাতি সন সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

৩১. গৌড় রাজমালা ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা।

৩২. *প্রিয়পাঠ*, শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। কলিকাতা সেন্ট্রাল টেকস্ট বুক কমিটির অনুমোদিত। অষ্টম সংস্করণ। Printed by Jadunath Seal, Hare Press 23/1, Bechu Chatterjee Street. Published by the Students Library. Dacca 1889. অর্ধশতাব্দীরও পূর্বের ছাত্রগণ লক্ষ্মণসেনের এই পলায়ন কলঙ্কের কথা কণ্ঠস্থ করিয়াছে। আমার আজও এই কবিতাটি স্মরণ আছে।

৩৩. In 1192 Muhammad Ibn Sam had avenged Prithiviraja's defeat of the Muslims in the previous year, and had crushed the Chahumana opposition to his advance. In 1193 Delhi had fallen, and in 1194 Kanauj, and in the same year Muhammad Ibn Bakhtiyar, one of Kutb-ud-din Aibak's generals, advanced rapidly, conquered Bihar, took Nadiya and overthrew Lakshmanasena who escaped with his life. *If the Muhammadan historians are to be believed*, the invaders met with no organised opposition, and the conquest was extraordinarily easy. The Gahadavalas seem to have withdrawn and left open the way through Magadha. In Bihar itself three were no armed men, and the capital, Nadiya (afterwards Lakhnauti), was taken by only eighteen horsemen Lakshmanasena escaped across the river into Eastern Bengal, where early in the thirteenth century his sons succeeded him. Literature seems to have flourished at his court, the most notable names being those of Jayadeva, author of the Gitagovindo, Halayudha, and Dhoyi, author of the Pavanduta, an imitation of the celebrated Meghadut. Inscriptions surviving from the reigns of his sons, Visvarupasena and Kesavasena, tell us only that these kings granted certain lands in the Vanga region and ruled for about fourteen and three years respectively. But, although the progress of the Muhammadans was slower in eastern than in western Bengal, by the middle of the thirteenth century all trace of Hindu rule had disappeared. *The Cambridge Shorter History of India*. Edited by H. H. Dodwell, Pages 148 & 149.

৩৪. স্বর্গত দুর্গাচরণ সান্যাল তৎ-প্রণীত "বাংলার সামাজিক ইতিহাসে" লিখিয়াছেন :—"রাজা লক্ষ্মণসেন বিনা যুদ্ধে পলায়ন করায় মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেস্তা তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া 'লছমনিয়া' বলিয়া লিখিয়াছেন। তাহা হইতেই ইংরেজি ইতিহাসে এবং তদনুরূপ বাংলা ইতিহাসে লাক্ষ্মণ্যসেন বা দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন রাজা এবং নবদ্বীপ তাহার রাজধানী কল্পিত হইয়াছে। তাহা সমস্তই ভুল। নবদ্বীপ কখনও রাজধানী ছিল না। এবং লাক্ষ্মণ্যসেন নামে কোনও রাজা ছিল না।

৪৫. The ruler of Eastern Bengal in those days was Lakshmansena, described by the Muhammadan writer as an aged man and reputed. though erro-neously, to have occupied the throne for eighty years. The portents which were said to have attended his birth had been justified by the monarch's exceptional personal qualities. His family we are told, was respected by all the Rais or chiefs of Hindusthan, and he was considered to hold the rank of hereditary Khalif (Caliph) or spiritual head of the country. Turstworthy persons affirmed that no one. great or small, ever suffered injustice at his hands and his generosity was proverbial. V. A. Smiths' *Early History of India*. Page 405.

৩৬. *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1896, Part I. P. P. 9-15.

৩৭. J.A.S.B. March 1914. Edilpur Grant of Kesavsena by R. D. Banerji M. A. ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড। "গৌড়ের ইতিহাস" প্রথম খণ্ড।

৩৮. ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই তাম্রশাসনখানির প্রাপ্তিস্থানের নির্দেশ করিয়াছেন। ননীবাবু তাহার গ্রন্থের ১৯৪ পৃষ্ঠা উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন :—So far as Mr. Nalinikanta Bhattasali of Dacca has been able to ascertain, this plate was found in the year 1925, in the village of Madhyapada, in Vikrampur pargana, about 14 miles direct south of Dacca town. It passed through Dacca town to Susang, in Mymensing District and was acquired there by Maharaja Bhupendra Chandra Singh who presented it to the Sahitya Parishad at Calcutta. Before this a strip had been cut away from the bottom of the plate. *Inscriptions of Bengal* Page 194.

৩৯. বাংলার ইতিহাস রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চপুষ্প—অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ প্রবোধচন্দ্র সেন লিখিত বাংলার ইতিহাসে হিন্দুরাজত্বের শেষ যুগ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ১৬২-১৭৫ পৃষ্ঠা।

৪০. *J. A. S. B.* Vol VII p. p. 43-46, 47-51.

৪১. ডক্টর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী এম, এ, পি, এইচ, ডি বলেন—From the records of the early Sena Kings, we know of only !wo Bhuktis in Bengal. Viz Paundra Vardhana and Vardhamana,—গুপ্ত ও পালরাজাদের সময় পৌন্ড্রবর্ধনভুক্তি কেবলমাত্র বর্তমান রাজশাহি জেলা লইয়া গঠিত ছিল। কিন্তু সেনরাজাদের সময় উহার সীমা পরিবর্ধিত হইয়া অন্য কয়েকটি প্রদেশেও সীমাভুক্ত হইয়াছিল। বঙ্গ [appoximately the Dacca Division]-ও তাহার অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমান প্রেসিডেন্সি বিভাগের কতকাংশ অর্থাৎ, ভাগীরথীর পূর্বতীরবর্তী কতকাংশও বঙ্গের সীমান্তবর্তী ছিল। বর্ধমানভুক্তি গঠিত হইয়াছিল মুর্শিদাবাদ জেলা [ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী স্থান] এবং বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি এবং হাওড়া জেলাও বর্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্তি ছিল। বল্লালসেনের সীতাহাটিতে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে অনুমান করা যায় যে, [আনুমানিক ১১৭১ খ্রিঃ] উত্তর-রাঢ়া বর্ধমানভুক্তির মধ্যবর্তী একটি মণ্ডল ছিল। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর শাসন হইতে জানা যায় যে, [১১৮৩ খ্রিঃ অঃ] উত্তর-রাঢ়া কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত ছিল। ইহার দ্বারা এইরূপ অনুমান করা যায়, লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে তাহার বিভিন্ন প্রদেশ জয় করিবার ফলে বর্ধমানভুক্তির বিস্তার আবশ্যকীয় হইয়াছিল।

[* * It is probable that the conquests of Lakshmanasena in the direction of Bihar must have made this an administrative necessity. It seems to have taken over the Northern Radha tract from Vardhamana-bhukti, although we know from the Govindpur grant, that the latter *bhukti*, was in existence in the 2nd year of Lakshman Sena. The Ajaya which was the boundary between northern and southern Radha must then have been the boundary between the two *bhuktis*. The *Kankagrama-bhukti* appears to have extended into the Santal parganas and Bhagalpur on the north-west of Uttara-Radha. On the north cost it could have extended very little beyond the river Ganges.

Epigraphia Indica, vol. XXI. No 37. *Saktipur copper-plate of Lakshman-Sena* Page 213-2 by Dhirendra Chandra Ganguli. M.A.. Phd. Benares.

গৌড়ের ইতিহাস ২১৪ পৃষ্ঠা।

রাজধানী
শ্রীবিক্রমপুর—রামপাল



শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার [রাজধানী] কোথায়, বিক্রমপুরের কোনও স্থানে তাহা অবস্থিত ছিল, এইবার সেই কথা বলিতেছি।

শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী কোনও সময়ে কোনও কোনও নৃপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, সেই অতি সুদুর অতীত হইতে আরম্ভ করিয়া সেনরাজ বংশের রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর সম্পর্কে সমুদয় কথা আমরা সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছি।

আমরা বিবিধ তাম্রলেখ এবং প্রামাণিক গ্রন্থ ইত্যাদি হইতে দেখাইয়াছি যে, চন্দ্র, বর্ম সেন সকল রাজাদের রাজধানীই ছিল শ্রীবিক্রমপুর। বিক্রমপুরে গুপ্তরাজাদের প্রভাবও বিদ্যমান ছিল, তবে কত দিন, কত কাল কি ভাবে তাহা ছিল, জনপ্রবাদ ব্যতীত তাহা তেমন ভাবে গ্রহণ করিবার মত প্রমাণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই।[১]

শ্রীবিক্রমপুর বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী। বর্তমানে তাহা রামপাল নামে পরিচিত। চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত এই রাজধানী হইতেই বঙ্গরাজ্য শাসন করিতেন। বর্মনৃপতিগণ এই শ্রীবিক্রমপুর রাজধান হইতেই শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। বিজয়সেনের বারাকপুরের তাম্রশাসন হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, মহারাজ বিজয়সেনের সময়েই প্রথম বিক্রমপুর সেনরাজাদের হস্তগত হইয়াছিল। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন, বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন, লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেন, কেশবসেন প্রভৃতির সময়েও বিক্রমপুরেই রাজধানী ছিল। আমরা সমুদয় তাম্রলেখেই দেখিতে পাইয়াছি যে, প্রত্যেক বিভিন্ন বংশের নৃপতিরাই শ্রীবিক্রমপুরবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতে তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছেন, কাজেই বিভিন্ন রাজবংশের রাজধানী যে শ্রীবিক্রমপুর ছিল, তদ্বিষয়ে কোনওরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে না।

শ্রীবিক্রমপুর কোথায়? ঃ

সে প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে ১৩২৩-২৪ সালে শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী কোথায় অবস্থিত তাহা লইয়া নানারূপ ঐতিহাসিক যুদ্ধ হইয়াছিল। বর্তমান সময়ের তরুণ সম্প্রদায়ের নিকট তাহা একরূপ অজ্ঞাত বলিয়াই মনে হয়। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন বর্ধমানে হয়। সে সময়ে স্বর্গত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দেবগ্রামের "দমদমের ভিটাকেই" বল্লালসেনের সীতাহাটি তাম্রশাসন বর্ণিত বিক্রমপুরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে "বর্ধমানের ইতিকথা" এবং "বর্ধমানের পুরাকথা" ইত্যাদি প্রবন্ধও প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে ঐ সম্বন্ধে নানারূপ বাদ প্রতিবাদ হইতে থাকে। "ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা শ্রদ্ধাসম্পদ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় ঐ সম্পর্কে 'সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা' 'প্রতিভা' প্রভৃতিতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সে সময়ে যে ঐতিহাসিক বিতর্ক চলিয়াছিল বর্তমান সময়ে সে বিষয়ে কেহই কোনও তর্ক উপস্থিত করিতে অক্ষম, কেননা শ্রীবিক্রমপুর রাজধানীর সমীপবর্তী নানাস্থান হইতে বিবিধ শ্রীমূর্তিসমূহ এবং তাম্রশাসন ইত্যাদি আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐরূপ অলীক তর্কের শেষ হইয়াছে।[২] 'ঢাকার

ইতিহাসের' সমালোচনা করিতে যাইয়া স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

"গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে গ্রন্থকার বিক্রমপুরের অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। নদিয়া জেলার বিক্রমপুর যে কোনও কালে রাঢ়দেশে অবস্থিত ছিল না এবং উহা যে চন্দ্র, বর্ম ও সেনবংশীয় রাজগণের তাম্রশাসনসমূহে উল্লিখিত বিক্রমপুর হইতে পারে না তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। রাঢ় অনুসন্ধান সমিতি ভূমিষ্ট হইয়া তনুত্যাগ করিয়াছে ; অতএব, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর আলাদিনের দৈত্যের সাহায্যে এক রাত্রিতে নদিয়া জেলায় উঠাইয়া আনার প্রয়োজনও অন্তর্হিত হইয়াছে। (প্রবাসী ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা।)

রামপালের নামোৎপত্তি ঃ

বিক্রমপুরের প্রাচীনত্বের নিদর্শন-স্বরূপ যাহা কিছু দেখিবার আছে তৎসমুদয়ই রামপাল ও তৎসন্নিকটবর্তী গ্রাম-সমূহে অবস্থিত। বিক্রমপুরের ক্ষমতাশালী রাজাদের রাজধানী হইবার মত স্থান হইতেছে রামপাল। শ্রীবিক্রমপুরের নাম রামপাল কিরূপে হইল সে সম্বন্ধে অনেক কিছু প্রচলিত কাহিনী চলিয়া আসিতেছে।

আমরা এখানে তাহার দুই-একটি উদ্ধৃত করিতেছি। কাহারও কাহারও মতে পালবংশীয় নরপতি রামপালের নামানুসারে এস্থানের নাম 'রামপাল' হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৩৫ পৃষ্ঠায়ও উল্লেখ করিয়াছি। সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত 'রামচরিত' গ্রন্থে লিখিত আছে ; "পূর্বদিকের অধিপতি বর্মরাজা নিজের পরিত্রাণের জন্য উৎকৃষ্ট হস্তী ও স্বীয় রথ প্রদান করিয়াছিলেন।" বেলাব-তাম্রশাসনের প্রতিপাদয়িতা ভোজবর্মাকেই এই প্রাগদেশীয় বর্মরাজা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। স্বর্গত নগেন্দ্রবাবুর মতে—"সামলবর্মার পিতা জাতবর্মা দিব্য নামক কৈবর্ত-নায়কের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। হয়ত কৈবর্তপতি রাবণরূপী ভীমের পক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গের অনুসরণ করিয়া রামপাল কিছুদিনের জন্য পূর্ববঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, আর সামলবর্মা তৎকালে ভীমপক্ষকে ধ্বংস করিয়া উৎপাত নিবারণ করিয়াছিলেন, রাজকবি যেন তাহারই আভাস দিয়াছেন। যেখানে সামলবর্মা গৌড়াধিপ রামপালকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, সেইস্থানই এক্ষণে বিক্রমপুরের মধ্যে "রামপাল" নামে পরিচিত রহিয়াছে।"[৩]

এ অনুমান একেবারে এযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। আশুতোষ গুপ্ত মহাশয় তাহার লিখিত 'রামপাল' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"I am of opinion that the prince who gave his name to this city and lake of Rampal was a king of the Pal dynasty."।

গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎপ্রণীত "লঘুভারত" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"রাম নামৈকা বৈদ্যরাজ মহাধনী
তৎপালিতা সানগরী রামপালেতি সংজ্ঞিতা।"

বিখ্যাত সাহিত্য-সংস্কারক কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর বলেন—"বল্লাল প্রতিষ্ঠিত রাজবাড়ির মুদির নাম ছিল রামানন্দ পাল, লোকে তাহাকে সাধারণত রামপাল বলিত। রাজবাড়ি তণ্ডুলাদি যোগাইয়া রামপাল কালে সমৃদ্ধিশালী হইল এবং বল্লালের রাজধানী হইতে খানিকটা দূরে বাড়ি করিয়া দেশীয় বণিক সমাজে সম্মানের আসন লাভ করিল। বল্লাল যখন দিঘি খনন করেন, তখন তাহার দিঘি সংবর্ধিত হইয়া রামপালের বাড়ির নিকট যাইয়া পৌঁছে এবং রামপালের শুভাদৃষ্ট ক্রমে রামপাল দিঘি নামে পরিচিত হয়। এ সম্পর্কে একটি গ্রাম্য উপকথা আছে, তাহার প্রথম পংক্তি এই,—

"বল্লাল কাটায় দিঘি নামে রামপাল।"

এই সমুদয় কাহিনীর কোনও মূল্য আছে বলিয়া মনে করি না। ইহা অলীক গ্রাম্য-প্রবাদ মাত্র। বিক্রমপুরের সর্বত্রই এইরূপ নানা কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়।

রামপালের অবস্থান ঃ

রামপাল বিক্রমপুরের পূর্বোত্তর প্রান্তে মেঘনাদ (মেঘলা) নদের পশ্চিম তটে মুন্সিগঞ্জ মহকুমার নিকটবর্তী। মুন্সিগঞ্জ হইতে উহা দুই ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা ২৩' ৩৮" উঃ এবং দ্রাঘি ৯০' ৩২' ১০" পূঃ। বিক্রমপুরের সাধারণ ভূমির উচ্চতা অতি কম। কিন্তু রামপালের চতুর্দিকের অনেক উচ্চ। "দিল্লি যেমন ভারতের রাজবংশগুলির মহাশ্মশান, রামপাল সেইরূপ বিক্রমপুরের রাজবংশগুলির মহাশ্মশান। প্রায় পঁচিশ বর্গ-মাইল-ব্যাপী স্থানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রাজধানী ছিল।"

রামপাল ও তাহার চারিদিকের বহু পল্লী লইয়া রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখানে তাহাদের কয়েকটির নাম করিলাম। রামপালের মানচিত্রের সহিত পাঠকবর্গ গ্রামের নাম মিলাইয়া দেখিবেন। রামপাল, সুবাসপুর, [সুখবাসপুর] বজ্রযোগিনী, আটপাড়া, সুয়াপাড়া, নাহাপাড়া, রঘুরামপুর, শঙ্করবান্দ, জোড়াদেউল, মানিকেশ্বর, মীরকাদিম, কাজিকস্‌বা, পানাম, পঞ্চসার, চাঁপাতলি, চূড়াইন, মহাকালী, কেওয়ার, নগরকস্‌বা, কাগজিপাড়া, শাঁখারিবাজার, সিপাহিপাড়া, কামারনগর, দেওসার, সোনারঙ্গ, টংগিবাড়ি, পুরাপাড়া, ঘাসির পুকুরপাড়, মাকুহাটি প্রভৃতি গ্রাম লইয়া প্রাচীন শ্রীবিক্রমপুর-রামপাল নগরী সুবিস্তৃত ছিল।

ঢাকা নগরীতেও বর্তমান সময়ে শাঁখারিবাজার, কামারনগর প্রভৃতি নামীয় পল্লী বর্তমান রহিয়াছে। এইরূপ নাম-সাদৃশ্যের মধ্যে যে একটা ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহা প্রাচীন রামপাল গ্রাম পর্যবেক্ষণ করিলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে, প্রাচীন রামপাল-নগরী ভগ্ন-হতশ্রী এবং ভস্মীভূত হইলে ঐ সমুদয় ব্যবসায়ীগণ নব প্রতিষ্ঠাপিত ঢাকা নগরীতে যাইয়া বাস করেন।

রামপালে ধন প্রাপ্তি ঃ

"রামপালে মৃত্তিকার উপরিভাগে দালানাদি প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু অনেকানেক ইষ্টকালয় ও ঘাটলা ইত্যাদি যে মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে রামপাল হইতে সুবচনী খালের পূর্বপার পর্যন্ত যে সকল গ্রাম অবস্থিত আছে, তাহার প্রায় প্রত্যেক স্থানেই মৃত্তিকার নিম্নদেশে বহুল পরিমাণে ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায়। উপরি দেশেও অনেক ইষ্টকাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্বারা স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে, পূর্বে এ সকল স্থানে অনেক আঢ্য লোকেরা বাস করিতেন। যাহা হউক, বর্তমান সময়ে রামপাল ও এতৎসমীপবর্তী কতিপয় গ্রামে ভূমি খনন করিয়া অনেকে স্বর্ণপাত ও রৌপ্যপাত ও ইষ্টকাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ইংরেজ রাজত্বকালে রামপালের সন্নিহিত জোরার দেউল গ্রামে এক ব্যক্তি মাটির নীচে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়াতে সে "সোনাকপালিয়া" নামে খ্যাত আছে। অনেক দিন বিগত হইল বজ্র-যোগিনীর অন্তর্গত সুয়াপাড়া নামক স্থানে বাঁরৈ জাতীয় এক ব্যক্তি ভূমিচাষ করিতে করিতে একখানি পাথর প্রাপ্ত হইয়াছিল। জনৈক কর্মকার উহা দেখিতে পাইয়া ইহা যে মূল্যবান পদার্থ ইহা জানিতে পারিল এবং আপন কোনও কর্ম সাধনের ভান করিয়া কিঞ্চিৎ মূল্য প্রদান-পূর্বক গ্রহণ করত স্থানান্তরে বিক্রয় করিয়া ৮০ হাজার টাকা লাভ করে। কথিত বাঁরৈ ইহা অবগত হইয়া ঐ প্রস্তর প্রাপ্ত হইবার জন্য কর্মকারের নামে দেওয়ানি আদালতে অভিযোগ করে, সেখানে সে পরাজিত হইয়া সদরে আপিল করে, সেখানে সে পরাজিত হইয়া উহা হইতে নিবৃত্ত হয়।"

এই হীরক প্রাপ্তির সম্বন্ধেই টেলার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন—"A few years ago a ryott while ploughing a field in this place and found a diamond of the value of Rs 70,000 (7,000) it afterwards gave rise to a law suit before the provincial court of Appeal." এই হীরকখণ্ড রামপালের রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। একজন মুসলমান একবার সুবর্ণ-নির্মিত একটি তলোয়ারের খাপ ও কয়েকটি স্বর্ণগোলক পাইয়াছিল, এ-সমুদয় স্বর্ণের ওজন প্রায় সাত সের ছিল। বিগত ১৩১০ সালে রামপালের নিকটবর্তী রতনপুর নামক স্থানের একজনের মুসলমান প্রাচীন কালের কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কতকগুলি ধূর্ত লোক তাহাকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহার অধিকাংশ আত্মসাৎ করে। বক্রী যাহা ছিল তাহা মুন্সিগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর গভর্নমেন্টের সম্পত্তি বলিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। জনরবে প্রকাশ যে, তাহার সংখ্যাও নাকি শতাধিক হইবে।

ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এতদ্ সম্পর্কে বলেন—"I personally know of several cases of the find of Treasure. A book of 24 thick golden leaves bound together by a copper wire was found from Dhamdaha tank and melted down. A copper vessel full of treasure was found in the Deul at Sonerang. The finder went to calcutta to dispose of his find secretly, fell into the clutches of swindlers and lost everything, and was brought home, a raving lunatic. Fifteen solid bricks of gold were found in Punchasar and secretly disposed of. The silver image of Vishnu come from the Deul at churain, from which also hails the splendid pedestal of the image Nataraja." অর্থাৎ, আমি নিজেও রামপালের নানাস্থান হইতে নানারূপ ধনরত্ন প্রাপ্তির কথা জানি। ধামদার দিঘির ভিতর হইতে ২৪ খানি সোনার পাতওয়ালা তার দিয়া বাঁধা একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছিল—কিন্তু উহা গলাইয়া ফেলায় আর কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। একবার সোনারঙ্গের দেউল হইতে এক ব্যক্তি একটি ঘটিভরা মুদ্রা পাইয়াছিল। সে কলিকাতা গিয়া উহা গোপনে হস্তান্তরিত করিতে গিয়াছিল, কিন্তু জুয়াচোরদের পাল্লায় পড়িয়া সর্বস্ব খোয়াইয়া বাড়ি ফিরে। আর একবার পঞ্চসার গ্রামের এক ব্যক্তি ২৪ খানা সোনার ইট বা ফালি পায়, সে গোপনে উহা বিক্রয় করিয়া ফেলে। রজত-নির্মিত বিষ্ণু মূর্তিখানিও চূড়াইন গ্রামেই পাওয়া যায়—নটরাজ মূর্তির প্রস্তর-নির্মিত পাদপীঠও চূড়াইন গ্রাম হইতে পাওয়া গিয়াছিল।

রজত নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি ঃ

ইংরেজি ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে এবং বাংলা ১৩১৬ সালে চূড়াইন গ্রামের মৃত্তিকাভ্যন্তর-হইতে রজত-নির্মিত একটি বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়াছিল। সে গ্রামের বারুজীবিদের মধ্যে কেহ কেহ একটি বোরোজ [বিক্রমপুরে বোরো শব্দ ব্যবহৃত] নির্মাণের জন্য নিকটবর্তী একটি শুষ্ক পুষ্করিণী খনন করিতে যাইয়া উহা প্রাপ্ত হয়। দীর্ঘকাল মৃত্তিকাভ্যন্তরে থাকায় মূর্তিটি এতদূর বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল যে, ইহা কোনও ধাতু-নির্মিত তাহাই প্রথমে কেহ ঠিক করিতে পারেন নাই, পরে ঢাকা নগরীতে নীত হইলে সেখানকার কর্মকারগণ উহার মলিনত্ব দূর করিতে সমর্থ হয়। তখন প্রকাশ পায় উহা রজত-নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি।

'চূড়াইন' বা চূড়ামণি গ্রাম বিক্রমপুরের সুপ্রসিদ্ধ সেনরাজগণের রাজধানী রামপালের অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রামস্থ 'দেউল বাড়ি' [দেবালয়] নামক স্থানে অদ্যাপি বহু ইষ্টক স্তূপ—এবং ভগ্ন দেবমন্দিরাদির কঙ্কাল-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রামের মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতেই আর একটি প্রাচীন অট্টালিকার একটি অভগ্ন কক্ষও প্রকাশিত হইয়াছে। এই রজত-নির্মিত মূর্তির

সম্বন্ধে ড"র ভট্টশালী মহাশয় তাহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন—[A silver image of Vishnu, *discovered in 1909 from a ditch by the Districl Board road, a little to the* South of the Deul at Churain. Now in the Indian museum, calcutta. Exquisiteworkmanship]. আমি এই বিষ্ণু-মূর্তির সম্বন্ধে ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী' পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।

এই বিষ্ণু-মূর্তিখানি চালিসমেত উচ্চতায় ১১ ইঞ্চি, ওজনে ১১৬ তোলা। পাদপীঠের নীচে গরুড় করজোড়ে উপবিষ্ট। বেদির উপরে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মাধারী চতুর্ভুজ বাসুদেব দণ্ডায়মান। বাসুদেব বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান, সৌম্য-হাস্যময় বদনমণ্ডল অপূর্ব প্রভায় বিভাসিত। দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। এই মূর্তিখানি কলিকাতা যাদুঘরের ললিতকলাবিভাগে [Arts section] রক্ষিত আছে। এই ক্ষুদ্র বিষ্ণুমূর্তিখানির শিল্প-নৈপুণ্য দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। মূর্তিখানির মাথায় কিরীট, কর্ণভূষা প্রভৃতি শিল্প-নৈপুণ্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

শতবর্ষ পূর্বের প্রত্যক্ষদর্শী বলেন : 'রামপাল ও এতৎ নিকটবর্তী কতিপয় স্থানে মৃত্তিকার নিম্নদেশে এত ইষ্টক দৃষ্ট হয় যে, তাহা শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এমন কি তন্নিমিত্ত সহজে গমনাগমন করা দুঃসাধ্য। প্রায় দশ বৎসর বিগত হইল [সে অর্থে বর্তমানকাল হইতে প্রায় শত বৎসর পূর্বের কথা] পূর্বোক্ত রাজবাটির সন্নিহিত বহু ভদ্রলোক-সমাকীর্ণ বজ্রযোগিনী নামক গ্রামে, ভগবান রায় নামক জনৈক সৎকুলোদ্ভব মহাশয় স্বীয় বাটির এক স্থানে একটি পুষ্করিণী ও একটি গর্ত খনন করিয়া তাহাতে এত ইষ্টক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, ঐ ব্যক্তি আপন বাটিতে একতালা, দুতালা ৫/৬ খানা দালান ও ঘাটলা ইত্যাদি নির্মাণ করিতে আর বড় ইট ক্রয় করেন নাই। তিনি প্রায় আট লক্ষ ইট প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার প্রাপ্ত সকলের দৈর্ঘ্য ন্যূন্যাধিক দেড় হাত ও বিস্তার প্রায় আঠার অঙ্গুলি হইবে। এইরূপে অনেকেই মাটির নীচে অসংখ্য ইষ্টকাদি প্রাপ্ত হইতেছেন। সকলেই প্রায় ১—১$\frac{১}{২}$, ২—২$\frac{১}{২}$, ৩—৩$\frac{১}{২}$, ৪—৪$\frac{১}{২}$, ৫ হাত মাটির তলে পাইয়া থাকে। অনেকে আবার তন্মধ্যে প্রস্তর এবং ধাতু ও যৌগিক-পদার্থ নির্মিত অদ্ভুত মূর্তিসকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ উহার নামাদি নিরূপণে সক্ষম নহে। .... রামপালের যে-সকল ইষ্টকালয় ছিল তদ্বারা ঢাকা নগরীর অনেকানেক ইষ্টকালয় নির্মিত হইয়াছে। রামপাল একটি বৃহৎ স্থান। উহার এক অংশের নাম শাঁখারিবাজার। পূর্বে তথায় অনেক শাঁখারি-জাতি বাস করিত। পরে যখন ঢাকা নগরীর পত্তন হয় তখন তাহারা [শাঁখারিরা] তথা হইতে ঢাকায় যাইয়া বাস এবং ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করে। রামপালের পশ্চিমাংশের নাম রঘুরামপুর।

রঘুরামপুর ঃ

রঘুরামপুরের একটি পুরাতন পুষ্করিণী খননে কতকগুলি দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই পুষ্করিণীটি পঞ্চসার গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মহলানবীশ জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়ের গণনানুযায়ী খনিত হয়। আমরা এই খনন ব্যাপারে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলাম। জ্যোতিষী মহাশয় আমাকে এ খনন-কার্যের আনুপূর্বিক ইতিহাস যেরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কৌতূহলী পাঠকগণের জ্ঞাতার্থ এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

প্রাচীনত্বের নিদর্শন রঘুরামপুরের পুষ্করিণী খননের বিবরণ ১৯১২ ডিসেম্বর ১৯১৩ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত ঃ

"আমি গণনা করিয়া জানিতে পারি যে, প্রাচীন হিন্দু রাজধানী রামপাল অঞ্চলে *রঘুরামপুর নামক পল্লীতে একটি পুরাতন বুজা-দিঘির গর্ভে বহু মাটির নীচে লোক-চক্ষুর*

অন্তরালে পাকা বাঁধানো স্থান [brick structure] আছে এবং তাহাতে অনেক ধাতব পদার্থ [Metalic goods] নিহিত রহিয়াছে। জ্যোতিষিক গণনায় ধাতু বলিতে সোনা, রূপা, লোহা, তামা পিতল, কাঁসা, রাঙ্গ, সীসা, টিন ইত্যাদিই বুঝায়, অধিকন্তু মণি-মাণিক্য এবং সাধারণ প্রস্তরও বুঝাইয়া থাকে। আমি ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাইয়া সরকারি খরচে আমার গণনার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমার গণনায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারায় আমি বিভাগীয় কমিশনার মহাশয়কে গণনার অব্যর্থ ফল দেখিবার জন্য দৃঢ়তার সহিত আহ্বান করিয়াছিলাম, এবং এ কার্যে যে ব্যয় লাগে, তাহা সম্পূর্ণ নিজে দিতে স্বীকার করায়, এ বিষয়ের প্রতি মহামান্য গভর্নর-বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম, পরে ম্যাজিস্ট্রেট-বাহাদুর নিজে স্থানটি পরীক্ষা করেন। তাহার পর সরকার-বাহাদুর আমাকে নিজ ব্যয়ে ভূমি খনন করিয়া গণনার ফল পরীক্ষা করিবার জন্য অনুমতি দেন। এই অনুমতির বলে আমি গত ১৯১২ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯১৩ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত বহু লোক লাগাইয়া খনন করিয়াছি। খননকালে চারি মাস পর্যন্ত পুলিশের পাহারা বর্তমান ছিল। ১৪/১৫ হাত মাটির নিম্ন হইতে যথার্থই পাকা বাঁধান স্থান এবং তাহার উপরে ধাতু-নির্মিত বহুসংখ্যক দেবমূর্তি এবং ত্রিশূল, খড়ম, থালা, সরা, ঘট, শঙ্খ, হরিতকি ইত্যাদি বিবিধ পুজোপকরণ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গভর্নমেন্ট ঢাকাতে মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঐ সকল পুরাদ্রব্য পরম যত্নে রক্ষা করিতেছেন। ভূমি খননকালে বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের ব্যবস্থা-সচিব মাননীয় সার উইলিয়ম ডিউক, কে সি আই আই সি এস মহোদয় ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট-বাহাদুরকে সঙ্গে করিয়া মুন্সিগঞ্জ থানায় আসিয়া আবিষ্কৃত জিনিসগুলির অনেকগুলি দর্শন করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহা লাট-বাহাদুরের অভিপ্রায়ানুসারে তাড়াতাড়ি ঢাকায় নেওয়াইয়াছিলেন। গত ১৬ই জুলাই, ১৯১৩ তারিখে স্বয়ং বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর মুন্সিগঞ্জ পদার্পণ করিয়া লোকেলবোর্ডের অভিনন্দনের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"As you may have heard I was much interested in the valuable archaeological finds lately made with the assistance of Pandit Pareshnath Mahalanahis of Panchashar and in February last, I went with my friend Khan Bahadur Aulad Husain to inspect them in the Dacca cuthery." ইহাই রঘুরামপুরের দিঘি খননের আদ্যোপান্ত ইতিহাস।

রঘুরামপুর নাম কেন হইল?

এখন রঘুরামপুরের প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করিব। রঘুরামপুর রামপালের অন্তর্গত একটি অতি প্রাচীন স্থান। স্থানটি প্রাচীন হইলেও নামটি খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। রঘুরামপুর এ নামটি সাড়ে তিনশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। এ স্থানের এইরূপ নানা পরিবর্তনের পূর্বে ইহা কি নামে অভিহিত হইত তাহা খুব ভালরূপে সপ্রমাণ করা এতকাল পরে সম্ভবপর না হইলেও, কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে এই মাত্র। রঘুরামপুরের নামোৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতে পারি, সত্য রূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে তাহাতে কোনও বাধার কারণ নাই। বারভূঁইয়ার শ্রেষ্ঠ বীর চাঁদরায়-কেদাররায়ের পতনের পর তাহাদের মন্ত্রী রঘুরামরায় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন। ইনি রাজ্য বা জমিদারি প্রাপ্তির পর প্রাচীন রাজধানী রামপালের নিকটবর্তী স্থানে স্বীয় রাজধানী নির্মাণ করিয়া উহার নাম রঘুরামপুর রাখেন। 'ডাকৈর' নামক কুলগ্রন্থে তাহার সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"ভরদ্বাজ গোত্রে দাস আদি সাধ্য হয়।
ক্রিয়াগুণে দোষে ভাবাভাব পরিচয়।।

ভরদ্বাজ রবি রাজা রঘুরাম রায়।
সমস্ত বিক্রম যার রাজস্ব যোগায়।
হিন্দু মুসলমান যুবা বালক স্থবির।
যার পদতির ভয়ে কম্পিত শরীর।।
দ্বারে দ্বারে থানাদ্র বিস্তর লস্কর।
শত শত ছিল যার চাকর নফর।।
লভিল ক্রমশঃ কালে বিপুল সম্মান।
বিক্রমে সমাজপতি রঘুরাম ছিলা।
বহু ক্রিয়াগুণে বহু সম্মান পাইলা।।”

রঘুরাম রায় মোঘলের অনুগ্রহে একরূপ স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন। তাহাকে রাজস্ব ব্যতীত মোগলের নিকট আর কোনও বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত না। এই রঘুরাম রায় বৈদ্যবংশসম্ভূত ভরদ্বাজ গোত্রীয় ছিলেন। রঘুরামের সহিত মোঘলের দুই-একবার যে সংঘর্ষ না ঘটিয়াছিল তাহা নহে। তিনি সে সকলের প্রত্যেকটিতে জয়লাভ করেন। রঘুরাম রায়ের অধস্তন পুরুষেরা পরবর্তীকালে নপাড়া গ্রামে বাসস্থান পরিবর্তন করিয়া পরিশেষে নবপাড়ার চৌধুরী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। বজ্রযোগিনী গ্রামে অদ্যাবধি ইহাদের পুরোহিতবংশধরগণ বাস করিতেছেন। রঘুরাম রায়ের কীর্তিসম্পর্কে বহু কথা প্রচলিত আছে, এখানে তাহা আলোচনার স্থান নহে। রঘুরাম রায়ের অভ্যুদয়কাল যোড়শ শতাব্দীর শেষ বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ; কাজেই “রঘুরামপুরের” নামোৎপত্তি [৩০০/৩৫০] তিন শত-সাড়ে তিন শত বৎসরের অধিক নহে।

শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মহলানবিশ জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়ের গণনানুসারে যে পুষ্করিণীটি খনিত হইয়াছে, ঐ দিঘির জল সেচন করিয়া প্রায় ১৫/১৬ হাত নীচে ইষ্টক-নির্মিত খিলানের অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে ইষ্টক-নির্মিত অংশ বাহির হইয়াছে তাহার চতুর্দিক খনন করিয়া উহা কি তাহা আবিষ্কৃত হইবার সুযোগ ঘটে নাই। বাঁধান অংশটি প্রস্থে আট ফুট, কিন্তু দৈর্ঘ্য অর্থাৎ, মৃত্তিকাভ্যন্তরে ইহা কত দূর পর্যন্ত প্রোথিত রহিয়াছে তাহা এখনও অজ্ঞাত। কেহ কেহ উহা ঘাটলার উপরকার ছাত বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। খনন-কার্য যদি আর কিছু দূর অগ্রসর হইত তাহা হইলে প্রকৃত-সত্য প্রকাশিত হইত। কিন্তু তাহা আর হয় নাই।

খননে প্রাপ্ত শ্রীমূর্তি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ঃ

এই খননের ফলে যে সকল শ্রীমূর্তি ও প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে, আমরা এখানে তাহার বিবরণ প্রদান করিলাম।

১। **লোকনাথ মূর্তি** ৩"×২", বোধ হয় এই মূর্তিটি স্বর্ণখচিত ছিল। অদ্যাপি স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন দেখা যায়। অতি সুন্দর মূর্তি এই লোকনাথদেবের—ললিতাসনে উপবিষ্ট। দক্ষিণ পদ আসনোপরি বিন্যস্ত। বামপদ পাদপীঠের নিম্নদিকে শতদলাসনের নিম্নভাগে প্রলম্বিত। বামহস্ত দ্বারা দীর্ঘ মৃণাল সংযুক্ত বিকশিত শতদল ধৃত। দক্ষিণহস্তে অভয় বা বরদমুদ্রা। ডক্টর ভট্টশালীর মতে—it is very beautiful miniature. দ্বিভুজ লোকনাথের ধ্যান এইরূপ—

পূর্ববৎ কর্মযোগেন লোকনাথম্ শশিপ্রভম্।
হ্রীকারক্ষররসম্ভূতম্ জটামুকুটমণ্ডিতম্।।
বজ্রধর্ম জটান্তহস্তম্ অশেষ রোগনাশনম্।
বরদম্ দক্ষিণে হস্তে বামে পদ্মধরম্ তথা।।
ললিতাক্ষেপমস্থস্তু মহাসৌম্যম্ প্রভাস্বরম্।
বরদেৎপালকা সৌম্যা তারা দক্ষিণংতং স্থিতা।।

বন্দনাদণঅডহস্তন্তু হয়গ্রীবোথ বামতং।
রক্তবন্নের্মাং মহারৌদ্র ব্যাঘ্রচর্মাম্বর প্রিয়ং।। [সাধনমালা]

২। মৃত্তিকাফলকে খোদিত **বুদ্ধদেবের মূর্তি** ৫"×৩", ইঞ্চি। ভূমিস্পর্শ মুদ্রা। শিখর সংযুক্ত। বজ্রাসন বিহারের [বুদ্ধগয়া] অভ্যন্তরে উপবিষ্ট আছেন, এই মূর্তিতে তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। বুদ্ধদেবের দুই পার্শ্বে দুইটি স্তূপ। আর দক্ষিণে ও বামে আরও ছয়টি ক্ষুদ্র স্তূপ বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান। নিম্নে খোদিত-লিপি "যে ধর্ম হেত প্রভব" ইত্যাদি। এই মৃত্তিকা-ফলক-খোদিত মূর্তি একাদশ শতাব্দী-কালের বলিয়া অনুমিত হয়।

৩। **জম্ভল**—২$\frac{১}{২}$ × ১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি আকারের একটি অতি ক্ষুদ্র মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। জম্ভল-মূর্তি অতি প্রাচীন মূর্তি। "সাধনমালা" হইতে জানা যায় যে, জম্ভল-মূর্তির শীর্ষদেশে "রত্নসম্ভব, অক্ষোভ্য" প্রভৃতি পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ বা বজ্রসত্ত্ব মূর্তি অবস্থিত থাকেন। জম্ভল-মূর্তি গান্ধার, মথুরা, সারনাথ, মগধ, নেপাল এবং বঙ্গদেশে পাওয়া গিয়াছে। আমরা বিক্রমপুরেও জম্ভল-মূর্তি পাইতেছি। জম্ভল বৌদ্ধদের ধন-দেবতা—যেমন হিন্দুদের কুবের। সাধনানুযায়ী—জম্ভল হইবেন স্বর্ণাভ, লম্বোদর, বিল্বফল এবং বামে স্ত্রী নকুল বমন করিতেছে এইরূপ। জম্ভল-মূর্তি ত্রিমুখও হইয়া থাকেন। পাইকপাড়া-দেউলের পূর্বদিকস্থ চৌগাড়া হইতে একটি জম্ভলের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ঐ মূর্তিটির পিছনে "ওঁ-জম্ভল-জলোশায়-স্বাহা।" এইরূপ খোদিত লিপি আছে।[৪]

৪। **প্রজ্ঞাপারমিতা**—হালকা বালু-পাথরের একটি প্রজ্ঞাপারমিতা মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

৫। **বিষ্ণুমূর্তি**—৫ ইঞ্চি পবিমিত।

৬। **বিষ্ণুপট্ট**—চারিখানি বিষ্ণুপট্ট পাওয়া গিয়াছে। ঢাকা যাদুঘরে উহা রক্ষিত আছে। একটির আকার ৫$\frac{১}{২}$ × ৫$\frac{১}{২}$ × $\frac{৪}{৫}$ ইঞ্চি উহাতে নয়টি প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। একদিকে বিষ্ণু-মূর্তি উপবিষ্ট রহিয়াছেন ঐ ভাবে খোদিত, অপর দিকে পরশুরামের পরিবর্তে ত্রিবিক্রম-মূর্তি খোদিত। বামন-মূর্তি আকারের দিকে পা তুলিয়া রহিয়াছেন। এই পট্টটি কালো-কাদার মত প্রস্তর দ্বারা নির্মিত।

৭। **কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্মিত একটি ফলক**—আকার ৪$\frac{৪}{৫}$ × ৪$\frac{৪}{৫}$ × $\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। একটি শিখর মধ্যে দেবী-মূর্তি, উর্ধ্বাংশ ভগ্ন। দশটি দল-বিশিষ্ট শতদল-মধ্যে—১। মৎস্য ; ২। কূর্ম ; ৩। বরাহ ; ৪। নৃসিংহ ; ৫। বামন। বামনের—এক পা উর্ধ্বদিকে সমুখিত ; ৬। পরশুরাম—হস্তে কুঠারের পরিবর্তে গদার মত অস্ত্র ; ৭। রাম ; ৮। বলরাম ; ৯। বুদ্ধ ; ১০। কল্কি। এই ফলকখানির অনেকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রঘুরামপুর খননে যে বিষ্ণুপট এবং খোদিত প্রস্তর-নির্মিত ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার একখানিও অভগ্ন নহে।

৮। **গরুড়-মূর্তি**—রঘুরামপুরের এই খনন দ্বারা কাষ্ঠ-নির্মিত যে গরুড়-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাকে অতুলনীয় শিল্প-বৈভব বলিতে পারা যায়। গরুড়ের যুগ্ম-হস্ত দুইখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত থাকিয়াও এই কাষ্ঠ-নির্মিত গরুড়-মূর্তিটি যেরূপ রহিয়াছে তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য বলিতে হয়। গরুড়ের দৃষ্টি, গরুড়ের উপবেশন-ভঙ্গি, গরুড়ের মস্তকোপরি বিক্ষিপ্ত-কুঞ্চিত কুন্তলরাজি শিল্পীর গঠন-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। গরুড়ের মুখমণ্ডল হাস্যময় অপূর্ব দীপ্তিযুক্ত।

পঞ্চসার গ্রাম-নিবাসী শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়িতেও একটি প্রস্তর-নির্মিত গরুড়-মূর্তি আছে। উহার আকার ২০"।

৯। **বটুকভৈরব**—পোড়া-মাটির তৈয়ারি একটি বটুকভৈরব-মূর্তিও এখানে পাওয়া

গিয়াছে। দেবতার উদরটি বেশ স্ফীত, দীর্ঘ নরকপাল-মালা কণ্ঠে দোলায়মান। চক্ষু দুইটি গোলাকার। ওষ্ঠাধর বিভক্ত এবং বীভৎস হাস্যযুক্ত। চতুর্ভুজ। দক্ষিণদিকের একহস্তে তরবারি, অপরহস্ত ভগ্ন। বামদিকের উর্ধ্বহস্তে ধৃত দণ্ড। উহার উপরের দিকটা ভগ্ন বলিয়া উহা ত্রিশূল কি দণ্ড তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে না। বামদিকের নিম্নহস্তে নরকপাল-পাত্র ধৃত। এই মূর্তি উলঙ্গ নহে—বস্ত্রপরিহিত—কুকুরও নাই। পায়ে কাষ্ঠ-পাদুকাও নাই। মূর্তিটি ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয় ধ্যান-নির্দিষ্ট কোনও কোনও অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। [The figure not naked and does not wear wodden sandals like the Indian Museum Image. The dog is also absent. The smallness of the image is perhaps responsible for some of these omissions]

১০। (ক) গণেশ—২" ইঞ্চি মাত্র উচ্চ। মহারাজ রাজলীলাসনে উপবিষ্ট। মূর্তিখানি ভালই আছে। ইঁদুরটি গণদেবের পদতলে বসিয়া আছে।

(খ) গণেশ—এই ক্ষুদ্র মূর্তিটিও ২"—রঘুরামপুরের মৃত্তিকা খননেই পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটি বিশেষভাবে ক্ষয় পাইয়াছে। নিম্নস্থ দক্ষিণহস্তে একটি মোদক—অন্যান্য হস্তে কি আছে তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

বিক্রমপুরের নানা গ্রাম হইতে আরও অনেক গণেশ-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে মুন্সিগঞ্জের হেরম্বগণেশ-মূর্তিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা স্বর্গত সতীশচন্দ্র মিত্র বলেন—"সেন রাজগণের পূর্বে এতদঞ্চলে মূর্তিদ্বারা গণেশ পূজা ছিল না। ভারতবর্ষের অন্যত্র আবহমান-কাল এই গণেশ-মূর্তির পূজা প্রচলিত আছে। কিন্তু বঙ্গদেশে সেন রাজগণের আমলেই উহা প্রচলিত হয়। আবার সে রাজত্বের শেষেই উহার বিলোপ হইয়াছিল।" ইহা সত্য কিনা বলা যায় না। আমরা এই মূর্তির বিষয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত "সঙ্কল্পের" ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা (১৩২১ সাল ২২৪ পৃষ্ঠা) "বিক্রমপুরে প্রাপ্ত কয়েকটি প্রাচীন শ্রীমূর্তি-পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম। এই অপূর্ব মূর্তিটি রামপালের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। পরে উহা মুন্সিগঞ্জের নিকটবর্তী বৈষ্ণবদেবের একটি আখড়ায় সুরক্ষিত আছে। এই মূর্তির পাঁচটি মুখ। ইহার ধ্যান এইরূপ—

"মুক্তাকাঞ্চননীলকুন্দঘুসৃণচ্ছায়ৈস্ত্রিনেত্রান্বিতৈ
র্নাগাস্যৈর্হরিবাহনং শশিধরং হেরম্বমর্কপ্রভং।
দৃপ্তংদানমভীতিমোদকরদান্ টঙ্কং শিরোক্ষাত্মিকাং
পাশং মুদগরমঙ্কুশং বিশিখকং দোর্ভির্দধানং ভজে।।

আমরা এই মূর্তিটিকে হেরম্ব-গণেশ নামে অভিহিত করিয়াছিলাম। সর্ববিঘ্ননাশন গণপতি নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যেমন, গণেশ, মহাগণেশ, হরিদ্রাগণেশ, বিঘ্নরাজ, লক্ষ্মী, গণপতি, শক্তি, গণেশ, ক্ষিতি, প্রসাধন-গণেশ, বক্রতুণ্ড, হেরম্ব-গণেশ, মহাগণপতি, বিঘ্ন গণপতি, উচ্ছিষ্ট গণপতি ইত্যাদি। এই হেরম্ব-গণেশ মূর্তিটির আকার ৩$\frac{১}{২}$ × ২$\frac{১}{২}$ ফিট। উর্ধ্বে কীর্তিমুখ। কীর্তিমুখের নিম্নভাগে ছয়টি এক শুণ্ড-বিশিষ্ট দ্বিভুজ গণেশ-মূর্তি পদ্মোপরি উপবিষ্টরূপে খোদিত। চালির দুই পার্শ্বে পার্শ্বখোদিত গণেশ-মূর্তি দুইটির নীচে মাল্যহস্তে বিধ্যাধর ও বিদ্যাধরী উপবিষ্ট। এই গণেশ-মূর্তির পঞ্চমুখ পঞ্চ শুণ্ডযুক্ত। প্রত্যেক বদনে তিনটি নয়ন। হস্তে ধ্যানানুমোদিত দ্রব্যাদি সংরক্ষিত। ইহার দক্ষিণদিকের প্রথম হস্তে মুদ্রা, দ্বিতীয় হস্তে অঙ্কুশ, তৃতীয় হস্তে অক্ষমালা, চতুর্থ হস্তে অভয় (মুদ্রা) ; বাম দিকের প্রথম হস্তে দন্ত, দ্বিতীয় হস্তে অঙ্কুশ, তৃতীয় হস্তে অক্ষমালা, চতুর্থ হস্তে অভয় (মুদ্রা) ; বাম দিকের প্রথম হস্তে দন্ত, দ্বিতীয় হস্তে টঙ্ক, তৃতীয় হস্তে ত্রিশূল এবং চতুর্থ হস্তে মোদক। ইনি ত্রিনয়ন,

সিংহের উপর ললিতাসনে আসীন। সারদা-তিলক তন্ত্রের সহিত এই মূর্তির ধ্যান শ্বেহ মিলিয়া যায়। প্রত্যেক গজেন্দ্রবদনে এক একটি দন্ত। 'মৎস্যপুরাণ', 'অগ্নি পুরাণ', হেমাদ্রি এবং সারদা-তিলক গ্রন্থে গণেশের ধ্যান ও বর্ণনা অতি বিস্তৃতভাবে আছে। বিক্রমপুরে বহু গণেশ-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। নটরাজ গণেশ-মূর্তিও বিক্রমপুরে কয়েকটি আছে। ইহা হইতেও মনে হয় যে, বিক্রমপুরের সেন রাজগণের প্রভাব বিশেষ ভাবে এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

রামপালের অনতিদূরবর্তী গ্রাম রানীহাটি হইতে যে সকল মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যেও একটি নটরাজ গণেশ-মূর্তি আছে—সে বহু বৎসর পূর্বের কথা। এই গণেশ-মূর্তিটি আউটসাহি গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ গুপ্তের বাড়িতে আছে। তাহারও কতকটা ভগ্ন। আকার ২ফিট ৮"×১ ফিট ৭"। ঊর্ধ্বে কীর্তিমুখের পরিবর্তে পঞ্চ আম্র ফল ও পঞ্চ আম্রপাত্র।[৫]

১১। **লিঙ্গ**—লিঙ্গ এবং গৌরীপট্ট—সেই অতি আদি যুগ হইতেই ঐ লিঙ্গ-পূজা চলিয়া আসিতেছে। রঘুরামপুর হইতে—লিঙ্গ ও গৌরীপট্ট-সংযুক্ত দুইটি লিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে। (ক) লিঙ্গের নিম্নভাগ কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরে খোদিত। ৩"। (খ) লিঙ্গের নিম্নভাগ ১"। দ্বিপাড়া গ্রামের অতি প্রাচীন পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গটি ও বেজগাঁ গ্রামের শিবলিঙ্গটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১২। **সূর্য-মূর্তি**—একটি অতি সুন্দর সূর্য-মূর্তিও রঘুরামপুর হইতে পাওয়া গিয়াছে। ৪' ২" × ১' ১১"। এই মূর্তির উপরে কীর্তিমুখ আছে। অরুণ-মূর্তির নীচে নাগনাথ।

১৩। **চামুণ্ডা**—কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিত এই চামুণ্ডা মূর্তিটির আকার—বর্তমানে যেরূপ আছে তাহা ৩"×৪"। দাড়িওয়ালা। এক শবোপরি দেবী চামুণ্ডা উপবিষ্টা। সম্ভবত দেবীর চারিখানি হাত ছিল। উপরিস্থিত দুইখানি হাত মাত্র আছে। দক্ষিণ হস্তে একখানি ছুরি, বাম হস্তখানি হাঁটুর উপর ন্যস্ত। একটা শৃগাল শবের দক্ষিণ-ভাগ দংশন করিতেছে।

১৪। **মনসা**—একসময়ে মনসাপূজা বিশেষভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই বহু মনসাদেবীর মূর্তি, মনসার-ঘাট ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। বিক্রমপুরের নানা গ্রাম হইতে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্মিত মনসামূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ডক্টর ভট্টশালী মহাশয়ের মতে—"The large numhber of Stone images of Manasa of the 10th—12th century, that have been found throughtout Bengal-testify to the established character of her cult during the period." রঘুরামপুরের এই খনন হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মনসার-ঘট, বিভিন্ন কলস ও ঘটের গায়ে সর্পাঙ্কিত এইরূপ অনেক কিছু পাওয়া গিয়াছে। আমার সংগৃহীত কোরহাটির মনসা-মূর্তির চিত্র 'ঢাকার ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। এই মূর্তিটি এখন ফরিদপুর জেলার কোনও গ্রামে উহার মালিকের সহিত স্থানান্তরিত হইয়াছে।

রঘুরামপুরের খননে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির মধ্যে পিতলের নির্মিত একটি প্রদীপাধারও উল্লেখযোগ্য। চারিটি মাটির কলস, ইহাদের গাত্রে অঙ্কিত চিত্রের রঙ এখনও আবিকৃত রহিয়াছে। একটি মৃত্তিকা-নির্মিত ও অপর একটি প্রস্তর-নির্মিত সম্পুটক। প্রস্তর-নির্মিত সম্পুটকটির আকার ৪"×৩"। লৌহ-নির্মিত ক্ষেপনি, ২' ৮"। হস্তীদন্ত-নির্মিত পাশার গুটি। ঐ গুটির যে চিহ্ন রহিয়াছে তাহা বর্তমানকালের মত নহে। লোহার চিমটা ৪" কাঁসার থালা। উহার বেড় ১' ৩"।

রঘুরামপুরের খননের কথা বলিলাম। এইবার রামপালের অন্তর্গত স্থান-সমূহে আরও যে-সমুদয় প্রত্ন-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে যে-সকলের কথা বলিতেছি।

রামপালের নিকটবর্তী দেউলবাড়ি ঃ

দেউলবাড়ি বলিতে যে দেবালয় বুঝায় তাহা আমরা বহু স্থানে উল্লেখ করিয়াছি।

রামপালের নিকটবর্তী স্থান-সমূহ ঘিরিয়াই দেউলবাড়িগুলি বিদ্যমান। দেউলবাড়িগুলির সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে।

ধীপুরের দেউল খনন ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ ঃ

টংগিবাড়ি থানার অন্তর্গত ধীপুর গ্রাম। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে মাটি তুলিতে যাইবার সময় সমান্তরাল ভাবে দুইটি প্রাচীরের চিহ্ন আবিষ্কৃত হওয়ায় ইতিহাসানুরাগী অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ শ্রীযুক্ত জগন্মোহন সরকার মহাশয় ঢাকা মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষকে উহা খনন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র দেন। ঢাকা যাদুঘরের কর্তৃপক্ষ খনন-কার্যের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন এবং খনন-কার্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুসম্পন্ন করিবার ভার ঢাকা যাদুঘরের কৃতী অধ্যক্ষ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডক্টর ভট্টশালী মহোদয়ের উপর সমর্পিত হয়। তিনি ধীপুর দেউলের খনন-কার্য ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আরম্ভ করিয়া ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাহার এই খননে তিনটি চতুষ্কোণ অট্টালিকার চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়। অট্টালিকা তিনটি পাশাপাশিভাবে সন্নিবেশিত ছিল এবং দীর্ঘ প্রাচীরও দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

অর্থাভাবে উক্ত কার্য কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ঐ দালানের একটির মধ্যে একটি নর-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। কঙ্কালটি উত্তর-দক্ষিণ দিকে লম্বমানভাবে শায়িত ছিল। আর একটি দালানের মধ্য হইতে দুইটি 'জালা', মৃত্তিকা-নির্মিত সুবৃহৎপাত্র পাওয়া যায়। জালা দুইটি খালি ছিল। দেউলের নিকটবর্তী পুষ্করিণী হইতে—প্রস্তর-মূর্তির পাদপীঠ, খোদিত কাষ্ঠ ও কতকগুলি কড়ি পাওয়া যায়। এ-সমুদয় দ্রব্যাদি বর্তমানে ঢাকা যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

রামপালের নিকটবর্তী স্থান-সমূহের দেউলবাড়ি, খালের পাড়, প্রাচীন পুষ্করিণী, ডোবা, গড়, খাদ ইত্যাদি খনন করিয়াই বিবিধ দেবমূর্তি পাওয়া যাইতেছে। আমি এ বিষয়ে বহু পূর্বে নানা প্রবন্ধেও আলোচনা করিয়াছি যে, শ্রীবিক্রমপুর ও রামপাল অঞ্চলের চারিদিকটা যদি খনিত হইত তাহা হইলে প্রাচীনের অনেক কীর্তি গৌরবমণ্ডিত প্রত্ন-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইত। কে রামপালের নিকটবর্তী স্থানসমূহের খনন কার্য করিবে? কোনও দেউলবাড়িই আজ পর্যন্ত যথোপযুক্ত ভাবে খনিত হয় নাই।

১। **সোনারঙে দেউল**—রামপালের অদূরেই সোনারঙের দেউল অবস্থিত। এই দেউলের নিকটে একটি বৃহদাকার সূর্য-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এবং উহা উক্ত গ্রামের মুন্সিবাড়ির দিঘির পাড়ের মন্দির-প্রাচীরের সহিত গ্রথিত আছে। এই মঠ দুইটি দেউলবাড়ির অল্প পশ্চিমেই অবস্থিত। দেউলবাড়ির উত্তরভাগের দিঘির মধ্য হইতে গ্রানাইট প্রস্তর গঠিত একটি প্রস্তর-স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল, উহার আকার ১৭"— উচ্চ। উহার নিকটবর্তী গ্রাম হইতেও অনেক কিছু পাওয়া গিয়াছে। একটি গণমূর্তি-সম্বলিত প্রস্তর খণ্ডও উল্লেখযোগ্য। সোনারঙ গ্রামে দুইটি দেউলবাড়ি আছে। একটি গ্রামের পূর্বদিকে অপরটি গ্রামের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। সোনারঙের পূর্বদিকস্থ দেউলবাড়ি হইতেও বহুদিন পূর্বে একখানি বৃহৎ প্রস্তর পাওয়া গিয়াছিল।

দ্বাদশ-ভুজ অবলোকিতেশ্বর-মূর্তি ঃ

সোনারঙ গ্রামের দেউলে দ্বাদশ-ভুজ অবলোকিতেশ্বর মূর্তিটি পাওয়া গিয়াছিল। ঐ মূর্তিটি আমি সোনারঙ গোঁসাইবাড়ি হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এই মূর্তিটির বিস্তৃত পরিচয় 'প্রবাসী' পত্রিকায় কার্তিক, ১৩১৬, ৯ম ভাগ ৭ম সংখ্যায় "বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর-মূর্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম এবং "বিক্রমপুরের ইতিহাস" প্রথম সংস্করণেও এই মূর্তির উল্লেখ করিয়াছি এবং পরিশিষ্টেও তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছিল।

অবলোকিতেশ্বর লোকনাথ মূর্তিগুলি দুই হাত, চারি হাত, ছয় হাত, দশ হাত, বারো হাত এমনকি সময় সময় সহজ-হস্ত-সমন্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও অবলোকিতেশ্বর তিন বা একাদশ শীর্ষ-বিশিষ্ট। অবলোকিতেশ্বর সাধারণত বিষ্ণুর ন্যায় মানবের শোক-দুঃখ মোচনার্থ বোধিসত্ত্বের অবতাররূপে অর্চিত হইয়া থাকেন। যুয়নচয়ঙের ভ্রমণ-কাহিনী পাঠে জ্ঞাত হই যে, তিনি অবলোকিতেশ্বর দেবকে পুষ্পগুচ্ছ অর্পণ করিয়াছিলেন। অবলোকিতেশ্বরের মূল মন্ত্র "ওঁ মণিপদ্মে ওঁ" এবং বীজমন্ত্র হ্রী, ইহা হৃদয় শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। অবলোকিতেশ্বর সাধারণত "মহাকরুণা" এবং 'পদ্মপাণি' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মূর্তি অর্চনা ও অভ্যুদয় কোনও সময়ে বৌদ্ধধর্মে প্রথম প্রবেশ লাভ করে, সে সময়ের নির্ণয় এখনও পর্যন্ত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম-প্লাবিত বিক্রমপুরে অবলোকিতেশ্বর মূর্তিটি পাওয়ায় তেমন বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই।

২। **নাটেশ্বরের দেউল**—এই দেউলবাড়ি হইতেও অনেক মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই দেউলবাড়িটি আমরা পূর্বে উচ্চস্তূপ রূপে দেখিতে পাইয়াছি।

৩। **জোড়া দেউল।**

৪। **পাইকপাড়ার দেউল।**

৫। **খিলপাড়ার দেউল।**

৬। **সোনারঙের দেউল।**

৭। **ধীপুরের দেউল**—প্রভৃতির খনন-কার্য সুসম্পন্ন হইলে অনেক কিছু প্রাচীন কীর্তি-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইতে পারে। ১৩১৮ সালের বৈশাখ মাসে জোরার দেউলের সংলগ্ন একটি রাস্তার পার্শ্বের মাটি খুঁড়িয়া একখানা প্রকাণ্ড প্রস্তর পাওয়া গিয়াছিল। উহা দৈর্ঘ্যে ১১ ফুট, প্রস্থে ২"—৮" দুই ফুট আট ইঞ্চি পুরু। দেখিলে মনে হয় যে, এই বৃহৎ প্রস্তরখানিকে বাঁটালির সাহায্যে চাঁচিয়া পাতলা করা হইয়াছে। বাঁটালির দাগগুলি এখনও স্পষ্ট রহিয়াছে।

শ্রীবিক্রমপুর ও রামপালের প্রাচীনত্ব ঃ

রামপাল বা শ্রীবিক্রমপুর ডক্টর ভট্টশালী মহাশয়ের মতে ৭০০ বৎসরের প্রাচীন নগরী, [Rampal, or Sri Vikrampur was a city about 700 years ago] আমরা তাহার মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না। শ্রীবিক্রমপুর নগরীর মৃত্তিকা পরীক্ষায় এবং শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন যদি দশম শতাব্দীর বলিয়া ধরা যায়, [পণ্ডিতগণের মতানুযায়ী] তাহা হইলে শ্রীবিক্রমপুরের বয়স প্রায় ১০০০ বৎসর হইবে। আমাদের মনে হয় সাভার ও শ্রীবিক্রমপুর এবং তৎ-সংলগ্ন স্থানসমূহ একই সময়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল। শ্রীবিক্রমপুরের মৃত্তিকাভ্যন্তরে এখনও কত কি প্রাচীন কীর্তি গুপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহার কতটুকুই বা আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১]

রামপাল ও তন্নিকটবর্তী স্থান হইতে যে সকল দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া হইল।

কাষ্ঠ-নির্মিত স্তম্ভ ঃ

রামপাল হইতে কারুকার্য-শোভিত কাষ্ঠ-নির্মিত দুইটি স্তম্ভ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামপালের বিখ্যাত দিঘির দক্ষিণ ভাগ হইতে এই কাষ্ঠ-স্তম্ভ দুইটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্তম্ভ-দুইটি সেখ আবদুল গণি এবং আবদুল রহমান প্রাপ্ত হইয়া ঢাকা যাদুঘরে উপহার দিয়াছেন। এই স্তম্ভ দুইটি ৯' ৫" × ১১" × ১১" পরিমিত। এই স্তম্ভ দুইটির গাত্রে বিবিধ মূর্তি খোদিত আছে। একটি স্তম্ভে দেখা যাইতেছে—এক দেবী-মূর্তি। দেবী তরবারির দ্বারা একজন দৈত্যকে বধ করিতেছেন। অপর স্তম্ভে—একটি বৃক্ষের নীচে বিষণ্ণ-বদনে সম্ভবত

একজন রাজপুত্র বসিয়া আছেন, তাহার তীর-ধনুক মাটিতে পড়িয়া আছে। একটি উট, এক জন ঋষি ও মৃগির যৌনমিলন-দৃশ্য ইত্যাদি খোদিত। রাজপুত্র সম্ভবত মহাভারতের নৃপতি পাণ্ডু।[৬]

গণদেব-মূর্তি নিম্নভাগে খোদিত রহিয়াছে। দ্বিতীয় স্তম্ভটির গাত্রে খোদিত—কীর্তিমুখ, নৃত্যপরায়ণা নারী-মূর্তি, দুইটি নারীমূর্তি পাখির দিকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িতেছেন।

নাটেশ্বর দেউলের কাঠের চৌকাঠ ঃ

নাটেশ্বর দেউল-বাড়ির সংলগ্ন একটি প্রাচীন পুষ্করিণীর কাদামাটির নিম্নভাগ হইতে কাঠের চৌকাঠ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১০" ১০" × ৮" × ৯"। উর্ধ্বাংশের দিকটা চওড়া হইবে ৮' ৭"। কারুকার্যের মধ্যে তেমন কোনও বিশেষত্ব নাই। রামপাল ও তাহার উপকণ্ঠ সম্পর্কে, সত্য-সত্যই—"কত রত্ন বিলুণ্ঠিত চরণ তলে" বলা যাইতে পারে।

বল্লাল-বাড়ি ঃ

আমি যখন প্রথম রামপাল দেখিয়াছিলাম আমার বয়স ছিল মাত্র নয় বৎসর। আমার মাতামহীর মুখে রামপাল সম্পর্কে অপূর্ব রোমাঞ্চকর কথা শুনিয়াই সেই বাল্যকালে আমাকে রামপাল দেখিবার জন্য প্রলুব্ধ করিয়াছিল। আমার মনে পড়িতেছে, আমার বাল্যবন্ধু শিমুলিয়া-নিবাসী শ্রীকামাখ্যামোহন গুপ্ত আমাকে রামপাল দেখাইতে সঙ্গে করিয়া লইয়াছিলেন। তখন সে প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে যে জঙ্গলাকীর্ণ, স্তূপীকৃত ইষ্টকরাজি, বিক্ষিপ্ত বিরল বসতি—যে রামপাল দেখিয়াছিলাম, সে রামপাল কি এখনও তেমনি থাকিতে পারে? তখন বাবা আদমের মসজিদটি ছিল জঙ্গলের মধ্যে আর তাহার ছিল ভগ্ন জীর্ণ অবস্থা। এমনিভাবে বল্লাল-বাড়ি, অগ্নিকুণ্ড, মিঠাপুকুর ইত্যাদি নানা দর্শনীয়-স্থান দেখিতে যেরূপ ভয়ের সহিত অগ্রসর হইতে হইয়াছিল—এখনকার জনবহুল রামপালের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না, এবং বর্তমানের তরুণ বিক্রমপুরবাসীদের কাছে তাহা স্বপ্ন বলিয়াই মনে হইবে। কানিংহাম বলেন ;—

"Bikrampur was the residence of the early Sena Rajas before the *aggrandisement of the family by the conquest of Barendra and Rarh.* The site *of the old capital is still pointed out near the great lake of Rampal Dighi,* to the north of which is the Ballalbari, or place of Ballal Sen. To this place the Hindu Raja retired on the invasion of the muhammadans and the consequeut capture of his chief cities of Gaur and Nadiya. The people of the country know only the one name of Ballal Sen, who they say was the opponent of the Musalman invaders. According to Taranath this King was named Lava Śema, While the Muhammandan historians call him Lakhmaniya. But his true nome was most probably the same as that of his grand-father Lakhmana Sena, and as this is frequently pronounced Lakhan Sen, I believe that it is really the Same name as the Lava Sen of Taranath. Ballal Sen was the great aggrandiser of the family, to whom several places are attributed, as well as the foundation of the famous city of Gour. The place of Ballal-Bari at Bikrampur was quite sufficient to preserve the name of Ballal, while the name of Lakshmana, having been forgotten, all the events of consequence on the history of the Senas would naturally be referred to the family."

প্রায় শতবর্ষ পূর্বের রামপালের বর্ণনা ; খিড়কির দ্বার ঃ

বল্লালবাড়ি—এই কথাটি হইতেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এখানে নৃপতি বল্লালসেনের বাড়ি ছিল। অদ্যাপি ইহার প্রাচীন চিহ্ন বিদ্যমান আছে। যদিও কোনও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ উপরে নাই, তথাপি ইহার চারিদিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলে চতুঃপার্শ্বস্থ প্রায় ২০০ শত ফিট প্রশস্ত পরিখা ইত্যাদি দেখিলে বিশাল রাজবাড়ির গৌরব উপলব্ধি হইয়া থাকে। রাজবাড়ির পরিমাণ ৭৫০"×৭৫০" ফিট। এই স্থানের চতুর্দিক বেড়িয়া ২০০ শত ফিট প্রশস্ত পরিখার চিহ্ন আজিও বর্তমান আছে। ১২৭৪ সাল, ইংরেজি ১৮৬৭ সালে—সে প্রায় আশি বৎসর বা অনায়াসে শতবর্ষ পূর্বে বল্লাল-বাড়ি কিরূপ ছিল তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম—"বল্লালসেন রামপালে বাস করিবার নিমিত্ত বৃহৎ এক অন্তঃ-পুরিকা নির্মাণ করিয়াছিলেন। উহা ন্যূনাধিক ছয় হাজার হস্ত দীর্ঘ ও ৮ শত হস্ত বিস্তৃত বৃহৎ এক পরিখায় পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। ঐ স্থান বল্লালবাড়ি নামে খ্যাত। ঐ স্থানেই মহারাজের আবাস-বাটি ছিল। অধুনা তথায় ইষ্টকালের চিহ্নমাত্র নাই। মৃত্তিকার নীচে ইষ্টকাদি থাকিবার সম্ভাবনা। বল্লাল-বাড়ির পূর্বদিকে যে বৃহৎ এক খিড়কির দ্বার ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অধুনা তথায় কতিপয় মুসলমান বসতি করে। উহা রাজধানী বলিয়া গভর্নমেন্ট তাহার কর গ্রহণ করেন না।"

পরিখার অবস্থা ঃ

"উপরে যে পরিখার কথা উল্লেখ করা হইল উহা এক্ষণে প্রায় শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার মধ্যস্থলে এক হাত কি অর্ধ-হস্ত স্থানে কিঞ্চিৎ জল দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষকেরা তাহাতে বোরোধান রোপণ করিয়া থাকে।"

বল্লাল-বাড়ির বহির্বাটি ঃ

"বল্লাল-বাড়ির দক্ষিণপার্শ্বে বৃহৎ এক স্থান বিদ্যমান আছে, উহা বল্লালসেনের বহির্বাটি বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। উল্লিখিত বাহির বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বৃহৎ একটি গজারি বৃক্ষ অবস্থিত আছে, লোকে তাহাকে বল্লালের হস্তী-বন্ধনের স্তম্ভ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।"

"এরূপ কিংবদন্তী যে, উক্ত গজারি গাছটি পূর্বে মৃতাবস্থায় ছিল, ঋষিগণ অমর বর দেওয়াতে উহা সঞ্জীবিত হইয়াছে। এ বিষয়ে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।"[৭]

বল্লাল-বাড়ির দক্ষিণদিকের দক্ষিণভাগের পরিখার নিকটবর্তী ছোট একটি পুকুর হইতে একখানি অতি সুন্দর নটরাজ মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেনরাজারা শৈব ছিলেন, তৎ-সম্বন্ধে আমরা পূর্বে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। কাজেই হয়ত রাজধানীর অন্তর্গত কোনও দেব-মন্দিরে এক সময়ে এই নটরাজ দেবের মূর্তিখানি প্রতিষ্ঠাপিত ছিল এবং সেনরাজারা ভক্তিভরে তাহার অর্চনা করিতেন।[৮]

বিক্রমপুরের নানা গ্রাম হইতে অনেক নটরাজ-শিব পাওয়া গিয়াছে। আমি নটরাজ-শিব সম্বন্ধে 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন', 'ভারতবর্ষ' 'সঙ্কল্প এবং' অন্যান্য বিখ্যাত মাসিক পত্রিকাতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।[৯]

মীরকাদিমের খালের পূর্বদিকে নাটেশ্বরের প্রকাণ্ড দেউল বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি যখন উহা প্রথম দেখিয়াছিলাম, তখন উহা ইষ্টক-পরিপূর্ণ একটি বিরাট স্তূপের মত দেখিয়াছিলাম। এখন উহার সে অবস্থা নাই। 'নাটেশ্বর' নাম হইতেই এইরূপ অনুমিত হয় যে, এই দেউল বা দেবালয়টিতে খুব সম্ভব নটরাজ মূর্তি প্রতিষ্ঠাপিত ছিলেন। কিন্তু উহার ভিতর হইতে আজ পর্যন্তও কোনও নটরাজ বা নটেশ-মূর্তি আবিষ্কৃত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন—"এই

দেউলটি বৈষ্ণব বর্মরাজগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হয় এবং সেনরাজগণ কর্তৃক শৈব দেউলে পরিণত হয়। এই দেউলের অল্প দূরেই সোনারঙের দেউল বিদ্যমান। দেউলটি বেশ বড়। ঐ দেউলের পূর্বভাগ এখনও সিংহদরজা নামে পরিচিত। ঐ সিংহদরজার সম্মুখেই মেদিনীমণ্ডলের দিঘি। এই দিঘিটি বেশ বৃহদাকার। এই দিঘি ও সিংহদরজার মধ্যবর্তী স্থানটুকুকে লোকে এখনও লুড়াইতলি বলে। রাস্তা দিয়া যাইবার সময় প্রত্যেক পথিক খড়কুঠা দিয়া একটা লুড়া বানাইয়া সময় সময় অগ্নি দিয়া এবং অনেক সময় তাহা অগ্নি সংযুক্ত না করিয়াই দেউলের উদ্দেশে লুড়া বানাইয়া এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে নিক্ষেপ করিয়া যায়, এই প্রথাটি এখনও বিদ্যমান আছে। ইহা সূর্যপূজার স্মৃতি বলিয়া মনে হয়।" বিক্রমপুরের বহু গ্রামেই লুড়াইতলি আছে। এ বিষয়ে মৎ-সম্পাদিত 'বিক্রমপুর' পত্রে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছিল।

আমরা পূর্বেই একথা বলিয়াছি যে, চন্দ্র-বর্ম-সেন প্রভৃতি বিভিন্ন রাজাদের রাজধানী রামপালের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থান ব্যাপিয়া বিদ্যমান ছিল। আমরা প্রথম বল্লালবাড়ি যেমন দেখিয়াছিলাম এবং শতবর্ষ পূর্বে উহা যেমন ছিল, এখন যদি কেহ ঠিক তেমনি ভাবে দেখিতে পাইবেন বলিয়া মনে করেন, তবে তাহা সম্পূর্ণ ভুল হইবে। পূর্বে দিল্লি যেমন দেখিয়াছি নতুন দিল্লির পর তাহার কত কি রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রায় শতবর্ষ পূর্বের বল্লালবাড়িতে চৌগাড়ার অন্ত ছিল না। "তত্রস্থ সুগভীর চৌগাড়া-সকল সন্দর্শন করিলে ভয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।" অধুনা ইহার অনেকানেক স্থান মৃত্তিকায় ভরাট হইয়াছে। কৃষকেরা তাহাতে নানাপ্রকার শস্য রোপণ করিয়া থাকে। রামপাল অতি উচ্চ ও উবরা ভূমি। সেখানে নানাবিধ শস্য উৎপাদিত হইয়া থাকে। * * * এখানে তেঁতুল ও শিমূল তুলা অনেক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।"

রামপালের বা কাচ্‌কির দরজা ঃ

বল্লাল-বাড়ি ও রামপালের দিঘির পশ্চিম পাড় হইতে যে সুপ্রশস্ত রাজপথ উত্তরে ধলেশ্বরী নদীর তীর হইতে দক্ষিণে পদ্মা বা কীর্তিনাশা নদী পর্যন্ত গিয়াছে, উহার নাম কাচ্‌কির দরজা।" রামপালের দিঘির পশ্চিম পাড় দিয়া উত্তরে ধলেশ্বরী নদীর খাড়ি (রিকাবিবাজারের খাড়ির সম্মুখস্থ গুদারাঘাট) হইতে প্রায় সরলভাবে দক্ষিণাভিমুখে রাজাবাড়ি থানা পর্যন্ত বৃহৎ একটি রাজপথ সোজা দেখিতে পাওয়া যায়। উহার নাম রামপালের দরজা। উক্ত দরজার পরিসর অন্যূন ৪০ হাত হইবে।" আমরা শতবর্ষ পূর্বে রামপাল ও তাহার এই পথের অবস্থা কিরূপ ছিল, সে বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া আর এখানে উল্লেখ করিলাম না।

এই রামপালের দরজা আমরা দক্ষিণ দিকে ২০০/২৫০ হাত প্রশস্তও দেখিয়াছি, কৃষকেরা উহা জমির চাষ-আবাদের সঙ্গে সঙ্গে আত্মসাৎ করিয়া উহাকে খর্বাকার করিয়া তুলিয়াছে। কিছুদিন পরে উহার চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। এই রামপালের দরজা হইতে আরও অনেক রাস্তা চারিদিকে বাহির হইয়া গিয়াছিল। এখন ঐ সমুদয় রাজপথ ডিস্ট্রিক্টবোর্ড ও লোকালবোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতির রাস্তার সহিত মিলিয়া গিয়াছে। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে Main Circuit Map-এ উত্তরদিকের পথের দিকটা 'কপাল দুয়ার' নামে পরিচিত ছিল। [In the Main Circuit Map of 1859, a place on its northern end is designated Kapal Duar and this may have been also the name by which the northern end of the road was known.]

মিঠাপুকুর ঃ

বল্লালবাড়ির ঠিক মধ্যস্থলে **মিঠাপুকুরটি** অবস্থিত। মিঠাপুকুরের পার্শ্বেই **অগ্নিকুণ্ড।** বল্লালসেন বাবা আদম নামক ফকিরের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন এইরূপ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া বল্লালসেনের শুদ্ধান্তঃপুরবাসিনীগণ অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করেন, সেইজন্য ইহার নাম অগ্নিকুণ্ড। অগ্নিকুণ্ড একটি সুগভীর গর্ত বিশেষ। এখানে একসময় প্রায় বারোমাস জল থাকিত। আমি প্রথম যেবার রামপাল দেখিতে যাই, তখন আমাদের পথ-প্রদর্শক কৃষক একটি কোদালি দ্বারা খনন করিয়া উহা হইতে প্রচুর-পরিমাণে কয়লা বাহির করিয়াছিল, আমি সে সময়ে তাহার কিছু সংগ্রহও করিয়াছিলাম। আমরা সেস্থানে বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে পারি নাই, কেননা সেখান হইতে এত অধিক পরিমাণে "জুঁইয়া" নামক একপ্রকার বিষাক্ত কৃষ্ণবর্ণের পিপীলিকা নির্গত হইয়াছিল যে, তথায় দাঁড়াইয়া থাকাই ক্লেশকর হইয়াছিল। কাজেই ওই স্থানে একসময়ে কোনওরূপ একটা বড় রকমের শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

এ বিষয়ে যে কিংবদন্তী বা কাহিনীটি প্রচলিত তাহা "বল্লালচরিতম্" নামক গ্রন্থে আছে। "বল্লালচরিতম্" নামে দুইখানি সংস্কৃত পদ্য-গ্রন্থ আছে। উহার একখানি আনন্দভট্ট কর্তৃক খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে বিরচিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থে বল্লালসেনের রাজধানী গৌড়, বিক্রমপুর ও স্বর্ণগ্রামে বলিয়া লিখিত আছে। আর একখানি "বল্লালচরিতম্" গ্রন্থ উহা গোপালভট্ট কর্তৃক বিরচিত এবং তাহার বংশধর আনন্দভট্ট লিখিত পরিশিষ্ট সংবলিত এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বল্লালচরিতে এইরূপ উপাখ্যান আছে যে, দ্বিতীয় বল্লালসেন বাবা আদমের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবার সময় সঙ্গে একটি সংবাদবাহী পারাবত লইয়া গিয়াছিলেন এবং বলিয়া গিয়াছিলেন যে, যদি পারাবতটি প্রত্যাবর্তন করে তাহা হইলে পুরবাসিনীগণ বুঝিবেন যে, তিনি যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, সুতরাং, তাহারাও যেন অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করিয়া নিজ সম্ভ্রম ও মান রক্ষা করেন। দৈবের বিচিত্র লীলা। বল্লাল রণে জয়ী হইয়া শোণিত-সিক্ত কলেবর ধৌত করিবার জন্য যেমন নদী-জলে অবতরণ করিয়াছেন, অমনি পারাবতটি উড়িয়া আসিয়া রাজবাড়িতে পৌঁছে, রানী ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকাগণ আত্মবিসর্জন করিলেন।

এ বিষয়ে সুধী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত আমরা এক মত—

"এ দেশে বেদব্যাসের আমল হইতে সাধারণত যে ভাবে ইতিহাস রচিত হইয়া আসিয়াছে বল্লাল-চরিত দুখানাতেও তাহার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। উপরন্তু আমরা এখানে কয়েকটি তারিখ পাইতেছি যাহার কোনওটির সহিত কোনওটির মিল নাই। আনন্দভট্ট কৃত বল্লাল-চরিতের মতে বল্লালসেন ১০২৮ শকে প্রাণত্যাগ করেন, কিন্তু অন্য বল্লাল-চরিতের মতে স্বয়ং বল্লালের আদেশে তাহার গৃহশিক্ষক গোপালভট্ট ১৩০০ শকে তাহার বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন এবং আনন্দভট্ট ১৫০০ শকে তাহার পরিশিষ্ট যোগ করিয়া দিয়াছেন। আনন্দভট্টের নিজের বল্লাল-চরিত কিন্তু ১৪৩২ শকে লিখিত। ঐতিহাসিক গবেষণায় বল্লালসেনের রাজত্বের যে কাল নির্ণীত হইয়াছে, তাহা ১১০৬ খ্রিস্টাব্দের বহু পরে এবং ১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দের বহু পূর্বে।

"আবার বায়াদুম্ব বা বাবা আদমের সমাধি ও তাহার স্মরণার্থ মসজিদ এখনও সশরীরে রামপাল হইতে কিছু দূরে বর্তমান। এই মসজিদের উপর উৎকীর্ণলিপিতে দেখা যায়, ইহা খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে নির্মিত।"

'নহ্য মূলা জনশ্রুতি—এইরূপ একটা কথা আছে। জনশ্রুতি এক মূল সাধিতে পারে, কিন্তু সেই মূলকে বিকৃত আকারে বিপথে লইয়া যাওয়াও জনশ্রুতির একটি কার্য।"

"প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ বল্লালসেন যে এইভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই তাহা সুনিশ্চিত। ১১০৬ খ্রিস্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয় নাই এবং তাহার সময়ে বঙ্গদেশে মুসলমানগণ

এতটা বিক্রান্ত হয় নাই যে, হঠাৎ রামপাল রাজধানীতে আসিয়া বঙ্গেশ্বরের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারে। যে দেশে রাজার সমকালে ইতিহাস রচিত হয় না সেখানে পরবর্তীকালে নানা কাহিনী ও কিংবতন্তী স্তূপীকৃত হইয়া ঘটনাগুলিকে বিকৃত আকারে উপস্থিত করে। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন সম্বন্ধে এইরূপ ঘটনা অসম্ভব বলিয়া এবং কিংবদন্তী খুব প্রবল বলিয়া কোনও কোনও লেখক পরবর্তীকালের দ্বিতীয় বল্লালসেন নামক এক রাজার উপর এই অগ্নিকাণ্ডঘটিত ব্যাপার চাপাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু যেখানে ইতিহাস এত বিকৃত, সেখানে এরূপ কিছু করিয়া থাকিলে, রাজার নামটাই যে বিকৃত হয় নাই এ কথা কে বলিতে পারে? বল্লালসেন বড় রাজা ছিলেন বলিয়া অনেক ক্ষুদ্র রাজার ক্ষুদ্র কার্য তাহার উপর আরোপিত হওয়া খুবই সম্ভব। লক্ষ্মণসেনের পরও পূর্ববঙ্গ অনেককাল পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। হয়ত কোনও পরবর্তী রাজার সাহায্যে রাজপুতানার সুপরিচিত জহরব্রত বিক্রমপুরে ক্ষুদ্র আকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সমসাময়িক ইতিহাস সে সম্বন্ধে নীরব থাকায় পরবর্তীকালে বল্লালসেনের উপর সমগ্র ঘটনাটি চাপাইয়া দেওয়া কিছু অসম্ভব নহে।'

কপোতের পলায়ন ও তদৃষ্টে পুরমহিলাগণের অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন এদেশে এত অধিক স্থানে রাজাদিকের প্রাণত্যাগের কাহিনীর সহিত জড়িত যে, ঐতিহাসিক এইসব কাহিনী গ্রহণ করিতে একটু অতিরিক্ত সাবধান হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। আমরা দশরথ দনুজমাধবের বিষয় পূর্বে বলিয়াছি। বিশ্বেশ্বর বাবু বলেন—'ইনিই মুসলমান ঐতিহাসিকের দনৌজা বা নুজ্যা। বিক্রমপুরে যদি মুসলমানের ভয়ে জহরব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সম্ভবত উহা তাহারও পরে।" গিয়াসউদ্দিন বলবন [১২৬৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দ] যখন দিল্লির সম্রাট তখন ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শাসনকর্তা তুগ্রিল খাঁ বিদ্রোহী হন। সে সময়ে দশরথ দনুজমাধব বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন। বলবন তাহার সহিত ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে সন্ধি করেন, বাবা আদমের স্মৃতিরক্ষা মসজিদ দনুজমাধবের বহু পরবর্তী।[১০]

অগ্নিকুণ্ডের সন্নিকটে মিঠাপুকুর অবস্থিত। এই পুকুরটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০ হস্ত ও প্রস্থে ১০০ হাত হইবে। এই পুষ্করিণীর মধ্যেই অগ্নিকুণ্ড হইতে চিতাভস্ম-সমূহ ফেলা হইয়াছিল বলিয়া জন-প্রবাদ প্রচলিত। মিঠাপুকুরে এখনো বারোমাস জল থাকে। এস্থানে বহু কৃষকের বাড়ি অবস্থিত। ডাক্তার টেলার সাহেব মিঠাপুকুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"In the centre of Balla-baree, there is a tank called "Meetha Pukhur" in which the remains of the Rajaa and his family are said to have been deposited. It is regarded as a place of great sanctity by the Hindoo in the neighbourhood, who carefully abstain from using its water, or removing the soid from its banks." এখন আর সেদিন নাই। এই পুষ্করিণীর তীরে যে সকল মুসলমান কৃষকগণের বাড়ি অবস্থিত, তাহারাই এক্ষণে ইহার জল ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকে।

বাবা আদমের মসজিদ ঃ

বল্লালবাড়ি হইতে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে বাবা আদমের মসজিদটি অবস্থিত। এই স্থান রামপালের সীমান্তভুক্ত। রামপালের এই অংশের নাম দুর্গাবাড়ি। মসজিদটি এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়াছে। মসজিদের গাত্রস্থিত প্রস্তর-ফলক হইতে জানিতে পারা যায় এইটি ৮৮৮ হিজরিতে অর্থাৎ ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। ইহার নির্মাতা মালিক কাফুর। সুলতান জালালউদ্দিন ফতে শাহার সময় ইহা নির্মিত হয়। ব্লকম্যান, হরিনাথ দে প্রভৃতি মনীষিগণ নিম্নলিখিতরূপ ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন "God Almighty says" ; The mosque belong to God. Do not associate any one with God. The prophet, may God bless hem, says ; He who builds a mosque will have a castle built for him by

God in paradise. This Jami masjid was built by the great Malik, Malik Kafur, in the time of the king, the son of the kind Jalal-ud-diny wauddin Fateh Shaha, the king son of Mahammad Sahah, the king, in the middle of the month of Rajab 888 Hijri 1483 A. D. বাবা আদমের সম্বন্ধে নানারূপ উপাখ্যান ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, যে স্থানে বাবা আদম নামাজ পড়িতেন—ঠিক সেই স্থান নির্বাচিত হইয়াই মসজিদটি নির্মিত হইয়াছে। মসজিদটির ইষ্টক মসৃণ ও পাতলা এবং কারুকার্য-খচিত। পূর্বে ছয়টি গম্বুজ ইহার পুরোভাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিত। বর্তমানে মাত্র তিনটি গম্বুজ আছে। বক্রী তিনটি ভূমিকম্পে ছাত সহ ধ্বংসের পথে গমন করিয়াছে। মসজিদ মধ্যস্থিত দুইটি প্রস্তরস্তম্ভ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। মসজিদে প্রবেশ করিলেই দ্বারের দুই পার্শ্বে এই স্তম্ভ দুইটি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উচ্চতা ৭হাত এবং পরিধি ৩$\frac{১}{২}$ হাত। স্তম্ভদ্বয় ধূসরবর্ণ। কথিত আছে, মসজিদের গাত্রে মূল্যবান মণিরত্ন সংযোজিত ছিল, মগেরা লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। এক সময়ে ফৈজদ্দিন খন্দকার, মফিজদ্দিন দেওয়ান এবং আইনদ্দিন খন্দকার প্রভৃতি এই মসজিদের খাদেম ছিলেন। এই মসজিদটি মেরামত হওয়ায় ইহার প্রাচীন রূপ আর নাই।

বাবা আদমের সমাধি ঃ

মসজিদটির সন্নিকটে বাবা আদমের সমাধি বিরাজিত। সমাধিটি মধ্যযুগে একেবারে জীর্ণাবস্থায় নিপতিত হইয়াছিল—কয়েক বৎসর হইল মেরামত হওয়ায় ইহার কতকটা নবজীবন লাভ হইয়াছে। এই সমাধিটিও প্রাচীন। বাবা আদমের মসজিদ ও সমাধিই পূর্বাঞ্চলে মুসলমান প্রাধান্যের প্রথমাবস্থার সূচনা করিতেছে। সে হিসাবে দেখিতে গেলে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই পূর্ববঙ্গে ধীরে ধীরে মুসলমান প্রাধান্য বিস্তৃত হইতে থাকে। বাবা আদমের মসজিদের অনতিদূরে কাজিকস্‌বা, রিকাবিবাজার প্রভৃতি গ্রামেও কয়েকটি প্রাচীন মসজিদ অবস্থিত আছে। সে-সকলগুলির আলোচনার স্থান এখানে নহে, আমরা বিক্রমপুরের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে তাহার আলোচনা করিব।

কোদালধোয়ার দিঘি ঃ

বাবা আদমের মসজিদ হইতে বরাবর দক্ষিণাভিমুখে যে পথ গিয়াছে, সে পথ দিয়া কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে দক্ষিণদিকে একটি দিঘি পাওয়া যায়। উহার নাম কোদালধোয়ার দিঘি। কিংবদন্তী এই যে, যে সমস্ত মজুর রামপালের দিঘি-খননকার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা প্রতিদিনই কার্যশেষে একস্থান হইতে এক কোদাল মাটি কাটিয়া কোদাল ধুইয়া ফেলিত, এইরূপে একস্থান হইতে মাটি কাটিতে কাটিতে ঐ স্থানেও একটি বিশাল দির্ঘিকা খনিত হইয়া গেল, উহারই নাম কোদালধোয়ার দিঘি। বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ কোদালধোয়া দিঘির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন বল্লালরাজের কোতোয়ালের বাড়ি এই দিঘির তীরে ছিল। সেজন্যই কোতোয়াল-দহ হইতে দিঘির নামে হইয়া গিয়াছে কোদাল ধোয়া। এই সকল জনপ্রবাদের সুমীমাংসা হওয়া এখন অসম্ভব। এই দিঘিও দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ১০০০ × ৫০০ হাত হইবে।

বাবা আদমের মসজিদটি রামপালের অদূরবর্তী কাজিকস্‌বা নামক স্থানে অবস্থিত। কসবা পার্শি শব্দ, নগর বুঝাইয়া থাকে। রামপালের একটি ভাগের নাম নগরকসবা। নগর বলিতে শহর বুঝায় এবং কসবা শব্দের অর্থ হইতেছে নগর। অতএব এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। পরবর্তীকালে মুসলমান প্রভাব বিস্তৃত হইলে পর প্রাচীন শ্রীবিক্রমপুর নগরের বিভিন্ন পল্লীর নামও পরিবর্তিত হইতে থাকে—যেমন নগরকসবা, কাজি-কসবা, আবদুল্লাপুর প্রভৃতি।

রামপালের তেঁতুল গাছ ঃ

রামপাল দিঘি—বা বল্লাল দিঘি। রামপালের দিঘি এক সময়ে বিক্রমপুরের একটি প্রধান দর্শনীয় জিনিস ছিল ; শ্রীবিক্রমপুর রাজধানীর চারিদিকে পার্শ্ববর্তী গ্রাম-সমূহে অনেক বৃহদাকার দিঘি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় দিঘি খননের প্রধান কারণ দিঘির ভিতর হইতে মাটি তুলিয়ে ভূমি উচ্চ করিয়া বাড়ি নির্মাণ করা। রাজধানীর উপযুক্ত নিরাপদ উচ্চস্থানের জন্যই এইরূপ বিশালকায় দিঘি খনন এবং পানীয় জলের জন্যও দিঘি খনন সেকালে একটি আবশ্যকীয় পুণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। রামপালের চতুর্দিকস্থ ভূমির ন্যায় উচ্চভূমি বিক্রমপুরে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সুবিখ্যাত ভৌগোলিক এবং সেকালের ঢাকা বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর সি বি ক্লার্ক (C. B. Clarke) রামপালের দিঘির তীর এবং পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, "যদি বর্ষাকালে কোনও দিন এ স্থানে জল উঠে, তাহা হইলে সমস্ত ঢাকা জেলা একেবারে জলে ভাসিয়া যাইবে। 'রামপালের দিঘির পূর্বতীরে তিন্তিড়ি বৃক্ষের নিম্নস্থ স্বাদ লবণাক্ত, জনপ্রবাদ, এখানে এক সওদাগরের সুবৃহৎ লবণ বোঝাই তরণী নিমজ্জিত হইয়াছিল। এই দিঘি রামপালের দিঘি এবং বল্লাল-দিঘি এই নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

এই দিঘির দৈর্ঘ্য ২২০০ ফিট এবং প্রস্থ ৮৪০ ফিট। মহারাজা বল্লালসেন এই দিঘিটি খনন করিয়াছিলেন বলিয়াই কিংবদন্তী প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। Main Cricuit map-এর নির্দেশ অনুসারে এই রামপাল দির্ঘি ২২০০×৮৪০ ফিট। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম এই দিঘির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—Half a mile to the south of Ballal-bari there is one of the largest and finest sheets of water that I have seen. It is called Rampal Dighi, and is about 1,800 feet in length from north to south by 800 ft in breadth. The water is deep and clear and the banks are covered with large old trees. The Royal Elephants are said to have been kept at the northern end. The land at the south end is still held by the descendants of the old Rajas. অর্থাৎ, বল্লাবাড়ির আধ মাইল দক্ষিণে আমি বিখ্যাত রামপালের দিঘি দেখিয়াছিলাম। এই দিঘির উত্তর ও দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ১,৮০০ ফিট এবং প্রস্থ ৮০০ ফিট। দিঘির জল নির্মল ও গভীর। দিঘির তীরে বড় বড় সব পুরনো গাছ রহিয়াছে। রামপাল দিঘির উত্তর পাড়ে ছিল রাজাদের হাতিশালা। দক্ষিণ দিকের ভূমি এখনও প্রাচীন রাজাদের বংশধরগণের অধিকারে রহিয়াছে। এইখানে কানিংহাম কোনও রাজার বংশধরগণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে "রামপালের বিবরণে" তদানীন্তন ঢাকা কলেজের ছাত্র প্রসন্নচন্দ্র গুহ রামপাল দিঘির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বল্লালবাড়ির বহির্বাটির দক্ষিণাংশে ন্যূনাধিক দুই সহস্র হস্ত দীর্ঘ ও নয় শত হস্ত পরিসর-বিশিষ্ট প্রায় শুষ্কভাবাপন্ন বৃহৎ একটি দির্ঘিকা বর্তমান আছে। উহা রামপালের দিঘি বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, মহারাজা বল্লালসেন এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, তাহার জননী একাদিক্রমে যতদূর পদব্রজে যাইতে পারিবেন রাজা বল্লাল ততদূর দীর্ঘ এক দির্ঘিকা খনন করাইয়া দিবেন। তদনুসারে তাহার মাতা এক দিবস বৈকালে বাহির-বাটির দক্ষিণ হইতে ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি অধিকদূর গমন করিলে পর বল্লালসেনের মনে এই ভাবনা উপস্থিত হইল যে, তাহার মাতা অনেক দূর অতিক্রম করিয়াছেন, আরও গমন করিলে তিনি অত বড় দির্ঘিকা অত্যল্প সময়ের মধ্যে খনন করিতে পারিবেন না। রাজার ইঙ্গিতানুসারে একজন অনুচর তাহার জননীর চরণে অলক্ত-চিহ্নিত করিয়া বলিল, "ঠাকুরানি! আপনার চরণে

শোণিত চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি, এ শোণিত চিহ্ন কিসের? একথা শুনিয়া বল্লালজননী চমকিত ভাবে ফিরিয়া চাওয়া মাত্রই, সেই স্থানে এক খোটা গাড়িয়া চিহ্নিত করত দিঘি খনন-কার্য আরম্ভ হইল।"

এই দিঘির নাম রামপালের দিঘি কেন হইল তৎসম্বন্ধেও বিবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন 'অনেক দিন পর্যন্ত দিঘিতে জল উঠিয়াছিল না, রাজা বল্লালের পরম স্নেহাস্পদ ভৃত্য রামপাল স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া অশ্বারোহণ পূর্বক সে দিঘিতে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালীন উহার চতুষ্পার্শে লোক রাখিয়া বলে ইহা জলে পরিপূরিত হইলে তোমরা সকলে উহাকে রামপালের দিঘি বলিয়া আখ্যাত করিও। এতদ্বচন প্রয়োগান্তে, রামপাল প্রোক্ত দিঘিতে প্রবেশ করিবামাত্র উহা কল কল স্বরে জলপূর্ণ হইতে লাগিল এবং রামপাল তখন সকলের নয়ন পথাতীত হইয়া কোথায় গেল, কেহই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। আর সেই সময়ে সকলের মুখ হইতে 'রামপাল! রামপাল' এই শব্দ বিনির্গত হইতে লাগিল। তদবধি উহা রামপালের দিঘি বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।[১১]

"এই দিঘি এমন সুবৃহৎ হইয়াছিল যে, উহার একপারে দণ্ডায়মান হইয়া অপরপারের প্রতি ভালরূপে দৃষ্টি সঞ্চালন হইত না। আধুনা উক্ত দিঘির অনেক স্থান ভরাট হওয়াতে উহা পূর্বাপেক্ষা অনেক সংকীর্ণ হইয়াছে, এইক্ষণে কৃষকেরা উহার স্থানে স্থানে বোরো ধান রোপণ করিয়া তদুৎপন্ন যথা পরিপালিত ধান্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

"মধ্য যোগে রামপালের দিঘিতে মৎস্যের বড় আড়ম্বর ছিল। তাহা শ্রবণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। সময়ে সময়ে লোকেরা রামপালের দিঘিতে মাছ ধরিবার নিমিত্ত স্ব স্ব অস্ত্র সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইত। সকলে দিঘিতে না নামিয়া তাহার পাড়ে দণ্ডায়মান থাকিত। এবং আপন আপন অস্ত্রগুলি উর্ধ্বমুখে ধরিয়া কোলাহল করিত। তাহাতে প্রকাণ্ড মৎস্যসকল লম্ফ প্রদান করিয়া পতিত হইত। উল্লম্ফিত মৎস্যাঘাতে অনেকানেক লোক আহত হইত।"

রামপালের দিঘি কে খনন করিল? ঃ

বর্তমান সময়ে রামপাল দিঘির তীরে সেই—"প্রাচীনকালীয় বৃহৎ বৃহৎ অশ্বত্থ, পাকুর, তেঁতুল, শিমুল ও খর্জুর প্রভৃতি বৃক্ষরাজিতে পূর্ণ অবস্থা আর নাই।" এখন এই দিঘির মধ্যে স্থানে স্থানে জল থাকে, আর অন্যান্য স্থানে কৃষিকার্য হইতেছে। ক্রমশ চারিদিক ভরাট হইয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হয় পূর্বের সেই দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের পরিমাপও হ্রাস পাইতেছে। অনেকে বল্লালসেনের দিঘি নৃপতি বল্লালসেন খনন করিয়াছিলেন কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বর্গত আশুতোষ গুপ্ত বলেন,—"বল্লালসেনের রাজধানী এবং তাহার খনিত দিঘির নাম রামপাল হইবে কেন? ইহা কি আশ্চর্য বলিয়া মনে হয় না? আমার মনে হয় বল্লাসেনের পর পালবংশীয় কোনও নৃপতি রামপাল রাজধানীতে বাস করিবার সময় এই দিঘি খনন করেন এবং পরে উহা বল্লালসেনের নামের সহিত জড়িত হইয়াছে। কেননা বুড়িগঙ্গার উত্তরাংশে যে একসময়ে পালরাজারা রাজত্ব করিতেন এবং তাহারা সেনরাজাদের পূর্বে ও পরে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া হিন্দু জনগণ তাহাদের প্রাধান্য স্বীকার করিতেও যেন দ্বিধা বোধ করিতেন, তাহারই ফলে ব্রাহ্মণদের প্রতি কৃপাবান্ হইয়া বৌদ্ধনৃপতিদের কীর্তিও সেনরাজাদের উপর অর্পিত হইয়াছে। কেননা দিঘি খনন করা পালরাজাদের একটা বিশেষত্ব ছিল। দিনাজপুরের মহীপাল দিঘি আজও বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের কথার সমর্থন করিতেছে। বোধ হয় বাংলাদেশে মহীপাল দিঘিই বৃহত্তর দিঘি। এজন্য আমি মনে করি পালরাজাদেরই কোনও নৃপতি এই শহরের নাম ও দিঘির নাম রামপাল রাখিয়াছেন।"

আমরা গুপ্ত মহাশয়ের এই ভ্রান্ত মত গ্রহণ করিতে অক্ষম। দিঘি খনন করা কেবল যে পাল রাজাদেরই একটা বিশেষত্ব ছিল তাহা নহে, সেকালের হিন্দু নৃপতি মাত্রেই দিঘি খনন একটা পুণ্য কার্য বলিয়া মনে করিতেন। বল্লালসেন-খনিত গৌড়ের "সাগরদিঘি" যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই জানেন যে, মহীপাল দিঘি এবং সাগর দিঘি আয়তনে প্রায় একই প্রকার। আমি নিজে বল্লালসেনের খনিত বিশাল সাগরদিঘি দেখিয়াছি। ঐ দিঘির চারিতীরে ছয়টি ঘাট ছিল। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।—"গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেন—"সম্ভবত বল্লালসেনই একডালা দুর্গ নির্মাণ করেন। দুর্গ নির্মাণার্থ যে প্রভূত মৃত্তিকার প্রয়োজন হইয়াছিল, বোধ হয় তাহা সাগরদিঘি খননের দ্বারা পাওয়া গিয়াছিল। বল্লালসেন বাগবাড়ির মধ্যে দুটি পুষ্করিণী খনন করান। তাহার নাম টামনা দিঘি ও ভাতশালা দিঘি। টামনা দিঘি অতি বৃহৎ। উহাতে চারিটি ঘাট ছিল। উত্তরে একটি ও দক্ষিণে একটি এবং পশ্চিম দিকে দুটি। ঘাটের ইট লোকে ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে। ঐ ঘাটগুলি রঙিন ইটের ব্যবহার করিতেন, তাহা জানা যাইতেছে।" গৌড়ের বড় সাগর দিঘি একটি প্রকাণ্ড হ্রদ, ১,৬০০×৮০০ গজ দীর্ঘ ও প্রশস্ত। নবদ্বীপের উত্তরে বল্লালদিঘি নামে একটি দিঘি আছে। প্রবাদ যে, উহা বল্লালসেন খনন করাইয়াছিলেন। দিঘি খনন করাইবার হেতু সম্বন্ধেও অনেকে এইরূপ বলেন যে, বৃদ্ধবয়সে গঙ্গাবাসের জন্য নবদ্বীপের উত্তরে একটি রাজবাড়ি করেন। যথা—

মুক্তি হেতু বল্লাল আসিল গঙ্গাস্নান,
জহ্নুনগরোত্তরে করে সে বাসস্থান।"

কাজেই বল্লালসেন বা সেনরাজারা দিঘি খনন করিতেন তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার মত কোনও কারণই বিদ্যমান নাই—অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এই দিঘি সম্ভবত বল্লালসেনই খনন করিয়াছিলেন। এস্থানের নাম রামপাল কেন হইল, সে বিষয়ে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমি বিশেষভাবে রামপাল পর্যবেক্ষণ করিয়া যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে আমারও বিশ্বাস "সেনবংশের সময় শ্রীবিক্রমপুর নগরের সকলের চেয়ে বেশি বিস্তৃতি হইয়াছিল, তাহা দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল ও প্রস্থে পাঁচ মাইল এই বিপুল আয়তন ধারণ করিয়াছিল।" এই জন্যই আমরা সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করি যে, এই দিঘি বল্লালসেনেরই খনিত নতুবা 'বল্লাল কাটায় দিঘি' এই জনপ্রবাদ এতদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না।[১]

রামপাল দিঘির ন্যায় বৃহৎ না হইলেও তাহার তুল্য বা তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাকার আরও কয়েকটি বিক্রমপুরের দিঘির পরিচয় আমরা এখানে দিতেছি। এই সব দিঘি কে বা কাহারা খনন করিলেন তাহারও অনুসন্ধান আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তবে আমাদের বিশ্বাস যে, বিক্রমপুরের বিভিন্ন রাজবংশীয়েরাই এই-সব দিঘি খনন করাইয়াছিলেন।

রামপাল দিঘি—২২০০ ফিট × ৮৪০ ফিট।
ধামারণ দিঘি—২২০০ ফিট × ৮০০ ফিট।

ধামারণ—ধর্মারণ্য শব্দের অপভ্রংশ। ধামারণের দিঘির আয়তন ঠিক রামপাল দিঘির মত—প্রস্থে মাত্র ৪০ ফিট কম। এই দিঘির তীরে শাকদ্বীপে ব্রাহ্মণগণের বসতি রহিয়াছে।

নৈয়ের পুকুর—২০০০ ফিট × ৭০০ ফিট।
মামাসার দিঘি—১৪০০ ফিট × ৬০০ ফিট।
ধামাদ দিঘি—১১০০ ফিট × ৫০০ ফিট।
সুখবাসপুর—৯০০ ফিট × ৫০০ ফিট।
শানের দিঘি—৭০০ ফিট × ৭০০ ফিট।

দেওর-চুড়াইন দিঘি [রামপাল দিঘির ঠিক পশ্চিমে] ৮০০ ফিট × ৮০০ ফিট।

সুয়াপাড়া দিঘি—৭০০ ফিট × ৫০০ ফিট।
টাঙ্গিবাড়ি দিঘি—৭০০ ফিট × ৫০০ ফিট।
মগা দিঘি [চারপাড়া]৭০০ ফিট × ৭০০ ফিট।

রামপালের উপকণ্ঠে এবং আশেপাশেই এইরূপ কয়েকটি বৃহৎ দিঘি অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ছোট-বড় দিঘি আছে, সে সমুদয়ের উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

হরিশ্চন্দ্রের দিঘি ঃ

রামপালের পশ্চিম ভাগের একটি দিঘি হরিশ্চন্দ্রের দিঘি বলিয়া প্রসিদ্ধ। রঘুরামপুরের অদূরেই হরিশ্চন্দ্রের ভিটার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। ঐ ভিটার দক্ষিণ পার্শ্বে প্রায় দুই শত হস্ত দীর্ঘ এবং ৮০/৯০ হস্ত প্রশস্ত দিঘিটি বিরাজিত আছে। "উহা তারা ও বড় বড় জঙ্গল সহকৃত ভীটাবলিতে পরিপূর্ণ। উক্ত দিঘির ১০/১২ হস্ত পরিমিত স্থানের ভীটসকল মাঘি পূর্ণিমা দিবসে জলমগ্ন হইয়া পড়ে। ক্রমে ভাসিতে থাকে। এই আশ্চর্য অনেকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু কেহই উহার কারণ উদ্ভাবিত করিতে পারেন নাই।"

এই দিঘির সম্পর্কিত আশ্চর্য ব্যাপার আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উহার উপর দিয়া মানুষ এবং গোরু-বাছুর অবলীলাক্রমে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছে দেখিয়াছি, কিন্তু নির্ধারিত সময়ে ধীরে ধীরে ভিটা ইত্যাদি কি জানি কোনও নৈসির্গক কারণে নিম্নে নাবিয়া গিয়াছে এবং জল বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি এবিষয়ে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে ইহার কারণ কি তৎ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সম্ভবত এই দিঘির তলভাগের সহিত কোনও উৎসের যোগ আছে, তাই বিশেষ কোনও সময়ে এইরূপ হইয়া থাকে। আশ্চর্যের কথা এই যে, আজও পর্যন্তও এ বিষয়ে কেহ কোনও কারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই।

এই দিঘি সম্বন্ধে নানারূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত। এই রাজা হরিশচন্দ্র কে ছিলেন? 'সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস প্রণেতা স্বর্গত স্বরূপচন্দ্র রায় মহাশয়ের এবং এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার রামপাল শীর্ষক প্রবন্ধ-লেখক স্বর্গত আশুতোষ গুপ্তের মতে এই হরিশ্চন্দ্র—বৌদ্ধ নৃপতি হরিশ পাল। এই প্রসঙ্গে ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলেন—"বর্মবংশের বিষয়ে আমরা প্রধান এই একটি বিযয় অবগত আছি যে, তাহারা বৈষ্ণব ছিলেন। হরিবর্মদেব স্বীয় রাজধানী হইতে মাতার পদব্রজে কাশী যাইবার জন্য এক রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। * * পাইকপাড়া আবদুল্লাপুরের সীমায় অবস্থিত বৃহৎ ইষ্টক-নির্মিত পোলটির উপর দিয়া যে দীর্ঘ রাস্তা সোজা পশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহাই হরিবর্মের নির্মিত রাস্তা।"

এখন দেখা আবশ্যক যে, রামপাল ও তাহার উপকণ্ঠের কোনও স্থান হইতে বৈষ্ণব কীর্তি-চিহ্ন বাহির হইয়াছে, হরিবর্মের রাস্তা কোনও স্থান হইতে বহির্গত হইয়াছে, এবং বর্মবংশের স্মৃতি-বিজড়িত আর অন্য কোনও কীর্তি রামপালের কোনও অংশে আছে কিনা।

সুয়াসপুর বা সুখবাসপুর ঃ

"রামপালের দক্ষিণে সুখবাসপুর গ্রামের আশে-পাশে বহু বৈষ্ণব-কীর্তি-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুখবাসপুর গ্রামে বহুকাল হইতে জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে, এখানে রাজার বাটি অবস্থিত ছিল। সুখবাসপুর মনসাবাড়িতে সুখবাসপুরের প্রকাণ্ড দিঘি হইতে উত্থিত এক বিপুলায়তন বিষ্ণুমূর্তি রক্ষিত আছে। আর একখানা প্রায় ছয় ফুট উচ্চ অতি সুন্দর কারুকার্য-খচিত বামন অবতারের মূর্তি এই গ্রাম হইতে আবদুল্লাপুরের বৈষ্ণবদের আখড়ায় লইয়া গিয়া রাখা হইয়ছে। তাহার নীচে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে "নমো বা—" পর্যন্ত লিখিত আছে। লিপিটি বোধ হয় 'নমো বামনায়' বলিয়া আরব্ধ করা হইয়াছিল—কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই।[১৩] এই দুইটি প্রকাণ্ড মূর্তি দেখিয়াই মনে হয় যে, এরূপ বিপুলায়তন মূর্তি কোনও প্রতাপশালী রাজা ভিন্ন অন্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।

হরিবর্ম হরিশ্চন্দ্র কি ? ঃ

"সকলের চেয়ে বড় প্রমাণ, সুখবাসপুর গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত হরিশ্চন্দ্রের দিঘি। আমার মনে হয় এই হরিশ্চন্দ্র হরিবর্ম ব্যতীত আর কেহই নহেন। নামসাদৃশ্য ভিন্ন অবশ্য অন্য কোনও বিশেষ প্রমাণ নাই। কিন্তু পূর্বোক্ত হরিবর্মের রাস্তাও যে হরিশ্চন্দ্রের দিঘির উত্তর পাড় ঘেঁষিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, সুখবাসপুরেই বর্মবংশের রাজধানী ছিল। সুখবাসপুরের উত্তর প্রান্তে দেবসার গ্রামে এক প্রকাণ্ড দিঘি এবং তাহার পাড়ে এক উচ্চ দেউল আছে। দেবসার গ্রাম রামপালের বিখ্যাত দিঘির পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। আমার মনে হয় এই দেবসার দেউলে বর্মরাজাদের অনেক কীর্তি লুকাইয়া আছে। সুখবাসপুরের পূর্বে একটি প্রকাণ্ড মাঠ আছে—তাহার নামটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাহার নাম সরস্বতীর মাঠ। বিষ্ণুপত্নী সরস্বতী দেবীর সম্মানে কোনও অতীত কালে বর্মরাজাদের সময় হয়ত এখানে সারস্বত-সম্মিলনের ব্যবস্থা ছিল, সেই প্রাচীন গৌরবযুক্ত নামটি এখনও রহিয়া গিয়াছে। সরস্বতীর মাঠের পূর্বপ্রান্তে কেওয়ার গ্রাম। কেওয়ার গ্রাম বর্মদের সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। **কেওয়ার দেউল** হইতে একখানা বিষ্ণুমূর্তি বাহির হইয়াছে—তাহার পাদপীঠে চারি লাইন লিপি আছে। তাহার যতদূর পাঠ উদ্ধার করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে দিলাম।

লিপি-পরিচয়

১। অয়মানুষমেয়েন সযোগাঙ্গভুবা বিভুঃ [।]
২। বঙ্গোকেন কৃতোবিষ্ণ-র্বিষ্ণুসালোক্য-কাম্যয়া [।।]
৩। বরেন্দ্রীতটকীয়েন শাণ্ডিল্যকুলজন্মনা পিতাম- [।]
৪। হস্য পৌত্রেণ প্রণপ্তা শৌরিশর্ম্মণঃ।।

লিপিটির ভাষা অশুদ্ধ সংস্কৃত বলিয়া বোধ হয়। নীচের দুই লাইনের শেষ অত্যন্ত ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে বলিয়া নিঃসংশয় পাঠ দিতে পারিলাম না। প্রথম দুই লাইন বেশ পরিষ্কার ভাবে খোদিত থাকিলেও তাহারও তিন-চারটি অক্ষরের পাঠ অশুদ্ধি-হেতু সংশয়যুক্ত। লিপিটির অর্থ এই দাঁড়ায় যে, গৌরীশর্মার পুতি, পিতামহশর্মার নাতি, কুলশর্মার ছেলে শাণ্ডিল্য গোত্রজ বরেন্দ্রীহট্ট নিবাসী বঙ্গোকশর্মা ৯১০শকে ক্বহোরি অর্থাৎ, বর্তমান কেওয়ার গ্রামে সালোক্য কামনায় বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। শকাব্দের ৯১০ খ্রিস্টাব্দের ৯৮৮-র সমান। সময়টি ঠিক বর্মবংশের অভ্যুত্থানের সময়।"

হরিবর্মের তাম্র শাসন ঃ

ভোজবর্মের বেলাব-লিপি ব্যতীত হরিবর্মদেবেরও একখানি তাম্রশাসনের কথা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এই শাসনলিপিখানা বিক্রমপরের রাজধানী হইতেই প্রদত্ত হইয়াছিল। এই শাসনের একখানি অস্পষ্ট চিত্র নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের মুখপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি হরিবর্মদেবের তাম্রশাসনের ব্যাখা দিয়াছেন বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ২১৫—২১৭ পৃষ্ঠায়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই হরিবর্মদেব মূল বর্মবংশেরই কোনও শাখা বা স্বগোত্র-সম্ভূত হইতে পারেন। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

[Palas of Bengal P.P 97-98] নামক গ্রন্থের ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠায়ও এই তাম্রশাসনখানির বিষয় উল্লিখিত আছে। তাহাতে এই তাম্রশাসনখানির অতি অল্প অংশ-মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। "এই তাম্রশাসনখানির ২৭শ পংক্তি .... ইহা খলু বিক্রমপুর-সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ জ্যোতিবর্মপাদানুদ্যাত পরমবৈষ্ণব পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজধিরাজ শ্রীহরি বর্মদেবঃ কুশলী।

বর্তমান সময়ে এই তাম্রশাসনখানির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় তাঁহার Inscriptions of Bengal Vol III-এর এই শাসনখানির উল্লেখ করিতে মন্তব্য করিয়াছেন—"I am afraid is too conjectural to be utilized for historical purposes."

এই হরিবর্মের সম্বন্ধেও অনুসন্ধান সাপেক্ষ। নগেন্দ্রবাবুর মতে "শাসনখানি খ্রিস্টিয় ১১শ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৬$\frac{১}{২}$ অঙ্গুলি ও প্রস্থে ১৩$\frac{১}{৪}$ অঙ্গুলি ছিল। তাম্রশাসনের উর্ধ্বভাগে রাজা হরিবর্মদেবের লাঞ্ছন (emblem) ছিল।"

ডক্টর ভট্টশালী মহাশয়ের এই অনুমান কতদুর সত্য তাহা এখনও প্রকৃতভাবে বলা কঠিন। হরিশ্চন্দ্র ও হরিবর্মা একই ব্যক্তি কিনা তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যাইতে পারে না। এবিষয়টি নূতন আবিষ্কার-সাপেক্ষ। আবার জনপ্রবাদকে একেবারে অগ্রাহ্য করাও যাইতে পারে না। আমরা যতদিন পর্যন্ত সঠিকভাবে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিব, ততদিন পর্যন্ত এসমুদয় কিংবদন্তী ও অনুমানকে একেবারে উপেক্ষা করিতে কিংবা গ্রহণ করিতে পারি না।

গজারি বৃক্ষ ঃ

গজারি বৃক্ষ—রামপালের গজারি বৃক্ষটি এক সময়ে ঐস্থানের একটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল। দুঃখের বিষয় ঐ গাছটি মরিয়া গিয়াছে। আমরা প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে যখন ঐ গাছটিকে দেখিয়াছিলাম, তখন উহার উচ্চতা প্রায় ষাট হাত ছিল। দেখিলেই বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হইত। বৃক্ষটির বিশাল দেহ ছিল না। ইহার গোড়ার বেড় ছিল ৪—হাত মাত্র। প্রায় ৪/৫ হাত উর্ধ্বে গাছটি দুইটি মূল শাখায় বিভক্ত ছিল। ঢাকা জেলায় এক ভাওয়ালের গজারি-বন ব্যতীত আর কোথাও শাল বা গজারি গাছ দেখা যায় না। এই একটি মাত্র গজারি গাছ কি ভাবে কেমন করিয়া এই স্থানে জন্মিয়াছিল তাহা আলোচ্য বটে। এক সময়ে নানাবিধ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ও হরিৎপত্ররাজি সুশোভিত হইয়া ইহা অতি সুন্দর দেখাইত। নিকটবর্তী স্ত্রী ও পুরুষগণ বিশেষ মৃতবৎসা স্ত্রীগণ ইহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলে উষ্ণতা অনুভব করিতেন বলিয়া কথিত হইত।

গজারি বৃক্ষতলের মেলা ঃ

আমি যে সময়ে গাছটিকে প্রথম দেখি তখন উহার তলদেশে স্তূপীকৃত ইষ্টকরাশি দেখিয়াছিলাম। বংশপরম্পরা-বিশ্রুত জনপ্রবাদ হইতে ইহার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। 'পল্লীবিজ্ঞানে' লিখিত আছে—"বল্লালবাড়ির দক্ষিণপার্শ্বে বৃহৎ এক স্থান বিদ্যমান আছে, উহা বল্লালসেনের বহির্বাটি বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। উল্লিখিত বাহির-বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বৃহৎ একটি গজারি তরু অবস্থিত আছে, লোকে তাহা বল্লালের হস্তী-বন্ধনের স্তম্ভ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। * * * অধুনা কতিপয় বৎসর হইতে চৈত্রমাসে অষ্টমী দিবস প্রাগ-বর্ণিত দির্ঘিকার উত্তর পাড় সুপ্রসিদ্ধ গজারি বৃক্ষতলে একটি ক্ষুদ্রতর মেলা মিলিয়া থাকে। ঐ দিবস মুন্সিগঞ্জের পূর্বদিকস্থ যোগিনীঘাটে অষ্টমী-স্নান করণার্থ অসংখ্য যাত্রী সমাগত হয়। স্নান ও তৎসঙ্গে আপন আপন ধর্ম-কর্ম সমাপনান্তে

অনেক যাত্রিক বল্লাল রাজার কীর্তিকদম্ব সন্দর্শন জন্য রামপালে উপস্থিত হয়। সে উপলক্ষে তথায় নানাবিধ দ্রব্যাদি বিক্রীত হইয়া থাকে।"

গজারি বৃক্ষ সম্বন্ধে বিবিধ কিংবদন্তী ঃ

এই গজারি বৃক্ষের সম্বন্ধে বিক্রমপুরে বিবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এই মৃত তরু ব্রাহ্মণের আশীর্বাদবারি-সিঞ্চনে সঞ্জীবিত হইয়াছিল বলিয়া জনপ্রবাদ প্রচলিত। এবং তাহার সহিত আদিশূর নামক একজন নৃপতির নাম বিজড়িত রহিয়াছে। আমরা প্রয়োজন-বোধে এখানে সংক্ষেপে সে সমুদয় উপাখ্যান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

আদিশূর ঃ

বিক্রমপুরে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত যে, আদিশূর নামে এক নৃপতি ছিলেন, তিনি অতি সৎলোক, সদ্বিচারক, তত্ত্ববেত্তা ও মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। তাহার প্রতাপে সমুদয় শত্রুকুল নির্মূলপ্রায় হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং বৌদ্ধদিগকে গৌড়-রাজ্য হইতে দূরীকৃত করেন। এই মহাত্মা আদিশূরই বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল নগরীতে বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহাদের চরণে চর্মপাদুকা ও সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত ছিল। তাহারা এইরূপ বেশে তাম্বুল চর্বণ করিতে করিতে রাজবাড়ির দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দ্বারবানকে রাজার নিকট তাঁহাদের আগমন-বার্তা বলিবার জন্য বলিলেন। ব্রাহ্মণগণ মনে ভাবিয়াছিলেন যে, রাজা তাহাদের আগমন-বার্তা শ্রবণ করিয়া শীঘ্রই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। এই নিমিত্ত তাহারা সকলেই মহারাজকে আশীর্বাদ করিবার জন্য জল-গণ্ডূষ-হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। কিন্তু মহারাজ আদিশূর, এই সকল বিপ্রেরা যোদ্ধাবেশে আগমন করায় বিরক্ত হইয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। বিপ্রগণ বুঝিতে পারিলেন হয়ত রাজা তাহাদের বেশ-ভূষার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বিরক্ত হইয়াছেন, অতএব তাহাকে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব দেখাইবার জন্য করস্থিত আশীর্বাদ-বারি নিকটবর্তী মল্লকাষ্ঠে স্থাপিত করিলেন। চিরশুষ্ক মল্লকাষ্ঠ দেখিতে দেখিতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া পল্লাবিত হইয়া উঠিল।" এই অমর গজারি বৃক্ষ এক সময় বিক্রমপুরবাসী নরনারীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিত। ইহার তীরে মেলা বসিত, গাছটির গা মহিলারা সিন্দুর-দ্বারা সুরঞ্জিত করিয়া দিতেন।

কয়েক বৎসর হইল গজারি গাছটির মৃত্যু হইয়াছে, আমি "বিক্রমপুরের ইতিহাসের" প্রথম সংস্করণে আমার নিজের হাতে তোলা উহার আলোকচিত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমার পূর্বে কেহ গজারি বৃক্ষের কোনও চিত্র প্রকাশ করেন নাই।

আদিশূর-রাজা কে ছিলেন?— শূরবংশ ঃ

এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে আদিশূর-রাজা সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিতেছি। 'আদিশূর' নামে কোনও রাজা ছিলেন কিনা, এবং কোথায় কোনও সময়ে তিনি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, এই প্রসঙ্গ লইয়া আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ অনেকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আদিশূর নৃপতি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। তবে বর্তমান ঐতিহাসিকেরা সকলে একবাক্যে এই কথা স্বীকার করেন যে, পশ্চিমবঙ্গের শূর-রাজ্য বা দক্ষিণবাংলায় শূরবংশ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। শূর-বংশের বিখ্যাত রাজা আদিশূর সম্বন্ধে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহার ভিতর হইতে ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করা বড় কঠিন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরি ও ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেন—"পশ্চিমবঙ্গের শূর-রাজ্য এবং পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশ শাসিত রাজ্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ। কিন্তু শূর-বংশের সুপ্রসিদ্ধ রাজা আদিশূর সম্পর্কে যে সকল কাহিনী প্রচলিত আছে, সমসাময়িক কোনও লেখায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়

নাই। তবে একথা নিঃসন্দেহ-রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শূরবংশ নামে একটি প্রতাপশালী স্বাধীন রাজবংশ দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় রাজত্ব করিতেন। এই শূর-বংশের কন্যা বিলাসদেবী বল্লালসেনের জননী ছিলেন। কিন্তু তিনি শূর-বংশীয় কোনও নৃপতির কন্যা ছিলেন, সে বিষয়ে আমরা সীতাহাটিতে প্রাপ্ত বল্লালসেনের তাম্রশাসন হইতে কিছুই জানিতে পারি না। আদি—প্রথম এই দিক দিয়াও হয়ত অজ্ঞাতনামা শূর-নৃপতিকে "আদিশূর" নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন।"[১৪]

শূরবংশীয়েরা কোথা হইতে আসিলেন?

'গৌড়ের ইতিহাস' প্রণেতা বলেন—"শূর-বংশীয়দের সময় হইতে গৌড়রাজ্যের বিশ্বাসযোগ্য কিছু কিছু ঐতিহাসিকতথ্য অবগত হওয়া যায়। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের গ্রন্থে লিখিত আছে, শূরবংশীয়গণ কাশ্মীরের নিকটবর্তী দরদ দেশ (বর্তমান দর্দিস্থান) হইতে গৌড়ে আগমন করেন। যথা—

আগমৎ ভারতং বর্ষং দারদাৎ স রবিপ্রভঃ।
জিত্বাচ বৌদ্ধরাজানং তথা গৌড়াধিপং বলান্।"

আদিশূর এই বংশীয় সর্বপ্রধান নরপতি। কাশ্মীর-রাজ অবন্তীবর্মার শূর নামক মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সম্ভবত শূর-বংশের স্থাপনকর্তা। * * আইন-ই-আকবরিতে আদিত্য শূরবংশীয় রাজগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। আবুল ফজল আদিশূরকেই আদিত্যশূর বলিয়াছেন কি না বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন—আদিত্যশূর কর্ণসুবর্ণের নিকটস্থ সিংহেশ্বরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।* * কুলজি গ্রন্থে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণগণ সুরসরিদ্-বিধৌত গৌড়নগরে আগমন করেন ;—কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। পাণ্ডুয়ার হোমদিঘি ও ধূমদিঘির তীরে তাহারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, লোকের এইরূপ বিশ্বাস। ঘটককারিকা মতে পঞ্চ-ব্রাহ্মণ বিক্রমপুরে আসিয়াছিলেন। আদিশূর পৌণ্ড্রনগরে রাজত্ব করিতেন। বিক্রমপুরের কোনও স্থানে তাহার রাজধানী ছিল না। যে সময়ে সেনরাজগণ গৌড় হইতে তাড়িত হইয়া বিক্রমপুরে গমন করেন, সেই সময়ের পূর্ববর্তী কোনও ঘটককারিকা নাই। পরবর্তী কুলাচার্যগণ সেন রাজগণের বিক্রমপুরের রাজধানীকে বাড়াইবার জন্য তথায় সেনরাজগণের রাজধানী কল্পনা করিয়া, পঞ্চ-ব্রাহ্মণকে সেই স্থানে আনিয়া প্রথম উপস্থিত করিয়াছেন ইত্যাদি।[১৫]

বলা বাহুল্য এ সব বিষয়ে বিতর্ক একান্ত নিষ্প্রয়োজন। কেননা আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই যখন আমরা সন্দিহান, তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না তাহাই যখন নিরাকরণ হয় নাই তখন কিংবদন্তী লইয়া বিতর্ক চলিতে পারে না।

ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ লিখিয়াছেন—হর্ষ তাহার প্রাধান্যকালে সমুদয় বঙ্গদেশ, এমন কি কামরূপ বা আসাম, এবং সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যবঙ্গের উপরও তাহার প্রভুত্ব বিদ্যমান ছিল। হর্ষের মৃত্যুর পর স্থানীয় নৃপতিরা যে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না। বাংলাদেশে বংশপরম্পরাগত এইরূপ জনপ্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, বাংলাদেশের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থবংশীয়দের পূর্ব-পুরুষেরা আদিশূর নামক একজন নৃপতি কর্তৃক হিন্দুধর্মের ও সমাজের সংস্কারের জন্য আনীত হন। কেননা সে সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। কিন্তু এই নৃপতি আদিশূর সম্পর্কে কোনও প্রামাণিক বিবরণ আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে মনে হয় যে, যে আদিশূর নামে একজন নৃপতি সম্ভবত গৌড় ও তাহার কাছাকাছি স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবত তিনি ৭০০ খ্রিস্টাব্দে কিংবা তাহারও কিছু পূর্বে রাজত্ব করেন। * * হরিমিশ্র এবং এডুমিশ্রের কারিকা অনুযায়ী এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে—আদিশূর সম্ভবত পালরাজাদের অব্যবহিত-পূর্বে রাজত্ব করিতেন। পঞ্চ-ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-পঞ্চকের আগমনের

অল্প পরেই গৌড় পালরাজাদের করতলগত হয়। কাজেই আদিশূরকে পালরাজগণের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়।[১৬]

কুলপঞ্জিকা ও আদিশূর ঃ

'গৌড়রাজমালায়' রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলেন—"কুলপঞ্জিকা বা ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ ভিন্ন, আর কোথায়ও আদিশূরের পরিচয় পাওয়া যায় না। এখন যে সকল কুলপঞ্জিকা দেখা যায়, তাহা আদিশূরের আনুমানিক আবির্ভাবের কালের অনেক পরে রচিত। পরবর্তীকালের রচনা হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইলে, বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। যে পরবর্তীকালের গ্রন্থে তুল্যকালীন গ্রন্থোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত থাকে, তাহাই কেবল ইতিহসের উপাদান-ভাণ্ডাররূপে গৃহীত হইতে পারে। কুলগ্রন্থ নিচয়ে আদিশূর রাজার বিবরণ যে সেরূপ প্রমাণ অবলম্বনে সঙ্কলিত, তাহ এযাবৎ কেহই প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই। কারণ আদিশূরের সময়ের কোনও চিহ্নই এখনও পাওয়া যায় নাই। অনেকে বলিতে পারেন, কুলপঞ্জিকার আদিশূর রাজার বিবরণ প্রত্যক্ষ প্রমাণমূলক না হইলেও, জনশ্রুতিমূলক, এবং জনশ্রুতির যদি ইতিহাসে স্থান লাভ করিবার অধিকার থাকে, তবে আদিশূর রাজার বিবরণ ইতিহাসে স্থান পাইবে না কেন? জনশ্রুতিমাত্রই যে প্রামাণ্য এবং ঐতিহাসিকের বিবেচ্য, এবং যে প্রবল এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিরোধী, তাহাই ঐতিহাসিকের বিবেচ্য, এবং যে প্রবল জনশ্রুতি প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুকূল তাহাই ইতিহাসে স্থানলাভের যোগ্য।"

"এখন আদিশূর সম্বন্ধীয় জলশ্রুতির পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক, উহার ঐতিহাসিকতা কতদূর। রাঢ়ীয় কুলজ্ঞগণের মধ্যে প্রচলিত আদিশূর সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে বিধিবদ্ধ আছে—

"আসীৎ পুরা মহারাজ আদিশূর প্রতাপবান।
আনীতবান্ দ্বিজান পঞ্চ পঞ্চগোত্রসমুদ্ভবান্।।"

এখানে পাওয়া গেল,—আদিশূর ছিলেন (আসীৎ)। বারেন্দ্রকুলজ্ঞগণের গ্রন্থে আরও কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তাহারা আদিশূরের এবং বল্লালসেন সম্বন্ধে নিরুপণ করিয়াছেন। যথা—

"জাতো বল্লালসেনো গুণি-গণিত স্তস্য দৌহিত্র-বংশে।"

"আদিশূর রাজা পঞ্চ-ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন [পঞ্চ-ব্রাহ্মণের পরিচয়] এহি পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ সংস্থাপন করিয়া আদিশূর রাজার সর্গারোহণ।। তদন্তে কিছু কালানন্তর তত দহিত্রকুলেত উদ্ভব হইলেন বল্লালসেন [বল্লাল সেন কর্তৃক কুল-মর্যাদা স্থাপন এবং রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বিভাগ] ইত্যবকাশে অন্যান্য দেশীয় রাজাসকল ব্রাহ্মণহীন দেশ বিবেচনা করিয়া বল্লালসেনের নিকট ব্রাহ্মণ যাচিঞ্চা করিয়া কহিলেন, শুনহে বল্লাল সেন তোমার মাতামহ কুলোদ্ভব আদিশূর পঞ্চগোত্রে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া গৌড়মণ্ডল পবিত্র করিয়াছেন। আমরা যবনাক্রান্ত দেশে বাস করি, আমারদিগের দেশে কিঞ্চিৎ ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়া আমারদিগের দেশ পবিত্র করি।"

"আদিশূর সম্বন্ধে যে সকল জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে এইটাই সর্বাপেক্ষা প্রবল। কুলজ্ঞগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ইতিহাস-সঙ্কলন নহে, বংশাবলি রক্ষা। বংশাবলি অনুসারে হিসাব করিলে, আদিশূরের যে সময় নির্ধারিত হয়, তাহার সহিত এই জনশ্রুতির সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে। "গৌড়ে-ব্রাহ্মণ" কার বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বর্তমান ব্যক্তির পুরুষ সংখ্যা ভট্টনারায়ণ হইতে ৩৬/৩৭ এবং ৩৮ পুরুষ, কাশ্যপগোত্রে ৩১/৩২/৩৩/৩৪ পুরুষ, ভরদ্বাজগোত্রে ৩৫ হইতে ৩৯ পুরুষ, কিন্তু বাৎস্যগোত্রে ২৫ হইতে ২৮ পুরুষ দৃষ্ট হয়।" রাঢ়ীয় সমাজে ৩৫ হইতে উর্ধ্বতন সমাজের লোক বিরল। বাৎস্যগোত্র ছাড়িয়া দিলে, বর্তমানকালকে আদিশূর-আনীত ব্রাহ্মণগণের কাল

হইতে গড়পড়তায় ৩৪/৩৫ পুরুষের কাল বলা যাইতে পারে। প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে, আদিসূর ৮৫০ বৎসর পূর্বে [১০৬০ খ্রিস্টাব্দে] বর্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই অনুমান, "বেদবাণাঙ্ক-শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতঃ "[৯৫৪ শকে বা ১০৩২ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন] এই কিংবদন্তীর বিরোধী নহে, এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কর্ণাট-রাজকুমার বিক্রমাদিত্যের সহিত বল্লালসেনের পূর্বপুরুষের গৌড়ে আগমনকালের সহিত ঠিকঠাক মিলিয়া যায়। প্রথম রাজেন্দ্র-চোলের তিরুমলয়লিপিতে দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিপতি রণশূরের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আদিশূরকে রণশূরের পুত্র বা পৌত্র ধরিয়া লইলে, কোনও গোলই থাকে না"[১৭]

সম্প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় "বঙ্গীয় কুলশাস্ত্রে মূল্য শীর্ষক" একটি প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষ' পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, সম্ভবত আরও করিবেন। [২৭ বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা কার্তিক—১৩৪৬]

মূলত উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বের সঙ্কলিত কুলপঞ্জিকা লইয়া এই প্রবন্ধ লিখিত। তাহার মতে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ব্যাপক ও বিধিবদ্ধভাবে এবং কোনও বিশেষ ঐতিহাসিক তথ্য সমর্থনের জন্য কুলগ্রন্থ জাল করা হইয়াছে, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং, যে সমুদয় প্রাচীন কুলগ্রন্থের বহুল প্রচলন ছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে যাহার পুঁথি আবিষ্কৃত ও পরিচিত হইবার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে—প্রধানত তিনি সেই সমুদয় গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা বিচারে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকাল কুলজি-শাস্ত্রের প্রধান যুগ বলিয়া মনে করি। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর কয়েকখানি হস্তলিখিত কুলপঞ্জির পুঁথি আছে এবং গীতাচার্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন মহাশয়ের নিকটও কতকগুলি পুঁথির সন্ধান মিলিবে। অন্যত্র প্রাচীন পুঁথি খুঁজিলে আরও হয়ত পাওয়া যাইতে পারে। বিশেষত যে যে কুলপঞ্জিতে কুলীনগণের বংশ পরিচয় আছে তাহার সন্ধান বঙ্গদেশের নানাস্থানেই মিলে, তাহার মধ্যে ভ্রমপ্রমাদ বিশেষ নাই বলিয়াই অনেকে মনে করেন। জানিনা তাহা কতদূর সত্য।

আমাদের মনে হয় ডক্টর মজুমদার মহাশয়ের মত বিচক্ষণ ব্যক্তি বঙ্গীয়-কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণ করিতে অগ্রসর হইয়া খুবই ভাল করিয়াছেন। তিনি আদিশূর সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "মহেশকৃত নির্দোষ কুলপঞ্জিকা আর একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। নুলোপঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা অনুসারে মহেশ লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক। কিন্তু ইহা সত্য কি না এবং সত্য হইলেও এই দুই মহেশ অভিন্ন কি-না এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট কোনও প্রমাণ নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার একখানি পুঁথি আছে, কিন্তু তাহা বিশেষ প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রন্থে আদিশূরের কোনও উল্লেখ নাই।"

আমরা আদিশূর সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। কুলগ্রন্থ এবং প্রচলিত জনপ্রবাদ ব্যতীত যখন কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। গজারিগাছ সম্বন্ধে যে জনপ্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহার মূলে কোনও সত্য আছে কিনা কে বলিতে পারে?

ময়নামতীর পুঁথি ও শ্রীবিক্রমপুর ঃ

ময়নামতীর পুঁথিতে, ময়নামতী ও রাজা গোপীচাঁদের গানে বিক্রমপুরের নাম রহিয়াছে। ময়নামতীর গান আনুমানিক ১১শ—১২শ শতাব্দীর বিরচিত বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। ময়নামতীর চারিদেশে চারিটি বাড়ি থাকার বিষয় নির্দিষ্ট রহিয়াছে। যথা—

"অব্রেথা হইলে শিষ্যা খ্যেতীর উপর।
এক নাম রাখি জাব মেহ্রাকুল শহর।।

আদ্ধামাটি আছে কিছু মেহারকুল নগরে।
নিজ মাটি আছে কিছু মেহারকুল নগরে।।
নিজ মাটি আছে কিছু বিক্রমপুর শহরে।।
আর আছে আদ্ধ্যমাটি তরফের দেশ।
ছাটি গ্রাম পূর্বমাটি জানিবা বিশেষ।।

রামপালের পূর্বদিকস্থ গ্রাম পঞ্চসার হইতে পশ্চিমে মীরকাদিমের খাল, উত্তরে ফিরিঙ্গিবাজার, রিকাবিবাজার হইতে দক্ষিণে মাকুহাটির খাল পর্যন্ত ২৫ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া শ্রীবিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি-চিহ্ন কতক বাহিরে কতক মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে। এ সমুদয় কীর্ত্তি-চিহ্ন হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীবিক্রমপুর একদিন সত্য-সত্যই বহু সৌধরাজি-সমাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। ইতিহাসের ক্রমোন্নতির সহিত এইরূপ আশা করা যায় যে, নব নব আবিষ্কারের দ্বারা বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাস আরও উজ্জ্বলতর হইবে।

১. সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তৎ-প্রণীত "মানস সরোবর ও কৈলাস" নামক ভ্রমণ কাহিনীতে লিখিয়াছেন—আসকোট নামক স্থানের রাজওয়ারা সাহেবের পরিচয় সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জানিয়াছিলাম। ইহারা রাজা গজেন্দ্রসিংহ পাল বাহাদুরের বংশধর "কুতুর" রাজবংশ বলিয়া ইহাদের খ্যাতি চলিয়া আসিতেছে। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ঢাকা বিক্রমপুরের পালবংশীয়ের রাজাগণ .... বখ্‌তিয়ার খিলজির আমলে বিতাড়িত হইয়া এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই রাজওয়ারা সাহেব এক্ষণে তাহাদেরই বংশধর"। বলা বাহুল্য যে, ইহা কিংবদন্তী মাত্র। ইহার মধ্যে কোনও ঐতিহাসিক সত্য আছে কি না বলা কঠিন।
২. ঢাকার ইতিহাস—দ্বিতীয় ভাগ, বিক্রমপুর মাসিক পত্রিকা—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, নবাবিষ্কৃত (বিক্রমপুরের?) ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই-একটি কথা—কামিনীকুমার ঘটক—৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা—দ্বাবিংশ ভাগ।
৩. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড।
৪ *Buddhist Iconography* Page 39.—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য এম, এ.।
৫. আউটশাহি গ্রামের অনতিদূরে একরূপ সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র গ্রামের নাম বলুই। বলুইয়ের পূর্ব নাম "রাণীহাটি।" রানীহাটি কোনও রানীর নাম—স্মৃতি বহন করিতেছে, এত কাল পরে সে কথা কে বলিবে? রানীহাটি গ্রামের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত ইষ্টক সমূহ প্রাচীনের কীর্ত্তি বিভূষিত জনবহুল নাগরিক সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়। এই গ্রামের একটি পুষ্করিণী খনন করিতে বহু দেব-দেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। সে সকলের অধিকাংশই লুপ্ত, যে কয়েকটি মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়া সযত্নে রক্ষিত আছে তন্মধ্যে গণেশ, বরাহবতার, নটরাজ, পরশুরাম, বিষ্ণু-মূর্ত্তি ইত্যাদি। আমি বলুই গ্রাম হইতে একটি বিষ্ণুমূর্ত্তির সন্ধান পাইয়া উহার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এই মূর্ত্তিটি আউটশাহি বাল্যাশ্রমে আছে। বিক্রমপুরের প্রাচীন ভাস্কর্য-কীর্ত্তি, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত ও লিখিত—বিক্রমপুর [১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা কার্তিক ১৩৩০]
৬. *Iconography of Buddhist and Brahmanical sculptors in the Dacca Museum*—273-74.
৭. পল্লী-বিজ্ঞান—প্রথম ভাগ ৫ম সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ—১৮৬৭ জুন।
৮. "The place where the Hindu Princes resided is still pointed out at Rampal a little to the west of Firinghibazar. The site of the palace of King Ballalsen consists of quadrangular mound of earth. covering an area of about three thousand square feet wide. There are no traces of buildings within this enclosed space, but in its vicinity and in the country for many miles around mounds of bricks and wall foundations at a great depth below the surface are met with, and were formerly used as building materials for the construction of house in the city. Near the site of Ballalsen's palace there is a deep excavation called

Agni Kundu, where it is said that the Hindu Prince of Vikrampur, and his family burned themselves to the approach of the Musalman : [Hunter's *Stastical Account of Bengal* (Dacca Division) Page 70.]

বিক্রমপুরের প্রাপ্ত শ্রীমূর্তি পরিচয় স্বতন্ত্র ভাবে "বিক্রমপুরের ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ডে চিত্র সহ আলোচিত হইবে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতেছি মাত্র। সেজন্যই মূর্তি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইল না।

মুন্সিগঞ্জ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীগণ (Subdivisional Officer) অনেকেই রামপাল সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন কিংবা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাদের সে সমুদয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ যে সমুদয়ই প্রামাণিক এমন কথা বলা চলে না। আমরা এখানে তাহাদের কয়েকজনের ও অন্যান্য লেখকগণের নাম করিলাম।

(১) *Ruins and Antiquities of Rampal*-by Asutosh Gupta Esq. C. S. J. R. A. B. & I 1889.

(২) *Arch. Survey of India Reports* Vol XX Bihar & Bengal, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, *রামপালের বিবরণ* ইত্যাদি।

১০. বিক্রমপুর বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য-প্রবাসী ১৩৪২।

১১. *J. A. S. B.* 1889.

১২. *J. R. A. S. B.* 1889 *The Antiquities of Rampal*, by A. T. Gupta. গৌড়ের ইতিহাস ১০২ পৃষ্ঠা। শ্রীবিক্রমপুর ও তাহার উপকণ্ঠ-শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী। প্রবাসী আষাঢ়, ১৩২২ ১৫শ ভাগ, ১ম ভাগ ৩য় সংখ্যা।

১৩. (1) *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum*, x. (2) Theer is a comparatively small tank in the south-west part of Rampal, which deserves a passing notice. It is called Raja Haris Chandra's dighi. It is overgrown with trees and shrubs which are flooded over with water for a week once a year of the time of the full moon in the month of Magh. Before and after this period the tank is dry. * * * the tank is said to have beeb excavated by Raja Haris Chandra, probably one of the Kings of the Pal dynasty. P. 22, J.A.S.B. 1889. সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস—স্বরূপচন্দ্র রায়। 'বিক্রমপুর' পত্রিকা যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত, ১৩২০ সাল, প্রথম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। মীরকাদিমের খাল—৭৭—৮৯ পৃষ্ঠা। নলিনীকান্ত ভট্টশালী।

১৪. ভারতবর্ষের ইতিহাস—ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন ও ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী ৯৩ পৃষ্ঠা, আদিশূর সম্বন্ধে যাহারা বিস্তৃতভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলি আলোচনা করিবেন—ঢাকার ইতিহাস ২য় খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, শূরবংশ। বাংলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। গৌড়ের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়। গৌড়রাজমালা, আদিশূর। গৌড়ে ব্রাহ্মণ, মহিমাচন্দ্র মজুমদার প্রণীত, ও বিবিধ পুস্তকাবলি।

১৫. গৌড়ের ইতিহাস, ৬৯-৭৯ পৃষ্ঠা।

১৬. Up to date on authentic account of Adisura has been obtained. The oldest writers on Brahmanical genealogy whose writings have come down to us—I refer particularly to Hari Misra and Eru Misra—place Adisura shortly before the Palas: and they state that shortly after the arrival of the five Brahmans from Kanauj, the kingdom of Gaur became subject to the Palas (U.C. Batavyal, in J.A.S.B. Part. I Vol. I viii (1894, p. 41)

Ranasura of Souhern Radha (the Burdwan Division) seems to have belonged to Sura dynasty of Bengal who are said to have brought the five Brahmanas from Kanauj. That they were disposed of the greater part of their dominions by the Palas is also asserted by the Bengal genealogists. *Ranasura* was one of the chiefs who helped Mahipal to repel the invasion of Rajendra Chola, king of Kanchi, about A.D. 1023. (H. P. Sastri, Mem A.S.B. Vol. iii (1910, p. 10). The site of the palace of Adisura is pointed out at the northern end of the ruins of Gaur. (E. India, Vol. III.,27).

১৭. *গৌড়রাজমালা* ৫৬—৫৮ পৃষ্ঠা।

পরিশিষ্ট

বিজয়সেনের দেবপাড়া লিপি



মূল প্রশস্তি ও ইহার বঙ্গানুবাদ

ওঁ নমঃ শিবায়।

বক্ষোংশুকাহরণসাধ্বসকৃষ্টমৌলি—
মাল্যচ্ছটাহতরতালয়দীপভাসঃ।
দেব্যাস্ত্রপামুকুলিতং মুখমিন্দুভাভি—
র্বীক্ষ্যাননানি হসিতানি জয়ন্তি শম্ভোঃ।।১।।

১। স্বামী বক্ষঃস্থলের বস্ত্র হরণ করিবেন এই ভয়ে মস্তকস্থিত মাল্যগুচ্ছদ্বারা রমণ-ভবনের প্রদীপ-জ্যোতিঃ (যিনি) নির্বাপিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই দেবীর (পার্বতীর) লজ্জামুকুলিত মুখ (মস্তকস্থিত) চন্দ্রের আলোকে নিরীক্ষণ করিয়া (পঞ্চমুখ) শম্ভুর সহাস্য বদনাবলী জয়যুক্ত হউক।

লক্ষ্মীবল্লভ-শৈলজদয়িতয়োরদ্বৈত-লীলাগৃহং
প্রদ্যুম্নেশ্বর-শব্দলাঞ্ছনমধিষ্ঠানং নমস্কুর্ম্মহে।।
যাত্রালিঙ্গনভঙ্গকাতরতয়া স্থিত্বান্তরে কান্তয়ো—
র্দ্দেবীভ্যাং কথমপ্যভিন্নতনুতাশিল্পেঽন্তরায়ঃ কৃতঃ।।২।।

২। লক্ষ্মীপতি (হরি) ও পর্বতী-পতি (হরের) অদ্বৈত-লীলার গৃহস্বরূপ 'প্রদ্যুম্নেশ্বর' নামে প্রখ্যাত এই অধিষ্ঠানকে (দেবনিবাস বা দেবমূর্তিকে) নমস্কার করিতেছি, যাহাতে দেবীদ্বয় স্ব-স্ব কান্তের বা স্বামীর আলিঙ্গন ভঙ্গ হইবে এই কাতরতায় তাহাদের মধ্যবর্তিনী থাকিয়া কোনও প্রকারে তাহাদের এক শরীরতার নির্মাণবিষয়ে বিঘ্ন বিধান করিতেছেন।

যৎ-সিংহাসনমীশ্বরস্য কনকপ্রায়ং জটামণ্ডলং
গঙ্গাশীকরমঞ্জরীপরিকরৈর্যচ্চামরপ্রক্রিয়া।
শ্বেতোৎফুল্ল-ফণাঞ্চলঃ শিব-শিরঃসন্দানদামোরগ—
শ্ছত্রং যস্য জয়ত্যসাবচরমো রাজা সুধাদীধিতিঃ।।৩।।

৩। মহাদেবের কনক-প্রায় জটামণ্ডল যে রাজার সিংহাসন, গঙ্গার শিকর-মঞ্জরি-সমূহদ্বারা যাহার চামর-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে, এবং শ্বেতবর্ণের উৎফুল্ল বা সুবিস্তৃত ফণাপ্রান্ত-বিশিষ্ট শিবমস্তকের বেষ্টন-মাল্য রূপী সর্প যাহার ছত্র—সেই আদি রাজা অমৃত-কিরণ (চন্দ্রদেব) জয় লাভ করুন।

বংশে তস্যামরস্ত্রী-বিততরতকলাসাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য—
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।

যচ্চারিত্রানুচিন্তা পরিচয়শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারাঃ
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ।।৪।।

৪। দেবস্ত্রীগণের সহিত সম্পাদিত রতিকলার সাক্ষীভূত সেই চন্দ্রদেবের বংশে, চতুর্দিকে কীর্তিমান বীরসেন- প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; পরাশয়-তনয় (ব্যাসদেব) বিশ্বজনের কর্ণ পরিসরের প্রীতির জন্য যাহাদের চরিত্রকথার সতত স্মরণের পরিচয় হেতু পবিত্র সূক্তিমধুধারা রচনা করিয়াছেন।

তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদন-ব্রহ্মবাদী
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।
উদগীয়ন্তে যদীয়াঃ স্খলদুদধিজলোল্লোলশীতেষু সেতোঃ
কচ্চান্তেষ্বপ্সরোভি র্দশরথতনয়-স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধগাথাঃ।।৫।।

৫। শত শত শ্রেষ্ঠ প্রতিযোদ্ধার উন্মূলন করিয়া পারদর্শী, ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়গণের কুলশেখর, সামন্তসেন নামক ব্যক্তি সেই সেনবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—দশরথ-তনয় রামচন্দ্রের তুলনায় যাহার যুদ্ধগাথা, সেতুবন্ধের স্খলদ্‌জলধিজলের উত্তালতরঙ্গ-সম্পর্কে শীতল কচ্ছপ্রদেশসমূহে, অপসরোগণ-কর্তৃক উচ্চৈঃস্বরে গীত হইত

যস্মিন্ সঙ্গরচত্বরে পটুরটত্তূর্য্যোপহূতদ্বিষ-
দ্বর্গে যেন কৃপণকালভুজগঃ খেলায়িতঃ পাণিনা।
দ্বৈধীভূতবিপক্ষকুঞ্জরঘটা-বিশ্লিষ্টকুম্ভস্থলী-
মুক্তস্থূলবরাটিকাপরিকরৈর্ব্ব্যাপ্তং তদদ্যাপ্যভূৎ।।৬।।

৬। যে যুদ্ধ-চত্বরে পটুনিনাদশীল তূর্যের (ধ্বনিতে) শত্রুবর্গকে আহ্বান করিয়া তিনি (সামন্তসেন) নিজ পাণিদ্বারা কৃপণরূপ কালসর্পকে খেলাইতেন। সেই (যুদ্ধচত্বর) অদ্যাপি দ্বিধাচ্ছিন্ন শত্রু গজঘটার বিশ্লিষ্ট কুম্ভস্থল হইতে বিনির্গত স্থূল বরাটিকাসদৃশ মুক্তা-সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

গৃহাদ্‌গৃহমুপাগতং ব্রজতি পত্তনং পত্তনা-
দ্বনাদ্বনমনুদ্রুতং ভ্রমতি পাদপং পাদপাৎ।
গিরের্গিরিমধিশ্রিতস্তরতি তোয়াধিস্তোয়ধে-
র্যদীয়মরিসুন্দরীসরকপৃষ্টলগ্নং যশঃ।।৭।।

৭। শত্রু বনিতাদিগের সরক-পৃষ্টে (গমনাগমনের অবিচ্ছিন্ন পংক্তিতে) সংলগ্ন হইয়া যদীয় যশঃ গৃহ হইতে গৃহে উপস্থিত হইতে, (পত্তন) নগর হইতে নগরে চলিয়া যাইত, বন হইতে বনে দৌড়াইত, পাদপ হইতে পাদপে ভ্রমণ করিত, গিরি হইতে গিরিতে আশ্রয় লইত এবং সমুদ্র হইতে সমুদ্রান্তর পার হইয়া যাইত।

দুর্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণ-কর্ণাটলক্ষ্মী-
লুণ্টাকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গবীরঃ।
যস্মাদাদ্যাপ্য বিহিতবসামানসমেদঃসুভিক্ষাং
হৃষ্যৎপৌরস্ত্যজতি ন দিশং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা।।৮।।

৮। একাঙ্গবীর (অ-চতুরঙ্গবলান্বিত) অর্থাৎ, অসহায় বীর (সামন্ত সেন) অরিকুলাকীর্ণ কর্ণাটরাজলক্ষ্মীর লুণ্ঠণকারী দুর্বৃত্তগণের এরূপ বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন যে, প্রেতভর্তা (কৃতান্ত) হর্ষান্বিত পুরবাসীগণ সহ অদ্য পর্যন্ত বসা, মাংস ও মেদঃপিণ্ডের অনিঃশেষিত ভাণ্ডার-যুক্ত দক্ষিণদিক পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না।

উগ্‌দন্ধীন্যাজ্যধূমৈর্ম্মৃগশিশুরসিতাখিন্ন-বৈখানস-স্ত্রী-
স্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিত-ব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনাসেব্যন্ত শেষে বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যাশ্রমাণি।।৯।।

৯। যে স্থানগুলি আজ্যধূমে সুগন্ধ, যেখানে মৃগশিশুরা অখেদযুক্ত বৈখানস-স্ত্রীগণের স্তন্যদুগ্ধ আস্বাদন করিত, যেখানে কীর (শুক) পক্ষিগণ বেদপারায়ণে অভ্যস্ত থাকিত এবং যেখানে প্রান্তপ্রদেশগুলি ভবভয়তিরস্কারী মস্করীন্দ্রগণদ্বরা (সন্ন্যাসীগণদ্বারা) পরিপূর্ণ থাকিত, গঙ্গার পুলিনপরিসরের অরণ্যে অবস্থিত সেই পূণ্যাশ্রমসমূহ তিনি (সামন্তসেন) শেষ বয়সে আশ্রয় করিয়াছিল।

অচরমপরমাত্মজ্ঞানভীস্মাদমুষ্মা-
ন্নিজভুজমদমত্তারাতিমারাঙ্কঃ বীরঃ।
অভবদনসানোম্ভিন্ননির্ম্মিক্তুতত্তদ্-
গুণনিবহমহিম্নাং বেশ্ম হেমন্তসেনঃ।।১০।।

১০। আদ্য পরমাত্মার জ্ঞানবশত (লোকের) ভয়োৎপাদক সেই (সামন্তসেন) হইতে, নিজবাহুদর্পে মত্ত শত্রুকুলের ধ্বংসসাধনে প্রখ্যাত বীর, নিরন্তরবিকাশী নির্মল সর্ব-প্রকার গুণনিবহের মাহাত্ম্য-গৃহস্বরূপ, হেমন্তসেন-নামক ব্যক্তি জন্ম লাভ করিয়াছেন।

মুর্দ্ধন্যর্দ্ধেন্দু চূড়ামণি-চরণরজঃ সত্যবাক্কণ্ঠভিত্তৌ
শাস্ত্রং শ্রোত্রেরিকেশাঃ পদভুবি ভুজয়োঃ ক্রূরমৌর্ব্বীকিণাঙ্কঃ।
নেপথ্যং যস্য জজ্ঞে সততমিয়দিদং রত্নপুষ্পাণি হারা-
স্তাড়ঙ্কং নূপুরস্রক্কনকবলয়মপ্যস্য ভৃত্যাঙ্গনানাম্ ।।১১।।

১১। অর্দ্ধেন্দুশেখর (মহাদেবের) চরণধূলি যাহার মস্তকে, সত্যবাক্য যাহার কর্ণভিত্তিতে, শাস্ত্রকথা যাহার কর্ণে, (পদানত) শত্রুর কেশগুচ্ছ যাহার পদভূমিতে, কর্কশ জ্যাঘাতের কিণ-চিহ্ন ভুজদ্বয়ে—এইগুলিই কেবল সর্বদা যাহার ভূষণরূপে পরিগণিত হইত, (হেমন্তসেনের) সেবকজনের রমণীদিগের, কিন্তু, (মস্তকে) রত্নপুষ্পসমূহ, (কর্ণভিত্তিতে) হারাবলী, (কর্ণে) কর্ণপূর, (পদস্থলে) নূপুরমালা এবং (ভুজদ্বয়ে) কনকবলয় (ভূষণরূপে) শোভমান ছিল।

যদ্দোর্ব্বল্লিবিলাস-লব্ধগতিভিঃ শল্যৈর্ব্বিদীর্ণৈরিসাং
বীরাণাং রণতীর্থ বৈভববলাদ্দিব্যং বপুর্ব্বিভ্রতাম্।
সংসক্তামরকামিনীস্তনতটীকাশ্মীর পত্রাঙ্কিতং
বক্ষঃ প্রাণিব মুগ্ধসিদ্ধমিথুনৈঃ সাতঙ্কমালোকিতম্।।১২।।

১২। যাহার বাহুবল্লীর বিলাসে উৎক্ষিপ্ত বাণসমূহদ্বারা বিদীর্ণবক্ষাঃ বীরগণ রণতীর্থের মাহাত্ম্যবশত দিব্য শরীর ধারণ করিয়া (স্বর্গে) অনুরাগবতী দেবকামিনীগণের স্তনতটে শোভিত কুঙ্কুমপত্রের রক্তিমায় নিজ নিজ বক্ষঃস্থল অঙ্কিত করিলে পর, মুগ্ধ সিদ্ধমিথুনগণ পূর্বের ন্যায় (রক্তাঙ্কিত মনে করিয়া) ইহার প্রতি আতঙ্কের সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে।

প্রত্যর্থিব্যয়কেলিকর্ম্মণি পুরঃ স্মেরং মুখং বিভ্রতো
রেতস্যৈতদসেশ্চ কৌশলমভূদ্দানে দ্বয়োরদ্ভুতম্।
শত্রোঃ কোপিহদধে-বসাদমপরঃ সখ্যুঃ প্রসাদং ব্যধা
দেকো হারমুপাজহার সুহৃদামন্যঃ প্রহারং দ্বিষাম।।১৩।।

১৩। সম্মুখে সহাস্যবদন ধারণ করিয়া প্রত্যর্থিবর্গের (রাজপক্ষে প্রার্থয়িতাদের, আর অসিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বীদের) ব্যয়রূপ (রাজপক্ষে অর্থব্যয়রূপ, আর অসিপক্ষে বিনাশরূপ) ক্রীড়া করিবার সময়ে, এই ব্যক্তির (হেমন্তসেনের) ও তাহার অসির (এই উভয় বস্তুর) দান বিষয়ে (একতঃ দান করা কার্যে, অন্যতঃ ছেদন কার্যে) অদ্ভুত কৌশল লক্ষিত হইত। এক বস্তু (তদীয় অসি) শত্রুর অবসাদ বিধান করিতেন ও অপর বস্তু (হেমন্তসেন স্বয়ং) মিত্রের প্রসাদ বিধান করিতেন ; আবার এক বস্তু (তিনি নিজে) সুহৃদ্বর্গের হার উপহার দিতেন ও অন্য বস্তু (তদীয় অসি) অরাতিকুলের প্রহার উপহার দিত।

মহরাজ্ঞী যস্য স্বপরনিখিলান্তঃপুরবধূঃ—
শিরোরত্নশ্রেণীকিরণসরণিস্মেরচরণা।
নিধিঃ কান্তেঃ সাধ্বীব্রতবিততনিত্যোজ্জ্বলযশা
যশোদেবী নাম ত্রিভুবনমনোজ্ঞাকৃতিরভূৎ।।১৪।।

১৪। যাহার চরণযুগল নিজের ও পরের সমগ্র অন্তঃপুরস্থিত বধূগণের শিরোরত্ন শ্রেণির কিরণপুঞ্জে রঞ্জিত হইয়া সহাস্যবৎ প্রতীয়মান হইত, কান্তির আধার যিনি সাধ্বীব্রত দ্বারা নিত্যোজ্জ্বল যশোরাশি বিস্তার করিতেন, ত্রিলোকসুন্দরাকৃতি সেই যশোদেবী নামক দেবী তাহার (হেমন্তসেনের) মহারাজ্ঞী ছিলেন।

ততস্ত্রিজগদীশ্বরাৎ সমজনিষ্ট দেব্যাস্ততো—
প্যরাতিবলশাতনোজ্জ্বল-কুমারকেলিক্রমঃ।
চতুর্জ্জলধিমেখলাবলয়সীমবিশ্বম্ভরা—
বিশিষ্টজয়সান্বয়ো বিজয়সেন-পৃথ্বীপতিঃ।।১৫।।

১৫। যাহার কুমার-কেলি-ক্রিয়া শত্রুবলের উচ্ছেদসাধনে জাজ্জ্বল্যমান থাকিত এবং যিনি চতুঃসমুদ্র-মেখলাবলয়বেষ্টিত পৃথিবীর বিশিষ্ট জয়লাভ করিয়া সার্থকনামা হইয়াছিলেন, সেই বিজয়সেন ভূপতি সেই (ত্রিজগদীশ্বর হেমন্তসেন) ও সেই দেবী (যশোদেবী) হইতে জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

গণয়তু গণশঃ কো ভূপতীংস্তাননেন
প্রতিদিনরণভাজা যে জিতা বা হতা বা।
ইহ জগতি বিষেহে স্বস্য বংশস্য পূর্ব্বঃ
পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ।।১৬।।

১৬। প্রতিদিন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তিনি কত ভূপতিকে পরাজিত বা নিহত করিয়াছিলেন, কে তাহা গণে গণে গণনা করিতে সমর্থ? তিনি এই জগতে তদীয় নিজ বংশের পূর্ব (প্রথম) পুরুষ বলিয়া একমাত্র চন্দ্রেই রাজশব্দের প্রয়োগ সহ্য করিতেন।

সংখ্যাতীতকপীন্দ্রসৈন্যবিভুনা তস্যারিজেতুস্তুলাং
কিং রামেণ বদাম পাণ্ডবচমূনাথেন পার্থেন বা।
হেতোঃ খড়্গলতাবতংসিতভুজামাত্রস্য যেনার্জ্জিতং
সপ্তাম্ভোধিতটীপিনদ্ধবসুধাচক্রৈকরাজ্যং ফলম্ ।।১৭।।

১৭। যিনি একমাত্র অসিলতাবিভূষিত ভুজমাত্রের সাহায্যে সপ্তসমুদ্রতটবেষ্টিত বসুধাচক্রের ঐকরাজ্যরূপ ফল অর্জন করিয়াছিলেন—সেই শত্রুবিজেতা (বিজয়সেনের) তুলনা কি অসংখ্য বানরসেনার অধিনায়ক রামচন্দ্রের সহিত, কিংবা পাণ্ডবসেনাপতি পার্থের (অর্জুনের) সহিত করা যাইতে পারে?

একৈকেন যৈঃ গুণেন মৈঃ পরিণতং তেষাং বিবেকাদৃতে
কশ্চিদ্ধন্ত্যপরশ্চ রক্ষতি সৃজত্যন্যশ্চ কৃৎস্নং জগৎ।
দেবোয়ং তু গুণৈঃ কৃতো বহুতীথৈ ধীমান্ জঘান দ্বিষো
বৃত্তস্থানপুষচ্চকার চ রিপুচ্ছেদেন দিব্যাঃ প্রজাঃ ।।১৮।।

১৮। যে তিন দেবতা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) কেবল এক একটি গুণবশতঃ পরিণাম (স্বস্বকার্যে উন্নতি) লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বিনা বিবেচনায়, এক দেবতা (শিব) কেবল সমগ্র জগতের নাশকার্য, এক দেবতা (বিষ্ণু) কেবল ইহার রক্ষাকার্য ও অপর দেবতা (ব্রহ্মা) কেবল ইহার সৃষ্টিকার্য পরিচালন করিতেছেন। কিন্তু, গুণবাহুল্যে দেবরূপে পরিণত হইয়া এই ব্যক্তি (বিজয়সেন) ধী বা বিবেচনা সহকারে অরাতি বিনাশ, সমাজ মর্যাদার অনুলঙ্ঘনকারীদের পোষণ ও শত্রুচ্ছেদ করিয়া দিব্য (স্বর্গীয়) প্রজার সৃষ্টি, এই তিনকার্যই (একসঙ্গে) সম্পন্ন করিতেন।

দত্ত্বা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতিভৃতামুর্বীমুরীকুর্বতা
বীরাসৃগলিপিলাঞ্ছিতোঽসিরমুনা প্রাগেব পত্রীকৃতঃ।
নেত্থং চেৎ কথমন্যথা বসুমতীভোগে বিবাদোন্মুখী
তত্রাকৃষ্টকৃপাণধারিণি গতা ভঙ্গং দ্বিষাং সন্ততিঃ।।১৯।।

১৯। এই নরপতি ইতিপূর্বেই প্রতিদ্বন্দ্বীরাজগণকে দিব্য ভূমি (স্বর্গ) দান করিয়া (অর্থাৎ, তাহাদিগকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়া স্বর্গে প্রেরণ করিয়া), (তৎপরিবর্তে) তাহাদের ভূমি নিজে অধিকার করিয়া, বীররক্তে (লিখিত) লিপিদ্বারা লাঞ্ছিত বা চিহ্নিত তদীয় অসিকে শাসন বা পত্ররূপে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যদি তাহাই না হইত, তবে কেন তিনি আকৃষ্ট-কৃপণ-ধারী হইয়া (অগ্রসর হইলে), বসুমতীর ভোগবিষয়ে বিবাদোন্মুখ শত্রুসন্তানগণ পলায়ন-পর হইয়া যাইবে?

ত্বং নান্যবীরবিজয়ীত গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বান্যথামননরূঢ়-নিগূঢ়-রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপ—
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায় ।।২০।।

২০। "তুমি নান্য-বীর-বিজয়ী" (অর্থাৎ, নান্য ও বীর নামক রাজদ্বয়ের পরাজয়কারী) কবিগণের এই (স্তুতি) বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহার অর্থ অন্যথা ভাবিয়া (অর্থাৎ, "তুমি ন-অন্যবীর-বিজয়ী বা অন্য বীরকে পরাজিত করিতে সমর্থ হও নাই" এরূপ নিন্দাবাক্য মনে করিয়া) মনে রোষভাব লুক্কায়িত করিয়া তিনি গৌড়েন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কামরূপ ভূপতিকে বিদূরিত করিয়াছিলেন এবং কলিঙ্গ নরপতিকে বলপূর্বক পরাজিত করিয়াছিলেন।

শূরংমন্য ইবাসি নান্য কিনিহ স্বং রাঘব শ্লাঘসে
স্পর্দ্ধাং বর্দ্ধন মুঞ্চ বীর বিরতো নাদ্যাপি দর্পস্তব।
ইত্যন্যোন্যমহর্নিশপ্রণয়িভিঃ কোলাহলৈঃ ক্ষ্মাভুজাং
যৎকারাগৃহযামিকৈর্নিয়মিতো নিদ্রাপনোদক্রমঃ।।২১।।

২১। 'হে নান্য, যেন এখনও তুমি নিজকে শূর মনে করিতেছ', 'হে রাঘব, এখানে কেন নিজের শ্লাঘা করিতেছ', 'হে বর্ধন, স্পর্ধা ত্যাগ কর', 'হে বীর, অদ্যাপি তোমার দর্প বিরামলাভ করিতেছে না'—এইরূপে (কারারুদ্ধ) রাজগণের পরস্পরের প্রতি দিবারাত্রি

প্রজ্বলিত কোলাহলদ্বারা তাহার (বিজয়সেনের) কারাগারের যামিক বা প্রহরীগণ নিদ্রাচ্ছেদজনিত ক্লান্তির উপশম করিয়া লইত।

পাশ্চাত্যচক্রজয়কেলিষু যস্য যাব—
দগঙ্গাপ্রবাহমনুধাবতি নৌবিতানে।
ভর্গস্য মৌলিসরিদম্ভসি ভস্মপঙ্ক—
লগ্নোজ্ঝিতের তরিরিন্দুকলা চকাস্তি।।২২।।

২২। যাহার নৌবিতান (নৌ-বহর) পাশ্চাত্য (রাজ) চক্রের জয়রূপ কেলি-ক্রিয়াতে গঙ্গাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে অনুধাবন করিলে পর, শিবের মস্তকস্থিত নদীর (গঙ্গার) জলে ভস্ম-পঙ্কে লগ্ন হইয়া পরিত্যক্ত ইন্দুকলার ন্যায় তরী-সমূহ শোভা পাইতেছিল।

মুক্তাঃ কর্পাসবীজৈর্ম্মরকতশকলং শাকপত্রৈরলাবূ—
পুষ্পে রূপ্যাণি রত্নং পরিণতিভিদুরৈঃ কুক্ষিভির্দাড়িমানাম্।
কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকসিতকুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ
শিক্ষ্যন্তে যৎপ্রসাদাদ্বহুবিভবজষাং যোষিতঃ শ্রোত্রিয়াণাম্।।২৩।।

২৩। যাহার দানানুগ্রহে বহুবিভবভোগকারী শ্রোত্রীয়দিগের পত্নীগণকে নাগরিক স্ত্রীরা কর্পাসবীজদ্বারা মুক্তার, শাকপত্রদ্বারা মরকতমণিখণ্ডের, অলাবুপুষ্পদ্বারা রৌপ্যের, পরিপক্ক হইয়া স্ফুটনোন্মুখ দাড়িমকুক্ষি দ্বারা (অর্থাৎ, দাড়িমের অন্তঃস্থিত বীজদ্বারা) রত্নের এবং কুষ্মাণ্ডীলতার বিকশিত কুসুমদ্বারা সুবর্ণের পরিচয় শিক্ষা দিতেন।

অশ্রান্তবিশ্রাণিতযাজ্ঞযূপ—
স্তম্ভাবলীং দ্রাগবলম্বমানঃ।
যস্যানুভাবাদ্ভুবি সঞ্চচার
কালক্রমাদেকপদোপি ধর্ম্মঃ।।২৪।।

২৪। কালক্রমে (কলিকালে) ধর্ম একপদবিশিষ্ট হইলেও, যাহার (বিজয়সেনের) প্রভাবে সতত প্রদত্ত যজ্ঞযূপস্তম্ভাবলীকে তৎক্ষণাৎ অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিতে পারিতেন।

মেরোরাহতবৈরিসঙ্কুলতটাদাহূয় যজ্বামরান্
ব্যত্যাসং পুরবাসিনামকৃত যঃ স্বর্গ্গস্য মর্ত্তস্য চ।
উত্তুঙ্গৈঃ সুরসদ্মভিশ্চ বিততৈস্তল্লৈশ্চ শেষীকৃতং
চক্রে যেন পরস্পরস্য চ সমং দ্যাবাপৃথিব্যোর্ব্বপুঃ।।২৫।।

২৫। যিনি যজ্ঞকারী হইয়া (যুদ্ধে তাহার ভুজবলে) আহত শত্রু দ্বারা পূর্ণতট মেরু-পর্বত হইতে দেবগণকে (পৃথিবীতে) আহ্বান করিয়া স্বর্গের ও মর্ত্যের পুরবাসীগণের স্থান-বিনিময় বিধান করিয়াছিলেন; এবং যিনি অত্যুচ্চ দেবভবনও বিস্তৃত তল্ল বা তড়াগ দ্বারা কৃতাবশেষ স্বর্গ ও পৃথিবীর দেহকে পরস্পরের সমান (পরিমিত) করিয়া তুলিয়াছিলেন।

দিক্শাখামূলকাণ্ডং গগনতলমহাম্ভোধিমধ্যান্তরীপং
ভানোঃ প্রাক্প্রত্যগদ্রিস্থিতিমিলদুদয়াস্তস্য মধ্যাহ্নশৈলম্।
আলম্বস্তম্ভমেকং ত্রিভুবনভবনস্যৈকশেষং গিরীণাং
স প্রদ্যুম্নেশ্বরস্য ব্যধিত বসুমতীবাসবঃ সৌধমচ্চৈঃ।।২৬।।

২৬। সেই পৃথ্বীন্দ্র (বিজয়সেন) প্রদ্যুম্নেশ্বরের জন্য দিকশাখার মূলকাণ্ডস্বরূপ,

গগনতলরূপ মহাসাগরের মধ্যস্থিত অন্তরীপতুল্য, পূর্ব-পশ্চিম-পর্বতে অবস্থান করিয়া উদয় ও অস্তলাভকারী সূর্যদেবের মধ্যাহ্নপর্বতসদৃশ, ত্রিভুনরূপ ভবনের একমাত্র আশ্রয়স্তম্ভ ও গিরিসমূহের মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট পর্বতরূপী এক উচ্চ সৌধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

প্রাসাদেন তবামুনৈব হরিতামধ্বা নিরুদ্ধো মুধা
ভানোদ্যাপি কৃতোঽস্তি দক্ষিণাদিশঃ কোণান্তবাসী মুনিঃ।
অন্যামুচ্ছপথোয়মৃচ্ছতু দিশং বিন্ধ্যোপ্যসৌ বর্দ্ধতাং
যাবচ্ছক্তি তথাপি নাস্য পদবীং সৌধস্য গাহিষ্যতে।।২৭।।

২৭। হে সূর্যদেব, এই প্রাসাদদ্বারাই তোমার (রথের) অশ্বগণের পথ নিরুদ্ধ হইতেছে, তবে কেন অদ্যাপি বৃথাই (অগস্ত্য) মুনি দক্ষিণ দিকের এক কোণে বাস করিতেছেন? তিনি যদি শপথ ত্যাগ করিয়া অন্যদিকে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বিন্ধ্যপর্বতও যদি যথাশক্তি বর্ধিত হয়, তথাপি (সেই বর্ধিতমান বিন্ধ্য) এই সৌধের উচ্চপথ লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবে না।

স্রষ্টা যদি স্রক্ষ্যতি ভূমিচক্রে
সুমেরুমৃৎপিণ্ডবিবর্ত্তনাভিঃ।
তদা ঘটঃ স্যাদুপমানমস্মিন্
সুবর্ণকুম্ভস্য তদর্পিতস্য।।২৮।।

২৮। প্রজাপতি স্বয়ং যদি পৃথিবীরূপ চক্রের উপর সুমেরু পর্বতরূপ মৃৎপিণ্ড স্থাপন করিয়া তদ্বিবর্তন বা তদ্ঘূর্ণন দ্বারা (একটি ঘট) নির্মাণ করেন, তাহা হইলে সেই ঘটই এই সৌধে তদ্বারা (বিজয়সেন দ্বারা) অর্পিত সুবর্ণকুম্ভের একমাত্র উপমান হইতে পারে।

বিলেশয়বিলাসিনীমুকুটকোটিরত্নাঙ্কুর—
স্ফুরৎকিরণমঞ্জরীচ্ছুরিতবারিপূরং পুরঃ।
চখান পুরবৈরিণঃ স জলমগ্ন পৌরাঙ্গনা—
স্তনৈণমদসৌরভোচ্চলিতচঞ্চরীকং সরঃ।।২৯।।

২৯। তিনি ত্রিপুরারি (শিবের) জন্য (সেই সৌধের) সম্মুখে একটি সরোবর খনন করাইয়া দিয়াছিলেন—যে সরোবরের জলৌঘ (জলান্তর্বর্তিনী) নাগবধূদিগের মুকুটাগ্রের রত্নাঙ্কুর হইতে স্ফুরন্ত কিরণমঞ্জরীদ্বারা রঞ্জিত ছিল এবং যাহার উপরিভাগে (স্নানার্থ) জলমগ্ন পৌর রমণীদিগের স্তনতটে ব্যবহৃত মৃগমদের সৌরভে ভ্রমরকুল উড়িয়া বেড়াইত।

উচ্চিত্রাণি দিগম্বরস্য বসনান্যর্দ্ধাঙ্গনাস্বামিনো
রত্নালঙ্কৃতিভির্বিশেষিতবপুঃশোভাঃ শতং সুভ্রুবঃ।
পৌরাঢ্যাশ্চ পুরীঃ শ্মশানবসতে র্ভিক্ষাভুজোস্যাক্ষয়াং
লক্ষ্মীং স ব্যতনোদ্দরিদ্রভরণে সুজ্ঞো হি সেনান্বয়ঃ।।৩০।।

৩০। (শিব) দিগম্বর (নগ্ন) হইলেও তাহার জন্য নানাবর্ণাকৃতি বসনের, অর্ধ-নারীশ্বর হইলেও তাহার জন্য রত্নলঙ্কারে শরীর শোভাবর্ধনকারিণী একশত সুভ্রূ রমণী (সেবাদাসী), শ্মশানবাসী হইলেও তাহার জন্য পৌরজনপরিপূর্ণ অনেক পুরী এবং ভিক্ষাজীবী হইলেও তাহার জন্য অক্ষয় সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন—যেহেতু সেনবংশীয়গণ সবিশেষ জানেন কেমন করিয়া দরিদ্রভরণ করিতে হয়।

চিত্রক্ষৌমেভচর্ম্মা হৃদয়বিনিহিতস্থূলহারোরগেন্দ্রঃ
শ্রীখণ্ডক্ষোদভস্তমা করমিলিতমহানীলরত্নাক্ষমালঃ।

বেষস্তেনাস্য তেনে গরুড়মণিলতাগোনসঃ কান্তমুক্তা-
নেপথ্য-ন্‌রস্থিরিচ্ছাসমুচিতরচনঃ কল্পকাপালিকস্য।।৩১।।

৩১। তিনি (বিজয়সেন) ওই কল্পকাপালিক (শিবের) জন্য এইরূপ স্বেচ্ছারচিত বেশের ব্যবস্থা করিলেন, যে বেশে বিচিত্র ক্ষৌমবস্ত্র গজচর্মের, বক্ষঃস্থলবিনিহিত স্থূলহার সর্পরাজের, চন্দনচূর্ণ ভস্মের, করধৃত মহানীলমণি অক্ষমালার, গরুড়মণি-(মরকত)-লতা (অন্যান্য) সর্পসমূহের এবং রমণীয় মুক্তাভূষণ নরকপালের, কার্য সম্পাদন করিত।

বাহোঃ কেলিভিরদ্বিতীয়কনকচ্ছত্রং ধরিত্রীতলং
কুর্বাণেন ন পর্য্যশেষি কিমপি স্বেনৈব তেনেহিতম্।
কিন্তস্মৈ দিশতু প্রসন্নবরদোপ্যর্দ্ধেন্দুমৌলিঃ পরং
স্বং সাযুজ্যমসাবপশ্চিমদশাশেষে পুনর্দ্দাস্যতি।।৩২।।

৩২। বাহুদ্বয়ের কেলি দ্বারা তিনি পৃথিবীতলে একচ্ছত্রাধিপত্য স্বয়ং বিধান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার আর অন্য কিছু করণীয় অবশিষ্ট রহিল না। প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদানকারী চন্দ্রশেখর (শিব) তাহাকে আর কি দিবেন? কিন্তু তিনি অন্তিম দশার শেষে তাহাকে নিজ সাযুজ্য (মুক্তি) প্রদান করিবেন।

প্রস্তোতুমস্য পরিতশ্চরিতং ক্ষমঃ স্যাৎ
প্রাচেতসো যদি পরাশরনন্দনো বা।
তৎকীর্ত্তিপূরসুরসিন্ধুবিগাহনেন
বাচঃ পরিত্রয়িতুমত্র তু নঃ প্রযত্নঃ।।৩৩।।

৩৩। যদি কেহ পারেন, তাহা হইলে বাল্মীকি অথবা পরাশরতনয় ব্যাসদেবই তাহার চরিতের স্তুতি সম্পূর্ণভাবে করিতে সমর্থ হইবেন। তবে তাহার কীর্তি রাশিরূপ সুরনদীতে (গঙ্গাতে) অবগাহনদ্বরা নিজের বাণীকে পবিত্র করার জন্য এই বিষয়ে (এই প্রশস্তি রচনায়) আমাদের প্রযত্ন।

যাবদ্বাস্তোস্পতিপুরধুনী ভূর্ভুবঃস্বঃ পুনীতে
যাবচ্চান্দ্রী কলয়তি কলোত্তংসতাং ভূতভর্ত্তুঃ।
যাবচ্চেতো গময়তি সতাং শ্বেতিমানং ত্রিবেদী
তাবত্তাসাং রচয়তু সখী তত্তদেবাস্য কীর্ত্তিঃ।।৩৪।।

৩৪। যতদিন পর্যন্ত ইন্দ্রপুরীর (স্বর্গের) নদী (মন্দাকিনী) ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক পবিত্রিত করিবে, যতদিন পর্যন্ত চান্দ্রমসী কলা ভূতভরণকারী শিবের শিরোভূষণের কার্য করিবে, এবং যতদিন পর্যন্ত বেদত্রয় পণ্ডিতজনের চিত্তে শুদ্ধি আনয়ন করিবে—ততদিন পর্যন্ত ইহাদের (অর্থাৎ স্বর্গগঙ্গা, চন্দ্রকলা ও ত্রিবেদীর) সখিরূপে এই (রাজার) কীর্তিই সেই ক্রিয়া (অর্থাৎ, ত্রিলোক পবিত্রকরণ, শিবশিরোভূষণ ও পণ্ডিতগণের চিত্তসংশোধন) বিধান করুক।

নির্ম্মিক্তসেনকুলভূপতিমৌক্তিকানা—
মগ্রন্থিলগ্রথনপক্ষ্মলসূত্রবল্লিঃ।
এষা কবেঃ পদপদার্থবিচারশুদ্ধঃ—
বুদ্ধেরুমাপতিধরস্য কৃতিঃ প্রশস্তিঃ।।৩৫।।

৩৫। এই প্রশস্তি পদ ও পদার্থের বিচার দ্বারা শুদ্ধবুদ্ধি কবি উমাপতিধরের রচনা—ইহা যেন নিষ্কলঙ্ক সেনকুলভূপতিগণরূপ মুক্তাসমূহের গ্রন্থিরহিত গ্রথনকার্যের একটি মসৃণ সূত্রবল্লী।

ধর্ম্মপ্রণপ্তা মনদাসনপ্তা
বৃহস্পতেঃ সূনুরিমাং প্রশস্তিম্।
চখান বারেন্দ্রকশিল্পিগোষ্ঠী বারেন্দ্রকশিল্পিগোষ্ঠী—
চূড়ামণী রাণক-শূলপাণিঃ।।৩৬।।

৩৬। ধর্মের প্রণপ্তা, মনদাসের নপ্তা, বৃহস্পতির পুত্র, বারেন্দ্রকশিল্পীগোষ্ঠীর চূড়ামণি রাণক (উপাধিধারী) শূলপাণি এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন।

বিক্রমপুর

(সংক্ষিপ্ত)

হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়



কালীপাড়ার জমিদার বংশ ঃ

কালীপাড়ার জমিদার বংশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে মহারাজ বল্লাল সেনের সময় হইতেই আরম্ভ করিতে হইবে।

সেন বংশীয় রাজাদিগের মধ্যে বল্লাল সেন বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১১১৯ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। মহারাজ বল্লাল সেন বঙ্গদেশকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া রাঢ়, বারেন্দ্র, বাগড়ী, বঙ্গ ও মিথিলা আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। বল্লালের দেশ বিভাগ অনুসারেই বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণের মধ্যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ সময় হইতে বঙ্গে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর প্রাধান্য কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন হয় ; এক শ্রেণীর লোকের সহিত অন্য শ্রেণীর লোকের যৌন সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়।

মহারাজ বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্ণ সেন ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার শাসনকালে প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ দেবীবর বিশারদ লোকের গুণাগুণ অনুসারে কুলীন, বংশজ ও গোত্রীয় প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ করত মেলবন্ধন দ্বারা বল্লালী প্রথার আরও দৃঢ়তা সম্পাদন করেন।

আদিশূর আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে 'বেণী সংহার' নাটক প্রণেতা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কবি ভট্টনারায়ণ অন্যতম।

ভট্টনারায়ণ হইতে নিম্নে সপ্তদশ পুরুষ গঙ্গাধর এবং তৎপুত্র ভগীরথ, হরিহর ও রত্নগর্ভ। ইহারা কুলীন শ্রেণীর আচার্য শেখরি মেলীয় বন্দঘটী গাঁই বলিয়া প্রসিদ্ধ।

রত্নগর্ভের পুত্র বল্লভ। বল্লভের চারিপুত্রের মধ্যে বাণীনাথ হইতে ঢাকা জিলার কালীপাড়ার বারৈয্যা চৌধুরী জমিদার বংশ, যোগিনাথ হইতে ঢাকা জিলার কনকসারের বারৈষ্যা বংশ, যদুনাথ হইতে নদীয়া জিলার বেল পুকুরের (বিল্বপুষ্করিণীর) ঠাকুর ভট্টাচার্য বংশ এবং রামনাথ হইতে ফরিদপুর জিলার প্রিয়কাঠির বারৈয্যা বংশের উদ্ভব হইয়াছে। বল্লভের বংশধরগণ বর্তমানে নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন।

বাণীনাথের পুত্র মথুরানাথ বা মথুরেশ বিক্রমপুর বাইনখাড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি দুর্গাদাস মৌলিকের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া কুল ভঙ্গ হন।

মথুরানাথের পুত্র বলরাম। তৎপুত্র রঘুদেব। ইনি চাঁচুড়পাশা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই রঘুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় হইতেই পরবর্তী কালীপাড়ার জমিদার বংশ বিক্রমপুরে সামাজিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন।

রঘুদেবের, চন্দ্রশেখর ও কালীকাপ্রসাদ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ চন্দ্রশেখর 'কুলকল্পদ্রুম' গ্রন্থে চাঁদ নামে অভিহিত। কালীকাপ্রসাদের বংশধরগণ চন্দ্রশেখরের বংশধরগণের সহিত আজ পর্যন্তও এক সমাজে বসবাস করিয়া আসিতেছেন।

তৎকালে খরস্রোতা পদ্মা নদীর উত্তর তীরবর্তী উত্তর বিক্রমপুরে বাঘিয়া চাঁচুড়পাশা নামক দুইখানা প্রসিদ্ধ গ্রামে পাশাপাশিভাবে অবস্থিত ছিল। এই উচ্চাঙ্গের ব্রাহ্মণ সমাজের সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড তখনকার দিনে অভিনব ব্যাপার বলিয়া সকলেই মনে করিতেন। বাঘিয়া চাঁচুড়পাশা

সমাজ বিক্রমপুর কেন, সমস্ত পূর্ববঙ্গে একটি আদর্শ সমাজ বলিয়া গণ্য হইত। চাঁচুড়পাশার জমিদার বংশ ধনে-মানে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

বর্তমান শ্রীনগর থানা হইতে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে প্রায় ১১ মাইল ব্যবধান চাঁচুড়পাশা[১] গ্রাম অবস্থিত ছিল। চাঁচুড়পাশার খালের পূর্বপারে বাঘিয়া ও পশ্চিম পাড়ে চাঁচুড়পাশা। ইহার উত্তরে দাতারা গ্রাম, দক্ষিণ পূর্ব কোণে কৃষ্ণনগর, উত্তর পূর্ব কোণে গোপালপুর, পূর্বে বাঘিয়া ও পশ্চিমে পদ্মানদী। গ্রামখানা চারিদিকেই খাল দ্বারা বেষ্টিত হইয়া এক দুর্গাকারে পরিণত হইয়াছিল।

রামনারায়ণ বারৈয্যা চৌধুরী ঃ

চন্দ্রশেখরের পুত্র রামনারায়ণ বাংলা ১১২৪ সনে চাঁচুড়পাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রামনারায়ণের আকৃতি, স্বভাব ঋষির ন্যায় প্রতীয়মান হইত। সে সময়ের দেশাচার অনুসারে তাহার মস্তকের কেশদাম পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত বিলম্বিত ছিল।

রামনারায়ণ রূপবান, জ্ঞানবান ও হিন্দুধর্মে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি রাজর্ষির ন্যায় একদিকে বিষয় বৈভবে দৃষ্টি এবং অপর দিকে তপশ্চর্যায় মনোনিবেশ করিতেন। তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্মিনীও পতির অনুরূপা ছিলেন।

রামনারায়ণ সংস্কৃত, পার্শী ও উর্দু ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞোপবীত সংস্কারের পর হইতেই সদাচার অবলম্বন করেন। সে সময়ে দেশের সমস্ত নরনারী স্ব স্ব ধর্ম রক্ষার জন্য প্রাণপাত করিতেন। ত্রিসন্ধ্যামন্ত্র পাঠ না করিয়া কোন ব্রাহ্মণ জল গ্রহণও করিতেন না। সকল শ্রেণীর লোকই মণ্ডিত মস্তকের মধ্যস্থলে বড় বড় শিখার ন্যায় চুলের গুচ্ছ ধারণ এবং নানা ব্রতানুষ্ঠান, পদব্রজে তীর্থ পর্যটন ও দেশভ্রমণ করিত। কোনও প্রকার পাপজনক কার্যে লোক লিপ্ত হইত না ধর্মরক্ষার জন্য প্রাণাধিক পুত্র পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

রামনারায়ণের সূর্যনারায়ণ ও চন্দ্রনারায়ণ নামে দুই পুত্র এবং গঙ্গামণি, হরিপ্রিয়া, অভয়া ও নারায়ণী নাম্নী চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পুত্রগণ বয়োপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের প্রতি জমিদারি কার্যের ভারার্পণ করিয়া তিনি একমনে তপশ্চর্যায় নিরত থাকিতেন। ক্রমে পূর্ণাভিষেক ও শাক্তাভিষেক প্রভৃতি নানা তান্ত্রিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করত তিনি "আনন্দনাথ গিরি" উপাধি প্রাপ্ত হন এবং তদবধি তিনি 'রামনারায়ণ আনন্দনাথ গিরি' নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

কালীপাড়া 'বৌলবাড়ির' দির্ঘিকার তীরে এক বৃহৎ বিল্ববৃক্ষ মূলে তাহার তপশ্চর্যার নানাপ্রকার নিদর্শন বর্তমান ছিল। সময় সময় তথায় নানারূপ অলৌকিক ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হইত। তৎসম্বন্ধীয় নানাপ্রবাদ এই পরিবারে অদ্যাপি শ্রুত হইয়া থাকে।

সেকালে অশেষ-ক্ষমতাপন্ন 'মনাই' নামে এক বাকসিদ্ধ ফকির ছিলেন। রামনারায়ণের সঙ্গে তাহার একান্ত সৌহৃদ্য থাকায় উভয়ে নিভৃতে বসিয়া অনেক সময় ধর্মালোচনা করিতেন। রামনারায়ণ ৮৪ বৎসর বয়সে কলিকাতা গঙ্গার তীরে দেহত্যাগ করেন। তাহার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া কালীপাড়া বাটিতে যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছিল।

সূর্যনারায়ণ ও চন্দ্রনারায়ণ বারৈয্যা চৌধুরী ঃ

রামনারায়ণ তপস্যার ফলে দুইটি পুত্র লাভ করেন, জ্যেষ্ঠ সূর্যনারায়ণ, কনিষ্ঠ চন্দ্রনারায়ণ। উভয়েই সুগঠন ও রূপবান ছিলেন। পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করত সূর্যনারায়ণ বৈষয়িক কার্যে আর চন্দ্রনারায়ণ সরকারি কার্যে ব্রতী হইলেন। চন্দ্রনারায়ণও জ্যেষ্ঠের ন্যায় কৃতী পুরুষ ছিলেন। তিনি সরকারি কার্য করিয়া প্রভূত ধন উপার্জন করিয়াছিলেন। কাদিরাবাদ তা তাহারই নামে খরিদ হইয়াছিল। পরোপকার ব্রতই তদীয় জীবনের সার ছিল। পিতা রামনারায়ণ বর্তমানে নিঃসন্তান অবস্থায় শ্রীশ্রী কৃষ্ণের ঝুলন উৎসব দিবসে তিনি অকালে পরলোকগমন করেন।

অতঃপর কালীপাড়া বাটিতে আগমন করত তিনি বহু সংখ্যক লাঠিয়াল ও বরকন্দাজ সৈন্যসহ চিরলিয়া মধুরদিতে উপস্থিত হন। তথায় অনেক ভদ্রলোক বিশেষত কুলীনের বাস ছিল। তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ কতই বলিলেন, "তোমরা রাজার বশ্যতা স্বীকার ও করাদি প্রদান কর। তাহাতে তোমাদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, অন্যথা যেভাবেই হউক বশ্যতা স্বীকার করাইব।" তাহাতে তাহারা সূর্যনারায়ণের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য বিশেষত অবমানাকর বাক্য প্রয়োগ এবং অপব্যবহার করায় তিনি বলে এবং কৌশলে তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া বন্দোবস্ত এবং করাদি আদায় করেন। ভূকৈলাশ রাজস্টেটে ঐ বন্দোবস্ত "নারায়ণী বন্দোবস্ত" নামে খ্যাত ছিল। তাহাতেই সূর্য নারায়ণের যশো গৌরব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং তিনি ভূকৈলাশ রাজ্যষ্টেট হইতে প্রচুর সম্মান এবং পুরস্কার লাভ করেন ; কিন্তু এই ব্যাপারে সূর্যনারায়ণের জীবন বিপন্ন হইয়া উঠে।

এ সময়ে সূর্যনারায়ণ চিরলিয়া মধুরদি নিবাসী মালাবর মুখোপাধ্যায় নামক নৈকুষ্য কুলীনের ভগ্নী ত্রিপুরাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। এই সময় অনিবার্য কারণে ভূকৈলাশের রাজগণের অনুরোধ ক্রমে সূর্যনারায়ণ হাওড়া জিলার অধীন শিবপুর নিবাসী পরম পূজ্যপাদ স্বর্গীয় জয়রাম তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট ইস্টমন্ত্র গ্রহণ করেন। তদবধি তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বংশধরগণ সূর্যনারায়ণের পরবর্তীগণের গুরু অবধারিত হইয়াছেন। চন্দ্রনারায়ণ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করায় তাহার সমস্ত সম্পত্তিই সূর্যনারায়ণের হস্তে আসিল। চন্দ্রনারায়ণ বর্তমানেই সূর্যনারায়ণ জমিদারি খরিদ করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমেই বরিশাল জেলার অন্তর্গত কাদিরাবাদ তপ্প চন্দ্রনারায়ণের নামে খরিদ করেন। দিল্লির বাদশাহের নিয়োগমতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাঙ্গালা বিহার ওড়িশার দেওয়ানি সনন্দ প্রাপ্ত হন। বাঙ্গলা ১১৮৭ সনে ইংরেজি ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে এই সম্পত্তি খরিদ করায় কোম্পানি মোহর ও সকৌন্সিল গবর্নর লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবের দস্তখতযুক্ত যে বায়নামা প্রাপ্ত হন ঐ বায়নামাতে কাদিরাবাদ তার মালিক "চৌধুরী" উপাধি পাইবার নিয়ম থাকায় তদবধি এই বংশ সম্মানিত "চৌধুরী" উপাধি লাভ করিয়াছেন। ঐ বায়নামার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

চৌধুরী উপাধির সনন্দ বা কাদিরাবাদ খরিদের বায়নামা

মতসুদ্দিয়ান ও মহম্মতহান ও আওল্লা ও চৌধুরী আল ও কাননগোআন, ও তাহুত দারাণ ও রায়তান ও জিরতি আন তপ্পে কাদিরাবাদ আমলে পরগণে বোজেরগু উমেদপুর মহাল জায়গির সরকার আলীর সরকার বাজুহায় মাতালফে জিলা জাহাঙ্গিরনগর মজুফসুতে জিম্নতল বিলাত বাঙ্গলা বেদানন্দ তপ্পা মজকুরের মামুদসাফি চৌধুরী সরকারের মবলকহায় খাজানা বাবদ সন ১১৮৬ সাল আপন জিম্বে বাকি রাখিয়াছে তাহাতে নিলামে দুই দফা হুকুম নামা লটকানে ও সরকারে খাজনা আদায় করিলেক না একারণ বড় সাহেব ও কৌগুলী সাহেবানের হুকুম বমজিম বাঙ্গলা ১৬ মাহে জ্যৈষ্ঠ সন ১১৮৭ সালে বাঙ্গলা তারিখে মোতাবেক ২৬ মাহে মাই ১৭৮০ সাল ইংরেজি জেওয়ানি আদালতের কাচারিতে তপ্পা মজকুরের নিলাম হইল। নিলামের সময় চন্দ্রনারায়ণ বারের্য্যা বন্দোবস্ত তপ্পা মজকুর মবলক ১২৫০ বারশত পঞ্চাশ টাকায় সিক্কা কিস্মতে খরিদ করিয়া কিস্মতের টাকা নগদ দাখিল করিয়াছে অতএব তপ্পা মজকুরের চৌধুরী মামুদসফি চৌধুরীর তগরিতে নিলামের তারিখ ইস্তক চন্দ্রনারায়ণ মজকুরকে মোকরার হইল আমলতো দেয়ানতে রাস্তা দুরস্ত থাকিবে প্রজালোকের সহিত সলুকে কাজ করিবে। যে দেহাহারের আরাজি অধিক জাহির হয়ে এবং সরকার মাল গুজারিক বরতক্ত আদায় করিবে দরগাতে যে আবুয়াব মানা আছে তাহাতে পরহেজ থাকিবেক ও তোমরা ইহাকে তপ্পা মজকুরে চৌধুরী কায়েম ও ইহার মোহর ও দস্তখত ওমার তকমিম কাগজে মাতব্বর জানিবা ও দোসরা কাহাকে ইহার শরিক না জানিবা ইতি ১৭৮০ সাল তারিখ ২৪ জুন বাঙ্গলা ১১৮৭ সন তারিখ ১৩ আষাঢ়।

কোম্পানি মোহর ও সকৌন্সিল গভর্নর সাহেবের দস্তখত।

সম্পত্তি খরিদ ঃ

চন্দ্রনারায়ণের অভাবে সূর্যনারায়ণ তদীয় সমস্ত সম্পত্তির মালিক হইয়া এবং স্বোপার্জিত অর্থ দ্বারা ক্রমে বাকরগঞ্জ জিলার তপ্পে কাদিরাবাদে, ঢাকা জিলার অধীন ঢাকলে রায়পুর ও চাকলে নুরপুর, ফরিদপুর জিলার অধীন পরগণে রাজনগরচাকলে আমিরাবাদ, পরগণে রায়নন্দলালপুর ও বরিশাল জিলার অধীন পরগণে বোজরগ উমেদপুর, আয়লা ফুলজুড়ি, নাগদি শ্রীরামপুর, বুড়ামজুমদার ইত্যাদি বহু সম্পত্তি খরিদ করেন। শেষোক্ত ৩টি সম্পত্তি সূর্যনারায়ণ ক্রয় মাত্র ছাড়িয়া দেন। তৎসম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, আয়লা ফুলঝুড়িতে তখন লোকের বসতি ছিল না, কেবল ২।৪ ঘর মগ বাস করিত। গভীর জঙলে পরিপূর্ণ ঐ স্থানে ডেঙ্গায় বাঘ জলে কুম্ভীর পথে ডাকাতের ভয়ে কেহ যাইতেও সাহস করিত না। ঐ সম্পত্তি খরিদ করিয়াই সূর্যনারায়ণ তথায় উপস্থিত হইলে মগ প্রজাগণ মাংস খাওয়ার জন্য তাহাকে কয়েকটি বৃহৎ জোঁক প্রদান করে।

কালীপাড়ার বাসভবন ঃ

বিগত ১২০০ সনে চাঁচুড়পাশার থানার বাড়ি পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইলে পিতা রামনারায়ণ জীবিত থাকিতেই কালীপাড়ার আবাস বাটির ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। উহা "বৌলবাড়ি" নামে প্রসিদ্ধ। প্রাগুক্ত খলিপাশা গ্রাম নদী শিকস্ত হইলে সেই হাটই কালীপাড়াতে আনিয়া তারাচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের বাসস্থান হয়। খানাবাড়ির উত্তর পশ্চিম কোণে কিঞ্চৎ দূরে নরকান্দা নামক পৃথক স্থানে শিকদারপাড়া ছিল। কুলীন দৌহিত্র সন্তানগণকে খানাবাড়ির উত্তর ও পূর্বদিকে ভরণ পোষণ ও দোলদুর্গোৎসব করিবার উপযোগী ভোগার্থ সম্পত্তি প্রদানে পৃথক পৃথক ভাবে বাসস্থান দেওয়া হয়। এইরূপ সূর্যনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত বাসভবনে ক্রমশ আধুনিক রুচি অনুযায়ী পরিপাট্য ও সৌন্দর্য প্রবিষ্ট হইয়া প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পকলা ও রুচির সমাবেশ হইয়াছিল। এক সমসূত্রে চারি হিস্যার সৌধমালা। তৎভিন্ন গ্রামবাসিগণ অধিকাংশই সঙ্গতিসম্পন্ন বলিয়া তাহাদের ইষ্টকময় বাসভবনাদি দ্বারা কালীপাড়া তৎকালে একটি সমৃদ্ধিশালিনী নগরীর ন্যায় শোভা পাইত।

আত্মবিক্রয় ঃ

তৎকালে এতদেশে সঙ্গতিপন্ন জনগণের নিকট আত্মীয় স্বজনহীন এবং নিরন্নগণের আত্মবিক্রয় বা দাসখত দিবার প্রথা ছিল। স্বয়ং স্ত্রীপুত্র সহ আত্মবিক্রয়ের স্থলান্তরে স্বীয় দাসদাসীগণকে অপরের নিকট বিক্রয়ের কবলাপত্র লিখিয়া দিত। সূর্যনারায়ণ এবং তাহার পূর্ব এবং পরবর্তীগণের নিকট অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ ঐরূপ আত্মবিক্রয় করিয়াছিল। ঐরূপ প্রথা সঙ্গতিশালী জনগণের পক্ষে অত্যাচারমূলক বলিয়া প্রচারিত হইলেও তখন লোকের ধর্মভাব এতই জাগরিত ছিল যে, যাহারা অর্থহীন, ঋণদায়ে আবদ্ধ ও পরিজনের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইতে অসমর্থ, তাহারা ধর্ম এবং আত্মরক্ষার্থ স্বীয় মনিব কি অপর কোন বিশ্বাসী লোকের নিকট দুই চারি টাকা গ্রহণে আত্মবিক্রয় করিত। চলিত ভাষায় উহা দাস বা নফরী খত নামে অভিহিত হইলেও অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায় যে দাসখত গৃহীতা দাতাগণকে আপন পরিবারভুক্ত পোষ্য মনে করিয়া পুত্র কন্যার ন্যায় গ্রাসাচ্ছাদন দান ব্যতীত কাশী গয়া প্রভৃতি ধর্মকার্যও করাইতেন ; দাতাগণও তৎবিনিময়ে সাংসারিক কাজকর্ম নির্বাহ করিত। কেহকে ভাই কেহকে বোন কেহকে কাকা প্রভৃতি প্রিয় সম্বোধন ডাকা হইত। আজ তাহার বিপরীত দাঁড়াইয়াছে। এ বংশে ঐরূপ আত্মবিক্রয়ী তিন শতাধিক লোক প্রতিপালিত হইয়াছে। তাহাদের নগরকান্দায় স্থান সঙ্কুলন না হওয়ায় অন্য স্থানেও বাসস্থান করা হইয়াছিল। বসতবাটি ভোগর্থ দেওয়া ব্যতীত ভরণ পোষণ ও সাময়িক নানাভাবে সাহায্য করত শিক্ষিতগণকে তহশিলদারী কার্যেও নিযুক্ত করা হইয়াছে। এইক্ষণ তাহারা পুত্রকলত্রে পরিবৃত হইয়া কালীপাড়া ভাঙ্গার পর মেদিনীমণ্ডল,

চন্নধূল, উছাপুরা, চামরদী প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছে। নিম্নে একখণ্ড আত্ম এবং স্ত্রীপুত্র বিক্রয়ের, অপরখণ্ড স্বীয় দাসদাসী অন্যের নিকট বিক্রয় কবচের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

আত্ম ও স্ত্রীপুত্র বিক্রয়ের কবচের প্রতিলিপি

ইয়াদি কির্দ্দ কবচপত্রমিদং শ্রী সূর্যনারায়ণ বারয্যা ওলধে শ্রীরামনারায়ণ বারৈর্য্যা ইবনে চন্দ্রশেখর বারযা মহাশয়েষু লিখিত শ্রীজগন্নাথ দাস ওলধে, গঙ্গারাম দাস ইবনে রামপ্রসাদ দাস সাকিন চাচুরপাশা আমি আর আমার স্ত্রী শ্রীমতীসুবর্ন্নি আর আমার পুত্র শ্রীজয়নারায়ণ দাস ও লিখিতং শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস ওলধে তথা ইবনে তথা আমি আর আমার স্ত্রী শ্রীমতী কমলী আমরা এই পাচ জন মনুষ্য যে আপনার স্থানে ৩১ এক ত্রিশ রূপাইয়ায় বিক্রয় হইলাম সেই মবলগ পুরোজন দশ মাসি ৩১ একত্রিশ রূপাইয়া আপনারা স্থানে দস্তবদস্ত পাইয়া কবচ লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১১৯১ এগার শও একানবৈ তারিখ ১লা ফাগুন।

শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মা	ইসাদি-
সাংচাচুরপাশা।	শ্রীরামহরি শর্ম্মা।
নিংসহি শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস	সাকিন বাঘিরা।
শ্রীজগন্নাথ দাস্	শ্রীরামহরি শর্ম্মা

দাসদাসী বিক্রয়পত্রের প্রতিলিপি

ইয়াদি মনুষ্য বিক্রয়পত্রমিদং শ্রীরাম জগন্নাথ শর্ম্মা ওলধে রাম রাম চক্রবর্তী ইবনে রামগোবিন্দ চক্রবর্তী সুচরিতেষু শ্রীরামশরণ শর্ম্মা ওলধে রামগোবিন্দ চক্রবর্তী ইবনে রামচরণ চক্রবর্তী কস্য লিখন আগে আমার ঘরে নফল বাঞ্ছারাম শুদ্র তশ্য পুত্র শ্রীডেঙ্গর শুদ্র বয়স উনেইস বৎসর আমার হিস্যার হৃণ অন্য উপহতি যে রাজী রগবতে সেইৎচ্ছায় নগদ অন্য পুরোজন দহমাসি মবলগ ৮৷৷০ সাড়ে অষ্ট রূপাইয়া দস্তবদস্ত আমি তোমার স্থানে পাইয়া বেচিলাম লোয়াজিমা খোরাক পোষাক দিয়া দান বিক্রয় অধিকারী হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে নকরী কর্ম করাইতে রহো ইতি ১১৮৪ এগার শও চৌরাশী পরগণাতী সন ৫৭৬ পান শও ছয় শত্তরী তারিখ ১৩ মাঘ।

	ইসাদি-
শ্রীশোভারাম দেয়	শ্রীরদুকৃষ্ণ দেয়
শ্রীরামজয় দাস	শ্রীহরিপ্রদাস
শ্রীরামধন শর্ম্মা	হেমায়তী পাট্টা

বাটোয়ারা ঃ

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, সূর্যনারায়ণের দুই পরিণয় ছিল, প্রথমা পত্নীর গর্ভে বঙ্গচন্দ্র নামে এক পুত্র, পার্বতী নাম্নী এক কন্যা, আর দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে অন্নপূর্ণা ও জগদম্বা নাম্নী দুই কন্যা জন্মে। সুতরাং দ্বিতীয়া পত্নী ত্রিপুরাসুন্দরীকে ১২০১ সনে কান্তনাথকে দত্তকে রাখিয়া দেন। ভবিষ্যতে ঔরস ও দত্তক পুত্র মধ্যে কোনরূপ মনোমালিন্য না জন্মে এজন্য সম্পত্তি বণ্টন করিয়া ১২০৮ সনে এক ও ১২১২ সনে অপর এক এবং ১২২৬ সনে খানাবাড়ির বাটোয়ারা পত্র সম্পাদন করেন, বাটোয়ারা পত্র ব্যতীত এ বংশে এ পর্যন্ত কোন উইলের প্রচলন দেখা যায় না। বহু সম্পত্তি অর্জনান্তে তীর্থবাসে সূর্যনারায়ণ পরলোক গমন করায় তাহার পারলৌকিক কার্য কালীপাড়া বাটিতে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

স্বর্গীয় কাশীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী ঃ

কাশীকান্তবাবু ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের অন্তর্গত কালীপাড়া গ্রামে সর্বজনমান্য বিখ্যাত ব্রাহ্মণ জমিদার বংশে ইংরাজি ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ১২০৭ সালের মাঘ মাসের ২০শে শুক্রবার দিন জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী। কালীপাড়ার এই

ব্রাহ্মণ জমিদার বংশ এক সময়ে দানশীলতায়, বদান্যতায়, পরোপকারে, অতিথিপরায়ণতায় এবং প্রজাবাৎসল্যে বঙ্গদেশের আপামর সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষা, দীক্ষা, নিষ্ঠা এবং জ্ঞান গৌরবে বিভূষিত এই বংশের বংশধরগণ বহুবর্ষ পর্যন্ত বিক্রমপুর সমাজের একমাত্র কর্ণধাররূপে সমাজের যথাবিহিত মঙ্গলসাধনে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

কাশীকান্তের পিতা বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী মহাশয় তাহার জীবিতকালে বিক্রমপুর ব্রাহ্মণসমাজের অবিসম্বাদী নেতারূপে বহু সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গচন্দ্র সদাশয় এবং উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি দুঃস্থ প্রজাগণের সাহায্যকল্পে মুক্ত হস্তে দান এবং পরোপকার ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য সর্বত্র খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গচন্দ্র বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ; বহু পণ্ডিত তাহার অর্থ সাহায্যে প্রতিপালিত হইতেন। বঙ্গদেশের বিখ্যাত পণ্ডিতগণের প্রত্যেকের জন্য তিনি বাৎসরিক বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

কাশীকান্তবাবু বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শিক্ষার আলোক ভিন্ন দেশের অজ্ঞানতা দূরীভূত করা অসম্ভব, তিনি সে সময়েই দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বদ্ধপরিকর হন। তাহারই প্রযত্নে এবং অর্থ সাহায্যে কালীপাড়া মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কাশীকান্ত এই স্কুলের সাহায্যে মুক্ত হস্ত ছিলেন। বস্তুত কালীপাড়ার এই ইংরেজি বিদ্যালয় কাশীকান্তবাবুর এক অক্ষয় কীর্তি। যখন তিনি সর্বপ্রথম ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারকল্পে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, তখন বহুলোক তাহার বিপক্ষে আন্দোলন আরম্ভ করে এবং নানারূপ অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিতে যত্নবান হয় কিন্তু কাশীকান্তবাবু অকুতোভয়ে লোকের নিন্দা গ্লানি নীরবে সহ্য করিয়া এই সদানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। তিনি নিজ গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কাশীকান্তবাবু অতি অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাহার স্বধর্ম নিষ্ঠা, হৃদয় মাধুর্য এবং চরিত্রের পবিত্রতায় মুগ্ধ হইয়া এবং পণ্ডিত প্রতিপালনে ও সমাজরক্ষায় যত্নবান বলিয়া নবদ্বীপের বিশিষ্ট পণ্ডিত সমাজ তাহাকে পূর্ববঙ্গের সমাজনেতা বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কাশীকান্তবাবু বন্ধুবৎসল এবং আশ্রিত পালক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কাশীকান্তবাবু পৈত্রিক জমিদারির বহুবিধ উন্নতি সাধন করেন।

কাশীকান্তবাবুর সময়েও বিক্রমপুর অঞ্চলে ক্রীতদাস রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল। ইছাপুরা নিবাসী ঘটকপ্রবর ষোড়শীকান্ত দেবশর্মা মহাশয় কাশীকান্তবাবুর বাড়ি হইতে একখানা দাসখতের নকল আনিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার পাঠ দেওয়া গেল।

যদিও ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে এই ঘৃণ্য প্রথা দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল, তথাপি ঢাকা জিলায় এই প্রথা বহুদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং কালীপাড়ার বাবুগণ ইংরেজ রাজত্বেও কয়েকবার দাসখৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন। [২]

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী ঃ

স্বর্গীয় কান্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরীর দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ শ্যামাকান্ত, কনিষ্ঠ অম্বিকাকান্ত।

অদৃষ্টবাদী আর্যগণ কালকে অদৃষ্টজ্ঞাপক বলিয়া বিশ্বাস করেন। মানুষের জন্মকাল তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সূচনা করে। শ্যামাকান্ত ১২৩৮ সনের ৫ কার্তিক বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপূর্ণিমা তিথিতে কালীপাড়ার বাটিতে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মীপূর্ণিমাতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া তাহার অপর নাম লক্ষ্মীপ্রসাদ ; সর্বত্র অন্বর্থ না হইলেও শ্যামাকান্তের লক্ষ্মীপ্রসাদ নাম লক্ষ্মীপ্রসাদ স্বরূপই হইয়াছিল। ৬ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় মাতাপুত্রের সমস্তভার নিজহাতে তুলিয়া লইলেন। ৬ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ বিধুর শ্যামাকান্ত মাতৃস্নেহে লালিত পালিত ও বর্ধিত হইয়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে যে শিক্ষায় ও চরিত্র বলে দিন দিন উৎকর্ষ লাভ করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন সে কেবল তাহার মহিয়সী প্রতিভাবতী জননীর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও

শিক্ষার গৌরব। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাকান্তের শিক্ষার ভার উপযুক্ত পাত্রে ন্যস্ত হয়। তিনি স্বকীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে অল্পদিনেই পার্শী, উর্দু ও সংস্কৃত ভাবায় বিশেষ বুৎপত্তিলাভ করেন, জ্ঞানের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চরিত্রে নানাবিধ গুণ প্রস্ফুটিত হইল।

বিক্রমপুরের গৌরব ব্রাহ্মণ সমাজের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও অনুষ্ঠানের উন্নতির জন্য তিনি নানাবিধ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া তাহার অশেষকল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। বিক্রমপুরে পণ্ডিত সমাজের উন্নতির জন্য যদি কোনরূপ যত্ন ও চেষ্টার সূচনা হইয়া থাকে তবে সেই গৌরবের প্রধানপাত্র একমাত্র শ্যামাকান্তবাবু ইহা অত্যুক্তি নহে, কর্মের পুরস্কার, আজ ইহা ভুলিয়া গেলে, দেশবাসীর অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশিত হইবে। তিনি তাহার কালীপাড়ার বাড়িতে ১২৭৯ সনে হিতোপদেশিনী নামে এক মহতীসভা ও লাইব্রেরী স্থাপন করেন। পুস্তকালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য বিক্রমপুরের মৃতপ্রায় গৌরবকে জীবনীশক্তি প্রদান করা, কালক্রমে দেশে যখন প্রাচীন ধর্ম ও শাস্ত্র ধীরে ধীরে অনাদৃত হইতে চলিল তখন জীর্ণ হস্ত লিখিত প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থমালা গ্রথিত করিয়া সময়ের জন্য এক অপূর্ব রত্নভাণ্ডার সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন, দুর্ভিক্ষের দিনে যেন সেই অফুরন্ত রত্ন ভাণ্ডার হইতে ভিক্ষুক অনন্তরত্ন লাভ করিতে পারে। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে বহু পুরাতন তুলট কাগজে এবং তালপত্রে লিখিত পুস্তক নানা স্থান হইতে লোক পাঠাইয়া পুস্তকাগার পূর্ণ করিলেন ; বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র, স্মৃতি, ব্যাকরণ, পুরাণ, কাব্য, জ্যোতিষ প্রভৃতি কত শাস্ত্রগ্রন্থ, সংস্কৃত, বাঙ্গালা-ইংরেজি অভিধান, আইন গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিলেন তাহার সীমা নাই, সকলেই তাহার সেই দিনে তাহার এই উদ্যম অতীব নূতন, অন্য কোথাও এইরূপ চেষ্টা কেহ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না।

এই সকল কার্যই তাহার বিদ্যানুরাগের যথেষ্ট প্রমাণ। যাহার হৃদয়ে জ্ঞানের পিপাসা নাই তাদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ে কখনও এইরূপ অনুরাগ সম্ভবপর নহে। তাহার হিতোপদেশিনী সভার সভাপতি ছিলেন তিনি নিজে, সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত প্রবর জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ ও কালীকুমার বিদ্যারত্ন। পূর্বে বিক্রমপুর স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য বিখ্যাত ছিল, দেশ দেশান্তর হইতে ছাত্রগণ বিদ্যালাভের জন্য বিক্রমপুরে আসিতেন। তখন আধুনিক প্রণালিতে সংস্কৃত শাস্ত্রে কোন দেশেই কোন পরীক্ষা গৃহীত হইত না, অধ্যাপকগণ স্ব স্ব ছাত্রের পারদর্শীতা ও রুচি অনুসারে তাহাদিগকে উপাধি বিতরণ করিতেন। উপাধিলাভের পর অধ্যাপকপদ প্রাপ্ত হইয়া আজীবন তাহাকে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত, তাহার প্রতিযোগিতার কখনও শেষ হইত না, প্রতিনিয়ত সমাজে শাস্ত্রাদিকার্যে নিমন্ত্রিত হইয়া তাহাকে বিচার করিতে হইত ; কতিপয় বিজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও সমাজস্থ বিশেষজ্ঞগণ সেই বিচার্য বিষয়ের মধ্যস্থতা করিতেন। উভয়ে বিদ্যাবত্বার বিচার করিয়া তাহাদের বিদায় নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন, বিদায়ের প্রথা বড়ই সুন্দর ছিল ; সাধারণত নৈয়ায়িক ষোল আনা, স্মার্ত বার আনা, এবং বৈয়াকরণ আট আনা বিদায় পাইতেন ; যোগ্যতা অনুসারে আনিব আধিক্য ও ন্যূনতা হইত ; প্রত্যেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে আত্মোন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইত। বিক্রমপুরের গৌরব কালীপাড়ার জমিদার শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী পূর্ববঙ্গে সর্বপ্রথম ১২৭৯ সনে "হিতোপদেশিনী সভায়" নানা শাস্ত্রবিদ্ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রশ্ন করাইয়া লিখিতভাবে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া এক নূতন যুগের প্রবর্তন করেন, তদবধি বহুদিন এইরূপ পরীক্ষা গৃহীত হইয়া বিক্রমপুর ও উক্ত সভা গৌরবান্বিত হইয়াছিল। উত্তীর্ণ ছাত্রগণ যথোপযুক্ত পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইতেন ; অধ্যাপক ও পরীক্ষকগণ যথোপযুক্ত বিদায় প্রাপ্ত হইতেন। হিতোপদেশিনী সভা হইতে গৃহীত, সংস্কৃত লিখিত পরীক্ষার একখানা সার্টিফিকেটের নকল লিপিবদ্ধ করা গেল।

নং ৪৭ শ্রী শ্রী ঈশ্বরো জয়তি।

(চিহ্ন)

কালীপাড়া হিতোপদেশিনী সভায়াঃ

শ্রীযুক্তবাবু শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী ভূম্যধিকারিণা প্রতিষ্ঠিতায়াঃ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীহরি বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্যব্যাকরণ শস্ত্রাধ্যাপকস্য ছাত্রায়া।

শ্রীযুক্ত দেবীচরণ ভট্টাচার্য ব্যাকরণ শাস্ত্রাধ্যায়িণী তৃতীয় শ্রেণীভুক্তায়।

বিদ্যাগৌরব বিখ্যাত পণ্ডিতানা, সুসম্মতা

প্রশংসা পত্রিকা দত্তা সুশিক্ষা ফলভাগিনে।।

প্রথম পরীক্ষা

শকাব্দা ১৭৯৯

তারিখ ১০ই জ্যৈষ্ঠ

পরীক্ষকানাং

শ্রী অভয়াচরণ বিদ্যারত্নানাং

শ্রীকালীকৃষ্ণ শিরোমণিনাং

শ্রী শ্রী হরি বিদ্যালঙ্কারানাং

শ্রীকালীকুমার বিদ্যারত্ন

সম্পাদকস্য

কালীপাড়ার ভূম্যাধিকারী স্বর্গীয় শ্যামাকান্তবাবুর পরীক্ষার্থী হিতোপদেশিনী সভার কয়েকটি সংস্কৃত শাস্ত্রের তৎকালীন পীরক্ষার্থীর নাম—

১.	শ্রীযুত দেবীচরণ তর্কভূষণ	সাং বাসাইল	অধ্যাপক	শ্রীহরিবিদ্যালঙ্কার
২.	কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন	সাং গঙ্গানগর	"	"
৩.	শ্রীকৃপানাথ তর্কসিদ্ধান্ত	সাং ফেগুনাসার	×	×
৪.	বামনদাস বিদ্যারত্ন	সাং রাজদিয়া	"	শ্রীদুর্গাচরণ তর্করত্ন
৫.	দেবীদাস চূড়ামণি	সাং ইছাপুরা	"	কালীকুমার বিদ্যারত্ন, কুড়াপাড়া
৬.	রজনীকান্ত ভট্টাচার্য	"	"	অন্নদাচরণ তর্করত্ন, পয়সাগাও
৭.	শশীমোহন স্মৃতিরত্ন	সাং নয়াকান্দি	"	"
৮.	নিশিকান্ত ভট্টাচার্য	সাং ইছাপুরা	"	হরিমোহন শিরোমণি, কেওইখালি
৯.	পার্বতীচরণ বাচস্পতি	সাং মুকডোবা	"	দুর্গাপ্রসাদ তর্কলঙ্কার, সাত্রাপাড়া
১০.	কালীকুমার বিদ্যারত্ন	সাং পড়ানপুর	"	×
১১.	জগচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ	সাং সোনাচাকা (নোয়াখালি)	"	×
১২.	তারাচরণ ন্যায়রত্ন	সাং ধোপার পাশা		×
১৩.	কৃষ্ণকিশোর শিরোমণি	সাং ইছাপুরা		×
১৪.	কেদার নাথপদরত্ন	সাং মেদিনীমণ্ডল		×
১৫.	গঙ্গাচরণ তর্করত্ন	সাং ইছাপুরা		×
১৬.	লোকনাথ শিরোমণি	"		শ্রীহরিবিদ্যালঙ্কার

বিক্রমপুর হিতোপদেশিনী সভা হইতে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দ ১২৭৯ সনে, ঢাকা সারস্বত সমাজ হইতে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ ১২৮৫ সনে সংস্কৃত বিদ্যার লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছিল। শ্যামাকান্তবাবুর স্থাপিত হিতোপদেশিনী সভা হইতে প্রদত্ত যে সার্টিফিকেটের নকল দেওয়া হইল তাহাও ১৭৯৯ শকাব্দে ১২৮৪ সনের ১৩ জ্যৈষ্ঠ তারিখের ; ইহাই শেষ পরীক্ষা। এই সকল বিষয় সবিশেষ আলোচনা দ্বারা জানা যায় শ্যামাকান্তবাবুই পূর্ববঙ্গে সর্বপ্রথম সংস্কৃত বিদ্যার পরীক্ষা লিখিতভাবে তাহার হিতোপদেশিনী সভা হইতে গ্রহণ করাইয়াছিলেন।

১. শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘটক বিদ্যানিধি সঙ্কলিত 'কুলকল্পদ্রুম' গ্রন্থে চাঁচুড়পাশা গ্রামের নাম 'চাঁচৈরপাশা' লিখিত হইয়াছে।

২. মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত কাশীকান্ত বাড়ৈয্যা চৌধুরীবাবু মহাশয় সদুদার চরিত্রেষু লিখিতং শ্রীয়ামদাস রাহা পীসরে পচুদাস রাহা ইবনে রূপরামদাস রাহা সাকিম পরগণে বিলদেওনীয়া প্রকাশ্য নাম কাউলিপাড়া সরকার বিক্রমপুর কীয় মনুষ্য বিক্রী পত্রমিদং আগে আমার খানে জাত নিজ মনুষ্য শ্রীশিবসুন্দর সজান আবতিতি নামে তাহার স্ত্রী আর শ্রীসোনাতন দে দাস ও শ্রীহরিসোনা দে দাস ও শ্রীরামরাজা দে দাস ও শ্রীনরহরি দে দাস এই চাইর পুত্র আর শ্রীরোহিনী নামে তাহার এক ছোড়ী এই সাতজন মনুষ্য অন্ন (বস্ত্র) দিতে না পারিয়া দায়গ্রস্ত হইয়া তোমার (নিকট) মবলগে ৭৩ তেওওর রূপেয়া পাইয়া (বান্দা ঘর করিয়া) দিলাম খোরাক পোষাক পাইয়া তোমার দাস নফর ও খেদমত করিবেক গাফেলতি করিয়া (যদি) গরহাজিব হয়ে পাকড়িয়া আনিয়া খেদমতে রাখিবা।
এই নিয়মে মনুষ্য বিক্রয় পত্র দিলাম ইতি সন ১২২৯ তেসরা ভাদ্দর মাহে—
ইসাদী—শ্রীরামজীবন দাস—সাকিন সাহাবাজনগর (সরকার বিক্রমপুর)

দ্বিতীয় অধ্যায়



শ্রীনগরের লালা কীর্তিনারায়ণের বংশ পরিচয় ঃ

বঙ্গদেশের প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়কে শ্রীনগরের লালা কীর্তিনারায়ণের বংশপরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি অতিশয় আগ্রহ সহকারে তাহার প্রাচীন একটি বেতের বাক্স হইতে লালা বংশের একটি লিখিত বিবরণ আমাকে প্রদান করেন। বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ও উক্ত প্রবীণ ঐতিহাসিকের পাণ্ডুলিপির সমর্থন করেন। উক্ত বিবরণ এবং অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত উপকরণ অবলম্বনে আমি শ্রীনগরের লালা কীর্তিনারায়ণের বংশ পরিচয় লিখিতে আরম্ভ করি। বহু অনুসন্ধানের পর আমি মেদিনীমণ্ডলের ভূস্বামী স্বর্গীয় গোলোকচন্দ্র চৌধুরী ও স্বর্গীয় দ্বিজ যদুনাথ ভট্টাচার্যের বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাই। ১৩৩৯ সনে শ্রীনগরের বর্তমান জমিদার লালা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমার বসু মহাশয় আমার প্রেরিত পাণ্ডুলিপি পড়িয়া, বর্তমানে বিক্রমপুরের যে সব ইতিহাস আছে তাহা এবং উপযুক্ত উপায়ে মৎসংগৃহীত বিবরণসমূহ ভ্রমসঙ্কুল এবং অসম্পূর্ণ বলিয়া মুঙ্গের হইতে একখানা চিঠি লিখিয়া জানান। তৎসঙ্গে তিনি তাহার বংশ কাহিনীর এক পাণ্ডুলিপিও আমাকে পাঠাইয়া দেন। আমি চিঠিখানা এবং উক্ত পাণ্ডুলিপি প্রবীণ ঐতিহাসিক আনন্দনাথ রায় মহাশয়কে কলিকাতায় বাসকালীন দেখাই। তিনি আমাকে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার বসুর লিখিত পাণ্ডুলিপি ও আমার লিখিত পাণ্ডুলিপি উভয়ই প্রকাশ করিবার পরামর্শ দেন। আমিও প্রবীণ ঐতিহাসিকের উপদেশ যুক্তিপূর্ণ বিবেচনা করিয়া লালাবাবুর পাণ্ডুলিপির প্রথম স্থান দিয়া তৎপর উক্ত প্রবীণ ঐতিহাসিকদের ও বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা অম্বিকাচরণ ঘোষ মহাশয়ের ইতিহাস ইত্যাদি হইতে সঙ্কলিত বিবরণ প্রদান করিলাম। আশা করি শ্রীনগরের লালা কীর্তিনারায়ণের বংশ পরিচয় এইভাবে লিপিবদ্ধ করায় পরবর্তীকালে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের পক্ষে প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করা সহজসাধ্য হইবে।

এই লালা বংশের বদান্যতা, সৌজন্য ও প্রতিভা বঙ্গদেশের সর্বত্র সুপরিচিত। লালা কীর্তিনারায়ণ বসুর পর হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত যাহারা এই বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই বিদ্যাবুদ্ধি সর্বপ্রযত্নে অনুকরণযোগ্য।

শ্রীনগরের বাবুদের (এই বসু বংশের) আতিথেয়তার কাহিনী বঙ্গের আবালবৃদ্ধ নরনারীর মুখে মুখে বহুকাল হইতে বর্ণিত হইয়া আসিতেছে। মনেপ্রাণে অতিথি সৎকার ইহারা যেমন করিয়া আসিয়াছেন কোন বড় রাজামহারাজদের বাড়িতে তেমন হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা জিলা) মহকুমার অন্তর্গত লাঙ্গলবন্ধ নামক স্থানে সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মপুত্র স্নানের সময় যে সব যাত্রী সুবিধার জন্য এই বসু বংশ বহুকাল হইতে যে বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া আসিতেছেন তাহার তুলনা বঙ্গদেশে তো নাই-ই, অন্য কোথায়ও আছে কিনা জানি না।

শ্রীনগরের লালা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের লিখিত বিবরণ ঃ

বিগত প্রায় তিন শত বর্ষের কায়েস্থ সমাজের প্রকৃত ইতিহাসের অভাব লক্ষিত হইতেছে। বঙ্গের সামাজিক বিকৃতিই ইহার মূল কারণ বলিয়া মনে হয়। বাংলায় মুসলমান শাসনকালে

অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগে বিক্রমপুর যে কায়স্থজাতি দ্বারা শাসিত হইত ইহা অস্বীকার করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। "বঙ্গীয় সমাজ" প্রণেতা সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী এ বিষয়ে যথার্থ কথাই লিখিয়াছেন। বঙ্গদেশে উপর্যুপরি ধর্ম পরিবর্তন ও সামাজিক বিপ্লব সাধিত হওয়ায় কায়স্থগণের প্রাচীন সাহিত্যে ও ইতিহাসে অপলাপ ঘটিয়াছে। বঙ্গীয় কায়স্থগণ সাবিত্রীভ্রষ্ট হইয়াছেন।

সে সময় বিক্রমপুর অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার ছিল, বাণীকমলার অকৃপায় আজ সেই বিক্রমপুর ধনহীন ; যে দেশ একদিন শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা ছিল, গ্রহের ফেরে আজ সেই বিক্রমপুরে দুর্ভিক্ষের তাড়নায় বাণী কমলার বরপুত্রগণ প্রবাসী। পূর্বকালে অনেক বিদেশী ভদ্র সন্তান বিক্রমপুরে একটুকু স্থান লইবার আশায় বিক্রমপুরের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন। পরে ইহারা বিক্রমপুর সমাজকে অশেষ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়া গিয়াছেন।

স্বর্গীয় কংসনারায়ণ বসু ঃ

তিনি ১১০৭ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পৈতৃক আবাসস্থান প্রথমে উলপুরে তৎপরে ইদিলপুরে ছিল। বাল্যকালে কংসনারায়ণের পড়াশুনায় বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। সেকালে গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের টোল কিংবা মুন্সির নিকট আরধি ভাষা শিক্ষা করা অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। কংসনারায়ণ অল্প সময়ের মধ্যে আরবি ভাষায় বিলক্ষণ পণ্ডিত হইলেন। তাহার পিতা কৃষ্ণরাম বসু। কৃষ্ণরাম বসু আবাসভূমি ইদিলপুর পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুর পরগণার অধীন বেজগাঁ গ্রামে আসিয়া স্বীয় বাসস্থান নির্মাণ করেন। বেজগাঁ গ্রামে কায়স্থ না থাকায়—এবং ঘটকদের কুলগ্রন্থে "বেজগ্রামে কুলংনাস্তি"[১] লেখা থাকায় কৌলিন্য রক্ষার্থ কৃষ্ণরাম বসু বেজগাঁ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ঘটকদের প্ররোচনায় কুলভ্রষ্ট গ্রামে বাস হেতু কৃষ্ণরামকে কৌলিন্য হইতে নামিতে হইল। সে সময়ে রাইসবর নিবাসী তালুকদার রামচন্দ্র গুহ-মুস্তাফি অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। কৃষ্ণরাম তাহার আশ্রয়ে আসিলেন। রামচন্দ্র অতিশয় বুদ্ধিমান ও বহুদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাহার খঞ্জ মেয়ের সঙ্গে কৌশলে কংসনারায়ণের বিবাহের প্রস্তাব করেন। কৃষ্ণরাম দারিদ্র্য প্রপাড়িত হইয়া রামচন্দ্রের কন্যার সঙ্গে কংসনারায়ণের বিবাহ দেন। ইতিমধ্যে কৃষ্ণরাম মানবলীলা ত্যাগ করেন। কংসনারায়ণ বিবাহের যৌতুক স্বরূপ রাইসবর গ্রামের কতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। বেজগাঁ গ্রামেও আজ পর্যন্ত বসু বংশের সম্পত্তি আছে। তাহাদের পুরোহিত বংশ আজও বেজগাঁ গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছেন। কালক্রমে কংসনারায়ণের তিনটি পুত্র, তিনটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম পুত্র কীর্তিনারায়ণ, দ্বিতীয় রামভদ্র, তৃতীয় শিবনারায়ণ এবং হরিপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া ও রামপ্রিয়া নামে তিন কন্যা। কংসনারায়ণ অতিকষ্টে তাহার তালুকের সামান্য আয় দ্বারা সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেছিলেন। পুত্রগণের বিদ্যা শিক্ষার জন্য একজন মুন্সি নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে উর্দু ও পার্শী ভাষা শিখাইয়াছিলেন। কীর্তিনারায়ণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পার্শী ও উর্দু ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিয়া সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। সেকালে কায়স্থের ছেলে সংস্কৃত পড়িলে মহা-বিপদ-অল্পায়ু হয়—এই বিবেচনায় তাহার মনের সাধ মনেই থাকিয়া যায়। এদিকে উত্তরোত্তর সংসারের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া যাওয়ায়—নবাব সরকারের খাজনা না দিতে পারায় ভূসম্পত্তিও নষ্ট হইতে চলিল। সংসারের নানা প্রকার অশান্তির দরুণ কংসনারায়ণের মস্তিষ্ক বিকৃতি জন্মিল।

কীর্তিনারায়ণ পিতার অবস্থা দেখিয়া অচিরে জাহাঙ্গীরনগর যাইবার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে রওনা হইলেন ; সেসময় ঢাকার শাসনকর্তা মহারাজ রাজবল্লভ সেন ছিলেন। পথিমধ্যে—রায়পুরা গ্রামে, যখন মহারাজ আনন্দময়ীর মন্দিরে সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন, সে সময় কীর্তিনারায়ণ মহারাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া একটি নমস্কার করিলেন।

মহারাজের নিয়ম ছিল, প্রতিদিন প্রাতঃ-সন্ধ্যাবন্দনার পর মহারাজার সাধ্য অনুসারে সাহায্য প্রার্থী ব্যক্তিকে বিমুখ করিতেন না। কীর্তিনারায়ণ তাহার সংসারের সমস্ত বিষয় আনুপূর্বিক মহারাজকে জ্ঞাপন করিলেন। অচিরে মহারাজ তাহাকে মহাফেজখানা সেরেস্তার মোহরার পদে নিযুক্ত করিলেন। কীর্তিনারায়ণ অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্বীয় বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে লাগিলেন। মহারাজ তাহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাহাকে সেরেস্তাদার পদে এবং তৎপর মন্ত্রণাসভার একজন সদস্যপদে নিযুক্ত করিলেন। নবাব সরকার তখন মুর্শিদাবাদে ছিল। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেন—"একদা মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারের হিসাব সম্বন্ধে রাজা রাজবল্লভ অত্যন্ত গোলযোগে পতিত হন, কিন্তু কীর্তিনারায়ণের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে ও ক্ষিপ্রতায় অচিরে সমস্ত গোলযোগ হইতে রক্ষা পান। এইসূত্রে কীর্তিনারায়ণ নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাহার অনুগ্রহে তিনি নানা উপাধি লাভ করেন। সে সময় মন্ত্রণা-সভার সদস্যব্যতীত অপর কাহাকেও লালা উপাধি দেওয়া হইত না।" অদ্যাপি লালা কীর্তিনারায়ণের বাড়ি বলিয়া প্রাচীন ব্যক্তিগণ লালাবাবুর বংশধরগণের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

এই সময়ে লাল কীর্তিনারায়ণের কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি করিবার আগ্রহ জন্মে। ইতিপূর্বে কংসনারায়ণ উন্মত্ত অবস্থায় ইহলীলা ত্যাগ করেন। লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইলে সব দিক হইতে সুখ-সম্পদ আসিয়া দেখা দেয়। লোকে কথায় বলিতে আরম্ভ করিল—"কীর্তিনারায়ণ কাস্তে ভেঙে গড়ায় করতাল"। লালা কীর্তিনারায়ণ ত্রয়োদশ চাক্‌লার অন্তর্গত পঁচিশজন জমিদারের অন্যতম জমিদার জালালপুরদিগের ও তৎকালীন জমিদার মতিউল্লা ও লালউল্লার নিকট হইতে ৬৪৮ টাকা ৬ আনা দেড় পাই দিয়া বদরাসন, বরহানগঞ্জ নামক দুই চাক্‌লার মিরাস পাট্টাগ্রহণ করেন। বাঙ্গালা ১১৭৫ সনের ৭ই জ্যৈষ্ঠ (ইংরেজি ১৭৬৮) তারিখে এই কার্য সম্পাদিত হয়। উহাতে কোনও জমার উল্লেখ না থাকায়, তিনি কাহাকেও কোন খাজনা দেন নাই। এইরূপে কীর্তিনারায়ণের জমিদারি খরিদ সুবিধা হইল। তিনি অনন্তদেবকে[২] তাহার কুলদেবতারূপে স্থাপন করিয়া সুযোগমতে ক্রমান্বয়ে অনেক তালুক খরিদ করিয়া অল্পসময়ের মধ্যে বিক্রমপুর সমাজে একজন খ্যাতনামা জমিদার পদে অধিষ্ঠিত হন। অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় আরও বলেন, "কথিত আছে যে, একসময়ে মহারাজ রাজবল্লভ সেনের কোনও কার্যের প্রতি নবাব সরকার হইতে সন্দেহের উৎপত্তি হয় এবং তন্নিমিত্ত তাহার কৈফিয়ৎ তলব হয়। এই ব্যাপারে কীর্তিনারায়ণ মহারাজকে যথোচিত সাহায্য করিয়া বিপদমুক্ত করায় তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাকে পুরস্কারস্বরূপ কতক ভূসম্পত্তি দান করেন। মহারাজ রাজবল্লভের পরিবারস্থ কতিপয় আত্মীয়-স্বজনের বসত বাড়ি এই সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ায় তাহারা ইহাতে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করেন। লালা কীর্তিনারায়ণ এই সামান্য ঘটনা লইয়া রাজপরিবারের সঙ্গে ভবিষ্যতে অসদ্ভাব হইবার ভয়ে ১১৮০ সনে রাজ পরিবারের বসত বাটি ও তৎপার্শ্বস্থিত কতক সম্পত্তি ৩৫০০ টাকার পরিবর্তে এবং ভবিষ্যতে স্বাধীন জমিদার হইবেন এই শর্তে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেন। ইহাতে তাহার সম্পত্তি হইতে দুই আনা অংশ বাহির হইয়া যায়। এইরূপে হস্তান্তরিত হইয়া ইহা ভিন্ন জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আর বক্রি চৌদ্দ আনা অংশই বৈকুণ্ঠপুর পরগণার ষোল আনা রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কীর্তিনারায়ণ এই চৌদ্দ আনা অংশ ও শ্রী শ্রী আনন্দদেবের নামে ক্রীত সমুদয় সম্পত্তি মিলাইয়া এক নূতন পরগণার সৃষ্টি করেন। সমস্ত সম্পত্তি অনন্তদেবের নামে ক্রীত এবং অনন্তদেবের বাসস্থান বৈকুণ্ঠপুর বলিয়া তাহার সৃষ্টি পরগণার নাম ও হইল বৈকুণ্ঠপুর[৩] পরগণা।

লালা কীর্তিনারায়ণ একজন পরম বৈষ্ণব ছিলেন। রাইসবরের নাম পরিবর্তন করিয়া তিনি শ্রীনগর নাম রাখেন। শ্রী অর্থ লক্ষ্মী। নগর শব্দের অর্থ উচ্চ প্রাসাদ সম্বলিত জনপদ। বিক্রমপুরে প্রভূত প্রভুত্ব লাভ করিয়া লালা কীর্তিনারায়ণ মনোরম বাসভবন সমন্বিত রাইস্বর গ্রামের নাম

সমৃদ্ধশালী নগর অর্থে শ্রীনগর রাখেন। সেকালে আবালবৃদ্ধবণিতা কীর্তিনারায়ণকে ভাগ্যবান পুরুষ বলিয়া মনে করিতেন। বস্তুতই কীর্তিনারায়ণ ভাগ্যশালী ছিলেন। তবে কমলা চঞ্চলা। ঋষিগণ বলেন, "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি" এই পৃথিবীর ধনজন সুখ-সম্পদ প্রভৃতি সমস্ত শ্রেষ্ঠ বস্তুই বহু বিঘ্নে সমাচ্ছন্ন। লালা কীর্তিনারায়ণের কীর্তিসমূহ এখন অতীতের গর্ভে বিলীন। অধ্যাপক গুপ্ত বলেন—"লালা কীর্তিনারায়ণ শ্রীনগর পত্তন করিয়া চতুর্দিকে পরিখা খনন করতঃ সুদৃঢ় বাসভবন প্রস্তুত করেন। গ্রাম রক্ষার্থ পাইক নিযুক্ত হইল। তাহারা তীর, বর্শা প্রভৃতির সাহায্যে গ্রামরক্ষা করিত। বিপদকালে তাহাদের আত্মরক্ষার্থে চারিটি[৪] গোলাকার উচ্চাকৃতি বুরুজ তৈয়ারি করা হয়। আজও বিদীর্ণ বুরুজ অতীতের সাক্ষ্য স্বরূপ মাথা তুলিয়া আছে। সংস্কারাভাবে তাহাও শীঘ্র কালের গর্ভে বিলীন হইবে।"

রথযাত্রা উপলক্ষে একটি মেলা বসিত, আজও সেই মেলা বসিয়া আসিতেছে। বিখ্যাত লৌহজঙের ঝুলন মেলা অপেক্ষা ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি কম ছিল না। বিক্রমপুরের প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখে অবগত হওয়া যায় যে, সেকালে পূর্ববঙ্গের আর কোথাও[৫] রথের মেলায় সেইরূপ মহাসমারোহ হইত না। চতুর্দিকস্থ অগণন দর্শকবৃন্দের কলকোলাহল ও ঢাকের ভীষণ শব্দে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিত। কীর্তিনারায়ণের আবাসবাটি ও নানারূপ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা সমূহে পরিশোভিত ছিল। রথটি পিতলের ছিল ; বর্তমানে যে রথটি আছে তাহা পূর্বাপেক্ষা তিন হাত ছোট হইবে। রথের গায়ে নানাপ্রকার দেবদেবীর মূর্তি থাকায় ইহা বড়ই সুন্দর দেখাইত। কীর্তিনারায়ণের বৈঠকখানা দালান সুসজ্জিত ও কলা নৈপুণ্যপূর্ণ থাকায় দর্শকদের নয়নতৃপ্তিকর হইত। বৈঠকখানার বারান্দায় দৌবারিকগণ দণ্ডায়মান থাকিয়া দিবারাত্র পাহারায় নিযুক্ত থাকিত। অর্থী-অভ্যাগতের কৃতজ্ঞতা ব্যঞ্জক জয়োচ্চারণ-রোলে বৈঠকখানা নিয়ত মুখরিত থাকিত। কীর্তিনারায়ণের স্বধর্মপরায়ণতা, বিদ্যোৎসাহিতা, উদারতা ও গুণগ্রাহিতার কথা বিক্রমপুরের পথে ঘাটে সর্বদা আলোচিত হইত। যখন বসন্তের শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনগরের দোলের একটা অনির্বচনীয় উন্মাদনা শ্রীনগর ও তাৎপার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহে জাগিয়া উঠিত এবং বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে হোলিগানের প্রতিযোগিতা চলিত সে দৃশ্য উপভোগ করা সত্য সত্যই একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। মৃদঙ্গের তালে তালে হোলির সমধুর সঙ্গীত লহরীর সহিত দোল পূর্ণিমার সেই শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত নিশীথে কুলদেবতা অনন্তদেব কুঙ্কুম রাগে সুরঞ্জিত হইয়া স্বর্ণ সিংহাসনে দোলায়মান থাকিতেন। ইহা ব্যতীত কীর্তিনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির তাহার জীবনের অন্যতম কীর্তি। এখন সে মন্দির অতীতের গর্ভে ইষ্টকস্তূপে পরিণত। গৃহদেবতা ছিল অনন্তদেব ও কাত্যায়ণী। কীর্তিনারায়ণের সমস্ত জমিদারি অনন্তদেবের নামে ক্রয় করা হইয়াছিল। এই উভয় বিগ্রহই কীর্তিনারায়ণ শ্রীনগরে স্থাপন করেন। আজিও অনন্তদেব ও কাত্যায়নী রীতিমত পূজা পাইয়া আসিতেছেন। ১১৭৫ বঙ্গাব্দে কীর্তিনারায়ণ শ্রীনগরে অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত করেন, আজ পর্যন্তও তথায় অতিথি সেবা পূর্ণমাত্রায় যত্নের সহিত চলিয়া আসিতেছে। এই স্বনামখ্যাত ব্যক্তির কল্যাণে শ্রীনগর একদিন ধন ও ঐশ্বর্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। লালা কীর্তিনারায়ণ ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

স্বর্গীয় লালা কৃষ্ণকুমার বসু ঃ

ইনি লালা কীর্তিনারায়ণের দত্তক পুত্র। ১১৮০ বঙ্গাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে পিতামাতার একমাত্র আদরের দুলাল ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে তিনি বেশি অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষাতে তিনি বিলক্ষণ বুৎপত্তি লাভ করেন। অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। জননীর প্রতি ভক্তি, ঈশ্বরে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, তাহার জীবনের সার ব্রত ছিল। তিনি বিশেষ সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। জমিদারির কার্যে তাহার বড়

মনোযোগ ছিল না। তিনি সর্বদা প্রাচীন বিশ্বস্ত কর্মচারীদিগকে শ্রদ্ধা করিতেন, তাহাদিগের উপরই জমিদারির নির্ভর ছিল।

লালা কৃষ্ণকুমার ১২৫৯ বঙ্গাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

লালা কৃষ্ণকুমার বসুর একমাত্র পুত্র লালা জগদ্বন্ধু বসু—ইনি ১২৩২ বঙ্গাব্দে শ্রীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। আজকাল প্রবাদ আছে জগদ্বন্ধু বসুর নাম প্রাতে স্মরণ করিলে, সেদিন ভাল যায়। ঢাকার স্বনামধন্য নবাব আবদুলগনি সাহেব জগদ্বন্ধুকে বড় সম্মান করিতেন। জগদ্বন্ধু ঢাকায় আসিলে এই মহানুভব নবাব তাহাকে আহার্য দ্রব্য সম্ভার পাঠাইয়া, স্বীয়গুণগ্রাহীতার পরিচয় দিতেন।

লালা জগদ্বন্ধু শ্রীনগর সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। যশোহরের বিখ্যাত মহারাজ বসন্ত রায়ের বংশধর দ্বারকানাথ রায় মহাশয় লালা জগদ্বন্ধুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী আনন্দময়ীকে বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়ায় জগদ্বন্ধু ভাগিনেয়গণকে তাহাদের বাসস্থান চব্বিশ পরগণার পুঁড়া গ্রাম হইতে উঠাইয়া শ্রীনগরে আনিলেন। সেই সময় হইতে মহারাজ বসন্তরায়ের একশাখা শ্রীনগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। লালা জগদ্বন্ধুর ভগ্নী আনন্দময়ী পিতৃবংশ লোপের ভয়ে নিজ সন্তানের ভাবী সমৃদ্ধি উপেক্ষা করিয়া ভ্রাতা জগদ্বন্ধুকে তাহার অনিচ্ছায় দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করান। লালা জগদ্বন্ধুর মৃত্যু ১২৮৬ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে হয়। এই দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্র লালা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার ও লালা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বসু। বিক্রমপুরের খ্যাতিমান পুরুষ সিংহ শ্রীযুত লালা রাজেন্দ্রকুমার ১২৭২ সনে শ্রীনগরে জন্মগ্রহণ করেন।

রাজেন্দ্রবাবু জীবনের অধিকাংশ সময় বিদেশে পরিভ্রমণ করিয়া যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। হিন্দুধর্মের উপর তাহার প্রগাঢ় ভক্তি। জীবনের প্রত্যেক কার্য ঈশ্বরের কার্য ও অবশ্য কর্তব্য মনে করিয়া তিনি অবিলম্বে তাহা সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

এত ঐশ্বর্য থাকিলেও লালা রাজেন্দ্রকুমার নিরহঙ্কার ও অত্যন্ত বিনয়ী। তাহার একমাত্র পুত্র লালা প্রদ্যোৎকুমার বসু—জন্ম ১৩০৭ সনের ২২ বৈখাখ। শৈশব হইতেই প্রদ্যোৎকুমার ধর্মপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ এবং নানাসদ্‌গুণের অধিকারি। ইনি আইন পরীক্ষায় ১৯২৫ সনে উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা সদর দেওয়ানি আদালতে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি দুর্ভিক্ষ জড়িত লোকদের সাহায্যকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। বিষয়ের তত্ত্বাবধান করাতে জমিদারি সংক্রান্ত কর্মে তাহার বিশেষ দক্ষতা জন্মিয়াছে।

প্রদ্যোৎকুমার সত্যবাদী, সত্যনিষ্ঠ ও স্বাধীন প্রকৃতির লোক। তিনি জমিদারির উন্নতিকল্পে অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন।

লালা ব্রজেন্দ্রকুমার বসু বাংলা ১২৮২ সালে শ্রীনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাহার পিতার চতুর্থ সন্তান। তাহারা সর্বসমেত দুই ভাই ও তিন বোন। লালা ব্রজেন্দ্রকুমারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম লালা রাজেন্দ্রকুমার। ব্রজেন্দ্রকুমারের তিন ভগ্নীর মধ্যে বর্তমানে কেহই জীবিত নাই ; সকলেই অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন।

ব্রজেন্দ্রবাবু বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত শান্তশিষ্ট এবং নম্রস্বভাব ছিলেন। শ্রীনগর গ্রামে গৃহশিক্ষকের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা পরিসমাপনান্তে লালা ব্রজেন্দ্র কুমার একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে গৃহশিক্ষক এবং বিশ্বস্ত ভৃত্যের সমভিব্যাহারে বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে ঢাকা নগরীতে গমন করেন। শৈশব হইতেই ব্রজেন্দ্র বাবু ভৃত্যটির বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় ভৃত্যটি সর্বদা ছায়ার মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। এই ভৃত্য সর্বদা মায়ের মত যত্নে ব্রজেন্দ্রবাবুকে লালন পালন করিয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবুর পঁচিশ বা ছাব্বিশ বৎসর বয়সের সময় এই ভৃত্যটি পরলোক গমন করিলে পর তিনি তাহার শোকে এতই ম্রিয়মান হইয়াছিলেন যে, কয়েকটি দিন পর্যন্ত তিনি সর্বদা অশ্রুবিসর্জন করিতেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ পর্যন্ত করিতেন না।

ব্রজেন্দ্রবাবু ঢাকা নগরীতে প্রথমে কলেজিয়েট স্কুলে ও পরে পগোজ স্কুলে অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত ও ইংরাজি সাহিত্যে তাহার অতিশয় অধিকার ছিল। লেখাপড়ায় ব্রজেন্দ্রবাবুর সর্বদাই আগ্রহ ছিল এবং অদ্যাপিও তিনি বিদ্যানুশীলনের প্রতি উদাসীন নহেন। এখনও তিনি অবসর সময়ে ভাল ভাল পুস্তক পাঠ করিয়া চিত্তের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির প্রতি অমনোযোগী নহেন। বিদ্যানুশীলনের প্রতি তাহার অত্যধিক আগ্রহ থাকা স্বত্বেও শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি শিক্ষা বিষয়ে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তিনি মনোনীত হইয়াও অসুস্থতার জন্য পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। পরীক্ষা দিতে না পারায় তিনি অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন।

বাল্যজীবনে খেলার দিকে ব্রজেন্দ্রবাবুর খুব ঝোঁক ছিল। ক্রিকেট খেলায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাহার সহপাঠী বন্ধুবান্ধব যাঁহারা জীবিত আছেন, তাহাদের নিকট, ব্রজেন্দ্রবাবুর ক্রিকেট খেলার ভূয়সী প্রশংসা এখনও শুনা যায়। তিনি খুব ভাল ঘোড়া দৌড়াইতে পারিতেন। প্রত্যহ অপরাহ্নে তিনি আট দশ মাইল ঘোড়া দৌড় করিয়া শারীরিক পরিশ্রম করিতেন। নানা স্থান হইতে তিনি ভাল ভাল ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া পালিতেন এবং স্বয়ং ঘোড়ার তত্ত্বাবধান করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে এখন যদিও তিনি ঘোড়ায় চড়িতে অসমর্থ তবু অশ্বপ্রীতি এখনও তাহার কমে নাই।

শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ গুহ রায় ঃ

এই বংশের (মহারাজা বসন্ত রায়ের বংশের) স্বর্গীয় মথুরানাথ গুহ রায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় বহুকাল নারায়ণগঞ্জ শহরে কার্যব্যাপিদেশে কাটাইয়াছেন। এরূপ সাধু প্রকৃতির নিরভিমান এবং সহৃদয় লোক সচরাচর দেখা যায় না। শহরের সকল সদানুষ্ঠানের সঙ্গে ইহার আন্তরিক যোগ ছিল। ইনি স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশনের এবং নিতাইগঞ্জ স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। প্রথম যৌবনে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সাধনা প্রাপ্ত হইয়া নিজের জীবনকে শত প্রলোভনেও তিনি সৎপথে রাখিতে পারিয়াছেন। সাধু সজ্জন যে কেহ ইহার নিকটে আসিতেন ইহার অন্তরের ভক্তি ভাব দেখিয়া তাহারা আনন্দিত হইতেন। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বর্গীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দজী (রাখাল মহারাজ) এবং স্বামী প্রেমানন্দজী যতীন বাবুকে অত্যন্ত স্নেহ ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। যতবার নারায়ণগঞ্জে তাহারা আসিয়াছেন এই সরল গুরু বিশ্বাসী অকপট ধর্মভীরু যতীন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যান নাই। দীর্ঘকাল কার্যব্যাপদেশে নানা প্রকার লোকের সংঘাতে আসা সত্ত্বেও কেহ ইহার নিকট হইতে কোন কর্কশ বা অন্যায় ব্যবহার পান নাই। ইহার গৌরবর্ণ, সুশ্রী ও সৌম্য মূর্তি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। ইহার সহজ সততায় এবং কর্তব্যপরায়ণতায় ইংরেজ মনিবরাও ইহাকে অতি সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন। ১৯৩২ সালে ৬২ বৎসর বয়সে ইনি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

সাংসারিক নানাপ্রকার প্রলোভনরূপ যেসকল অগ্নি পরীক্ষায় ইনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা অতি কম লোকের ভাগ্যে হইয়া থাকে। অনটনের ভিতরে সহজলভ্য অর্থকে উপেক্ষা করা কম শক্তির পরিচায়ক নহে। প্রত্যহ ইনি গুরুমূর্তি পূজা করেন এবং সদগুরুর বিশেষ কৃপায় সমস্ত প্রলোভনের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। উঁহার দুইটি পুত্র শৈলেন্দ্র ও জীবন্দ্রে কৃতবিদ্য হইয়া কলিকাতায় বাস করিতেছেন। অবসর গ্রহণের পর যতীনবাবু সস্ত্রীক নানা তীর্থে কাল অতিবাহিত করিতেছেন।

যতীনবাবুর পত্নী শ্রীযুক্তা সুনীতি গুহ অসামান্যা মহিলা। খর্বকায়, একহাড়া গড়ন ও তীক্ষ্ণ চক্ষু দেখিলে ইহাকে প্রখর বুদ্ধিশালিনী বলিয়া মনে হয়। ইনি যে বাস্তবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাড়ার সকলের সুখে দুঃখে সহানুভূতি দেখাইতে তাহার মত আর কেহ

ছিল না। ইহার কর্মপটুতা এবং রন্ধনকার্যে নিপুণতা সর্বজনপ্রসিদ্ধ। তাহার চেহারায় বুদ্ধিমত্তা স্নিগ্ধতা দেদীপ্যমান।

শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ গুহ রায় ঃ

মহারাজা বসন্ত রায় মহাশয়ের বংশের স্বর্গীয় মথুরানাথ গুহ রায় মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র শ্রীযুত হেমেন্দ্রনাথ গুহ রায় মহাশয় সর্বজন পরিচিত ব্যক্তি। বাল্যে অতি অলৌকিক ও অযাচিতভাবে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট সাধন প্রাপ্ত হন। বিদ্যাশিক্ষাকালীন বরিশালের স্বনামধন্য স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং ঋষিকল্প আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসর্গে ইহার চরিত্র গঠিত হয়। বরিশালে পাঠাভ্যাস শেষ করিয়া ঢাকা কলেজ হইতে এফ এ পাশ করিয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এ পড়িতে থাকেন। ইহার শারীরিক ও মানসিক শক্তি অদ্ভুত ; এ দুয়ের একত্র সমাবেশ দেশে খুব অল্পই দেখা যায়।

বঙ্গভঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনে হেমেন্দ্রনাথ পড়া ছাড়িয়া দেশের হিতের জন্য সমগ্র মনপ্রাণ ঢালিয়া দেন। ভবিষ্যতের ভাবনা ইহাকে যুবক হেমেন্দ্রনাথের অদম্য উৎসাহ, স্বার্থত্যাগ ও অমানুষিক পরিশ্রম করিবার শক্তি দেখিয়া আশ্চর্যন্বিত হইতেন। শ্রীঅরবিন্দ, মনিষী বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুর এবং কবিসম্রাট শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ, স্যার আশুতোষ চৌধুরী এবং বোমকেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি নেতৃবর্গ ইহাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং ইনি তাহাদের অতিশয় বিশ্বাসভাজন ছিলেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রমিকনেতা কেয়ার হার্ডি (Ker Hardy M.p) সাহেবের ভারতভ্রমণকালীন তাহার সেক্রেটারি ছিলেন হেমেন্দ্রনাথ ; তৎপর পার্লামেন্টের সদস্য Dr. V. H. Rutherford "ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান" এর জগত প্রসিদ্ধ সম্পাদক Dr. Nevinson 1907 সনে ভারতে আসেন, তখন তাহাদের সেক্রেটারিও তিনিই ছিলেন। শেষোক্ত দুই জন ইহার গুণাবলীতে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে ইঁহাকে বিলাত লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু নৈষ্ঠিক হিন্দু বলিয়া তিনি যাইতে রাজি হন নাই। স্বর্গীয় Dr. Annie Besant বাংলায় যখন "হোমরুল লীগ" স্থাপন করেন তখন শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সম্পাদক এবং হেমেন্দ্রনাথ সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯২০ সালের কলিকাতা স্পেশাল কংগ্রেসে হেমেন্দ্রনাথ অন্যতম সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় হেমেন্দ্রনাথকে বঙ্গীয় জমিদার সভার (Bengal Land Holder's Association) সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করেন। বঙ্গভঙ্গের সময় জমিদার সভার প্রেসিডেন্ট স্বর্গীয় মহারাজা সূর্যকান্ত, স্যার আশুতোষ চৌধুরী সম্পাদক এবং অক্লান্ত কর্মী হেমেন্দ্রনাথকে সহকারি হিসাবে পাইয়া দেশব্যাপী যে আসাধারণ আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা সর্বজনবিদিত। এই সময় হেমেন্দ্রনাথ "Bengalee", "Indian Daily News" 'সন্ধ্যা', 'নবমুক্তি' ও 'বন্দেমাতরমের' নিয়মিত লেখক ছিলেন। স্বনামধন্য, অসামান্য বাগ্মী ও দেশনায়ক স্যার সুরেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথের কার্যকুশলতায় অত্যন্ত প্রীত ছিলেন। "Bengal Landholders' Association"-এর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাতে হেমেন্দ্রবাবু সমাজের সর্বশ্রেণীর বিশেষত ধনী লোকদের সহিত ঘনিষ্টভাবে শিখিবার সুযোগ পান। কিন্তু ধনী এবং সমৃদ্ধশালী ব্যক্তির ঘনিষ্ট সম্পর্কে আসিয়াও নিজের বৈশিষ্ট্য কখনও হারান নাই। তাহার তেজস্বিতা, স্পষ্টবাদীতা এবং নিরপেক্ষতা অনন্যসাধারণ। কলিকাতার বহু লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত উঁনি জড়িত। ইঁনি কলিকাতার "গোরক্ষিণী সভার" (All India Cow Conference) ট্রাস্টি, আদি "মহাকালী পাঠশালার" একজন সেক্রেটারি, "মহাজন সভার" (Bengal Mahajan Sava) বিশিষ্ট সভ্য এবং এক্ষণে "বংগীয় জমিদার সভা" Bengal Land Holder's Association) অনারারী অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারি। বহু রাজপুরুষ ইহার স্পষ্ট ও সরল সত্যবাদীতায় মুগ্ধ। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা, কাশ্মীর ও নেপালের ভূতপূর্ব

মহারাজদ্বয় এবং বর্তমান দ্বারবঙ্গেশ্বরের সহিত হেমেন্দ্রবাবুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কিন্তু তিনি এই সকল ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদিগকে কখনও নিজ সুখ-সুবিধার জন্য অবলম্বন করেন নাই। দেশবন্ধু দাশ মহাশয় কলিকাতার কর্পোরেশন হাতে নিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হিসাব পরীক্ষার কাজে হেমেন্দ্র নাথকে নিযুক্ত করেন।

হেমেন্দ্রনাথের পিতৃমাতৃভক্তি অনন্যসাধারণ। বিদেশে বাল্যকালে যখন পড়াশুনা করিতেন তখন তাহাদের জন্য ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেন। তাহাদের ছাড়িয়া যাহাতে প্রাণে বেদনা পাইতেন ; কিন্তু তাহাদের সমক্ষে সকল মনঃকষ্ট চাপিয়া যাইতেন। সেই বাল্য বয়সে মাতা-পিতার চরণধূলি শিশিতে ভরিয়া রাখিতেন এবং প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতেন। এখনও জীবনের অপরাহ্নে স্বর্গীয় পিতার পাদুকা (খড়ম) এবং মাতৃদেবীর ছবি প্রত্যহ পূজা না করিয়া বাহির হন না। বাল্যে প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট সাধন প্রাপ্তির সময় তাহার শ্রীমুখবাক্য "মাতাপিতা প্রত্যক্ষ দেবতা" তাহার হৃদয়ে চিরকালের জন্য অঙ্কিত রহিয়াছে। মাতার শেষ বয়সে তাহার ইচ্ছানুযায়ী মাদ্রাজ এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রসিদ্ধ সকল তীর্থ সমূহ একাধিকবার পরিদর্শন করিয়াছেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে হরিদ্বারের কুম্ভে একমাস মাতাকে লইয়া হেমেন্দ্রবাবু হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে যাপন করিয়াছেন। ১৯১৭ সালে প্রয়াগের কুম্ভে বৃদ্ধা মাতাকে লইয়া মাসাধিককাল গঙ্গার চড়ার উপর বাস করিয়েছেন। হেমেন্দ্রবাবু মাতাকে লইয়া সমস্ত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়াছেন। এবং নিজে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে পদব্রজে কেদার ও বদ্রীনারায়ণ তীর্থ করিয়া আসিয়াছেন। অতি শৈশবে পিতার সাধু সর্জনানুরক্তি হেমেন্দ্রনাথে সংক্রামিত হয়। বৃন্দাবনের ব্রজবিদেহী বড় কাঠিয়াবাবা, স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ, স্বামী গম্ভীরানাথজী, গয়ার ধুনিয়া পাহাড়ের বাবা ঠাকুরদাস, পুরীর চরণদাস বাবাজী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এবং পাগাড়ি বাবা ইঁহাকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ইহার অকপট এবং অনাড়ম্বর ভাব মহাপুরুষগণের কৃপা আকর্ষণ করিত। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দজী (রাখাল মহারাজ) এবং স্বামী প্রেমানন্দজী হেমেন্দ্রনাথকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। জগন্নাথক্ষেত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী প্রায়ই যাইতেন এবং হেমেন্দ্রনাথকে পাইলে সহজে ছাড়িয়া দিতেন না। সহজ, সরল পথ অবলম্বন করিয়া বিনাড়ম্বরে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করা সৌভাগ্যের পরিচায়ক। জীবনে এতগুলি মহাপুরুষ ও দেশের কৃতী সন্তানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সকলের অদৃষ্টে ঘটে না। কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ একবার হেমেন্দ্রনাথের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া একখানা গ্রন্থে তাহার নাম লিখিয়া নিম্ন লিখিত আশীর্বচন লিখিয়া পাঠান—

"প্রথম পাতাখানি মেলেছে শতদল
তুলেছে আকাশের দিকে,
রবির কর তাহে শুভ সমুজ্জ্বল
আশিস লিপি দিল লিখে।"

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩১২ সাল জোড়াসাঁকো।

---

১. "ফরিদপুরের ইতিহাস"—৭৭ পৃষ্ঠা। বারভুঞা ১৪৯ পৃষ্ঠা; প্রবীণ ঐতিহাসিক লালা শ্রীযুত আনন্দনাথ রায় মহাশয় বলেন—"বিশ্বম্ভর সুরের তিন কি চারি পুরুষ পরে রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের অভ্যুদয় হয়। তিনি গাভার ঘোষ বংশীয় পরমানন্দ ঘোষের সহিত আপনার এক তনয়ার বিবাহ দেন। ঘোষ সস্ত্রীক স্বালয়ে প্রস্থান করিলে, চন্দ্রদ্বীপ সমাজস্থ অপরাপর সামাজিকেরা তাহার সহিত সমাজ-সামাজিকতা করিতে স্বীকৃত হন না। পরমানন্দ অনন্যোপায় হইয়া বনিতাসহ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার ভুলুয়াতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য তৎপ্রতিকার মানসে বদ্ধপরিকর হন। তৎকালে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রাজা রামচন্দ্র, যশোহরের

রাজা প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদার রায় এবং ভূষণার মুকুন্দ রায় এই চারিজন দলপতি ছিলেন। ভুলুয়াধিপতি এই চারিজন দলপতির অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়ায়, সকলেই তাহার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের বাড়িতে কোন এক বিবাহ ব্যাপারে এই সকল দলপতিরা নিমন্ত্রিত হইয়া স্ব স্ব দল ভুলুয়াতে আগমন করেন, কিন্তু বিক্রমপুরের সকল সামাজিক তাহাতে যোগদান করেন না। এইজন্য রাজগণের আদেশে এই উদ্ধত সামাজিকগণকে কুলচ্যুত করিয়া ঘটকগণ তৎক্ষণাৎ একটি শ্লোক রচনা করেন, যথা—

"বেজগ্রামে স্থিতাঃ সর্বে যে চতুর্মণ্ডলে স্থিতাঃ।
চান্দনী চাকুলী যে চ নাস্তি তেষাং কুলং বুধাঃ।"

এইকারণে বিক্রমপুরস্থ বেজগাঁ, চতুর্মণ্ডল, চান্দনী ও চাকুলীবাসী শ্রেষ্ঠ কায়স্থগণ কুলচ্যুত হন, এমন কি এই সকল স্থানে যদি কোন কুলীন আসিয়া বাসও করেন, তবে তাহারাও কুলচ্যুত হইয়া থাকেন।

২. ঢাকার ইতিহাস—যতীন্দ্রমোহন রায় প্রথম খণ্ড। শ্রীনগরের অনন্তদেব—শ্রীনগরের স্বনামখ্যাত লালা কীর্তিনারায়ণ ১১৭৫ বঙ্গাব্দে অনন্তদেবকে তদীয় কুলদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। লালা কীর্তিনারায়ণ অনন্তদেবের নামেই বিভিন্ন সময়ে নানা সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। অনন্তদেব জাগ্রত দেবতা। শ্রীনগরের লালা বাবুগণ সমুদয়ক্রিয়া কলাপেই অনন্তদেবের অর্চণা করিয়া তাহার নাম নিয়া অন্যত্র গমনাগমণ করিয়া থাকেন।

দৈনিক পূজার নিয়ম : প্রাতে জাগরণ, পরে স্নানাদি করাইয়া /৭।। সের তণ্ডুলের নানা উপকরণসহ ভোগ। সন্ধ্যায় কীর্তন ও আরতি, পরে বৈকালী। প্রতি পূর্ণিমা ও একাদশীতে /৫ সের দুগ্ধের মিষ্টান্ন ভোগ প্রদত্ত হয়।

বাৎসরিক নিয়ম : দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ পুষ্পদ্বারা বিশেষভাবে পূজা। বৈশাখ জলধা ও শীতল ভোগ, জ্যৈষ্ঠে আমক্ষীর ও ক্ষীরের ভোগ। ভাদ্রে পিষ্টকাদি দ্বারা ভোগ। আশ্বিনমাসে নানাবিধ দ্রব্যাদি দ্বারা বিশেষভাবে ভোগ প্রদত্ত হয়। কার্তিক মাসে ঘৃতের প্রদীপ ও প্রত্যহ মিষ্টান্ন ভোগ দেওয়া হয়। পৌষে পিষ্টকাদি এবং মাঘ মাসে কুলনের ভোগ হয়। চৈত্রে পুরী ও ক্ষীর দ্বারা প্রত্যহ বৈকালী হয়।

৩. রাইসবর নিবাসী কীর্তিনারায়ণ বসু নবাব সরকারের কার্য করিয়া "লালা" এই গৌরবাত্মক উপাধি লাভ ও বহু ভূসম্পত্তি অর্জন করেন। এই সময়ে স্বীয় বাসস্থান রাইসবরে নামকরণ হয় শ্রীনগর। বর্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত শ্রীনগরের বাবুগণ, তাহার ও তদীয় ভ্রাতাদের বংশধর। বিভিন্নস্থানে যে সকল সম্পত্তি তাহার হস্তগত হয় উহা সমুদয় একত্র করিয়া তিনি বৈকুণ্ঠপুর নামে এক পরগণা নবাবী সেরেস্তার অন্তর্গত করিয়াছেন। বর্তমান সময়ের ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর—প্রভৃতি জেলায় এই পরগণার জমি আছে। ফরিদপুরের অন্তর্গত শিবচর থানার অনেক স্থান বৈকুণ্ঠপুর পরগণার অন্তর্গত। উহার কতকাংশ শ্রীনগরের লালাবাবুদের হস্তভ্রষ্ট হইয়াছে, অবশিষ্ট তাহারা আজিও ভোগ করিতেছে। History of Faridpur by Ananda Charan Roy. Part II, p. 38.

৪. শ্রীনগরের বুরুজ— শ্রীনগরের জমিদার বংশের স্থাপয়িতা ইতিহাস প্রসিদ্ধ লালা কীর্তি নারায়ণের নির্মিত বুরুজ অষ্টাদশ শতাব্দীর উন্নত স্থাপত্যের জ্বলন্ত নিদর্শন। কীর্তিনারায়ণ শ্রীনগর পত্তন করিয়া উহার চতুর্দিকে পরিখা খননপূর্বক সুদৃঢ় বাসভবন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বিপৎকালে আত্মরক্ষার্থ স্বীয় আবাস ভূমির চতুর্দিকে যে চারিটি বুরুজ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি মাত্র ধ্বংস চিহ্ন লইয়া অতীতের সাক্ষীস্বরূপে বিদ্যমান আছে। সংস্কারাভাবে বোধহয় ইহাও কালগর্ভে বিলীন হইবে। এই বুরুজটি গোলাকার ; উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফিট হইবে। অভ্যন্তরীণ ব্যাসও প্রায় ৭ ফিট। এই বুরুজে দিবারাত্রি সান্ত্রী প্রহরী নিযুক্ত থাকিত।" Sri Jatindra Mohan Roy–History of Dacca, Part I. p. 358.

৫. শ্রীনগরের রথ মেলা—রথযাত্রা উপলক্ষে এখানে অষ্টাহব্যাপী একটি বৃহৎ মেলার অধিবেশন হয়। এই জেলায় শ্রীনগরের প্রসিদ্ধ কুম্ভকারগণের প্রস্তুত নানাবিধ সুদৃশ্য মূর্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বিক্রমপুরের নানা স্থান হইতে এই সময়ে এখানে বহুলোকের সমাগম হয়। দূর দেশান্তর হইতে আগত দোকানদারগণ বিবিধ পণ্য-সম্ভার দ্বারা তাহাদের ক্ষুদ্রপণ্য বিথিকা পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে। এইসময়ে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদেরও ত্রুটি হয় না।" ঢাকার ইতিহাস—যতীন্দ্রমোহন রায়। প্রথম খণ্ড। ২৬২ পৃঃ।

তৃতীয় অধ্যায়



ন'পাড়ার চৌধুরী বংশ ঃ

বারভূঞার পতনের পর, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া আবার বহু জমিদারের অভ্যুদয় হয়। কেদার রায়ের জমিদারি নিজ বিক্রমপুর ন'পাড়ার ভরদ্বাজ গোত্রজ বৈদ্য চৌধুরীদের হস্তাগত হয়। প্রথম জমিদার রঘুনন্দন অতি সচ্চরিত্র এবং বীর পুরুষ ছিলেন। এজন্য মানসিংহ তাহার হস্তেই ঐ জমিদারি ন্যস্ত করেন। রঘুনন্দন জমিদারি লাভ করিয়া স্বদেশের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া তুলেন। নানা স্থান হইতে নানা শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোক আসিয়া এই সময়ে তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। বিশেষ বৈদ্য সম্প্রদায় মধ্যে ইহারা সাধু ছিলেন। এজন্য যশোহরাঞ্চল হইতে বহু সম্ভ্রান্ত বৈদ্য আনিয়া স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে দুই তিন পুরুষ পর যাঁহারা এই বংশে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন, তাহারা কিন্তু আর কাহাকেও সম্মানী বলিয়া গ্রাহ্য করিতেন না। নানারূপ অত্যাচার অবিচার চলিতে লাগিল। শুনা যায়, ইহারা সাড়ে সাত শত ঘর লোককে ক্রীতদাসের কার্যে নিযুক্ত করেন, ভদ্রলোকের বাটির নিকট দিয়া, অশ্লীল সারি গাহিয়া বাইচের নৌকা চালাইতেও ইতস্ততঃ করিতেন না।

অত্যাচারের মাত্রা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সকল শ্রেণীর উপরই চলিতে লাগিল। যাঁহাদের পদধূলি বাড়িতে পড়িলে, ইহাদের পূর্ব পুরুষেরা একদা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন, সেই সকল স্বজাতীয়দিগকেও এখন আর ইহারা মনুষ্য বলিয়াই বিবেচনা করিতেন না।

দিন কাহারও সমান যায় না, এদিকে বৈদ্য বংশের মধ্যে যাহারা ইতিপূর্বে কেবল চিকিৎসা ও শাস্ত্রচর্চা করিয়া এতকাল জীবন যাপন করিতেছিলেন, এখন আবার তাহাদের বংশধরেরা অনেকেই সংস্কৃত শ্লোকাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, পারস্য ভাষা চর্চায় মনোনিবেশ করিলেন। অচিরাৎ ফলও ফলিল। তন্মধ্যে অনেকে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। এই সময় তাহাদের নিকট জমিদারের অন্যায় অত্যাচার বা আদব কায়দা ভাললাগিত না।

বোধহয় সকলেই অনুমান করিতে পারেন যে মানব যতই উন্নতি লাভে অগ্রসর হয়, আর যাহাতে তাহারা সেইরূপ পদ লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে বিক্রমপুরস্থ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রাধান্য ব্যতীত বৈষয়িক বিষয়ে বড় কেহ লিপ্ত ছিলেন না। স্বাবলম্বনে এই সময়ে বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে জপসার রায়, সোনারঙ্গের ও সোমকাটের ভূঞা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

ক্রমে এই কয়েক ঘর একত্র হইয়া জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। জমিদার ও নুতন অভ্যুত্থিত প্রজাগণকে দমন জন্য নিত্য নতুন অত্যাচারের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, উভয়পক্ষের দাঙ্গা হাঙ্গামায় বিক্রমপুর উৎসন্ন হইতে বসিল। এই কথা ক্রমে ঢাকার সুবেদারের কর্ণগোচন হইল। এই সময়ে সুবেদার সরফরাজ খাঁয়ের প্রতিনিধি ঘালেব আলি খাঁ ঢাকার নায়েব এবং যশোবন্ত রায় তাহার দেওয়ান ছিলেন।

প্রজারা জমিদারের বিরুদ্ধে নানারূপ অত্যাচারের, আবার জমিদার পক্ষ হইতে তাহাদের বোট ও বাইচের নৌকা ভঙ্গের বাবদ অভিযোগ উপস্থিত করিল, প্রমাণে জমিদার পরাস্ত

হইলেন। সমবেত প্রজামণ্ডলীর কাতর ক্রন্দনে, ঘালেব আলি খাঁ ও যশোবন্ত রায় ব্যথিত হইলেন, প্রজারা বলিল, যদি অতঃপর আর জমিদারের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করা হয়, তবে আর তাহাদের মান সম্ভ্রম রক্ষা পাইবার উপায় নাই। ইহার পর রাজাজ্ঞা প্রচার হইল, অতঃপর যে সকল প্রজা জমিদারের অধীন হইতে আপন বিষয় সম্পত্তি আনিয়া নবাব সরকারের সেরেস্তায় নাম জারি করিবে, তাহাদের সহিত জমিদারের আর কোন সংস্রব থাকিবে না। যেমন হুকুম প্রচার, অমনি সাত শত আবেদনকারী আসিয়া স্ব স্ব জমা জোত সম্বন্ধে নবাব সেরেস্তায় নাম জারি করিয়া লইল।

আইন আকবরি—মোঘল শাসন সময়ে সরকার সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত নিম্নলিখিত পরগণাগুলি ছিল, যথা ঃ

১) অবতার সাহপুর, ২) আনচাপ, ৩) অবতার ওসমানপুর, ৪) বিক্রমপুর, ৫) বেলাজোওয়ার, ৬) বলদাখান, ৭) বোয়ালিয়া, ৮) পারচাঁদে, ৯) বাটখারা, ১০) পলাশবাটি, ১১) চরদিয়া, ১২) ফুলরী, ১৩) পানহাটি, ১৪) তাতরা, ১৫) তাজপুর, ১৬) তিরকি, ১৭) যোগীদিয়া, ১৮) জেওয়ার বন্দর, ১৯) চোকেন্দী, ২০) চণ্ডীহার, ২১) চাঁদপুর, ২২) হাবেলি সোনারগাঁ, ২৩) খিজিরপুর, ২৪) দৌহার, ২৫) ভানডেরা, ২৬) দক্ষিণ সাহপুর, ২৭) দেওয়ানপুর, ২৮) দেকান ওসমানপুর, ২৯) রায়পুর, ৩০) সুখারগঞ্জ, ৩১) সুকেরী, ৩২) সোলিমপুর, ৩৩) সেলিসেবি, সরজলকর, ৩৪) সুকাওসা, ৩৫) সুকদিয়া, ৩৬) সেবার চল, ৩৭) শমসপুর, ৩৮) কড়াপুর, ৩৯) গবদী, ৪০) কার্তিকপুর, ৪১) কাঁদি, ৪২) কোলহরি, ৪৩) ঘাটি দুনাই, ৪৪) মারকোর, ৪৫) মজমপুর, ৪৬) মেহার, ৪৭) মনোহরপুর, ৪৮) সাহীজল, ৪৯) নারায়ণপুর ও সায়র জেকাও, ৫০) লেপুয়া কোট, ৫১) হিমতী বাজু, ৫২) হাটঘাটি।

এই বাহান্ন মহলের রাজস্ব ১০,৩৩,১৩,৩৩৩ দাম। তন্মধ্যে বিক্রমপুর পরগণার রাজস্ব ৩৩,৩৫,০৫২ দাম[১] অর্থাৎ সমগ্র মহাল মধ্যে বিক্রমপুরের রাজস্ব সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল দেখা যায়। উপরে যে সকল মহাল বা পরগণার নামোল্লেখ করা হইয়াছে, উহার অধিকাংশ অধুনা ঢাকা, ফরিদপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালি এই চার জেলার বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

বিক্রমপুর ইতিহাস প্রণেতা স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ ঘোষ মহাশয় বলেন ঃ **ন'পাড়ার চৌধুরী ঃ** "অত্রত্য চৌধুরীগণ অতিশয় প্রতাপ সম্পন্ন ও ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। বিখ্যাত রঘুনন্দন দাশ এই চৌধুরীদিগের পূর্বপুরুষ ছিলেন। অনেকে বলেন রাজবল্লভ অপেক্ষা ইহাদের জনবল ও সাহসিকতা অধিক ছিল। যাহা হউক ইহারা সাধারণত লোকের প্রতি তাহাদের কৃত কার্যকলাপের বিষয় শ্রবণ ও স্মরণ করিলে অনায়াসেই তৎসমস্তের প্রমাণ প্রত্যক্ষীভূত হইবে। যখন আরাকানে ব্রহ্মদেশীয়দিগের সহিত ইংরেজদিগের সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তখন কতিপয় রণ পোতারোহনে কয়েকদল পশ্চিমাঞ্চলীয় সিপাই আরাকানাভিমুখে গমন করেন। পথিমধ্যে ন'পাড়ার নিকট উপস্থিত হইলে তাহাদের আহারের সময় হয়। নওপাড়ার চৌধুরীদিগের অনেক কদলী বাগান ছিল। সিপাইগণ কদলী পত্রে বাসনের কার্য সম্পাদন করিত। সুতরাং উহার আবশ্যক হওয়াতে তাহারা তীরে নামিয়া বাগানে প্রবেশ করে। প্রবেশকালে চৌধুরীগণের লোকেরা তাহাদিগকে অনেক প্রকার নিষেধ বাক্য বলে। কিন্তু রণকুশল সিপাহীবৃন্দ তাহাদের কথায় ভীত না হইয়া সশঙ্কিতচিত্তে পাত কাটিতে থাকে। দ্বারপালগণ চৌধুরীদিগকে এ বিষয় জ্ঞাপন করিলে তাহারা তাহাদিগকে (সিপাইদিগকে) প্রহার ও তাহাদের যানসমূহ নদীগর্ভে নিমগ্ন করিবার আদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে চৌধুরীবৃন্দের সেনাগণ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্বক সিপাইদিগের অনেককে আহত করে। তাহাদিগের পোতাবলী জলমগ্ন করিয়া তাহাদিগকে যারপর নাই দুরবস্থা করিয়া দেয়।

এই সংবাদ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইলে তাহারা চারিজন প্রধান দারোগার উপর এ বিষয়

তদন্ত করিবার ভার দেন। দারোগাগণ নওপাড়ায় উপনীত হইবামাত্র তাহাদের তিনজনকে চৌধুরীবৃন্দ নানাবিধ বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া পরিশেষে বন্দি করিয়া রাখেন। অবশিষ্ট ব্যক্তি অতি কষ্টে পলায়ন করিয়া এই সমস্ত শোচনীয় ঘটনা গবর্নমেন্টের গোচর করেন। গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে এরূপ অত্যাচারিত মনে করিয়াছিলেন যে তাহারা যাহাতে সমূলে চৌধুরীগণ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ আদেশ করিলেন। চৌধুরীদিগের গৃহ তোপদ্বারা জ্বালিয়া দেওয়ার অনুমতি হয়। অনন্তর গভর্নমেন্ট প্রেরিত সৈন্যবৃন্দ তেপাগ্নিতে চৌধুরীদিগের বাটি ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। যে চৌধুরীগণ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বলে দাঙ্গা হাঙ্গামাদি করিয়া সকলের মনে মহান আতঙ্কের উৎপাদন করেন, যাঁহাদের ভয়ে নদীমার্গ দিয়া বহু মূল্য দ্রব্য পূর্ণ নৌকা শ্রেণীর গমন অসাধ্য হইত। সহজ কথায় যাঁহারা অত্যাচারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্বক মানমদে মত্ত হইয়াছিলেন, সেই বহু প্রতাপ সম্পন্ন নওড়ার চৌধুরীগণ এইরূপে একটি সামান্য ঘটনায় একবারে বিপন্ন ও উৎসন্ন হইয়া যান।"

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে চাঁদ-কেদার রায়ের পতনের পরে চাঁপাতলার ভরদ্বাজ বংশীয়গণের জ্যেষ্ঠশাখা চৌধুরীগণ ন'পাড়া গ্রামে অট্টালিকা প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত চৌধুরী বংশের রাজত্বকালে বিক্রমপুরের যে কতিপয় গ্রামে শ্রেষ্ঠ বৈদ্য সমাজ সন্নিবেশিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে বিন্যস্ত হইল।

রাজপাশা, সঙ্কট, গোবিন্দমঙ্গল, দাউনিয়া (বিলদাউনিয়া), জপ্‌সা, কোঁয়রপুর, মাশারিয়া, দশলঙ, চামারদি, কাকুরগাঁ, সোনারটং, কাঁচাদিয়া, হাতারাভোগ, বসুর, বিদগাঁ, আউটসাহী, মূলগাঁ ও বাহেক। উল্লিখিত গ্রাম সমূহে কোন্ কোন্ বংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

(১৬০৮ খ্রিঃ ন'পাড়ায় চৌধুরীদিগের অভ্যুদয় হয়)

রামপাল বৈদ্যগ্রাম বেজগাঁ	সেনরাজগণের জাতি বৈশ্বানর বংশ। [আয় ৩,২,৯০০ দাম]
পালগ্রাম পালগাঁ	পালরাজগণের জ্ঞাতি শক্তি গোত্র প্রভব সেনবংশ। [আয় ৭১,১০০ দাম]
চম্পাবতী চাঁপাতলী	ভরদ্বাজ গোত্র দাশবংশ। [আয় ২০,১০০ দাম]
সঙ্কট বা সম্‌কট	প্রসিদ্ধ সেন রাজবংশ ও কাশ্যপ গোত্র প্রভব অশ্বগুপ্তবংশ। [আয় ২০,০১ দাম]
সপ্তগ্রাম সাতগাঁ	ধন্বন্তরি গোত্র প্রভব সপ্ত ভ্রাতার বংশ। [আদায় ৩১,২০২ দাম]
ষোলঘর (নেত্রাবতী)	শক্তি গোত্র প্রভব দত্ত পানি সেনের বংশ। [আদায় ৩১২,০৭২ দাম]
করগ্রাম বাঘীরা কায়েথারা মামুদপুর	পরাভব গোত্র কর বংশ। এই বংশে নিদান গ্রন্থ প্রসিদ্ধ মাধবকর জন্মগ্রহণ করেন। [৩,৭৪,৩৯১ দাম]
শিমুলিয়া মানারিয়া	জামদগ্ন্য গোত্র প্রভব ধর বংশ। [৫,২১,০৫৯ দাম]

মধ্যপাড়া
মালপদীয়া | আত্রেয় গোত্রপ্রভব দেববংশ ধন্বন্তরী গোত্র প্রভব বুয়ি সেন বংশ। [৯২৭৯৫ দাম]

পোড়াগাছা | কাশ্যপ গোত্র প্রভব গুপ্ত বংশ। শক্তি গোত্র প্রভব কালীসেনের বংশ। শক্তি গোত্র প্রভব শিয়াল সেনের বংশ। [৩২,১০৯ দাম]

সোনার দেউল
কোঁয়রপুর | মৌদগল্য গোত্র প্রভব পাহিদাস বংশ। [১২,৭,২১০ দাম]

বৌলাসার
তাজপুর
ভাটিঝিঁরা | শাণ্ডিল্যগোত্র প্রভব দত্ত বংশ। বিখ্যাত শ্রীপতি দত্ত এই বংশ সম্ভূত [১২০৭৯৬ দাম]

বেলতলী— মৌদগল্য গোত্র প্রভব সেন বংশ। [১৩,১০০৭ দাম]

মুকুটপুর— শক্তি গোত্র প্রভব স্বর্ণপীঠ আখ্যাধারী সেন বংশ। [৪৯,৯৫৭ দাম]

বালীগ্রাম বা
বালীগাঁ
গোবরদি | কাশ্যপ গোত্র প্রভব দত্ত বংশ ও পরাশর গোত্রজ কর বংশ। [আদায় ১,১০,৫০০ দাম]

শিয়ালদী— কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র প্রভব দত্ত বংশ।

ফেগুনাসার— আত্রেয় গোত্র প্রভব দেব বংশ। [আয় ৩,২০,৪০২ দাম]

নুরপুর— ধন্বন্তরি গোত্র প্রভব সেন বংশ। [আদায় ২,২০,৫৬৯ দাম]

এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত গ্রামসমূহে ন'পাড়া চৌধুরীগণের রাজত্বকালে বৈদ্যোপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

১. দ্বিপাড়া	২. সানিহাটি	৩. বাহেরকুচি	৪. কুর্মিরা	৫. সুচন্দল
৬. মজিলগ্রাম (মাইজগাঁ)	৭. নোয়াপাড়া	৮. হোসেনখানি	৯. কাচাদিয়া	১০. হাসারা
	১১. টংগিবাড়ি	১২. ন'পাড়া	১৩. চুড়াইন	১৪. বিলাসপুর
১৫. আভিয়া	১৬. কোটাপাড়া	১৭. বানুকা	১৮. ভাটিমভোগ	১৯. ভবানীপুর
২০. জৈনসার	২১. আপরকাঠি	২২. দোসরপাড়া	২৩. শকুনগাঁ	২৪. ফুরসাইল
২৫. কমরপুর	২৬. গুণগ্রাম	২৭. মূলচর	২৮. মাইনগাছা	২৯. আটিগাঁ
৩০. বেহেরগাঁ	৩১. ধানকুনিয়া	৩২. নয়না	৩৩. মরহাটি	৩৪. নগর
৩৫. কার্তিকপুর	৩৬. পণ্ডিতসার	৩৭. রামভদ্রপুর	৩৮. ধামারণ	৩৯. চারুনিয়া
৪০. ইছাপাশা	৪১. রূপঠা	৪২. আকিয়াধল	৪৩. বেরপাড়া	৪৪. চাচরতলা
৪৫. মেদিনীমণ্ডল	৪৬. ধোপরাপাশা	৪৭. বোকাইনগর		

এই গ্রামগুলি প্রায়ই কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে। ন'পাড়ার চৌধুরীগণ স্বজাতিবৎসল ছিলেন।

সম্প্রতি কীর্তিনাশা বিলুপ্ত প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রামের সম্ভ্রান্ত বৈদ্যগণ উত্তর বিক্রমপুর, ভরাকৈর, বালীগাঁ, সাওগাঁ, তেলিরবাগ, গাউপাড়া, গারুড়গা, কলমা, বাশীনা, নয়না, স্বর্ণগ্রাম, বরহাইল, বানারী এবং দক্ষিণ বিক্রমপুরে পালং, কুরাশী, কোঁয়রপুর, ভোমসার, কোটাপাড়া, নগর, মসুরাদেওভোগ, কার্তিকপুর প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন।

ন'পাড়ার চৌধুরীগমের রাজত্বকালে বিক্রমপুরের রাজস্ব আদায় ৮৩,৩৭৬ টাকা ছিল এবং

কার্তিকপুরের রাজস্ব আদায় ৮০,০০০ দাম বা ২,০০০ টাকা ছিল। স্বর্গীয় রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় বলেন, "১৬০৫ কিংবা ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে মোঘল শাসন সময়ে বিক্রমপুর ন'পাড়ার ভরদ্বাজ বংশীয় বৈদ্য চৌধুরীদিগের হস্তে চাঁদ কেদারের সমস্ত সম্পত্তি আসে। সুচতুনর মানসিংহ রঘুনন্দন দাশ চৌধুরীকে অত্যন্ত সুকৌশলী ও বুদ্ধিমান বিবেচনায় তাহার হস্তে বিক্রমপুরের জমিদারি অর্পণ করিয়া তৎপর দিল্লি অভিমুখে গমন করেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যপক গুপ্ত মহাশয় রঘুনন্দন দাশচৌধুরীকে অত্যন্ত গুণবান, সচ্চরিত্র বিনয়ী বলিয়া লিখিয়াছেন, সত্য, কিন্তু তিনি যে একজন সুচতুর ব্যক্তি ছিলেন সেই বিষয়েও সন্দেহ নাই। তৎপর তাহার বংশধরগণ অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হইয়া বহু নফর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ ঘোষ মহাশয় তদীয় বিক্রমপুরের ইতিহাসে ইহা বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সময়ে দক্ষিণ-বিক্রমপুর নড়িয়ার ব্রাহ্মণ-রায় ঘটক চৌধুরীগণ এবং উত্তর বিক্রমপুরে মালখাঁনগর নিবাসী দেবীদাস বসু সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন— তাহাদের অনুগ্রহে ও চেষ্টায় সেই সময়ে দেশে ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণত্ব বজায় রহিয়াছিল।

বিক্রমপুর নড়িয়ার রায়চৌধুরী ঘটকদিগের বিক্রম ও গৌরব রাশি মধ্যাহ্ন ভাস্করের প্রভায় বিক্রমপুরবাসীর স্মৃতিপটে চিরদিন জাগরুক থাকিবে। মালখাঁনগরের বসু ঠাকুরগণ ও মাতৃভূমির গৌরব রক্ষায় কার্পণ্য করে নাই।

ন'পাড়া চৌধুরীদিগের রাজত্বকালে বিক্রমপুরে হিন্দুদের মধ্যে নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয়। [১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে][২]

১. ব্রাহ্মণ রাঢ়ী, বারেন্দ্র বৈদিক ২.ক্ষত্রিয় ৩. বৈদ্য ৪. কায়স্থ ৫. ছত্রী ৬. কামার ৭. কুমার ৮. আগরওয়ালা ৯. আগুরি ১০. সুবর্ণবণিক ১১. গোপ বা গয়লা ১২. মোদক ১৩. গাররী ১৪. কৈবর্ত ১৫. বারই (বারুজীবী) ১৬. বৈষ্ণব ১৭. নাপিত ১৮. শাঁখারি ১৯. কাঁশারি ২০. মালি ২১. তিলি ২২. কুরমি ২৩. শূদ্র ২৪. সদগোপ ২৫. আম্বলি ২৬. গন্ধবণিক ২৭. কাচুরি ২৮. ধোপা ২৯. চাষা ৩০. কোয়রি ৩১. পাটনি ৩২. বাগদি ৩৩. ধানুক ৩৪. বেহারা ৩৫. পইয়তি ৩৬. পুবর ৩৭. তিয়র ৩৮. পোদ ৩৯. মাঝি ৪০. মাল ৪১. কারলি ৪২. কাড়াল ৪৩. পাইটাল ৪৪. সেকরা ৪৫. সূত্রধর ৪৬. সাহা ৪৭.পাইটবটি ৪৮. নরবানট্ট ৪৯. জেলে ৫০. কলু ৫১. তাঁতি ৫২. যুগি ৫৩. চুনারি ৫৪. বুনা ৫৫. মিয়াটার ৫৬. ভুঁইমালি ৫৭. কাওলি ৫৮. হাড়ি ৫৯. মালো ৬০. মাল ৬১. রাজবংশী ৬২. কারাঙ্গী ৬৩. দোসাদ ৬৪. ডোম ৬৫. চেল ৬৬. বিন্দ ৬৭. পালি ৬৮. মুচি ৬৯. কাহার ৭০. বাউতি ৭১. কাপালি ৭২. নমঃশূদ্র।

---

১. মুসলমান শাসনকালে "পাঠানবংশ" দেশের রাজা, তাহারা পূর্ববঙ্গের রাজধানী বিক্রমপুর হইতে সোনারগাঁয়ে স্থানান্তরিত করেন।

২. Raj Mohan Chatterjee's "Note" Shahabajnagar

চতুর্থ অধ্যায়



নড়িয়ার রায় ঘটক চৌধুরী বংশ পরিচয় ঃ

আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণ ও বঙ্গের প্রাচীনতর ব্রাহ্মণগণের বংশ বর্ধিত হইয়া বর্তমান বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের একটি প্রধান অংশ গঠিত হইয়াছে। আদিশূরের পরবর্তী কালে বল্লাল সেন কৃত কৌলিন্য প্রথা সংস্থাপনের ফলে কুলীন গোত্রিয় ও বংশ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য কায়স্থাদি উচ্চ জাতীয়গণের বংশ পত্রিকা অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। তাহা, দেশ প্রচলিত পুরাতন আখ্যায়িকা, ও বংশ পরম্পরাগত কুল কাহিনীর সাহায্যে অনেক পুরাবৃত্তের উদ্ধার সাধিত হইতে পারে। প্রাচীন কুলগ্রন্থ, কাহিনী ও আখ্যায়িকার সাহায্যে এই বংশের যতদূর তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই এস্থলে বিবৃতি করিলাম। বৈষয়িক ও পারিবারিক সম্বন্ধে সম্পর্কান্বিত কোনও বংশের ইতিহাসে বা পৌরাণিক কাহিনীতে ইহাদের পুনরাবৃত্ত প্রাপ্ত হইলে তাহা অতিশয় আদরে গৃহীত হইবে। সেই সকল বংশের সহিত ইহাদের কিছু না কিছু সম্বন্ধের উল্লেখ দেখা যায়, তাহার কয়েকটি নাম মাত্র জানিতে পারিয়াছি, তৎবংশীয়গণ যদি সম্বন্ধের কারণ ও ইতিবৃত্ত জ্ঞাপন করিতে পারেন তাহা হইলে অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব।

১। চাঁদসীর কুশারী গোত্রিয় স্বর্গীয় নীলকণ্ঠ মজুমদার—ইনি মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের কার্য করিতেন। কি কার্য করিতেন জানিতে পারি নাই।

২। রামভদ্রপুরের গোঁসাই ভট্টাচার্য, চাঁদরায় ও কেদাররায়ের গুরু বংশ। অসম্বন্ধ আখ্যায়িকার সহিত ইহাদের উল্লেখ শুনিয়াছি। কোন ঐতিহাসিক সম্বন্ধ দেখিতে না পাওয়াতে ইহাদিগের নাম সন্নিবেশিত করিতে পারিলাম না।

৩। মূলপাড়ার সরদার বংশেরও উল্লেখ শুনিয়াছি। কিন্তু ঐতিহাসিক সম্বন্ধের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না।

৪। জপসার লালা বংশের সহিত এই বংশের অমরনারায়ণ রায় হইতে গুরুভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে। বিষয় ব্যাপারে ইহারা পরস্পরের সাহায্যকারী ছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসক কোনও ব্যাপারে উল্লেখ শুনি নাই।

মুসলমানাধিকৃত বঙ্গের ইতিহাসের সহিত এই বংশের কিছু সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা বঙ্গের সম্পূর্ণ বা প্রাদেশিক ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত তাহাদিগের কোনও কার্যে আসিতে পারে বলিয়া এবং কৌলিন্যের মেলবন্ধন সময়ের পূর্ব হইতেই এই বংশ এই নড়িয়া গ্রামে অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া ও ঐতিহাসিকের নিকট ইহার বিশেষ মূল্য আছে বিবেচনায় এই বংশ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইলাম।

মিশ্রগ্রন্থে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন সময়াবধি যে ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে বেদগর্ভ বংশোদ্ভব গাঙ্গুলি (গ্রাম নিবাসী বা) গাই সাবর্ণ গোত্রিয় শিশুরাম কুলতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বেদগর্ভের পুত্র বীরবৃত, তৎপুত্র সোভন, তৎপুত্র সৌরী, তৎপুত্র পীতাম্বর, তৎপুত্র জামোদর তৎপুত্র কুলপতি তৎপুত্র শিশু শম্ভু সহাস্য ও প্রভাকর। রাঢ়ী শ্রেণীর সাবর্ণ গোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ সকলেই এই বেদগর্ভের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত।

শিশুর পুত্র গদাধর, তাহার পুত্র হলায়ুধ, হলায়ুধের পুত্র আয়ু ও তাহার পুত্র বিনায়ক। বিনায়কের তিন পুত্র শিব, শূলপাণী ও মাধব। মাধবের সাত পুত্র দামোদর, কামদেব, গোপাল, নারায়ণ, লোহাই, হরিরাম ও শ্রীরঙ্গ। গোপাল গাঙ্গুলির সময় হইতেই তাহার বংশধরগণ নৈরাগ্রামে অবস্থিতি করেন। গোপাল গাঙ্গুলিও গৌড়িনগর হইতে এই দেশে আগমন করেন ও তাহার পূর্ব পুরুষের গোপাল বিগ্রহ লইয়া আসেন। রাজা লক্ষ্মণসেনের নিকট হইতে সেই বিগ্রহের সেবার জন্য কিছু দেবত্র ভূমি লাভ করিয়া বসবাস করিতে থাকেন। গোপাল গাঙ্গুলির স্থাপিত বলিয়া অদ্যাপিও নৈরারা অধিষ্ঠাত্র দেবতা শ্রীগোপাল বিগ্রহ "গোপাল গাঙ্গুলির গোপাল" বলিয়া আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। গোপাল গাঙ্গুলির পুত্র চণ্ডীরায় ও তাহার পুত্র শুভঙ্কর। বহু বয়স পর্যন্ত কোনও সন্তানাদি না হওয়াতে সংসারে বৈরাগ্য নিবন্ধন শুভঙ্কর পৈত্রিক গোপাল বিগ্রহ লইয়া সস্ত্রীক ভাগীরথীকুলে বাস করিবার নিমিত্ত গমন করেন। তথায় কিয়ংকাল অবস্থানের পরে স্বপ্নে গোপাল কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন ও বৃদ্ধবয়সে বহু পুত্র লাভ করেন। তাহাদিগের নাম যথাক্রমে গঙ্গাধর, গঙ্গাবর, গঙ্গাপতি, গঙ্গারাম, গঙ্গাদাস, গঙ্গাহরি, গঙ্গানারায়ণ। এই সময় হইতেই কুলিন ও শ্রোত্রীয়গণের মেলবন্ধন প্রথা প্রচলিত হয়। গঙ্গাধর গাঙ্গুলির নিজ গ্রামের নামে নৈরা বা নড়িয়া নামে মেলবন্ধন হইল।

"গঙ্গে গঙ্গাধরে মেলো নড়িয়া নাম বিশ্রুত" (কারিকা)। গোপাল গাঙ্গুলির বংশ ও তাহার দেবত্র সম্পত্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা আলোচনা এস্থলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। গোপালের দেবত্র সম্পত্তির আয়তন কত বড় ছিল তাহা এখন নির্ধারণ করা কঠিন। কারণ প্রথমত তৎকালে প্রচলিত তাম্র-শাসনাদি যাহা ছিল বলিয়া শুনা যায় আধুনিক গৃহবিবাদে ও গৃহদাহাদিতে তাহা অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত মুসলমান অধিকারের পরে ঐ সকল তাম্র-শাসনের ধাতু-মূল্যের অতিরিক্ত অপর মূল্য নাই বিবেচনায় কেবল ধাতু-মূল্যেই দ্রব্যাদির সহিত পরিবর্তিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চিত্তহরণ রায় ঘটক চৌধুরী মহাশয়ের পিতামহের পিতামহী যে নিতান্ত অভাব সময়ে ৪/৫ খানা তাম্র-ফলকের বিনিময়ে তৈল লবণাদি ক্রয় করিয়াছিলেন স্বর্গীয় শিবচন্দ্র রায় ঘটক চৌধুরী মহাশয়ের নিকট তাহা শ্রবণ করিয়াছি। তবে বর্তমান তালুক ও হাওলাদির সংজ্ঞার সহিত এই বংশের পূর্বতন পুরুষদিগের ও তাহাদিগের কুটুম্বগণের নামের উল্লেখ দৃষ্টে বুঝা যায় যে পোড়াগাছা, শিলঙ্গড় (সেলিমগড়), বক্‌সি বাজার, কানারগাঁও, মূলনাও, মূলপাড়া, লোনসিংহ, যোগপাট্টা (যোগীপট্ট) চাকদহ, কুলকাটি ইত্যাদি গ্রামে ইহাদের দেবত্র বিস্তারিত ছিল। বর্তমান নড়িয়া, নড়িয়া বা নৈড়া নাম এবং এই গ্রামের পারিপার্শ্বিক গ্রাম সমূহেরও অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থার বিষয় আলোচনা করিলে দুই তিন শত বৎসর পূর্বে এই সকলই নৈরা বা জলাভূমি ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। তদ্দৃষ্টে দেখা যাইবে যে নৈরার দক্ষিণ দিকে ও পশ্চিম দিকে সংলগ্ন যে সকল গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায় তৎ সমুদয়ই জলাভূমিতে স্থাপিত গ্রাম ও তাহাদের নামও সেই সকল স্থানের জলাকীর্ণতা-বাচক। যথা—

মূলপাড়া—বর্তমান সময়ে চড়াভূমিতে যেমন নূতন বসতি পাড়া বা কান্দি ইত্যাদি নাম পাওয়া যায় সেই প্রকার।

মূলনাও—নাও অর্থাৎ নৌকা বা জলাভূমি সংক্রান্ত নাম।

নোয়াঙ্গা—নোয়াদহ বা নূতন ডোবা স্থান।

নড়িয়ার দক্ষিণাংশ বরুণপাড়া, লোনসিংহের কিয়দংশ নাদিমসায় লস্করবাড়ি ভাজনপাড়া প্রভৃতি স্থান যে ঘৈয়ার বিলের অন্তর্গত ছিল তাহা প্রায় ১১০ বৎসরের উপরের কথা। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে ঘৈয়ার বিলের স্থানে স্থানে পৌষ মাস পর্যন্ত জল থাকিতে দেখা গিয়াছে। নবীপুর, মূলফতগঞ্জ ও কেদারপুর অপেক্ষাকৃত প্রাচীন স্থান বলিয়া কথিত হয়। লোনসিংহের প্রাচীন নাম 'লোঙ্গসি'। 'লোঙ্গা' কর্দম, কি গ্রাম হইতে লোনসিং হইতে কয়েকদিন পূর্বে লুনসিং ও ইদানিং

ইংরাজিতে লোনসিং ও বাংলাক্ষরে লোনসিং হইয়াছে। ফলতঃ আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তাহার অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত রাজবল্লভের রাজনগরের প্রাচীন নাম বিলদাউনিয়া ও শ্রীপুর (কেদাররায়ের রাজধানী) বিল বলিয়া কথিত হইত। অপিচ মুসলমান ভুঁইয়াদের দলিল ইত্যাদিতে ও এই সকল অঞ্চলে অনেক নাওরা মহালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ চারিশত বৎসর পূর্বে যে এক সকল অঞ্চলে প্রকাণ্ড বিল বা জলাভূমি ছিল তাহার আর একটি কারণ এই দেখা যায় যে বর্তমানে দক্ষিণপারে বিক্রমপুরের যে অংশ পতিত হইয়াছে, তাহার ইদিলপুর ও কার্তিকপুর পরগণা সম্বলিত কুড়ি কি ত্রিশ মাইল আন্দাজ ভূমিভাগ উত্তরে ও পূর্বে পদ্মা ও মেঘনা এবং দক্ষিণে আইরল্ খাঁ নামক পদ্মার শাখা দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া যে একটি দ্বীপের সৃজন করিয়াছে এই স্থানটুকু এই প্রবাহিণী ত্রয়ের স্রোতে ভাঙিয়া গড়িয়া বিক্রমপুরের উত্তরাঙ্গ ও ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত চাঁদপুর প্রভৃতি স্থান হইতে স্বাভাবিক অবস্থার অনেক তারতম্য লাভ করিয়াছে। এখানে পূর্বপার বা চাঁদপুরের ন্যায় সুপারি জন্মে। বরিশাল জিলার ন্যায় নারিকেল ও ফরিদপুরের ন্যায় খেঁজুর গাছ উৎপন্ন বর্ধিত ও সুফলদায়ক হয়। কিন্তু উত্তর বিক্রমপুরে ঈদৃশ নারিকেল, খেঁজুর ও সুপারি গাছ জন্মে না। চাঁদপুরেও নারিকেল ও খেঁজুর গাছ এরূপ হয় না। এতদ্ভিন্ন নানাপ্রকার কৃষিজাত শস্যের এবং আরণ্য প্রাণীর ও বেশ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এখনকার যাহা কিছু দেখিয়া অন্যূন ৩/৪ শত বৎসরের পূর্বের কোনও বিষয়েরই কিছু স্থির ধারণা করা যাইতে পারে না, যাহা হয় তাহা অনুমান মাত্র।

আর একটি কথা এই যে গোপাল গাঙ্গুলির ভ্রাতা বা অন্যান্য সন্তানগণের এখানকার পূর্বাবাসের কোনও প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। গঙ্গাধর গাঙ্গুলির ন্যায় তাহার অপর ভ্রাতাগণও অবশ্য কোনও না কোনও মেলে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন নিদর্শন এই গ্রামে বা কোনও নিকটবর্তী স্থানে দেখা যায় না। লোনসিংহের গাঙ্গুলি বংশীয়েরা অনেকেই খড়দহ মেলের পরবর্তীকালে এখানে আনীত হইয়াছেন। ইহা হইতে গোপাল গাঙ্গুলি এবং তাহার সন্ততীগণের বহু পত্নিত্বের একটি আভাস পাওয়া যায় ও ইহা অনুমান করা যায় যে বিভিন্ন পত্নীর গর্ভজাত সন্ততীগণ তাহাদের মাতুল ভবনে প্রতিপালিত হইতেন ও যাহারা পিতৃভবনে বাস করিতেন তাহারাও বিভিন্ন স্থানে অর্থাৎ তাহাদিগের শ্বশুরাশ্রয়ে স্বীয় বংশ বর্ধনের জন্য সচেষ্ট থাকিতেন। এই বিষয়ে কারিকা ইত্যাদি মিশ্রশাস্ত্রে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে কিছু সুফল পাইবার আশা করা যাইতে পারে। বর্তমান সময়ে তাদৃশ কুলাচার্যগণের অভাব বশত ইহাও সুদূর পরাহত। বর্তমান শিক্ষা ও সমাজ পদ্ধতির অনসরণ ক্রমে আমরা বঙ্গের ইতিহাস রক্ষকদিগকে নির্মূল করিয়াছি।

কারিকাতে উল্লিখিত আছে "গঙ্গাধর গাঙ্গুলি নড়িয়া গ্রামে বাস করিতেন। তাহার প্রপিতামহ গোপাল সুরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কুলে রণ্ডদোষ প্রাপ্ত হয়। গঙ্গাধরের পিতা শুভঙ্কর কুলক রায় বলাৎকার-দোষ প্রাপ্ত হয়। বাবলার জ্ঞান বন্দ্যো রণ্ডদোষ প্রাপ্ত ছিলেন, সেইজন্য গঙ্গাধর জ্ঞান বন্দ্যোর সহিত কুল করিয়া ঐ রণ্ডদোষ প্রাপ্ত হয়েন। এই সকল কারণে গঙ্গাধরের গ্রামের নামে নরিয়া নামে মেল হইল।" [১] মিশ্র শাস্ত্রান্তর্গত কুলরমা গ্রন্থ (রঘুনাথ বাচস্পতি কৃত) হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল। আজকাল কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার সময় নির্ধারণ লইয়া এক একটা বড় পত্রিকায় সমালোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সমালোচনার ভারটা লেখক ঐতিহাসিকগণের হাতে সমর্পণ করিয়া এক্ষেত্রে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মেল বন্ধন কর্তা দেবীবরের সময় নির্ধারিত হইলেই ইহারও সময় ঠিক হইল।

গঙ্গাধরের পুত্র রঘুনাথ বাচস্পতি, যদুনাথ পণ্ডিত ও বাণীনাথ। নড়িয়া মেলের নড়িয়ার সাবর্ণ ঘটকগণ রঘুনাথ বাচস্পতি মিশ্রের সন্তান। রঘুনাথ বাচস্পতির পূর্ববর্তিগণ ঘটকতা ব্যবসায় করেন নাই। তিনিই প্রথম কুলশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন এবং কুলশাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

তাহার প্রণীত কুলগ্রন্থ মধ্যে সর্বপ্রধান গ্রন্থ কুলরমা বা কুলরাম। রঘুনাথ বাচস্পতি ও ধ্রুবানন্দ মিশ্র সমসাময়িক লোক হইলেও ধ্রুবানন্দ মিশ্র যখন বৃদ্ধ রঘুনাথ তখন যুবা। কথিত আছে ধ্রুবানন্দের নিকট রঘুনাথ কুলশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রঘুনাথ ও দেবীবর সমসাময়িক লোক।

রঘুনাথ বাচস্পতির সন্তানগণ অনেকেই ঘটক উপাধি দ্বারা পরিচিত সুতরাং তাহাদের নাম পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায় তাহা শ্রীরাম ঘটক সার্বভৌম, ঘটক শিরোমণি, ঘটক চক্রবর্তী। রঘুনাথ বাচস্পতির কন্যা রাঢ়দেশ হইতে মাধ্যই মেলের লোকনাথ মুখোপাধ্যায়ে পর্যায় প্রাপ্ত হয়েন। তাহার সন্তানগণ নৈরালমেল প্রাপ্ত হইল কিন্তু এদিকে নৈরালমেল পালটি হীন প্রকৃতিই রহিয়া গেল। সুতরাং তদবধি নড়িয়ার গাঙ্গুলিগণ অপর সকল মেলে কন্যাদান ও নিজেরা শ্রোত্রিয় কন্যার পাণিগ্রহণ দ্বারা স্বীয় কৌলিন্য রক্ষা করিয়া আসিতে লাগিলেন। লোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের বংশধরগণ কালে ঘটক ভট্টাচার্য উপাধিভূষিত ভরদ্বাজ ঘটক বলিয়া প্রথিত হইয়া আসিতেছেন। ঘটক ভট্টাচার্যের সন্ততিগণ অনেকেই দীর্ঘকাল যাবৎ এই গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছিলেন। অধুনা কীর্তিনাশার কোপে স্থান ভ্রষ্ট হওয়ায় নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

রঘুনাথ বাচস্পতির দ্বিতীয় ভ্রাতা যদুনাথ পণ্ডিত যশোহর জিলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত ব্রাহ্মণডাঙা গ্রামে যাইয়া বাস করেন। অদ্যাপি সেখানে তাহার বংশধরগণ বর্তমান রহিয়াছেন।

শ্রীরাম ঘটক সার্বভৌমের পুত্র গোবিন্দ ঘটক রায়। তাহার পুত্র কৃষ্ণজীবন ঘটক বিশারদ। গোবিন্দ ঘটক রায় ও কৃষ্ণজীবন বিশারদের সময়ে গোপালের দেবত্র সম্পত্তির বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে এই সময়ে মোঘল বাদশাহের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ, কেদার রায় ও চাঁদ রায়ের উচ্ছেদ সাধন করিতে এই অঞ্চলে আগমন করেন। কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর বা আড়াফুল বাড়িয়া নড়িয়ার উত্তরের গ্রাম। মানসিংহের সৈন্যগণ নড়িয়ার দক্ষিণ দিকে যে স্থানে ছাউনি স্থাপন করে তাহার নাম তাহারাই "সেলিম গড়" রাখেন। বর্তমানে উচ্চারণ বিকৃতি প্রভাবে উহাকে সিলঙ্গড় কেহ কেহ বা বর্ণ বিপর্যয় করিয়া শিড়ঙ্গল কহিতেও ত্রুটি করে না। সেলিমগড়ের পূর্ববর্তী গ্রাম ফতেজঙপুরও মানসিংহের জয়ের ধ্বজা নিজ নামের সহিত জড়াইয়া অদ্যাপি বহন করিয়া আসিতেছে। সেলিমগড় কি ফতেজঙপুর হইতে উত্তরাভিমুখে অভিযান করিতে হইলে নড়িয়ার পথের মুখেই পতিত হয়; কাজেই নড়িয়ার ঘটকব্রাহ্মণগণ তখন পৈতৃক বিগ্রহ ও প্রাণ লইয়া হয়ত কোনও স্থানে পালাইয়া জীবন রক্ষা করাই যথেষ্ট মনে করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহারা পলায়ন না করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত মানসিংহের সৈন্যবাহিনীগণের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান করেন এবং যদিচ অবশ্যের পরাস্ত হইয়াছিলেন... তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরে বলিতেছি। তবে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের গল্পের সঙ্গে অমিতবলশালী ও ভোজনরসিক এক গৌরী ঘটকের নাম শুনা যায়। সেই গৌরী ঘটক, কৃষ্ণজীবন বিশারদের কনিষ্ঠ, গৌরী কিনা বলা যায় ন। গৌরী ঘটকের বলশালীত্বের ইতিহাসে শুনা যায় তিনি নাকি কোথায় যাইবার সময় বৃষ্টিতে আক্রান্ত হইলে একখানা ভাসমান ডিঙি নৌকা (৯ হাত দীর্ঘ) টোকার মত মাথায় দিয়া গিয়াছিলেন। ইদিলপুরের কায়স্থ জমিদার বাড়িতে অতিথি হইয়া তাহাকে আহার্য পাকের জন্য যে সের দেড়েক চাউল দেওয়া হইয়াছিল তাহা দ্বারা তিনি জলযোগ করিয়াছিলেন। এই প্রকার আরো অনেক ঘটনা গৌরী নামে জড়িত আছে। ইদিলপুরের বাড়িতে আহারের ঘটনাটি গৌরী নামে যোজিত থাকিলেও (যেহেতু....., তাৎকালিক ঘটকগণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের কিছু প্রতিগ্রহ করিতেন না) তিনি যে ইদিলপুরের রায়দিগের বাড়িতে আহার করিয়াছিলেন ইহা বিশ্বাস হয় না। চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের প্রচলিত কাহিনীতে গৌরী ঘটকের নামের উল্লেখ দেখা যায়। অশীতিপর বৃদ্ধের নিকট হইতে স্বর্গীয় চিন্তাহরণ ঘটক বাচনিকশ্রুত একটি বহুকালের প্রচলিত

পুরাতন গ্রাম্য কবিতার গুটি চরণ স্মরণ আছে তাহাতেও এক গৌরীকিশোর বা গৌরকিশোর রায়ের নামের উল্লেখ দেখা যায় তাহা এই —

* * * *

রাজা (গৌরকিশোর), গৌরিকিশোর রায়।
তুমি রৈলে মাটির তলে কি হবে উপায়। ধ্রু

* * * *

রাজা মানের লস্করে নেয় হাতি দিয়া বেড়ি।
লক্ষ্মীকান্ত ঠাকুর লৈয়া ফিরেন বাড়ি বাড়ি।

মূলকথা কেদার রায় ও চাঁদ রায়ের রাজ্যের সহিত ইহাদের কোন সংস্রব আছে কি না সঠিক জানা যায় না। তবে মানসিংহের সৈন্যাদির পরিচালনে ইহারা অতিশয় হীন অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কৃষ্ণজীবন বিশারদের চারি পুত্র। ১। রাঘবেন্দ্র, ২। যাদবেন্দ্র, ৩। রাজেন্দ্র ও ৪। ইন্দ্রনারায়ণ। রাঘবেন্দ্র ও যাদবেন্দ্র নিঃসন্তান। রাজেন্দ্রের সন্তানগণ লোনসিংহ, পুরাপাড়, সেলিমগড় প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

ইন্দ্রনারায়ণের সময় হইতেই নড়িয়ার ঘটকগণ রায়[২] চৌধুরী উপাধি ও গুণানন্দি পরগণার জমিদারি ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে লাভ করেন। কথিত আছে ইন্দ্রনারায়ণ বাল্যকালে অতিশয় রূপবান ও ক্রীড়া পরায়ণ ছিলেন। গ্রামের পূর্বদক্ষিণ প্রান্তে দোস্ত[৩] ঐ স্থানটি এখনও দোস্তার পাড় পদ্মার বাড়ি বলিয়া কথিত হয়। ফিরিঙ্গি 'De'coster' নামে একজন পর্তুগীজ বণিক পদ্মানাম্নী জনৈকা নীচকুলোদ্ভবা সুন্দরীর প্রেমে জড়িত হইয়া এস্থানে বাস করিতেন। তাহার প্রভূত ধন সম্পত্তি ছিল কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারী কেহই ছিল না। ইন্দ্রনারায়ণ ক্রীড়া ব্যপদেশে প্রায়ই মাসে মাসে যাইয়া দোস্ত সাহেবের সহিত দোস্তালি করিতেন। দোস্ত সাহেবও নাকি ইন্দ্রনারায়ণকে তাহার উদ্যান প্রসূত নানাবিধ সাময়িক ফল মূলাদি দ্বারা তুষ্ট করিতেন। ফলে সেই বৃদ্ধ ও কিশোরের মধ্যে একটি মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া যায়। দোস্ত ফিরিঙ্গি ও তাহার রমণী পরিশেষে অন্তত সপ্তাহে একবার ইন্দ্রনারায়ণকে (তাহাদের আদরের নাম ইন্দুরিয়াকে) না দেখিতে পাইলে বাড়ি পর্যন্ত আসিয়া তালাস করিয়া যাইত। ক্রমে দোস্ত সাহেবের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিল। রোগশয্যায় পতিত হইয়া দোস্ত সাহেব ইন্দ্রনারায়ণকে ৭ মটকি রৌপ্যমুদ্রা (গোট টাকা) দান করিলেন ও যাবৎকাল তাহার প্রণয়িনীর তত্ত্বাবধান করিতে কহিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ তাহার বাক্য যথা শক্তি পালন করিয়াছিলেন। দোস্ত সাহেবের মৃত্যুর পর প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইয়া ইন্দ্রনারায়ণের অবস্থা বিশেষ পরিবর্তিত হইয়া উঠিল। সাহেবের মৃত্যুর ছয় মাস অতীত না হইতে হইতেই তাহার প্রণয়িনী পরপারের পথে তাহার অনুসরণ করিলেন সুতরাং তাহার অংশের অপর ৫ মটকি ধনও ইন্দ্রনারায়ণের হস্তগত হইল। বহুতর ধনের অধীশ্বর হইয়া ইন্দ্রনারায়ণ ধন দ্বারা নবাবকে তুষ্ট করিয়া রায় চৌধুরী উপাধির সহিত গুণানন্দী পরগণার জমিদারি লাভ করেন ও পরগণা গ্রদবন্দর ও বিক্রমপুরের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামিলাত তালুক সমূহের পুনরুদ্ধার করেন। নিজ জমিদারি[৫] গুণানন্দী পরগণার অন্তর্গত নিজ গ্রামের কিয়দংশ ভূমি ও বিক্রমপুর পরগণার অধীন কিয়দংশ ভূমি তালুক ঘটক ভট্টাচার্য নামে আখ্যাত।

রঘনাথ বাচস্পতি তদীয় দৌহিত্র রামচরণ ঘটকরত্ন ঘটক ভট্টাচার্যকে যে ভূমিদান করেন পরবর্তীকালে তাহাই তালুক ঘটক ভট্টাচার্য নামে অভিহিত হয়। ইন্দ্রনারায়ণ রায় ঘটক চৌধুরী গুণানন্দীর জমিদারি লাভ করিয়া যে গড় বেষ্টিত বসত বাটি নির্মাণ করেন সেই গড়ের মধ্যে ঘটক ভট্টাচার্যের বাড়ি ও বাজার সন্নিবিষ্ট ছিল, তাহাতে ইহাই অনুমান হয় যে বহুকাল পর্যন্ত ঘটক ভট্টাচার্য ও ঘটক চৌধুরীগণ এক পরিবারের ন্যায় এক বাড়িতেই বাস করিতেন।

এই গড় পরিখার অভ্যন্তরে ইন্দ্রনারায়ণের নিজ বসত বাটি, ঘটক ভট্টাচার্যের বাড়ি, বাজার,

পুরোহিত, শিকদার, ধোপা, নাপিত, ভূঁইমালি প্রভৃতি ও অপরাপর নিয়ত কর্মচারিগণের বাসস্থান ছিল। এতদতিরিক্ত আরও দুইটি বাহির গড়ের কথা শুনা যায় কিন্তু উহার স্থান নির্দেশ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কারণ পদ্মার ভাঙনে উহার উত্তর ও পশ্চিমদিকের অংশ ভাঙিয়া গিয়াছে এবং পূর্ব ও দক্ষিণদিকের অংশ হয়ত সরমাটিতে ভরিয়া যাইয়া তদুপরি লোকালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। গত ১৫০ একশত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে নড়িয়া দুইবার নদী কবলিত হইয়া আয়তনে বহু ক্ষীণ ও পুরাতন চিহ্নবিহীন হইয়াছে। যাক এই প্রথম গড়, পরিখার অন্তর্গত ভূমির পরিমাণ অনুমান চারি পাঁচ দ্রোণ[৬] ছিল।

প্রাচীন অশ্বত্থ—গড়াভ্যন্তরস্থ বাজারের প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষটি এখনও বর্তমান আছে। সেই বৃক্ষের নিকটে স্বর্গীয় অকুলহরণ রায় ঘটক চৌধুরী, অধুনা একটি যুগল বট অশ্বত্থ রোপন করিয়াছেন ও তৎসলগ্ন দেবমন্দির স্থাপনের চেষ্টায় আছেন।

পুরোহিত—পুরোহিতগণ দেহাটিমেলের কাশ্যপ গোত্রীয় চট্টোপাধ্যায় উপাধিধারী কুলীন সন্তান। তাহারা কখন কি প্রকারে এই গ্রামে আনীত ও স্থাপিত হইয়াছিলেন তাহার কোনও আখ্যায়িকা অবগত নহি। তাহাদের বংশধরগণ বর্তমান সময়ে কেহই এই গ্রামে নাই ; পদ্মার ভাঙনে তাহারা অনেকেই নিজ নিজ বিষয় স্থলে বাড়ি করিয়াছেন ও নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছেন।

প্রাচীন অশ্বত্থ * * * * মন্দির স্থাপনের চেষ্টায় থাকিয়া পরলোক গমন করেন। তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ রায় ঘটক চৌধুরী—ইনি কিছুকাল পরে আই. জি. আর. এস. এন কোম্পানির স্টিমার সার্ভিসে কার্য করিয়া অডিট ইনস্পেক্টর পদে উন্নীত হন ও পরে ১৯২১ সনে চাকরি ছাড়িয়া দেন। ইনি নড়িয়াতে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন হওয়ার প্রাকালে প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং উক্ত অশ্বত্থ বৃক্ষ সম্বন্ধে একটি আভাস পাইয়া উক্ত কার্যও ছাড়িয়া দেন। তাহার আভাস এইরূপ—

এই স্থান একটি পীঠস্থান। নারায়ণ মহাদেবের স্কন্ধস্থিত মৃত সতীদেহ ৫১ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিবার সময় 'চিবুক' এই স্থানে পতিত হয়। যদিচ পীঠ মাহাত্ম্যে দেবী 'ভ্রামরী' ও ভৈরব 'বিকৃতাক্ষ' বলিয়া উল্লেখ আছে কিন্তু ইহার আভাস দেবী 'চতুর্ভুজা বগলারূপে সিদ্ধেশ্বরী' এবং ভৈরব 'বিকটাক্ষ'। এই স্থানটি প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বেও জল ও স্থলের সংযোগ স্থল ছিল। ইহার উত্তরে স্থলভাগ এবং দক্ষিণে খৈয়ার বিল নামক জলভাগ ছিল।

এই অশ্বত্থ বৃক্ষটি কত কালের তাহা অতি প্রাচীন ব্যক্তিরাও বলিতে পারেন না। এই মাত্র জানা যায় ঘটক চৌধুরীগণের পূর্ববর্তী ইন্দ্রনারায়ণের সময় তাহার গড়ের মধ্যে এই স্থানে একটি বাজার ছিল। এই স্থানে এখনও প্রতি বৎসর ৩ বৈশাখ তারিখে একটি মেলা মিলে। সাধারণ লোকে এই স্থানটিকে সিদ্ধেশ্বরীতলা ও প্রেমতলা নামে অভিহিত করে, কারণ এই বৃক্ষ মধ্যে কেহ কাহারও অনিষ্ট না করিয়া পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্মাবলম্বী প্রাণী বাস করে ; যেমন বিষধর সর্পও বাস করে এবং সর্প ভক্ষণকারী গোসাপও বাস করে, নকুলও বাস করে, শিয়াল সজারু প্রভৃতিও বৃক্ষতলস্থ মৃত্তিকা গহ্বরে বাস করে।

স্থানটি অতি মনোরম। এই স্থানে উপস্থিত হইলেই চিত্তে একটি অনির্বচনীয় প্রশান্ত ভাবের উদয় হয়। এই বৃক্ষমূলে বহুকালাবধি গ্রামস্থ এবং পার্শ্ববর্তী ও বহুদূরস্থ লোক পূজা প্রদান করে।

এই বৃক্ষকাণ্ডে কতকগুলি প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্তমান। বৃক্ষটির দক্ষিণ ভাগে বৃক্ষ হইতে বহির্গত কতকগুলি শিকড় বাহির হইয়া বৃক্ষগাত্রে এমন ভাবে সংলগ্ন আছে যে দেখিলেই একটি দেহকাণ্ড বলিয়া মনে হয় ; বৃক্ষের পশ্চিম দিকেও ঠিক এইরূপই।

গোপাল পূজা—ইন্দ্রনারায়ণের সমসাময়িক বা তৎপূর্ববর্তী গোপাল পূজকের বংশের কোনও নিদর্শন নাই। এখন যাহারা গোপাল বিগ্রহের অর্চনা করিয়া থাকেন তাহারাই শ্রীবিগ্রহ

সেবায় নির্ধারিত বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। গোপালের বৃত্তি যথা, বিবাহাদি ব্যাপারে প্রণামি, শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে যজ্ঞেশ্বর ভাগ, দানে শয্যা, বরণে স্বস্তিক। রায় ঘটক চৌধুরী বংশের হস্ত হইতে নড়িয়ার জমিদারি চলিয়া যাওয়ার পরেও গ্রামবাসী জনসাধারণ গোপাল বৃত্তির লোপ করেন নাই।

শিকদার বংশ—শিকদার সাধারণত গড়াভ্যন্তরস্থ যাবতীয় ব্যাপারের সর্বেসর্বা তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। সামাজিক, পারিবারিক, এমন কি ব্যক্তিগত চাল-চলনাদি সর্ব বিষয়েই ইহাদিগের উপদেশ সর্বাগ্রে গৃহীত হইত। পুরীর রক্ষণাবেক্ষণ, আবশ্যক মত বহিঃশত্রু হইতে পুরীরক্ষার নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ, প্রভু ও প্রভু পরিবারবর্গের দেহরক্ষক স্বরূপে তাহাদের অনুগমন, ভোজন সময়ে আহার্য বস্তুর পরীক্ষা, প্রত্যহ রাত্রিকালে শয়ন কক্ষ নির্বাচন, প্রভৃতি কার্যভার ইহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। শিকদারগণের পরিবার পালন ও সর্ববিধ ব্যয়-ভার সরকারি কোষ হইতে বহন করা হইত এবং ইহাদিগের বিশেষ বিশেষ বৃত্তিও নির্ধারিত ছিল। ফলতঃ শিকদারগণ সর্বতোভাবে পরিবারের অঙ্গীভূত ছিল। কালক্রমে শিকদারগণের কুটুম্বগণও অনেকে শিকদার পদবী ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। কারণ তৎকালে এই শিকদার পদবী বিশেষ সম্মানার্হ উচ্চ পদবী বলিয়া পরিগণিত ছিল। অধুনা এই শিকদারদিগের বংশধরগণ শিকদার শব্দের দাসার্থ ব্যবহার দৃষ্টে এই পদবী বর্জনের নিমিত্ত চেষ্টিত আছেন। ইহাদের অধিকাংশই দে, দাস, দত্ত চন্দ প্রভৃতি নানা উপাধি ও নানা গোত্রে বিভক্ত মৌলিক কায়স্থ বলিয়া পরিচিত। বর্তমান সময়েও গ্রামান্তরে গমনকালে প্রাচীন প্রথানুসারে শিকদারদিগের দাসদিগকে তাহাদের সহিত ঘটক চৌধুরী বংশধরগণের অনুগমন করিতে দেখিয়াছি। অধুনা শিকদারদিগের বংশ ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, অনেকে শিকদার পরিচয়-পরাঙ্মুখতা নিবন্ধন গ্রামান্তরে গমন করিয়া হীনতর দাস পরিচয়ের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। নৈড়ার শিকদার কোনও বংশ বিশেষের যে শিকদার নহে ইহাই তাহাদের সামান্য দাসত্বের প্রতিকূলে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ফলতঃ উহারা গড়াভ্যন্তরের সকলেরই শিকদার ছিল।

পাইক ও সর্দার—সাধারণত মুসলমান জাতির বরকন্দাজ বা পাইক ছিল, নমঃশূদ্র জাতির মধ্যেও এই শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যায়। নৌ-বিভাগ বোধ হয় ঝাল (জেলে) দিগের হস্তেই ছিল। এই সকল জাতির মধ্যে মাল, সর্দার, ফৌজদার, ঢালি, হালদার, মাঝি প্রভৃতি পদবীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা প্রাচীন তথ্যের কোনও ইতিহাস অনুসন্ধানের উপায় দেখি না ; কারণ কেহই তিন চারি পুরুষের উপরে বংশ পরিচয় দিতে পারে না। তবে কাহারও কাহারও পুরুষ পরম্পরাগত স্ব স্ব সামাজিক মর্যাদা, বৃত্তি ও উপাধি দ্বারা পূর্ব পুরুষের বিশিষ্টতার একটু আভাস মাত্র পাওয়া যায়।[৭]

গোলাধ্যক্ষ—ইন্দ্রনারায়ণের সময় গোলাধ্যক্ষ কে ছিল তাহার নাম পাওয়া যায় না। নরিয়ার তালুকদার উপাধিধারী সাহা বংশের তালুকাদির পরিচয়ে তাহাদিগের ঊর্ধতন চতুর্থ, পঞ্চম পুরুষের নাম পর্যন্ত পাওয়া যায়। এই তালুকদারগণের পূর্ব পুরুষগণ গোলাধ্যক্ষ ছিলেন।

পোদ্দার—পোদ্দারদিগেরও কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না।

দেওয়ান বাড়ি—প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে পশ্চিম নরিয়া পদ্মার কুক্ষিগত হইবার পূর্বে আমরা দেওয়ান বাড়ি নামে একটি বাটির পরিচয় মাত্র পাইয়াছি, এই বাড়িতে কবে কে কাহার দেওয়ান ছিল তাহার কোনও সংবাদই অবগত নহি।

নৈড়ার দিঘি—নৈরার দিঘি এখন আর দিঘি নাই। দিঘির স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ কতকগুলি ম্যালেরিয়া প্রসূতি ডোবা, স্থানে স্থানে রোপিত ও পতিত বীজোৎপন্ন পলায়িত মন্দার কাননের আবরণান্তরালে সুপারি-বৃক্ষ-পোষিণী উদ্যান-সীমান্তবর্তিনী গড় সমূহ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন অনুসন্ধিৎসু পর্যটকের নিকট দিঘির স্মৃতিমাত্র জাগরিত করিয়া দেয়। এখন এই দিঘির মধ্যে

তালুকদার ও পোদ্দার মহাশয়েরা দুইটি বড় বড় পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে কদলী ও সুপারি বাগান করিয়াছেন, আরও দুই একটি পুষ্করিণী খনিত ও বাগিচা প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা আছে। দেশের বর্তমান জমিদার, কি দেশবাসী বহু কাল যাবৎ কাহারও এই প্রাচীন চিহ্ন রক্ষা করিবার মতি হয় নাই।[৮] ঘটক চৌধুরী বংশধরগণ ত অক্ষমই। ক্ষমতাবান থাকিতেও বোধ হয় তাহাদের দৃষ্টি এই এই দিকে পতিত হয় নাই।

পরগণার সামান্য বিবরণ—মেঘনা নদের পশ্চিম পারে, বর্তমান সময়ে ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশাল জিলার অন্তর্গত যে সকল স্থানে গুনানন্দী পরগণার নাম পাওয়া যায় পূর্বে অর্থাৎ মেঘনা বা পদ্মার শাখা প্রশাখাদি দ্বারা ছিন্ন হইবার পূর্বে—এ সকল একই চাকলার অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন ডিহি স্বরূপ থাকিলেও এক্ষণে এই সমুদয়কে পরগণার ছিট বলিয়াই মনে হয়। এই পরগণার প্রধান চাকলা ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত মেঘনা নদের পূর্ব কূলে অবস্থিত। মেঘনা নদের পশ্চিম কূলে যে অংশ পতিত হইয়াছিল, মোটামুটিভাবে উহার দক্ষিণ সীমানা ফতেজঙপুর, পশ্চিম সীমানা শ্রীপুর সাহাবন্দর বা নরিকুল, উত্তর সীমানা আরা-ফুলবাড়িয়া বা শ্রীপুর (কেদার রায়ের বাসস্থান) ও নবীপুরের পূর্বোত্তরে একটি শাখা বাহির হইয়া উত্তরে ঢাকা জিলার অন্তর্গত চাঠাতিপাড়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। ইহাও অনুমান মাত্র। পক্ষান্তরে মূল পরগণা মেঘনা নদের পূর্বপারে অবস্থিত থাকিলেও ঘটক চৌধুরীদিগের অধিকৃত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভূমিভাগকেও এই পরগণার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচিত করা হইয়া থাকিবে। মেঘনা নদের পূর্বপারে বর্তমান চাঁদপুর ও নরসিংহপুর প্রভৃতি স্থানের দক্ষিণস্থ চরভৈরবীর উত্তর ও সিংহেরগাঁও পরগণার পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তরে ময়নামতি পর্যন্ত এই পরগণা নানা ভাবে আঁকিয়া বাঁকিয়া বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। মূল কথা ইহার নির্দিষ্ট সীমানা আমরা অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। সেটেলমেন্টর জরিপ কার্য শেষ হইয়াছে, ইহার কোনও কিনারা পাওয়ার আশা করা যাইতে পারে। বস্তুত এই সীমানার মধ্যে অনেক অন্য পরগণা ও তালুকের নামোল্লেখ দেখা যায় সুতরাং ইহা দ্বারা এই পরগণার তদানীন্তন আয়তনের আভাস মাত্র দেওয়া হইল। ভৌগোলিক হিসাবে উহার যথার্থ সীমা নির্ণয় হইল না। এস্থানে এই পরগণার সীমান্তবর্তী বা সমীপবর্তী স্থান সমূহের একটু সামান্য পরিচয় দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইল না।

আরা-ফুলবাড়িয়া বা শ্রীপুর—ইতিহাস প্রথিত ভুঁইয়া (ভূম্যধিকারী) চাঁদ রায় ও কেদার রায় নিজ বাসগ্রাম আরা-ফুলবাড়িয়াকে শ্রীপুর নামে অভিহিত করেন। বর্তমান বসাকের চড়ের পূর্ব ভাগে একখণ্ড ভূমি "শ্রীপুরের ট্যাক্" নামে এখনও অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীপুর সাহাবন্দর—ইহার প্রচলিত নাম নদীকূল, পরিকূল, কি লড়িকূল তাহা ঠিক জানি না। এই স্থান এক্ষণে পদ্মার কুক্ষিগত হইয়া নূতন পরস্থ হইয়াছে, পোড়াগাছার দক্ষিণ-পূর্বে এই স্থান অবস্থিত ছিল। এস্থানে সাহা জাতীয় ধনাঢ্য বণিকগণের বাসস্থান ছিল, তজ্জন্যই বোধ হয় তদানীন্তন সাহাগণ ইহাকে "শ্রীপুর সাহাবন্দর" নামে অভিহিত করেন। সাহাবন্দর নাম হইতে ইহার প্রাচীন নাম নদীকূল হইতে লড়িকূল নামে অপভ্রষ্ট হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। ইহার তৎকালীন তৌজিভুক্ত পুরা নাম "সরকার সোনারগাঁও তাঁবে কোরার হাট শ্রীপুর সাহাবন্দর।" এই প্রাচীন সাহা বংশের অনেকেই এক্ষণে পালং-এর নিকটবর্তী লক্ষ্মীগঞ্জ, ধানুকা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। তাহাদের মধ্যে স্বর্গীয় প্যারীমোহন সাহার পুত্র মোহিনীমোহন ও ক্ষেত্রমোহন সাহা এবং কিশোরীমোহন সাহার পুত্রগণ বিশেষ পরিচিত। ইহাদের পাল-এর বাড়িও সম্প্রতি পদ্মার কৃপা দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছে।

প্রাচীন নড়িয়ার সীমা ও পরিধি—প্রাচীন নড়িয়ার সীমা, দৈর্ঘ্যে উত্তরে আরা-ফুলবাড়িয়া হইতে দক্ষিণে খৈরার বিল পর্যন্ত অনুমান ৫/৬ মাইল ও পশ্চিম মূলপাড়া হইতে পূর্বে কেদারপুর ও চণ্ডীপুরের পশ্চিম অর্থাৎ বর্তমান মূলফতগঞ্জের খালের পশ্চিমপার পর্যন্ত

অনুমান ৩ কি ৩।৷০ মাইল। রেনেল সাহেবের ম্যাপের সহিত তুলনা করিয়া এসিস্ট্যান্ট সেটেলমেন্ট অফিসার শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ দাশগুপ্ত মহাশয় বলিয়াছিলেন যে "এক্ষণে প্রাচীন নড়িয়ার আট ভাগের একভাগ মাত্র ভূমি আলসিতে অবশিষ্ট আছে বাকি সকলই পদ্মার চড়ের সামিল।

কেদার বাড়ি—প্রসিদ্ধ (ভূম্যধিকারী) ভুঁইয়া কেদার রায় এই গ্রামে বসত বাটি নির্মাণ করিবার নিমিত্ত গড় খনন করাইয়া ইহাকে কেদারপুর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, তাই এই গ্রামের নাম কেদারপুর ও গড়াভ্যন্তরস্থ স্থান কেদারবাড়ি নামে পরিচিত। ঐতিহাসিকের পক্ষে ইহা একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান। উত্তর বিক্রমপুরের রাজাবাড়ির মঠের ন্যায় দক্ষিণ বিক্রমপুরের কেদার বাড়ির গড় ও বিক্রমপুরের গৌরবময় প্রতিষ্ঠা সমূহের একটি প্রধান অঙ্গ। যে পদ্মা কীর্তিনাশা উপাধি গ্রহণপূর্বক বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে বিক্রমপুরের বহু কীর্তি কলাপের বিলোপ সাধন করিয়াছে, সেই পদ্মার ভাঙন আরম্ভ হইবার অব্যবহিত প্রাক্কালেই কেদার রায় এই বাড়ি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় উহা সুসম্পন্ন হইতে পারে নাই।

পদ্মা, কীর্তিনাশা বা রথখোলার খাল—শুনা যায় কীর্তিনাশা পূর্বে একটি স্বল্প পরিসর ও গভীরতা বিশিষ্ট খালের মত হালট ছিল। অর্থাৎ বর্ষার জল প্লাবনে খালের আকার ধারণ করিত অন্যথা শুক্‌নার সময় হালটরূপে ব্যবহৃত হইত। এই হালটে রাজবল্লভের বাড়ির নারায়ণ বিগ্রহের রথ আকর্ষিত হইত। সেই প্রকাণ্ড রথ-চক্রঘর্ষণে ভূমিতে যে চিহ্নাঙ্কিত হইয়াছিল বৃষ্টির জল পড়িয়া পড়িয়া প্রথমে উহাতে একটু একটু জল দাঁড়াইতে থাকে ; পরে অল্প জলের কালে লোকে ঐ স্থান দিয়া নৌকা টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে উহা একটি সামান্য পরিসর খালের আকার ধারণ করে ও একটু গভীর হয়। তখনও ইহার এক পাশে সরিয়া রথের টান হইত। এই খালটি বর্ষার সময়ে মাত্র খালস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। কালে ইহা দ্বারা পদ্মার স্রোত ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে এবং ইহা দুই কূল ভাঙ্গিয়া বড় হয় ও "রথখোলার গাঙ" নামে অভিহিত হয়। সেই রথখোলার গাঙই ভবিষ্যতে রাজনগর, রাজা রাজবল্লভের কীর্তিরাশি নাশ করিয়া কীর্তিনাশা নামে অভিহিত হয়। সোনারং নিবাসী কমলাকান্ত শিরোমণি মহাশয় যখন তাহার প্রথম বয়সে গামছা জড়ান কাপড়খানা বগলে লইয়া একলম্ফে টুক করিয়া পদ্মা পার হইবার কাহিনী বর্ণন করিতেন তখন কৌতুক করিয়া বলিতাম যে "শিরোমণি মহাশয় বুঝি ত্রেতার কাহিনী কীর্তন করিতেছেন।"

ইন্দ্রনারায়ণ রায়, ঘটক, চৌধুরী—জমিদারি গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রনারায়ণ নিজের ঘটকতা ব্যবসায়ের অর্ধাংশ কোলা ও কাঁচাদিয়া নিবাসী স্বীয় আত্মীয়দিগকে ঘটক পদবী সহ তুল্যাংশে দান করিলেন। সেই সময়ে বিক্রমপুর সমাজান্তর্গত প্রধান প্রধান শ্রোত্রিয়গণ কন্যাসম্প্রদান দ্বারা প্রায় প্রত্যেকেই ঘটক চৌধুরী বংশের সহিত কুটুম্বিতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ব্রাহ্মণ সমাজের প্রথা এই যে বিবাহ সভায় যে শ্রেষ্ঠ শ্রোত্রিয় সন্তান উপস্থিত থাকিবেন। তিনিই সর্বাগ্রে চন্দন পাইবার অধিকারী হইবেন। অনেক স্থলে একাধিক বংশের শ্রোত্রিয় সন্তান উপস্থিত থাকিলে কে কাহার অগ্রে চন্দন পাইবার অধিকারী হইবে ইহা লইয়া তুমুল তর্কবিতর্কের সূচনা হয়, ফলে কুলাচার্যগণ বাধ্য হইয়া কাহাকেও চন্দন না দিয়া নারায়ণ বিগ্রহে চন্দন অর্পণ করিয়াই ক্ষান্ত হন। কিন্তু এই সব কারণে শ্রোত্রিয়গণ এবং কুলাচার্যগণ পরামর্শ স্থির করিয়া তাহাদিগের নিজেদের মধ্যে বিবাদ ভঞ্জনোদ্দেশ্যে নড়িয়া সমাজে বিবাহ সভায় ঘটক চৌধুরীদিগকেই তাহাদের বংশ গৌরবের পোষকতা স্বরূপ সর্বাগ্রে চন্দন পাইবার অধিকারী সাব্যস্ত করেন।

বিক্রমপুরে বিবাহ সভায় চন্দনদানের পূর্বে অদ্যাপি মিশ্রধ্রুবানন্দ ঘটক বিরচিত নিম্নের শ্লোক কয়টি পঠিত হইয়া থাকে।

নত্বা তাং কুলদেবতাং খলু সদা সম্মানসে হংসতাং।
যা তাং ভক্তি বিশেষতঃ কুলসভামধ্যে সদা মোদিতাং।।
শ্রীমদ্বন্দ্যঘটীয়কাদিক মহাবংশাবলীং ব্যক্ততো।
বক্ষ্যে তৎপরিবর্তবর্তন বিধিং মিশ্রধ্রুবানন্দকঃ।।
মাতর্ভবানি ভবদীয় পদারবিন্দ
দ্বন্দং প্রণম্য শিরসাহং নিবেদয়ামি।
যাবৎ করোমি কুলকল্পলতাবতারং
তাবৎ কদাপি মম কণ্টতটংনে বাহ্যং।।
প্রণম্য বিঘ্নেশ্বর পাদমাদৌ
বাগীশ্বরীং তাং কুল দেবতাঞ্চ।
নৃপ প্রবোধায় কুলস্য পঞ্জিং
বিরচ্যতে শ্রীযুত মিশ্রকেন।।
জ্বালাকেশ চতুর্ম্মুখে সুনটতি বেদত্বমাপ্যস্বয়ং।
যামারাধ্য নিরন্তরং সুরগুরুর্বাচস্পতিত্বং যজৌ।।
যস্যাপাদরজো বিশেষ বিমলো বাল্মীকিরাদ্য কবিঃ।
সা ত্রৈলোক্য জনানুমোদরসিকা বাক্ দেবতা নম্যতে।।

ইন্দ্রনারায়ণের চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করে। প্রথম রমানাথ, দ্বিতীয় সুধারাম, তৃতীয় অনিরুদ্ধ ও চতুর্থ পরশুরাম। ইহাদিগের মধ্যে পরশুরাম কনিষ্ঠ হইলেও সবিশেষ বল বিক্রমশালী ও সাহসী ছিলেন এবং কাজ কর্ম বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন ; অপিচ কনিষ্ঠ পুত্র নিবন্ধন পিতার অতিশয় আদরের পাত্র ছিলেন। ইহারা যখন প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক সেই সময়ে বঙ্গের নবাবগণ কিছু হীনবল হইয়া পড়ে। রাষ্ট্র নায়ককে হীনবল এবং দেশে অরাজকতার লক্ষণ দর্শন করিয়া তাহারা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলেন ও রাজকীয় প্রাপ্য করদান বন্ধ করিয়া দিলেন।

রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রথমত বর্তমান কুমিল্লা জিলার অন্তঃপাতি দায়ুদনগরের ফৌজদার সসৈন্যে নড়িয়া আক্রমণ করেন ও সহজেই পরাজিত হইয়া প্রস্থান করেন। ঢাকার সুবাদার এই ব্যাপারে কোনও প্রকারে হস্তক্ষেপ না করিয়া একেবারে মুর্শিদাবাদে সংবাদ প্রেরণ করেন। যে স্থান হইতে বহু সৈন্য সমাভিব্যাহারে একজন সেনাধ্যক্ষ আগমন করেন। তখন শারদীয় দুর্গোৎসব সবে মাত্র শেষ হইয়া গিয়াছে ; দেশ সম্পূর্ণরূপে জল প্লাবিত না হইলেও অনেক স্থানই জলাকীর্ণ সুতরাং ভোজপুরী পশ্চিমা সৈন্যগণ এই জলাকীর্ণ স্থানে আসিয়া নৌযুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। দুই এক দিন মাত্র যুদ্ধের পর নড়িয়া গড় অবরোধ করিয়া বসিয়া রহিল।

গড়ের খাত খুব গভীর ও উহার পারে মাঁদার গাছের বেড়া, তাহাতে কণ্টকাকীর্ণ ঘন-বিন্যস্ত কেতকীর সহিত বেত্রলতা জড়িত থাকিয়া যে পশ্বাদির অভেদ্য ও তাৎকালিক কামানের গোলার অচ্ছেদ্য প্রাচীর গঠন করিয়া রাখিয়াছে তাহা ভেদ করিয়া কাহারও প্রবেশ করা একেবারেই অসাধ্য ব্যাপার। তাহাতে আবার উভয় পক্ষ হইতেই "তীর পড়ে ঝাকে ঝাকে গুলি করে রৈয়া" এদিকে "নৈয়ার ঘটক যুদ্ধ করে কচুবনে (গাছের আড়ে) রৈয়া।" কাজেই ঈদৃশ আক্রমণে গড় নিবাসিগণের কিছুতেই বহিঃশত্রুর নিকট পরাজিত হইবার কথা নহে। সেই সময়ে বন্দুক ও কামানের যুদ্ধ প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু উহার এত উন্নতি ও প্রসার হয় নাই। এদিকে ঘটক চৌধুরীদিগের অস্ত্র শস্ত্রাদিও নবাব পক্ষীয়গণের অস্ত্রশস্ত্রাপেক্ষা কোনও অংশেই হীন ছিল না। বিশেষত তীর সন্ধানে রমানাথের সিদ্ধ হস্ত অনিরুদ্ধের অসি ও বল্লম এবং পরশুরামের কামান

ও বন্দুকের সন্ধান অমোঘ ছিল। উভয় পক্ষেই যুদ্ধটি বেশ জাকাইয়া উঠিল। বিশেষত ঘটক চৌধুরীগণ আত্মরক্ষার জন্য বদ্ধ পরিকর, তাহাতে তাহাদের সমর নৈপুণ্য প্রদর্শনের এই প্রকার সুযোগ পাইয়া পরম উৎসাহে যুদ্ধ করিতেছিল। জমিদার পক্ষ নিজেদের সুরক্ষিত স্থানে থাকিয়া অরক্ষিত নবাব সৈন্যের বহু ক্ষতি করিলেও গড়ের বাহিরে আসিয়া বহু সংখ্যক নবাব সৈন্যের সম্মুখীন হইবার সাহস করিতে পারে নাই ; এই প্রকারে সমানভাবে উনবিংশ দিবস পর্যন্ত সংগ্রাম চলিতে লাগিল। এদিকে নবাব বাহিনীর অনেকে যেমন যুদ্ধে তেমনই জ্বর ও আমাশয় রোগে পঞ্চত্ব পাইতে লাগিল। নিজ সৈন্যের এতাদৃশ দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয় পলায়নের উদ্যোগ করিতে ছিলেন। ইতিমধ্যে কোনও গৃহ-ভেদীর নিকট ঘটক চৌধুরীগণের গোলাগুলির অভাব সংবাদ শ্রবণ করিয়া আরও দুই একদিন অপেক্ষা করিয়া মনস্থ করিলেন। তখন অনন্যোপায় জমিদারগণ শিক্কা টাকা দমকায়[৯] (এক প্রকার হালকা কামান) পুরিয়া চালাইতে লাগিলেন। বিপক্ষগণও সাধারণ গোলার স্থলে রৌপ্য মুদ্রা দর্শন করিয়া অধিকতর উৎসাহিত চিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

এইরূপে আরও দুই দিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। দুই দিন পরে বারুদও ফুরাইয়া গেল ; কিন্তু বারুদ প্রস্তুতের উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত না থাকা প্রযুক্ত উপায়ান্তর বিহীন হইয়া পলায়নই যুক্তি সঙ্গত মনে করিলেন ও অবশেষে একবিংশতি দিবসের রাত্রিযোগে শ্রীশ্রীগোপাল বিগ্রহ ও স্বজন পরিবারগণ সহ চাঁদনী গ্রাম নিবাসী নীলকণ্ঠ মজুমদারের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

নবাব সৈন্য গড় মধ্যে প্রবেশ করিয়া হর্ম্ম্য মন্দিরাদি ভূমিসাৎ ও গৃহাদি দগ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। এই যুদ্ধের সাক্ষী স্বরূপ একটি প্রাচীন পলাশ বৃক্ষ স্বীয় শৈবাল কলঙ্কিত কঠিন ত্বক ও কাষ্ঠ-তনুর অন্তরালে কতিপয় গোলাগুলি ধারণ করিয়া দীর্ঘকাল পর্যন্ত জীবিত ছিল। তাহার উন্নত-স্কন্ধ বিশাল কলেবরের এই সকল ক্ষতস্থান নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্ফোটকাকারে বিরাজমান থাকিয়া *বীণাপানি পদে কিংশুকাঞ্জলি দানেচ্ছুর পুষ্পচয়ন সৌকার্যার্থে* আরোহিণী রচনা করিয়া রাখিয়া ছিল। বিগত ১৩০৩ সনের প্রবল ঝড়বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাচীন ইতিবৃত্তের সাক্ষী বনস্পতি ধরাশয়ন করিয়াছে। তাহার শুষ্কাকাষ্ঠ জ্বলন্ত ভাষায় কোনও রন্ধন পরায়ণার নিকট তাহার সমসাময়িক গ্রাম্য কবির কবিতাচ্ছন্দে সমর সংবাদ কীর্তন করিয়া ছিল কিনা সন্দেহ। মাননীয় স্বর্গীয় শিবচন্দ্র রায় মহাশয় যখন প্রায় শতবর্ষ বয়ক্রম কালেও জোর পুকুরের-ঘাটে প্রাতঃস্নান করিয়া তর্পনোদকাঞ্জলি গ্রহণপূর্বক পূর্বাভিমুখী হইয়া অশ্রুপ্লাবিত নয়নে এই বনস্পতির দিকে চাহিয়া থাকিতেন তখন কি এক অপার্থিব জ্যোতিতে তাহার বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। যৌবনের উদ্যম সময়ে রায় মহাশয়ের ঈদৃশ ভাবোচ্ছ্বাস দর্শনে কৌতুহলাকৃষ্ট হইয়া তাহার নিকট তাহার পূর্বপুরুষগণের গৌরব কাহিনী শ্রবণে কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাহার পরে সর্বদাই আমাদের বোধ হইত ঐ পলাশ যেন আমাদের সহিতও কথা কহে। সেই পলাশ নাই, গ্রাম্য কবির গীতিকাও লুপ্ত হইয়াছে। তাহার দুই এক চরণ যাহা প্রাচীনগণের নিকট নানারূপে শুনিয়া সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা এই—

ও ঘটক পালাইলারে—
নৈরার সোনার পুরি কারে দিলারে? ধ্রু।।

* * * *

তীরে পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পরে রৈয়া।
নৈরার ঘটক যুদ্ধ করে কচুবনে বৈয়া[১০]।।
ও ঘটক ইত্যাদি। ধ্রু।।

... ...

পূবের ঘাটে রমানাথ তেতৈল[১১] পাতার আড়ে।।
ডান হাতে বাও হাতে তীর ঝাঁকে ঝাঁকে ছাড়ে।। ।ধ্রু।।

... ...

চাইর'দিগে লস্করেতে লাগল হাহাকার।
রঘুঘটক ডাইক্যা[১২] কয় গুল্লি নাইরে আর।। ।ধ্রু।।
গোট টাকারে গুল্লি করনা ওরে গুণমণি।
পশুরামের দমকা ফুটে বাজের গর্জ্জনি।। ।ধ্রু।।

... ...

দিন নাই ক্ষেণ নাই রাত্র অন্ধকার।।
একইশ দিনে সোনার নৈরা হইল ছারখার।। ।ধ্রু।।

... ...

দুর্গা পূজার ঘট কেনরে ভাসল দিঘির জলে।।

* * * *

গলাগলি ধৈর‍্যা তারা কান্দে চাই'র ভাই।
সিংহাসনের উপুর কেনরে লক্ষ্মী ঠাঁরৈণ নাই।।
বাপে বলে ওরে পুত্রু ক'লি[১৩] কিরে কথা।
জানিলাম আমারে নিশ্চয় নিদয় হইলেন
* * * মাতা।।[১৪]

... ... ঘর দুয়ার।
গোপালের বালাখানা কর্‌ল চুরমার।।

... ...।ধ্রু।।

ইত্যাদি—

বাস্তবিকই সোনার নৈরা ছারখার হইল। নবাব সৈন্যের অত্যাচার শঙ্কায় গ্রামের ইতর ভদ্র অধিবাসিগণ নিজ নিজ ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া যাহার যেখানে সুবিধা পূর্বেই পলায়ন করিয়াছে। গ্রাম্য বাজারের দোকান পাট বন্ধ করিয়া দোকানদার পালাইয়া গিয়াছে, কৃষকগণ পাকাধানের মমতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। হেলে, জেলে, মুটে, মজুর, ধনী, দরিদ্র সকলেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। একজন এই দুরবস্থার সময়েও এই গ্রামকে ত্যাগ করেন নাই। নিতান্ত সঙ্কট সময়েও তিনি কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না বলিয়াই তিনি সকল কালে সকল বেদে সঙ্কটহরা জননী বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। তিনি যে মা, মাতা সন্তানকে ত্যাগ করিতে পারেন না, বিশেষতঃ বিপদকালে। ঐ দেখ গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে বনস্পতিগণ পরিবৃত দ্রুমলতা শোভিত বাপীতটে অশ্বত্থ রূপিণী শিবদারা সিদ্ধেশ্বরী বিরাজ করিতেছেন। আর তাহার পদমূলে বিভূতি-ভূষিত কলেবর, প্রবালানুবিদ্ধ রুদ্রাক্ষ মাল্য ও বলেয় বিভূষিতাঙ্গ, সিন্দুর-কুঙ্কুম-তিলকাঙ্কিত-ললাটে ধ্যানমগ্ন সাধক ব্রহ্মাণ্ডগিরি[১৫] অবিচল চিত্তে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডগিরি জননীর বড় আদুরে ছেলে ; ব্রহ্মাণ্ড কখন যে বায়না ধরিত মা তখন তাহা পালন করিতেন। কথিত আছে দেবী ষোড়শী কুমারী বেশে একখণ্ড শিলা বহন করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশ-দেশান্তরে গমন করিতেন। এই স্থানে আসিয়া ব্রহ্মাণ্ড-জননী সেই শীলা বহন-কার্য হইতে রেহাই পাইয়াছিলেন। শুনা যায় ঐ প্রস্তরখণ্ডই পরবর্তী সময়ে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর ভৈরব, শঙ্কর বিগ্রহরূপে অর্চিত হইয়া আসিতেছিলেন। ব্রহ্মাণ্ড গিরির এদেশে আগমনের ও সমাধিগ্রহণের সময় অবগত নহি। নড়িয়া সিদ্ধেশ্বরী তলায় পুকুরের পশ্চিমোত্তর কোনে অভ্রোচ্চ

প্রাচীন বেষ্টিত বট-অশ্বত্থ যুগল ব্রহ্মাণ্ডের সাধন পীঠ ও পশ্চিম পারে অশ্বত্থ তাহার সমাধি স্থল বলিয়া কীর্তিত হইত। পুকুরের উত্তর পারে সিদ্ধেশ্বরী বৃক্ষের পূর্বদিকে প্রায় ৩০/৪০ হাত দূরে একটি মঠের মধ্যে প্রস্তরময় শিব-বিগ্রহ ছিল। প্রবাদ যে তাহার বন্ধুর পাষাণ বপু পাতাল পর্যন্ত প্রবিষ্ট ছিল। উহা কোনও খোদিত লিঙ্গমূর্তি নহে। মৃত্তিকার উপরে উহার যতটুকু জাগিয়াছিল তদৃষ্টে উহা একখানি সাধারণ কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর খণ্ড বলিয়াই বোধ হইত। ইহা আমাদের স্বচক্ষে দেখা। উহা যে মাটির নিচে কতকটা পর্যন্ত প্রোথিত তাহা অনুসন্ধান করিবার কৌতূহল তখন আমাদের জন্মে নাই।

প্রায় ১১০ কি ১২৫ বৎসর পূর্বে রথখোলার খাল দিয়া যখন কেদার রায়ের গুরুদেব প্রথিত নামা সিদ্ধ সাধক গোঁসাই ভট্টাচার্যের মন্ত্র প্রতিষ্ঠিত অষ্টধাতু বিনির্মিত 'ডলন' যন্ত্র-বিগ্রহ 'ঢোল সমুদ্রের' [১৬] কূল ভাঙিয়া পদ্মা বা গঙ্গার জলে অবগাহন করিতে যাত্রা করিত, যখন সেই ডলন বিগ্রহকে কোলে পাইয়া রথখোলার খাল নদী পদবী লাভ করত পদগৌরব মত্ততায় কাঁপিয়া উঠিয়া প্রবল বেগে দু'পার ভাঙিয়া চলিতে লাগিলেন, তখন সেই পূর্ব বাহিনী স্রোতস্বিনী উত্তর পার চাঁচুরতলার দিগম্বরী দেবীর "এবং দক্ষিণ পারে" নড়িয়ার সিদ্ধেশ্বরীর ও নবাবপুরের "ত্রিনাথের" পাদমূল পর্যন্ত স্বীয় দ্রবময়ী কলেবর বিন্যস্ত করতঃ এই ত্রিপুটি আসনে কিৎকাল বিশ্রাম লাভ করিলেন। কথিত আছে যখন পদ্মা বা তথা কথিত রথখোলার নদী সিদ্ধেশ্বরীর পাদমূলে অবস্থান করিতেছিলেন তখন একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের সময় মেঘগর্জনের ন্যায় ভয়ানক শব্দ ও ভূমিকম্প উৎপাদনপূর্বক বহু জন কোলাহলের মধ্যে সকলের দৃষ্টি সমক্ষে সাতটি মাইট আরও কত কি সিদ্ধেশ্বরীর পুকুর হইতে নদীর জলে প্রবেশ করিল।

অন্যূন বিংশ বৎসর পূর্বেও তাৎকালীক প্রাচীন ও প্রৌঢ়গণের চক্ষুর উপর এই ঘটনাটি দেদীপ্যমান ছিল। তাৎকালীক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাথমিক অভ্যুদয়ে অনুপ্রাণিত স্বর্গীয় হরিপ্রসাদ রায় ঘটক চৌধুরী মহাশয় এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার দিন লিপিতে যে মন্তব্য লিখিয়াছেন তাহার মর্ম নিম্নে লিখিত হইল। এই ঘটনাটি ইংরাজিতে লিপিবদ্ধ ছিল। তাহা এই "ঘটনাটি অন্য কাহারও মুখে শুনিলে হয়ত ইহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম ও হিন্দু সমাজের প্রচলিত অন্ধ-বিশ্বাসের একটি গল্প বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু যাহা স্বচক্ষে দেখিলাম তাহা অবিশ্বাস করি কি প্রকারে? ইহা কেবল আমি নহি গ্রামের আরও মান্য-গণ্য বহু লোকেই দেখিয়াছেন। সুতরাং ইহা যে আমার কোনও প্রকার চোখের ধান্দা নয় তাহাও নিশ্চয়" এই ঘটনার সময় বঙ্গাব্দ ১২৫১/৫২ সাল। সেই কালে শ্রীযুত চিন্তাহরণ ঘটক মহাশয়ের পিতার বয়ঃক্রম ১৫/১৬ বৎসর ছিল। তখন তিনি জুনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন।

নড়িয়ার সেই সিদ্ধেশ্বরী পীঠ এখন পদ্মার কুক্ষিগত। প্রথম বারে রথখোলার গাং কেবল সিদ্ধেশ্বরীর ধন গ্রহণ করিয়াই ফিরিয়া যায়। তারপরে মহারাজা রাজবল্লভের কীর্তিরাশি ধ্বংস করত যখন পশ্চিম দিক হইতে আক্রমণ করে তখন সিদ্ধেশ্বরী স্বয়ংই কীর্তিনাশা উপাধিভূষিতা পদ্মা সলিলে অবগাহিতা হইলেন। সে স্থানে সিদ্ধেশ্বরী পীঠ স্থাপিত ছিল এখন তাহার চারিদিকে চড় পড়িয়াছে ও দেবীর পীঠস্থানে একটি অতলস্পর্শ কূম (কূপ) হইয়া আছে বলিয়া দেশস্থ সকলের নিকট শুনিতে পাই। ফলত বর্তমান নড়িয়ার পশ্চিমস্থ মহিষখোলা চড়ের পূর্বদিকে একটি স্থানে যে নালার জল খুব গভীর তাহা অনেকেই মাপিয়া দেখিয়াছে। প্রায় শত পরিমিত দড়িতে ও তাহার তলস্পর্শ করিতে পারে নাই। অনেক নৌকা সেই কূপে পড়িয়া হারাইয়া গিয়াছে বলিয়াও শুনিতে পাই। এই কূপটি যে আছে তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। তবে ঐ কূপটি ঠিক সিদ্ধেশ্বরীর পীঠ স্থান কিনা তাহা থাক নকসার সহিত মিলাইয়া দেখা হয় নাই। প্রত্যক্ষদর্শীদিগের অনুমান ঐ স্থানেই সিদ্ধেশ্বরী দেবীর পীঠ ছিল।

স্বর্গীয় বিহারীলাল সাহা যখন অবিচ্ছিন্ন বিক্রমপুর পদ্মানদীর স্রোতবেগে দ্বিধা বিভক্ত হয়

নাই তখন এই বিক্রমপুর ঢাকা জেলার অন্তর্গত গির্দাঘাট নামক একটি পল্লিগ্রামে শিবচন্দ্র সাহার বাসস্থান ছিল। তাহার দুইটি কন্যাসন্তানের পর ফটকরিপার বাড়িতে সন ১২৭৩ সনের ১৪ ফাল্গুন খ্রিস্টিয় ১৮৬৭ সনের ২৫ ফেব্রুয়ারি পুত্র বিহারীলাল (রাসবিহারী) জন্মগ্রহণ করেন।" লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলে ছাই মুঠোও সোনা হয়—প্রবাদ বাক্য বিহারীলালের তৎকালীন কারবারের প্রসারণে সত্যতায় পরিণত হয়।

১৩১৫ সনের লক্ষ্মী পূর্ণিমা তিথিতে বিরাট আয়োজনে নিজ বাড়িতে বার্ষিক লক্ষ্মীপূজা আরম্ভ করেন। দূরদেশ হইতে বিখ্যাত কারিগর আনাইয়া প্রতিমা ও নানাবিধ পুতুল তৈয়ার করান হয়। সুবৃহৎ নিজ মূর্তির একপার্শ্বে রামের দল ও অপর পার্শ্বে বামনের দল দৃশ্যে প্রয়োজন বিশেষে ৫০/৬০টি সুগঠিত পুতুল দর্শক মাত্রকেই কৌতূহলাবিষ্ট করে। নড়িয়া ও তন্নিকটবর্তী গ্রাম ব্যতীত ২০/২৫ মাইল দূর হইতে নৌকা বোঝাই করিয়া বিহারীলাল সাহার বাড়ির লক্ষ্মীমূর্তি দর্শন করিতে বিস্তর লোক আসে। পূজার সময় প্রত্যহ নিমন্ত্রিত দরিদ্র নারায়ণ সেবায় প্রায় ২০০/৩০০ শত লোককে ভোজন করান হয়। দর্শকগণকে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে আদর যত্ন ও আপ্যায়নের ত্রুটি না ঘটে সেই দিকে বিশেষ সতর্কতা নেওয়া হয়। বাড়ির নিকটেই স্টিমার স্টেশন সুতরাং স্টিমার স্টেশন ঘাটে লাগা মাত্রা যাত্রীগণ ছুটিয়া আসিয়া সামান্য সময়ের জন্যও এই সুবিখ্যাত প্রতিমা দর্শন করিয়া যাইতে ক্লেশ বোধ করে না। কারণ বিক্রমপুরে এইরূপ লক্ষ্মীমূর্তি ও নানাবিধ পুতুল সজ্জিত মনোহর দৃশ্য খুব কমই দেখা যায়। এতদুপলক্ষে প্রত্যেক রাত্রে নিত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণ মানসে বহু লোক সমাগম হয় কিন্তু একটু বিশেষত্ব এই যে দূরদেশ হইতে আগত ব্যক্তি মাত্রকেই আহারাদি সম্বন্ধে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না ; ইহা অতীব প্রশংসার্হ।

নিজ গ্রাম ও তন্নিকটবর্তী গ্রামের ছেলেদের লেখাপড়া শিক্ষার অসুবিধা ও শিক্ষাবিস্তারে বিষয় তিনি অনেক দিন যাবতই চিন্তা করিতে ছিলেন। বিশেষত বাল্যকালে অভাবের তাড়নায় যদিও তিনি স্বয়ং শিক্ষা সম্বন্ধে বেশিদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই ; বর্তমান উন্নত অবস্থায় অপরকে শিক্ষাদানের উচ্চাকাঙ্খা তাহার প্রবল হইয়া উঠিল। তাই ইংরেজি ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জানুয়ারি তারিখে নিজ গ্রামে তিনি "নড়িয়া বিহারীলাল হাই স্কুল" স্থাপন করিলেন।

ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার ব্যাধি গ্রাম্য দলাদলিতে সক্রামিত হইয়া স্কুল স্থাপনের পর হইতেই নানাভাবে দেখা দিল। বিহারীলাল সৎসাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাই জিঘাংসা প্রসূত বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিস্তর অর্থব্যয়ে তিনি স্কুলের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইলেন। এই ব্যাপারে তাহার অনধিক ৪০০০০ টাকা খরচ হইয়াছিল। এস্থলে ইহা বলা অতিরঞ্জিত হইবে না যে, দলাদলির ক্লেশ গঞ্জনার পরিবর্তে ঐক্যবদ্ধ সহানুভূতি পাইলে বিহারীলালের জীবদ্দশাতেই এই স্কুলটি কলেজে পরিণত হইত। তিনি তাহার পিতার নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু জঘন্য দলাদলিই অন্তরায় হইয়া তাহার সদাকাঙ্খা চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।

কন্যাদায়গ্রস্তকে অর্থ সাহায্য করা, অসহায় ঋণদায়গ্রস্তকে ঋণমুক্ত করিয়া দেওয়ার অনেক উদারতার দৃষ্টান্ত বিহারীলালের জীবনে অনেকেই দেখিয়াছেন ; তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসী প্রভৃতি প্রার্থী মাত্রকেই যে কোন রূপ সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। সময় সময় প্রতারককে দান করা হইতেছে জানিয়াও তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তিনি বলিতেন ; আমি সদুদ্দেশ্যেই তাহাকে দিতেছি, সে যাহা ইচ্ছা করুক।

তিনি পুনরায় তীর্থ ভ্রমণ করিয়া কলিকাতা আসেন এবং ১৩৩১ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগেই নানা পীড়ায় অসুস্থ হইয়া পড়েন।

১৩৩২ খ্রিস্টাব্দের মাঘ মাসের প্রথমভাগে তাহাকে দেশের বাড়ি নড়িয়াতে নিয়া আসা হয়। দেখিতে দেখিতে রোগ হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় আর স্থানান্তর নেওয়া সম্ভবপর হইল না। অবশেষে

২২শে মাঘ উত্তরায়ণ অষ্টমী তিথিতে রাত্রি ১টা ১০ মিনিটের সময় মুখে শ্রীভগবানের নামোচ্চারণ করিতে করিতে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাহার বিধবা পত্নী, ৬ পুত্র, ৪ কন্যা ও দুই বিধবা ভগ্নিকে শোক সাগরে ভাসাইয়া ৫৯ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে প্রিয় স্কুল প্রাঙ্গণে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাসময়ে সুসম্পন্ন হয়।

অল্পদিন মধ্যেই স্কুল প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভার আয়োজন হয়। এবং সভা আরম্ভের পূর্বে বিহারীলালের তৈলচিত্র প্রতিকৃতি খানা পুষ্প মাল্যে সুশোভিত করিয়া বহু ছাত্র শিক্ষক ও বিদ্যোৎসাহী জনগণ দ্বারা মিছিল সহকারে সভাস্থলে আনীত হয়। বিহারীলালের দান ও সদগুণাবলী উচ্চ প্রশংসার সহিত আলোচিত হইয়া মৃতের আত্মার প্রতি বিশেষ সম্মান জ্ঞাপন করা হয় এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট সান্ত্বনা লিপি প্রেরিত হয়।

ইংরেজি ১৯২৯ সনে স্কুল প্রাঙ্গণে নড়িয়া কনফারেন্স উপলক্ষে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত উপস্থিত হন এবং সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার প্রারম্ভে সভাপতি মহাশয় স্কুল প্রতিষ্ঠাতা দানবীর বিহারীলালের তৈলচিত্র প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার কর্তব্যময় জীবনী উল্লেখ প্রশংসার সহিত বলেন, "নিঃস্বার্থভাবে এত অর্থব্যয় করিতে খুব কমই দেখা যায়।"

বাংলায় ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎ এক রাত্রিতে স্কুলটি অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়। তৎপর গ্রাম্য লোক নিজ নিজ বাড়ি হইতে আসবাবপত্র আনাইয়া সাময়িকভাবে বিহারীলাল সাহার নাটমন্দিরে স্কুল বসাইল। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে বিহারীলালের উপযুক্ত পুত্রগণ বিস্তর অর্থব্যয়ে পুনরায় স্কুলগৃহ নির্মাণ ও নূতন আসবাবপত্র প্রস্তুত করাইয়া স্কুল পূর্ব স্থানেই স্থাপন করিলেন। স্বর্গীয় পিতার তৈলচিত্রও পূর্ববৎ স্থাপিত হইল। ক্রমে লাইব্রেরিতে বহু পুস্তক ক্রয় করিয়া আনা হইল। তদবধি স্কুলটি তাহার কৃতী পুত্রগণের সুনজরে থাকিয়ে রীতিমত পরিচালিত হইতেছে।

বিহারীলালের আজানুলম্বিত বাহু, উজ্জ্বল বর্ণ ও সুন্দর অবয়ব যে দেখিত, সেই তাহাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিত ; কেবল ইহাই নহে, তাহার স্বভাবসুলভ তেজস্বিতা ও অমায়িকতা মুখশ্রীতে প্রতিভাত হইয়া অন্তরের ভাব বলিয়া দিত। প্রার্থী মাত্রকেই তিনি স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহাদের প্রতি কেহ অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করিলে তিনি দুঃখিত হইতেন।

অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া সূর্যোদয়ের পূর্বেই প্রত্যহ বৈষয়িক কার্যাদিতে মনোযোগ দিতেন। বৈষয়িক কর্মের ক্ষতি হইলেও রীতিমত সন্ধ্যাহ্নিকে ত্রুটি হইত না। বৈকালে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ধর্মালোচনা করিতেন। হরিসঙ্কীর্তন সময়ে তিনি অন্তরের ভক্তি ভাবে যেন মাতোয়ারা হইয়া যাইতেন। সময়ের সদ্ব্যবহার করা তাহার আজীবন অভ্যাস ছিল এবং তাহাই তাহার উন্নতির পরিচায়ক বলিয়া মনে করা অসঙ্গত নয়।

বিক্রমপুরে এক দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া এক জীবনে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় ও সদ্ব্যয় করা, নড়িয়ার বিহারীলাল সাহার মত দ্বিতীয়টি খুব কমই দেখা যায়। তিনি যে অমর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন করিয়া তাহার কর্মময় জীবনের সার্থকতা প্রতিপালন করিবে।

১. *ষোড়শীকুমার ঘটক, ইছাপুরা (বিক্রমপুর)।

২. রায়চৌধুরীর সনদ লিপির নকল এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

৩. Assistant Settlement Officer Mr. Ascoley ইহাকে De'Coster নাম দিয়াছেন।

৪. রাম রাম ঘটক, বাসদেব কালীচরণ ঘটক তালুক রঘুনন্দন ঘটক তালুক, রাজবল্লভ ঘটক তালুক প্রভৃতি নিজেদের নামানুসারে কতকগুলি খারিজা তালুকের উদ্ভব হইয়াছিল।

৫. ৭॥ হাত নলের ২৪ নল দীর্ঘ ও ২০ নল প্রস্থে ১ কানি ও ১৬ কানিতে ১ দ্রোণ।

৬. নড়িয়া গ্রামের কিঞ্চিৎ পূর্ব দক্ষিণ কোণে "পাইকপাড়া" নামে অভিহিত একটি গ্রাম ও তাহারই সংলগ দক্ষিণে "বাহির দিঘির পাড়" নামে অপর একটি গ্রাম আছে। তাহাতে কেবলমাত্র মুসলমানগণই বাস করে। জন প্রবাদ এইরূপ, ইন্দ্রনারায়ণের মুসলমান পাইকগণ এই গ্রামে বাস করিত। বাহির দিঘির পাড় চলিত কথায় বাইর দিঘির পাড় নামটি দিঘির নাম হইতেই হইয়াছে। এখানে একটি প্রকাণ্ড দিঘি আছে ইহার দৈর্ঘ্য উত্তরে দক্ষিণে অনুমান ৫০০ হাত ও প্রস্থ পূর্ব পশ্চিমে অনুমান ৩০০ হাত হইবে। কথিত আছে এই দিঘিটি ইন্দ্রনারায়ণের মুসলমান পাইক ও প্রজাগণের সুবিধার্থে গড়ের বাহিরে কাটান হয় এবং সেই হেতু ইহার নাম "বাহির দিঘি" হয়। গড়ের মধ্যে যে বাড়ির নিকট অপর একটি দিঘি তাহার বিবরণ পরে বলা হইবে।

৭. ঘটক চৌধুরীগণের জমিদারী হস্তচ্যুত হওয়ায় দেশের বর্তমান জমিদার।

৮. এই প্রকার একটি দমকার নল বঙ্গীয় কলিকাতা সাহিত্যপরিষৎ প্রদর্শনীতে রক্ষার নিমিত্ত শ্রীযুত চিন্তাহরণ রায় ঘটক চৌধুরী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

৯. বসিয়া।

১০. তেঁতুল।

১১. বোধ হয় তখন রমানাথের পুত্র রঘুনন্দন কিশোর বয়স্ক ছিলেন।

১২. কলি = কহিলি।

১৪. আমারে কৈরাছে কোপ ঠাঁরৈন লক্ষ্মীমাতা। পাঠান্তর।

১৫. ইনি প্রথিত নামা ব্রহ্মানন্দগিরি কিনা তাহা বিচার্য। অথবা ব্রহ্মাণ্ডগিরি নামক অপর কোনও সাধক। অনুসন্ধানে ইহার কোনও পরিচয় পাইলে জানাইবার ইচ্ছা রহিল। বলা বাহুল্য যে প্রাচীন কাহিনী-শ্রুত ইতিহাসের সত্যতা দানে অক্ষমতা মার্জনীয়। মূলকথা নড়িয়ার সিদ্ধেশ্বরী একটি সাধনসিদ্ধ পীঠস্থান ও উহা ব্রহ্মাণ্ডগিরির সাধন পীঠ বলিয়া কীর্তিত।

১৬. কেদার রায়ের মাতা এই প্রকাণ্ড দির্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করেন। সময়ে উহা বাইচা নামক জলজ শৈবালদাম বিশেষে একবারে আবৃত হইয়া যায় ও উহা পরিষ্কার করান অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই জন্য মহাত্মা গোঁসাই ভট্টাচার্য মহাশয় শিষ্যদিগের আগ্রহাতিশয্যে অনুরুদ্ধ হইয়া একটি ডলন যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঐ দিঘির জলে নিক্ষিপ্ত করেন। এই অভিচার ক্রিয়া সাধন সময়ে গুরুমহাশয় নাকি শিশুদিগকে বলিয়াছিলেন এক সময়ে এই ডলনই তোমাদের সমগ্রপুরী চিহ্নহীন করিবে।

প্রবীন ঐতিহাসিক শ্রীযুত আনন্দনাথ রায় প্রণীত "ফরিদপুরের ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ড ৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। নড়িয়া—এই প্রাচীন গ্রামটি বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ, পূর্বে এই স্থান উত্তর ও দক্ষিণ দিকে লম্বিত ছিল, প্রায় ৮০ বৎসর অতীত হইল, কীর্তিনাশা নদীর প্রথম উদ্ভবের সহিত এই স্থানের প্রায় আট ভাগের সাত অংশ নদীগর্ভস্থ হয়। তজ্জন্য এই গ্রাম পূর্ব ও পশ্চিম দিকে লম্বিত হইয়া পড়ে। এই গ্রামের উত্তর সীমাতেই, প্রসিদ্ধ বন্দর আলী ফুলবাড়ি বিদ্যমান ছিল। উহার বিষয় সাধ্য সাধনও সেই কালে ঘটিয়াছে। রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সমাজে যে কয়েকটা মেলের পরিচয় আছে, তন্মধ্যে নড়িয়া মেলের উৎপত্তি এই গ্রামের নামানুসারেই সংগঠিত হয়। কুল গ্রন্থে লিখিত আছে "গাঙ্গে গঙ্গাধর মেলো নরিয়া নাম বিশ্রুত।" এই গঙ্গাধর গাঙ্গুলীর দুই পুত্র, যদুনাথ পণ্ডিত ও রঘুনাথ বাচস্পতি। উক্ত বাচস্পতির কন্যাকে রায়বাসি মাধ মেলের লোকনাথ মুখোপাধ্যায় বিবাহ করেন, তজ্জন্য এই মেলের পালটি ও প্রকৃতি না থাকায় এই দলস্থগণের বরাবর মেলে ভঙ্গ করিয়া পরিণয় ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন মেলে কন্যা দান ও শ্রোত্রীয় কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া, স্বীয় মর্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। বাচস্পতির দৌহিত্রগণ ঘটক ভট্টাচার্য উপাধি গ্রহণ করিয়া, এই গ্রামের অধিবাসী হন। বাস্তবিক পক্ষে ইহারা প্রকৃত সাবর্ণ ঘটক বংশ।

কীর্তিনাশার প্রথম আক্রমণের সহিত গ্রামের ক্ষীণতা আরম্ভ হইয়া, পুনরায় ঐ নদী কর্তৃক ক্ষীণতর হইলে, এই ঘটক বংশের ও অন্যান্য অধিবাসিগণের মধ্যে অনেকেই এই স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তথাপি পালং থানার মধ্যে এই স্থানের বর্তমান জনসংখ্যা অধিক। জাহাজ ঘাটার সহিত ইহার লোক সংখ্যা ৪৬৫১। ইহার মধ্যে পুরুষ ২০৬২ জন, স্ত্রী ২৫৮ জন, হিন্দুর সংখ্যা ৩২১০, মুসলমানের সংখ্যা ১৪৪১। রঘুনাথ বাচস্পতির তিন পুত্র, তাহাদের উপাধি ছিল, ঘটক সার্বভৌম, ঘটক শিরোমণি এবং ঘটক

চক্রবর্ত্তী। উপাধি ব্যতীত ইহাদের প্রকৃত নাম অবগত হওয়া যায় না। বাচস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদুনাথ পণ্ডিত নড়িয়া হইতে উঠিয়া যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইল সাবডিভিসনের অধীন ব্রাহ্মণ ডাঙা গ্রামে বাস সংস্থাপন করেন। তদ্বংশধরগণ অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন।

এই সার্বভৌমের পুত্র ঘটক রায়, ইহারও প্রকৃত নাম অবগত হওয়া যায় না। ঘটক রায়ের অপর দুই ভ্রাতা নাম, আদিত্য ও পুরন্দর। ঘটক রায় বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ের সহিত মিলিত হইয়া, মোঘল সেনাপতি মানসিংহের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন, এইজন্য মানসিংহ সংগ্রামে জয়ী হইয়া ঘটক রায়ের ব্রহ্মত্র বাজেয়াপ্ত করেন। পরে রায়ের পৌত্র ইন্দ্রনারায়ণ কর্তৃক উহার উদ্ধার সাধন হয়। রায় উপাধি ধারণের সহিত ইহারা ঘটকতা ব্যবসা পরিত্যাগ করেন। দোস্ত ফিরিঙ্গি নামে এক পর্তুগিজ বণিক, নড়িয়া গ্রামে একটি হীনবর্ণা রমণীর প্রণয়ে আবদ্ধ হওয়ায়, গ্রামের একাংশে বাস করিত। ইন্দ্রনারায়ণ রায়কে এই ব্যক্তি স্নেহের চক্ষে অবলোকন করিতেন। এই ফিরিঙ্গির কোন সন্তান সন্ততি না থাকায়, আপন যাবতীয় সম্পত্তি অন্তিমকালে ইন্দ্রনায়ারণ রায়কে প্রদান করেন। এই অর্থবলে ইন্দ্রনারাযণ রায় গুণানন্দী পরগণার বন্দোবস্ত গ্রহণ ও পৈত্রিক সম্পত্তি গ্রদ বন্দর মধ্যে যে তালুক তাহাদের হস্তভ্রষ্ট হইয়াছিল, উহার উদ্ধার সাধন করেন। ইন্দ্রনারায়ণের পুত্রগণের সময়ে দেয় রাজস্ব বন্ধ করায়, নবাব সৈন্য তাহাদিগের অবরুদ্ধ করার মানসে, নড়িয়াতে উপস্থিত হয়। রায়গণ ও উহাদে বাধা দিতে অগ্রসর হন, কিছুদিনের মধ্যেই নবাব প্রেরিত লোকেরা জয়ী হইয়া, ঘটক রায়গণের বাড়ি লুণ্ঠন করেন, রায়গণ পলাইয়া অন্যত্র অবস্থান করিতে বাধ্য হন। এতৎ সম্বন্ধে একটি গ্রাম্য গীত রচিত হইয়াছে, উহা সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। গুণানন্দী পরগণা যতদিন হস্তগত ছিল, ততদিন পর্যন্ত ইহাদের প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল, ঢাকা, ত্রিপুরা এবং ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত। ফরিদপুরের মধ্যে মোট পরগণার এই পরগণা দুই আনার পরিমাণ অংশ হইবে। আত্মকলহ ইহাদের পতনের প্রধান কারণ। নড়িয়া পণ্ডিতপ্রধান স্থান, এই গ্রামের যাবতীয় উন্নতি ঘটক চৌধুরী বংশদ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। অতীত সময়ে ঘটক বংশে বহু কৃতী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, হরিপ্রসাদ রায়, উকিল রজনীকান্ত রায় ঘটক প্রকৃতি পরবর্তী সময়ের প্রসিদ্ধ লোক। বর্তমান সময়ে শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় ও শ্রীযুত চিন্তাহরণ রায় প্রভৃতি যোগ্য ব্যক্তি বর্তমান আছেন। নরিয়ার যে অংশ সিকস্ত হইয়াছিল, অধুনা উহা আবার পয়স্থ হইয়া লোকের বাসোপযোগী হইয়াছে, এই গ্রামের নিকটেই প্রসিদ্ধ আলা ফুলবাড়িয়া গ্রাম বিদ্যমান ছিল, পরে নদী কর্তৃক ভগ্ন হয়, সম্প্রতি বসাকের চর বলিয়া যে স্থানটির পরিচয় হইয়াছে, অনেকের বিশ্বাস উহাই প্রাচীন আলা ফুলবাড়িয়া। চর নড়িয়ার লোক সংখ্যা ৪৬২৩ বসাকের চরের লোক সংখ্যা ১৩৮২। আমাদের বিশ্বাস নবীপুর নামে যে একটি গ্রাম ছিল, যথায় সর্বপ্রথম ত্রিনাথের মেলা বসে, বসাকের চর মধ্যে কতকটা ঐ নবীপুরের পয়স্থ ভূমির অংশ হইতে পারে। নড়িয়াতে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল, সম্প্রতি উহার কতকটা অবনতি ঘটিয়াছে। স্থানীয় সিদ্ধেশ্বরীতলা ও গোপাল দেব প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া প্রচলিত। নিকটবর্তী স্থান বাসিগণ আজিও মানস করিয়া তাহার পূর্জার্চনাদি করে। পালা অনুসারে গোপালের অর্চনা হইয়া থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়



মালখাঁনগরের বসু ঠাকুর ঃ

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালখাঁনগর নিবাসী বসুবংশীয়গণ বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। তাহাদের পূর্বপুরুষ দেবীদাস বসু বসুবংশীয়গণের আদিপুরুষ দশরথ বসু (পুষণ বসু) হইতে অর্ধস্তন সপ্তদশ পুরুষ। দেবীদাস বসুর পিতামহ গোপাল বসুর[১] চারিপুত্র। প্রথম পুত্র রাজবল্লভ বসুর সন্তানগণ ওলপুরে (ইহারা রাজবল্লভ বসুর দ্বিতীয় পুত্র রামচন্দ্র বসুর সন্তান) যথাক্রমে রায়চৌধুরী এবং রায় মিরবহর, খ্যাতিযুক্ত হইয়া বাস করিতেছেন ; গোপাল বসুর দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দ চন্দ্র বসুর সন্তানগণ মালখাঁনগরে বসুঠাকুর খ্যাতিযুক্ত হইয়া বাস করিতেছেন ; তৃতীয় পুত্র যদুনাথ বসুর সন্তানগণ ইদিলপুরে বাস করিতেছেন এবং চতুর্থ পুত্র সদাশিব বসুর সন্তানগণ টাকী অঞ্চলের পুঁড়াখোড়গাছি গ্রামে বাস করিতেছেন।[২] গোপাল বসুর দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দ্রচন্দ্র বসুর দুই পুত্র দেবীদাস বসু ও রঘুনাথ বসু। জ্যেষ্ঠ দেবীদাস বংশাবলী সম্বন্ধেই এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে। কনিষ্ঠ রঘুনাথ অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং তিনি বৃন্দাবনেই বাস করিতেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যরচিতমৃতে শ্রীচৈতন্যদেবের ছয়জন পার্ষদের উল্লেখ আছে।

"জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।।"

কথিত আছে, যে রঘুনাথ বসুই এই দাস রঘুনাথ। কিন্তু ঐতিহাসিক হিসাবে এই কিংবদন্তীর বিশেষ কোন মূল্য নাই ; কারণ শ্রীচৈতন্য রঘুনাথ বসুর বহুপূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যাহা হউক, রঘুনাথ বসু যে একজন পরম বৈষ্ণব এবং বৃন্দাবনের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বৃন্দাবনে তাহার প্রতিষ্ঠিত কুঞ্জ অদ্যাপি বর্তমান আছে। রঘুনাথ বসু অপুত্রক। মালখাঁনগরের বসুবংশীয়গণ তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবীদাস বসুর বংশধর।

গোপাল বসুর বাসস্থান কাহারও মতে শ্রীনগরে,[৩] কাহারও মতে বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে ছিল। কথিত আছে যে, চন্দ্রদ্বীপ সমাজে কোন সামাজিক কুমন্ত্রণাদি হইলে, চন্দ্রদ্বীপের রাজার আসন সর্বদক্ষিণে করা হইত ; তাহার পরে অন্যান্য কুলীনকগণ বসিতেন, কারণ চন্দ্রদ্বীপের রাজগণ রাজপতি ছিলেন। পূর্বের কুলীন রাজবংশের দৌহিত্র পরমানন্দ রায় যখন চন্দ্রদ্বীপের রাজা ছিলেন, তখন পূর্বরীতি অনুসারে তিনিও এক নিমন্ত্রণে সর্বদক্ষিণে পরমানন্দ কুলীন ছিলেন ; তাহার সন্তানগণ একজন বাকরগঞ্জ জেলায় বাস করিতেন। কুলীন হইয়া কুলীনের দক্ষিণে আসন পাওয়া অযৌক্তিক। ইহাতে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের সহিত গোপাল বসুর মনোমালিন্য হওয়াতে তিনি চন্দ্রদ্বীপ ত্যাগ করিয়া যশোহর সমাজে বসুরহাট (২৪ পরগণার অন্তর্গত আধুনিক বসিরহাট) নামক স্থানে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। তাহার নামানুসারেই ঐ স্থান বসুরহাট নামে খ্যাত হয়। এই বসুরহাট হইতেই পরে গোপাল বসুর পৌত্র দেবীদাস বসু উপলক্ষে ঢাকা বাজারে আগমন করেন এবং পরে কৌলীন্যলোপের আশঙ্কায় শীঘ্রই সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালখানগর গ্রামে যাইয়া বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন। মালখানগরের কুরছিনামা

হইতে জানা যায় যে, গোপাল বসুর চারি পুত্র পূর্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন গ্রামে যাইয়া নিজ নিজ বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন এবং সেই সেই স্থানে তাহাদের বংশধরগণ অদ্যাপিও বাস করিতেছেন। সুতরাং বোধ হয় যে, গোপাল বসুর দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দ্র চন্দ্র বসুই প্রথমে মালখানগরে আগমন করেন। তিনি মালখাঁনগর না আসিয়া থাকিলেও তিনিই ঢাকা শহরের অন্তর্ভুক্ত বসুরবাজারে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন, এইরূপ অনুমিত হইতে পারে।

কেহ কেহ বলেন,[৪] দেবীদাস বসুই প্রথমে পূর্ব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া ঢাকাতে বসুরবাজারে আসিয়া বাস করেন ; কিন্তু কৌলিন্যলোপের আশঙ্কায় শীঘ্রই পুনরায় সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া মালখানগরে গিয়া বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন। পূর্বোক্ত প্রবাদ বাক্য এবং কুলচার্যগণের উক্তি এই সিদ্ধান্তেরই অনুকূল। সুতরাং দেবীদাস বসুই পূর্ব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া ঢাকা বসুরবাজারে আসেন এবং পরে তথা হইতে মালখাঁনগরে যান এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সমীচীন।

যিনিই মালখানগরে প্রথম আসিয়া থাকুন, তাহারই বাসস্থান তথায় আসিবার পূর্বে ঢাকা শহরের অন্তর্ভুক্ত বসুরবাজারে ছিল ; কারণ বসুদের নামানুসারেই ঐ স্থানের নাম বসুরবাজার হইয়াছে। তাহাদের খনিত পুষ্করিনী অদ্যাপি তথায় বর্তমান আছে। বসুরবাজারের হাট তাহাদেরই সংস্থাপিত। নারাণদিয়া, বসুরবাজার, দয়াগঞ্জ প্রভৃতি কিসমৎ তাহারা লাখেরাজ (নিষ্কর) ভোগ করিতেন এবং অদ্যাপিও মালখানগরের বসুবংশীয়গণ ভোগ করিতেছেন।

"নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর রাজস্ব বন্দোবস্তে নৌ বিভাগে ৭৬৮ খানি সশস্ত্র রণতরী ও নৌকা সুসজ্জিত থাকার উল্লেখ আছে।" এই নৌবাহিনী দ্বারা পদ্মা ও মেঘনাদ নামক নদীদ্বয় সুরক্ষিত ছিল এবং উহার উপকূলবাসী প্রজাগণ মগ, আরাকানী ও পর্তুগিজ জলদস্যুগণের উৎপাত হইতে রক্ষিত হইত। নৌসৈন্য ও নাবিকগণের মধ্যে ৯২৩ জন পর্তুগিজ ফিরিঙ্গি ছিল ; ইহারা প্রধানত কামান চালাইবার জন্যই নিযুক্ত থাকিত। নবাব ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে প্রথমে এই ফিরিঙ্গিদল ঢাকায় যায়। বঙ্গের রাজধানী মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে যখন মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়, নৌবিভাগের প্রধান কার্যালয় তখন অন্যান্য বিভাগের সহিত ঢাকা হইতে উঠাইয়া আনা হয় নাই। পূর্বাঞ্চল ও উপকূল রক্ষার জন্য নদীবহুল ঢাকা হইতেই নৌযুদ্ধ পরিদর্শনের সুবিধা। মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে এই নৌবিভাগের মাসিক ব্যয় ২৯,২৮২ টাকা নির্দিষ্ট ছিল। 'নাওয়ারা' মহলের বার্ষিক আয় (৭,৭৮,৯৫৮ টাকা) নৌ বিভাগের কার্যে ব্যয়িত হইত, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ঢাকা ও শ্রীহট্ট, এই উভয় চাক্‌লাতেই 'নওয়ারা' মহালের ভূমি ছিল, ঢাকার মধ্যেই ইহার অংশ।

নাওয়ারা মহালের বার্ষিক আয়ের মধ্যে ৫০ হাজারেরও কিছু অধিক প্রত্যন্ত দেশের জমিদার প্রভৃতির নিকট পেস্‌করররূপে আদায় হইত। আকবরের আমলে টোডরমল্ল কর্তৃক, পরে সুলতান সুজা কর্তৃক এবং তৎপরে মুর্শিদকুলী খাঁ কর্তৃক, বঙ্গদেশের যে সমস্ত বিভাগ এবং বন্দোবস্ত হয় 'নাওয়ারা' মহাল সেই সমস্ত বন্দোবস্ত বহির্ভূত। দেবীদাস বসু 'নাওয়ারা' মহালের কানুনগো ছিলেন তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। মুসলমান আমলের কানুনগো বলিতে কি বুঝায়, তাহা হয়ত অনেকেই জানেন না। কেহ ভ্রমে অল্প বেতনভোগী আধুনিক কানুনগোর সহিত মুসলমান আমলের কানুনগোর তুলনা করিবেন না। সদর কানুনগো অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। রাজস্ব বিভাগে দেওয়ানের পরই তাহার পদ ছিল। সদর রাজস্বের উপর শতকরা আট আনা সদর কানুনগোর 'রসুম' নির্দিষ্ট ছিল। সদর কানুনগো দিল্লির সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। রাজা টোডরমল্ল সম্রাট আকবরের আদেশে যখন সমস্ত ভারতবর্ষের রাজস্ব বন্দোবস্ত কার্যে নিযুক্ত হইলেন, সেই সময় তাহার সাহায্য নিমিত্ত তিনি দশজন প্রধান কানুনগো নিযুক্ত করেন। এইরূপে কানুনগো পদের প্রথম সৃষ্টি হয়। তাহার অমায়িক ও সরল স্বভাবের গুণে, সকল শ্রেণীর সকল রকমের ব্যক্তিই তাহার সহিত অবাধে মিশিতে পারিত। তাহার জীবনের আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয়

ছিল তাহার একান্তিক সময়ানুবর্তিতা। তিনি তাহার জীবনকে একটি সম্পূর্ণ ছন্দে বাধিয়া লইয়াছিলেন এবং জীবনে কখনও সে ছন্দ ভঙ্গ হইতে দেন নাই।

অশ্বিনীকুমারের (পিতা গোবিন্দচন্দ্র বসুঠাকুর) চরিত্রে এমন কতকগুলি গুণ ছিল, যাহা প্রত্যেকের আদর্শ স্থানীয় হওয়া উচিত। তাহার নিয়মানুবর্তিতা, কর্মকুশলতা, সরলতা, দয়া, দাক্ষিণ্য সর্বজনবিদিত ছিল। কত শিক্ষার্থী যে তাহার নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে, কত লোক যে কর্মক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার শক্তি সামর্থ্য তাহার উপদেশাবলীর মধ্য হইতে লাভ করিয়াছে, কত দুস্থ দরিদ্র যে তাহার প্রদত্ত অর্থে প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অপরকে যথাসাধ্য সাহায্য ও উৎসাহিত করিতে তিনি কখনও বিমুখ ছিলেন না। সময়ের সঙ্গে তাহার জীবনের যেন এক বিচিত্র যোগাযোগ ছিল। তাহার জীবন নিরূপিত কর্মপন্থায় বাঁধা ছিল। এই জন্যই মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত, ৮০ বৎসর বয়সেও তাহার বলিষ্ঠ ঋজু দেহ দর্শনে সকলে বিস্মিত হইত।

অশ্বিনীকুমারের ৬ পুত্র ও ১ কন্যা বর্তমান। কন্যা পঞ্চম সন্তান। তাহার পুত্রগণ প্রায় সকলেই কর্মক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসুঠাকর এম এ, বি এল, পিতার পদাঙ্কঅনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা সরকারের মুন্সেফি চাকুরি গ্রহণ করেন এবং ক্রমে জেলা জজের পদে উন্নীত হন। অতীব দক্ষতার সহিত ২৭ বৎসর কাল উচ্চ পদে কাজ করিয়া, পিতার জীবদ্দশাতেই তিনি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে সরকারি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার কার্য কুশলতার পুরস্কার স্বরূপ, গভর্নমেন্ট, ১৯৩৩ সালের নববর্ষ তারিখে তাহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র বসুঠাকুর বি এল, ময়মনসিংহে মহারাজা শশীকান্ত আচার্য বাহাদুরের মালদহ জিলাস্থিত জমিদারির অধ্যক্ষতা দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতেছেন।

তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র বসুঠাকুর এম এ, বি এল, পি এইচ ডি, ডি এস সি, মধ্য ভারতে অবস্থিত, হোলকর সরকারের, ইন্দো কলেজে অধ্যক্ষের (Principal) পদে নিযুক্ত আছেন। বর্তমানে ইনি আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক ভাইস চান্সেলার।

পঞ্চম পুত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্র বসু ঠাকুর, জামসেদপুরস্থ টাটা কোম্পানিতে উচ্চপদে নিযুক্ত আছেন।

ষষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র বসুঠাকুর বি এ বীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। কন্যা শ্রীমতী অমলাবালার স্বামী, ঢাকা জিলাস্থ বিক্রমপুরের অন্তর্গত হরপাড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র গুহ বি এল কৃতিত্বের সহিত উত্তর বর্মার Myingyan (মিন্‌জান) শহরে ওকালতি ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়



তারপাশার মহাশয় ঃ

১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে সেলিম জাহাঙ্গীর যখন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন বার ভূঞার এক ভূঞা নোয়াখালির অন্তর্গত ভুলুয়া পরগণার লক্ষ্মণ মাণিক্যের স্বাধীনতা ধ্বজা কিছুদিনের জন্য উড্ডীয়মান রাখিয়াছিলেন। তৎপর মোঘল সৈন্যের গতি রোধার্থে লক্ষ্মণ মাণিক্যের স্বাধীনতা চিরতরে অন্তর্হিত হইল। সে সময়ে নরনারায়ণ রায় নামে লক্ষ্মণ মাণিক্যের মন্ত্রী মোঘলের আধিপত্য স্বীকার করিয়া ভুলুয়ার স্বাধীন ভূস্বামী নামে দিল্লির সম্রাটের অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছিলেন। মানসিংহ বার ভুঁইয়াগণকে একে একে পরাস্ত করিয়া, কয়েক বৎসর বঙ্গের সুবেদারি পদে নিযুক্ত থাকেন। তৎকালীন শ্রীরামপুর পরগণার অন্তর্গত বিক্রমপুরের কতকাংশ ভূমিতে নরনারায়ণ বসবাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভুলুয়া পরগণার ভূস্বামী নরনারায়ণকে তারপাশা গ্রামে স্থাপন করেন। সের আফগানের হস্তে কুতুবউদ্দীনের মৃত্যু হইলে জাহাঙ্গীর কুলী খাঁ বাংলার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হইয়া নরনারায়ণের ভদ্রাসন বিক্রমপুর তারপাশা গ্রামে স্থানান্তর করিতে অনুমতি দেন। সম্ভবত ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে নরনারায়ণ বিক্রমপুর আসেন। ভুলুয়া পরগণার কিসমৎ বিক্রমপুর তারপাশা গ্রামে অবস্থান করার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় নরনারায়ণ তারপাশায় ভদ্রাসন নির্মাণ করিতে অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সে সময়ের তারপাশা গ্রামের প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার, আমরা জনশ্রুতি হইতে যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এই স্থলে তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। তারপাশা গ্রামের নামের ব্যুৎপত্তি অনুধাবন করিলে, যতদূর বুঝিতে পারা যায় মোঘল শাসন সময়ে আরবী শব্দ তারপাছ শব্দের অপভ্রংশ হইতে তারপাশা শব্দের উৎপত্তি। তারাপাশা গ্রামখানি আজ প্রায় ৫০ বৎসর হইল পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। আছে শুধু অতীতের জনশ্রুতি।

তারপাশার মহাশয়গণ বিক্রমপুরের অন্যতম সমাজ প্রতিষ্ঠাতা বলিলেও ভুল হয় না। বহু কুলীন সন্তানকে ভঙ্গ করিয়া তাহারা বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে "মহাশয় উপাধি" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্তমানে আমরা স্যার উপাধিতে যাহা বুঝিয়া আসিতেছি মোঘল শাসনে "মহাশয়" উপাধিতে তাহাই বুঝাইত। দেশ হইতে রাজন্যবর্গ আসিয়া তারপাশা বাড়িতে থাকিয়া রাজকার্য, সমাজ, রীতি, প্রতিষ্ঠা শিক্ষা করিয়া যাইতেন। তারপাশার জনগণের নাম, যশ, দিল্লি দরবারের স্বয়ং সম্রাট পর্যন্ত অবগত ছিলেন সেই হেতু আমরা সম্রাটের খেলাৎ 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন।

স্বর্গীয় কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় তারপাশা মহাশয়গণের নিকট বঙ্গদেশের হিন্দু রাজন্যবর্গ রাজনীতি শিক্ষা করিতে আসিতেন। সময় হইতে হুক্কার মধ্যে কড়ি বাঁধা রীতি সম্ভব হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য ও শুদ্র এই বর্ণের রাজন্যবর্গ সর্বদা তারপাশা বাড়িতে থাকিতেন। কাহাকেও আসন ও জাতি বর্ণ্যের বলিয়া দিতে হইত না। ব্রাহ্মণের হুক্কা ছিল, ক্ষত্রিয়দের রৌপ্য, বৈশ্যের পাথরের এবং শুদ্রের জন্য পিতলের হুক্কার ব্যবস্থা ছিল। এই তামাকের প্রথা নরনারায়ণ দিল্লির রাজপুরুষ আচার আচরণ দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। সে সময় বিক্রমপুরের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তামাক সেবন করিতেন না। তামাক সেবন করিলে জাতি ও ধর্ম নষ্ট হয়, এই ভয়ে কেহ তামাক খাইতেন না। কিন্তু দেশের রাজন্যবর্গ দিল্লির পুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া

তাহাদের ব্যবহার, আদবকায়দা ইত্যাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। আজকালও বিক্রমপুর অঞ্চলে আইরস বলিয়া অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ চৌচালা ঘর, দালান, পুকুর দিঘি প্রস্তুত করিতে পারিতেন না। চৌচালা ঘর কেবলমাত্র নামাজ ও মসজিদের জন্য ব্যবহার ছিল। কাজি সাহেবগণ নামাজের জন্য ব্যবহার করিতেন, সেইজন্য লোক সাধারণের চৌচালা ঘর ব্যবহার, নবাব সরকার হইতে নিষিদ্ধ ছিল। এমন কি কেহ যদি ঝিকটি ঘর চৌচালা প্রস্তুত করিতেন, তবে কাজী সাহেব তাহাকে বিশেষ কঠোরভাবে শাসন করিতেন। অন্দরবাড়ি, বাহিরবাড়ি প্রথা, সে সময়ে তারপাশার মহাশয়গণ শিক্ষা দিয়াছিলেন ; আজ পর্যন্ত কালীপাড়ার বাবুগণের বাড়িতে কতকগুলি 'তারপাশা' প্রথা দৃষ্টিগোচর হয়। তারপাশা রায় মহাশয়গণের অস্তিত্ব অনেকদিন হয় অন্তর্হিত হইয়াছে ; কিন্তু তাহাদের আচার ব্যবহার এখন পর্যন্ত সমাজে পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। আজকাল আমরা অনেক তালুকদিগের বাড়িতে প্রজাদিগের বিবাহ, আনন্দ উৎসব ব্যাপারে খাদ্যদ্রব্য পাঠানোর ব্যবস্থা দেখিতে পাই, তাহাকে 'রাজভেট' বলা হয়, কারণ পূর্বে ভূস্বামিগণ প্রজার বাড়িতে স্বয়ং যাইতেন না ; কারণ প্রজার ঐশ্বর্য দেখিলে প্রবাদ ছিল, প্রজার ভাগ্যলক্ষ্মী অন্তর্হিত হয়। এই কারণে কোন ভূস্বামী প্রজার বাড়িতে যাইতেন না ; প্রজার সুখ শান্তির জন্য ভূস্বামী সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন।

তারপাশার রাজবাটির কয়েকটি অদ্ভুত নিয়ম ছিল, যথা,

(১) অন্তঃপুরচারিণী বধুর অল্প বয়স্ক ভ্রাতা আসিলেও তাহার বহির্বাটিতে অবস্থান করিতে হইত।

(২) পরিবারের উপনীত ব্যক্তির ব্রাহ্মণ মুহূর্তের অন্তঃপুরের (বাড়ির) বাহির হইতে হইত এক প্রহর রাত্রির পর অন্তঃপুরে যাইতে হইত।

(৩) বিবাহিত জীবনে পঞ্জিকার নির্দিষ্ট সময়ে অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার ছিল, অন্য সময় বহির্বাটিতে থাকিতে হইত। এই সব নিয়ম ব্যতিক্রম করিলে তাহাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইত।

নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজারাম দেখিলেন, তৎকালীন হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ দ্বারা সর্বদা শাসিত। কাঁচাদিয়া, বটেশ্বর, সাহাবাজনগর, চাচরপাশা প্রভৃতি সমাজের ব্রাহ্মণগণ সর্বদা তারপাশার ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, কারণ ইহারা ভুলুয়ার (নোয়াখালি) অন্তর্গত সপ্তসতি ব্রাহ্মণ। ইহারা বিক্রমপুর সমাজে সর্বদা হীনভাবে বসবাস করিতেছিলেন। এদিকে রাজপুরুষের অত্যন্ত পিয়ারের পাত্র বিবেচনায় পূর্বোক্ত সমাজের ব্রাহ্মণগণ মুখে তারপাশার সমাজের ব্রাহ্মণগণকে কিছু বলিতে সাহসী হইতেন না। ইহা লক্ষ্য করিয়া রাজারাম একটি স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিলেন।

রাজারাম স্বীয় উদ্যমশীলতা ও কৃতিত্বে অতুল সম্পত্তির অধিকারী ও নবাব সিরাজদৌল্লার একান্ত অনুগ্রহের পাত্র হইয়া বঙ্গদেশে নানারূপ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে লাগিলেন। দেবকার্য, দেবালয় ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠায় ইহারা বিশেষ আগ্রহ ছিল। ইহা ব্যতীত সমাজের গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি বাকলার পরগণা হইতে নৈকুষ্য ব্রাহ্মণগণকে আনিয়া কুলীন ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং নিজ এলাকায় এক একখানা দেবী ও বিশ দ্রোণ জমি যৌতুক দিকে আরম্ভ করিলেন। এরূপে প্রায় ৭০ জন কুলীন ভঙ্গ করিয়া রাজারাম তারপাশায় এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন, ইহা সাহাবাজনগর সমাজ অপেক্ষা বড় দ্বিজপল্লি বলিলে ভুল হইত না। কুলীনগণ তারপাশা সমাজে উচ্চ আসন পাওয়ায় সেকালে কাঁচাদিয়া সমাজের[১] নেতা কালীপাড়ার বাবুগণ মনে মনে বিপদ গণিলেন। এদিকে রোয়াইলের রায়গণ ও নৈকুষ্য কুলীনগণকে উচ্ছিষ্ট করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। কালীপাড়ার বাবুগণ দেখিলেন, বিক্রমপুরে মহাশয়গণ দ্বারা কুলীনগণ জাতিচ্যুত হইল ; কুলীনগণ মহাশয়গণের অনুগত হইয়াছে, তারপাশার সমাজের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, দেখিয়া বাবুগণ শিক্ষাবিস্তারে ব্যস্ত হইলেন।

আজ পর্যন্ত তারপাশা সমাজের বংশজ লোকদিগকে দেখিলে উহারা মনে মনে নোয়াখালির ব্রাহ্মণ বলিয়া উহাদিগকে কূট চক্ষে দেখে। কুলীনগণ দ্বারা তারপাশা সমাজ প্রতিষ্ঠিত, তাই বংশজগণ সর্বদা গৌরবান্বিত। সেকালে সপ্তসতি ব্রাহ্মণ বিক্রমপুর সমাজে আসিয়া ধর্মরক্ষার জন্য প্রাণপাত করিতেন। ত্রিসন্ধ্যা পাঠ না করিয়া কোন ব্রাহ্মণ জল গ্রহণও করিতেন না। সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণই মুণ্ডিত মস্তকের মধ্যস্থলে বড় বড় শিখার ন্যায় চুলের গুচ্ছ ধারণ এবং বার মাসে তের পার্বন করিতেন। তারপাশার মহাশয়গণ যে কোন নিমন্ত্রণ উপলক্ষে সর্বদা ব্রাহ্মণ সমাজে তারপাশায় মসলন্দ পাইতেন। আজ পর্যন্ত সেই প্রথা কান্দাপাড়া গ্রামে প্রচলিত আছে। আমরা মসলন্দ বিষয়টি সাধারণের অবগতির জন্য বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করিলাম। মহাসমারোহের সামাজিক ব্যাপারে তারপাশার মহাশয়গণ একসঙ্গে বসিয়া আহারাদি করিতেন। নোয়াখালি হইতে আগত তারপাশার সমাজভুক্ত, কুলীন ব্রাহ্মণ এবং একমাত্র রোসাকর ভট্টাচার্যের সন্তান ব্যতীত বংশজগণ নিমন্ত্রণ সভায় যে আসন পাইতেন তাহাকেই মসলন্দ বলা হইত। সমাজপতি হিসাবে যত জন মহাশয় আসিবেন, তাহাদিগকে সোনার নিমকদানী, রূপার থালা, গ্লাস, বাটি ইত্যাদিতে আহার্য প্রদান করিতে হইত। ছাতির নিচে, উচ্চাসনে বসিয়া ইহারা জলের পরিবর্তে দুগ্ধ দ্বারা প্রথম গণ্ডুষ করিতেন। মহাশয়গণ গণ্ডুষ করিলে কুলীনগণের আদেশে বংশজগণ গণ্ডুষ করিতেন। আহার শেষে মহাশয়ণ নূতন বাসনে আচমন করিতেন, ভূইমালী সেই নূতন বাসনের একমাত্র অধিকারী ছিল। সমাজের কোন লোকের কুলীনদের নিমন্ত্রণ করিতে হইলে সর্বপ্রথম মহাশয়গণের নিকট তজ্জন্য অনুমতি নিতে হইত। বৃন্দাবনও শিবপ্রাসাদের সন্তানগণ কোন বিবাহ উপলক্ষে গেলে তারপাশার সমাজের শ্রেষ্ঠ বলিয়া ষোল আনি বিদায় পাইতেন। সাহাবাজনগর সমাজের কুলীনগণ মধ্যে পাঁচ গাঙ্গুলি বংশ আত্মারাম এবং মুখোপাধ্যায় বংশের বিষ্ণুঠাকুরের সন্তানগণও ষোলআনী বিদায় পাইতেন।

মোঘল শাসন সময়ে তারপাশার মহাশয়গণের অনেক পাইক ছিল ; তাহারা দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং লাঠিখেলার অত্যাচারে বিক্রমপুরের অন্যান্য ভূস্বামিগণকে অস্থির করিয়া তুলিতেন। ইহারা একমাত্র নবাবের পক্ষের লোক ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করিতেন না।

ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে মহাশয়গণ অপরিমিত মদ্যপান ও কুল সম্বন্ধ করিয়া আজ দৈন্য দশায় উপস্থিত হইয়াছেন। এই বংশের শেষ পণ্ডিত, পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গীয় রসিকচন্দ্র রায় কবিরত্ন মহাশয়ের লিখিত অনেকগুলি অর্ধেক পার্সী এবং অর্ধেক বাংলায় লিখিত দলিল দস্তাবেদ দেখিয়াছি, তাহার পাঠ উদ্ধার করিতে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাহার কোনই উদ্ধার সাধন হয় নাই।

রসিকচন্দ্র রায় মহাশয় জীবিত থাকাকালে তাহার কলিকাতা ২৫ নং দর্পনারায়ণ ঠাকুর স্ট্রিটের বাড়ি হইতে উক্ত মহাশয়ের লিখিত তাহাদের বংশের একখানা ইতিহাস পাইয়াছিলাম। পরবর্তীকালে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের সহায়তা করিবে বিবেচনা করিয়া আমরা অতি কষ্টে তাহার পাঠ উদ্ধার করিয়া দিলাম।

ভারত ইতিহাসে বর্ণিত আছে গৌড় ও বঙ্গের অধীশ্বর মহারাজা "আদিশূর" যজ্ঞ নির্বাহের নিমিত্ত কান্যকুব্জ হইতে নানাশাস্ত্রে পারদর্শী পঞ্চ গোত্রীয় পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে নিজ রাজধানীতে আনয়ন করেন।

তাহারা ১) শ্রীহর্ষ, ২) ভট্টনারায়ণ, ৩) দক্ষ, ৪) বেদগর্ভ ও ৫) ছান্দড় নামে ভারতে প্রসিদ্ধ। বিক্রমপুরের 'রামপাল' নামক বল্লালের রাজধানীর বৃহৎ দির্ঘিকার উত্তর পার্শ্বস্থ মৃত শাল বৃক্ষ (যাহা রাজহস্তী বন্ধনে ব্যবহৃত হইত) উহাদের কৃত যজ্ঞের আশীর্বাদ শিরে সংস্থাপিত হওয়ায় তৎক্ষণাৎ জীবিত ও ফলপুষ্প পত্রে শোভিত হইয়া অতুল ব্রহ্মতেজের বিজয় পতাকা অদ্যাপি ভারত আকাশে উড্ডীয়মান করিতেছে। সেই পঞ্চ গোত্রীয় সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের ছিয়াম্নজন বংশধরগণকে এক একটি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়া আদিশূরের বংশধর ধরাধরশূর গৌড় ও

বঙ্গে স্থাপন করেন। উহাদের ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত গ্রামের নামানুযায়ী 'গাই' নির্বাচিত হয়। সুতরাং 'গাই' শব্দের অর্থ গ্রামীন তাই লিখিত আছে।

"পঞ্চ গোত্র ছিয়ান্ন গাই।
তাহা ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই"।

ইহারাই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া ভারতে প্রসিদ্ধ। ধরাধরশূরের পরবর্তী রাজা বল্লাল সেন, তৎকালীন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রিত করেন এবং স্বীয় উৎসর্গীকৃত স্বর্ণ ধেনু খণ্ড দান গ্রহণে লুব্ধ ও অনুরুদ্ধ করেন। যাহারা অস্বীকৃত হন তাহাদিগকে রাজ দণ্ডের ভীতি প্রদর্শন করা হয়।

যাহারা লুব্ধ বা ভীত হইয়া স্বর্ণ দান গ্রহণ করেন তাহাদিগকে প্রতিগ্রাহী বংশজ শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

যাহারা জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াও স্বীয় ধর্ম রক্ষা করিয়াছিলেন তাহাদের বংশ পরম্পরা অষ্টগুণ বিশিষ্টকে শ্রোত্রীয় ও নবগুণ বিশিষ্টকে কৌলিণ্য সম্মানে বিভূষিত করেন। সুতরাং তৎ সময় হইতে সম্যক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ, বংশজ, শ্রোত্রীয় এবং কুলিন এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যাহারা শ্রোত্রীয় শ্রেণীভুক্ত তাহারা পুষিলাল, অম্বুলী, সিমলাই, পালধি, পাকড়াশি ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শ্রোত্রীয় আখ্যা ধারণ করেন।

তারপাশার মহাশয় বংশের পূর্বপুরুষ সেই 'দক্ষ' হইতে সঞ্জাত। সুতরাং কাশ্যপ গোত্রীয় বটে।

দক্ষ পুত্র 'নীর' গৌড়ের অম্বুলী গ্রামবাসী বলিয়া অম্বলী গাই ছিলেন। তারপাশার মহাশয় বংশীয় ব্যক্তিগণ সেই নীরের বংশধর সুতরাং কাশ্যপ গোত্রীয় অম্বুলী শ্রোত্রীয় নামে পরিচিত।

ভাগ্যবান পুরুষগণের নাম উল্লেখ সময়ে তারপাশায় মহাশয় বংশের আদিপুরুষ স্বর্গীয় নরনারায়ণের নাম বিক্রমপুর বাসিগণের হৃদয়ে গৌরব গরিমা আবির্ভূত হইয়া শ্রদ্ধার মন্দাকিনী নয়নে প্রবাহিত হয়। উহার জীবনী অভাবনীয় বিবিধ ঘটনা বৈচিত্রে রঞ্জিত ও পরিপূর্ণ। কাজেই উহার সঠিক ঘটনাবলী সবিস্তার লিপিবদ্ধ করা গেল। ইহা অভ্যোন্নতি কামী ব্যক্তিগণের একটি আলোচনার সামগ্রী সন্দেহ নাই।

মুর্শিদাবাদ নবাব প্রাসাদের সন্নিকটস্থ মতিয়া ঝিল নামক যে জলাশয় বর্তমান রহিয়াছে উহার অতি নিকট "নন্দনপুর" নামে একটি ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ পল্লি ছিল। বর্তমানে উহা ম্যালেরিয়ার প্রকোপে লোকবাস লুপ্ত হইয়া অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। তত্রত্য নবাবের রাজত্বকালে উহার পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ জন সমাগমে সর্বদা মুখরিত থাকিত।

নন্দনপুর পল্লিতে, পরম ধর্মপরায়ণ শম্ভুনাথ রায় নামে অম্বুলী বংশীয় ও অম্বলী গ্রাম হইতে নবাগত জনৈক সাধক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাহার রামেশ্বর ও নরনারায়ণ নামে দুই পুত্র ছিল। রামেশ্বর বাংলা ও পার্শীভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শম্ভুনাথের সংসারে দিন দিন ঔদাসিন্য দর্শন করিয়া, গ্রামস্থ স্বজাতীবর্গ নবাব সরকারে চেষ্টা করিয়া রামেশ্বরকে চাকরি করিয়া দেন। রামেশ্বর প্রাণপণে স্বকার্যে মনোযোগ প্রদান করিয়া উত্তরোত্তর কার্যে উন্নতি লাভ করিয়া আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনে সক্ষম হন। কিন্তু কনিষ্ঠ সহোদরের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে না পারায় তদ্বিষয়ে হতাশ হইয়া পড়েন। ক্রমে সরকারি কার্যের চাপে ভ্রাতার শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগের অভাবে উহার সময়ের অল্পতা নিবন্ধন নরনারায়ণের মন শিক্ষা অপেক্ষা সঙ্গীতের দিকে অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

শম্ভুনাথ ও তৎপত্নী কালগ্রাসে পতিত হইলে রামেশ্বর পিতৃমাতৃহীন ভ্রাতার প্রতি আর তাড়না না করিয়া, পিতৃমাতৃ শোক বিদুরিত করিবার অভিপ্রায়ে সমধিক স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। উহাতে নরনারায়ণের সঙ্গীত শিক্ষার বিশেষ সুযোগ ঘটিল। তিনি কতিপয় বৎসর মধ্যে একজন ওস্তাদ হইয়া উঠিলেন। সংসারে উন্নতিকল্পে তাহার দ্বারা কোনও সহায়তা হইত না, প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিয়া কোনদিন বা তৎপূর্বেই বাটি হইতে বাহির হইতেন দ্বিপ্রহর বা

তৃতীয় প্রহর সময়ে বাড়িতে প্রত্যাগমন করিয়া আহার কার্য ত্রস্তভাবে নির্বাহ করিয়া পুনঃ গৃহত্যাগ করিতেন।

দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতে লাগিল কিন্তু নরনারায়ণের আর কোনও পরিবর্তন ঘটিল না।

কিন্তু নরনারায়ণের ঐকান্তিক ভ্রাতৃ ভক্তি ও সত্যনিষ্ঠা বশত ঐ সকল দোষ তাহার ভ্রাতার ভ্রাতৃ স্নেহের কোনই লাঘব করিতে সক্ষম হইল না বটে কিন্তু ভ্রাতৃবধূর মনে ক্রমে ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত করিতে লাগিল। ক্রমে বাটির পরিচালিকার সাহায্যে ভ্রাতৃবধূ তাহার স্বামীর মনে গরল ঢালিতে শুরু করিয়া দিলেন।

রামেশ্বর অতি সুবোধ ও ভ্রাতৃ বৎসল ছিলেন ঐ সকল চেষ্টা তাহার নিকট সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইতে লাগিল।

বিষধর সর্প যেমন দংশনের সুবিধা না পাইলে দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে ভ্রাতৃবধূর অবস্থাও দিন দিন তেমন ভীষণ হইতে ভীষণতর ও অবশেষে ভীষণতম হইয়া দাঁড়াইল। একদা নরনারায়ণ দ্বিপ্রহরে বাড়ি ফিরিয়া যথারীতি স্নানাহ্নিক সম্পন্ন করিয়া আহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। বাড়িতে বধূঠাকুরাণী কি পরিচারিকাটির কোন সাড়া পাইলেন না ; আহার্যের আবরণ উদ্‌ঘাটন করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাহার হৃদয়ে অপমানানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নয়ন যুগলে বিষাদ সলিল দৃষ্টি রুদ্ধ করিল। চরণদ্বয় বাত্যাহত কদলী পত্রের ন্যায় তরতর কাঁপিতে লাগিল। অস্ফুট স্বরে মনের অজানাভাবে উচ্চারিত হইল বৌঠাকরুণ তুমি হিন্দুর মেয়ে, এই কি তোমার কর্তব্য জ্ঞান? কোন্ প্রাণে,—কি সাহসে তুমি পিতৃমাতৃহীন দেবরের, আহার্যের উপর ধৌত অঙ্গার রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে? মা'র অভাবে তোমাকেই মার মত দেখিয়াছি। দাদা—দাদা—দেখ এসে তোমার স্নেহের—অতি স্নেহের নরনারায়ণের কি অবস্থা—চলিলাম—আর জীবনে তোমার চরণ দেখিতে পাইব না। আজ বিদায় জন্মের তরে বিদায়! বলিতে বলিতে নিঃশব্দে দ্রুত পদে এক বস্ত্রে চিরতরে গৃহত্যাগ করিলেন।

বৈচিত্র এ সংসারের নিত্য পরিণাম,
শুভাশুভ কর্মোৎপত্তি কারণোপাদানে,
ফলিত ঘটনাপটে ঘটে অবিরাম,
জ্ঞানগুণ অভিমানে অঞ্জন অঙ্কনে।। "পদ্যকাদম্বরী"

যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে তৎকালে কলিকাতা নগরী এরূপ অগণিত অট্টালিকাপূর্ণ ও জনসমাকীর্ণ ছিল না। অতি দূরে দূরে মাঝে মাঝে ভদ্রলোকের বাস ছিল। ইহার কোন দ্বিতীয় অট্টালিকার গবাক্ষ হইতে গৃহকর্ত্রী, শিব পূজার অবসানে ফুল জল নিম্নে অসতর্কিত অবস্থায় ফেলিয়া দিলে উহা ভূমি সংলগ্ন খোলা দাবায় শায়িত, একটি ক্ষুদ্র পিপাসাতুর সংজ্ঞাহীন ব্রাহ্মণের শরীরের উপর পতিত হয়। গৃহকর্ত্রী লোক মুখে অবগত হইয়া নিজকে অত্যন্ত অপরাধিনী মনে করিয়া তাড়াতাড়ি তৎস্থলে উপনীত হন। এবং তাহাকে নানারূপ পরিচর্যায় সংজ্ঞা লাভ করাইয়া অনেক অনুনয় বিনয় ও বারংবার প্রণামাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া কৃতকার্যের ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই ব্রাহ্মণ সেই নরনারায়ণ! নরনারায়ণ চক্রবর্তী সুস্থ হইয়া গৃহকর্ত্রীর কোনও অপরাধ হয় নাই বলিয়া সুখী ও আশ্বস্ত করেন কিন্তু বলেন এই হতভাগ্য ব্রাহ্মণকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়া আমার যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছেন কারণ দুর্ভাগা জীবনে মৃত্যুই শান্তি।

নরনারায়ণের এই কাতরুক্তি শ্রবণে তাহার এত কি ভয়ঙ্কর দুঃখের কারণ আছে জানিতে দয়াময়ী গৃহকর্ত্রীর অবলা সুলভ করুণাময় হৃদয় ভরিয়া গেল ও একান্ত কৌতূহল জন্মিল। বারংবার অনুরোধে অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া কহিলেন ব্রাহ্মণ, যদি ভগবৎ ইচ্ছায় এই তৃতীয় প্রহরের সময় ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর, হইয়া আমার দ্বারে উপনীত হইয়াছ যদি তুমি আমার কথামত এখানে স্নানাহার করিয়া আমাকে গৃহস্থের কর্তব্য পালনের সুযোগ দান কর তবে আমি তোমার

নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তোমার কোন আর্থিক কষ্টভোগ করিতে হইবে না। কারণ আমাকে ভগবান অর্থের অভাবে রাখেন নাই কিন্তু জনেরই অভাব।

আমার একটি মাত্র ছেলে ও ছেলের বউ আর আমি। দুদিন পরে আমাদের এসবই পরে খাবে। ছেলে চট্টগ্রামে চাকরি করে, বৌমা আর আমি এখানে থাকি। তা যদি হাতে ধরে ব্রাহ্মণের জন্য কিছু করিতে পারি পরকালের কাজ হবে।

নরনারায়ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক গদ্ গদ্ কণ্ঠে অশ্রুপূর্ণ নয়নে গৃহকর্ত্রীর পানে তাকাইয়া কহিলেন আপনার কথা মার মত স্নেহগাথা। আপনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। আমি ছেলের মতন আপনার স্নেহনীড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

ব্রাহ্মণবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া গৃহস্ত্রী নরনারায়ণকে স্নানাহারের ব্যবস্থা করিয়া আশ্রয় দান করিলেন। তাহার সত্যপ্রিয়তা ও অমায়িকতা গুণে প্রীতা হইয়া তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

কতিপয় দিনে নরনারায়ণের বিমল চরিত্রের পরিচয় পাইয়া গৃহকর্ত্রী উহার যাবতীয় ঘটনা পুত্রের নিকট লিখিয়া উপসংহারে লিখিলেন, "এই দেবতুল্য ব্রাহ্মণকে আমি আশ্রয় দিয়াছি, যদি তুমি ইহাকে অতি সত্বর বিশিষ্ট লোকের ন্যায় অবস্থাপন্ন না করিয়া দেও, তোমার জল পিণ্ড আমার ভোগাধিকারে আসিবে না।"

তৎকালে লোকের মাতৃভক্তি জগতে আদর্শ স্থান অধিকার করিত, মায়ের এই আদেশলিপি শিরে ধারণ করিয়া পুত্র অঙ্গীকার লিপিসহ নরনারায়ণ চক্রবর্তীকে চট্টগ্রাম প্রেরণের অভিপ্রায় জানাইলেন।

সে সময়ে নবাবের এক একটি বিভাগীয় একটি প্রধান কর্মচারীর হস্তে দেওয়ানি ফৌজদারি প্রভৃতি যাবতীয় কর্মভার ন্যস্ত থাকিত। গৃহকর্ত্রীর মাতৃভক্ত পুত্র চট্টগ্রামের সে পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বর্তমান নোয়াখালি জিলার কার্য ও চট্টগ্রামের বিভাগীয় প্রধান কার্যকারকের অধীনে ছিল। নরনারায়ণ চট্টগ্রামে আনীত হইলেন। তাহার শিক্ষা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া বিভাগীয় কার্যকারকের মনে বড়ই দুঃখ উপস্থিত হইল, ভাবিলেন ইহাকে বাঙলা ও পার্শী ভাষায় এবং জমিদারী সংক্রান্ত কার্য নির্বাহ হইবে না ; সুতরাং বিশেষ তাড়না করিয়া উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলেন।

নরনারায়ণ ভ্রাতৃবধূ হইতে লাঞ্ছিত হওয়ার পর সঙ্গীত শিক্ষা অপেক্ষা মানুষ হওয়ার দিকে বেশি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। শিক্ষার সময় উহাতে তাচ্ছল্য করিয়া অবশেষে অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। এই সুযোগ পাইয়া প্রতিপালকের তাড়না বালকের ন্যায় সহ্য করিয়া পূর্ণ উদ্যমে তাহাকে শিক্ষা বিষয়ে সন্তোষ দান করিতে লাগিলেন।

বিভাগীয় কার্যকারক তাহার সত্যপ্রিয়তা, নম্রতা এবং বিদ্যানুরাগ দর্শনে চমৎকৃত হইলেন।

কতিপয় বৎসরান্তে তাহাকে কার্যক্ষম মনে করিয়া নবাব সরকারে তাহার অধীনে কার্যে নিযুক্ত করিলেন।

নরনারায়ণ কিছুদিনে যোগ্য কর্মচারী মধ্যে পরিগণিত হইলে প্রতিপালকের মনে অনির্বচনীয় আনন্দের উদ্রেক হইল ; মাতৃবাক্য পূর্ণ মাত্রায় প্রতিপালনের সুযোগ সুবিধা খুঁজিতে লাগিলেন।

নরনারায়ণের আর একটি গুণ ছিল, কাছারি হইতে সকল আমলাবর্গ চলিয়া গেলে, প্রতি সেরেস্তার কাগজপত্র কোথায় কি অনতর্কীতভাবে পড়িয়া আছে, তাহা একত্রিত করিয়া নিজের নিকট অতি সাবধানে রাখিয়া দিতেন, উহাতে অনেক পরিমাণে ভাগ্যচক্রের দ্রুত পরিবর্তন করিয়া দিল।

একদা বিভাগীয় প্রধান কার্যকারক নবাব সরকারের অতি প্রয়োজনীয় কাগজ হারাইয়া নিজের চাকরি ও মানরক্ষা বিষয়ে নিজকে অত্যন্ত বিপন্ন মনে করিলেন। নোটিশ দিয়া ঘোষণা করিলেন যে "এই কাগজ যে উপস্থিত করিতে পারিবে, তাহার নিকট তিনি চির কৃতজ্ঞতাপাশে

আবদ্ধ থাকিবেন, ও যথাশক্তি পারিতোষিক প্রদান করিবেন", কিন্তু কিছুতেই কাগজ মিলিল না। তখন তিনি গুরুতর চিন্তায় উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। সে সময়ে একদিন সহসা কে যেন স্মরণ করাইয়া দিল "নরনারায়ণের দপ্তর ভালরূপে অনুসন্ধান কর,—বিপদ কাটিয়া যাইবে।" তখন কাছারির সকল আমলা বাসায় চলিয়া গিয়াছে, একমাত্র নরনারায়ণ উপস্থিত। অমনি তাহার স্তূপাকার সঞ্চিত কাগজ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিলেন। ভগবানের চক্রে তাহার সেই কাগজ সাগর হইতে অমৃত কল্প সেই দলিল তাহার দৃষ্টি পথে পতিত হইল। জগদীশ্বরের অপার করুণার জন্য নয়নে প্রেমাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। নরনারায়ণকে তাহার পরম বান্ধব মনে করিলেন ; কিন্তু তাহার নিকট সে ভাব অব্যক্ত রাখিলেন।

দৈবের অপার লীলা অপার মহিমা! ভাবিলে মানব বুদ্ধিও অধ্যবসায় বিফল হইয়া যায়!

বর্তমান নোয়াখালি জিলার অষ্ট হাজারি পরগণার মাজুলি জমিদারগণ নবাবের মালগুজালি আদায়ে শৈথল্য করিয়া নয় বৎসরের খাজনা বাকি ফেলিয়া রাখায় তৎসময় নবাব সরকার তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া চট্টগ্রামের বিভাগীয় প্রধান কার্যকারককে, পরগণা অতি সত্বর অন্যত্র পত্তন করিতে আদেশ প্রদান করেন, তখন প্রধান কর্মচারী নিজ হইতে, সেই নয় বৎসরের খাজনা ও নবাবের উপযুক্ত সেলামী প্রদান করিতে মনে স্থির করিয়া নরনারায়ণের নামে সেই জমিদারি বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত রিপোর্ট করেন, এবং নরনারায়ণের ভাগ্যবশে সেই রিপোর্টানুযায়ী কার্য করিবার নিমিত্ত নবাবের আদেশ সমাগত হয়। প্রধান কার্যকারক আদেশ পাওয়া মাত্র নরনারায়ণ চক্রবর্তী নামে উক্ত ভুলুয়ার অষ্ট হাজারি পরগণা বন্দোবস্ত দিলেন। তদবধি নরনারায়ণ চক্রবর্তী অষ্টহাজারি পরগণার জমিদার হইলেন।

সহসা এই ভাগ্য পরিবর্তিত হইলেও নরনারায়ণ সেই প্রতিপালকের নিকট পূর্ব্ববৎ অনুগত থাকিয়া তাহার পরামর্শ মতে জমিদারির কার্য পরিচালন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। নবাব পক্ষের সহায়তায় উহা অতি সুন্দররূপে সুশাসিত হইতে লাগিল।

নরনারায়ণ জমিদার হইয়াও সেই প্রকার নির্বিকারভাবে চলিলেন, কাজেই কতিপয় বৎসর মধ্যে প্রভূত ধনের অধিকারী হইলেন। তখন প্রধান কর্মচারী 'শ্যামপুর', 'সিঙ্গাইর' পরগণা ও ঐ প্রকার খরিদ করিয়া দিয়া নরনারায়ণকে একটি বড় জমিদার করিয়া দিলেন। দিন দিন অজস্র অর্থ সঞ্চিত হইতে লাগিল। তখন নরনারায়ণকে উপযুক্তরূপে বিবাহের অনুষ্ঠান করিয়া বিভাগীয় প্রতিনিধি সম্পূর্ণরূপে মাতৃ আদেশ প্রতিপালনে সক্ষম হওয়ায় নিজকে ধন্য মনে করিলেন।

আজগাম যদালক্ষ্মী নারিকেল ফলাম্বুবৎ।
নির্জগাম যদালক্ষ্মী করি ভুক্ত কপিথ্যবৎ।।

(৩)

নরনারায়ণ চক্রবর্তী এত বয়স পর্যন্ত অদীক্ষিত ছিলেন তাই পৈত্রিক কুলগুরু বাহাদুরপুরের গোস্বামী প্রভুকে আনয়ন করাইয়া মহাসমারোহে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং প্রভুর ভদ্রাসন বাহাদুরপুরের বাটি অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া সর্বপ্রকার আর্থিক অভাব মোচন করিয়া দিলেন।

কোষাগারে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হইতেছিল। ক্রোড়াধিক টাকা সঞ্চিত রাখিয়া অষ্ট হাজারি পরগণা বন্দোবস্ত সময়ে বিভাগীয় চট্টগ্রামের প্রধান কার্যকারক যে অর্থ দিয়াছিলেন, তাহার সেই সমস্ত টাকা পরিশোধ করিলেন এবং প্রতিপালকের মাতৃশ্রাদ্ধ সময়ে নিজে উপস্থিত হইয়া লক্ষাধিক টাকা দান করিয়াছিলেন।

অতি অল্পকাল মধ্যেই পঞ্চ হাজারি প্রভৃতি অন্যান্য পরগণা খরিদ করিয়া জমিদারি ক্রমেই বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

বিভাগীয় কর্মচারী বার্ধক্য নিবন্ধন চট্টগ্রাম হইতে কার্যে অবসর গ্রহণ করিলে নরনারায়ণ

নিজকে বন্ধুহীন মনে করিয়াছিলেন। তাহার জীবিতকাল পর্যন্ত তাহাকে অযাচিতভাবে অর্থ প্রদান করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেন।

কিছুদিন পরে নরনারায়ণের 'রাজারাম' নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

পুত্রের বাংলা ও পার্শী ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন। সময়ে রাজারাম দুই ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিলেন। মহাসমারোহে ইন্দিরা নাম্নী পরম লাবণ্যবতী নবম বর্ষিয়া কন্যার সহিত পুত্রোদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর পুত্রসহ জমিদারি পর্যবেক্ষণ করিয়া গ্রামে গ্রামে দিঘি পুষ্করিণী খনন করিয়া জল কষ্ট নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং নিঃস্ব অসংখ্য ব্রাহ্মণ প্রজাগণ বিত্ত ব্রহ্মোত্তর ও প্রজার পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধে অর্থ প্রদান করিয়া যথেষ্ট পুণ্য ও যশঃ অর্জন করিতে লাগিলেন। অদ্যাপিতদ্দেশের ব্রাহ্মণ গৃহে তাম্রফলকে খোদিত পারস্য ভাষায় কোন কোন লিখিত ব্রহ্মোত্তর দলিল নরনারায়ণের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

নরনারায়ণ এতকাল শুধু অবস্থার উন্নতি কল্পে অবিরত পরিশ্রম ও মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন কিন্তু নিজ ভদ্রাসন বাটি অবস্থানুযায়ী নির্মাণের দিকে মাত্রই লক্ষ্য করেন নাই। প্রবাস বাটির ন্যায় বাস গৃহেই জীবনের দীর্ঘকাল কর্তন করিলেন। একদিন তাহার সে বিষয়ে চিন্তা আকৃষ্ট হইলে প্রধান প্রধান কর্মচারীগণকে এবং বিষয় কার্যে মহা বিচক্ষণ পুত্র রাজারামকে ডাকাইয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সর্বসম্মতি ক্রমে স্থিরিকৃত হইল, যে নিজ জমিদারি মধ্যে শ্যামপুর পরগণার অন্তর্গত জিলা ঢাকার অন্তঃপাতী বিক্রমপুর তারপাশা মৌজা অতি সুযোগ্য স্থান। উহা অধিকাংশ স্থলই 'তারা' জঙলে সমাকীর্ণ বলিয়া 'তারবাসা' রূপান্তরে তারপাশা নামে পরিণত হইয়াছে। তারাবন অতি সহজ চেষ্টায় আবাদ হইতে পারিবে এবং পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠস্থল বিক্রমপুরে রাজপ্রসাদ তুল্য সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণ সমাজ সংস্থাপিত করিলে, উহা অতি গৌরবের কার্য হইবে।

শুভদিনে পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনে বদ্ধপরিকর হইয়া রাজারাম বহু অর্থ ও লোকজন সমভিব্যহারে তারপাশা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে অভিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইয়া স্থানের অবস্থা দর্শনে পরম উৎসাহ ও আনন্দ উপভোগ করিলেন। বহু লোক জঙলাবাদে নিযুক্ত হইল।

(৪)

তারপাশার পূর্ব সীমা চর তারপাশা দক্ষিণ সীমা কাঁচাদিয়া পশ্চিম সীমা বটেশ্বর। উত্তর সীমা বারমাস স্রোতবহী বহু প্রশস্ত বিশুদ্ধ সলিলা খাল। বারমাস নৌকাপথে নানা দিকে চলাচলের এবং মালামাল আমদানির বিশেষ সুবিধা আছে। ঐ খাল দ্বিপ্রহরের পথ ব্যবধান পশ্চিমে পদ্মা নদী হইতে উদ্ভুত হইয়া বরাবর পূর্ব দিকে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। উক্ত খালের উত্তর পারে পশ্চিম দিকে মেদিনীমণ্ডল তৎপূর্বে যথাক্রমে কালা সাদা, ইছাপাশা, বাজপুর, উয়ারি, কোমরপুর, ভাওয়াল। তারপাশার দৈর্ঘ পূর্বে পশ্চিমে প্রায় চারি মাইল ; উত্তর দক্ষিণে প্রশস্থ তিন মাইল। উহার স্থান সমূহ সমতল। তারাবনে কাঠ বিড়াল, শৃগাল ও নেকড়ে বাঘের আবাস স্থল ছিল।

তারপাশা মৌজা দুই ভাগে বিভক্ত ; পশ্চিম তারপাশা ও তারপাশা মধ্যভাগে ছোট প্রান্তর। তারপাশার সমস্ত ভুমি আবাদ কার্য শেষ হইলে রাজারাম তারপাশার খাল ধার হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত বাটির সীমা নির্ধারণ করত উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব তিন দিকে দির্ঘিকা ও বাটির তিন দিকে বৃহদায়তনের পরিখা খনন করাইলেন। দক্ষিণে অতি উচ্চ সিংহ দ্বার ও চৌদিক অতি উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত করিয়া ভিতরে চারি মহল রাজপ্রাসাদ তুল্য মনোরম অট্টালিকা নির্মাণ ও বাটির দক্ষিণে বাজার সংস্থাপিত করিলেন।

তৎকালে পদ্মার দক্ষিণপার রাজনগরের রাজা রাজবল্লভের বাটি ও তারপাশার এই

অট্টালিকা পূর্ববঙ্গের আদর্শ দৃশ্য ছিল। এই দুই কীর্তি পদ্মা ধ্বংস করিয়া কীর্তিনাশা নামে অভিহিত হইয়াছে।

পরম পিতৃভক্ত পুত্র রাজারাম একান্ত উৎসাহে নিজ ভদ্রাসন নির্মাণ কার্য সমাধা করিয়া সপরিবারে পিতামাতাকে আনিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। সপরিবারে শুভদিনে অত্রত্য সকল আসবাব জিনিষাদি সহ বৃদ্ধ পিতাকে নিয়া যাত্রার সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন, কিন্তু সহসা নরনারায়ণ সন্ন্যাস রোগে ভবলালী সাঙ্গ করিয়া অশীতিবর্ষ বয়সে প্রজাগণকে শোক সাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

রাজারাম পিতৃশোকে আত্মহারা হইলেন। তারপাশায় সপরিবারে যাওয়ার প্রাণের এই উদ্দীপ্ত আকাঙক্ষা পিতৃ বর্তমানে কার্যে পরিণত করিতে পারিলেন না, চিরতরে এই দুঃখ হৃদয়ে রহিয়া গেল।

অনন্তর পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য যথাশক্তি সম্পাদন করিয়া সপরিবারে তারপাশা নব ভদ্রাসনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তৎ সময়ে কতিপয় ব্রাহ্মণকে নোয়াখালি হইতে সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে[২] রাজদীয়া (বিক্রমপুর) নিবাসী কালীচরণ তর্কালঙ্কারের প্রপিতামহ আসিয়াছিলেন। ক্রমে তারপাশা গ্রাম নানা বিষয়ে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া সুপ্রসিদ্ধ হইতে লাগিল।

তারপাশা নবালয়ে প্রবেশের অতি অল্পকাল মধ্যেই সর্ব সুলক্ষণ সম্পন্ন মহাভাগ্যবান রামদেব রায় নামে রাজারামের কৃতবিদ্য এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহার জন্মাবধি জমিদারি অনেক বর্ধিত এবং ধনাগার অজস্র অর্থে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তারপাশায় নিবিড় তারাবনের দক্ষিণাংশে দুই তিন ঘর ব্রাহ্মণ এবং কতিপয় অন্য শ্রেণীর লোকের বসত বাটি ছিল।

বর্ণিত ব্রাহ্মণগণ মধ্যে "গোষ্ঠীপতি" নামক একজন শ্রোত্রীয় ছিলেন। রাজারাম উহার একটি পরমাসুন্দরী সুলক্ষণা কন্যার সহিত মহা আড়ম্বরে রামদেবের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সেই সুলক্ষণা কন্যার শ্বশুরগৃহে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল উন্নতি হইতেছিল, কাজেই এই পুত্রবধূ পরিজন ও আত্মীয়বর্গের এবং শ্বশুরের অতি আদরের পাত্রী হইয়া উঠিলেন। তত্রত্য লোকের ধারণা ছিল এই নববধূ কমলা প্রকৃতই কমলারূপে গৃহে আগমন করিয়াছেন। প্রতি সন মাঘী সপ্তমী উপলক্ষে "তপার" ঘট স্থাপন করিয়া যে সূর্যের পূজা দেওয়া হয় উহা সর্বত্রই মাঘী সপ্তমী পূজা নামে অভিহিত কিন্তু গোষ্ঠীপতি বাড়ির পূজার বিশেষত্ব ছিল। বর ও কনে দুই ঘটে হিন্দুর বিবাহ পদ্ধতিতে বিবাহ, মুখচন্দ্রিকা ইত্যাদি হইত। পরদিন বাসী বিবাহ অন্তে অপরাহ্নে আশেপাশের গ্রামস্থ সকল মেয়ে উপস্থিত হইয়া মৎস্য, সিন্দুর, হলুদ ইত্যাদি আয়স্ত্রীর জিনিষাদি তণ্ডুল বিনিময়ে কিনা বেচা করিত। কলিকাতার 'বৌ' বাজার মাত্র নামেই কিন্তু এই বৌবাজার প্রকৃত এখানে ছিল। উক্ত তপার হাটের খরিদা সিন্দুর ও মৎস্যাদি যে সধবা কিনিয়া না আনিবে, এবং মৎস্য ভক্ষণ না করিবে তাহার আয়স্ত্রী খসিয়া পড়িবে ইত্যাকার ধারণা হিন্দু ললনাগণের হৃদয়ে দৃঢ় বদ্ধমূল ছিল। মেয়ের বিয়ে হয় না, এই হাটে মানসিক করিয়া গড়াগড়ি দিলে অতি অল্প দিন মধ্যেই তাহার বিবাহ হইয়া যাইত। বহুস্থলে উহা ফলিয়া যাওয়ায় উহা প্রত্যক্ষ দেবতার হাট বলিয়া তত্রত্য লোকে বিশ্বাস করিত। নববধূ শ্বশুর মহাশয়কে আব্দারে বাধ্য করিয়া পতিগৃহে সেই "তপাব্রত" ও এই বরের হাট প্রতিষ্ঠা করিলেন। তারপাশার শেষ অস্তিত্ব পর্যন্ত মহাশয় বাটির এই ক্রিয়া মহা আড়ম্বরের সহিত নির্বাহ হইত এবং বর্তমান বংশধরগণের কান্দাপাড়া বাড়িতেও ঐ উভয় বাটির "মেয়ে হাট"—বর্তমান আছে।

অনন্তর রাজারামের "সুন্দরী" নামে একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

উক্ত কন্যা নবমবর্ষে পদার্পণ করিলে রাজারামের কুলীন সমাজ সংস্থাপন বিষয়ে পিতৃ-আদেশ মনে জাগিয়া উঠিল। ফুলিয়ামেলের শ্রেষ্ঠতম বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয় কুলীন "রমাকান্তের" সন্তান রাজিবের সহিত স্বীয় কন্যার উদ্বাহ ক্রিয়া বহু ধুমধামের সহিত সমাপন করিলেন। স্বর্ণ

রৌপ্য বহু তৈজসাদির সহিত সতের সের ধান্য পরিমাপের বৌটার (ধামার) চৌদ্দ বৌটা টাকা যৌতুকরূপে বিবাহ সভায় উপস্থাপিত হইয়াছিল। বিবাহের পর দিন কন্যা স্বামী পক্ষীয় লোকের প্ররোচনায় একটি কাণ্ড করিলেন।

রাজারাম. স্বীয় পুত্রসহ অমাত্য আত্মীয় ও বহুলোকজনে বেষ্টিত হইয়া যখন সভায় বসিয়াছিলেন, তখন বিবাহের পরিধেয় বস্ত্র ও হেম রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া কন্যা একটি দাসী সঙ্গে ত্রিতল দরবার গৃহে উপস্থিত হইলেন। পিতৃ ক্রোড়ে সহসা উপবেশন করিয়া, অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। রাজারাম অতি আদরের সহিত অশ্রু জল মোচন করিয়া, ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কন্যা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিলেন "বাবা আমি রাজার মেয়ে তুমি কোন্ প্রাণে আমাকে বিদেশী দীন দরিদ্রের ঘরে সপে দিলে।"

সভাস্থ সকলে আশ্চর্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন এত মেয়ের কথা নয়, বর পক্ষীয় কোন বুদ্ধিমান লোকের বাক্যের পুনরুক্তি মাত্র। রাজারামেরও উহা বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু ভাবিলেন কথাটি ঠিক। অমনি সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন, "তোমার কোন চিন্তা করিতে হইবে না, আমি আমার বাটির পূর্বদিকে তোমার থাকিবার উপযুক্ত বাটি প্রস্তুতের আদেশ দিয়াছি। তোমাকে ফুলিয়া গ্রামে যাইয়া থকিতে হইবে না ; আর আমার জমিদারির যে কোন স্থল হইতে ঘোড়া ছাড়িয়া যতদূর ঘোড়া না থামে তত মৌজা তোমাকে ভূসম্পত্তি দান করিব।" তখন হাসিভরা মুখে কন্যা বিদায় হইল।

তৎপর বর্তমান "নোয়াখালি" জিলার রামগঞ্জ থানাধীন সুন্দরপুর, রাজিবপুর ও ফতেপুর এই তিন মৌজা জামাতা রাজিব ঘোড়া দৌড়িয়া অধিকার করিলেন যাহার তৎকালে ৯ টাকা মাত্র সদর খাজানা ও ৯০০০্ হাজার টাকা মুনাফা ছিল। বর্তমানে সেই সম্পত্তির আয় নব্বই হাজার টাকারও অধিক। উক্ত মৌজাদ্বয় কন্যা সুন্দরীর নামে "সুন্দরপুর" জামাতা রাজিবের নামে "রাজিবপুর" আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল।

নানাবিধ সৎকার্যে দেশের উন্নতি কল্পে ও জনসাধারণের শিক্ষা ও ঔর্দ্ধদৈহিক কার্যে অকাতরে ধন দান করিতেন। রামদেব রায় মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে বহু স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন ও লোকজন সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পার্শি ভাষায় বক্তৃতা করিয়া রাজভক্তি প্রদর্শন করিলেন। অতি অল্প বয়সে এরূপ কৃতবিদ্য জমিদার তৎসময়ে অতি অল্প ছিল। নবাব তাহার সুকুমার কান্তি নম্রতা ও উদারতা দর্শনে প্রীত ইয়া কহিলেন তুমি "মহাশয়" ব্যক্তি। আমি তোমাকে বংশ পরম্পরা এই উপাধিতে ভূষিত করিলাম।

তৎক্ষণাৎ নবাবের সেই উপাধি খেলাৎ প্রদত্ত হইল।

রামদেব নারায়ণ মহা সন্তোষের সহিত উপাধি গ্রহণ করিয়া তারপাশায় উপস্থিত হইলেন, তদবধি রামদেব নারায়ণ রায়ের বংশধর "মহাশয়" নামে প্রসিদ্ধ।

গীত[৩]

দেখরে তারপাশা মোদের কতবা গৌরবের ছিল
আমাদেরি কর্মফলে নালে খালে ভেঙে নিল।।
তারপাশাতে তিন মুখুয্যা
তারপাশার "মশায়" আনিল,
আর যত কুলীন কত
আনিয়া স্থাপিত করিল।
বিধি প্রতিবাদী হয়ে বিত্ত ভূমি আগে নিল,
(এমন) সদাশয় তারপাশার "মশায়"
রামচন্দ্র বনে চলিল।

প্রবীন ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত আনন্দনাথ রায় মহাশয় বলেন—তারপাশার মহাশয়গণের অধঃপতনের পর তদীয় স্থাপিত কুলীন ও সাহাবাজনগর বেঘে সমাজের ব্রাহ্মণ কুলীনদের অবস্থা দেখিয়া, একমাত্র সমাজ সমাজ রক্ষার জন্য বিক্রমপুরে কাহার না প্রাণ কাঁদিয়াছিল? তিনি আজীবন সমাজ সংস্কারকরূপে বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ সমাজে বিখ্যাত ও প্রাতঃস্মরণীয়।

স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ ঘোষ প্রণীত "বিক্রমপুর ইতিহাস" ১৪৫ পৃষ্ঠা "তারপাশা" অধ্যায়—তারপাশা অত্যন্ত আয়ত স্থান। এই গ্রাম সর্বত্র মন্দ পরিচিত নহে। অত্রত্য মহাশয়গণ নানাবিধ সাধু কার্যানুষ্ঠান করিয়া অতিশয় প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া গিয়াছেন। ইহাদিগের সঙ্কল্প বিশুদ্ধ ও মহান ছিল বলিয়াই বোধ হয় ইহারা "মহাশয়" এই সম্মানাত্মক উপাধি লাভ করিয়া সাধারণেও তাদৃশ বিখ্যাত হন। আজিও মহাশয়দিগের অনুষ্ঠিত কার্যাবলীর অনেক নির্দশন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদিগের নিজ বাটি উত্তুঙ্গ সৌধমালায় পরিশোভিত। বিচিত্র কারুকার্য সম্পন্ন সিংহদ্বার প্রভৃতি কতকগুলি অট্টালিকা সজ্জিত আমাদিগের নেত্র যুগলের আতিথ্য পালন করিয়া থাকে। মহাশয়দিগের বাটি নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ক্রমে সিংহদ্বারের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে অট্টালিকাগুলি অধুনা জঙললতায় পরিপূর্ণ হইয়া কালের চমৎকারিণী শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। মহাশয়গণ বাটির চতুর্দিকে এক সু-প্রশস্ত প্রাকার নির্মাণ করান, তাহাদিগের পরিবার মধ্যে এরূপ শাসন ছিল যে, দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক কোন ব্যক্তিই তাহাদিগের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিত না। এমন কি অন্তঃপুরস্থা কামিনীদিগের অল্পবয়স্ক কোন ভ্রাতা আসিয়া উপস্থিত হইলে ও তাহাকে ইহারা ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না। তাহাকে যথারীতি বহির্বাটিতে অবস্থান করিতে হইত। এরূপ রীতি যদিও সাধারণের হৃদয়গ্রাহিণী বলিয়া প্রতীত না হয়, কিন্তু মহাশয়গণ ইহাকে যার পর নাই সম্মান ও সভ্যতার চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেন।

মহাশয়দিগের জমিদারী নানাস্থলে বিদ্যমান ছিল। মহাশয়গণ অতি বিস্তৃত শ্যামপুর ও ভুলুয়ার পরগণার অধিকারী ছিলেন। অধুনা তাহাদিগের তাদৃশ প্রভাব ও কীর্তি রাশি লক্ষিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদিগের কিছুই জানি না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজি তাহাদিগের বংশজগণ তেজোহীন হইয়া রহিয়াছেন।

এরূপ কিংবদন্তী যে, তারপাশা গ্রামে পূর্বে কুলীন ব্রাহ্মণের নাম মাত্রও ছিল না। মহাশয়গণ বহুল ধন ব্যয় ও আয়াস স্বীকার করিয়া বাইঘে হইতে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া নিজপল্লিতে স্থাপিত করেন। তদবধি এই তারপাশা গ্রাম অন্যতম কুলীনপ্রধান স্থান হইয়া সর্বত্র পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিক্রমপুর ইতিহাসের দ্বাদশ অধ্যায়ের বিবিধ প্রসঙ্গ ৪০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "তারপাশার মহাশয়গণ বহরের চৌধুরীগণের সমসাময়িক। যখন বসু রায় চৌধুরী বংশের প্রতিপত্তি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তখন তারপাশা গ্রামবাসী 'মহাশয়গণ'ও নানাবিধ সাধু অনুষ্ঠান দ্বারা প্রতিষ্ঠা ভাজন উপাধি প্রাপ্ত হন। মহাশয়গণের সেই ধনৈশ্বর্য আজ এখন কোথায়? এত সময়ে সুন্দর সুন্দর সৌধমালা পরিশোভিত ইহাদের আবাস বাটি দর্শকগণের চক্ষের তৃপ্তি উৎপাদন করিত, আজ কোথায় সেই সিংহদ্বার, কোথায় সেই বিরাট অট্টালিকা? দিঘি সরোবর সকলি এখন পদ্মার গর্ভে, মহাশয়গণের বাসভবন বহু খণ্ডে বিভক্ত ছিল। অন্তঃপুর, বহির্বাটি, দেবালয়, অতিথিশালা, কাছারি গৃহ, লাঠিয়ালদের বাড়ি ঘর কত কি ছিল ; ইহাদের বাটির চতুর্দিকে এক সু-প্রশস্ত প্রাচীর বিদ্যমান ছিল ; সেই প্রাকারমধ্যে বাটিস্থ পুরুষগণ ব্যতীত অপরের প্রবেশাধিকার ছিল না। এমন কি কোনও অন্তঃপুরচারিণী বধূর অল্প বয়স্ক ভ্রাতা আসিলেও তাহাকে বহির্বাটিতে অবস্থান করিতে হইত, ইহারা তাহাকেও বাটির ভিতর যাইয়া ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না। মহাশয়গণের এই রীতি আমাদের নিকট কিস্তুতকিমাকার বলিয়া বিবেচিত হইলেও তাহারা কিন্তু ইহা একান্ত সভ্যতা ও সম্মানের চিহ্ন বলিয়াই মনে করিতেন। যদিও এখন আমরা ইহাকে দীনবন্ধুর 'জামাই বারিকের' অন্যতম

সংস্করণ ব্যতীত আর কিছুই মনে করিব না। পূর্বে ইহাদের বিস্তৃত জমিদারি ছিল, মহাশয়গণ শ্যামপুর ও ভুলুয়া পরগণার অধিকারী ছিলেন। দানে, ধনে, প্রতাপে, অতিথি সেবায় এই ব্রাহ্মণ জমিদার বংশ সে সময়ে বিক্রমপুরে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন আজ কিন্তু তাহাদের বংশধরগণ অতি হীন অবস্থায় দিন যাপন করিতেছেন।

পূর্বে তারপাশা গ্রামে কোনও কুলীন ব্রাহ্মণের আবাস ছিল না ; মহাশয়গণ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কুলীন প্রধান বেইঘে বা বেঘেগ্রাম হইতে কুলীন আনিয়া স্থাপিত করেন। তদবধি তারপাশা গ্রাম কুলীন প্রধান। পদ্মার প্রবল আক্রমণে এই বংশের সমুদয় কীর্তি বিলুপ্ত হইয়াছে।"

তারপাশার "মহাশয়গণ" সমাজ গড়িয়াছিলেন এবং রাসবিহারী সমাজসংস্কার করিয়াছেন, বর্তমানে ব্রাহ্মণ সমাজের "ব্রাহ্মণের নব অভ্যুত্থান" সেই বিষয়ে পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুত বলাই দেবশর্মার মতামত নিম্নে প্রকাশ করিয়া অধ্যায় পরিসমাপ্ত করিলাম। আমাদের এই অধ্যায়ে সমাজ সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গেই মোঘল রাজত্ব হইতে ব্রাহ্মণ সমাজের অবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়া বর্তমান সমাজ পর্যন্ত পরিসমাপ্ত হইল।

"কোন একটি বিশেষ ভাব, বিশিষ্ট আদর্শ একটি বিশিষ্ট পাত্রকে অবলম্বন করিয়াই অভিব্যক্ত হয়। যে পাত্রকে আশ্রয় করিয়া উহার প্রাথমিক বিকাশ আরম্ভ হয়, তাহাই তাহার চিরন্তনীতে পরিণত হয়, ইহার নামই বৈজিক শক্তি বা বংশানুক্রম। বংশানুক্রম স্বভাব অপরিবর্তনীয় স্বধর্ম। ইহার পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তন ঘটাইতে পারা যায় না। ঘটাইতে চেষ্টা করিলে একটা ব্যভিচারী প্রতিক্রিয়ার অবস্থা উপস্থিত হয়। ইহার উপরে গুণের একটা প্রকৃতি আছে ; উহা পাত্রের সহিত অবিভাজ্য। গুণ হইতে বস্তুকে এবং বস্তু হইতে গুণকে পৃথক করা যায় না। অগ্নির দাহিকা শক্তি ও অগ্নি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, পরন্তু একই।

গুণ-কর্মানুসারে চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা ভাগবত-বিধান। কিন্তু এই গুণ ও কর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের বিভাগ আর কেহ করিতে পারে না। করিতে যাইলে অভাগবত বিদ্রোহী সৃষ্টি হয়। তাহাতে বংশানুক্রমে ব্যাঘাত পড়ে : সমাজবিন্যাসে বিশৃঙ্খলা আসে এবং গুণ ও কর্ম ক্রমশ স্বৈরগতি প্রাপ্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। তাহতে স্বাভাবিক বিকাশের প্রতিবন্ধকতা ঘটিয়া মানবতার উন্নতিস্রোত রুদ্ধ হইবার আশঙ্কা ঘটে ; ইহারই নাম ধর্মের গ্লানি।

ব্রাহ্মণ্য একটা গুণ, একটা আদর্শ। সর্বোত্তম গুণ, সর্বোত্তম আদর্শ। কোনও মানুষ আত্মোৎকর্যের ফলে ব্রাহ্মণ্য শক্তির অধিকারী হইতে পারে। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ্য প্রকৃতি সমাজবিন্যাসের কখনই বিদ্রোহী নহে, অধিকন্তু শিষ্ট সেবক। কেন না, ব্রাহ্মণ্য বিজিগীষু নহে,—মৈত্রীপ্রবণ কাহাকেও উদ্বিজিত করা, বিদ্রোহের বহ্নি জ্বালিয়া সামাজিক শান্তিকে ভস্মীভূত করা, কাহারও অধিকারকে কাড়িয়া লওয়া—এসব অব্রাহ্মণ্য শূদ্র স্বভাবের লক্ষণ। ব্রাহ্মণ্যস্বভাব ক্ষমাশীল, শান্তিপরায়ণ, লোকসংগ্রহকারী এবং সমাজসেবক। যুগে যুগেই দেখা গিয়াছে—ব্রাহ্মণের প্রতি অব্রাহ্মণের একটা বিদ্বেষও আছে, আবার ব্রাহ্মণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষাও আছে। অতীত দিনেও ছিল, আজও আছে। আজও দেখি—ব্রাহ্মণকে অভিসম্পাত করিতে কেহ ছাড়ে না, আবার ব্রাহ্মণ হইবার বাসনাও সুপ্রচুর। এখন দেখিতেছি, সকলেই চাহিতেছে ব্রাহ্মণ হইতে। গুণে ব্রাহ্মণ না হউক, অন্ততঃ ব্রাহ্মণের আভিজাত্যের অধিকারী হইতে আশূদ্র-চণ্ডাল সকলেই সমুৎসুক। এখন দেখিব এই আকাঙ্ক্ষার সার্থকতা কিনা, এবং সম্ভব হইলে কোন দিক হইতে কেমন করিয়া? আর ইহা তপঃসিদ্ধ কি না?

ব্রাহ্মণ্য গুণে এবং বংশধারায় ওতপ্রোত। ব্রাহ্মণের সন্তান স্বভাবতই ব্রাহ্মণ। বৈজিক শক্তি হইতে সে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অধিকারী হইয়াছে! এই বৈজিকতা জন্মসিদ্ধ। অশ্বত্থ-বীজে অশ্বত্থই জন্মগ্রহণ করে। সিংহের ঔরসে সিংহই জন্মায়, ইহার ব্যত্যয় হয় না ; ব্যত্যয় করিবার চেষ্টা উন্মাদ প্রচেষ্টা। বংশানুক্রম বিধাতৃ-বিধানে যে যাহা হইয়াছে, তেমনই হইবে। প্রতিবাদ করিলে

উপায় নাই বিদ্রোহ করিলেও গত্যন্তর নাই। ব্রাহ্মণসন্তান আদর্শ ব্রাহ্মণ না হইতে পারেন, ব্রাহ্মণ্যলাভ করিবার সমগ্র সম্ভাবনীয়তাই তাহার মধ্যে অবস্থান করিতেছে।

অপরপক্ষে গুণও বংশজ। এক একটা বিশেষ বংশ ও গোষ্ঠীতে এক একটা বিশেষ গুণ প্রকাশ পায়। ব্রাহ্মণ্যের গুণ ব্রাহ্মণবংশ-গোষ্ঠীরই স্বভাব ধর্ম ও সহজ ধর্ম। আবার মানবতা বলিয়া একটা বস্তু আছে। বিশ্বমানবের একটা সাধারণ ঐক্য রহিয়াছে। প্রত্যেক মানবেরই একটা সাধারণ ধর্ম আছে। এই ধর্মের বিকাশ না হইতে পারে, ব্যতিক্রম হয় না। অনুশীলন বা তপস্যায় প্রত্যেক মনুষ্য মানবতার সমুচ্চ অবস্থায় উপনীত হইতে পারে। অবশ্য ইহার একটা শিষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত ক্রম আছে। আকস্মিক উত্তেজনার বশে এই অবস্থা লাভ হয় না। বিশেষত ব্রাহ্মণ্য মানবতার সমুচ্চ বিকাশ। উহা উত্তেজনা এবং বিজিগীষাহীন।

সমাজবিন্যাসে গুণের এবং বংশানুক্রমের উভয়ের একান্ত প্রয়োজন। গুণকে অবহেলা করিলেও চলিবে না, আবার গোত্রগণকে অমর্যাদা করাও অবৈজ্ঞানিকতা। সেইজন্য আর্য সমাজ বিধি গুণকে তাহার প্রাপ্য মর্যাদা দান করিয়াছে, কিন্তু সমাজবিন্যাসকে শিথিল হইতে দেয় নাই। ঈশ্বরপরায়ণ চণ্ডাল দ্বিজ হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও সমাজ সংস্থানে দ্বিজের অধিকার এবং হরিভক্তিপরায়ণ অন্ত্যজের প্রতিষ্ঠা সমপর্যায়ের নহে। এখানে দ্বিজ ও চণ্ডাল উভয়ের সমাজ কর্তব্য স্বতন্ত্র এবং অপরিবর্তনীয়। ঈশ্বরনিষ্ঠ চণ্ডাল মানবতার কাছে বরণীয় হইলেও সমাজসংস্থানে তাহার চণ্ডালব্রতই প্রতিপালন করিতে হইয়াছে। আরও প্রণিধানের বিষয়, সেই তপস্বী এবং চণ্ডালেরও ব্রাহ্মণ হইবার অভিমান নাই, কেন না, তপস্যা প্রভাবেই তিনি অভিমানশূন্য হইয়াছেন। সেই জন্যই দেখি যে যাঁহার নিকট শুকদেব ব্রহ্মবিজ্ঞান শিক্ষা করিতেছেন, সেই উপদেষ্টা একজন মাংস বিক্রেতা।

মহাশয় বংশের কুশীনামা

- নরনারায়ণ রায় মহাশয়
  - রাজনারায়ণ রায় মহাশয়
    - রামদেব রায় মহাশয়
      - উদয়নারায়ণ রায় মহাশয়
        - সদানন্দ রায় মহাশয়
          - ভৈরবচন্দ্র রায় মহাশয়
            - ঈশ্বরচন্দ্র রায় মহাশয়
              - রামচন্দ্র রায় মহাশয়
                - রসিকচন্দ্র
                  - অনিলচন্দ্র
                  - অমিয়
                - বিজয়চন্দ্র
                  - পরেশ
                  - পীযূষ
                  - প্রীতিশ
                  - পৃথ্বীশ
                - সুরেন্দ্রনাথ
                  - পরিমল
                  - পরিতোষ
              - প্রতাপচন্দ্র
                - হারাণচন্দ্র
                  - গোপাল
                - কালীপদ
                  - দিলীপ
                  - মঙ্গল
              - অবিনাশচন্দ্র

বর্তমানে "রায় মহাশয়গণ" বিক্রমপুর কান্দাপাড়া গ্রামে অতিসম্মানিত ভাবে বসবাস করিতেছেন। রায় মহাশয়গণ শ্রোত্রীয়, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে ভুলুয়া হইতে আনিত ব্রাহ্মণগণ বংশ। তাহারা মহাশয়গণের অনুগ্রহে কন্যাগণকে নৈকুষ্যে সম্প্রদান করিতেন। তারপাশার মহাশয় অধ্যায়ে লিখিত বংশ শব্দ শুধু তাহাদের সঙ্গে আনিত ব্রাহ্মণদের উল্লেখ মাত্র। মাহশয়গণের কন্যা কুলীনগণ বিবাহ করিলে সম্মান মনে করিতেন। তাহাদের সমাজস্থ বংশজের কন্যাগণ দ্বারা বর্তমান বিক্রমপুরে বৃন্দাবনে ও শিবপ্রসাদের সন্তান আনিত হয়, এ কার্যের দরুণ তাহারা শ্রোত্রীয়ের উচ্চ সম্মান "মহাশয়" উপাধিতে ভূষিত হন।

---

১. **কৌলিন্য প্রথার উৎপত্তি**। কোনও সময়ে বঙ্গ দেশীয় ব্রাহ্মণগণ আচার ভ্রষ্ট ও উৎপথগামী হওয়ায় তদানীন্তন কালের বৈদিকী ক্রিয়াকাণ্ড উপযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞ লোকাভাবে লুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। তদ্দর্শনে তৎকালীন হিন্দু নরপতি আদিশূর কনোজ হইতে পাঁচ জন নিষ্ঠাবান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এদেশে আনয়ন করেন। এবং তাহাদিগের বাসস্থানের জন্য পাঁচখানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ প্রদান করেন। পরে বল্লালসেনের সময়ে, ঐ পঞ্চ বিপ্রের বংশধরদিগের মধ্যে আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি নয়টি উৎকৃষ্ট লক্ষণান্বিত দেখিয়া তাহাদিগকে সাধারণভাবে কুলীন সংজ্ঞা দিয়া এতদ্দেশীয় (সপ্তশতী) পূর্বতন ব্রাহ্মণগণ হইতে তাহাদিগকে পৃথক করেন। তৎপরে লক্ষ্মণসেন এই ব্যাপক কুলীন সংজ্ঞাধারী ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে গুণের তারতম্য অনুসারে শ্রেণীয়, বংশজ ও কুলীন (সঙ্কীর্ণার্থে) নামক তিনটি শ্রেণী নির্দেশ করিয়াছেন। যে প্রণালীতে তিনি তাহাদিগের ঐ সকল গুণের পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ কিংবদন্তি এতদ্দেশে আজিও কীর্তিত হইয়া থাকে। কথিত আছে একদা লক্ষ্মণসেন আদিশূরানীত উক্ত পঞ্চ বিপ্রের বংশোদ্ভব কুলীনদিগকে রাজসভায় আহ্বান করেন। তাহাতে কতকজন কুলীন রাজানুগ্রহ লাভের উৎকট উত্তেজনা বশত ব্রাহ্মণোচিত নিত্যক্রিয়া সমাধা না করিয়াই বেলা প্রহরের মধ্যে রাজ দরবারে উপস্থিত হয়েন। আর কতকজন ভূদেব ও দেবাদিদেব উভয়ের মনস্তুষ্টি সঙ্গত মনে করিয়া, অতি ক্ষিপ্রতার সহিত সন্ধ্যাহ্নিকাদি সমাপন করিয়া দেড় প্রহরের সময়ে রাজসদনে উপস্থিত হন। অপর কতক জন রাজকীয় অনুগ্রহ নিগ্রহের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া যথাবিধি ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ করিয়া, দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাহারা আড়াই প্রহরের সময়ে আসিয়াছিলেন, তাহারাই প্রকৃত নিষ্ঠাবান ও উক্ত নবগুণ সম্পন্ন স্থির করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ কৌলিণ্য মর্যাদাসম্পন্ন রাখিলেন। যাহারা দেড় প্রহরের সময়ে আসিয়াছিলেন, তাহারা ক্রিয়া, ধর্মহীন না হইলেও আংশিক পরিমাণে শান্তভাব বর্জিত মনে করিয়া ও "শান্তি" লক্ষণটি ব্যতীত অবশিষ্ট অষ্টগুণের অধিকারী বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে "শ্রোত্রির" সংজ্ঞা দিলেন। আর যাহারা এক প্রহরের মধ্যে আসিয়াছিলেন, তাহারা অপর প্রভৃতি নবগুণ বর্জিত স্বত্বেও সদ্বংশজাত মনে করিয়া তাহাদিগকে "বংশজ" নামে অভিহিত করিলেন।

ইহার পর তদানীন্তন সমাজের অতিমাত্র প্রতিপত্তিশালী দেবীবর ঘটক নামক একটি লোক কৌলিন্য লক্ষ্মণ জ্ঞাপক শ্লোকের "নিষ্ঠা শান্তি" স্থলে "নিষ্ঠাবৃত্তি" পাঠ বসাইয়া কুলীনদিগের কুল কন্যাগত করিলেন। অর্থাৎ এই সময় হইতে এইরূপ নিয়ম হইল যে, কোনও কুলীনের বংশ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে তাহার প্রত্যেক কন্যাকে উচ্চ বংশে সম্প্রদান করিতে হইবে। ইহার পূর্বে কোন কুলীনের মেয়েদের মধ্যে কাহাকে উচ্চ ঘরে কাহাকেও বা নিম্ন ঘরে আর কাহাকেও বা সমান ঘরে বিবাহ দিলে তাহাতে কুল গৌরবের হানি হইত না।

দেবীবর যদি কেবল এতটুকু সংস্কার করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তার বড় কেহ তাহার দোষ দিত না। কারণ, তাহার প্রবর্তিত এই নূতন নিয়মে কুলীন কন্যাগণের বিবাহ-ক্ষেত্র কতকটা সঙ্কুচিত হইলেও এতটা সঙ্কীর্ণ হইয়া ছিল না। যে তাহার ফলে এক পুরুষের বহু পত্নীর পাণিগ্রহণ করা বা কন্যাগুলিকে যাবৎজীবন অনূঢ়া রাখা অথবা স্বজনাবয়ো জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল. কারণ তখনও কোনও কুলীন কুমারের সঙ্গে যে কোন কুলীন কুমারীর বিবাহ হইতেও বাধা ছিল না। কিন্তু পরে দেবীবর মেলবন্ধন নামক একটি সামাজিক আইন পাশ করিলেন যে তাহার পূর্ব প্রস্তাবিত বিবাহ সম্বন্ধীয় পূর্বোক্ত সর্বদারিকতা রহিত হইয়া গেল।

কোন গ্রামে অনেকগুলি লোক থাকিলে আজ কালও যেমন, সেই গ্রামের কোন ব্যক্তির কোন দোষ উপলক্ষে একটা দলাদলির সৃষ্টি হয় এবং হয়ত কতকগুলি লোক সেই অকার্যকারীর সঙ্গে মিলিত হইয়াই,

একটা নূতন দলের সৃষ্টি করে, সেইরূপ কুলীন সন্তানদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায়, তাহাদের কৃত কোনও একটি দোষকে ভিত্তি করিয়া দেবীবরের চেষ্টায় এক একটা দলের সৃষ্টি হইতে লাগিল, এইরূপে ক্রমে ছত্রিশ রকমের দোষ অবলম্বন করিয়া ক্রমশ ছত্রিশটি দলের উদ্ভব হইল ; এই দল গুলিকে কুলজী শাস্ত্র অর্থাৎ মিশ্রগ্রন্থে মেল বলে। যথা—ফুলিয়া, খড়দহ, সর্বানন্দী, বল্লভী, আচার্যশেখরী ইত্যাদি। দেবীবরের কৃত মেল শব্দের সংজ্ঞা এই—"দোষাণাং মিলনং মেলঃ"। প্রথমে ইহাদের প্রত্যেক দল অপর দলকে জাতিভ্রষ্ট মনে করিয়া পরস্পরের মধ্যে আহারাদি ও আদান প্রদান রহিত করেন। কালসহকারে খাওয়ার দলাদলিটা উঠিয়া যায়। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধীয় দলাদলিটা পূর্ণ মাত্রাতেই রহিয়া গিয়াছে। বর্তমান সময়ে এক মেলের লোক অন্য মেলের মধ্যে বিবাহ করিতে পারে না। সুতরাং বর ও কন্যা সংগ্রহের ক্ষেত্র নিতান্ত অল্প পরিসর হওয়ার এই প্রথম কারণ।

কালক্রমে ইহাতে আরও জটিলতা প্রবেশ করিয়াছে। কোন কুলীন নিজ মেলেরই যে কোন পাত্রের সহিত নিজ দুহিতার বিবাহ দিতে পারেন না। ঐ মেলের কোন নির্দিষ্ট পরিবারের মধ্যে দিতে হইবে, নতুবা কুলগৌরব অক্ষুন্ন থাকে না। যথা ফুলিয়া মেলের সীতারামের সন্তানের সহিত ঐ মেলের কেশব চক্রবর্তীর সন্তানের বিবাহ হইতে পারে। ইহাকে 'ঘর' বলে। স্বঘরে বিবাহ না দিলে সমাজে নিন্দিত হইতে হয়। বর কন্যা সংগ্রহের ক্ষেত্র সংস্কারের ইহা দ্বিতীয় কারণ।

শুধু ইহাই নহে, বিবাহ ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণতর করিবার জন্য আরও কয়েকটি সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। পূর্বোক্ত কেশব ও সীতারাম হইতে নিচের দিকে গণিলে পাত্র ও পাত্রী যদি একই সংখ্যায় উপস্থিত হয়, তবেই বিবাহ দিতে পারিবেন নতুবা 'বিপর্যয়' নামক অপ্রায়শ্চিত্ত দোষ ঘটিবে। সুতরাং পাঠক দেখিতে পাইতেছেন, যে কোন একটি মেয়ের জন্য একটি বর খুজিতে হইলে মেল, ঘর, পর্যায় নামক কতকগুলি সঙ্কীর্ণ গলি ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে কেমন একটি ক্ষুদ্র প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হইতে হয়। বর ও কন্যা সংগ্রহের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হওয়ার ইহা তৃতীয় কারণ।

[সাহাবাজনগর নিবাসী রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "কৌলিন্য প্রথা" পুস্তক হইতে সংগৃহীত]

২. কালীচরণ তর্কালঙ্কার—তারপাশার স্মার্ত পণ্ডিত। জন্ম ১৭৪১ শকে (বঙ্গাব্দ ১২২৬ সন, ১৮১৯ খ্রিঃ) মৃত্যু ১৮১৪ শকে (বঙ্গাব্দ ১২৯৯, ১৮৯২ খ্রিঃ) বিগত শতাব্দীতে যে কয়জন পণ্ডিত তারপাশা সমাজে স্মৃতি শাস্ত্রে প্রাধান্য লাভ করে তন্মধ্যে ইনি অন্যতম। ইহার পিতার নাম রামনিধি তর্কসিদ্ধান্ত। নবদ্বীপের স্মার্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের নিকট অধ্যয়ন করিয়া তর্কালঙ্কার উপাধি লাভ করেন। সে সময়ে তাহার বাড়ির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। তাহার মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি অর্থাভাবে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া শিষ্যালয়ে থাকিতে বাধ্য হয়।

৩. বঙ্গাব্দ ১২৯৩ সনে শ্রাবণ মাসে তারপাশা গ্রাম নদীগর্ভে লীন হয়।

* স্বভাবকবি গোবিন্দদাস প্রণীত।

৪. বিক্রমপুর-সমাজের ব্রাহ্মণ ওকুলীন ব্রাহ্মণের একান্ত অনুরোধে বিক্রমপুরের রাসবিহারীর কৃত বল্লালি* সংশোধনী উদ্ধৃত হইল।

বল্লালী সংশোধনী নাম্নী দেশ হিতৈষিণী স্বর্গীয় রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ১২৭৮-২২শে ফাল্গুন। "বর্তমান বল্লাল দ্বারা এতদ্দেশে যেরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিলে বল্লালী মর্যাদাসম্পন্ন কুলীন মহাশয়দিগকে সভ্য সমাজে ঘৃণিত এবং লজ্জিত হইতে হয়, আর এই বল্লালীই যেন এ প্রদেশের অধঃপতনের প্রধান কারণ হইয়াছে। মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কুলীন মহাশয়েরা যে এক এক ব্যক্তি স সোয়া-শ পরিণয় করিয়া, যেমন গুরুতা ব্যবসায়ী ঠাকুর মহাশয়েরা শিষ্যালয়ে ভ্রমণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, তৎপ্রায় কুলীন মহাশয়েরাও যে যে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বার্ষিক পান সেই সেই স্থানে সম্বৎসরে এক একবার প্রত্যাগমন করেন ; কিন্তু তাহাতেও অধিককাল বিলম্ব করেন না, কোথায় বা এক রাত্রি প্রবাস, কোথায় বা মধ্যাহ্ন ক্রিয়া, কোথায় বা বহির্বাটি হইতেই বার্ষিক নিয়া বিদায় হন। যেমন ঠাকুর মহাশয়রা এক জোর বরণ বস্ত্র ও কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পাইলেই একেবারে পাঁচ সাত জনের কাণে মন্ত্র প্রদান করেন, তৎপ্রায় কুলীন মহাশয়েরাও এক জোর বরণ বস্ত্র আর কিঞ্চিৎ কুলোচিত পণ পাইলে এক কালে পাঁচ সাতটি পরিণয় করিয়া থাকেন, ইহারা যে সকল স্ত্রীদিগের পাণিগ্রহণ করেন, তাহাদিগের দুরবস্থা একবার দর্শন করিলে কোন্ পাষাণ হৃদয় দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক অশ্রুপাত না করিয়া পারেন। তবে যে কুলীন মহাশয়দিগের অশ্রুপতন হয় না, তাহার কারণ এই যে, যেমন নিষাদেরা পশুপক্ষী হিংসা করিয়া তন্মূল্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, তাহাদের কি পশুপক্ষী হিংসাতে কখনও দয়া হয়?

কুলীনদিগের পক্ষিণীর প্রায় স্ত্রীগুলা চাঁদের মত বালক বালিকাগণ সহিত পিত্রালয় কি মাতুলগৃহে দীনা ক্ষীণা মহিলারূপে কাল কর্তন করেন, কিন্তু তাহারাই সৌভাগ্যবতী বটেন। যাহাদিগের পিত্রালয়ে কি মাতুলালয়ে অন্নাচ্ছাদনের অভাব তাহাদিগের আর দুরবস্থার পার নাই। যেমন ছিন্নমূল পদ্মিনীগুলা শুষ্কতা লাভ করিয়া সরোবরে ভাসিয়া বেড়ায়. তৎপ্রায় কুলীনদিগের পদ্মিনী প্রায় স্ত্রীরা শীর্ণতা লাভ করিয়া দুঃখার্ণবে ভাসিয়া বেড়ায়। যখন ঐ বালক বালিকারা অন্যান্য বালক বালিকাদের পিতৃস্নেহ দর্শন করিয়া, মাতার নিকট পিতার কথা জিজ্ঞাসা করে, তৎকালে প্রসূতির যে দুঃখানল উদ্দীপন হয়, তাহা কি আর কোনরূপে নির্বাণ হইয়া থাকে? কেবল নেত্রেতে শতধারে অশ্রু বর্ষণ করিয়াই জীবন রক্ষা করে। ঐ স্ত্রীগুলা সচ্চরিত্রা থাকিলে অন্নাচ্ছাদনের অভাবেই দুশ্চরিত্র হয়, এই মহীমণ্ডলে অন্নাচ্ছাদনের অভাব হইলে কে কি না করিয়া থাকে? হায় ; কি পরিতাপ? মানবের মান প্রাণ হইতেও প্রিয়। মানী লোকেরা অসম্মানের আশায় প্রাণ পরিত্যাগ করেন। সেই মান পরিবারের সকলেরই পরিধেয় বটে। তন্নিমিত্তই ফলে পরিবারকে সুশাসনে মনোরঞ্জন করিয়া প্রতিপালন করেন। কি আশ্চর্য! কুলীন মহাশয়েরা যে সেই মানের প্রতি নেত্রপাত না করিয়া জন সমাজে নানা প্রকার নিন্দনীয় হইতেছেন, ইহাতে কি তাহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও অসম্মান বোধ হয় না? মানবদেহ ধারণ করিয়া যদি সেই মানই না থাকে তবে আর তাহাদিগের কুলের গৌরব কি? বৃক্ষ হইতে পতন হইয়া যাহার জীবনের অভাব হয়, তাহার চক্ষু নষ্ট হইয়াছে কিনা, একথা কে জিজ্ঞাসা করে? যদি কুলীন মহাশয়েরা এইরূপ বিবেচনা করেন পৌরাণিক প্রসঙ্গেও অনেকানেক রাজাদিগের বহু বিবাহ শ্রুত হওয়া যায়, কিন্তু তাহাতেও নল রাজা যুদ্ধিষ্ঠির প্রভৃতি যাঁহারা ধার্মিক রাজা ছিলেন, তাহাদিগের বহু বিবাহ ছিল না। যৎকালে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তৎকালে তিনি দ্বিতীয় পরিণয় না করিয়া সীতার অভাবে স্বর্ণ সীতা প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞ নির্বাহ করেন। যাঁহারা মদ গর্বে গর্বিত, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ রাজা ছিলেন তাহারাই বহু বিবাহ, কি বলপূর্বক অন্যের ভার্যা অপহরণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহারাও এই কুলীনদিগের মত ভার্যাগুলি হরিলুটের প্রায় চতুর্দিকে নিক্ষেপ করেন নাই, সকলেরই মনোরঞ্জনপূর্বক প্রতিপালন করিয়াছেন। অদ্ভুত বল্লালীতে ধর্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ কতকগুলি কুকর্ম আছে এই যে, অনেকানেক স্ত্রী আজন্ম নিধন পর্যন্ত অবিবাহিতা থাকে, কি কোন কোন বালিকাকে বৃদ্ধেতে সম্প্রদান করে, কি কোন কামিনী সন্তানের ন্যায় বালককে পতি স্বীকার করে, এ বিষয় কত বড় ধর্ম বিরুদ্ধ এবং বিপর্যয় কার্য আর যাহারা সন্তানের ন্যায় বালককে পতি স্বীকার করে, তাহাদের সন্তান প্রত্যাশা দূরে থাকুক, পতিকেই পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে হয় এবং কুলীনদিগের এই বহু বিবাহ কুপ্রথা প্রচলিত থাকাতে আর একটি অনিষ্ট হইতেছে এই যে এক ব্যক্তির অভাবেই কন্যা বৃদ্ধা যুবতী বহুবিধ স্ত্রীর বৈধব্য দশা উপস্থিত হয়, যেমন মেঘ রাশির রসাল বৃক্ষ অবলোকন করিলে বহুবিধ অপক্ক ফল মধ্যে দুই একটি সুপক্ক ফল সুশোভা করে তদ্রূপ এতদ্দেশীয় বহুবিধ বিধবা মধ্যে দুই একটি সধবা সুশোভিতা হয়। সেই ব্রাহ্মণের বিধবাদিগের এক দিবসের যাতনা সন্দর্শন করিলেই হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রতি মাসেই দুইটি একাদশীর উপবাস করিয়া থাকে, আবার শিব চতুর্দশী, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি কত উপবাস করে, সেই উপবাসে বালিকা বিধবাদিগের যেরূপ যাতনা হয়, তাহা তাহাদিগের দেহেতে জীবাত্মা রূপে যিনি বিরাজ করিতেছেন তিনিই জানেন, উপবাসের দিবস বেলা এক প্রহর হইলই উপবাসের হাহুতাশে বিপরীত জল পিপাসা হয়, ক্রমে রবির উত্তাপ বাড়িতে থাকে আর তাহাদের জঠরানল উদ্দীপন হইয়া ক্ষীরহীনতার ন্যায় দুর্বলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আহার বা অনাহারে পত্তিক উর্ব্বণ হইয়া শীরঃপীড়া হয়। কেহ বা ঘন ঘম মুখাসৃত পতন করিয়া অন্যের বৈরক্তি জন্মায়, বেলা অবসান হইতে থাকিলেই উপবাসিনী রমণীরা নেশা-কারিণীর ন্যায় অঙ্গের অবস্থা বোধ করিতে থাকে। রাত্রিযোগে যেমন পশু পক্ষীগুলি প্রহরে প্রহরে স্বীয় স্বীয় মত নাদ করে তৎপ্রায় উপবাসিনী বালিকারাও উপবাসে কাতর হইয়া প্রহরে প্রহরে মাতাকে সম্বোধন করে। ইহারাও যদি বিধিকৃত এক এক পুরুষের একটি করা হইত তথাচ ধর্মের প্রতি নির্ভর করিয়া তাহাদের মনকে প্রবোধ দেওয়া প্রধান একটি কারণ ছিল, কিন্তু কুলীনদিগের হস্তে পতিত হইয়া যেপতির জীবন মরণে তুল্যরূপ যাতনা ভোগ করে, ইহার অধিক মনোদুঃখের কারণ আর কি আছে? এই বল্লালিতে যেন এতদ্দেশ অধঃপতন হওয়ার উদ্যত হইয়াছে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এক বিক্রমপুরের কত শত শত স্ত্রী পতি সন্দর্শন পায় না। আবার অর্থব্যয়ে অশক্ত হইয়া কত শত শত পুরুষও অবিবাহিত আছে। সাত আট শত টাকা না হইলে আর কোন প্রকারে ব্রাহ্মণের বিবাহ হয় না। যদি এই বল্লালির বহু বিবাহ কুপ্রথা না থাকিত, তবে কি আর মহাপাপ কন্যা বিক্রয়ের কুপ্রথাই প্রচলন হইত, না এই ব্রাহ্মণগুলা অবিবাহিত থাকিয়া এককালে নির্বংশ হইত? ব্রাহ্মণের বিবাহ এতদ্দেশে কিরূপ সুকঠিন হইয়াছে, তাহা এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণে ভিন্ন অন্যে জানে না ; কেহ হাজার বার শত টাকা একস্থানে সঞ্চিত

করিয়া কন্যা অন্বেষণে মুহুর্মুহু ভ্রমণ করিতেছে, অথচ পাত্রী পায় না। কেহ আশ্বাসে শ'দুইশ টাকা ব্যয় করিয়া পরে হাহাকার করিতেছে। বিবাহ দূরে থাকুক, সে টাকা পায় না। শ্রোত্রিয় এবং বংশজ মহাশয়দিগের বিশেষ দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে। এই কুলীনদিগের নিমিত্ত আর এতদ্দেশে তাহাদের পাত্রী পাওয়া যায় না। যেমন বাণিজ্য ব্যবসায়ীরা এক দেশের দ্রব্যাদি অন্য দেশে নিয়া বিক্রয় করে, তদ্রূপ কতকগুলি মনুষ্য আছে যে তাহারা শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে কন্যার চালান আনিয়া এতদ্দেশে বিক্রয় করে। কেহ পাঁচ শত টাকা দিয়া পরিণয় করিয়াও পরে পতিত হয়। পাত্রী পিতাকে বাবাজান বলে। শ্রোত্রিয় এবং বংশজ মহাশয়দিগের কেবল অন্যাভগিনী থাকিলেই বিবাহের পাত্রী সুস্থিরের সঙ্গস্থা থাকে, পরিবর্ত সম্বন্ধের সঙ্ঘটন থাকিলে আর কন্যার মূল্য দিতে হয় না। কিন্তু যাহারা সম্ভ্রান্ত প্রসিদ্ধ শ্রোত্রীয় কি বংশজ আছে, তাহাদের বংশাভাব হইলেও পরিবর্ত সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। অদ্ভুত বল্লালিতে এইরূপ দুর্ঘটন উপস্থিত হইয়াছে যে কতকগুলি পুরুষের স্ত্রী সঙ্ঘটন হয় না, আর আর বহুবিধ স্ত্রীও পতি সন্দর্শন পায় না। এতদ্দেশের অবস্থা দর্শনে বোধ হয়, যেন জগদীশ পাপীর দুষ্কর্ম ভোগ জন্যই এস্থানকে নির্মাণ করিয়াছেন। হায় কি পরিতাপ? কুলীন মহাশয়েরা যে ধর্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ এক নূতন ধর্ম অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম নষ্ট করিতেছেন, ইহাতে কি তাহাদিগের অধর্ম উপার্জন হয় না? আমি বারম্বার সবিনয়ে আবেদন করিতেছি যে, কুলীন মহাশয়েরা সকলে একবাক্য হইয়া যেমন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের কি বৈদ্য শূদ্রের কৌলিন্যের নিয়ম আছে, তৎপ্রায় বহু বিবাহ প্রভৃতি দোষ পুঞ্জের পরিহার করিয়া বল্লালীর সংশোধন করেন। নচেৎ কাহারও সম্মান সমরক্ষণ হইবেক না। আমি কেবল বল্লালীর সম্মান বৃদ্ধি মানসে এ বিষয়টি সংক্ষেপে লিপি করিয়া ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। যদি কুলীন মহাশয়েরা আমাকে বল্লালী বিদ্রোহী বিবেচনায় ইহার প্রতি নেত্রপাত না করিয়া এই বিরুদ্ধাচার সংশোধনের সদুপায় না করেন, তবে তাহারা অদ্ভুত বল্লালির অনিয়মে পাপ, তাপ, রোগ, শোক জর্জরিত হইয়া অচিরাৎ অধঃপতন হইবেন সন্দেহ নাই। যৎকালে বল্লাল সেন ব্রাহ্মণদিগের সদাচারে সন্তুষ্ট হইয়া অসাধারণ কৌলিন্য মর্যাদা অর্পণ করেন, তৎকালে ধর্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ কি বিবাহ প্রভৃতি কোন কুপ্রথা প্রচলিত ছিল না? অনন্তর যখন ঐ কুলীনদিগের আচার আচরণের বিচার করেন, তৎকালেও সকলের সদাচার না দেখিয়া, কুলীন শ্রোত্রিয় বংশজ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। স্বর্ণ, গোদান গ্রহণের পাপেই প্রথমত বংশজ সংজ্ঞার উৎপত্তি হয়। এইক্ষণ যেমন কম্বলের পশম ত্যাগ করিলে আর কিছুই থাকে না, তৎপ্রায় বল্লালের নিয়ম মতে কুলীনদিগের বিচার করিলে কাহারও কৌলিন্য মর্যাদা থাকে না।

"প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে" বিক্রমপুরের সমাজ সংস্কারক রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার বল্লালি সংশোধনী নানা দেশ হিতৈষিণী পুস্তকে বিক্রমপুরের সমাজে আচার, ব্যবহার, কিরূপ গ্রথিত ছিল, তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। যদিও বর্তমানে পুস্তকখানা সময়োপযোগী না তথাপি রাসবিহারী সমাজের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করায় আজ বিক্রমপুর সমাজ তাহারই ফলে পরিশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়াছে। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীতে, রাসবিহারীর গুণপনা বিষয়ে যথেষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, কিন্তু যতদিন জগত থাকিবে, ততদিন গুণের আদর থাকিবে, কারণ গুণই চিরস্থায়ী ; প্রতিভাই চির আদরণীয় ও পূজনীয়। "বল্লালি সংশোধনী" পুস্তকখানা আজ পাঁচ বৎসর যাবৎ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ১২৭৮ সনে পুস্তকখানা লিখিত হয়।

যে দীন কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান সমাজের এই জঘন্য প্রথা দূর করিবার জন্য নিজ স্বার্থ ও মর্যাদা তুচ্ছ জ্ঞান করিতেও পরাঙ্মুখ হয় নাই, যিনি জনসাধারণ কর্তৃক পাগল নামে অভিহিত হইয়াও নিজ কর্তব্য পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, তাহাকে দেবতা বলিব না মানুষ বলিব?

আজ যদি রাসবিহারী পাশ্চাত্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাহার নাম ইতিহাসে, সুবর্ণ অক্ষরে গ্রথিত থাকিত, বর্ষে বর্ষে তাহার স্মৃতিসভা হইত, দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে রাসবিহারী জন্মিয়াছিল, তাই তিনি জীবনে একদিনের জন্যও বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা পান নাই ; কিন্তু এমন একদিন আসিবে, হয়ত আমরা দেখিতে পাইব না, যখন রাসবিহারীর নাম গ্রহণ করিয়া সকলে ধন্য হইবে, জগদীশ্বর করুণ সে শুভদিন যেন শীঘ্রই বঙ্গ দেশে আবির্ভূত হয়। "শ্রীরাজমোহন চট্টোপাধ্যায় দেবশর্মনঃ" বেজগাঁ, ঢাকা।

সপ্তম অধ্যায়



মাইজপাড়ার রায় বংশ ঃ

মোঘল শাসন সময়ে বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় না থাকায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থেরাই সমস্ত বঙ্গদেশের জমিদার ছিল। পাঠান শাসনকালে বঙ্গদেশে কোন নিকৃষ্ট জাতীয় লোক ভূমিঅধিকারী হইতে পারিত না। নবাব কিংবা শরিফগণ সময় সময় উচ্চ কর্মচারীদিগের কার্যকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া শেষ জীবনে তাহাদিগকে জমিদার বা ভুঁইয়া করিয়া দিতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্তা ছিলেন সুলতান সুজা। তাহার শাসনকাল ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। রামচন্দ্র শর্মা নামে জনৈক ব্রাহ্মণ সুলতান সুজার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং শেষ জীবনে তাহার পূর্ব বাংলায় জমিদারি করিবার প্রবল আকাঙ্খা হয়। সুলতান সুজা ঢাকা হইতে রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তরিত করেন। হিন্দু জমিদার দ্বারাই দেশশাসন হইত কিন্তু সেই সময় সকল জমিদারের "জমিদার" উপাধি ছিল না। বড় জমিদারদিগকে "রাজা" বা "মহারাজা" উপাধি দেওয়া হইত। আর ক্ষুদ্র জমিদারদের ভুঁইয়া বা রায় উপাধি ছিল। মোঘল রাজত্ব কালে সেই সকল রাজা মহারাজাদের জমিদার উপাধি হইয়াছিল "চৌধুরী", "রায়" ইত্যাদি। রামচন্দ্র শর্মা আইরালখাঁ নদীর দক্ষিণ পারে একখণ্ড ভূমিতে নিজ ভদ্রাসন নির্মাণ করিলেন। বর্তমানে যাহা আইরল বিল নামে খ্যাত তাহা আইরলখাঁ নদীর নামের রূপান্তর মাত্র।[১] বর্তমানে আমরা দেখিতেছি কতকগুলি গ্রামের নামও রূপান্তর হইয়াছে, আইরল খাঁ নদীতে যে গুদারা ঘাট ছিল বর্তমানে সেই স্থানের নাম গাদীঘাট হইয়াছে। এই বিলের সম্বন্ধে নানা প্রকার কিংবদন্তী শুনা যায়। যদিও অনেক নদনদী থাকায় এদেশের বাণিজ্য প্রধানত জলপথে চলিত তথাপি বাণিজ্য কার্য ও গমনাগমনের সুবিধার জন্য সুলতান সুজা রাজবর্তন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক এলফিনস্টোনের মতে দিল্লির সম্রাট আকবরের রাজত্ব ঈশ্বরের আশীর্বাদের ন্যায় তাহার কর্মচারী ও প্রজাদের অশেষ মঙ্গল বিধান করিয়াছিল। হিন্দু কর্মচারী ও আমলাদের মঙ্গলের জন্য তিনি কি সাধু অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহা জানিতে হইলে সংক্ষেপে বাংলার দুই একটি বিষয় আলোচনা করা দরকার। The slaughter of cows fordidden and made a capital offence as in a purely Hindu State. Bloe ain. p. 220 Vincent Smith. p. 356.

আকবরের সময়ে গোহত্যা রহিত হয় এবং ধর্মের প্রতি সম্মান দেখান কর্তব্য এইরূপ আদেশ প্রচারিত হয়। ধর্মনির্বিশেষে গুণের আদর করা এবং যোগ্য ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। অত্যাচার পীড়িত ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুদের রক্ষা করিয়া এবং তাহাদের জাতীয় গর্ব তৃপ্ত করিয়া, সম্রাট আকবর হিন্দুদের মুগ্ধ করিয়াছিলেন।[২] সেকালে হিন্দু প্রজা, জমিদার, রাজা, মহারাজাগণ তাহার সদাশয়তা, মহত্ব, সর্ব ধর্মে সমদর্শিতা, সর্ব ধর্মে ঔদার্য, ধর্ম নির্বিশেষে নিরপেক্ষ বিচার দর্শনে মুগ্ধ হৃদয়ে জগদীশ্বরের সহিত দিল্লিশ্বরের তুলনা করিয়াছিলেন ; প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কবি টড লিখিয়াছিলেন, "He finally succeeded in healing the wounds his ambition had inflicted and received from millions that meed of

praise which no other of his race ever obtained "Tod Vol I Annals of Mewar. Chap X.

আমরা মাইজপাড়া রায় বংশের প্রসঙ্গে আকবরের কতকগুলি প্রসঙ্গ অনুধাবনা করিয়া সে কালের হিন্দু ভূস্বামীদিগের কতকগুলি রাজকার্য পরিচালনার আভাষ দিলাম। নবাব বা উচ্চ পদস্থ আমলাগণ ইচ্ছা করিলে নিজ ভদ্রাসন ইচ্ছানুরূপ নির্মাণ করিতে পারিতেন এবং বৃদ্ধ বয়সে ঈশ্বর চিন্তায় গণনার দিনগুলি সুখে কাটাইতে পারিতেন। রামচন্দ্র বৃদ্ধ বয়সে সুলতান সুজার আদেশ ক্রমে পরগণা বিক্রমপুরে আসিয়া নিজ নামে রামচন্দ্র শর্মা তালুক নবাব সরকারে লিখিয়া, ভদ্রাসন প্রস্তুত করিলেন। তিনি ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তৎপুত্র রত্নেশ্বর পার্শী ও উর্দু বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যে নবাব সরকারে নামজারি করিয়া ক্ষুদ্র জমিদার নামে অভিহিত হইলেন। সে কালে ক্ষুদ্র জমিদারগণ সময় সময় আবশ্যক হইলে মুর্শিদাবাদ গিয়া নবাব সরকারে কিছুদিন কার্য করিয়া নবাবের খাজনার পরিবর্তে খাটিয়া দিয়া আসিতেন। তাহাতে জমিদারগণের সম্মানের পক্ষে কেন ক্ষতি হইত না বরং সম্মান বাড়িত। রত্নেশ্বর অতি অল্পকাল মধ্যে সুলতান আজিম ওসমানের সময় নানা বিদ্রোহী পরগণায় খাজনা আদায় করিয়া নবাবের একজন বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছিলেন। সুরতান আজিম ওসমানের মৃত্যুর পর মুর্শিদকুলি খাঁ মুর্শিদাবাদের শাসনকর্তা হন। সে সময়ে রত্নেশ্বর নানা প্রকার জটিল কার্য উদ্ধার করায় মুর্শিদকুলি খাঁ তাহাকে উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। তৎপুত্র গোবিন্দপ্রসাদ নানা প্রকার অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া দিল্লি সম্রাটের নিকট হইতে "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রত্নেশ্বর জীবিতকালে ২ খানা তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, একখানা নিজ ভদ্রাসন মাইজপাড়া, অপরখানা বিক্রমপুর জমিদারি সংশ্লিষ্ট। কিন্তু গোবিন্দপ্রসাদের রায় উপাধির সনদ লিপির পাঞ্জাখানার নকল এখন পর্যন্ত আমরা প্রাপ্ত হই নাই। Assistant Settlement officer Mr. Ascoley সাহেব বলেন "৭।।° হাত নলের ২৪ নল দীর্ঘ ও ২০ নল প্রস্থ এক কানি ও ১৬ কানিতে ১ দ্রোণ এইরূপ ৫০ দ্রোণ জমি রত্নেশ্বর মুর্শিদকুলি খাঁর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া নবাব সরকারে তাম্রশাসন দিয়াছিলেন। বিক্রমপুর অন্তর্গত ক্ষুদ্র সামিলাত তালুকে (যাহা বর্তমানে ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত) রত্নেশ্বর একমাত্র জমিদার হইয়া নবাব সরকার হইতে তাম্রশাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" Mr. Ascoley সাহেব আরও বলেন মুসলমানাধিকৃত বঙ্গের ইতিহাসের সহিত মাইজপাড়া রায় বাবুগণের কিছু সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা প্রাদেশিক ঐতিহাসিকতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত তাহারা প্রাচীন লিখিত কাগজ হইতে এই বংশের অনেক ঐতিহাসিকতত্ত্বের দ্বার উদঘাটন করিতে পারিবেন। দুর্ভাগ্যবশত মাইজপাড়া রায় পরিবারের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্বন্ধে কোন দলিলপত্রের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। সম্ভবত মুর্শিদকুলি খাঁ গোবিন্দপ্রসাদকে নাওয়ার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করিয়া এবং বঙ্গের রাজস্ব বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধন করিয়া দিল্লির সম্রাটের "রসুম" দিতে বিশ্রাম করিতেন না, বোধ হয় সে সময় গোবিন্দপ্রসাদ নাওয়ার দেওয়ান নিযুক্ত হন।[৩]

গোবিন্দপ্রসাদ মোঘলের অনুগ্রহে একরূপ স্বাধীন ভাবেই স্বীয় জমিদারি রক্ষা করেন। তৎপর নওয়ার বিভাগের কার্য কুশলতায় মোঘল সম্রাট ও নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ তাহাকে "রায়" উপাধিতে ভূষিত করেন। গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের সময় হইতেই মাইজপাড়া রায়বংশের কীর্তি সম্পর্কে বহু কথা প্রচলিত আছে। গোবিন্দপ্রসাদের মাইজপাড়ার অট্টালিকা একটি দেখিবার জিনিস।[৪] সেকালে নিম্নলিখিত জিনিস ও রাজমিস্তরি দ্বারা অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। ইট ১৩,০০০,০০০, শুরকী ২৫,৭,৯৭০ ধামা, ১২৩৮৭০ মণ ঝিনুক আবশ্যক হইয়াছিল। চুণা প্রস্তুত করিতে, ২৯,৭৮৭৯০ নৌকা তেতুল, ২৫,০০০ হাজার মণ খর, ২৫০০০ মণ হরিতকি, ২৫০০০ গণ্ডা মেথি, ২৫০০০ মণ শুরকী প্রস্তুত করিতে ২৩০ খানা ঢেকিয় আবশ্যক হইয়াছিল। উপরোক্ত জিনিস হইল অট্টালিকার উপকরণ। রাজমিস্তরি ২৯৮ জন রাত্রিদিন পরিশ্রম করিয়া

ছয় বৎসর কালের মধ্যে এই সুবৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছিল। তিনি তুলা পঞ্চাগ্নি নামে এক বৃহৎ ব্রত এবং তৎসহিত আরেক বৎসর কাল মহাভারত পাঠ ও বহু দেশ হইতে আগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় করিয়াও নিজে সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১২ খানা মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বারা লিখাইয়া সেকালে ১২ পরগণায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদিগকে দান করিয়াছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি উৎসাহ এবং সামাজিক কুৎসা নিবারণ বিষয়ে তিনি সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে তীর্থ পর্যটনকালীন গুরু, পুরোহিত, ঘটক, কুলীন, পণ্ডিত নিয়া পাঁচ বৎসর কাল নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। সেকালে তীর্থ পর্যটন কিরূপ ব্যয় ও কষ্টসাধ্য ছিল তাহা ঐতিহাসিক পাঠক মাত্রেই সহজে অনুমান করিতে পারিবেন। নৌকা ব্যতীত কোথায়ও যাতায়াত করিবার সাধ্য ছিল না। পথিমধ্যে জলদস্যু আরাকান ডাকাতের বড়ই উপদ্রব ছিল। সমুদ্র পথও ভীষণ ভয়াবহ ছিল। আরাকান দস্যুদিগের আশঙ্কার কথাও অতীব শোচনীয় ও ভয়াবহ ছিল।

গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের তিন পুত্র জ্যেষ্ঠ বৈদ্যনাথ ওরফে রামশঙ্কর, মধ্যম চন্দ্রশেখর ও কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ। জ্যেষ্ঠ রামশঙ্কর ও কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ উভয়ে মাইজপাড়া বাড়িতে থাকিয়া জমিদারি কার্যের সুশৃঙ্খলা করিতেন এবং মধ্যম ভ্রাতা চন্দ্রশেখর রায় পিতার মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদেই সরকারে কার্য করিতেন একথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। নবাব সরকারে কার্য করিয়া রাজস্ব দিতে কেহ কোন অসুবিধায় পতিত হইত না। তাই চন্দ্রশেখর রায় নবাবের শুভদৃষ্টিতে পতিত হইয়া মুর্শিদাবাদে একখানা অট্টালিকা ও কতক ভূসম্পত্তি খরিদ করেন। তাহার একমাত্র পুত্র রামবিহারী রায় পলাশী যুদ্ধের সময় মুর্শিদাবাদে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আমরা বর্তমানে এখানে ইংরেজ শাসন সময় শাসনকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংস কর্মধারা বিষয়ে একটা আলোচনা করিব। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার শাসনকর্তা হইয়া আসিলেন। তিনি নিজে স্বচক্ষে দেশের দুর্দশা দূর করিবার জন্য মুর্শিদাবাদ হইতে রাজস্ব কাছারি কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন। সেই সময় হইতেই মুর্শিদাবাদ হইতে রাজধানী কলিকাতায় আসিল। মুর্শিদাবাদ চিরদিনের জন্য অন্ধকারে রহিল। কলিকাতার গৌরব দিন দিন উন্নতির সোপানে ধাবিত হইতে লাগিল। আজ কলিকাতা নগরী বৃটিশ রাজত্বের অন্যতম রাজধানী ও বাণিজ্য বন্দর। ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলা প্রদেশকে কতকগুলি জেলায় বিভক্ত করিয়া রাজস্ব সংগ্রহের জন্য প্রত্যেক জেলায় একজন ইংরাজ কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। সেইসব কর্মচারীগণের নাম কালেক্টর। ভূমির রাজস্ব (কর) প্রকাশ্য নিলামে ডাকা হইত। যিনি সে সময়ে সবচেয়ে বেশি টাকা দিতে স্বীকার করিতেন, তাহার সহিত কালেক্টর পাঁচ বৎসরের জন্য জমিদারি বন্দোবস্ত করিতেন। সেই সময় রামশঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামহরি রায় ওয়ারেন হেস্টিংসের অধীনে "ক্রোক সাজোয়াল" বাকিপড়া রাজস্ব জমিদারের সম্পত্তি ক্রোক নিলাম দ্বারা আদায়কারী কর্মচারী ছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে মহারাজ রাজবল্লভের পুত্রগণের সর্বময় কর্তা ছিলেন। রামহরি রায়ের জীবনের একটি প্রধান কর্ম তিনি মাইজপাড়া বাড়িতে ছোট বড় তিনটি মঠ নির্মাণ করিয়া প্রত্যেক মঠে এক একটি শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সম্ভবত ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনটি মঠের মধ্যে সবচেয়ে বড় মঠটি ৭৫ হাত উচ্চ ছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় মঠ নির্মাণের সন তারিখ কিছুই লিখা নাই। একস্থানে শিল্পীর পরিচয়ে এই মাত্র লেখা আছে "শ্রীজয়নারায়ণ রাজ সাংজগ দীয়া পরগণে ফতেবাদ"। প্রাচীনকালের সৃষ্টি কৌশল বিক্রমপুর হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, যাহা আছে বিধাতা ক্রমে ক্রমে তাহাও মুছিয়া ফেলিতেছেন। ১২৯২ সনের ৩১ আষাঢ় মঙ্গলবার প্রাতে সাতটার সময় ভীষণ ভূমিকম্পে ঐ উচ্চ মঠটি চূড়া সহ কতক অংশ ভূমিতে পতিত হইয়াছিল। বিক্রমপুর জননী তাহার সন্তানের যশ কীর্তি ক্রমে মুছিয়া ফেলিয়া দিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না।

স্বর্গীয় বিনোদবিহারী রায় মহাশয়ের জীবিত অবস্থায় অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ১২৯৩

খ্রিস্টাব্দের বৈশাখ মাসে উহা পুনঃ জীর্ণ সংস্কার করা হয়। মঠের জীর্ণ সংস্কার হওয়ার পর বর্তমানে মঠটি ৬৫টি হাতের উপর উর্ধ্ব হইবে। বিনোদবিহারী রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর আর কোন জীর্ণ সংস্কার করা হয় নাই। রামহরি রায় অসাধারণ প্রতিভা বলে অল্পকাল মধ্যে দেশের অশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। আজ পর্যন্তও বিদেশি পর্যটকগণ রামহরি রায়ের স্থাপিত করুণাময়ী ও শিবলিঙ্গ দেখিয়া সততই তাহার যশঃরাশি চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ না করিয়া থাকিতে পারে না। বাস্তবিক রামহরি রায় অতুলনীয় যশের অধিকারী হইয়াও করুণাময়ী কালীকার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইতে কোনদিনও বিচলিত হন নাই। তিনি প্রতি বৎসর ১ বৈশাখ তারিখে শাস্ত্রীয় বিচারের জন্য দেশ বিদেশের নানা স্থানের পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ধর্ম বিষয়ে অকাট্য যুক্তিতর্ক শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। এক কথা বলিতে কি রামহরি রায় অত্যন্ত ধর্মভীরু লোক ছিলেন। শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য তিনি সর্বদা বিষবৎ ত্যাগ করিতেন। তাহার নিজ ভদ্রাসনের বাহির বাড়ির উত্তর খণ্ডে ২৪ হাত দীর্ঘ ও পাঁচ হাত প্রস্থ পাকা গাঁথুনী দেওয়া সেকালের জাফরি ইটের খিলান অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া এবং ঐ অট্টালিকার দক্ষিণ দিকে ২৭ হাত দীর্ঘ সাড়ে চারি হাত প্রশস্ত তিন খানা কোঠা প্রস্তুত করিয়া কাশীধাম হইতে পাষাণময়ী কালী মূর্তি ও দুইটি শিবলিঙ্গ আনিয়া স্থাপন করেন। মধ্যের কোঠায় কালী মূর্তি এবং পূর্ব ও পশ্চিমের কোঠায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। রামহরি রায়ের দেবদেবী প্রতিষ্ঠার কথা আজও বিক্রমপুরে প্রাচীনদের মুখে অবগত হওয়া যায়। পুণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য মহৎ দানের কথা সেকালে অতি বিরল ছিল। ভারতের নানা স্থান হইতে একশত এগার জন বিখ্যাত সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিয়া প্রথম যজ্ঞ আরম্ভ করেন। তৎপর প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে পাথেয় ব্যতীত ১৫খানা স্বর্ণ মুদ্রা প্রণামী দিয়াছিলেন। দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঘটক বিদায় এবং ২৫ টাকা সহচর দিয়াছিলেন। প্রত্যেক দরিদ্রকে নূতন বস্ত্র ও দশ সের চাউলের এক থলিয়া চাউল ও নগদ ১ টাকা দান করা হইয়াছিল। ইহাতে রামহরি রায় বৃদ্ধ বয়সে অবস্থার বিপর্যয়ে রাজা রাজবল্লভের পুত্রদের আশ্রয়ে ও অনুগত্য স্বীকার করিয়া সংসারের সর্বময় কর্তা হইয়াছিলেন। বর্তমানে তাহার উত্তরাধিকারী সেবাইতগণ করুণাময়ী, শিব, শালগ্রাম-শিলা ও লক্ষ্মী-গোবিন্দ বিগ্রহের দৈনিক ভোগ দিয়া সেবা করিয়া আসিতেছেন। রামহরি রায়ের প্রতিষ্ঠিত কালী "করুণাময়ী" নামে খ্যাত। নিম্নে আমরা তাহার নিয়মিত পূজার ব্যবস্থা লিখিতেছি। মায়ের দৈনিক অর্চনা হইয়া থাকে। পূজার ব্যয়ের জন্য দেবোত্তর তালুক আছে। ঢাকার কালেক্টরির তৌজির ৬৬০ নং তালুকসমূহের আয় মায়ের দৈনিক পূজার জন্য ব্যয় হইয়া থাকে। প্রত্যেক অমাবস্যার সময় ও অন্যান্য সময়ে "করুণাময়ীর" নিকটে খুব ধুমধানের সহিত পূজা হইয়া থাকে। হিন্দু ধর্মানুমোদিত বহু যাগযজ্ঞ করুণাময়ীর নিকট সম্পাদন হইয়াছে।

সেকালে চোর ডাকাতের উপদ্রব খুবই বেশি ছিল। সে সব কারণে দস্যুর হস্ত হইতে নিরাপদ থাকিবার জন্য রামহরি রায় কয়েকটি কপাট প্রস্তুত করিয়াছিলেন অর্থাৎ আজকালকার রীতিনীতি অনুসারে যাহাকে গেট বলে। ভূমিকম্পে সেকালের প্রাচীন নিদর্শন কপাটগুলি ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে যে সব গেট অবশিষ্ট আছে, তাহার কারুকার্য ও শিল্পকৌশল দেখিতে বিস্মিত হইতে হয়। বাড়ির চতুর্দিকে পরিখা, এবং বাড়ির পূর্বদিকে দির্ঘিকার পূর্বতীরেই মঠত্রয় বিরাজ করিতেছে। তৎপর বাজার ও পোস্ট অফিস। এই দিঘি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অনুমান ৩৫০ এবং ১২৫ হাত হইবে। দিঘির পূর্ব পারে দাঁড়াইয়া বৈদেশিক পর্যটকগণ অট্টালিকার নানাবিধ সুদৃশ্য কারুকার্য শিল্পকলার বিষয় মনে মনে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না।[৫]

স্বর্গীয় রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন ঃ মাইজপাড়ার রায় বাবুগণের উন্নতির সময় অর্থাৎ ১১১২ বঙ্গাব্দের প্রথমভাগে মাইজপাড়ার গ্রামের উন্নতিকল্পে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র ও বৃত্তা সকল গ্রামে আনিয়া স্থাপন করেন এবং কতকজমি বসতবাটি ইত্যাদি দিয়াছিলেন। গত সেটেলমেন্টের জরিপের সময় ডেপুটি শ্রীযুত কালীপদ মৈত্র মহাশয় বলেন ঃ মাইজপাড়া বাবুগণের পথকরের কাগজ দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া

যায়—এই সকল নিষ্কর ও নান্‌কার, চাকরান ভূসম্পত্তির আয় বার্ষিক ১৭৬৭ টাকার অধিক হইবে। রায়বাবুগণের মধ্যে কেহই পূর্বপুরুষের নাম যশ বজায় রাখিবার জন্য তত চেষ্টিত নয়। নানাপ্রকার মামলা মোকদ্দমায় ক্রমশঃ মাইজপাড়া বাবুগণের নাম যশ ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া আসিতেছে।

আজ প্রায় ৫০ বৎসর অতীত হইল মাইজপাড়ার অতিথিশালা উঠিয়া গিয়াছে, আছে শুধু অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ দিঘি, মঠ ও করুণাময়ী মাতৃ-মূর্তি। এই বংশের অনেকে কায়ক্লেশে জীবিকা নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। আর যাহারা সচ্ছল আছেন, তাহারা দেশ ছাড়িয়া বিদেশে অট্টালিকা প্রস্তুত করত পুত্র পৌত্র নিয়া সুখে সংসার যাপন করিতেছেন। কোথায় সেই সুরম্য বৃহৎ বাটি, আর কোথায় সেই বাজার, দিঘি পুষ্করিণী সম্বলিত তিনটি মঠ ; অদ্যাপি যাহা আছে তাহাও অযত্নে অতি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইবে। বর্তমানে বিক্রমপুরের মোকদ্দমার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তন্মধ্যে মাইজপাড়া গ্রামের মোকদ্দমা সংখ্যা অত্যধিক বলিলেও ভুল হয় না। বাবুগণের নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ ক্রমশ ক্ষীণ ম্লান হইয়া আসিতেছে। বিক্রমপুরের অন্যান্য জমিদারদের চেয়ে মাইজপাড়ার রায়বাবুগণের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীর সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে।

ঢাকা জিলাস্থ বিক্রমপুর অন্তর্গত মাইজপাড়ার রায়বংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত, ইহারা কান্যকুব্জ হইতে রাজা আদিশূর আনিত শাণ্ডিল্য গোত্র ভট্টনারায়ণের বংশোদ্ভব। এক সময় ইহারা অতি সমৃদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন, ইহাদিগের আদি বাস কোথায় ছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না, কিন্তু প্রবাদ দ্বারা জানা যায় যে সুলতান সুজা নবাবের অত্যাচারের শেষ সময় রায়বাবুগণের পূর্বপুরুষ ভট্টনারায়ণের দ্বাবিংশ-পুরুষ অধঃস্তন রামচন্দ্র প্রথম মাইজপাড়া আসিয়া বাস করেন। বাবুদের বাড়ি রামচন্দ্র শর্মা তালুক মধ্যস্থিত।

রামচন্দ্রের পুত্র রত্নেশ্বর নবাব আমির ওসমানের সময় মুর্শিদকুলি খাঁর সময় নবাব সরকারে কোন উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। রত্নেশ্বরের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় মুর্শিদকুলি খাঁর সময় নাওরার দেওয়ান ছিলেন। তাহার কার্য প্রণালীতে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে 'রায়' উপাধিতে ভূষিত করেন। গোবিন্দপ্রসাদ ঐ দেওয়ানী পদে থাকা অবস্থায় ১১২৮ বাং সন ইং ১৭২২ খ্রিঃ অঃ মাইজপাড়া গ্রামে দুর্গোৎসব আরম্ভ করেন। বর্তমান সময়ও তাহার বংশধরগণ দুর্গাপূজা করিয়া আসিতেছেন। মাইজপাড়া রায়বংশের দুর্গোৎসবের যজ্ঞের একটুকু বিশেষত্ব আছে ; যাহা সচরাচর প্রায় অন্য কোথায়ও দেখা যায় না। দুর্গাপূজা আরম্ভের প্রথম বৎসর তিনি ১০৮ (অষ্টোত্তর শত) বিল্বপত্র দ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করেন, এবং প্রতি বৎসর আটটি বিল্বপত্র বৃদ্ধি হয়। এই নিয়মে ১৩৩৬ সনে ১৭৬৪টি বিল্বপত্র দ্বারা যজ্ঞ সমাধা করা হইয়াছে। আজ দুইশত আট বৎসর (২০৮) যাবৎ এই নিয়মে পূজা চলিয়া আসিতেছে। এই গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের সময় হইতেই রায়বাবুদিগের প্রতিপত্তি ও অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে।

দেওয়ান গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের তিন পুত্র জ্যেষ্ঠ বৈদ্যনাথ ওরফে রামশঙ্কর, মধ্যম চন্দ্রশেখর ও কনিষ্ঠ রামকৃষ্ণ। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উভয়ে মাইজপাড়া গ্রামেই থাকিতেন, মধ্যম চন্দ্রশেখর রায় মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে কার্য করিতেন এবং তথায়ই বাড়ি নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। তাহার একমাত্র পুত্র কুঞ্জবিহারী রায় মুর্শিদাবাদের বাড়িতেই বাস করিতেন কিন্তু কখন কখন মাইজপাড়া জ্ঞাতিগণের সহিত দেখা করিতে আসিতেন, মুর্শিদাবাদের বাড়িতেই তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হন।

গোবিন্দপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামশঙ্করের পাঁচ পুত্র মধ্যে রামহরি রায় সর্বজ্যেষ্ঠ। রামহরি রায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম অবস্থায় ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসন সময় গভর্নমেন্টর অধীনে "ক্রোক সাজোয়াল" (গভর্নমেন্টের বাকিপড়া রাজস্ব জমিদারগণ হইতে ক্রোক নিলাম দ্বারা আদায়কারী কর্মচারী) ছিলেন। পরে ঐ কর্মত্যাগ করিয়া রাজনগর রাজবাড়ির দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। রাজনগরে দেওয়ান থাকা অবস্থায় তাহার মাইজপাড়াস্থ বাড়িতে ছোট ও বড় তিনটি মঠ নির্মাণ করাইয়া উহাতে তিনটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত মঠত্রয়ের মধ্যে মাঝের মঠটি পয়ষট্টি হাতের উপর উচ্চ হইবে। পরিতাপের বিষয় এই যে তৈয়ারের সন তারিখ উহাতে উল্লেখ নাই, একস্থানে শিল্পীর পরিচয়ে দেখা যায় এই মাত্র লিখিয়াছে "শ্রীজয়নারায়ণ রাজ সাং জসদীয়া পরগণে ফতেবাদ"।

১২৯২ সনের ৩১ আষাঢ় মঙ্গলবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া উচ্চ মঠটির চূড়াসহ কতক অংশ ভূপতিত হয় ; এবং মৃত বিনোদবিহারী রায়ের চেষ্টায় ও উদ্যোগে ১২৯৩ সনের বৈশাখ মাসে উহা পুনঃ মেরামত করা হয়।

রামহরি রায় তাহার বাড়ির একখণ্ডে ২৪ হাত দীর্ঘ ও ৫ হাত প্রস্থ পাকা খিলান দেওয়া দালান দেন। এই দালানের দক্ষিণের বারান্দাও খিলান দেওয়া, দীর্ঘ ২৭ হাত প্রস্থ ৪।। হাত, দালানের কোন সাতির বর্গা নাই, দালান কুঠরিতে বিভক্ত। ইনি কাশীধাম হইতে পাষাণময়ী কালীমূর্তি আনাইয়া মধ্যের কোঠায় প্রতিষ্ঠা করেন, এবং পূর্ব ও পশ্চিম দুই কুঠরিতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। উত্তরাধিকারী সেবাইতগণ ঐ সকল দেবতা ও শালগ্রাম শিলা ও লক্ষ্মী-গোবিন্দ বিগ্রহের দৈনিক ভোগাদি দিয়া সেবা করিতেছেন। প্রতিষ্ঠিত কালী 'করুণাময়ী' নামে খ্যাত, এই মূর্তি রায় বাবুদিগের কুলদেবতা, তথায় দৈনিক চণ্ডী পাঠ হয়। রামহরি রায় কতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া তাহার স্বীয় নামে এক তালুক সৃষ্টি করেন। ঐ তালুক ঢাকা কালেক্টরীর তৌজির ৬৬০ নং।

রামহরি রায়ের সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকানাই রায় এক সময় ঢাকা আপিলান্ট কোর্টের উকিল ছিলেন। সেই সময় রাজনগরের রাজাদিগের পতন অবস্থা, রামকানাই রাজনগরের কতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া তালুক রামকানাই রায় সৃষ্টি করেন। এই তালুক ঢাকা কালেক্টরীতে ১৭৫নং তৌজি ভুক্ত।

রামকানাই রায়ের পুত্র তারাপ্রসাদ রায় অতিশয় বুদ্ধিজীবী ও প্রবল জমিদার বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পৌত্র বিলাসচন্দ্র রায় বর্তমানে ঢাকাতে ওকালতি করিতেছেন।

রামহরি রায় অপুত্রক থাকায় রামকিশোর রায়কে দত্তক পুত্রগ্রহণ করেন। রামকিশোর রায় ঢাকা আপিলান্ট কোর্টে ওকালতি করিতেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান পরোপকারী ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। রামকিশোর তাহার ওকালতির এক সময় শ্রীনগরের বাবুদিগের পরগণে বৈকুণ্ঠপুর সম্পত্তি নিলামে খরিদ করেন। কিছুদিন পর শ্রীনগরের স্বর্গীয় লালা কৃষ্ণকুমার বসু মহাশয় সম্পত্তি চাহিবা মাত্র ছাড়িয়া দেন, আর এর সময় ময়মনসিংহ জিলাস্থ কালিপুরের কতক জমিদারি নিলামে খরিদ করিয়া উক্ত বাবুদিগের অনুরোধে ছাড়িয়া দেন। ইদানীং এই প্রকার উদারতা প্রায় দেখা যায় না। রামকিশোর রায় তাহার পৈত্রিক সম্পত্তির সহিত নিজে কতক সম্পত্তি খরিদ করিয়া অবস্থার বহু উন্নতি করেন। তিনি রাজনগরের রাজাদিগের কতক জমিদারি নিলাম হওয়ায় ১৩২১ সনে জোয়ার শ্যামসিদ্ধি খরিদ করেন, উহা বর্তমানে ঢাকা কালেক্টরির ৩৯২ নং তালুক। ইহা ভিন্ন তিনি পরগণে কার্তিকপুর মধ্যেও কতক তালুক খরিদ করেন তাহা ফরিদপুর কালেক্টরির তৌজি ভুক্ত।

রামকিশোর অতিশয় ধার্মিক ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করার জন্য তাহার প্রবল উৎসাহ ছিল। ইনি পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া বহু তন্ত্র গ্রন্থ সংগ্রহ করেন, এবং সমস্ত মহাভারত নকল করা। ঐ সকল গ্রন্থ তাহার উত্তরাধিকারীগণের নিকট এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে। ইনি অসাধারণ বলিষ্ঠ ছিলেন। তৎকালীন প্রচলিত গোট টাকা ক্রমে টিপিদ্বারা বেকিয়া ফেলিতে পারিতেন।

রামকিশোর রায়ের তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ হরিকিশোর, মধ্যম আনন্দবিহারী ও কনিষ্ঠ রাজবিহারী। হরিকিশোর ঢাকায় তৎকালীন জজ সাহেব বাহাদুরের সেরেস্তাদার ছিলেন, পরে ঢাকাতেই কয়েকবৎসর ওকালতি করেন। সংস্কৃত ও পার্শী ভাষায় তাহার বিশেষ জ্ঞান ছিল, তাহার পাণ্ডিত্য গুণে সন্তুষ্ট হইয়া বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহতব চান্দ বাহাদুর সম্পাদিত সংস্কৃত মহাভারত ও কলিকাতা শোভাবাজার নিবাসী রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাহার সংগ্রহ শব্দকল্পদ্রুম নামক বৃহৎ সংস্কৃত অভিধান সাদরে উপহার দেন।

রামকিশোরের দ্বিতীয় পুত্র আনন্দবিহারী কলিকাতা সদর দেওয়ানি আদালতে মিছিল খাঁ (পেস্কার) ছিলেন। অল্প বয়সেই কাল প্রাপ্ত হন। রামকিশোরের কনিষ্ঠ পুত্র রাজবিহারী রায় ঢাকা কমিশনার অফিসের মহাফেজ ছিলেন। তিনি অতি বিজ্ঞ ও সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন, তাহার অবিচলিত ভ্রাতৃ-ভক্তি ছিল। আজকাল এইরূপ ভ্রাতৃ-ভক্তি অতি বিরল। মাইজপাড়ার নিকটবর্তী গ্রামসমূহে এই ভ্রাতৃত্রয়ের জ্ঞানী, ধার্মিক ও পরোপকারী বলিয়া খ্যাতি ছিল। এক সময় ভ্রাতৃত্রয় তাহাদের কোন সরিক ভ্রাতার সম্পত্তি নিলামে খরিদ করিয়া পরে বিনামূল্যে উক্ত সরিকের স্ত্রীর নামে লিখিয়া ছাড়িয়া দেন।

হরিকিশোরের এক পুত্র অন্নদাকিশোর বহুকাল পুলিশের ইনস্পেক্টর ছিলেন, এবং প্রশংসার সহিত কার্য করিয়া গভর্নমেন্ট হইতে ঘড়ি, চেন্ পুরস্কার প্রাপ্ত হন। কতক বৎসর পেনশন ভোগ করিয়া পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠপুত্র উমাকিশোর রায় স্কুল বিভাগে ডেপুটি ইনস্পেক্টর ছিলেন, এবং যশের সহিত কার্য করিয়া পেনশন প্রাপ্ত হন।

উমাকিশোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমদাকিশোর রায় নোয়াখালী জিলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া দশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ঢাকা কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করিয়া ২০ টাকা বৃত্তি পাইয়া উক্ত কলেজ হইতে বি. এ. পাশ করেন। ঢাকা কলেজ হইতে পদার্থ বিজ্ঞানে এম. এ. পরীক্ষা দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন, বি. এল. পরীক্ষায় পাশ করিয়া আসাম প্রদেশে শিবসাগরে ওকালতি আরম্ভ করেন। পরে জোরহাট হেড কোয়ার্টার স্থানান্তরিত হওয়ায় জোরহাট ওকালতি করেন। শিবসাগর ওকালতি করার সময়ই ইনি গভর্নমেন্টের উকিল পদে নিযুক্ত হন, এবং সুচারুরূপে কার্য নির্বাহ করেন। তাহার কার্যের পুরস্কার স্বরূপ ইনি গভর্নমেন্ট কর্তৃক রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। ইনি ধীর ও শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন

মাইজপাড়া[৬] বিক্রমপুরের একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। শ্রীনগর থানার অন্তর্গত। শ্যামসিদ্ধি, কুশারীপাড়া প্রভৃতি ইহার নিকবর্তী উত্তর সীমা—মাঠাগাঁও, পূর্বে পরাণীমণ্ডল, পশ্চিম সীমায় রাঢ়ীখাল ও দক্ষিণে দামলা। এই গ্রামে রায় পরিবার বিশেষ খ্যাতিমান। ইহাদের পূর্বপুরুষ রামচন্দ্র শর্মা আদিশূরের আনীত কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণক্ষিতীশ শর্মা হইতে দ্বাবিংশ পুরুষ। রামচন্দ্র শর্মা সুলতান সুজার সময়ে মুর্শিদাবাদ হইতে অত্যাচার ভয়ে এই গ্রামে আগমন করেন। খানাবাড়ি সংশ্লিষ্ট রামচন্দ্র শর্মা নামে তালুক অদ্যাপি সুপ্রচলিত। এখানে এই পরিবারের সংক্ষিপ্ত বংশলতা প্রদত্ত হইল। রত্নেশ্বর শর্মা ইনি কোনও নবাবের দেওয়ান ছিলেন বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত। গোবিন্দপ্রসাদ মুর্শিদকুলি খাঁর সময় ১১২৮ ইংরাজি ১৭২২ খ্রিঃ অঃ নাওয়ার বিভাগের দেওয়ান ছিলেন। মাইজপাড়ার প্রাচীন রায় উপাধিধারী জমিদারবর্গের নাম বহুকাল হইতে বিখ্যাত। রায় জমিদারগণ নানা স্থান হইতে কুলীন আনয়নপূর্বক কন্যা সম্প্রদান করিতেন। জমিদার রামকানাই রায় মহাশয় কুলীনমেলে ভরদ্বাজ গোত্রীয় বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় নামক একজন অতি প্রসিদ্ধ স্বকৃত ভঙ্গ কুলীনের নিকট স্বীয় কন্যা তিলোত্তমা দেবীকে সম্প্রদান করেন। রায় পরিবারের মধ্যে বর্তমান সময়ের প্রধান শ্রীযুত প্রমদাকিশোর রায় এম. এ. বি. এল। ইনি বর্তমান সময় আসামের অন্তর্গত জোরহাটের গভর্নমেন্টের উকিল। প্রমদাবাবু দেশ-হিতৈষী, সদাশয় এবং শিক্ষা বিষয়ে মুক্ত হস্ত। আসামে তাহার ন্যায় অতিথি-বৎসল ব্যক্তি অতি অল্প দৃষ্ট হয়। জোরহাটে তাহার বাসায় থাকিয়া বহু দরিদ্র শিক্ষা লাভ করে।

(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের প্রণীত বিক্রমপুরের বিবরণ হইতে উদ্ধৃত হইল।)

মাইজপাড়া গ্রামে ইহাদের প্রতিষ্ঠিত মহাদেবের মন্দির ইত্যাদি অতি সুন্দর।

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্ত মহাশয়ের সৌজন্যে প্রকাশিত হইল।

[সুলতান আজিম ওসানের প্রদত্ত খেলাৎ]

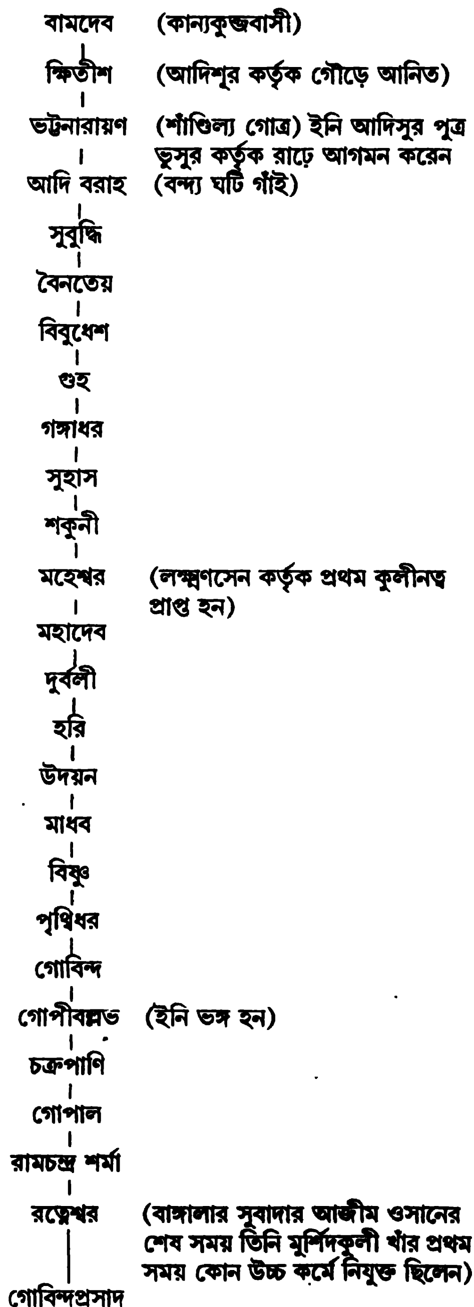
মাইজপাড়ার দেওয়ানি ফর্মন ঃ

(বিশেষণ সমন্বিত) রত্নেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়... সুবার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিয়া আদেশ দেওয়া যায় যে, তিনি প্রচলিত প্রথা ও নিয়ম অনুসারে, সরকারি মালজাৎ এবং সায়ের জাৎ রাজস্ব আদায় জায়গীরদারগণের কার্য ও সাধারণত রাজকর সম্বন্ধীয় সমগ্র ব্যবস্থা পরিদর্শন করিবেন। *** প্রথা মত রাজকীয় সমুদয় ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট রাজস্ব রাজকোষে প্রেরণ করিতে হইবে এবং ইহার হিসাব পূর্বতন দেওয়ানের হিসাবও *** সদরে পাঠাইবেন। যাহাতে আমাদের সুখ-শাসনে প্রজাবর্গ বর্ষে বর্ষে ** নিরাপদে গৃহ, আবাদ ও অন্যান্য অধিকার ভোগ করিতে পারে এবং দেশের ঐশ্বর্য ও সুখ বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য তাহাদের প্রতি সদয় ও কোমল ব্যবহার করিতে আদেশ প্রদত্ত হইতেছে।

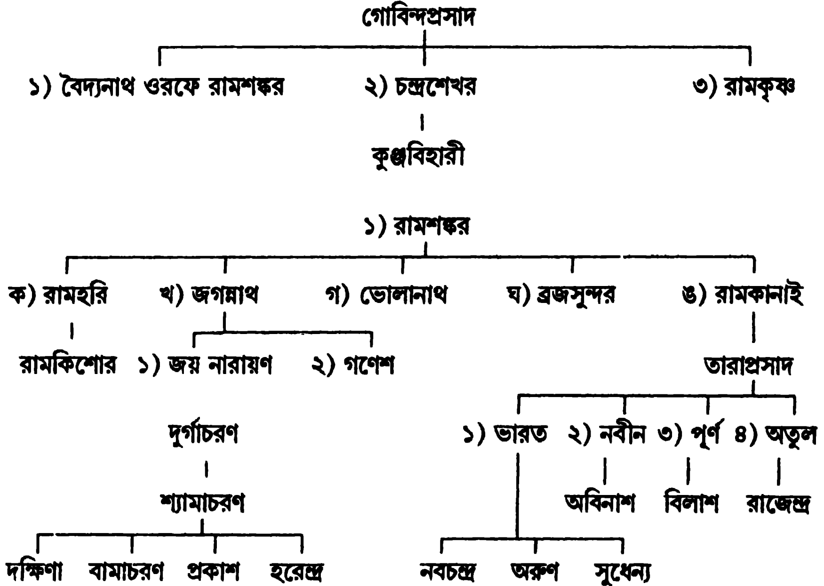
* * * *

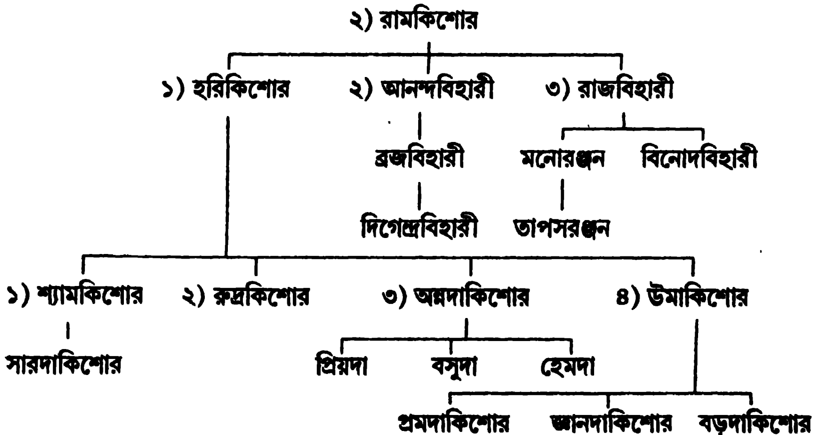
[পার্শী ভাষা হইতে বঙ্গানুবাদ হইল, স্থানে স্থানে কীট দষ্ট]

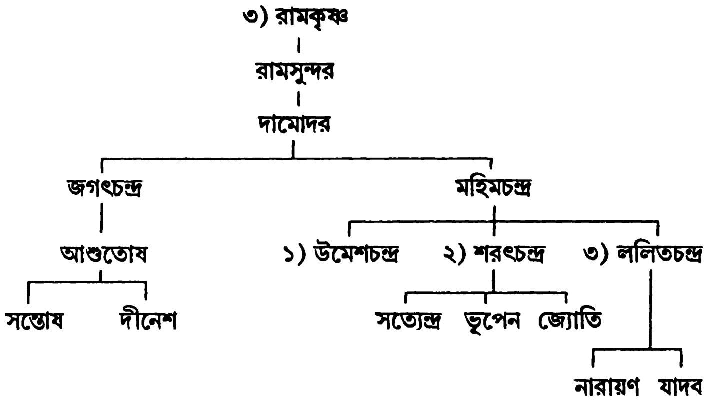
মাইজপাড়া রায়বংশের কুশীনামা



গোবিন্দ প্রসাদ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সময় ১১২৮ সনের এবং ইংরাজি ১৭২২ খ্রিস্টাব্দ হইতে পূর্ব নাওয়ার বিভাগের দেওয়ান ছিলেন এবং নবাব সরকার হইতে অনুমতি ক্রমে দিল্লি সম্রাটের অনুগ্রহে "রায়" সম্মানজনক উপাধি প্রাপ্ত হন। ১১২৮ সন বঙ্গাব্দ ইংরাজি ১৭২২ সনে ইনি মাইজপাড়া গ্রামে দুর্গোৎসব আরম্ভ করেন। আজ পর্যন্তও উত্তরাধিকারীগণ দুর্গা পূজা করিয়া আসিতেছেন।







মাইজপাড়া রায় বাবুগণের রেকর্ড রুম হইতে ১২৩৭ সনের লিখিত ফিরিস্তি হইতে প্রাপ্ত দলিলের সঙ্গে "মোঘল রাজত্বে" ভারতবর্ষে উপাধিপত্রের বিশিষ্টতার নিদর্শন পত্র যাহা জোড়হাট আসাম হইতে রায় শ্রীযুক্ত প্রমোদাকিশোর রায় বাহাদুর কর্তৃক প্রেরিত তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল যথা—

বাবু—মাস্টার, স্যার, সম্ভ্রান্তব্যক্তি, হিন্দুদিগের সম্মানজনক উপাধি, ইহা সম্ভ্রান্ত হিন্দু বা উচ্চ পদস্থ হিন্দু কর্মচারীর প্রতি প্রযোজ্য হইয়া থাকে।

ক্রোরী—এক কোটি সংখ্যক দাম[৭] আদায়কারী কর্মচারী, মুসলমান গবর্নমেন্টের কোন দেশের অংশ বিশেষের চিরস্থায়ী রাজস্ব সংগ্রাহক। সময় সময় তাহাকে সামান্য কাষ্ঠের জন্য জবাবদিহি করিতে হইত। এই কর্মচারী আকবরের রাজত্বকালে ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম নিযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

দেওয়ান—দরবার গৃহ, রাজস্ব বিভাগের দেশীয় মন্ত্রী। কোন এলাকার দেওয়ানী মোকর্দ্দমার প্রধান বিচারক। কোন প্রদেশের রাজস্ব সমূহের সর্বপ্রধান 'রিসিভার' (তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী)। জমিদার বা ইউরোপীয় রাজস্ব সংগ্রাহকের অধীন প্রধান রাজস্ব কর্মচারীকেও সাধারণভাবে এই উপাধি প্রদান করা হইত। মোঘল সম্রাট প্রদত্ত সনন্দ বলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চিরস্থায়ীভাবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব সমূহের সর্বপ্রধান রিসিভার নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। (দেওয়ানী দেখ) বিক্রমপুর প্রথম খণ্ড—প্রাণকৃষ্ণ দেওয়ান।

সাবন্দর—রাজবন্দরের রাজ-ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি। ঢাকার গভর্নমেন্টের শুল্ক গৃহ।

শিকদার—আমলদারের উপাধি, উত্তর সরকারে আমলদারগণ দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়কারীর ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি।

লালা—এই উপাধি নবাব স্বয়ং দিল্লি সম্রাট হইতে লিখিয়া আনিতেন। নবাবের মন্ত্রণা গৃহের পারিষদবর্গকে এই উপাধি দেওয়া হইত অর্থাৎ নবাবের মন্ত্রিদিগকে বৃদ্ধ বয়সে "লালা" আখ্যা দেওয়া হইত। (শ্রীনগর অধ্যায় দেখ) এবং সম্রাট কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানজনক উপাধি বংশানুক্রমেই ভোগ করিতে পারিত। আজকাল পশ্চিম দেশের লোকে "লালা" বিকৃত অর্থে ব্যবহার করে।

তালুকদার—তালুকের মালিক দখলকার। বা তালুকের অধিকারী। তালুকদারগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার বিশেষ। কোন কোন তালুকদার উপরিস্থ জমিদারের বরাবরে সরকারে রাজস্ব প্রদান করিয়া থাকেন ; এবং তাহারা প্রজাদিগের নিকট হইতে যে খাজানা আদায় করেন, তাহার হিসাব নিকাশ উপরিস্থ জমিদারদিগের নিকট দিয়া থাকেন। অপর তালুকদারগণ প্রত্যক্ষভাবে

গবর্নমেন্টকে রাজস্ব প্রদান করেন। পূর্বোক্ত তালুকগুলি 'মজকুরী' নামে প্রসিদ্ধ, এবং শেষোক্ত তালুকদারগণ অন্য নিরপেক্ষ (Indipendent)।

জমিদার—জমিন=মৃত্তিকা, ভূমি। দার=মালিক বা রক্ষক এই দুই শব্দের যোগে জমিদার শব্দের উৎপত্তি, সুতরাং জমিদার শব্দের অর্থ জমির তত্ত্বাবধায় কর্মচারী অর্থাৎ জমি সংরক্ষণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। ভূস্বামী (পরিভাষায় এতদ্‌সম্বন্ধে বহু উদাহরণ দৃষ্ট হইয়াছে) মুসলমান শাসনকালে যাহার হস্তে কোন জেলার জমি সমূহের ভার অর্পণ করা হইত অর্থাৎ যাহার তত্ত্বাবধানে জমি রক্ষিত হইত তিনিই জমিদার বলিয়া কথিত হইতেন। তিনি রাজস্ব হিসাবে চাষী প্রজাদিগের রক্ষক ছিলেন এবং জেলার উৎপন্ন দ্রব্যের গবর্নমেন্টের প্রাপ্য অংশ অথবা তৎমূল্যস্বরূপ টাকা আদায় করিতেন। এই আদায়ী টাকা হইতে জমিদারগণ শতকরা দশ টাকা হারে কমিশন পাইতেন। গবর্নমেন্টের বিশেষ সনন্দবলে সময় সময় তাহারা স্বীয় জীবিকা নির্বাহার্থ কোন কোন গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যের গবর্নমেন্টের প্রাপ্য অংশ প্রাপ্ত হইতেন। ইহাই নানকর জমি নামে প্রসিদ্ধ।

মধ্যে মধ্যে এই পদের নিয়োগ নরীভূত করা হইত। এই সকল জমিদার যে পর্যন্ত গবর্নমেন্টের সন্তোষ বিধান করিয়া কাজ চালাইতে পারিতেন, তাহারাই এই পদে স্থায়ী থাকিতে পারিতেন, এবং তাহাদের উত্তরাধিকারীগণও এই পদ উপভোগ করিতে পারিতেন। মুসলমান গবর্নমেন্টের পতনাবস্থায় যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকে, সেই বিপ্লবের সুযোগে জমিদারগণ তাহাদের বহু দিনের ভোগ দখলের তত্ত্বাবধানীয় জমির অধিকারিত্ব পুরুষাণুক্রমে দাবি করিয়া থাকেন। তখন গবর্নমেন্ট ঐ দাবি মঞ্জুর করিতে বাধ্য হয়। বিশেষত বঙ্গদেশের জমিদারগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে তাহাদের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত জমিসমূহে পুরুষাণুক্রমে প্রোপাইটারি (মালিক দখলিকার) স্বত্বে স্বত্বাবান ছিল।

খাসনবিস—গবর্নমেন্টের কেরানি অথবা হিসাবপরীক্ষক সম্বন্ধীয়। সুবাদারের আবওয়াব বা করপ্রাপ্তির বিধিবদ্ধ নিয়ম বা সুবাদারের ধার্য কর। জাফর খাঁ ইহা প্রবর্তিত করেন, জমিদারদিগের বার্ষিক পাট্টা পরিবর্তনের সময় মুচ্ছদ্দি বা খালসার কেরানিরা জমিদারদিগের নিকট হইতে এই কর আদায় করিতেন। ইহা পরে অন্যান্য বিষয়েও অনুবর্তন করিয়াছেন। (See Solaghar)

ঢাকার নিয়াবত (Neabut of Dacca)—পূর্বে ঢাকা প্রদেশ সুবাদারী গবর্নমেন্টের প্রধান স্থান ছিল। তখন ইহার নাম ছিল জাহাঙ্গীরনগর। এবং খালসা রেকর্ডে ইহা (Ichlampoor) নামে পরিচিত। জাফর খাঁর শাসনকালে ১৭১৭ খ্রিঃ অব্দে বঙ্গদেশের রাজপ্রতিনিধির রাজধানী বর্তমান মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হইবার পর হইতেই এই ঢাকা নায়েব বা সুবার ডেপুটি কর্তৃক শাসিত হইত। সময় সময় এই সুবাদারের প্রতিনিধি সম্রাটের বিশ্বস্ত ও কর্মঠ এবং দেওয়ান পদের উপযুক্ত হইলে তাহাকে দেওয়ানের পদও দেওয়া হইত। এই প্রকারে আলিবর্দ্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র সাহামত জঙ নিবাইস মহম্মদ খাঁ সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনারোহণের পূর্বে তাহার (নিবাইস মহম্মদের) মৃত্যুকাল পর্যন্ত বহু বৎসর এই উভয়বিধ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তিনি নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এই দুই বিভিন্ন পদের অপব্যবহার করিয়াছিলেন। পরস্পর পরস্পরকে বাধা দিবার জন্য এই বিভিন্ন পদে দুই জন ব্যক্তির নিয়োগ হইত। কিন্তু তিনি উভয়বিধ উচ্চপদ স্বীয় গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখিয়া নিজ এলাকার জমির রাজস্বের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, এবং রাজস্ব সরকারে প্রদান না করিয়া স্বয়ং আত্মসাৎ করিতেন। সরকারে ইহার কোন হিসাব নিকাশ দিতেন না এবং পূর্ব নির্ধারিত ওয়াশীল জমা তুমারী নামক রাজকর ব্যতীত আর কোন রাজস্ব সরকারে প্রদান করিতেন না।

সরগার (Sharagar)—প্যাদা বা পিয়নদিগের তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী, স্বদেশরক্ষী সৈন্যদল অথবা যে কোন কর্মচারী।

চৌধুরী—হিন্দু রাজত্বকালের জমির চিরস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক অথবা তৎকালের রাজস্ব-

তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী। কিন্তু মুসলমান রাজত্বকালে প্রথমত ক্রোরী পদের নিয়োগ দ্বারা পরে জমিদার পদের নিয়োগ দ্বারা আংশিকভাবে চৌধুরী পদ বাতিল করা হইয়াছিল (Superseded)।

১৭৮৯ সনের ২৯ সেপ্টেম্বর সাহাবাদের কালেক্টর কর্তৃক বোর্ড অব রেভিনিউর নিকট লিখিত অনুবাদ।

"পালওমান সিংহের পুত্র বাবু জগরনাথ সিং এবং বাবু ছিন্নত সিং ১৭৭১ খ্রিঃ অব্দে রোটাসের কালেকটার পামার সাহেবের বরাবরে পাটনা কাউন্সিলে বর্ণনা দাখিল করে যে, তাহাদের জমিদারিতে ৮৭৪ $\frac{৩}{১২}$ খানা গ্রাম আছে। এবং ১৭৭২ সনের ৯ নভেম্বর তাহাদের জমিদারির অন্তর্গত ২৯ খানা গ্রাম এওজসূত্রে বাস্টিটার্ট, বারওয়েল এবং পক সাহেবের স্বাক্ষরিত সনন্দবলে তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ঐ পরগণার অধিবাসীদিগের দাখিলি বর্ণনায় দেখা যায় যে উল্লিখিত ৮৭৪ খান গ্রামের অধিকাংশই অন্যান্যের সম্পত্তি। এবং উল্লিখিত ২৯ খানা গ্রাম মালিকান স্বত্ব না থাকায় উক্ত বাবু দ্বয় ঐ সকল (২৯) গ্রামের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। কিন্তু ইহার চারি বৎসর পরে উল্লিখিত সনন্দবলে ঐ ২৯ সংখ্যক গ্রাম আমিন রেজাখুলিখাঁর কর্তৃত্বে আবার তাহাদের অধিকারে আইসে।

বকসী—বেতন প্রদানকারী কর্মচারী। প্রধান সেনাপতি।

মুন্সি—পত্রলেখক কর্মচারী। সম্পাদক। যে সকল দেশীয় লোক ইউরোপীয়ানদিগকে পারসি ভাষা শিক্ষা দেন, ইউরোপীয়ানগণ তাহাদিগকে মুন্সি আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন।

রাজা—কিং, প্রিন্স, (ভূপতি বা যুবরাজ), সামন্ত, প্রধান সর্দার। প্রাচীনকালে সামরিক হিন্দু জাতির নেতা বা প্রধান ব্যক্তিকে এই উপাধি দেওয়া হইত।

রায় রাওয়ান বা রায়ন—হিন্দু উপাধি। ইহা খালসাদিগের প্রধান কর্মচারীর উপাধি। রাজকোষের প্রধান কোষাধ্যক্ষকেও এই উপাধি প্রদান করা হইত।

সুবাদার—কোন প্রদেশের রাজপ্রতিনিধি বা শাসন কর্তা। (সুবা দেখ) পদ মর্যাদায় রণতরির অধ্যক্ষের (Captain) সমকক্ষ দেশীয় সামরিক কর্মচারীকেও এই উপাধি প্রদান করা হইত।

মজুমদার—(মজুমদার) সমগ্র আদায়ী রাজস্বের ভার যাহার উপরে অর্পিত হইত। কোন জেলা বা প্রদেশের রাজস্বের অস্থায়ী হিসাবনবিস।

নায়েব—ডেপুটি।

নায়েব নাজিম—নাজিম বা গবর্নরের ডেপুটি।

পেশকার—প্রধান কার্যকারক, ম্যানেজার, প্রধান সাহায্যকারী।

সরকার—কোন বিষয়কর্মের নেতা। রাজ্য, গবর্নমেন্ট। কোন প্রদেশের বৃহত্তম বিভাগ। প্রধান ব্যক্তি। বঙ্গদেশবাসী ইউরোপীয়ানগণ সরকারি আফিসে নিযুক্ত হিন্দু লেখক ও হিসাবনবিস কর্মচারীকে সরকার নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এবং সময় সময় তাহাদিগের প্রাইভেট কার্যে নিযুক্ত, হিন্দু লেখক কর্মচারী ও হিন্দু হিসাবনবিসকেও এই উপাধি দেওয়া হইত।

হাবেলী—গৃহ, বাসস্থান, অধিকার। (বঙ্গদেশের জমিদারগণের নিজ ব্যবহার্য জমিকে হাবিলি বলা হইত) কিন্তু মাদ্রাজ প্রদেশে কোন জমিদার বা জায়গিরদারের মধ্যবর্তীতা ব্যতীত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্নমেন্টের খাস কর্মচারী দ্বারা আদায় করা হইয়া থাকে। অন্য কার্যকারকের যোগে ইহার রাজস্ব আদায় করা হয় না। বঙ্গদেশে 'খাস' কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় মাদ্রাজে সে অর্থে 'হাবিলি' শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে।

নিজামত—বন্দোবস্ত। গবর্নমেন্ট নাজিম অথবা নিজামের আফিস। ফৌজদারি বিচার বা শাসন।

নাওয়ারা—নৌস্থাপন। নৌকাসমূহের বন্দোবস্ত।

ইজারা—জোত জমি। জমি বা খাজনার পাট্টাপত্র।

ইজারাদার—যে জমির ইজারা গ্রহণ করে, অথবা খাজনায় ইজারা গ্রহণ করে।

নয়াব (নবাব)—উচ্চ ডেপুটি অর্থাৎ সুবাদারের উচ্চ প্রতিনিধি, রাজপ্রতিনিধি, কোন প্রদেশের শাসনকর্তা। মোঘল গবর্নমেন্টের অধীন কোন প্রদেশের শাসনকর্তা উচ্চ পদাভিষিক্ত পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকেও নবাব উপাধি দেওয়া হইত।

নাজিম—রচনাকারী, বন্দোবস্তকারক, ব্যবস্থাপক, মীমাংসক, কোন প্রদেশের সর্বপ্রধান কর্মচারী বা শাসনকর্তা, ফৌজদারি বিচার বিভাগের প্রধান মন্ত্রীকে ও নবাব ও সুবাদার উপাধি প্রদান করা হইত।

শাসনকালে যাহার হস্তে কোন জেলার জমি সমূহের ভার অর্পণ করা হইত অর্থাৎ যাহার তত্ত্বাবধানে জমি রক্ষিত হইত তিনিই জমিদার বলিয়া কথিত হইতেন। তিনি রাজস্ব হিসাবে চাষী প্রজাদিগের রক্ষক ছিলেন এবং জেলার উৎপন্ন দ্রব্যের গবর্নমেন্টের প্রাপ্য অংশ অথবা তৎমূল্য স্বরূপ টাকা আদায় করিতেন। এই আদায়ী টাকা হইতে জমিদারগণ শতকরা দশ টাকা হারে কমিশন পাইতেন। গবর্নমেন্টের বিশেষ সনন্দবলে সময় সময় তাহারা স্বীয় জীবিকা নির্বাহার্থ কোন কোন গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্যের গবর্নমেন্টের প্রাপ্য অংশ প্রাপ্ত হইতেন। ইহাই নানকর জমি নামে প্রসিদ্ধ।

১. শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত বিক্রমপুর বিবরণ : "আরিয়ল বিলের উৎপত্তির ইতিহাস নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে কল্পনা বলে বলা যায় যে, সে সময়ে বিক্রমপুরের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল, হয়ত তাহারই কোন অংশে বিলের আয়তন প্রাপ্ত হইয়াছিল।"

২. পাঠানগণের সময়ে ভৌমিকগণের যে স্বাধীনতা ছিল, মোঘলদিগের বঙ্গাধিকারের পর তাহাদের সে স্বাধীনতা খর্ব হইবার উপক্রম হয়। সুতরাং তাহারা মোঘলগণকে বঙ্গাধিকারে বাধা প্রদান করেন। মোঘলগণের বঙ্গাধিকার পক্ষে যে বাধা বড় বিষম বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাংলার কয়েকজন ভূম্যধিকারী সেই সময়ে যদি মোঘলপক্ষে সহায়তা না করিতেন, তাহা হইলে বঙ্গদেশের সকল অংশ অধিকার করা তাহাদের কঠিন হইয়া দাঁড়াইত। আকবর বাদশাহ যখন দিল্লির সিংহাসনে সমাসীন, মোঘল গৌরব রবি যখন মধ্যাহ্ন কিরণ বিকিরণ করিতেছেন, বঙ্গের কয়েকজন ভৌমিক সেই সময়ে মোঘলদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তাহাতে ভৌমিকগণ তখন কিরূপ বলবীর্য সম্পন্ন ছিলেন, স্বতঃই প্রতীত হয়। বাংলার শেষ পাঠান নৃপতি দায়ুদ খাঁর হস্ত স্খলিত হইয়া বাংলার মসনদ মোঘলগণের অধিকারে আসিলে, প্রথমে মোঘল দরবার হইতে বাংলার জন্য মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই মুসলমান শাসন কর্তৃগণ বাংলায় বিশেষরূপ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। পাঠান ও মোঘল ভূম্যধিকারিগণ, পূর্বে যাহারা আসিয়া বাংলায় প্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন, তাহারাও বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহেন নাই ; পরন্তু বাংলার হিন্দু ভূম্যধিকারীবর্গও অনেকে মোঘলশাসনের বিরুদ্ধাচারে প্রবৃত্ত হন। তখন, সূক্ষ্মদর্শী আকবর বাদশাহ, হিন্দু শাসনকর্তার দ্বারা বঙ্গদেশ শাসনে প্রবৃত্ত হন।

—পৃথিবীর ইতিহাস—চতুর্থ খণ্ড ২৪৬ পৃষ্ঠা। ভারতবর্ষ।

৩. গোবিন্দপ্রসাদের ধর্মক্রিয়াকলাপের জন্য ব্রহ্মোত্তর, ভোগোত্তর শিববৃত্তি নানকার, চাকরাণ, চেরাগি প্রভৃতি অনেক দলিল ইত্যাদি গত সেটেলমেন্টের সময় দৃষ্টিগোচর হয়।

ভারতবর্ষ ২৪৭ পৃষ্ঠা "প্রাচীন বঙ্গের গৌরব বিভব" হইতে সংগৃহীত। যেমন ভৌমিকগণের দমনের জন্য, তেমনই মগ (আরাকান), ফিরিঙ্গি (পর্তুগীজগণের) আক্রমণ নিবারণ জন্য ঢাকা শহর 'নৌয়ারা' বা নৌবহর স্থাপিত হইয়াছিল। সেই নৌবহরের ব্যয় নির্বাহ জন্য আকবর বাদশাহ কতকগুলি পরগণা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন নৌয়ারা রক্ষার জন্য নৌযানাদির উপর একটি কর ধার্য হইয়াছিল। এরূপ স্থান হইতে অন্য স্থানে যে সকল পোত গতিবিধি করিত, তাহাদিগকে সেই শুল্ক দিতে হইত। প্রথমে তিন সহস্র পোত লইয়া নৌয়ারা গঠিত হইয়াছিল। পরিবেবে নৌশারার জন্য ৭৬৮ খানি রণতরী নির্দিষ্ট থাকে। তখন জমিদারগণ জায়গির হিসাবে আবশ্যকমত অধিক রণতরী সরবরাহে বাধ্য থাকেন। ৯২৩ জন পর্তুগিজ বা ফিরিঙ্গি নৌবহরের নাবিকের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। নৌবহর রক্ষায় মাসিক ব্যয় পড়িত

২৯,২৮২ টাকা চট্টগ্রাম হইতে ব্রহ্মপুত্র তীরস্থিত রাঙামাটি পর্যন্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য ৮,১১২ জন সৈন্য এবং ৩৫৯১৮০ টাকা ব্যয় নির্দিষ্ট ছিল। শ্রীহট্ট অঞ্চলে তখন পোত নির্মাণপযোগী কাষ্ঠাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইত, সেই সকল কাষ্ঠে ঐ সকল পোত নির্মিত হইত।

N.B. (1) Blockman's Contributions to the Geography and History of Bengal, Mahammadan Period. (2) Tailors Topography and Statistics of Dacca. (3) আইন-ই-আকবরী।

৪. শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন ২০ মনে এক ধামা। ২৫০ মনে এক ধাম নৌকা। পুরাতন প্রসঙ্গে গোবিন্দপ্রসাদ রায় নাওয়ারার বিভাগের দেওয়ানি নিযুক্ত থাকাকালীন বিক্রমপুর অঞ্চলে নিম্নলিখিত কয়েকটি পুরাতন প্রসঙ্গ অবগত হওয়া যায়।

১. **ঘাসি নৌকা :** পাঠান রাজত্বকালে নৌমহলের কর্তৃপক্ষের উপর অশ্ব ও হাতির খাদ্য সংগ্রহের জন্য ঘাট মাঝিদিগের উপর প্রত্যহ যুদ্ধের ব্যবহৃত অশ্ব ও হাতির জন্য ঘাস প্রেরিত হইত। যে নৌকায় ঘাস পাঠান হইত তাহাকে ঘাসি নৌকা বলা হইত। ঘাসি নৌকাসমূহ কোন সময়েও অন্য কার্যে ব্যবহৃত হইত না। পাঠান রাজত্বের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময়েও মাঝিগণ নৌকার সম্মুখভাগে কতক ঘাস রাখিয়া অন্য রবিশস্য পূর্ণ করিয়া ঘাট মাঝির হাত হইতে করের দায়ে পরিত্রাণ পাইত। পাঠান রাজত্ব সময়ে ঘাট মাঝিগণ ঘাসি নৌকাসমূহ বেগার খাটাইত। অদ্যাপি ঐ সব নৌকার নাম ঘাসি নৌকা নামে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

২. **গহেনা নৌকা :** পাঠান শাসন সময়ে যে সব নৌকার রাজকার্যের জন্য কর্মচারীগণ মফঃস্বল যাতায়াত করিতেন তাহাকে গমনাগমন বলা হইত। অর্থাৎ যাহার দ্বারা জলপথে গমনাগমন করা হইত তাহাকে "গমনাগমন" বলা হইত। ইস্ট ইন্ডিয়া কোং-র সময় হইতে "গমনাগমন" শব্দের অপভ্রংশ গহেনা নৌকা বলিয়া প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। গহেনা নৌকাসমূহও অন্তর্ভুক্ত ছিল। নানাপ্রকার চিত্র-বিচিত্রে রঞ্জিত করিয়া নবাব কর্মচারীগণ সর্বদা এইসব নৌকা ব্যবহার করিতেন বলিয়া সর্বসাধারণ লোক ঐ সব নৌকাগুলিকে সম্মানের চক্ষে দেখিত।

৩. **পাল্কি :** পাঠান রাজত্বকালেই বিক্রমপুরে পাল্কির প্রচলন আরম্ভ হয়। পাঠান রাজত্বের পূর্বে এতদ্দেশে পাল্কির প্রচলন ছিল কিনা, তাহা অনুসন্ধান করা বড়ই কষ্টসাধ্য। সাধারণ লোক কখনই পাল্কি ব্যবহার করিতে পারিত না। কাজিগণই সর্বদা পাল্কি ব্যবহার করিতে পারিতেন এবং সময় সময় জমিদারগণ যখন মুর্শিদাবাদ নবাব সরকার হইতে তলব হইত তখন, তাহারা পাল্কি ব্যবহার করিতেন। প্রত্যেক জমিদারেরই এক একখানা মূল্যবান পাল্কি ছিল। বর্তমান সময়ে আমরা যেসব পাল্কি দেখিতেছি পূর্বে এমত ছিল না। পাঠান শাসনকালে জমিদারগণের পাল্কিসমূহ রূপার ও জরির কার্যে ভূষিত হইত। প্রত্যেকখানা পাল্কি প্রস্তুত করিতে অন্তত ৫০০০ টাকা হইতে ৭০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যয় হইত। প্রত্যেকখানা পাল্কির জন্য আট জন বেহারা নিযুক্ত থাকিত। বেহারাগণ অতি উত্তম পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে পঁহুছিলে, জমিদারগণ তখন দরখাস্ত পেশ করিতেন।

৪. **শিরস্ত্রাণ :** পাঠান শাসন সময়ে বিক্রমপুর ও সোনারগাঁ প্রভৃতি অঞ্চলে পুরুষ মাত্রকেই শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিতে হইত। মুসলমানগণ টুপি এবং হিন্দুগণ উষ্ণীষ ব্যবহার করিতেন। যাহার মাথার শিরস্ত্রাণ থাকিত না তাহাকে কেহ সমাজে স্থান দিত না। এমন কী কাজি সাহেবের বিচারালয়ে গ্রামবাসিগণকে পর্যন্ত শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া যাইতে হইত। ব্রাহ্মণের জন্য সাদা উষ্ণীষ, বৈদ্য ও ক্ষত্রিয়ের জন্য লাল, বৈশ্য হলুদ ও শূদ্রের জন্য কাল বর্ণের উষ্ণীষ ব্যবহার প্রথা ছিল। হিন্দু সমাজ সর্বদা উষ্ণীষের বর্ণ দেখিয়া জাতি বর্ণ ও ধর্ম সহজে অনুমান করিতে পারিতেন।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামনীলের মাঝি বংশধরগণ পাঠান রাজত্বকালে ঘাটমাঝির কার্য করিতেন। ঘাট মাঝিগণ সর্বদা নবাব সরকার হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হইতেন। তাহাদের অধীনে ১০,০০০ হাজার গহেনার নৌকা, ১০০০ হাজার ঘাসি নৌকা, ১০,০০০ পলার নৌকা, ১০,০০০ পান্সি নৌকা, ১,০০,০০০ ছিপ নৌকা (যাহা যুদ্ধের সময় ব্যবহার হইত) থাকিত মোট ৫০,০০০ হাজার নৌকার পরিচালনে একজন ঘাট মাঝি রাখা হইত। তাহারা প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর মুর্শিদাবাদ নবাব সরকার হইতে নাম খারিজ করিয়া সনন্দ আনিতেন। (See Beghara Manjhi's Family)

৫. "Majpara Chapter written by Mr. Sasi Bhusan Dutt M. A. Principal of Krishnanagar College".

৬. অধ্যাপক শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের প্রণীত বিক্রমপুরের বিবরণ হইতে উদ্ধৃত হইল।

৭. চল্লিশ দামে এক টাকা (মুসলমান শাসনকালের মুদ্রা বিশেষ)।



অষ্টম অধ্যায়

জপসার বাবুবংশ ঃ

অধুনা লুপ্ত জপসা গ্রাম সে কালের দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত বঙ্গের একটি প্রসিদ্ধ পল্লি ছিল। অধ্যাপক রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্রের মতে 'জস্বল' জাতির বাস নিবন্ধন স্থানের নাম জপসা হইয়াছে, কিন্তু 'জস্বল' জাতির আদৌ কোন পরিচয় মিলে না, সুতরাং নামোৎপত্তির এইরূপ কারণ নির্দেশ সমীচীন মনে হয় না। বৌদ্ধ প্লাবিত বিক্রমপুর অঞ্চলে 'সার' যুক্ত বহু গ্রামের নাম অবগত হওয়া যায় যথা, জৈনসার, তুলাসার, মহীসার, পণ্ডিতসার, চিকনীসার ইত্যাদি। আমাদের মনে হয় 'জপসা' কথাটি—'জপসার' শব্দেরই অপভ্রংশ ; অর্থ—'জপ' হইয়াছে সার যে স্থানের। হয়ত বৌদ্ধযুগে 'জপসায়' একটি সংঘারাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। অথবা এককালে এই পল্লি যে তান্ত্রিক সাধনার অন্যতম পীঠস্থান ছিল না, কে বলিতে পারে?

সার্ধশতাব্দী হইল জপসা কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে। অধুনা ঐ স্থানে পুনঃ 'চড়' জাগিয়া উঠিয়াছে। নিম্নলিখিত কিসমতগুলি লইয়া জপসা মৌজা গঠিত হইয়াছিল—(১) দিয়াপাড়া। (২) পোনরপাড়া, (৩) ছয়পাড়া, (৪) মৃধাপাড়া বা রাজকান্দি, (৫) নয়াকান্দি, (৬) বিয়ের হাওলা, (৭) লক্ষ্মীপুরার একাংশ, (৮) মীরারবাগের একাংশ, (৯) লালার বাগ, (১০) ঠারিণেরবাগ, (১১) ক্রোড়ীরবাগ, (১২) বড় রায়ের বা গোবিন্দ রায়ের বাগ, (১৩) দেওয়ানের বাগ, (১৪) সিকদার বাগ।

শ্রীযুত অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিক্রমপুরের বিবরণে লিখিয়াছেন—"তিনশত কি সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্বে এস্থানের অবস্থা কিরূপ ছিল, উহা অবগত হইবার উপায় নাই। তৎ সময়ে যে হিন্দু-মুসলমান কয়েক ঘর এস্থানে বাস করিতে উহাই জানা যায়। দুই ঘর বৈদ্য ও ২/৩ ঘর ব্রাহ্মণ ও ঐ পরিমাণ শূদ্র মাত্র তথায় বাস করিত। মোসলমানের সংখ্যা অধিক ছিল, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুও না ছিল এমন নয়।"

জপসার রায় জমিদার বংশের অন্যতম কৃতী সন্তান প্রাচীন কবি লালা রামগতি তদীয় সুবিখ্যাত "মায়াতিমির চন্দ্রিকা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

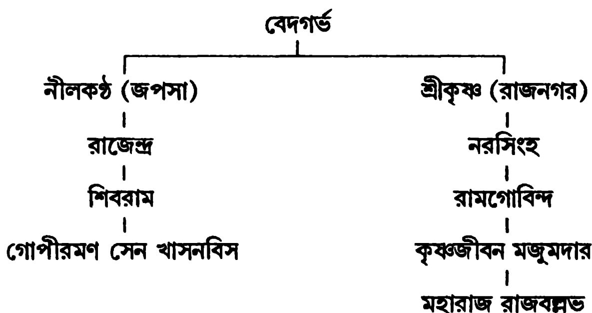
"ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থ পূর্বেতে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার।।
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহে সদ্জ্ঞানী বিস্তর।।
বিশিষ্ট বৈদ্যবংশের বসতির স্থান।
জপসা নামেতে গ্রাম তথায় প্রধান।।
শ্রীরামপ্রসাদ রায় বিখ্যাত তাহাতে।
বৈদ্যশ্রেষ্ঠ লালাবাবু খ্যাতি নিজামতে।।

বৈদ্য জমিদার—রায় মহাশয়দের বসতি স্থাপনের পর হইতেই জপসার উন্নতির সূত্রপাত হয়। বৈদ্যকুলজি গ্রন্থে দেখিতে পাই—

"বলভদ্র রাম নিম মাধব উচলি,
মহীপতি বুঢ়ণ রোষ বংশের উত্তম বলি।।"

জপসার জমিদারবাবুগণ এই বলভদ্র সেনের সন্তান। ধন্বন্তরী কুলোদ্ভব বলভদ্র সেনের অধঃস্তন পুরুষ গোপীরমণ সেন এই জমিদার বংশের স্থাপয়িতা। "তাহার বৃদ্ধ পিতামহ বেদগর্ভ সেন বিদ্যাধ্যয়ন জন্য যশোহর জিলান্তর্গত ইৎনা হইতে বিক্রমপুরে আগমন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ রাজনগর গ্রামে (তৎকালীন বিলদাউনিয়া) গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বেদগর্ভের দুই পুত্র নীলকণ্ঠ ও শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণের বংশেই বৈদ্যকুলপ্রদীপ মহারাজ রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গোপীরমণ শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ নীলকণ্ঠের প্রপৌত্র।"[১]

নিম্নের বংশ তালিকায় তৎকালীন বঙ্গের দুই প্রধান জমিদার বংশের রক্তসংস্রব বুঝিতে পারা যাইবে—



গোপীরমণ নবাব সরকারের খাস মহালের তহশীলদারি কার্য করিতেন। ক্রমে তিনি কিছু জমিদারি ক্রয় করিতে সমর্থ হন। তিনি বাকলার উত্তর সাহাবাজপুরের বিখ্যাত জমিদার বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং শ্বশুরের নিকট হইতে উত্তর সাহাবাজপুরের শ্রীরাম সেনের তালুক লাভ করেন। গোপীরমণের ছয় পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ছয় পুত্রের নাম যথা—শ্রীরাম রায়, দেওয়ান কৃষ্ণরাম রায়, গোবিন্দরাম রায়, রামমোহন ক্রোড়ী, রাজা রাম রায় এবং রঘুনন্দন রায়। ইহারা সকলেই কৃতবিদ্য হন। মৃত্যুর পূর্বে গোপীরমণ নিজ সম্পত্তি ও বসতি স্থান পুত্রগণকে সমান ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়া দেন। জামাতা চন্দ্রশেখর দাশকেও তিনি কিছু সম্পত্তি এবং এক বৃহৎ বাসভবন নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। গোপীরমণের ছয় পুত্রের ঘর জপসার ছয় হাবেলী নামে প্রসিদ্ধ।

জপসার এই জমিদার বংশ সে কালে বহু কুল ক্রিয়া দ্বারা আপনাদের বংশ গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

"রাজনগর জপসাতে হয়েছে চন্দন।
দেশময় প্রচারিত যশের কীর্তন।"

অম্বষ্ঠ ভাবাবলী। ৪৩ পৃষ্ঠা

"দ্বিতীয় জপসা বৈদ্য কুল সুপ্রসাদ।
কুলশিরে মণিজম্মে রাজা রামপ্রসাদ।।
শত শত কুলক্রিয়ান্বিত দুই ঘর।
কুলীন না হয়ে মান্য কুলীন উপর।।"

ঘটককৃত ডাকের।

স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই বংশের পরিচয় দিতে যাইয়া তদীয় "জাতিতত্ত্ব বারিধি" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"বঙ্গ সমাজে জপসার জমিদারগণ মহারাজ রাজবল্লভের পরই সমৃদ্ধি সম্পন্ন বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন। তত্রত্য রাজা রামপ্রসাদ সেন বাহাদুর তাহার কন্যা সর্বেশ্বরী দেবীর বিবাহ সময়ে চন্দনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে মহারাজ রাজবল্লভ সমাজপতি, লালা মৃত্যুঞ্জয় সহকারী সমাজপতি ও লালা রামপ্রসাদ নায়েব (প্রতিনিধি) সমাজপতি বলিয়া প্রত্যবধারিত হন।"

গোপীরমণ অতি সাধু-স্বভাব ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। প্রত্যহ আহারের পূর্বে তিনি অনুসন্ধান লইতেন গ্রামের কোন পরিবার অভুক্ত আছে কি না। অভুক্তের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া তবে তিনি স্বয়ং আহার করিতেন। ইহার ছয় পুত্র সকলেই কৃতী পুরুষ। প্রথম পুত্র শ্রীরাম গৃহে থাকিয়া সংসারের কর্তৃত্ব করিতেন, অপর পুত্রগণ সকলেই রাজসেবা দ্বারা অর্থোপার্জনে নিযুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণরাম নাওয়ার দেওয়ান ছিলেন। ৪র্থ রাম মোহনচাঁদ প্রতাপের তহশীলদারের পদে নিযুক্ত থাকিয়া প্রচুর ভূসম্পত্তি অর্জন করেন এবং ক্রোড়ী উপাধি প্রাপ্ত হন। দেওয়ান কৃষ্ণরামের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রাজা রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদ পিতার শ্মশান ক্ষেত্রে দুইটি মন্দির ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সার্ভেয়ার জেনারেল মেজর রেনেল ১০/১২ মাইল দূরবর্তী পদ্মা ও মেঘনা হইতে এই মঠ দেখিতে পাইয়া তদীয় মানচিত্রে ইহা অঙ্কিত করিয়া বিবরণীতে ইহার কথা লিখিয়া গিয়াছেন। "বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ভোলা সাবডিভিসনের গঙ্গাপুর, মেহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত হাট মেহেন্দিগঞ্জ (বাহাদুরপুর), ঝালকাটি থানার অন্তর্গত তারাবনিয়া ও মহদীপুর এবং পটুয়াখালি সাবডিভিসনের অন্তর্গত বোজের গৌউমেদপুরের মধ্যগত হোসেনাবাদ (জৈলসা) প্রভৃতি স্থানে লালা রামপ্রসাদ স্বীয় সম্পত্তি মধ্যে এক একটি কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার অর্চনার জন্য দেবোত্তর জমি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তত্তৎবংশধরগণের ঐ সকল সম্পত্তি হস্তান্তর হইলেও পূর্ব দেবত্রের আয় হইতেই মেহেদিগঞ্জের ও হোসেনাবাদের কালীর এবং তারাবনিয়ার আখড়ার সংস্থাপিত কালাচাঁদ বিগ্রহের অর্চনা চলিতেছে। অন্যান্য দেবালয়গুলি উঠিয়া গিয়াছে। জেলা ফরিদপুরের পালং স্টেশনের অন্তর্গত কাশাভোগ গ্রামে রামমোহন ক্রোড়ী এক কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার অর্চনার জন্য ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তথাপি পূর্ব দেবোত্তর আয় দ্বারাই অর্চনা চলিতেছে।" লালা রামপ্রসাদের অপর কীর্তি নিদর্শন খুলনা জেলার মূলঘর গ্রামে অদ্যাপি বর্তমান আছে। ইহা সিদ্ধেশ্বরী কালী মাতার দ্বিতল মন্দির। তিনি তদীয় শ্বশুর গঙ্গারাম রায়ের বাসভবনে উহা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

রামপ্রসাদ প্রথমত মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারে কর্ম করিয়া লালা উপাধি লাভ করেন। মহারাজ রাজবল্লভ দেওয়ান হইলে, তিনি তাহার সহকারীরূপে ঢাকার নেজাবতীতে নিযুক্ত হন। তিনি ঢাকার নেজাবতীর মন্ত্রণা সভার সভ্য ছিলেন।

জপসার এই বাবু বংশ যেমন রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্ম কার্যে আচার অনুষ্ঠানেও তেমনই বিদ্যানুশীলনে গুণ গ্রাহিতা ঔদার্য প্রভৃতি গুণে সেকালের সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বহু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বংশ ইহাদের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিলেন। পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মধ্যে কেহ কেহ আজিও জপসার বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। "এই পরিবারের সকলেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাহাদের মধ্যেও বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। জপসা গ্রামে তৎকালোচিত সংস্কৃত ও পারস্য এই উভয় ভাষার অনুশীলন ছিল। ব্রাহ্মণগণ মধ্যে সংস্কৃত চর্চা অধিক ছিল, বৈদ্যগণ সংস্কৃত ও পারস্য উভয় ভাষাই অধ্যয়ন করিতেন। এই সকল শিক্ষা বিধানের জন্য দেওয়ান কৃষ্ণরাম কর্তৃক এক মখতব ও রামমোহন ক্রোড়ী দ্বারা এক সংস্কৃত টোল সংস্থাপিত হয়। কৃষ্ণরায়ের নব নির্মিত পঞ্চরত্নের নিম্নতলে মখতবের কার্য চলিতে থাকে। এতদ্ভিন্ন স্বগ্রাম অথবা ভিন্ন গ্রামের যে কোন বিদ্যালয়ের জন্য তিনি অর্থদান করিতেন। (পরবর্তী কালে) বাবু হরনাথ রায় দ্বারা গ্রামে বঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুলোক এই লালা বাবুদের বাড়িতে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়া গিয়াছেন।"[২] মহারাজ রাজবল্লভ জপসার মখতবের ছাত্র ছিলেন। শুনিতে পাই পরবর্তীকালে আধুনিক বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় দ্বারিকা নাথ সেন মহোদয় জপসার টোলে শৈশবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

লালা রামপ্রসাদের দুই পুত্র রামগতি ও জয়নারায়ণ অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন। রামগতির কন্যা প্রখ্যাতনামা বিদুষী কবি আনন্দময়ী। জয়নারায়ণের হরিলীলা কাব্য ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের ভূমিকায়—ডাঃ দীনেশচন্দ্র কবি প্রতিভার আলোচনা করিতে যাইয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে এই বংশের তৎকালীন আভিজাত্য ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যাইবে। আমরা সেন মহাশয়ের রচনার অনেকাংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। ডাঃ দীনেশচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ফিপ্‌ফথ্ রিপোর্টে ইহাদের উল্লেখ আছে। ইহাদের পূর্ব পুরুষ গোপীরমণ ও হরনাথ রায়ের নাম বেভারিজ সাহেবকৃত বাকরগঞ্জের ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে। * * * এই প্রসিদ্ধ পরিবারে জয়নারায়ণ অতুল প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত, আরবি, পারসি ও হিন্দুস্থানী বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এই পাণ্ডিত্যের পরিচয় হরিলীলায় যথেষ্ট আছে। * * * * জয়নারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগতি যোগ সম্বন্ধে "মায়াতিমির চন্দ্রিকা" নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। ইহা বাংলায় রচিত হইলেও পুস্তকখানির উত্তরার্ধে যোগ সম্বন্ধে এত জটিলতত্ত্বের সমাবেশ আছে যে তাহা অনেক পাঠকেরই দুরধিগম্য। পুস্তকখানি বানিয়ানের "Pilgrim's Progress"-এর ন্যায় আধ্যাত্মরাজ্যের অভিযান বর্ণনা করিয়া ক্রমশ গুরুতর যোগ সম্বন্ধীয় বিষয়ের অবতারণাপূর্বক জটিল হইয়াছে। ইহা এক সময়ে মুদ্রিত হইয়াছিল, অধুনা দুষ্প্রাপ্য। রামগতি সেনের অপর গ্রন্থ "যোগকল্প-লতিকা" সংস্কৃতে লিখিত। ইনি লালাবাবুর ন্যায় সংসার ত্যাগ করিয়া যোগী হইয়াছিলেন এবং একাদিক্রমে ৪০ বৎসরকাল কাশীতে যোগাভ্যাস করিয়া ৯০ বৎসর বয়সে স্বর্গীয় হন। লালা জয়নারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লালা রাজনারায়ণ সংস্কৃতে "পার্বতী পরিণয়" নামক কাব্য রচনা করেন, তাহা এখন পাওয়া যায় না। লালা জয়নারায়ণ রচিত আর একখানি বাংলা কাব্য আছে, তাহা "চণ্ডী কাব্য"। এই পুস্তকে তাহার কবিত্ব শক্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে। * * * * জয়নারায়ণ ১৬৯৪ শকে হরিলীলা রচনা করেন। * * * হরিলীলা অন্নদামঙ্গলের ২০ বৎসর পরে রচিত হইয়াছে। * * * হরিলীলা পুস্তকে অপর একজনের রচনা কতক পরিমাণে স্থান পাইয়াছে। * * * আনন্দময়ী দেবী * * ইনি জয়নারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী, রামগতি সেনের কন্যা। * * * আনন্দময়ী সংস্কৃতে এতদূর পারদর্শিনী ছিলেন যে মুখে মুখে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। রাজবল্লভ অগ্নিস্টোম যজ্ঞ করিবার সময়ে ঐ যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক কতকগুলি তত্ত্ব এবং যজ্ঞ কুণ্ডের প্রতিকৃতি চাহিয়া রামগতি সেনের নিকট পত্র লিখেন, তিনি পূজায় ব্যাপৃত থাকায় তাহার কন্যা আনন্দময়ী শাস্ত্র ঘাঁটিয়া তাহা উদ্ধার করিয়া দেন। ইহার রচিত অংশগুলিতে কোন পৃথক ভণিতা নাই ; লজ্জাশীলা কুল ললনা পিতৃব্যের গ্রন্থে স্বীয় ভণিতা দিতে কুণ্ঠিতা ছিলেন, কিন্তু তাহার রচিত কবিতাগুলির কথা এক সময়ে পূর্ববঙ্গে শিক্ষিত মহলে সকলেই জানিতেন। * * * জয়নারায়ণের রচনা অপেক্ষা আনন্দময়ীর রচনা সংস্কৃত শব্দে অধিকতর ভারাক্রান্ত, বিদ্যাবত্তার অধিকতর পরিচায়ক এবং রচনার বাহাদুরী প্রদর্শনে বেশি লীলায়িত। ৩ পৃষ্ঠার "জলদ বনজ যুগ যুগ তিন রাম। খর্বরূপী বুদ্ধ হৈয়া কল্কি সে বিরাম।" এই দুইটি ছাত্র আনন্দময়ীর। * * * আনন্দময়ীর দ্বিতীয় অংশটি পাথরে গাঁথা কীর্তিস্তম্ভের মত বাংলা ভাষার ইষ্টক মন্দিরের মধ্যে নিজের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপন করিতেছে। (হরিলীলার) ৫৬ পৃষ্ঠা হইতে ৬০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ভুজঙ্গ প্রয়াতছন্দের নাম দিয়া যে বাসি-বিবাহের বর্ণনা চলিয়াছে—ইহা সেই অংশ। ইহার শব্দ যোজনা কতকটা উৎকট কিন্তু এইরূপ সংস্কৃতাত্মক শব্দের যোজনা, গাণ্ডবী ধনুতে শর যোজনার ন্যায়। তাহা যে সে লোকের কর্ম নয়। * ৯৮ হইতে ১০১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যে বিরহ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা

আনন্দময়ীর লেখা ; ইহাতে সংস্কৃতের গুরুগম্ভীর ধ্বনি নাই, সরল কবিত্ব আছে। আনন্দময়ী যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার অর্ধ শতাব্দী পরে এই বংশে গঙ্গামণি দেবীর আবির্ভাব হয়। গঙ্গমণি ও বিদুষী ছিলেন (১) * * * পূর্বোক্ত কয়েকটি পদছাড়া হরিলীলার সমস্তই জয়নারায়ণের লেখা। যিনি ধৈর্য ধারণপূর্বক আদ্যন্ত কাব্যখানি পাঠ করিবেন, তিনি অনেক স্থলেই কবির শক্তির পরিচয় পাইবেন। * * * সত্য বটে, ভারতচন্দ্রের "ববম্ভম্ ববম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে।" প্রভৃতি পদে ধন্যাত্মক শব্দদ্বারা অন্নদামঙ্গলে এক গরীয়ান কীর্তিস্তম্ভ গঠিত হইয়াছে ; জয়নারায়ণের চেষ্টা ভারতচন্দ্রের ২০ বৎসর পরে, তাহারও এই ধন্যাত্মক কবিতার মধ্যে যে সহজ পটুত্ব, শ্রুতিমধুরতা ও স্বচ্ছন্দগতি আছে—তাহা প্রশংসনীয়। * * * জয়নারায়ণ যেখানে রাজসভা এবং রাষ্ট্রীয় শাসনের কথা লিখিয়াছেন, সেখানে তদানীন্তন কালের নিখুঁত চিত্রপট আছে—সেগুলি বঙ্গীয় সাময়িক ইতিহাসে প্রতিবিম্বত।** ৮৩ পৃষ্ঠা হইতে ৯২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পুলিশের যে কার্যাবলীর বিবরণী দেওয়া হইয়াছে, তাহা এত তথ্যপূর্ণ যে বর্তমান পুলিশের গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে তাহাদের তুলনায় সমালোচনা চলে। বঙ্গের বাণিজ্য তখন অস্তোন্মুখ হইলেও এই কাব্যে তাহার যে প্রচুর ইঙ্গিত আছে তাহাতে সেই যুগের সমৃদ্ধির কথা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। সদাগর বলিতেছেন—আমি বণিক—হস্তিনা, কর্ণাট, বঙ্গ, কলিঙ্গ, উৎকল, বারাণসী, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, পঞ্চাল, কম্বোজ, ভোজ, সৌরাষ্ট্র, জয়ন্তী, দ্রাবিড়, নেপাল, কাঞ্চী, অযোধ্যা, অবন্তী, মথুরা, কাম্পিল্য, মায়াপুরী, দ্বারাবতী, চীন, মহাচীন, কামরূপ প্রভৃতি স্থানে সর্বদা সফর করিতে যাতায়াত করিতে থাকি। * * হরিলীলা ঠিক দুইশত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল, তখনও সমুদ্রযাত্রার কথা অন্তত সমুদ্র যাত্রার নিকট স্মৃতি শুধু একটা স্বপ্নে পর্যবসিত হয় নাই। * * * জয়নারায়ণ যে ঐশ্বর্যের অঙ্কে লালিত, হীরা, মণি, মুক্তা, জহরৎ যে তাহার ঘরের কোণে থাকিত এবং জহরীর মত যে তিনি তাহার দর জানিতেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি—

"শুনি ধনপতি হেরি জামাতা ডাকিয়া।
বলিল দেখিতে মূল্য হারের আসিয়া।।
রাণীর গলার মণিময়ানন্দ হার।
তিন হারে ছয় লহরে মুক্তা বিশ হাজার।।
বিশ বিশ রত্তি প্রতি মুক্তার ওজন।
তাথে মাণিকের বন্দ অরুণ-কিরণ।।
পঞ্চবিংশ পঞ্চবিংশ বন্দ প্রতি হারে।
দেড়শত হল বন্দ লিখিতে সুমারে।।
বন্ধহ ওজনে বিশ বিশ রত্তি হয়।
মধ্যহারে ধুকধুকি সেই মণিময়।।
লঘুতরা বিশ রত্তি লটকনের মতি।
অন্ধকারে দীপ প্রায় প্রকাশিল জ্যোতি।
মধ্যেতে জ্বলিছে অতি শ্বেত হীরাখান।
বিশ মাষা আভা পূর্ণচন্দ্রের সমান।
মাষা যার বিশ হাজার আর জবা যার।
মালার মেরুতে তিন ঘুন্টিই মুক্তার।।
সেই তিন বিশ রত্তি হইল ওজনে।
চন্দ্রভান দেখি তাহে আঁকে হর্ষ মনে।।
আঁকিলেন মূল্য সেই হারে মনোহর।
চন্দ্রভান তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার।।

বিষয়-গৌরবে, কবিত্ব মহিমায়, পাণ্ডিত্যে ও শব্দ বৈভবে জয়নারায়ণের "হরিলীলা" এই শ্রেণীর সমস্ত পুস্তক হইতে শ্রেষ্ঠ।"[৩]

বর্তমান যুগে এই বংশের প্রবীণ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় আনন্দনাথ রায় ও তদীয় ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন রায় বঙ্গে সুবিখ্যাত। ইহারা বাল্যকাল হইতেই সাহিত্য চর্চা করিয়া আসিতেছেন। আনন্দনাথ জপসা গ্রাম হইতে একখানা বাংলা মাসিকপত্র সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করিতেন। তাহার "বারভূঞা" এবং "ফরিদপুরের ইতিহাস" সর্বসাধারণের নিকট বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। বাংলা ১২৮৩ সালের কার্তিক মাসে যতীন্দ্রমোহন জপসা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে স্বগ্রামের টোলে সংস্কৃত পড়িয়া পরে ইনি ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। বি. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া অবস্থার বিপর্যয়ে চাকুরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। প্রথমে ঢাকার নবাব সরকারে পরে জমিদার ও মাড়োয়ারী ফার্মে দায়িত্বপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত হইয়া ঐ সকল কর্ম পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। অতি শৈশব হইতেই ইনি প্রবন্ধাদি রচনা করিতে ভালবাসিতেন। ঢাকায় নবাব সরকারে কার্যে নিযুক্ত থাকাকালীন ইনি বহুল তথ্যপূর্ণ সুপ্রসিদ্ধ ঢাকার ইতিহাস নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ প্রণয়ণে তাহার বিপুল পরিশ্রম, সত্য নির্ণয়ের আগ্রহ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ হান্টার সাহেবের বিবরণের পর এত তথ্য বহুল ইতিহাস বাংলায় কমই রচিত হইয়াছে। নব্য ভারত, সাহিত্য, মানসী ও মর্মবাণী, ভারতী ঢাকা রিভিউ, প্রতিভা, সুধা প্রভৃতি মাসিকপত্র যতীন্দ্রমোহনের তথ্য-যুক্তিপূর্ণ বিবিধ ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রবন্ধে সমৃদ্ধ হইয়াছে। ইনি ঢাকা মিউজিয়ামের অন্যতম সদস্যপদে বৃত হইয়াছিলেন, স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি বাংলার সাহিত্যিক মনীষিগণ সকলেই যতীন্দ্রমোহনকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন। "ঢাকার ইতিহাসের" অমর লেখক রূপে বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে যতীন্দ্রমোহনের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন "ঢাকার ইতিহাস" রচনা করিয়া এবং "সাহিত্য" "প্রবাসী" প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর সাময়িক পত্রে নানা সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া সাহিত্যিক সমাজে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। স্বর্গীয় আনন্দনাথ রায় অপর প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি পারসী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত এবং বিশিষ্ট বুদ্ধিমান বলিয়া সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। তাহার বাঁশ ও বেতের সূক্ষ্ম কাজের শিল্পনৈপুণ্যের কথা আজও বৃদ্ধদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। জপসার প্রসিদ্ধ সুবৃহৎ শিবলিঙ্গ পদ্মাগর্ভস্থ হওয়ার আশঙ্কা হইলে তিনি বুদ্ধিগুণে কৌশল উদ্ভাবন করিয়া উহাকে স্থানান্তরিত করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছিলেন। ন্যায়পরায়ণ জানিয়া সরকার বাহাদুর আনন্দনাথকে বেঞ্চের অনারারী হাকিমি পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহনের ভ্রাতা বর্তমান সময়ে ব্রহ্মদেশে জিওলজিস্টের কার্যে নিযুক্ত আছেন। পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ রায় বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের রসায়নের অধ্যাপক। আনন্দনাথের পুত্রগণেরও সাহিত্য চর্চায় অনুরাগ আছে। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ আইনব্যবসায়ী কুশধী শ্রীযুত রজনীকান্ত গুপ্ত লালা বংশের দৌহিত্র সন্তান। জপসা গ্রাম নদীদিকস্থ হওয়ায় অধিবাসিগণ বিপন্ন হইলে, রজনীকান্ত স্বীয় অর্থে 'নগর' গ্রাম ক্রয় করিয়া তথায় বাস্তু নির্মাণ করেন এবং মাতুল বংশীয়গণকেও বাটি নির্মাণের জন্য স্থান প্রদান করেন।

মহারাজ রাজবল্লভের জীবনীলেখক স্বর্গীয় রসিক লাল গুপ্ত মহাশয় জপসার বাবুগণের লালা উপাধি রাজবল্লভ প্রদত্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[৪] এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় আনন্দনাথবাবু আমাদিগকে জানাইয়াছেন—"গুপ্ত মহাশয়ের ইতিহাস লেখার প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে রাজবল্লভের পৌত্র গঙ্গাপ্রসাদ বাবুর তত্ত্বাবধানে যে ইতিহাস লিখিত হয় তাহাতে লিখিত আছে—জপসা নিবাসী লালা রামপ্রসাদ সেন জাতিত্ব সম্পর্কে রাজবল্লভের ভ্রাতুষ্পুত্র অথচ মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের এক কর্মচারী ছিলেন। তিনি দেওয়ান রাজবল্লভের মুর্শিদাবাদ উপস্থিতির বার্তা পাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন উভয়ত স্ব স্ব দৈহিক ও বৈষয়িক কুশল

সংবাদ জ্ঞাপনান্তর প্রথমত দেওয়ান রাজবল্লভ কিরূপে নিকাশের দায় হইতে স্বীয় প্রভুকে মুক্ত করিয়া স্বাভীষ্ট সাধন করিবেন তাহার সুযোগ চিন্তায় চিন্তিত থাকিয়া রামপ্রসাদ সেনের পরামর্শনুসারে স্বীয় কর্মোদ্ধার মানসে প্রথমত নবাব নাজেমের সহিত সন্দর্শন করিয়া নানা কৌশলে নাজেম বাহাদুরের সহিত কিঞ্চিৎ প্রতিপন্ন হইলেন। আনীত বক্রী রাজস্ব ও নিকাশ প্রদানের প্রস্তাব করাতে রাজস্বের টাকা জগৎশেঠের দিবার ও উঠাইবার আর সংক্ষেপত ঢাকা প্রদেশের আয় ব্যয় স্থিতি বৃদ্ধির নিকাশ উপস্থিত করিতে নবাব নাজেম কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তদনুসারে বক্রী রাজস্ব এবং সুচারুরূপে নিকাশ প্রদান করিলে নবাব নাজেমের প্রসাদভাজন এবং কিঞ্চিৎকাল মুর্শিদাবাদ অবস্থিতির অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। নবাব নিবাইস মহম্মদ রাজবল্লভের এই সুকৃতি কার্যে পরম পরিতোষ প্রাপ্তে তাহাকে বহুতর ধন্যবাদ ও পুরস্কার প্রদান করেন।" এই বিবরণ হইতে পাঠক মহোদয়গণ অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে রাজবল্লভ যখন পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ অথবা নবাব নাজেমকে দেখেনও নাই তখন রামপ্রসাদ 'লালা' উপাধি ধারণ করিয়া মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে কাজ করিতেছিলেন"।

জপসার কীর্তি পরিচয় ঃ

রাজনগরের সুপ্রসিদ্ধ সৌধাবলীর ন্যায় জপসার মন্দির অট্টালিকাও যে এক সময়ে পূর্ব বাংলার অন্যতম গৌরবের বস্তু ছিল, প্রত্যক্ষদর্শী আনন্দনাথের নিম্নলিখিত বিবরণ হইতেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন—

"বহুকাল অতীত হইল ঢাকা জেলার জনৈক রাজপুরুষ দক্ষিণ বিক্রমপুরান্তর্গত জপসা গ্রামের একটি প্রাচীন বাড়ি লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই কেল্লা কাহার?" কারণ ঐ সময় উহার নিকটবর্তী চণ্ডীপুর গ্রামে আর একটি ভগ্নদুর্গের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। সাহেব তাহা অবগত ছিলেন, উহা যে চাঁদ ও কেদার রায়ের তাহা তিনি জানিতেন। জপসার এই বাড়ির গঠন প্রণালী দৃষ্টে উহা কাহার দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল এই বিষয় অবগত হইবার জন্যই এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এই রাজপুরুষের নাম ছিল মিঃ জন পীটার্সন। তিনি ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।[৫] প্রশ্নোত্তরে তিনি অবগত হইতে পারিলেন যে, উহা কেল্লা নয়, গ্রামের জমিদার বাড়ি। বহুদূর হইতে যত নিকটবর্তী হইতেছিলেন, ততই তাহার পূর্ব বিশ্বাস অপনোদন হইতেছিল ; কারণ রাস্তা অবলম্বন করিয়া বাড়ির দক্ষিণ পরিখার সীমায় উত্তীর্ণ হইতে প্রথমে তাহার এক বৃহৎ দেবালয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বড় রাস্তা হইতে পরিখা ভেদ করিয়া জমিদার বাড়ির সহিত যে রাস্তাটি সম্মিলিত হইয়াছে, ঠিক তাহার পশ্চিম পার্শ্বে ও পরিখার উত্তর পারে এই বাটি সংস্থাপিত ছিল। বাড়িতে এক বৃহৎ মন্দির ; তন্মধ্যে চতুর্ভুজা কালীদেবী, শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত গৌরীশঙ্কর, দ্বাদশরুদ্র, বৃষভ এবং যুক্তদ্বিভুজ, ঊর্ধনেত্র, পদ্মাসনে আসীন এক সৌম্য-মূর্তি সংস্থাপিত ছিল।[৬] এই বাড়ির পশ্চিমের ভদ্রাসনে ইষ্টকগ্রথিত উচ্চ বেদিমূলে কষ্টিপাথরনির্মিত বৃহৎ এক শিবলিঙ্গ, এবং তৎপার্শ্বে উপবিষ্ট ও প্রস্তরনির্মিত এক বৃহৎ বৃষভ। বাড়ির অপর পার্শ্বে আর একখানি ক্ষুদ্র ইষ্টকালয় ছিল ; উহা দেবীর ভোগ রন্ধন জন্য ব্যবহৃত হইত। এই বাড়ির মধ্য আঙিনায় একটি ইষ্টকগ্রথিত চৌবাচ্চা হইতে চারিটি তাম্রনির্মিত নল শিবের মস্তকের দিকে নীত হইয়াছিল। তদ্দারা যখন ইচ্ছা শিবের স্নানাকার্য সম্পাদন করা যাইতে পারিত ; কারণ শিব এতই উচ্চ যে একজন দীর্ঘকায় মনুষ্য হস্ত উত্তোলন করিলেও তাহার শিরঃস্পর্শ করিতে পারিত না। প্রস্তরনির্মিত চারিটি হংস ঐ চৌবাচ্চায় ভাসিয়া থাকিত। এই সকল দৃশ্যে রাজপুরুষের মন আকৃষ্ট হইল। তিনি ক্রমে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন। আমরা যে দেবালয়ের কথা বলিলাম, ঠিক উহার পূর্বাংশ ধরিয়াই বাড়ির দিকে এক রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। এই পথের পূর্ব পার্শ্বে একটি বৃহৎ সরোবর ও ইষ্টকনির্মিত ঘাট সাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই স্থান হইতে লক্ষ্য করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা একটি বাড়ি নয়, চতুর্দিকে বৃহৎ পরিখাবেষ্টিত স্থানের মধ্যে ছয়টি বাড়ি শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্মিত হইয়াছে। উহার নির্মাণ

কৌশল এইরূপ যে, বিবিধ অট্টালিকা প্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইয়াও উহার প্রত্যেক বাড়ির প্রবেশপথ সমসূত্রে বিদ্যমান। অন্দর ও বাহির খণ্ডের যে দিকেই হউক এক বাড়ি হইতে অপর বাড়ি প্রবেশের ইচ্ছা করিলে কাহাকেও ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতে হয় না, অথবা নবাগত ব্যক্তিকে এইটুকু অতিক্রম করিতে গোলক ধাঁধাঁয় পড়িতে হয়। প্রত্যেক বাড়ির বাহির খণ্ডে এক একটি যোড় কোঠা বা সিংহদ্বার। সিংহদ্বারের সংলগ্ন দুইদিকে দুইটি প্রকোষ্ঠ থাকায় উহাকে কেহ যোড় কোঠা, কেহ বা সিংহদ্বার বলিত। এই প্রকোষ্ঠদ্বয়ে প্রহরী ও পাইকগণের অবস্থানের জন্য ব্যবস্থা ছিল। তৎকালে এই বাড়িতে যতগুলি অট্টালিকা ছিল তন্মধ্যে ছয়টির কথাই উল্লেখযোগ্য—

দেওয়ান কৃষ্ণরাম রায়ের পঞ্চরত্ন, তৎপুত্র লালা রামপ্রসাদের রঙ্গমহাল, লালা রঘুনন্দনের ত্রিতল দেবমন্দির[৭], রামগঙ্গা রায়ের প্রকাণ্ড বাসভবন, হরনাথ বাবুর বৈঠকখানা দালান ও রুক্মিনীকান্তবাবুর কালীমন্দির। এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি ঝিকুটি দালান ও দেবালয় সাময়িক দেবার্চনার জন্য নির্মিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে গোপীরমণ খাসনবীশ দুর্গাপূজার জন্য যে ঝিকুটি নির্মাণ করান তাহাই বৃহৎ ছিল।

মিস্টার জন পিটার্সন বাড়ির এই সন্দর্শনে যদিও বুঝিলেন যে উহা কেল্লা নহে, তথাপি তাহার প্রতীত হইল যে, ইহা শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হওয়া সহজসাধ্য নয়। দূর হইতে উহা দুর্গবৎই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। মহারাজ রাজবল্লভের সাত পুত্রের সাত হাভেলি বৃহৎ হইলেও এইরূপ শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্মিত হইয়াছিল। আর একজন রাজকর্মচারী ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে পদ্মা ও মেঘনা এই উভয় নদী হইতে একটা মন্দির লক্ষ্য করিয়া এই স্থানে উপনীত হন। তিনি ছিলেন সার্ভেয়ার জেনারেল মেজর রেনেল। তদীয় মানচিত্রে এই মন্দিরটির চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। এই মন্দিরের চিত্রপার্শ্বে তিনি লিখিয়া রাখিয়াছেন—"Japsa Pagoda seen in both the rivers"—জার্নেলের ৩৯ পৃষ্ঠায় দেখা যায়" Japsa Pagoda (which is very high) may be distinctly seen in both the rivers. The country here about in pleasent"[৮] অতঃপর আর একটি রাজকর্মচারীর কথা এই স্থানে বলা হইতেছে। ইনি ছিলেন ঢাকা বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টার ডক্টর হিল সাহেব। স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে তাহার জপসাতে আগমন হয়। সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি ইন্সপেক্টার বিদ্যাধর দাস। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ রায় স্কুলের সম্পাদক ছিলেন। কোন কারণ বশত তিনি তখন দেশে ছিলেন না, কাজেই সাহেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের উপস্থিত থাকা আবশ্যক হইয়াছিল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় দীননাথ সেন সরকার[৯] মহাশয় তাহার সহিত আনন্দবাবুর পরিচয় করিয়া দিলেন। মিঃ হিল সাহেব অতি ভদ্রলোক ছিলেন ; কয়েকটি কথার পর তিনি বলিলেন, "আসিবার পথে যে দেবালয়টি দেখিলাম ঐ বাড়িতে আমি প্রবেশ করিতে পারি কি না?" আনন্দবাবু বলিলেন বাড়িতে প্রবেশ করিতে নিষেধ নাই, কিন্তু দেবগৃহে যাওয়া নিষিদ্ধ। সাহেব দেবগৃহ বলিতে বোধ হয় একমাত্র দালানই বুঝিয়াছিলেন। তাহার কিন্তু স্কুল দেখা ভাল করিয়া হইল না। তাড়াতাড়ি কার্য সমাধা করিয়া তিনি সেই দেবালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন ; আনন্দবাবু ও বিদ্যাধরবাবুর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে সাহেবের পশ্চাদ্বর্তী হইলেন। বোধ হয় পাঁচ মিনিট পূর্বে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা বাহির হইতে দেখিলাম—সাহেব ফিতাদ্বারা শিবমূর্তির উচ্চতা ও বেড় পরিমাপ করিতেছেন। শিব তখন ঘরেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আনন্দবাবু বিস্মিত হইয়া বিদ্যাধরবাবুকে বলিলেন, "সাহেব করিতেছেন কি? তিনি ত' ঠাকুরের জাতি নষ্ট করিলেন।" বিদ্যাধরবাবু সেকথা সাহেবকে জানাইলেন। পরে যখন আমরা উপস্থিত হইলাম, তখন সাহেব বলিলেন, "আমি ত' মন্দিরে প্রবেশ করি নাই, বাহিরের এইটি মাত্র স্পর্শ করিয়াছি। তবে, যাহাতে এই ভ্রমের সংশোধন হতে পারে, সে বিষয়ে এখন আমার কি কর্তব্য?" বিদ্যাধরবাবু আনন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন উপায় কি? সাহেব ত' লজ্জিত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত বিধান যাজ্ঞা করিতেছেন, এস্থলে কি ব্যবস্থা হওয়া উচিত?"

"যদি বলি, আমাদিগকে পুনরায় অভিষেক দ্বারা দেবতার শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া লইতে হইবে, তবে বোধ হয় খরচটা সাহেব তখনই ফেলিয়া দেন।" কিন্তু তখন আনন্দবাবু জানাইলেন যে, এতৎসম্বন্ধে প্রতিবিধান যাহা হয় আমরাই করিয়া লইব। তখন সাহেব হাসিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। অতঃপর সাহেব কালীমন্দিরে ও পঞ্চরত্নের দেবালয়ের শ্বেত প্রস্তর নির্মিত গণেশ, বলরাম ও ধাতুনির্মিত কাত্যায়নী ও লক্ষ্মীগোবিন্দ প্রভৃতির মূর্তি দেখিয়া কাহার কি নাম তাহা লিখিয়া লইতে লাগিলেন, তৎসহ এই সকল বিগ্রহ ও মন্দির কাহার দ্বারা কোন্ সময়ে স্থাপিত হইয়াছে উহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাকে জানান হইল—এই সকল পঞ্চরত্ন ঢাকা নাওয়ারার দেওয়ান কৃষ্ণরাম রায় কর্তৃক প্রস্তুত আরম্ভ হয়, কিন্তু একাল পর্যন্ত নির্মিত হইতেই তিনি গতাসু হইলে তৎপুত্র ঢাকা নবাবের দেওয়ানের সহকারী লালা রামপ্রসাদ উহার উপর পঞ্চমন্দির নির্মাণ করিয়া উহাকে পঞ্চরত্নে পরিণত করেন। শিব ও কালীর মন্দির-মধ্যস্থ দেবতা সকল এই রামপ্রসাদের দ্বিতীয় পুত্র লালা জয়নারায়ণ[১০] কর্তৃক সংস্থাপিত হয়। এই সকল কথার পর হিল সাহেব ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক বিদায় লইলেন। এই ঘটনা হইল প্রায় ৪২/৪৩ বৎসর পূর্বের কথা। হিল সাহেব যে সকল বিষয় জানিয়াছিলেন তাহার গতি কি হইয়াছে তাহার কোনও অনুসন্ধান পাই নাই। নদী কর্তৃক এই স্থান ধ্বংস সাধিত হইলে পর ফরিদপুরের ভূতপূর্ব অ্যাসিস্টান্ট সেটেলমেন্ট অফিসার এস্কালী সাহেব এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে মুদ্রিত Journal of James Renell-এর পরিশিষ্টে লিখিয়াছেন—

Rajnagar–This place was swept away by the Krishna in 1871-72 and Lurikull by the same river nine years later, together with Japsa (জপসা) Pagoda. The ground of which they stood has since reformed and that course of the Krishna is practically dry."[১]

আমরা যে বাড়ির কথা লিপিবদ্ধ করিলাম উহার প্রতিষ্ঠাতা গোপীরমণ সেন ও মহারাজ রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদার যথাক্রমে বেদগর্ভ সেনের পুত্র নীলকণ্ঠ ও শ্রীকৃষ্ণ সেনের প্রপৌত্র। গোপীরমণ নবাব সরকারের খাসমহালে তহশীলদারী কার্য করিতেন, এবং এই কার্য উপলক্ষে কিছু জমিদারি ক্রয় করিতে সক্ষম হন। বেদগর্ভ সেনের বংশধরগণ চির ভূম্যধিকারী হইলেও গোপীরমণ সেনই প্রথম জমিদার। তাহার ছয়টি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। পিতার চেষ্টায় পুত্রগণ সকলেই কৃতবিদ্য হন। গোপীরমণ দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, পুত্রগণ স্ব স্ব ক্ষমতায় অনায়াসে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবে। তখন স্বীয় সম্পত্তি ও বসতি স্থান পুত্রগণকে সমান ছয়ভাগে বিভক্ত করিয়া দেন। এই বাড়িই নানাবিধ দেবালয়, সরোবর ও হর্ম্যমালায় সুশোভিত হইয়া ছয়হাবেলী নামে সাধারণ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তিনি তাহার জামাতা চন্দ্রশেখর দাশকেও বাড়ির উত্তরের পরিখার উত্তর দিকে বৃহৎ বাসভবন নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। যথাকালে গোপীরমণের পুত্রগণ উন্নত হইয়া গ্রামের সৌষ্ঠব সংসাধনে যত্নবান হন। তন্মধ্যে জপসার মধ্যবর্তী সুপ্রশস্ত রাস্তা ও দির্ঘিকার নাম উল্লেখযোগ্য। রাজনগরের রাজসাগরের নিম্নেই উহার নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু এই বৃহৎ সরোবরের সোপান শ্রেণীর সদৃশ দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বিশিষ্ট ঘাট পূর্ববঙ্গে ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দির্ঘিকার মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া পাহাড় সদৃশ তীরভূমিতে সংলগ্ন উহার শেষ সোপানটি প্রত্যক্ষ করিলে নির্মাতার কৌশলের কথা মনে উদিত হইয়া স্বতঃই তাহাকে ধন্যবাদ করিতে ইচ্ছা জন্মিত। খিলান অবস্থাতেই শূন্যমাত্র অবলম্বন করিয়া উহার নির্মাণ কার্য শেষ করা হইয়াছিল। প্রবল বর্ষায়ও ২৫/২৬টি সোপান অতিক্রম করিলে জলের সংস্পর্শ ঘটিতে পারিত। সর্বোপরি সুপ্রশস্ত সোপানের তিনদিকে আলিসা পরিবেষ্টিত থাকায় উহাতে উপবেশনের কার্য সম্পাদন হইত। ঘাটের দুই দিকে গম্বুজ বিশিষ্ট মন্দিরে দুইটি প্রহরীজনের আশ্রয় স্থান ছিল। এই সোপান শ্রেণীও দুই মন্দিরের কিঞ্চিৎ পশ্চিম

দিকে এক 'আখড়াবাড়ি" বা বৈষ্ণব ধাম ছিল। এই বাড়িতে দুইটি সুদৃশ্য মন্দির ছিল। উহার নাম ছিল লক্ষ্মীজনার্দনের দোলমঞ্চ। প্রথমটিতে নিম্বকাষ্ঠনির্মিত নিত্যানন্দ, চৈতন্য ও রাধাগোবিন্দ প্রভৃতির প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

উহার সন্নিকটস্থ অপর একটি বাড়ি ভাট কবিদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। আখড়া বাড়ির কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে ছিল একটি বৃহৎ বন্দর। উহা পশ্চিমতীরের কতকাংশ হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণ তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই দক্ষিণতীরের কতকাংশ স্থান সিদ্ধেশ্বরী বাড়ি নামে পরিচিত হইত। এই বাড়িতে লালা রামপ্রসাদ তদীয় পিতৃদেব কৃষ্ণরাম রায়ের শ্মশানক্ষেত্রে দুইটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সার্ভেয়ার জেনারেল মেজর রেনেল ১০/১২ মাইল দূরবর্তী পদ্মা ও মেঘনা হইতে এই মঠ সন্দর্শন করিয়া তদীয় কার্য বিবরণীতে উল্লেখ করিয়াছেন। রেনেলের মানচিত্রে এই মন্দিরের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সিদ্ধেশ্বরী বাড়িতে প্রতি বৎসর ১ বৈশাখ একটি মেলা বসিত এবং তথায় বহু লোকের সমাগম হইত।

ইতপূর্বে যে দোলমঞ্চের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে উহার দক্ষিণ পার্শ্ব স্পর্শ করিয়া একটি সরল রাস্তা গ্রামের মধ্য ভেদ করিয়া বরাবর পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। বর্ত্মটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২ মাইল, প্রস্থও ১৫ হাতের ন্যূন নহে। উভয় পার্শ্বে রোপিত তাল, বট, ও অশখ প্রভৃতি বৃক্ষরাজি উহার শোভা সংবর্ধন করিয়া পথিকের আশ্রয়স্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল। রাস্তার দুই পার্শ্বেই দুই প্রকাণ্ড পরিখা বা খাল।

এই পথ অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলেই একটি প্রকাণ্ড বাড়ি দৃষ্টিগোচর হইত। উত্তরের গড় বা পরিখা অতিক্রম করিয়া এই বাড়ি হইতে আর একটি রাস্তা আসিয়া বড় বর্ত্মটির সহিত মিলিত হইয়াছে। বাড়ি প্রবেশ করিতেই সম্মুখে প্রকাণ্ড মঠ। উহাতে শিব প্রতিষ্ঠিত। সম্মুখে একটি দির্ঘিকা ; তৎপরে যোড় কোঠা বা সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া বাহিরের খণ্ডে প্রবেশ করা যাইত। এই বাড়ি কতকগুলি অট্টালিকায় সুশোভিত ছিল। কালীদেবীর জন্য পৃথক একটি খণ্ড ছিল। এই বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা বৈদ্যবংশীয় রামানন্দ সরকার রাজবল্লভের সময় ঢাকায় পেস্কারী কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া বহু ভূসম্পত্তি ও অর্থ উপার্জন করেন। গ্রামের নিকটবর্তী গোপালপুর নামক স্থানে তাহার অর্থে নিখাত একটি প্রকাণ্ড দিঘি ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বাড়ির সমসূত্রে রাস্তার গড়ে দক্ষিণ পারে একটি স্থানের নাম ছিল *"নীলখোলা"। চড়ক পূজাকে পূর্ববঙ্গে 'নীল' পূজা বলিয়া থাকে। নীলপূজা ও চড়ক ঘুরান হইত* বলিয়া উহার নাম হয় 'নীলখোলা'। এই স্থানে হরনাথ রায়ের বাগান ও সরোবর ছিল। তথা হইতে কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলেই রাস্তার উত্তর দিকের গড়ে উত্তরাংশে একটি বৃহৎ ইষ্টকালয় নয়নপথে পতিত হইত। উহা লালা রামপ্রসাদের পুত্র লালা রামগতি দ্বারা স্থাপিত অভয়াদেবীর বাড়ি। এক মন্দিরে পাষাণময়ী চতুর্ভুজা অভয়াকালী, এবং অপর মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। পুকুরের পূর্বপার ভিন্ন অপর তিন পারে সুন্দর বাঁধাঘাট। নানাবিধ উদ্যান তরুতে বাগান সমাচ্ছন্ন। যে কোন দর্শক এই নির্জন স্থানে গমন করিয়াছেন তাহারই মনে এক অভূতপূর্ব সাত্বিক ভাবের সঞ্চার না হইয়া পারে নাই। পঞ্চমুণ্ডের উপর দেবী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সাধক রামগতি বিষয় সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া এই দেবীর পদেই আত্মসমর্পণ করেন। প্রবাদ এই, জমিদার বংশের একটি কুটুম্ব উন্মাদগ্রস্ত হন। তিনি একদিন এই বাড়ির উপর দিয়া চলিয়া যাইবার সময় ঘর হইতে কে যেন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাছা, আমাকে এই পুকুরে স্নান করিতে লইয়া চল।"

শব্দ লক্ষ্য করিয়া পাগল গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল জনশূন্য গৃহ। সে হাসিয়া চলিয়া যাইতেই পুনরায় শ্রবণ করিল, "বাছা আমাকে লইয়া গেলে না। আমার বড়ই গরম বোধ হইতেছে, শীঘ্রই স্নান করাও।" এবার সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, দেবীই কথা বলিতেছেন। তখন সে বলিল, "আমি তোমাকে একা লইয়া যাইব কি প্রকারে?" দেবী বলিলেন "একাই

পারিবি।" তখন পাগল দেবীকে মস্তকে বহন করিয়া পুষ্করিণীর তীর হইতে জলে নিক্ষেপ করিল। পরে জল হইতে উত্তোলন করিতে যাইয়া আর তাহাকে বহন করিয়া আনিতে সাধ্য হইল না। উন্মাদ বলিয়া উঠিল "এই কি করিলে আমি তোমাকে গৃহে না রাখিতে পারিলে যে উৎপীড়িত হইব"। অভয়া বলিলেন "ভয় নাই তুই প্রস্থান কর।" তাহাই হইল। রাত্রিযোগে রামগতির প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল "আমাকে এই জলাশয় হইতে উত্তোলন করিও না, আমি এই জলেই আছি। প্রতিষ্ঠিত ঘটে নিয়ত বিরাজ করিব।" অধিকন্তু উন্মাদ তদবধি প্রকৃতিস্থ হইল। এই জন্য দেবী জাগ্রত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তদনন্তর রাস্তার দক্ষিণ পরিখা অতিক্রম করিলে আর একটি ভবন দৃষ্ট হইত। এই বাড়িতে একটি প্রকাণ্ড সেঘড়া ও কয়েকখানা অট্টালিকা এবং কয়েকটি প্রকাণ্ড সরোবর ছিল। এই বাড়ি রাজবল্লভ সরকার কর্তৃক নির্মিত হয়। তদ্বংশীয় রামরূপ সরকারের সহিত বংশলোপ ঘটিলে তদীয় জ্ঞাতিগণ মালিক হইয়া এই বাড়ি দেওয়ান ভারতচন্দ্র সেনের নিকট পত্তনি করেন। ভারতচন্দ্র এই বাড়িতে বসতি করিতে আরম্ভ করিলে পরে এই বাড়ি দেওয়ান বাড়ি নামে অভিহিত হয়।

তদনন্তর কিঞ্চিৎ পশ্চিমে অগ্রসর হইতেই সেই ছয় হাবেলীর সুদৃশ্য চিত্র পথিকের নয়ন বশবর্তী প্রকাশ হইয়া তাহাকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিত[১২] যে ছয় ভ্রাতা হইতে ছয় হাবেলী নামের উৎপত্তি তাহাদের নাম—শ্রীরাম, কৃষ্ণরাম, গোবিন্দরাম, রামমোহন, রাজরাম ও রঘুনন্দন। ইহাদের বৈষয়িক কার্য কলাপের বিররণ পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। জপসার কীর্তিকলাপের কয়েকটি মাত্র চিত্র পাঠক মহোদয়গণের অবগতির জন্য এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল। পূর্ববঙ্গের কত স্থানে এইরূপ কত কীর্তির নমুনা প্রাপ্ত হইতে পারা যায় উহার অনুসন্ধান কে লইয়া থাকেন, নানারূপ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পূর্ববঙ্গের যতটা পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে সম্ভবত অন্য কোনও স্থানে তদ্রুপ ঘটে নাই। এই দুই শত বৎসরের মধ্যে রাজনগরের সেই অভ্রভেদী মন্দির নিচয়ের উদ্ভব ও বিনাশ সাধন প্রত্যক্ষ হইল। জপসা যদিও উহা হইতে ন্যূন কীর্তি বক্ষে ধারণ করিত তথাপি পূর্ববঙ্গের আর কোথায়ও বুঝি এইরূপ একখানি সুসজ্জিত গ্রাম ছিল না। সেই রম্য নিকেতন আজ কোথায়? প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে কবি মহিমচন্দ্র দাশ ডাক্তার, জপসার ধ্বংস অনিবার্য মনে করিয়া যে 'শোক সঙ্গীত' হিতৈষী পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন তাহা শেষে প্রকৃতই ঘটিয়াছিল। সমুদয় স্থাপত্য শিল্পের চিহ্ন সহ জপসা কীর্তিনাশার সলিলে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার কিছুমাত্র চিহ্ন বিদ্যমান নাই।[১৩] তবে তখনকার শিল্পের প্রচুর নিদর্শন স্বরূপ বহু দেবদেবীর প্রতিমূর্তি আজ পর্যন্ত তথায় বিদ্যমান দেখা যায়। জমিদার বংশধরগণ শত বাধা সহ্য করিয়াও উহার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে এই সকল প্রতিমূর্তি পড়িয়া রহিয়াছে। অধিকারীগণের অবস্থা পরিবর্তন নিবন্ধন একমাত্র প্রেমাশ্রুনীরে সেই সকল বিগ্রহের পদবিধৌত করিয়া তাহারা স্বীয় সেবাব্রতের নিয়ম উদ্‌যাপন করিতেছেন। আর সেই জপসা নাই তবে অধুনা ঐ যে একটা দ্বীপবৎ প্রান্তর উত্তপ্ত বালুকারাশি বক্ষে ধারণ করিয়া মরমে পুড়িয়া মরিতেছে, ঐ স্থানেই নাকি বিবিধ সৌধসমন্বিত, সরোবরবক্ষবিলগ্ন দেব দ্বিজ ও ধনীপরিপূর্ণ জাপসা বিদ্যমান ছিল[১৪] গড়া, ভাঙা, ভাঙা গড়া হইতে প্রতিনিয়তই জগতে চলিতেছে। আমরা অল্পমানব ইহাকেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলিয়া থাকি।

মহিলা কবি স্বর্গীয়া আনন্দময়ী ঃ

আমরা "জপসার বাবু বংশ" পরিচয়ের পরিশিষ্টে মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের "বঙ্গের মহিলা কবি" হইতে স্বর্গীয়া কবি আনন্দময়ী ও গঙ্গামণির জীবনী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

অধ্যাপক গুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন, "আমাদের গৌরব করিবার সময় আসিয়াছে, আনন্দ প্রকাশ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে—কেন না—যুগ-যুগ বাহী স্মৃতির ধারায় আমরা সমাজের উন্নতি ও সংস্কারের জন্য নারীর কণ্ঠ শুনিতে পাই নাই, কবে কোন্ সুদূর অতীতে

বৈদিক যুগে কিংবা বৌদ্ধ যুগে নারী আপনার প্রতিষ্ঠার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন সেকথা স্মরণ করিয়া কোনও লাভ নাই।

স্বর্গীয়া কবি আনন্দময়ী ও গঙ্গামণি আমাদের সেকালের বিক্রমপুরের অবরোধবাসিনী পুরমহিলাগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন। আজও গঙ্গামণি বাংলার-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া চিরস্মরণীয়া হইয়া থাকিবেন।

"এই মহীয়সী বিদুষী মহিলা কবি বিক্রমপুরের সুপ্রসিদ্ধ সাধক কবি বিলদায়নীয়া (রাজনগরের) অধিবাসী লালা রামগতি সেনের কন্যা ; আনন্দময়ীর মাতার নাম কাত্যায়নী। ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে আনন্দময়ী জন্মগ্রহণ করেন। রামগতি নিজহস্তে কন্যার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া কন্যাকে সুশিক্ষিতা করিতে সম্পূর্ণরূপে পারগ হইয়াছিলেন। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে পয়গ্রামবাসী প্রভাকরবংশীয় রূপরাম কবিভূষণের পুত্র অযোধ্যারাম সেনের সঙ্গে ইহার বিবাহ হয়। লালা রামপ্রসাদ পৌত্রী ও তাহার পতিকে যে বৃত্তি প্রদান করেন, তাহা কৌতুকস্বরূপ 'আনন্দীরাম সেন' বলিয়া অভিহিত হয় ; পতি-পত্নীর নামের যোগে এই অদ্ভুত সঙ্কর নামের উদ্ভব হয়। অযোধ্যারাম সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাহার পত্নীর বিদ্যার খ্যাতি তাহার যশঃলোপ করিয়াছিল।

আনন্দময়ীর বিদ্যাবত্তার সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, রাজনগর গ্রামবাসী পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের পুত্র হরিদেব বিদ্যালঙ্কার আনন্দময়ীকে শিবপূজা পদ্ধতি লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে ভ্রম থাকায় আনন্দময়ী বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে পুত্রের অধ্যয়ন সম্বন্ধে অমনোযোগী বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। মহারাজ রাজবল্লভ যখন অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করেন, তখন তিনি যজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতি চাহিয়া রামগতি সেনের নিকট পত্র লিখেন, সেই সময়ে রামগতি সেন মহাশয় পুরশ্চরণে নিযুক্ত থাকায় স্বয়ং পুস্তক হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া দিতে অসমর্থ হন। তিনি এ বিষয়ের ভার কন্যা আনন্দময়ীর উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন, কারণ কন্যার বিদ্যাবত্তার সম্বন্ধে তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। আনন্দময়ী যথাসময়ে পিতৃ আদেশ অনুযায়ী সমুদয় প্রমাণ ও প্রতিকৃতি স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, পরে রাজসভায় এই বিষয়ের আলোচনা হইলে সকলেই তাহা বিশ্বাস করিলেন। কারণ আনন্দময়ীর পাণ্ডিত্য তখন সর্বজনবিশ্রুত ছিল। বিশেষ সভাস্থ পণ্ডিত কৃষ্ণধন বিদ্যাবাগীশ মহাশয় আনন্দময়ীর অধ্যাপক ছিলেন।

আমরা এখন আনন্দময়ীর কবিত্ব সম্বন্ধে পরিচয় দিব। আনন্দময়ী তদীয় খুল্লতাত জয়নারায়ণকে হরিলীলা গ্রন্থ প্রণয়ন সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। আমরা এস্থলে 'হরিলীলা' হইতে আনন্দময়ীর রচনার পরিচয় দিতেছি। সওদাগর পুত্র চন্দ্রভানুর সহিত সুনেত্রার "বাসি বিবাহ" উপলক্ষে কবির বর্ণনা শুনুন।

"হের চৌদিগে কামিনী লক্ষে লক্ষে।
সমক্ষে, পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে।।
কতি প্রৌঢ়া রূপা ওরূপে মজন্তি।
হসন্তি, স্খলন্তি, দ্রবন্তি, পতন্তি।।
কত চারুবক্ত্রা সুবেশা, সুকেশা।
সুনাসা, সুহাসা, সুবাসা, সুভাষা।।
কত ক্ষীণমধ্যা, শুভাঙ্গা, সুযোগ্যা।
রতিজ্ঞা, বশীজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মদজ্ঞা।।
দেখি চন্দ্রভানে, কত চিত্তহারা।
নিকারা, বিকারা, বিহারা, বিভোরা।।
করে দৌড়াদৌড়ি, মদমত্ত প্রৌঢ়া।

অনূঢ়া, বিমূঢ়া, নবোঢ়া, নিগূঢ়া।।
কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ড পৃষ্ঠা।
প্রহৃষ্টা সচেষ্টা, কেহ ওষ্ঠদষ্টা।।
অনঙ্গাস্ত্রবিদ্ধা, কত স্বর্ণ বর্ণা।
বিকীর্ণা, বিশীর্ণা, বিদীর্ণা, বিবর্ণা।।
কারো ব্যস্ত বেণী, নাহি বাস বক্ষে!
কারো হার কুর্পাস্ পরিস্রস্ত কক্ষে।।
* * * *
কারো বাহু বল্লি কারো স্কন্ধ দেশে।
রহিয়া সাধু বাক্য বক্রে প্রকাশে।।
সুকক্ষে, নিতম্ব উর হের কুম্ভে।
এভাবে ওভাবে হাটিতে বিলম্বে।।
তাহে দোলিতা লাজভারি ভরেতে।
পরে হেলি দুলি অনঙ্গ জ্বরেতে।।
সুনেত্রাকে কেহ, কেহ চন্দ্রভানে।
করে সেক তোয়ে সবে সাবধানে।।
সুহস্তে ঢালিছে সর্ববারি অঙ্গে।
ঝনৎ ঝনৎ নলৎ গমৎ গলৎ পড়ে নীর অঙ্গে।।
সখি চন্দ্রভানে বলে চাতুরীতে।
এ রত্নের মালা কাকের গলেতে।।
শুনি চাতুরী দম্পতি হেট মাথে।
চলাচল গলাগল সখী সর্বতাতে।।

আমাদের দেশে পূর্বে বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি মাঙ্গলিক উৎসবে রমণীগণ মিলিয়া সমস্বরে সঙ্গীত করিতেন, তাহাদের উলুধ্বনি সহকারে এই সমুদয় সঙ্গীতের মধুর স্বর-লহরী একদিন সত্য সত্যই বিশেষ উপভোগ্য ছিল। পূর্বে এবং বর্তমান সময়েও অধিকাংশ স্থলেই আনন্দময়ীর বিচরিত সঙ্গীতই গীত হইত। আমরা এখানে তাহারও একটি উল্লেখ করিলাম।

বিবাহের গান

যাত্রা করি রঘুনাথ করিলেন গমন।
জানকী করিতে বিয়া চলেন নারায়ণ।।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে জনক রাজার বাড়ি।
রঘুনাথ করিবেন বিয়া জনক কুমারী।।
সর্বলোকে বলে ধন্য সীতার জননী।
তাহাকে দিবেন সেবা দেব রঘুমণি।।
নারীগণে বলেন রাণী শুনগো বচন।
সীতারে সাজাও সাজে কৌশল্যানন্দন।।
সীতারে সাজায়ে রাণী রতি করি দূর।
কঙ্কন মেখলা দিল পঞ্চম নূপুর।।
নাসায় বেসর দিলে শিরে শিরোমণি।
ঠেকিতে তরুয়া যেন ধরিয়াছে ফণী।।

তাহার পরে পরাইল তার কেঙুর।
আভরণ স্থলে সীতার শশী করি দূর।।
মণিময় আভরণ পরাইল শেষে।
রঘুনাথ বরিতে গেলেন মনের হরিষে।।
বিচিত্র সেউতি পুষ্প সীতাদেবী খিটে।
গগনে ঠেকিয়া পৈল রামের মুকুটে।।
বিচিত্র পঙ্কজ পুষ্প গন্ধ মনোহর।
উদয়ে ফুলের জ্যোতি জিনি নিশাকর।।
পঙ্কজের দল জিনি জানকীর হাত।
ভ্রমণ গুঞ্জরে পাশে হাসেন রঘুনাথ।
ভ্রমর বলে শশী নয়নোদর পদ্মবর।
শশধর হৈলে হেথা আসিত চাকোর।।
রাম বামে জানকীর বিবাহ হইল।
কৃত্তিকা সহিত যেন শশী লুকাইল।।
বিবাহ হইল সীতার রাম বামে বসি।
লাজে লুকাইল তখন শরদের শশী।।
বিবাহ হইল সাঙ্গ যজ্ঞ সমাপন।
পাণিগ্রহ সাঙ্গ কৈল কৌশল্যানন্দন।।
অপূর্ব বসন্ত ঋতু মদনের সখা।
যাহে নব নব কুসুমের দেখা।।
বিকসিত রসাল—মঞ্জরী নানা মতে।
ফলিত মল্লিকা কলি কত শতে শতে।।
স্তবকের ভরে নত কুসুমের লতা।
যেন গুরু কুচভরে নিতম্ব নিলতা।।
পৃথিবী রজতময় হইয়াছে কিশোরে।
কিংশুকে ভুবন পূর্ণ স্বর্ণ অলঙ্কারে।।
কুসুমের বনে কত কত অলিকুল।
গুণ গুণ শব্দ করে গন্ধেতে আকুল।।
মলয় কন্দর হইতে মন্দ সমীরণ।
বিরহিণীর যম হেতু বহে ঘন ঘন।।
কারো হার খুলি ঘুরায় বারে বার।
কেহ খসাইয়া পুনঃ দেয় অলঙ্কার।।
কদলী বেদীতে রাম জানকী আনিয়া।
কত নাট কত জাট করে বিনাইয়া।।
শুভক্ষণে সূর্য অর্ঘ্য দিয়া রঘুপতি।
সীতা সঙ্গে ঘরে চলেন অতি হৃষ্ট মতি।।

অন্নপ্রাশনের গীতের নমুনা—

"ছয় মাসের রঘুনাথ জননীর কোলে।
কেলী করে দেখে রাজা মন কুতূহলে।।

নব শশী জিনি কান্তি বাড়ে দিন দিন।
কত পূর্ণ শশী মুখ হেরিয়া মলিন।।
অন্নপ্রাশনের হেতু কৈলা অনুমতি।
আসিলেন বশিষ্ঠ ঋষি অতি হৃষ্ট মতি।।
শুভ তিথি বার আর নক্ষত্র বিহিত।
বিচারিয়া শুভক্ষণ কহেন পুরোহিত।।
নানা মত করিলেন মঙ্গল রচন।
নানা স্থানে নাচে গায় যত বামাগণ।।

আনন্দময়ীর সহজ রচনার নমুনাও এখানে একটু দিতেছি। স্বামী চন্দ্রভানু ব্যবসায় উপলক্ষে ডিঙা সাজাইয়া শ্বশুরের সহিত প্রবাসে গমন করিয়াছেন, তখন বিরহিণী সুনেত্রা বিরহ-ব্যথায় ব্যথিতান্তঃকরণে বলিতেছে—

————আসি দেখহ নয়নে।
হীনতনু সুনেত্রার হয়েছে ভূষণে।
হয়েছে পাণ্ডুর গণ্ড, রুক্ষ কেশ প্রতি
ঘরে আসি দেখ নাথ এসব দুর্গতি।।
রহিয়াছি চির বিরহিণী দীন মনে।
অর্পণ করিয়া আমি তোমা পথ পানে।।
* * * *
ভাবি যাই যথা আছ হইয়া যোগিনী।
না সহে এ দারুণ বিরহ আগুনি।।
যে অঙ্গে কুঙ্কুম তুমি দিয়াছ যতনে।
সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে।।
যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বাঁধিছ আপনি।
তবে জটাভার করি হইব যোগিনী।।
শীত ভয়ে যে বুকেতে লুকায়েছ নাথ।
বিদারিব সে বুক করিয়া করাঘাত।।
যে কঙ্কণ করে দিয়াছিলা হৃষ্ট মনে।
সে কঙ্কণ কুণ্ডল করিয়া দিব কাণে।।
তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষা পাত্র করি।
মনে করি হরি স্মরি হই দেশান্তরী।।
তাতে মাতা প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি।
আর তব স্থাপ্য-ধন বিষম যৌবন।।
লুকাইয়া নিয়া ফিরি দরিদ্র যেমন।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র লেখক ডাক্তার শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বলেন—'ইহার অব্যবহিত পরেই রমণী কবির দৃষ্টি শব্দালঙ্কারের প্রতি পুনঃ প্রবর্তিত হইয়াছে। অলঙ্কার দেখাইবার স্পৃহা রূপসীগণের স্বাভাবিক, আনন্দময়ী নূতন কোন অপরাধ করেন নাই, কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত রচনা পড়িয়া আনন্দময়ীর অলঙ্কারস্পৃহা পাঠক কি স্ত্রীলোক-সুলভ রোগ বলিতে ইচ্ছা করিবেন? —"পতি শোকসাগরে, না দেখিয়া নাগরে, ফিরে যেন সাগরে ডাক ছাড়ি। হইয়ে জীবশেষা, বিগলিতবেশা, লটপটকেশা, ভূমে পড়ি।"

এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে যে, জয়নারায়ণ এক দিবস কাব্যরচনায় এতদূর দৃঢ় মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন যে, বেলা দ্বিতীয় প্রহর হওয়া সত্ত্বেও তাহার স্নানাহারের কথা মনে ছিল না। আনন্দময়ী খুল্লতাতকে স্নানাহারাদি করিতে অনুরোধ করিলেন। কবি জয়নারায়ণ বলিলেন যে, আর অতি সামান্য অবশিষ্ট আছে ভগবানের দশ অবতার সংক্ষেপে বর্ণনা হইলেই তিনি উঠিবেন। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রীর ঐকান্তিক অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া স্নানাহার করিতে গমন করিলেন। এই অবসরে আনন্দময়ী লিখিলেন,—

"জলজ বনজ যুগ যুগ তিন রাম।
খর্বাকৃতি বুদ্ধদেব কল্কি সে বিরাম।"

এত সংক্ষেপে আর কেহই এরূপভাবে ভগবানের দশরূপ বর্ণনা করেন নাই। স্ত্রীলোকের কেশের বর্ণনা অনেকেই করিয়াছেন কিন্তু—

কুটিল কুন্তল তার, বন্ধন শঙ্কায়।
নিতম্বে পড়িয়া পদ ধরিবারে ধায়।।

সুন্দর নয় কি?

আনন্দময়ী যেরূপ সুশিক্ষিতা ছিলেন, তদ্রূপ বিনীতা ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। পতির প্রতি তাহার অচলা ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। পতির মৃত্যুর সময়ে আনন্দময়ী পিত্রালয়ে ছিলেন, যখন তিনি এই হৃদয়বিদারক সংবাদ শুনিতে পাইলেন, তখন আর তাহার পুত্র, কন্যা, ভাই ভগ্নী কাহারো নিমিত্ত মমতা রহিল না, আত্মীয় স্বজনকে বলিয়া সত্বর অনুমৃতার আয়োজন করিলেন। পরিশেষে স্বামীর কাষ্ঠ পাদুকা হৃদয়ে ধারণ করিয়া জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়া পতির অনুগামিনী হইলেন। যতদিন পর্যন্ত মহিলা কবিগণের কাব্যের আদর থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত আনন্দময়ীর কবিত্ব-প্রতিভা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় কাব্যগগন আলোকিত করিবে।

স্বর্গীয় মহিলা কবি গঙ্গামণি ঃ

কবি গঙ্গামণি ও লালা রামপ্রসাদের কন্যা ও লালা জয়নারায়ণ ও লালা রামগতির ভগিনী। গঙ্গামণি আনন্দময়ীর সমসাময়িক। বিবাহ সময়ে গাহিবার উপযুক্ত বহু মঙ্গল গান তিনি রচনা করিয়াছিলেন। এক সময়ে সে সকল সঙ্গীত বিশেষ আদরেরও ছিল। কিন্তু কালবশে গঙ্গামণির সে সমুদয় সুমধুর সঙ্গীতাবলী বিলুপ্ত প্রায়। আমরা কবি গঙ্গামণির একটি খণ্ডিত গান প্রকাশ করিলাম। ইহা হইতেই তাহার রচনা নৈপুণ্য ও কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই গানটিতে সীতার বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

জনক নন্দিনী সীতা হরিষে সাজায় রাণী।
শিরেশোভে সিঁথিপাত, হীরা, মণি, চুণী।।
নাসার অগ্রেতে মতি বিম্বাধর পরি।
তরুণ নক্ষত্র ভাতি জিনি রূপ হেরি।।
মুকুতা দশন হেরি লাজে লুকাইল।
করীন্দ্রের কুম্ভ মাঝে মজিয়া রহিল।।
গলে দিল থরে থরে মুকুতার মালা।
রবির কিরণে যেন জ্বলিছে মেখলা।।
কেয়ূর, কঙ্কণ দিল আর বাজুবন্ধ।
দেখিয়া রূপের ছটা মনে লাগে ধন্দ।
বিচিত্র ফলিত শঙ্খ ফুল পরিচিত।
দিল পঞ্চ কঙ্গণ পৈছি বেষ্টিত।।
মনের মত আভরণ পরাইয়া শেষে।
রঘুনাথ বরিতে যান মনের হরিষে।।

আমাদের দেশে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে মহিলারা কিরূপ অলঙ্কার পরিয়া সেকালের পুরুষদের মন ভুলাইতেন ইহা হইতে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

১. আনন্দনাথ রায় প্রদত্ত বিবরণ।
২. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—বিক্রমপুরের বিবরণ।
৩. হরিলীলার ভূমিকা—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন।
৪. আনন্দনাথ রায় প্রেরিত বিবরণ।
৫. ১৮২০-২১ খ্রিস্টাব্দে জেলার ম্যাজিস্ট্রেটগণকে নানা বিষয়ে এক রিপোর্ট প্রদান করিতে হইত ; তন্মধ্যে দুর্গ অনুসন্ধানের কথাও ছিল। তদুপলক্ষে তাহার জপসা আগমন সম্ভবপর।
৬. এই প্রতিমূর্তিগুলি এখনও বিদ্যমান আছে, উহা ঠিক ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি-হিন্দু দেবালয়ে গুরুভাবে পূজিত হইতেছেন।
৭. ভূতা বালখানা নামে পরিচিত।
৮. The Journal of Major James Renell published by the Asiatic Society of Bengal, 1910.
৯. ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব উকিল পণ্ডিতাগ্রগণ্য স্বর্গীয় ডক্টর প্রিয়নাথ সেন, এম এ, ডি. এল. পি. আর. এস মহাশয়ের পিতা।
১০. হরিলীলা ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য প্রণেতা কবি জয়নারায়ণ।
১১. রেনেল ও এস্কলী সাহেবের বিবরণ পাঠ করিয়া পাঠকগণ বুঝিবেন যে জপসা একটি কীর্তিপূর্ণ স্থান ছিল।
১২. বড় বর্ত্ম ছয় হাবেলী অতিক্রম করিয়া বরাবর পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলেই নূতন বাড়ি। এই বাড়িতে অট্টালিকা ও কপাইসারের দিঘি ছিল। তথা হইতে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে মাঠের দিকে গমন করিলে রামগঙ্গা রায়ের বৃহৎ দির্ঘিকা নয়নগোচর হইত। পরে এই রাস্তা রাজনগরের দিকে গিয়াছিল।
১৩. জপসার ভূম্যধিকারিগণের কীর্তির নিদর্শন আজিও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়। তন্মধ্যে কাশীর বাঙ্গালী টোলাস্থ রামানন্দ সরকারের হাবেলী ও ব্রহ্মপুরী এবং লালা রামপ্রসাদ তদীয় শ্বশুর খুলনা জেলার মুলঘর গ্রামের গঙ্গারাম রায়রে বাসভবনে সিদ্ধেশ্বরী কালীর অবস্থান জন্য যে দ্বিতল মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন তাহাই উল্লেখযোগ্য।
১৪. রাজনগর, জপসা, লড়িকুল প্রভৃতি স্থানগুলি নদী গর্ভস্থ হইয়া দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই চড়া পড়িয়াছে, কতদিনে উহার বিনাশ সাধন কে বলিতে পারে?

নবম অধ্যায়



লৌহজঙের পাল বাবুগণের বংশ পরিচয় ঃ

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলার দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক বিক্রমপুরের বীরাগ্রগণ্য চাঁদ কেদার রায়ের যখন শ্রীপুরে রাজধানী ছিল সে সময় যশোহর হইতে রামনাথ পাল নামে কাশ্যপ গোত্রীয় জনৈক তিলি আসিয়া চাঁদ কেদার রায়ের কোষাধ্যক্ষের কার্য আরম্ভ করেন। জনশ্রুতিতে যতদূর অনুমান করা যায়, যশোহরের প্রতাপাদিত্যের অত্যাচারে চাঁদ কেদার রায়ের আশ্রয়ে থাকিবার জন্য তিনি শ্রীপুর রাজধানীতে সপরিবারে আসেন। এই প্রাচীন তিলি বংশের অনেকেই এক্ষণে রাজার বাড়ির নিকটবর্তী দিঘিরপাড় বিদগাঁ হাসাইল প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। বর্তমান বসাকেরচরের পূর্বভাগে এখ খণ্ড ভূমি শ্রীপুরের "ট্যাক্" নামে এখনও অভিহিত হইয়া আসিতেছে। অথচ মুসলমান ভুইয়াদের দলিল ইত্যাদিতেও এই সকল অঞ্চলে অনেক নাওয়া মহালের নামের পূর্বে রমানাথ পালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমান সময়ে তিলি জাতি উচ্চ শিক্ষায় উন্নতির সোপানে উঠিতেছে কিন্তু প্রাচীন তিনি জাতির "কারিকার" অভাব বশত ইহার অনুসন্ধানও সুদূর পরাহত।

বর্তমান শিক্ষা ও সমাজ পদ্ধতির অনুসরণ করিতে গিয়া ক্রমে ক্রমে আমরা প্রাচীন ঐতিহাসিকদিগের প্রাচীন পুস্তক হারাইয়াছি। ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে চাঁদ কেদারের পতনের পরেই হিন্দু স্বাধীনতা সূর্য চিরকাল তরে অস্তমিত হইয়া যায়। মোঘল রাজত্বের সময় চাঁদ কেদার রায়ের প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়। মোঘল বাদশাহের প্রধান সেনাপতি মানসিংহের অনুমত্যানুসারে রমানাথ পালের পুত্র বলরাম পাল মোঘলদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে এক প্রকার স্বাধীনভাবেই তালুকদারি করিতে ছিলেন। কিন্তু এদিকে নরপিশাচ জল দস্যু মগ ও পর্তুগিজগণের ভীষণ আক্রমণে প্রপীড়িত হইয়া লোকজন শ্রীপুর হইতে সপরিবারে লৌহজঙ আসিয়া বসবাস করিতে থাকে। কালক্রমে বলরাম পালের দুই পুত্র হইল, বিষ্ণুরাম ও লক্ষ্মীনারায়ণ। লক্ষ্মীনারায়ণের চার পুত্র এবং ৪০ বৎসর বয়সে লক্ষ্মীনারায়ণ মৃত্যু মুখে পতিত হইল। বিষ্ণুরামের সাত পুত্র হইল। যথা— ১) রাজারাম, ২) রামদেব, ৩) নন্দরাম, ৪) মুক্তারাম, ৫) অনন্তরাম, ৬) জয়রাম, ৭) শান্তিরাম। প্রবাদ আছে বিষ্ণুরাম অসীম বলশালী ও ভোজনপটু ছিলেন। রাজস্ব সময় মত নবাব সরকারে না দিতে পারায় তাহার আহারের পরিমাণ ক্রমশ সংসারের উত্তোরোত্তর বৃদ্ধির সঙ্গে কমিয়া গিয়াছিল। বলশালী ও ভোজনপটু বিষ্ণুরামের শরীরের অবস্থার পরিবর্তন দেখিয়া মুসলমান শাসনকর্তা ধানকুনিয়া ও লৌহজঙ তাহাকে জায়গির দেন। তদবধি লৌহজঙের পাল বাবুগণ ভৌমিক বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। রেনেল সাহেবের ম্যাপের সহিত তুলনা করিয়া এসিস্ট্যান্ট সেটেলমেন্ট অফিসার শ্রীযুত কালীপদ মৈত্র মহাশয় বলিয়াছেন যে "এক্ষণে প্রাচীন লৌহজং ধানকুনিয়ার দশ ভাগের এক ভাগ ভূমি আসলিতে অবশিষ্ট আছে, বাকি সকলই পদ্মার চরের সামিল হইয়াছে। ঐতিহাসিকের পক্ষে ইহা একটি বিশিষ্ট প্রমাণ, যে পদ্মা কীর্তিনাশা নাম গ্রহণপূর্বক বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে বিক্রমপুরের বহু কীর্তিকলাপের বিলোপ সাধন করিয়াছে, সেই পদ্মার ভাঙন আরম্ভ হইবার অব্যবহিত প্রাক্কালেই নূতন লৌহজঙ বন্দর পত্তন হইয়াছিল। নন্দরাম পালের ছয় পুত্র ১)

রামজীবন, ২) অনুরাম, ৩) শ্যামদাস, ৪) রামদাস, ৫) সুধারাম, ৬) শোভারাম ষষ্ঠ পুত্র শোভারাম। এককালে বিক্রমপুরে কেন পূর্ববঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ ধনী নামে পরিচিত ছিলেন। তাহার মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে নগদ এক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। সুধারাম পরম বৈষ্ণব ছিলেন, বিষয় কর্ম বিশেষ দেখিতেন না। সমস্ত কার্যই কণিষ্ঠের উপর নির্ভর ছিল। সুধারাম ও শোভারাম উভয়েই ধর্মশীল লোক ছিলেন। দেব ও দ্বিজের উপর অটল ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। শোভারাম পালের নামে একখানা দাসখত দেখিতে পাওয়া যায়। কালক্রমে সুধারামের দুই পুত্র হয় যথা কৃষ্ণমঙ্গল ও রায়চাঁদ। শোভারামের চারিপুত্র হয়। গোপালকৃষ্ণ, রতনকৃষ্ণ, কৃষ্ণচন্দ্র ও শিবচন্দ্র।

লৌহজঙের পাল বাবুদের বাড়ি বর্ণনা—পাল বাবুদের অতুল কীর্তি বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে লৌহজঙের প্রাচীন কাহিনী তিমির গর্ভে স্থান পাইয়াছে। মহারাজ রাজবল্লভের অতুল কীর্তি বিলুপ্তির পর লৌহজঙের কীর্তিচিহ্ন প্রায় বিংশতি বর্ষ পর্যন্ত অস্তিত্ব ছিল। পুরাতন লৌহজঙের দক্ষিণ দিকে পদ্মা, উত্তরে ধানকুনিয়া, পশ্চিমে তারপাশা, পূর্বে আইকাদল, ও সোয়াকদল গ্রাম ছিল। বাবুগণের পাঁচটি পৃথক পৃথক হিস্যা ছিল। পাঁচ হিস্যায় ছোট বড় অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে বড়বাবু ও ছোটবাবুর বৈঠকখানাই উল্লেখযোগ্য। সেখানে রাজনগরের পরে লৌহজঙের বাবুগণের বৈঠকখানার কারুকার্য দেখিয়া, বহু প্রবাসী দর্শনকারী ও নীলকরের সাহেবগণ স্থাপত্য ও চিত্রকরের কৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাল বাবুগণের সমৃদ্ধি, ধন, জন ও ঐশ্বর্যের কথা পণ্ডিতগণ অনেক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বৌখণ্ড, সদর খণ্ড, বাহির খণ্ড। বৌখণ্ডে এক চকমেলান দ্বিতল পাকা বাড়ি। বৈঠকখানার দক্ষিণে মনোরম উদ্যান পশ্চিমে আমলা খানা, পূর্বে দপ্তর খানা এবং উত্তরে ঠাকুর মন্দির, দপ্তর খানার সমস্ত পূর্ব দিক ব্যাপিয়া তোরন দ্বার অবস্থিত ছিল। তোরণ দ্বারে পশ্চিম দেশিয় হিন্দুস্থানী দ্বৌবারিকগণ অষ্টপ্রহর পাহারা দিত। দক্ষিণদিকে উদ্যানের পর প্রত্যেক হিস্যার পৃথক পৃথক বাজার ছিল। যথা (১) বড়বাবুর বাজার, (২) ছোটবাবুর বাজার, (৩) ভুঁইয়া বাজার, (৪) তালুকদারের বাজার, (৫) ষোল আনী বাজার। প্রত্যেক বাজারে বাবুগণের কাছারি ছিল। মোঘল শাসনের শেষ সময়ে লৌহজঙের বাজারে একটি গির্জা ছিল। রোমান ক্যাথলিক পাদরি সাহেবগণ সময় সময় আসিয়া ধর্ম প্রচার করিতেন। নীলকরের সাহেবগণও প্রত্যেক রবিবারে উপাসনা করিতেন। সেকালে লৌহজঙের বাবুগণের যে কেবলমাত্র জমিদারিই ছিল তাহা নহে, তাহাদের তেজারত কারবারও ছিল। সে সময় সন্দ্বীপে পর্যাপ্ত পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হইত এবং সেকালে লৌহজঙে বাবুগণই একমাত্র লবণের ব্যবসা করিয়া পূর্ব খ্যাতি ও ধনৈশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। লবণের ব্যবসার জন্য ১০ খানা শুলুক ছিল। প্রত্যেক খানা শুলুকে প্রায় তিন হাজার মণ লবণ বোঝাই হইত। লবণ বোঝাই হইয়া নারায়ণগঞ্জ, লৌহজঙ আসিত। ব্যবসার ক্রমশ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণগঞ্জে পরগণে নাথুল্লাবাদ বিনোদশঙ্কর শর্মা রায় জমিদারি খরিদ করেন। কার্তিবারুণী মেলা উপলক্ষে পাল বাবুগণের যথেষ্ট লবণের ব্যবসা হইত। লক্ষ লক্ষ টাকা তাহারা লাভবান হইত। উত্তরবঙ্গে তামাকেরও আড়ৎ ছিল। আজকালও রঙপুর অঞ্চলে পাল বাবুগণে তামাকের ব্যবসার কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

লৌহজঙের ঝুলন মেলা—ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে এক মাস ব্যাপী একটা মেলা বসিত, আজও সেই ঝুলন মেলা বসিয়া আসিতেছে। বিক্রমপুরে প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখে অবগত হওয়া যায় যে, সেকালে পূর্ববঙ্গের আর কোথাও এইরূপ মহাসমারোহে ঝুলন মেলা হইত না। এক মাস পূর্ব হইতে অগণিত দর্শকবৃন্দের ও বিক্রেতা ও ক্রেতাগণের কল কোলাহলে ও জগঝম্প বাদ্যের ভীষণ শব্দে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিত। এই এক মাসের জন্য বাবুগণের ষোল আনী খরচে ষোল আনী বাজারে লৌহজঙে অতিথিশালায় অতিথিদিগের আহারের বন্দোবস্ত হইত। উপন্যাস পটু বৃদ্ধদিগের মুখে আজকালও পাল চৌধুরীদিগের ঝুলনের ছড়া পাঁচালী কথা

শুনিতে পাওয়া যায়। বাবুগণ অতুল সম্পত্তির অধিকারী তাহারা অত্যন্ত বিনয়ী দেবদ্বিজে ভক্ত, ঈশ্বরে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সম্পন্ন ছিল ; বিশাল জমিদারি কার্যের প্রতি তাহাদের মাত্রই মনোযোগ ছিল না ; তাহারা সর্বদা ব্যবসার দিকে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। বাবুগণের বহু সম্পত্তি ব্রহ্মত্র, দেবত্র ও লাখেরাজ দান আছে। এখন সে সব দান ও কীর্তি অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত আছে। লৌহজঙের উন্নতির জন্য বাবুগণ অনেক কার্যই করিয়া গিয়াছেন, লোকের গমনাগমনের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাটের সংস্কার ও ব্যবসার সুবিধার জন্য খাল কাটান হইত। ধান কুনিয়া হইতে কনকসার এবং ধানুকুনিয়া হইতে বেজগাঁ যে খাল দৃষ্ট হয় তাহা লৌহজঙের পাল বাবুগণের অর্থে সেকালে কাটান হয়। বেজগাঁর স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ দেওয়ান ইহা নিয়া বহু কলহ ও আপত্তি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মহারাজ রাজবল্লভের উপদেশে উভয় পক্ষ আপোষ ও মীমাংসায় শান্তিতে থাকে।

আমরা নিম্নে লৌহজঙ পালবাবুদের অতি প্রাচীন দলিল হইতে চৌধুরী উপাধির সনন্দ পত্রখানার নকল লিপিবদ্ধ করিলাম।

চৌধুরী উপাধির সনন্দ

মতসুদ্দিয়ান ও মহম্মতহান ও আএল্লা ও চৌধুরী আল ও কাননগো আন ও তাহুত দারাণ ও রায়তান ও জিরাত আন তপ্পে লোহজঙ আমলে পরগণে রাজনগর বিক্রমপুর মহাল জায়গির সরকার আলির সরকার বাজুহায় মাতালফে জিলা জাহাঙ্গীরনগর মুজাফসুতে জিম্মুতল বিলাত বাঙ্গলা বেদানন্দ তপ্পা মজকুরের মামুদসাফি চৌধুরী সরকারের মবলক হার খাজানা বাবদ সন ১২০৬ সাল আপন জিম্মে বাকি রাখিয়াছে তাহাতে নিলামে দুইখানি দফা হুকুমনামা লটকানে ও সরকারে খাজানা আদায় করিলেক না একারণ বড় সাহেব ও কৌশুলী সাহেবানের হুকুম মজিম বাঙ্গলা ৬ শাওণ সন ১২০৭ সালে বাঙ্গলা তারিখে মোতাবেক ১৬ মাহে ফেবারী ১৮০০ সাল ইংরাজি দেওয়ানি আদালতের কাচারিতে তপ্পা মজুকর নিলাম হইল। নিলামের সময় শোভারাম পাল সুধারাম পাল গং বন্দোবস্ত তপ্পা মজুকর মবলক ৫২১০ বায়ান্নশত দশ টাকার সিক্কা কিস্মতে খরিদ করিয়া কিস্মতের টাকাই নগদ দাখিল করিয়াছে। অতএব তপ্পা মজকুরের চৌধুরীই মামুদ সফি চৌধুরীর তশরিতে নিলামের তারিখ ইস্তক শোভারাম সুধারাম পাল তাং মজকুরেকে মোকরার হইল আমলতো দেয়ানতে রাস্তাঘাট দুরস্ত থাকিবে প্রজালোকের সহিত সলুকে কাজ করিবে। সে দোহা হারের আরজি অধিক জাহির হয়ে এবং সরকার মাল গুজারিক বরতক্ত আদায় করিবে দরগাতে যে আবুয়াব মানা আছে তাহাতে পরহেজ থাকিবেক ও তোমরা ইহাকে তপ্পা মজকুরে চৌধুরী কায়েম ও ইহার মোহর ও দস্তখত ওমার তকমিম কাগজে মাতব্বর জানিবাও দোসরা কাহাকে ইহার সরিক না জানিবা। ইতি ১৮০০ সাল তারিখ ২৬ এপ্রিল বাঙ্গলা ১২০৭ সন তারিখ ১১ চৈত্র।

কোম্পানির মোহর ও সাকৌন্সিল গভর্নর সাহেবের দস্তখত

অতি প্রাচীনকালে লৌহজঙের তিলি বংশের গুরু সাহাবাজনগর নিবাসী কাশ্যপ গোত্রীয় তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ গঙ্গারাম দেবশর্মা নামে একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাহার গোত্র অনুসারে তদীয় শিষ্যগণ কাশ্যপ গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইহারা বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাধক শ্রীপাটসাগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রামনীলের চক্রবর্তী বংশ ইহাদের পুরোহিত বংশ। শ্রীধর ঠাকুর ইহাদের ভোগী পৃথক চট্টগ্রাম নিবাসী পূজারী নিযুক্ত ছিল এবং যাগ, যজ্ঞ, প্রতিষ্ঠা পার্বণাদি নানাবিধ কার্য উক্ত চক্রবর্তী বংশের পুরোহিতগণ সম্পাদন করিয়া থাকিতেন। পুরোহিতদিগের মধ্যে যিনি

পণ্ডিত তাহার জন্য পাল বাবুগণের অর্থ ব্যয়ে পুরোহিত বাটিতে সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপনার জন্য টোল গৃহ স্থাপিত হইয়াছিল। উপন্যাস পটু বৃদ্ধদিগের মুখে আজিও টোল গৃহের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রত্যেক বাজারে একশত লাঠিয়াল থাকিত, তাহারা নানকার খাইত ; কোন কেহই বেতন ভোগী ছিল না। কাপড় পোষাক ও খোরাকি সরকার হইতে পাইত। প্রত্যেক একশত লাঠিয়ালের জন্য একজন সর্দার নিযুক্ত হইত ; চারজন সর্দার দুই দ্রোন ও প্রত্যেক পাইক চারি দ্রোন জমি ভোগ করিত। আপদ বিপদের সময় প্রাণপণে প্রভুর ধন, সম্পত্তি রক্ষা করাই ইহাদের কাজ ছিল।

কুণ্ডু তালুকদারগণ পাল বাবুগণের পোদ্দার ছিল। আমাদের দেশে পূর্বে দেখিতে পাওয়া যাইত, ব্যবসায়ীগণ সবাই আত্মীয় বৎসল ছিলেন ; তাহাদের আত্মীয়গণকে সর্বদা কোষাধ্যক্ষের কার্যে নিযুক্ত করিতেন। লৌহজঙের পাল বাবুগণের কোষাধ্যক্ষের কর্মসচিব পোদ্দার উপাধি ছিল এবং খাজাঞ্চী কার্য পাল তালুকদারগণ করিতেন। তাহাদের বংশধরগণ আজও লৌহজঙে বসবাস করিয়া আসিতেছেন।

পাল বাবুগণের গৃহ দেবতা শ্রীধর ঠাকুর বিগ্রহ কত দিনের প্রাচীন তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। শ্রীধর জাগ্রত দেবতা, পাল বাবুগণের সমুদয় ক্রিয়াকলাপই সেকালে শ্রীধর বিগ্রহের সম্মুখে হইত। দৈনিক পূজার নিয়ম ছিল প্রাতে জাগরণ করিয়া এক প্রহর কীর্তন, বাল্য ভোগ, তৎপর স্নানাদি করাইয়া কুড়ি সের তণ্ডুলের নানা কীর্তন ও আরতি ; তৎপর বৈকালী বার মাসের বার প্রকার ফল মূল ও সদ্য মধু। প্রতি পূর্ণিমায় এক শত বৈষ্ণব সেবা ও একাদশীতে একশত ব্রাহ্মণ সেবা, প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ঠাকুরের অতিথি বলিয়া সম্মান করিতেন এবং ঠাকুরের ভোগ প্রসাদ সেবা করিতে হইত। কার্তিক মাসে নিয়ম সেবার সময় প্রত্যেক বৈষ্ণব ও দশজন ব্রাহ্মণকে নূতন বস্ত্র দান করিতেন। রাত্রিতে হরিনাম কীর্তন হইত ; প্রত্যেক হিস্যায় পালা অনুসারে এই প্রকার নিয়মে হাইকোর্টের বিধানে বাধ্য করিয়া শ্রীধর ঠাকুরের পূজা ও সেবার কার্য হইত।

বর্তমান সময়ে স্বর্গীয় চন্দ্রবিনোদ বাবুর পৌত্র উপেন্দ্রমোহন ও নীলকৃষ্ণ পাল চৌধুরী মহাশয় প্রমুখ ব্যক্তিগণ পূর্বপুরুষের গৌরব রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। শ্রীধর ঠাকুরের অতিথিশালা আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ উঠিয়া গিয়াছে। এখন স্বর্গীয় কেবলকৃষ্ণ পাল চৌধুরীর বংশ পরিচয় দিব।

লৌহজঙ :

এই স্থান কীর্তিনাশী নদীর উত্তর তটে অবস্থিত। ইহার আয়তনের ন্যায় বসতি সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। সম্প্রতি কীর্তিনাশা লৌহজঙকে এককালে উদরস্থ করিয়াছে। লৌহজঙের ধনী প্রধান পালবৃন্দ সর্বত্র পরিশ্রুত। পূর্বকালে ইহাদিগের বিপুল প্রতিপত্তি ছিল। ইহাদিগের প্রাচীন কার্যকলাপ স্মরণ করিবার মধ্যকালে আমাদের অন্তঃকরণে খেদের আবির্ভাব হইত। কিন্তু আধুনিক ভাবদর্শন করিয়া অনুমান হইতেছে, ইহাদের অস্তমিত যশোরবি পুনরুত্থিত হইবে। পালদিগের প্রযত্নে এখানে একটি ইংরেজি বঙ্গ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের ক্রমেই উন্নতি হইতেছে। তত্রত্য কতিপয় দেশ হিতৈষী ব্যক্তি অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে এই বিদ্যালয়ে "জ্ঞানপ্রকাশিকা" নাম্নী একটি সাপ্তাহিক সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অল্পকাল হইল, লৌহজঙে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু শুনা যাইতেছে গবর্নমেন্ট উহার স্থায়িত্বের জন্য সাহায্য প্রদানে অসম্মত হইয়াছেন। তাহারা বলেন এক গ্রামে তিন শ্রেণীস্থ বিদ্যালয় স্থাপন তাহাদের উদ্দেশ্য নয়।

পাল মহোদয়গণের বাটির সন্নিকটে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে একটি মেলা হইয়া থাকে। মেলা প্রায় সমস্ত ভাদ্র মাস ব্যাপিয়া থাকে। ইহাতে ঢাকা বরিশাল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি

পূববর্তী স্থান হইতে বহুবিধ বণিক আগমনপূর্বক আসন স্থাপন করিয়া বিবিধ শিল্প জাত দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। মেলায় দর্শক ও অনেক সমাগত হয়। এই মেলার সময় পাল বাবুরা নাট্য সঙ্গীত প্রভৃতি অলীক আমোদ উপলক্ষে অনেক টাকা ব্যয় করেন।

লৌহজঙের বাণিজ্যবলম্বিদিগের সংখ্যা মন্দ নহে। অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয়ই সুন্দররূপে চলিতেছে। পালগণও ইহার দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান হইতেছেন। বহু দূরবর্তী স্থান লইয়া ইহাদের লবণ ও বস্ত্রাদির ব্যবসায় হইয়া থাকে। অনেকের তৈল, তিল, গুড়, চিনি, তামাক, সরিষা প্রভৃতির কারবার আছে। কলকাতা, পাটনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, দক্ষিণে সাহাবাজপুর প্রভৃতি স্থানসমূহে ইহাদের বাণিজ্য চলিতেছে।

স্বর্গীয় কেবলকৃষ্ণ পাল চৌধুরী ঃ

ইহার নাম পাল চৌধুরীবংশে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেবলকৃষ্ণ বড় সুলক্ষণাক্রান্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি প্রথমত আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়া মুর্শিদাবাদে গিয়া কতকদিন নবাব সরকারে জমিদারি কার্য শিক্ষায় উন্নতি লাভ করেন। তৎপর কলিকাতায় থাকিয়া উত্তরোত্তর ব্যবসার উন্নতি করেন। তিনি একজন সুদক্ষ বক্তা ছিলেন, তিনি কলিকাতা থাকাকালীন বহুলোককে নিজের গদিতে রাখিয়া চাকুরিতে বহাল করিয়াছেন। কাহারো হীনাবস্থা জানিলেই তাহাকে যথোচিত সাহায্য করিতেন, তাহার কলিকাতার গদিতে অনেক দেশস্থ লোকের আহার ও থাকার স্থান ছিল। তিনি অমায়িক, সচ্চরিত্র ও বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন। কেবলকৃষ্ণ পাল তাহার মাতার "দানসাগর" শ্রাদ্ধে বহু অর্থব্যয় করেন। একপক্ষ কাল পর্যন্ত সেকালে বহুলোককে নানাবিধ সামগ্রী দ্বারা পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইয়া ছিলেন। এবং সে সময়ে নানাদেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া মাতৃশ্রাদ্ধে উপস্থিত করিয়াছিলেন, কেবলকৃষ্ণ পাল চৌধুরীর হিন্দুর অনুষ্ঠেয় পুণ্য কার্যে বিশেষ উৎসাহ ছিল। পরোপকার করা জন্মগত অধিকার ছিল।

তাহার মৃত্যুকালে দুই পুত্র রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠ আনন্দ ও কনিষ্ঠ প্যারিমোহন। সেকালে লোকে একালের মত আত্মপ্রশংসা লিখিয়া রাখিতে লজ্জা বোধ কিংবা অধর্ম বিবেচনা করিত।

সেকালে লৌহজঙ ব্যতীত অন্যান্য গ্রামের সৎ কার্য ও পণ্ডিতদিগের সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি কেবলকৃষ্ণ পাল চৌধুরীর সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল।

পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজাধীন বার্ষিক পরীক্ষা বৈশাখ মাসের শেষ অথবা জৈষ্ঠ্য মাসের প্রথম ভাগে গৃহীত হইয়া থাকে। নব্য ও প্রাচীন ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত, স্মৃতি, সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ, পুরাণ, আয়ুর্বেদ ও জ্যোর্তিশাস্ত্রে উপাধি, মধ্য ও আদ্য এই তিনটি পরীক্ষা গৃহীত হয়। ঢাকা, সুধারাম (নোয়াখালি), কুমিল্লা, কলিকাতা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, পটীয়া ও (ফরিদপুর) কবিরাজপুর এই সমাজের পরীক্ষা কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়াছে। উপাধি পরীক্ষা তিনদিন এবং আদ্য ও মধ্য পরীক্ষা দুইদিন গৃহীত হয়। উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্বপ্রথম ছাত্রগণ বৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন। বিদ্যাৎসাহী ধনাঢ্যগণের অর্থ সাহায্যে তাহাদের ইচ্ছানুসারে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রে উপাধি পরীক্ষাত্তীর্ণ সর্বপ্রথম ছাত্রদিগকে স্বর্ণ ও রজত পদক প্রদত্ত হইয়া থাকে। পূর্ববঙ্গ সারস্বত সমাজাধীন পরীক্ষা প্রদানার্থীকে কোন চাঁদা দিতে হয় না। সকল শাস্ত্রের সমস্ত পরীক্ষার্থী ছাত্রকেই সংস্কৃত ভাষায় উত্তর লিখিতে হয়। পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের লব্ধ প্রতিষ্ঠ অধ্যাপকগণ পরীক্ষক হইয়া থাকেন। সারস্বত সমাজের কার্যাবলী সাধারণ সভা কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মানুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর মহালয়ার দিন সারস্বত সমাজের বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ, ত্রিপুর, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, শ্রীহট্ট এবং নবদ্বীপ, ভট্টপল্লি, কলিকাতা, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানের অধ্যাপকবর্গ নিমন্ত্রিত ও বার্ষিক বিদায় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ছাত্রগণের পদক, উপাধি ও প্রশংসা পত্রাদি ঐ সভায়ই প্রদত্ত হয়। কার্য সৌকয্যার্থে সারস্বত সমাজের একটি কার্য নির্বাহক সভা আছে। পূর্ববঙ্গের সমস্ত জিলার কতিপয় প্রবীণ অধ্যাপক ঐ সভার সভ্য। স্থাপনাবধি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন সারস্বত সমাজের সম্পাদক পদে অভিষিক্ত আছেন। বিক্রমপুরের প্রধান স্মার্ত পণ্ডিতবর শ্রীযুত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন ইহার বর্তমান সভাপতি। আমাদের সদাশয় ইংরেজ গবর্নমেন্ট সারস্বত সমাজের উৎকর্ষ সাধনায় বার্ষিক পাঁচশত টাকা দান করিতেছেন।

প্রাচীনকালে বিক্রমপুর পরগণা সংস্কৃত বিদ্যালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের গৃহে এবং টোলে অহরহ নানা শাস্ত্রের আলোচনা হইত। কথিত আছে যে এই বিক্রমপুরে বসিয়াই "ভট্টনারায়ণ" ও "শ্রী হর্ষ" প্রভৃতি কবিগণ তাহাদিগের গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন ; মহারাজ বল্লালসেন রামপাল রাজধানীতে অবস্থানকালে "দানসাগর" রচনা করিয়াছিলেন ; বল্লালের শিক্ষাগুরু গোপাল ভট্ট বল্লাল চরিত্র রচনা করিয়াছিলেন। এই বিক্রমপুরের অধিবাসী হলায়ুধ ভট্টাচার্য "ব্রাহ্মণ সর্বস্ব" রচনা করিয়াছিলেন, আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ "সাহিত্য দর্পণ" রচনা করিয়াছিলেন। বান্ধব সম্পাদক রায় শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি আই ই বাহাদুর বলিয়াছেন যে, বিশ্বনাথের বংশধরগণ এখনও বিক্রমপুরের ভরাকৈর গ্রামে বসবাস করিতেছেন।

বিক্রমপুরে যাঁহারা শাস্ত্র আলোচনা করিতেন তাহাদিগের মধ্যে কাঠাদিয়া নিবাসী স্বর্গীয় কমল সার্বভৌম ইছাপুরা নিবাসী তারিণীচরণ ন্যায় বাচস্পতি, দক্ষিণ বিক্রমপুর ভোজেশ্বরের কালীনাথ তর্কভূষণ ও তারিণীচরণ গোস্বামী প্রসিদ্ধ ছিলেন ; স্মার্ত পণ্ডিতদিগের মধ্যে কুরাপাড়ার কালীকাণ্ড শিরোমণি, দীনবন্ধু ন্যায় পঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবর চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রভৃতি প্রধান। বৈয়াকরণের মধ্যে কুরাপাড়ার নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার প্রধান ছিলেন।

প্রাচীনকালে বিক্রমপুরে বহু কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় শিবচন্দ্র সেন প্রণীত সত্যনারায়ণের "পাচালী", "সারদা মঙ্গল" দ্বিজ যদুনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত "শনির পাঁচালী" এবং দক্ষিণ বিক্রমপুর নিবাসী জপসা গ্রামের লালা রামপ্রসাদ প্রণীত হরিলীলা।

বিক্রমপুরে তিলি জাতির গুরু গোস্বামী বংশের জীবনী প্রণেতা বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাঠকাটা গ্রামে রাঢ়ীয় কাশ্যপ গোত্র শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ কুলে হলায়ুধ ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন ইনিই বঙ্গাধিপতি লক্ষ্মণ সেনের গুরু, পরে রত্নাকর মিশ্র নামক এক মহত্মা গ্রহণ করেন। রত্নাকরের দুই পুত্র সর্বাপ্রকাশানন্দ। প্রভু চৈতন্য দেবের প্রিয় জগন্নাথ দাস গোস্বামী সর্বানন্দের পুত্র।

আমাদের বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে ইনি কাঠকাটা জগন্নাথ দাস নামে পরিচিত। যথা "শ্রীনাথ চন্দ্র আর উদ্ধব দাস, জিতা মিশ্র কাঠকাটা জা দাস।"

বলা বাহুল্য বাসস্থানের নামে হইতেই এই উপাধির সৃষ্টি। জগন্নাথ তৎকালে বঙ্গদেশের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও সাহিত্য সমালোচক ছিলেন।

জগন্নাথ অল্প বয়সেই মাতাপিতৃহীন পিতৃব্য প্রকাশানন্দের অভিভাবকত্বে লালিত পালিত হন। ইনি শৈশব হইতেই বিষ্ণু ভক্ত ছিলেন। যথাকালে পিতৃব্যের যত্নে জগন্নাথ টোলে প্রেরিত হইলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই দেশের সর্বপণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হইলেন ও আচার্য লাভ করিলেন।

বৈদ্যকবি স্বর্গীয় শিবচন্দ্র সেন। কাঁচদিয়া গ্রামে শিবচন্দ্র সেনের জন্ম। শিবচন্দ্র, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জীবিত ছিলেন। সারদামঙ্গল বৃহৎ গ্রন্থ, ইহা রামায়ণের নামান্তর মাত্র। রাম শারদার পূজা করিয়া, তাহার মাহত্ম্যে রাবণ বধ করিয়াছিলেন। এই অর্থে কবি রামায়ণকে শারদামঙ্গল আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। শারদামঙ্গল বহুদিন পূর্বে স্কুল পণ্ডিত কেদারেশ্বর চক্রবর্তী মুদ্রিত করিয়া ছিলেন। শারদামঙ্গলের ভাষা বিশুদ্ধ ও লালিত্য সম্পন্ন। কবির নিবাস

কাঁচাদিয়া গ্রামে, এখন কীর্তিনাশার বিশাল উদরে স্থান পাইয়াছে। কবির বংশধরগণ এখন স্বর্ণগ্রাম (কামারখাড়া) গ্রামে বাস করিতেছেন। বিক্রমপুর সেকালে শিবচন্দ্র সেনের দুর্গোৎসব, রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়ের দোল, কামিনী মুখোপাধ্যায়ের দ্বীপান্বিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

১২০১ সনের বৈশাখ মাসে বিক্রমপুরে দ্বিজরামপ্রসাদ ও পণ্ডিত প্রবর রাজকৃষ্ণ সেন মহোদয় সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করিয়া ছিলেন।

১৮৮৪ সনে "বিক্রমপুর বার্তাবহ" নামে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হয়।

১৮৯৪ সনে মুন্সিগঞ্জ হইতে "বিক্রমপুর" নামে একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বাহির হয়।

বিক্রমপুরের সাতটি পারিবারিক লাইব্রেরীর মধ্যে কার্তিকপুর ভোজেশ্বর, জৈনসার লাইব্রেরী ও বেজগাঁ রাজমোহন লাইব্রেরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেজগাঁ লাইব্রেরী ইং ১৯০০ সনে স্থাপিত হয়।

মুন্সিগঞ্জ মহকুমার অর্থাৎ উত্তর বিক্রমপুরে ৯৭৮ খানা গ্রাম এবং দক্ষিণ বিক্রমপুরে ৪৯০ খানা গ্রাম।

বিক্রমপুরে বর্ষার সময়ে জমি সকল কোন কোন স্থানে ১০ ফুট হইতে ১৪ ফুট পর্যন্ত জলের নিচে থাকে।

১৭৯৭ সনে বিক্রমপুরে প্রথম বিলাতী আলু আসে এবং ঢাকা জেলায় প্রথম চাষ আরম্ভ হয়।

বিক্রমপুরে একটি মসলিনের আড়ং আবদুল্লাপুর তৎ সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে রিপোর্টের নকল—

They have been treated also with such injustice that instances have been known of their cutting off their thumbs to prevent their being forced to wind silk. [W. Bolts] [1772]

লালমোহন পাল চৌধুরী লৌহজঙে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আনন্দমোহন পাল চৌধুরী মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। গ্রাম্য পাঠশালায় বাংলা ভাষা শিক্ষা করিয়া আরবি ও পারসি ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত তিনি কলিকাতা গমন করেন। তাহার মেধা শক্তি অসাধারণ ছিল, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার উপযুক্ত পরিচালনার গুণে সর্বতোমুখী জ্ঞানের প্রচুর বিকাশ হয়। কলিকাতা তাহার কর্মক্ষেত্র ছিল। ধর্মতত্ত্বানুসন্ধানী হইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। বাল্যকাল হইতেই সজ্জন সহবাস, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সৎকার্যাদির অনুসরণ ক্রমে তাহার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল। তিনি সর্বদা গল্পচ্ছলে বলিতেন সংসারে অসচ্চরিত্র ব্যক্তি কখনই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। বাক্য ও আচরণের সংযমে প্রকৃত শিষ্টাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। লোকহিতকর অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ লালমোহনের সহচর ছিল।

এক সময় দুর্ভিক্ষে লৌহজঙের অধিবাসীগণ অধিকাংশই নিঃসম্বল হইয়া পড়িল। লালমোহন অগ্রজের নিকট লৌহজঙ অধিবাসীগণের দুরবস্থা এবং তাহারা যে অনাহারে ও ব্যাধি প্রপীড়িত হইয়া দিনপাত করিতেছে তাহা জানাইলেও অগ্রজ শশীমোহন উহাতে কর্ণপাত না করিয়া নিরুত্তর রহিলেন। কিন্তু দায়রসাগর লালমোহন স্থির থাকিতে না পারিয়া যথাসাধ্য অর্থ অকাতরে বিতরণ করেন। মুন্সিগঞ্জ হাসপাতালে নিঃস্বার্থ দান লালমোহনের সর্বোপরি অক্ষয় কীর্তি। স্বজাতীয়গণের বিরাগ ও তাহাদের নানারূপ অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও বহু লোকহিতকর কার্যে দান করিতেন। কলিকাতা অবস্থানকালে লালমোহন স্বহস্তে রন্ধন করিয়া নিয়মসেবা করিতেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও সান্ধ্যবন্দনাদি নিত্যকৃত্য ও বৈষ্ণব সেবা সমাপন না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। মৃত্যুকালে দুই পুত্র রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন ; প্রথম রাজেন্দ্রমোহন, দ্বিতীয় অহীন্দ্রমোহন।

শ্রীযুত রাজেন্দ্রমোহন পাল চৌধুরী লৌহজঙে জন্মগ্রহণ করেন। সাত বৎসর বয়সের সময় লৌহজঙ পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা জন্য কলিকাতা হাটখোলার বাসায় গমন করেন। স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ক্রমে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তৎপর কলেজে প্রবেশ করিয়া অসাধারণ মেধা শক্তি পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুর নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন। তীর্থস্থানে তাহার নিকট প্রার্থী হইয়া কেহ বিফল কাম হয় নাই। তিনি নিজ ব্যয়ে নিজ গ্রামে স্কুল ও অন্যান্য স্থানে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিতেন। রাজেন্দ্রমোহন সার্বজনীন প্রীতি, করুণা ও পরদুঃখকাতরতা গুণে বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন। তাহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান খগেন্দ্র। তিনি একজন নীরবকর্মী ও সেবক এবং আত্মগোপনই রাজেন্দ্রমোহনের স্বভাব। তাহার অনুমতিক্রমে তাহার লিখিত ডায়েরি হইতে বিক্রমপুরের বহু আবশ্যকীয় ও জ্ঞাতব্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়া উদ্ধৃত করিলাম।

ঐতিহাসিক স্থানসমূহ ঃ

কার্তিকপুর, শ্রীপুর, নড়িয়া বিঝাড়ী, আবদুল্লাপুর, ইদ্রাকপুর, কাজিকসবা, কেদারপুর, রাজাবাড়ি, ন'পাড়া, শ্রীনগর, মালখানগর, রঘুরামপুর, রামপাল, রাজনগর, রামনীল, সমতট, ফতেজঙপুর, ফিরিঙ্গিবাজার, বজ্রযোগিনী, টংগিবাড়ি।

পুণ্যস্থানসমূহ ঃ

বেজগাঁ, বুড়াশিব, বেজগাঁ কালী, বেজগাঁ বড় বাড়ির শ্রীশ্রী লক্ষ্মীজনার্দন ঠাকুর, চাচুরতলার কালীবাড়ি, পাটাভোগের হরিবাড়ি, হলদিয়ার কালী, হইরামুন্সার কালী, লৌহজঙের শ্রীধর ঠাকুর ও শ্রীনরসিংহ জীউ, কলমার জয়কালী, শ্রীনগরের অনন্তদেব, ভায়ারের কালী ও দুর্গা, পাইকপাড়ার বাসুদেব, সেরাজাবাদের সুধারামের আখারা, তালতলার শিবলিঙ্গ ও আনন্দময়ী, নাগর নন্দীর শ্রীধর ঠাকুর বিগ্রহ, বাঘরার বাসুদেব, বহরের রাজরাজেশ্বর, ইছাপুরা দক্ষিণা কালী, দুয়াল্লীর শিববাড়ি, মাঐসারের দগীশ্বরী, মালদার কালীবাড়ি।

প্রাচীন কীর্তিসমূহ ঃ

রাজাবাড়ির মঠ, কার্তিকপুরের মসজিদ, পাথরঘাটার মসজিদ, শ্রীনগরের বুরুজ, ইদ্রাকপুরের কেল্লা, আবদুল্লাপুরের পুল, তালতলার পুল, কুরাসির শিব মন্দির।

পোস্ট অফিসসমূহ ঃ

ভাগ্যকুল, বাঘরা, কাঠিয়াপাড়া, হাসারা, কেওটখালি, কুমারভোগ, গ্রামওয়ারী, মেদিনীমণ্ডল, শেখেরনগর, বারৈখালি, ষোলঘর, শ্রীনগর, মাইজপাড় বেলতলী আটাড়া, দোগাছি, কুকুটিয়া, শ্যামসিদ্ধি, মুন্সিগঞ্জ, ফিরিঙ্গিবাজার, ঘাসির পুকুরপাড়, কেওয়ার, মূলচর, পঞ্চসার, বহর, ভরাকৈর, কলমা, বজ্রযোগিনী, বারুনী, বিদগাঁ, হাসাইল বালরী, ইছাপুরা, চন্দনধূল, খিদিরপাড়, কুচিয়ামোড়া, রসুনীয়া, সিরাজদিঘা, শিয়ালদী, তাজপুর, টোল বাসাইল, বিক্রমপুর মধ্যপাড়া, জৈনসার, পশ্চিমপাড়া কাঠাদিয়া সিমুলিয়া, রাউৎভোগ, যশলঙ্গ, কোলা বেলতলী, রোজদী, লৌহজঙ বেজগাঁ, ভোগদিয়া, ব্রাহ্মণগাঁ, গাওদিয়া, গাওপাড়া, হলদিয়া, কনকসার, কোরহাটি, মালখানগর, কাইচাইল, মালপদিয়া, পাঐলদিয়া, শিলিমপুর, মীরকাদিম, পাইকপাড়া, রাজাবাড়ি, সোনার আড়িয়ল, বালিগাঁ, বেতকা, আইটসাহী, পুরাপাড়া, টংগিবাড়ি, স্বর্ণগ্রাম, বাঘিয়া, নয়না।

বিক্রমপুরের স্টিমার স্টেশন ঃ

কাদিরপুর, মাওয়া, তারপাশা, সুরেশ্বর, কলমা, বহর, কমলাঘাট, মুন্সিগঞ্জ, মীরকাদিম, তালতলা, বেতকা, সেরাজদীঘা, নড়িয়া, পালং।

বিক্রমপুরের খাল ঃ

তালতলার খাল, শ্রীনগরের খাল, কুচিয়ামোড়ার খাল, মীরকাদিমের খাল, চুড়াইনের খাল, বেজগাঁর খাল, বহুরের খাল, কলমার খাল, হলদিয়ার খাল।

প্রসিদ্ধ রাস্তা ঃ

তালতলা হইতে শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ হইতে তালতলা, ইছাপুরা হইতে জৈনসার, তালতলা হইতে ঘোড়দৌড়, ঘোড়দৌড় হইতে মুন্সিগঞ্জ, বজ্রযোগিনী হইতে কাটাখালি, কোলাপাড়া হইতে ভাগ্যকুল, বাঘরা হইতে শ্রীনগর পর্যন্ত।

বাণিজ্যবন্দর ঃ

মীরকাদিম, ফিরিঙ্গিবাজার, তালতলা, রিকাবী বাজার, বারুণীঘাট, মুন্সিগঞ্জ, ভাগ্যকূল, লৌহজঙ, শেখরনগর, বারুইখালি, ধান কুনিয়া ভরাকর, সুবচনী মাকোহাটি, দিঘিরপাড়, কনকসার, শ্রীনগর, হলদিয়া, সেরাজদীঘা।

প্রাত্যহিক বাজার ঃ

বজ্রযোগিনী, টংগিবাড়ি, সোনারং কলমা আউটসাহী, হাসাড়া, বেজগাঁ, ভোগদিয়া, লৌহজং, ধানকুনিয়া, কনকসার, বালিগাঁ, চচুরতলা, শ্রীনগর, ষোলঘর, আবদুল্লাপুর, ভাগ্যকুল, বাঘরা, নাগরনন্দি, কাইঠাপাড়া, মাইজপাড়া, রাঢ়ীখাল, রিকাবীবাজার, বিদগাঁও, হাসাইল, ডহরী ছটফইটা, দ্বিপাড়া নূতন বাজার, সুবচনী, দিঘিরপাড়, সেরাজগীঘা, কামারখাড়া, কোলাপাড়া, হলদিয়া, ইছাপুরা, সিংপাড়া, বীরতারা, খিদিরপাড়া, মধ্যপাড়া, মুন্সিগঞ্জ, উয়ারী।

ভূমিকম্প ঃ

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ১২ জুন, ১০৭১, ১০৭২ সনে, ১১৬৮ সনের ১৮ চৈত্র সোমবার, ১২৫৩ সনের ৩রা কার্তিক রবিবার দিবা ২। ১৫ মিনিটের সময়, ১২৫৭ সনের ২৫ পৌষ বুধবার, ১২৫৯ সনের ২৭ শ্রাবণ মঙ্গলবার, ১১৩৮ সনে, ১১৮১ সনে, ১২১৮, ১২৭৮ সনে, ১২৯৭ সনে, ১১৮১ সনে, ১২১৮ সনে, ১৩০৯ সনের ৬ ভাদ্র ও ১৩৪২ সনে।

জলপ্লাবন ঃ

১৭৮৭ খ্রিঃ অঃ ১৭৮৮ খ্রিঃ অঃ ১৭৮৬ খ্রিঃ অঃ ১৭৬৯ খ্রিঃ অঃ ১৭৭০ খ্রিঃ অঃ ১৭৮৪ খ্রিঃ অঃ ১৮৩৩ খ্রিঃ অঃ ১৮৪৪ খ্রিঃ অঃ ১৮৭৬ খ্রিঃ অঃ ১২৮৩ সনের ১৬ কার্তিক, ১৩২৬ সনের আশ্বিন মাসে।

বিক্রমপুরে বৈদ্যুতিক আলো ঃ

বেজগাঁ নিবাসী রায় প্রসন্নকুমার দাশ বাহাদুর ১৩১৯ সনে প্রথম ব্যবহার করেন। তৎপর দক্ষিণ বিক্রমপুর ডোমসারের পালচৌধুরীগণ তড়িতালোক ব্যবহার করেন। ভাগ্যকুলের জমিদারগণ অস্থায়ীভাবে সময় সময় কার্য উপলক্ষে বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন।

বিক্রমপুরের পণ্ডিতগণ ঃ

মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নকুমার তর্কনিধি, কমলাকান্ত সার্বভৌম, সারদাচরণ পঞ্চানন, কালীচরণ তর্কালঙ্কার, নৃসিংহ শিরোমণি কাশীকান্ত ন্যায়পঞ্চানন, দীননাথ বিদ্যাবাগীশ, ব্রজলাল তর্করত্ন, কালীচরণ তর্কবাগীশ, মদনমোহন সার্বভৌম, গোলকচন্দ্র সার্বভৌম, চন্দ্রনারায়ণ ন্যায় পঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় তারিণীচরণ শিরোমণি, জগৎবন্ধু তর্কবাগিশ, দেবীচরণ তর্কভূষণ, কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, কৃপানাথ তর্কসিদ্ধান্ত, রামদাস বিদ্যারত্ন, দেবীদাস চূড়ামণি, শশীমোহন স্মৃতিরত্ন, পার্বতীচরণ বাচস্পতি, কালীকুমার বিদ্যারত্ন, জগচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, তারাচরণ ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণকিশোর শিরোমণি, কেদারনাথ পদরত্ন, গঙ্গাচরণ তর্করত্ন, লোকনাথ শিরোমণি, হরি

বিদ্যালঙ্কার, দুর্গাচরণ তর্করত্ন, কালীকুমার বিদ্যারত্ন (কুড়াপাড়া) অন্নদাচরণ তর্করত্ন, হরিমোহন শিরোমণি, দুর্গাপ্রসাদ তর্কলঙ্কার, রামমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি।

বিক্রমপুরের মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ ঃ

কালিদাস কবিরত্ন, রামদুর্লভ সেন, গঙ্গাপ্রসাদ সেন, রামরাজ দাস, ভগবানচন্দ্র দাস, মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন, পীতাম্বর কবিরত্ন, হরিমোহন সেন, গুডিভ চক্রবর্তী, গুরুপ্রসাদ সেন, রজনীনাথ, নিশিকান্ত, শীতলাকান্ত, অভয়কুমার দত্ত, অভয়াচরণ দাস, মুন্সি কাশীনাথ, স্যর চন্দ্রমাধব, মনোমোহন, লালমোহন ঘোষ, দাতা কালীকুমার, কালীমোহন, দুর্গামোহন, ভুবনমোহন দাস, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ডাক্তার অঘোরনাথ, সরোজিনী নাইডু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আচার্য জগদীশচন্দ্র, পদ্মলোচন ঘোষ, মিস্টার পি. আর দাস।

বিক্রমপুরে স্কুলসমূহ ঃ

মুন্সিগঞ্জ, ভাগ্যকূল, হাসাড়া তেলীর বাগ, বেজগাঁ, বানরী, কলমা, লৌহজং, ব্রাহ্মণগাঁ বাঘড়া, ইছাপুরা, মধ্যপাড়া, আড়িয়ল, পয়সা, বৌল তলী, চাঁপাতলী স্বর্ণগ্রাম, সিদ্ধেশ্বরী, পুরা, ব্রাহ্মণভিটা, সোনারং, বিনোদপুর, আবদুল্লাপুর, আউটসাহী মালখাঁনগর, রাজদীয়া।

প্রসিদ্ধ গ্রামনাম ঃ

ষোলঘর কুকুটিয়া, পাইকপাড়া বজ্রযোগিনী, রামপাল, কাজীরপাগলা, শেখের নগর, রাঢ়ীখাল। মুন্সিগঞ্জ, পঞ্চসার কমলাঘাট, ফিরিঙ্গিবাজার, মীরকাদিম, রামপাল, বেতকা, পাইকপাড়া, কাইচাইল, আউটসাহী, সোনারং, বজ্রযোগিনী, কেওয়ার, শিলিমপুর, বালীগাঁ, পুরাপাড়া, কুড়মিরা, আড়িয়ল, শিমুলীয়া, রাউৎভোগ, যশোলঙ্গ, বাঘিয়া, কলমা, বাসিরা, পাঁচগাঁও, ভরাকৈর, স্বর্ণগ্রাম, মূলচর, তেলীরবাগ, কান্দাপাড়া দ্বিপাড়া, বহর, মত্তগাও, টংগিবাড়ি কাঠাদিয়া, মিতারা, বানরী, বিদগাঁও, চাচুরতলা, রাজাবাড়ি, বাহেরক, মালদা, বাহেরপাড়া, গুণগাঁও, নশঙ্কব, হাসাইল, শ্রীনগর, রাজানগর, ষোলঘর, হাসাড়া, শেখরনগর, কুমারভোগ, সেরাজদিঘা, কোলা, ভাগ্যকুল, পাওলদীয়া, মালখানগর, ফেগুনাসার, বয়রাগাদী, কুকুটিয়া, তালতলা, তন্তর, মেদিনীমণ্ডল, কাজিরপাগলা, কোরহাটি, হলদিয়া, তেওটিয়া, ব্রাহ্মণগাঁ, লৌহজং, ধানকুনিয়া, কনকসার, বেজগাঁ, বিক্রমপুর পাইকপাড়া, শিবরামপুর, পাউসার, পশ্চিমপাড়া, জৈনসার, শ্রীধরখোলা, বাড়ৈখালি, বীরতারা, সিংপাড়া, চন্দনধুল, ইছাপুরা, মধ্যপাড়া, দোগাছি, শ্যামসিদ্ধি, মাইজপাড়া, রাঢ়িখাল, কুশারীপাড়া, নাগরভাগ, ভোগদীয়া, খিদিরপাড়া, মালপদীয়, রাজদীয়া, আইকাদল, রুজদী, দক্ষিণ চাইরগাঁ, নাগেরহাট, ডহরী, গাওদীয়া, পয়সা, পাওপাড়া প্রভৃতি।

বিক্রমপুরের বিবিধ আলোচনা ঃ

ভাগ্যকুলের (বিক্রমপুরের) স্বনামধন্য দানশীল জমিদার রাজা শ্রীল শ্রীযুত জানকীনাথ রায় বাহাদুরের একান্ত অনুরোধে লৌহজং পাল বাবুদের রেকর্ড রুম হইতে শ্রীযুত জলধর পাল চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিক্রমপুরের বিবিধ আলোচনা নামক প্রবন্ধ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল। রাজা বাহাদুর যৌবনে অমরচাঁদ পাল চৌধুরীর দ্বারা লিখিত বিধায় লৌহজং পাল বংশের অধ্যায়ে আমরা আবশ্যক বোধে এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

দক্ষিণ বিক্রমপুর মুলফতগঞ্জ থানা ঢাকা জেলার অধীন ছিল। ১৮৬৬ সালের পূর্বেই মুলফতগঞ্জ থানার শাসন সংক্রান্ত কার্য বাকরগঞ্জ জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে ন্যস্ত করা হইলেও কার্যত তাহা হয় নাই। ঐ থানার অধিবাসীগণ এই পরিবর্তনে অপত্য উত্থাপন করিলে এতকাল ঐ পরিবর্তন স্থগিত থাকে। মুলফতগঞ্জ থানাসহ মাদারিপুর মহকুমা ১৮৭৪ সনে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। চাকুরি ব্যবসায় উপলক্ষে দেশান্তরে বাস করার জন্য

বিক্রমপুরের অধিবাসী প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে এমন স্থান নাই, যে স্থানে প্রচুর পরিমাণে বিক্রমপুর পরগণার লোক দেখিতে না পাওয়া যায়।

Mr. Phillips সাহেব তাহার রিপোর্টে লিখিয়াছেন, "Paragana Bikrampur in the Dacca District is famous for the migrating spirit of its inhabitants, there is not single district in Bengal in which men of Bikrampur can not be found in considerable numbers in Government of Private Services."

লোক সংখ্যা বিক্রমপুরের সর্বাপেক্ষা অধিক, প্রতি বর্গ মাইলে ১৬৫৪ জন। এত ঘন বসতি অন্য কোথায় নাই। মুন্সিগঞ্জ মহকুমা ও মাদারীপুর মহকুমার কতক অংশ সহ সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমপুর পরগণা অবস্থিত। বিক্রমপুর খুব বৃহৎ পরগণা নহে ; কিন্তু লোক সংখ্যায় ইহা বাঙ্গালার অদ্বিতীয় পরগণা। বর্তমানে বিক্রমপুর (১৯২০ মার্চ) প্রতি বর্গ মাইলে প্রায় ২৭০০ লোকের বাস।

Gait সাহেব বলিয়াছেন : Sons of Bikrampur are found all over Bengal, Assam and even further afield practising as Pleaders of holding Posts.

Mr. Sutherland সাহেব লিখিয়াছেন, "Bikrampur the officina of the amlaginas in Eastern Bengal."

১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুন্সিগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হয়। ১৮৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দে মুন্সিগঞ্জ মহকুমার চৌকি, থানা, ফাঁড়ি ছিল তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

মহকুমা	চৌকি	থানা	ফাঁড়ি থানা
মুন্সিগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	বৈদ্যের বাজার রোহিতপুর
	বহর	রাজবাড়ি শ্রীনগর	মুন্সিগঞ্জ

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে পদ্মার গতি পরিবর্তিত হইয়া বিক্রমপুর পরগণার অর্ধাংশ ঢাকা জেলা হইতে পৃথক হইয়া যায়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুনের গবর্নমেন্ট বিজ্ঞাপনী অনুসারে ঐ সনের ১ আগস্ট হইতে বিক্রমপুর দক্ষিণ ভাগ (৪৫৮ খানা গ্রাম) বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

কোন প্রসিদ্ধ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর বিক্রমপুরবাসীদের কার্যদক্ষতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যদি হংস পুচ্ছধারীগণ বীর বলিয়া গণ্য হয়, তবে বিক্রমপুরবাসীরাই যথার্থ বীর শ্রেষ্ঠ। ইহাদের অতি অল্প লোকেরই বৃত্তি সম্পত্তি আছে। ইহারা স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মণীষা দ্বারা জীবনমাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকেন।"

If quitlt drivers are heroes it is a veritable nidvs et matric herovm etc etc. Very few (of the people of Bikramput) have lands and they have to get their livelihood by their wits and brains. Phillips Report (1891)

বিক্রমপুরের উচ্চারণ ঃ

বিক্রমপুরের অধিবাসীদিগের ভাষার ও বাক্যালাপে বিশেষত্ব আছে। ইহাদের বাক্যের শেষে যে দীর্ঘ উচ্চারণ থাকে তাহা দ্বারা বিশেষরূপে ইহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ উচ্চারণ অবশ্য কোমল।

হিন্দু রাজত্ব হইলে বিক্রমপুর সংস্কৃত শিক্ষার একটি কেন্দ্র স্থান। নবদ্বীপ ব্যতীত এরূপ স্থান এতদ্দেশে আর নাই। সেকালে বিক্রমপুরের পল্লিতে পল্লিতে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল। বহু দূরবর্তী স্থান হইতে এই সকল চতুষ্পাঠীতে আসিয়া শিক্ষার্থীরা অধ্যয়ন করিত। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকেরাই ছাত্রদিগের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন। মুসলমান রাজত্ব সময়ে বিক্রমপুরে

আরবি ও পার্শি ভাষা শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে "মোক্তব" এবং বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষার জন্য পাঠশালা স্থাপিত ছিল।

প্রাচীন গ্রাম্য প্রথা অনুসারে মৌলবি ও গুরু মহাশয়েরা "গ্রামিকানের" চাঁদা দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন। তাহাদের বেতন স্বরূপ শস্যাদি গ্রহণেরও রীতি ছিল। পড়ুয়ারাও যাহার তাহার সুবিধা অনুসারে কড়ি, শস্য, মুদ্রা প্রভৃতি দ্বারা বেতন প্রদান করিত। টেইলার সাহেব লিখিয়াছেন (1838) কলার-পাতে লিখান, টান অক্ষর পড়ান, জমিদারি মহাজনীর হিসাবপত্র রাখা, কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়া ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইত। বিক্রমপুরে প্রথম কালিপাড়া গ্রামে প্রথম ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, পরে ভেঘরিয়া এই দুইটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শেষ হয় পাঁচ বৎসর পরে ভেঘরিয়া স্কুল স্থাপিত হয়।

১৮৬৬ সনে বিক্রমপুরে স্ত্রীলোকদিগের জন্য বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

১। বিক্রমপুর জননা বিদ্যালয় (মুন্সিগঞ্জ)	২। চাইরগাঁ মহিলা বিদ্যালয়
৩। শ্রীধরখোলা বালিকা স্কুল	৪। বারিখালি বালিকা স্কুল
৫। ব্রাহ্মণগাঁও বালিকা স্কুল	৬। আউটসাহি বালিকা স্কুল
৭। ভাগ্যকুল বালিকা স্কুল	৮। কোলাপাড়া বালিকা স্কুল
৯। কামারগাঁও বালিকা স্কুল	১০। সোয়াকদল বালিকা স্কুল
১১। ষোলঘর বালিকা স্কুল	১২। রশুনিয়া বালিকা স্কুল
১৩। খালিয়াবক্গাঁ বালিকা স্কুল	১৪। রাথুরা বালিকা স্কুল

১৫। লক্ষ্মীকোল বালিকা স্কুল

* সে সময়ে অর্থাৎ ১৮৬৬ সনে বিক্রমপুরে শতকরা একজন স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানিত।

উত্তর বিক্রমপুরের হাটবাজার

১। দীঘলী	শনি, মঙ্গলবার	২। বেজগাঁ	দৈনিক বাজার
৩। গাউপাড়া	দৈনিক বাজার	৪। গাওদিয়া	রবিবার, বৃহস্পতিবার
৫। যশলদীয়া	শুক্রবার, সোমবার	৬। শিমুলিয়া	মঙ্গলবার
৭। নাগেরহাট	দৈনিক বাজার	৮। নওপাড়া	শনিবার, বুধবার
৯। ক্ষীদিরপাড়া	মঙ্গলবার, শনিবার	১০। মাওয়া	দৈনিক বাজার
১১। দিঘিরপাড়	শুক্রবার, সোমবার	১২। আটপাড়া	দৈনিক বাজার
১৩। বজ্রযোগিনী	দৈনিক বাজার	১৪। মুন্সিগঞ্জ	দৈনিক বাজার
১৫। কাটাখালি	দৈনিক বাজার	১৬। ফিরিঙ্গিবাজার	দৈনিক বাজার
১৭। মার্কোহাটি	দৈনিক বাজার	১৮। পুরা	শনিবার, মঙ্গলবার
১৯। আউটসাহী	দৈনিক বাজার	২০। বালীগাঁও	সোমবার, শুক্রবার
২১। আরিয়ল	রবিবার, বৃহস্পতিবার	২২। কলমা	শুক্রবার, সোমবার
২৩। টংগিবাড়ি	সোমবার, শুক্রবার	২৪। সোনারং	দৈনিক বাজার
২৫। আবদুল্লাপুর	দৈনিক বাজার	২৬। কুণ্ডেরবাজার	বৃহস্পতিবার
২৭। আলদী	রবিবার. বৃহস্পতিবার	২৮। সেরাজাবাদ	দৈনিক বাজার
২৯। বাঘিয়া	দৈনিক বাজার	৩০। কামারখাড়া	দৈনিক বাজার
৩১। হাঁহাইল	শনিবার, মঙ্গলবার	৩২। তেয়টিয়া	দৈনিক বাজার
৩৩। শ্যামসিদ্ধি	দৈনিক বাজার	৩৪। কামারগাঁও	দৈনিক বাজার
৩৫। ঝাউটিয়া	দৈনিক বাজার	৩৬। খরিয়া	দৈনিক বাজার
৩৭। সৈদপুর	দৈনিক বাজার	৩৮। বরাম	দৈনিক বাজার

৩৯। কুইচামোরা	রবিবার, বৃহস্পতিবার	৪০। বয়রাগাদী	দৈনিক বাজার
৪১। কমলাঘাট	দৈনিক বাজার	৪২। দোগাছি	দৈনিক বাজার
৪৩। চুরাইন	দৈনিক বাজার	৪৪। রুজদী	দৈনিক বাজার
৪৫। কয়কীর্তন	দৈনিক বাজার	৪৬। ধানেরখোলা	দৈনিক বাজার
৪৭। ঘোড়দৌড়	দৈনিক বাজার	৪৮। মনমোহন পালের বাজার	দৈনিক বাজার
৪৯। বরহর	রবিবার, বৃহস্পতিবার	৫০। আটিগাঁ	দৈনিক বাজার
৫১। গিরিগঞ্জ	বৃহস্পতিবার	৫২। শেখেরনগর	শনিবার, মঙ্গলবার
৫৩। তেঘরিয়া	দৈনিক বাজার	৫৪। মধ্যপাড়া	রবিবার, বুধবার
৫৫। হলদিয়া	সোমবার	৫৬। কনকসার	দৈনিক বাজার
৫৭। ভবানীপুর	শুক্রবার, সোমবার	৫৮। ইছাপুরা	দৈনিক বাজার
৫৯। বাঁরৈখালি	দৈনিক বাজার	৬০। শিবরামপুর	দৈনিক বাজার
৬১। গয়ালীমান্দা	মঙ্গলবার	৬২ রাঢ়িখাল	দৈনিক বাজার
৬৩। মাইজপাড়া	সোমবার, শুক্রবার	৬৪। শ্রীনগর	রবিবার, বুধবার
৬৫। ষোলঘর	দৈনিক বাজার	৬৬। হাঁসাড়া	দৈনিক বাজার
৬৭। বীরতারা	বৃহস্পতিবার, রবিবার	৬৮। সিংপাড়া	দৈনিক বাজার
৬৯। বাঘরা	সোমবার, বৃহস্পতিবার	৭০। ভাগ্যকুল	মঙ্গলবার, শনিবার
৭১। ভোগদীয়া	সোমবার, শুক্রবার	৭২। ডহরী	শনিবার, বুধবার
৭৩। নাগরনন্দী	দৈনিক বাজার	৭৪। সুবচনী	মঙ্গলবার, শনিবার
৭৫। মুন্সিরহাট	শনিবার	৭৬। ছটফটিয়া	রবিবার
৭৭। বিদগাঁ	দৈনিক বাজার	৭৮। তালতলা	শুক্রবার, সোমবার
৭৯। রিকাবীবাজার	দৈনিক বাজার	৮০। মোহনগঞ্জ	দৈনিক বাজার
৮১। বিয়ানিয়া	দৈনিক বাজার	৮২। বিবন্দী	দৈনিক বাজার
৮৩। গারুরগাঁও	শনিবার, মঙ্গলবার	৮৪। খালিপাশা	দৈনিক বাজার
৮৫। পঞ্চসার	দৈনিক বাজার	৮৬। করিমগঞ্জ	রবিবার
৮৭। ভীলাকান্দি	দৈনিক বাজার	৮৮। তারাটিয়া	দৈনিক বাজার
৮৯। বেজেরহাটি	দৈনিক বাজার	৯০। ইমামগঞ্জ	বৃহস্পতিবার, রবিবার
৯১। তন্তর	দৈনিক বাজার	৯২। বাসাইল	দৈনিক বাজার
৯৩। কুমারভোগ	দৈনিক বাজার	৯৪। ব্রাহ্মণগাঁ	দৈনিক বাজার
৯৫। সানিহাটি	দৈনিক বাজার	৯৬। ভরাকৈর	দৈনিক বাজার
৯৭। ভীরুজ খাঁ	দৈনিক বাজার	৯৮। দইধারমার বাজার	দৈনিক বাজার
৯৯। রায়পুরা	দৈনিক বাজার	১০০। মাগরবাগ	শুক্রবার, সোমবার
১০১। সমাসপুর	দৈনিক বাজার	১০২। কোলাপাড়া	দৈনিক বাজার
১০৩। কাজিরপাগলা	দৈনিক বাজার	১০৪। কুকুটীয়া	দৈনিক বাজার
১০৫। শিলিমপুর	বৃহস্পতিবার	১০৬। মিরকাদিম	বুধবার, শনিবার
১০৭। সেরাজদিঘা	বুধবার	১০৮। দেউলভোগ	শনিবার, মঙ্গলবার
১০৯। রাজানগর	দৈনিক বাজার	১১০। ভাওয়ার	রবিবার, বৃহস্পতিবার
১১১। চারিগাঁ	দৈনিক বাজার	১১২। জৈনসার	দৈনিক বাজার
১১৩। নাগেরবাজার	বৃহস্পতিবার	১১৪। দক্ষিণ চাইরগাঁ	বুধবার, শনিবার

পদ্মা কুক্ষিগত গ্রাম : কাঁচাদিয়া, মানুরিয়া, হাতারভোগ, মূলগাঁও, কিত্তা, রাজপাশা, সোনার দেউল, সমকোট, গোবিন্দমঙ্গল, মাইজগাও, আকিয়াধল, রামনিল, সকুনগাও, সুচন্দল

গোরপাড়া, বিল দাউনিয়া, রাজনগর, জপসা, বাঘিয়া চামালদি, করগাও, আন্তিয়া, দেশরত, দোশরপাড়া, রাজপুর, পৌরাগাছা, বউলাসার, সাহাবাজ নগর, সাতগাও, চারুনিয়া, বানকুনিয়া, নপাড়া, শেলাসৈত, রুপটা, পাশা, মাইজগাছা, কাউলিপাড়া, তারপাশা, ইছাপাশা, বেড়পাড়া, চৌদ্দহাজারি, ভবানীপুর, বসুর, আটিগ্রাম গুণগাও, ভাওয়ার ও কুমারপুর।

বিক্রমপুরের কুটির শিল্প ঃ

নিম্নলিখিত স্থানগুলি কুটির শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

কাঁসা, পিতল : ব্রাহ্মণগাঁও, ধানকুনিয়া, লৌহজং, ফিরিঙ্গিবাজার, আবদুলাপুর, ষোলঘর, বেজগাঁ, গৌরগঞ্জ, ধামাইরা।

কাগজ : আরিয়লে সাত আট শত মোসলমানের বসতি আছে। তাহারা কাগজ প্রস্তুতকারক বলিয়া ইহারা "কাগজি" নাম সুপরিচিত।

নৌকা : আউটসাহী, তাজপুর, বেজগাঁ, নাগরভাগ, বহর, ব্রাহ্মণগাঁও, সেনহাটি, হলদিয়া, তেলির বাগ, মেদিনীমণ্ডল, ভাগ্যকুল, নাগেরহাট।

কুম্ভকার : আউটসাহী, মধ্যপাড়া, দক্ষিণ চারিগাঁও, তালতলা, শ্রীনগর, ফেগুনাসার, কনকসার, নাগেরহাট, ভাগ্যকুল, তন্তর, সিংপারা, ফুরসাইল, দীঘলী।

শীতলপাটি : ধাইদা, টংগিবাড়ি, ফেগুনাসার, রুজদি, সেরাজদিঘা, বিদগাঁ রাজাবাড়ি, তালতলা।

অয়েল ক্লথ : মালখানগর, মালপাদিয়া।

সেকড়া কর্মকার : ফিরিঙ্গিবাজার, নাগেরহাট, বেজগাঁ, কুকুটিয়া, মালপদিয়া, ইছাপুরা, শ্রীনগর, বিনোদপুর, রিকিববাজার, ভাগ্যকুল, ধানকুনিয়া, কামরগাঁ ও মিরকাদিম।

লৌহ কর্মকার : আউটসাহি, বেজগাঁ, ফিরিঙ্গিবাজার, কুকুটিয়া, কান্দপাড়া, মধ্যপাড়া, কোলা, বাইদভোগ, ইছাপুরা, শ্রীনগর, মাকহাটি, গাওদিয়া, বানকুনিয়া, তালতলা, কামারগাঁও, ভাগ্যকুল।

মৎস্যের জাল : শ্রীনগর, কনকসার, সামসিদ্ধি, ব্রাহ্মণগাঁও ভাগ্যকুল, বহর, বেজগাঁ, তালতলা।

পাট হইতে নানারকম শিল্প : আরিয়ল, ইছাপুরা, স্বর্ণগ্রাম, মধ্যপাড়া, বেজগাঁ।

বেত ও বাঁশ হইতে নানারকম শিল্প : ইছাপুরা, আউটসাহি, গাউদিয়া, কাকলদীয়া, রাইতভোগ, ফেগুনাসার, বেতকা, কামারগাও মাইজপাড়া, হলদিয়া, বেজগাঁ।

দরজি বা খলিপা : শ্রীনগর, ভাগ্যকুল, হাঁসাড়া, বেজগাঁ, ব্রাহ্মণগাঁ ও বজ্রযোগিনী, ষোলঘর, ধানকুনিয়া, গয়ালীমান্দ্রা, মিরকাদিম, হলদিয়া, লৌহজং, তালতলা।

বই বাঁধা : শ্রীনগর, কামারগাঁও, লৌহজং, তালতলা, মিরকাদিম, ষোলঘর।

তাঁতের কাপড় : আবদুলাপুর, কুমারভোগ, কাজির পাগলা, যশাইলদা, মাওয়া, খিদিরপাড়া, মেদিনীমণ্ডল, শিমুলিয়া, হলদিয়া।

শুকনা মাছ : রায়পুরা, তালতলা।

কাপড় ও সুতা রং : হলদিয়া, এই স্থান হইতে রং সুতা ও কাপড় নানা রকম রং হয়।

বিক্রমপুরের ছাপাখানা : লৌহজং, তালতলা, মিরকাদিম, রাজদীয়া।

পৈতা বা যজ্ঞ উপবিত : আউটসাহি, কান্দাপাড়া, মেদিনীমণ্ডল, বেজগাঁ, ষোলঘর, শ্রীনগর, বেতকা, নাগরভাগ, হাঁসাড়া, আরিয়ল, ইছাপুরা, পঞ্চসার, স্বর্ণগ্রাম।

মেচ : আউটসাহি—এই গ্রামে মিস্টার কে টি বারডি নামক এক জনৈক ভদ্রলোক, "বিক্রমপুর মেচ, কোং" নামক কোম্পানি খুলিয়াছিলেন এবং বহুলোক খাটিত।

গুড় : মধ্যপাড়া, রামপাল, তালতলা, ইছাপুরা, মিরকাদিম, ফিরিঙ্গিবাজার, বজ্রযোগিনী, মুন্সিগঞ্জ।

বুতাম : বেজগাঁ, পাইকপাড়া, আটপাড়া, শ্রীনগর, ধনকুনিয়া।

সাবান : লৌহজং, তালতলা, ফিরিঙ্গিবাজার।

বিক্রমপুরে কোন কোন স্থান হইতে মাছ বিদেশে রপ্তানি হয়।

মৎস্য : মুন্সিগঞ্জ, লৌহজং, ভাগ্যকুল, বহর, রাজাবাড়ি, মাওয়া।

বিক্রমপুরের কোন স্থান হইতে "পান" বিদেশে রপ্তানি হয় : বেতকা ও ছটফটিয়া এই দুই স্থান হইতে বিক্রমপুরের বহু হাজার হাজার টাকার পান বিদেশে রপ্তানি হয়। এই জন্য প্রসিদ্ধ।

বিক্রমপুর বৈদ্য গ্রামগুলির তালিকা :

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারিতে বিক্রমপুর বৈদ্য সংখ্যা ১০,৯৩৫ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৫২২৫ এবং স্ত্রীলোক ৫৭১০। এই বিক্রমপুরের বহু বৈদ্য প্রবাসীভাবে অন্য জিলাতেও আছেন, সুতরাং লোকসংখ্যা ঠিক করা যায় না। আদমসুমারির বৈদ্য সংখ্যা হিসাবে এই বিক্রমপুর দ্বিতীয় স্থানীয়।

১। সোনারং-রোষ, হিঙ্গুগণ, মাধব, শিয়াল সেনবুরুণ, অরবিন্দু, বিষ্ণু, কার্ণ, নিম, ত্রিপুরা ও ভরদ্বাজ।

২। আউটসাহি—উবলি, বৈদ্যবল্লভ, গণ, মাধব, বুরুণ, চতুর্ভুজ, শিয়াল সেন, কার্ণ ও অশ্বগুপ্ত।

৩। কুরমিরা-পোঃ আরিয়ল অস্তগুপ্ত। টংগিবাড়ি এবং আমতলি হিঙ্গু শিয়াল সেন কার্ণ, সত্য বস্তু, মহীপতি ও অশ্বগুপ্ত।

৪। টংগিবাড়ি এবং আমতলি-হিংগু, শিয়াল সেন, কার্ণ, সত্যবস্তু, মহীপতি ও [illegible]।

৫। বালিগাঁ-দুহি সেন, বুরুণ, কার্ণ নয় দাশ, মঙ্গলানন্দ, দত্ত ওকর।

৬। নেত্রাবতী, পোঃ আউটসাহি—দুহি সেন, গণ, কার্ণ, ধর, দেব, কর, শিয়াল সেন ও মাধব।

৭। আবরকাঠা, পোঃ আরিয়ল—বৈশ্যানর, মঙ্গলানন্দ ও মাধব।

৮। দ্বিপাড়া, পোঃ মাখলখানগর—পাহিদাস, ভরদ্বাজ, ধর ও দেব।

৯। ফেগুনাসার, পোঃ মালখানগর—নয় দাশ, দেব ও ভরদ্বাজ।

১০। ফুল্লশালী, পোঃ মালখানগর—দুহি সেন, পাহি দাশ ও নয় দাশ।

১১। সলদিয়া—বুরুণ, মাধব, বৈশ্যানর, ভরদ্বাজ, ধর ও রাম।

১২। চুরাইন, পোঃ বজ্রযোগিনী—গণ, শিয়াল সেন, বুরুণ, রোষ, বল ভদ্র, যদুনান্দ ও ভরদ্বাজ।

১৩। চাঁপাতলি, পোঃ বজ্রযোগিনী—রাম, নিম, ভরদ্বাজ ও দত্ত।

১৪। ঘাসির পুকুরপাড়া—পাহি দাশ ও নয় দাশ।

১৫। ইছাপুরা—শক্তি গোত্র সেন।

১৬। শিয়ালদি—দত্ত ও সেন।

১৭। জৈনসার—দত্ত ও বুরী সেন।

১৮। বাহেরকুটা, পোঃ ইছাপুরা—শিয়াল সেন, ভরদ্বার ও দত্ত।

১৯। ভটিমভোগ, পোঃ পশ্চিমপাড়া—শিয়ালসেন।

২০। তাজপুর-পাহি দাশ ও দত্ত।

২১। মধ্যপাড়া, পোঃ বিক্রমপুর মধ্যপাড়া—গণ, দুহি সেন, শিয়াল সেন, বুরী সেন, রোষ, কার্ণ, পাহি দাশ, সত্য বস্তু, কাবু, মহিপতি ও ধর।

২২। সিমুলিয়া, পোঃ পূর্ব সিমুলিয়া—বুরুণ, মাধব রোষ, উচলি, নিম, মহিপতি, ধর ও দত্ত।

২৩। যশোলঙ্গ—গণ, হিঙ্গু, কবি সেন, মহিপতি, কায়ু ও দেব।

২৪। নয়না—রাম, কার্ণ দাশ, নয় দাশ, বুরুণ, কায়ু, ভরদ্বাজ ও ধর।

২৫। মালদা, পোঃ নয়না—শিয়াল সেন, নিম।
২৬। নশঙ্গর—বুরুণ ও রোষ।
২৭। কামারখাড়া, পোঃ স্বর্ণগ্রাম—হিঙ্গু, বুরুণ, রোষ, নিম, অরবিন্দ, কায়ু ও রাম।
২৮। বাঘিয়া—শিয়ালসেন, মহিপতি ও আদ্য গোত্র সেন।
২৯। মূলচর—গণ, হিঙ্গু, শিয়াল সেন, ধোয়ী, ভরদ্বাজ ও মহিপতি।
৩০। বরাইল, পোঃ স্বর্ণগ্রাম—গণ, কার্ণ, নিম ও ত্রিপুর।
৩১। বাহেরক, পোঃ দিঘিরপাড়—গণ, হিঙ্গু বুরুণ, রোষ, কায়ু ভরদ্বাজ ও ধর।
৩২। চাতুরতলা, পোঃ দিঘীরপাড়—মাধব।
৩৩। গারুরগাও, হাসাইল—বৈদ্যবল্লভ ও নিম দাশ।
৩৪। বানরি—বুরুণ, মাধব, বলভদ্র, পাহি দাশ, কায়ু ও ভরদ্বাজ।
৩৫। কলমা—নিম ও বৈদ্যবল্লভ।
৩৬। বাশিরা, পোঃ কলমা—রাম ও নিম।
৩৭। ভরাকর—গণ, কার্ণ ও নয় দাশ।
৩৮। তেলিরবাগ—যদুনন্দন।
৩৯। সাওগাঁও, পোঃ ভরাকর-গণ, বৈদ্যবল্লভ ও যদুনন্দন।
৪০। পালগাঁ, পোঃ ভরাকর—শক্তি গোত্র সেন।
৪১। বেজগাঁ—রোষ, নিম, কাশ্যব গোত্র গুপ্ত ও দত্ত।
৪২। গাউপাড়া—গণ, বৈদ্য বল্লভ ও নিম।
৪৩। সানিহাটি, পোঃ ব্রাহ্মণগাঁও—শক্তি গোত্র সেন, ধন্বন্তরি সেন ও মৌদগোল্য দাশ।
৪৪। মেদিনীমণ্ডল—দেব।
৪৫। গ্রাম উয়ারি—গয়ি সেন।
৪৬। পাটাভোগ—শক্তি গোত্র সেন ও ধন্বন্তরি গোত্র সেন।
৪৭। ষোলঘর—শক্তি গোত্র সেন ও মৌদগোল্য দাশ।
৪৮। হাঁসাড়া—শিয়াল সেন, রোষ ও মৌদগোল্য দাশ।
৪৯। বেলতলি, পোঃ বেতলি আটপাড়া—কণি সেন. মৌদগোল্যগোত্র সেন, ধর ও রাম।
৫০। কুড়াশী, পোঃ দাশর্ত্তা—শিয়াল সেন, রাম বল ভদ্র, বিষ্ণু, নিম ও ত্রিপুর।
৫১। কোটপাড়া পোঃ দাসর্ত্তা—শিয়াল সেন, মাধব, রাম উচলি, নিম এবং সত্যবন্ত।
৫২। পণ্ডিতসার, হোগলা কার্ত্তিকপুর—বুরুণ, মাধব. রোষ, মঙ্গলানন্দ ও ভরদ্বাজ।
৫৩। ধামারণ, পোঃ উচলি—রোষ।
৫৪। মামুদপুর, পোঃ কার্ত্তিকপুর—কর (চৌধুরী)।
৫৫। মগর, পোঃ মহীশর—বুরুণ, শিয়াল সেন, কর্ণ ও কায়ু গুপ্ত।
৫৬। রামভদ্রপুর—কর।
৫৭। উপসি—মাধব ও বলভদ্র।
৫৮। মসুরা, পোঃ ভোজেশ্বর—বুরুণ।
৫৯। মগর, পোঃ উপসি—শিয়াল সেন, মাধব, গণ, হিঙ্গু, বলভদ্র, উচলি, কার্ণ, কায়ু গুপ্ত ও বিষ্ণু দাস।
৬০। পালং—মাধব, হিঙ্গু, বুরুণ, বলভদ্র, বিষ্ণু কার্ণ. সত্যবন্ত, কায়ু মহীপতি ও ভরদ্বাজ।
৬১। ডোমসার, পোঃ কয়ারপুর—হিঙ্গু, রোষ ও নিম।
৬২। কুয়ারপুর—হিঙ্গু, গণ, মাধব, শিয়াল সেন, বৈদ্যবল্লভ, উচলি, রাম, নিম ও কায়ু।

দশম অধ্যায়



কার্তিকপুরের মুন্সি চৌধুরী বংশ ঃ

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মোঘল শাসনের দোর্দণ্ড প্রতাপে চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের পরাজয়ের কলঙ্ক কালিমা বাঙালির হৃদয়ে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে। কিন্তু কেদার মহিষী জীবিতাবস্থায় নিজেই রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই মহিয়সী মহিলার মৃত্যুতে কেদার রায়ের রাজ্য তাহার মন্ত্রী ও সেনাপতিগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কেদারের মৃত্যুতে তাহার ভগ্নোৎসাহ অন্যতম বীর সেনানী সেক কালুর হৃদয়ে গভীর বেদনার বিষাদ চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শোকদগ্ধ হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি গৃহে ফিরিয়া গেলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মুখে অবগত হইয়াছি, যে "সেক কালু সম্রাটের প্রদত্ত জমিদারি কার্তিকপুর উপেক্ষা করিয়া পদ্মার বুকে আত্ম বিসর্জন করিয়াছিলেন।" সেক কালুর একমাত্র কন্যা নূরন্নেছার উপর এই বিশাল জমিদারির ভার অর্পিত হইল। তৎ সময়ে মানসিংহের সঙ্গে আগত মোঘল সৈন্যের অন্যতম সেনাপতি ফতে মহম্মদ নামে একজন বীর যুবক সেক কালুর কন্যা নূরন্নেছার পাণিগ্রহণ করিয়া কার্তিকপুরে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি আর বঙ্গদেশ ছাড়িয়া দিল্লিতে মোঘলের অধীনে কার্য করেন নাই। ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে কার্তিকপুরের নূতন জমিদারির নাম দিল্লির বাদশাহ শাহজাহান সরকারে পত্তন করিয়া তিনি স্বাধীনভাবে জমিদারি আরম্ভ করেন।

আশা করি কার্তিকপুরের মুন্সি চৌধুরী সাহেবগণের বংশ পরিচয় এইরূপে লিপিবদ্ধ করায় পরবর্তীকালে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের পক্ষে প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করা সহজসাধ্য হইবে। বস্তুত কার্তিকপুরের মুন্সি চৌধুরীগণের প্রকৃত ইতিহাস লেখা আমার পক্ষে দুরাশা মাত্র। দ্বিতীয়ত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাস লেখা চলে না। কার্তিকপুরের চৌধুরীগণের মধ্যে যাঁহারা জীবিত আছেন তাহারা বলেন "আমাদের বংশের ইতিহাস নাই, আমরা জানি না।" এ দুর্নাম ঘুচাইবার জন্য ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে বা প্রত্নতত্ত্বানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া অনেকবার কার্তিকপুর চৌধুরী বাড়িতে আমাকে যাতায়াত করিতে হইয়াছিল।

"অন্নাভাবে শীর্ণ চিন্তা জরে জীর্ণ", দাসত্ব করিয়া জীবনযাপনের পর ঐতিহাসিক তথ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়া ধৃষ্টতা নহে কি?

ফতে মহম্মদ একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পূর্ব বাংলায় জমিদারি বিস্তার করিয়া কেবল সুখে কালযাপন করেন নাই। সেকালে কার্তিকপুরে নিবিড় জঙ্গল ছিল, রাত্রিতে একাকী কেহ চলিতে পারিত না, আজকালকার মত তখনকার দিনে এত বন্দুকের ছড়াছড়িও ছিল না ; তাহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল সচ্চরিত্রতা ও অমায়িক ব্যবহার সম্বন্ধে সংযম, পর দুঃখ কাতরতা, নিঃস্বার্থ দান। তিনি কেবল মুসলমানেরই বন্ধু ছিলেন না। হিন্দুরও একজন মুরুব্বি ছিলেন। তিনি একজন লোকহিতৈষী ভাল মোছল্লী ছিলেন। দিনের অধিকাংশ সময় কোরাণের সুরা মনে মনে আবৃত্তি করিতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও শুক্রবারে রোজা করিতেন। তিনিই সর্বপ্রথম বিক্রমপুরে মহরমের তাজের শোভাযাত্রা বাহির করেন। তিনি সুন্নি মুসলমান ছিলেন। তদীয় কার্তিকপুর আবাস ভূমিতে তিনি প্রকাণ্ড ইস্টকালয় নির্মাণ করেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৫৭ হস্ত। প্রস্তে ৮৭ হস্ত এবং উচ্চতা ১৫ হস্ত হইবে। ১৩০১ সনের ভূমিকম্পে অট্টালিকার অনেক অংশ ফাটিয়া

গিয়াছিল। অট্টালিকার ভিতরের দেওয়ালে ও ছাদে নানাবিধ সুদৃশ্য কারুকার্য ছিল। তিনি সেকালে এক অতিথিশালা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে মুসলমান অতিথিশালাটি পূর্ববাংলার গৌরবের বস্তু ছিল। ফতে মহম্মদের মৃত্যুর পর এই সুন্দর স্থানটি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। মুসলমানাধিকৃত বঙ্গের ইতিহাসের সহিত এই বংশের কিছু সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা আরবি কিংবা পারশি ভাষায় সুপণ্ডিত তাহারা একটুকু পরিশ্রম স্বীকার করিলে এই বংশের কাহিনী উদ্ধার করিতে পারিবেন।

শাহ মহম্মদ—ইনি ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ফতে মহম্মদ। জন্মিবার অল্পকাল মধ্যে ইহার মাতার মৃত্যু হয়। ইনি ১৫ বৎসর বয়সে পিতার সহিত দিল্লি হইতে বাংলাদেশে আগমন করেন। ইনি ইদিলপুরের রঘুনন্দন গুহ চৌধুরীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইদিলপুরের রঘুনন্দন গুহ চৌধুরী সেকালে একজন অন্যমত জমিদার ছিলেন। তাহার জমিদারির বার্ষিক আয় ১,১১,৯০৭ টাকা ছিল। তাহার কন্যার নাম ছিল শশীমুখী। জামাতা শাহ মহম্মদকে তিনি ৩৬ খানা গ্রাম যৌতুক দিয়াছিলেন। শাহ মহম্মদ হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন। তাহার জীবিতকালে তিনি হিন্দুর অভক্ষ্য ভক্ষণ করেন নাই। সর্বদা হিন্দুর ধর্ম আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি শশীমুখীকে বিবাহ করিয়া তাহার শশা বিবি নাম রাখিলেন। প্রবাদ আছে মহারাজ রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদার মহাশয়ের কুলপুরোহিত বেজগাঁ গ্রাম নিবাসি ভট্টাচার্য বংশীয় এক ব্রাহ্মণকে এক দ্রোন জমি দান করিয়া জয়কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে প্রতিভা কোনদিন অনাদৃত থাকে না। তিনি পারস্য ভাষায় অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাহার হস্ত লিখিত পুস্তক আজকাল কার্তিকপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার বুদ্ধিবলে তাহার জমিদারির উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। তিনি একমাত্র পুত্র মাইনদ্দিনকে রাখিয়া যান, দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কোন সুসন্তান হয় নাই। শাহ মহম্মদের মৃত্যুর পর তাহার দ্বিতীয় স্ত্রী কার্তিকপুর ভূসম্পত্তি লইয়া গোলযোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিক্রমপুরের তৎকালীন জমিদার রঘুনন্দন গুহ চৌধুরী মহাশয় আপসে দৌহিত্রের জমিদারির অংশ হইতে মাসিক ৫০০ টাকা জীবিতকাল পর্যন্ত ভাতা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

মুন্সি মাইনদ্দিন—ইনি ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শাহ মহম্মদ মাইনদ্দিন। মাতা অদ্বিতীয় প্রতিভাশালী রমণী ছিলেন। মাতার যত্ন ও চেষ্টায় মাইনদ্দিন এক মুসলমান মৌলবির নিকট আরবী ও পার্শী ভাষা শিক্ষা করিয়া তৎকালীন জমিদারির কার্য ও আইন কানুন ভালরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তৎকালীন প্রচলিত ভল্লর যুদ্ধ, অসি চালনা, লাঠি খেলা প্রভৃতিতে অল্পকাল মধ্যে মাইনদ্দিন প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। কার্তিকপুর নিবাসী বৈদ্য রঘুনন্দন সেনকে জমিদারি সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া তিনি হজ করিবার জন্য মক্কা শরিফ অভিমুখে রওনা হইলেন। হজে যাইবার সময় তিনি দুই পুত্র রাখিয়া যান। প্রথম পুত্র নৈমুদ্দি দ্বিতীয় পুত্র ইমামুদ্দি। ঐতিহাসিক এলফিন স্টোনের মতে বাঙ্গলাদেশ মাইনদ্দিন হইতেই প্রথম মুন্সি উপাধি আরম্ভ হয় ; যদিও অনেক নদ নদী থাকায় এদেশের বাণিজ্য প্রধানত জলপথে চলিত তথাপি বাণিজ্য কার্যও গমনাগমনের সুবিধার জন্য মুন্সি মাইনদ্দিন রাজপথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

নবাব মীর জুমলা নামে মাত্র নবাব ছিলেন ; কিন্তু যখন রাজধানী ঢাকায় আনয়ন করেন তখন মুন্সি ইমামদ্দির জমিদারি সুশাসনের কথা শুনিয়া নবাব সায়েস্তা খাঁ তাহাকে চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে মীর জুমলার শাসন ভার গ্রহণের পর সায়েস্তা খাঁ মুন্সি ইমামদ্দির বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রভাব প্রতিপত্তি দেখিয়া তাহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। ফলতঃ তাহার মত গুণবান পুরুষ কার্তিকপুরে নিতান্ত বিরল ছিল। তিনি তাহার জমিদারি হইতে দুই আনা অংশ ভ্রাতুষ্পুত্র চতুষ্টয়কে দান করিয়াছিলেন। নিজ পুত্রগণকে জমিদারির ছয় আনা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র চতুষ্টয়কে দশ আনা মোট ষোল আনা জমিদারি বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন।

মুন্সি ইমামদ্দিনের তিন পুত্র মনিরদ্দি, ইয়াহিনদ্দি ও মুন্সি ফৈজদ্দি। তিনি পারস্য, উর্দু ও আরবি ভাষাবিদ মুন্সি মৌলবিগণের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। মুন্সি নাজিমদ্দিন চৌধুরীর এক তনয়ার পরিণয় কার্য সম্পাদিত হয়। তাহার গর্ভে আসানুল্লার পুত্র ঢাকার বর্তমান নবাব ছলিমোল্লা জন্মগ্রহণ করেন। পরে ঢাকার বর্তমান নবাব বংশের সহিত এই চৌধুরী বংশের আরও আদান প্রদান কার্য সম্পাদিত হইয়াছে।

কার্তিকপুরের সাধারণ গ্রাম্য বিবরণ ঃ

কালীগঙ্গার যে ক্ষীণ স্রোতধারা কালের করালমূর্তি ধরিয়া শ্রীপুর ও রাজনগর উদরস্থ করিয়া কীর্তিনাশার অপনাম লাভ করিয়াছিল নয়া ভাঙ্গনী রূপিণী উহারই পূর্ব দক্ষিণাভিসারিণী শাখা মেঘনাদের সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্তিকপুরে অনেকাংশই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। একটি মুখ্য গ্রাম রূপে পরিচয় দিতে পারে কার্তিকপুর নামে অভিহিত সে স্থান আর নাই ; কীর্তিনাশিনীর অত্যাচার পীড়িত হইয়া সে গ্রাম পশ্চিমে সরিতে সরিতে কয়েকটা ক্ষুদ্র পল্লিকে বুকে লইয়া কোনরূপে আপনার অস্তিত্ব ও নাম বজায় রাখিয়াছে মাত্র। একটি সুপ্রাচীন সমৃদ্ধ জনপদের অবস্থান ও কীর্তির সন্ধান এই ক্ষুদ্র স্থানে আর কেমন করিয়া মিলিতে পারে?

আজ দেড়শত বৎসরও হয় নাই নদীর দ্বারা বিক্রমপুর দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। ইহার পূর্বে উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর একই সংলগ্ন ভূমিখণ্ড ছিল। ধলেশ্বরীর দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া ইদিলপুরের উত্তর সীমা পর্যন্ত এই অখণ্ড বিক্রমপুর বিস্তৃত এবং ইহারই প্রাচীন নাম সমতট। মেঘনার পশ্চিম তটে দাঁড়াইয়া একটি প্রধান জনপদরূপে একদিন কার্তিকপুর এই সমতটের শিক্ষা ও সভ্যতা বৃদ্ধির অন্যতম সহায় হইয়া উঠিয়াছিল। আরাকান ও পর্তুগীজ দস্যুর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া কতবার বিক্রমপুরের জীবন মান সম্পদ যে রক্ষিত হইয়াছে কে তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে?

বাকরগঞ্জের মধ্য দিয়া যে সকল অর্ণবপোত মেঘনার যে সুবর্ণ গ্রাম ও বিক্রমপুরে বাণিজ্য করিতে যাইত উহারা কার্তিকপুরেরই পাশ দিয়া যাতায়াত করিত।

মেজর রেণেলের মগপে রাজাবাড়ি হইতে অনেক দক্ষিণে কার্তিকপুরের সংলগ্ন উত্তরে বহর নামে একটি স্থান দেখা যায়। এই "বহর" রাজাবাড়ির পশ্চিমস্থিত বহর হইতে নিশ্চয়ই একটি স্বতন্ত্র গ্রাম। এই বহর সমতটের অন্যতম পোতাশ্রয় ছিল এবং বিক্রমপুরের মুকুটমণি শ্রীপুরাধিপতির নৌবহর। কেদারবাড়ির অদূরবর্তী এই বহর কার্তিকপুরের সুপ্রশস্ত নদীতে অবস্থান করিত কিনা ঐতিহাসিকের আলোচ্য বিষয়।

সা সুজা আরাকানে পলায়ন কালে ইহার কোন এক স্থানে পোতে আরোহণ করিয়াছিলেন ঐতিহাসিকগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। বহর কার্তিকপুরই কি সম্রাট তনয়কে শেষ অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন? কার্তিকপুরের সুজাবাদ পল্লি কি সেই করুণ স্মৃতি বহন করিতেছে? ইহার সঠিক সংবাদ কে দিতে পারিবেন?

খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতাব্দীতে বিক্রমপুরাধিপ বীর কেশরী চাঁদ কেদার কার্তিকপুরের মালিক ছিলেন। কেদারের স্মৃতির সহিত কার্তিকপুরের নাম বিশেষ রূপে জড়িত হইয়া আছে। কার্তিকপুরের সংলগ্ন রামভদ্রপুরে তদীয় গুরুদেব সিদ্ধ মহাপুরুষ গোসাঞি ভট্টাচার্যদেবের শ্রীপাট। কার্তিকপুরের অর্ধ ক্রোশ মাত্র উত্তরে কমলাপুরের স্নানঘাট ; গুরুদেবের সিদ্ধি প্রভাবে কেদার এই স্থানেই ব্রহ্মপুত্রের অনুগ্রহ লাভ করিয়া স্নান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। অদ্যাপি অশোকাষ্টমী তিথিতে বহু নরনারী ভট্টাচার্য দেবের সৃষ্ট এই তীর্থে স্নান করিয়া লৌহিত্য স্নানের ফললাভ করিয়া থাকেন। কার্তিকপুরে কেদারের অন্যতম সেনানায়ক সেখ কালুর বাসভূমি ছিল। "বিষম সমরসিংহ" মানসিংহ যখন "হয়গজনর নৌকা" বলে বঙ্গভূমি কম্পিত করিয়া মোঘলদর্প চূর্ণকারী শ্রীপুরাধিপতির সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন তখন সেখ কালুর অধিনায়কত্বে কার্তিকপুরের মুসলমান সৈন্যগণ অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল

করিয়াছিল। দিনারার মুসলমান পাইকগণের রণনৈপুণ্য ও সাহসিকতার খ্যাতি আছে। উহারা কালুর সেই বীরসৈন্যগণের বংশধর। কেদারের অন্যতম কীর্তি কাচকির দরজার একটি শাখা ঘড়িসারের মধ্য দিয়া বরাবর পশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছে।

প্রাচীন তাম্রশাসন ও কুলগ্রন্থাদি হইতে জানিতে পারা যায় যে হিন্দু শাসন সময়ে ইদিলপুর বিক্রমপুরেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং উহার পৃথক কোনও নামের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায় না। শ্যামল বর্মা কর্তৃক বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে প্রদত্ত বেজনীসার, সামন্তসার প্রভৃতি গ্রাম এখনও ইদিলপুরান্তর্গত। "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, চাঁদ ও কেদার রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করায় উক্ত বৈদিকগণ ঐ সমস্ত ভূমির করদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া শ্যামল বর্মা দেবের অপর তাম্রশাসন হইতে উদ্ধৃত বঙ্গ বিষয় পাঠে বিক্রমপুর ভূক্তান্তে—পূর্বে নাগরকুণ্ডা, দক্ষিণে ধীপুর, পশ্চিমে লঙ্কাচুরা ও উত্তরে কুলকণ্ঠি চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূমিও যে বর্তমান ইদিলপুরেই অবস্থিত, তাহা এ অঞ্চলবাসীর পক্ষে বুঝিতে মোটেই কষ্টকর নহে। কাজেই হিন্দু শাসন সময়ে যে, প্রাচীন বিক্রমপুর (হিন্দু শাসনকালের) ও বর্তমান বিক্রমপুবে কোনও পার্থক্য আছে কিনা? পরগণা মুসলমানী শব্দ ; হিন্দু শাসন সময়ে পরগণা বিভাগ ছিল না। তখন ইদিলপুর বিক্রমপুরভুক্তি বা ভাগেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় বলেন যে, হিন্দু শাসন সময়ে এক একটি 'ভুক্তি' বহু 'মণ্ডলে' এবং এক একটি 'মণ্ডল' বহু 'বিষয়ে' বিভক্ত হইত। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন যে মুসলমান শাসন সময়ে ঐ মণ্ডলগুলিই পরগণায় পরিণত হয়। ইহা সত্য হইলে বুঝিতে হইবে যে বর্তমান জেলাগুলির সদর মহকুমার মত বিক্রমপুরভুক্তির অন্তর্গত বিক্রমপুর মণ্ডল নামের কতকগুলি অংশও অবস্থিত ছিল এবং তাহাই মুসলমান শাসন সময়ে বিক্রমপুর পরগণা নামে পরিচিত হয়। ইদিলপুর বিক্রমপুর ভুক্তি বা ভাগের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও উহা উক্ত মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা ঠিক বোঝা যায় না ;—থাকিলেও সেই মহালটি আস্ত পরগণায় পরিণত হইয়াছিল কিনা অর্থাৎ বিক্রমপুর মণ্ডল বা ভুক্তি পরগণায় পরিণত হওয়ার পরেও ইদিলপুর পরগণা বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা তাহাও বিবেচ্য। কারণ বিক্রমপুর পরগণার প্রসার লইয়াই আমাদের তর্ক ; বিক্রমপুর মণ্ডল বা ভুক্তি লইয়া নহে। মুসলমান শাসনকর্তাগণ নিজেদের শাসন সৌকার্যের জন্যই দেশকে পরগণাদিতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। কাজেই তাহারা যে মণ্ডল বা ভুক্তিগুলির অঙ্গ বিন্দুমাত্রও বিকৃত না করিয়া দেশগুলিকে পরগণায় পরিণত করিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না। মুসলমান শাসন সময়ে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে এক একজন জমিদারের শাসনাধীন সমস্ত ভূমিই একই পরগণান্তর্গত ছিল এবং অনেক সময়েই উক্ত জমিদারের রাজধানীর নামানুসারেই পরগণার নামকরণ হইত। এই কারণেই এমন চতুর্দিকে অন্য পরগণান্তর্গত ভূমি সমূহে বেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ড অপব পরগণার অন্তর্গত হইত। নিম্নে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে ইদিলপুর পরগণাও মুসলমান শাসনের প্রারম্ভে এইরূপেই সৃষ্ট হইয়াছিল। প্রচলিত প্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায় যে বর্তমান ইদিলপুর মুসলমানদের করায়ত্ত হইলে পর তাহার অধিকৃত ভূখণ্ডের উত্তরাংশে জলদামের নদীর তীরবর্তী কুতুবপুর নামক স্থানে একটি প্রমোদ উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তথায় তাহাদের কতকগুলি সৈন্যও অবস্থান করিত। মধ্যে মধ্যে তাহারা নদীর পরপারবর্তী ছয়গাঁ ও দেওভোগের ব্রাহ্মণদিগকে ধরিয়া নিয়া উক্ত উদ্যানে নানারূপ নিষ্ঠুর কৌতুকের অবতারণা করিত। কিন্তু সে সময় মগবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচিত ছয়গাঁয়ের ভূম্যধিকারীগণের শক্তি নিতান্তই খর্ব হইয়া পড়ায় তাহারা মুসলমানদিগকে মোটেই আটিয়া উঠিতে পারিত না। সে সময় সেনরাজগণের শক্তিও নিতান্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি তাহারা যে মধ্যে মধ্যে প্রজাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইতেন, তাহা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। উপরোক্ত প্রমোদ কাননে মুসলমান হস্ত হইতে অশ্বারোহী সৈনিক কর্তৃক কয়েকজন ব্রাহ্মণের রক্ষা বৃত্তান্ত এখনও প্রবাদ মুখে প্রচলিত আছে। কিন্তু শীঘ্রই ছয়গাঁয়ের হিন্দুগণ অত্যাচার ভয়ে পলাইতে বাধ্য হয় এবং উক্ত ছয়গাঁ ও পার্শ্ববর্তী কয়েকখানা গ্রাম মুসলমান করায়ত্ব হইয়া পড়ে। এই মুসলমান বীরের নাম ইদিল খাঁ এবং ইহার নাম হইতেই যে ইদিলপুর পরগণার নামকরণ হইয়াছিল, তাহা শ্রদ্ধাস্পদ প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় তাহার "ফরিদপুরের ইতিহাসে" স্বীকার করিয়াছেন। ইদিলখাঁর এই আক্রমণ যে সেনরাজগণের অন্তিম সময়ে ইতিহাসোক্ত তুর্কীদিগের আক্রমণেরই অনুরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। ইদিল খাঁ কর্তৃক তৎ জমিদারির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ায় ছয়গাঁ, দেওভোগাদি নদীর উত্তর তীরবর্তী কয়েকখানা গ্রামও তখন ইদিলপুর

পরগণান্তর্গত হইয়া পড়ে। ষোড়শ শতাব্দীতে এই সমস্ত ভূভাগ চাঁদ ও কেদাররায়ের হস্তগত হইলে পর উক্ত স্থান আবার হিন্দুদের বাসস্থানে পরিণত হয়। এবং সে সময়ে ছয়গাঁয়ে নবাগত সিদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য চূড়ামণি মহাশয় রাজ সমীপে দরবার করিয়া ছয়গাঁদি গ্রামকে বিক্রমপুরের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়ার ফলেই যে উহারা বিক্রমপুরের অংশ বলিয়া পরিচিত হইতেছে, তাহা এখনও স্থানীয় প্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, যে সময় বিক্রমপুর ভুক্তি বা মণ্ডলের দক্ষিণাংশ করায়ত্ব পরগণায় পরিণত হয়, তখনও বর্তমান বিক্রমপুরাংশ স্বাধীন হিন্দু নৃপতিগণ (সেনবংশীয়) কর্তৃকই শাসিত হইতেছিল। এইরূপে ইদিলপুরাংশ বিক্রমপুরাংশের পূর্বেই পরগণায় পরিণত হয়। এবং দুই অংশ ইদিলপুর (মোসলমানাধিকৃত) ও বিক্রমপুর (হিন্দু শাসিত) এই দুই নামে পরিচিত হইতে থাকে। পরে বিক্রমপুর ভাগও মুসলমান করকবলিত হইয়া পীর আদম নামে কাজী দ্বারা শাসিত হয়। বস্তুত উভয়েই এক বিক্রমপুর ভুক্তির গর্ভজাত সহোদরা বিশেষ হইলেও পরগণা হিসাবে উহারা মূলতঃ পৃথক ; একে অপর হইতে স্বতন্ত্র স্বাধীন। মোসলমান শাসনকালের ইতিহাসেও আমরা ইদিলপুরকে বিক্রমপুরের বাহিরে দেখিতে পাই। শ্রীপুর রাজগণের সময়ে ইদিলপুর তাহাদের অধিকারভুক্ত থাকিলেও উহা যে পৃথক পরগণা বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহা চূড়ামণি মহাশয়ের ছয়গাঁকে ইদিলপুর হইতে বিচ্ছিন্ন করতঃ বিক্রমপুরের সামিল করিয়া লওযার চেষ্টা হইতেও বুঝিতে পারা যায়। আইন আকবরী গ্রন্থেও লিখিত আছে যে সে সময় বিক্রমপুর ও কার্তিকপুর পরগণা সরকার সোনারগাঁয়ের ও ইদিলপুর সরকার বাকলার (বর্তমান বাকরগঞ্জ) অন্তর্ভুক্ত ছিল। "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও উভয়ের পার্থক্য প্রমাণ করে, যথা—

দিশপুরোত্তরে ভাগে ব্রহ্মপুত্রস্য—পশ্চিমে।
বৃদ্ধ গঙ্গা দক্ষিণে চ পূর্বে পদ্মানদী বরাৎ।।
বিক্রমভূজবাসত্বাৎ—বিক্রমপুরমতো বিদুঃ।
অর্দ্ধোদয়স্য যোগে চ অভূৎতরন্নৃপীঃ।।

পদ্মা নদী যে পূর্বে বিক্রমপুরের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইত তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামগতির কবিতা হইতেও জানিতে পারা যায়, যথা—

ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থ পূর্বেতে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার।।
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহে সদ্‌জ্ঞানী বিস্তর।।

"দিগ্বিজয় প্রকাশ" গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশ স্পষ্টই প্রমাণ করে যে ইদিলপুর বিক্রমপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কাজেই হিন্দু শাসন সময়ে ইদিলপুর ভুক্তি বা ভাগের মধ্যে থাকিলেও পরগণা হিসাবে উহা বিক্রমপুরের অন্তর্ভুক্ত নয়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে ছয়গাঁয়ের দক্ষিণে জলদামের নদীই বিক্রমপুরের দক্ষিণ সীমা এবং উহার দক্ষিণ তীর হইতেই ইদিলপুর পরগণার আরম্ভ হইয়াছে। কেহ নয়াভাঙ্গনী নদী পর্যন্ত ইদিলপুরের সীমা কল্পনা করিয়া উক্ত নদীকেই বিক্রমপুরের দক্ষিণ সীমানা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। তাহাদের জানা উচিত যে ইদিলপুরের বিস্তৃত উক্ত নদী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নহে, পরন্তু উহার দক্ষিণ তীরবর্তী বাকরগঞ্জ জেলায়ও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

বর্তমানে বিক্রমপুর পরগণা বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি. পরগণা সৃষ্টির সময় বিক্রমপুর ভুক্তির সেই অংশটুকুই যে বিক্রমপুর পরগণা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা আমাদের উপরোক্ত বৃত্তান্তগুলি হইতেই অনুমিত হয়। পরে বিভিন্ন সময়ে এই বিক্রমপুর পরগণার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন জমিদারের অধিকারভুক্ত হইয়া যে বিভিন্ন পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল তাহা পরগণা আমিনাবাদ, বৈকুণ্ঠপুর, রাজনগর প্রভৃতি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। রাজনগরের মহারাজাদের অধিকারভুক্ত সমস্ত ভূভাগ পরগণা রাজনগর বলিয়া পরিচিত। পরগণা রাজনগর বলিয়া ভূমি শুধু উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরে নয় সুদূর বাকরগঞ্জ জেলায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। বলিতে কি বিক্রমপুর পরগণা সৃষ্টি হওয়ার পরে উহা এতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, ঐগুলিকে বিক্রমপুর পরগণা হইতে কোনরূপে বাদ দেওয়া চলে না। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণার নাম জমিদারি সংক্রান্ত কাগজপত্র ব্যতীত অন্যত্র বড় দেখা যায় না। কাজেই প্রথম পরগণার সৃষ্টি হওয়ার সময় যে ভূ-ভাগ

বিক্রমপুর পরগণা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, এত ভাগ বিভাগ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের পূর্ববর্তিগণ সেই ভূ-ভাগকেই বিক্রমপুর পরগণা বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন এবং আমরাও স্বীকার করিতেছি। কাজেই বিক্রমপুর দক্ষিণ পারের পূর্বাংশে এখন যে ভূ-ভাগ কার্তিকপুর পরগণা বলিয়া পরিচিত তাহাও পরগণা বৈকুণ্ঠপুর রাজনগরের মত বিক্রমপুর পরগণারই অন্তর্গত ; পরন্তু ইদিলপুর পরগণার মত স্থানও বিক্রমপুর পরগণা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। যে কার্তিক মল্লির নামানুসারে কার্তিকপুর গ্রামের নামোৎপত্তি, তিনি মোসলমান শাসনকালের লোক। কেদার রায়ের অন্যতম সেনানী সেক কালুর জমিদারিই তাহার রাজধানী কার্তিকপুর গ্রামের নামানুসারে কার্তিকপুর পরগণা নামে পরিচিত হয়। কালুর বংশধরগণের সময়ে জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হইয়া অনেক নূতন নূতন ভূখণ্ডও উক্ত পরগণা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কাজেই কার্তিকপুর পরগণা ষোড়শ শতাব্দির শেষ ভাগে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে সংগঠিত হয়। বস্তুত আইন-ই-আকবরির পূর্বে অন্য কোন গ্রন্থেই কার্তিকপুরের নাম দৃষ্ট হয় না। কাজেই কার্তিকপুর পরগণা যে বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত তাহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। মোট কথা ইদিলপুর হিন্দু শাসন সময়ে বিক্রম ভুক্তির অন্তর্গত থাকিলেও উহা কখনও বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং এখনও নাই ; পক্ষান্তরে কার্তিকপুর চিরদিনই বিক্রমপুরের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এখনও আছে।

শ্রীপুরাধিপতির পতনের পর কার্তিকপুরের জমিদারি সেক কালুর হস্তগত হয়। সেই হইতে বহুকাল পর্যন্ত মুসলমান জমিদারগণই কার্তিকপুর শাসন করিয়া আসিতেছেন। মহারাজ রাজবল্লভের সময়ে উহা নামত রাজনগরের শাসনাধীন হইয়াছিল। কালুর বংশের পতনর পর মুন্সি চৌধুরীগণ কার্তিকপুর আগমন করেন। ইহারা বঙ্গের মুসলমান সমাজে বিশেষ সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিচিত, এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা জানমামুদ বক্সী লস্কর বাদশাহের সৈনিক বিভাগে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি প্রথমে সামান্য ভূসম্পত্তি জাইগির প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহার বংশধরগণ বুদ্ধি ও কর্ম কুশলতাগুণে রসুলপুর এবং ইদ্রাকপুর নামক দুইটি বৃহৎ পরগণার অধিকার লাভ করেন। মুন্সি ইমামুদ্দিন রাজনগরাধিপের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। ইহাতে রাজনগরের সহিত কার্তিকপুরের শত্রুতা উপস্থিত হয়। মুন্সিদের গৃহ বিবাদের কোন সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া রাজা গোপালকৃষ্ণ কার্তিকপুর আক্রমণ করেন। ঘড়িসার খালের উভয় তটে দুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। অবশেষে যুক্তিতলা নামক স্থানে সন্ধি হয়। কথিত আছে মুন্সি পরিবারের চাঁদ বিবি এই সময়ে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

এই যুদ্ধের ফলে কার্তিকপুর পুনঃ রাজনগরের অধীনে আসে। নিহত ১০৮ জন বীর পুরুষের মুণ্ডোপরি রাজনগরের সুপ্রসিদ্ধা শ্রীশ্রীরণদক্ষিণা মাতার মূর্তি স্থাপিত হইয়াছিল। রাজবল্লভের বংশধরগণের হস্তচ্যুত হইয়া গেলেও অদ্যাপি কার্তিকপুর পরগণার সহিত রাজনগরের মহারাজ তনয়গণের নামই যুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মুন্সি জমিদারগণ বিক্রম ও শাসন দক্ষতায় বাংলার কোন ভূস্বামী হইতে হীন নহেন। ইহারা একদিকে রাজনগর ও অপর দিকে ইদিলপুর ভূস্বামীগণের সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাইয়া কার্তিকপুরের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হয় নাই ইংরাজ শাসনকালে এই বংশীয় মস্তাজদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী ওয়াইজ সাহেবের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া যে বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন—সেই কথা, দিনারার খুনের কথা, স্মরণ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। উক্ত চৌধুরী সাহেব দৈন্য ও মৃত্যু বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তথাপি শির অবনত করেন নাই।

মুন্সি জমিদারগণ পূর্বাপর দানশীলতা ভদ্রতা ঔদার্য ও বিদ্যোৎসাহিতাগুণে বঙ্গে সুবিখ্যাত। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইলেও স্থানীয় হিন্দুগণের সহিত ইহাদের বিশেষ হৃদ্যতা চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের প্রধান কর্মচারী সকলেই হিন্দু ছিলেন, অদ্যাপিও আছেন। হিন্দুর ধর্মে কর্মে উৎসবে অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া হিন্দুর দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়া এই মুন্সি জমিদারগণ যেরূপ উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেইরূপ উদারতা বর্তমান হিন্দু মুসলমান উভয়ের আদর্শ হইলে সাম্প্রদায়িক সমস্যার অচিরেই সমাধান হইতে পারে। মুন্সিগণ উত্তর বিক্রমপুরস্থিত বেজগাঁ গ্রামে পাষাণময়ী কালীমাতা স্থাপন ও দুই দ্রোন জমি দেবীর সেবার জন্য দেবোত্তর দান করিয়াছিলেন ; আজিও উক্ত দেবীর সেবাইত নিযুক্ত আছেন এবং দেবোত্তর তালুক ভোগ করিয়া আসিতেছেন। দুইটি বৃহৎ নদীর মোহনায় স্থিত বলিয়া কার্তিকপুর সুপ্রাচীন কাল হইতেই ব্যবসায়ের এক প্রধান কেন্দ্ররূপে

গড়িয়া উঠিয়াছে। এ অঞ্চলে ধুরী (সম্ভবত ধরণী শব্দজ) নামে এক প্রকার নৌকার প্রচলন ছিল। উহার নির্মাণে আদৌ লৌহধাতুর ব্যবহার হইত না। সমুদ্রের উপকূলের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্যই বোধ হয় ঐরূপ লৌহহীন নৌকার প্রচলন হইয়া থাকিবে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার কমার্সিয়াল রেসিডেন্ট সাহেবের মন্তব্য পাঠে জানা যায় কার্তিকপুরে এক সময়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপন্ন হইত (ঢাকার ইতিহাস ১ম খণ্ড ১৮৮ পৃঃ) সুতাকাটা দিঘি নামে পরিচিত মধুপুরের সুবৃহৎ দিঘি কোনও জমিদার গৃহিণীর স্বহস্ত প্রস্তুত কার্পাস সুতার বিক্রয়লব্ধ অর্থে খনিত হইয়াছিল এরূপ প্রবাদ আছে। জমিদার সাহেবগণ দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির জন্য খুবই যত্ন লইতেন। ইহাদের উৎসাহে স্থানীয় হিন্দুগণ ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিলের মত প্রতি বৎসব এক মিছিল বাহির করিয়া উহাতে শিল্প নৈপুণ্যের প্রতিযোগিতা করিতেন। রাজনগরের কাল বৈশাখী ও কমলা ঘাটের কার্তিক বারুণীর মেলার মত এখানে তিনমাস স্থায়ী এক মেলা বসিত। এই মেলায় সেকালের সমস্ত রকমের আমোদ প্রমোদেরই ব্যবস্থা করা হইত। কার্তিকপুরের ঘরেমীগণ বেত বাঁশ ও অভ্রের সাহায্যে "রঙ্গিল ঘর" নামে এক প্রকার কারুকার্যপূর্ণ সুন্দর গৃহ নির্মাণ করিত। সুপ্রাচীন কাল হইতে কার্তিকপুর বিদ্যাচর্চার একটি কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত। হিউ এন সাঙ্গ সমতটে অনেক বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন। উত্তর বিক্রমপুরে উহাদের কতকগুলি সন্ধান মিলিয়াছে। অনুসন্ধান করিলে দক্ষিণ বিক্রমপুরে উহাদের কয়েকটি মিলিতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্বে কার্তিকপুরের অনতিদূরে এক চড়া ভূমিতে এক বৃহৎ মারীচ নামক বৌদ্ধ দেবতার মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এ অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে অদ্যাপি ত্রিনাথ ও গোরখনাথের পূজার প্রচলন আছে। দক্ষিণ বিক্রমপুর যে এক সময়ে বৌদ্ধ প্রভাব মুক্ত ছিল না ইহাই তাহার প্রমাণ। কার্তিকপুরে থিবপাড়া নামে একটি পল্লি আছে। উহার সন্নিকটে বহু যোগী জাতীয় লোকের বাস। থির বা স্থবির বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নাম। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরাই হিন্দু ধর্মের অভ্যুত্থানে যুগী জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কে বলিতে পারে কোন কালে এই থিরপাড়া বা স্থবির পল্লিতে একটা বৌদ্ধ সঙঘারাম ছিল কিনা? কার্তিকপুরের বিভিন্ন পল্লিতে বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ডিঙ্গামানিক নিবাসী কৃষ্ণদেব বিদ্যালঙ্কার বেদগর্ভ ও গোলকচন্দ্র সার্বভৌম তাহাদের অন্যতম। তাঁহাদের সুযোগ্য বংশধর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্য খ্যাতি বঙ্গের বাহিরেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কবিরাজগণের মধ্যে স্বর্গীয় রামলোচন সেন অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন। রামলোচনের ভ্রাতুষ্পুত্র ময়নাগড় বাহুবলীন্দ্র রাজপরিবারের দ্বার কবিরাজ কৃষ্ণকুমার সেন কবিভূষণ সম্ভবত নিদান গ্রন্থের সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদক। ডাক্তারি গ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদ কার্যে তিনি সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ উদয়চাঁদ দত্তের সাহায্য করিয়াছিলেন। কবিভূষণ মহাশয়ের সতীর্থ ঈশানচন্দ্র সেন কবীন্দ্রেরও নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ছিল।

বাংলা সাহিত্যে কার্তিকপুরের বিশিষ্ট কোন দান না থাকিলেও কার্তিকপুরে সাহিত্য চর্চার অভাব ছিল না। অক্ষয়কুমার রায় মহাশয় অনেক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন ; দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা পরিরক্ষিত হয় নাই। তাহার রচিত সুরথ উদ্ধার শীর্ষক কবিতার মাধুর্য এখনও প্রবন্ধ লেখকের স্মৃতিপথে প্রবাহিত হইতেছে। কালীকুমার রায় মহাশয় কার্তিকপুরের একজন উল্লেখযোগ্য কবি ছিলেন। বঙ্গীয় কবির গ্রন্থকার তাহার গ্রন্থে রায় মহাশয়ের কবিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাহার রচিত নিমাই সন্ন্যাস গান যখন তান মান সহকারে গীত হইত তখন ভক্তি ও ভাবের প্রবাহ উৎসারিত হইয়া শতশত নরনারীর হৃদয়ে যে ভাবের বন্যা সৃষ্টি করিত তাহা লেখকের অনেকবার প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। বহু কবিগণ, শ্যামাসঙ্গীত ও নানা হাস্য রসাত্মক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা দ্বারা তিনি তখনকার লোকের মনে সুবিমল আনন্দের ধারা প্রবাহিত করিতে সক্ষম হইতেন। তাহার রচিত মধুর হরিগান আজও এ অঞ্চলে ভক্তি সহকারে গীত হইয়া থাকে।

স্বর্গীয় রাজকুমার রায় মহাশয় প্রকৃত কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাহার রচিত সুবন্ধ বধ, জয়দেব, বালক সঙ্গীত) শ্যামা-সঙ্গীত প্রভৃতি গানে, বিষুব সংক্রান্তি শীর্ষক ও অন্যান্য কবিতায় তাহার কবিত্ব শক্তির প্রচুর নিদর্শন এখনও বিদ্যমান। ভাষা ও ভাবের সম্পদে তাহার রচিত বহু গান ও কবিতা বঙ্গ সাহিত্যের স্থায়ী ভাণ্ডারে স্থান পাইবার যোগ্য, তাহার রচিত বিনয় প্রণিপাত শীর্ষক গানে—

"যেমন স্রোতের সেহলা, ফিরে অষ্ট বেলা, মাঠে ঘাটে ভাসিতে ভাসিতে। আমি সেইমত ফিরি, কেউ না চাহে ফিরি, যাইতে কিম্বা আসিতে।

আমি চাহি এ ভিক্ষা দান, যখন দেহ হতে যাবে প্রাণ, কাল ভয়ে যেন নাহি কাঁপি, না হই প্রলাপি, পদে রেখো হৃদয়ে চাহি।" তাহার গভীর ও অকৃত্রিম ভক্তির পরিচায়ক।

গদ্য রচনায়ও তাহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। তাহার প্রণীত মুষ্টিযোগ রত্নাকর গ্রন্থের ভূমিকায় বর্ত্তমান কালের স্বাস্থ্য হীনতার কারণ তিনি অতি সংযত অথচ সুমার্জিত ভাষায় নির্দেশ করিয়াছেন। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার সেনগুপ্ত মহাশয় পদ্য ও গদ্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কালীকিশোর সেন চৌধুরী মহাশয় একজন প্রকৃত সাহিত্যসেবী। সভার উদ্বোধন সঙ্গীত ও আবৃত্তির জন্য নির্দিষ্ট "তরুণাভিযান" তাহারই লেখনী প্রসূত। শ্রীযুক্ত রণজিত সেন সরকার মহাশয় অধ্যাপনার কার্যে ব্যাপৃত থাকিলেও সাহিত্য চর্চা কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। ভারতের সাধনা পত্রিকার সম্পাদক ডিঙ্গামানিক নিবাসী শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত এম এ এবং চিকন্দি হিতৈষিণীর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুত নলিনীমোহন সেন চৌধুরী বি এল সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত। শ্রীযুত হরেন্দ্রলাল সেন চৌধুরী, শ্রীযুত ভূপেন্দ্রলাল সেন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী সেন সরকার, শ্রীযুত সত্যরঞ্জন সেন ও বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক। "পল্লি মঙ্গল" সম্পাদক শ্রীযুত জ্ঞানরঞ্জন সেনগুপ্ত কার্তিকপুরের অধিবাসী।

প্রকৃত সাহিত্য সেবক হিসাবে যাহার নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করা উচিত তিনি শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সেনগুপ্ত বি এ। সংস্কৃত বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে তাহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বহু সারগর্ভ রচনা দ্বারা তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গল্প প্রবন্ধ কবিতা সকল ক্ষেত্রেই তাহার সমান অধিকার ছিল। চিত্র বিদ্যায়ও তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। নিরঞ্জনবাবুর ন্যায় সর্বমুখী প্রতিভা অতি অল্প লোকেই দৃষ্ট হয়। যিনি তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তিনিই তাহার বিদ্যাবত্তা চরিত্রের মাধুর্য ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। ১৩৩৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাহার অকাল মৃত্যুতে শুধু কার্তিকপুরই একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন হারায় নাই—বঙ্গ সাহিত্যেরও অপরিসীম ক্ষতি হইয়াছে।

কার্তিকপুরের ইতিহাস আলোচনা করিতে আর একজন মনীষীর কথা মনে উদিত হয়। কার্তিকপুরের সুবিখ্যাত বীরপুরুষ অমিত তেজ ও বীর্যের আধার রজনীকান্ত সেন সরকার মহাশয় আজ ছয় বৎসর হইল পরলোক গত হইয়াছেন। তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন। সাহিত্য-চর্চা তাহার বড়ই প্রিয় ছিল। তিনি বহু আয়াস স্বীকার করিয়া কার্তিকপুর ইতিহাসের অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

এই সেই পবিত্র কার্তিকপুর—যেখানে সতী শিরোমণি কালীপ্রিয়া দেবী শিশুপুত্রের কাতর ক্রন্দন আত্মীয়স্বজনের অনুরোধ উপরোধ ও পার্থিব বৈভবের প্রবল আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া সপ্তাহাধিক দীর্ঘকালের স্বামীর গলিত শব বক্ষে ধারণ করিয়া সহাস্য বদনে স্বামীর সঙ্গে চিতা আরোহন করিয়াছিলেন। আজ ১০১ বৎসর হইল সেই সুপবিত্র চিতা-বহ্নি নির্বাপিত হইয়াছে।

এই সেই পুণ্যস্থান যেখানে একদিন মহাপুরশ্চরণ যজ্ঞের হোমাগ্নি তাহার লোল জিহ্বা দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত করিয়া যজ্ঞ কর্তাদের বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাস ও অচল ভক্তির অখণ্ডনীয় প্রমাণ ঘোষণা করিয়াছে। এই যজ্ঞ মণ্ডপের অনতি দূরে আজও সেই যজ্ঞকুণ্ড ও যজ্ঞবেদী সেই মহাযজ্ঞের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। আবার এই পবিত্র ভূমিতেই একদিন তুলা পঞ্চাগ্নি নামে মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। আজও সেই যজ্ঞকুণ্ড ও যজ্ঞবেদী সেই মহাযজ্ঞের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সেই যজ্ঞের বেদী চতুষ্টয় আজিও এই পীঠ স্থানের অতীত গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

কার্তিকপুরের মুন্সিচৌধুরী পরিবারের কুশীনামা ঃ

শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সেন বি এ, মহোদয় কর্তৃক সংগৃহীত। কার্তিকপুরের চৌধুরী পরিবারের পূর্বপুরুষগণের জন্ম ও মৃত্যু খ্রিস্টাব্দ লিপিবদ্ধ হইল।

ফতে মহম্মদ—মৃত্যু ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দ।

সাহ মহম্মদ—জন্ম ১৬০৭ মৃত্যু ১৬৪৯।

সাহ মহম্মদ (স্ত্রী শশী বিবি)—জন্ম ১৬০৫ মৃত্যু ১৬৬০।

মুন্সি মাইনদ্দিন জন্ম ১৬২৯ মৃত্যু ১৬৫১।

ছোট পুত্র মুন্সি ইমামদ্দি—জন্ম ১৬৪৯ মৃত্যু ১৭৪৭ স্ত্রী চাঁদ বিবি।

বড় পুত্র মুন্সি নৈমুদ্দি—জন্ম ১৬৪৪ মৃত্যু ১৬৭৭।

১ম স্ত্রীর গর্ভে
(১) মুন্সি জাহির (বড় ৫ আনি) জন্ম ১৬৬৯ মৃত্যু ১৭৭০।
(২) মুন্সি জমির (বড় ৫ আনি) জন্ম ১৬৭০ মৃত্যু ১৭৫০।
২য় স্ত্রীর গর্ভে
(১) মুন্সি হাসেন (ছোট ৫ আনি) জন্ম ১৬৭২ মৃত্যু ১৭৩৭।
(২) মুন্সি হোসেন (ছোট ৫ আনি) জন্ম ১৬৭৭ মৃত্যু ১৭৭১।

History of Dacca by K. N. Mazumder M.R.A.S. p 187

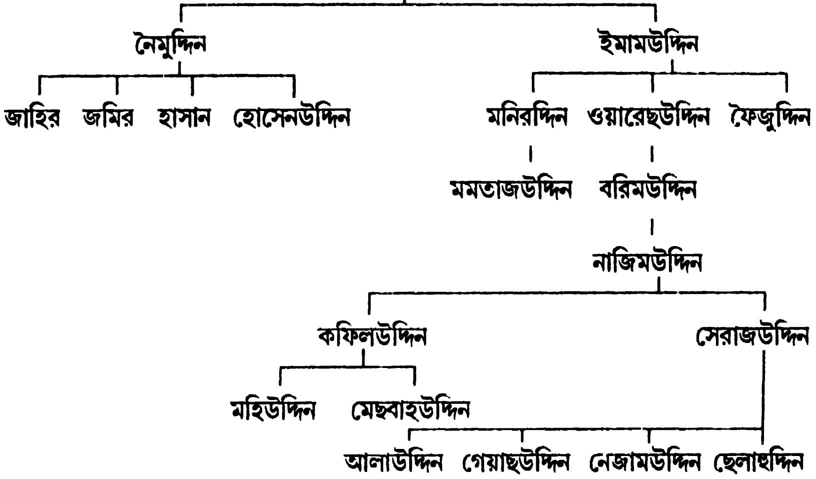
মোহরফররোখশের ১১৫২ হিজরী প্রদত্ত ফরমান হিজরী ১১৫২।

উপস্থিত সম্পূর্ণ ফলদায়ক শুভকাল। সর্বজন মাননীয় এই ফরমান প্রচারিত হইল যে (বিক্রমপুর) কার্তিকপুর পরগণা বাংলার অন্তর্গত কার্তিকপুর ও বিলদেওনীয়া জমিদারির বিমর্জ্জিম তপশীলবেশী জমা ও পেসক্স প্রদান স্বীকারে সেখ কালুকে প্রদত্ত হইতেছে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হাকিম, আমল ও মুতঃ মুদ্দীগণের কর্তব্য যে তাহারা ওই সেখ কালুকে উক্ত কার্তিকপুর ও বিল দেওনীয়া জমিদার জানিয়া তাহার উপর এতৎ সম্বন্ধীয় কার্যভার ন্যস্ত আছে, এইরূপ বিবেচনাধীন করেন এই সম্বন্ধে তাহার নিকট প্রতিবর্ষে নতুন সনন্দ তলপ করা না হয়।

উক্ত সেখ কালুর সর্বদা উচিত যে এই এলাকার প্রজাবৃন্দ, অধিবাসী ও প্রবাসী পথিকগণের সর্বদা হিত চেষ্টা করিয়া ফকির, ফাকরা প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে বজায় রাখিয়া সচ্চরিত্রতার সহিত নিজ জমিদারির কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন। প্রজাবর্গ যাহাতে উত্তম রূপে চাষাদি দ্বারা স্বচ্ছন্দে রাজত্ব সংগ্রহ করিতে পারে এবং যাহাতে রাজকর বর্দ্ধিত হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন ও আদায় পক্ষে জুলুম না করেন। ক্ষেত্রের উৎপত্তি শক্তি বর্ধিত হইলে, নির্ধারিত রাজকর অপেক্ষা বেশি জমা পেসক্সরূপে কিস্তি কিস্তি প্রদান করা কর্তব্য বিবেচনা করেন, এই রাজকীয় আদেশ পালনে ত্রুটি না করেন। ১লা মহরম, ২৬ জুলুম।

ঐতিহাসিক স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ ঘোষ মহাশয় প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে বিক্রমপুর ইতিহাসে কার্তিকপুরের মুন্সি চৌধুরীদিগের তৎকালীন কিংবদন্তীর যাহা সন্ধান পাইয়া ছিলেন, আমরা প্রথিতনামা ঐতিহাসিকের প্রদত্ত কার্তিকপুর আবিষ্কারের অনেক নতুন রহস্য অবগত হইলাম এবং আবশ্যক বোধের ঐ প্রবন্ধ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রাজা রাজবল্লভের সময়েও কার্তিকপুরের মুন্সিদিগের নিরতিশয় প্রতাপ ছিল। রাজা রাজবল্লভের সহিত ইহাদিগের কিছু কিছু প্রতিযোগিতা ছিল। একদা উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলে পরস্পর উভয় পক্ষ হইতেই বহুতর যষ্ঠিধারী বীরপুরুষ বিবাদে মত্ত হইয়া সংগ্রামস্থলে সমাগত হয়, তাহাতে এত অধিক লোকের প্রাণ বিনাশ হয় যে সমীপবর্তী তরঙ্গিনীর জল তৎশোনিতে রঞ্জিত হইয়াছিল, মুন্সিদিগের প্রতিই জয়লক্ষ্মী চৌধুরীদিগের অঙ্কশায়িনী হন। আবার অনেকের বিশ্বাস প্রথমে একবার রাজবল্লভ ও বারান্তরে চৌধুরীগণ জয়লাভ করিয়াছিলেন। নানা মুনির নানা মত আমরা অধিকাংশের ধারণায় নির্ভর করিয়া চৌধুরীদিগকেই রণজিত বলিয়া লিখিলাম। অনতি বিলম্বে তাহারা (মুন্সিরা) মহাসমারোহ সহকারে এক বৃহৎ কালীমূর্তি নির্মাণ করাইয়া তাঁহার পূজা করান। হিন্দুদিগের দেব দেবীর প্রতি মুসলমানদিগের ঈদৃশ বিশ্বাস দেখিয়া যারপরনাই বিস্ময়াপন্না হইতে হয়। ঐ মূর্তি এখনও সংস্থাপিত আছে। আজও মহাসমারোহে উহার অর্চ্চনাদি নিস্পন্ন হইয়া থাকে। দূরবর্তী নানা স্থানে মুন্সিদিগের অনেক হট্টাদি বন্দর আছে, ইহারা জমিদারিতে অনেক লাভ করেন। ইহাদের বাড়ির সামনে প্রতি বৎসর ১ বৈশাখ একটি মেলা মিলিয়া থাকে।


কার্তিকপুরের মুন্সি চৌধুরী বংশের কুর্শীনামা
ফতেহ মহাম্মদ
নৈমুদ্দিন
ইমামউদ্দিন
জাহির
জমির
হাসান
হোসেনউদ্দিন
মনিরদ্দিন
ওয়ারেছউদ্দিন
ফৈজুদ্দিন
মমতাজউদ্দিন
বরিমউদ্দিন
নাজিমউদ্দিন
কফিলউদ্দিন
সেরাজউদ্দিন
মহিউদ্দিন
মেছবাহউদ্দিন
আলাউদ্দিন
গেয়াছউদ্দিন
নেজামউদ্দিন
ছেলাহুদ্দিন



একাদশ অধ্যায়

বহরের বসুরায় চৌধুরী বংশ ঃ

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিক্রমপুরে যে সকল কর্মবীর জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে দেশের ও সমাজের নানাবিধ সৎকার্য ও উন্নতির জন্য সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন আমরা এখন সেই খ্যাতিমান বংশের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। মুসলমান শাসনকালে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু প্রাদেশিক পূর্ণ দায়িত্বে শাসন স্বাতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। সেকালে দিল্লি সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিলেই প্রাদেশিক পূর্ণ দায়িত্বে নিজ নিজ এলাকায় পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারিতেন। শাসনকার্যের কৃতিত্ব সম্রাটের প্রতিনিধি স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া গুণবত্তার পুরস্কার স্বরূপ বিপুল ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা ভোগ করিতে দিতেন। মুসলমানাধিকৃত বঙ্গের ইতিহাসের সহিত বহরের বসু রায় চৌধুরী বংশের অনেক সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা মুসলমান বঙ্গের সম্পূর্ণ বা প্রাদেশিক ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত তাহাদিগের পক্ষে ইহার দ্বার উদ্‌ঘাটন সম্ভবপর।

আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণ ও পঞ্চজন কায়স্থ সন্তান সহ বর্তমানে বঙ্গের প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বংশ বর্ধিত হইয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজ গঠিত। আদিশূরের পরবর্তীকালে বল্লাল সেন কৃত কৌলিন্য প্রথা স্থাপনের ফলে কায়স্থাদি উচ্চ জাতীয় গণের বংশ আদ্যপি বঙ্গের ঘরে ঘরে বর্তমান রহিয়াছে। প্রাচীন কুল গ্রন্থ, কাহিনী ও আখ্যায়িকার সাহায্যে এই বংশের যতদূর তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই এস্থলে বিবৃতি করিলাম। এই বংশের পূর্বপুরুষ কৃষ্ণজীবন বসু মজুমদার। ইনি বাকরগঞ্জ জেলার ওলপুরের বসু মজুমদার, বহরের জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণপূর্বক বহর আগমন করেন ; এবং গুরুর নিকট দেহমন অর্পণ করিয়া সাধন ভজনে জীবনযাপন করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে থাকেন।

তাম্রপাঞ্জার ইতিহাস ঃ

এই বংশের দশরথ বসু হইতে নিম্নতম অষ্টাদশ পুরুষ হরিরাম বসু দিল্লির বাদশাহ জাহাঙ্গীর হইতে ফরমান প্রাপ্ত হন। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। পিতামহের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের পুত্র খসরুই রাজা হইবে মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া সে পাঞ্জাবে বিদ্রোহী হইল। অচিরেই সে বন্দি হইয়া কারারুদ্ধ হইল এবং ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে কারাগারেই খসরুর মৃত্যু হয়। কয়েক বৎসর পূর্বেই জাহাঙ্গীর পারস্যদেশীয় একটি অপূর্ব সুন্দরী রমণীর প্রতি অনুরক্ত ছিল। জাহাঙ্গীর তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে তাহার পিতা অসম্মত হন, এবং তাহার সভাসদ আলীকুলী নামক এক ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ দেন। জাহাঙ্গীর কিন্তু উক্ত রমণীকে ভুলিতে পারেন নাই। সিংহাসনে আরোহন করিয়াই তিনি আলীকুলীকে হত্যা করাইলেন এবং মিহরউন্নিসাকে অন্তঃপুরে নিয়া আসিয়া তাহার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন ; কিন্তু তেজস্বিনী রমণী প্রথমে তাহার প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু কতিপয় বৎসর অতীত হইলে এই স্বামী হন্তাকেই বিবাহ করিলেন এবং স্বীয় বুদ্ধি বলে অচিরেই তাহার প্রধানা মহিষী হইলেন। তদবধিই তাহার নাম নুরজাহান বা জগতের আলো হইল।

এই সময়েই উক্ত বংশের হরিরাম বসু দিল্লির বাদশাহ জাহাঙ্গীর হইতে এই ফরমান প্রাপ্ত

হন। এই ফরমান বাদশাহের নিজহস্তের পাঞ্জা (হাতের ছাপ) তাম্রপাত্রে আরবী ভাষায় খোদিত ছিল। এই ফরমান উক্ত বসু বংশকে বাদশাহ ৫৮৪৭ নং জমিদারি দান করেন। উক্ত হরিরাম বসু দেশে ফিরিয়া জমিদারির নাম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিবরাম বসুর নামে লিখাইয়া নেন। তদবধি এই জমিদারির নাম পরগণে বহর জমিদারি শিবরাম রায়চৌধুরী নামে পরিচিত। উক্ত বসু বংশ তদবধি এতদ্দেশে বসুরায় চৌধুরী উপাধিলাভ করিয়াছে।

রাজ রাজেশ্বর বিগ্রহ ঃ

চৌধুরী বংশের গৃহদেবতা শ্রীশ্রী রাজ রাজেশ্বর বিগ্রহ ১২০১ সনে চৌধুরী বংশের আদি বাটিতে স্থাপিত হয়। বিগ্রহ মন্দির ইষ্টক নির্মিত দোচালা ঘরে স্থাপিত ছিল। ঐ প্রকার সাতির বরগা বিহীন ঘর, ঝিকুটি ঘর বলিয়া অভিহিত হইত। এতদ্দেশ্যে ঐ প্রকার ঘর অতি বিরল, এই ঝিকুটি ঘর ১৩১১ সনে পদ্মানদীর কুক্ষিগত হয়। রাজ রাজেশ্বর বিগ্রহ ঈষৎ বাদামি রঙের অতিপ্রাচীন শালগ্রাম কোথা হইতে কাহার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল জানা নাই।

দশ মহাবিদ্যা বিগ্রহ ঃ

এই চৌধুরী বংশের খ্যাতনামা কয়েকজন মহাপুরুষের উদ্যোগে এই মহাউৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। এই পূজা উক্ত বংশের অক্ষয়কীর্তি। এই উৎসব বাংলার কোন হিন্দু রাজার দ্বারা সংঘটিত হয় নাই। যাহাদের উদ্যোগে এই উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল তাহাদের নাম জয়চন্দ্র রায় চৌধুরী, ব্রজকিশোর রায়চৌধুরী, মদন রায়চৌধুরী এবং কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী। উক্ত দশ মহাবিদ্যা মূর্তি একসময়ে প্রবল বর্ষায় ভাসাইয়া নিয়া যায়। এই মহাসমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠান ১২৬০ সালে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত বর্ষায় প্লাবনের পর আর সেই পূজা হয় নাই। এই দশ মহাবিদ্যা বিগ্রহ দেবী কালীরই নানারূপ মূর্তি। মূর্তি মৃন্ময়, দশটি বিগ্রহের নাম, যথা—(১) কালী, (২) তারা, (৩) ষোড়শী, (৪) ভুবনেশ্বরী, (৫) ভৈরবী, (৬) ছিন্নমস্তকা, (৭) বিদ্যাধূমাবতী, (৮) বগলা, (৯) মাতঙ্গী, (১০) কমলা। দশজন পূজক পুরোহিত ও ১০ জন তন্ত্রধার এই পূজায় নিয়োজিত থাকিতেন। উক্ত দশভূজা মূর্তি নির্মাতা কুম্ভকার কৃষ্ণনগর হইতে আনীত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে পীতাম্বর ও ধনঞ্জয় রুদ্রপালের নামই পাওয়া যায়। এই পূজায় ৩২৫টি পাঠা এবং দশটি মহিষ বলি দেওয়া হইয়াছিল। ১১২১ খানা নৈবেদ্য দেওয়া হইয়াছিল। বঙ্গদেশের বহু রাজা মহারাজা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত বিগ্রহের সম্মুখে ১০ মণ ধূপ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। এবং ১১০টি ঢাক তালমান সহকারে দেবীর আঙিনায় বাজান হইয়াছিল। কিংবদন্তী আছে, পূজোপলক্ষে নরবলি দেওয়া হইয়াছিল ; কিন্তু এই জনপ্রবাদের সত্যতা এখনও প্রমাণিত হয় নাই।

বহর মুন্সেফি আদালত ঃ

এই আদালতে মুন্সেফ কোর্ট এবং ছোট আদালতের কাজ করা হইত। এই আদালতে একজন মুন্সেফ ছিলেন একজন জজ ছিলেন। ইহা কবে স্থাপিত হয় তাহা বলা যায় না। ৬৭ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত এখানে অবস্থিত ছিল এইরূপ প্রমাণিত হয়। পরে ইহা নদী গর্ভে বিলুপ্ত হয়। ১২৭৮ সালে বহর হইতে মুন্সেফি আদালত স্থানান্তরিত হয়।

১১০১ সনে বিক্রমপুরের জনসংখ্যা ঃ

বহর বসু রায়চৌধুরী মহাশয়দিগের অভ্যুদয় সময় রাজারাম বসু রায় চৌধুরী মহাশয়ের উৎসাহ ও অর্থানুকূল্যে ২৪২ বৎসর পূর্বের সমগ্র বিক্রমপুর ভূমির জনসংখ্যা গণনা করিয়াছিলেন। আমরা কালীপ্রসন্ন বসু রায়চৌধুরী মোক্তার মহাশয়ের সৌজন্যে তাহার রেকর্ড রুম হইতে প্রাপ্ত হইলাম।

মুন্সিগঞ্জ

ক্রমিক নং	গ্রাম	জনসংখ্যা	ক্রমিক নং	গ্রাম	জনসংখ্যা
১।	বহর	২১৪৮	২।	রাজাবাড়ি	২৭৯০
৩।	সেরাজাবাদ	৮৯০	৪।	মার্কোয়াটি	৭১৯
৫।	বদর যোগিনী	২১৩৪	৬।	মধ্যপাড়া	২২৮
৭।	নুন কিশর	৭৯	৮।	ধানকুনিয়া	২০২
৯।	লৌহজং	২১১২	১০।	নুলুয়া	৫৬৭
১১।	বালিগাঁ	৮৭৯	১২।	মীরগঞ্জ	৯২০
১৩।	আবদুল্লাপুর	৫৮৯	১৪।	মীরকাদিম	১০২০
১৫।	ফিরিঙ্গিবাজার	২০১৩	১৬।	মীরেষরী	৫১৭
১৭।	ইন্দ্রাকপুর	১৮৯০	১৮।	রামপাল	৯৪৮
১৯।	শ্রীপুর	১৭৯১	২০।	কুন্দিদাদপুর	১৫৮
২১।	সাদকপুর	৭২১	২২।	তয়রা	৫২০
২৩।	রামগাও	২০৮	২৪।	তলুই	৭২১
২৫।	রাণীগঞ্জ	১২০	২৬।	কার্তিকপুর	৪০১
২৭।	স্নানঘাটা	৮৯০	২৮।	বুহার	২০৯
২৯।	মূলফৎগঞ্জ	৭১৩	৩০।	জপসা	২০৩
৩১।	নড়িকুল	১২০১	৩২।	কাউলিপাড়া	৪০১
৩৩।	হলদিয়া	৯২৬	৩৪।	গয়ালী মান্দ্রা	৭৩৪
৩৫।	শ্রীনগর	৩৬৭	৩৬।	রাইসবর	৫৩২
৩৭।	দেউলভোগ	৪৭৮	৩৮।	বাড়ৈখালি	৬৮৯
৩৯।	সেরাজদিঘা	৫০১	৪০।	রিকিববাজার	১৩৯
৪১।	তালতলা	১৪৮	৪২।	ভেদেরগঞ্জ	৪২৫
৪৩।	ঘড়িসার	১২২	৪৪।	চিকন্দি	২০৬
৪৫।	ডোমসার	৫২৬	৪৬।	পালং	১২২১
৪৭।	দিঘিরপাড়	৩৬০	৪৮।	যশইলদা	৫০৯
৪৯।	ভাগারকুল	১৯১২	৫০।	তারপাশা	১৭০৭
৫১।	জৈনসার	৬৫৮	৫২।	গাওদিয়া	২৭৯
৫৩।	কনকসার	৪৮০	৫৪।	কমলাঘাট	১২০৬
৫৫।	টংগিবাড়ি	৯৮	৫৬।	ভোজেশ্বর	৫৮
৫৭।	পণ্ডিতসার	১৩১	৫৮।	গঙ্গানগর	৯১৯
৫৯।	কাঞ্চনপাড়া	৭২০	৬০।	হাসাইল	৮৯০
৬১।	ভীরুজ খাঁ	১৮৯২	৬২।	আরিয়ল	২৮০
৬৩।	শিলিমপুর	৬৩১৩	৬৪।	নওপাড়া	৯৮১
৬৫।	ধলদুত্র	৪৫১	৬৬।	উয়ারি	৮০৩
৬৭।	কোরহাটি	১৪৯	৬৮।	সেনহাটি	৮০১
৬৯।	ব্রাহ্মণগাঁ	৫০১	৭০।	সংগ্রামবীর	৭৮০
৭১।	রামনীল	৩৭১	৭২।	চৌদ্দহাজারী	৩৭১
৭৩।	সোহাদল	১৭১১	৭৪।	ভাসুলদী	১৫৭৮
৭৫।	মাগুরখণ্ড	২৩৪২	৭৬।	বটেশ্বর	২২৬

ক্রমিক নং গ্রাম	জনসংখ্যা	ক্রমিক নং গ্রাম	জনসংখ্যা
৭৭। সাহারাজনগর	২৪৩৬	৭৮। চাচুড়তলা	৩৭১
৭৯। বিদগাও	৩৫৩	৮০। কোমরপুর	৪৩৫
৮১। আকিয়াদল	৩১৯	৮২। সাড়াদগরী	২৭০
৮৩। কাচাদিয়া	১৩২০	৮৪। লক্ষ্মীপুরা	৪২২
৮৫। একান্দল	২৪৮	৮৬। মাইজপাড়া	৭২৮
৮৭। বাসগাও	১১৪৫	৮৮। চামারদি	২০২
৮৯। করগাও	৩৩১	৯০। করণগাও	৪৫২
৯১। গোড়াইল	২০১	৯২। গোকুলগঞ্জ	৭০১
৯৩। দুয়পাড়া	৩২৮	৯৪। মজগুন্নী	২৯১
৯৫। গোপালপুর	৭২২	৯৬। পালগাও	৫৩০
৯৭। বাউলাসার	৪১৬	৯৮। চণ্ডীপুর	২০১
৯৯। হাসেরকান্দি	৮৪৫	১০০। দিয়াপাড়া	৪০১
১০১। গার্গেরিজোড়া	৪০৭	১০২। পারগাঁ	৫৪৩
১০৩। শিমুলিয়া	৭৫৩	১০৪। টংগিবাড়ি	৭০৫
১০৫। বিলাসপুর	৮০৮	১০৬। ধানুকা	১৪৩১
১০৭। শ্যামপুর	১০২	১০৮। নবীপুর	৩৫৫
১০৯। রণক	১০২	১১০। কান্দাপাড়া	৪০১
১১১। পসাইল	১২০	১১২। নারিকেলতা	৮৪
১১৩। পশ্চিমপাড়া	১২০	১১৪। রাউতপাড়া	৩৭৮
১১৫। রাজপাশা	৫৪০	১১৬। বকসীবাজার	২২৮
১১৭। খারচাকা	১৪৮	১১৮। খিলগাও	৩৮৮
১১৯। দেওভোগ	২০৯	১২০। গজনাইপুর	৪৫৭
১২১। সোনার দেউল	৭৮১	১২২। মালপদীয়া	১২০২
১২৩। রুজদী	১৪২	১২৪। তন্তর	৩৯২
১২৫। আকসাইল	১৭১	১২৬। পোড়াগাছা	৫৮৮
১২৭। কালার গাঁ	৬৪২	১২৮। লড়িকুল	৪০৮
১২৯। রূপটা	২৭০	১৩০। সঙ্কট	৩১৯
১৩১। মীতারা	৪৩৭	১৩২। হাসারা	৩০৭
১৩৩। শ্যামসিদ্ধি	৬১৭	১৩৪। সেখেরনগর	৪৯৪
১৩৫। শ্রীধরখোলা	৫০১	১৩৬। মাইজপাড়া	৭৪২
১৩৭। বানড়ি	৫০১	১৩৮। মালখাঁনগর	১১৯৪
১৩৯। দ্বিপাড়া	৪০১	১৪০। আউটসাহী	২০৮
১৪১। শিবরামপুর	১৮০	১৪২। গাওপাড়া	১০২
১৪৩। পঞ্চসার	৬৪১	১৪৪। পাইকপাড়া	৫৭৮
১৪৫। উপসী	৪৩১	১৪৬। বিঝারী	৮০১
১৪৭। রুদ্রকর	২০১	১৪৮। জাজিরা	৯৪০
১৪৯। রামভদ্রপুর	৫৭৮	১৫০। লোনসিং	৩৪৯
১৫১। নড়িয়া	১৮৪৮	১৫২। চান্দনি	৭০৪
১৫৩। তেওতা	৯৬৭	১৫৪। মেদিনীমণ্ডল	৪১৩
১৫৫। মাওয়া	৫৭২	১৫৬। কাজীরপাগলা	৫৩০

ক্রমিক নং গ্রাম	জনসংখ্যা	ক্রমিক নং গ্রাম	জনসংখ্যা
১৫৭। কাজীরগাও	৪১৬	১৫৮। জোড়াদেওল	২০৭
১৫৯। দেওলভোগ	৭২৯	১৬০। বেতকা	৬০৮
১৬১। চুড়াইন	৮২০	১৬২। আটপাড়া	১৮৭
১৬৩। সোনাটং	১৯২	১৬৪। ভরাকর	৩৭৮
১৬৫। বালিগাঁ	২২২	১৬৬। তেওতা	৩০৯
১৬৭। মূলচর	৩৪৮	১৬৮। ধীপুর	৯০২
১৬৯। জৈনসার	২০৭	১৭০। শিয়ালদী	৫০৮
১৭১। গোবরদী	১১৯	১৭২। বাসাইল	২০৪
১৭৩। বীরতারা	৫০১	১৭৪। পাটাভোগ	৭৮১
১৭৫। কুকুটিয়া	৮৪৮	১৭৬। জীবসারা	৪৬৮
১৭৭। কোলাপাড়া	৭০৯	১৭৮। তাজপুর	১২০২
১৭৯। ষোলঘর	১১৮	১৮০। নাগরভাগ	২২৯
১৮১। হরপাড়া	৩০১	১৮২। বিবন্দি	১৩০
১৮৩। পয়সা	২০২	১৮৪। বাঘড়া	১০৮
১৮৫। সাৎরাপাড়া	১৯৮	১৮৬। আউল	২৪১৩
১৮৭। সেনহাটি	২০২২	১৮৮। রূপসার	২০৭০
১৮৯। কেদারবাড়ি	১৭৯৮	১৯০। কাশাভোগ	২৩২
১৯১। নাগেরপাড়া	২৮৭	১৯২। মাঐসার	২০১৮
১৯৩। পণ্ডিতসার	৭০৮	১৯৪। পাচক	৭৮৫
১৯৫। স্বর্ণঘোষ	২৮৩	১৯৬। আকসা	২৮৩
১৯৭। দুলুখণ্ড	২০৯	১৯৮। আচুরা	২০৭
১৯৯। চামটা	১৭৮	২০০। কাশাভোগ	১০৭
২০১। নাগেরপাড়া	১৩০৮	২০২। রাহাপাড়া	১৯০২
২০৩। আমতলী	৩৭৯	২০৪। ধামারণ	৮০১
২০৫। সিলংগড়	২০৯	২০৬। ডোমসার	১০০২
২০৭। ফুরাসি	১৭৮	২০৮। হোগলা	২৩৭
২০৯। চিকনীসার	৩৩১	২১০। আদাবাড়ি	১৪৩
২১১। মোহনপুর	২৪৩০	২১২। পাউসার	১২০

শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুত আনন্দনাথ রায় মহাশয় বলেন কিম্বদন্তী আছে রাজারাম বসুরায় চৌধুরী মহাশয়ের পরগণে রাজনগর তালুক বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থ সাহায্যে সমগ্র বিক্রমপুর ভূমির জনসংখ্যা গণনা করিয়াছিলেন।



দ্বাদশ অধ্যায়

বাঘরার রায় মাঝি বংশ ঃ

খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পৃথিবী রাজ বিজয়ী মহম্মদ ঘোরীর অনুচর বক্তিয়ার তনয় ইক্তিয়ারউদ্দীন খলজী মহারাজ লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করেন। ইহার পর ধীরে ধীরে পূর্ববঙ্গ মুসলমানগণের পদানত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সেকালের ইতিহাস এখনও বিস্মৃতির অতল গহ্বরে লুকায়িত রহিয়াছে। বাংলার মুসলমান শাসকগণ সময় সময় দিল্লির সুলতানগণের অধীনতা স্বীকার করিতেন বটে, কিন্তু কার্যত তাহারা স্বাধীনভাবেই রাজ্যশাসন করিতেন। দিল্লির তিনজন সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন, গিয়াসউদ্দীন তোগলক এবং ফিরোজ শাহ তোগলক বঙ্গদেশে বিদ্রোহ দমন করিতে গমন করিয়াছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে সামসুউদ্দীন ইলিয়াস শাহ বিদ্রোহী হইলে দিল্লিশ্বর ফিরোজ শাহ তোগলক বারবার চেষ্টা করিয়া তাহাকে দমন করিতে পারেন নাই। এই সময় হইতে বাংলার সহিত দিল্লির সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইল, বাংলার সুলতানগণ স্বাধীন হইলেন। দুইশত বৎসর বাংলার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রহিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার শেষ স্বাধীন সুরতান দায়ুদ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া সম্রাট আকবর এই প্রদেশে মোঘল আধিপত্য স্থাপন করেন।

পাঠান আমলে বাংলার অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বিস্তৃতভাবে জানিবার উপায় নাই, কারণ কোন সমসাময়িক হিন্দু বা মুসলমান লেখকের রচিত কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। "তবকৎই নাসিরী", "তারিখ-ই-ফিরোজশাহী" যে সকল গ্রন্থে দিল্লির সুলতানগণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে সেই সকল গ্রন্থে বাংলার উল্লেখ খুব কমই পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গ তখনও নদীমাতৃক দেশ ছিল। দিল্লির সুলতানি সৈন্যদল জলপথে যাতায়াত ও যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত না থাকায় বঙ্গদেশ আক্রমণকালে তাহাদের বিশেষ অসুবিধা হইত। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরণী বলিয়াছেন যে এই জলপ্লাবিত অস্বাস্থ্যকর প্রদেশের উপর বিরক্ত হইয়াই সুলতান ফিরোজশাহ তোগলক সামসুউদ্দীন ইলিয়াস শাহের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। সম্ভবত বাঙালি নাবিকগণ সুলতানি বাহিনীকে এমন ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল যে সুলতান বাধ্য হইয়া বঙ্গদেশ জয়ের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গে এক বিষম দুর্যোগের সূচনা হইল। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল প্রদক্ষিণ করিয়া দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। ক্রমে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পর্তুগিজগণের বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। বঙ্গদেশে হুগলি ও চট্টগ্রাম তাহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। পর্তুগিজগণ অত্যন্ত পরধর্মদ্বেষী এবং অত্যাচারী ছিল। তাহারা নিরীহ গ্রামবাসিগণের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিত এবং বহু লোককে বলপূর্বক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করিত। জলপথে তাহাদের অবাধ প্রভুত্ব ছিল। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের আদেশে বাংলার সুবাদার কাসিম খাঁ হুগলি অধিকার করিয়া পর্তুগিজগণকে কথঞ্চিৎ দমন করে।

লুণ্ঠনকারী পর্তুগিজগণের প্রধান সহায়ক ছিল আরাকাননিবাসী মগগণ। এখন আরাকান ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত, কিন্তু ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইহা একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। প্রায় দুই শত

বৎসর চট্টগ্রাম আরাকানরাজের অধীন ছিল ; সম্রাট আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বাংলার সুবাদার শায়েস্ত খাঁ ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে মগদিগকে বিতাড়িত করিয়া চট্টগ্রাম মোঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। মগেরা প্রতি বৎসর জলপথে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত হইত এবং জনসাধারণের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিত। বরিশাল, নোয়াখালি, ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, যশোহর প্রভৃতি জেলা মগদের অত্যাচারে ছারখার হইয়াছিল। মগেরা কেবল যে লুণ্ঠন দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিত তাহা নয়, তাহারা স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে বহু লোক বন্দি করিয়া আরাকানে দাসরূপে বিক্রয় করিত। পর্তুগিজগণ প্রায়ই তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া লভ্যাংশ গ্রহণ করিত। "মগের মুলুক" এই সুপ্রচলিত প্রবাদবাক্যটি এখনও সেই দুর্দিনের স্মৃতি আমাদের মনে জাগাইয়া দেয়।

বঙ্গদেশে মোঘল অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে সুবাদারগণ পর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুগণকে দমন করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। পূর্বে বাংলার রাজধানী ছিল বর্তমান বিহারের অন্তর্গত রাজমহলে, কিন্তু রাজমহল হইতে সুদূর পূর্ববঙ্গে জলদস্যু দমন সম্ভব নয় দেখিয়া সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে সুবাদার ইসলাম খাঁ ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। এইরূপে ঢাকার গৌরবের সূত্রপাত হয়। ইসলাম খাঁ, কাসিম খাঁ শায়েস্তা খাঁ প্রভৃতি পরাক্রান্ত সুবাদারগণ বারংবার জলদস্যুগণের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া জনসাধারণের ধনপ্রাণ নিরাপদ করেন।

জলদস্যুগণকে দমন করিতে হইলে শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করা আবশ্যক, নতুবা তাহাদিগকে সম্মুখ সংগ্রামে লিপ্ত করা সম্ভব হয় না। তাই দায়ুদ খাঁর পতনের অব্যহিত পরেই সম্রাট আকবরের নির্দেশে বঙ্গদেশে "নৌযান বা নৌ বহর" গঠিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত "নৌযান" বর্তমান ছিল, কারণ বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলের সরকারি কাগজপত্রেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় "নৌয়ারা"র ব্যয় নির্বাহের জন্যে সম্রাটের "কর্মচারী ঘাটমাঝি" আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। ঘাটমাঝিগণ সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন এবং সম্রাটের নিকট আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল করিতেন। তাহারা প্রত্যক্ষভাবে সুবাদারের আদেশ অনুযায়ী কার্য করিলেও প্রকৃতপক্ষে বাদশাহী দরবারের নিকট দায়ী থাকিতেন। স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্যখচিত পাল্কিতে ঘাটমাঝিগণ যাতায়াত করিতেন। তাহাদের মস্তকে রক্তবর্ণ শিরস্ত্রাণ থাকিত। যে সকল নৌযান জলপথে যাতায়াত করিত তাহাদের উপর জলকর স্থাপনের অধিকার ঘাটমাঝির ছিল। "নৌয়ারা"র নাবিকগণ ঘাটমাঝি কর্তৃক নিযুক্ত হইত।

এক্ষণে আমরা প্রাচীন বিক্রমপুরের এক সুপ্রসিদ্ধ মাঝি বংশের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করিব। বহু পুরাতন কাগজপত্র এবং বিশ্বাসযোগ্য কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া এই কাহিনী রচিত হইল। উপযুক্ত উপকরণের অভাবে ইহা অসম্পূর্ণাঙ্গ রহিল। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে কোন ঐতিহাসিক বাংলার প্রাচীন কীর্তিগাথা কীর্তন করিতে অগ্রসর হইলে "নৌয়ারা"র পরিচালক এই সম্ভ্রান্ত বংশের বিলুপ্ত ইতিহাস পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন।

সম্রাট আকবর যখন দিল্লির সিংহাসনে বর্তমান, ভারতের সেই গৌরবময় যুগে বিক্রমপুর নিবাসী জগন্নাথ দে মহাশয় বাদশাহী নৌ-বিভাগে কার্য করিতেন। দায়ুদ খাঁর পতনের পর বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশে দ্বাদশ জন পরাক্রান্ত ভৌমিক বা জমিদার প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। ইতিহাসে ইহারাই "বার ভুইয়া" নামে সুপ্রসিদ্ধ। ভৌমিকগণের মধ্যে বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভৌমিকগণকে দমন করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে বাদশাহী আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সম্রাট আকবর প্রিয় সেনাপতি অম্বরাধিপতি মানসিংহকে পূর্ব ভারতে প্রেরণ করেন। মানসিংহ ছলে-বলে-কৌশলে ভৌমিকদিগকে দমন করিতে কৃতকার্য হন। ভৌমিকগণ নৌবলে বলীয়ান ছিলেন, তাই তাহাদিগকে পরাজিত করিবার জন্য বাদশাহী নৌ-বহর শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই উপলক্ষে জগন্নাথ দে স্বীয় কার্যকুশলতায় মানসিংহের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মানসিংহের অনুগ্রহে

জগন্নাথ প্রচুর ভূসম্পত্তি লাভ করেন এবং তৎপুত্র রাজীবলোচন বাদশাহী "নৌয়ারা"র "ঘাটমাঝি" নিযুক্ত হন। মতান্তরে রাজীবলোচন খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন এবং দিল্লীর মোঘল সম্রাট ফরুখশিয়র তাহাকে "রায়" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। নিম্নে বাদশাহী মোহর ও পাঞ্জার যে চিত্র মুদ্রিত হইল তাহা দ্বারা দ্বিতীয় মতই সমর্থিত হয়।[১] যাহা হউক, রাজীবলোচন যে জগন্নাথের বংশধর ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাজীবলোচনের বংশধরগণ বাদশাহী সনন্দ অনুসারে "রায়" উপাধি গ্রহণ করিলেও এই পরিবার প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী "মাঝি বংশ" নামেই সুপ্রসিদ্ধ।



এই মোহরে ফারসি ভাষায় যাহা লিখিত আছে তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ ঃ—"উপস্থিত সম্পূর্ণ ফলদায়ক শুভকালে সর্বজনমাননীয় এই আদেশপত্র প্রচারিত হইল যে মাঝি নৌয়ারা বাংলার অন্তর্গত জাহাঙ্গীরনগর তপশিল বেশি জমা পেস্‌কস্ প্রদান স্বীকারে রাজীবলোচন দে মাঝিকে রায় উপাধি প্রদত্ত হইতেছে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হাকিম, আমলা ও মুৎসুদ্দীগণের কর্তব্য যে তাহারা এই রাজীবলোচন দে মাঝি রায়কে উক্ত জাহাঙ্গীরনগরের নৌয়ারার রায় মাঝি জানিয়া তাহার উপর এতৎসম্বন্ধীয় কার্যভার ন্যস্ত আছে এইরূপ বিবেচনা করেন। নৌয়ারা মহল সম্বন্ধে তাহার নিকট প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর সনন্দ তলপ করা না হয়। মোহর ফরুখশিয়র ২৯শে জেলহজ্জ ১১ জুলুস ১১২৫ হিজিরী প্রদত্ত।"

জগন্নাথ মাঝির বংশ "রামনীলের মাঝি বংশ" বা "বাঘরার মাঝি বংশ" নামে প্রসিদ্ধ। বাঘরা বিক্রমপুরের একটি বৃহৎ গ্রাম ; ইহার যে অংশে মাঝিগণ বাস করিতেন তাহা প্রাচীর বেষ্টিত ছিল এবং "রামনীল" নামে পরিচিত হইত। রাক্ষসী পদ্মা রাজা রাজবল্লভের কীর্তিভূষিত রাজনগরের ন্যায় মাঝিদের স্মৃতিবিজড়িত রামনীল ও বাঘরার আদি বাসস্থানও সম্পূর্ণ গ্রাস করিয়াছে। যে স্থানে রামনীল অবস্থিত ছিল তাহা এখন চরে পরিণত হইয়াছে। সরকারি সেটেলমেন্ট রেকর্ডে এই চর এখন "চর রামনীল" নামে উল্লিখিত হয়। কিছুদিন পূর্বেও এই চরে মাঝি বংশের বিশাল প্রাসাদের চতুর্দিকে প্রায় তিন মাইল লম্বা প্রাচীর ছিল। জগন্নাথ মাঝির সমাধির উপর "সপ্তদশরত্ন" নামে এক মনোহর মন্দির ছিল। তৎকালে বিক্রমপুর অঞ্চলে এই মন্দিরের স্থাপত্য কৌশল অতুলনীয় ছিল।

রাজীবলোচনের মৃত্যুর পর দুর্দান্ত মগ জলদস্যুগণ দুইবার রামনীলের প্রাসাদ লুণ্ঠন করে। জগন্নাথের বংশধরগণ বহুদিন পর্যন্ত মগদিগকে বিতাড়িত করিয়া ঢাকা জেলার শান্তি রক্ষা করিয়াছিলেন ; তাই মগেরা এতদিন পর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিল। তাহাদের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাঝিগণ রামনীলের বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া বাঘরায় আগমন করেন। কিন্তু এখানে আসিয়াও তাহারা নিস্তার পাইলেন না ; মগেরা বাঘরার মাঝি বাড়ি ভস্মসাৎ করিল এবং প্রচুর ধন-রত্ন লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল। যে মগ দস্যুদিগকে দমন করিয়া মাঝি বংশ খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের অত্যাচারেই রামনীল ও বাঘরা শ্মশানে পরিণত হইল!

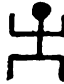
যাহা হউক, মাঝি বংশ ধীরে ধীরে পূর্ব গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন। তাহাদের বিশাল জমিদারির কিয়দংশ তাহাদের হস্তগত রহিল। বাঘরা অঞ্চলে এখনও "মাঝির তালুক" সুপরিচিত। পঞ্চশলা ও সেটেলমেন্ট রেকর্ডেও বাঘরায় "তালুক রাজীব লোচন মাঝি" বর্তমান। দেড়শত বৎসরের অধিককাল পূর্বে রাজীবলোচন পরলোকগমন করিয়াছেন, কিন্তু তাহার নাম ও কীর্তি অদ্যাপি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই।



এই পাঞ্জায় ফারসি ভাষায় যাহা লিখিত আছে তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—"রাজীবলোচন রায় মাঝির উপর হুকুম জারী হইল। রাজীবলোচনের উচিত যে এই এলাকার প্রজা, অধিবাসী ও পথিকগণের হিতচেষ্টা করিয়া দরিদ্রগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে বজায় রাখিয়া সচ্চরিত্রতার সহিত নিজ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন ; নৌয়ারা মহলের প্রজাবর্গ যাহাতে উত্তমরূপে চাষাদি দ্বারা স্বচ্ছন্দে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারে এবং যাহাতে রাজকর বর্ধিত হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন ও আদায় পক্ষে জুলুম না করেন ; ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বর্ধিত হইলে নির্ধারিত রাজকর অপেক্ষা বেশি জমা পেস্‌কস্ রূপে কিস্তি কিস্তি প্রদান করা কর্তব্য বিবেচনা করেন ; এই রাজকীয় আদেশ পালনে ত্রুটি না করেন। ফরুখশিয়র হিজিরী ১১২৫, ৩ শ্রাবণে, ৬ জুলুস।"

রাজীবলোচনের পুত্র রামজগন্নাথ ইংরেজ গভর্নমেন্টের বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলা নবাবের ক্ষমতা নামমাত্রে পর্য্যবসতি হয়, প্রকৃত ক্ষমতা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হস্তগত হয়। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট লর্ড কর্নওয়ালিশ সম্রাট ফরুখশিয়রের সনন্দের অনুসরণ করিয়া রামজগন্নাথকে বংশানুক্রমে "রায়" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং নির্দিষ্ট বৃত্তি ও সম্পত্তি প্রদান করেন। কিছুদিন পরে রামজগন্নাথ কোম্পানির "নৌয়ারা"র সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

সেকালে বঙ্গদেশে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। রামজগন্নাথ নিম্নোদ্ধৃত দাসখত গ্রহণ করিয়াছিলেন ঃ—



[illegible]

ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ফলে দাসত্ব প্রথা লুপ্ত হয়।

রামজগন্নাথ ৯২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাহার পুত্র গৌরসুন্দর রায় ১০১ বৎসর জীবিত ছিলেন। গৌরসুন্দরের স্ত্রী পদ্মাবতী স্বপ্নে হরিঠাকুর প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, পদ্মাবতী একবার মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হইলে বহু চিকিৎসক তাহার আরোগ্য বিধানের চেষ্টা করেন, কিন্তু কেহই সফলকাম হন নাই। অবশেষে এক গভীর রাত্রিতে তিনি শ্রীহরির প্রত্যাদেশ লাভ করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালেই হরিপূজার ব্যবস্থা হইল। ধর্মপরায়ণ রায় বংশ অদ্যাপি হরিপূজা করিয়া আসিতেছেন।

সম্প্রতি গৌরসুন্দরের পৌত্র শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায় মহাশয়ের চেষ্টায় হরিঠাকুরের মন্দির নির্মিত হইয়াছে। সহস্র সহস্র হিন্দু বাঘরার হরিঠাকুরকে জাগ্রত দেবতা বলিয়া স্বীকার করেন। অনেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় রোগমুক্ত হইতে না পারিয়া হরিঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

হরিঠাকুরের মন্দিরের পার্শ্বে পদ্মাবতীর স্বহস্ত প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরী গাছ আজও বর্তমান এবং "সিদ্ধেশ্বরী-তলা" বলিয়া কথিত হয়। অদ্যাপিও শত শত হিন্দু নারী সকল শুভকার্য উপলক্ষে এইখানে উপস্থিত হইয়া মঙ্গলগীত সহকারে তৈল-সিন্দুর দ্বারা সিদ্ধেশ্বরী গাছের অর্চনা করে।

গৌরসুন্দরের চারি পুত্র ছিল—১) রামদুর্লভ, ২) রামকুমার, ৩) হরিদাস ও ৪) হরিচরণ—

রামদুর্লভ পুত্রহীন ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র রামকুমার—শৈশবে মক্তবে জনৈক মৌলবির নিকট আরবি ও উর্দুভাষা শিক্ষা করিয়া স্বীয় অধ্যবসায় দ্বারা নারায়ণগঞ্জে বালিয়াটির জমিদার জগন্নাথবাবুর অধীনে প্রধান কর্মচারী পদে নিযুক্ত থাকিয়া সর্বময়কর্তা হইয়া বহু অর্থ উপার্জন করিতেন। তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত রায় এখনও জীবিত আছেন।

হরিদাস ৬৫ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। হরিদাসের দুই পুত্র বর্তমান আছেন। প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত রায় নারায়ণগঞ্জে বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত মোক্তারী করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত রায় বংশের কীর্তি রক্ষা করিতেছেন। তিনি ধর্মভীরু, দানশীল, মিষ্টভাষী, সদ্বক্তা ও বিচক্ষণ। যখন তিনি নারায়ণগঞ্জে ব্যবসায়ে ব্রতী ছিলেন তখন বহু লোক তাহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছে। যে যতদিন ইচ্ছা তাহার বাড়িতে অবস্থান করিত ; তিনি যে কেবল আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতেন তাহা নহে, প্রয়োজন হইলে অর্থ সাহায্যও করিতেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে তিনি প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ সহস্র দরিদ্র নারায়ণকে মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ করিতেন। বেলুড় মঠের স্বামীজীগণ শতমুখে তাহার প্রশংসা করেন। তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন, কিন্তু এক কপর্দকও সঞ্চয় না করিয়া সমস্তই দুঃস্থ ও বিপন্নের সাহার্য্যার্থে ব্যয় করিতেন। তাহার সহধর্মিনীও পতির ন্যায় সরল ও উদার প্রকৃতি। ভগবানের অনুগ্রহে তাহারা সৎপুত্র লাভ করিয়াছেন। পুত্রও জনক-জননীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ রজনীকান্ত ব্যবসায়োপলক্ষে কলিকাতায় বাস করিতেছেন। এখানে তাহার গৃহের নাম "বিক্রমপুর অতিথি-সৎকার আশ্রম" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বহু লোক তাহার গৃহে অবস্থান ও আহার করে। অবসর মত রজনীকান্ত প্রায়ই জন্মভূমি বাঘরা গ্রামে যাইয়া গোপনে দান করেন। তিনি যশের জন্য দান করেন না, আত্মপ্রশংসা বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। বস্তুত রজনীকান্তের ন্যায় আদর্শচরিত্র ও সদাশয় পুরুষ বর্তমান যুগে বিরল।

যে বাঘরা গ্রাম মাঝি বংশের কর্মভূমি তাহার ইতিহাস সম্বন্ধে দুই একটি কথার উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। বাঘরা অতি প্রাচীন গ্রাম ; সম্রাট আকবরের সময়েও এই গ্রামে লোকের বসতি ছিল। চাঁদরায় ও কেদার রায় যখন শ্রীপুরের অধিপতি ছিলেন তখন এই গ্রামে তাহাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণের জন্য কেদার রায় এই গ্রামে একটি প্রকাণ্ড দির্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন।

বাঘরার বাসুদেববাড়ি বিক্রমপুরের একটি প্রসিদ্ধ দেবালয়। এই দেবালয়ের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। কথিত আছে, কেদার রায়ের রাজত্বকালে বাঘরা নিবাসী যুগীরাম বা যুগল গোপ নামক এক ব্যক্তি স্বপ্নে বাসুদেবের প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়, "আমি কেদার রায়ের দিঘিতে আছি।" সেই রাত্রিতেই অভিরাম শর্মা নামক এক ব্রাহ্মণ প্রত্যাদেশ পাইলেন, "তোর জপ, তপ ও ভক্তিতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোর ক্রন্দন আর সহ্য করিতে না পারিয়া আমি তোকে দেখা দিব স্থির করিয়াছি। কেদার রায়ের দিঘি হইতে এক ডুবে আমার মূর্তি উঠাইয়া তাহা বাঘরা গ্রামে স্থাপন কর। বাঘরা আমার লীলাভূমি হইবে। কেদার রায় যেন ইহা জানিতে না পারে। তোর মনে ভয় হইলে জগন্নাথ মাঝিকে জানাইলে প্রতিকার হইবে।"

প্রভাতে যুগীরামের সহিত অভিরামের সাক্ষাৎ হইল এবং তাহারা স্বপ্ন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় জগন্নাথ মাঝি পাল্কীতে সেখানে উপস্থিত হইলেন। যুগীরাম ও অভিরাম তাহার নিকট স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে তিনি তাহাদিগকে মূর্তি উদ্ধার করিতে আদেশ দিলেন। অভিরাম এক ডুবে বাসুদেব মূর্তি পাইলেন ; যুগীরাম ক্রমাগত ছয় ডুবে

ছয় প্রকার পূজার সামগ্রী পাইলেন (বেদী, খড়্গ, তাম্রফলক, ঘণ্টা, দীপ, পুষ্পপাত্র) তদবধি বাঘরা গ্রামে বাসুদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন।

বাসুদেব সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। (১) ভাগ্যকুলের দানশীল জমিদার, পরম বৈষ্ণব গঙ্গাপ্রসাদ রায় রোগাক্রান্ত হইয়া ১২১৪ বাঙ্গালা সনে নবদ্বীপে গমন করেন। তথায় রোগের উপশম না হওয়ায় তিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সেইদিন রাত্রিশেষে তাহার উপর স্বপ্নাদেশ হইল, "তুই সত্বর দেশে যাইয়া বাঘরা গ্রামে বাসুদেবের সেবা কর।" গঙ্গাপ্রসাদ দেশে ফিরিয়া বাসুদেবের দৈনিক পূজার বন্দোবস্ত করেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার অন্তিম আদেশ অনুসারে তাহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয় গুরুপ্রসাদ রায় ও প্রেমচাঁদ রায় বাসুদেবের মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। অদ্যাপি ভাগ্যকুলের জমিদারগণ বাসুদেবের প্রতি ভক্তিমান। তাহারা বাসুদেবের পূজার জন্য বাৎসরিক প্রণামীর ব্যবস্থা করিয়াছেন!

(২) বহুদিন পূর্বে বাঘরার কয়েকজন লোক পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে চাঁদরায়ের দিঘিতে মৎস্য ধরিতে যায়। তখন বাঘরার চক্রবর্তী বংশের জনৈক পূর্বপুরুষ জলে প্রস্তর নির্মিত বাসুদেব মূর্তি প্রাপ্ত হন। সেই রাত্রিতেই বাসুদেবের প্রত্যাদেশ হয়, "এই দিঘির পশ্চিম দিকে অবস্থিত পুষ্করিণীতে আসন ও পূজা-পদ্ধতি পাওয়া যাইবে।" পরদিন ঐ পুষ্করিণীতে ডুব দিয়া আম্বলি বংশের এক ব্যক্তি তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ পূজা-পদ্ধতি এবং গোপজাতীয় এক ব্যক্তি একখানা প্রস্তরনির্মিত আসন প্রাপ্ত হন। ফলে চক্রবর্তী পরিবার এবং আম্বলি পরিবার উভয়েই বাসুদেব প্রতিষ্ঠার দাবি করেন ; এই দাবি ক্রমশ কলহে পরিণত হয়। অবশেষে গ্রামস্থ প্রধান ব্যক্তিগণের মধ্যস্থতায় এই মীমাংসা হয় যে প্রত্যেক পরিবার প্রতি বৎসর ছয়মাস বাসুদেব মূর্তি নিজ বাড়িতে রাখিবেন। পরে দেখা গেল যে বাৎসরিক পর্বগুলি উভয় পরিবারের পালায় সমানভাগে পড়ে না, সুতরাং পর্বোপলক্ষে প্রাপ্য আয়ের তারতম্য হয়। তখন উভয় পরিবার রাজদ্বারে বিচার প্রার্থী হইলে ঢাকার তদানীন্তন (১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ) ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ওয়াল্টার ব্যবস্থা করেন যে প্রত্যেক পরিবার চারিমাস বাসুদেবের সেবা করিবেন। অদ্যাপি এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। আম্বলি বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে ; সেই বংশের জনৈক দৌহিত্র এখন বাসুদেব পূজা করেন। চক্রবর্তী বংশও বহু শাখায় বিভক্ত ; কোন কোন শাখা বিলুপ্ত হইয়াছে।

বাঘরার বাসুদেব কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি, গরুড়ের পৃষ্ঠে অবস্থিত। বিষ্ণুমূর্তির উপরে দুইদিকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী, মধ্যস্থলে দশাবতার মূর্তি। মন্দিরের প্রাঙ্গণ অতি মনোরম স্থান ; এখানে উপস্থিত হইলেই চিত্তে অনির্বচনীয় প্রশান্ত ভাবের উদয় হয়। প্রত্যহ বহুদূর হইতে বহু লোক সন্তান কামনায় ও সন্তানের কল্যাণ কামনায় বাসুদেবের পদতলে সমবেত হয়।

---

১. বাঙ্গালার নবাব সরফরাজ খাঁর প্রদত্ত আর একখানি পাঞ্জায় রাজীবলোচনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এই পাঞ্জার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। এই পাঞ্জাদ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে রাজীবলোচন মানসিংহের সমসাময়িক ছিলেন না।

পরিশিষ্ট ১



লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন

প্রাপ্তিবৃত্তান্ত ঃ

মুর্শিদাবাদ জেলার বর্তমানে সদর (পূর্বে কান্দি) মহকুমার অন্তর্গত শক্তিপুর গ্রামে লক্ষ্মণসেনের একখানি নতুন তাম্রশাসন সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাত্র-সভ্য শ্রীযুক্ত সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের যত্নে আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত শক্তিপুর নামক গ্রামে স্বর্গীয় শিবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতে এই তাম্রশাসন ছিল।

বিষয় ও ব্যক্তি ঃ

এই শাসনখানি একাধারে দান ও বিনিময়ের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইয়াছিল। এইরূপ দুই কার্যের জন্য একখানিও মাত্র শাসন বোধ হয় বঙ্গদেশে ইতিপূর্বে পাওয়া যায় নাই। মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন তাঁহার রাজত্বের ৩য় বৎসরে ২ শ্রাবণ তারিখে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে অনিরুদ্ধ দেব শর্মার প্রপৌত্র, পৃথ্বিধর দেব শর্মার পৌত্র, অনন্ত দেব শর্মার পুত্র শাণ্ডিল্য-সগোত্র শাণ্ডিল্যাসিতদেবল-প্রবর ও সামবেদীয় কৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী কুবের দেবশর্মাকে বৎসরে ৫০০ উৎপত্তিযোগ্য ৯৮ ভূদ্রোণ পরিমিত ৬ পাটক ভূমি দান করিয়াছিলেন। এ পর্যন্ত সেন রাজাদের যতগুলি শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সাক্ষাৎ ভাবে কোন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা হইয়াছে। কিন্তু এই শাসনে আমরা এই বিশেষত্ব দেখিতে পাই যে, পূর্বে শ্রীমদ্বল্লালসেন দেবের নিকট হইতে হরিদাস নামক গয়াল ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রতিগৃহীত বৎসরে ৫০০ উৎপত্তিযোগ্য ছত্রপাটক নামক শাসনের বিনিময়ে এই তাম্রশাসনে উল্লিখিত ভূমি দান করা হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় আর কোনও শাসনে গয়াল ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখা যায় না।

দেশ ও স্থান ঃ

এই শাসনে প্রাচীন ও বিস্তৃত সেনরাজ্যের কোন অংশের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা বর্তমানে বুঝিবার উপায় নাই, কারণ এযাবৎ প্রকাশিত অন্য কোন লিপিতে এই শাসনে লিখিত স্থানের নামগুলি পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাচীন বঙ্গের স্থানীয় ভূগোল আলোচনায় এই শাসনখানি নতুন আলোকপাত করিবে। ইহার শ্রীমধুগিরি মণ্ডল ও কুম্ভীনগর ও কঙ্কগ্রাম ভুক্তি প্রভৃতি কোথায় ছিল তাহা বর্তমানে জানিবার কোন উপায় নাই। * ঐ অঞ্চলে কুমারপুর চতুরকে যে দুই খণ্ড ভূমি দেওয়া হইয়াছিল তাহার যে সীমা, পরিমাণ এবং বাৎসরিক উৎপত্তি পাওয়া যাইতেছে তাহা নিম্নে দেখানো হইল।

তাম্রশাসনের পাঠ

(সম্মুখ)

১। (॥)[২] ওঁ নমো নারায়ণায়।। বিদ্যুদ্যত্রমণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং বারিস্বর্গতরঙ্গিনী[২] সি-

২। ত শিরোমালা বলাকাবলিঃ (।) ধ্যানাভ্যাস [স] মীরণোপনিহিত শ্রেয়োঙ্কুরোদ্ভূতয়ে ভূয়াদ্বঃ স ভবাৰ্ত্তিতাপভিদ্-

৩। রঃ শম্ভোঃ কপর্দাম্বুবুদঃ।। [১][৩] আনন্দোম্বুনিধৌ চকোরনিকরে দুষ্ক[৪] চ্ছিদাম্ভান্তকী কহ্লারে হতমো-

৪। হতা রতিপতাবেকোহমেবেতি ধীঃ (।) যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়ন্ত্যাশু প্রকাশাজ্জগত্য-

৫। ত্রিধ্যান-পরম্পরাপরিণতং জ্যোতিস্তদাত্তাম্মুদে।। [২][৫] সেবাবনম্রনৃপকোটী-কিরীট-রোচির-

৬। মু (মু)ল্লসৎপদনখদ্যুতি-বল্লরীভিঃ (।) তেজোবিষজ্জরমুষো দ্বিষতামভূবন ভূমীভুজঃ স্ফুটমথৌষ

৭। ধিনাথবংশে।। [৩][৬] আকৌমার-বিকস্বরৈ[৭]র্দ্দিশি দিশি প্রস্যন্দিভির্দ্দোর্যশঃ প্রালেয়ৈরেরিয়াজ[৮] বক্ত্রনলি

৮। ম্লানীঃ[৯] সমুন্মীয়ন্ (।) হেমন্তঃ স্ফুটমেব সেনজননক্ষেত্রস্য[১০] পুণ্যাবলী শালিশ্লাঘ্যবিপাকপীব-

৯। রগুণস্তেষামভূদ্বংশজঃ।। [৪][১১] যদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিতভুজঃ স্ফুট[১২] সহচরৈর্যশোভিঃ শোভন্তে পরিধি-

১০। পরিণদ্ধা ইব দিশঃ (।) ততঃ কাঞ্চীলীলা-চতুর-চতুরম্ভোধিলহরী-পরীতোর্ব্বী-ভর্ত্তাজনি বিজ-

১১। য়সেন [ঃ] স বিজয়ী।। [৫][১৩] প্রত্যহঃ কলিসম্পদামনলসো বেদায়নৈকাধ্বগঃ সঙ্গ্রামঃ[১৪] শ্রিতজঙ্গমা-

১২। কৃতিরভূদ্বল্লালসেনস্ততঃ যশ্চেতোময়মেব শৌর্যবিজয়ী দস্তৌষধং[১৫] তৎক্ষণাদক্ষীণা রচয়াঞ্চ-

১৩। কার বশগাঃ স্বস্মিন্ পরেষাং শ্রিয়ঃ।। [৬][১৬] সংভুক্তান্যদিগঙ্গনাগণ-গুণাভোগ-প্রলোভাদ্দিশামীশৈরংশ

১৪। সমর্প্পণৈ[১৭] ঘটিতস্তত্তৎপ্রভাব-স্ফুটৈঃ (।) দোরুষ্মক্ষপিতারি[১৭ক] সঙ্গররসো রাজন্যধর্মাশ্রয়ঃ শ্রীম-

১৫। লক্ষ্মণসেন ভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাজনি।। [৭][১৮] শশ্বদ্বদ্ধ-ভয়াদ্বিমুক্তবিষয়াস্তন্মাত্র নিষ্ঠীকৃত-

১৬। স্বান্তা যান্ত কথং ন নাম রিপবস্তস্য প্রয়োগান্নয়ম্ (।) যৈরাত্মপ্রতিবিম্বিতেপি[১৯] চণ্ডত্বৃ[২০]-

১৭। ণেপ্যদ্বৈতেন যতস্ততোপি সপরো বেদঃ পরং বীক্ষ্যতে।। [৮][২১] স খলু শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত-শ্রীম-

১৮। জ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেন দেবপাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পর-

১৯। মভট্টারক-পরমবৈষ্ণব-মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবঃ কুশলী। সমুপ-

২০। গতাশেষ-রাজ-রাজন্যক-রাজ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্য-মহাপুরোহিত-ম-

২১। হাধর্মাধ্যক্ষ-মহাসান্ধিবিগ্রহিক-মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত অন্তরঙ্গ-

২২। বৃহদুপরিক-মহাক্ষপটলিক-মহাপ্রতীহার-মহাভোগিক-মহাপীলুপতি-মহা-

২৩। গণস্থ-দৌঃসাধিক-চৌরোদ্ধরণিক-নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকা-দিব্যাপৃতক-গৌল্মি-

২৪। ক-দণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষ(য়)পত্যাদীন্ অন্যাংশ্চ সকলরাজপাদোপজী-বিনোধ্যক্ষ-প্রচারো-

২৫। ত্তাহিনাকীর্ত্তিতান্ চট্টভট্টজাতীয়ান্[২২] ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণেতরান্ যথার্হং মান-

২৬। য়তি বোধয়তি সমাদিশতি **চ** মতমস্তু ভবতাম্ যথা **শ্রীমধুগিরিমণ্ডলাবচ্ছিন্ন-কুন্তীনগর-**

২৭। প্রতিবদ্ধঃ **কঙ্কগ্রামভূ**-ক্ত্যন্তঃপাতি দক্ষিণবীথ্যামুত্তরবাটায়াং[২৩] **কুমারপুরচতুরকে** পূর্ব্বে অপ-

২৮। রা **জোলি**সমেত-মালিকুণ্ডাপরিসরভূঃ সীমা দক্ষিণে বমস্থলীয় **ভাগড়ীখণ্ডক্ষেত্রং** সীমা-

২৯। পশ্চিমে **অচ্ছমা গোপথঃ** সীমা উত্তরে **মোচননদী** সীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ ষট্‌ত্রিংশট্‌ক (ৎক) দ্রোণাত্মক (ঃ)

(পশ্চাৎ)

৩০। সম্বৎসরেণ সার্দ্ধশতদ্বয়োৎপত্তিকঃ **বারহকোণা-বাল্লিহিতা-নিঝাপাটক**-সম্বন্ধিভূদ্রো-

৩১। ণ চতুষ্টয়োপেত-পাটকদ্বয়সমেত-**রাঘবহট্টপাটক**স্তথাচতুরকে পূর্ব্বে **চাকলিয়াজো-**

৩২। **লী**সীমা দক্ষিণে **শ্চ** (?)[২৪] **প্রবদ্ধাজোলী**সীমা পশ্চিমে লাঙ্গলজোলীসীমা উত্তরে **পরজাণ-**

৩৩। **গোপথঃ**সীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নস্ত্রিপঞ্চাশদ্ভূদ্রোণাত্মকঃ সম্বৎসরেণ সার্দ্ধশ-

৩৪। তদ্বয়োৎপত্তিকো [ঃ] **টামরবড়া**সমেত-**বিজহারপুর-পাটক** (ঃ) এবমেতদ্ব [দ্ব] য় বিলিখিত-

৩৫। নাম-সীমং ভূসীমাদ্যবচ্ছিন্নং দেবব্রাহ্মণাদিভূ-বহিঃ গোপথাদ্যভূবাস্তু-ভূসহিতং[২৫] বৃষভশং-

৩৬। করনলেন[২৬] উ(ঊ)নবতি ভূদ্রোণাত্মকং সম্বৎসরেণ পঞ্চশতোৎপত্তিকং রাঘবহট্ট-বারহ-

৩৭। কোণা-নিঝাবস্থিত-খণ্ডক্ষেত্রভূদ্রোণচতুষ্টয়াত্মক-বাল্লিহিতাপাটক-টামরবড়া-

৩৮। পাটকসমেত-বিজহারপুরপাটকমেতৎ ষট্‌পাটকং সঝাট[২৭] বিটপ(ং) সজলস্থলং সগ-

৩৯। র্ত্তোষরং সগুবাকনারিকেলং সহ্যদশাপরাধং পরিহৃত-সর্বপীড়ং অচট্টভট্টপ্রবেশ-

৪০। মকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যং তৃণযূতি[২৮] গোচরপর্যন্তং **অনিরুদ্ধ-দেবশর্মণঃ** প্রপৌত্রায়

৪১। **পৃথ্বীধরদেবশর্মণঃ** পৌত্রায় **অনন্তদেবশর্মণঃ** পুত্রায় শাণ্ডিল্য-সগোত্রায় শা-

৪২। ণ্ডিল্যাসিত-দেবল-প্রবরায় সামবেদ-কৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়িনে আচার্য শ্রী-

৪৩। **কুবেরদেবশর্মণে** পুণ্যে [হ] **অহনি** বিধিবদুদকপূর্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণ-ভট্টা-

৪৪। রকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্য-যশো(হ) ভিবৃদ্ধয়ে **শ্রীবল্লালসেনদেব প্রদত্ত**

৪৫। গয়াল-ব্রাহ্মণ-**হরিদাসেন** প্রতিগৃহীত-পঞ্চশতোৎপত্তিক-ছত্রপাটকাভিধান-শাস

৪৬। নো [ন] বিনিময়েন এতদ্রাঘবহট্টাদি ষট্‌পাটকম্প্রত্যেকমুপরি লিখিত প্রমাণং পঞ্চশতো

৪৭। [তো][২৯] ৎপত্তিযোগ্যংছত্রপাটকংকোষ্ঠীকৃত্য[২৯ক] অস্মৈপুনর্বাহ্মণায় শ্রীকুবেরাভিধানায় সূর্যগ্রহে

৪৮। এতৎসমুৎসৃজ্যাচন্দ্রার্ক(ং)-ক্ষিতিসমকালং যাবত্তু [ৎভূ] মিচ্ছিদ্রন্যায়েন-তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্ত

৪৯। মস্মাভিস্তত্তবস্তিঃ সর্বৈরেবানুমন্তব্যম্ (।) ভাবিভিরপি নৃপতি ভিরপহরণে নরকপাত-

৫০। ভয়াৎ পালনে ধর্মগৌরবাৎ পালনীয়ং [ম্] (।) ভবন্তি চাত্র ধর্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ (।) ভূমিং

৫১। যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চভূমিং প্রযচ্ছতি (।) উভৌ তৌ পুণ্যকর্মাণৌ নিয়তং স্বগ্‌র্গগামিনৌ।।[৯][৩১]

৫২। বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ(।) যস্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য [তস্য।][৩২] তদা ফলং (ম্)।।[১০][৩৩] আস্ফোট-

৫৩। য়ন্তি পিতরো বল্গয়ন্তি পিতামহা (ঃ) (।) ভূমিদাদাতা কুলে জাতঃ স ন স্ত্রাতা ভবিষ্যতি।।[১১][৩৪] যষ্টি [ং] বর্ষ [ং]-

৫৪। সহস্রাণি স্বগ্‌র্গে তিষ্ঠতি ভূমিদঃ (।) আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকং ব্রজেৎ।।[১২][৩৫] স্বদত্তাং

৫৫। পরদত্তাম্বা [ংবা] যো হরেত বসুন্ধরাং (।) স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে।। [১৩][৩৬] ইতি কমল

৫৬। দলাম্বু বিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্য জীবিতঞ্চ (।) সকলমিদ মুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা[৩৭] নহি।

৫৭। পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ।। [১৪][৩৮] শ্রীমল্লক্ষণসেন ক্ষোণীন্দ্রঃ[৩৯] সান্ধিবিগ্রহিকম্ [ং] ত্রিপুরা

৫৮। রিনাহমকরোৎ[৪০] কুবেরকস্য শাসনে দূতম্।। [১৫][৪১] সং ৩[৪২] শ্রাবণদিনে২[৪৩] শ্রীনিমহাসাংনি

* এই শাসনের প্রাপ্তিস্থান শক্তিপুরের পশ্চিমোত্তরে কান্দির তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পাঁচথুপী (পঞ্চস্তূপী?)। এই গ্রামের উত্তরাংশে বারকোণার দেউল রহিয়াছে। এই বাবকোণাই কি প্রাচীন 'বারহকোণা'? এই অঞ্চলে কুমারপুরও আছে। এই শাসনে 'বাল্লিহিতা' নামে স্থানের উল্লেখ আছে। ইহার সহিত বল্লালসেনের নৈহাটি শাসনের (৪৪) 'বাল্লহিট্‌ঠা' গ্রামের কোন সম্পর্ক আছে কি না, বলিবার কোন সূত্র নাই। টা মরবড়া নামের 'বড়া' অংশটুকু অন্য স্থানেও পাওয়া যায়, যথা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালাভুক্ত বিশ্বরূপসেনের শাসনে (৪৩) 'বাঙ্গাল বড়া'।

১. এই চিহ্নটিকে পণ্ডিতেরা ওঁ বলিয়া ধরিয়াছেন। ইহা ওঁ নহে, স্বস্তিবাচক চিহ্ন।
২. স্বর্গ (৫১ ও ৫৪ পংক্তিতেও স্বগ্‌র্গ আছে)।
৩. শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দ।
৪. দুঃখ। দুষ্‌খ পাঠ আনুলিয়া, তর্পণদীঘি ও গোবিন্দপুর শাসনে আছে।
৫. শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দ।
৬. বসন্ততিলক ছন্দ।
৭. সুধু গোবিন্দপুর শাসনে 'বিকমারকস্বরৈ'
৮. আ, গো, ও ত, শাসনে—'রিপুরাজ'।
৯. নলিন-ম্লানী (আ. গো, ও ত, শাসনে)
১০. আ, ও ত. শাসনে 'ক্ষেত্রৌঘ' কিন্তু গো, শাসনে 'ক্ষেত্রস্য' আছে।
১১. শার্দ্দুলবিক্রীড়িত ছন্দ।
১২. আ, গো ও ত, সবগুলিতে 'তেজঃ' আছে।
১৩. শিখরিণী ছন্দ।
১৪. আ, গো, ত, শাসনেও ঙ ও গ সম্পূর্ণ লেখা আছে।
১৫. দত্ত্বা।
১৬. শার্দ্দুলবিক্রীড়িত ছন্দ।
১৭. সমর্পণ—আ. (সমর্প্পণ), গো ও ত শাসনে (শমর্প্পণ)।

১৭ ক.আ. ও ত. শাসনেও আছে, কিন্তু গ. শানে 'ক্ষয়িত'

১৮. শার্দ্দুলবিক্রীড়িত ছন্দ।

১৯. ইহার পর ত. শাসনে 'নিপতৎপত্রেপি' অধিক আছে, উহা এখানে না থাকায় ছন্দপতন হইয়াছে।

২০. —দ্ব—

২১. শার্দ্দুলবিক্রীড়িত ছন্দ ; এই শ্লোকটি সুধু ত. শাসনে আছে, অন্যগুলিতে নাই।

২২. আ. গো. ও ত. শাসনে ইহার পর 'জনপদান্' অধিক আছে ; এই শব্দটি বিজয়সেনের ব্যারাকপুর লিপি এবং বল্লালসেনের নৈহাটি লিপিতেও আছে।

২৩. = বাটে।

২৪. অস্পষ্ট।

২৫. 'দেব' হইতে 'সহিতং' পর্যন্ত অংশটুকু লক্ষ্মণসেনের ত. শাসনে 'দেবগোপথাদ্যসারভূবহিঃ' এইরূপ আছে।

২৬. বল্লালসেনের নৈহাটি শাসনেও (৪৫) পাওয়া যায়। পূর্বে ইহা অনেকে 'নলিন' এইরূপ পাঠ করিয়াছিলেন। Inscriptions of Bengal—III—p. 87, footnote 1 ; কিন্তু ল-এর একার বেশ স্পষ্ট।

২৭. ভূমিকায় পাঠ আলোচিত হইয়াছে। পূর্বে অনেকে 'সসাট' পড়িয়াছিলেন।

২৮. ভূমিকায় পাঠ আলোচিত হইয়াছে। পূর্বে অনেকে 'পূতি' পাঠ করিয়াছিলেন।

২৯. ভুলে 'তো' দুইবার লিখিত হইয়াছে।

২৯ ক.ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে।

৩০. বিজয়সেনের ব্যারাকপুর, বল্লাসেনের নৈহাটি এবং লক্ষ্মণসেনের আ. ত. ও মাধাইনগর শাসনে-ক্ক-এইরূপ আছে, শুধু গো. শাসনে-র্ক আছে।

৩১. অনুষ্টুভ্ ছন্দ।

৩২. ভুলে 'তস্য' শুধু একবার লেখা হইয়াছে।

৩৩. 'অনুষ্টুভ্ ছন্দ।

৩৪. অনুষ্টুভ্ ছন্দ।

৩৫. অনুষ্টুভ্ ছন্দ। এই শ্লোকটি লক্ষ্মণসেনের আর কোনও শাসনে দেখা যায় না, কিন্তু বল্লালসেনের নৈহাটি শাসনে আছে।

৩৬. অনুষ্টুভ্ ছন্দ।

৩৭. বুদ্ধা।

৩৮. পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ। শ্রীযুক্ত ননীগোপালবাবু আ. ও গো. শাসনে এই শ্লোকের ছন্দকে পুষ্পিতাগ্রা লিখিয়াছেন, তাহার পুস্তকের অন্য সব জায়গায় মালিনী লিখিয়াছেন Inscriptions of Bengal—III—pp. 75. 88. 97. 126. 138. 155.

৩৯. ক্ষৌণীন্দ্রঃ।

৪০. লক্ষ্মণসেনের অন্যান্য শাসনে রাজদূতের নাম নারায়ণ দত্ত। এই শাসনের দূতের নামটি নতুন পাওয়া যাইতেছে। বোধ হয়, ত্রিপুরারিনাথ শব্দটি লৌকিক উচ্চারণে ত্রিপুরারিনাহ হইয়াছিল।

৪১. আর্যা ছন্দ।

৪২, ৪৩. সংবতের অঙ্কটি ৩ বলিয়া মনে হয় এবং তারিখটি ১ ও হইতে পারে।

পরিশিষ্ট ২



ভোজবর্মার বেলাব গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসন

সম্মুখ পৃষ্ঠার পাঠ

বিষ্ণু চক্র সমন্বিত রাজমুদ্রা।

১। ওঁ সিদ্ধি॥ স্বায়ম্ভুব মিহাপত্যং মুনিরত্রি দি (র্দি) বৌকসাং। তস্য চন্নাযনং তেজ স্তেনাজা
২। য়ত চন্দ্রমাঃ। রৌহিণেয়ো বুধস্তস্মাদস্মাদৈলঃ পুরূরবাঃ স্বয়ং-বৃতঃকীর্ত্ত্যা
৩। চোর্বশ্যাচ ভুবাচয়ঃ॥ সোপ্যায়ুং সমজীজনম্মনু সমোরাজস্ততো জজ্ঞিবান্ ক্ষ্মা
৪। পালো নহুষস্ততোজনি মহারাজোযযাতিঃ সুতম্ সোপি প্রাপ যদুং ততঃক্ষিতি ভু
৫। জাং বংশোয়া মুজ্জস্ততে বীরশ্রীশ্চ হরিশ্চ যত্র ব শঃ প্রত্যক্ষ মৈবেক্ষত্ত সোপীহ
৬। গোপীশত কেলিকারঃ কৃষ্ণো মহাভারত সূত্রধারঃ অর্ঘঃ পুমানংশ কৃতাবতা
৭। রঃ প্রাদুর্ব্বভূবেদ্ধিত ভূমিভারঃ॥ পুংসামাবরণং ত্রয়ী নচ তয়া হীনা ন নগ্না ইতি
৮। ত্রব্যান্ (ং) চাদ্ভুত সঙ্গরেষু চ রসাদ্রোমোদ্গমৈ বর্মণঃ বর্মাণোতি গভীর নাম দধতঃ
৯। শ্লাঘ্যৌ ভুজৌ বিভ্রতো ভেজুঃ সিংহপুরং গুহামিব মৃগেন্দ্রাণাং হরের্বান্ধবাঃ॥
১০। অভবদথকদাচিদ্যাদবীনাং চমূনাং সমরবিজয়ধারাঃ মঙ্গলং বজ্রবর্মা শম
১১। ন ইব রিপূণাং সোমবন্ধান্ধবানাং কবিরপি চ কবিনাং পণ্ডিতঃ (প) ণ্ডিতানাম্॥ জা
১২। ত্রবর্মা ততো জাতো গাঙ্গেয়ইব শান্তনোঃ (।) দয়াব্রতং রণক্রীড়া ত্যাগো যস্যমহো
১৩। ৎসবঃ গৃহ্নন্বৈণ্য পৃথুশ্রিয়ং পরিণয়ন্ কর্ণস্য বীরশ্রিয়ং যো * * * প্রথম হ্রিয়ং পরিভবং
১৪। স্তাং কামরূপশ্রিয়ং নিন্দন্দিব্য ভুজশ্রিয়ং
১৫। সাচ্ছ্রিয়ং বিতত বাদ্যাং সার্বভৌমশ্রিয়ং॥ বীর শ্রিয়ামজনি সামলবর্ম দেবঃ
১৬। শ্রীমাঞ্জগৎ প্রথম মঙ্গল নামধেয়ঃ কিম্বর্ন্নয়ামাখিল ভূপগুণোপ পন্নো দোষৈ
১৭। ম নাগপি পদংনকৃতঃ প্রভুর্মে। তথোদয়ী সুনুরভূত প্রভূত প্রত্যপ বীরেষ্বপিসঙ্গ
১৮। রেষু যশচন্দ্রহা (স) প্রতিবিম্বিতং স্বমেকং মুখং সম্মুখমীক্ষতে স্ম॥ তস্যামালব্য দেব্যা
১৯। সীৎ কন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী। জগদ্বিজয়মল্লস্য বৈজয়ন্তী মনোভুবঃ॥ পূর্ন্নেপ্যাশে
২০। য-ভূপাল পুত্রীণামবরোধনে তস্যাসীদগ্রমহিষী সৈব সামল বর্মণঃ॥ আসী
২১। ত্তয়োঃ সু (সূ) নুবিহান্তরং যঃ শ্রীভোজ বর্মোভয় বংশ (দী) পঃ পাত্রেষু সর্বাসু দশাসু যে
২২। নম্নেহোনু লুপ্তশ্চ হতং তমশ্চ॥ হাধিক (ক) ষ্টমবীর মদ্য ভুবনং ভূয়োপি কং (কিং) রক্ষসা
২৩। মৃৎপাতয়ো মু (প) স্থিতোস্ত কুশলী শঙ্কা স্বলঙ্কাধিপঃ॥ ইতি যং গুণগাথাভি স্তুষ্টা
২৪। বপুরুষোত্তমঃ মজ্জযন্নিব বাগ্ ব্রহ্মময়ানন্দ মহোদধৌ॥ সখলু শ্রীবিক্রমপু-
২৫। র সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবারৎ মা (ম) হারাজাধিরাজ শ্রীসামল বর্ম দেবপা-
২৬ দানুধ্যাত পরমবৈষ্ণব পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্ভোজ

পশ্চাৎ পৃষ্ঠার পাঠ

২৭। শ্রীপৌণ্ড্র ভুক্ত্যন্তঃপাতি অধঃপত্তন মণ্ডলে কৌশাম্বী অষ্টগচ্ছ খ
২৮। ণ্ডল সং উয্যলিকা গ্রামে গুবাকাদি সমেত সপাদনব দ্রোণাধি
২৯। ক পাটক ভূমৌ সমুপ গতাশেষ রাজরাজন্যক রাজ্ঞী রাণক রা
৩০। জপুত্র রাজামাত্য পুরোহিত পীঠিকাবিত্ত মহাধর্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধি বি
৩১। গ্রহিক মহাসেনাপতি মহামুদ্রাধিকৃত অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক মহাক্ষপ
৩২। টলিক মহাপ্রতিহার মহাভোগিক মহাব্যূহপতি মহাপীলুপতি মহাগ
৩৩। ণস্থ দৌস্সাধিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবলহস্ত্যশ্ব গোমহিষাজাবিকাদি
৩৪। ব্যাপৃতক গৌল্মিক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক বিষয় পত্যাদীন্ অন্যাংশ্ চ সক
৩৫। ল রাজ পাদোপ জীবিনোধ্যক্ষ প্রচারোক্তান ইহা কীর্তিতান্ চট্টভট্ট জাতী
৩৬। য়ান্ জনপদান ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হম্মানয়তি
৩৭। বোধয়তি সমাদিশতি চ মহমস্তুভ (ব) তান্। যর্থোপরিলিখিতা ভূমিরিয়ম্ স্ব
৩৮। সীমাবচ্ছিন্না তৃণ পূতি গোচর পর্যন্তা সতলা সো দ্দেশা সাম্রপনসা স
৩৯। গুবাক নালিকেরা সলবণা সজলস্থ (লা) সগর্তোষরা সহ্য দশাপরাধা পরি
৪০। হৃত সর্বপীড়া অচাডভড প্রবেশা অকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যা সমস্ত রাজভোগক
৪১। র হিরণ্য প্রত্যায় সহিতা সাবর্ন্ন সগোত্রায় ভৃগু চ্যবন আপ্নবান ঔ
৪২। র্ব্ব জমদগ্নি প্রবরায় বাজসনেয় চরণায় যজুর্ব্বেদ কম্ব শাখাধ্যায়ি
৪৩। নে মধ্যদেশ বিনির্গত উত্তর রাঢ়ায়াং সিদ্ধল গ্রামীয় পীতাম্বর দেব
৪৪। শর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় জগন্নাথ দেব শর্ম্মণঃ পৌত্রায় বিশ্বরূপ দেব শর্ম্ম
৪৫। ণঃ পুত্রায় শান্ত্যাগারাধিকৃত শ্রীরাম দেব শর্ম্মণে শ্রীমতা ভোজ
৪৬। বর্ম্মদেবেন পুণ্যে অহনি বিধিবদুক পূর্ব্বকং কৃত্বা ভগবন্তং বাসুদেব ভ
৪৭। ট্টাবক মুদ্দিশ্য মাতা পিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্য যশোভি বৃদ্ধয়ে আচন্দ্রার্কং ক্ষি
৪৮। তি সমকালং যাবদ্ভূমি চ্ছিদ্রন্যায়েন শ্রীবিষ্ণু চক্রমুদ্রয়া তাম্রশা
৪৯। সনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ।। ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ।।
৫০। স্বদত্তাম্পরদত্তা ম্বা যো হরেত বসুন্ধরাম সবিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ প চ্যতে।।
৫১। শ্রীমদ্ভোজ দেব পাদীর সম্বৎ ৫ শ্রাবণ দিনে ১৯ নি অনুমহাক্ষনি।[১]

শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় ঢাকার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন আবশ্যক বোধে এই স্থলে উদ্ধৃত হইল।

ওঁ সিদ্ধি। স্বর্গবাসী দেবগণের মধ্যে অত্রিমুনি স্বয়ম্ভুর অপত্য ছিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে তেজঃ সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে চন্দ্রমা জন্মগ্রহণ করেন। (১—২)

তাহা (চন্দ্রমা) হইতে রৌহিণের বুধ এবং বুধ হইতে ইলার পুত্র পুরূরবা জন্মগ্রহণ করিয়া কীর্তি এবং উর্বশী এবং বসুন্ধরা কর্তৃক স্বয়ংবৃত হইয়াছিলেন। (২—৩)

সেই মনুপ্রতিম (পুরূরবা) আয়ুর জন্মদান করিয়াছিলেন। রাজা আয়ু হইতে ভূপাল নহুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নহুষ হইতে মহারাজ যযাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও যদুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা হইতে যে রাজবংশ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল তাহাতে বীরশ্রী এবং হরি বহুবার প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃষ্ট হইয়াছিলেন। (৩—৫)

এই বংশে, পূজ্য-পুরুষ, অংশাবতার, মহাভারতের সূত্রধার গোপীশতকেশীকার শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভাব হইয়া পৃথিবীর ভার উদ্ধার করিয়াছিলেন। (৫—৭)

ত্রয়ী (বেদবিদ্যা) পুরুষের আবরণ। তাহার (বেদবিদ্যার) অভাব ছিল না বলিয়াই অনগ্না,

ত্রয়ী বিদ্যার এবং অদ্ভুত সমর ক্রীড়ায় আনন্দহেতু রোমোদ্‌গম দ্বারা বর্ম্মিণঃ হরির বান্ধব সমূহ "বর্ম্মন" এই গভীর নাম এবং শ্লাঘ্য বাহুযুগল ধারণ করিয়া সিংহ বিবরতুল্য সিংহপুর নামক স্থানে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। (৭—৯)

অনন্তর কোনও সময় বজ্রবর্মা যাদবীয় সৈন্যের মঙ্গলময় এবং অপ্রতিহত বিজয়শ্রীর হেতুভূত হইয়াছিলেন। তিনি অরিকুলের শমন, বান্ধবগণের চন্দ্র, কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি এবং পণ্ডিতগণের মধ্যে পণ্ডিত ছিলেন। (১০—১১)

শান্তনু হইতে যেমন গাঙ্গেয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রজবর্মা হইতেও জাত্রবর্মা জন্মগ্রহণ করেন। দয়াই তাঁহার ব্রত এবং যুদ্ধই তাঁহার ক্রীড়া এবং ত্যাগই তাঁহার মহোৎসব ছিল। (১১—১৩)

তিনি বৈণ্য পৃথুশ্রীকে ধারণ করিয়া কর্ণের (কন্যা) বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া, * * * কামরূপ শ্রীকে পরাভব করিয়া দিব্যের ভূজশ্রীকে নিন্দা করিয়া, গোবর্ধনের শ্রীকে বিফল করিয়া, শ্রীকে শ্রোত্রীয় সাৎ করিয়া, সার্বভৌম শ্রী বিস্তৃত করিয়াছিলেন। (১৩—১৫)

জগতে প্রথম মঙ্গল নামধারী শ্রীমান সামল বর্ম দেব বীরশ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কি আর বলিব? (যেমন) সেই অখিলভূপগুণোপন্ন আমার প্রভুতে কিয়ৎ পরিমাণেও দোষ স্পর্শ করে নাই। (১৫—১৭)

সেইরূপ প্রভৃত প্রতাপশালী বীরগণ মধ্যেও উদীয়সূনু বীরসমাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রহাস নামক খড়্গ ফলকে স্বীয় মুখ প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইতেন। (১৭—১৮)

সেই জগদ্বিজয় মল্লের মালব্য দেবী নাম্নী কামদেবের বৈজয়ন্তী রূপিণী, ত্রৈলোক্যসুন্দরী এক কন্যা ছিল। (১৮—১৯)

অশেষ ভূপাল-কন্যাগণ কর্তৃক রাজান্তঃপুর পূর্ণ থাকিলেও তিনিই (মালব্যদেবী) সামল বর্মার অগ্রমহিষী ছিলেন। (১৯—২০)

উভয়কুল-প্রদীপ শ্রীভোজবর্মা নামে তাহাদের পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রকার অবস্থাতেই উপযুক্ত পাত্রে স্নেহের লোপ করিতেন না; অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া দিতেন। (২০—২১)

হা ধিক। কষ্টের বিষয়, অদ্য ভুবন বীরশূন্য হইয়াছে। তবে কি আবার রাক্ষসগণের উৎপাত উপস্থিত? এখন ভুবন অলঙ্কাধিপ অর্থাৎ রাবণ শূন্য বা শত্রুশূন্য। (এই রাজাভোজ) কুশীল হউন। এইরূপে বাগ্‌ব্রহ্মানন্দ মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া গুণগাথা সমূহে পুরুষোত্তম যাহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন ঃ

শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার (রাজধানী) হইতে মহারাজাধিরাজ শ্রীসামলবর্মদেব পাদানুধ্যাত পরমবৈষ্ণব, পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ সেই শ্রীমদ্‌ভোজ শ্রীপুণ্ড্রভুক্তির অন্তঃপাতি অধঃপত্তন মণ্ডলে, কৌশাম্বী অষ্টগচ্ছ খণ্ডল উষ্যলিকা গ্রামে, গুবাকাদি সমেত সপাদ নবদ্রোণাধিকপাটক ভূমিতে (এক পাটক সোয়া নয় দ্রোণ পরিমিত) সমুপগত সমুদয় রাজা, রাজন্যক, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, পুরোহিত, পীঠিকাবিত্ত, মহাধর্মাধ্যক্ষ, মহাসান্ধি, বিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত, অন্তরঙ্গ-বৃহদুপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতিহার, মহাভোগিক, মহাব্যুহপতি, মহাপীলুপতি, মহাগণস্থ, দৌঃ সাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, নৌবলব্যাপৃতক. হস্তিব্যাপৃতক, অশ্বব্যাপতৃক, মহিষ ব্যাপৃতক, অজব্যাপৃতক, অবিকাদি ব্যাপৃতক, গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডনায়ক, বিষয়পতি, প্রভৃতি এবং অধ্যক্ষ প্রচারোক্ত কিন্তু অকথিত অন্যান্য রাজাপাদোপজীবীদিগকে চট্টভট্ট জাতীয় জনপদবাসীগণকে, ক্ষেত্রকর ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণোত্তমগণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, বিজ্ঞাপন

করিতেছেন, এবং আজ্ঞা করিতেছেন,—সকলের অভিমত হউক, স্বসীমাবচ্ছিন্ন তৃণ পূতি গোচর পর্যন্ত সতল, সোদ্দেশ, আম্র, পনস, গুবাক, নারিকেল বৃক্ষ সমেত সোদ্দেশ, আম্র, পনস, গুবাক, নারিকেল বৃক্ষ সমেত সলবণা সজলস্থলা, সগর্ত্তোসরা, যাহার (যে ভূমি সম্বন্ধে প্রতিগৃহীতার)। দশটি অপরাধ সহ্য হইবে, সর্বপ্রকার উৎপীড়ন রহিত, চাট, ভাট জাতীয় প্রবেশাধিকার বিরহিত, যাহা হইতে কোনও প্রকার করাদি গৃহীত হইবে না, রাজভোগ্যকর ও হিরণ্যপ্রত্যয় সহিত, উপরিলিখিথ ভূমি সাবর্ণ্য গোত্রীয়, ভৃগুচ্যবন আপ্নবান, ঔর্ব, জমদগ্ন প্রবর রাজসনের চরণোক্ত যজুর্ব্বেদের কন্বশাখাধ্যায়, মধ্যদেশ হইতে বিনির্গত উত্তর রাঢ়ায় অবস্থিত সিদ্ধল গ্রামবাসী পীতাম্বর দেবশর্মার প্রপৌত্র জগন্নাথ দেবশর্মার পৌত্র, বিশ্বরূপ দেবশর্মার পুত্র, শান্ত্যাগারাধিকৃত শ্রীরাম দেব শর্মাকে এই পুণ্য দিনে বিধিবৎ উদকস্পর্শ পূর্বক ভগবান বাসুদেব ভট্টারককে উদ্দেশ্য করিয়া মাতা পিতা ও স্বীয় পুণ্য ও যশ বৃদ্ধির জন্য, চন্দ্র সূর্য ক্ষিতি সমকাল পর্যন্ত ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ানুসারে শ্রীমদ্বিষ্ণুচক্র মুদ্রাদ্বারা তাম্রশাসন করিয়া আমি শ্রীভোজবর্মদেব প্রদান করিলাম। এতদ্বিষয়ে ধর্মানুশাসনের শ্লোক আছে ঃ স্বদত্তই হউক বা পরদত্তই হউক যিনি ভূমি হরণ করিবেন তিনি বিষ্ঠার কৃমি হইয়া পিতৃগণ সহ পচিতে থাকিবেন। শ্রীমদ্ভোজবর্মদেব পাদীয় সংবৎ ৫, শ্রাবণ ১৯ দিনে ৫৮ নি (বদ্ধ) অনু। মহাক্ষ (পটলিক) নি [বদ্ধ]।

---

১. কেহ কেহ এই শ্লোকের ভিন্নার্থ করিয়া থাকেন ঃ—"বেদ মনুষ্যের বস্ত্র স্বরূপ ; যাহারা বেদ মানে না তাহারা নগ্ন অথবা যথেচ্ছাচারী। কৃষ্ণের পরবর্তী যাদবেরা তেমন ছিলেন না ; যখন নগ্ন বৌদ্ধমত প্রবল হইয়া ত্রয়ীর নিন্দা চতুর্দিক হইতে প্রচার পূর্বক এতদ্দেশ আক্রমণ করে, তৎকালীন যাদবেরা গম্ভীরভাব গ্রহণে অটল ছিলেন। ত্রয়ীর প্রতি আস্থা জনিত রসে তাঁহাদের এমন তীব্র রোমাঞ্চ ঘটিয়াছিল তাহা যেন শরীরের বর্ম ভেদ করিয়া বহির্দেশে ফুটিয়া উঠিত। সেই ধর্মমন্দিরে তাঁহারাই শ্লাঘ্যবাহ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিষ্ঠিত সিংহপুর আস্তিকতার স্বাপক্ষে দুর্ভেদ্য দুর্গ স্বরূপ হইয়াছিল। সেই আস্তিকদিগের কুলে এই তাম্রশাসন-কর্তার প্রপিতামহের জন্ম সুতরাং এই রাজবংশ অন্যান্য বৌদ্ধদিগের ন্যায় নাস্তিক নহে।" ঢাকা প্রকাশ।

পরিশিষ্ট ৩



শ্রীচন্দ্রদেবের কেদারপুরের তাম্রশাসন[১]

বঙ্গদেশস্থ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ইদিলপুর প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রদেবের একখানি তাম্রশাসন সম্বন্ধে স্বর্গীয় মনীষী গঙ্গামোহন লস্কর, এম-এ প্রদত্ত এক বিবরণ জে. টি. রেঙ্কিন, আই-সি-এস্ মহোদয় ঢাকা রিভিউ পত্রিকার ১৯১২ সনের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশ করেন। প্রায় দশম কি একাদশ শতাব্দীতে "চন্দ্র" উপাধিধারী একটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজবংশ যে বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছেন, উক্ত পত্রে প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধ হইতেই এই বিষয় সর্বপ্রথম প্রতিপাদিত হয়। অতঃপর বঙ্গদেশের প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বিক্রমপুর চন্দ্ররাজগণের কাহিনী পৌর্বাপর্য্যক্রমে তাহাদের দেশের সহিত সংযোজিত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ঢাকা জেলার মুন্সিগঞ্জ মহকুমার অন্তঃপাতী রামপাল গ্রামে অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক দ্বিতীয় তাম্রফলক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তদ্দ্বারা এই বিষয়টি আরও প্রবলতর ভাবে সমর্থিত হইতেছে। অধ্যাপক বসাক মহাশয় উহা বাংলা "সাহিত্য" পত্রিকার বঙ্গাব্দ ১৩২০ সনের শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত করেন। পরিশেষে উহা "এপিগ্রেফিয়া ইন্ডিকার" দ্বাদশ খণ্ডের ১৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে।

বর্তমান তাম্রশাসনখানি শ্রীচন্দ্রদেবের তৃতীয় তাম্রশাসন। উহা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত কেদারপুর গ্রামে মৃত্তিকা খননকালে পাওয়া গিয়াছে। কেদারপুর মধ্য ইংরেজি স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উহা সংরক্ষিত হয়। আমি জনৈক বন্ধুর নিকট ইহা অবগত হই। ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জে. এন. রায়, আই-সি-এস ও মাদারীপুরের মহকুমা হাকিম মিঃ এন, সেন মহোদয় দ্বয়ের সৌজন্যে মাননীয় মিঃ টি, ইমারসন, সি-আই-ই, আই-সি-এস মহোদয় কর্তৃক ঢাকা যাদুঘরের জন্য উহা সংগৃহীত হয়।

এই তাম্রশাসনখানি ৮।। ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৭। ইঞ্চি প্রস্থ, বসাক মহাশয়ের তাম্রশাসনখানি ৯।। ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৮ ইঞ্চি প্রস্থ; সুতরাং ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এই তাম্রফলকের শীর্ষদেশের ঠিক মধ্যভাগে চন্দ্ররাজগণের রাজকীয় মোহর অঙ্কিত আছে। ইহার উভয় পার্শ্বে দুইটি শায়িত উন্নত-শীর্ষ মৃগ "ধর্মচক্র" সূচনা করিতেছে এবং উহা ডিয়ারপার্কের (মৃগদাব)—কাশীর অন্তর্গত বর্তমান সারনাথের—"ধর্ম চক্রের প্রথম ঘূর্ণণের" নির্দশন স্বরূপ। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে চন্দ্রদেবের পূর্ববর্তী বঙ্গের "পালবংশের" রাজগণেরও অনুরূপ মোহর ছিল, এবং এই পালরাজগণও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এই চক্রের নিম্নদেশে "শ্রীশ্রীচন্দ্রদেবের" নাম গ্রথিত আছে।

এই তাম্রশাসনখানি অসমাপ্ত এবং দেখিয়া বোধ হয় ইহার দ্বারা কোনও "দান" সম্পাদিত হয় নাই। ইহাতে কেবল দানের মঞ্জুরীকৃত অংশগুলি খোদিত হইয়া বক্রী অংশ অবস্থানুযায়ী অনুশাসন দ্বারা পূর্ণ করিবার অপেক্ষায় মুদ্রাগৃহে সংরক্ষিত হইয়াছিল। এই তাম্রফালকখানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—সেখানে প্রশস্ত পরিখা বেষ্টিত রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও বিনষ্টপ্রায়

এক বিশাল দীর্ঘিকার চিহ্ন বর্তমান। দীর্ঘিকাটি মোঘল শাসনের প্রাক্কালে যে পরাক্রান্ত দ্বাদশ ভৌমিকগণ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছেন তাহাদের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কেদাররায়ের স্মৃতির সহিত বিজড়িত। কেদাররায়ের রাজধানী শ্রীপুরে অবস্থিত ছিল। রাল্‌ফ ফিচের বর্ণনাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রীপুর একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। কেবলমাত্র কতিপয় ক্রোশ দূরে কেন যে দ্বিতীয় রাজধানী গঠিত হইয়াছিল উহার যুক্তিসিদ্ধ কারণ উপলব্ধি করা যায় না। অবশ্য কেদারপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনখানির উক্ত গ্রামে আসার বহুল প্রকার কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু এই অসমাপ্ত তাম্রশাসনের আবিষ্কারে ইহাই অনুমিত হয় যে কেদারপুরে যে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় উহা চন্দ্রবংশীয় রাজগণের এবং তাঁহারা কেদাররায়ের অনুমান ৫০০ শত বৎসর পূর্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এই তাম্রফলকের কেবল একদিক মুদ্রিত এবং নিম্নদেশে প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমিত স্থান শূন্য। ইহাতে ১৮ পংক্তি খোদিত লিপি আছে। এই অক্ষরগুলি ২৪ হইতে ৩০ ইঞ্চি উচ্চ, এবং অধিকাংশ স্থলেই সুস্পষ্টরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। অবশ্য খোদাইকার বা লেখকের ভ্রম প্রচুর পরিমাণেই পরিলক্ষিত হয় এবং তদ্দরুণ পরিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার কার্যও বিষম কষ্টকর ব্যাপারে পর্যবসিত হইয়াছে।

এই অনুশাসনে চন্দ্ররাজ বংশোদ্ভব শ্রীচন্দ্রদেবের রাজত্বের উল্লেখ আছে। উত্তরবঙ্গে পাল রাজত্বের শেষ ভাগে ও পূর্ববঙ্গে বর্মন ও সেন রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্বে ইহারা পূর্ববঙ্গে কতিপয় শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহা দশম-একাদশ শতাব্দীর বাংলা অক্ষরে খোদিত। কেবল মুদ্রাকরের ভ্রমাত্মক অংশ ব্যতীত সমুদয় উৎকীর্ণ বিবরণটি বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় ও পদ্যে লিখিত। শেষ তিন পংক্তি গদ্যে লিখিত।

বর্ণশুদ্ধি বিদ্যা সম্বন্ধে ইহাতে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। পূর্ব ভারতীয় গৃহগাত্রোৎকীর্ণ লিপিতে "র" এর পরিবর্তে "ব" লেখাই একরূপ রীতি ছিল এবং আধুনিক বাংলা ভাষার ন্যায় এতদুভয়ের ব্যবহারে তখন কোনও বৈষম্য করা হইত না। "অবগ্রহ" কখনও ব্যবহৃত কখনও বা পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনুস্বার সম্বলিত "নিস্ত্রিংশ" শব্দের বর্ণবিন্যাস উল্লেখযোগ্য।´ (রেফ্) অধিকাংশ স্থলেই ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিত্ব করিয়াছে।

"ঢাকা রিভিউ"তে প্রকাশিত ইদিলপুরের শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনের সহিত বর্তমান তাম্রশাসনের তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে উভয় তাম্রফলক একই মুসাবিদার প্রতিলিপি। ইদিলপুর তাম্রশাসনের শেষ ভাগে শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসন হইতে গৃহীত একটি শ্লোক অতিরিক্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত উহার প্রতিলিপি ইদিলপুর ও কেদারপুর তাম্রশাসন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এস্থলে ইহা প্রণিধানযোগ্য যে তিনখানি তাম্রশাসনেরই আবাহন শ্লোক অভেদাত্মক।

এ পর্যন্ত যে তিনখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে উহার প্রত্যেক খানিই শ্রীচন্দ্রের নামাঙ্কিত কাজেই মনে হয় তিনিই চন্দ্রবংশের একমাত্র প্রতাপশালী রাজা যিনি তাম্রশাসন প্রদানের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার ইতিহাস সঙ্কলনের নিমিত্ত যে সমস্ত অনুলিপি উপকরণ পাওয়া যায় তাহা একত্র সংগৃহীত করিবার অভিপ্রায়ে ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত বাবু গঙ্গামোহন লস্করের ইদিলপুর অনুশাসনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে আবশ্যক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাম্রশাসনখানি এখনও বর্তমান আছে বলিয়া শোনা যায় কিন্তু উহা যাহাদের হেফাজতে আছে তাহারা পুনরায় উহা অন্য কাহাকেও দেখাইতে অনিচ্ছুক।

"অনুশাসনে তিন জন রাজার নাম খোদিত আছে—(১) সুবর্ণচন্দ্র (২) তাঁহার ছেলে ত্রৈলোক্যচন্দ্র (৩) ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র (শ্রী) চন্দ্রদেব। এই রাজাদের মধ্যে শেষোক্ত রাজা সতত পদ্মাবতী ভুক্তির অধীন কুমারতালকা মণ্ডলে অবস্থিত লেলিয়াগ্রামে কতক জমি দানের

আদেশ বিক্রমপুর ছাউনি হইতে প্রদান করেন। সতত পদ্মাবতীর আক্ষরিক অর্থ 'তীর সমাহিত পদ্মার ঘর' এবং খুব সম্ভবত পদ্মার তীরে অবস্থিত কোন ভুক্তির নাম ছিল। কোন দান গৃহীতার নাম এখনও পড়া যায়, এখন আসরাফপুর অনুশাসনের ন্যায় পরিমাপ কাঠিকে দানের ভূমির দ্রোণ এবং পাটক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সার্বভৌমিকত্ব সূচক উপাধি যথা পরমেশ্বর, পরমভট্টারক এবং মহারাজাধিরাজ (শ্রী) চন্দ্রদেবের নামের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। পরমসৌগত (সৌগত বুদ্ধের অতি ভক্ত পূজক) উপাধি দাতার নামের পূর্ব ব্যবহৃত হইয়াছে। ১২শ শতাব্দীর বাংলা অক্ষরের অনুরূপ লিপি সম্ভবত ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুশাসনের উর্ধভাগের মোহর বঙ্গদেশের পালরাজাদের অনুশাসনের মোহরের অনুকৃতি।

মুসলমান কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইবার কিছু পূর্বে বৌদ্ধ রাজত্ব যে পূর্ববঙ্গে বর্তমান ছিল আসরাফপুরের দেবখড়্গ অনুশাসনের ন্যায় বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত অনুশাসনখানি তাহার পরিচয় দেয় তজ্জন্য এই অনুশাসনখানি অতি প্রয়োজনীয়।

অনুশাসনখানি একদিকে সম্পূর্ণভাবে খোদিত বিপরীত দিকে কতকাংশ খোদিত। বিপরীত দিকের লেখা প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। লুপ্তপ্রায় অংশে দান গৃহীতার নাম ও জমির পরিচয়। সর্বসাকুল্যে ৩৬ লাইন লেখা ইহাতে আছে।

পংক্তি ১—৪ সম্ভবতঃ বুদ্ধের সম্মানের জন্য এক পংক্তি পদ্য। পংক্তি ৪—৫ সুবর্ণচন্দ্র নামে এক রাজা যাহাকে অগ্নিদ্বারা পবিত্রীকৃত কিংবা তুলাদণ্ডে ওজন করা হয় নাই যিনি প্রকৃতি কর্তৃক মহত্ব দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন যাঁহার কার্য সকল সাধু ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

পংক্তি ৫—৬ রাজাকে কেন সুবর্ণচন্দ্র বলা হইতে ইহা পদ্যে বলা হইয়াছে।

পংক্তি ৬—৯ উপরিলিখিত রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন তিনি পবিত্র দর্শন ছিলেন—তাঁহার পরলোকের ভয় ছিল—তিনি জীবজগতের সান্ত্বনা স্বরূপ ছিলেন ত্রিভুবনে তাঁহার যশস্বী কার্যাবলী সকল সর্বত্র বিদিত ছিল।

পংক্তি ৯—১০ সেই রাজা সম্বন্ধে আরও কতকগুলি শব্দ—তিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া আশা পূরণ করিয়াছিলেন এবং তাহার শত্রুদের অগ্নি নির্বাণ করিযাছিলেন।

পংক্তি ১১—১৩ ত্রৈলোক্যচন্দ্র দেব সম্বন্ধে আরও কতকগুলি প্রশংসাসূচক (শব্দ) বাক্য।

পংক্তি ১৪—১৫ উপরিউল্লিখিত রাজার (শ্রী) চন্দ্র নামে এক পুত্র ছিল। তিনি ইন্দ্রের সমতুল্য ছিলেন এবং তাঁহার বীর্য ইন্দ্রের ন্যায় ছিল এবং তিনি শুভ মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম সময়ে শুভ চিহ্ন সকল রাজৈশ্বর্য দ্যোতক ছিল।

পংক্তি ১৫—১৮ (শ্রী) চন্দ্রদেব সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশংসা বাক্য।

পংক্তি ১৮—১৯ বিক্রমপুর স্থিত বিজয়বাহিনী ছাউনি হইবে।

পংক্তি ২০ সৌগতের (বুদ্ধের) ঐকান্তিক পূজক পরমভট্টারক পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্য চন্দ্রদেবের পাদপদ্ম ধ্যানকারী পুত্র।

পংক্তি ২১ মহারাজাধিরাজ শ্রীমান শ্রীচন্দ্রদেব সুস্থ শরীরে লেলিয়া গ্রামে সমবেত নিম্নলিখিত রাজকীয় কর্মচারিবৃন্দ ও গ্রামবাসীদিগকে সম্মান করিয়া—

পংক্তি ২২ সতত পদ্মা ভুক্তিতে অবস্থিত কুমারতালকা মণ্ডলে।

পংক্তি ২৮ এইরূপে উপরিউল্লিখিত কর্মচারিবৃন্দকে আদেশ দিতেছেন।

পংক্তি ২৯—৩০ দান গৃহীতাদের নাম লেখা আছে।

বর্তমান কেদারপুর অনুশাসনের নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিচয় : বৌদ্ধমতাবলম্বীদের ত্রিরত্ন বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্গ অভিবাদন প্রণাম (নমস্কার) করিয়া অনুশাসনখানি আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পর বর্ণিত হইয়াছে পূর্ণচন্দ্র নামে একজন লোক ছিলেন—তাঁহার বহু সৈন্য সামন্ত ছিল। তিনি রাজবংশ

সম্ভূত ছিলেন না কিন্তু কোন উচ্চবর্ণে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুবর্ণচন্দ্র (স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল) পবিত্র নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। সুবর্ণচন্দ্র ধার্মিক লোক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র ছিল। ত্রৈলোক্যের দেশ জয় বহুদূর বিস্তৃত ছিল এবং তিনি তাঁহার শত্রুগণের ভীতি উৎপাদক ছিলেন (v5) ত্রৈলোক্যের পুত্র শ্রীচন্দ্র—তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। (v6) তিনি প্রসিদ্ধ বিজয়ী ছিলেন—তাঁহার যুদ্ধ খ্যাতি স্বর্গে পৌঁছিয়াছিল। (v7) এই শেষ রাজা শ্রীচন্দ্রদেব যাঁহার শ্রীবিক্রমপুরের বিজয়ী ছাউনি হইতে এই অনুশাসনখানি প্রদান করিবার কথা ছিল—এই পর্যন্ত আসিয়া অনুশাসন লিপি সমাপ্ত হইয়াছে।

ঢাকা যাদুঘরে সংরক্ষিত তাম্র-শাসনের খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার

মোহর—

শ্রীচন্দ্রদেব [ঃ]

১। সিদ্ধিরস্তু স্বস্তি। বন্দ্যো জিনঃ স ভগবান করুণৈক পাত্রং
২। ধম্মো[১]প্যসৈ[২] বিজয়তে জগদেকদীপঃ [।*] যৎসেবয়া
৩। সকল এব মহানুভাবঃ সংসার পারমুপগচ্ছতি ভিক্ষুসঙ্ঘঃ।। [১*] পূর্ণ-
৪। চন্দ্র ইতি শ্রীমানাসীন্নাসীরজং রজঃ। যস্যোষষ[৩] য়োষ[৪]ৎবৃ [৩] মাতপত্রমপত্র
৫। পাঃ[৫] [২*] নাম্নৌ বিশুদ্ধো ন তুলাধিরূঢ়ঃ কিন্তু প্রকৃত্যৈব যুতো গরিম্না। তথাপি ক-
৬। ল্যাণসুবর্ণ্ণ কল্পঃ সুবর্ণ্ণচন্দ্রস্মুকৃতী ততোভূত্।। [৩*] পুণ্যাবলোকঃ পরলো-
৭। কভীরোর্লোক্যঃ সমাশ্বাসিত জীবলোকঃ [।*] ত্রৈলোক্যসংকীর্ত্তিতপুণ্যকীর্ত্তেঃ ত্রৈ-
৮। লোক্যচন্দ্রোঽস্য ব (র) ভূব পুত্রঃ।। [৪*] চতুঃপয়োবাশি সমাপ্তপৃথ্বীজয়াভিলাষোবি-
৯। যয়েম্বলুদ্ধঃ [।*] যুদ্ধেযু নিস্ত্রিংশলতাজলেন যো বৈরিবহ্নিং স[৬] ময়াঞ্চকার।। [৫]
১০। শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্রদেবঃ সমজনি তনয়স্তস্য সদ্বর্ব্ব (র) ক্ষোঃ ক্রুরারম্ভে স[৭]য়ালুঃ
১১। পরগুণমুখরো দোষবাদৈকমূকঃ। [*] প্রেক্ষ্যঃ পীনো গুণানাং নিধিরিতি
১২। বিষয়াসক্তিপক্ষাদ্বিপক্ষে যস্মিনা (ন্না) ধত্ত বেধা[৮] শ্রিয়মতিরভসাদর্থতো না-
১৩। মতশ্চ।। [৬*] স্পৃষ্টঃ পার্থিবপাংসুদোহর সপ্তঘাঘনদিগ্নজৈ[৯] র্নৈত্রাণামনিমে-
১৪। যতঃ পরিহৃতো দূরেণ বৃন্দারকৈঃ [।*] কেশেষ্বস্পরসামপূর্ব্বপলিতাভ্রান্তিং
১৫। সমারোপয়ন্ সন্তানো রজসাং রণেসু[১০]ষু জয়িনো যস্য দ্যুমার্গং গতঃ।। [৭*]
১৬। স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাত্ পরমসৌগতো
১৭। মহারাজাধিরাজঃ শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্রদেবপাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ প—
১৮। রমভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্রদেবঃ কুশলী।

১. পাঠ—ধর্মৌ।
২. পাঠ—সৌ।
৩. পাঠ—প।
৪. পাঠ—ষি। [এই ভ্রমাত্মক পাদ যথোপযুক্তরূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই। "য" এর পর "বৃ" অক্ষরটি মুদ্রিত হয় নাই। যদিও আমি স্থিরনিশ্চয় নহি আমার মনে হয়—সম্ভবপর পাঠ এইরূপ হইবে—"যস্মা (দৃদ্বি) ২ [ঃ*] সি [বে] ধুঃ [ধ] এবং ইহার এইরূপ অনুবাদ করিতেছি ঃ "যাহার (ধুলি) ভয়ে শত্রুবর্গ (রাজন্যবর্গ) সমস্ত লজ্জা পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার ছত্রতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল।
৫. পাঠ—পং।
৬. পাঠ—শ।

৭. পাঠ—দ।

৮. পাঠ—বেধাঃ।

৯. এই পংক্তিটির এইরূপ পাঠোদ্ধার করা গেল : স্পৃষ্টঃ পার্থিবপাংশুদোহদরসম্লাঘাধনৈর্দিগজৈঃ।

১০. সু—বাদ হইবে।

অনুবাদ

১ পংক্তি। সিদ্ধি লাভ হউক। মঙ্গল হউক।

১ম শ্লোক। করুণার একমাত্র পাত্র, ভগবান জিন বন্দ্যনীয়। জগতে একমাত্র আলোক ধর্মেরই জয় হয়। ইহাদের উপাসনা করিয়া উদারচেতা ভিক্ষু সঙ্ঘ পরপারে চলিয়া যান।

২য় শ্লোক। ভাগ্যদেবীর বরপুত্র পূর্ণচন্দ্র নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার যুদ্ধ বাহিনী উত্থিত ধূলিকণায় চন্দ্রাতপের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই পূর্ণচন্দ্রকে সূর্যদেবের পত্নী সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

৩য় শ্লোক। (সুবর্ণ ও রাজার ন্যায়) অগ্নিদ্বারা শুদ্ধীকৃত অথবা তুলাদণ্ডে তৌলিত না হইয়াও প্রকৃতি দত্ত মহত্ব থাকায় তাঁহা হইতে সুবর্ণ দীপ্তি বিশিষ্ট সুবর্ণ চন্দ্রের উদ্ভব হইল।

৪র্থ শ্লোক। পরলোক, পাপভীত, ত্রিভুবনবিদিত যশস্বী সুবর্ণচন্দ্রের পুণ্যদর্শন, সুশ্রী ও মানবজাতির সান্ত্বনাদায়ক ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে এক পুত্র ছিল।

৫ম শ্লোক। বিষয়ে অনাসক্ত হইলেও চতুঃসাগর বেষ্টিত এই পৃথিবী-জয়াভিলাষী হইয়া তিনি জলদ্বারা অগ্নি নির্বাপণের ন্যায় যুদ্ধে তরবারিদ্বারা শত্রু নিপাত করিয়াছিলেন।

৬ষ্ঠ শ্লোক। সাধুজনের বন্ধু এই ত্রৈলোক্য চন্দ্রের শ্রীচন্দ্রদেব নামে মহা সৌভাগ্যশালী এক পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি সকলের প্রতি এমন কি ক্রুরকর্মাদের প্রতিও দয়ালু, পরগুণকীর্তনকারী, পরের দোষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বাক ছিলেন। তাঁহার প্রিয়দর্শন সুগঠিত দেহ সর্বগুণের আধার ছিল। জাগতিক সর্ব বিষয়ে অনাসক্ত ইহাকে সৃষ্টিকর্তা ভগবান নামে ও কার্যত "শ্রী" অর্থাৎ লক্ষ্মীযুক্ত করিয়াছিলেন।

৭ম শ্লোক। সমরজয়ী সেই নৃপতি যে ধূলিরাশি উত্থিত করিয়াছেন, দিঙ্নাগগণ সেই ধূলিপটলের সংস্পর্শলাভজনিত গর্ব অনুভব করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। দেবতাগণ দূর হইতেই সেই পাংশুজাল পরিহার করিয়াছিলেন,—কেন না, তাঁহাদের লোচন নিমেষশূন্য (সুতরাং তাঁহারা লোচন নিমীলিত করিতে অসমর্থ)। সেই রজোরাশি আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া অপ্সরোগণের কেশে সংলগ্ন হইয়াছিল এবং বার্ধক্যবশত তাঁহাদের কেশ শুভ্রবর্ণ হইয়াছে, এই অপূর্ব ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছিল।

১৬—১৮ পংক্তি : পরম সৌগত (সৌগত—সুগতের উপাসক, বৌদ্ধ) মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক (প্রজাগণের রক্ষাকর্তা), শ্রীমান্ কুশলী চন্দ্রদেব শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্র দেবের পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া থাকেন। তাঁহার সমৃদ্ধিশালী (শ্রীমৎ) রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর হইতে—

পরিশিষ্ট ৪



অরিরাজ-দনুজ-মাধব শ্রীমদ্দশরথ দেবের তাম্রশাসন

গত বৎসর ভাদ্র মাসে একদিন অপ্রত্যাশিতরূপে খবর পাইলাম যে, বিক্রমপুরে আদাবাড়ি গ্রামে একখানা তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। কাল-বিলম্ব না করিয়া তথায় চলিয়া গেলাম; এবং উহা ঢাকা মিউজিয়মের জন্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিলাম। তাম্রশাসনখানির তামা বোধ হয় খুব ভাল ছিল না, উভয় পৃষ্ঠেই এমন গভীর ভাবে সবুজ বর্ণের ঝঙ্কার পড়িয়াছিল যে, একটি অক্ষরও পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল না। লেখার ছন্দ দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল, উহার বয়স খুব বেশি নহে, ১১শ—১২শ শতাব্দী অপেক্ষা পুরাতন নিশ্চয়ই নহে। তাম্রশাসনের উপরে রাজকীয় মুদ্রা সংযুক্ত থাকে, ইহা সকলেই জানেন। পূর্ববঙ্গের এই পর্যন্ত চারিটি বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই লাঞ্ছন ভিন্ন ভিন্ন। কান্তিদেবের বংশের লাঞ্ছন সর্পবেষ্টিত নরসিংহ মূর্তি। চন্দ্রদের লাঞ্ছন ধর্মচক্র, দুই দিকে দুই মৃগ, অর্থাৎ মৃগদাববিহারে বুদ্ধদেবের ধর্মচক্র প্রবর্তন। বর্মদের লাঞ্ছন বিষ্ণুচক্র। সেনদের লাঞ্ছন দ্বাদশ-হস্ত-বিশিষ্ট যোগাসনস্থ সদাশিবমূর্তি। এই শাসনখানায় কিন্তু চারি-হস্ত-বিশিষ্ট যোগাসনস্থ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ মূর্তি লাঞ্ছনরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। তাম্রশাসনখানা আনিতে নৌকায় গিয়াছিলাম, নৌকায় বসিয়াই পাঠ করিলাম, রাজার নামের আগে বিশেষণ আছে—অন্বয়-কমল-বিকাশ-ভাস্কর-সোম-বংশ-প্রদীপ-প্রতিপন্নকর্ণ সত্যব্রত-গাঙ্গেয় ইত্যাদি। এই বিশেষণগুলি লক্ষ্মণসেনের পুত্রগণের তাম্রশাসনে রাজার প্রতি প্রযুক্ত সুপরিচিত বিশেষণ। ভাবিলাম, লক্ষ্মণসেনের ছেলেদেরই কাহারও তাম্রশাসন আবিষ্কার করিয়াছি। কিন্তু লাঞ্ছনের পরিবর্তনের হেতু বুঝিলাম না। লক্ষ্মণসেন বৈষ্ণব হইয়াছিলেন বলিয়া কি তাঁহার পুত্রগণ পারিবারিক লাঞ্ছন সদাশিবমূর্তি বদলাইয়া নারায়ণ-মূর্তি করিয়া লইয়াছিলেন? এ রকম কোনও প্রাচীন রাজবংশ করিয়াছে বলিয়া তো কখনও শুনিয়াছি, মনে পড়ে না! অথবা, নূতন রাজবংশের তাম্রশাসনই বা আবিষ্কার করিলাম! মনে মনে একটু শঙ্কিতও হইলাম। অমনি তো পূর্ববঙ্গের ইতিহাসে শ'-শোয়াশ' বছরের মধ্যে চারিটি রাজবংশের প্রাদুর্ভাব আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহারাই ঠেসাঠেসি করিয়া দাঁড়াইবার জায়গা পায় না; আবার আর একটি!

তাম্রশাসন ঢাকায় লইয়া আসিলাম। ঢাকার প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। ভোর হইতে না হইতেই মধুলুব্ধ ভৃঙ্গের মত বিক্রমপুর-মুন্সিগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশনের ইতিহাস-শাখার সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আসিয়া জুটিলেন। তার পরে দু'জনে চক্, জল ও নেকড়া লইয়া ঘষি আর মুছি, মুছি আর ঘষি। কিন্তু অকরুণ বিধাতা ছয় সাত শত বৎসর ধরিয়া সযত্নে তাম্রশাসনখানার উপরে এমনি অস্বচ্ছ সবুজ রং ফলাইয়াছেন যে, চক ঘষিয়া ঘষিয়া হাতের নখ ক্ষয় হইয়া যাইতে লাগিল, সভাপতি মহাশয়ের আঙ্গুল ক্ষয় হইয়া রক্ত বাহির হইল, নাকে, মুখে, গোফে, দাড়িতে খড়ি মাটির রং ধরিতে লাগিল। তবু রাজার নাম এবং বংশ পরিচয় আর কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে না! "দেবান্বয়-কমল-বিকাশ-ভাস্কর" না "সেনান্বয়-কমল-বিকাশ-

ভাস্কর"? অনেক বিবেচনার পরে ঠিক হইল, উহা 'দেবান্বয়'ই হইবে। যাক্, বাঁচা গেল, তাম্রশাসন সেন বংশের নহে, নূতন এক দেববংশের। তার পরে রাজার নাম। অনেক বিচারের পরে স্থির হইল, নাম যাহাই হউক, উহার শেষে 'রথ' শব্দটা আছে। কোন্ রথ? ভূতিরথ? ভগীরথ? ভৃঙ্গরথ? ভৃশরথ? কোনটাই নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা চলে না, অথচ রথীর সংখ্যাও নিঃশেষ হইতে চলিল। অবশেষে দেখা গেল যে, খুব পরিচিত এক রথকে ছাড়িয়া কুটিল কুপথ ধরিয়া ভ্রমণ করিতেছি। ইনি হচ্ছেন আমাদের রামলক্ষ্মণের পিতা সুপরিচিত দশরথ! তখন দেখা গেল যে, রাজার নামটি সত্যই দশরথ। খণ্ড খণ্ড পাঠ যোজনা করিয়া নিম্নলিখিত অখণ্ড পাঠ খাড়া হইল :

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠা)

(৩য় পংক্তি) ....ইহ খলু বিক্রমপুর সমাবাসিত

(৪র্থ ") শ্রীমত্ বিজয়স্কন্ধাবারাত্ শ্রীমন্নারায়ণচরণ কৃপাপ্রসাদসমাদাদিতগৌড়[১] রাজ্যঃ অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজত্র

(৫ম ") য়াধিপতি দেবান্বয়-কমল-বিকাশ-ভাস্কর-সোমবংশপ্রদী[প]—প্রতিপন্ন কন্ন সত্যব্রতগাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমে

(৬ষ্ঠ ") শ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীমদ্দশরথদেবপাদা বিজয়িনঃ

সকলেই বোধ হয় জানেন যে, ১০ম—১২শ শতাব্দীর তাম্রশাসনগুলি প্রায় সমস্তই রাজাকর্তৃক ব্রহ্মোত্তর দানের দলিল,—তামার পাতে লোহার কলমে লেখা। এইগুলিতে প্রথমে থাকে রাজার বংশানুকীর্তন, পরে 'ইহ খলু' ইত্যাদি ধরিয়া আরম্ভ করিয়া রাজা ও রাজধানীর নাম। পরে প্রদত্ত ভূমি ও দান-গ্রহীতার বংশপরিচয়। ভবিষ্য নরপতিগণ যেন এই দান নষ্ট না করেন, এই অর্থের কয়েকটি অনুরোধ ও অভিশাপাত্মক শ্লোকে শাসনলিপির সমাপ্তি হয়। নূতন তাম্রশাসন পাইলেই রাজার নাম ও রাজধানী জানিবার জন্য আমরা সর্বাগ্রে 'ইহ খলু' ইত্যাদি খুঁজি। এই শাসনের 'ইহ খলু' ইত্যাদি পাঠ করিয়া রাজার নাম ও রাজবংশের নাম উদ্ধার করিয়া যখন দেখিলাম যে, এই শাসন বিক্রমপুর রাজধানী হইতেই প্রদত্ত হইয়াছে, তখন সন্দেহমাত্র রহিল না যে, বিক্রমপুরের নূতন এক রাজবংশের আবিষ্কার করিয়াছি।

দ্বিগুণ উৎসাহে তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলাম। দুই ধারই এমন ক্ষরিয়া গিয়াছে যে, স্পষ্ট থাকিলে যে লিপিখানা প্রেমলিপির মত অনায়াসে পাঠ করা যাইত তাহার এক এক লাইন পড়িতে চারি-পাঁচ ঘণ্টার দারুণ পরিশ্রম ও অভিনিবেশ দরকার হইতে লাগিল। প্রায় মাসেকের চেষ্টায় গদ্যাংশের পাঠের একরকম উদ্ধার হইল ; পদ্যাংশে কিন্তু বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক বৈজ্ঞানিকপ্রবর শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাম্রশাসন খানা অনেকটা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মাসেকের চেষ্টার পরে চোখের অবস্থা এমন হইল যে, তখনকার জন্য তাম্রশাসনখানা রাখিয়া দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর রহিল না।

তাম্রলিপিখানি, উপরে রাজমুদ্রার জন্য বর্ধিত অংশটুকু বাদ দিলে, দৈর্ঘ্যে পৌনে নয় ইঞ্চি এবং প্রস্থে পৌনে বার ইঞ্চি। উহাতে প্রথম পৃষ্ঠে ২৬ পংক্তি, এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ২৯ পংক্তি, এই মোট ৫৫ পংক্তি লেখা আছে। উহা রাজার রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে কার্তিক মাসের ২১ তারিখে প্রদত্ত। প্রদত্ত ভূমির সঠিক বিবরণ এখনও বুঝিতে পারি নাই, তবে উহা অন্তর্বাটি, বান্দিখাণ্ডা, নবসংখহ, বীষয়িপাড়া ইত্যাদি গ্রামে অবস্থিত ছিল। অন্তর্বাটি বোধ হয় আদাবাড়িরই পুরাতন নাম। বান্দিখাণ্ডা পরিষ্কারই বর্তমান বাইনখাড়া। বর্তমানে বাইনখাড়া প্রকাণ্ড মৌজা, আদাবাড়ি উহারই অন্তর্গত নাতিবৃহৎ পাড়া। প্রদত্ত ভূমির চারিদিকের

গ্রামগুলির নাম চৌহদ্দিনির্ণয়কালে উল্লিখিত হইয়াছে। উত্তরে নয়নাব ও মূলদাব,—বর্তমান নয়না ও মালদা। দক্ষিণে বড়াইলা ও ভাঙ্গনিয়া, আজিও এই নামেই পরিচিত। পশ্চিমে গণাগ্রাম ও মান্তহটা। গণাগ্রাম বর্তমানে গণাইসার বলিয়া পরিচিত। মান্তহটা বর্তমানে কোন গ্রামের নাম তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। নামটি ঠিক পড়িয়াছি কি না, সে বিষয়েও নিশ্চিত নহি। পূর্বসীমায় কি কি গ্রামের উল্লেখ আছে, তাহাও ঠিক করিতে পারিলাম না।

প্রদত্ত ভূমির আয় বোধ হয় প্রতি বৎসর পঞ্চশত পুরাণ, বর্তমানের প্রায় আড়াই শত টাকার সমান। এই আয়ের ভূমি অনেকগুলি ব্রাহ্মণকে গাঞি উল্লেখ করিয়া ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা—

সন্ধ্যাকর	৭৫
ভরদ্বাজ গোত্রীয় দিণ্ডী গাঞি শ্রীমাত্রী	৪৫
... শ্রীশক্র	৮৫
পালী গাঞি শ্রীসুগন্ধ	২৭
সেউ গাঞি শ্রীসোম	৩০
পালি গাঞি শ্রীবাদ্য	৩০
মাসচটক শ্রীপণ্ডিত	৫০
মূল শ্রীমাণ্ডি	৫০
দিণ্ডী শ্রীরাম	২৫
সেহণ্ডায়ী শ্রীলেভূ	২৫
পূতি শ্রীদক্ষ	৭
সেউ শ্রীভট্ট	২৪
মহান্তিয়াড়া শ্রীবালি	২৫
করঞ্জ গ্রামী শ্রীবাসুদেব	৫
মাসচড়ক[২] শ্রীমিকো	৫

উপরের তালিকা হইতেই ইতিহাসবেত্তাগণ বুঝিতে পারিতেছেন, দেশের ইতিহাসে এবং রাঢ়ী বাহ্মণগণের সামাজিক ইতিহাসে এই তাম্রলিপিখানার গুরুত্ব কত দূর। গাঞি ও নাম দুই চারিটি পড়িতে পারি নাই, তবু রাঢ়ী শ্রেণির ৫৬ গাঞির মধ্যে এই শাসনে আপতত নয়টি গাঞির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

দশরথ দেবের সময় নির্ধারণ করা বিশেষ কঠিন নহে। তিনি বিশ্বরূপ ও কেশবসেনের তাম্রশাসনের পাঠ হুবহু নকল করিয়াছেন, তাম্রশাসন প্রচারের যেন অচিরকাল পূর্বে নারায়ণের প্রসাদে গৌড়রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ বুঝা যাইতেছে। সহজেই বুঝা যায়, তিনি সেনদের পতনের পরে বিক্রমপুরে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তবকৎ-ই-নাসিরি মতে ১২৫৯ খ্রিস্টাব্দেও (৬৫৮ হিঃ) (Raverty, P. 558) পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। কাজেই আপাতত ধরিয়া লওয়া যায়, দশরথদেব ১২৬০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে নারায়ণ-চরণ-কৃপা-প্রসাদে বিক্রমপুরে রাজা হইয়াছিলেন। ইহার পরে কুলগ্রন্থে যখন প্রাচীন কুলাচার্য হরিমিশ্রের উক্তি দেখি—

প্রাদুরভবৎ ধর্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্।
দনৌজা মাধবঃ সর্ব্ব ভূপৈঃ সেব্য পদাম্বুজম্।।

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা)

তখন সন্দেহ মাত্র থাকে না যে, অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীমদ্দশরথদেবের প্রসঙ্গই হইতেছে।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই দনুজমাধবকে সেন বংশজ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 'সেনবংশাদন্তরম্' কথাটিতে "সেনবংশলুপ্ত হইলে তাহার পরে" এই অর্থও বুঝাইতে পারে। তাম্রশাসনের প্রমাণে দেখা যাইতেছে, ইহাই প্রকৃত অর্থ। তিনি স্পষ্টই দেববংশজ, সেনবংশজ নহেন।

রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের সামাজিক ইতিহাসে এই দনুজমাধব বিশেষ বিখ্যাত রাজা। সেনদের পতনের পরে তিনিই রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের আশ্রয়স্থল হইয়াছিলেন। রাঢ়ীয় কুলীন সমাজে সমীকরণ অর্থাৎ পদমর্যাদায় কে কাহার সমান তাহার নির্ধারণ একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। রাঢ়ীয়দের কুলগ্রন্থে এইরূপ ১১৭টি সমীকরণের বিবরণ নামাদি সহ লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম সমীকরণ বল্লালসেনের সভায় হয়। দ্বিতীয় সমীকরণ লক্ষ্মণসেনের সভায় হয়। লক্ষ্মণ সেনের সভায় যাহাদের পদমর্যাদা সমান বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছিল, তাহাদের কাহারও কাহারও পুত্রের নাম দনুজমাধবের রাজসভায় তৃতীয় সমীকরণের তালিকায় দেখি। দনুজমাধব যে লক্ষ্মণসেনের বড় বেশি পরবর্তী নহেন, ইহা হইতেও তাহা বুঝা যায়। এই দনুজমাধবের সভায় রাঢ়ীয় কুলীনগণের চারিবার সমীকরণ হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায়, মহারাজ দনুজমাধব দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সম্রাট গিয়াসুদ্দীন বলবন যখন তুঘ্রিলের বিদ্রোহ দমনের জন্য ১২৮৩ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গে আসেন, তখন জলপথে তুঘ্রিলের পলায়ন রোধ করিবার ভার লইয়াছিলেন সোনারগাঁর রাজা দনুজ রায়। অর্থাৎ ইনি ঢাকা, নোয়াখালি, ফরিদপুর, বরিশাল জেলার মধ্যবর্তী জলপথগুলির প্রভু ছিলেন। অরিরাজ-দনুজ-মাধব দশরথ এবং এই তুঘ্রিলের জলপথে পলায়ন রোধকারী দনুজ রায় যে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি এমন অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

১২৮৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১২৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে সুলতান বলবনের পুত্র নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশ মুসলমান শাসনে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা আরব্ধ হয়। ১২৯১ খ্রিস্টাব্দে নাসিরুদ্দিনের পুত্র রুক্নুদ্দিন কৈকায়ুস্ লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে আরোহন করেন। কৈকায়ুসের রাজত্বকালেই বোধহয় পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়; কারণ কৈকায়ুসের একটি মুদ্রায় প্রথম বঙ্গের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই হিসাবে দেখা যায়, অরিরাজ-দনুজ-মাধব শ্রীমদ্দশরথ দেব আনুমানিক ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সমগ্র বঙ্গদেশ ও শ্রীহট্ট যে মুসলমান শাসনের অধীনে আসিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। কৈকায়ুসের ভ্রাতা শামসুদ্দিন ফিরোজ লক্ষ্মণাবতী সিংহাসনে ১৩০১ হইতে ১৩২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারই রাজত্বকালে ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীহট্ট বিজিত হয়। শামসুদ্দিন ফিরোজের ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে সুবর্ণগ্রামে মুদ্রিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

কৃত্তিবাসরে যে আত্মবিবরণী পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে :

পূর্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজ।
তার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা।।
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলাঃ গঙ্গাতীর।।

(বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা)

এই বেদানুজ (যে দনুজ?) রাজা অরিরাজ-দনুজ-মাধব শ্রীমদ্দশরথ দেব বলিয়াই বোধ হইতেছে এবং যে প্রমাদে তাঁহার পাত্র নৃসিংহ ওঝা বঙ্গদেশ ছাড়িয়া গঙ্গীতারে ফুলিয়া গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কৈকায়ুসের আক্রমণে দনুজমাধবের রাজ্যনাশ

বলিয়াই বোধ হয়।

তাম্রশাসনখানার প্রথম পৃষ্ঠায় দনুজমাধবের বংশপরিচয় রাজত্ব-প্রাপ্তির বিবরণ, সেন বংশের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ইত্যাদি লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া বোধ হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ধার এমনি ক্ষয়িয়া গিয়াছে যে, এখন পর্যন্ত উহার এক রকম কিছুই পড়া যায় নাই।—এই অংশের পাঠোদ্ধার করিয়া যখন উঠিব, তখন আশা করি, বাংলার সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে এবং অন্ধকারময় ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নূতন কথাই বলিতে পারা যাইবে।

আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক-ইতিহাসকারগণ কুলগ্রন্থের উপর খড়্গহস্ত। কিন্তু কুলশাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সমসাময়িক লিপি দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। আমাদের দেশের মত ইতিহাসহীন দেশে ইতিহাসের অমূল্য উপাদানের আধার এই কুলশাস্ত্রগুলি, আমার মতে, ব্যক্তিবিশেষের অপরাধে অযথা উপেক্ষিত ও উপহসিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকগণের পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তি যদি কুলশাস্ত্রধর্ষণে নিযুক্ত না হইয়া কুলশাস্ত্রগুলির বিশ্বাসযোগ্য সংস্করণ-সম্পাদনে ব্যয়িত হইত, তবে এত দিনে এই উপেক্ষিত কীটদষ্ট পুঁথিগুলি দেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের কাজকে অনেকখানি অগ্রসর করিয়া দিত, সন্দেহ নাই।[৩]

১. রাজ্যটির নাম যে, 'গৌড়' রাজ্য, এই দুই-অক্ষরনিবদ্ধ তথ্যটি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালগোবিন্দ বসাক উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনিও যে মধ্যে মধ্যে আসিয়া চক্ খসিয়া নখ ক্ষয় করিয়া গিয়াছেন, বলাই বাহুল্য।

২. মাসচটক এবং মাসচড়ক এই দুই বানানই দুই স্থানে আছে।

৩. আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ মহোদয়ের নিকট একদিন ঢাকা মিউজিয়ম লাইব্রেরিতে "বর্ম-বংশ তাম্রশাসন" প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি আমাকে ৩ খানা তাম্রশাসন দেখাইয়া অরিরাজ দনুজ মাধবভীমদ্দশরথ দেবের তাম্রশাসন খানা দেখাইয়া বিক্রমপুর ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। মনস্বীর ঔদার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া আজও অধ্যাপক মহাশয়ের আদেশ অনুসারে (পৌষ ১৩৩২) ভারতবর্ষ হইতে অরিরাজ দনুজ মাধবভীমদ্দশরথ দেবের তাম্রশাসনের সমস্ত অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

বিক্রমপুরের মেয়েলি ব্রতকথা

বিক্রমপুরের মেয়েলি ব্রতকথা

শ্রীমতী হিরণবালা দেবী
কর্ত্তৃক সংগৃহীত

প্রথম সংস্করণ।

প্রকাশক
বীণা পাব্লিশিং হাউস।
বীণা প্রেস, ঢাকা।

১৩৩২ সন।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা

ভূমিকা

ব্রতকথা হিন্দুকুললক্ষ্মীর দৈনন্দিন জীবনের সহচর। গুরুজনে ভক্তি, ধর্মে, বিশ্বাস, গৃহধর্মে আস্থা, ইন্দ্রিয় সংযম প্রভৃতি শিক্ষার সোপান। প্রাচীনকালে মহিলারা স্মৃতির সাহায্যেই বিশ্বাস ও ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে ব্রত নিয়মাদি দ্বারা নীতি ও সদাচার পালন করিতেন। স্বামী, পুত্র, কন্যা ও পরিবারবর্গের কুশলার্থে তাহারা বারমাসেই কোন না কোন ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন।

প্রাচীনকালের যে ব্রত-মঙ্গল একদিন গৃহস্থের গৃহ-প্রাঙ্গন চন্দন-ধূপ-গুগ্‌গুলের পবিত্র গন্ধ বিতরণ করিয়া স্বাস্থ্য ও আনন্দ দান করিত, অধুনা তাহাই নব্যা মহিলাগণ ধীরে ধীরে ভুলিয়া যাইতেছেন।

সেকালের সেই নৈতিক নিয়ম-নিষ্ঠা তেমন আর নাই, সেই ধান্য-দুর্বা-তেল-সিন্দুর, দেবতার প্রসাদ ও আশীর্বাদ তেমন আর কেহ বিতরণ করেন না—হিন্দু-ললনার ভক্তি-প্রবল হৃদয়টিই যেন হারাইয়া গিয়াছে। যে হৃদয় ভক্তিতে আনত হইয়া প্রাচীন বৃক্ষ দেবতার চরণতলে পুষ্প-বিল্বপত্রাঞ্জলি প্রদান করিত—আমাদের সেই ভক্তি-প্রবৃদ্ধা সতীলক্ষ্মী ভগিনীগণ যেন দিন দিন সব ভুলিয়া যাইতেছেন। দেশের সেই দুর্দিনের অবসান হইয়াছে—ভগিনীগণ দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধা হইয়াছেন—আবার তাহারা সেই পূজনীয়া প্রাচীনাদিগের প্রবর্তিত ব্রত-নিয়মানুষ্ঠানের প্রতি অনুরাগিনী হইয়াছেন, আমাদের সৌভাগ্য-রবি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহারই ফলে হিন্দু মহিলার ভক্তি-বিশ্বাস-পুণ্য কথাগুলি সুন্দর বেশ-ভূষায় নানা মাসিক পত্রে ও পুস্তিকায় মুদ্রিত হইয়া যেমন শিশুদের মনোরঞ্জন করিতেছে, তেমনই মহিলাদিগকে আবার আপন-পরের মঙ্গল বিধানে অনুপ্রাণিত করিতেছে।

ব্রতকথাগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে—রাজা-প্রজা সকলেই ভক্তি সহকারে ব্রতানুষ্ঠান করিতেন—ইহার ব্যত্যয় ঘটিলে রাজার রাজ্যের, গৃহস্থের, গৃহের অমঙ্গল ঘটিত। ব্রতকথাগুলি, দুঃখীর অশ্রুজলে সিক্ত, ভক্তির চন্দন-সৌরভে স্নিগ্ধ, অনন্তরূপ ভগবানের অনন্তরূপ দয়ার মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল।

গৃহের কল্যাণপ্রদ এই ব্রত পার্বনগুলি প্রাচীনাদিগের চিতাভস্মের সহিত বিলুপ্ত হইয়া না যায়—সেই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন এবং তাহারই ফলে 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'ছেলে ভুলান ছড়া', 'উপকথা' প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গ সাহিত্যের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। এখন ভরসা হয় প্রাচীনা ঠাকুরমাদের সঙ্গে সঙ্গে গল্পগুলির বিলোপ সংঘটিত হইবে না।

বর্তমান পুস্তকে বিক্রমপুর অঞ্চলের কয়েকটি ব্রতকথা সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করা হইল। ইহার কয়েকটি ব্রতকথা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত "বিক্রমপুরের ইতিহাস", "বিক্রমপুর" মাসিক পত্রিকা ও শ্রীযুক্তা শতদলবাসিনী বিশ্বাস কর্তৃক সংগৃহীত "বাঙ্গালার ব্রতকথা" পুস্তিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে। আর কয়েকটি ব্রতকথা শ্রীযুক্ত সদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম।

অবশিষ্ট কয়েকটি কাহিনী নূতন সন্নিবেশিত হইল। এক্ষণে সাধারণ্যে ইহার আদর হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

ঢাকা, বীণা প্রেসের অধ্যক্ষ মহাশয় এই পুস্তক প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন, নতুবা পুস্তকখানা শীঘ্র বাহির হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুস্তকে অনেক ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গেল—আশা করি, ভক্তিপ্রাণ পাঠক পাঠিকাগণ ইহা ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন।

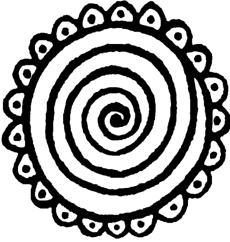
শ্রীমতী হিরণবালা দেবী

পোঃ বিক্রমপুর মধ্যপাড়া, (ঢাকা)
চাটুয্যা বাড়ি
চৈত্র সংক্রান্তি, ১৩৩১ সন

মাঘ মণ্ডলের ব্রত

সারা মাঘ মাস ব্রত করিবার নিয়ম। পাঁচ বৎসর কাল এই ব্রত করিতে হয়। ইট, চাউল, অঙ্গার, বিল্বপত্র, হলুদ ইত্যাদি গুঁড়া করিয়া যথাক্রমে পাঁচ বৎসর পাঁচটি মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া মেয়েরা এই ব্রত করিয়া থাকে। মণ্ডলের উপরাংশে সূর্য, সর্বনিম্নে অর্ধচন্দ্র এবং মধ্যে মণ্ডল অঙ্কিত করিতে হয়। শেষ বৎসর বালিকাগণকে ঘাট হইতে ছড়া পড়িয়া পরে বাড়িতে আসিয়া মণ্ডল মধ্যে লাড়ু, মধু, ঘৃত, অন্ন প্রভৃতি অর্পণ-পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠে ব্রত শেষ করিতে হয়। ছোট ছোট বালিকাদিগকে প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগের অভ্যাস করাইয়া গৃহকর্মে নিযুক্ত করিবার জন্যই যে এই ব্রতের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই।

"মাঘ মণ্ডল সোনার কুণ্ডল
সোনার কুণ্ডলে ঢাইলা ঘি,
আমি বড় মাইন্‌ষের পুতের ঝি।
সোনার কুণ্ডলে ঢাইলা মৌ
আমি বড় মাইন্‌ষের পুতের বৌ।
সোনার কুণ্ডলে ঢাইলা লাড়ু,
শাঁখার আগে সোনার খাড়ু।
চন্দন কাষ্ঠে রাঁধি,
জিরা তুষ ফিকি,
দোলায় আসি ঘোড়ায় যাই
আঁকে বইসা দই ভাত খাই।
চন্দ্র সূর্যে দিয়া ফুল,
ভইরা উঠুক তিন কুল।

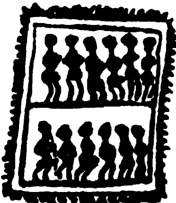


*   *   *   *

আমরা পূজি মেটে কোট,
আমাদের হবে সোনার কোট।
আমরা পূজি মেটে আয়না,
আমাদের হবে সোনার আয়না।
আমরা পূজি মেটে চিরুনী,
আমাদের হবে সোনার চিরুনী।
আমরা পূজি মেটে কৌটা,
আমাদের হবে সোনার কৌটা।"

মাঘ মাসের প্রাতঃকালে স্বভাবতই কুয়াশা হয়, তখন বালিকারা পুকুরের ঘাটে বসিয়া সুর করিয়া নিম্নলিখিত ছড়াগুলি আবৃত্তি করে :—

কুয়া ভাঙি কুয়া ভাঙি এ্যাচলার আগে,
সকল কুয়া গেল বরই গাছটির আগে
দে দে বরই গাছটি ভরসা দে,
ছয় কুড়ি ছয়টা বরই লিখিয়া দে।
লিখিতে পড়িতে একটি হ'ল উনা,
কেটে কুটে ফেলালো শিবের কানের সোনা।
শিবের কানের সোনা নালো নড়িয়ার পিতল।
কতকাল থাকবো আমরা বর্তের ভিতর?



বর্তের ভিতর নানা রতন জ্বলে,
পাড়া ভরে লো জয় জোকার পড়ে।
আমরা জয় দিব নালো জোকার দিব,
সোনা দুটি ভাই বোন কোলে তুলে নিব।
*   *   *   *

চোখ্ মুখ ধোয়ার ছড়া।
চোখে মুখে জল দিতে কি কি ফুল লাগে?
সরুয়া মরুয়া দুটি ফুল লাগে।
ওপাড় থেকে জিজ্ঞাসে মালী,
কি কি ফুলে মুখ পাখালি?
ভাই এনে দিয়াছে সরষার ডালি
তাই দিয়া আমরা মুখ পাখালি।
যে জল ছোঁয় নালো কাকে আর বকে
সে জল ছুঁই আমরা দুর্বার আগে।
*   *   *   *



সরস্বতী জিজ্ঞাসেন কি বর মাগে—
পাশা খেলিয়া জিনিলাম কড়ি ;
তাই দিয়া কিনিলাম কপিলেশ্বরী।
কপিলেশ্বরী গাই কিবা ঘাস খায়,
পুকুরের চারি পাড়ের দুর্বা খায়।
দুর্বা খেয়ে লো সই শুকাল দুধ,
কি দিয়া পাল্‌বো আমরা রাইয়ের ঘরের পুত।
রাইয়ের ঘরের পুত নালো বেড়ার মাটি,
ব্রতীদের ভাই বোন্ লোহার কাঠি।

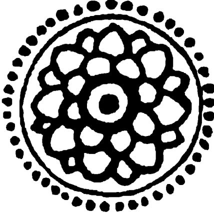
সূর্য উঠাইবার ছড়া

ওঠ ওঠ সূর্যদেব ঝিকি মিকা দিয়া,
না উঠিতে পারি আমি ইয়লের লাইগা,
ইয়লের পঞ্চ কোটি শিয়রে থুইয়া,
সূর্য উঠবেন কোন্ খান দিয়া?
বামুন বাড়ির ঘাটা দিয়া।
বামুনদের মাইয়ারা বড় শেয়ান,
পৈতা যোগায় বেহান বেহান।
ওঠ ওঠ সূর্যরে ঝিকি মিকি দিয়া।
*   *   *   *

সূর্য ওঠ্‌বেন কোন্ খান দিয়া?
বট গাছটির আগা দিয়া,
নবীন পৈতা গলায় দিয়া,
কামরাঙা সিন্দুর কপালে দিয়া
লাল গামছা কাঁধে কইরা,
ওঠ ওঠ সূর্যরে ঝিকি মিকি দিয়া?

*   *   *   *

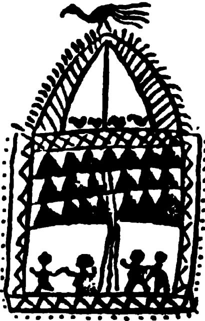
সূর্য ওঠ্‌বেন কোন্‌খান দিয়া?
বৈদ্য বাড়ির ঘাটা দিয়া।
বৈদ্যের মাইয়ারা বড় শেয়ান,
সন্ধ্যা পূজা করে বেহান বেহান।
তার গোত লাইনা জল পুষ্করিণীতে ভাসে,
তাহা দেইখা মাইলানী ঝি খট্‌ খটাইয়া হাসে।
হাসচ্‌ কেন্‌লো মাইলানী ঝি তুইত আমার সই,
মাঘ মণ্ডলের ব্রত করবো ঘাট পাব কই।
আছে আছে লো ঘাট মালী বাড়ির কাছে।
রাত পোহাবে মালিনী বুড়ী ফুল ধোয় তাতে।
তার ফুল ধোয়া বোলা জল পুকুরেতে ভাসে,
তাই দেখে মালিনী ঝি খল খলাইয়া হাসে।
হাসিস্‌ নালো মালিনী তুই আমার সই,
মাঘ মণ্ডলের ব্রত করবো ঘাট পাব কই।
আছে আছে লো ঘাট নাপিত বাড়ির কাছে,
মাঘ মণ্ডলের ব্রত আমরা করবো সেই ঘাটে।



*   *   *   *

মাছ ধরিবার ছড়া

রাইদের পুকুরে ফেলিলাম জাল,
তাতে উঠল না কিছু মাছ।
মামাদের পুকুরে ফেলিলাম জাল
তাতে উঠল রাঘব বোয়াল।
পেয়েছি পেয়েছি মাছ নিবে কে?
আস্‌ছে ঐ বামুন মেয়ে খালুই হাতে করে।
থাক থাক বামুন মেয়ে, আপনি নিব ধরে।
যেমন তেমন করে।
কুটেছি, কুটেছি, মাছ ধোবে কে?
আসছে ঐ বামুন মেয়ে জলের ঘটি নিয়ে।
কুটেছি কুটেছি মাছ, বাঁধবে কে?
আস্‌ছে ঐ বামুন মেয়ে কড়াই হাতে করে।



*   *   *   *

ভোজন শেষ, ভাইদের প্রতি আশীর্বাদ এবং পিতার সৌভাগ্য কামনা।

খরকা মঠুম্‌, কাটুম্‌ কুটুম্‌ মুঠে ধরি মাজা,
ভাইটি আমার লক্ষেশ্বর বাপ আমার রাজা!
দধিশ্বর, দধিশ্বর ; বাপ ভাই আমার লক্ষেশ্বর ;
খাইটি কেটে ভাইটি পেলাম।
তার শত্রু দুই নখে কেটে দিলাম।

মাটির পুতুল বিবাহের গান—

হালা ধরি, মালা ধরি, তুলে ধরি ছাতি,
শিব শঙ্কর বিয়া করে, গৌর পার্বতী।
আন গৌরীকে ডাক দিয়া,
যুঁতি মালতীর তলা দিয়া,
যুঁতি মালতীর নাই ফুল,
গৌরীর মাথায় দীঘল চুল।

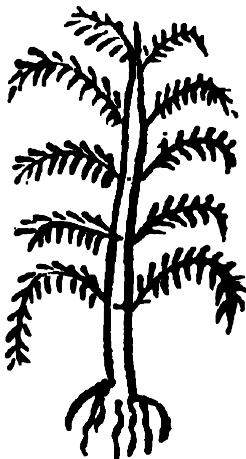


এপাড়া ও পাড়া কিসের বাদ্য বাজে?
রাজার বেটা সদাগর বিয়া করতে সাজে।
সাজ সাজরে "রাইল" মাথায় মুটুক দিয়া,
ঘরে আছে সুন্দরী কন্যা তুলে দিব বিয়া।
রাজ সাজরে "রাইল" পায়ে নূপুর দিয়া,
ঘরে আছে সুন্দরী কন্যা তুলে দিব বিয়া।

* * * *

বৃক্ষ, ঘাট, পথ প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে—

আমের বউল আসেরে লোচা লোচা
বাপ ভাইরে দিমু আমরা তসরের কোচা
দে দে আম গাছটা ঝলুই দে,
ছকুড়ি ছয়টা আম লেইস্‌খা দে,
লেখ্‌তে পড়তে গোটা হইল ঊনা
কাইটা কুইটা ফালালো সিসাইর কানের সোনা,
সিপাইর কানের সোনা নালো নড়িয়ার পিত্তল,
এই বর্ত করি আমরা মাঘের শীতল।
মাঘের জলফুটি টলমল করে,
উইড়া যাইতে পইখ্‌টা পুইড়া পুইড়া মরে।
হাতে লইলে ফটিক জলে।



* * *

আমরা পূজি ঘাট,
আমাদের হবে সোনার খাট।
আমরা পূজি পথ,
আমাদের হবে সোনার রথ।
আমরা পূজি মান্দার
আমাদের বাপ ভাইয়ের ঘর ধানে চাউলে ভাণ্ডার।

* * * * *

বট গাছটি মেল্‌লো পাত,
সূর্য ঠাকুর জগন্নাথ।

থুয়া ব্রত

সমগ্র অগ্রহায়ণ মাসে এই ব্রত করিবার নিয়ম এবং চারি বৎসরে ইহার সমাপ্তি হয়। প্রতিদিন ভোরে কিছু না খাইয়া মাটির মধ্যে একটি গোলাকার গর্ত খনন করিয়া তাহার চারিপারে চারিটি এবং মধ্যে একটি 'থুয়া (মাটির স্তূপ) বসাইয়া ছড়া বা মন্ত্র পড়িতে হয়। ছড়া এই ঃ—

থুয়া পূজে থুয়ানী
আগুন মাসের বৌয়ানী
হাতে ঝাড়ি কাখে কলসী

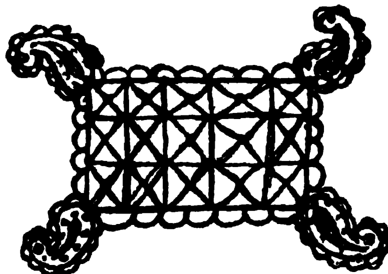
থুয়া পূইজা ঘরে গেল, মাকে নমস্কার করতে ;—মা কি আশীর্বাদ করেন?

আকালে ভাতন্তি হইও,
সকালে পুতন্তি হইও
জনে সায়তি হইও,
ভাদ্র মাসের গঙ্গাজল যেমন ভরপুর থাকে,
তুমি তেমন ভরপুর থাইকো।

তুষ-তুষালি ব্রত

সমগ্র পৌষমাস এই ব্রত করিবার নিয়ম, থুয়া ব্রতের মত এই ব্রতেও ব্রতিনী প্রাতে কিছু না খাইয়া তুষ ও গোবর দ্বারা এক একটি পিণ্ড নির্মাণ করিয়া ছড়া পাঠ করত ঃ তাহার পূজা করে। ছড়া এই ঃ—

তুষ তুষালি কাঁধে ছাতি,
বাপের ধন লাতি পাতি
ভাইর ধন লাস পাশ,
সোয়ামির ধন টগর বগর
পূতের ধন অতি ঝগর
অষ্ট বর্ণের গোবর
নবান্নের তুষ,
বিয়া করে স্বর্গের উপর,
গাই বিয়ন্ত,
আখা জ্বলন্ত,
ঢেঁকি পড়ন্ত
সন্ধি বিলাস,
পাট কাপড়খানা রাত্রি বাস।



ফাগুন কুণা ব্রত

সারা ফাগুন মাস এই ব্রত করিবার নিয়ম। চারি বৎসরে ইহা সাঙ্গ হয়। প্রত্যুষে ফল্গু দ্বারা মণ্ডলাঙ্কিত করিয়া এই ব্রতের মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হয়। মন্ত্রর শেষ চরণেই ব্রতিণীর কামনা পরিব্যক্ত রহিয়াছে। মন্ত্র এই ঃ—

ফাগুন কুণা [illegible],
গুণনিধি দুল ওয়া লইল পান,
ঘাটে দোলা পথে ঘোড়া,
উঠানে ফাগুন কুণা,
খাটালে খাট,
মাইজালে ভোজন পাট,
তিল তুলসী রাত্রে,
ঘি তুলসী পাত্রে,
ইন্দ্র রাজা জিজ্ঞাসা করেন, ধর্মরাজার ঠাই—
ঐ পাড়ার বালিকারা কিসের বর্ত করে?
চাইর বছর ধইরা তারা ফাগুন কুণা করে।
ভাই আমার লক্ষ্মীশ্বর,
বাপ আমার রাজা।
ফাগুন কুণায় দিয়া ফুল,
ভইরা উঠুক তিন কুল।

তারা ব্রত

মাঘ মাসের প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এই ব্রত করিতে হয়। প্রতিদিন এক একটি মণ্ডলের মধ্যে চন্দ্র সূর্য ইত্যাদি আলপনা অঙ্কিত করিবার নিয়ম। প্রথম বৎসর চারিটি, দ্বিতীয় বৎসরে আটটি, তৃতীয় বৎসরে বারটি ও চতুর্থ বৎসরে ষোলটি, সরা, খই, গুড়, মোয়া (মোদক) ক্ষীরের লাড়ু ইত্যাদি দ্বারা পূর্ণ করিয়া মণ্ডলের চারিধারে রাখিতে হয়—এই ব্রতও চারি বর্ষে সাঙ্গ হয়।

সংক্রান্তি দিবসে অন্নের পরিবর্তে দধি ও খই ভোজন করিতে হয়। ছড়া এইরূপে কথিত হইয়া থাকে। ব্রতের ফল শ্লোকেই ব্যাখ্যাত রহিয়াছে।

"এক তারা, দুই তারা, * * * ষোল তারা পূজি।
ষোল ষোল তারা তোমরা হইয়ো সাক্ষী।
বৃত দিয়া করি আমি পঞ্চ গ্রাসী।
সাগর আন কাগর আন,
ষোল ঘরের ভুজ্যি আন।
ষোল ঘরের ষোল বর্তি
আমি তাদের অধিপতি।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসেন—গৌরী "তারা" পূজি কি কি ফল পায়? গৌরী বলেন—

শঙ্কর হেন স্বামী পায়।
কার্তিক গণেশ পুত্র পায়,
লক্ষ্মী সরস্বতী কন্যা পায়,
নন্দী ভৃঙ্গী নফর পায়
জয়া বিজয়া দাসী পায়।

অর্জুন হেন ভাই পায়।
লক্ষ্মণ হেন দেবর পায়।
ষোল ব্রতীর হাতে ষোল সরা দিয়া,
আমি যাই ইন্দ্রপুরে নাটুয়া হইয়া।
চন্দ্র সূর্যে দিয়া ফুল,
ভ'রে উঠুক তিন কুল।

যমপুকুরের ব্রত

কার্তিক মাস এই ব্রতের সময়। ঘরে বহির্ভাবে একটি ছোট পুকুর কাটিয়া তাহার চারি পার্শ্বে ধান, মানকচু, হলুদ ও কলাগাছ রোপন করিয়া প্রাতে কিছু না খাইয়া একমাস কাল এই ব্রত করিবার নিয়ম। মাটির দ্বারা কাক, চিল, কুম্ভীর, যমরাজার মা ইত্যাদি নির্মাণ করিয়া খনিত পুকুরের জলে স্নান করাইতে হয়। ব্রত কথা এইরূপ ঃ—

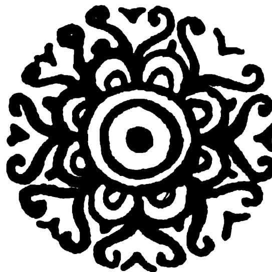
এক শ্বাশুড়ি তাঁহার পুত্রবধূকে এই ব্রত করিতে না দেওয়ার পাপে মৃত্যুর পর তাঁহার প্রেতাত্মার উদ্ধার হয় না। পরে তিনি পুত্রকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন যে বধূকে এ ব্রত করিতে না দেওয়ায় তাঁহার প্রেতাত্মার উদ্ধার হইতেছে না। পুত্র স্বপ্ন দেখিয়া স্ত্রীকে ঐ ব্রত করিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু বধূ তখন সুযোগ বুঝিয়া বলিল যে সোনার পুতুল ও দুধের পুকুর না হইলে সে ব্রত করিবে না। মাতৃমুক্তি প্রয়াসী সন্তান অবশেষে স্ত্রীর প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে বাধ্য হন। তৎপরে বধূ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক ব্রত করে। মন্ত্র এই ঃ—

ওলো ওলো ক্ষুদিরা ধাই, ধানতলা না দিলি ঠাই।
" " " " ।।
" " কলতলা " ।
" " হলুদতলা " ।।

ত্রিভুবন চতুর্থী**

মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর পূর্বদিন এই ব্রত করিতে হয়, ইহাও চারি বৎসর করিবার নিয়ম। কাঁঠালের পাতার উপর নিম্নলিখিত রূপ লিখিতে হয়।

"আগুনের চাউল, পৌষের সরা টোপা, মাঘের পানি,
অমুকে যে বর্ত্ত করে ত্রিভুবনে জানি।"



** কোন কোন স্থানে ইহাকে বরদা চতুর্থীও বলে

নিরাকুলির ব্রত

বিপদের সম্ভাবনায় মন ব্যাকুল হইলে ঘরের গৃহিণী এই ব্রত করিয়া থাকেন। ব্রতের ফল নিরাকুলি অকুলে কুল দেন। এই ব্রত সধবা, বিধবা, কুমারী, সকলেই করিতে পারে। শনিবার কিংবা মঙ্গলবার রাত্রে ব্রতের কথা কহিয়া ব্রত করিতে হয়।

একদেশে এক ভগবানচন্দ্র রাজা। তাহার স্ত্রী লক্ষ্মীমতী কন্যা। একদিন লক্ষ্মীমতী স্বপ্ন দেখে, সে যেন নিরাকুলির কথা কহিতেছে। সেই স্বপ্নের পর হইতে লক্ষ্মীমতী প্রত্যেক শনিবারে ও মঙ্গলবারে নিরাকুলির কথা কহিত। কতকদিন পরে লক্ষ্মীমতীর গর্ভ হইল। ১০ মাস পরে একটি ছেলে হইল।

ছেলেটির বয়স পাঁচ বৎসর। আবার লক্ষ্মীমতীর গর্ভ হইয়াছে। একদিন সে নিরাকুলির ব্রত করিবার জন্য সমস্ত জোগাড় করিল। ভগবানচন্দ্র রাজা আসিয়া তাহার সমস্ত ফেলিয়া দিল। লক্ষ্মীমতী খুব রাগিয়া গেল এবং রাজাকে কহিল—আমার নিরাকুলিরটা তুমি কেন ফেলিলা? আজ তোমার রাজত্ব সব যাইবে! এই কথা কহিয়া লক্ষ্মীমতী রাগ করিয়া সে দিন ব্রত করিল না। সেই রাত্রেরই রাজার রাজত্ব সব গেল। নিরাশ্রয় ভগবানচন্দ্র রাজা লক্ষ্মীমতী ও তাহার ছেলেটি পুরী হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে এক বনে গিয়া পড়িল। ভোরে উঠিয়া দেখে কোথায় রাজবাড়ি ; তাহারা এক বনে আসিয়া পড়িয়া আছে। বিপদের উপর বিপদ—এমন সময় লক্ষ্মীমতীর প্রসব বেদনা আরম্ভ হইল। লক্ষ্মীমতী কহিল—রাজা, আমার এখন উপায় কি? রাজা কহিল, আর এখন উপায় কি? এখানেই প্রসব হউক। লক্ষ্মীমতী নিরাকুলির নাম স্মরণ করিয়া সেই বনেই একটি ছেলে প্রসব করিল। প্রসবান্তে কাতর হইয়া লক্ষ্মীমতী রাজাকে কহিল—আমার বড়ই পিপাসা হইয়াছে—আমার জন্য একটু জল লইয়া আইস।

রাজা নদীর পারে জল আনিতে গেল। এক দেশে এক রাজা মারা গিয়াছিল, তাহার রাজহস্তী চারিদিকে ঘুরিতেছিল—যাহার কপালে রাজদণ্ড দেখিবে তাহাকেই নিয়া সেইখানে রাজা করিবে। ভগবানচন্দ্র জল আনিতে যাইয়া সেই হাতির সম্মুখে পড়িল। তাহার কপালে রাজদণ্ড দেখিয়া তাহাকে রাজহস্তী পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া গেল।

এদিকে লক্ষ্মীমতী জলের আশায় বসিয়া আছে, রাজা আর আসে না। অবশেষে পিপাসায় অস্থির হইয়া সে বড় ছেলেকে কহিল, তুই এখানে বসিয়া থাক, আমি রাজাকে তল্লাস করিয়া আসি আর স্নান করিয়া আসি। লক্ষ্মীমতী অনেক খুঁজিয়াও রাজাকে না পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নদীতে স্নান করিতে গেল। এক ব্যাপারীর নৌকা নদীর এককোণে ছিল আর সারা নদী শুকাইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীমতী কহিল, দেখহ ব্যাপারী, তোমার নৌকাখানা একটু সরাও, আমি স্নান করি। ব্যাপারী কহিল—তুমি কে আমাদের নৌকা নারিলা? লক্ষ্মীমতী কহিল,—আমি লক্ষ্মীমতী কন্যা। ব্যাপারী দেখিল যে, এই কন্যা সঙ্গে থাকিলে আর নৌকা ঠেকিবার ভয় থাকিবে না, তাই সে লক্ষ্মীমতীকে জোর করিয়া ধরিয়া নৌকায় তুলিল, লক্ষ্মীমতী কত মিনতি করিল—কহিল, আমাকে ছুইস না, আমার অশৌচ, আমার একটি ছেলে হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপারী তাহা মানিল না। তখন লক্ষ্মীমতী নিরুপায় হইয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। কহিল—হে ভগবান, আমার সৌন্দর্য সব তুমি নেও, আমাকে কুরূপ কুৎসিৎ কর। তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীমতীর সমস্ত রূপ চলিয়া গেল। ব্যাপারী তাহার এই দশা দেখিয়া তাহাকে নৌকার পাটাতনের নিচে স্থান দিল, এবং নৌকা ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

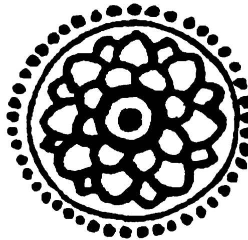
এদিকে ছেলে দুটি সেই বনেই আছে। সেই দেশে এক গোয়ালার একটি কপিলেশ্বরী গাই আছে। গোয়ালা ভোরে গাই ছাড়ে, সেই বনে ছুটিয়া গিয়া গাই ছেলে দুটিকে দুধ দেয়। এইরূপে কতক দিন যায়, গোয়ালা ভাবে, গাই কোথায় যায় আর আগের মত দুধ দেয় না কেন তাহা

দেখিতে হইবে। একদিন গোয়ালা গাই ছাড়িয়া তাহার পিছে পিছে চলিল। গিয়া দেখে, গাই এক বনের মধ্যে দুটি ছেলেকে দুধ দিতেছে। গোয়ালা কহিল, কিহে বাছারা, তোমরা এখানে কেন? বড় ছেলেটি কহিল, আমার—

বাপ গেছে জল আনতে সেও আসে নাই।
মা গেছে স্নান করতে সেও আসে নাই।
যে গুণে আছে গোয়ালের কপিলেশ্বরী গাই।
চারিটি বাণের দুগ্ধ পেয়ে বাঁচি দুটি ভাই।

গোয়াল কহিল, এখন তোমরা কোথায় যাইবে? ছেলে দুটি কহিল, আমাদেরে যে নেয় সেই আমাদের বাপ মা, তার সঙ্গেই যাই। গোয়ালা ছেলে দুটিকে আর গাইটিকে লইয়া বাড়ি আসিয়া গোয়ালিনীকে কহিল—দেখ, তোর জন্য কি একটি জিনিস আনিয়াছি। গোয়ালিনী ছেলে দুটিকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, কোথায় এই দুটি ছেলে পাইলা? গোয়ালা সমস্ত বিবরণ বলিল। গোয়ালিনী তখন পেটে একটি ধামা বাঁধিয়া রাজার বাড়ি দধি দুগ্ধ লইয়া গেল। সকলে বলিতে লাগিল—ওলো! বাঝা গোয়ালিনী তোর আবার কবে গর্ভ হইয়াছে? গোয়ালিনী কহিল, ঠাকুরুণ, এই মাসে ১০ মাস। গোয়ালিনী বাড়ি আসিল, আসিয়া একটি কুকুর কাটিয়া ছেলেটির গায় রক্ত মাখাইয়া দিল। তাহার পরদিন চারিদিকে খবর গেল যে, রাজার বাড়ির গোয়ালিনীর একটি ছেলে হইয়াছে ও আর একটি ছেলেকে পোষ্য আনিয়াছে। শুনিয়া সকলেই আহ্লাদিত।

কতকদিন পরে ছেলে দুটি বড় হইল। গোয়ালা রাজাকে বলিয়া কহিয়া ছেলে দুটিকে নিয়া ঘাট মাঝির কাজে দিল। দৈবক্রমে সেই ব্যাপারীর নৌকাও সেই ঘাটেই আসিয়া লাগিল। একদিন রাত্রে ছোট ছেলেটি কাঁদে, বড়টি বলিল—আয় আমরা বাপ মায়ের কথা কহি। বড়টি দুঃখের কথা কহিতে লাগিল, ছোটটি শুনিতে লাগিল। সেই লক্ষ্মীমতী কন্যা তাহাদের কথা শুনিয়া সারারাত্র কাঁদিল। তাহার পরের দিন ব্যাপারীরা রাজার কাছে গিয়া কহিল, আমাদের নৌকায় একটি মেয়ে আছে, আপনার ঘাট মাঝি ছোড়া দুইটা রাত্রে তাহাকে মারিয়াছে। ছেলে দুইটিকে ডাকাইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল—আমরা তাহাকে দেখিও নাই। লক্ষ্মীমতীকে ডাকাইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাল কাঁদিয়াছ কেন গো? লক্ষ্মীমতী কহিল, আপনার ঘাট মাঝি ছেলে দুটির কথা শুনিয়া কাঁদিয়াছি। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন ছেলে দুইটি কি কথা বলিয়াছিল। তাহারা সমস্ত বলিল—রাজার পূর্বের কথা সব মনে হইল। তখন জিজ্ঞাসা করিয়া রাজা সব জানিতে পারিলেন। রাজা গোয়ালাকে পুরস্কৃত করিয়া তাহার নিকট হইতে ছেলে দুটিকে গ্রহণ করিলেন, রাজপুরীতে আনন্দের কোলাহল উঠিল। লক্ষ্মীমতী স্নান করিয়া স্বামী পুত্র নিয়া নিরাকুলির কথা কহিল। সেই রাত্রে রাজা পূর্ব রাজত্বও ফিরিয়া পাইল এবং সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করিতে লাগিল।

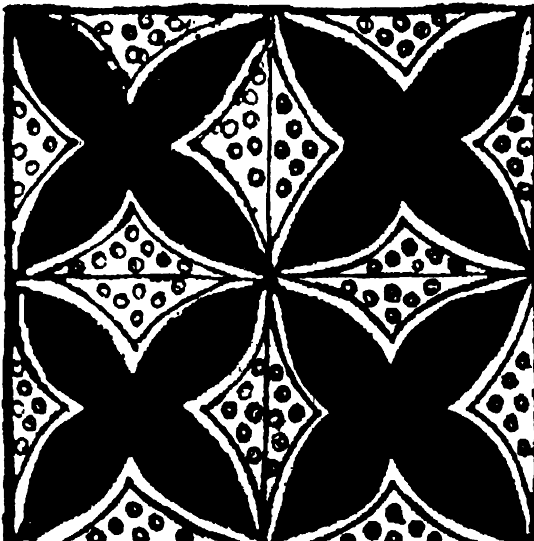


আকুলির ব্রত

এক বিধবা, তার একটি মাত্র ছেলে, পিতৃহীন বলিয়া গ্রামবাসী সকলেই তাহাকে "দুইখ্যা" নামে সম্বোধন করে। অতি কষ্টে দিন চলে। মা সূতা কাটিয়া দেয়—দিনের খোরাক তাহাতেই নির্বাহ হয়। একদিন দুঃখী হাটে চলিয়াছে—পথে একটি বটগাছ, সে গাছ হইতে কে যেন বলিল "আজ, তোর সূতা অমূল্য হ'বে। সূতা বেচে আমার জন্যে তেল সিঁদুর আনিস্।" সত্য সত্যই সে দিন দুঃখী হাটে যাইয়া সূতা বিক্রি করিয়া অনেক টাকা পাইল। সে মনের আনন্দে বহু জিনিসপত্র কিনিয়া নৌকা ভরিয়া লইয়া বাড়ির দিকে বওয়ানা হইল। তেল সিঁদুর কিনিতে তাহার ভুল হইয়া গেল। নৌকা আর চলে না। হঠাৎ তাহার মনে হইল তেল সিঁদুর ত কেনা হয় নাই। সর্বনাশ! অমনি সে নৌকা ফিরাইয়া বাজারে যাইয়া তেল সিঁদুর কিনিয়া আনিল এবং ঐ যে বটগাছ— সেই বটগাছ তলায় তেল সিঁদুর রাখিয়া বলিল "কে আমাকে তেল সিঁদুর আনিতে বলিয়াছিলেন? আমি তেল সিঁদুর আনিয়াছি এই দেখুন।"

বটগাছে ছিলেন আকুলি ঠাক্রুণ—তিনি আসিয়া বলিলেন "আমার তেল সিঁদুর লাগিবে না, তোর মাকে বলিস্, শনিবারে অথবা মঙ্গলবারে উঠান লেপিয়া পিঁড়ি, ঘট, আমসরা দিয়া যেন আকুলির কথা বলে, তবে তোদের সব দুঃখ দূর হ'বে। যে কথা শুনিতে আসিবে তারও মঙ্গল হবে।" দুঃখীর মা সামনের শনিবার আকুলির কথা বলিল। তাহার সব দুঃখ দূর হইল। শেষে সকলে আসিয়া আকুলির নিকট প্রার্থনা করিল "আমার মঙ্গল হউক, আমি আকুলির কথা শুনিব।" এইরূপে আকুলির কথা পৃথিবীতে প্রচারিত হইয়া পড়িল। সকলে বিপদে পড়িলে আকুলির কথা বলিও এবং আকুলির নিকট প্রার্থনা করিও, সব দুঃখ দূর হইবে।

ফল কি? "অবিবাহিতার বিয়ে হবে, আটকুঁড়ির ছেলে হ'বে, দীন-দুঃখীর দুর্দশা দূর হ'বে।"



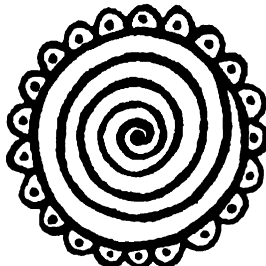
হরিষ মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত

বৈশাখ মাসের প্রত্যেক মঙ্গলবার গৃহের মঙ্গলের জন্য এই ব্রত করে।

এক বিধবা গোয়ালিনীর সাতটি ছেলে ও একটি মেয়ে ছিল। সাত ছেলে ও মেয়েটিকে নিয়া গোয়ালিনী অতি কষ্টে দিন কাটাইত। গোয়ালিনীর সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত খারাপ। দুবেলা আহার জোটে না। কোন প্রকারে কায়িক পরিশ্রম দ্বারা মেয়ে ও ছেলে সাতটিকে মানুষ করিতে লাগিল। গোয়ালিনীর ব্যবসায়ও বন্ধ, কাজেই তাহার এতগুলি ছেলেপেলের আহার জোটান বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়িল। সে নিজে নানারূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া এখন ছেলে কয়টিকে মানুষ করিয়া তাহাদের বিবাহ করাইয়াছে। কিছুদিন যায়, একদিন এক ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত গোয়ালিনী সই পাতাইল। সই-এর অবস্থা বেশ ভাল। তাঁহার সাহায্যে গোয়ালিনী ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিল, সই, তোমার এত ঐশ্বর্য কিসে হইল? সই বলিল, আমার একটি ব্রত আছে, সেই ব্রতের ফলে আমার এত ঐশ্বর্য হইয়াছে! গোয়ালিনী বলিল, 'সই, এ ব্রত অন্য কেহ কি করিতে পারে না? ব্রাহ্মণী—'কেন পারিবে না ; মনের ঐকান্তিক ভক্তির সহিত মা চণ্ডীকে ডাকিলে অবশ্যই তিনি মুখ তুলিয়া চাহিবেন। সকলেই তাঁহাকে ডাকিতে পারে।' গোয়ালিনী—আমি এ ব্রত করিব। ব্রতের উপকরণাদি আমাকে বলিয়া দাও। আমার আর কষ্ট সহ্য হয় না। সই বলিল, "এ ব্রত করিতে বিশেষ কিছুই ব্যয় করিতে হয় না। তুমি এ ব্রত অনায়াসেই করিতে পার। বৈশাখ মাসের প্রত্যেক মঙ্গলবারে এই ব্রত করিতে হইবে। আর যতকাল জীবিত থাকিবে এই ব্রতভঙ্গ করিতে পারিবে না।" গোয়ালিনী তাহাতেই স্বীকৃত হইল। ব্রাহ্মণী তখন নিয়মাদি বলিয়া দিলেন। একটি কলার "মাইজের" আগায় সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া "মাইজ" বসাইতে হইবে। মাইজের মধ্যে একটি জবাফুল, ধান, দুর্বা ও একটি ফল দিবে। দই, ক্ষীর ইত্যাদি নৈবেদ্য দিতে হয়। পরে ব্রাহ্মণ আসিয়া মা চণ্ডীর উদ্দেশ্যে এই সকল উৎসর্গ করিবেন। এই ব্রত করিয়া ভাত ভিন্ন অন্য সমস্তই খাইতে পারে ; গোয়ালিনী তাহাই করিল। বৈশাখ মাস পড়িলেই প্রত্যেক মঙ্গলবারই এই ব্রত করিতে লাগিল। সে যে দিবস প্রথম ব্রত করিল, সেই দিনই দই বেচিয়া অনেক পয়সা পাইল। চণ্ডী মায়ের বরে, গোয়ালিনীর ধনজন দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। এইরূপ সুখ-স্বচ্ছন্দে পুত্র ও পুত্রবধূদের লইয়া, আমোদ আহ্লাদে দিন যায়। কিছুদিন পরে গোয়ালিনী একদিন সইকে বলিল, 'সই আমার এত ঐশ্বর্য আর সহ্য হয় না। টাকা পয়সার ঝন্ ঝন্ লোকজনের এত হাসি, গল্প, ঘোড়াশালায় ঘোড়া, হাতিশালায় হাতি, এসব আর আমি দেখিতে শুনিতে পারিতেছি না। কত বৎসর যাবত কান্না কাহাকে বলে, জানি না। আমার কেবলই কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে।" সই এ কথা শুনিয়া তাহাকে অনেক বুঝাইল, 'এ ব্রত করার পর হইতে তোমার দুঃখ ঘুচিয়াছে। কত সুখ-সম্পদে, বৌ, ঝি, ছেলেপেলে নিয়া দিন কাটিতেছে ; তুমি এত ব্রত ভাঙ্গিও না।' গোয়ালিনী তাহা মানিল না। ব্রাহ্মণী শেষটায় বিরক্ত হইয়া তাহাকে ব্রত ভঙ্গ করিতে বলিলেন। গোয়ালিনী নিজে আর ব্রত করে না। বধূদের সকলকেও এই ব্রত করিতে নিষেধ করিয়াছে। বড় বৌ কিন্তু লুকাইয়া ভিন্ন ঘরে ব্রত করিল। মা চণ্ডী প্রসন্না হইয়া তাহাদের সুখ শান্তি বজায় রাখিলেন। এদিকে গোয়ালিনী নিজের অবস্থার কোন পরিবর্তন হইল না দেখিয়া ব্রাহ্মণীর কাছে কাঁদিয়া বলিল, "সই ব্রত তো ভঙ্গ করিয়াছি, কিন্তু ইহাতেও যে আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল না। আমি কাঁদিবার সুযোগ পাইলাম না। আমাকে কাঁদিবার উপায় বলে দাও।" ব্রাহ্মণী বলিল, "রাজার বাড়িতে একটি হাতি মরিয়াছে, তুমি উহাকে উপলক্ষ করিয়া কাঁদিতে থাক।" গোয়ালিনী তাহাই করিল। হাতিকে ধরিয়া কাঁদিবা মাত্র হাতি বাঁচিয়া উঠিল। সকলে দেখিয়া অবাক! রাজার নিকট খবর গেল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া গোয়ালিনীকে যথেষ্ট অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। গোয়ালিনী সই এর নিকট গিয়া বলিল, "সই, আমি এবারও শোক করিতে পারিলাম না। আমি কাঁদিবা মাত্র হাতি বাঁচিয়া উঠিল। শীঘ্র আমাকে কাঁদিবার উপায় বলিয়া দাও।" ব্রাহ্মণী রাগ করিয়া বলিল, "কেন,

আমি তো তোমাকে আগেই বলিয়াছিলাম যে তোমার এত সুখ শান্তি, ভাল লাগিবে না।" গোয়ালিনী বলিল, "না সই আমি কোন কথা শুনিব না। আমার কেবলই কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে।" ব্রাহ্মণী বলিল, 'যদি তোর একান্তই কাঁদিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে মেয়ের বাড়ি বিষের লাড়ু পাঠাইয়া দিস।' এবার গোয়ালিনী মনে করিল যে এখন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারিব। এদিকে লোকটি লাড়ুর হাঁড়ি নিয়া যাইতে লাগিল। পথে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইল। মা চণ্ডী এই লোকটির জন্য ব্রাহ্মণের বেশে পথে অপেক্ষা করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'তুমি ঐ পুকুরে স্নানাদি করিয়া আইস। আমি তোমার হাঁড়ির প্রহরী রহিলাম।' লোকটি স্নান করিতে গেল। ঠাকুর ভাবিতে লাগিলেন, আমার ভক্তের হৃদয়ে যেন শোক প্রবেশ করিতে না পারে। তাই ঠাকুরের বরে বিষের লাড়ু অমৃতের লাড়ু হইয়া রহিল। লোকটি আসিয়া তাহার হাঁড়ি লইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিল। সকলেই এই জিনিস খাইয়া প্রশংসা করিতে লাগিল আর বলিয়া দিল, দিদিমাকে, মাকে বলিও যেন আরও কিছু লাড়ু পাঠাইয়া দেন। গোয়ালিনী সেই দিন কিছুই আহার করে নাই। কতক্ষণে মেয়ের মৃত্যুর বার্তা নিয়া আসিবে, সেই আশায় পথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কিন্তু লোকটি আসিয়া বুড়িকে তাহার আশানুরূপ বার্তায় সন্তুষ্ট করিতে পারিল না। গোয়ালিনীর কান্না হইল না, মেয়ে ও নাতি পুতি "সই আমার আর সাধ মিটিল না। বিষের বাড়িতে মেয়েটা মরে নাই।" ব্রাহ্মণী এবারও অনেক বুঝাইল, গোয়ালিনী তাহা শুনিল না। তখন ব্রাহ্মণী বলিল যে, বড় বৌ কিংবা তোমরা কেহই আগামী মঙ্গলবার ব্রত করিও না। তাই করা হইল। সেই মঙ্গলবারে কেহই আর ব্রত করিল না। মঙ্গলচণ্ডীর শাপে গোয়ালিনীর যে যেখানে ছিল, সকলেই সেখানে মরিয়া রহিল। গোয়ালিনী আর কাহাকেও জীবিত না পাইয়া প্রাণ ভরিয়া কান্না আরম্ভ করিল। এরূপভাবে সাত রাত্রি, সাত দিন অনবরত কাঁদিয়া কাঁদিয়া শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। আর কাঁদিতে পারে না। তাহার আবার সকলকে পাইতে ইচ্ছা হইল। পুত্র ও পুত্রবধূদের নিয়া তাহার সংসারের সাধ হইল। সে সইকে ডাকিতে লাগিল, সই আসিয়া বলিল, "কেন, এখন আবার আমাকে ডাকিতেছ কেন? বসিয়া সাধ মিটাইয়া কাঁদ।"

তখন গোয়ালিনী সইয়ের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, "সই আমার সকল সাধ মিটিয়াছে, আমি আর কাঁদিতে পারিব না। আমার আবার সকলকে দেখিতে ইচ্ছা করে। কি করিয়া আমি আবার সকলকে পাইব, সে উপায় বলিয়া দাও।" তখন সই বলিল, 'আবার মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত কর, তবে আবার তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।' তখন গোয়ালিনী আবার ব্রত করিল। মঙ্গলচণ্ডীর মঙ্গল ইচ্ছায় গোয়ালিনীর সকল বাঁচিয়া উঠিল। আবার পূর্ব সুখ শান্তি ফিরিয়া আসিল। সোনার মঙ্গলচণ্ডী গড়াইয়া পুত্রবধূদের ব্রত করাইল। সে অবধি সর্বত্র এ ব্রতের প্রচার হইল। এ ব্রত করিলে লোকের গৃহে শান্তি হয়। হর্ষ ছাড়া বিবাদ হয় না। সুখ ছাড়া বিষাদ হয় না। সুখ ছাড়া দুঃখ হয় না, এই ব্রত করিলে লোকে সুখে, শান্তিতে, ধনে, জনে দিন পাত করিতে পারে।' তাই ইহার নাম হরিষ মঙ্গলচণ্ডী ব্রত।



অসময়ী নারায়ণী ব্রত

শনিবার অথবা রবিবার দিবস এই ব্রত করিতে হয়। দুঃসময়ে এ ব্রত করিলে সুসময়ের আবির্ভাব হয়। স্ত্রী, পুরুষ উভয়েই এ ব্রত করিতে পারে। একখানা ধৌত কাষ্ঠাসনে আম্রপল্লবযুক্ত ঘট বসাইয়া ধূপ ও দীপ দিতে হয়। তৈল, সিন্দুর, পান, সুপারি, কজ্জল, চন্দন ও যথাসম্ভব মিষ্ট দ্রব্যাদি একখানা থালায় রাখিয়া ব্রতের কথা বলিতে হয়। কথা শেষে পাঁচটি হুলুধ্বনি দিয়া সকলে প্রণাম করেন এবং তৈল সিন্দুর এবং চন্দনাদি মস্তকে ও ললাটে স্পর্শ করেন।

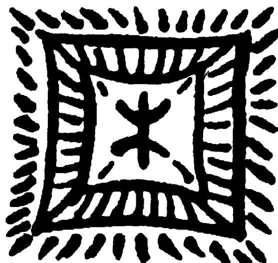
এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। তাহার সন্তানাদি নাই। এক দিবস ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে—রাস্তায় অসময়ী নারায়ণী তাহাকে বলিল, "ব্রাহ্মণ কোথাও যাও, আমাকে ভিক্ষা দাও।" ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "আমি নিঃসন্তান, অত্যন্ত দুঃখী। আমার নিত্য ভিক্ষা তনুরক্ষা।" অসময়ী নারায়ণী বলিল, "তুমি এই হল্‌দি দু'খানা নাও, তোমার অভাব মোচন হবে। তোমার স্ত্রী ঋতু স্নান করিয়াছে, ইহাতেই সে অন্তঃসত্ত্বা হবে এবং তাহার একটি ছেলে জন্মিবে। ছেলের ষষ্ঠী, অন্নারম্ভ, বিবাহ প্রভৃতিতে আমায় তৈল-সিন্দুর দিও এবং পৃথিবীতে আমার ব্রত প্রচার করিয়া দিও।"

কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণের একটি ছেলে হইল। ব্রাহ্মণ পুরোহিত বাড়ি চলিয়াছে—পথিমধ্যে এক বাঘের সহিত সাক্ষাৎ। বাঘ বলিল, "ব্রাহ্মণ তোকে খাই?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "আমার ছেলে হইয়াছে, পুরোহিত বাড়ি যাইতেছি, আমাকে খাইও না।" বাঘ বলিল, "১২ বৎসর যাবৎ লোহার খাঁচায় আবদ্ধ বাঘিনীকে আনিয়া দিতে পারিলে তোমাকে ছাড়িয়া দিব।" ব্রাহ্মণ "তথাস্তু" বলিয়া চলিয়া গেল এবং বাড়ি আসিয়া অসময়ীর নিকট বাঘিনীর উদ্ধারের জন্য মানস করিল।

একদিন বাঘ বসিয়া আছে, এমন সময় দেখিল শোলার খাচায় বাঘিনী আসিয়া উপস্থিত।

দৈবযোগে ঐ পথে এক পথিক যাইতেছিল। ব্যাঘ্র পথিককে হত্যা করিল এবং তাহার ধনরত্ন লইয়া ব্রাহ্মণকে (ভার্যা প্রাপ্তির) পুরস্কার দিতে গেল। ব্রাহ্মণের বাড়ি আসিয়া বাঘ ডাকিল, "বাবা! বাবা! বাহিরে আসুন, প্রণাম করিব।" ব্রাহ্মণ ভয়ে ছেলেটিকে উপরে রাখিয়া দ্বার পথে উঁকি দিয়া দেখিতে লাগিল যে বাঘ কি করে। বাঘ বারান্দায় ধনরত্ন রাখিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল এবং বলিল, "ভ্রাতার অন্নারম্ভে যেন নিমন্ত্রণ করেন।"

ব্রাহ্মণের ছেলের অন্নারম্ভ। সমস্ত স্ত্রী-আচারাদি সম্পন্ন হইয়াছে ; কিন্তু ভ্রমক্রমে অসময়ী নারায়ণীর তৈল সিন্দুর দেওয়া হয় নাই। ক্ষিপ্রহস্তে ব্রতের নিয়মিত দ্রব্যাদি একত্রিত করিয়া উপস্থিত সকলে অসময়ী নারায়ণীর ব্রত করিল ; ব্রতের গুণে ছেলে বাঁচিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে প্রচার করিয়া দিল যে, "অসময়ে অসময়ী নারায়ণীর ব্রত করিলে কাহারও দুঃখ থাকে না। যে যাহা মানস করিয়া ভক্তিভাবে এ ব্রত করে, তাহার সে অভিলাষ পূর্ণ হয়।"



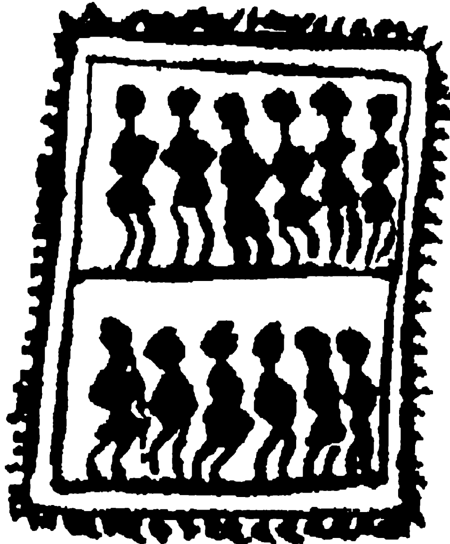
মুস্কিল আসানের ব্রত

রবিবার ও বৃহস্পতিবার ব্রত করিবার নিয়ম। সোয়া সের ধান্যের চাউল দ্বারা সিন্নি দিতে হয়। প্রাঙ্গণে কতটুকু জায়গা গোময় দ্বারা লেপিয়া একটি ঘট, আম্রপল্লব, সিন্দুর ইত্যাদি দ্বারা সাজাইয়া ; একখানা পরিষ্কার পিঁড়িতে মুস্কিল আসান ঠাকুরের আসন স্থাপন করতঃ ব্রতের কথা বলিয়া উলুধ্বনি দিতে হয়।

এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। প্রত্যহ এক পাড়াতেই ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। প্রত্যহ একপাড়াতেই ভিক্ষা করে বলিয়া একদিন গৃহস্থের বধুরা ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দিল না। বলিল যে "এই জায়গাতেই ভিক্ষা করে, আজ আমরা ভিক্ষা দিব না।" ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ঐ দিন ভিক্ষা না পাইয়া মনের কষ্টে ভগবানকে বলিল, "আমার জীবিকা নির্বাহের সম্বল একমাত্র ভিক্ষা, আজ তাহাও জুটাইলা না। সুতরাং আজ আমি প্রাণ দিব ; আমাকে উদ্ধার কর। একদিন সকলের প্রাণ যাইবে, কাজেই ভিক্ষা যখন পাইলাম না তখন আজই প্রাণ দিব। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ দুপুরবেলা রৌদ্রের সময় চাষাদের ক্ষেতের ধারে শুইয়া পড়িলেন এবং বলিলেন "ঠাকুর এখন আমার প্রাণ নিয়া যাও।" এই প্রকারে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ক্ষেতের ধারে শুইয়া আছেন, ক্ষুধায় কাতর, প্রাণ যায়, এমন সময় "মুস্কিল আসান ঠাকুর" মনে মনে চিন্তা করিলেন যে—"ব্রাহ্মণের আয়ু থাকিতে প্রাণ দিতে আসিয়াছে এবং আমাকে একাগ্রচিত্তে ডাকিতেছে" সুতরাং ব্রাহ্মণকে আয়ু থাকিতে উদ্ধার করিতে পারি না ; কিন্তু বর্তমানে কষ্টভোগ হইতে উদ্ধার করিব"। এই বলিয়া স্বয়ং "মুস্কিল আসান" ভগবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকটা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাকে তিনবার ডাক দিলেন। তিনবার ডাকের পর, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ যন্ত্রণার সহিত উত্তর দিলেন যে—"কে আমাকে অনর্থক ডাকিয়া বিরক্ত করিতেছে?" আমি মাঠের ধারে শুইয়া আছি, আমি ত কাহারো অনিষ্ট করিতেছি না। তুমি আমাকে কেন বিরক্ত করিতেছ? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, আমি "মুস্কিল আসান ঠাকুর"। তুমি উঠ, আর শুইয়াছ কেন? ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন যে, কোথায় তোমাকে ত ঠাকুরের মত দেখা যায় না। আমি শুনিয়াছি যে—ভগবানের চারি হাত, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী কিন্তু তাহারত কিছুই দেখি না। ছলনাকারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অবশেষে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণ করিয়া ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে দেখা দিলেন। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ভগবানের পা জড়াইয়া ধরিলেন ও বলিলেন যে "ঠাকুর আমাকে এখন উদ্ধার কর।" তদুত্তরে ভগবান বলিলেন যে—"তোমাকে আমি কি প্রকারে উদ্ধার করিব। তোমার আয়ু আছে, কাজেই এখন তোমাকে উদ্ধার করিতে পারি না।" তুমি পূর্বে যে পাড়ায় ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলা, পুনরায় সেই পাড়ায় ভিক্ষা করিতে যাও। আজ অন্যান্য দিন অপেক্ষা বেশি ভিক্ষা পাইবা। তাহা হইতে মুস্কিল আসান ঠাকুরের সিন্নির জন্য কতক চাউল উঠাইয়া রাখিবা এবং আগামী কল্য মুস্কিল আসানের সিন্নি দিবা। এই বলিয়া ঠাকুর অন্তর্ধান হইলেন এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণও ভিক্ষায় বাহির হইলেন। ভিক্ষায় যাইয়া সত্যই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ভগবানের অনুগ্রহে বেশি পরিমাণে আতপ তণ্ডুল ও তাহার সঙ্গে কিছু তরকারিও পাইলেন। পরদিন ব্রাহ্মণ ঐ তণ্ডুল হইতে মুস্কিল আসানের জন্য কিছু রাখিয়া তার অন্যান্য বিক্রি করিয়া জিনিসপত্র ক্রয় করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ মুস্কিল আসানের সিন্নি তৈয়ার করিয়া পূজা দিতেছেন, এমন সময়ে এক কাঠুরিয়া কাষ্ঠ বিক্রি করিতে আসিয়াছে এবং ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর এই সিন্নি তৈয়ার করিয়া কি কর?" ব্রাহ্মণ তাহাকে সকল কথা বলিল। কাঠুরিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, ঠাকুর! একটু প্রসাদ পাইতে পারি কি? ব্রাহ্মণ কাঠুরিয়াকে অনায়াসে প্রসাদ দিলেন। কাঠুরিয়া খাইয়া মানস করিল যে "আমি যদি কাষ্ঠ বিক্রি করিয়া উন্নতি করিতে পারি তাহা হইলে আমি মুস্কিল আসানের সিন্নি দিব।" যাহা হউক মুস্কিল আসান ঠাকুরের কৃপায় ব্রাহ্মণের দিন দিন দুঃখ দারিদ্র্য দুর হইতে লাগিল। এদিকে কাঠুরিয়াও মানস করিয়াছে পর, পরদিনই কাষ্ঠ বিক্রি করিয়া দ্বিগুণ লাভ করে।

এইরূপভাবে সে কাষ্ঠ বিক্রি করিয়াই খুব উন্নতি করিল। অতঃপর একদিন সকল কাঠুরিয়া নদীর পাড়ে মুস্কিল আসানের সিন্নি তৈয়ার করিয়া পূজা দিতেছে। এমন সময় এক ধনপতি সওদাগর নৌকারোহণে যাইতে ছিলেন, উহাদের পূজার আয়োজন দেখিয়া উপরে উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে—"তোমরা কিসের পূজা করিতেছ?" তদুত্তরে কাঠুরিয়া বলিল যে, আমরা "মুস্কিল আসানের" পূজা করি। সওদাগর পূজার ফলাফল জিজ্ঞাসা করায় কাঠুরিয়াগণ বলিল যে, এই পূজা করিলে "অপুত্রার পুত্র, নির্ধনের ধন, দুঃখীর দুঃখ দারিদ্র্য নাশ ও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।" সওদাগর পূজার শেষে প্রসাদ খাইয়া মানস করিল যে, "যদি আমার সন্তান হয় তবে আমি একশত মুদ্রা দিয়া মুস্কিল আসানের পূজা দিব।" ইতিমধ্যেই সওদাগরের স্ত্রী ঋতুস্নান করিয়া ছিলেন এবং কতকদিনের মধ্যেই সওদাগরের স্ত্রী গর্ভবতী হইলেন এবং দশমাস দশদিন অন্তরে একটি কন্যা প্রসব করিলেন। কন্যা ক্রমশই বড় হইতে লাগিল এবং স্বর্গের উর্বশীর ন্যায় সুন্দরী হইল। সওদাগর কন্যার রূপ ও গুণ দেখিয়া পূজার কথা ও ব্যবসা বাণিজ্যের কথা সকলই ভুলিয়া গেলেন। কন্যা ক্রমেই বড় হইতে লাগিল। দ্বাদশ বর্ষীয়া হইল তবু কন্যার বিবাহ হইতেছে না। এমনকি সম্বন্ধও আসে না। তখনই সওদাগরের পূজার মানস কথা স্মরণ হইল ; এবং মুস্কিল আসান ঠাকুরকে একমনে ডাকিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "আমার কন্যার বর যোগাড় করিয়া দাও। আমার অপরাধ ক্ষমা কর।" মুস্কিল আসান ঠাকুর তাহার করুণ ডাকে সন্তুষ্ট হইয়া কন্যার বর যোগাড় করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে ঐ দেশেরই এক রাজা মারা গেলেন। রাজার একটি ছেলে। রাজার রাজত্বও ছারখার হইয়া গেল। রাজপুত্র শেষে কোন উপায় না দেখিয়া দেশত্যাগ করিয়া কোনও মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং মুনি ঠাকুরকে গুরু বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং বলিলেন যে, "আপনার আশ্রমে থাকিতে চাই।" ডাক দেওয়াতে মুনিঠাকুর ধ্যান ভঙ্গ হইয়া ক্রোধাগ্নি হইয়া বলিলেন—'তুই গুরু বলিয়া সম্বোধন করিলি বলিয়া তোকে রক্ষা করিলাম নতুবা তোকে এখনই ভস্মসাৎ করিতাম। তুই কি চাস এখানে? রাজপুত্র বলিল, "আমি আপনার নিকট থাকিব ও পূজার ফল, ফুল জোগাড় করিব।" মুনিঠাকুর শান্ত হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিল। পরে একদিন বলিল যে—তুই এখানে থাকিতে পারবি না। তোর ভবিতব্য আসিতেছে। রাজপুত্র বলিল "আমি কোথায় যাইব। আমার কেহই নাই মুনি ঠাকুর।" মুনি তথাপিও তাহাকে রাখিলেন না। রাজপুত্র বাহির হইয়া শেষে পথমুখে চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে এক ধনপতি সওদাগরের বাড়ি যাইয়া উপস্থিত হইল এবং বাড়ির মালীকের নিকট এক গ্লাস জল চাহিল। এমন সময় ধনপতি সওদাগর বাহির হইয়া দেখিলেন যে কে জল চায় এবং তাহার পরিচয় লইলেন, পরে তাহাকে আদর যত্ন করিয়া বাড়ির ভিতর নিয়া গেলেন। ধনপতি সওদাগর রাজপুত্রের সঙ্গে তাহার মেয়ে বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে রাজপুত্র বলিলেন যে, "আমার পিতৃঋণ আছে ৫০০ পাঁচশত টাকা। সেই টাকা দিতে পারিলে আমি বিবাহ করিব। ধনপতি সওদাগর তাহাই স্বীকার করিলেন এবং কন্যা বিবাহ দিলেন। কিন্তু মুস্কিল আসানের পূজা আর দিলেন না। কতকদিন পরে ধনপতি সওদাগর জামাতাকে সঙ্গে লইয়া বাণিজ্যে চলিলেন। বাণিজ্যে যাইয়া মুস্কিল আসানের অনুগ্রহে বিস্তর লাভ হইল। বাণিজ্যের লাভের গুণে ধনপতি সন্তুষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যে চোরে ঐ দেশের রাণীর গলার হার চুরি করিয়া বাজারে বিক্রি করিতে আনিয়াছে। সওদাগর সুন্দর হার দেখিয়া জামাতাকে কিনিয়া দিলেন। পরদিন প্রাতে চোর ধরিবার জন্য কোতোয়াল ছুটিল। সওদাগরের জামাতার গলে হার দেখিয়া কোতোয়াল তাহাদিগকে ধরিয়া রাজার নিকট নিয়া গেল। রাজা হার গ্রহণ করিয়া, সওদাগর ও জামাতাকে মশান ঘরে রাখিল। সওদাগর এক মনে মুস্কিল আসানকে ডাকিতে লাগিলেন, মুস্কিল আসান ঠাকুর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে স্বপ্নে বলিলেন যে, "সওদাগর হার ক্রয় করিয়া তোমার দেশে চোর হইল কেন? তুমি উহাদিগকে শীঘ্র মুক্ত করিয়া দেও। ধন দৌলত সঙ্গে দিয়া দাও, নচেৎ তোমার বংশ ছারখার করিব।" রাজা পরদিন প্রাতে উঠিয়া উহাদিগকে ধন দৌলত দিয়া

দেশে পাঠাইয়া দিলেন। সওদাগর আসিতেছে, পথে মুস্কিল আসান ঠাকুর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া সওদাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তোমার নৌকায় কি ভরিয়াছ?" এইরূপ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে সওদাগর চোর মনে করিয়া বলিল যে "আমি নৌকায় মাটি ভরিয়াছি। তোমার তাহাতে প্রয়োজন কি?" মুস্কিল আসন ঠাকুরের কৃপায় নৌকার সকলই মাটি হইল। সওদাগর নৌকায় মাটি দেখিয়া ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িল। ব্রাহ্মণ বলিল যে, "তুমি কতবার মুস্কিল আসানের পূজা মানস করিলা কিন্তু এ পর্যন্ত পূজা করিলা না কেন?" সওদাগরের সকল কথা মনে পড়িল এবং পুনরায় তাঁহার পূজা মানস করিল। তৎপরে নৌকায় পুনরায় ধনদৌলত হইল। এদিকে ধনপতি সওদাগরের বাড়ি পুড়িয়া যাওয়ায় সকলে অন্নকষ্টে দিন যাপন করিতেছে। একদিন সওদাগরের স্ত্রী মুস্কিল আসানে পূজা স্বপ্নে দেখিয়া পরদিন কিছু আতপ চাল যোগাড় করিয়া মুস্কিল আসানের সিন্নি দিতেছে, এমন সময় সওদাগর দেশে আসিয়া পৌছিল। কন্যা প্রসাদ হাতে লইয়াছিল, সেই সময় পিতা দেশে আসিয়াছে শুনিয়া আহ্লাদে প্রসাদ ফেলিয়া চলিয়া গেল। তাহাতে জামাতা সহিত সওদাগর ঘাটে আসিয়া নৌকা সহ জলমগ্ন হইল। সওদাগরের কন্যার ক্রন্দন শুনিয়া "মুস্কিল আসান ঠাকুর" স্বর্গ হইতে দৈববাণী করিলেন যে, "প্রসাদ ফেলিয়াছ বলিয়া এ দুর্দশা, শীঘ্র যাইয়া আমার প্রসাদ বিচারিয়া খাও। তবেই সওদাগর, জামাতা ও নৌকা সহিত ভাসিয়া উঠিবে।" সকলে জয় জোকার দিতে লাগিল। নৌকা ভাসিয়া উঠিল। সওদাগর একশত মুদ্রা দিয়া বিবিধ প্রকারে মুস্কিল আসানের পূজা দিল। পরে ধন দৌলত বাড়িতে আনিল। মুস্কিল আসানের কৃপায় সওদাগর সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল।



নাটাই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত

অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি রবিবারে ব্রত করিতে হয় এবং ব্রত শেষে পিষ্টক ভক্ষণ করিতে হয়। ব্রতের ফল চণ্ডীর অনুগ্রহ লাভ।

রাজা যাবেন বাণিজ্যে, দেশ শুদ্ধ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সাত ডিঙ্গা সাজান হইয়াছে। লোকজনের কলরব, মাঝি মাল্লাদের আনাগোনার শব্দে রাজপুরী টলমল। কিন্তু যেতেও রাজার মন চায় না ; তার মনে সুখ নাই। বড়রাণী এক ছেলে এক মেয়ে রেখে মারা গিয়াছেন, ছোট রাণী দুই ছেলে দুই মেয়ে নিয়ে ঘরকন্না করিতেছেন। রাজা দেশে থাকিবেন না, বিমাতা সাপিনী বাঘিনী কখন কি বিভ্রাট ঘটাইয়া বসেন তাহার ঠিকানা নাই। হয়ত বড় ছেলে মেয়ে দুইটিকে না খাইতে দিয়াই মারিয়া ফেলিবে। মাঝিরা কহিল—"মহারাজ! তার ভাবনা কি? তেলি বাড়িতে কড়ি দিয়া যান, তারা তেল যোগাবে। তাঁতি কাপড় যোগাবে। তাহলে আর রাজপুত্র রাজকন্যার অভাব কিসের?" রাজা তাই করলেন, তেলিকে বললেন তেল যোগাতে, আর মোদককে মুড়ি মুড়কি যোগাতে বলে দিয়ে বাণিজ্যে গেলেন, ছোট রাণীকে কিছুই বললেন না।

রাজাও গেলেন ছোট রাণীও সতীনের ছেলে মেয়ে দুটিকে পেয়ে বসলেন। সারাদিন তাদের দিয়ে বনে জঙ্গলে ছাগল চরাইতেন। আর দিনের শেষে পোড়া ব্যঞ্জন খাইতে দিতেন। কিন্তু তেলি বাড়ির কাছ দিয়া যাবার সময়, তেলিরা তেল মাখিয়া দিত, ক্ষুধা পেলে মোদকেরা মুড়ি মুড়কি দিত, কাজেই বিমাতার অত্যাচারেও তারা কাহিল হ'ল না। ছোট রাণী ভাবলেন, ওদের পোড়া ভাত পোড়া ব্যঞ্জন খেতে দেই, তবু ওরা মোটা হয় কেমন করে? আর আমার বাছারা ঘি, দুধ খেয়েও দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে। নিজের ছেলেমেয়েদের বলিয়া দিলেন, "ওরা কোথায় যাইয়া কি খায় তা লুকাইয়া দেখে আসিও।" তারা সে সব দেখে এসে মাকে খবর দিল। ছোট রাণী তা শুনে রেগে তেলি বাড়ি গিয়ে তেলের হাঁড়ি ভেঙে দিলেন ; মোদকের মুড়ি মুড়কি ফেলে দিয়ে আসিলেন। তারপর থেকে তারা না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে যেতে লাগল। নাটাই মঙ্গলচণ্ডী ঠাক্‌রুণের মনে কি আছে কে জানে! একদিন তারা বনের ভিতর ছাগল হারাইয়া কোথাও খুঁজে পায় না, বিমাতার ভয়ে মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হইয়া গেল, সন্ধ্যাবেলা ভয়ে বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। ছাগল হারাইয়াছে, শুনিয়াই তো ছোট রাণী তেলে বেগুনে জ্বলে উঠ্‌লেন এবং মেরে ধরে তাদের বাড়ি থেকে তাড়াইয়া দিলেন। তারা বনে বনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এমন সময় এক গৃহস্থের বাড়িতে জয়জয়কার শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানতে পারল, তারা নাটাই মঙ্গলচণ্ডী ঠাক্‌রুণের ব্রত করে। এ ব্রত করলে কি হয়? অবিবাহিতের বিয়ে হয়, অপুত্রের পুত্র হয়, হারান ধন ফিরে আসে, ছোট ঘর বড় হয়, নির্ধনের ধন হয়, বড় ঘর ছোট বর পায় ; সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, সর্বত্র জয় হয়, দূরের বন্ধু উড়ে আসে। নাটাই মঙ্গলচণ্ডীর বরে সকল ঘর ভরে।"

ব্রতে কি কি লাগে? অগ্রহায়ণ মাসের প্রত্যেক রবিবারে ব্রত করিতে হয়, তিনখানা কলার মাইজের একখানাতে তিনখানা লুনা পিঠা, আর একখানাতে চারখানা আলুনি পিঠা ও অপরখানাতে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়া ২১ গাছি দুর্বা ও ২১টি ধান এবং মঙ্গল ঘট রাখিয়া নাটাই মঙ্গলচণ্ডী ঠাক্‌রুণের কথা শুনিতে হয়। ব্রত শেষে বতীর জ্যোৎস্নায় পিঠাগুলি দেয়াশলাই দ্বারা আগুনে কিঞ্চিৎ পোড়াইয়া পরে আধারে বসিয়া ভক্ষণ করিতে হয়-—মন্ত্রো যথা ঃ—

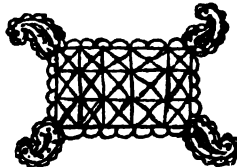
"জোনাকে পোড়ে, আধারে খায়।
যে যেই বর মাগে, সে সেই বর পায়।"

ওরা তাই শুনিয়া ভাবিল, নাটাই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিলে "দূরের বান্ধব উড়ে আসে", তবে আমরাও এ ব্রত করব। নাটাই মঙ্গলচণ্ডী ঠাক্‌রুণের বরে যেন বাবা ঘরে আসেন। সেদিন

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম রবিবার ছিল তাই তাহারা সেই দিনই ব্রত করিবে স্থির করিল, না হ'লে আবার কতকদিন বসে থাকতে হয়। কিন্তু ওরা বারদুয়ারে মাগিয়া খায়, পিঠে করবে, তার চাউল পাবে কোথা? তাই নদীর কিনারায় যাইয়া বালির পিঠা তৈয়ার করিল, একুশ গাছি দুর্বা তুলে আনল এবং ক্ষেত থেকে ২১টি ধান কুড়াইয়া নিয়া আসিল, কলার পাতে মঙ্গল ঘট রাখল, তারপর গৃহস্থ বাড়িতে যে কথা শুনিয়াছিল, দিদি তাহা বলিলে, ছোট ভাই দুর্বা হাতে করিয়া তাই শুনিল। কথা শেষ হলে বোন এক জোকার দিল।

ব্রত শেষে বর্তীর পিঠা খাইতে হয়, বালির পিঠা কি করে খাবে? শুঁকিয়া ফেলিয়া দিল। "দূরের বন্ধু উড়ে আসে" তবে তো বাবা কাল আসবেন। "রাত পোহা, রাত পোহা" রাত পোহাল, ভোরবেলা সত্যি সত্যি তারা দেখতে পেল রাজার সাত ডিঙ্গা। পাল খাটিয়ে আসছে, রাজা ছাদের উপরে বসে আছেন, হঠাৎ ছেলেমেয়ের উপর তাঁর নজর পড়ল। তিনি মাঝিদের ডেকে বলিলেন, "তোরা দেখতো ও দুটি কার ছেলেমেয়ে? মাঝিরা রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে নৌকাতে নিয়া আসিলেন। ছোট রাণী তাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তা শুনে রাজা খুব রেগে গেলেন এবং তাদের নৌকার ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়া ঘাটে যাইয়া টিকারা দিলেন এবং ছোট রাণীকে তাঁর নিজের ও বড় রাণীর ছেলে মেয়েকে সঙ্গে করিয়া নৌকার জিনিস বরণ করিয়া তুলে নিয়ে যেতে বললেন। এদিকে ছোট রাণী তাঁর নাটাইয়ের সূতা এলোমেলো করে ফেলে দিয়ে, মিছিমিছি মায়া কান্না কেঁদে বলিলেন, "বড় রাণীর" ছেলেমেয়ে দুটো যে দুষ্টু, বাপরে আমার নাটাইয়ের সূতা ছিঁড়ে ফেলেছে, তারপর দুই ভাইবোনে মিলে আমাকে মেরে ধরে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। রাজা বললেন, তবে থাক আর বরণ করে কাজ নাই, জিনিসপত্র এখন এমনি ঘরে তুলে নিব। তারপর রাজা একটা পুকুর কাটিয়া তেল সিঁদুর মাথায় দিয়া রাণীকে পুকুরটা সাতপাক ঘুরিয়া আসিতে বলিলেন। রাণী ছয়পাক ঘুরিয়া যেই সাতপাক ঘুরিবেন, অমনি রাজা তাঁকে পুকুরে ঠেলে ফেলে দিয়া হেঁটে কাঁটা পিঠে কাঁটা দিয়া পুতে রাখলেন। তারপরের বছর আবার অগ্রহারণ মাসের রবিবার আইল, রাজকন্যা ২১ গাছ দুর্বা আনলেন, কলার মাইজ কাটলেন, ৩খানা লুনো পিঠা আর চারখানা আলুনা পিঠা তৈয়ার করে ব্রত করলেন। নাটাই মঙ্গলচণ্ডী ঠাকরুণের বরে আর এক দেশের এক রাজপুত্র সেই দেশে বাণিজ্য করিতে আসলেন। রাজা তাঁহার সঙ্গে বড় রাণীর কন্যার বিয়ে দিলেন। এক বছর সেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে থেকে রাজপুত্র শ্বশুরকে বললেন মহারাজ! আমি দেশে যাব। রাজা বললেন "বেশ ত।" তিনি ধন দৌলত দিয়া জামাই ডিঙ্গা পূর্ণ করে দিয়ে, মেয়েকে শ্বশুরের ঘর করতে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা নৌকাতে যাইতেছেন দৈবাৎ সেদিন অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম রবিবার ছিল, কাজেই রাজকন্যা নৌকাতেই ব্রত করতে লাগলেন, বাড়ি থেকে দুর্বা ও পিঠা তৈরি করে নিয়ে এসেছিলেন। নাটাই মঙ্গলচণ্ডী ঠাক্‌রুণের কথা শুনিবার লোক নাই, নিজে বলিয়া নিজেই শুনতে লাগলেন। রাজা দেখলেন রাণী বিড় বিড় করে আপন মনে কি বকছেন, পাগল নাকি? জিজ্ঞাসা করলেন "ও কি কর?" "নাটাই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করি?" এ ব্রত করলে কি হয়? "অবিবাহিতার বিয়ে হয়, অপুত্রের পুত্র হয়, হারান ধন ফিরে আসে, ছোট ঘর বড় হয়, নির্ধনের ধন হয়, বড় ঘরে ছোট বর পায়, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, সর্বত্র জয় হয়, দূরের বন্ধু উড়ে আসে, নাটাই মঙ্গলচণ্ডীর বরে সকল ঘর ভরে। এই ব্রতের বরে আমি বিদেশের বাপ দেশে পেয়েছি, এই ব্রত করেই তোমাকে পেয়েছি।" কুবুদ্ধি রাজার সকল কথা বিশ্বাস হল না ; তিনি রাজকন্যার সকল অলঙ্কারের ঝাঁপিটি নদীর ভিতর ঝুপ করে ফেলে দিলেন, আর বললেন, "যদি ঘরে বসে এই ঝাঁপি ফিরে পাই, তবেই বুঝব নাটাই মঙ্গলচণ্ডী প্রত্যক্ষ দেবী। এইরূপ তার গা খালি করে, রাজা তাকে ঘরে নিয়ে গেলেন। ছেলে বিয়ে করে এসেছে শুনে তার মা বরণডালা সাজিয়ে বৌ ঘরে তুলে নিতে এলেন, কিন্তু বৌ দেখেই তো তার চক্ষুস্থির, ওমা! এই নাকি বৌয়ের শ্রী! বাপের বাড়ি থেকে ইচার আংটি গাছটিও দেয়নি। পাড়াপড়সীরা আউ, ছি, করতে লাগল। বুড়ো রাণী

মুখখানি হাঁড়িপানা করে বৌকে ঘরে তুলে নিলেন, কিন্তু বউ তাঁর দুচোখের বিষ হল। নানারকমে তাকে জ্বালা যন্ত্রণা দিতে লাগলেন। কিছুদিন পরে রাজকন্যার একটি ছেলে হল। বুড়ো রাজার ইচ্ছা হল একটা দীঘী কাটাবেন। হাজার হাজার মাটি কাটা লোক লাগিয়ে দিলেন, জল আর উঠে না, মজুরেরা একে একে বিদায় হয়ে চলে গেল, বলল "মহারাজ! আমাদের দিয়ে আর হবে না।" রাজা ইহা অলক্ষুণে কাণ্ড মনে করে ভেবে অস্থির হলেন। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁর নাতিকে কেটে রক্ত দিলে দিঘীতে জল উঠবে নইলে উঠবে না। দিঘীতে জল না উঠলেও চলে না, নাতিকেই বা কি করে কাটেন? তিনি দুঃখিত হয়ে পরদিন আর শোবার ঘরের দরজা খোলেন না। ছেলে এসে ডাকাডাকি করাতে খুলে দিলেন। ছেলে বাপের মুখখানা ভার দেখে জিজ্ঞেস করল, "বাবা কি হয়েছে?" রাজা এই নির্ঘাত স্বপ্নের কথা কোন মুখে বলবেন, তাই চুপ করে রইলেন। শেষে ছেলে অনেক পিড়াপিড়ি করাতে স্বপ্নের কথা খুলে বললেন। রাজপুত্র বললেন, "বাবা! তার জন্য কি, আপনি সাধ করে দিঘী কাটিয়েছেন রাজ্যের লোক তার জল খেয়ে বাঁচবে, ছেলের মায়া করে আমি তার ব্যাঘাত কিছুতেই হ'তে দিব না।" বুড়ো রাজাও শেষে সম্মত হইলেন, এবং ছেলের ভাত এবং পুকুর উৎসর্গ করার দিন পঞ্জিকা দেখে ঠিক করলেন। সেদিন ভারি ঘটা কত বামুন পণ্ডিত কত হাজার হাজার লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে কিন্তু জেলেরা জাল ফেলে একটি পুঁটি মাছও পেল না। এখন তো জাত যায়, উপায়! এদিকে নাটাই চণ্ডী ঠাকরুণ এক বুড়ির রূপ ধরে, পাকা চুলে সিন্দুর, চওড়া কস্তা পেড়ে শাড়ি ও শাঁখা পরে, আর এক গাল পান চিবুতে চিবুতে রাজকন্যাকে এসে বললেন, "বউ তুই বল্না যে আমি বাপের বাড়ি থেকে আসবার সময় যে গাঙ্গ দিয়ে এসেছি সেই গাঙ্গে একবার জাল ফেলিতে।" বউ সেই কথা শাশুড়িকে জানালেন, তিনি তো প্রথমে সে কথা গ্রাহ্যই করলেন না। অবশেষে বুড়ো রাজা শুনে ভাবলেন, একবার চেষ্টা করে দেখতেই বা বাঁধা কি? জেলেদের পাঠিয়ে দিলেন, ওমা! জাল আর টেনে তোলা যায় না অনেক টানাটানি করে তুলে দেখতে পাইল, প্রকাণ্ড একটা রাঘব বোয়াল উঠেছে? এত বড় মাছ কাটবে কে? আর সকলে পরাভব মানলে। নাটাই চণ্ডী ঠাকরুণ আবার এসে রাজকন্যাকে বললেন 'বউ তুই কাটগে না।' তিনি কাটতে গেলেন, পেট কেটে দেখেন তার মধ্যে তাঁর হারান অলঙ্কারের ঝাঁপিটা রহিয়াছে। ছেলের ভাত হল, এখন পুকুর উৎসর্গ হইবে, রাজপুত্র ছেলে কেটে রক্ত দেবার জন্য তাকে কোলে করে দিয়ে গেলেন, কেটে যেই রক্ত দিলেন অমনি দিঘী জলে ভরে থই থই করতে লাগল। নাটাই মঙ্গলচণ্ডী ঠাকরুণ আবার রাজকন্যাকে এসে বললেন, "বউ তোর যে সর্বনাশ হল তা তুই জানিসনি, তোর ছেলেকে যে ওরা কেটে নতুন পুকুরে রক্ত দিয়েছে।" রাজকন্যা তো তাই শুনে 'হায় কি হল' বলে কাঁদতে লাগলেন, নাটাই মঙ্গলচণ্ডী বললেন, "তা বউ আর কেঁদে কি হবে, শিগগির করে নতুন পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আয়" রাজকন্যা কাঁদতে কাঁদতে পুকুরে ডুব দিতে গেলেন। তখন নাটাই মঙ্গলচণ্ডীর মহিমা দেখে সকলেই অবাক হয়ে গেল, দেখল রাজকন্যা তাঁর ছেলেটিকে কোলে করে উঠলেন। সকলে অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, কি করে এরূপ হ'ল। রাজকন্যা নাটাই মঙ্গলচণ্ডীর কথা বললেন। রাজ্যশুদ্ধ এই রাষ্ট্র হল। সকল মেয়েরা ব্রত আরম্ভ করিল, নাটাই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত রাজ্যে প্রচারিত হল। শাশুড়ি এখন আর বউকে অনাদর করেন না। শেষে বুড়ো রাজা বুড়ো রাণী স্বর্গে গেলেন রাজপুত্র রাজা হয়ে স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।



ষষ্ঠী ঠাকুরাণী ব্রত

জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবস ছেলেপেলেদিগকে প্রহার বা তিরস্কার করা নিষেধ। ছেলেপেলেরা অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিলেও "ষাট ষাট" বলিয়া আদর করা ষষ্ঠী দেবীর অভিপ্রেত। এইদিন বিড়ালকেও খুব আদর করিতে হয়। সন্তানের মঙ্গলে মানসেই হিন্দু মহিলারা ষষ্ঠী দেবীর অর্চনা করেন।

এক ছিল তার বউ আর শাশুড়ি। শাশুড়ি ষষ্ঠী ব্রত করিতেন, ব্রতের সমস্ত আয়োজন করিয়া নৈবেদ্য সাজাইয়া বউকে বলিয়া যেতেন, "বউ! তুমি দেখিও বিড়ালে যেন নৈবেদ্য খায় না।" পেটুক বউ কিন্তু লোভ সামলাতে না পেরে সাজানো নৈবেদ্য থেকে কিছু কিছু খেয়ে কলা পাতা খানা গরুরে খাইতে দিত। শাশুড়ি এসে বলিতেন, "ও পোড়া কপাল এ নৈবেদ্যগুলো আগেভাগেই খেলো কে?" বউ খুব ভাল মানুষ সাজিয়া বলিত, "তা কি জানি তোমার কালো বিড়াল ছাড়া নৈবেদ্য খাইতে আর কে আসবে।" শাশুড়ি তাই সত্যি মনে করিয়া কালো বিড়ালটাকে ধরিয়া মারিতেন। বেচারা বিড়াল, বউর দোষে এইরকম করে মার খাইত। কি করবে কথা তো বলতে পারে না, তাই শুধু চুপ করে মার খাইত।

এইরকম করে কিছুদিন পরে শাশুড়ির মৃত্যু হল। বউ ঘরের গিন্নি হইল। বউ-এর ছেলেপেলে হবে, কিন্তু তাকে দেখবার শুনবার কোন লোক নাই। ষষ্ঠী ঠাকরুণ বউ-এর লোভের সাজা দিবার জন্য অবসর খুঁজছিলেন, এই সুবিধা পাইয়া তার শাশুড়ির রূপ ধরে এসে বললেন, "আহা, বউ তোর এত কষ্ট সইতে না পেরে আমি যমপুরী থেকে ফিরে আসিয়াছি, তা এখন আর তোর কোন ভাবনা নাই, ছেলে হলে আমিই দেখব শুনব এখন।" তারপর বউ-এর একটি টুকটুকে ছেলে হল। ষষ্ঠী ঠাকরুণ ছেলেকে চুরি করে নিয়া লক্ষ্মী ঠাকরুণের আসনের নিচে লুকাইয়া রাখিলেন এবং তাঁর বরে সেখানে চাঁদের মত দিন দিন ছেলে বাড়তে লাগল। বউ ছেলে বা শাশুড়ি কাহাকেও দেখতে না পাইয়া কেঁদে কেঁদে সারা হল।

কিছুদিন যায় বউর আবার ছেলে হবার সময় হল। এবার আবার ষষ্ঠী ঠাকরুণ তার মাসীর রূপ ধারণ করে ছেলেকে আগের মত লুকিয়ে রাখলেন। এই রকম করে ক্রমে ক্রমে বউর সাতটি ছেলে হল, কিন্তু ষষ্ঠী ঠাকরুণের কোপে পড়ে কাহাকেও কোলে রাখতে পারলেন না। তাঁর দুঃখে শিয়াল কুকুর কাঁদতে লাগল।

এদিকে ষষ্ঠী ঠাকরুণের পায়ে মস্ত এক গোদ হয়েছে, তার যন্ত্রণায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন। যদি নরলোকের কেউ এসে তাঁর গোদের পুঁজ, রক্ত চুষে বাহির করতে পারে, তবেই তাঁর যন্ত্রণার লাঘব হয়, তাই ঘোষণা করে দিলেন, "যদি কোন মেয়ে তাঁর গোদের পুঁজ, রক্ত চুষে দেয় তবে তিনি তাঁকে যে বর চাইবেন তাই দিবেন। বউ বুঝতে পেরেছিল ষষ্ঠী ঠাকরুণের কোপেই তার এদশা হইয়াছে। তাই সে ঠিক করল ষষ্ঠী ঠাকরুণের গোদের পুঁজ, রক্ত চুষে তাঁকে খুশি করে ছেলেদের আবার ফিরে পাবার বর চাইবে। অমনি এক ভিখারিনীর বেশ ধরে ষষ্ঠী ঠাকরুণের কাছে গিয়া বলিল, "আমি আপনার পুঁজ. রক্ত চুষে দিব, আমাকে একটা বর দিতে হইবে।" ষষ্ঠী ঠাকরুণ বললেন "তা বেশ" তারপর বউ তাঁর গোদের পুঁজ, রক্ত চুষে তাঁর যন্ত্রণা খুব কমাইয়া দিল। মা ষষ্ঠী খুব খুশি হয়ে বললেন, "তুমি কি বর চাও?" বউ বলিল "আমি বড় অভাগিনী, নিজের দোষে সোনার চাঁদ সাত ছেলে হারাইয়াছি। দয়া করে তাদের ফিরিয়া দিতে হবে।" ষষ্ঠী ঠাকরুণ তখন তাকে চিনতে পেরে বললেন. "ও তুই হতভাগিনী আমার নৈবেদ্যর আগ খেয়েছিলি ; যা যখন বর দিতে চাহিয়াছি তখন দিবই, ঐ পুকুর পাড়ে দেখতে পাবি, তোর ছেলেরা সব খেলা করিতেছে, যদি তারা তোর সঙ্গে যাইতে চায় তবে নিয়া যাবি।" বউ তখন পুকুর পাড়ে যাইয়া দেখতে পাইল কার্তিকের মত ছেলেরা ছুঠোছুটি করিয়া খেলা করিতেছে। বউ বলিল, "বাবা সকল ঘরে চল্ আমি তোদের হতভাগিনী মা, আয় কোলে আয়।"

কিন্তু তারা সকলেই বলিল, "ষষ্ঠী দেবীর নৈবেদ্য আগে আগে খায়, আমরা এমন মায়ের কাছে যাব না।" বউ কেঁদে কেঁদে কত বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু ছেলেরা কিছুতেই মায়ের সঙ্গে যাইতে স্বীকার করিল না। শেষে ষষ্ঠী ঠাকরুণের কথায় ছোট ছেলে বলিল, "আমার বার 'ষাট্' যদি রাখতে পার, তবেই যাইতে পারি।" মা বলিল, "সে কি রকম"। ছেলে উত্তর করিল, "মাসীর কান কেটে দিব তবু তিনি ষাট ষাট বলে কোলে নিবেন ; পিসির নাক কাটব তবু তিনি ষাট ষাট বলে কোলে নিবেন ; এইরূপ বার রকম দৌরাত্ম্যি যদি সইতে পার তবেই যেতে পারি।" মা তাতেই স্বীকার হইল, এবং শুধু ছোট ছেলেকে ঘরে নিয়ে গেল। বউ একটা ভাল কাজ করেছিল নৈবিদ্যি খেয়ে কলার পাতাখানি গরুকে খাইতে দিত। তার ফলে গরুর সুন্দর সুন্দর বাছুর হয়েছিল বউ তখন ছেলে ফিরে পাইয়া ষষ্ঠীর দেবীর ব্রত করে দেবীর বরে সুখে ঘর সংসার করতে লাগল। ষষ্ঠী ঠাকরুণের কাছে আর ছেলেরা সুখে আছে বুঝতে পেরে তদের জন্য আর তেমন ভাবনা রইল না।

সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত

অগ্রহায়ণ মাসের পাঁচ মঙ্গলবার ব্রত করিতে হয়, যদি পাঁচ মঙ্গলবার না পড়ে তবে মাঘ মাসের প্রথম মঙ্গলবারে অবশিষ্ট ব্রতটি করার নিয়ম।

একটি কলার মাইজে আটগাছি দুর্বা, আটটি ধান্য হইতে স্বহস্তে বিচ্যুত চাউল এবং নৈবিদ্যি রাখিতে হয়। ব্রতের পর উক্ত কলার পাতা জলে ভাসাইয়া দিতে হয়।

ব্রতের দিন ব্রতকারিণীকে আট মুষ্টি তণ্ডুলের অন্ন এবং আট তরকারি খাইতে হয়। উহার কিছুমাত্র ফেলিবার নিয়ম নাই। শাশুড়িগণ সেকালের বধূদিগকে পেট ভরিয়া খাইতে দিতেন না বলিয়াই কি দেবীর এরূপ বিধান?

এক ছিলেন রাজা। অপার ঐশ্বর্য। কিন্তু ছেলেপিলে নাই। এ রাজ্য কে ভোগ করবে? একে একে তিনটি বিয়ে করলেন। বিধাতার ফল তিনি না দিলে তো আর পাবার যো নাই! কোন রাণীরই ছেলেপিলে হল না, রাজার মনে সুখ নাই! আঁটকুড়ো হ'য়ে বেঁচে থাকলেই বা কি না থাকলেই বা কি? এরকমভাবে কিছুদিন যায়। একদিন রাজা সভাতে বসে আছেন, এমন সময় "জয় মা তারা" বলে এক সন্ন্যাসী এসে রাজাকে হাত তুলে আশীর্বাদ করে রাজার সামনে উপস্থিত হলেন। রাজা তাড়াতাড়ি উঠে সন্ন্যাসীকে আদর করে বসালেন। তারপর হাত জোড় করে জিজ্ঞেস করলেন—"দাসের ঘরে কি মনে করে প্রভুর পদধূলি পড়েছে, আজ্ঞা করলে, তা পালন করতে সাধ্যমত চেষ্টা করব।" শুনে সন্ন্যাসী আবার একটা হাই তুলে তুড়ি দিয়ে "তারা তারা" বলে বললেন বিশেষ কোন দরকারে আসি নাই, রাজ দর্শন করে মহারাজকে আশীর্বাদ করে যাবার জন্যই আসা হয়েছে। ভাল রাজপুত্রেরা কোথায়, তাদের তো দেখতে পাই না। সন্ন্যাসীর কথা শুনে রাজার দুঃখ আরও জেগে উঠল। তিনি ঘাড় হেঁট করে রইলেন, পাত্র, মিত্র, উজির, নাজিরেরা বললেন, "প্রভু ঐ দুঃখেই আমরা সকলে নিতান্ত মনোকষ্টে আছি, মহারাজের কোন ছেলেপিলে নাই।"

"ছেলেপিলে নাই?" সন্ন্যাসী এই কথা বলেই বললেন, "আচ্ছা, আমি একটা ঔষধ দিয়া যাই, রাণীদের তা খাওয়ালেই তাঁদের সন্তান হবে।" তারপর সন্ন্যাসী একটা গাছের শিকড় দিয়ে রাণীদের তাহা কাটিয়া খাইতে বলে, খড়ম চট চট করতে করতে চলে গেলেন। কিন্তু যাবার সময় বলে গেলেন, "মহারাজ! আমার ঔষধ খাইয়া রাণীমাদের নিশ্চয় ছেলে হবে, কিন্তু ছেলে হ'লে, আমাকে একটি দিতে হবে।" রাজা ভাবলেন মোটেই ছেলে নাই, সকল রাণীর ঘরে ছেলে হলে না হয় একটি দিব। তারপর প্রকাশ্যে বললেন, "যে আজ্ঞে।"

পরদিন স্নান করে শুদ্ধ হ'য়ে রাণীরা ঔষধ বেটে খেলেন। সন্ন্যাসীর কি মহিমা! এতদিন কত তুকতাক করে যা হয়নি সন্ন্যাসীর ঔষধে তাই হল, তিন রাণীই গর্ভবতী হলেন। তারপর দশমাস দশদিন পরে বড় দুই রাণী দুইটি করে যমজ সোনার চাঁদ ছেলে প্রসব করলেন। আর ছোট রাণী প্রসব করলেন একটি শঙ্খ! ওমা কি হবে! শঙ্খ আবার কারু পেটে হয় নাকি? রাজা শুনে ভাবলেন, রাণীর পেটে শঙ্খ হয়েছে লোকে শুনে বলবে কি? তা যা হবার হয়েছে ভেবে আর কি হবে। রাজপুরুষদের জন্ম উপলক্ষে দেশ শুদ্ধ আনন্দের রোল উঠল, রাজা অকাতরে দান ধ্যান করতে লাগলেন। এইরূপে কিছুদিন যায়।

শঙ্খের মা ছোট রাণীকে সকলেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে লাগলেন, এমনকি রাজাও তাঁকে দেখতে পারে না। তাঁকে বাগানের ভিতর আলাদা ঘর করে দিলেন, সেখানেই তাঁকে খাবার টাবার দিয়ে আসা হত। রাণী খাবার রেখে স্নান করতে যেতেন, এসে দেখতেন কে যেন তাঁর খাবারগুলো কতক খেয়েছে, কত এলোমেলো করে রেখেছে। রোজই এ রকম হয়, কে করে তা আর ধরতে পারেন না। তাই একদিন করলেন কি খাবার ঘরে রেখে স্নান করবার নাম করে বাইরে এসে চুপ করে দাঁড়াইয়া রইলেন। ওমা! দেখেন কি শঙ্খের ভিতর থেকে পরম সুন্দর এক টুকটুকে ছেলে বাহির হইয়া খাবার খাইতেছে। তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া গেলেন ধরতে, কিন্তু তাঁকে দেখেই ছেলে শঙ্খের ভিতরে আবার ঢুকে পড়ল, কিছুতেই আর তাকে ধরতে পারলেন না।

তার পরদিনও ঐ রকম করে লুকিয়ে রইলেন, শঙ্খ থেকে ছেলে বাহির হইল, অমনি তাকে ধরে ফেলিলেন। আর বললেন, "বাবা! এমন করে এতদিন ফাঁকি দিয়াছ, আর তোমাকে ছাড়ব না।" শঙ্খ রাজপুত্র বলিল আচ্ছা মা, এখন থেকে তোমার কাছেই থাকব, কিন্তু তুমি শঙ্খটা ফেলো না।

ছোট রাণী বললেন, তা হবে না ওটা থাকলেই তুমি ওর ভিতর ঢুকে পড়বে, আর তোমাকে খুঁজে পাব না, এই বলে তিনি শঙ্খটা ফেলে দিলেন, তারপর রাজার কাছে খবর পাঠালেন, এসে ছেলে দেখতে।

রাজা এসে ছেলে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। আদর করে কোলে তুলে নিলেন। সেইদিন থেকে ছোট রাণীর অবস্থা ফিরে গেল। তাঁর আদর আবার আগের মত বেড়ে উঠল।

এদিকে সন্ন্যাসীর কোন খোঁজ নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে সন্ন্যাসীর কথা মনে করিয়া রাজা মাঝে মাঝে চমকে উঠতেন। কিন্তু অনেক কাল তাঁর কোন খোঁজ না পাইয়া ভাবলেন, হয়ত সন্ন্যাসী মরিয়া গিয়াছে, আপদ গিয়াছে।

কিছুদিন এইরূপে যায় একদিন হঠাৎ সেই সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত। রাজার প্রাণ উড়ে গেল। ভয়ে ভয়ে তাঁকে বসতে দিলেন। সন্ন্যাসী বললেন, "মহারাজ! ছেলে?"

রাজা ভাবলেন বড় দুই রাণীর দুটি করে ছেলে, তাদের একজনকেই দিবেন।

কিন্তু সন্ন্যাসী বললেন, "মহারাজ! আপনি সব ছেলেকেই নিয়া আসুন আমি তার মাঝ থেকে একজনকে বেছে নিব।"

রাজা কি করেন? সকল রাজপুত্রকেই ডাকিয়া আনলেন। রাজা যে ভয় করেছিলেন তাই ; সন্ন্যাসী শঙ্খ কুমারকেই পছন্দ করে বসলেন।

রাজা বললেন, 'প্রভু ওটি ছোট রাণীর একমাত্র ছেলে আপনি ওকে ছেড়ে আর কাউকে নিন।"

সন্ন্যাসী বিরক্ত হইয়া বললেন—"না মহারাজ! আমি এইটিই চাই, তারপর রাজার সম্মতির অপেক্ষা না করেই শঙ্খ কুমারকে নিয়া চললেন।

ছোট রাণী খবর পাইয়া পাগলিনীর মত ছুটে এলেন এবং চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর কিছু মাত্রও দয়া হইল না। তিনি ছোট রাণীর দিকে ফিরেও চাইলেন না। ছোট

রাণী সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করতেন, দেবীকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, "মা! আমাকে এ সঙ্কট থেকে উদ্ধার কর।" তারপর শুনতে পেলেন তাঁর প্রাণের ভিতর থেকে কে যেন বলছে, "তোমার কোন ভয় নাই, আবার তোমার ছেলে তোমার কাছে ফিরে আসবে।"

ছোট রাণী শুনে কতকটা আশ্বস্ত হলেন এবং বললেন, "মা! তোমার পায়ে আমার বাছাকে সঁপে দিলাম, বাছা যেন আমার ভালয় ভালয় ফিরে আসে।"

এদিকে সন্ন্যাসী ছিলেন এক ব্যাপার নিয়া ; তিনি একশত আটটি রাজপুত্রকে কালীর নিকট বলি দিতে পারলে সিদ্ধ হ'তে পারবেন বলে একে একে একশত সাতটি বলি দিয়াছেন। শঙ্খ কুমারকে বলি দিতে পারলেই তাঁর কামনা পূর্ণ হয়।

তিনি শঙ্খ কুমারকে নিয়া আশ্রমে রাখিয়া পূজার জিনিস জোগাড় করতে গিয়াছেন। এমন সময় শঙ্খ কুমার দেখতে পেলেন একশত সাতটা মানুষের মাথা ঝুলান রহিয়াছে, কিন্তু সকলেই হাসছে। শঙ্খ কুমার ভাবলেন, এ এক তামাসা মন্দ নয়, কাটা মাথা হাসে, এমন তো কখনও দেখি নাই, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা হাসছ কেন?"

মাথাগুলো সব বলে উঠল, "হাসছি, তোমারও আমাদের মত দশা হবে, তাই মনে করে। সন্ন্যাসী একশত আটটি রাজপুত্রকে কালীর দুয়ারে বলি দিতে পারলে সিদ্ধ হতে পারবে, আজ তোমাকে বিনাশ করতে পারলেই একশত আট বলি পূর্ণ হয়।"

শঙ্খকুমার শুনে খুব ভয় পেলেন, কিন্তু কি করবেন, চুপ করে মন্দিরের দরজায় বসে রইলেন! এমন সময় শুনতে পেলেন দেবী বলছেন, "শঙ্খকুমার! তোমার ভয় নাই। যখন সন্ন্যাসী এসে তোমাকে প্রণাম করতে বলবেন, তখন তুমি বলো আমি প্রণাম করতে জানি না। তারপর সে যখন নিজে প্রণাম করে দেখিয়ে দিবে, তখন তুমি আমার হাত থেকে এই তরোয়ালখানা নিয়া তাকে কেটে ফেলবে, তারপর আমার পাদোদক রাজপুত্রদের কাটা মাথার উপর ছিটিয়ে দিলেই তারা বেঁচে উঠবে।"

শঙ্খকুমার বেশ করে সব কথা শুনলেন। তারপর সন্ন্যাসী এসে যখন রাজপুত্রকে বললেন, "শঙ্খকুমার! তুমি দেবীকে প্রণাম কর।" তখন তিনি বললেন, "প্রণাম? কৈ প্রণাম কি রকম করে করতে হয় তাতো জানি না, দেখিয়ে দিন।" সন্ন্যাসী তাই শুনে যেমন প্রণাম করে দেখাবার জন্য ঘাড় হেঁট করেছেন, অমনি শঙ্খকুমার দেবীর হাতের তরোয়াল নিয়া তার মাথাটি কেটে ফেললেন। তারপর দেবীর পাদোদক রাজপুত্রদের কাটা মাথার উপর ছিটিয়ে দিতেই তারা বেঁচে উঠল।

তারপর শঙ্খকুমার রাজপুত্রদের সঙ্গে করে দেশে চললেন। দেশে যেতে সমুদ্র পার হয়ে যেতে হয়, আসার সময় সন্ন্যাসীর শক্তিতে পার হয়েছিলেন, এখন কি করে পার হবেন? ছোট রাণী যে সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডী ঠাকুরাণীর ব্রত করে কলার মাইজ পাতা ভাসাইয়া দিতেন তাই ভেলা হয়ে এসে উপস্থিত হল। রাজপুত্রেরা তার উপর চেপে সমুদ্র পার হইলেন।

শঙ্খকুমার দেশে গিয়ে দেখেন মা তার শোকে পাগলিনীর ন্যায় আছেন, আর দিন রাত সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকছেন। শঙ্খকুমারকে দেখে তাঁর আর আনন্দের সীমা রইল না। তিনি সব কথা শুনে সঙ্গের রাজপুত্রদের বললেন, "বাছা সকল! আমি যেমন আমার শঙ্খকুমারের জন্য পাগলের মত ছিলাম, তোমাদের মায়েরাও ঠিক তেমনি আছেন। দেশে গিয়ে আপন আপন মাকে বলো যে—সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডী দেবীর দয়ায় হারান জীবন ফিরে পেয়েছ, তাঁহারা যেন দেবীর ব্রত করেন।"

রাজপুত্রেরা ছোট রাণীকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়া দেশে গেলেন। এইরূপে সঙ্কটা মঙ্গলচণ্ডী ঠাকুরাণীর ব্রত সকল জায়গায় প্রচারিত হইল।

সুমতি ঠাকুরাণীর ব্রত

এক যে ছিল বিধবা, তার একটি মাত্র ছেলে, নাম গোবিন্দা। সে রাজবাড়িতে রাজার একশত একটা হাঁস রাখত, তাতে যা কিছু পাইত তা দিয়া কোনও মতে তাদের দুজনের দিন চলত। একদিন খুব বৃষ্টি হইয়াছে, রাজবাড়িতে মাংস পোলাও প্রভৃতির খুব আয়োজন হইয়াছে। তাই দেখে গোবিন্দার জিভ দিয়াও টস টস করে জল পড়তে লাগল। কিন্তু রাজবাড়ির কেউ তাকে ডেকেও জিজ্ঞাসা করল না। কিন্তু রসনা তো সে কথা বোঝে না, সে মাংসের জন্য গোবিন্দাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। গোবিন্দা বাড়ি গিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে মাকে বলল, 'মা মাংস খাব।' মা বলল, 'তোকে কি ভাল খাওয়াতে আমার অসাধ বাছা? গরিবের ছেলে মাংস কোথা পাবি বল?' গোবিন্দা বলল, 'মা, মাংসের জন্য কোন ভাবনা নাই, আমি মাংসের যোগাড় করে দেই।' মা বলল, 'ওমা! সে কিরে? তুই মাংস কোথা পাবি? গোবিন্দা 'তুমি দেখই না কেন' এই বলিয়া অমনি ছুটে গিয়া রাজার যে একশত একটা হাঁস চরাতো, তা থেকে একটা হাঁস চুরি করে এনে কেটে কুটে মাকে রাঁধতে দিল। মার বুকখানা ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। রাজবাড়ির হাঁস চুরি করে আনে নাই তো, তা হলেই সর্বনাশ! রাজা গর্দান রাখবেন না। তা যা হবার হয়েছে এখন আর ভেবেচিন্তে কি হবে, মা রেঁধে দিল, গোবিন্দাও সাধ মিটিয়ে পেট ভরে মাংস খেল। পরদিন হাঁস বের করবার সময় রাজবাড়ির লোকেরা দেখতে পাইল একশত একটা হাঁসের মধ্যে একটা হাঁস নাই, অমনি সোর পড়ে গেল, রাজার কানে খবর গেল। রাজা রেগে হুকুম দিলেন, "কে কোথায় আছিস শিগগির গোবিন্দাকে ধরে নিয়ে আয়।" রাজার হুকুমে অমনি চারিদিকে লোক ছুটিল। তারপর দেখতে না দেখতে গোবিন্দাকে ধরে পিঠমোড়া করে বেঁধে রাজার কাছে হাজির করল। রাজা জবাফুলের মত চোখ রাঙা করে বললেন, "হ্যারে গোবিন্দা! তুই আমার হাঁস চুরি করে খেয়েছিস।" গোবিন্দার তো আত্মাপুরুষ উড়ে গেছে, মুখ দিয়া কথা বেরোয় না, অনেক কষ্টে বলল, "হ্যাঁ মহারাজ খেয়েছি।" রাজা বললেন তবে যা, এখন তোকে ছেড়ে দিলাম, সন্ধ্যার আগে যদি হাঁস আনতে না পারিস তবে তোর গর্দান নিব। গোবিন্দা কাঁদতে কাঁদতে মার কাছে গেল। ছেলের ভাব দেখেই মার প্রাণ চমকে উঠল। তারপর ছেলের কথা শুনে সে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। মা ও ছেলে এক রকমভাবে আছে রাঁধা নাই, বাড়া নাই, খাওয়া নাই, লওয়া নাই, উভয়ে গলা ধরে কেবলই কাঁদছে।

এদিকে কৈলাস থেকে ঠাকুর ঠাকুরাণী সোনার রথে চড়ে আকাশ দিয়া যাচ্ছেন! মা দুর্গা গোবিন্দা ও তার মার কান্না শুনে বললেন, 'প্রভু! মর্ত্য লোকে ও কে কাঁদছে আমি দেখে আসি। ঠাকুর বললেন কি জানি কে কাঁদছে ঐ জন্যই তো কোনখানে যেতে তোমাকে সঙ্গে নিতে চাহিনা। যার ইচ্ছা কাঁদুক, আমাদের তা দেখে দরকার কি?"

ভগবতী বললেন, "ওমা! সে কি কথা। আমাদের দরকার নাই? আমরা হচ্ছি জগতের লোকের মা বাপ, ছেলেমেয়ের কষ্ট আমরা দেখব না তো আর কে দেখবে? তুমি একটু থাক, আমি চট করে দেখে আসি।" এই বলিয়া ঠাকুরাণী রথ থেকে নামিয়া আসিলেন। তারপর গোবিন্দার মার মন কেমন, গৃহস্থের যে কাজ অতিথিদের সম্মান করা, বিপদে পড়ে সে তা ভুলিয়া গিয়াছে কিনা, তা পরীক্ষা করবার জন্য এক খুনখুনে বুড়ির রূপ ধারণ করে, শনের মত পাকা চুলগুলি চুলকাতে চুলকাতে এবং উকুনের কামড়ে আঃ উঃ করতে করতে, গোবিন্দার মার কাছে এসে বললেন, হাঁলো, গোবিন্দার মা ঘরে আছিস তো? বয়স হয়েছে ঢের চোকেও দেখতে পাই না—তা তোরা কাঁদছিস কেন? খাওয়া দাওয়া হয়নি বুঝি?" গোবিন্দার মা বুড়িকে বসতে দিয়া বলল—"আর মা আমাদের কি আর খাওয়া দাওয়া আছে, হতভাগা ছেলে লোভে পড়ে সর্বনাশ করে বসেছে। রাজার বাড়ির হাঁস চুরি করে খেয়েছে, রাজা তাই গোবিন্দার গর্দান নিবার হুকুম দিয়াছেন।" ঠাকরুণ বললেন, "রাজা বলেছেন বলেই কি সত্য সত্যিই একটা হাঁসের জন্য

গর্দা নিবেন? হয়তো ভয় দেখাইয়াছেন, তা তোমরা ভাবিও না রৌদ্রে অনেকটা পথ হাঁটিয়া আমার মাথা বড় গরম হইয়াছে, একটু তেল দেও তো।"

গোবিন্দার মা বলল, "আমার কি তেমন কপাল যে আমি কাউকে আদর যত্ন করব? দেখি শিশিটাতে তেল আছে নাকি।" তারপর শিশিটা উপুড় করে যে দুতিন ফোঁটা তেল বাহির হইল, দেবী তাই পাইয়া খুশি হয়ে বললেন, 'এতেই হবে।' একটু সিঁন্দুর দেখ্তো আছে কিনা? গোবিন্দার মা বিধবা, সিঁন্দুর কোথা পাবে? সে কালের কৌটাগুলা মুছে যা কিছু পাইল দেবী তাতেই খুশি হলেন, আর বললেন, "এতই যখন হল এখন একটু পান যদি দিতে পারতে তবেই হত।" অনেক খুঁজে গোবন্দির মা একটু শুকনা পান ও সুপারি এনে দিল। ঠাকুরাণী তাই খেয়ে গোবিন্দাকে বললেন, "গোবিন্দা! রাজা যখন তোকে হাঁস বের করতে বলবেন, তখন তুই বলবি "মহারাজ মিছিমিছি আমার গর্দা নিতে চাচ্ছেন, আপনার একশত একটা হাঁসই আছে, একটাও কমে নাই" এই বলে দেবী অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। গোবিন্দা ও তাঁর মা ইহা দেবী ভগবতীর খেলা মনে করে অবাক হইয়া রইল। তাদের ভয় দূর হল, প্রাণে বল এলো। এমন সময় দৈববাণী শুনতে পাইল, "আমার নাম সুমতি ঠাকুরাণী, রোজ পান সুপারি ও তেল সিঁন্দুর দিয়া আমার পূজা করবে, পাঁচজনকে ডেকে এনে কথা শুনবে, পূজা শেষ হলে প্রসাদ বেটে দিবে। তাহলে তোমাদের আর কোন দুঃখ কষ্ট থাকবে না, অপার ঐশ্বর্য হবে।" তারপর সন্ধ্যাবেলা রাজবাড়ি থেকে পেয়াদা পাইক এসে গোবিন্দাকে ধরে নিয়া গেল। গোবিন্দা কাঁপতে কাঁপতে রাজার কাছে গিয়া হাত জোড় করে বলতে লাগল "দোহাই মহারাজার! আমি হাঁস চুরি করি নাই, গণিয়া দেখতে আজ্ঞা হউক। একশত একটা হাঁসই আছে।" লোকজনেরা গণিয়া দেখিল সত্যি সত্যি একশত একটা হাঁসই আছে। সকলে অবাক হইয়া রহিল, যারা রাজাকে হাঁস চুরির খবর দিয়াছিল, তাদের মাথা হেঁট হল। রাজা রেগে বললেন, "তোমরা মিছিমিছি গোবিন্দাকে চোর বলেছ। তোমাদেরই গর্দান নিব।" যাহা হউক রাজা শেষে তাদের ক্ষমা করিলেন। এবং গোবিন্দাকে বকশিস দিয়া বিদায় করে দিলেন। তারপর থেকে গোবিন্দার মা রোজ সমুতি ঠাকুরাণীর ব্রত করতে লাগল। গোবিন্দার কপালও ফিরে উঠল।

একদিন গোবিন্দার মা ব্রতের কথা শুনবার জন্য রাজবাড়ি গিয়া রাণীদের ডেকে আনতে গিয়াছে। ওমা, কোথাকার গোবিন্দা ছোট লোক, তাঁদেরই হাঁস চরাইয়া খায়, রাণীরা কি পারেন তার বাড়িতে যাইতে? তাঁরা গেলেন না। সেই হতে ক্রমেই রাজার অবস্থা খারাপ হতে লাগল, আজ হাতিশালে হাতি মরে, কাল ঘোড়াশালে ঘোড়া মরে, এই রকম করে রাজা ক্রমেই লক্ষ্মীছাড়া হতে লাগলেন। আর গোবিন্দার অবস্থা ক্রমেই ভাল হতে লাগল। রাজা ভাবলেন, "গোবিন্দার এমন কপাল হল কি করে?" একদিন গোবিন্দাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যারে গোবিন্দা, তুই আমার একশো একটা হাঁস চরাইয়া কোনওরূপে দিন চালাইতি, এখন তোর অবস্থা এমন হল কি করে?" গোবিন্দা বলল, "মহারাজ! আমার মা সুমতি ঠাকরুণের ব্রত করেন তাতেই আমাদের এমন অবস্থা হয়েছে। মা একদিন ব্রত দেখবার জন্য রাণীমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তারা অহঙ্কার করে যাননি, তাই আপনার এমন দশা হইয়াছে।"

রাজা বললেন, "আচ্ছা কাল যখন সুমতি ঠাকরুণের ব্রত হবে, তখন আমাদের খবর দিবি, আমরা দেখতে যাব।"

পরদিন ব্রতের সময় গোবিন্দা এসে রাজাকে খবর দিল। রাজা রাণীদের সঙ্গে করে ব্রত দেখতে গেলেন এবং মানস করলেন, আবার যদি আগের মত তার ঐশ্বর্য ফিরে আসে, তবে তিনি খুব সমারোহ করে, ব্রতের জায়গা সোনা দিয়া বাঁধিয়া ব্রত করবেন।

সুমতি ঠাকরুণের বরে তাঁর রাজ ঐশ্বর্য ফিরে পেলেন। রাজা খুব ধুমধাম করে ব্রতের যোগাড় করলেন, কিন্তু ব্রতের কথা কইবে কে? গোবিন্দার মাকে ডাক। গোবিন্দার মা বলল, "মহারাজ আমি গরিব গৃহস্থের ব্রতের কথাই জানি, রাজ-রাজরার ব্রতের কথা কিরূপে বলব। পুরোহিত ঠাকুরকে ডাকুন। কিন্তু সমুতি ঠাকরুণের ব্রত কথা পুরোহিত ঠাকুরও জানেন না।

এমন সময় মহাদেব আকাশ পথে সেইখান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি মর্তে এই গোলমাল দেখে ব্যাপার কি জানবার জন্য এক বুড়ো বামুনের রূপ ধরে এলেন, এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি বলাবলি করছ।" রাজা বললেন, "আমার রাণীরা সুমতি ঠাকরুণের ব্রত করবেন কিন্তু কথা বলবার পুরোহিত খুঁজে পাইতেছি না।"

ঠাকুর বললেন, "তা আমি পূজা করব।"

তারপর মহাদেব নিজেই ব্রতের মন্ত্র পড়লেন এবং যাবার সময় মানস করে গেলেন, "যদি কৈলাসে গিয়া দেখি দুর্গা ও গঙ্গা দুই সতীনে খুব প্রণয় হয়েছে, তারা এক বাটায় পান খায়, এক জায়গায় বসে গল্প করে, তবে আমিও সুমতি ঠাকরুণের ব্রত করব। কৈলাসে গিয়ে সত্যি সত্যি দেখতে পেলেন দুই সতীনে খুব পীরিত হয়েছে। তারা এক বাটায় পান খায়, এক জায়গায় বসে গল্প করে। তিনি তখনি ব্রতের আয়োজন করলেন। দেবী এসে হেসে বললেন, "ও আবার কি হইতেছে আমাকে আবার পূজা করা কেন?"

ঠাকুর বললেন, 'এ পূজার ফলে যদি দুই বোনের মধ্যে এমন প্রণয় দেখতে পাই, তবে রোজ এ পূজা করব।"

এইরূপ ক্রমে সুমতি ঠাক্‌রুণের ব্রত মর্তলোকে প্রচারিত হইল।

ক্ষেত্র ব্রত

নব বধূ শ্বশুরালয়ে আসিয়া অনভ্যাস বশতঃ বেগুন ভাজিতে ভাজিতে দৈবাৎ একখানা উনানে পড়িয়া গেলে গিন্নি বধূকে তিরস্কার না করিয়া "ক্ষেত্তর ঠাকুরের" ভোগে লাগিয়াছে বলিয়া বরং আনন্দ প্রকাশই করিয়া থাকেন। ক্ষেত্র ঠাকুরের এই মধ্যস্থতায় অনেক অসাবধানা বধূ শাশুড়ির তিরস্কার হইতে রক্ষা পাইয়া যান। এই ক্ষেত্র ঠাকুর কে তাহা ব্রতকারিণীগণ ঠিক বলিতে পারেন না। অনেকে অগ্নিদেবকেই ক্ষেত্র ঠাকুর বলিয়া নির্দেশ করেন আর কেহ কেহ বলেন সূর্যদেবই ক্ষেত্র ঠাকুর। আমার শেষেরটিই সত্য বলিয়া মনে হয়। কেননা সূর্য হইতেই আমরা খাদ্যাদি পাইয়া থাকি। আর রাখালদিগকে উদর পুরিয়া ছাতু ভক্ষণ এবং ক্ষেত্রস্থিত কীট পতঙ্গের আহার সংস্থান করাই ক্ষেত্রব্রতের প্রধান অঙ্গ। অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে কদলী, ছাতু, খেজুরের গুড় প্রভৃতি উপকরণাদি দ্বারা ব্রত করিবার নিয়ম।

এক যে রাড়ীর পুত মইল্লা তার সংসারে কেউ নাই কেবল এক মা। এরা খুব গরিব। একদিন খাওয়ার জোটে তো একদিন জোটে না। মা নিজের জন্য ভাবেন না, বিধবা হওয়ার পর যে ছেলেটিকে বুকে ধরে মানুষ করছেন ; সময় মত তার মুখে দুটো ভাত দিতে পারেন না, এ কষ্ট আর রাখবার স্থান নাই। লক্ষ্মী ঠাক্‌রুণের বরে মইল্লার মামাদের খুব কপাল। তাই তার মা ভাবলেন, ছেলেকে সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া যাউক, সেখানে কত চাকর বাকর খাটছে মইল্লা তো আপনার লোক, গরুটা বাছুরটা রাখবে আর তিন বেলা পেট ভরে খেতে পাবে। এইরূপ ভেবে মা ছেলেকে ভাইদের বাড়িতে পাঠাইয়া ছিলেন। মামারা মইল্লাকে দেখে খুশি হয়ে বলল, "এতদিন আসিস নাই কেন? কত লোক আমাদের এখানে খায়, আর তুই আমাদের ভাগ্নে এতদিন খেতে পরতে কষ্ট পেয়েছিস। তুই আমাদের এখানে থাক, গরু বাছুর রাখবি, আর ক্ষেতে আমাদের জন্য নাস্তা নিয়া যাবি। এখানে খেতে পরতে কোন কষ্ট হবে না, দিদিকেও মাঝে মাঝে খোরাক পাঠাইয়া দিব।" মইল্লা এখানে বেশ সুখেই রইল। কিন্তু কোন কোন মেয়ে মানুষের কেমন স্বভাব, পরের ভাল চোখে সয় না, মইল্লার মামীদের সে দু'চক্ষের বিষ হল। তারা মইল্লাকে পাতের এঁটো কাঁটা দিতে লাগল। সে পেটের দায়ে কিছু কিছু খেত, আর সব ঢেঁকি ঘরের পেছনে মাটির নিচে পুতে রাখত। এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন মইল্লা মামাদের জন্য নাস্তা নিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় শুনতে পেল, কে যেন একটা ঝোপের নিচে থেকে তাকে

ডেকে বলছে "মইল্লা তুই যে তোর মামাদের জন্য খাবার নিয়া যাস তা থেকে সব রকমের কিছু কিছু এখানে রেখে যা ; তোর ভাল হবে।" মইল্লা বলল, "বাপরে তাও কি হয়! তা হলে কি আর মামীরা আমাকে আস্ত রাখবে? ঝাঁটা পেটা করে বাড়ি থেকে তাড়াইয়া দিবে?" ঝোপের নিচে থেকে আবার সেইরূপ শব্দ হল—"তোর কোন ভয় নাই, তুই আমার কথা শোন, তোর ভাল হবে।" মইল্লা তখন মাথা থেকে খাবারের ভাঁড় নামিয়ে সব রকমের কিছু কিছু খাবার সেখানে রেখে মামাদের কাছে গেল। ফিরে আসবার সময় ঝোপের নিচে থেকে আবার শব্দ হল, "মইল্লা তুই বড় ভাল ছেলে, আমি তোর উপর বড় খুশি হয়েছি। তুই সন্ধ্যাবেলা এখানে এসে মাটি খুঁড়লে এক কলসী মোহর পাবি, তাই নিয়ে যাস, তা হলেই তোদের কপাল ফিরবে।"

মইল্লা সেদিন মামার বাড়িতে গিয়া বিকালবেলা মামাদের বলল, "মাকে দেখবার জন্য মন বড় ব্যস্ত হয়েছে আমি বাড়ি যাব।" মামারা ভাবিল, "হতে পারে, ছেলেমানুষ কতদিন ধরে মা ছেড়ে এসেছে।" তাঁরা তাকে যেতে দিল। মইল্লা সন্ধ্যাবেলা সেই ঝোপের মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে সত্যি সত্যি এক কলসী চকচকে মোহর পাইল, তার আর আহ্লাদ ধরে না। বাড়িতে এসে মাকে কলসীটি দিল এবং সেদিন থেকেই তাদের কপাল ফিরে গেল। দেশে বিদেশে তাদের ঐশ্বর্যের কথা রাষ্ট্র হল, মইল্লা নাম ঘুচে গিয়ে তখন তার নাম হল "নতুন রাজা"। দীন দুঃখীর প্রতি নতুন রাজার অসীম করুণা। তাঁর সুখ্যাতির কথা আর লোকের মুখে ধরে না। নতুন রাজার একদিন ইচ্ছা হল দীঘি কাটাবেন, দেশে বিদেশে ঢোল পিটিয়ে দিলেন "নতুন রাজা দীঘি কাটাচ্ছেন, যে যত ওড়া (ঝোড়া) মাটি কাটবে, সে তত ওড়া কড়ি পাবে।" দেশ বিদেশ থেকে দীন দুঃখী লোক মাটি কাটতে আসতে লাগল, রাজা তাদের কড়ি বুঝাইয়া দিবার জন্য একজন সরকার রেখে বলে দিলেন, যত মজুর আসবে, আগে সবাইকে একবার তাঁর কাছে হাজির করতে হবে, তারপর মাটি কাটবে।

এদিকে হয়েছে কি, নতুন রাজার মামাদের আর কষ্টের সীমা নাই ; সবদিন খাওয়াও জোটে না। তখন একদিন মামীরা বলল, "শুনলাম কে এক নতুন রাজা দীঘি কাটাচ্ছেন মজুরেরা যত ওড়া মাটি কাটে তত ওড়া কড়ি পায়, একবার সেখানে গিয়া দেখনা।" তারা ভাবল, "মন্দ নয় কয়েক ওড়া মাটি কাটলে কিছুদিনের খাওয়ার যোগাড় হবে।" তখন মামারা দুই ভাইয়ে নতুন রাজার বাড়িতে গেল, তাদের ভাগ্নে মইল্লাই যে নতুন রাজা হয়েছে তা তারা জানত না। রাজার বাড়িতে যেতেই সরকার তাদের রাজার কাছে নিয়া গেল, রাজা তাদের চিনতে পারলেন ; কিন্তু তারা চিনতে পারল না। রাজা সরকারকে বললেন, "এদের এখন মাটি কাটতে হবে না, নতুন কাপড় এনে দাও, আর স্নানের জোগাড় করে দাও।" মামাদের তো একথা শুনে ভয়ে 'আত্মাপুরুষ' উড়ে গেল। "নতুন পুকুরে শুনেছি নরবলি দিতে হয়, তবে কি আমাদেরই বলি দিবে।" স্ত্রীদের মনে মনে গালাগালি করে তারা ভয়ে ভয়ে স্নান টান করল ; কিন্তু দেখে রাজা তাদের উপর কোনই দুর্ব্যবহার করেন না। অন্দরমহলে খাবার জায়গা হয়েছে সেখানে গিয়া তারা রাজাকে দেখল, কথায় যেন চেনা লোকের মত মনে হল, ব্যাপার কি? তারপর খেতে বসে নতুন রাজা মামীদের দুর্ব্যবহারের কথা গোপন করে সব খবর বললেন এবং মামীদেরও আনার জন্য পাল্কী পাঠাইয়া দিলেন।

মামীরা এলেন, কিন্তু এখন ভাগ্নের প্রতি তাদের ভালবাসা উথলে উঠল। ভাগ্নেকে নিজের হাতে খেতে না দিলে আর তাঁদের মন ওঠে না। দুধের সর প্রভৃতি ভাল জিনিস সবই ভাগ্নের পাতে দেন। একদিন মামা ভাগ্নে খেতে বসেছেন, মামীরা পরিবেশন করছেন, আর ভাল খাবারগুলি সবই ভাগ্নের পাতে ঢেলে দিচ্ছেন, ভাগ্নে তখন একটু হেসে বললেন--

"সেই মামা সেই মামী পুকুর পাড়ে ঘর,
কেন লো মামী নড়চড় হাতে রেখে সর?"

মামারা এই কথার অর্থ কি জিজ্ঞেস করতে, নতুন রাজা মামীদের ব্যবহারের কথা বললেন।

তারা তো রেগে স্ত্রীদের মারধর করতে যায় কিন্তু নতুন রাজা বললেন, "এদের কি দোষ, আমার কপালে দুঃখ ছিল বলেই ওদের এরূপ মতিগতি হয়েছিল, আবার অদৃষ্টের সঙ্গে সঙ্গেই মতিগতি ফিরেছে।"

এইরূপে দুঃখী বিধবার ছেলে মইল্লা ক্ষেত্র ঠাকুরের বরে রাজা হয়ে সুখে সংসার করতে লাগল।

সুবচনী ব্রত

এক ব্রাহ্মণের একটি মাত্র ছেলে তার নাম দুইখ্যা। দুইখ্যা হাজার বাড়ি হংস পালে। এক নাপিত দূত রাজাকে ক্ষৌরী করিতে যায়, তখন দেখে যে দুইখ্যা রাজার ১০৮টি হংস চরাইতেছে। ইহা দেখিয়া নাপিত দূত বলিল—"এত হংস চরাও, আজ একটা হংস আমরা মারিয়া খাই।" তদুত্তরে দুইখ্যা বলিল, "আমি হংস মারিলে রাজা আমার গর্দান নিবে।" নাপিত দূত বলিল—রাজা কি হংস গণিতে আসিবে? চল একটি হংস মারিয়া খাই। পরে নাপিত দূতের কথায় একটি হংস মারিল। এই সংবাদ পরে রাজার কানে গেল। ইহা জানিতে পারিয়া দুইখ্যা বাড়িতে ছালিভুরার মধ্যে মৃত হংসটি লুকাইয়া রাখিল। রাজা হংস মারার কথা শুনিয়া দুইখ্যার মাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে—"দুইখ্যার মা! তোমার দুইখ্যা নাকি আজ একটি হংস মারিয়া খাইয়াছে।" তদুত্তরে দুইখ্যার মা বলিল—'রাজা মশায়! আমি ইহার কিছুই জানি না।" পরে দুইখ্যার মা দুইখ্যাকে জিজ্ঞাসা করিল—দুইখ্যা বলিল—"না, মা! আমি মারি নাই, নাপিত দূত আমার নিকট দিয়া যাওয়ার সময় মারিয়াছে। পরে নাপিত দূত যাইয়া চালাকি করিয়া রাজার নিকট বলিয়াছে যে, দুইখ্যা হংস মারিয়াছে।"

অনেকদিন হইতেই দুইখ্যার মার ঘরে সুবচনী স্থাপিত ছিল। দুইখ্যার মা সুবচনী মার একজন প্রধান সেবিকা। তাড়াতাড়ি দুইখ্যার মা ঘাটে যাইয়া ডুব দিয়া বলিল—মা! সুবচনী তুমি জানিও। তোমাকেই রোজ পূজি। তুমি ছাড়া আর আমার এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার কেহই নাই। দুইখ্যার মা একখানা কলার মাইজ কাটিয়া, তাতে তৈল সিন্দুর দিয়া সুবচনী মার পূজা করিয়া আসিলেন। আর দুইখ্যাকে বলিলেন—মরা হংসটা কোথায় রাখিয়াছ দাও আমি জিয়াইয়া দিই। পরে দুইখ্যা মৃত হংসটি আনিয়া মার নিকট দিল। দুইখ্যার মা সুবচনীর ঘট হইতে তিনবার জলের ছিটা দিল, তাহাতেই মৃত হংসটি বাঁচিয়া উঠিল। পরে তৈল সিন্দুর দিয়া হংস পালের মধ্যে উড়াইয়া দিল।

এদিকে রাজা এক সভা মিলাইয়া দুইখ্যা ও তাহার মাকে ডাকাইয়া আনিলেন। রাজা সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন। দুইখ্যারে গর্দান নিব না জেলে বন্দি করিয়া রাখিব। ইহা শুনিয়া দুইখ্যার মা রাজার নিকট বলিল—রাজা মশায়? আমার দুইখ্যাকে উচিৎ বিচার করিয়া বধ করেন। ১০৮টি হংস আছে কিনা তাহা গণিয়া দেখুন, পরে দুইখ্যাকে বধ করেন। তখন রাজা বলিলেন যে, আমার কাছে একবার হংস গণিয়া দেখাও। তদনুসারে রাজার নিকট হংস গণিয়া দেখাইলেন, ঠিক ১০৮টি হংসই আছে।

দেখুন তো রাজা মশায় আমার দুইখ্যাকে কেন বধ করিতে চাহিয়াছিলেন? পরে সভাস্থ সকলে বলিল যে, এরূপ রাজার সভাতে আমরা আর আসিব না। রাজা দেখিতে পাইলেন যে, হংস পালের মধ্যে কেবল একটি হংসের কপালে তৈল সিন্দুর মাখা, অপরগুলির মধ্যে নাই কেন?

ইহার কারণ দুইখ্যার মার নিকট জিজ্ঞাসা করায় দুইখ্যার মা বলিল—"আমার দুইখ্যার কোন দোষ নাই। দুইখ্যা হংস মারে নাই। নাপিত দূত হংস মারিয়াছিল। আমি সুবচনী ছাড়া আর কিছুই জানি না। সুবচনীর আমি একজন সেবিকা। সুবচনীর অনুগ্রহে তৈল সিন্দুর দিয়া মরা হংসটি বাঁচাইয়াছি।"

ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন—দুইখ্যা সত্যি করিয়া বলত? কে হংস মারিয়াছি? আমি রাজত্বের অর্ধেক তোমাকে দিব এবং আমার মেয়ের তোমার নিকট বিবাহ দিব।

দুইখ্যা শপথ করিয়া বলিল যে, "নাপিত দূতই হংস মারিয়াছিল।"

পরে নাপিত দূতকে ডাকিয়া আনিয়া রাজা তাহাকে শাস্তি দিলেন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া, রাজার কন্যা দুইখ্যার নিকট বিবাহ দিলেন। দুইখ্যারে বাড়ি ও দালান কোঠা তৈয়ার করিয়া দিলেন এবং খাওয়া পরার জন্য কাপড় ও টাকাকড়ি ইত্যাদি দিলেন। দুইখ্যার অবস্থা ফিরিল ও সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। পরে একদিন রাজা মহাসমারোহে কলার মাইজ, আমের পল্লব, পান, সুপারী ও তৈল সিন্দুর ও নানাবিধ উপকরণ দিয়া সুবচনীর ব্রত করিলেন এবং রাজ্যেও প্রচার করিয়া দিলেন। সুবচনী ব্রতকথা সকলে শুনিবে ও তৈল সিন্দুর সধবাকে দিবে। যে ভক্তিপূর্বক ব্রতকথা কয় ও শুনে সুবচনী মা! তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

নিস্তারিণী ব্রত

প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে নানাবিধ শাকসব্জী ইলিশ মৎস্য, অন্নব্যঞ্জনাদি রান্না করিয়া ব্রত করিবার নিয়ম।

এক গোয়ালা কন্যার সঙ্গে এক ব্রাহ্মণ কন্যা সই পাতাইয়াছে। ব্রাহ্মণ কন্যার বাড়ি নিস্তারিণী ব্রত উপলক্ষে গোয়ালা কন্যাকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছে। পরে গোয়ালা কন্যার বাড়িও নিস্তারিণী ব্রত উপলক্ষে ব্রাহ্মণ কন্যাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। এবং ব্রতান্তে ব্রতের উপকরণ নৈবেদ্য ও অন্ন ব্যঞ্জন ইত্যাদি একটি ধামায় করিয়া ব্রাহ্মণ কন্যার বাড়ি নিয়া যাইতেছিল। রাস্তায় রাজবাড়ির কোতোয়াল দেখিতে পাইয়া গোয়ালা কন্যাকে বলিল—তোমার ধামার মধ্যে কি? আমাকে দেখাও।

গোয়ালা কন্যা বারংবার বলিল যে, "ইহার মধ্যে যে জিনিস আছে তোমাকে দেখাইতে পারি না।"

পরে কোতোয়াল জোর করিয়া দেখিল যে, "রান্না সব জিনিস" তাহার সই ব্রাহ্মণ কন্যার জন্য নিয়া যাইতেছে। ইহাতে ব্রাহ্মণ কন্যার জাতি নষ্ট হইবে বলিয়া কোতোয়াল রাজার নিকট যাইয়া সব বলিল। তৎক্ষণাৎ রাজা কোতোয়ালকে পাঠাইয়া গোয়ালা কন্যাকে ডাকাইল। গোয়ালা কন্যা ভয়েতে "মা নিস্তারিণী আমাকে রক্ষা কর" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ধামা নিয়া গোয়ালা কন্যা রাজবাড়ি উপস্থিত হইল। ধামা খুলিয়া দেখে যে নিস্তারিণী মার অনুগ্রহে সমুদয় "রান্না জিনিস" "কাঁচা তরকারি" ইত্যাদি হইয়াছে। রাজা ইহা দেখিতে পাইয়া কোতোয়ালকে শাস্তি দেওয়ার প্রস্তাব করিল। কোতোয়াল এরূপ দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল এবং রাজার নিকট করজোড়ে বলিল যে, "হুজুর গোয়ালা কন্যা নিস্তারিণী মাতার সেবিকা। গোয়ালা কন্যা নিস্তারিণী মাতাকে ডাকিয়াছিল, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া রান্না জিনিস কাঁচা করিয়া দিয়াছেন। আমার কোন দোষ নাই। আমাকে ক্ষমা করুন।"

রাজা ইহা শুনিয়া গোয়ালা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তুমি এরূপ করিলে? গোয়ালা কন্যা রাজার নিকট সমুদয় কথা ব্যক্ত করিল। রাজা কোতোয়ালকে মুক্ত দিলেন। গোয়ালা কন্যাও সেই অবধি রান্না জিনিস আর ব্রাহ্মণ বাড়িতে লইয়া যেতেন না। রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, এই ব্রত করিলে লোকে বিপদ হইতে নিস্তার পায়। সেই হইতে দেশে ব্রত প্রচার করিয়া দিলেন।

কালকরের ব্রত

কালকর কৃষ্ণ কুমার ঠাকুর নামক দুইজন পথিক ব্রাহ্মণ একদিন দুপুরবেলা কোন এক অতিথি সেবিকা ব্রাহ্মণ কন্যার বাড়ি আসিয়া অতিথি হইল। ব্রাহ্মণ কন্যা তাহাদিগকে দেখিয়া বসিবার আসন দিলেন এবং তাঁহাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণদ্বয় উপবেশন করিয়া বলিলেন—আমরা কিন্তু মাছ মাংস ছাড়া আহার করি না। ব্রাহ্মণ কন্যা তাহাই স্বীকার করিলেন। তখন দুপুরবেলা ব্রাহ্মণ কন্যা কোথা হইতে মাছ, মাংস সংগ্রহ করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। দুপুরবেলা ব্রাহ্মণদ্বয় না খাইয়া ফিরিয়া গেলেও পাপ হইবে মনে করিয়া, স্বীয় ক্রোড়ের পুত্র কাটিয়া উহার মাংস রান্না করিয়া ব্রাহ্মণদ্বয়কে পরিতোষ করিয়া ভোজন করাইলেন। ব্রাহ্মণদ্বয় ভোজনান্তে সন্তুষ্ট হইয়া যখন বাড়ির দিকে রওনা হইলেন তখন ব্রাহ্মণ কন্যাও কিছুদূর তাঁহাদের পেছনে পেছনে অগ্রসর হইলেন। পরে বাড়ি আসিয়া দেখিলেন যে ঘরের মেঝেয় ছেলে ওয়া ওয়া করিয়া কাঁদিতেছে। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ কন্যা আশ্চর্যান্বিত হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণদ্বয়ের পিছু পিছু দৌড়াইয়া যাইয়া বলিলেন—"ঠাকুর তোমার কি জান? কি শুন? আমি কোলের ছেলে কাটিয়া উহার মাংস দ্বারা তোমাদিগকে আহার করাইয়াছি। সেই ছেলে পুনরায় কিরূপে বাঁচিয়া উঠিল ও আমার ঘরের মেঝেয় ওয়া ওয়া করিয়া কাঁদিতেছে।" তদুত্তরে ব্রাহ্মণদ্বয় বলিলেন—"আমরা কালকর কৃষ্ণকুমার ঠাকুর। আমাদের ব্রত দেশে প্রচার নাই। আমরা ছেলেপেলে ও গরু বাছুরের রক্ষক। চৈত্র মাস যায় বৈশাখ মাস আসে এই সংক্রান্তিতে আমাদের পূজা দিতে হয়। আমাদের বরে তোমার মৃত ছেলে পুনরায় জীবিত হইয়াছে।" সেই হইতে ব্রাহ্মণ কন্যা চৈত্র সংক্রান্তিতে একখানা কলার মাইজে আম, কলা, বাঙ্গি নানাবিধ ফল ফলাদি ও দধি চিড়া ছাতু ইত্যাদি স্থাপন করিয়া কালকরের পূজা দিতেন ও কথা বলিতেন। সেই হইতে দেশে 'কালকরের ব্রত' প্রচারিত হইল।

ইয়াতলি ব্রত

এক যে ব্রাহ্মণ—তার দুই কন্যা। কন্যা দুইটি রাখিয়া মা স্বর্গে গেলেন। ব্রাহ্মণ আবার বিবাহ করিলেন। সৎ মা কন্যা দুইটিকে দুই চক্ষের কোণেও দেখিতে পারে না। ব্রাহ্মণের মনে সুখ নাই।

কন্যা দুইটি জ্বালায় যন্ত্রণায় কাহিল হইয়া গিয়াছে। ফোঁড়ায় পাঁচড়ায় গা খসিয়া পড়ে। সৎ মা সর্বদাই গেন্-গেন্ করে। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, এই কষ্ট তো আর দেখা যায় না। মাসী বাড়ির নাম করিয়া এক জঙ্গলে রাখিয়া আসি। দেবতার দয়া থাকে বাঁচবে, দয়া না থাকে তাহা হইলে কি হইবে?—ব্রাহ্মণ আর ভাবিতে পারিলেন না। এক অরণ্যের মধ্যে কন্যা দুইটিকে ঘুমন্ত অবস্থায় রাখিয়া আসিলেন।

ব্রাহ্মণ যাওয়ার সময় পানের পিচ ফেলিয়া গিয়াছিলেন। ছোট মেয়েটি ভাবিল, বাপকে বাঘে খাইয়াছে। বড়টি ভাবিল—মাসী বাড়ির নাম করিয়া বাবা যন্ত্রণা এড়াইলেন। কন্যা দুইট অরণ্যে বসিয়া কাঁদিতেছে, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিলেন—তোমরা কাঁদিও না। তোমাদের ভয় নাই। আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব। যাহারা ফোঁড়া-পাঁচড়া হইয়া দুঃখ কষ্ট পায়, আপনার জন যাহাদিগকে ছাড়িয়া যায়, আমি তাহাদিগকে রক্ষা করি। যাহারা আমার পূজা করে, তাহাদের ফোঁড়া-পাঁচড়া দূর হয়, দিব্য কান্তি-পুষ্ট শরীর হয়, সব দুঃখ দূরে যায়। তোমরা আমার পূজা করিও তবেই সকল দুঃখ দূরে যাইবে। অগ্রহায়ণ কি মাঘ মাসে রবিবার কিংবা বৃহস্পতিবার একুশটি দৌলা-পিঠা, পায়েস দিয়া আমার পূজা করিতে হয়।

কন্যা দুইটি নিকটে কোন ক্ষেত হইতে ধান কুড়াইয়া আনিয়া দৌলা তৈয়ার করিল, তারপর ইয়াতল-পরমেশ্বরের পূজা করিল। তাহাদের পূজায় ইয়াতল ঠাকুর সন্তুষ্ট হইলেন।

এক রাজপুত্র ও সওদাগর পুত্র বনে শিকার করিতে আসিয়া কন্যা দুইটিকে বিবাহ করিয়া রাজধানীতে লইয়া গেলেন। সেখানে তাহারা সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। ইয়াতল পরমেশ্বরের কৃপায় তাহাদের কোন কষ্টই রহিল না—তখন হইতে ইয়াতল ঠাকুরের পূজার প্রচার আরম্ভ হইল।

ষষ্ঠী ব্রত

এই ব্রত কথাটা সুতিকা গৃহে ষষ্ঠী দিবস, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও বিবাহ উপলক্ষে কথিত হয়।

এক আটকুঁড়ে রাজা। একদিন ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিলেন, বাড়ির মালী পান খাইয়া ঠোঁট লাল করিয়া ঝাড়ু দিতেছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে মালী, আজ যে বড় পান খাইয়া ঝাড়ু দিতে আসিয়াছিস! কারণ?

মালী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—হুজুর! সভয়ে বলিব না নির্ভয়ে বলিব?

রাজা বলিলেন—ভয় নাই তোর, নির্ভয়েই বল।

মালী বলিল—মহারাজ। আপনার সন্তান নাই বলিয়া লোকে আপনাকে আটকুঁড়া রাজা বলে। আমি তা কিছু বলি না মহারাজ—তবে রোজই সকালে আপনার মুখ দেখিয়া আর ভাল খাওয়া হয় না, দিনটাও ভাল যায় না, তাই আজ সকালে স্নান করিয়া, খাইয়া একটা পান মুখে দিয়াই আসিয়াছি। অপরাধ হইয়া থাকে, ক্ষমা করিবেন মহারাজ!

রাজা আর কিছু বলিলেন না। রাণীর কাছে আসিয়া বলিলেন—রাণী, আমি আর এদেশে থাকিব না ; সন্তান নাই বলিয়া মালীটা পর্যন্ত সকালে স্নান-আহার না করিয়া আমার মুখ দেখে না। আমি দেশ ছাড়িব।

রাজার কথা শুনিয়া রাণীর মনটা মেঘলা হইয়া গেল। দাসী জিজ্ঞাসা করিল—কি রাণী, তোমার মুখ যে ভারি দেখা যায়?

রাণী রাজার কথা দাসীকে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—দাসী, এর উপায় কি?

দাসী বলিল—পুরুষের মন তো রমণীর হাতে। তুমি এক কাজ কর।

রাণী বলিলেন কি?

দাসী বলিল—তুমি রাজাকে জানাও যে তোমার গর্ভ হইয়াছে।

রাণী দাসীকে বলিলেন—তোর মুখে আগুন! আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না।

দাসী বলিল—দেখ রাণী. কে বলিতে পারে যে তোমার কথা সত্য হইবে না? আর সত্যই যদি না হয়, তবে এমনও হইতে পারে, সময়ে রাজার মন ফিরিয়া গেল। তখন মিথ্যার অপরাধ দেবতাও ক্ষমা করিবেন।

রাণী মনে মনে মা ষষ্ঠী দেবীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন—মা, আমি যা বলিব, আমি যদি সতী হই, তবে তাই যেন সত্য হয়। দেখিও, আমাকে বিপদে ফেলিও না যেন!

রাণী রাজাকে জানাইলেন, তাহার সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা আছে ; সুতরাং কিছুদিন না দেখিয়া দেশ ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। রাজা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন।

এদিকে রাণী মনে প্রাণে ষষ্ঠী দেবীকে ডাকিতেছেন। দাসী একটি ক্ষীরের ছেলে তৈয়ার করিয়া রোজ দুধ খাওয়াইতে লাগিল। একদিন দাসী বলিল—'রাণী এখন তুমি গর্ভের পূর্ণলক্ষণগুলি দেখাইয়া রাজাকে একদিন বলিয়া বসিবে, তোমার প্রসব বেদনা উপস্থিত।'

রাণী দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন—'পোড়ার কপালী, মরণের ভয়ও রাখিস না যে!'

দাসী বলিল—'রাজা যদি দেশ ছাড়িয়া মনের দুঃখে বনে যায়, সে কি মরণ হইতে কম দুঃখ হইবে রাণী?' রাণী আর দাসীর সঙ্গে পারিয়া ওঠে না।

অবশেষে সত্যই একদিন রাণী আতুরঘরে ঢুকিলেন। রাজার কানে সংবাদও গেল, ছেলে হইয়াছে। রাজা আহ্লাদে আটখানা হইলেন। অন্তঃপুরে ঢোল, ডাগর, সাঁনাই, শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। রাজ্যময় জয় জয়কার পড়িয়া গেল। আটকুঁড়া রাজার ছেলে হইয়াছে।

রাণী বলিল—দাসী, এখন যে রাজা ছেলে দেখিতে আসিবেন।

দাসী বলিল—আসুন, মা ষষ্ঠী যদি নিজের মান নিজে না রাখেন, তো না রাখিবেন। আমরা মরিব। রাণী চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ছেলের ষষ্ঠীর দিন রাত্রিতে এক ঘটনা ঘটিল। রাণী ঘুমাইয়া আছেন, দাসীও ঘুমে। ক্ষীরের ছেলে ওয়া ওয়া করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাণী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া ছেলে কোলে লইয়া দুধ দিতে লাগিলেন। দাসী বলিল—রাণী, মা ষষ্ঠীর বলে দয়া নাই? দেখিলে তো? সতীলক্ষ্মীর প্রার্থনা মা ষষ্ঠী না শুনিয়া পারেন না। আমি কি তোমার কাছে খেলার কথা বলিয়াছি রাণী?

রাণীর আনন্দে চক্ষু দিয়া টস টস করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পরদিন রাজা পুত্র মুখ দেখিয়া জন্ম সার্থক করিলেন। আবার নতুন উৎসাহে রাজা রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

রাণী রাজ্য মধ্যে ঢোল দিয়া জানাইয়া দিলেন—মা ষষ্ঠীর পূজা যে করিবে ; তাহাকে মনে প্রাণে যে ডাকিবে, সে ধনপুত্র লক্ষ্মী লাভ করিবে। তাহার দুঃখ দূর হইবে।

গাড়ুসী বা গাড়ু ব্রত

আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিন এই ব্রত করিতে হয়। পূর্বদিন শেষ রাত্রিতে পাট-পেকাটি দিয়া আঙ্গিনায় আগুন জ্বালিতে হয়। আগুন লইয়া ঘরে ঘরে যাইয়া মন্ত্র বা ছড়া পড়িতে হয়। ছড়া ব্রত কথায় উল্লেখ করা হইল। তেঁতুল পোড়া ও হলুদ বাটা আগুনের কাছে বসিয়া হাতে-পায়ে মুখে মাখিতে হয়, তাহা হইলে পা ফাটে না, ঠোট ফাটে না, গাল চড় চড় করে না। সংক্রান্তি দিন বোরোর চাউল বা রোয়া ধানের চাউল পাক করিয়া খাইতে হয়। লাঙ্গল দ্বারা চাষ করিয়া যে ধান বোনা হয়, তাহা এই ব্রতে ব্যবহৃত হইতে পারে না। পূজার অন্যান্য উপকরণ :—শালুক, সাপলা প্রভৃতি দিয়া ডাল পাক করিতে হয়। ঐ দিন মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ।

এক সওদাগর—সে ছিল বড় অনাচারী। সওদাগরের উপর ছিল অলক্ষ্মীর দৃষ্টি। সওদাগরের স্ত্রী ছিলেন ভাল মানুষ—তিনি লক্ষ্মী মানিতেন, লক্ষ্মী চিনিতেন, লক্ষ্মী ছাড়া কিছু জানিতেন না।

সওদাগরের স্ত্রীর অসুখ। বুড়া হইয়াছেন—আর বাঁচিবেনই বা কয় দিন? তিনি পুত্রবধূকে ডাকিলেন। বলিলেন—বৌমা, তোমার শ্বশুরের উপর অলক্ষ্মীর দৃষ্টি আছে। আমি তো চললাম, এই সংসার তোমাকেই দেখিতে হইবে। অনাচার-অনিয়ম করিও না, করিলে সংসার ছারখার হইবে। আমি যেমন নিয়ম নিষ্ঠামত চলিয়াছি অথচ সওদাগরকে জানিতে দিই নাই, তুমিও তেমনই করিবে। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি দিন সুবিধা পাইলেই অলক্ষ্মীটা আসিয়া ঢুকিবে। সওদাগর নিষেধ করিলেও ঐ দিন যাহা যাহা গৃহস্থকে করিতে হয়, তাহা তুমি সব করিবে, আবার খড়কুটা ছড়াইয়া, অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে—তবেই সওদাগর টের পাইবে না।

সওদাগরের স্ত্রী চক্ষু বুজিলেন।

আশ্বিন মাস যায়, কার্তিক মাস আসে—সেই সংক্রান্তির আগের দিন সওদাগর পায়খানায় গিয়া দেখেন যে একটি কন্যা, কি তার রূপ, কি তার লাবণ্য! সওদাগর জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে? কন্যা বলিল—আমি যেই হই, তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর, তবে তোমার কথার উত্তর দিব।

সওদাগর তো ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন—আচ্ছা, আমি তোমাকে বিবাহ করিব।

কন্যা বলিল—কিন্তু এক কথা ; কাল সংক্রান্তি—কাল যদি তোমার ছেলের বউ গৃহস্থের আচার নিয়ম না করে, তবেই তুমি আমাকে পাইবে, তাহা না হইলে আর পাইবে না।

সওদাগর বলিলেন —সে তো আমি কোন দিনই করিতে দিই না, কালও দিব না।

বাড়ি আসিয়া সওদাগর কড়া হুকুম দিলেন, সংক্রান্তির নিয়ম যেন কোন প্রকারেই কেহ মানিয়া না চলে। সওদাগরের পুত্রবধূ সওদাগরের নিষেধ শুনিল না। শাশুড়ির উপদেশ মত, শেষ রাত্রিতে আগুন জ্বালিল, পাটখড়ি জ্বালিয়া তামাকের মত ধুয়া টানিল, ঘরে ঘরে আগুন লইয়া মন্ত্র পড়িল—

জোঁক-পোক কি কর?
ঘরের থনে নিকল।
লক্ষ্মীঘরে আয়—
অলক্ষ্মী দূর হ।
মাছি ঘরে আয়—
মশা দূর হ।

তেঁতুল-পোড়া, হলুদবাটা ঠোঁটে লাগাইল, মুখে মাখিল, পরে মুছিয়া ফেলিল। শঙ্খ ফুঁকিতে পারিল না, কাঁসীও বাজাইতে পারিল না। উঠানে ঝাঁট দিয়া, উঠান নিকাইয়া আবার অপরিষ্কার করিয়া রাখিল। ভোরবেলা শালুক-সাপলা প্রভৃতি গাড়্সী পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া যথা নিয়মে গোপনে ব্রত পালন করিল।

সওদাগর এই সকল কিছুই জানিতে পারিলেন না। বাড়িঘর অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন দেখিয়া সওদাগর কোন সন্দেহই করিতে পারিলেন না। এইবার বধূকে মাছ খাওয়াইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত।

গাড়্সী ব্রতের দিন ব্রতনীর মাছ খাইতে নাই। সওদাগর এক রাঘব-বোয়াল মাছ আনাইয়া বলিলেন—বৌমা, এই মাছ আজ তোমাকে খাইতে হইবে, আর মাছ কাটা রক্তমাখা জল দুয়ারে ফেলিতে হইবে! বধূ মাথা ঝুঁকাইয়া বলিল—আচ্ছা।

বধূ মাছ কাটিয়া রক্তমাখা জল দূরে ফেলিয়া দিয়া, রক্ত চন্দনে জল ঢালিয়া দুয়ারে ফেলিয়া দেখাইল, মাছকাটা জল দুয়ারেই রাখা হইয়াছে। সওদাগর খাইয়া গেলেন, বলিয়া গেলেন—বৌমা যেন মাছ খায়।

বধূ মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ খাইবে ; কিন্তু সে বাটি ভরা মাছ ফেলিয়া দিয়া রোয়া ধানের ভাত, শালুক-সাপলা দিয়া রাঁধা ডাল তাড়াতাড়ি খাইয়া উঠিল।

পরের দিন সওদাগর পায়খানায় গিয়াছেন—পায়খানায় যাইয়া দেখেন যেখানে রূপসী বসিয়াছিল, সেখানে একটা কাক পিশাচ বসিয়া আছে। রাজাকে দেখিয়া বলিল—দেখ সওদাগর, তোমার বধূ তোমার নিষেধ না শুনিয়া গাড়্সী ব্রত করিয়াছে, তোমাকে তাহা জানিতে দেয় নাই। এই দেখ, ব্রতের ফলে আমি কেমন হইয়া গিয়াছি। যাহা হউক, এইবার তুমি রক্ষা পাইলে। আমি অলক্ষ্মী—একবার তোমার সংসারে ঢুকিতে পারিলে সব ছারখার করিয়া দিতাম—বলিয়া একটা চিৎকার দিয়া পিশাচটা মরিয়া গেল। সওদাগর কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ি আসিয়া সকলকে এই কথা জানাইয়া বধূকে বলিলেন—বৌমা, তোমার জন্য এই সংসার আমার রক্ষা পাইল। এ ব্রত তুমি গোপনে রাখিও না—দেশ-দেশান্তরে জানাইয়া দাও।

বধূ বলিল—এ ব্রত আমার শাশুড়ি করিতেন, তিনিই আপনাকে না জানাইয়া এ ব্রত করিতে বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই পুণ্যে আপনি অলক্ষ্মীর হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। আমি সেই সতী লক্ষ্মীর আদেশ পালন করিয়াছি মাত্র।

লোহাই-জাঙ্গি ব্রত

"জাঙ্গি"—কথাটা জঙ্ঘা কথার অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। লৌহ জঙ্ঘা অর্থাৎ আড়ষ্ট-অবশ জঙ্ঘা যাহার তাহার বিষয়ক কথা, নামটি পড়িয়া ইহাই মনে হয়।

এক ব্রাহ্মণের সাত পুত্র—সাতটিই অবশ, হাঁটিতে পারে না একটিও। ব্রাহ্মণ বাড়িতে নাই, ব্রাহ্মণী গিয়াছে ঘাটে, জল আনিতে। এদিকে হইয়াছে কি—এক ঠাকুর আসিয়া ভিক্ষা চাহিল—"ঘরে কে? আমি ব্রাহ্মণ, ভিক্ষা চাই।"

ব্রাহ্মণের ছেলেরা বলিল—ঠাকুর, একটু দেরি কর। মা গিয়াছেন ঘাটে, আসিলেই ভিক্ষা পাইবে। ব্রাহ্মণ বলিল—না, আমি দেরি করিতে পারি না ; আমাকে আরও পাঁচ বাড়ি যাইতে হইবে তো?

তাহারা বলিল—এই দেখ ঠাকুর, আমরা খাটে বসিয়া আছি, হাঁটিবার শক্তি নাই, কেমন করিয়া তোমাকে ভিক্ষা দিব?

ব্রাহ্মণ বলিল—আচ্ছা, এই লাঠিখানা ধরিয়া আস।

সাত ছেলে হি-হি করিয়া হাসিয়া বলিল—কি যে বল ঠাকুর! কত ওষুধ, কত চিকিচ্ছা—কিছুতে কিছু হইল না, এখন কিনা তোমার লাঠি ধরিয়া আসিব।

ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, ধরই না লাঠিখানা। পার ত আসিবে, না পার আসিবে না।

সাত ছেলে ভাবিল—বেশ তো মজা!

তাহারা ব্রাহ্মণের লাঠিখানা ধরিল। যেই ধরিল আর তখনই উঠিয়া দাঁড়াইল। বাঃ! ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ তখন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের মা আসিয়া সমস্ত শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কৈ সে ব্রাহ্মণ কৈ?

ছেলেরা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ঐ যে ঠাকুর যায়—ঐ। মা যাইয়া ব্রাহ্মণের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—ছেলে ভাল করিয়া গেলে, তুমি কে ঠাকুর?

ব্রাহ্মণ বলিল—আমার নাম লোহাই-জাঙ্গি ঠাকুর। তোমার ছেলেদের দুঃখে আমার বড় কষ্ট হইতেছিল, তাই দুঃখ দূর করিয়া গেলাম। তোমরা আমার পূজা দিও। অরণ্য ষষ্ঠীর দিন আমার পূজা করিতে হয়। যে আমার পূজা করে তাহার জরা-বাত-ব্যাধি রোগ থাকিতে পারে না।

কাট্‌না ব্রত

প্রতি বৎসর পয়লা বৈশাখ তারিখে এই ব্রত করিতে হয়। ব্রতের উপকরণ দেখিয়া বিশ্বকর্মার পূজা বলিয়া মনে হয়। উপকরণ : চাল, ছোট কলাই, তিল, কালি জিরা প্রভৃতি অষ্ট শসা ভাজিয়া ডালায় করিয়া দিতে হয়। সঙ্গে আট্-কাট্‌না অর্থাৎ আট রকমের গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতি দিতে হয়। ঢেঁকি ঘরে ব্রত হয়—তন্মধ্যে ঢেঁকি একটি তাছাড়া কুলা, বিচন, টাকুয়া চরকা, সুতা-পাঁজ সব দিতে হয়। ঝাঁপি টুকরির ফুল চন্দনে মাখিয়া যন্ত্রাদিতে ছাপ দিতে হয়।

কামার বউ আর কুমার বউ—দুই সই। কুমার বউর কেবল মেয়ে হয় আর কুমার বেটা রাগে গর গর করে। কুমার একবার খোলাকুলি বলিয়া দিল, আবার মেয়ে হইলে মেয়ে শুদ্ধ বউকে মারিয়া ফেলিবে।

কুমার বউর আবার গর্ভ। প্রসবের সময় হইলে কুমার বৌ সইয়ের কাছে যাইয়া বলিল—সই, এখন উপায়? এবার কন্যা হইলে তো আর রক্ষা নাই।

সই বলিল—এক কাজ কর তুই। একটা হাঁড়ি ও সরা লইয়া গাঙের পারে যা। মেয়ে হয় তো হাঁড়িতে ভরিয়া সরা দিয়া ঢাকিয়া গাঙে ভাসাইয়া দিবি—আর ছেলে হয়ত তো কথাই নেই। মেয়ে হইলে কুমারের কাছে বলবি গর্ভ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

তাহাই হইল। কুমার-বউর মেয়েই হইল। হাঁড়িতে ভরিয়া ভাসাইয়া দিয়া আসিয়া সই-এর কথাই কুমারকে বলিয়া দিল। কুমোর রা করিল না।

হাঁড়ি নদীর জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এক চিল্‌নী তাহা দেখিয়া মনে করিল, ইহাতে অবশ্যই খাদ্যবস্তু কিছু আছে। সে ঠোঁট দিয়া সরাটা সরাইয়া দেখিল—ওমা, একটি মেয়ে! আঃ কি সুন্দর মেয়েটি!

পাখির প্রাণেও মায়া কিছু অল্প না। চিল্‌নী থাবা দিয়া মেয়েটিকে লইয়া পথের ধারে একটা বট গাছের উপরে তাহার বাসায় লইয়া গেল এবং হাট-বাজার-লোকালয় হইতে খাবার আনিয়া দিতে লাগিল। চিল্‌নীর আদরে-যত্নে কন্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

একদিন হইয়াছে কি—এক রাজপুত্র শিকারে বাহির হইয়াছে। সঙ্গে লোক-লস্কর। বেলা দুই প্রহর—আকাশ হইতে আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে। রাজপুত্র লোকজন লইয়া সেই বটগাছের তলায় যাইয়া বিশ্রাম করিতে বসিলেন। লম্বা এক গাছ খুব কালো চিকন চুল রাজপুত্রের গায়ের উপর আসিয়া উড়িয়া পড়িল। রাজপুত্র ভাবিলেন—একি! এখানে এমন চুল কোথা হইতে আসিল। রাজপুত্র বলিলেন—ওহে, তোমরা কেহ গাছে উঠিয়া দেখ দেখি, কিছু আছে কি না।

রাজপুত্রের কথা—একজনকে বলিতে দশজন গাছে উঠিল। গাছে উঠিয়া দেখে কি—এক পরমা সুন্দরী কন্যা। তাহারা রাজপুত্রকে জানাইল। রাজপুত্র দেখিয়া ত ভুলিয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—কন্যা, তুমি দেবী না মানবী, অপ্সরা না কিন্নরী?

কন্যা বলিল—আমি দেবীও না, দানবীও না, অপ্সরাও না, কিন্নরীও না। আমি মানবী। এই বলিয়া নিজের জন্মকথা রাজপুত্রকে বলিল।

রাজপুত্র বলিলেন—আমি অমুক দেশের রাজপুত্র, তুমি আমাকে বিবাহ করিবে?

কন্যা বলিল যে, তাহার চিল্‌নী মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া একথার উত্তর দিবে।

রাজকন্যা চিল্‌নী মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাজপুত্রকে বিবাহে মতামত দিল। রাজপুত্র গন্ধর্ব মতে কন্যাকে বিবাহ করিলেন। কন্যা শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় চিল্‌নী কানে কানে বলিয়া দিল যে, রাজবাড়িতে যে একটা সূতা গাছ আছে তাহাতে ঝাঁকি দিয়া মন্ত্র পড়িলেই বিপদে-আপদে সে যাইয়া উপস্থিত হইবে। মন্ত্র এই

"সূতা গাছটি নড়-চড়
চিল্‌নী মা আমার উড়িয়া আসিয়া পড়।"

রাজপুত্র বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। রাজা বউ দেখিয়া খুব খুশি। রাজার সাত পুত্র। ছয় পুত্রের বৌরা হিংসায় আর বাঁচে না—অ্যাঁ! ভারি তো রূপ!

রাজবাড়ি হইলে কি হইবে—রাজার নিয়ম বড় কড়া। বৌদিগকে রাজার খুশিমত অনেক সময় গৃহস্থালীর কাজকর্মও করিতে হয়। তাই রাজা একদিন নতুন বৌর হাতের রান্না খাইতে চাহিলেন। কন্যা তো ফাঁপরে পড়িয়া গেল। ঘরবাড়িতেও আর সে থাকে নাই যে রান্না করিতে পারিবে? তাহার চিল্‌নী মায়ের কথা মনে হইল। সে তাহার উপদেশ মত সূতা গাছে ঝাঁকি দিয়া মন্ত্র পড়িল, আর চিল্‌নী উড়িয়া আসিল। কন্যা তাহার বিপদের কথা জানাইল। চিল্‌নী রাঁধিয়া-বাড়িয়া দিয়া গেল। সকলে খাইয়া তো অবাক! এ যে দেবতার ভোগ! রাজার খুশি আর ধরে না!

এইরূপে কন্যার অনেক পরীক্ষা হইয়া গেল। কন্যা চিল্‌নী মার সাহায্যে সব পরীক্ষাই সহজ করিয়া লইল।

ছয় বৌর সন্দেহ হইল—এ বেটী যাদু জানে, নইলে এমন হয় না। তাহারা একদিন যুক্তি করিয়া সূতা গাছটা কাটিয়া ফেলিল, একদিন চিল্‌নী আসিলে, তাহাকেও মারিয়া ফেলিল। কন্যার জানাই ছিল, চিল্‌নীকে মারিয়া ফেলিলে কেমন করিয়া বিচনের বাতাস দিয়া বাঁচাইতে হইবে। তাই চিল্‌নী মা যে মরিয়াও মরিল না তাহা আর ছয় বৌ জানিতে পারিল না।

এমন দিনে সূতা কাটা ও কাপড় বুনান পরীক্ষা আসিল। ছয় বৌ ভাবিল—এবার দেখা যাইবে চাঁদ, কেমন করিয়া যাদু বিদ্যা দেখাও! ছয় বৌ সূতা কাটিল, কাপড় বুনাইল, তারপর রাজাকে দেখাইল। নতুন বৌ আর দেখায় না। বৌরা হাসে, চোখ টেপাটেপি করে—জব্দ, এইবার জব্দ!

শ্বশুরকে দিয়া ছয় বৌ বলাইল—নতুন বৌকে এখনই কাপড় দেখাইতে যাইবে, দেখাইতেই হইবে—সকলেই তো দেখাইয়াছে। শ্বশুর তাই বলিলেন। কন্যা তোরঙ্গ খুলিয়া কাপড় দেখাইলে, শ্বশুর বলিলেন—আমি রাজা, কত মিহি কাপড় পরিয়াছি, আমি এমন মিহি কাপড় তো আর পরি নাই। আর কি সুন্দর!

রাজা কাপড় খুলিতে লাগিল—কাপড় আর ফুরায় না। রাজবাড়ির সকলে পরিল, রাজ্যের সকলে পরিল—কাপড় তো আর ফুরায় না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—বৌমা, তুমি কিছু মন্ত্রতন্ত্র জান?

সে বলিল—আমি তো কিছু জানি না, সব জানে আমার চিল্নী মা। এই বলিয়া কন্যা সমস্ত কথা বলিল।

রাজা বলিল—তবে এই পক্ষী দেবতার কথা তো গোপন করা উচিত নয়। দেশের সকলে জানুক, জানিয়া তাহার পূজা করুক। এই বলিয়া রাজা দেশময় চিল্নী-মার কথা ঘোষণা করিয়া দিলেন। ঘরে ঘরে চিল্নী-মার পূজার প্রচার হইল।

কুলাই ব্রত

উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন করিতে হয়।

এক সওদাগরের পুত্র—অনেক দিন পরে শ্বশুরবাড়ি যাইতেছে। যাইতে যাইতে একটি বটগাছ তলায় দেখিতে পাইল, দুইটি কন্যা বসিয়া ধূলা ফেলিতেছে, ধূলা মাপিতেছে। সওদাগর পুত্র ভাবিল—এ তো বেশ: সে জিজ্ঞাসা করিল—তোমরা এই কি করিতেছ?

কন্যা দুইটি বলিল—আমরা ধূলা মাপিতেছি। আমরা যেদিন যাহার নামে ধূলা না মাপিব, সেদিন সে খাইতে পারিবে না।

সওদাগর পুত্র বলিল—ইস্! মিথ্যা কথা। তোমরা ধূলা লইয়া খেলিতেছ।

কন্যা দুইটি বলিল—সত্য-মিথ্যা, পরীক্ষা করিয়া দেখ।

সওদাগর পুত্র বলিল—আচ্ছা দেখিব! আমার নামে আজ ধূলা মাপিও না—বলিয়া হাঁটিতে লাগিল। পথে-পথে ভাবিতে লাগিল—মেয়ে দুইটি বেশ খেয়ালী তো। আমি সওদাগরের ছেলে শ্বশুরবাড়ি চলিয়াছি অনেক দিন পর—আমি খাইতে পারিব না।—এ কি সম্ভব?

সওদাগর-পুত্র শ্বশুরবাড়ি যাইয়া শ্যালকদের সঙ্গে খাইতে বসিয়াছে। শাশুড়ি জামাইকে ভাত দিতেছে। এমন সময় সওদাগরপুত্র হাসিয়া ফেলিল। শাশুড়ি ঘৃণায় লজ্জায় সেখান হইতে চলিয়া গেল. শালারা চটিয়া লাল! কি! মা আসিয়াছেন ভাত দিতে. আর তুমি কিনা হাসিলে—এ্যাঁ? শ্যালকরা ভাগিনী-পতিকে মারিতে উদ্যত হইল। সওদাগর-পুত্র বলিল—আগে আমার কথা শোন, তারপর মারিতে হয় মারিও।

সওদাগর-পুত্র পথের কথা খুলিয়া বলিল। তাহারা সকলেই কৌতূহলী হইয়া বটগাছের নিচে যেখানে কন্যারা ধূলা মাপিতেছে সেইখানে যাইয়া উপস্থিত। কন্যা দুইটি তাহাদিগকে দেখিয়াই ব্যাপার বুঝিল। বলিল—কেমন, তোমার খাওয়া হইয়াছে?

সওদাগর পুত্র তাহাদের পা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, তোমরা কে? আমার অপরাধ ক্ষমা কর!

কন্যা দইটি বলিল—আমরা ভাগ্যদেবী। পৃথিবীতে যে যাহা ভোগ করে, তাহা আমাদের

এই ধূলা-খেলার খেয়ালের উপরই নির্ভর করে। তুমি বিশ্বাস কর নাই, তাই এই লাঞ্ছনা পাইলে। তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি। যাহারা আমাদের পূজা করে, ভাগ্য তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হয়, জানিবে।

সকলে আশ্চর্য হইয়া যে যাহার স্থানে ফিরিয়া গেল।

ধানাই পূর্ণিমা ব্রত

পৌষ মাসের পূর্ণিমা দিন উপবাস করিয়া সন্ধ্যার সময় পূর্ণিমা গোঁসাইর পূজা করিতে হয়। শাস্ত্রে পূর্ণিমা গোঁসাই বলিয়া কোন দেবতার নাম নাই। পুরোহিতগণ ব্রতিনীকে দিয়া নারায়ণের পূজা করাইয়া থাকেন। উঠানে একটি বাঁশের কঞ্চি রোপণ করিয়া ধানের ছড়া দ্বারা সাজাইতে হয়। কঞ্চির মূলে একটি বেদিকা প্রস্তুত করিয়া একুশটি পুকুর কাটিতে হয় এবং তাহা দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। দুগ্ধের পরিমাণ অনুসারে পুকুর ছোট বড় করা যায়। পূজান্তে ব্রতিনীকে এক পাক হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে হয়। ভোজনের সময় শৃগালে ডাকিলে আর খাইতে নাই।

এক যে ব্রাহ্মণ আর এক ব্রাহ্মণী—তারা ছিল বড় দুঃখী। এমন দুঃখ যে—দিনান্তে এক বেলা কোন দিন দুটি শাক-ভাত জুটিত, আবার কোন দিন তাও জুটিত না।

দিন যায়, মাস যায়, বছর ফিরিয়া আসে—আঃ তাহাদের দুঃখ আর যায় না।

একদিন ব্রাহ্মণ গিয়াছে ভিক্ষায়—আর আসে না। পূবের সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায়-যায়। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মা তুমি কাহার জন্য দুয়ারে বসিয়া এমন ভাবিতেছ?

ব্রাহ্মণী নিজের দুঃখ-দারিদ্রের কথা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন—ব্রাহ্মণ গিয়াছে ভিক্ষায়, বুড়া মানুষ, বেলাও ভাঁটি পড়িয়া গিয়াছে, তাই ভাবিতেছি—অনাহারে, রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় না জানি মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়াছে!

ব্রাহ্মণ বলিলেন—আঃ বড় দুঃখ তো তোমাদের। এক কাজ করিও—ব্রাহ্মণ আসিলে তাহাকে পূর্ণিমা গোঁসাইর বাড়ি পাঠাইয়া দিও, তিনি তোমাদের দুঃখ দূর করিবেন। আর পথের কথা ভাবিতেছ, তা পথিকের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াও যাইতে পারিবে।

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। এদিকে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ভিক্ষার ঝুলি আর টানিয়া বাড়ি আনিতে পারিতেছেন না—এতই ভিক্ষা পাইয়াছেন সেই দিন। যে দিত এক মুঠ, সে দিয়াছে দশমুঠ ; যে দিত না কিছুই—সেও কিছু দিয়াছে।

ভগবানের দয়া। ব্রাহ্মণ খুব খুশি হইয়া বাড়ি আসিলেন। বাড়ি আসিয়া ব্রাহ্মণীর কথা শুনিলেন, শুনিয়া বলিলেন—ব্রাহ্মণী তুমি বড় বোকা—যিনি আসিয়াছিলেন তিনিই পূর্ণিমা গোঁসাই, তুমি চিনিতে পার নাই।

ব্রাহ্মণী মাথা-কপাল কুটিয়া ব্রাহ্মণকে পূর্ণিমা গোঁসাইর বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন।

পথে দেখিলেন, মস্ত এক দীঘি—আর সেই জলে দুই যুবতী একখানা কাপড় পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ব্রাহ্মণ তাহাদের কাছে পূর্ণিমা গোঁসাইর বাড়ির পথ জানিয়া লইলেন।

তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—পূর্ণিমা গোঁসাইর বাড়ি কেন যাইবে ঠাকুর?

ব্রাহ্মণ বলিলেন—দিন যায়, মাস যায়—আমার দুঃখ আর যায় না। তাই পূর্ণিমা গোঁসাইর বাড়ি যাইতেছি, দেখি আমার দুঃখের একটা কিনারা করিতে পারি কিনা।

যুবতীরা বলিল—তবে ঠাকুর আমাদের কথাও বলিও? আমরা বারো বছর ধরিয়া এইভাবে বুক-জলে দাঁড়াইয়া আছি, উঠিতেও পারি না, ডুবিয়া মরিতেও পারি না—আমাদের দুঃখ দূর হইবে কিসে!

ব্রাহ্মণ আচ্ছা বলিয়া পথ চলিতে লাগিলেন।

পথে দেখিলেন একটা কুমির, একটা শিয়াল, কলা বাগান, ধানক্ষেত, গাভী ও একটা আম গাছ। তাহারা সকলেই পথ দেখাইয়া দিয়া তাহাদের দুঃখ কেন হইয়াছে আর কেমনেই বা চাপ দূর হইতে পারে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে বলিল। ব্রাহ্মণ পূর্ণিমা গোঁসাইর বাড়ি যাইয়া নিজের কথা যেমন বলিলেন, তাহাদের কথাও তেমন বলিলেন।

পূর্ণিমা গোঁসাইর বাড়ি হইতে ফিরিবার পথে আবার তাহারা ব্রাহ্মণকে ধরিয়া বসিল। পূর্ণিমা গোঁসাই যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন তাহাই বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরিতে লাগিলেন। প্রথমেই ধরিল—আম গাছ। তোমার গোড়ে এক ভাঁড় সোনা আছে, উপুড় হইয়া যদি কোন ব্রাহ্মণকে তাহা দিতে পার, তবেই তোমার ফল পাখিতে খাইবে, পূজায় লাগিবে। তোমার বৃক্ষ জন্ম সার্থক হইবে।

আম গাছ বলিল—আর ব্রাহ্মণ কোথায় পাইব ঠাকুর। আমি ভাঙিয়া পড়ি, তুমি সোনার ভাণ্ড লইয়া যাও।

গাভী।—তোমার দুধ যে বারো বছর ধরিয়া কেহ দুহিতেও পারে না, বাছুরও খায় না, লোকের সেবায়ও লাগে না—আর তুমি দুধের ভারে দুঃখ পাইতেছ, তাহার কারণ এই যে, তোমার গৃহস্থ গোঁসাই ঠাকুরের ব্রতিনীকে দুধ দেয় নাই—এক সের দুধের পাঁচ সেরের দাম চাহিয়াছিল। সে যাহা হউক, এখন তুমি এক ব্রাহ্মণকে একসের দুধ দিলেই তোমার দুধ দেবার্চনায়ও লাগিবে, বাছুরও টানিয়া লইবে। ব্রাহ্মণ গাভীর অনুরোধে দুধ দুহিয়া লইলেন।

এইরূপে ধান ক্ষেত ও কলা বাগান ব্রাহ্মণকে এক কাঁদি কলা ও পাঁচ একুশ ছড়া ধান দিয়া অভিশাপ হইতে মুক্তি লাভ করিল।

তারপরে শিয়াল আর কুমিরের সঙ্গে দেখা। শিয়ালকে বলিলেন, তুমি বড় অন্যায় করিয়াছিলে। গোঁসাইর ব্রতিনীরা দিনমান উপবাস করিয়া পূজার শেষে হবিষ্যি করিতে বসিয়াছিল—আর তুমি হুক্কা হুয়া করিয়া ডাকিয়াছিলে, তাহাতে তাহাদের খাওয়া নষ্ট হইয়াছিল। কাজেই বারো বছর ধরিয়া খাইতেও পার না, ডাকিতেও পার না—গলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আর এরূপ করিও না, তবেই ভাল হইবে।

আর কুমিরকে বলিলেন, তুমিও বড় অন্যায় করিয়াছিলে। ব্রতিনীরা পূজার জল তুলিতে আসিয়া তোমার ভয়ে ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহারই পাপে তুমি খালের এপার-ওপার সাঁকো হইয়া আছ। আর এমন করিও না, তবেই জলের কুমির জলে যাইতে পারিবে।

সকলের শেষে যুবতীদিগের সঙ্গে দেখা। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—বলিয়াছিলে ঠাকুর আমাদের কথা?

ব্রাহ্মণ বলিলেন—তা বলিয়াছিলাম। বলিলেন, তাঁহার ব্রতকারিণীরা ঘাটে বসিয়া সন্ধ্যা পড়িতে ছিল, তোমরা সাঁতার কাটিয়া পাড়ের জল তাহাদের গায়ে ছিটাইয়া দিয়াছিলে। তোমরা অভিশাপ হইতে মুক্ত হইতে পার, যদি এক ব্রাহ্মণের দাসী হইয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতে পার।

যুবতীরা বলিল—আর ব্রাহ্মণ পাইব কোথায় ঠাকুর? আমরা তোমারই দাসী হইব।

ব্রাহ্মণ আর করেন কি? যুবতীরা ব্রাহ্মণের হাতের-কাঁধের জিনিসপত্রগুলি বহন করিয়া বাড়িতে লইয়া চলিল।

ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরিয়া দেখেন—ওমা! দালান-কোঠা, বাগ-বাগিচা, দীঘি-পুকুর, রাজপুরী ঝমঝম করে। ব্রাহ্মণী হাসিমুখে আসিয়া ব্রাহ্মণকে বাড়ির ভিতর লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণীর দুঃখ আর রহিল না। তারপর পৌষ মাসের ধান্য পূর্ণিমার দিন বিধিমত পূর্ণিমা গোঁসাইর পূজা করিলেন। পৃথিবীতে আড়াই অক্ষর লিখিয়া দিলেন—এই ব্রত যে করিবে তাহার দুঃখ-দারিদ্র্য দূরে যাইবে। এই ব্রতের ফলে অপুত্রকের পুত্র হয়, দূরের বান্ধব সামনে আসে, নির্ধনীর ধন হয়। যে যাহা বাসনা করে তাহাই পূর্ণ হয়।

মৌনি-স্নানের কথা

সোমবারে যদি চতুর্দশীযুক্তা অমাবস্যা হয়, অথবা কেবলমাত্র অমাবস্যাও হয়, তবে সেই দিন মৌনি স্নান করিলে সহস্র গো-দানের ফল লাভ হয়। অরুণোদয়কাল হইতে স্নান কাল পর্যন্ত মৌনি স্নান। এই কাল পর্যন্ত মৌনি থাকিয়া স্নান করাকে মৌনি স্নান বলে—সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য পুরোহিত দর্পণ।

অমাবস্যা যদি রবি-সোম দুইদিন পায়, তবে তাহাকে পূর্ণ মৌনি স্নান বলে। এতদ্ব্যতীত মৌনি স্নানকে খণ্ড মৌনি স্নান বলে। স্নান করিয়া যে পাত্রে জল আনা হয় তাহা উঠানে রাখিয়া তাহাতে সিঁদুরের পুত্তলী আঁকিয়া ধান্য-দুর্বা দিতে হয়। তারপর কথা শেষে পাঁজের সূতা দিয়া জল পাত্র বেড়িতে হয়। পূর্ণ মৌনি স্নানে বেড়িতে হয়, মৌনি স্নানের জল রমণীগণ বিবাহ সময়ের জন্য সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকেন।

বামুনঝি আর গোয়াল ঝি—দুই সই।

বামুন ঝি পূর্ণ মৌনি বেড়ে। সহস্র মৌনি বেড়িলেই পূর্ণ মৌনি বেড়া হয়। গোয়াল ঝি খণ্ড মৌনি বেড়ে।

গোয়াল ঝির একটি কন্যা। একদিন সে এক সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দিতে যাইয়া ফিরিয়া আসিয়া মাকে বলিল যে, সন্ন্যাসী বলিয়াছে—আমার কপালে বিধবা লক্ষণ লেখা আছে। কাজেই তিনি ভিক্ষা লইলেন না। গোয়ালঝি কন্যার কথা শুনিয়া দৌড়াইয়া যাইয়া সন্ন্যাসীর পায়ে পড়িল। বলিল—ঠাকুর, আমার কন্যা বিধবা হইবে বলিয়া গেলে, কিন্তু তার প্রতীকারের উপায় তো কিছু বলিলে না?

সন্ন্যাসী বলিল—আর উপায় কি?। বিধবা সে হইবেই ; যদি পূর্ণ মৌনি বেড়ার কলসীর জল আর সূতা আনিয়া জামাইর গায়ে ছিটা দিতে পার, সেই সূতার ডোঁর বাঁধিয়া দিতে পার, তবে আবার বাঁচিতে পারে।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর চলিয়া গেল। গোয়ালঝির কন্যার বিবাহের সময় জামাই সত্যই ঢলিয়া পড়িল। গোয়ালঝির মনে পড়িল, তাহার সই বামুনঝি পূর্ণ মৌনি বেড়ে। গেল সে সই-এর কাছে। সই বলিল—সর্বনাশ কি বলিস সই? পূর্ণ মৌনির জল আর সূতা কি দেওয়ার জো আছে? তবে যে আমার সহস্র মৌনি ঢলিয়া পড়িবে।

গোয়ালঝি বামুনঝির পা ধরিয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—তাহা হইলে পোড়া কপালী কাঁচা বাড়ি হইবে সই।

বামুনঝির দয়া হইল। সে মৌনি বেড়া সূতা আর মৌনি স্নানের জল সইকে দিয়া বলিল—আর খণ্ড মৌনিতে বেড়িস না তুই। পূর্ণ মৌনিতে বেড়িয়া সূতা ও জল আনিয়া দিবি তো আমার সহস্র মৌনি বাঁচিয়া উঠিবে। তুই আমার সহস্র মৌনি নষ্ট করিয়া গেলি কিন্তু?

গোয়ালঝি পূর্ণ মৌনিতে বেড়িবে স্বীকার করিয়া গেল। মৌনি-বেড়া সূতা ও জল জামাইর গায়ে ছোঁয়াইতেই সে বাঁচিয়া উঠিল।

গোয়ালঝি পূর্ণ মৌনিতে বেড়িয়া সূতা ও জল সইকে আনিয়া দিল। সইয়ের নষ্ট মৌনি আবার বাঁচিয়া উঠিল। গোয়ালঝি বামুনঝিকে বলিল—সই, যে মৌনি স্নানের এত গুণ তাহা গোপনে থাকিবে কেন? দেশে দেশে রাষ্ট্র করিয়া দেই—মৌনি স্নানের জল আর মৌনি বেড়া সূতা যে ছুঁইবে তাহার রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য দূর হইবে। মরা মানুষ জিয়া উঠিবে, মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে।

এই পূর্ণ মৌনি স্নানের জল আর মৌনি বেড়া সূতা গৃহস্থেরা এখনও সযত্নে রাখিয়া থাকেন। বিবাহের সময় এই সূতা দিয়া ডোর বাঁধিতে হয় এবং এই জল বর-কন্যার গায়ে ছিটাইয়া দিতে হয়।

দুঃখ-নাশিনী ব্রত

শনি-মঙ্গলবার করিবার নিয়ম

এক ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী—ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় গিয়াছেন। জেলেনি পাড়ায় মাছ বেচিতে আসিয়াছে। সকলেই কিনিয়াছে। প্রতিবাসিনীদের অনুরোধে পড়িয়া তাহাকেও কিনিতে হইল। ব্রাহ্মণীর পক্ষ হইয়া সকলে বলিয়া দিল, "ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় গিয়াছে, গাওয়াল-ফেরতা আসিয়া দুই আঁজলা চাউল লইয়া যাইস।"

সকলে দয়া করিয়া কেহ একটু তেল, কেহ একটু লবণ, কেহ একটু মশলা দিল—তাহা দিয়াই তিনি মাছ রাঁধিয়া ব্রাহ্মণের আশায় বসিয়া রহিলেন। বেলা ভাঁটা পড়িয়া গেল, ব্রাহ্মণ আর আসেন না। জেলেনি দুই তিনবার তাগাদা করিয়া, বিরক্ত হইয়া একবার আসিয়া রাঁধা মাছই লইয়া গেল।

ব্রাহ্মণী অঝরে কাঁদিতে লাগিলেন।

শিব-পার্বতী কৈলাসে যাইতেছিলেন। পার্বতী বলিলেন—দাঁড়াও ঠাকুর, আমি আসি।

শিব বলিলেন—ঐ তো রোগ! একটু দুঃখ কষ্ট দেখিলেই গলিয়া যান! মেয়েমানুষ লইয়া এই জন্যই তো চলা বিপদ! পার্বতী শিবের কথা শুনিলেন না।

পার্বতীর হাতে রাঙা শাখা, পরনে রাঙা পাড় ধুতি, মুখে একগাল পান, ভোরের সূর্যের মত কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। পার্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন—কি মা, কি দুঃখ তোমার—কাঁদিতেছ কেন?

ব্রাহ্মণী তাহাদের অবস্থা সব খুলিয়া বলিলেন। পার্বতী বলিলেন—কাঁদিও না তুমি, ওঠ, মাথায় তেল দাও, স্নান কর, ব্রাহ্মণ আসিবে এখনি!

ব্রাহ্মণী বলিলেন—মা, আমার যদি এমন অবস্থাই হইবে, তবে আর কাঁদি কেন আমি? ঘরে আমার তেল নাই, একখানা ছাড়া দুইখানা তেনাও নাই যে স্নান করিতে পারিব।

পার্বতী বলিলেন, ঘরে যাও দেখিবে সব আছে। বলিয়া পার্বতী অদেখা হইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী ঘরে যাইয়া দেখিলেন সত্যই—সবই আছে! রাঁধা ভাত, পাঁচ তরকারি, দুধ-মিষ্টান্ন—সব! ব্রাহ্মণী দেখিয়া শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণ আসিয়া দেখেন, সেই ঘর-বাড়ি কিছুই নাই। দালান, কোঠা, পুকুর-ঘাট্‌লা—রাজপুরী। প্রথমত চিনিতেই পারিলেন না। শেষে দেখিতে পাইলেন, ব্রাহ্মণী বসিয়া আছে, কিছুই বলে না, ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া আছে। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, দৈবক্রমে তাহাদের অবস্থার এরূপ পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণীর তাক লাগিয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন. ব্যাপার কি? যেমন যেমন ঘটিয়া ছিল, ব্রাহ্মণী তেমন-তেমন বলিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন—ব্রাহ্মণী, তুমি বড়ই বোকা। ভগবতী আমাদের দুঃখ দূর করিতে আসিয়াছিলেন, তুমি বুঝিতে পার নাই।

এতক্ষণে ব্রাহ্মণীর চৈতন্য হইল। ব্রাহ্মণী আবার ভগবতীর দর্শন প্রার্থনা করিলেন। ভগবতী আকাশ হইতে বলিলেন—আমি দুঃখনাশিনী দুর্গা। আমিই তোমাদের কষ্ট দূর করিয়াছি। ব্রাহ্মণ আমাকে দেখিতে পাইবে না—তোমার পুণ্যে সে আমাকে দেখিতে পারে—ঐ যে মাঠের ধারে বট গাছের তলে, ঐ যে বড় দীঘিটা আছে—সেই দীঘির জলে, কেবল ছায়ার মত।

ব্রাহ্মণ দেখিলেন—দেখিয়া প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর দুঃখ মোচন হইল।

ঘাটাকুলি ব্রত

শনি-মঙ্গলবারের ঘাটে দাঁড়াইয়া এই ব্রত কথা বলিতে ও শুনিতে হয়। ব্রতের উপকরণ কলার মাইজ, তেল সিঁন্দুর, পান, সুপারী ইত্যাদি। ব্রত কথা শুনিবার জন্য প্রতিবেশীদিগকে একবারের বেশি ডাকিতে নাই—আসিলে মঙ্গল, না আসিলে অমঙ্গল হয়।

এক সওদাগর পুত্র—স্ত্রী ছাড়া ঘরে আত্মীয়স্বজন আর কেহ নাই—তিনি বাণিজ্যে যাইবেন। বাণিজ্যে যাইবেন—যুবতী বধূ, তাহাকে রাখা যায় কোথায়? ভাবিয়া ঠিক করিলেন যে বধূকে মামারবাড়ি রাখিয়া যাইবেন। ঝিনুক মাপিয়া খাইলে রাজার গোলাও ফুরাইয়া যায়—বসিয়া বসিয়া তো আর খাওয়া যায় না? তিনি বধূকে মামারবাড়ি লইয়া গেলেন।

মামারবাড়ি যাইয়া মামীকে বলিলেন—মামী, আমি বাণিজ্য করিতে যাইব, তোমার ভাগিনা-বউ এখানে রহিল। আর, কতদিনই বা থাকিব—ছ মাস, বড় জোর এক বছর—বুঝিলে মামী?

মামী মুখ ফুলাইয়া বলিলেন—তা তবে রাখিয়া যাও—কাজ-কর্মে যদি কুইড়া না হয়, তবে তোমার মামার জোত-জয়ান সংসারে একরকম চলিয়া যাইবে—আর যত শীগগির পার লইয়া যাইতে ভুলিও না।

সওদাগর পুত্র চলিয়া গেলেন। ছয়মাস, এক বছর, দুই বছর—না ছয় বছর চলিয়া গেল, কৈ সওদাগর পুত্র আর ফেরেন না।

এদিকে মামীর যন্ত্রণায় বধূর দুর্দশার আর সীমা নাই। খাইতেও দেয় না, পরিতেও দেয় না—অথচ সংসারের কাজকর্ম করাইয়া লইয়া নিজের বুঝ্ মামী বুঝিয়া লইতে ষোল আনার এক কড়াও ছাড়ে না—বধূর নাকের জলে চোখের জলে একত্তর।

সওদাগরের বৈটা সওদাগর—তার বউ এত সহ্য হইবেই বা কেন? যে খাইত দুধ-ভাত সে কিনা খাইবে পোড়া ভাত আর পোড়া চাঁচি। বধূর চোখের জল আর শুকায় না।

এদিকে ঘাটাকুলি ঠাকুরাণী ইহা দেখিয়া দৈববাণীতে বলিলেন—দেখ, তুই আমার ব্রত কর তবেই তোর দুঃখ দূর হইবে।

ব্রতের নিয়ম বলিয়া ঘাটাকুলি ঠাকুরাণী আকাশে মিলাইয়া গেলেন। বধূ ব্রত করিতে লাগিল।

একদিন ব্রত করিবার সময় মামীকেও সে ডাকিল—মামী বলিল, আস্পর্ধাটা দেখ মাগীর! আমার ভাত খায় আবার আমার সমান চলিতে চায়—এ্যাঁ আমাকে লইয়া ব্রত করিবে—বাপ্‌রে বাপ্, মাগীর লেহাজ্ দেখতে পরাণ যায়!

মামী গেল না। বধূ ব্রত করিল। মামীর ছয় ছেলে ঢলিয়া পড়িল। মামী বলিল—ডাইনি তুই কি ব্রত করলি, আমার ছয় সোনা ঢলিয়া পড়িল—পেত্নি তুই আমার সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যা।

বধূ বলিল যে, সে ব্রত কথা শুনিতে যায় নাই বলিয়া এইরূপ হইয়াছে। ব্রত করিলেই ছয় ছেলে বাঁচিয়া উঠিবে। মামী তাহাই করিল—ছয় ছেলে যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল।

একবারের ব্রতে সওদাগর-পুত্রের স্ত্রীর কথা মনে হইল, দ্বিতীয়বারের ব্রতে সওদাগর-পুত্র দেশে আসিলেন, তৃতীয়বারের ব্রতে সওদাগর-পুত্র স্ত্রী ও ধন-জন লইয়া সুখে-শান্তিতে বাস করিতে লাগিলেন।

পুস্তকে ব্যবহৃত কতিপয় প্রাদেশিক শব্দের অর্থ।

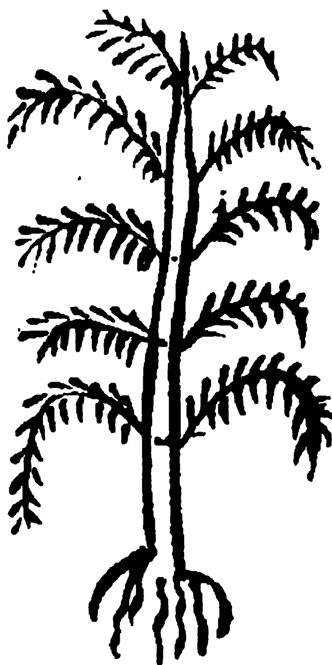
মৌ—মধু	আঁকে—মণ্ডল মধ্যে	ইয়ল—কুয়াশা
থুইয়া—রাখিয়া	গোতলাইনা—ঘোলা	বউল—মুকুল
লোচা—থোপা থোপা	কোচা—কাপড়	ঝল্লই—ঝুলেপড়া

রাঘব—বড়	খালুই—কলাগাছের পাট দ্বারা নির্মিত ডুলা	দীঘল—লম্বা
রাইল—শ্রীকৃষ্ণ	কুয়া—কুয়াশা	গোতলাইনা—অপরিষ্কার
খুয়ানী—বধূগণ	ভাতন্তি—বহু অন্নবিশিষ্ট অর্থাৎ অন্নপূর্ণা	পাখালি—ধুই
বরই—কুল	খরকা—ছোট কাঠি, পরিকা	পুতন্তি—পুত্রবতী
আইয়ো—ত্রয়ো অর্থাৎ রণজয়ী	সারতি—লোকজনে পূর্ণ	লাতিপাতি—যৎসামান্য
টগরবগর—প্রচুর	ঝগর—কলহপূর্ণ	অষ্টবর্ণ—বলদ
আঘা—চুল্লী	ঘাটালে—পশ্চাৎ দুয়ারে	মাইজালে—গৃহের পশ্চাৎ দিগের অংশ

সাগর আন কাগর আন—অর্থাৎ ব্রতের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনয়ন কর।

সন্ধিবিলাস—সংসারে সকলের সহিত প্রীতিভাব

ছৈল—ছোলা	গুয়া—সুপারি	পাট—স্থান
নাটুয়া—নর্তকী	নিকাইয়া—লেপিয়া	



সংযোজিত

বিক্রমপুরে গার্শিব্রত

নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তী



...বিক্রমপুরের গার্শিব্রতের কথা এখানে আলোচনা করিলাম। বিক্রমপুরে গার্শিব্রতকে "গারুব্রত" বলা হইয়া থাকে। "গারু" শব্দের উৎপত্তি কোথা হইতে তাহা আমরা বলিতে পারি না। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিবসে ঐ ব্রত হইয়া থাকে। সংক্রান্তির পূর্বদিন শেষরাত্রিতে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে ঘুম হইতে উঠিয়া শঙ্খ ধ্বনি করিতে থাকে এবং পাঁকাটিতে আগুন জ্বালাইয়া গৃহের ভিতর চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া আসে এবং বৃদ্ধারা মুখে মুখে বলিতে থাকে—

"জোঁক পোঁক বাহির হ'
লক্ষ্মী আসুন ঘরে।"

এই মন্ত্র পড়িয়া সমুদয় ঘরে আগুন লইয়া যায় এবং পরে শয়নগৃহের মেঝেতে আগুন স্থাপন করিয়া তাহাতে কাঁচা তেঁতুল পোড়াইয়া থাকে এবং ঐ তেঁতুল-পোড়া সকলে ঠোঁটে মালিশ করিয়া থাকে, ইহাতে নাকি শীতকালে ঠোঁট ফাটে না। কেহ কেহ পাঁকাটির আগুন লইয়া সিগারেটের মত ধূম পান করিয়া থাকে। প্রভাতে সকলেই গৃহাদি পরিষ্কার করিয়া থাকে। এই ব্রতের কথা শুনিলেই ব্রতের উদ্দেশ্য বুঝা যায়। আমরা সংক্ষেপে এখানে বিক্রমপুরের (গার্শি) গারুব্রতের কথা লিখিতেছি। স্ত্রীলোকগণ সকলে একত্র বসিয়া এই কথা শুনিয়া থাকে। একজন বৃদ্ধা এই ব্রত কথা বলিয়া থাকে—

লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী দুই ভগিনী। এক গৃহস্থ লক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়া সংসারে আনিয়াছে, কিন্তু গৃহস্থ লক্ষ্মীকে দেখিতে পারে না। লক্ষ্মী স্ত্রী সর্বদা গৃহ পরিষ্কার রাখে, কিন্তু গৃহস্থ তাহা ভালবাসে না, সে অনাচার করিতে ভালবাসে। লক্ষ্মীর ভগিনী অলক্ষ্মীও গৃহে আসিতে চাহে কিন্তু লক্ষ্মীর দরুণ আসিতে পারে না ; গৃহস্থকে রাত্রিতে অলক্ষ্মী দেখা দিয়া যায়। এই গৃহস্থের একটি পুত্র ছিল। কালক্রমে পুত্রের বিবাহ দিয়া গৃহস্থ সংসারের ভার পুত্রবধূর উপর দিয়াছিল। কিছুদিন পরে লক্ষ্মীর মৃত্যু হইল, গৃহস্থ বেচারা পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল। এদিকে লক্ষ্মী মৃত্যু সময়ে পুত্রবধূকে বলিয়া যায়, "ওগো মা! তুমি সর্বদা সদাচার করিয়া ঘরে ধূপ প্রদীপ দিবে, নতুবা ঘরে অলক্ষ্মী আসিবে।" কিন্তু লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর বধূর শ্বশুর বধুকে সর্বদাই অনাচার করিতে উৎসাহ যোগায়। বধূ শাশুড়ির উপদেশমত গোপনে সদাচার করে, কিন্তু শ্বশুরকে বুঝাইবার জন্য সামান্য কদাচারের ভাণ করিয়া থাকে। একদিন এই সংক্রান্তির দিন বধূর শ্বশুর-ঠাকুর সন্ধ্যাকালে বিকটাকার অলক্ষ্মীর মূর্তি দেখিয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার চিৎকার শুনিয়া বধূ তথায় যাইয়া শ্বশুরের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইল। অনেক কষ্টে বৃদ্ধের জ্ঞান সঞ্চার হইল এবং বধূকে অলক্ষ্মীর দর্শনের কথা বলিল। বধূও অনাচারের ভাণ করিতেছে বলিয়া শ্বশুরকে জানাইল। সেই দিন হইতে বৃদ্ধ শ্বশুর আর বধূকে অনাচার করিতে বলে নাই এবং যাহাতে অলক্ষ্মী গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে সেজন্য লক্ষ্মীর পূজা দিয়া থাকে।"

গারুব্রতের দিন বিক্রমপুরের হিন্দুগণ জাল দিয়া ধৃত মাছ ভক্ষণ করে না—হলকর্ষিত শস্যাদি ভোজন করে না। সেদিন খেসারী ডাইল ও "শালুক" ভক্ষণ করিয়া থাকে, এই প্রকার না করিলে অলক্ষ্মী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করে ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। এইদিন সন্ধ্যাকালে হিন্দুরমণীগণ বাড়ির চতুর্দিকে আলোক (প্রদীপ) দান করিয়া থাকে। গারুব্রত লক্ষ্মীর পূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

** প্রবাসী ১৩৩০ আষাঢ়*

বিক্রমপুরের পৌষ সংক্রান্তির ছড়া



বিক্রমপুর অঞ্চলেও পৌষ সংক্রান্তির উৎসব আছে, তথায় প্রতিবৎসর পৌষ মাসের শেষ ভাগে হিন্দু ও মুসলমান বালকগণ দিবাবসানে দীর্ঘ যষ্টি হস্তে দলে দলে শ্রুতি মধুর বিবিধ কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এবং সংক্রান্তির দিন মধ্যাহ্নে কোন মাঠে গিয়া মহানন্দে "পোষলা" করিয়া থাকে। হিন্দু বালকেরা হরির নামে ও মুসলমান বালকেরা মানিক পীর ফকিরের নামে উৎসবে ব্রতী হয়।

ছড়াগুলির বিষয় বিভিন্ন—কোনটি লক্ষ্মীর নামে, কোনটি টাকা পয়সা নিয়া, কোনটি বা বাঘের নামে রচিত। কিন্তু কোন ছড়াতেই তাদৃশ সামঞ্জস্য নাই, কষ্টকল্পনায় অর্থ টানিয়া আনিতে হয়। তজ্জন্য অর্থ গ্রহণ করা কঠিন।

বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি ছড়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

১) আইল্যাম্ রে অরণে (১)
লক্ষ্মী মায়ের চরণে,
লক্ষ্মীমায় দিলেন বর
ধান চাউল বাইর কর।
ধনে দিয়া, না দিয়া কড়ি
ঐ বাড়ি পাইম্ সোনার লড়ি (২)।
সোনার লড়ি পাইম্ রে
শ্যাম সুমারি কাইম্ রে।

(২) ছিকা (৩) লড়ে, ছিকা চড়ে,
ঝমঝমাইয়া ট্যাকা পরে ;
এক্‌টা ট্যাকা পাল্যাম্ রে
বাইন্যা-বাড়ি গেলাম্ রে।
বাইন্যা-বাড়ি ঘুঘুর বাসা,
এক এক ঘুঘু নও নও বাসা,
নও নও বাসে নও নও পণ,
আমরা পাব কয় পণ।

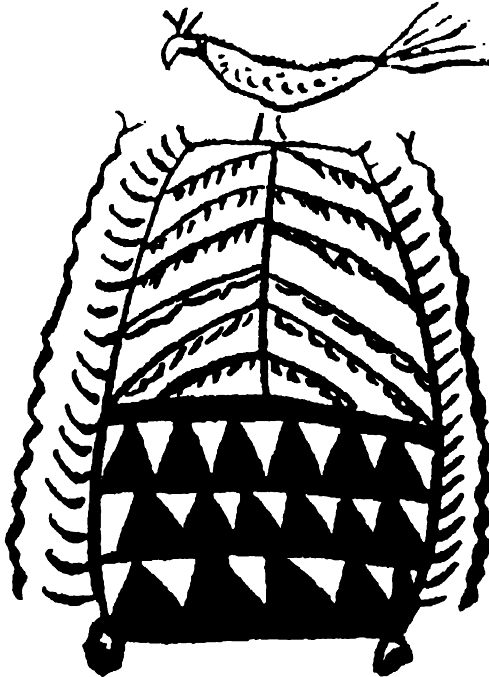
৩) আইর‍্যা (৪) নলের বেড়া,
যাই উত্তর পাড়া ;
উত্তরপাড়া ঘরটি
সোনার লড়ি খামটি।
সোনা চেয়ে রূপা ভাল (৫)
ঐ বাড়িখনি দেখতে ভালা,
দেখতে ভালা, উচা টুই
ট্যাকা আছে মোচা দুই।

(৪) দাদায় গোছে বাঘাইপুর
কিনা আনছে চাম্পা ফুল,
চাম্পা না রে মর্তমান (৬)
এস গিরি কর দান।
এক ধান দুই ধান
মধ্যে মধ্যে হলদে ধান,
অরে (৭) হল্‌দে গুয়া (৮) খা,
পাড়ের বাঘ সরে যা।
কুলইর বর, কুলইর বর।

সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

(১) অরণ—হরণ করা। (২) লড়ি—লাঠি, যষ্ঠি। (৩) ছিকা—উচ্চে দ্রব্যাদি রাখিবার যন্ত্র বিশেষ। (৪) আইয়্যা—অন্ধকার বিশিষ্ট। (৫) ভালা—উত্তম। (৬) মর্তমান—কলাবিশেষ। (৭) অরে—ওরে ; সম্বোধনসূচক অব্যয়। (৮) গুয়া—সুপারি।

* *প্রবাসী ১৩২৬ পৌষ*



সংযোজন

রামপাল



---

১. হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়

রামপালের রাজত্ব সময়ে বিক্রমপুরের সীমানা ঃ

"বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" প্রণেতা দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় প্রথম অধ্যায়ে সীমা নির্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন,—"ইহার পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে বরেন্দ্রভূমি এবং উত্তরে জঙ্গল। ইহার কতকাংশে বঙ্গের রাজ্য ছিল বলিয়া ইহা বঙ্গদেশ বলিয়া অভিহিত হয়। ভগবান পরশুরাম ব্রহ্মার মানস-সরোবর হইতে খাল কাটিয়া এই দেশে ব্রহ্মপুত্র নদ আনয়নপূর্বক জলদানের পুণ্যে মাতৃহত্যা জনিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। যে স্থানে স্নান করিয়া তাহার পাপান্ত হইয়াছিল, সেই স্থান পরশুরাম-ক্ষেত্র ও পৌষনারায়ণী নামে খ্যাত। এই দেশের কতকগুলি ক্ষত্রিয় প্রাণভয়ে পরশুরামের নিকট আপনাদিগকে ধীবর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। তাহাদের সন্তানেরাই রাজবংশী। এইদেশও মগধ রাজ্যের অধীন এবং ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছিল। তখন এই দেশ মগধের বৌদ্ধ সম্রাটদিগের অধীন পাল উপাধিকারী করদ-রাজগণ দ্বারা শাসিত হইত। পাষণ্ডদলনের পর সেই পালগণ স্বাধীন হইয়া ক্রমে ক্রমে শৈব হিন্দু হইয়াছিলেন। পাল বংশের ধর্মপাল প্রথম সনাতন ধর্মগ্রহণ করেন। তৎপুত্র দেবপাল বা দেপাল গৌড়নগর হইতে কয়েকজন কায়স্থ আনিয়া বঙ্গদেশে স্থাপিত করেন এবং তাহাদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান করিয়া সেই সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন। তৎপুত্র রামপাল এই বংশের শেষ রাজা। রামপালের পত্নী ও পুত্রবধূ কায়স্থ কন্যা। তদীয় রাজ্যের প্রধান কার্যকারক সমস্তই কায়স্থ ছিল। রামপালের একমাত্র পুত্র যক্ষপাল জনৈক প্রজার পত্নীর প্রতি দুর্ব্যবহার করায় নিরপেক্ষ রাজা তাহার প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন। তাহার পত্নী ও পুত্রবধূ শোকে বিমূঢ়া হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে আত্মবিসর্জন করিলেন। রামপাল নিজে গঙ্গাতীরে যাইয়া শিবভক্ত বিজয়সেনকে নিজ রাজ্য প্রদান করতঃ অনশনে প্রাণত্যাগ করিলেন। এই সময় হইতেই বঙ্গদেশে বৈদ্যরাজত্বের সূত্রপাত হয়।"

বিক্রমপুরের রামপাল নামক স্থানটির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থসমূহে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পালবংশের শেষ রাজা রামপালই রামপাল নামক স্থান স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। আদিশূরের রাজত্বের পূর্বে রামপাল যে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে সান্যাল মহাশয়ের পুস্তকে যথেষ্ট প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রাচীন নাম প্রাঠ্য দেশ, বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের সময় সেই শব্দ অবভ্রষ্ট হইয়া রাঠ বা রাঢ় নামে পরিণত হয়। এইদেশ বহুকাল মগধদেশের অধীন ছিল। জরাসন্ধের প্রসিদ্ধ রাজধানী পঞ্চকুট এই দেশের অন্তর্গত। মগধের শূদ্র রাজাদের অধীনে এইদেশও ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছিল। বৌদ্ধরাজত্বের সময় পাল উপাধিকারী করদ-রাজগণ মগধ সম্রাটের অধীন থাকিয়া এই দেশ শাসন করিতেন। পাষণ্ড দলনের পর এদেশের উত্তর ভাগ গৌড়াধিপতির অধীনে উত্তররাঢ় নামে খ্যাত হয়। দক্ষিণ-রাঢ় স্বাধীন হইয়াছিল। আদিশূর ও তৎপরবর্তী সেন রাজগণ ক্রমশ সমস্ত রাঢ় দেশ অধিকার করিয়া এইদেশ স্বরাজ্য ভুক্ত করিয়াছিলেন।

৯৪৪ শকাব্দে বঙ্গাধিপতি আদিশূর কর্তৃক বিক্রমপুরে প্রথম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার এক শত বৎসর পূর্বে রাজা রামপাল বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন। অদ্যাবধি বিক্রমপুরে রামপাল নামক স্থানে রামপালের অক্ষয় কীর্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইতিহাসের সত্য

নির্ণয় যথাসাধ্য চেষ্টায় সন্নিবেশিত হয়, কিন্তু কিম্বদন্তীর উপর কতকটা নির্ভর না করিয়া চলাও সুকঠিন। রামপালের দিঘি অদ্যাপিও আছে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে—"তাহার পত্নী ও পুত্রবধু শোকে বিমূঢ় হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে আত্মবিসর্জন করিলেন।" অনেকেই অনুমান করেন যে, রামপালের দিঘিতেই তাহার পত্নী ও পুত্রবধু আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। সে সময়ে হিন্দুরাজগণের ধর্মপ্রাণ বিধায় যে আত্মবিসর্জন করিয়া বিক্রমভূমির অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া যাইবে তাহা কিংবদন্তী বলিয়া ইতিহাসে অনাদৃত রাখা সুকঠিন।

অধ্যাপক শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত[১] রামপাল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, রামপাল বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী। "রামপাল" এই শব্দটি উচ্চারণ করিলেই বিক্রমপুরবাসীর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব ভাবের উদয় হয়। স্বাধীনতার পুণ্য নিকেতন, বীরত্বের কেন্দ্রস্থল, পাণ্ডিত্যের গৌরব দর্পিত রামপালের পবিত্র স্মৃতি আমাদিগকে ক্ষোভে ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে। যে স্থান একদিন রাজপ্রাসাদে শোভা পাইত, হস্তীর বৃংহতি ধ্বনিতে, অশ্বের হ্রেষারবে ও সৈন্যগণের কোলাহলে যে স্থান প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইত, তাহা এখন নীরব ও নির্জন। যেখানে রাজপ্রাসাদ ছিল, এখন সেখানে কৃষক হল চালনা করিতে করিতে চিরজয়ী কালের বিজয় গৌরব ঘোষণা করিতেছে। গভীর জল পরিপূর্ণ, প্রাসাদ-বেষ্টিত পরিখাগুলি এখন সবুজ সুন্দর ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া জাগতিক বস্তুর নশ্বরতা প্রকাশ করিতেছে। বৃহৎ ও সুন্দর যাহা কিছু দর্শনীয় ও উপভোগ্য ছিল সময়ের পরিবর্তনের সহিত সে সমুদয় অন্তর্হিত হইয়াছে। বিক্রমপুর এক মহাশ্মশান—সে শ্মশানের শ্মশান রামপাল। অতীতের গৌরব, বৈভবময় জ্ঞানধর্মবিমণ্ডিত সভ্যতা ও শ্রেষ্ঠতার সঙ্গে ধনৈশ্বর্যের ও বীরত্বের যে মহিমোজ্জ্বল মিলন সংগঠিত হইয়াছিল, বর্তমান যুগে শ্মশানের এই পুঞ্জীভূত ভস্মরাশির নিম্ন হইতে তাহার ছায়াচিত্র গ্রহণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। এ সংসারে সকলই যায়—থাকে কেবল স্মৃতি। অমা রজনীর তিমিরাবৃত গগনে জলদনিচয়ের মধ্য হইতে বিদ্যুত ঝলসিত হইলে, পথহারা পান্থ যেমন ক্ষণিক উল্লসিত হইয়া উঠে, আমরাও তেমনি অন্ধ তমসাচ্ছন্ন প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করিতে যাইয়া স্মৃতির আলোকে পথ ধরিয়া চলিয়াছি। বারভূঞা প্রণেতা আনন্দবাবু বলেন—রামপাল নামক স্থানে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ এক প্রকাণ্ড দির্ঘিকার খাত বর্তমান আছে। কেহ কেহ বলেন যে, রামপাল নামে কোনও এক রাজা কর্তৃক এই জলাশয় খনিত হওয়ায়, তাহার নামানুসারে স্থানের নাম রামপাল হইয়াছে। এই স্থানে কতকগুলি ইষ্টক স্তূপ অদ্যাপি বর্তমান আছে। কতকগুলি দেবদেবীর প্রতিমূর্তিও মৃত্তিকা গর্ভে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে প্রতীতি হয়, পূর্বকালে এই স্থানে একজন পরাক্রমশালী রাজার রাজধানী ছিল।

রামপালের রাজধানীর বিবরণ ঃ

বিক্রমপুরের পূর্বোত্তর প্রান্তে মেঘনাদ (মেঘনা) নদের পশ্চিম তটে বর্তমান ঢাকা নগরীর বার মাইল দক্ষিণ-পূর্ব ও মুন্সিগঞ্জ মহকুমার দুই ক্রোশ পশ্চিমে রামপাল অবস্থিত। অক্ষা ২৩° ৩৮' উঃ ৯০° ৩২' ১০" পূঃ। রামপাল এবং ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রাম ইত্যাদি অভিনিবেশ সহকারে পরিদর্শন করিলে প্রাচীনকালে যে ইহা কতদূর বিস্তৃত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রাচীনকালে ইহার বিস্তৃতি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় দশ বার মাইল পর্যন্ত ছিল। কারণ রামপালের সমীপবর্তী দশবার মাইলের মধ্যে এমন স্থান নাই যেখানে অদ্যাপি কোন না কোন প্রাচীন চিহ্ন বিদ্যমান না আছে। যে সমুদয় বৈদেশিক এবং দেশিয় পর্যটক অভিনিবেশ সহকারে রামপাল ও তৎসমীপবর্তী গ্রামসমূহ পরিদর্শন করিয়াছেন, তাহারা সকলেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইষ্টকস্তূপ, রাজপথাদির ভগ্নাংশ, ইত্যাদি দেখিয়া আমাদের উক্তির যথার্থতা স্বীকার করিবেন। এখনও আবদুল্লাপুর, রিকাবিবাজার, পঞ্চসার, সোনারঙ, পাইকপাড়া, বজ্রযোগিনী, চূড়াইন ইত্যাদি স্থানে রাস্তা ও অট্টালিকাদি ভগ্নাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। হায়! কে জানিত যে একদিন মহাসমৃদ্ধ রাজনগর দরিদ্র কৃষক বসতিতে পরিণত হইবে? কত প্রাচীন মহামহীরুহ

আজিও উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কিন্তু হায়! সে নয়নমনমোহকর স্বাধীনতার প্রদীপ্ত গৌরবস্থল, সুমহান রাজপ্রাসাদ কোথায়? সুদীর্ঘ সরোবর অদ্যাপি বিশুদ্ধ দেহে পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহার পাষাণ সোপানসমূহ কোথায়? যাহা ছিল তাহা মাতা বসুন্ধরা নিজ উদরে গ্রহণ করিয়াছেন। ধ্বংসাবশিষ্ট পুরাতন দৃশ্যাবলীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইলে হৃদয়ে আপনা হইতেই একটা শ্মশান বৈরাগ্যের ভাব জাগিয়া উঠে, মনে হয় কবি সত্যই গাহিয়াছেন—

"বীরত্বের গর্ব আর প্রভুত্ব বিভব
সম্পদ সংসার সহ যাহা করে দান
অলঙ্ঘ্য মৃত্যুর হায়! মুখাপেক্ষি সব
গৌরবের পথ মাত্র মৃত্যুর সোপান।"

রামপালের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার জনপ্রবাদ প্রচলিত। কেহ কেহ বলেন পাল বংশীয় সপ্তদশ নরপতি রামপালের নামানুসারে "রামপাল" এই নামোৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু লঘুভারতকার বলেন যে,—

"রাম নামৈকো বৈদ্যরাজ মহাধনী
তৎপালিতা সা নগরী রামপালেতি সংজ্ঞিতা।"

অর্থাৎ রাম নামক জনৈক বৈদ্যবংশোদ্ভব মহাধনী নরপতির রাজধানী ছিল বলিয়াই ইহার নাম রামপাল হইয়াছে। বিখ্যাত সাহিত্য সংস্কারক স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর C.I.E. বলেন "বল্লাল প্রতিষ্ঠিত রাজবাড়ির মুদির নাম ছিল রামানন্দ পাল, লোকে তাহাকে সাধারণত রামপাল বলিত। রাজবাড়ির তণ্ডুলাদি যোগাইয়া, রামপাল কালে সমৃদ্ধিশালী হইল এবং বল্লালের রাজধানী হইতে খানিকটা দূরে বাড়ি করিয়া দেশিয় বণিক সমাজে সম্মানের আসন লাভ করিল। বল্লাল যখন দিঘি খনন করেন, তখন তাহার দিঘি সংবর্ধিত হইয়া রামপালের বাড়ির নিকট গিয়া পঁহুছে এবং রামপালের শুভাদৃষ্ট ক্রমে রামপাল দিঘি নামে পরিচিত হয়। উপরোক্ত ঘোষ বাহাদুরের রামপালের ইতিহাস যাহা বর্ণিত হইয়াছে আমার মতে এই সব একটা অনুমান ভ্রান্তিমূলক বোধ হয়—তাহার উদাহরণ ক্রমে দ্রষ্টব্য—

দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয় সামাজিক ইতিহাসে রামপালের শেষ রাজত্বের বিষয় বিশেষভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। রামপাল একজন শৈব রাজা ছিলেন, নচেৎ শিবভক্ত বিজয়সেনকে স্বীয় রাজ্য প্রদান করতঃ অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেন না। এই সময় হইতেই বাংলায় বৈদ্যরাজত্বের সূত্রপাত হয় ; তৎপর আদিশূর প্রভৃতি বৈদ্যরাজগণ ক্রমশ রাজত্ব বিস্তার করত রামপাল নামক স্থান রাজ্য স্থাপন করেন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর কালীপ্রসন্নের রামপালের সম্বন্ধে ও দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয়ের সামাজিক ইতিহাসের সমালোচনা করিলে সান্যাল মহাশয়ের রামপালের সম্বন্ধে বিশেষ ভ্রম দৃষ্ট হয়। তাহার পরিচয়, রামপাল বলিলে কাহারও নিকট অপরিচিত স্থান বলিয়া মনে হয় না। যদি রামপাল সামান্য রাজবাড়ির মুদি হইতেন তবে তাহার যশঃ মান খ্যাতি আজ পর্যন্ত বিক্রমপুরের বালকবৃদ্ধবণিতা সকলেই ভুলিয়া যাইতেন। অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি যে তিনি ছিলেন তাহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

রামপালের রাজত্বের পর বিজয়সেন রাজত্ব করেন এবং তৎপর সমস্ত রাঢ়দেশ অধিকার করিয়া রামপাল নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। তৎপূর্ব হইতেই রাজার নাম অনুসারে রাজ্যের নাম রামপাল বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। শূরবংশীয় রাজগণ যখন বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন তখনও রামপাল বলিয়া এই স্থানের নাম সুপরিচিত ছিল।

২. রাজেন্দ্রলাল আচার্য ঃ

সে দিন পৌষের এক অতি সুন্দর প্রভাত—বিহগকূজন-মুখরিত, শিশিরসিক্ত, কুয়াশা-বিমুক্ত, বালরুণ-কিরণ সমুজ্জ্বল। যেরূপ তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আবেগ হৃদয়ে লইয়া ভক্ত দেব-দেউলে যাত্রা করে, আমিও সেদিন তেমনি বাংলার এক স্বপ্নময় রহস্যময় তীর্থদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম।

সেই সুমহান অতীতের বিরাট দৃশ্যাবলী যেন মূর্তি লইয়া সে দিন আমাকে দেখা দিয়াছিল। যেন দেখিতে লাগিলাম, সৌধের পর সৌধের সারি, তড়াগের পর তড়াগ—যেন মন্দিরের পর মন্দির হইতে ধূপ ধূম-গন্ধ উর্ধ্বে উত্থিত হইয়া দেবচরণে ভক্তের পূজার বার্তা নিবেদন করিতে স্বর্গের সিংহদ্বারে যাত্রা করিয়াছে। দেউলে দেউলে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছে। যেন দেখিলাম, বিস্তৃত রাজপথ কোলাহল-চঞ্চল। কোথাও বঙ্গবীর বর্মে চর্মে সুশোভিত হইয়া অশ্বারোহনে সেনানিবাসে যাইতেছে—হস্তীর পর হস্তী চলিয়াছে, রথের পর রথ। যেন বিজয়ী বাহিনী জয়স্কন্ধাবার হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। তুরী বাজিতেছে। জয়ডঙ্কার বিপুল নিনাদে গগন পরিপূর্ণ হইয়াছে।

এমন সময় একজন বন্ধু বলিলেন—"এই গ্রামের নাম পঞ্চসার"

দেখিলাম অগণিত কদলীবৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন একখানি গণ্ডগ্রাম। মুসলমান কৃষকের হাল তাহার প্রতি ক্ষেত্র বিদীর্ণ করিয়া নানা শস্য উৎপন্ন করিয়াছে। পথিপার্শ্বে কয়েকখানি ক্ষুদ্র কুটির পঞ্চসারের বাজার নামে পরিচিত হইয়া অনুসন্ধিৎসুর কৌতূহল উদ্দীপিত করিতেছে।

কাণ্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের চরণপূজা করিয়া আদিশূর তাহাদিগকে যে পঞ্চ গ্রাম দান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে, এই কি তাহার একখানি? আমরা কি তবে সেই সুরসরিদবিধৌতপাদ গৌড় নগরের[২] উপকণ্ঠে আসিয়া উপনীত হইলাম?

কালপ্রভাবে কি না হয়। শ্মশানে কুসুম ফোটে, সাগর শুষ্ক হয়, পর্বতচূড়া ধ্বসিয়া যায় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সামগান-মুখরিত পুণ্যক্ষেত্র যে এখন নৃত্যশীল গৃহপালিত কুক্কুট ক্রীড়াভূমি হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু ইহাই কি সেই গৌড় জনপদ? তবে সে সুরসরিৎ কৈ? তাহার চিহ্নই বা কৈ? কোন দিন কি তাহা রামপালের সন্নিকটে বর্তমান ছিল? তবে তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ কৈ?

সত্যই কি তবে পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন? "বেদবাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" কি তবে ঠিক? ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তির তবে অর্থ কি? তবে তাহাতে ভবদেবকে আদিশূরের আমন্ত্রণে সমাগত পরাশরের বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচিত করা হয় নাই কেন? কোন্ ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া এ কথা বলিতে সাহসী হইব যে "বেদবাণাঙ্কা শাকে" সমগ্র বঙ্গদেশে ধর্মশীল বেদবিৎ একজন ব্রাহ্মণও বর্তমান ছিলেন না? বৌদ্ধধর্ম কি বঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণ্যকে একেবারেই বিলুপ্ত করিয়াছিল? সকল প্রশ্নের একমাত্রই উত্তর আছে—নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ। কিন্তু জনশ্রুতি এতই পল্লব-বহুল যে, শুধু তাহার ছায়ায় আশ্রয় লইয়াই নিজেকে নিরাপদ বলিয়া মনে করা যায় না।

যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই মনে হইতে লাগিল, আদিশূর কি সত্যই একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি? যদি তাহাই হইবেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে এখন পর্যন্তও এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া অশংসয়ে বলা যাইতে পারে—আদিশূরের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আর সন্দেহ নাই। জনশ্রুতি বহুদিন হইতে আদিশূরের নাম বহন করিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং কে অশংসয়ে কহিবে—আদিশূর কবিকল্পনামাত্র। ইনি তবে কে? দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশূরের বংশধর? না বীরসেন? না অন্য কেহ? বাংলার ইতিহাস এখনও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন! কতদিনে সে অন্ধকার বিদূরিত হইবে? কতদিনেই বা সত্যের দ্বার উদঘাটিত হইয়া ঐতিহাসিক সারসত্য আবিষ্কৃত হইবে? বাঙালি এ চেষ্টা না করিলে কে আর তাহা করিবার জন্য অগ্রসর হইবে? ইংরাজ লিখিত বাংলার ইতিহাসে এবং কেবল তদ্দৃষ্টে রচিত বাঙালির ঐতিহাসিক নিবন্ধে প্রবাদ-প্রসঙ্গও সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক প্রমাণের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে!

সেই অল্প পরিসর ইতস্তত ভগ্ন কাষ্ঠসেতুর দ্বারা সংযুক্ত গ্রাম্যপথে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলাম। সেনবংশের গৌরব-কাহিনী তখন হৃদয় মধ্যে জাগিতেছিল। সেন ও পাল রাজগণের সমর-দুন্দুভি যেন তখন শুনিতেছিলাম। হায় রে! কোথায় বা সেই মহারাজাধিরাজ জ্যোতিবর্ম

— পাদনুধ্যাত — পাদানুধ্যাত — পরমবৈষ্ণব — পরমেশ্বর — পরমভট্টারক — মহারাজা বিরাজ হরিবর্মদেব যিনি বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে ভূমি দান করিয়া তাম্রফলকে সে কাহিনী উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন! শ্রুতি ও কি ইহার কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে। কোথায়ই বা সেই বিজয়সেন, লক্ষ্মণসেন, আর কোথায়ই বা সেই গর্গ-যবনান্বায় কালরুদ্র?

যাঁহাদের অমিত বিক্রমে বহুদিন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে মুসলমানের বিজয়কেতন উড্ডীন হইতে পারে নাই[৩] এই কি তাহাদের সেই বিশাল রাজধানীর বিলুপ্ত শ্মশান? একদিন হয় তো এই স্থানে কত বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত হইয়াছে, কত বীরসেনা "হর হর বম্ বম্ মহা কলরবে" দশদিক বিকম্পিত করিয়া বিজয়মাল্যে বিভূষিত বীরনৃপতির অনুগমন করিয়াছে। আজ আর সে নগরী নাই, সে রাজপথ নাই। ভূগর্ভে নিহিত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইষ্টক দেখিয়া এখন তাহার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লইতে হয়। ইষ্টকরাশিও এখন ভূপৃষ্ঠে স্তূপের ন্যায় বর্তমান থাকিয়াও অট্টালিকাদির অবস্থান সূচনা করে না! কৃষকদের হল ক্ষেত্রগুলিকে ধূলিতে পরিণত করিয়াছে। যেখানে উদ্যানবাটিকায় ফুল্ল মল্লিকা মালতী হাসিত, এখন সেখানে নিরবিচ্ছিন্ন রামপালের সুবিখ্যাত কদলীকুঞ্জ বর্তমান!

অনুসন্ধান করিলে "বল্লাল বাড়ির" নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকদূর পর্যন্তও প্রচুর পরিমাণে ইষ্টক পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রামের ভূগর্ভ হইতে জীর্ণ কক্ষাদির চিহ্ন, ধাতব দেবদেবী মূর্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বিক্রমপুরের সেই প্রাচীন রাজধানীর বিস্তার প্রায় ১০/১২ মাইল ছিল! বহু লোক মৃত্তিকা খননকালে স্বর্ণ রৌপ্য ও মূল্যবান প্রস্তরাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এক যুবক সপ্ততি সহস্র মুদ্রামূল্যের একখানি হীরক প্রাপ্ত হইয়াছিল।[৪]

বিক্রমপুরের অনেক গ্রামই—সকল গ্রাম বলিলেও অন্যায় হইবে না—পার্শ্ববর্তী ক্ষেত্র হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া গ্রামবাসীরা এরূপ করিয়া থাকেন। না করিলে বর্ষা সমাগমে গৃহাদি ভাসিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। রামপালেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কোন প্রাকৃতিক নিয়মে রামপাল এইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কে তবে এরূপ করিয়াছিল—কোন্ যুগে এরূপ করিয়াছিল—কি কারণেই বা করিয়াছিল, স্বতঃই এই সকল প্রশ্ন মনে উদিত হইতে লাগিল। আমরা অনুমান করিলাম, মুন্সিগঞ্জ অপেক্ষা বল্লালবাড়ির উচ্চতা প্রায় মুন্সিগঞ্জের সরকারি গৃহগুলির ছাদের সমান হইবে!

এই বিষয় আলোচনা করিতে করিতে আরো কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই দেখিলাম পার্শ্ববর্তী তরুরাজির উপর শির তুলিয়া একটি প্রাচীন মহীরুহের প্রেতমূর্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে—উহা শাখাহীন, পত্রহীন, রসহীন। শুনিলাম উহাই বিক্রমপুরের সুবিখ্যাত গজারি বৃক্ষ (শাল বৃক্ষ)—কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের তপঃ প্রভাবের স্মৃতি বহিয়া আজিও দণ্ডায়মান রহিয়াছে! যখন উহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম, উহার মৃত্তিকানির্মিত বেদী পরিক্রমণ করিলাম, তখন হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিলাম। কিন্তু তখনই মনে হইল বঙ্গে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন প্রমাণ করিতে কি এখন ইহাই আমাদের অন্যতম প্রধান সম্বল? ইহার উপর নির্ভর করিয়াই কি এখন বাঙালির ও বাংলার ইতিহাসের এক অপরিজ্ঞাত অংশ অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

এই কি সেই শুষ্ক মল্লকাষ্ঠ যাহা একদিন নবাগত ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ-দিগের করচ্যুত আশীর্বাদবারি বা আশীষ-কুসুম শিরে ধারণ করিয়া মুহূর্তে নবজীবন লাভ করিয়াছিল? সেই ইন্দ্রজালই কি এখন বাংলার এক অতি প্রাচীন ও অতীত সমৃদ্ধিগৌরবে গরীয়সী বীর প্রসবিনী পণ্ডিতজননী শস্যশ্যামলা নদী-মেখলা প্রদেশের ইতিহাস রচনার প্রধান পাদপীঠ!

যেমন আর সে রাজধানী নাই, রাজপ্রাসাদ নাই, যেমন আর সে ব্রাহ্মণ নাই, যজ্ঞভূমি নাই—যেমন ছিল তেমন যখন আর কিছুই নাই, সেই মহামহীরুহই বা থাকিবে কেন? উহা জীর্ণ

হইয়াছে, উহার রসাল বক্ষ বহু স্থান বিদীর্ণ হইয়াছে, উহার পত্র-পুষ্পের চিহ্ন পর্যন্ত আর নাই! আছে কেবল মসীবর্ণ দুইটি সুদীর্ঘ শাখা ও তাহাদের একটির শিরে একটি জীবন্ত বৃদ্ধ শকুনি! কিন্তু বিক্রমপুরের নরনারীর হৃদয়ে আজিও উহার প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জাগ্রত রহিয়াছে, হিন্দু মুসলমান উভয়ের নিকটেই উহা আজিও যেরূপ দেব-ভাবে পূজিত, তৈল ও সিন্দুরের অনুলেপেই তাহার পরিচয় বর্তমান রহিয়াছে। শুনিলাম আজিও কত রমণী বন্ধ্যাত্ব দূর করিবার জন্য ভক্তিভরে এই বৃক্ষকে স্পর্শ করিয়া থাকে। সৎসঙ্গে বাসের জন্য পার্শ্ববর্তী আম্র পনস ও খর্জুর বৃক্ষাদিও পূজা লাভ করিতেছে। বৃক্ষগুলি একটি ক্ষুদ্র দেব-পরিবারের ন্যায় অবস্থিত থাকিয়া প্রবাদের দোহাই দিয়া নিত্যপূজা আদায় করিয়া লইতেছে!

ঐন্দ্রিজালিক গজারি বৃক্ষের নিকট হইতে অনুমান ২৪½ হস্ত দূরে দেখিলাম আর একটি গজারি বৃক্ষ দুইটি শাখা বিস্তার করিয়া উর্ধ্বে উঠিতেছে। উহাও ভক্তির অর্ঘ্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই। শুনিলাম তিন বৎসর পূর্বে একবার প্রাচীন গজারি বৃক্ষের নবীন পল্লব দেখা দিয়াছিল—শুষ্ক তরু মুঞ্জরিয়াছিল। কিন্তু আশ্বিন মাসে অকস্মাৎ একদিন পল্লবগুলি শুষ্ক হইয়া উঠিল এবং একে একে ঝরিয়া পড়িল। শুনিতে পাওয়া যায় যে, ঢাকা জেলার এক ভাওয়াল ব্যতীত বিক্রমপুরের অন্য কোন স্থানেই গজারি বৃক্ষ নাই। ঢাকার নূতন নগর রমনায় আমরা গজারিকুঞ্জ দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে। রামপালের প্রাচীন গজারি বৃক্ষের সর্বনিম্ন স্থানের পরিধি প্রায় ৪½ হস্ত হইবে। উচ্চতা ৫০ হইতে ৬০ হস্তের ভিতর। ৩½ কি ৪ হস্ত উর্ধ্ব হইতে দুইটি শাখা বহির্গত হইয়াছে। নবীন বৃক্ষটির পরিধি ১½ কি ১¾ হস্ত হইবে।

যে ভূভাগ পূর্বে পদ্মানদীর পূর্ব তীরে, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে, বুড়িগঙ্গার দক্ষিণে ও ইদিলপুরের উত্তরে অবস্থিত ছিল, তাহাই সেকালে বিক্রমপুর নামে পরিচিত ছিল। এই ভূভাগের রাজার নাম বিক্রম ছিল বলিয়াই না কি স্থানের নামও বিক্রমপুর হইয়াছিল। ইহাই দিগ্বিজয় প্রকাশের সিদ্ধান্ত। 'বিপ্রকল্পলতিকা'কার বলেন যে এই নৃপতির পিতৃপুরুষগণ দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন। Hunter সাহেব তাহার Statistical Account-এ লিখিয়াছেন যে, হিন্দু নরপতি সুবিখ্যাত বিক্রমাদিত্যের রাজসভা কিছুদিন ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশে বর্তমান ছিল! এ সকলই অনুমান মাত্র।

পদ্মানদীর তরঙ্গ-তাড়ণে বিক্রমপুরের পূর্বশোভা ও সম্পদ সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। শৌর্য বীর্য সম্পদ সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র-বৈভবও বুঝি গত হইয়াছে। নতুবা এখন যেমন দেখিতেছি, বিক্রমপুরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এরূপ কেন? কলহ স্বার্থপরতা ঈর্ষা প্রভৃতি এখন যেন বিক্রমপুরকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে! বিরাট অতীতের গৌরবোজ্জল স্মৃতি এখন একখানি দীর্ণ নগ্ন অপবিত্র কাঠামকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে মাত্র!

মোঘলদিগের শাসন সময়ে বিক্রমপুর সোনারগাঁর অন্তর্গত ৫২টি পরগণার একটি ছিল! সোনারগাঁর রাজস্ব ২৫৮২৮৩৪ মুদ্রা নির্ধারিত ছিল। তন্মধ্যে কেবল বিক্রমপুর হইতে ৮৩৩৭৭ মুদ্রা আদায় হইত।

যখন পাল-নরপালগণ বঙ্গের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন বঙ্গদেশেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সেই সময়েই বিক্রমপুরেও বৌদ্ধ ধর্ম আশ্রয় লাভ করিয়া রাজ-সিংহাসনের ছায়াতলে পরিপুষ্ট হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। এই বিক্রমপুরই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মভূমি, হলায়ুধের ক্রীড়াক্ষেত্র।

পাল ও সেন রাজদিগের শাসনকালই বিক্রমপুরের গৌরবের যুগ! জ্ঞানে কর্মে, রণে ধর্মে, শিল্পে বাণিজ্যে, ধনে জনে সেই সময়েই বিক্রমপুর এরূপ শ্রীধারণ করিয়াছিল যে, কোনও ঐতিহাসিক কবি তাহার একখানি অমুদ্রিত কাব্যে কহিয়াছেন—"দেবের নৈবেদ্য সম শ্রীবিক্রমপুর।" রামপাল সেই শ্রীবিক্রমপুরের অন্যতম রাজধানী।

মহম্মদ তোঘলক্ যখন পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতা হরণ করিলেন, তখন দেখিলেন, শাসন-

সৌকার্যার্থ এই বিস্তৃত জনপদকে বিভক্ত করা আবশ্যক। তাহারই আদেশে পূর্ববঙ্গ নিম্নলিখিত তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছিল—(১) লক্ষ্মণাবতী (২) সাতগাঁও এবং (৩) ঢাকা ও সুবর্ণগ্রাম একত্রে।

বর্তমান ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ এখন বিক্রমপুর নামে পরিচিত।

রামপালের নামকরণ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রবাদ প্রচলিত আছে। ঐতিহাসিক ভিত্তির অভাবে তাহাদের কোনটির উপরেই সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করা উচিত কি না, বিবেচনার বিষয়। কেহ বলেন, পালবংশীয় নরপতি রামপালের নামানুসারেই রাজধানীর নাম হইয়াছিল। লঘুভারতকার বলেন, রাম নামক একজন, "মহা ধনী" নরপতির রাজধানী বলিয়াই উহার নাম রামপাল। কাহারও মতে রাজা বল্লালের রাজবাড়ির মুদী রামানন্দ পালের নামের সহিত রামপালের সম্বন্ধ বর্তমান আছে!

যেমন রামপালের নামকরণ সম্বন্ধে, তেমনি আদিশূরের আমন্ত্রণে গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন সম্বন্ধেও নানাবিধ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। ইতিহাস একেবারেই মূক হইয়া শুধু প্রবাদ-প্রসঙ্গের দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে। স্বয়ং আদিশূরও যেমন কুহেলিকাময় অতীতের অন্ধ আবরণে সমাচ্ছাদিত থাকিয়া কবির কল্পনাকে মূর্তি গড়িবার অবসর দিয়াছেন, তাহার ব্রাহ্মণ-নিমন্ত্রণ ব্যাপারও তেমনি অনুকূল ও প্রতিকূল নানা প্রসঙ্গের সহিত বিজড়িত হইয়া সত্য নির্ণয়ের পথ একান্ত দুরূহ করিয়াছে।

ক্ষিতীশ-বংশাবলীর চরিতকার বলেন যে, একবার রাজপ্রাসাদের উন্নতশীর্ষে একটি গৃধ্র দর্শনে মহারাজ তাহার ব্যবস্থা নির্ণয়ের জন্য সভাসদগণকে আদেশ করিয়াছিলেন। তখন নাকি সমগ্র বঙ্গদেশে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ একজনও ছিলেন না! সেই জন্য কাণ্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণপঞ্চকে আনয়ন করা আবশ্যক হইয়াছিল। ইহা হইতেই ইংরাজ ঐতিহাসিক অনুমান করিয়াছেন যে, তখন এদেশে ধর্ম বিলুপ্ত হইয়াছিল। ঢাকা জেলার ব্রাহ্মণগণ ধর্মহীন হইয়াছিলেন। সাধারণ্যে ধর্মপ্রচার ও সকলকে ধর্ম শিক্ষা দিবার জন্যই কাণ্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করা আবশ্যক হইয়াছিল। ইতিহাস যখন শুধু প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে, তখন এইরূপেই বিকৃত হয়![৫] কেহ কেহ বলেন রাজপেয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য আদিশূর ব্রাহ্মণদিগকে বিক্রমপুরে আনাইয়াছিলেন। কাহারও মতে আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞই সাগ্নিক বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

কল্পনা লীলাময়ী। দেবীবর বলিতেছেন—ব্রাহ্মণগণ আসিলেন, কিন্তু সকলেরই শক্তিবেশ—খড়া চর্মাদি সুশোভিত! মহারাজ আদিশূরের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তিনি হয়ত ভরসা করিয়াছিলেন যে, জটাবল্কলধারী কৌপীনপরিহিত তেজঃপুঞ্জকান্তি পঞ্চ ব্রাহ্মণ পদরজ দানে তাহার রাজ্যকে পবিত্র করিবেন। মহারাজ বিরক্ত হইয়া তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেই আসিলেন না। ব্রাহ্মণগণ আশীষ পুষ্প হস্তে সিংহদ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহারা যে রাজঅতিথি, অতিথি-সৎকার যে পরম ধর্ম—ইহাও কি রাজা বিস্মৃত হইয়াছিলেন? ধর্ম-প্রতিষ্ঠাই যাঁহার কামনা ছিল, তিনি একথা যে বিস্মৃত হইবেন, ইহা সহজে বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, মহারাজ যখন নিতান্তই আসিলেন না, তখন তাহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য ব্রাহ্মণের প্রভাব প্রদর্শন বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণ হস্তস্থিত আশীষপুষ্প নিকটবর্তী একটি শুষ্ক হস্তিবন্ধন-কাষ্ঠের শিরে বর্ষণ করিলেন—অমনি "তদা কাষ্ঠং সজীবং স্যাৎ ফলপল্লব-সংযুতং"—সেই ফলপল্লবসংযুক্ত গজারি বৃক্ষের প্রেতমূর্তিই এখনও বর্তমান রহিয়াছে! কবে যে এই অলৌকিক ব্যাপার সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই! সম্বন্ধ নির্ণয়কারের মতে আদিশূরের রাজত্বকাল ৯০০ হইতে ৯৫২ খ্রিস্টাব্দ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, গজারি বৃক্ষের বয়স প্রায় সহস্র বৎসর! বিশেষজ্ঞগণ অনুসন্ধান করিলে বৃক্ষ দেখিয়া একবার বিচার করিতে পারিবেন। রামপালের নিকটে কোনো স্থানেই (একটি তিন্তিড়ী বৃক্ষ ভিন্ন) খুব বেশি প্রাচীন বৃক্ষ দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে

না। দুইটি বৃক্ষের (সিপাহী পাড়ায় একটি তিন্তিড়ী ও বল্লাল বাড়িতে একটি আম্র) প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু উহারাও দুই তিন শত বৎসরের অধিক পুরাতন, আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি নাই!

গজারি বৃক্ষের অতি সন্নিকটেই দক্ষিণে বল্লাল দিঘির উত্তর তীর। বৃক্ষ হইতে তীর বোধ হয় ২০ হস্তের অধিক ব্যবধান হইবে না। দির্ঘিকা বিশালায়তন। দীর্ঘে প্রায় ৩/৪ মাইল এবং প্রস্থে ১/২ মাইল।[৬] উহার তলদেশে এখন পাট ও ধান্যের চাষ হয়! কোন কোন স্থানে এখনও জল আছে। তাহা ঘন শৈবালে ও সুদীর্ঘ ঘাসে সমাচ্ছাদিত। দেখিলাম দির্ঘিকার দক্ষিণাংশে একজন কৃষক অতি কষ্টে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বহিয়া ঘাস কাটিতে যাইতেছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সদস্যদিগকে লইয়া বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার সীমান্তে জগদ্বল নামক গ্রামে অনতিদূরে যে দির্ঘিকা দেখিতে গিয়াছিলাম, উহা এই বল্লাল দিঘি বা রামপাল দিঘির সহিত তুলিত হইতে পারে—এ সংবাদ বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির নিকট আবশ্যক বোধ হইতে পারে বিবেচনার একথা লিখিলাম। সেই উদ্দেশ্যে ইহাও লিখিতেছি যে, অনেক করিয়াও রামপালের জগদ্বল নামক কোনো গ্রামের পরিচয় পাইলাম না! এখানে জোড়াদেউল নামে একটি গ্রাম আছে।

২.

নৃপতির দুর্বলতার জন্য গৌড়রাজ্যে বহুবার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার অন্যতম নির্দশন আজিও দিনাজপুরে এক রৌদ্রকরোজ্জল দির্ঘিকাবক্ষে জয়গর্বে দণ্ডায়মান আছে। মদনপালের রাজ্যকালে যে বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, তাহার সুযোগে বিজয়সেন বরেন্দ্রভূমে এটি নবরাজ্য সংগঠিত করিয়াছিলেন। তাহার "উত্তুঙ্গ দেবমন্দির" ও অগমিত "বিতত তল্প" একদিন বরেন্দ্রের শোভাবর্ধন করিয়াছিল। তাহার সমরবিজয়-কাহিনী, গৌড়েন্দ্র পরাজয়, মিথিলাপতির সহিত সংঘর্ষ কবিকল্পনা নহে। তাম্রে এবং শিলায় সে পরিচয় বর্তমান আছে। উমাপতিধরের প্রশস্তি তাহার লিখিত ইতিহাস। প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরাবশেষ তাহার কীর্তিচিহ্নের মধ্যে একটি। আভ্যন্তরীণ অবস্থাদি বিচার করিয়া বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বিজয়নগরেই বিজয়সেনের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে বিজয়নগর রামপালে বা তন্নিকটে নহে। উহা ঢাকা জেলাতেও নহে। উহার অবস্থান উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলায়।

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন পিতৃসিংহাসনে আরোহন করিয়াই পাল নরপালদিগকে উৎখাত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাহার রাজ্যাভিষেক তবে কোথায় হইয়াছিল? পূর্ববঙ্গে, না উত্তরবঙ্গে?[৭] তাহার অমিত বিক্রম বর্মরাজকে পরাজিত করিয়া তাহাকে বঙ্গে এবং রাঢ়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল. কাটোয়ার নিকটে[৮] প্রাপ্ত তাম্রশাসনে এ পরিচয় লাভ করা যায়। সেই তাম্রশাসন বল্লাল রাজত্বের ১১ সংবতে বৈশাখমাসের ১৬ তারিখে শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্দবারে সম্পাদিত হইয়াছিল।

বল্লালসেন বঙ্গবিশ্রুত বীর নরপতি। তাহার কীর্তিকাহিনী বাঙালির ইতিহাসে ও সমাজে সুপরিচিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নানা ঐতিহাসিক প্রমাণ বর্তমান থাকিতেও ইংরাজ ঐতিহাসিকের কল্পনা বল্লালকে ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়া তাহাকে অবতারত্ব প্রদান করিয়াছে![৯]

বল্লালসেন বিদ্বান বুদ্ধিমান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাহার রচিত অদ্ভুতসাগর ও দানসাগর ইহার পরিচয়। বল্লালের রাজত্বকাল দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষ ব্যাপী বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহার অধিককালই গৌড়রাজ্যের বিভিন্ন অংশ জয় করিবার চেষ্টাতেই ব্যয়িত হইয়াছিল। বিক্রমপুরে দুইজন বল্লালসেন রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। এই দ্বিতীয় বল্লালসেন কে? কবে কোথায় বর্তমান ছিলেন? কিরূপেই বা বিক্রমপুরের রাজসিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। প্রবাদ ইহাকে বেদসেন বা বিশ্বকতাতের পুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছে। বেদসেন

এবং বিশ্বকতাত একই ব্যক্তি, কি অভিন্ন ব্যক্তি তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা জানা নাই। বেদসেন বা বিশ্বকতাতই যে কোথা হইতে কিরূপে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাও জানিবার উপায় আছে বলিয়া বোধ হয় না।

আর কিছু না হউক, বাঙালির কল্পনাকে কেহ পরাজিত করিতে পারে নাই। সেই কল্পনার বলে নানারূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আবশ্যকমত শব্দ বা বাক্যবিশেষের অর্থান্তর গ্রহণ করিয়া আমরা কখন যে কাহাকে আনিয়া কোন রাজসিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া গ্রন্থরচনা করিতেছি, তাহা অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমরাই বুঝিতে পারি না! ইংরাজ ঐতিহাসিককে কল্পনাপ্রিয় বলিয়া দোষ দিলে কি হইবে? আমরা আদিশূরকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে পরিচিত করিবার জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে কহিয়াছি তৎকালে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাংলায় ছিল না বলিয়া পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া দেশে ধর্মসংস্থাপন করা প্রয়োজন হইয়াছিল! লোকনাথের ত্রিপুরা-তাম্রশাসন শীর্ষক প্রবন্ধে সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় বন্ধু রাধাগোবিন্দ বাবু দেখাইয়াইছেন যে, পূর্ববঙ্গেই সেকালে (সপ্তম শতাব্দীতে) বেদবিৎ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল না। "চতুর্ব্বিদ্য" ব্রাহ্মণ ও আর্যগণের বাসস্থানের জন্য মহাসামন্ত প্রদোষশর্মা রাজসমীপে ভূমি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।[১০] ঐতিহাসিক রচনাকৌতুক শীর্ষক[১১] প্রবন্ধে পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের নব প্রকাশিত রাজণ্যকাণ্ড নামক সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থের সমালোচনকালে কহিয়াছেন—"উহা রচনা কৌতুকের আধার!" সকলগুলির ব্যাখ্যা করা দূরে থাকুক, উল্লেখ করিতে হইলেও এক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিতে হয়। 'কায়স্থ সমাজের বিশাল ইতিহাসের, মুখবন্ধ যে এইরূপ রচনা-কৌতুকের আধার হইয়াছে, ইহা যথার্থই অনুশোচনীয়।" দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এই সকল গ্রন্থ বাংলার ইতিহাসরূপে সমাদৃত হইবার জন্য দাবি করিতেছে; কালে হয়ত ইহা হইতেই মতামত উদ্ধৃত হইয়া কত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচিত হইবে এবং বঙ্গের ঐতিহাসিকদিগের কল্পনা মার্শম্যানের কল্পনাকেও পরাজিত করিয়া কত নূতন নূতন তথ্য প্রচার করিবে!

বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক কহিয়াছেন—"এই খ্যাতনামা রাজার [বল্লাল সেনের] রাজত্ব সময়েই বিক্রমপুর ধনে, মানে, জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে জগতের এক শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল। বিক্রমপুরের প্রতি মৃত্তিকাকণায় বল্লালের পদ-চিহ্ন একদিন অঙ্কিত হইয়াছিল, কৌলীন্যের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন। আজ পর্যন্তও বিক্রমপুরের ঘরে ঘরে ইহার পবিত্র স্মৃতি বিরাজমান। অজ্ঞান শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই এই মহানুভব রাজার কীর্তিকাহিনী উপকথার ন্যায় বলিয়া থাকে।"

এ রচনা অতিশয়োক্তির নিদর্শন হইলেও ইহার মূলে সত্যের অভাব নাই। বল্লাল যে কীর্তিমান নরপতি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু সে কালের সমৃদ্ধি ও গৌরবের আর কোন বিশেষ চিহ্ন এ অঞ্চলে বর্তমান নাই। আছে কেবল দুইটি সুদৃঢ় সেতু। একটি মিরকাদিমের খালের উপর এবং অপরটি তালতলার খালের উপর। ইহাদের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, বহুকাল পূর্বেও বঙ্গের স্থাপত্যকলা সেতুনির্মাণ বিষয়েও সমুন্নত ছিল।[১২]

পূর্ব প্রবন্ধে বর্ণিত গজারি বৃক্ষের সন্নিকটেই ২০০ ফিট প্রশস্ত বিপুল পরিখায় পরিবেষ্টিত বল্লাল প্রাসাদের অবস্থান চিহ্ন আজিও বর্তমান আছে। অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ নাই, দেব-দেউলের ভগ্নস্তূপ নাই। এ রাজধানী হয়ত কেবল প্রথম বল্লালের অথবা উভয় বল্লালের যত্নে হর্মে, তোরণে, দেউলে, উদ্যানে সুশোভিত হইয়াছিল। কোথায় প্রাসাদ, কোথায় প্রাকার, কোথায় উদ্যান, কোথায় রাজসভা ছিল, তাহা নির্দেশ করিবার এখন আর কোন উপায় নাই! আছে কেবল তিন সহস্র বর্গফিট আয়তনের একটি প্রকাণ্ড উচ্চ ভূমি। এখন উহার সকল অংশই কর্ষিত হইয়াছে। ইহাই এখন বাংলার সেন রাজবংশের অন্যতম অবস্থান-চিহ্ন—ইহাই এখন বিক্রমপুরের কীর্তি ও গৌরবের শ্মশানভূমি! এই শ্মশান কি বাঙালি ঐতিহাসিকের কর্মক্ষেত্র নহে? কে ইহার গর্ভ হইতে রত্ন আবিষ্কার করিবার জন্য অগ্রসর হইবে? কে এখন এই চিতাভস্ম

লইয়া মূর্তি গড়িবে—কে এখন সেই মূর্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে? কে এখন অন্ধকারে যবনিকা উত্তোলন করিয়া, সেই সুমহান বিরাট বিশাল জ্যোতির্ময় অতীতকে মুগ্ধ নরনারীর নয়ন সমক্ষে আনিয়া ধরিবে? কোন্ ভক্তের অর্ঘ্য আবার পুরাতত্ত্বের মন্দিরতলে নবীন পাদপীঠ রচনা করিবে? ঢাকার সাহিত্য-পরিষৎ কি এদিকে বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন?

এ অঞ্চলে বল্লালসেনের নামের সহিত একটি কলঙ্ককাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে। কোন ডোমকন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলেন। দেশের হিন্দু সমাজ যাহাতে রাজার এই কার্য অনুমোদন করেন সে জন্য রাজা উৎপাত করিতে ত্রুটি করেন নাই! উৎপাত এত অধিক হইয়াছিল যে দেশের লোক "স্বস্থান ছাড়িয়া সবে গেলা অবশেষে!" হিন্দু সমাজের সহিত কলহ করিয়াই রাজা ক্ষান্ত হন নাই, পিতার সহিত এই বিষয়ের ঔচিত্যানুচিত্য সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! সহজ কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, তিনি ডোম কন্যার রূপলালসায় পিতার সহিত কলহ করিয়াছিলেন!

ইনি কি সেই বল্লালসেন যিনি গোবিন্দপাল দেবকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া, বর্মরাজকে পরাজিত করিয়া বঙ্গে এবং রাঢ়ে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন? ইনি কি সেই বল্লাল সেন যিনি শুধু বঙ্গ-বিজয়ে পরিতৃপ্ত না হইয়া কলিঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন? এই কি সেই বল্লালের চরিত্র-কাহিনী যিনি দানসাগরের মঙ্গলাচরণে আপনাকে গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন?

বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক বলিতেছেন—"মহারাজ বল্লাল যে ১০৫০ শকাব্দ হইতে ১০৯০ শকাব্দ অর্থাৎ ১১১৮—১১৬৮ খ্রিস্টাব্দ এই পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।" শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় বল্লালের অদ্ভুতসাগর হইতে দেখাইয়াছেন, বল্লাল-রাজত্বের প্রথম বৎসর ১১৫৯ খ্রিঃ অব্দ বা ১০৮১ শক। বল্লালের দানসাগর রচনায় কাল ১০৯১ শক বা ১১৬৯ খ্রিঃ অব্দ। ইহারই পূর্ব বৎসর অর্থাৎ ১০৯০ শক বা ১১৬৮ খ্রিঃ অব্দে তিনি অদ্ভুতসাগর রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু উহা শেষ না হইতেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে বল্লালের রাজত্বকালে কোন ক্রমেই "পঞ্চাশ বৎসর" ব্যাপী ছিল না।

বিক্রমপুরের ইতিহাস হইতে জানা যাইতেছে—"ময়মনসিংহের অষ্টগ্রাম প্রভৃতির দত্ত মহাশয়দিগের কুর্ছিনামার উপরও এই শ্লোকটি দৃষ্ট হইয়া থাকে—

"চন্দ্রর্ত্তশূন্যাবনিসংখ্যাশাকে বল্লালভীতঃ খলু দত্তরাজঃ।
শ্রীকণ্ঠনাম্না গুরুণা দ্বিজেন, শ্রীমাননন্তস্তু জগাম বঙ্গং।।"

অর্থাৎ ১০৬১ শাকে বা ১১৩৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমান অনন্ত দত্ত বল্লালের ভয়ে আপন গুরু শ্রীকণ্ঠ শর্মাকে সহ বঙ্গে পলায়ন করেন।"

বল্লালের কলঙ্কটিকা সম্বন্ধে ইহাই কেহ কেহ বিশেষ প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করিতে চাহেন। এই সঙ্গে "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" ও "বৈদ্য কুলপঞ্জিকা" হইতেও শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়া থাকে যে, বল্লাল সত্যই চরিত্রহীন ছিলেন! কিন্তু দেখা যাইতেছে ১১৩৯ খ্রিস্টাব্দে বল্লাল আদৌ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন নাই! বল্লালের পিতা বিজয়সেনের রাজ্যকাল সম্বন্ধে যতই কেন মতভেদ থাকুক না, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে ১১৩৯ খ্রিঃ অব্দে তিনি গৌড়সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তাহার শাসন সময়ে রাজকুমার বল্লালের এতদূর উচ্ছৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা ছিল না, যে অত্যাচারে পীড়িত হইয়া দেশের লোক স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিল! বল্লালের সমগ্র জীবন গৌড়রাষ্ট্র গঠন করিতেই ব্যয়িত হইয়াছিল। নিত্য রণকোলাহলে মত্ত থাকিয়া জন্মভূমির গৌরবরক্ষাই তাহার ব্রত ছিল। পিতৃদেবের উত্তুঙ্গ দেবমন্দির সমূহ এবং বহু বিততন্ত্র যাহাকে সর্বদা লোকহিতকর কার্যে উৎসাহিত করিত—ডোম কন্যার রূপমোহে আচ্ছন্ন হইয়া তিনি আপন সমাজকে নিগৃহীত করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন কিনা তাহাও চিন্তার বিষয়। রূপতৃষ্ণার শান্তি বিধান করিবার জন্য যাহার চিত্ত অস্থির, অসিধারণ করিয়া জন্মভূমির উদ্ধার সাধন ও গৌবরবর্ধন তাহার ধর্ম নহে!

বন্ধুদিগের সহিত বল্লাল-চরিত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে 'বল্লালভিটায়' চতুঃসীমা মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। কল্পনা সেই সুমহান অতীতকে জাগ্রত করিয়া দিল। দেখিলাম বল্লালের জয়স্কন্ধাবার পত্রে পুষ্পে সুশোভিত হইয়াছে। রক্ত পীত নীল শ্বেত জয়পতাকা ধীর পবনে দুলিতেছে, বঙ্গবীরের করধৃত অসি জ্বলিতেছে, জয়ঢক্কার বিপুল নিনাদে দিঙমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছে। বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপতলে বহুমূল্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া মহারাজ বল্লালসেন রাঢ়জয়কারী সেনাকুলকে যথোযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিতেছেন, "শ্রীবর্ধমান ভুক্ত্যন্তঃপাতী উত্তর রাঢ়া-মণ্ডলের" ভূমি দান করা হইতেছে।

ডাক্তার-বন্ধুর আহ্বানে চমক ভাঙিল। দেখিলাম আমরা একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের নিকট আসিয়াছি। শুনিলাম ইহারই নাম অগ্নিকুণ্ড! দ্বিতীয় বল্লালের রাজান্তঃপুরচারিকারা ভ্রমে পতিত হইয়া, মুসলমান শত্রুর হস্ত হইতে সতীধর্ম রক্ষার জন্য এই কুণ্ড মধ্যে নাকি অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন!

দ্বিতীয় বল্লাল যখন শুনিলেন যে একদল মুসলমান সৈন্য রামপালের নিকটবর্তী আবদুল্লাপুরে সেনা সমাবেশ করিয়াছে এবং তাহার দুর্গ মধ্যে গোমাংস নিক্ষেপ করিয়াছে, তখন রাজাজ্ঞায় হিন্দু সৈন্য যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইল। রাজা যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে জননীর চরণ বন্দনা করিলেন, রোরুদ্যমানা পত্নীদিগের সিক্ত বদনে চুম্বন করিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। তাহারা রোদন করিতে করিতে কহিলেন, 'নাথ, যুদ্ধে যদি অমঙ্গল ঘটে তবে আমাদের গতি কি হইবে?" রাজা গদ্‌গদ্ হইয়া পুনর্বার চুম্বন ও আলিঙ্গনান্তর তাহাদিগকে অভয় দিলেন। স্থির হইল যে, রাজা যুগল কপোত লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিবেন। যদি তাহার পূর্বেই কপোত প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করে, তবে বুঝিতে হইবে যুদ্ধে অমঙ্গল ঘটিয়াছে—স্বধর্মরক্ষার সময় নিকট হইয়াছে। পুরনারীরা তখনই যবন-স্পর্শকলঙ্ক হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত পূর্বপ্রস্তুত চিতায় আরোহন করিবেন!

দ্বিতীয় বল্লালের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা অত্যন্ত করুণ ও হৃদয়গ্রাহী সন্দেহ নাই এবং আধুনিক বঙ্গবীরদিগের উপযুক্ত। তবে যে যুগের রমণীদিগের ব্রত কথায় "ঘোড়ায় আসি, দোলায় যাই" প্রভৃতি বীরনারীর উক্তি বর্তমান ছিল, সে যুগের বীর রাজসহধর্মিণীর উপযুক্ত কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। কিন্তু কবি গোপালভট্ট এইরূপই লিখিয়াছেন—

প্রণম্য মাতরং স্ত্রীভ্যো দত্ত্বালিঙ্গনচুম্বণাৎ।
স্ত্রিয়োঽব্রুবংস্তু রাজানং বাষ্পাকুলিতলোচনৈঃ।।
যদিস্যাদশিবং যুদ্ধে কিং নো নাথ গতিস্তদা।
ততো গদ্‌গদসৌ রাজা সংচুম্ব্যালিঙ্গ্যাৎ তাঃ পুনঃ।।
*　*　*　*
কপোতযুগলং দূতং মমাঙ্গলসূচকং।
পূর্বপ্রস্তুতচিতায়াং দৃষ্ট্যৈব মরণং ধ্রুবং।।

বল্লাল যুদ্ধে গমন করিয়া অরাতি নিধন করিলেন। কিন্তু সে যুদ্ধে বীরের যুদ্ধ নহে, কাপুরুষের যুদ্ধ!

শত্রুর নিকটবর্তী হইয়া তিনি দেখিলেন, বাবা আদম উপাসনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। নিরস্ত্র অরির শির ছিন্ন করিতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া বল্লাল সেন বাবা আদমের দেহে অস্ত্রাঘাত করিলেন! তাহার ছিন্ন শির ভূমিতলে লুটাইল। ইতিমধ্যে রাজার শিথিল বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে তাহার অজ্ঞাতে কপোতযুগল উড়িয়া গিয়া রাজপ্রাসাদে উপনীত হইল! রাজরমণীগণ অমনি কালবিলম্ব না করিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নি মধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন!

কপোত যুগল পলায়ন করিয়াছে দেখিয়া বিজয়ী বল্লাল ক্ষিপ্রগতিতে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলেন, ধূ ধূ অনল জ্বলিতেছে—চিতাধূমে চারিদিক সমাচ্ছন্ন—তাহার সকল সুখ

সকল সন্তোষ ভষ্ম হইয়া গিয়াছে! বল্লাল নিজেও সেই অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন!

শুনিতে পাওয়া যায় কিছুদিন পূর্বে মৃত্তিকা খনন কালে এই কুণ্ড হইতে অনেক অঙ্গার উঠিয়াছিল। ধনরত্নের লোভে অনেকে এই স্থান খনন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারে নাই! শুনা যায় কিয়দ্দূর খনন করিলেই জুইয়া নামক এক শ্রেণীর বিষাক্ত পিপীলিকা শতে সহস্রে বহির্গত হইয়া খননকারীকে আক্রমণ করে?

ডাক্তার বন্ধু স্বয়ং এইরূপ দেখিয়াছেন বলিয়া আমরা খনন করিতে বিরত হইলাম।

অগ্নিকুণ্ডের নিকটেই একটি জলাশয় দেখিলাম। শুনিলাম ইহার নাম মিঠাপুকুর। পুষ্করিণীর জল ভাল বলিয়া বোধ হইল। অগ্নিকুণ্ড এবং মিঠাপুকুরের মধ্যবর্তী স্থানে একটি ক্ষুদ্র স্তূপ দেখিলাম। অভ্যন্তরে ইষ্টক আছে বলিয়া বোধ হইল। কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া একটু খনন করিতেই একখানি ইষ্টক বাহির হইল। দেখিলাম উহার গাত্রে তক্ষণ-শিল্পের চিহ্ন বর্তমান আছে। অনুমান হয় এখানে একটি মন্দির ছিল।

দুইটি পরিখার মধ্যভাগ দিয়া বল্লালবাড়ির মতই উচ্চ যে প্রশস্ত ভূখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ স্থানে পুরপ্রবেশের সিংহদ্বার ছিল বলিয়া কথিত হয়। এখন সেখানে সিংহদ্বারের কোন নিদর্শন বর্তমান নাই। সেই ভূখণ্ডের পার্শ্ব দিয়া একটি ক্ষুদ্র খাল কাটা আছে। শুনিলাম উহা মুন্সিগঞ্জের কাটাখালি নামক খাল পর্যন্ত আসিয়াছে।

রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে যে পরিখা ছিল তাহা এখন বর্তমান আছে। উহা সুবিস্তৃত। উহার কোন কোন স্থান শুষ্ক হইয়াছে। যেখানে জল আছে তাহাও ঘন শৈবালে সমাচ্ছন্ন। উত্তর দিকের পরিখার অপর পারেই যে স্থান আছে তাহাকে এখন সিপাহীপাড়া বলে। পুররক্ষীদিগের বাসের জন্য ঐ স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। এখন সেখানে সারিবিন্যস্ত কদলীবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। নিকটবর্তী পাইকপাড়া গ্রামও হয়ত সেকালে সেনানিবাস ছিল।

নিকটেই একটি দির্ঘিকা বর্তমান আছে। উহা 'কোদাল-ধোয়া' দিঘি নামে পরিচিত। ইহার সহিতও একটি প্রবাদ জড়িত রহিয়াছে। যাহারা বল্লালদিঘি খনন করিয়াছিল, দিনের কার্য শেষ করিয়া তাহারা প্রতিদিন একই স্থান হইতে এক কোদাল করিয়া মাটি কাটিয়া পরে আপন আপন কোদাল ধুইয়া ফেলিত। এইরূপে মাটি কাটিতে কাটিতে একটি নাতিদীর্ঘ দির্ঘিকা খণিত হইয়াছিল। এখন উহার অনেক অংশেই চাষ হইতেছে। মধ্যস্থলে একটি গোলাকার কাষ্ঠ প্রোথিত রহিয়াছে। পল্লীবালকগণ বলিল উহার নাম "নাগযষ্টি"। তীরের নিকটেই একখানি ক্ষুদ্র জীর্ণ তরণী ছিল। কৌতূহলী হইয়া মুন্সেফ-ভায়ার সহিত সেই তরণীযোগে নাগযষ্টির নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ডেপুটিভায়া এবং ডাক্তার বন্ধু তখন শ্রান্তদেহে বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া তাম্রকুট ও কমলালেবুর রস গ্রহণ করিতেছিলেন এবং যাহাতে আমাদের ভগ্ন জীর্ণতরী নিমজ্জিত না হয় ভগবানকে ডাকিয়া তাহাই বলিতেছিলেন!

নাগযষ্ঠির নিকটে যাইয়া দেখিলাম উহা একটি গোলাকার শালকাষ্ঠ। যতই উর্ধ্বে উঠিয়াছে ততই অল্পে অল্পে সরু হইয়াছে। উহা এখন জীর্ণ হইয়াছে। মাপিয়া দেখিলাম জলের উপর প্রায় দুই হস্ত এবং জলের মধ্যে চার হস্ত পরিমাণ বর্তমান আছে। শিরোদেশের পরিধি প্রায় ১৷৷০ হস্ত হইবে। উহার গাত্রে কোনরূপ কারুকার্য নাই। শিরোদেশের কিয়দংশ এরূপভাবে ভাঙিয়া গিয়াছে যে দূর হইতে দেখিলে মনে হয়—কিছু যেন ছিল। অনুমান হয় পুররক্ষী ও অন্যান্য সৈনিকদিগের ব্যবহারের জন্য এই দির্ঘিকা খনন করা হইয়াছিল।

কোদাল-ধোয়া দিঘি হইতে অল্পদূরেই বাবা আদমের মসজিদ ও সমাধি। বাবা আদম আদমসহিদ নামেও আখ্যাত। তাহার ঠিক পরিচয় পাইবার কোন উপায় আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিম্বদন্তী—বাবা আদমের কাহিনী নানাভাবে লোকসমাজে প্রচলিত করিয়াছে। উপাসনাকালে দ্বিতীয় বল্লালসনের হস্তে তাহার হত্যা, তন্মধ্যে একটি। এরূপ প্রবাদও আছে যে তাহার সহিত বল্লালের চতুর্দশ দিবসব্যাপী দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। সে সময়ে কেহ কাহাকেও পরাজিত

করিতে পারেন না। অবশেষে একদিন সায়ংকালে বাবা আদম উপাসনা-নিরত হইলে বল্লাল পশ্চাত হইতে তাহাকে আঘাত করেন।

বল্লালের অসি ব্যর্থ হইল। বাবা আদমের উপদেশে বল্লাল তখন তাহারই অসি দ্বারা তাহার মস্তক দেহচ্যুত করিলেন।

বাবা আদম কেন যে পূর্ববঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য কারণ জানিতে পারা যায় না। এরূপ প্রবাদ আছে যে, দ্বিতীয় বল্লালের আদেশে রামপালের গো-হত্যা নিবারিত হইয়াছিল। কিন্তু একজন মুসলমানের এইরূপ প্রতিজ্ঞা ছিল সে তাহার পুত্র হইলে সে গোবধ করিয়া জ্ঞাতিবর্গকে ভোজন করাইবে। কালক্রমে পুত্র জন্মিলে সে গো-হত্যা করিয়াছিল, কিন্তু একটি চিল একখণ্ড গোমাংস আনিয়া রাজপ্রাসাদে নিক্ষেপ করিলে পর বল্লাল অত্যন্ত কুপিত হইয়া সেই মুসলমানের শিশুটিকে পিতার সম্মুখেই নিহত করিয়াছিলেন।

পিতা শোকার্ত হইয়া মক্কায় গমন করিলে পর বাবা আদমের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। প্রতিহিংসা সাধনের জন্য তিনি পূর্ববঙ্গে আসিয়া যেরূপে নিহত হইয়াছিলেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। মৃত্যুর পর বাবা আদমের দেহ রামপালে এবং শির শ্রীহট্টে সমাহিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

বাবা আদমের মসজিদটি এক সময়ে দেখিতে অতি সুন্দর ছিল। কক্ষ, প্রাচীর ও বহির্ভাগ যে কারুকার্যময় ছিল, সে পরিচয় এখনও বর্তমান আছে। এখন মসজিদটির জীর্ণ দশা। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৩ ফিট এবং প্রস্থে ৩৬ ফিট। কক্ষ প্রাচীরের বেধ ৬৷৷০ ফিট। ছয়টি গম্বুজে ইহার ছাদ নির্মিত হইয়াছিল। মসজিদগাত্রে যতগুলি ইষ্টক আছে, সমস্তই খোদিত লতাপুঞ্জে সজ্জিত'। ভিতরে পলতোলা দুইটি প্রস্তর স্তম্ভ আছে। উহারাই ছাদের খিলানগুলিকে রক্ষা করিতেছে। স্তম্ভ দুইটি বাবা আদমের গদা নামে পরিচিত! মসজিদের শিরে আরব্যভাষায় যে প্রস্তর-ফলকলিপি আছে তাহা হইতে জানা যায়—মহম্মদসাহের পুত্র সুলতান জালালুদ্দীন আবুল মোজাফ্যর সাহ সম্রাটের পুত্র সুলতানের সময়ে ৮৮৮ হিজরীতে এই মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল।

মসজিদের নিকটেই বাবা আদমের জীর্ণ সমাধি বর্তমান আছে। মসজিদের চতুর্দিকে গুবাক আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ এবং বাঁশঝাড় আছে বলিয়া স্থানটি শীতল ও অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। পূর্বকথিত সিপাহীপাড়ার পর হইতেই ভূমি ক্রমেই নিম্ন হইতে নিম্নতর হইয়া নদীর দিকে আসিয়াছে। বাবা আদমের মসজিদ হইতে ধলেশ্বরীর তীর ১৷৷০ মাইলের অধিক হইবে না।

রামপালে অন্য আর কিছুই দ্রষ্টব্য নাই। কিন্তু ঐ নামের সহিত বহু-কীর্তি কাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে। বাংলার ইতিহাসের অনেকাংশ ঐ নামের সহিত সংযুক্ত। রামপালের নাম শুনিলেই, বরেন্দ্র কবি কলিকাল-বাল্মিকী সন্ধ্যাকর নন্দীর কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে সেই 'কলিযুগ রামায়ণ' রামচরিতের কথা ; মনে পড়ে বঙ্গের বিপুল কৈবর্তবিদ্রোহ। সেই বিগত-গৌরবের অতীত শৌর্যের, প্রথিত জ্ঞান-বৈভবের—সেই শিল্পসৌন্দর্যের, ধনৈশ্বর্যের, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের কত কথাই মনে পড়ে!

মনে পড়ে একদিন কারাক্লিষ্ট মহারাজ রামপাল তাহার জনকভূমি বরেন্দ্র ত্যাগ করিয়া শক্তি সঞ্চয়ের জন্য অঙ্গ, মগধ এবং রাঢ় জনপদ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাহার মাতুলমহলের নেতৃত্বে সামন্তগণে মিলিত হইয়া বিদ্রোহের দমনপূর্বক তাহাকে রাজসিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। হৃতরাজ্য উদ্ধৃত হইলে পর রামপাল বরেন্দ্রভূমে যে নব রাজধানী নির্মাণ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ রামপালকেই সেই রামাবতী বলিয়া নির্দেশ করিতে চাহেন। যাহা দেখিলাম তাহাই কি তবে সেই রামাবতীর চিতাভস্ম!

উত্তরবঙ্গে পাল রাজন্যবর্গের কীর্তিচিহ্ন এখনও যেরূপ সুস্পষ্ট দেদীপ্যমান—তল্লের পর তল্ল, কোথাও সোপানসম্বলিত ঘাট, স্তূপের পর স্তূপ, কোথাও ইষ্টক মণ্ডিত বাট—কোন স্থানে বিপুল গৃহভিত্তি, কোথাও চারুকারুমণ্ডিত প্রস্তরস্তম্ভ, কোথাও আবার ভাস্করের কঠিন হস্তে গঠিত

নবনীতসদৃশ কোমল জীবন্তবৎ মূর্তিনিচয়, আখের প্রভৃতি রাজনগরের ধ্বংসাবশেষ, জগদ্দল নামক গ্রাম—তথায় বৃত্তাকারে বৃহৎস্তূপ, স্তূপাভ্যন্তরে পাষাণস্তম্ভ—স্তম্ভগাত্রে চাক্‌চিক্যময় কাচ—গ্রাম হইতে কিঞ্চিত দূরে রৌদ্রকরোজ্জ্বল বিশাল দির্ঘিকা—কোথাও আবার শীর্ণকায়া পুণ্যতোয়া তরঙ্গিণী, কোথাও বা তাহার প্রাচীন খাত—রামপালে এ সকলের কিছুই দেখিলাম না!

এই রামপালেই কি তবে অধুনা-বিলুপ্ত মহাতীর্থ অপুনর্ভবা—এইখানেই কি জাগদ্দল মহাবিহার—ইহাই কি পালরাজবংশের শেষ রাজধানী? অথবা ইহা রামপাল হইতেও বহু প্রাচীন অন্য কোন পরাক্রান্ত নৃপতির রাজনগর কিম্বা প্রথম বল্লালের একটি অন্যতম জয়স্কন্ধাবার মাত্র?

** মানসী, ১৩২১ ফাল্গুন-চৈত্র।*

১. বিক্রমপুরের ইতিহাস চতুর্থ অধ্যায়।

২. সকল গুণ সমেতাঃ সাগ্নিকা ব্রহ্মনিষ্ঠা।
... ...ব্রাহ্মণঃ কাণ্যকুব্জাৎ।।
সুরসরিদবধৌতং যান্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং।
... ...বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

৩. The Bengal territory conquered in 1203-04 by the Mahomedans did not comprise the Eastern District. The *Bangadesh* was still under Ballal's descendants till the end of the 13th century, when Sonargaw was occupied by the second son of the Emperor Bulban.
—Blochman's History and Geography of Bengal.

৪. A few years ago a Raiyat while ploughing a field in this place found a diamond of the value of Rs 70,000 (£7000). It afterwards gave rise to a law Suit before the Provincial Court of Appeal. Topography of Dacca—Taylor.

৫. He sent to Kanauj for Brahmans *to teach the people the religion* which even the priestly class in *the district* (ইনিও সমগ্র বঙ্গদেশের কথা বলেন না) had forgotten and five Brahmans accompanied by five Kayasthas in due time arrived—Allen's Gazetter.

৬. The site of the old capital of Vikrampur is pointed out near the large tank called Rampal Dighi, which is three quarters of a mile long by a quarter of a mile broad.
—Allen's Gazetter.

৭. বিজয়পুর নামক রাজধানীতেই বিজয়সেনের পৌত্র লক্ষ্মণসেনের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল ধোয়ী কবির পবনদূতে এরূপ লিখিত আছে। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি থানায় দেবপাড়া গ্রামে সেন-রাজবংশের প্রথম শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বল্লালসেন দানসাগরে বলিয়াছেন যে তাহার পিতা বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার গুরুদেবও বরেন্দ্রমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৮. সম্প্রতি Herald পত্রিকা লিখিয়াছে যে কাটোয়া বিক্রমপুরের রাজধানী ছিল। এ সংবাদ কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নাই!

৯. Ballal Sen is fabled to have been the son of the Bramaputra river, which took the form of a Brahmin—Marshman.

১০. লোকনাথের ত্রিপুরা—তাম্রশাসন—শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

১১. ঐতিহাসিক রচনা-কৌতুক—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। সাহিত্য কার্তিক ১৩২১

১২. It is said to have been built by Raja Ballan Sen before the conquest of Bengal by Mahomedans— List of Ancient Monuments.

Ibid.—There are 2 bridges in the neighbourhod which tradition ascribes to Ballal Sen. One is over the Mirkadim khal and is called the Ballal Bridge ; it has 3 arches and the piers are six feet thick. The other is the little further to the west and spans the Taltola Khal ; this also has 3 arches, but was blown up in the early days of British rule to enable large boats with troops to pass to and from Dacca.



রাজনগর

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

অত্যুত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুলা বিভীষিকাময়ী পদ্মার দক্ষিণ তটে প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে রাজনগর নামে এক সমৃদ্ধিশালী গ্রাম বিদ্যমান ছিল। এই গ্রাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ বৈদ্যকুলোদ্ভব মহারাজা রাজবল্লভ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পূর্বে ইহার নাম ছিল বিলদাওনিয়া, তখন উহা বিলপরিপূর্ণ বিরল-বসতির একটি ক্ষুদ্রগ্রাম মাত্র ছিল। বিক্রমপুরের গৌরব রামপাল নগরীর ধ্বংসাবসানে এবং দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক চাঁদরায় কেদাররায়ের বড় সাধের শ্রীপুর নগরী পদ্মার কুক্ষিগত হইলে পর, রাজনগরের ন্যায় সুন্দর ও সমৃদ্ধিশালী স্থান কেবল বিক্রমপুরে কেন সমগ্র বঙ্গদেশেও তৎকালে অতি বিরল ছিল।

রাজনগর সেসময়ে সত্য সত্যই রাজনগর ছিল। তখন উহা 'নবরত্ন', 'পঞ্চরত্ন' বা 'শতরত্ন' ও 'একবিংশরত্ন' প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর সৌধাবলীর দ্বারা পরিশোভিত হইয়া সৌন্দর্যে ও স্থপতি-কৌশলের শ্রেষ্ঠতার জন্যে বঙ্গদেশে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। যিনি এ সমুদয় অট্টালিকা একবার দর্শন করিয়াছেন, তিনি তাহাদের সৌন্দর্য-স্মৃতি হৃদয় হইতে কখনও মুছিয়া ফেলিতে পারিবেন না! কিন্তু হায়! সে সমুদয় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা কারুকার্যখচিত অট্টালিকাসমূহ চিরদিনের জন্য পদ্মার রাক্ষসী-উদরে অন্তর্হিত হইয়াছে, আর সে সমুদয় নয়নাভিরাম সৌধাবলী কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইবে না। পদ্মার তরঙ্গপ্রহারে বিক্রমপুরের যে কতদূর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে তাহা লেখনীদ্বারা ব্যক্ত করা অসম্ভব। বিক্রমপুরের যাহা কিছু দেখিবার এবং গৌরবের ছিল সে সমুদয় গ্রাস করিয়া "কীর্তিনাশা" এই অপমান লাভ করিয়াও ক্ষুধিতা পদ্মার ভীষণ ক্ষুধার শেষ হয় নাই, এখন বিক্রমপুরের অতীত গৌরবের শেষ কঙ্কাল-চিহ্ন, বঙ্গের শেষ বীর চাঁদরায় কেদাররায়ের মাতার শ্মশানোপরি বিনির্মিত রাজবাড়ির সুবিখ্যাত মঠটি গ্রাস করিবার জন্য এই রাক্ষসী অত্যন্ত ব্যগ্রা ;—পদ্মা বর্তমান সময়ে এই মঠের দুই তিন খানা মাত্র ক্ষেত্রের অন্তর দিয়া প্রবাহিতা।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিক্রমপুর কেন, সমগ্র বঙ্গভূমির মধ্যেই ইহার কীর্তি-গরিমা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন এই স্থান ধনে, জনে, মানে, সম্ভ্রমে, বিদ্যায় ও শিক্ষায় দেশের আদর্শ স্বরূপ বিবেচিত হইত। যখন রাজনগর নির্মিত হয় তখন কি কেহ কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন যে একদিন ইহার বক্ষোপরি পদ্মার চঞ্চল তরঙ্গ ভীষণ রোলে নৃত্য করিবে! শতাধিক বৎসরের মধ্যে বিক্রমপুরের ভৌগোলিক পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদ্মার এক অতি ক্ষুদ্র শাখা রাজনগরের বহু উত্তর দিক দিয়া ক্ষীণ কলেবরে পূর্ব পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইত। সে সময়ে জনসাধারণে ইহাকে "রথখোলার" নদী নামে অভিহিতি করিত। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে এই ক্ষুদ্র খালের অবস্থান স্থলে গ্রামবাসী জন-সাধারণের রথোৎসব সম্পাদিত হইত ; রথের চক্রের আবর্তনে কালক্রমে উভয় পার্শ্বস্থ ভূমিক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও ক্রমে নিম্ন হইয়া যায় এবং বৃষ্টির জল প্রবাহিত হইতে হইতে খালের আকার ধারণ করিয়া রথখোলার খাল নামে অভিহিত হয়। এই উক্তি কেবল অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, কারণ ১৭৮১ সনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকার সময়ে, বোর্ড অব ডাইরেক্টরগণের অনুমত্যানুসারে তৎকালীন বঙ্গদেশের

সার্ভেয়ার জেনারেল জেমস রেনেল, এফ্. আর. এস. সাহেব ঢাকার ও তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহের যে ম্যাপ অঙ্কিত করেন তাহাতেও এস্থানে কোনও নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সে সময়ে পদ্মনদী ঢাকা জেলার দক্ষিণ পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাকরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মেহেদিগঞ্জ নামক স্থানে মেঘনা বা মেঘনাদ নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। তখন রাজনগরের মধ্য দিয়া পূর্ব ও পশ্চিম দিকে একটি খাল থাকায় এস্থানে নানাবিধ দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি হইত। একদিকে যেমন সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও 'রাজসাগর', 'পুরাতন দিঘি', 'কালীসাগর', 'কৃষ্ণসাগর', 'মতিসাগর', 'শিবপাড়ার দিঘি' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলাশয় সমূহ এস্থানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিত অন্য দিকে আবার তেমনি 'নারিকেলতা', 'মান্দারিয়া', 'চাকলাদার পল্লী', 'ভরদ্বাজ পল্লী', 'রাইয়তপাড়া' প্রভৃতি জনপূর্ণ পল্লীসমূহ থাকায় রাজনগর গ্রাম সর্বদাই আমোদ-কোলাহল-মুখরিত থাকিত। সেকালে সাধারণত সকলেরই অবস্থা ভাল ছিল, খাওয়া পরার চিন্তা বড় কাহাকেও একটা করিতে হইত না, সকলের ঘরেই মরাই-ভরা ধান থাকিত, কাজেই সকলে হয় লাঠি তরোয়াল খেলা নয়ত গান-বাজনা প্রভৃতি নির্দোষ আমোদে দিন কাটাইত। এই নিমিত্তই সেকালের রাজনগর গ্রামে বর্তমানের ভয়ঙ্করী অন্নচিন্তায় কাহাকেও ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত না। এস্থানে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কামার, কুমার, গোপ, মালাকার, কাংস্যবণিক, গন্ধবণিক, তন্তুবায় প্রভৃতি বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের যত বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকের বাস ছিল তদ্রূপ বর্তমান সময়েও বিক্রমপুরের কোনও বর্ধিষ্ণু গ্রামে এত বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকের বাস পরিলক্ষিত হয় না।

সেকালের রাজনগরবাসিগণের কেবল যে আমোদ প্রমোদ ও ব্যায়ামের প্রতি লক্ষ্য ছিল তাহা নহে, শিক্ষার প্রতিও তাহাদের বিশেষ মনোযোগ ছিল। জন-সাধারণের মধ্যে যাহাতে শিক্ষা প্রচালিত হয় সে বিষয়ে তাহারা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ছোট বড় সকলেই যাহাতে শিক্ষা লাভ করিয়া নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি ও সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবিষয়ে তাহারা সবিশেষ মনোযোগ করিতেন। রাজনগরের প্রতি পল্লীতেই বাংলা শিক্ষার জন্য পাঠশালা, পারস্য ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য মক্তব ও সংস্কৃত শিক্ষার্থ চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল। অভিভাবকগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে সুশিক্ষিত করিতেন। তবে পারসি ও সংস্কৃতের আদরই বেশি ছিল, বালকেরা সামান্য বাংলা শিক্ষা করিয়া সকলেই মৌলভির নিকট পারসি ভাষায় শিক্ষা লাভার্থ দুইবেলা পুঁথি হস্তে অধ্যয়ন করিতে যাইত। অন্তঃপুরেও শিক্ষার দ্বার অবরুদ্ধ ছিল না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে বিদুষী আনন্দময়ী ও গঙ্গদেবীর সুমধুর কবিত্বঝঙ্কারে বর্তমান বিদুষী মহিলাগণও গৌরবান্বিতা বোধ করিতেন না। শ্রীযুক্তবাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার সুপ্রসিদ্ধ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক গ্রন্থেও এই বিদুষী কবিদ্বয়ের কথা বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

বিধাতার আশ্চর্য বিধান হৃদয়ঙ্গম করা মানববুদ্ধির অগোচর। বিক্রমপুরবাসীর দুর্ভাগ্য তাই ১২৭৬ সনে কীর্তিনাশার তরঙ্গ-প্রহারে রাজনগর চিরদিনের জন্য লোকলোচনের অদৃশ্য হইয়াছে। আমরা এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে রাজনগরের দ্রষ্টব্য জলাশয়গুলি ও ইমারতাদির বিবরণ প্রদান করিলাম। ভরসা করি পাঠকগণ ইহা হইতেই মহারাজা রাজবল্লভের বাসগ্রামের একটা ছায়া-চিত্র হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিবেন।

রাজনগরের বক্ষভেদ করিয়া যে খালটি পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে প্রবাহিত ছিল, সেই খাল ধরিয়া পূর্বদিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই 'রাজসাগর' নামক একটি হ্রদের ন্যায় প্রকাণ্ড সরোবর দৃষ্টিপথে পতিত হইত। এই জলাশয়ের জল অত্যন্ত নির্মল ও সুপেয় ছিল। ইহার চারি তীরেই ইষ্টকনির্মিত সোপানাবলী থাকায় জনপদ-বধূগণের জল লইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ ছিল। এই সরোবরের উত্তর তীরে 'রাজসাগরের হাট' নামক রাজনগরের সুবিখ্যাত বন্দর থাকায় এস্থান সর্বদাই জনকোলাহলে মুখরিত থাকিত। সেকালের সভ্যতা ও রুচি অনুযায়ী এই হাটে

সমুদয় দ্রব্যই পাওয়া যাইত। বন্দরের ভিতরে বহু রাস্তা এবং নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের দোকান ছিল। রাজসাগরের পশ্চিমতটে স্থপতিকৌশলের নিদর্শন স্বরূপ নানা কারুকার্য খচিত দুইটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার একটিতে 'মহাপ্রভু' নামক দেবতা ও অপরটিতে 'জগন্নাথদেব' প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতিদিন ষোড়শোপচারে এই বিগ্রহের অর্চনা ও যথারীতি প্রাতে সন্ধ্যায় শঙ্খ ঘণ্টার গগন-ভেদী নিনাদে আরতি হইত। এই সরোবরের অন্যান্য তীরে নানাজাতীয় বণিকবৃন্দ পরমানন্দে বাস করিত। এই সরোবরের বৃহত্ত্ব সম্বন্ধে একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যদি ইহার এক তীর হইতে বন্দুকের আওয়াজ করা যাইত তবে অপর তীর হইতে তাহা শুনা যাইত না। মৃদু পবন স্পর্শেই ইহার বক্ষে তরঙ্গনিচয় উত্থিত হইয়া ক্রীড়া করিত।

পুরাতন দিঘি ঃ

আমরা পূর্বে যে পথের উল্লেখ করিয়াছি সেই পথ অনুসরণ করিয়া প্রায় এক মাইল পর্যন্ত পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলে পুরাতন দিঘি নয়ন-গোচর হইত। রাজসাগর অপেক্ষা ইহা আয়তনে ছোট ছিল। এই দিঘির পশ্চিমতটে চৈত্রসংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত দুইমাস কাল স্থায়ী একটি মেলা বসিত। এই মেলা 'কাল-বৈশাখীর মেলা' বলিয়া বিখ্যাত ছিল। ঢাকা জেলাস্থ উত্তর বিক্রমপুরের কার্তিকবারুণীর মেলা অপেক্ষা ইহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি কম ছিল না। প্রাচীন ব্যক্তিদের মুখে অবগত হওয়া যায় যে এই স্থানে চড়ক পূজায় যেরূপ সমারোহ হইত পূর্ববঙ্গের আর কোথাও সেরূপ হইত না। শতাধিক ঢাকের প্রচণ্ড নিনাদে হৃদয়ে এক আশ্চর্য ভাবের উদয় হইত। এক বিশাল চড়ক বৃক্ষে ষোড়শ সংখ্যক বলিষ্ঠ যুবক একত্র ঘূর্ণিত হইত, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য চতুর্দিকস্থ অগণন দর্শকবৃন্দের কল-কোলাহল ও ঢাকের ভীষণ শব্দে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিত।

পুরাতন দিঘি ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই সম্মুখে মহারাজা রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুত্র রায় মৃত্যুঞ্জয়ের বাটির তোরণদ্বার দৃষ্টি অবরোধ করিত। রাজবল্লভের মৃত্যুর পরে রায় মৃত্যুঞ্জয়ই রাজনগরের মধ্যে ধনে, মানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের আবাসবাটিও নানারূপ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা পরিশোভিত ছিল। পুরাতন দিঘির পশ্চিমতীরের উত্তর দিক হইতে একটি রাস্তা বরাবর পশ্চিমদিকে গিয়াছিল। এই পথের পার্শ্বে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু সরোবর ছিল, সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। এই পথটি রাজনগরের "পুরাতন দরজা" নামে অভিহিত ছিল। ইহার পশ্চিমদিকে রাজা রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদারের বাড়ি ছিল। এখানে বহু ছোট বড় অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে 'নবরত্ন' নামক রমণীয় প্রাসাদটির কথাই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

নবরত্ন ঃ

একটি চতুষ্কোণ একতল অট্টালিকার হলের চারিদিকে চারিটি ও প্রত্যেক কোণে এক একটি চতুষ্কোণ মঠ ও দুইটি মঠের প্রত্যেকটির মধ্যভাগে এক একটি 'ঝিকটি ঘর' (যে ইষ্টকনির্মিত গৃহের দোচালা ঘরের ন্যায় চাল) সন্নিবিষ্ট। ছাতের মধ্যস্থলে যে মঠটি ছিল তাহার উচ্চতা চতুর্দিকস্থ ঝিকটি ঘর হইতে অধিক ও মাটি হইতে প্রায় শতাধিক হাত উচ্চ ছিল। এই অট্টালিকা ইষ্টক ও প্রস্তরে নির্মিত এবং উহার প্রাচীরের গায়ে নানা প্রকার লতা, পাতা ও ফুল, ফল অঙ্কিত থাকায় ইহা বড়ই সুন্দর দেখাইত।

একবিংশরত্ন ঃ

ইহাই রাজা রাজবল্লভের বাড়ির সিংহ দরজা বা তোরণদ্বার ছিল। পুরাণ দিঘির পশ্চিমতটস্থ সুপ্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই এই সুবিশাল তোরণদ্বার দৃষ্টিগোচর হইত। এই তোরণদ্বার একটি ত্রিতল অট্টালিকা। প্রথমে তলের নিম্নে সিংহদ্বার, ইহার ছাত অর্ধবৃত্তাকারে

নির্মিত ছিল এবং ইহার নিম্নস্থ পথ এতদূর সুপ্রশস্ত ছিল যে তাহার মধ্য দিয়া অনায়াসে তিনটি হস্তী হাওদাসহ পাশাপাশিভাবে যাতায়াত করিতে পারিত। এই দ্বারের দুই দিকে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদী ছিল, উহাদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া দিবারাত্রি দৌবারিকগণ প্রহরায় নিযুক্ত থাকিত।

এই তোরণদ্বারপার্শ্বস্থ উভয়দিকের একতল অট্টালিকার মধ্যে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ ছিল। সে সকল প্রকোষ্ঠে রাজকীয় সৈন্যগণ বাস করিত। এই একতল অট্টালিকার ছাতের প্রতি কোণে এক একটি মঠ ও সমুখস্থ দুই মঠের মধ্যাংশে ও সিংহ দরজার উপরে তিনটি 'ঝিকটি' ঘর পরস্পর সংলগ্ন ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে যখন পূর্বগগন লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিত, যখন বিহঙ্গম-কুল বৃক্ষশাখায় বসিয়া মনের আনন্দে সুমধুর স্বর-লহরীতে চারিদিকে সুধাবর্ষণ করিত, তখন এ সকল ঝিকটি ঘর হইতে নহবতের সুমধুর প্রভাতীরাগিণী সানাইয়ের মোহিনী আলাপের সঙ্গে সঙ্গে রাজনগরবাসীর হৃদয়ে অপূর্ব পুলক সঞ্চার করিয়া দিত। দ্বিতলের ছাতের এই একাদশটি মঠ বিদ্যমান ছিল। ত্রিতলের ছাতের এই একাদশটি মঠের মধ্যস্থিত মঠটি সর্বাপেক্ষা উচ্চ এবং ইহার উভয়পার্শ্বের মঠগুলি ক্রম-নিম্ন থাকায় দূর হইতে ইহাকে ধনুকের উপরার্ধের ন্যায় দৃষ্ট হইত।

পশ্চিমদিকের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সেঘরা বা তিনটি প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একাকী দ্বিতল অট্টালিকা বিরাজিত ছিল। উৎসব উপলক্ষে বাদকগণ এস্থান হইতে বাদ্যধ্বনি করিত। সেঘরার উত্তরদিকে কারুকার্যখচিত একটি ঝিকটি ঘর ছিল। কথিত আছে যে মহারাজা রাজবল্লভ এক কোটি শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া তাহার উপরে ঐ ঘরটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই প্রথম তোরণদ্বার উত্তীর্ণ হইলেই দ্বিতীয় তোরণদ্বার। ইহা পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল। দ্বিতীয় তোরণদ্বার পার হইলেই সমুখস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণের দক্ষিণভাগে 'রঙ্গমহাল' নামক সুসজ্জিত ও কলা-নৈপুণ্যপূর্ণ বৈঠকখানার দালান দর্শকের নয়নগোচর হইত। ইহার সম্মুখেই সুন্দর একটি মন্দিরে বাসুদেব নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই মন্দিরের উত্তর দিকে আর একটি সিংহদ্বার স্থাপিত ছিল। সেই সিংহদ্বার পার হইলেই সুপ্রসিদ্ধ 'সপ্তদশরত্ন' বা 'শতরত্ন' নামক দোলমঞ্চ তৃতীয় প্রাঙ্গণের পুরোভাগে দৃষ্টিগোচর হইত।

সপ্তদশ রত্ন বা শত রত্ন ঃ

একটি উচ্চ চারিতল অট্টালিকা এরূপভাবে নির্মিত ছিল যে প্রত্যেক ঊর্ধতল তাহার নিম্নতলের মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল, এবং প্রতিতলের কোণে এক একটি সমআয়তন চতুষ্কোণ মঠ বিদ্যমান ছিল। সর্বোচ্চ তলে অর্থাৎ চতুর্থ তলের ছাতের মধ্যদেশে মঠের আকারে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা চতুর্দিকস্থ অন্যান্য মঠ অপেক্ষা উচ্চ ছিল। যখন বসন্তের শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের দোলের একটা উন্মাদ-উচ্ছৃঙ্খলতা পাড়ায় পাড়ায় জাগিয়া উঠিত ও বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে দুই দল বাঁধিয়া গানের প্রতিযোগিতা চলিত সে সত্য সত্যই একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল। মৃদঙ্গের তালে তালে হোরীর সুমধুর সঙ্গীত লহরীর সহিত দোল-পূর্ণিমার সেই শুভ্র-জ্যোৎস্নাপুলকিত নিশীথে ঐ সর্বোচ্চতলস্থ মন্দিরের মধ্যে রাজবল্লভের স্থাপিত লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র কুঙ্কুমরাগে সুরঞ্জিত হইয়া স্বর্ণসিংহাসনে দোলায়মান হইতেন। প্রত্যেক তলের এবং প্রত্যেক মঠের নিচেই বাসোপযোগী এক একটি প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান ছিল। প্রতি নিম্নতল হইতে তদূর্দ্ধতলে আরোহণ করিবার জন্য সুপ্রশস্ত সোপানাবলী নির্মিত ছিল। এই হিন্দোল-মন্দিরের অভ্যন্তরে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নিসর্গের প্রাণারাম পবিত্র সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইতে হইত। বিশাল মহীরুহরাজি ছোট ছোট গুল্মের ন্যায় এবং অদূরস্থ রথখোলার নদীকে একখানি শুভ্রবস্ত্রের ন্যায় দেখাইত। এই উচ্চ মন্দিরের সর্বোচ্চ মঠ প্রায় ১৫০ দেড় শত হাত উচ্চ ছিল। শতরত্ন মঠের অঙ্গনের একভাগে একতল অট্টালিকার বৈষয়িক কার্যাদি নিষ্পন্ন হইত ও সেঘরের পার্শ্বস্থ একটি ঝিকটি ঘরে মাতা সর্বমঙ্গলা শরতে পূজিতা

হইতেন। পদ্মার অপর তীর হইতে লোকে শতরত্ন মঠের অভ্রভেদী চূড়া লক্ষ্য করিয়া পদ্মা নদীতে পাড়ি ধরিত।

পঞ্চরত্ন মঠ ঃ

এই প্রাঙ্গণেই পঞ্চরত্ন নামক সুন্দর শিল্প-চাতুর্যময় দেবালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজনগরের মধ্যে শিল্পচাতুর্যে ও স্থপতি-নৈপুণ্যে ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। পাঁচটি দ্বিতল মন্দির একত্র সংযুক্ত ভাবে নির্মিত হওয়ায় ইহাকে 'পঞ্চরত্ন' মন্দির কহিত। এই সকল মন্দিরের একটি মধ্যস্থলে এবং অবশিষ্ট চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির উহার প্রত্যেকের কোণদেশের সহিত সংলগ্ন ভাবে গঠিত হইয়াছিল। এই পাঁচটি মন্দিরের প্রত্যেকটির প্রাচীর গাত্রেই নানাবিধ দেবদেবী ও লতাপাতার চিত্র অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত ছিল। এই মন্দিরের এক কক্ষে সুবিখ্যাত লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র, এক কক্ষে রাজরাজেশ্বরী, এক কক্ষে অন্যান্য দেবতাগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পঞ্চরত্ন মন্দিরের সমুখস্থ প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইলে অন্তঃপুরখণ্ডে প্রবেশ করা যাইত। অন্তঃপুরখণ্ডের চারিধারে চারিটি সুবৃহৎ সৌধ পরস্পর সংলগ্ন ছিল। প্রত্যেকটি অট্টালিকার ভিতরেই বহু প্রকোষ্ঠ ও সম্মুখে বারান্দা ছিল। উত্তরভাগের অট্টালিকাটি ত্রিতল ও অন্যান্য অট্টালিকাগুলি একতল ছিল। ত্রিতল অট্টালিকার একটি প্রকোষ্ঠে মহারাজার শয়ন-কক্ষ ছিল। তিনি বাড়ি আসিয়া সে স্থানেই বাস করিতেন।

রাজবল্লভের বাড়ির পশ্চিমদক্ষিণ কোণে তাহার গুরু কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের বাসভবন ছিল। ইহার বাড়িতেও তোরণদ্বার এবং মনোহর অট্টালিকাসমূহ বিরাজমান থাকিয়া সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিত।

আমরা পূর্বে রাইতপাড়া, নারিকেলতা পাড়া প্রভৃতি রাজনগরান্তর্গত যে সকল পল্লীর নাম করিয়াছি সে সব স্থানেও বিস্তৃত সরোবর, মঠ ও বহু সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল। সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। হান্টার সাহেব তৎসংকলিত ঢাকার Statical Account-এর একস্থানে রাজা রাজবল্লভ ও তাহার সুপ্রসিদ্ধ রাজনগরের বাড়ির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উহাকে "Splendid residence" বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

১২৭৬ সনে ক্ষুদ্র রথখোলার নদী ক্রমশ বিস্তারলাভ করিতে করিতে বিশাল পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া চিরদিনের জন্য রাজনগরের অতুল গৌরব-প্রভা প্রকাশক প্রাসাদাবলী গ্রাস করিয়া ফেলিল। চিরদিনের জন্য যাহা পৃথিবীর বুক হইতে মিলাইয়া গিয়াছে—তাহার স্মৃতি আর কতদিন থাকিবে? মহারাজা রাজবল্লভের এসকল কীর্তিস্তম্ভ যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনি জীবনে তাহা কখনও ভুলিতে পারিবেন না। রাজনগরের এই দারুণ দুর্গতির সময় শ্রীহট্টনিবাসী জয়চন্দ্র ভট্ট নামক একজন ব্যক্তি রাজনগরের রাজকবি স্বরূপ বাস করিতেছিলেন। তিনি রাজনগরের এই দুর্দশা দেখিয়া মনের দুঃখে যে সুদীর্ঘ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহা বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে ভাট কবিগণ স্বরসংযোগে গান করিয়া দর্শকের মনে একটা বিষাদের ভাব জাগাইয়া দেন। আমাদের প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে ; নচেৎ পাঠকদিগকে সে কবিতার রসাস্বাদন হইতে বঞ্চিত রাখিতাম না, আর সামান্য কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলেও সৌন্দর্য নষ্ট হইবে বলিয়া বিরত হইলাম।

মহারাজা রাজবল্লভকে ঐতিহাসিকগণ যে বর্ণেই চিত্রিত করুন না কেন তিনি যে একজন ক্ষমতাশালী ও জ্ঞানীপুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে কেহ কোনওরূপ আপত্তি করিতে পারেন না। রাজবল্লভ সমাজ-সংস্কার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাহার কন্যা অভয়ার অষ্টম বর্ষে বিবাহ হইয়াছিল। এই কন্যা রাজবল্লভের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া বিশেষ আদরের ছিল। কিন্তু বিধাতার লীলা মানববুদ্ধির অগোচর। এই বালিকা বিবাহের অত্যল্পকাল পরে বিধবা হওয়ায় তিনি বাল-বিধবার প্রতি হিন্দু-সমাজের পৈশাচিক অত্যাচার দূর করিবার জন্য ও তাহাদের পুনর্বিবাহের নিমিত্ত ভারতবর্ষের নানাস্থানে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট দূত প্রেরণ করিয়া মতামত

সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সর্ব দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীই শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা বাল বিধবাগণের বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া পাতি দিয়াছিলেন, কিন্তু নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শঠতায় নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী বিরুদ্ধ মত দেওয়ায় তাহা সম্পাদিত হইতে পারে নাই। কারণ সেকালে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর অনভিমতে কোন কার্যই শাস্ত্র-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইত না। এই একটি মাত্র মহৎকার্যের সূচনার জন্যও সমাজের সংস্কারেচ্ছু ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ে তাহার নাম গৌরবের সহিত অঙ্কিত থাকিবে।

** প্রবাসী ১৩১৫—৮ম ভাগ ৫ম সংখ্যা*

শ্রীবিক্রমপুর ও তাহার উপকণ্ঠ[১]



নলিনীকান্ত ভট্টশালী

বাঙলাদেশের অনেক মনীষীর মতে এখন বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক আলোচনার যুগ চলিতেছে।

এই যে দেশব্যাপী ঐতিহ্যানুসন্ধানের স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে তবু আমরা সম্পূর্ণ সজাগ হইতে পারিয়াছি কি? আমার ত তাহা বোধ হয় না। এখনো যেন মতসঙ্কলনেই—ইংরেজি, ফরাসি, জর্মানে পুথি অনুবাদ ও সেগুলি হইতে না বলিয়া বেমালুম গ্রহণেই আমাদের অধিকাংশ শক্তি অপব্যয়িত হইতেছে; অধিকাংশ চেষ্টা বিফলে অবসান লাভ করিতেছে।

এই মহাবিদ্বজ্জন সমাগমে বাংলার ঐতিহ্যালোচনার সূর্যরথের সপ্তাশ্ব শাস্ত্রী বসু মৈত্রেয় চন্দ বিদ্যাভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বসাক মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে তিন তিনটা রাজবংশ বর্ম চন্দ্র সেন বংশ তাম্রশাসনাবলী প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং সময় সময় সমস্ত বাংলা বিহারের শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছেন। আপনারা বারেকও কি সেই অতীত গৌরবমণ্ডিত পুণ্যভূমিতে যাইয়া পর্যবেক্ষণ করিবার অবসর পাইয়াছেন? যদি না পাইয়া থাকেন তবে কি করিয়া বলি যে প্রকৃতই অতীত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা বঙ্গদেশে সম্পূর্ণ জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে? কোথায় সেদিন একটা কথা শুনিলাম যে ঢাকা জেলায় স্থিত বিক্রমপুর, বর্ম চন্দ্র সেন রাজেদের রাজধানী এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মস্থান বিক্রমপুর নহে। কথা যখন উঠিয়াছে তখন প্রমাণও শীঘ্রই বাহির হইবে।[২]

বিক্রমপুর আমার জন্মভূমি, তাহার অতীত ও বর্তমান গৌরবে আমি গৌরবান্বিত। শ্রীবিক্রমপুর নগরের উপকণ্ঠে আমার ত্রয়োদশ পুরুষের বসতবাটি-জ্ঞান হওয়া অবধি বিক্রমপুরাধিপদের কত বিস্ময়জনক কাহিনী শুনিয়া শুনিয়া মানুষ হইয়াছি। কত মেঘগম্ভীর সন্ধ্যায় পিসিমার মুখে বল্লাল রমণীর অদ্ভুত আত্মবিসর্জন কাহিনী শুনিয়া বীরাঙ্গনা সোনামণির অসাধারণ বীর্যের পরিচয় পাইয়া চাঁদ-কেদারের বিপুল কীর্তি-কাহিনী অবগত হইয়া ভীষণ কীর্তিনাশার বিরাট ধ্বংসোৎসব মানসনয়নে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছি। বাল্যাবধি শ্রীবিক্রমপুরের মহাশ্মশান রামপালনগরী ও তাহার উপকণ্ঠে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিপুল প্রাচীন গৌরবের চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছি। তবু কি মনের আশা মিটিয়াছে? বাল্যকালে মুগ্ধ হইয়া কেবলি দেখিয়াছি—দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছি। ঐতিহাসিকের চক্ষে যখন দেখিতে শিখিলাম তখন হইতেই নানা কাজে নানা দাসত্ব শৃঙ্খলে জড়িত হইয়া মাতৃভূমি হইতে দূরে থাকিতে হইয়াছে। কিছু কিছু দেখিয়াছি কিন্তু এখনও ঢের বাকি রহিয়া গিয়াছে—জীবনে ভাল করিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পাইব কিনা কে জানে? কিন্তু যাহা দেখিয়াছি তাহাই আজ এই মহাসম্মিলনীতে নিবেদন করিতে চাই।

ইচ্ছামতী-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র-ধলেশ্বরী সঙ্গমে অবস্থিত বিক্রমপুর নগরের অবস্থান প্রাচীনকালে অতি মনোরম ছিল। কবে হইতে যে বিক্রমপুর ভূভাগে আর্যনিবাস হইয়াছে তাহা ঠিক করা যায় না। অশোক নাকি সমতটেও তাহার ধর্মরাজিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমি "প্রতিভা" এবং এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত আমার "একটি বিস্মৃত জনপদ" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে সমতটের রাজধানী কর্মান্ত নগরীর নিকটে অশোক প্রতিষ্ঠিত এবং হিউ এন সাঙ কর্তৃক দৃষ্ট ধর্মরাজিকার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। কর্মান্তনগর বর্তমান ত্রিপুরা জেলায়

কুমিল্লা শহরের অদূরে বর্তমান ছিল। কাজেই বিক্রমপুর ভূভাগ অশোকের রাজ্যের মধ্যে ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু অশোক যুগের বলিয়া অসঙ্কোচে নির্দেশ করা যায় এমন কিছু বিক্রমপুর হইতে এ পর্যন্ত বাহির হয় নাই।

বিক্রমপুরের বিক্রমপুর নাম কি করিয়া হইল? বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রবাদ আছে যে রাজা বিক্রমাদিত্য বঙ্গবিজয়ে আসিয়া এই সুন্দর সুরক্ষিত স্থানটিতে শিবির স্থাপন করেন এবং স্বনামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। প্রবাদের মূলে সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে। কালিদাসের রঘুর দিগ্বিজয়ে নৌসাধনোদ্যত বঙ্গদেশীয়গণের বাহুবলের পরিচয় পাইয়া স্বতঃই মনে হয় যে গুপ্তরাজাদের মধ্যে কোন বিক্রমাদিত্য উপাধিকারী রাজা বোধ হয় আসিয়া সেই বাহুবলের পরীক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন ; চন্দ্র নামক রাজার দিল্লি লৌহস্তম্ভে খোদিত লিপি পাঠ করিয়া জানা যায় যে তিনি সমবেত বঙ্গাধিপগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিক হিসাবে বঙ্গ বলিতে প্রাচীনকালে বিক্রমপুর এবং তাহার চতুস্পার্শকেই বুঝাইত। ভিনসেন্ট স্মিথ প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলীর মত এই যে চন্দ্রই সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। যদি এই চন্দ্রই চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য হন তবে তাহার বিক্রমপুরে আগমনের তো সমস্ত প্রমাণই রহিয়া গেল। কিন্তু কিছুদিন হয় মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় Indian Antiquary পত্রে এই চন্দ্রকে শুশুনিয়া গিরিলিপির পুষ্করণার অধিপতি চন্দ্র হইতে অভিন্ন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার চেষ্টা সফল হইয়া থাকিলে বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি রহস্য যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেল। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে দেখিতে পাই যে সমতট ডবাক কামরূপ সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যের প্রান্তস্থিত অনুগত রাজ্য। সমুদ্রগুপ্ত-তনয় চন্দ্রের শাসন সময়ে এই প্রান্তস্থিত রাজ্যগুলিকে তাহার শাসনাধীনে আনিবার চেষ্টা খুব স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। তাই মেহেরৌলির চন্দ্রকে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে ইচ্ছা হইতেছে। বিচার বিতর্কের স্থান ইহা নহে। ফরিদপুরের তাম্রশাসনগুলি যদি কূটশাসন না হয় তবে গুপ্ত রাজাদের প্রভুত্ব যে এই অঞ্চলে বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর এবং হর্ষবর্ধনের এক পুরুষ স্থায়ী প্রভুত্বের অবসানে পূর্ববঙ্গে খড়্গাবংশ মাথা তুলিয়াছিল। কর্মান্ত নগরে তাহাদের রাজধানী ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। বিক্রমপুরে তাহাদের অন্যতম রাজধানী ছিল কিনা অবগত হওয়া যায় না। বিক্রমপুরে যত প্রস্তরমূর্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার প্রাচীনতমগুলি সমস্ত বৌদ্ধমূর্তি, বিক্রমপুরের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে দেউল নামে পরিচিত একপ্রকার উচ্চ মৃৎস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রামে চার-পাঁচটি পর্যন্ত দেউলের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। বিক্রমপুর হইতে যত মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা প্রায়ই এই প্রাচীন দেউলগুলির সন্নিহিত পুকুর বা চৌগাড়া হইতে উঠিয়াছে। এইগুলি যে পুরাকালে দেবালয় ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিক্রমপুরের লুপ্ত ইতিহাস এই দেউলগুলির আশেপাশেই লুকাইয়া আছে, কিন্তু এগুলির দিকে কাহারও দৃষ্টি ভাল করিয়া আকৃষ্ট হয় নাই। বিক্রমপুরের ইতিহাস যথাসম্ভব উদ্ধার করিতে হইলে কোন দেউল হইতে কি উঠিয়াছে তাহার সাবধানে পর্যালোচনা আবশ্যক। সুখবাসপুর কালীর বাড়ির অব্যবহিত পশ্চিমদিকে স্থিত দেউলকে পাইকপাড়া গ্রামে আমার নিজ বসতবাটির দক্ষিণ সীমায়স্থিত দেউলটিকে এবং জৈনসার গ্রামস্থ দেউলটিকে আমি বৌদ্ধ খড়্গাবংশের প্রাধান্যের সময়ে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে করি। প্রথম দেউলটি হইতে একটি সুগঠিত বালুকা-প্রস্তরে নির্মিত তারা দেবীর মূর্তি উঠিয়াছে। তাহার গঠনভঙ্গী দেখিয়াই বুঝা যায় যে মূর্তিটি বরেন্দ্র-শিল্পের জন্মের পূর্ববর্তী সময়ের যে সময়ে কৃষ্ণপ্রস্তরের ব্যবহার তখনও বহুলভাবে প্রচলিত হয় নাই। পাইকপাড়া দেউলের সংলগ্ন প্রকাণ্ড পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ মঘাদিঘি নামে পরিচিত দিঘির অস্তিত্ব হইতে বুঝা যায় যে দেউলটি বৌদ্ধ দেউল ছিল। এই দেউলের নিকটবর্তী স্থান হইতে একটি অষ্টধাতুর ধ্যানীবুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহা নিকটেই এক বাড়িতে সরস্বতী বলিয়া বহুবৎসরাবধি পূজা পাইতেছে। দেউলের পূর্ব দিকস্থ চৌগাড়া হইতে একটি জম্ভলের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্তিটির পিছনে এক লাইন বিলুপ্ত-প্রায়

লিপি আছে। বহু কষ্টে তাহা পাঠ করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় জম্ভলপূজার বীজমন্ত্রটি লেখা রহিয়াছে। লিপিটিতে নয়টি অক্ষর মাত্র আছে যথা ওঁ জম্ভল জলেশায় স্বাহা। লিপিটির অক্ষর অত্যন্ত প্রাচীন ঢঙের-আসরফার শাসনদ্বয়ের লেখার সহিত তাহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। এই লিপি হইতে আমরা অনুমান করিতে চাই যে দেউলটি খড়্গাদের সময়ে প্রতিষ্ঠিত। সরস্বতীরূপে পূজিত বুদ্ধমূর্তিটিরও নাক মুখ চোখ কালবশে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া এরূপ হইয়া গিয়াছে যে কেবল উপবেশনভঙ্গী দেখিয়া উহাকে ধ্যানী বুদ্ধ বলিয়া চেনা যায়। এই অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তির আবিষ্কারও দেউলটির প্রাচীনত্বের একটি প্রমাণ। জৈনসারের দেউল হইতে একটি বালুকাপ্রস্তরের (standstone) ত্রৈলক্য-বিজয়িনীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহারও গঠনভঙ্গি দেখিয়া মনে হয় যে এটিও পালদের অভ্যুত্থানের পূর্ববর্তী কালের। এই মূর্তিটির ছবি গৃহস্থে বাহির হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়িবাবুও সাহিত্য পত্রিকায় বঙ্গের ভাস্কর্য নামক প্রবন্ধে এই মূর্তিটিকে তারা নামে পরিচিত করাইয়া ছবি বাহির করিয়াছিলেন। মূর্তিটি ঢাকা-পরিষদের উৎসাহী সভ্য শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া ঢাকা পরিষদের মন্দিরে সুরক্ষিত আছে।

খড়্গা বংশের পতন হইতে বর্মবংশের অভ্যুত্থান পর্যন্ত বিক্রমপুরের ইতিহাস সম্পূর্ণ তমসাচ্ছন্ন। খড়্গাবংশের বিক্রমপুরে অধিকারের বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ কিছুই নাই, যাহা আছে তাহাই উপরে উল্লিখিত হইল। কিন্তু বর্ম বংশের বিক্রমপুরে রাজত্বের বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। বর্ম বংশ কোন সময়ে রাজত্ব আরম্ভ করেন, হরিবর্ম এবং বজ্রশাসন ভোজবর্ম একই ধারার রাজা কিনা সে বিষয়ে বিতর্কে নিযুক্ত হইবার স্থান ইহা নয়। আমার বর্তমান প্রবন্ধের জন্য এইটুকুই জানা আবশ্যক যে বর্মবংশের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল। বিক্রমপুর বলিতে বর্তমানে এক প্রকাণ্ড পরগণাকে বুঝায় এবং প্রাচীন শ্রীবিক্রমপুর নগরী যেখানে ছিল তাহাতে রাজবংশের পর রাজবংশ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের রাজধানীগুলির মহাশ্মশান অধুনা প্রায় ২৫ বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া আছে। আমি বর্তমান প্রবন্ধে এই ২৫ বর্গমাইল স্থানের কোন অংশে কোন্ বংশের রাজধানী ছিল, যথাসম্ভব এবং যথাপ্রাপ্ত প্রমাণ ও যুক্তি দিয়াই তাহারই নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ প্রাচীন তাম্রশাসনাবলীতে উল্লিখিত শ্রীবিক্রমপুর নগরীই যে বর্তমান রামপাল তাহার প্রমাণ আবশ্যক। ইহার প্রমাণ করিতে আমি বক্র প্রমাণের সহায়তা গ্রহণ করিব। যদি রামপালের চতুর্দিকে ২৫ বর্গমাইলব্যাপী ভগ্নাবশেষ রাশি শ্রীবিক্রমপুর নগরের ধ্বংসাবশেষ না হয় তবে বিক্রমপুর পরগনা হইতে এমন স্থান খুঁজিয়া বাহির করা আবশ্যক যাহা শ্রীবিক্রমপুর নগরীর ধ্বংসাবশেষ হওয়া সম্ভব। বিক্রমপুর পরগণায় দ্বিতীয় এমন স্থান আর নাই। পুরুষ-পরম্পরাও এই স্থানকেই প্রাচীন রাজাদের রাজধানী বলিয়া নির্দেশ করিয়া আসিতেছে। তাই বিক্রমপুর নগরী যে বর্তমান রামপালের আশেপাশেই বর্তমান ছিল সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে বর্ম-চন্দ্র-সেন বংশের রাজধানী একই স্থানে ছিল বলিয়া মনে হয় না। এই বিপুল ধ্বংসাবশেষের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বংশের রাজধানী ছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। প্রথমে বর্মবংশের রাজধানী কোথায় ছিল তাহারই নির্ধারণের চেষ্টা করা যাইক।

এই নির্ধারণ ঠিকমত অনুসরণ করিতে হইলে রামপাল ও তৎসন্নিহিত ভূভাগের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আবশ্যক।

বর্ম বংশের বিষয়ে আমরা প্রধান এই একটি বিষয়ে অবগত আছি যে তাহারা বৈষ্ণব ছিলেন। হরিবর্মদেব স্বীয় রাজধানী হইতে মাতার পদব্রজে কাশী যাইবার জন্য এক রাস্তা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। আমি তৃতীয় সংখ্যা বিক্রমপুর পত্রিকায় মিরকাদিমের খাল নামক প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে পাইকপাড়া আবদুল্লাপুরের সীমায় অবস্থিত বৃহৎ ইষ্টক নির্মিত পোলটির উপর দিয়া যে দীর্ঘ রাস্তা সোজা পশ্চিমদিকে চলিয়া গিয়াছে তাহাই হরিবর্মের নির্মিত রাস্তা।

এখন দেখা আবশ্যক যে রামপাল ও তাহার উপকণ্ঠের কোন স্থান হইতে বেশি বৈষ্ণব-

কীর্তি-চিহ্ন বাহির হইয়াছে—হরিবর্মের রাস্তা কোন্ স্থান হইতে বহির্গত হইয়াছে, এবং বর্মবংশের স্মৃতি বিজড়িত আর অন্য কোন কীর্তি রামপালের কোন অংশে আছে কিনা।

রামপালের দক্ষিণে সুখরামপুর গ্রামের আশেপাশে বহু বৈষ্ণব-কীর্তি-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুখবাসপুর গ্রামে বহু প্রাচীনকাল হইতে জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে এখানে রাজার বাটি অবস্থিত ছিল। সুখরামপুর মনসাবাড়িতে সুখবাসপুরের প্রকাণ্ড দিঘি হইতে উত্থিত এক বিপুলায়তন বিষ্ণুমূর্তি রক্ষিত আছে, আর একখানা প্রায় ছয়ফুট উচ্চ অতি সুন্দর কারুকার্য খচিত বামন অবতারের মূর্তি এই গ্রাম হইতে আবদুল্লাপুরের বৈষ্ণবদের আখড়ায় লইয়া গিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার নিচে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে "নমো বা—" পর্যন্ত লিখিত আছে। লিপিটি বোধ হয় নমো বামনায় বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছিল কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। সুখরামপুর হইতে সংগৃহীত দুইটি প্রকাণ্ড মূর্তি দেখিয়াই মনে হয় যে এরূপ বিপুলায়তন মূর্তি কোন প্রতাপশালী রাজা ভিন্ন অন্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।

সকলের চেয়ে বড় প্রমাণ, সুখবাসপুর গ্রামের পশ্চিম-প্রান্তস্থিত হরিশ্চন্দ্রের দিঘি। আমার মনে হয় এই হরিশ্চন্দ্র হরিবর্ম ব্যতীত আর কেহই নহেন। নাম সাদৃশ্য ভিন্ন অবশ্য অন্য কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। কিন্তু পূর্বোক্ত হরিবর্মের রাস্তাও যে হরিশ্চন্দ্রের দিঘির উত্তর পাড় ঘেঁসিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে সুখবাসপুরেই বর্মবংশের রাজধানী ছিল। সুখবাসপুরের উত্তর প্রান্তে দেবসার গ্রামে এক প্রকাণ্ড দিঘি এবং তাহার পাড়ে এক উচ্চ দেউল আছে। দেবসার গ্রাম রামপালের বিখ্যাত দিঘির পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। আমার মনে হয় এই দেবসার দেউলে বর্মরাজাদের অনেক কীর্তি লুকাইয়া আছে। সুখবাসপুরের পূর্বে একটি প্রকাণ্ড মাঠ আছে—তাহার নামটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাহার নাম সরস্বতীর মাঠ। বিষ্ণুপত্নী সরস্বতী দেবীর সম্মানে কোন অতীতকালে বর্মরাজাদের সময় হয়ত এখানে সারস্বত-সম্মিলনের ব্যবস্থা ছিল, সেই প্রাচীন গৌরবযুক্ত নামটি এখনও রহিয়া গিয়াছে। সরস্বতীর মাঠের পূর্বপ্রান্তে কেওয়ার গ্রাম। কেওয়ার গ্রাম বর্মদের সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেওয়ার দেউল হইতে একখানা বিষ্ণুমূর্তি বাহির হইয়াছে—তাহার পাদপীঠে চারি লাইন লিপি আছে। তাহার যতদূর পাঠ উদ্ধার করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে দিলাম।

লিপি

(১) অয়সাঙ্ক (?) য (?) মেয়ে (?) ন মযোগা ইযু বারেয়ুঃ।
(২) বঙ্গোকেন স্কহো (তো? রিযু বিষ্ণু সালোক্য-কামোয়া।।
(৩) বরেন্দ্রী হ (৩) টকিয়েন শাণ্ডিল্য কুল মৃ (?) নু (?) না পি তা (?) ম।
(৪) হস্য পৌত্রেণ প্রণপ্তা শৌরি শর্ম্মণঃ।।

লিপিটির ভাষা অশুদ্ধ সংস্কৃত বলিয়া বোধ হয়। নিচের দুই লাইনের শেষ অংশ অত্যন্ত ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে বলিয়া নিঃসংশয় পাঠ দিতে পারিলাম না। প্রথম দুই লাইন বেশ পরিষ্কারভাবে খোদিত থাকিলেও তাহারও তিন চারিটি অক্ষরের পাঠ অশুদ্ধি অথবা বৈচিত্র্য হেতু সংশয় যুক্ত। "অঙ্ক যমেয়" শব্দটি ঠিকরূপ পড়িতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ—পারিয়া থাকিলেও ইহার অর্থ পরিষ্কার নহে। অঙ্ক ৯ আর দিকের সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থযুক্ত বলিয়া যমেয় = ১০ যদি ধরা যায় তবে ৯১০ শকাব্দ পাওয়া যায়। তবে লিপিটির অর্থ এই দাঁড়ায় যে গৌরীশর্মার পুতি, পিতামহ শর্মার নাতি, কুলশর্মার ছেলে শাণ্ডিল্য গোত্রজ বরেন্দ্রীহট্ট নিবাসী বঙ্গোক শর্মা ৯১০ শকে স্কহোরি অর্থাৎ বর্তমান কেওয়ার গ্রামে মালোক্য কামনায় বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। শকাব্দের ৯১০ খ্রিস্টাব্দের ৯৮৮র সমান। সময়টি ঠিক বর্মবংশের অভ্যুত্থানের সময়।

বিক্রমপুরের অন্যতম রাজবংশ চন্দ্রবংশের অভ্যুত্থানের সময় এখনও সঠিকরূপে নিরূপিত হয় নাই। তাহারা বর্মদেব পূর্ববর্তী না পরবর্তী তাহা নূতন তথ্যাবলীর আবিষ্কার ভিন্ন নির্ণীত হওয়া দুষ্কর। চন্দ্রবংশের রাজধানী বর্তমান বজ্রযোগিনী গ্রামের পুকুরপাড় অংশে ছিল বলিয়া মনে হয়।

সেখানে পরস্পর সংলগ্ন তিনটি প্রকাণ্ড দিঘির পাড়ে অনেক ভগ্নাবশেষের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এখানেও রাজার আবাসবাটি ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। চন্দ্ররাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। বজ্রযোগিনী বিখ্যাত বৌদ্ধনাম—তাহার আশেপাশের গ্রামগুলির নামও বৌদ্ধগন্ধি যথা— ধামদ অর্থাৎ ধর্মদেহ, ধানারণ অর্থাৎ ধর্মারণ্য, মহাকালী ইত্যাদি। ধামদ গ্রামের প্রান্তস্থিত দিঘিতে মাটি তুলিতে একখানা স্বর্ণপত্রের পুঁথি পাওয়া যায়। পুঁথির এক একখানা পাতা ৩০ ভরি ওজনের ছিল। এবং এরূপ ২৪ খানা পাতাতে পুঁথিখানা সমাপ্ত ছিল যতদূর খবর জানি, পুঁথির ২৩ খানা পাতা গলাইয়া ফেলা হইয়াছে, একখানা পাতা এখনও আছে। কিন্তু তাহা এরূপ গোপনে রক্ষিত হইতেছে যে তাহা বাহির করা দুষ্কর। এই মূল্যবান পুঁথিখানিতে কি লিখা ছিল ভগবানই জানেন। পুকুরপারের দিঘি হইতে একখানি সুন্দর সরস্বতী মূর্তি উঠিয়াছে, তাহা নিকটবর্তী এক বাড়িতে পূজা পাইতেছে।

প্রসিদ্ধ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বাড়ি "বিক্রমনিপুর বাঙ্গালা" ছিল বলিয়া তাহার তিব্বতীয় ভাষার জীবনচরিতে লিপিবদ্ধ আছে। ঐতিহাসিকগণের এই মত যে ইহা বঙ্গদেশান্তর্গত বিক্রমপুর ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিক্রমপুরে প্রবাদ বজ্রযোগিনী গ্রামই দীপঙ্করের জন্মস্থান। বজ্রযোগিনীকে কেহ কেহ ববদাযোগিনীও বলিয়া থাকেন। বজ্রযোগিনীকে স্থানীয় লোকে বদরযোগিনী নামে অভিহিত করে। এই বদরযোগিনী অথবা বজ্রযোগিনী একটি প্রকাণ্ড গ্রাম। ইহার নানা অংশ নানা "পাড়া" নামে অভিহিত যথা—নাহাপাড়া, ভট্টাজপাড়া, আটপাড়া, পুরোহিতপাড়া ইত্যাদি। যতদূর প্রমাণ পাইয়াছি আমার বোধ হয় সোমপাড়াতেই দীপঙ্করের আবাসভূমি ছিল। সোমপাড়াতে একটি প্রকাণ্ড পূর্বপশ্চিমে দীর্ঘ মঘাপুকুর আছে। এই পুকুর হইতে দুইখানা বরদাতারার মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। দিঘিটির মধ্য দিয়া একটা বাধ দিয়া বর্তমানে দুইটি পুকুরে পরিণত করা হইয়াছে। তাহার পশ্চিমের দিকেরটির জল এখনও ব্যবহৃত হয়। পূর্বের দিকেরটির এখন দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত।

পশ্চিমের পুকুরটির মালিকগণ পুকুরটিতে একটি ঘাট বাঁধাইয়া তাহাতে বড় তারা মূর্তিটি আঁটিয়া দিয়াছেন। তারা মূর্তিটির নিচে এক লাইন লিপি ছিল তাহার অনেকটা ভাঙিয়া গিয়াছে—যাহা আছে তাহা এরূপ পাঠ করিয়াছি—

কায়স্থ শ্রীসঙেঘশগু [প্র]...

নিকটেই একটি দেউল হইতে ষোড়শ মহাস্থবিরের এক মহাস্থবির বজ্রায়নিপুত্রের মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সকলেই জানেন মহাস্থবির মূর্তি ভারতবর্ষের অন্য কোথাও আর আবিষ্কৃত হয় নাই। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে তিব্বত অভিযানে আনীত এবং মহামহোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় বর্ণিত মহাস্থবির মূর্তির সহিত মাপে ও আকৃতিতে এই মূর্তিটির কোন প্রভেদ নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বর্ণিত মূর্তিসকল ৪ ইঞ্চি উচ্চ এই মূর্তিটিও ঠিক ৪ ইঞ্চি উচ্চ। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের ইতিহাসও ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে তিনি বরদাতারা ও ষোড়শ মহাস্থবিরের বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং তিব্বতে তাহাদের পূজা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। তাহার জন্ম-গ্রামের যে স্থানে তারা ও মহাস্থবিরের মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই স্থানের কাছেই তাহার বসতবাটি ছিল। এমন সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। নিকটবর্তী নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা নামে খ্যাত প্রাচীন বসতবাটি সেই স্থান হইতে পারে।

সেন বংশের রাজধানীর অবস্থান লইয়া কোন গোলমালই নাই। প্রকাণ্ড পরিখা-বেষ্টিত বল্লালবাড়ি নামে পরিচিত সুরক্ষিতস্থান এখনও সর্বজনবিদিত। সেন বংশীয়গণ শৈব ও সৌর মতের উপাসক ছিলেন। কেবল লক্ষণ সেন প্রথমে শৈব ও পরে নারসিংহ এবং পরে পুরাদরের বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। বল্লালবাড়ির চৌগাড়ায় দক্ষিণ পাড়ে এক পুকুর হইতে প্রকাণ্ড এক নটেশ শিবের মূর্তি বাহির হইয়াছে। তাহা এখন ঢাকা মিউজিয়ামে আছে। এইখান হইতেই সম্ভবত ঢাকার লিপিযুক্ত চণ্ডীমূর্তিটি লওয়া হইয়াছিল।

সেন বংশের সময় শ্রীবিক্রমপুর নগরের সকলের চেয়ে বেশি বিস্তৃত হইয়াছিল—তাহা দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল ও প্রস্থে পাঁচ মাইল এই বিপুল আয়তন ধারণ করিয়াছিল। নানা প্রমাণ দৃষ্টে প্রতীতি হয় যে পশ্চিম বিক্রমপুরের জলাভূমিকে সেন রাজগণ আবাসযোগ্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মিরকাদিমের খালের পূর্বপাড়ে নাটেশ্বর নামে এক গ্রামে এক প্রকাণ্ড দেউল আছে। তাহা হইতে কেবল বিষ্ণুমূর্তিই চারিপাঁচখানা বাহির হইয়াছে। দেউলটির নাম হইতে বোধ হয় যে নটেশমূর্তিও একদিন বাহির হওয়া সম্ভব। বোধ হয় দেউলটি বৈষ্ণব বর্মরাজগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেন রাজগণ কর্তৃক শৈব দেউলে পরিণত হয়। এই দেউলের অদূরবর্তী সোনারঙের দেউল হইতে প্রকাণ্ড একটি সূর্যমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। দেউলটি খুব বিপুলায়তন। তাহার অব্যবহিত পূর্ব প্রান্তস্থিত স্থানকে এখনও লোকে সিংহদরজা বলে। সিংহ দরজার সম্মুখে মেদিনীমণ্ডলের দিঘি নামক প্রকাণ্ড এক দিঘি আছে। এই দিঘিও সিংহদরজার মধ্যবর্তী স্থানটুকুকে লোকে এখনও লড়াইতগি বলে। রাস্তা দিয়া যাইবার সময় প্রত্যেক পথিক খড়কুটা দিয়া এটা লুড়া বানাইয়া সময় সময় অগ্নি দিয়া এবং অনেক সময় তাহা অগ্নিসংযুক্ত না করিয়াই দেউলের উদ্দেশ্যে এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে নিক্ষেপ করিয়া যায়। এই প্রথাটি এখনও বর্তমান আছে। ইহা সূর্যপূজার স্মৃতি বলিয়া মনে হয়।

সোনারঙ হইতে একটু অগ্রসর হইয়া টংগিবাড়ি নামক গ্রাম পাওয়া যায়। এক বৃদ্ধ মুসলমানের নিকট অবগত হইলাম যে টংগিবাড়ি দিঘির মধ্যে লক্ষ্মণসেনের জলটঙ ছিল। বল্লালসেনের নামই জনসাধারণ জানে, এ অবস্থায় বৃদ্ধের মুখে লক্ষ্মণসেনের নাম শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছিলাম। টংগিবাড়ি দিঘিটির মধ্য দিয়া বাঁধ দিয়া দিঘিকে হতশ্রী করিয়া ফেলা হইয়াছে। দিঘি হইতে একটি নৃসিংহমূর্তি উঠায় মনে হইতেছে যে বৃদ্ধের কথা সত্য হইলেও হইতে পারে—পরমনারসিংহ লক্ষ্মণসেনের হয়ত এক গ্রীষ্মাবাস এই দিঘির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আরিয়ল ও তৎসন্নিহিত বলই ও পুরাপাড়া গ্রামে সেন রাজগণের কীর্তি চিহ্ন ছিল বলিয়া মনে হয়। বলই গ্রামে এক দেউল আছে এবং তৎসন্নিহিত স্থানকে রানীহাটি বলে। বলই দেউল হইতে অনেক মূর্তি বাহির হইয়াছে।—তাহার অনেকগুলি আউটসাহি গ্রামে সুরক্ষিত আছে। পুরাপাড়া দেউল হইতে একটি অপূর্ব সুন্দর অর্ধনারীশ্বর মূর্তি বাহির হইয়াছিল—তাহা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া এখন রাজশাহীর চিত্রশালায় আছে। আরিয়ল গ্রামের দেউল হইতে প্রকাণ্ড সূর্যমূর্তি বাহির হইয়াছিল তাহা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া ঢাকা সাহিত্য-পরিষদে আছে। আরিয়ল গ্রামের যে অংশে দেউল অবস্থিত তাহাকে মানবান্ধা গ্রাম বলে। তাহার চারিদিকে বিল। তাহা দৃষ্টে মনে হয় যে বিল হইতে মাটি উঠাইয়া তাহা শানবান্ধা করিয়া অর্থাৎ ইষ্টক দিয়া বাঁধাইয়া তাহার উপর দেউল প্রতিষ্ঠিত হয়।

হিউ এন সঙের সমতট বর্ণনা হইতে অবগত হই যে সমতটে অনেক নির্গন্থ জৈন অর্থাৎ উলঙ্গ জৈন ছিল। তাহারা কোথায় গেল ইহা এক বিস্ময়ের বিষয়। আমরা বিক্রমপুরের দুইখানা গ্রামের নামে মাত্র জৈনস্মৃতি দেখিতে পাই। এক জনৈসার ; সেখানে এক অতি প্রাচীন ধর্মস্থলী আছে, সেখানে এখনও প্রতি বৎসর মেলা বসে। আর এক বজ্রযোগিনী গ্রামের দক্ষিণস্থ ডোকরাপাড়া, যাহারা অনেক বয়সেও উলঙ্গ হইতে সঙ্কোচ বোধ করে না। তাহাদিগকে ডোকরা বলিয়া গালি দেওয়া হয়। তাই ডোকরাপাড়া নামে বোধ হয় যে গ্রামটিতে উলঙ্গ জৈনদের নিবাস ছিল।

** প্রবাসী ১৩২২ আষাঢ়।*

১. গত বৎসর কলিকাতা সম্মিলনীতে ইতিহাস বিভাগে পঠিত, নানা কারণে এ পর্যন্ত ইহা ছাপিতে দেয় নাই। এখন ছাপিতে দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলাম। —লেখক।

২. প্রাচ্যবিদ্যামহার্নব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অশেষ পরিশ্রম করিয়া অধুনা প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন।



বিক্রমপুর : একালে ও সেকালে

রমাপ্রসাদ চন্দ

[যখন আড়িয়াল পল্লীমঙ্গলের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিপদ অলঙ্কৃত করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, তখন মনে করিয়াছিলাম, ব্যাপার বুঝি সাহিত্য-সম্মেলন বা ঐরূপ কিছু, তাই সহসা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবার সাহস করিয়াছিলাম। তারপর আড়িয়াল পল্লীমণ্ডলের প্রথম দশ বৎসরের কার্যবিবরণী পাঠ করিয়া দেখিলাম। এই মণ্ডলের মাণ্ডলিকগণ কেবল গ্রন্থাগার, মূর্তি সংগ্রহ, পুঁথি সংগ্রহ, বিদ্যালয় পরিচালন করিয়া ক্ষান্ত নহেন, বুদ্ধিমান লোকেরা যাহাকে বলে কাজের কাজ এমন অনেক কাজে হস্তক্ষেপ করিয়া ইহারা সফলতা লাভ করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক স্থাপন, চোর-ডাকাতের হাত হইতে গ্রামরক্ষণ, ব্রতী দল ও সেবাসমিতি গঠন, এমন কি পদব্রজে ভূপর্যটনের ব্যবস্থাও আপনারা করিয়াছেন। মণ্ডলাচার্য বা মহামাণ্ডলিক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় চিনি ও তৈল প্রস্তুত করিবার জন্য গ্রামের মধ্যে কল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আপনারা আপনাদের পল্লীর সকল প্রকার উন্নতিসাধনে রত ; আর আমি আমার পল্লী হইতে পলায়িত ; সুতরাং আপনাদের সমাজে অপাংক্তেয়। এইরূপ অপাংক্তেয় ব্যক্তিকে আপনারা কেবল পংক্তিতে নহে, আপনাদের পংক্তির প্রথম আসনে বসাইয়াছেন। এইজন্য যে আপনাদিগকে কি বলিব তাহা আমি বুঝিতে পারি না; কিন্তু দুদিনের জন্য এই পলাতককে যে আপনাদের সৎসঙ্গ লাভের সুযোগ দিয়াছেন, তৎজন্য আপনাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।]

বর্তমান যুগে নগর পল্লীর গৌরব অপহরণ করিয়াছে। কিন্তু একসময় পল্লীই ছিল দেশের সবর্স্ব। আমাদের সভ্যতা পল্লীর সভ্যতা, নগরের অনুপযোগী। নগরের আশ্রয় লইয়া এই সভ্যতা ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। পল্লীর অনেক দোষ ছিল, কিন্তু অনেক গুণও ছিল। এখনকার হিসাবে পল্লী সমাজের প্রধান দোষ জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা। কিন্তু পল্লীতে যেমন জাতিভেদ আছে, তেমনি জাতিভেদ নাই বা ছিল নাও বলা যাইতে পারে। কারণ, পল্লীতে জাতিভেদের সঙ্গে তাহার প্রতিষেধকও ছিল। নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন প্রকাশ্যভাবে নবদ্বীপে সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন, তখন নবদ্বীপের কাজি নিষেধ করিয়াছিলেন। এই নিষেধাজ্ঞার উত্তরে বিরাট একদল কীর্তনিয়া লইয়া গিয়া নিমাই কাজির বাড়ি চড়াও করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্য চরিতামৃতে' (আদিলীলা ১৭শ পরিচ্ছেদ, ১৪৮-১৫০) লিখিয়াছেন, কাজি সাহেব যখন বাড়ির বাহির হইয়া নিমাইকে বলিয়াছিলেন,

গ্রাম সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা।
দেহ সম্বন্ধে হৈতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা।।
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা।
সেই সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।।
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়।।

এখনও আমাদের গ্রাম হইতে গ্রাম সম্বন্ধ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। এখনও গ্রামের

আচরনীয় হিন্দু, অনাচরনীয় হিন্দু এবং মুসলমান পরস্পরকে চাচা, খুড়া, মামু, ভাই, ভগিনি, পিসি, মাসি বলিয়াই সম্বোধন করে, এবং ঝগড়ার সময় পর্যায় লঙ্ঘন করিয়া গালি দেওয়া বিশেষ অপরাধজনক মনে করে। এই গ্রাম সম্বন্ধে গ্রামের বিভিন্ন জাতির লোককে আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। গ্রামের সকল অধিবাসী আদৌ একই বংশোদ্ভব এরূপ সংস্কারও বোধহয় গ্রাম সম্বন্ধের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। জাতিভেদ, লঘুগুরু ভেদ, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভেদ, এইরূপ বিবিধ বৈষম্যের অন্তরালে একপ্রকার সাম্যও একসময় ছিল। প্রভুর পুত্র বয়োঃজ্যেষ্ঠ ভৃত্যকে রীতিমত সম্মান করিত। এবং বয়োঃজ্যেষ্ঠ ভৃত্য কনিষ্ঠ প্রভুপুত্রকে অভিভাবকের মত শাসন করিত। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ভৃত্যতন্ত্র শাসনের চিত্র আছে। এই চিত্র প্রীতিকর নয়। কিন্তু অন্যপ্রকার ভৃত্যতন্ত্র শাসনের সহিতও আমাদের পরিচয় আছে। এইরূপ শাসনের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে, প্রভূ-ভৃত্যে ধনী-নির্ধনে এখন যত ভেদ তখন এত ভেদ ছিল না। প্রকৃত জাতিভেদের উৎপত্তি হইয়াছে এখনকার শহরে। শহরে গ্রাম সম্বন্ধের বন্ধন ভুক্ত জাতিভেদ ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সভ্য-অসভ্য ভেদের সহিত মিলিত হইয়া বিকট আকার ধারণ করিয়াছে। পল্লীগ্রামে অপরিচিত দীন ব্যক্তিকেও "ভাই" বলিয়া সম্বোধন করা হয়। শহরে আসিয়া পাশ্চাত্য ফ্রেটারনিটি বা ভ্রাতৃত্বমন্ত্রে দীক্ষিত আমরা এইরূপ "ভাই" ডাক ভুলিয়া গিয়াছি। দেশের লোকের প্রকৃতি এবং দেশাচারের মর্ম-অনভিজ্ঞ-সমাজ-সংস্কারগণ শহরের সমাজের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতেছেন। শহরের সামাজিক ব্যাধির বিষ ক্রমশ পল্লীতে সংক্রামিত হইতেছে। এমন সময় ভোট-বাটোয়ারার এবং শাসন-পরিষদে আসন-বাটোয়ারার বিতণ্ডা উপস্থিত হওয়ায় আমাদের একসময়ে গ্রাম সম্বন্ধের একতা সূত্রে সম্বন্ধ সমাজ ত্রিখণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য প্রস্তুত। এই দুর্যোগে দেশনায়কগণ এদেশের জনগণের মধ্যে অনৈক্য স্বতঃসিদ্ধ মানিয়া লইয়া ঐক্য স্থাপনের জন্য নানা বিদেশি ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন। ইহারা আপনাকে পর করিয়া লইয়া পরহিতের তৃপ্তি ও খ্যাতি লাভ করিতেছেন। স্বজনকে হরিজনে পরিণত করিয়া হরিভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। আমাদের পল্লীসমাজে এই যে অনৈক্যের এবং অন্তর্দ্রোহের সূত্রপাত হইতেছে, ইহার পরিণাম চিন্তা করিতে গেলে শরীর শিহরিয়া ওঠে।

পল্লীসমাজের অন্তরে যখন এই অন্তর্দ্রোহের সূচনা হইতেছে, তখন আবার বাহির হইতে রাজদ্রোহের তাপ আসিয়া সমাজকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছে। আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের প্রধান প্রতিষ্ঠান নিরস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় যুবক সশস্ত্র বিদ্রোহ অলক্ষিতভাবে রাজপুরুষ হত্যা আরম্ভ করিয়াছিল। নিরস্ত্র বিদ্রোহ আপাতত স্থগিত আছে এবং সশস্ত্র বিদ্রোহেরও বিরাম দেখা যায়। গুপ্ত সশস্ত্র বিদ্রোহের অপকারিতা এবং নিস্ফলতা সম্বন্ধে অনেক বহুদর্শী এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি অখণ্ডনীয় যুক্তি-প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কিন্তু এদেশে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন-ক্ষেত্রে সকল চরমপন্থার অনুপযোগিতা সম্বন্ধে আমার একটি কথা বক্তব্য আছে।

দেশের মুক্তি সকলেরই প্রার্থনীয় এবং এই মুক্তির জন্য দেশবাসী মাত্রেরই সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্তব্য। আমাদের মুক্তির দাবি যে অসঙ্গত নহে এ কথা সরকারও স্বীকার করিয়াছেন; কালে আমাদিগকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সালোক্য মুক্তি (Dominion Status) দান করিবেন এরূপ আশাও দিয়াছেন। সুতরাং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দোষের কথা নহে এবং মুক্তির বিলম্ব ঘটিলে অধৈর্য হওয়া অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু অধৈর্য হইয়া চরমপন্থা অবলম্বন করিলে এ দেশে লাভের অপেক্ষা ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক মনে হয়। রাষ্ট্রীয় মুক্তিসাধনের গুরু ইউরোপিয়গণ আরিস্টোটলের সংজ্ঞা অনুসারে মানুষকে মনে করেন রাষ্ট্রীয় জীব (Political animal) অর্থাৎ তাহারা বিশ্বাস করেন মানুষের সুখ দুঃখ অনেকটা রাষ্ট্রীয় বিধি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। কিন্তু হিন্দু-সাধারণ তাহা মনে করে না। হিন্দু সাধারণ মনে করে, মানুষ

কর্মফলের হাতের ক্রীড়া পুতুল এই কর্মফল ভোগ করিবার জন্য সে পুনঃপুনঃ জন্মে এবং পুনঃপুনঃ মরে। এই পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণের হাত হইতে মুক্তি বা মোক্ষলাভ করা মনুষ্য জীবনের প্রধান-লক্ষ্য। মোক্ষ অবশ্য সহজলভ্য নহে এবং প্রকৃত মুমুক্ষুর সংখ্যা কখনও খুব বেশি হইতে পারে না। গীতিকার বলিয়াছেন—

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।

হাজার হাজার লোকের মধ্যে এক আধজন সিদ্ধির (মোক্ষের) চেষ্টা করে। কিন্তু হিন্দু-সাধারণের মধ্যে যাহারা মোক্ষের জন্য চেষ্টা করিতে অসমর্থ, তাহারাও ঐহিক ব্যাপারে অনেক সময় অর্ধবিরাগী, দৃষ্ট বিষয় অপেক্ষা অদৃষ্ট তাহাদের মনকে অধিক আকর্ষণ করে। এইরূপ সংস্কারসম্পন্ন জনগণকে ঐহিক মুক্তির জন্য চরমপন্থায় পরিচালিত করা অসাধ্য মনে হয়। কথায় বলে, "গুরু মিলে লাখে লাখ। চেলা নামিলে এক।" পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার ফলে এদেশে কতকজন চরমপন্থার নায়ক অভ্যুদিত হইতেছেন এবং হইবেন। কিন্তু কর্ম-জন্মান্তরে বিশ্বাসী জনসাধারণের পক্ষে দীর্ঘকাল তাহাদের মনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়, ততদিন তাহারা ইউরোপীয় জনসাধারণের মত রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে সম্পূর্ণ মাতিতে পারিবেন না। কিন্তু সেদিন বোধহয় অনেকদূরে। এইরূপ অনধিকারী শিষ্য সম্প্রদায় লইয়া চরম পন্থা অবলম্বন করিতে গেলে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের সম্ভাবনাই বেশি। সুতরাং আমাদের দেশের যে সকল যুবক-বৃদ্ধের মনে রাষ্ট্রীয় ভাব জাগরিত হইয়াছে তাহাদিগকে সংযত হইয়া, জনসাধারণ যতটা বেগে তাহাদের সঙ্গে অগ্রসর হইতে পারে ততটা বেগে অগ্রসর হওয়া উচিত। তাহারা যদি ধীর পদে অগ্রসর হইতে সম্মত হন তবে পূর্ণ স্বরাজ না হউক সুরাজ প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন।

কিন্তু ধীর পদে চলিতে হইবে বলিয়া এক মুহূর্তের জন্যও লক্ষ্য বিস্মৃত হওয়া কর্তব্য নহে। লক্ষ্য অবশ্য আমাদের মাতৃভূমির ওপর মুক্তি-মণ্ডপ গঠন। মুক্তি মণ্ডপ গঠনের বিলম্ব হয় হউক; কিন্তু যে-ভূমির ওপর মুক্তিমণ্ডপ গঠিত হইবে সেই ভিত্তিভূমির বাঁটোয়ারা হইতে দেওয়া কর্তব্য নহে। সম্প্রদায়ভেদ বা জাতিভেদ অনুসারে শাসন পরিষদের আসন বাঁটোয়ারা করিলে মুক্তিমণ্ডপের ভিত্তিভূমি খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। যদি আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ এবং 'অনাচরণীয়' হিন্দু ভ্রাতৃগণ হিন্দু ভদ্রলোককে বিশ্বাস করিতে না পারেন, সকল আসনই তাহাদিগকে ছাড়িয়ে দেওয়া উচিত, রাগ করিয়া নয়, অভিমান করিয়া নয়, সানন্দে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। তথাপি বাঁটোয়ারায় সম্মত হওয়া উচিত নহে।

বাংলার যে সকল ভদ্রসন্তান দেশগত প্রাণ তাহাদের কাজের অন্ত নাই। তন্মধ্যে সর্বপ্রধান কাজ, বাঙালির জন্য বাংলার সম্পদ (natural wealth) বা আর্থিক স্বরাজ রক্ষা। শৈশবে আমরা একটি হেঁয়ালি শুনিতাম—

"বলত পৃথিবীটা কার বশ।"

হেঁয়ালির উত্তর ছিল—"পৃথিবী টাকার বশ।"

জনসমাজে সম্পদের সাম্যবাদী কার্ল মার্কস দেখাইয়া দিয়াছেন, মানবের ভাগ্যচক্র অর্থের দ্বারা পরিচালিত। মার্কসের ব্যাখ্যাত এই তত্ত্বের নাম ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা (economic interpretation of history)। টাকা শুধু টাকশালে মুদ্রিত টাকা নহে; যে সকল বস্তুর দ্বারা বা যে সকল উপায়ে টাকা উপার্জন করা যায় তাহাও টাকা। যে দেশের টাকা উপায়ের সকল পথ বিদেশির হাতে সে দেশের মুক্তি অসম্ভব। বাংলার টাকা উপায়ের অধিকাংশ পথই এখন বিদেশি বা ভিন্ন প্রদেশীর হস্তগত। উচ্চ জাতীয় হিন্দুরা ইংরেজের আমলে চাকুরি, ওকালতি, ডাক্তারি প্রভৃতি পেশার মোহে চাষবাস শিল্প বাণিজ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং সঞ্চিত অর্থের দ্বারা জমিদারি খরিদ করিতেছিলেন। ফলে বাংলার সম্পদ—কয়লার খনি, পাটের বাজার, চা-বাগান, কল-কারখানা, দোকান-পসার পরহস্তগত

হইয়াছে। তন্মধ্যে এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা দেশবাসীর জন্য রক্ষা করিতে না পারিলে দেশের কোন প্রকার মুক্তিই সম্ভব হইবে না। ভদ্রলোকের হস্তগত চাকুরি এখন করিবেন মুসলমান এবং অনাচরনীয় হিন্দুগণ। তাহারা যে শীঘ্র চাকুরির এবং শাসন পরিষদের মোহ কাটাইয়া দেশের সম্পদ রক্ষার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার অবসর পাইবেন এরূপ আশা করা যায় না, সুতরাং বাংলার অবশিষ্ট সম্পদ রক্ষার ভার এখন অপর হিন্দুদিগকেই গ্রহণ করিতে হইবে। যদি তাহারা এ ভার বহনে অসমর্থ হয়েন তবে শাসন বিষয়ে অন্যরাজ অপেক্ষা গুরুতর বিপদ, ধনসম্পদের ক্ষেত্রে আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অন্যরাজ হইতে হইবে। শাসনবিধি সংস্কার হঠাৎ আমাদের জন্য নূতন অবস্থার (environment) সৃষ্টি করিয়াছে। এরূপ নূতন অবস্থার সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে হইলে (adaption to environment) অবকাশের দরকার। সে অবকাশ আর পাওয়া যাইবে না। সুতরাং আর সকল কর্ম, আর সকল আন্দোলন, ত্যাগ করিয়া আর্থিক পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভের জন্য আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। নতুবা যে ভদ্রলোকই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তাহা নহে ; তাহাদের প্রতিবেশী মুসলমান এবং অন্য জাতীয় হিন্দুগণও কালে অধঃপাতে যাইবে। আড়িয়াল পল্লীমণ্ডলের মাণ্ডলিকগণ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং শ্রীধর মিল প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিক্রমপুরে আর্থিক মুক্তির প্রকৃত পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। সমস্ত বিক্রমপুরবাসীর বিশেষতঃ স্বদেশগত প্রাণ যুবকগণের, অনন্যকর্মা হইয়া এই আদর্শের অনুকরণ করা কর্তব্য।

বড়ই আনন্দের বিষয়, আপনারা ব্যাঙ্ক এবং মিল করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, দেশবাসীর দৈহিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনের মুক্তির (intellectual emancipation)-এর জন্য পুস্তকালয়, প্রাচীন পুঁথিশালা এবং চিত্রশালাও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত বিক্রমপুরের প্রত্নসম্পদের দিকে প্রথমত আমাদের মনোযোগে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তারপর ঢাকা মিউজিয়ামের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী অনেক রত্ন উদ্ধার করিয়া ঢাকার চিত্রশালায় সঞ্চিত করিয়াছেন এবং তাহার সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি পুস্তকে আরও অনেক রত্নের পরিচয় দিয়াছেন। ইতিহাস বিক্রমপুরের এই দুইজন সুসন্তানকে বিস্মৃত হইবে না। আড়িয়াল চিত্রশালায় সংগৃহীত মূর্তিসমূহকে শ্রীযুক্ত রমেশ বসু মহাশয় দ্বাদশ শতাব্দীর ভাস্কর্য, নিদর্শন বলিয়া মনে করেন, এরূপ অনুমানের কারণ, বিক্রমপুরে প্রাপ্ত কোন কোন মূর্তিতে দ্বাদশ শতাব্দীর অক্ষরের লিপি পাওয়া গিয়াছে। বিক্রমপুরে যেরকম সূর্যমূর্তি পাওয়া যায়, ঠিক এই রকমের একখানি সূর্যমূর্তি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। এই মূর্তির পাদপীঠের লিপির অক্ষরের ওপর সরল মাত্রা নাই; প্রত্যেক লম্ববান রেখার অগ্রভাগ একটু চেপ্টা পেরেকের মাথার মত। এইরূপ লিপি যুক্ত মূর্তিকে দশম শতাব্দীর পরে ফেলা যায় না। সুতরাং আড়িয়াল চিত্রশালার এই সকল মূর্তিকে গৌড়ের পালশিল্পের নিদর্শন ভিন্ন বড় বেশি কিছু বলা কঠিন। আড়িয়াল হইতে সংগৃহীত এবং ঢাকা জীবনবাবুর বাড়ি রক্ষিত লক্ষণ সেনের তৃতীয় বর্ষের লিপিযুক্ত চণ্ডীমূর্তি দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, দ্বাদশ শতাব্দের চতুর্থ পাদ পর্যন্ত এই মূর্তি শিল্প সজীব ছিল।

এ দেশের সকল পদার্থরই গুণদোষ বিচারের বিচারালয় এখন ইউরোপের স্থানান্তরিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দে আমাদের প্রাচীন মূর্তিশিল্প বর্বরতার নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইত। বর্তমান শতাব্দে সেই মত পরিবর্তিত হইয়াছে।

এই মত পরিবর্তনের মূলে পরলোকগত হেবেল সাহেবের ১৯০৮ সালে প্রকাশিত ভারতীয় ভাস্কর্য এবং চিত্র বিষয়ক পুস্তক। হেবেলের দৃষ্টান্ত প্রথম অনুসরণ করেন ডাক্তার কুমারস্বামী। তার পরের ঘটনা সম্বন্ধে স্যর উইলিয়াম রোটেনস্টাইন তাহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—

"Later , when Havell returned to England. he. Coomaraswamy and I went

to hear a lecture by Sir George Birdwood, who while praising her crafts denied fine art to India, the noble figure of Buddha he linked to a noble suet pudding! This so disgusted me that, there and then, I proposed we should found an India Society. A meeting was held at Havells house and with the support of Dr. and Mrs. Herrngham. Thomas Arnold, W. R. Lethaby, Roger Fry, Dr. Thomas, T. W. R. Helton and others the new society was formed." (Men and Memoirs, 1903-1922. Vol. 2.p.231)

১৯১০ সালে ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং অনেকে স্যর জর্জ বার্ডউডের প্রকাশ্য প্রতিবাদও করিয়াছিলেন। তদবধি পাশ্চাত্য রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভারতের প্রাচীন মূর্তির আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।

ধ্যান-ধারণা-সমাধিতে আধ্যাত্মিক ভাবের চরম বিকাশ লক্ষিত হয়। আমাদের দেশের ভাস্কর দেবদেবীর এবং বুদ্ধ জীনের মূর্তিতে ধ্যান-ধারণা এবং সমাধিকে মূর্তিমন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। স্যর উইলিয়ম রোটেনস্টাইন বলিয়াছেন ভারতীয় শিল্পী তিনটি মহাভাবকে রূপদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

(1) The plastic interpretation of samadhi
সমাধির রূপের সৃষ্টি।

(2) জগৎ সৃষ্টিকারিণী মহাশক্তির প্রচণ্ড লীলা যে ঐক্যতান বাদ্যের তালে তালে চলিতেছে তাহার প্রকাশ। নটরাজের মূর্তি।

(3) The interpretation in material form of a moment between movement and tranquillity গতিশীলতার এবং শান্ত অবস্থার সন্ধিক্ষণের রূপ। ইহার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় দাক্ষিণাত্যের শিল্পে।

প্রাচীন ভারতের মূর্তিশিল্পের কি ইহা ছাড়া আর কোন গুণ নাই? রোটেনস্টাইন ভারতীয় মূর্তি শিল্পের যে সকল গুণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা symbolic meaning বা সাংকেতিক অর্থের সামিল। ভারতীয় মূর্তি শিল্প কি কেবল সংকেত মাত্র, ইহার রূপের কি কোন স্বতন্ত্র মহিমা বা সার্থকতা (formal meaning) নাই। মূর্তি শিল্পের এই সকল গুণ রূপকে সার্থকতা দান করে— সজীবতা, নিরেট বস্তুর দর্শন এবং স্পর্শ সুখের অনুভূতি, এবং গুরুত্বের অনুভূতি, দৃষ্টান্তস্বরূপ আড়িয়াল চিত্রশালার কনিষ্কমূর্তির উল্লেখ করিব। মূর্তির মুখ ভাঙিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট মূর্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় পাযাণ যেন স্বতঃস্ফীত হইয়া অশ্বে এবং অশ্বারোহিতে পরিণত হইয়াছে। অশ্বের সুগোল পৃষ্ঠ এবং গ্রীবা দর্শকের স্পর্শসুখ জাগাইয়া দেয়। আরোহীর এবং অশ্বের গুরুত্ব সহজেই অনুভূত হয়। আরোহীর বক্ষঃস্থল বাহু এবং জানুর গড়ন নয়নমনের তৃপ্তিকর। চারিটি বাহুর বিন্যাসে সুসঙ্গতি রহিয়াছে। আড়িয়ল চিত্রশালায় যে কয়খানি মূর্তি আছে তাহার কোনখানিই নির্জীব নহে এবং কোনখানিরই আকার একেবারে অর্থহীন নহে। এই সকল মূর্তি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় বিক্রমপুরবাসী সেকালে আধ্যাত্মিক হিসাবে কত উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহাদের রুচি কত মার্জিত ছিল এবং তাহাদের অনুভূতি কত সূক্ষ্ম ছিল।

খ্রিস্টিয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দের প্রথম ভাগ পর্যন্ত গৌড়মণ্ডলের সার্বভৌম পাল নরপালগণের কোন লিপি এ পর্যন্ত বিক্রমপুরে পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে চন্দ্রবর্মা এবং সেন রাজগণের তাম্রশাসনে বিক্রমপুর স্কন্দাবারে বাসের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে মনে হয়, পালযুগে বিক্রমপুর একটি খণ্ড রাজ্য ছিল। এই খণ্ড রাজ্যের অধিপতিগণ গৌড়াধিপের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। আমার অনুমান হয়, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই খণ্ডরাজ্য কখনও করদ, কখনও স্বাধীনরূপে বর্তমান ছিল এবং সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে আকবরের

সেনাপতি মানসিংহ কর্তৃক কেদার রায়ের পরাজয়ের এবং নিধনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অবসান হয়। কেদার রায়ের পরাজয়ের দিন বিক্রমপুরের জীবনসন্ধ্যা। তারপর হইতে ধ্বংসলীলা চলিতেছে। কীর্তনাশা পদ্মার দক্ষিণ তীরে বিক্রমপুরের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান আছে; এখনও প্রবাদ আছে এই কীর্তিনাশা এক সময় একটি সরু খাল মাত্র ছিল। বিক্রমপুরের জীবন সন্ধ্যায় বিক্রমপুর যে কত বড় ছিল খৃষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দের অঙ্কিত বাংলার দুইখানি মানচিত্রে তাহার পরিচয় যায়।

(১) মেথুজ ভেনডার ব্রুকের ম্যাপ। ভেনডার ব্রুক (Matheus van der Broucke) ১৬৫৮ হইতে ১৬৬৪ সাল পর্যন্ত বাংলা ওলন্দাজ (Dutch) বণিকগণের অধিনায়ক ছিলেন। ভেন ডার ব্রুকের ম্যাপের প্রথম সংস্করণ পাওয়া যায় নাই। ১৭২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বেলেন্টিনের (Valentyn's) ইস্ট ইন্ডিয়া (East India) নামক পুস্তকের পঞ্চম খণ্ডে ব্রুকের ম্যাপের যে সংস্করণ আছে ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে আনিত তাহার ফটোগ্রাফ প্রদর্শিত হইল। ডেনডার ব্রুকের সময় কলিকাতা একটি নগণ্য গ্রাম ছিল। বেলেন্টিনের প্রকাশিত ম্যাপের এই সংস্করণে কলিকাতার স্থানে সুতানুটি কলিকাতা (Calcutta) এবং কলকুল (Calcula) নামক তিনটি গ্রাম দেখা যায়। কলকুল গোবিন্দপুরের স্থলবর্তী। এই তিনটি গ্রাম এবং নিকটবর্তী অন্যান্য গ্রাম বোধহয় ভেনডার ব্রুকের পরে চিহ্নিত হইয়াছে।

(২) খ্রিস্টিয় সপ্তদশ শতাব্দে বাংলা মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ইংরাজ বণিকগণ তখন প্রজা হিসাবে বাংলায় বাণিজ্য করিত, সুতরাং জরিপ করিয়া ম্যাপ তৈরি করিবার তাহাদের অধিকার বা প্রয়োজন ছিল না। নদীপথে নৌকায় মাল চালান করিয়া তাহারা ব্যবসা করিতেন। মালের নৌকার মাঝি মাল্লার সুবিধার জন্য তাহাদের নদনদীর এবং আড়ঙের ম্যাপ আবশ্যক ছিল। এই জন্য ভেনডার ব্রুক ম্যাপ তৈরি করাইয়াছিলেন। ইংরাজ বণিকদেরও মালের নৌকার মাঝির সহায়তার জন্য ম্যাপ সহ নদ-নদীর বিবরণ প্রকাশিত করা আবশ্যক ছিল। এই শ্রেণীর বিবরণীর নাম English Pilot ইংরাজি নদী পথপ্রদর্শক। এইরূপ একখানি পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে।[১]

এই পুস্তকে একখানি ম্যাপ আছে। তাহাতে লেখা আছে যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা ইহা প্রস্তুত করিয়াছে এবং জন থর্নটন কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের একখণ্ড মাত্র লন্ডনের নৌসেনা বিভাগের বড় অফিসে (Admiralty)তে আছে। সেখান হইতে ম্যাপের ফটোগ্রাফ আনা আছে।

এই দুইখানি ম্যাপে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। ভেনডার ব্রুকের ম্যাপে নাম বেশি আছে, সুতরাং এই ম্যাপ হইতে বিক্রমপুর অংশের বিবরণ সংগৃহীত হইল।

বর্তমানে শুষ্কপ্রায় করতোয়া নদীর খাতের পূর্বতীরে ঘোড়াঘাট অবস্থিত। এই মানচিত্রে একটি নদীর পশ্চিমে ঘোড়াঘাট (Gerregaat) চিহ্নিত হইয়াছে। এই নদী অবশ্য করতোয়া এবং ভ্রমক্রমে পশ্চিমপারে ঘোড়াঘাট চিহ্নিত হইয়াছে। এই ম্যাপে করতোয়া প্রবহমান। এখন আর করতোয়ার সেদিন নাই। সেকালে যে জলরাশি করতোয়ার খাত দিয়া প্রবাহিত হইত, এখন তাহা তিস্তার খাতে চলিতেছে।

পশ্চিমে করতোয়া এবং পূর্বে শীতলক্ষ্যা (Lecki) এই দুই নদীর মধ্যভাগে আর কোন নদী চিহ্নিত হয় নাই; অর্থাৎ তখন তিস্তা আত্মপ্রকাশ করে নাই এবং ব্রহ্মপুত্র নদের জলরাশি তখন যমুনার খাত দিয়া বহিতে আরম্ভ করে নাই। ব্রহ্মপুত্রের জলরাশি তখন কতক লক্ষ্যা দিয়া, এবং কতক লক্ষ্যার পূর্বদিকে অবস্থিত ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত দিয়া গিয়া মেঘনায় পতিত হইত। শীতললক্ষ্যার এবং ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমের উত্তরে কাঠারব (Calterabo) এবং কাঠারবর রাজধানী সোনারগাঁও (Sonnergam)। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে, ঈশা খাঁ

কাঠারবর অধিপতি ছিলেন। লক্ষ্যার পশ্চিমদিকে, একটি অল্পপরিসর নদীর তীরে বৃহৎ ঢাকা নগরী। এই নদী বোধহয় বুড়িগঙ্গা। এই নদীর দক্ষিণে যে আর একটি অল্প পরিসর নদী আছে এই ক্ষুদ্র নদী কীর্তিনাশার প্রাচীন খাত। এই নদীর অনেক দক্ষিণ দিয়া পদ্মার বিপুল জলধারা প্রবাহিত হইত। এই নদীর তীর হইতে লক্ষ্যার তীর পর্যন্ত কেদার রায়ের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। আমার অনুমান হয় একসময় এই সমস্ত ভূভাগই বিক্রমপুর নামে পরিচিত ছিল।

ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলরাশি প্রাচীন খাত পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান যমুনার পথে প্রবাহিত হইয়া বিক্রমপুরকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে এবং কেদার রায়ের কীর্তিনাশ করিয়া কীর্তিনাশা নামধারণ করিয়াছে। কীর্তিনাশা কত যে সমৃদ্ধ গ্রাম ধ্বংস করিয়াছে তাহা গণনা করা অসম্ভব। কীর্তিনাশার কীর্তিনাশের এখনও বিরাম নাই। ফলে বিক্রমপুরের উত্তর পারের চিহ্ন থাকিবে কি না সন্দেহ।

সুতরাং বিক্রমপুরবাসী আমাদের সকল দিকেই বিপদ। এই বিপদ হইতে মুক্তির পথও সুপরিচিত। এই পথে চলিবার শক্তির একটি উপাদান ভক্তি বা ভাবের টানেরও অভাব নাই। কিন্তু আমাদের এই ভক্তি শুদ্ধা ভক্তি, জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তি নহে। এই জটিল বিপজ্জাল অতিক্রম করিতে হইলে জ্ঞানমিশ্রিত ব্যক্তি বা ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানের আবশ্যক। এইরূপ জ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি? এইরূপ জ্ঞানলাভের উপায় জানিতে হইলে আড়িয়লের চিত্রশালায় বা অন্যান্য চিত্রশালায় যে সকল উৎকৃষ্ট প্রাচীন দেব-দেবীর এবং বুদ্ধ জিনের প্রতিমা রক্ষিত হইয়াছে এইসকল প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। এই সকল প্রতিমা কেবল সজীব নহে। সবাক; প্রাণপাতিয়া অনুভূতির দ্বারা, ইহাদিগের বাণী শুনিতে পাওয়া যাইবে। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। নারায়ণ অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান। তাহার মুখমণ্ডলে—

কিঞ্চিৎ প্রকাশ স্তিমিতোগ্রহতারৈ
র্ভ্রূ বিক্রিয়ায়াং বিরত প্রসঙ্গৈ।।
নৈ ত্রৈ রবিস্পন্দিত পক্ষ্মমালৈ
লক্ষ্মী কৃতঘ্রাণমধো ময়ূখৈঃ।।

কুমারসম্ভব কাব্যে (৩/৪৭) কালিদাস ধ্যানমগ্ন শিবের চক্ষুর এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। বুদ্ধ ও জিনের মূর্তির ন্যায় বিষ্ণুমূর্তিতেও দেখা যাইবে, ঈষৎ-উন্মীলিত চক্ষুর তারার অধোমুখী রশ্মি নাসাগ্র লক্ষ্য করিতেছে। এইরূপ নয়নভঙ্গী ধ্যানমগ্ন মনের পরিচয় দেয়। সুতরাং পাষাণের বিষ্ণু দর্শককে নীরবে উপদেশ দিতেছেন। আমি যেমন ধ্যান করি, তুমিও তেমন ধ্যান কর।

হরগৌরীর যুগল মূর্তিও সেই কথাই বলিতেছেন। গৌরীকে ক্রোড়ে করিয়া হর ধ্যানমগ্ন, হরের ক্রোড়ে বসিয়া গৌরী ধ্যানমগ্ন। আর্যাবর্তের প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তিতে দেখা যায় ধ্যান কেবল বুদ্ধের বোধির এবং জিনের কেবল জ্ঞানের নিদর্শন নহে, দেবতার দেবত্বের নির্দশন ধ্যান; মানুষের মোক্ষ লাভের উপায়ও ধ্যান। উপনিষদে, বেদান্তে, ভগবদগীতায়, সকল শাস্ত্রে মুমূর্ষুর জন্য ধ্যানই বিহিত হইয়াছে। এখন আমাদের মন ঐহিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়াছে। এই মুক্তির মন্ত্র আসিয়াছে ইউরোপ হইতে। কিন্তু এই মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলেও ধ্যান করিতে হইবে; একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে হইবে। মুক্তিলাভের উপায় কি। মুক্তির বাহ্য-অভ্যন্তরে দুই প্রকার বাধাই আছে। অভ্যন্তরীণ বাধাগুলি অতিক্রম না করিয়া বাহ্য বাধার সম্মুখীন হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। অভ্যন্তরীণ বাধা যে কী তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না; ধ্যান করিলেই ধরা পড়িবে এবং ধ্যান করিলেই তাহা অতিক্রম করিবার উপায় দেখা যাইবে। আমার বিশ্বাস. ধ্যানের পথ পরিত্যাগ করার ফলে হিন্দুদের

অধঃপতন ঘটিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে মানুষের ইতিহাসকে কৃত (সত্য), ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চার যুগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং যুগে যুগে মানুষের শারীরিক মানসিক সকল প্রকার শক্তি ক্রমশ কমিয়ে আসিতেছে। এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে; এবং মানুষের শক্তির ক্রমিক হ্রাস হিসাব করিয়া যুগে যুগে বিভিন্ন আচার বিহিত হইয়াছে। যথা বিষ্ণুপুরাণ (৬/২/১৫-১৮)—

যৎকৃতে দশভির্বষে ত্রেতায়াং হায়নেন যৎ।
দ্বাপরে যচ্চ মাসেন অহারাত্রেণ তৎকলৌ।।
তাপসো ব্রহ্মচর্য্যস্য জপাদশ্চ ফলং দ্বিজঃ।
প্রাপ্নোতি পুরুষ স্তেন কলিঃ সাধ্বিতি ভাষিতম।।
ধ্যায়নকৃতে, যজন যজ্ঞে স্ত্রেতায়াং দ্বাপরাহচ্চয়ন।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত কেশবম।।

কৃতযুগে দশ বৎসর তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, জপ করিলে যে ফল পাওয়া যায়, ত্রেতাযুগে এক বৎসরকাল অনুষ্ঠান করিলে দ্বাপরযুগ একমাস অনুষ্ঠান করিলে, এবং কলিযুগে মাত্র এক দিবারাত্র অনুষ্ঠান করিলে সেই ফল পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত কলিযুগকে সাধু বলা হয়। কৃতযুগে ধ্যান করিয়া ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করিয়া, দ্বাপরে দেবতার অর্চনা করিয়া যে ফল পাওয়া যাইত, কলিযুগে কেশবের সংকীর্তন করিয়া সেই ফল পাওয়া যায়।

পারত্রিক মুক্তির ক্ষেত্রে কলিধর্ম পালন কতটা কার্যকরী তাহা বলা আমাদের অসাধ্য। আমাদের চিত্রশালায় রক্ষিত এবং প্রদর্শনীতে সজ্জিত ধ্যানমগ্ন প্রাচীন প্রতিমা দেখিলে মনে হয় পাল যুগে এবং সেনযুগেও এদেশে কৃতযুগে পালনীয় ধ্যানই মুক্তির সোপান বলিয়া গণ্য হইত। বাংলা দেশে ধ্যানমগ্ন চতুর্ভুজ বিষ্ণুর স্থানে বংশীবাদনরত গোপীনাথের পূজা এবং সংকীর্তন বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে ষোড়শ শতাব্দে চৈতন্যের সময় হইতে। পারত্রিক ব্যাপারে যাহাই হউক, ঐহিক ব্যাপারে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্যগণের সংযম এখন সংগঠন শক্তি কলি উল্টাইয়া দিয়াছে। এখন আর্থিক ব্যাপারে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মুক্তিলাভ করিতে হইলে সত্যযুগের ধর্মধ্যানে ফিরিয়া যাইতে হইবে শুধু সংকীর্তনে চলিবে না। ধ্যান করিলে জ্ঞান লাভ হইবে এবং সেই জ্ঞানের আলো আমাদিগকে মুক্তির প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার মোহে আমরা আমাদের দেশ-কাল-পাত্র ভুলিয়া পাশ্চাত্য মন্ত্রে মাতিয়া, উদ্ভট সংকীর্তন আরম্ভ করি এবং পদে পদে হুচট খাইয়া আহত হইতেছি। এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে ধ্যান করা আবশ্যক।

পরিশিষ্ট ঃ

বলাবাহুল্য কলিকাতায় বসিয়া এই প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলাম। তারপর আড়িয়ালে গিয়া যাহা দেখিলাম এবং শুনিলাম তাহা হৃদয়বিদারক। যাহাদের শহরে গিয়া বাস করিবার সাধ্য আছে তাহারা এখন আর গ্রামে বাস করে না। ভদ্রলোকের মধ্যে যাহারা এখন গ্রামে বাস করে তাহাদের মুখে হাসি নাই, মনে আনন্দ নাই। ভীতির ছায়া অনেকের মুখের মলিনতাকে গাঢ়তর করিয়াছে। গ্রামের উপকণ্ঠে গোরা সৈন্যের শিবির। গ্রামের অনেক যুবকই গৃহে আবদ্ধ। পুলিশ এবং গোরা সৈন্য রাত্রিতে গিয়া ইহাদের দেখিয়া আসে। গোরা সৈন্যেরা কোন অত্যাচার করে না। পথ না চিনায় এবং ভাষা না জানায় সময় সময় ইহারা গ্রামবাসীদিগের অসুবিধার সৃষ্টি করে এবং নিজেরাও অসুবিধা ভোগ করে। আড়িয়ল গোরা সেনার অধিনায়ক যুব ভদ্র এবং অমায়িক। বিক্রমপুরে এইরূপ আটটি গোরা সেনার শিবির আছে। প্রত্যেক শিবিরের অধিনায়ক একজন লেফটেন্যান্ট। চারিটি শিবিরের অধ্যক্ষ একজন কাপ্তান। আশা করিয়াছিলাম গত ১৫ বৎসর যাবৎ রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ঢেউ যেভাবে পল্লীসমাজ আন্দোলিত

করিয়াছে তাহার ফলে পল্লীর ভদ্রলোকেরা অন্তত দলাদলি ভুলিয়া একযোগে কাজ করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, লোকশিক্ষার হিসাবে বিক্রমপুরের এই অংশে আন্দোলন নিস্ফল হইয়াছে। গ্রাম্য দলাদলির ফলেও বোধহয় অনেক হতভাগ্য যুবকের পরকাল নষ্ট হইতেছে। গ্রামবাসীর মধ্যে কেউ কাহাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না; কে যে বন্ধু, কে যে গুপ্তচর (spy) তাহা চেনা যাইতেছে না। কথায় বলে "আঁধার ঘরে সাপ, সুতরাং সকল ঘরেই সাপ।" এইরূপ সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া বিক্রমপুরের পল্লীবাসী দরিদ্র ভদ্রলোকগণ অতি কষ্টে দিনযাপন করিতেছেন।

প্রবাসী—ফাল্গুন ১৩৪১

---

১. The English Pilot, The Third Book, Describing sea ... Original Navigation, collected for the general benefit of our own countrymen. By John Seller Hydrographer to the King.



শ্রীবিক্রমপুর

যতীন্দ্রমোহন রায়

শ্রীবিক্রমপুর কোথায়? হরিবর্মদেব, ভোজবর্মা, শ্রীচন্দ্র, বিজয় সেন, বল্লাল সেন এবং লক্ষণ সেন প্রমুখ বঙ্গ—রাজগণের তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার কোথায়? জ্যোতি বর্মা, বজ্র বর্মা, জাত বর্মা, শ্যামল বর্মা, বিশ্বরূপ সেন, কেশব সেন প্রভৃতি রাজন্যবর্গের স্মৃতি-বিজড়িত বিক্রমপুর কোন স্থানে অবস্থিত এ পর্যন্ত বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই মনে করিত এবং সমুদয় ঐতিহাসিগণই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ঢাকা-বিক্রমপুরেই বঙ্গ-রাজগণের জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ সম্বন্ধে কেহ কখনও অবিশ্বাসের রেখাপাতও করেন নাই। সম্প্রতি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় নদীয়া জেলায় দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের সন্ধান পাইয়া, দেবগ্রামের "দমদমার ভিটাকেই" বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রশাসন-বর্ণিত বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমৎসুক হইয়াছেন[১]। সুতরাং এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে, "বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার" কোন স্থানে অবস্থিত ছিল? উহা কি ভীম-প্রবাহা, ভীষণ তরঙ্গ সঙ্কুল পদ্মা-মেঘনাদের সলিল সিক্ত ঢাকা-বিক্রমপুর প্রদেশের কোনও স্থানে অবস্থিত ছিল, না পূত-সলিলা জাহ্নবীর প্রাচীন প্রবাহের তীরদেশে দেবগ্রাম-বিক্রমপুর মধ্যেই সংস্থাপিত ছিল? এত কাল কি আমরা পুরুষ পরম্পরাক্রমে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়াই ঢাকা-বিক্রমপুরকে বঙ্গাধিপতিগণের লীলানিকেতন বলিয়া বিনা বিচারেই গ্রহণ করিয়াছি, না উহা সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে? যাহা হউক, কথাটা যখন একবার উঠিয়াছে তখন ইহার চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়াই সঙ্গত। "সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক অথবা প্রচলিত মতের বিরোধীই হউক, তাহার জন্য ভাবিব না," বিনা প্রমাণে আমরা কিছুই বিশ্বাস করিব না এবং সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব না।

এখানে বলিয়া রাখি যে, "হিতবাদী" ও "অমৃতবাজার" পত্রিকায় নগেন্দ্রবাবুর এই অভিনব আবিষ্কারের কাহিনী পাঠ করিয়াই আমার দেবগ্রাম-বিক্রমপুর সন্দর্শন করিবার স্পৃহা জন্মে। ফলে গত ২৯ ফাল্গুন তারিখে ঐ স্থানে গমন করিয়া দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্তির নিদর্শনগুলি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি এবং দেবগ্রামের সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক কতিপয় সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ বৃদ্ধের নিকট অনুসন্ধান করিয়া "দমদমার ভিটা" (এই ভিটাকেই নগেন্দ্রবাবু বল্লালের ভিটা বলিয়া প্রমাণ করিতে সমুৎসুক), সাওতার দিঘি, দেবকুণ্ড, কুলইচণ্ডী প্রভৃতির যথাসম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। দেবগ্রামের প্রাচীন অধিবাসীগণ দমদমার ভিটাকে "দেবল রাজার ভিটা" বলিয়াই জানেন। বল্লালের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ থাকার বিষয় তাহারা একেবারেই অনবগত। গত বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের বাচনিক অবগত হইয়াছি যে, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অনুসন্ধানের ফলেও দমদমার ভিটার সহিত বল্লালের কোন সম্বন্ধ নির্ণীত হয় নাই। যাহা হউক, এতৎ সম্পর্কে. হিতবাদী পত্রিকার স্তম্ভে বিস্তর আলোচনা করিয়াছি. সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আমার এই আলোচনায় সম্ভবত কাহারও কাহারও মনোবেদনা উপস্থিত হইয়াছিল. তাহারই ফলে দেবগ্রামনিবাসী কতিপয় প্রৌঢ় ভদ্রলোক হিতবাদী পত্রিকায় আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া আমার ক্ষীণ বুদ্ধিতে যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, আমি অকপটে তাহাই লিপিবদ্ধ

করিয়াছি, পরন্তু কাহারও মনে ক্লেশ দেওয়া আমার অভিপ্রেত নহে।

বর্তমান প্রবন্ধে প্রথমত বর্ধমানের ইতিকথা[২] নামক পুস্তকের স্থান-পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত— "দেবগ্রাম-বিক্রমপুর" শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া, উপসংহারে শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধ্যাবারের অবস্থান নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব।

আলোচ্য পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠার ১৯শ ও ২২শ সংখ্যক চিত্রের পাদদেশে লিখিত "বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত পাথরের একধার" "বল্লালের ভিটা হইতে প্রাপ্ত অপর ধার," সম্ভবত লিপিকর প্রমাদ। কারণ, এই প্রস্তরখণ্ড দেবগ্রামের জনৈক ভদ্রলোকের অন্তঃপুরস্থিত একটি ক্ষুদ্র গৃহের দ্বারদেশে রক্ষিত আছে এবং ইহা তাহার অন্তঃপুরের একটি কূপ খনন করিবার সময়ে ভূগর্ভ মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল।

নগেন্দ্রবাবু, গোপাল ভট্ট এবং আনন্দ ভট্টর এজমালিতে লিখিত এবং পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বল্লাল চরিত্রের—

"বসতিস্ম নৃপঃ শ্রীমান্ পুরা গৌড়ে পুরোত্তমে
কদাচিদ্বা যথাকামং নগরে বিক্রমেপুরে।।
স্বর্ণগ্রামে কদাচিদ্বা প্রাসাদে সুমনোহরে।
রমমানঃ সহ স্ত্রীতির্দ্বিবীব ত্রিদিবেশ্বরঃ।।"

এই শ্লোকদ্বয় অব্যবহার করিয়া লিখিয়াছেন, "চারি শত বর্ষ পূর্বে রচিত আনন্দভট্টের বল্লাল চরিতেও লিখিত আছে, বল্লাল সেন কখনও গৌড়ে, কখনও বিক্রমপুরে এবং কখনও স্বর্ণগ্রাম বা সুবর্ণগ্রামে অবস্থান করিতেন। চারিশত বর্ষের এই প্রবাদ-বাক্য হইতেও মনে হয় যে বরেন্দ্রের মধ্যে গৌড়নগরে রাঢ়দেশের বিক্রমপুরে এবং বঙ্গদেশে সুবর্ণগ্রামে বল্লাল সেন রাজ কার্যোপলক্ষে সময় সময় অবস্থান করিতেন।" বিক্রমপুর যে রাঢ়দেশে অবস্থিত, তাহা বল্লাল-চরিতের এই শ্লোকটি হইতে পাওয়া যায় না।

সাধারণতঃ দুইখানি বল্লাল চরিত দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একখানি হরিশচন্দ্র কবিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত এবং অপরখানি পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত। বলা বাহুল্য যে, উভয় বল্লাল চরিতই গোপাল ভট্ট ও আনন্দভট্ট কর্তৃক লিখিত বলিয়া উল্লিখিত হইলেও এই উভয় পুস্তকের ভাষা ও বিষয়গত পার্থক্য যথেষ্ট রহিয়াছে। বিশেষতঃ এই শ্লোকটি দুইটিও হরিশচন্দ্র কবিরত্ন প্রকাশিত বল্লাল-চরিতে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং কোন্খানিকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিব? আচার্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় কেবলমাত্র একখানি হস্তলিখিত পুঁথি অবলম্বন করিয়াই বল্লাল-চরিত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এই পুঁথিও কাগজে লেখা, তালপাতায় নহে। সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শ পুঁথি যে প্রাচীন নহে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শুনিতে পাওয়া যায় যে, চুঁচুড়ায় এক সুবর্ণবণিকের বাড়িতেও একখানি বল্লালচরিত আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সুবর্ণবণিক জাতির প্রাচীন সামাজিক মর্যাদা এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এক্ষেত্রে এই বইখানি কিন্তু এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়ই রামচরিত গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। রামচরিতের ঐতিহাসিক তথ্যগুলিই যেরূপ সরল, বল্লাল-চরিতের কথাগুলি তদ্রূপ সরল নহে। ইহাতে বৃথা বাগাড়ম্বরেরও বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। রাম চরিতে শত শত ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে এবং সমুদায়গুলিই তাম্রশাসন বা শিলালিপির প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু বল্লালচরিতে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নাই বলিলেই হয়। যাহাও দুই-একটি আছে, তাহার সমর্থনকারী প্রমাণ অদ্যাবধি কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই। বল্লাল সেনের একখানি মাত্র তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং অপরপক্ষ যদি একথা বলেন যে, ভবিষ্যতে আরও খোদিত লিপি আবিষ্কার হইলে বল্লাল চরিতোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সমর্থন বাহির হইবে। তবে তাহাদের কথার উত্তরে বলিতে হয় যে,

সমর্থক প্রমাণ আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত বল্লাল চরিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিও গন্য হওয়া উচিত নয়।

রামচরিত সমসাময়িক ব্যক্তির লেখনি-প্রসূত। পক্ষান্তরে বল্লালচরিত বল্লালের মৃত্যুর প্রায় চারিশত বৎসর পরে রচিত হইয়াছে। অতএব রামচরিতের কথা যেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়, বল্লালচরিতের কথা তেমন করিয়া বিশ্বাস করা উচিত নয়। অতএব বল্লালচরিতের ঐ শ্লোক দুইটির মূল্য অতি অল্প। বিশেষত বল্লালচরিতেও এমন কোন কথা উল্লিখিত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমপুরকে অনায়াসে রাঢ়দেশে স্থাপিত করা চলে।

প্রাচীন বিক্রমপুর নগর যেখানে অবস্থিত ছিল, নগেন্দ্রবাবু কখনও সেখান যান নাই। দমদমার ভিটা হইতে বিক্রমপুরের দূরত্ব প্রায় পাঁচমাইল। এই দমদমার ভিটাতেই বল্লাল সেনের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার, রাজধানী বা প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই নগেন্দ্রবাবু প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহা হইলে তাম্রশাসনাদিতে দেবগ্রামের নাম উল্লিখিত না হইয়া বিক্রমপুরের নাম উল্লিখিত হইয়াছে কেন? বিক্রমপুর হইতে পাঁচমাইল দূরবর্তী দমদমার ভিটায় জয়স্কন্ধাবার বা রাজধানীই বা কেনই প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল? নগেন্দ্রবাবু বলিতে পারেন যে, বিক্রমপুর সহর দমদমার ভিটা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কিন্তু তাহা হইলে বিক্রমপুর ও দমদমার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে কোনও প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন নাই কেন? নগেন্দ্রবাবু হয়ত বলিবেন, রাজধানী ছিল বিক্রমপুরে, কিন্তু রাজবাড়ি ছিল তাহা হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্তী দমদমায়, কিন্তু পুরাকালে রাজপ্রাসাদ নগরের কেন্দ্রস্থানেই নির্মিত হইত। বড়জোর নগর প্রাসাদের মধ্যেই অবস্থিত থাকিত। নগরের বাহিরে পাঁচ মাইল দূরে রাজপ্রাসাদ, ইহা অশ্রুতপূর্ব। সুতরাং যদি দমদমার ভিটা বল্লালের ভিটা বলিয়াই পরিচিত থাকে, তবুও উহা বল্লাল সেনের রাজধানী, রাজপ্রাসাদ বা জয়স্কন্ধাবার হইতে পারে না। দমদমার ভিটা ও সওতার দিঘি হইতে দুইটি জাঙ্গাল রামপাল ও নবদ্বীপ পর্যন্ত যে সম্প্রসারিত ছিল, তাহা সত্য বটে এবং জাঙ্গাল হয়ত বল্লাল সেনেরই নির্মিত। কিন্তু তাহা দ্বারা কি প্রমাণিত হইবে যে, এই জাঙ্গাল যে স্থানে আসিয়াছে, সেই স্থানেই বল্লালের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল?

নগেন্দ্রবাবু "বিক্রম-তিরস্কৃত-সাহসাঙ্ক" পদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া দেবগ্রামপতি বিক্রমরাজকেও বিক্রমাদিত্যের সমতুল্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাজ যে সাহসাঙ্ক নামে পরিচিত হইতেন তাহার প্রমাণ কি? এই সাহসাঙ্ক পদ ব্যবহার করিয়া প্রশস্তিকার হয়ত পুরাকালের বিক্রমাদিত্যকে অথবা চালুক্য বংশের সাহসাঙ্ককে বিজয় সেন অপেক্ষা খাটো করিয়াছেন। দেবগ্রামের বিক্রমরাজ সম্বন্ধীয় এরূপ কোনও প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই যাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে তাহাকে ভারত-প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য অথবা চালুক্যবংশীয় সাহসাঙ্ক নৃপতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সুতরাং এ স্থলে সাহসাঙ্ক পদ দ্বারা দেবগ্রামাধিপতি বিক্রমরাজের কোনও ইঙ্গিত কল্পনা করা যায় না। সাহসাঙ্ক নামে একজন রাজা ছিলেন, তিনিও বিজয় সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি, তাহাকে ছাড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ভূস্বামীকে কেন ধরিতে যাই?

দেবগ্রাম প্রতিবদ্ধ বালবলভিপতি বিক্রমরাজই যে উজানি, মঙ্গলকোট, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রবাদে বিক্রমকেশরী, বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিত, তাহার কোনই প্রমাণই নাই। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর যে বিক্রমরাজ বা বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত, তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? বাংলার বহু স্থানেই তো "জিতের মাঠ" বা "জিতের পুষ্করিণী" রহিয়াছে। সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর যুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হয় যে, তৎসমূহের সহিতই বিক্রমজিৎ নামক এক রাজার বা বহু রাজার স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে।

দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতে যাইয়া নগেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন, "খ্রিস্টীয় ১০ম শতাব্দীতে গুড়বমিশ্রের গরুড় স্তম্ভলিপিতে বর্ণিত হইয়াছে[২] —

"দেবগ্রামভবা ধন্যা দেবীষু তুল্যবলয়ালোকসন্দীপিতরূপা।
দেবকীব তাম্মাদ-গোপালপ্রিয়কারকনসৃত পুরুষোত্তমম।।"

এই শিলালিপির প্রমাণেও আমরা বলিতে পারি যে, খ্রিস্টীয় ১০ম শতাব্দীর পূর্ব হইতেই দেবগ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থানে গৌড়েশ্বর নারায়ণ পালের প্রধানমন্ত্রী গুড়ব মিশ্রের মাতুলালয় ছিল বলিয়া তাহার প্রশস্তিকার সগৌরবে এই দেবগ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন।"

নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত শ্লোক গরুড়স্তম্ভলিপিতে দৃষ্ট হয় না। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় গরুড়স্তম্ভ লিপির একটি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছিল।[৩] অবশেষে অধ্যাপক কিলহর্নের অধ্যবসায়বলে একটি মূলানুগত পাঠ মুদ্রিত হইয়াছিল বটে[৪] কিন্তু তাহাতেও সমুদয় সংশয়ের নিরসন হইয়াছিল না। পরে গৌড়লেখমালায় একটি বিশুদ্ধ পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে।[৫] কিন্তু কী এশিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত পাঠ, কী অধ্যাপক কিলহর্নের পাঠ অথবা কি গৌড়লেখমালা-ধৃত পাঠ, কোথায়ও নগেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত শ্লোকটির সন্ধান পাইলাম না। গরুড়স্তম্ভ লিপির ১৬শ ও ১৭শ শ্লোকে লিখিত আছে —

"দেবগ্রাম-ভবা তস্য পত্নী বব্বার্ভিবাহভবৎ।
অতুল্যাচলয়া লক্ষ্ম্যা সত্যা চাপ্য (নপত্য) য়া।।
সা দেবকীব তস্মাৎ যশোদয়া স্বীকৃতং পতিং লক্ষ্ম্যাঃ।
গোপাল-প্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমং তনয়ং।।"

গৌড়লেখমালা, ৭৪-৭৫ পৃঃ

ইহা হইতে জানা যায় যে গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় এক দেবগ্রামে ছিল। কিন্তু গরুড়স্তম্ভলিপি হইতেও নগেন্দ্রবাবুর দেবগ্রামের প্রাচীনত্ব প্রমাণ হয় না। বঙ্গদেশে দেবগ্রাম নামে বহু গ্রাম রহিয়াছে। দেবগ্রাম নামক কোনও গ্রামের সন্ধান পাইলেই যে তাহাকে গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় বলিয়া পরিচিত করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। আলোচ্য দেবগ্রামেই যে গুড়বমিশ্রের মাতুলালয় ছিল তাহার প্রমাণ কি?

নগেন্দ্রবাবু রামচরিতের টীকায় রামপালের সামন্তচক্রমধ্যে দেবগ্রামাধিপতি বিক্রম রাজের[৬] নাম উল্লিখিত রহিয়াছে দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রামচরিতের দেবগ্রামই নদীয়া জেলায় অবস্থিত বিক্রমপুরের অনতিদূরবর্তী দেবগ্রাম। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসরণ করিয়া তিনি বালবলভীকে বাগড়ি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন[৭]। কিন্তু এই উক্তির সমর্থক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। "রামচরিতে" বালবলভীর বিবরণ দেখিয়া বোধ হয় যে, উক্ত দেশ নদীবহুল ছিল। হরিবর্মদেবের মন্ত্রী ভট্টভবদেবের ওড়িশায় ভুবনেশ্বরে আবিষ্কৃত প্রশস্তিতে বালবলভীর উল্লেখ সর্বপ্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বর প্রশস্তি এবং রামচরিত ব্যতীত ভবদেব ভট্ট বিরচিত "প্রায়শ্চিত্য নিরূপণ" ও "তন্ত্রবার্ত্তিকটীকা" নামক গ্রন্থদ্বয়ে তাহার বালবলভী ভুজঙ্গ উপাধিতে বালবলভীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে বর্তমান সময়ে দেবগ্রাম নামে বহু গ্রাম আছে, সুতরাং দেবগ্রাম বা বালবলভী যে নদীয়া জেলায় অবস্থিত ছিল, একথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না[৮]। যাহা হউক, বালবলভীকে বাগড়ি এবং দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভী-পতি বিক্রয়রাজকে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের যুক্তিই তাহার সিদ্ধান্তের অন্তরায় হইয়া উঠে। কারণ, দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ-বালবলভীপতি বিক্রমরাজ রামপালের সামন্তচক্র মধ্যে অন্যতম ছিলেন। রামপাল ১০৫৫-১০৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে[৯]। সুতরাং ১০৫৫-১০৯৭ খ্রিস্টাব্দ মধ্যেই যে দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের রামপালের সামন্ত বিক্রমরাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১০৫৫-১০৯৭ খ্রিস্টাব্দ মধ্যে যে বিক্রমপুরে রামপালে সামন্ত বিক্রমরাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই বিক্রমপুরে বিজয় সেন, ভোজবর্মা, শ্যামলবর্মা, জাতবর্মা, হরিবর্মা ও শ্রীচন্দ্র প্রভৃতি নবপতির স্থান হইতে পারে না।

বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়ে তাম্রশাসনোক্ত "পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তন্তঃপতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে" এবং কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্র শাসনোল্লিখিত "পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তন্তঃপতি বঙ্গে বিক্রমপুরভাগ প্রদেশে" প্রভৃতি উক্তিতে বিক্রমপুরের অবস্থান স্পষ্টরূপে নির্দেশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যে বিশ্বরূপ ও কেশব সেনের তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর, বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেনের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার, ভোজবর্মা, শ্রীচন্দ্র ও হরিবর্মার শ্রীবিক্রমপুর যে অভিন্ন, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তাম্রশাসনাদিতে এরূপ কোনই কথা পাওয়া যায় না, যাহাতে উপরোক্ত বিভিন্ন রাজবংশের শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারকে পৃথক বলিয়া মনে করিতে হইবে। বিশেষতঃ তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত বঙ্গদেশে (পূর্ববঙ্গে) অবস্থিত, পক্ষান্তরে নগেন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত দেবগ্রাম-বিক্রমপুর বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত এবং উহা বাগড়ি বা রাঢ়প্রদেশ-সংস্থ। সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর বিক্রমপুরকে তাম্রশাসনবর্ণিত বিক্রমপুর বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব।

ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তিতে গৌড় ও বঙ্গ স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রথম ভবদেব গৌড়াধিপতির নিকট হইতে হস্তিনীভট্ট গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ভবদেব ভট্ট (বালবলভীভুজঙ্গ) বঙ্গরাজ হরিবর্মার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। এই ভবদেবের পিতামহ আদিদেবও বঙ্গরাজের রাজ্যলক্ষ্মীর বিশ্রামসচিব মহাপাত্র ও অব্যর্থ সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন।[১০] বঙ্গরাজ হরিবর্মাদেবও শ্রীবিক্রমপুরমনাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতেই তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছেন[১১]। সুতরাং বিক্রমপুরকে বঙ্গ ব্যতীত রাঢ় বা বাগড়ীতে স্থাপন করা যায় না।

রামপালে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র পরে বঙ্গরাজ হইয়াছিলেন বলিয়াই রাজকবি তাহার পিতাকে "হরিকেল-রাজ-ককুদ-চ্ছত্র-স্মিতানাং শ্রিয়াং আধার" রূপে বর্ণনা করিয়াছেন[১২]। এই শ্রীচন্দ্রও শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীচন্দ্রের বিক্রমপুর বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার যে হরিকেল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। শ্রীচন্দ্র রামপালের অনেক পূর্ববর্তী রাজা। তিনি রামপালের প্রপিতামহ প্রথম মহীপালদেবের সমসাময়িক। সুতরাং তাহার তাম্রশাসনে যে বিক্রমপুরের উল্লেখ রহিয়াছে, সেই বিক্রমপুর কখনও রামপালের সমসাময়িক বিক্রমরাজের স্থাপিত হইতে পারে না। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে শ্রীচন্দ্রের বিক্রমপুর হরিকেল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে কথা হইতেছে, এই হরিকেল রাজ্য কোথায়? খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত জৈনাচার্য হেমচন্দ্র সুবিকৃত 'অভিধান-চিন্তামণিতে' হরিকেল বঙ্গের (পূর্ববঙ্গের) প্রাচীন নাম বলিয়া উক্ত হইয়াছে[১৩]। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং হরিকেল রাজ্যে এক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তাহার নির্দেশমতে হরিকেল পূর্বভারতের পূর্বসীমায় অবস্থিত[১৪]। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ যে হরিকেলের অন্তর্গত ছিল, একথা কিছুতেই বলা যায় না। নগেন্দ্রবাবুর বিক্রমপুর গঙ্গার পুরাতন খাড়ির পশ্চিম দিকে অবস্থিত, সুতরাং এই বিক্রমপুর হরিকেলীয় বা বঙ্গে অবস্থিত হইতে পারে না। সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত গ্রন্থে লিখিত আছে, "পূর্বদিকের অধিপতি বর্মরাজা নিজের পরিত্রাণের জন্য উৎকৃষ্ট হস্তি ও স্বীয় রথ প্রদান করিয়া রামপালের আরাধনা করিয়াছিলেন"[১৫]। বেলাব তাম্রশাসনের প্রতিপাদয়িতা ভোজবর্মাকেই এই প্রাতঃদশীয় বর্মরাজা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। এই ভোজবর্মাও শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতেই ভূমি দান করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, সন্ধ্যাকর নন্দীর বাসভূমি অথবা রামপাল বা মদনপালদেবের রাজধানী রামাবতী নগরী হইতে ভোজবর্মার রাজ্য বা রাজধানী পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল বলিয়াই রাজকবি ভোজবর্মাকে প্রাগ্দেশীয় বর্মরাজা বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। সন্ধ্যাকর নন্দী আত্মপরিচয় প্রদানকালে বলিয়াছেন যে, তাহার কুলস্থান পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের সহিত প্রতিবদ্ধ ছিল; তাহা পুণ্যভু ও বৃহদ্বটু বলিয়া পরিচিত ছিল এবং সমগ্র বসুধামমণ্ডলের শীর্ষস্থানে অবস্থিত বরেন্দ্রীমণ্ডলের তাহাই চূড়ামণি ছিল[১৬]। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ডে

করতোয়া-মাহাত্ম্যের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর ও বগুড়া জেলান্তর্গত মহাস্থানগড় অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন[১৭]। দেবগ্রাম-বিক্রমপুর এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের দক্ষিণদিকে এবং ঢাকা বিক্রমপুর ইহার পূর্বদিকে অবস্থিত। সুতরাং ঢাকা-বিক্রমপুরকেই প্রাগেদশীয় ভূপতি ভোজবর্মার জয়স্কন্ধাবার বলিয়া নির্দেশিত করিতে হয়। রামপাল এবং তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের রাজ্যকালে রামাবতী যে গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিল, তাহা রামচরিত এবং মদনপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়। রামাবতীর অবস্থান লইয়া মতভেদ রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। নগেন্দ্রবাবু বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের নিকট রামপুরা নামক স্থানে রামাবতীর অবস্থান নির্দেশ করিয়াছেন[১৮]। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে রামাবতী সরকার জনতাবাদ বা গৌড়ের সীমা মধ্যে অবস্থিত[১৯]। এই রামাবতীর অবস্থান গৌড়মণ্ডলেই হউক বা বগুড়া জেলায়ই হউক, দেবগ্রাম বিক্রমপুর এই উভয়স্থানেরই দক্ষিণদিকে এবং ঢাকা বিক্রমপুর পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। সুতরাং শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার যে ঢাকা-বিক্রমপুরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

তাম্রশাসন ও সমসাময়িক গ্রন্থাদির আলোচনা করিলে শ্রীবিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারকে ঢাকা-বিক্রমপুরেরই নিঃসন্দেহে স্থাপিত করিতে হইবে। বঙ্গদেশে বিক্রমপুর নামীয় বহু গ্রাম রহিয়াছে সুতরাং কোনও স্থানের নাম বিক্রমপুর অথবা তাহার পার্শ্ববর্তী কোনও স্থানে প্রাচীন কীর্তির কিছু নির্দশন পাওয়া গেলেই যে উহাকে বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইবে, তাহার কোনই অর্থ নাই। মনে করিলে যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যাহা বলা যায় তাহার যথার্থ প্রমাণ করিবার উপায় আছে কি না, তাহা পূর্বে ভাবিয়া দেখিলেই ভাল হয়।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—১-১৩২২ সন

বিক্রমপুর (প্রতিবাদের উত্তর) ঃ

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে, সেন রাজধানী বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারা পূর্ববঙ্গেরই কোন স্থানে ; আমার নব প্রকাশিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-রাজন্য কাণ্ডে আমার সেই পূর্ব বিশ্বাসই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অনন্তর বল্লাল সেনের সীতাহাটী-তাম্রশাসন ও ধোয়ী ফকির পবনদূত পাঠ করিয়া আমার সেই বিশ্বাসে আঘাত লাগে, তৎপরে নদীয়া জেলাস্থ দেবগ্রাম-বিক্রমপুর পরিদর্শন করিয়া আমার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়।

আমি চিরদিন সত্যাবিষ্কারের ভিখারী। নূতন নূতন তত্ত্বাবিষ্কারের ফলে আমাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিবর্তন করিতে হইবে। ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া রাখিলে চলিবে না। বর্ধমানের পুস্তিকার সময়াভাবে বিস্তৃত আলোচনা করিবার সুযোগ হয় নাই। পরিষৎ পত্রিকায় বর্তমান সংখ্যায় কোন কোন অংশ সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইলেও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার অবকাশ পাই নাই। বিষয়টি নিতান্ত গুরুতর মনে করিয়া সকল দিক্ আলোচনা করিয়া একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিতেছি। সুতরাং আমার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পর যতীন্দ্রবাবুর প্রতিবাদ শোভনীয় হইত। তিনি যে যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, আমার প্রবন্ধে বিশদভাবে সেই সমুদয়ের আলোচনা করিয়াছি। তবে তিনি যখন আমার প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বেই প্রতিবাদ করিয়াছেন। তখন কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে অতি সংক্ষেপে তাহার প্রতিবাদের উত্তর দেওয়া কর্তব্য বোধ করিতেছি।

(১) মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় আনন্দভট্টের বল্লালচরিত—একখানি পুঁথি দেখিয়া সম্পাদন করেন না। দুইখানি প্রাচীন পুঁথির মধ্যে একখানি আরঙ্গজেব বাদশাহের মৃত্যুবর্ষে ও অপরখানি ১১৯৮ বঙ্গাব্দের লিপি। দুইখানি পুঁথিই বিভিন্ন জেলা হইতে পাওয়া গিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখবন্ধ পাঠ করিলেই জানিতে পারিতেন। বল্লালচরিত রচয়িতা আনন্দ ভট্টের পূর্বপুরুষ সুবর্ণগ্রামের নিকটস্থ কাসার গ্রামের অধিবাসী। তাহার বল্লাল চরিতের শ্লোক হইতে

বেশ বুঝা যায় যে, বল্লাল সেনের অপর রাজধানী বিক্রমপুর পূর্ববঙ্গে নহে, তাহার পূর্ববঙ্গের রাজধানী সুবর্ণগ্রাম।

(২) দেবগ্রাম-বিক্রমপুরের অবস্থান দেখিলে ইহা কতকাংশ বঙ্গের এবং কতকাংশ রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল বলিয়া মনে হয়, প্রাচীন নবদ্বীপ সম্বন্ধেও এইরূপ।

(৩) বর্তমান দেবগ্রাম-বিক্রমপুর বাগড়ীর মধ্যে। বলা বাহুল্য, গঙ্গা ও পদ্মার বদ্বীপাংশই বাগড়ী নামে পরিচিত। ইহা প্রাচীন বঙ্গেরই অন্তর্গত। রাঢ় বা বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত নহে।

(৪) দেবগ্রাম-বিক্রমপুরকে আমি কোথাও বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বলি নাই। প্রাচীন তাম্রশাসন আলোচনা করিলে দেখা যায়, গঙ্গার পশ্চিমাঞ্চল হইতে বর্ধমানভুক্তি এবং পূর্বকূল হইতে পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ধরা হইয়াছে। এ অবস্থায় গঙ্গার পূর্বকূলে অবস্থিত দেবগ্রাম-বিক্রমপুর পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অন্তর্গত হইতেছে।

(৫) দেবগ্রাম সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা পরিষৎ পত্রিকায় ৩৪-৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

(৬) দেবগ্রামের দক্ষিণে ও বিক্রমপুরের উত্তরে দমদমা নামক স্থানে, যেখানে সাধারণ বল্লালের ভিটা ও বল্লালের ভিটা ও বল্লালের দিঘি দেখাইয়া থাকে। সেই স্থান হইতেই যখন পূর্ব-দক্ষিণমুখে ও পশ্চিম-দক্ষিণমুখে বল্লাল সেনের দুইটি জাঙ্গাল বাহির হইয়া গিয়াছে এবং এখানে সকলেই যখন বল্লালের বৃহৎ রাজবাটীর উল্লেখ করিয়া থাকেন, তখন এই স্থানে যে বল্লাল সেনের একটি রাজধানী ছিল, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এই বল্লালের ভিটার তিন মাইল দক্ষিণে বর্তমান বিক্রমপুর হাট। প্রাচীন গৌড় ও সুবর্ণগ্রাম রাজধানীর আয়তন ৪/৫ ক্রোশ বা ৮/১০ মাইলের অধিক ছিল, প্রাচীন বিক্রমপুরেও সেইরূপ ৮/১০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া থাকাই সম্ভব। এরূপ স্থলে বল্লালের ভিটা প্রাচীন বিক্রমপরের মধ্যে ছিল, সন্দেহ নাই।

(৭) দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধবালবলভীপতি বিক্রমরাজ রামপালের রাজত্বকালের প্রথমাংশে রাজা ছিলেন। তৎপরে তাহার অধিকার যথাক্রমে বর্ম ও সেনবংশের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বর্ম, সেন ও চন্দ্রবংশের তাম্রলেখবর্ণিত বিক্রমপুর অভিন্ন। শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারকারী রাধাগোবিন্দবাবু এই তাম্রশাসনের লিপিকাল আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন "বর্ম বংশের পর শ্রীচন্দের অভ্যুদয়"। যেমন কামরূপপতি ভাস্করবর্মা অল্পকালের জন্য কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়া কর্ণসুবর্ণ হইতে তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ চন্দ্রদ্বীপপতি শ্রীচন্দ্র অল্প দিনের জন্য হরিকেল অধিকার করিয়া বিক্রমপুর হইতে শাসন দান করিয়াছিলেন। ই চিং খ্রিস্টিয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে চন্দ্রদ্বীপের রাজসভায় এক বর্ষকাল অবস্থান করেন। তাহার বর্ণনায় পাইতেছি যে, হরিকেল চন্দ্রদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত। এ অবস্থায় তৎকালে হরিকেল বা প্রাচীন বঙ্গ পূর্ববঙ্গের মধ্যে গণ্য ছিল না। বরাহমিহির খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গ ও সমতট দুইটি ভিন্ন জনপদ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। যতীন্দ্রবাবুও তাহার ঢাকার ইতিহাসে লিখিয়াছেন ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশে ও ফরিদপুর জেলার পূর্বাংশ লইয়াই সমতট (১৭ পৃঃ)। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন অনুসারে ঢাকা জেলার অধিকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ বিক্রমপুর নামে অভিহিত (ঢাকার ইতিহাস, ১৬ পৃঃ)। আবার তিনিই প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঢাকা জেলার উত্তরাংশ বা অধিকাংশ প্রাগজ্যোতিষ বা কামরূপের অন্তর্গত ছিল (৫ পৃঃ)। বঙ্গাধিপ বর্ম ও সেনবংশের অধিকারভুক্ত হইলে পর ঢাকা জেলা বা সমতটপ্রদেশ পূর্ববঙ্গ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। সুতরাং ইচিং, বরাহমিহির ও যতীন্দ্রবাবুর গ্রন্থ হইতেই বুঝিতেছি যে, এখন যাহাকে পূর্ববঙ্গ বলে, তাহা প্রাচীন সমতট বা প্রাগ্জ্যোতিষের অন্তর্গত ছিল, হরিকেল বা প্রাচীন বঙ্গ উহা হইতে ভিন্ন। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে রাঢ় ও বরেন্দ্র একত্র গৌড় নামে এবং বঙ্গ স্বতন্ত্র উক্ত হইয়াছে। এই তন্ত্র হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, গঙ্গার পূর্বে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাংশে প্রাচীন বঙ্গদেশ। বর্তমান নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ঢাকার পূর্ব দক্ষিণাংশ এবং

ফরিদপুরের উত্তর পূর্বাংশ এই বঙ্গের অন্তর্গত। তাই বহুকাল হইতে নদীয়া, যশোহর, খুলনা ও ফরিদপুরের অধিবাসী রাঢ়বাসীর নিকট "বাঙ্গাল" বলিয়া পরিচিত। দেবগ্রাম বিক্রমপুর বর্তমান নদীয়া জেলার অন্তর্গত। সুতরাং প্রাচীনবঙ্গের মধ্যেই হইতেছে। এ অবস্থায় নদীয়া জেলাস্থ বল্লাল সেনের প্রবাদবিজড়িত বিক্রমপুরকে বর্ম ও সেনবংশের বিক্রমপুর বলিয়া স্বীকার করিতে আপত্তি কি? এই বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া বল্লাল সেনের জাঙ্গাল অদ্যাপি বিদ্যমান।

বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালের প্রথমাংশে যে সকল তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবারেরই উল্লেখ আছে, কিন্তু লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষাংশে প্রদত্ত তাম্রশাসনে ধার্যগ্রাম এবং তৎপুত্র কেশব ও বিশ্বরূপের উভয়ের তাম্রশাসনেই 'বিক্রমপুর ভাগ' প্রদেশে ভূমিদানের কথা আছে। সকলেই জানেন মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের নদীয়া বিজয়ের পর সেনবংশ পূর্ববঙ্গে গিয়াই আধিপত্য করিতে থাকেন। লক্ষ্মণ সেন শেষাংশে এবং কেশব ও বিশ্বরূপ প্রথম হইতেই পূর্ববঙ্গে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান বিক্রমপুর পরগনার মধ্যে বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার থাকিলে শেষোক্ত সেনরাজগণের তাম্রশাসনে কখনই বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবারের পরিবর্তে ফল্গুগ্রাম-জয়স্কন্ধাবারের উল্লেখ থাকিত না। বিশেষত ঢাকার ইতিহাস লেখক বিক্রমপুর পরগণার মধ্যে বিক্রমপুর নামে কোন শহর বা গ্রামের অস্তিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

বিজয় সেন ও বল্লাল সেনের তাম্রশাসন এবং লক্ষ্মণ সেনের সভাস্থ ধোয়ী কবির "পবনদূত" পাঠে মনে হইবে যে, রাঢ় দেশেই সেনবংশের পূর্বলীলাস্থলী; গঙ্গাতীরেই বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল। এ দেশে ব্রাহ্মণ কুলীনদিগের বিশ্বাস যে, বল্লাল সেন তাহার বিক্রমপুর রাজধানী হইতেই কুলবিধি প্রচার করেন, তাহার কুলব্যবস্থায় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্মানিত হইয়াছিলেন। যদি পূর্ববঙ্গ হইতে বল্লাল কুল-ব্যবস্থা প্রচার করিতেন, তাহা হইলে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রের ন্যায় বঙ্গজ ব্রাহ্মণসমাজেও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর সৃষ্টি হইত। বলা বাহুল্য যে, পাটুলি, বেগে, কাঁটাদীয়া, সাগরদীয়া প্রভৃতি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রধাম সমাজস্থানগুলি আলোচ্য বিক্রমপুরের নিকট। ঐ সকল সমাজস্থান কুলব্যবস্থার কালে সম্ভবত নদীয়াজেলাস্থ এই বিক্রমপুরসমাজের অন্তর্গত ছিল। মুসলমান-অধিকারের পর এ অঞ্চল হইতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ পূর্ববঙ্গের যে অংশে গিয়া বাস করেন, তাহাই পরে 'বিক্রমপুরভাগ' বা বিক্রমপুর পরগনা নামে খ্যাত হইয়া থাকিবে। কেবল ঢাকা জেলা বলিয়া নহে, এখানকার কতকগুলি লোক সুদুর কাছাড়ে গিয়াও বাস করেন, সেখানেও তাহাদের বাস হইতে একটি স্বতন্ত্র বিক্রমপুর পরগণার সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা হউক, আজও পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর পরগণার রাঢ়ীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা পাটুলি প্রভৃতি উক্ত সমাজস্থানের নামেই স্ব স্ব পূর্ব পরিচয় দিয়া থাকেন এবং "আদৌ রাঢ়ে ততো বঙ্গে।" বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। দেবগ্রামবাসী বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে প্রবাদ শুনিয়াছিলাম যে, বল্লাল সেন যখন বিক্রমপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপে চলিয়া যান। সেইসময় পুত্রবধূর বিরহব্যঞ্জক শ্লোক পাঠ করিয়া সেই রাত্রি মধ্যে লক্ষ্মণ সেনকে আনিবার জন্য রাজা বল্লাল সেন কৈবর্তদিগকে আদেশ করেন। কৈবর্তেরা সেই রাত্রি মধ্যে লক্ষ্মণসেনকে বিক্রমপুর রাজধানীতে আনিয়া দিয়াছিল। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বল্লালসেন কৈবর্তদিগের জলচল করিয়া লয়েন। তদবধি গঙ্গাতীরস্থ কৈবর্তগণ জলাচরণীয় হইয়াছে; কিন্তু পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর পরগণায় আজও কৈবর্তগণের জল চলে নাই। এ অবস্থায় লক্ষ্মণসেন-ঘটিত প্রবাদের মূলে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে, তাহা যে এই নদীয়া জেলা বিক্রমপুরেই হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

(৮) রামচরিতের প্রাগ্‌দেশীয় বর্মনৃপতিকে বঙ্গাধিপ ভোজবর্মা বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না। পৌণ্ড্রবর্ধন বা রামাবতীর পূর্বে তৎকালে প্রাগজ্যোতিম রাজাই ছিল, সমতট বা বঙ্গ ছিল না। আমার কথার প্রতিবাদ সূত্রে যতীন্দ্রবাবু যাহাই বলুন, তিনি তাহার ঢাকার ইতিহাসে নিজেই

স্বীকার করিয়া গিয়াছেন (ঢা. ই. ৫ পৃঃ)। বলা বাহুল্য, প্রাগজ্যোতিষের বর্মনৃপতিই রামচরিতকারের লক্ষ্য। সুতরাং ঢাকা-বিক্রমপুরের মধ্যে বিক্রমপুর-জয়স্কন্ধাবার ছিল তাহার উপযুক্ত প্রমাণাভাব। আমি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি, এখানে স্থানাভাবে বিস্তৃত আলোচনায় ক্ষান্ত রহিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

* যতীন্দ্রবাবুর যুক্তিগুলির সঙ্গে তুলনা করিয়া আমার যুক্তিগুলি পড়িলে পত্রিকার পাঠকগণের বিষয়টি বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া সংক্ষেপে কেবলমাত্র এই কয়টি কথা প্রকাশ করিলাম। —লেখক

১. অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব কর্তৃক সম্পাদিত "বর্ধমানের ইতিকথা" নামক পুস্তকে বসুজ মহাশয়ের প্রমাণাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।
২. বর্ধমানের ইতিকথা ৫৫ পৃষ্ঠা
৩. J. A. S. B. 1874. Pages 356-358
৪. Epigraphia Indica Vol. 11 Pages 161-164.
৫. গৌড়লেখমালা - ৭১-৭৬.
৬. দেবগ্রাম প্রতি বদ্ধবসুধাচক্রবাল বালবলভী তরঙ্গবহুল গল হস্ত প্রশস্তহস্ত বিক্রমসো বিক্রমরাজঃ"। রামচরিত, ২য় পরিচ্ছেদ, যে শ্লোক টীকা।
৭. Memories of the Asiatic Society of Bengal vol. III p. 14 বর্ধমানেব ইতিকথা - ৫৫ পৃষ্ঠা। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড) - ১৯৮ পৃষ্ঠা।
৮. বাঙ্গালার ইতিহাস - শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২৬০ পৃষ্ঠা।
৯. নগেন্দ্রবাবুর মতে রামপাল ১০৫৭-১০৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু চণ্ডীমৌয়ের শিলালিপি তদীয় ৪২ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-রাজন্যাকাণ্ড ২১৬ পৃঃ ও বাঙ্গালার ইতিহাস - শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, ২৬৯ পৃঃ।
১০. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (বাহ্মণ্যকাণ্ড, ১মাংশ) ৩০৪-৩১২ পৃঃ ।
১১. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ্যকাণ্ড, ২য়াংশ) ২১৫ পৃঃ।
১২. সাহিত্য, ২৪শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ৪০০-৪১০ পৃঃ।
১৩. "বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়া"— ইতি হেমচন্দ্র।
১৪. J. Takakusu's I-Tsing p. XLVI এবং বাঙ্গালার ইতিহাস — শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় - প্রণীত পৃঃ ২৪৭
১৫. "স্বপরিত্রাণ নিমিত্তং পত্যায়ং প্রাগ্দিশীয়েনন
বববারণেন চ নিজম্যন্দনদানেন বর্মনারাধে" — রামচরিত, ৩/৪৪
১৬. "বসুধা শীরোচবেন্দ্রীমণ্ডল চূড়ামণিঃ কুলস্থানং
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর প্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ॥—রামচরিত. কবি প্রকাশিত ১
১৭. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড) ২০৫ পৃঃ
১৮. বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্য কাণ্ড) ২০৯ পৃঃ
১৯. বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ২৭২ পৃঃ।

বিক্রমপুর নামের পুরাতত্ত্ব ও তাহাতে ইতিহাসের সূত্র



শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী

ঢাকা জিলা পূর্ববঙ্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। বিক্রমপুর আবার ঢাকার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও উন্নত স্থান। কেবল ঢাকা কেন, বিক্রমপুর সমগ্র বঙ্গদেশ ও সমগ্র ভারতবর্ষেও বিশেষ প্রখ্যাত। সুতরাং বিক্রমপুরের সুশিক্ষিত সন্তানেরা থাকিতে বিক্রমপুরের পুরাতত্ত্বের আলোচনায় হস্তক্ষেপ আমার মত ব্যক্তির পক্ষে যে অনাধিকার-চর্চা বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা আমি বিশেষরূপেই অনুভব করিতে পারিতেছি। বস্তুত বিক্রমপুরের দুই জন কৃতী সন্তানই 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' ও 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণয়ন করিয়া ঢাকা ও বিক্রমপুরের পুরাবৃত্ত উদ্‌ঘাটনে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে বিক্রমপুরের নামতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাহারা অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট পরিচয়ই দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই নাম-তত্ত্ব-দ্বারা কোন ঐতিহাসিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই, সুতরাং বিক্রমপুর ঢাকার ইতিহাসের ইহা একটি অসম্বন্ধ প্রসঙ্গরূপেই বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু বিক্রমপুরের নামতত্ত্ব বিক্রমপুর ও ঢাকার মূল ইতিহাসের সহিত অসংলগ্ন না থাকিয়া বরঞ্চ সুসংলগ্ন থাকাই উচিত। ঐতিহাসিক সূত্রযুক্ত এরূপ কোন নাম-তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, এই ভরসাতেই আমি এই আলোচনাটি সাধারণের গোচরীভূত করিতে সাহস করিতেছি।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় "ঢাকার ইতিহাস" প্রণয়ন করিয়াছেন। এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "বিক্রমপুরের ইতিহাস" প্রণয়ন করিয়াছেন। উভয়ই বিক্রমপুরের নাম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং উভয়েই উল্লেখ করিয়াছেন যে বিক্রমপুরে এরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে বিক্রমাদিত্য রাজার নামানুসারেই বিক্রমপুর নাম হইয়াছে। কিন্তু তাহারা এই প্রবাদটি অগ্রাহ্য করিয়া সেন বংশের আদি পুরুষ "বিক্রম সেন" নামক রাজার হইতে বিক্রমপুরের নামকরণ হইয়াছে। ইহাই বিক্রমপুর নামের প্রকৃত তথ্য বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। বিক্রম সেনকে বিক্রমপুরের স্থাপয়িতা বলিয়া প্রমাণিত করিতে হইলে তাহার সহিত বিক্রমপুরের কোন ঐতিহাসিক সংস্রব দর্শন করা একান্তই আবশ্যক। কিন্তু যতীন্দ্রবাবু বা যোগেন্দ্রবাবু এরূপ কোন ঐতিহাসিক সংস্রবের প্রমাণ যে দিতে পারিয়াছেন, তাহা আমাদের মনে হয় না। যোগেন্দ্রবাবু বিক্রম সেনকে বঙ্গের সেন রাজগণেরই পূর্বপুরুষ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু সেন রাজদিগের বংশতালিকায় তাহার নাম দৃষ্ট হয় না। যতীন্দ্রবাবু গৌড়ের রাজারূপে এক বিক্রম সেনের উল্লেখ পাওয়া যায় বলিয়া লিখিয়াছেন—কিন্তু গৌড় রাজাদিগের মধ্যে তিনি সেই বিক্রমের স্থান বা সময় নির্দেশ করেন নাই বা সেন রাজগণের সহিতও তাহার সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। বিক্রম সেন যদি বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠাতাই হইবেন তবে তাহার অসাধারণ বল বিক্রম বা কীর্তি-কলাপের পরিচায়ক আখ্যা অবশ্যই প্রচলিত থাকিত।

তৎপরিবর্তে কেবলমাত্র :

> "তদ্বংশে বিক্রম সেনোজাতঃ পরমধার্ম্মিকঃ
> কৃতবান্ বিক্রমপুরীং স্বনাম্নাভিহিতং সুধীঃ।।"

এইরূপ সামান্য একটি উক্তিতে তাহার পরিচয় অতি দুর্বল প্রমাণই বলিতে হইবে। বিশেষতঃ যদি তিনি সেনদিগেরই এক বংশীয় হইবেন বা তাহাদের পূর্বপুরুষই হইবেন—তবে সেন বংশীয়দিগের অশেষ কীর্তি-কাহিনীর বর্ণনা উপলক্ষে সর্বাগ্রেই তদীয় গুণ-গরিমা সগৌরবে

কীর্তিত হইত। কিন্তু একমাত্র স্থল ব্যতীত আর কোথায়ও যে তাহার কথিত কীর্তির কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না অথবা সমসাময়িক কি পরবর্তী কোন ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে কিংবা কিংবদন্তীতেও উহার অনুবর্তন বা সমর্থন দেখা যায় না—তাহাতে বিক্রম সেনের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ জন্মে তাহা নহে, প্রত্যুত সেন বংশ ও বিক্রমপুরের সহিত তাহার যোগ সম্পূর্ণরূপে আরোপিত বলিয়া দৃঢ় প্রতীতিই জন্মে।

বিক্রমাদিত্য রাজার নাম হইতে বিক্রমপুর নাম হইয়াছে—এই জনশ্রুতিকে আমরা সহজে উপেক্ষা করিতে চাই না ; কারণ জনশ্রুতি একেবারে উপেক্ষণীয় হইলে "নহ্যমূলা জনশ্রুতি" এরূপ বাক্যের উৎপত্তি কখনও হইত না। কিন্তু জনশ্রুতি অমূলক না হইলেও তাহা নির্বিকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য রাজার সহিত জনশ্রুতিটি সংযোজিত হওয়াই ইহার গ্রহণ সম্বন্ধে আপত্তির কারণ হইয়াছে। কারণ উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য কখনও যে এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন এরূপ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ইহা হইতে বিক্রমপুরের সহিত "উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের" যোগ ভ্রমাত্মক বলিয়ায় বুঝিতে পারা যাইতেছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য বিক্রমাদিত্যের যোগও যে ভ্রমাত্মক তাহা বলা যাইতে পারে না।

পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের ন্যায়ই প্রসিদ্ধ চালুক্য বিক্রমাদিত্যের সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। আমরা চালুক্য বিক্রমাদিত্যকেই বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রমাণ করিতে চাই। তিনি চালুক্যরাজ আদুর মল্ল বা ত্রৈলক্য মল্লের পুত্র ছিলেন। শৈশবেই তাহার ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের লক্ষণ সকল সূচিত হয় বিশ্বকোষে এ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, "এই পুত্রের অসাধারণ রূপলাবণ্য ও দেহ-জ্যোতিং দেখিয়া নৃপতি তাহার নাম রাখিলেন বিক্রমাদিত্য"। বিশ্বকোষকার তাহার আরও কয়েকটি নামের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন তাহার আরও কতকগুলি নাম পাওয়া যায়, যথা—বিক্রমণক ও বিক্রমণকদেব, বিক্রমলাঞ্ছন, বিক্রমাদিত্য দেব, বিক্রমার্ক, ত্রিভুবনমল্ল, কলিবিক্রম ও পরমাভিরাম।

সিংহাসন প্রাপ্তির পূর্বেই তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া অতুলনীয় বিক্রমের খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বিশ্বকোষে তদীয় বিজয় এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—"বিক্রম পিতার আদেশক্রমে দেশজয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ চোল রাজগণকে পরাস্ত করেন, কাঞ্চী লুঠ করেন ও মালব-রাজকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি সুদূর গৌড় ও কামরূপ পর্যন্ত সেনাবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। সিংহলের রাজা তাহার ভয়ে সুদূর বনে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি মলয় পর্বতের চন্দনবন ধ্বংস করেন এবং কেরল নৃপতিকে নিহত করেন। তিনি অসীম বিক্রম প্রকাশ, গঙ্গাকুন্দ, বেঙ্গী এবং চক্রকোট প্রভৃতি প্রদেশ স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন।"

বিদ্যাপতি, বিহলণ বিক্রমাদিত্যের জীবন চরিত লইয়া সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত "বিক্রমাঙ্ক চরিত" নামক গ্রন্থ বিরচন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিদ পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বুলার সাহেব এই বিক্রমাঙ্ক চরিতের একটি সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন : তাহাতে তিনি বিক্রমাদিত্যের গৌড় ও কামরূপ জয় সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—The assertion that Vikrama defeated the kings of Garuda and Kamrup sounds very strange, it is however possible that he made with his country a raid into their territories.' p. 31 (preface)

বিক্রমাদিত্যের উল্লিখিত গৌড়-কামরূপের বিজয়াভিযান স্মরণীয় করিবার জন্য তৎকর্তৃক বিক্রমপুর প্রতিষ্ঠার অনুমান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হয় না। উপরিউক্ত অভিযান ব্যতীত বিক্রমাদিত্য রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলে তদীয় সেনাপতি মহাবীর আচ কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের স্পষ্ট উল্লেখই পাওয়া যায়। বিশ্বকোষে এতৎসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"এ ছাড়া তিনি কলিঙ্গ, বঙ্গ, মরু, গুর্জ্জর চের ও চোলপতিকে চালুক্যপতির অধীন করিয়াছিলেন। প্রভুর জন্য রাজ্য প্রতিষ্ঠার

স্মৃতিরক্ষার্থ বিক্রমাদিত্যের সেনাপতি কর্তৃক বঙ্গে 'বিক্রমপুর' নামক নগর স্থাপনও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যেরূপই হউক চালুক্য প্রাগুক্ত প্রমাণ সকল হইতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

বৌদ্ধ গ্রন্থে বিক্রমপুরের নাম বিক্রমনীপুর পাওয়া যায় বলিয়া প্রকৃতিবাদ অভিধানে লিখিত হইয়াছে, যথা "সংস্কৃত বৌদ্ধ-গ্রন্থে ইহা বিক্রমনীপুর নামে উল্লিখিত হইয়াছে।" বিক্রমাদিত্যের নামান্তর যে 'বিক্রমণক ও বিক্রমণকদেব' ছিল তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। 'বিক্রমণী' নাম এই বিক্রমণক নাম হইতেই রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্টই অনুমিত হয়। এইরূপে চালুক্য বিক্রমাদিত্যের নামে 'বিক্রমপুরের' বৌদ্ধনামের ব্যাখ্যা পাওয়াতে বিক্রমপুরের চালুক্য বিক্রমাদিত্যের সহিত সংস্রবের বলবত্তর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে বলিয়াই আমরা মনে করি। বিশেষত চালুক্য বিক্রমাদিত্য যে স্বনামে অপর একটি পুরী নিজদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণও ইতিহাসে পাওয়া যায়। বিশ্বকোষকার লিখিয়াছেন, তাহার অন্যান্য অগণ্য কীর্তির মধ্যে বিষ্ণুকমলা-বিলাসীর মন্দির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের সম্মুখে এক বিশাল সরোবর খণিত হয়। উহার পুরোভাগে তিনি বহুল দেবমন্দির ও সুরম্য হর্ম্যাদিপূর্ণ বিক্রমপুর নামে এক বিশাল নগরী নির্মাণ করেন। যিনি স্বদেশে নিজের স্মৃতিরক্ষার্থ এরূপ ব্যগ্র ছিলেন তিনি যে বিদেশে আত্মস্মৃতি রক্ষার্থে আরও অধিক আগ্রহান্বিত হইবেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

এক্ষণে ঐতিহাসিক সময়ের সঙ্গে আমাদের সিদ্ধান্তের কিরূপ সামঞ্জস্য হয় তাহাই আমরা একটু আলোচনা করিয়া দেখিব, বিক্রমাদিত্যের দিগ্বিজয়ের সময় সম্বন্ধে যতীন্দ্রবাবু তদীয় ঢাকার ইতিহাসে লিখিয়াছেন—"কল্যাণের চালুক্য রাজ আবহমল্ল প্রথম সোমেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র কুমার বিক্রমাদিত্য ১০৪৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১০৭১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পিতার আদেশক্রমে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া গৌড় কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন।" *ঢাকার ইতিহাস ২য় খণ্ড ২৭০ পৃঃ।*

এই একাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেই বিক্রমপুর প্রতিষ্ঠার সময় বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

এক্ষণে আমরা দেখিব অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমাণে ইহার কিরূপ সমর্থন পাওয়া যায়। যতীন্দ্রবাবু ঢাকার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে ৯ম শতাব্দীতেও বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি হয় নাই। তখনও তৎপরিবর্তে সমতট নামেরই উল্লেখ পাওয়া যায়—

"বিশ্বরূপসেনের তাম্র-শাসন দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে বর্তমান ঢাকা জেলার অনেকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ তৎসময়ে বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইত। খ্রিস্টিয় নবম শতাব্দী পর্যন্তও এই স্থান সমতট নামে পরিচিত ছিল।" *ঢাকার ইতিহাস, ১ম খণ্ড ১৬ পৃঃ*

বিশ্বকোষকার লিখিয়াছেন যে, পালবংশের সময়েই বিক্রমপুরের কথা জানা যায়, তৎপূর্বে বিক্রমপুরের কথা জানা যায় না, যথা—

"অবশ্য বিক্রমপুর নামটি প্রাচীন। পালবংশের সময়ে বিক্রমপুর একটি প্রসিদ্ধ জনপদ বলিয়া গণ্য ছিল। তৎপূর্ববর্তী কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ, শিলালিপি বা তাম্র-শাসনে বিক্রমপুরের উল্লেখ নাই।"

এই সকল প্রমাণের দ্বারা নবম শতাব্দীর পরে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে পালদিগের রাজত্বকালেই যে বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই বলিতে পারা যায়।

হরিবর্মা, শ্রীচন্দ্র, বিজয় সেন প্রভৃতি যে-সমস্ত বঙ্গ রাজগণের তাম্র-শাসনে বিক্রমপুরের উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহাদের কেহই একাদশ শতাব্দীর বিক্রমাদিত্য অভিযানের পূর্ববর্তী বলিয়া প্রমাণিত হন নাই। সুতরাং তাম্রশাসনের প্রমাণও আমাদের অনুমানের বশংবাদী হইতেছে না।

বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠা ও গৌড়বঙ্গে সেন রাজবংশের অধিষ্ঠান দুইটিই ঐতিহাসিক বিশেষ সমস্যা। দিগ্বিজয় চালুক্য বিক্রমাদিত্যকে বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করিলে বিক্রমপুর প্রতিষ্ঠা সমস্যার যেমন সুসমাধান হয়, তেমনই গৌড়বঙ্গে সেন বংশাধিষ্ঠান সমস্যারও

সুসমাধান হয়। চালুক্য রাজ্য কর্নাট দেশের সহিত অভিন্ন বলিয়াই ঐতিহাসিকদিগের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেন-বংশের পরিচয়েও তাহারা কর্নাট ক্ষত্রিয় বলিয়াই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে চালুক্য বিক্রমাদিত্যের সহিত সেন-বংশীয়দিগের একটি ঘনিষ্ঠ যোগেরই সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেন-বংশীয়গণ চালুক্য রাজাদিগের সেনা নায়করূপেই প্রতীয়মান হয়। "সেন খ্যাতিটি সেনার সহিত যোগের ইতিহাস স্পষ্টরূপেই নির্দেশ করিয়াছে। এই যোগ হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, চালুক্য বিক্রমাদিত্যের দিগ্বিজয়াভিযানে সেনবংশের পূর্বপুরুষই সেনাদিগের নেতা হইয়া আসিয়াছিলেন এবং গ্রীক মহাবীর আলেকজাণ্ডারের আশিয়ার দিগ্বিজয়ের পর তদীয় সেনাপতিগণ যেমন বিজয়লব্ধ রাজ্য আপনারা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন—তেমনই বিক্রমাদিত্যের দিগ্বিজয়ের পর সেন বংশীয়গণই তদীয় বিজয়লব্ধ রাজ্যে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা এস্থলে এতৎ সম্বন্ধে আমাদের একজন প্রধান ঐতিহাসিকের আলোচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"গৌড়রাজ-মালার" লেখক মহাশয় এই সমুদায় প্রমাণ পরম্পরা আলোচনা পূর্বক প্রাচীন লিপির "কর্ণাট রাজ্য" কোথায় ছিল, তাহার পরিচয় প্রদান জন্য কল্যাণের চালুক্য রাজ্যকেই কর্ণাট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বিহলন দেব রচিত "বিক্রমাঙ্কচরিত" গ্রন্থের একটি শ্লোক অবলম্বন করিয়া কল্যাণীয় চালুক্য বংশীয় কুমার বিক্রমাদিত্যের সমর যাত্রার সহিত সামন্তসেনের বল আগমন প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

"প্রথম লিপি অনুসারে মনে হয়, সামন্ত সেন শেষ বয়সে কর্ণাট ত্যাগ করিয়া তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে বাংলায় আসিয়াছিলেন। অথচ এই দুইটি লিপি প্রায় একই সময়ে রচিত। এইরূপ তুল্যকালীন লিপিতে এত বিরোধ কল্পনা অসম্ভব। কিন্তু যদি অনুমান করা যায় রাঢ়দেশ কর্ণাট রাজ্যের পদানত ছিল এবং কর্ণাট রাজ কর্তৃক রাঢ়-শাসনার্থ নিয়োজিত (লক্ষ্মণ সেনের মাধাইনগর তাম্রশাসন কথিত) "কর্ণাট ক্ষত্রিয়" বংশজাত রাজপুত্রগণের বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়া রাঢ় দেশেই কর্ণাট রাজ্যের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে রত ছিলেন, তাহা হইলেই এই বিরোধের ভঞ্জন হয়। বিহলন বিবৃত চালুক্য রাজকুমার বিক্রমাদিত্য গৌড়াধিপের এবং (হয়ত গৌড়াধিপের সাহায্যার্থ আগত) কামরূপাধিপের পরাজয় বৃত্তান্ত এই অনুমানের অনুকূল প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। চান্দেল-রাজ কীর্তিবর্মার (রাজত্ব ১০৪০—১১০০ খ্রিস্টাব্দে) আশ্রিত "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" রচয়িতা কৃষ্ণ মিত্র যাহাকে "গৌড়ং রাষ্ট্র মনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কুমার বিক্রমাদিত্য গৌড়াধিপকে পরাজিত করিয়া সেই রাঢ় দেশ গৌড়ারাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। নবজিত রাঢ় শাসনার্থ কর্ণাট রাজ যে রাজপুত বা ক্ষত্রিয় সেনা নায়ককে নিয়োগ করিয়াছিলেন, সামন্ত সেন তাহারই বংশধর।" [১]

গৌড়রাজ মালার উপরিউক্তির অনুমোদন করিয়া বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ

"সেন রাজবংশের পূর্বপুরুষগণ এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহে থাকিয়া কালক্রমে (দক্ষিণ রাঢ়ে কর্ণাট রাজ্যের প্রভুত্ব সংস্থাপিত হইবার পর) বাঙালি প্রজাপুঞ্জের নির্বাচিত পালরাজবংশের প্রবল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল বরেন্দ্র মণ্ডলেও অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।[২]

এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা বিক্রমপুর যে চালুক্য বিক্রমাদিত্য কর্তৃক স্থাপিত হয়, বিশেষরূপেই এই মতের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইতেছে।

এক্ষণে বিক্রমপুরের সংস্থান কোথায় ছিল তাহাই আমরা বিচার করিয়া দেখিব। বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেনের তাম্রশাসনে "পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্ত্যন্তঃ পাতিবঙ্গে বিক্রমপুর" ভাগে বা "ভাগপ্রদেশে" বলিয়া যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতেই বিক্রমপুরের প্রথম সংস্থানের রহস্যের আভাস নিহিত রহিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। পুণ্ড্রবর্ধন উত্তরবঙ্গে অবস্থিত ছিল।

বিক্রমপুর এই উত্তরবঙ্গেই সংস্থিত ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বিশ্বকোষে বিক্রমপুরের উত্তরদিকের বিস্তার যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের অনুমানের বিশেষ সমর্থনই পাওয়া যায়—"পাল ও সেন বংশীয়দিগের অধিকার কালে সমস্ত পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল।" শ্যামলবর্মার রাজধানীর স্থান নির্দেশেও বিক্রমপুর গৌড়ান্তর্গত বলিয়াই জানিতে পারা যায়, যথা "গৌড়ান্তর্গত কান্ত বিক্রমপুরান্তে পুরীং নির্ম্মমে।" শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে" উদ্ধৃত রামদেবের "বৈদিক কুলমঞ্জরী" এক্ষণে উত্তরবঙ্গের কোন স্থানে বিক্রমপুর স্কন্ধাবার বা রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাই বিশেষ বিবেচ্য হইতেছে। করতোয়া ও মহানন্দার মধ্যবর্তী প্রদেশেই পুণ্ড্রবর্ধনের ভৌগোলিক সংস্থান বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।[৩]

'বিক্রমপুর' করতোয়া নদীরই তীরে স্থাপিত হয় বলিয়া মনে করি। করতোয়া তীরে পালবংশের প্রথিতনামা রামপাল রামাবতী নামে এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"সম্ভবত রামপাল এখানে পরাজিত হইয়া রাজধানী পরিবর্তন করেন। গঙ্গা ও করতোয়া সঙ্গমে তাহার নূতন রাজধানী শ্রীরামাবতী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।" [৪]

বিক্রমপুরের পূর্বাধিষ্ঠানেই রামাবতীর নূতন পত্তন হয় বলিয়া আমারা মনে করি। বিক্রমাদিত্যের নামানুসারে বিক্রমপুর নাম কল্পিত হয়, রামপাল, ও তদনুকরণেই আপনার নামানুসারেই নগরীর নামকরণ করিলেন। অনুকরণ যে কেবল রাজধানীর নামকরণেই সন্নিবদ্ধ রহিল তাহা নহে, বিক্রমপুর নগরের নাম সেরূপ একটি পরগণার ও নামকরণ হইয়াছে। রামপালও তেমনই রামাবতী নগরীর নামে একটি সমগ্র পরগণাই নাম রামাবতী প্রচারিত করিলেন।

শ্রীযুক্ত পরেশবাবু 'বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে' এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সরকার জিন্নতাবাদের অন্তর্গত রামাবতী নামক একটি পরগণার উল্লেখ আছে। আমাদের বিশ্বাস রামাবতী নগরীর নামানুসারে উক্ত পরগণার নামকরণ হইয়াছে। বিক্রমপুরের পূর্বে যে শ্রী শব্দের প্রয়োগ তাম্রশাসনাদিতে পাওয়া যায়, রামাবতীর পূর্বে সেই শ্রী শব্দটি পর্যন্ত সংযুক্ত হইয়া অনুকরণে পূর্ণতা স্পষ্ট সাক্ষ্যই যেন প্রদান করিতেছে। এই অনুকরণে বিক্রমাদিত্যের কীর্তি প্রচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে অতিক্রম করার গর্বিত উদ্দেশ্য দ্বারাই রামপাল প্রণোদিত হইয়াছিলেন। সম্ভবত ইহারই ফলে বিক্রমপুরের প্রাচীন বিস্তারের খর্বতা সাধিত হয়। ইহাতে বিক্রমপুর রাজধানীর নামে বিরূপ পাইলেও বিক্রমপুর পরগণা সগৌরবে এখনও বর্তমান থাকিয়া রামপালের ব্যর্থ চেষ্টাকে উপহাস করিয়াই যেন বিক্রমাদিত্যের অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। এইরূপেই বিক্রমপুর বিক্রমাদিত্য স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে সপক্ষ ও বিপক্ষভাবে সেন ও পাল রাজাদিগের অতীত ইতিহাসের সূত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

** ভারতী-পৌষ ১৩২৮ সন*

১. ঢাকার ইতিহাস ২য় খণ্ড ৩০০-৩০২ পৃঃ।
২. গৌড়রাজ-মালা উপক্রমণিকা ।|৹ পৃষ্ঠা।
৩. বাঙলা ভাষার অভিধান শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত।
৪. বিজয়া পৌণ্ড্রবর্ধন ৭ ভাদ্র ১৩২০।

বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্তি ও দর্শনীয় স্থানসমূহ



যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

কবি ঈশ্বরগুপ্ত তাহার কবিতায় বিক্রমপুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"বিক্রমে বিক্রমপুর ছিল যে বিক্রমপুর
সে বিক্রমের কিছু নাহি আর।"

প্রকৃত পক্ষেই একদিন যে বিক্রমপুরের বিজয়বৈজয়ন্তী সমুদয় বঙ্গদেশকে গৌরবমাল্য পরাইয়া দিয়াছিল যে বিক্রমপুরের গৌরব চাঁদরায়ের ভ্রাতা কেদার রায় দিল্লি সম্রাটের বিরুদ্ধে পর্যন্ত অস্ত্রধারণ করিয়া বাঙালি সৈন্যের সাহায্যে মোগলবাহিনীকে পর্যন্ত পরাস্ত করিয়াছিলেন, সেই স্বাধীনতার লীলাভূমি বীরপ্রসবিণী বিক্রমপুরের শোচনীয় শ্মশান-স্মৃতি সত্য সত্যই হৃদয় বিগলিত করিয়া তোলে।

বল্লালের দগ্ধ অস্থিভস্ম বুকে করিয়া প্রাচীন রামপাল অদ্যাপিও বিরাজমান, কিন্তু হায়! শ্মশানে সৌন্দর্য কোথায়? ধূ ধূ বিস্তৃত মাঠ ও প্রাচীনের দু'চারিটি চিহ্ন এখনও প্রাচীন ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞ দর্শককে শোকাভিভূত করিয়া ফেলে। বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্তিরাশির অধিকাংশই বিশালাকায়া পদ্মার কুক্ষিগত হইয়া চিরদিনের জন্য লোকলোচনের অদৃশ্য হইয়াছে; রাজা রাজবল্লভের শতরত্ন মঠ, শ্রীপুরের প্রাচীন কীর্তিসমূহ এ জগতের বক্ষ হইতে মহাকালের মহত্ত্ব প্রভাবে অনন্তকালের জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বর্তমানে যে সমুদয় অবশিষ্ট আছে তাহাও ধ্বংসের পথে পদার্পণ করিয়াছে, বোধ হয় আর কিছুকাল পরে তাহাদেরও চিহ্ন থাকিবে না। আমরা অদ্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যে সমুদয় প্রাচীন কীর্তিরাশির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ইতিহাস পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

(১) **রাজাবাড়ির মঠ**—ইহা পদ্মার উত্তর তীরে রাজাবাড়ি আউটপোস্টের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত। ইহা ইস্টক বিনির্মিত। প্রায় ৩০০ শত বৎসর পূর্বে বিক্রমপুরের স্বাধীন নরপতি চাঁদরায় ও কেদার রায়ের মাতার শ্মশানোপরি ইহা নির্মিত হইয়াছিল। এই মঠটির কেবলমাত্র একটি প্রকোষ্ঠ আছে তাহা কোন দেবোদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না। রাজবাড়ির মঠ বলিয়াই ইহা পরিচিত। ইহার নিম্নাংশের বেষ্টন ৩০ ফুট হইবে। পূর্বে ইহার উচ্চতা এখন যেরূপ আছে তদপেক্ষা অধিক ছিল, কিন্তু ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপ্লবে ও বহু প্রাচীন বলিয়া ইহার অনেকাংশ মাটিতে বসিয়া গিয়াছে। যাহারা পশ্চিম হইতে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর কিংবা চট্টগ্রাম যাতায়াত করিয়াছেন তাহারা অনেকেই স্টিমার হইতে প্রায় ৪/৫ ঘণ্টা পর্যন্ত এই মঠটি দেখিয়াছেন। অনেকদূর হইতেই ইহা দেখা যায়। বর্তমান সময়ে পদ্মা ইহার অতি নিকটবর্তী। দুই এক বৎসরের মধ্যেই এই মঠটি পদ্মার কুক্ষিগত হইবে ইহা স্থির নিশ্চিত।[১]

(২) **কেদারমার দিঘি**—এই বিশাল দির্ঘিকাটিও চাঁদ রায় কেদার রায়ের কীর্তি। এখন বিশুষ্ক ও কৃষাণের শস্যক্ষেত্রে পূর্ণা এই দিঘির দক্ষিণ তীরে একটি মন্দির ছিল, অদ্যাপিও তাহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান।

(৩) **রামপাল**—থানা মুন্সিগঞ্জ। বাবা আদমের সমাধি ও মসজিদ। সমাধিটি ইস্টক নির্মিত। ৩/৪ বৎসর হইল মেরামত করা হইয়াছে। রামপালের মধ্যে বাবা আদমের মসজিদ ভিন্ন অন্য কোনও অট্টালিকা নাই। এই মসজিদটির বাহ্য পরিমাণ ৪৯×৩৮ ফুট। অভ্যন্তরস্থ পরিমাণ ৩৩×২২। এইরূপ কিংবদন্তী যে যখন বর্মারা (Burmese) এ দেশ আক্রমণ করিয়াছিল, তখন

এই মসজিদটির প্রাচীরের কোণে বড় বড় প্রস্তর খণ্ড ও দরোজার চৌকাঠের বাজু ইত্যাদি, অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই মসজিদের সম্মুখে একটি প্রস্তর ফলকে খোদিত লিপি আছে, কেহই এ পর্যন্ত উহা পড়িতে পারেন নাই। সম্প্রতি নানা ভাষাবিদ, অধ্যাপক হরিনাথ দে পড়িয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। কিম্বদন্তী হইতে জানা যায় যে হিজিরা ৮৮৮ অর্থাৎ প্রায় ৪২৪ বৎসর পূর্বে ইহা নির্মিত হইয়াছিল। এই মসজিদটির অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। পূর্বে ইহার ৬টি গম্বুজ ছিল, এখন মাত্র তিনটি গম্বুজ অবশিষ্ট। তন্মধ্যেও একটি প্রায় ধ্বংসোন্মুখ, অপর দুইটি বেশ ভাল আছে। বড় বড় গাছ গজাইয়া শিকড় ইত্যাদি দ্বারা ইহাকে একরূপ ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। ইহার মেরামত করা অসম্ভব। দুইটি সুগঠিত সুন্দর প্রস্তরস্তম্ভ অদ্য পর্যন্ত ছাতের অবলম্বন স্বরূপ রহিয়াছে।

(৪) এখানে একটি গজারি বৃক্ষ আছে, তৎসম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী প্রচলিত। কেহ কেহ ইহাকে রাজা আদিশূরের হস্তাবন্ধন কাষ্ঠ বলিয়া মনে করেন, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ বারি সিঞ্চনে ইহা অমর হইয়াছে বলিয়া ইহার অপর নাম 'অমরতরু'। বিক্রমপুরের আর কোথাও এমন কি রামপালের নিকবর্তী কোন স্থানেই আর কোনও গজারি বৃক্ষ নাই। বসন্ত সমাগমে নবপত্র পল্লব পরিশোভিত হইয়া অন্যান্য বিটপী শ্রেণী হইতে নিজে স্বতন্ত্রতা লইয়া উন্নত মস্তকে বহুদূর হইতেই এই বৃক্ষটি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। জনপ্রবাদ যাহাই হউক না কেন ইহা দর্শনীয় বটে। মহিলাগণ, বিশেষতঃ মৃতবৎসা রমণীগণ ইহার অর্চনা করিয়া থাকেন। কাজেই ইহার নিম্নভাগ সিন্দুর রঞ্জিত।

(৫) বল্লাল দিঘি—দৈর্ঘ্যে এক মাইলের উপর। প্রস্থে প্রায় ২ মাইল। শুষ্ক ও কৃষকের ক্ষেত্রে পূর্ণ, কেবলমাত্র এই দিঘির এক পার্শ্বে বারো মাস জল থাকে।

(৬) মিরকাদিম—থানা মুন্সিগঞ্জ। বল্লালীপুল। মিরকাদিমের খালের উপর কত যুগের এই প্রাচীন পুলটি অদ্যাপিও সুগঠিত কলেবর বিরাজমান। মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে রাজা বল্লাল সেন কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাদিগকে বল্লালীপুল বলে। এই পুলটি ৮০০ শত বৎসরের প্রাচীন। খাল হইতে ইহার উচ্চতা ২৮ ফুট। সমুদয় পুলটি দৈর্ঘ্যে ১৭৩ ফুট হইবে। এই পুলটি দেখিতে বড়ই মনোহর। ইহা দুইটি খিলানের উপর অবস্থিত। একটি ১৭ ফুট ও অপরটি ১৪ ফুট। ইহার বুনিয়াদ অদ্যাপিও খুব শক্ত আছে। পুলের গায়ে অনেক গাছ গাছড়া গজাইয়াছে।[২]

(৭) পাথরঘাটা—থানা শ্রীনগর, আনোয়ারী মসজিদ। এই মসজিদ হিজরি ১১০২ এ অর্থাৎ ২০৭ বৎসর পূর্বে সম্রাট আলমগীর (ঔরঙ্গজেব) বাদশার জনৈক সভাসদ আনোয়ার কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। ইহার সম্মুখে একটি খোদিত লিপি আছে। এই মসজিদের বাহ্য পরিমাপ ফল ৩৪×২০ ফুট। মসজিদের উপরে মধ্যস্থলে একটি ও দুই পার্শ্বে ছোট দুইটি গম্বুজ আছ। এই মসজিদটির অবস্থা খুব ভাল। ঢাকার নবাব আসানুল্লার অর্থ সাহায্যে ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক ইহা সুন্দররূপে পুনর্নির্মিত হইয়াছে।[৩]

(৮) তালতলা—থানা শ্রীনগর। তালতলার খালের উপরেও পূর্বোক্ত মিরকাদিমের পুলের ন্যায় আরেকটি পুল আছে। এইটিও রাজা বল্লাল সেন কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত। এই পুলটিও পূর্বোক্ত মিরকাদিমের পুলটি উভয়ই রামপালের পশ্চিম দিক বরাবর এক সমসূত্রে অবস্থিত। জনপ্রবাদ এইরূপ যে রাজা বল্লাল সেন তাহার রাজধানী রামপাল হইতে বরাবর পদ্মা পর্যন্ত খাল ও রাস্তা তৈয়ার করাইয়াছিলেন এবং স্থানে স্থানে পুল নির্মাণ করাইয়াছিলেন, এই সমুদয় পুল তাহারই সাক্ষী স্বরূপ।

এই পুলটি তিনটি খিলানের উপর অবস্থিত ছিল। তন্মধ্যে দুইটি আজ পর্যন্তও আছে। বড়টি বর্মা যুদ্ধে কলিকাতা হইতে ঢাকায় বড় বড় নৌকা সৈন্য ও ডাক চলাচলের সুবিধার জন্য গভর্নমেন্ট কর্তৃক বারুদের সাহায্যে নষ্ট করা হইয়াছে। তদবধি পুলটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ,

লোকে অতি কষ্টে গমনাগমন করিয়া থাকে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহা নষ্ট হইয়া কেবলমাত্র ইস্টক স্তূপে পর্যবসিত হইবে।

(৯) মুন্সিগঞ্জের দুর্গ—এই দুর্গটি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময় বর্মাদের (Burmese) আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নির্মিত হইয়াছিল। আজকাল ইহা মুন্সিগঞ্জের সবডিবিজনেল অফিসরের বাসস্থান রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

* *প্রবাসী ১৩১৬ বৈশাখ*

১. It is a monumental tower of brick masonry built it is said over the funeral pyre of the mother of Chand Rayya and Kedar Rayya who were about 300 years ago some independent princes of the locality. *Government Publication of the List of Ancient monuments in the Dacca Division. Page 24.*

২. It is said to have been built by Raja Ballal Sen before the conquest of Bengal by the Muhammadans. If this is correct, it is about 800 years old.

৩. The Masjid was built in Hijri 1102, i.e. 207 years ago, by one Anwar, a courtier of Emperor Alamgir Shah (Aurangzeb) and bears an inscription in front. It is 34x20 out side measurement, has one central dome and a smaller one on each said *Government Publication List of the monuments in the District of Dacca, Page-24.*

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর মূর্তি

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত



বিক্রমপুরের ইতিহাস সংকলন কার্যে ব্রতী হওয়ার পর আমাকে বিক্রমপুরের বহুগ্রাম পর্যটন করিতে হইয়াছিল। সেই পর্যটনের ফলে যে সকল প্রাচীন দর্শনযোগ্য ও আলোচনার উপযুক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তন্মধ্যে দ্বাদশ হস্ত বিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর মূর্তি একটি।

বিক্রমপুরে যে এক সময়ে বৌদ্ধধর্মাধিপত্য। বিস্তৃত ছিল একথা সর্ববাদিসম্মত এবং প্রত্যেক প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতও তাহা এক বাক্যে স্বীকার করিবেন। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত মধ্যে যে সমতটের বর্ণনা আছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে সমগ্র পূর্ববঙ্গ এবং সুন্দরবনের কতকাংশ পর্যন্ত সমতট বিস্তৃত ছিল।[১] বিক্রমপুর এই সমতটাখ্যা প্রাপ্ত জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞান, বঙ্গের আদি গৌরব শীলভদ্র প্রমুখ প্রখ্যাতনামা বৌদ্ধ যতিগণ বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন।[২]

অতএব বৌদ্ধ প্রাধান্য প্লাবিত বিক্রমপুরে অবলোকিতেশ্বর মূর্তিটি পাওয়ায় যেমন বিস্ময়ের কোন কারণ নাই প্রায় প্রতি বৎসরই প্রাচীন পুকুর ও দির্ঘিকা ইত্যাদি খনন করিতে করিতে নানাবিধ প্রস্তর গঠিত বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যাইতেছে। বর্তমান ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাবল্য হেতু সে সমুদয় মূর্তি এখন হিন্দুর দেবতারূপে হিন্দুর দেবমন্দিরে পূজিত হইতেছেন।

হিন্দুধর্মের মধ্যে যেরূপ ভগবানকে আরাধনা করিবার নিমিত্ত সাকার ও নিরাকার উপাসনার দুইটি স্তর আছে, বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গেও তদ্রূপ নানাবিধ মূর্তি পূজা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। পুরা তত্ত্বানুসন্ধানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন আমরা যে সকল বৌদ্ধমূর্তি প্রাপ্ত হইতেছি তাহা সেই ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভূত।

প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই দুই শ্রেণীর লোক থাকে। এক শ্রেণী শিক্ষিত ও উন্নত অপর শ্রেণী অশিক্ষিত অথচ ভক্তিতে নত। উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যখন দেখিতে পায় যে, তাহারা ধর্মের যে সকল গূঢ়তত্ত্ব ও প্রকৃত জ্ঞান বিদ্যা ও জ্ঞানবত্তার দ্বারা আয়ত্ত করিতে সামর্থ হইয়াছে, তাহাদের সমধর্মী অজ্ঞ লোকেরা অজ্ঞতা নিবন্ধন তাহা অনুভব করিতেছে না, তখনি তাহারা সমধর্মী লোকদিগকে ধর্মের সংকীর্ণতার মধ্য দিয়া প্রকৃত মূল-কেন্দ্রে পৌছাইবার জন্য নানাবিধ পন্থার সৃষ্টি করে, সে সকল সহজ ও সরল পথ সাধারণে অনুসরণ করে বলিয়াই উহা সর্বত্র সহজে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং কালবশে আরও বিকৃত হইয়া অদ্ভুত অদ্ভুত ধর্ম ও মতের সৃষ্টি করে। তান্ত্রিকতাপূর্ণ মহাযান মত এইরূপেই ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই নিমিত্তই ভারতবর্ষের প্রায় প্রতি গ্রামেই প্রাচীন বৌদ্ধ তান্ত্রিকতাপূর্ণ মহাযান মতানুযায়ী নানাবিধ কল্পিত আকৃতি বিশিষ্ট বৌদ্ধ মূর্তিসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়।[৩]

এসকল রূপকমূর্তি সমূহ এতদিন পর্যন্ত কাহারো মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। এমন কি পুরাতত্ত্ব বিভাগের কর্তৃপক্ষগণও এ সকলের কোনও গুরুত্ব অনুভব করেন নাই। হিন্দুগণ কর্তৃক পূজিত বলিয়া তাহারাও এতদিন পর্যন্ত এই সকল মূর্তিকে কোনও অদ্ভুতাকৃতি হিন্দুর পৌরাণিক মূর্তি মনে করিয়া আলোচনার অনাবশ্যক জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া ছিলেন। বর্তমান সময়েও যে এই সকল পরিত্যক্ত মূর্তিসমূহের বিশেষরূপে আলোচনা হইতেছে তাহা বলা যায় না।

আলো ও ছায়া জগতের স্বাভাবিক রীতি। যেখানে আলো সেখানে অন্ধকারকে থাকিতেই

হইবে। একদিকে বৌদ্ধধর্মের উজ্জ্বল জ্ঞান তপনালোকে যেরূপ সুদূর চীন, জাপান প্রভৃতি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল, আবার তেমনি ইহার একাংশ গাঢ়তম অন্ধকারে আবৃত ছিল। য়ুয়নচয়ঙের ভারত গমনের পূর্বেও যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের এ সকল রূপক মূর্তির পূজা প্রচলিত ছিল তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব যে যুগে এ সকল রূপকমূর্তির পূজা ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রচলিত হইয়া উঠে, সে সময়কার প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে হইলে এসকল মূর্তির সূক্ষ্ম আলোচনা ব্যতীত প্রাচীন অজ্ঞাত বিবরণসমূহ জানিতে পারা অসম্ভব। আমরা এ প্রবন্ধে কেবল অবলোকিতেশ্বর সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব মূর্তি ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বিগণের মনঃকল্পিত দেবতা। প্রত্যেক ধর্মের যেমন জ্ঞান ও কর্ম এই দুইটি অঙ্গ আছে, তদ্রূপ বৌদ্ধধর্মেরও দুইটি দিক আছে, একটি নানাবিধ দার্শনিক মতানুযায়ী সমষ্টি দ্বিতীয়টি আনুষ্ঠানিক বা সাধারণ ধর্ম। ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেব প্রবর্তিত প্রথমোক্ত জ্ঞানধর্ম প্রচার করিবার জন্য এবং সাধারণের নিকট উহার নিগূঢ়তত্ত্ব সহজ ও সরলভাবে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত হিন্দুগণের পৌত্তলিকতার ন্যায় বহু দেবদেবীর পূজা প্রবর্তিত করিয়া বৌদ্ধধর্মের একটি প্রশাখার সৃষ্টি করেন। বৌদ্ধধর্মের মূর্তি পূজার রহস্য সম্বন্ধে অন্যরূপ কল্পনা করিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা প্রিয় জনসাধারণের মধ্যে শুষ্ক দার্শনিক মতের সমন্বয় করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব বোধে, ঠিক সেই জলে জল মিশাইয়া অর্থাৎ হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ধর্ম প্রচারের কৌশলরূপে এই সকল মূর্তির প্রবর্তন করাই বৌদ্ধধর্মের তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য ছিল, নচেৎ বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে মূর্তি পূজা প্রবর্তিত করিবার উদ্দেশ্য কি?

এ সকল ধর্মমত স্থূল দৃষ্টিতে পৌত্তলিকতা বলিয়া বিবেচিত হইলেও কিন্তু মূলত সেই মহান সার সত্যের সহিত একইভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ যে মহান সত্য ও ধর্ম আপনার মূল কেন্দ্রে অবিচলিত রহিয়া শূন্যতার মধ্যেও এই দৃঢ় বিশ্বাসকে পোষণ করে যে, ধর্মশীল মানবের সহিত অজ্ঞেয় ও মহান বিশ্বপতির প্রত্যক্ষ যোগ হইতে পারে। একথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যাক। জগতের প্রত্যেক ধর্মের মূল লক্ষ্য ঈশ্বর! কিন্তু তাহাকে উপলব্ধি করিবার জন্য বা তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার নিমিত্ত যেমন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন মত ও যুক্তি বিদ্যমান তেমনি জগতে প্রত্যেক ধর্মের সার বা মহৎ শিক্ষা নির্বাণ বা আত্মার সেই মহান শক্তির সহিত সম্মিলন। ইহা সকল ধর্মেরই শ্রেষ্ঠ সাধনা। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ সাধনাকে আয়ত্ত করিতে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রয়োজন। সেই শিক্ষা ও জ্ঞান অল্প সময় মধ্যে কাহারো পক্ষে আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নহে বলিয়াই প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই নানা প্রকার শাখা প্রশাখা বিদ্যমান। এই শাখা প্রশাখাগুলি প্রথম দৃষ্টিতে জ্ঞানবানের চক্ষে হাস্যাস্পদ বলিয়া বিবেচিত হইলেও কিন্তু মূলত এক বৃন্তে দুইটি ফুলের ন্যায়, উভয়ে একই বৃক্ষমাতার স্নেহ-কোলে বর্ধিত ও পুষ্ট। একটি পত্রাবরণমুক্ত সৌন্দর্যে ও সুরভিমাধুর্যে মনোহর। অপরটি এখনও পত্রাবগুণ্ঠন হইতে আপনাকে বিকশিত করিবার শক্তির জন্য পথ চাহিয়া আছে। অতএব আকার ও নিরাকার হীনযান ও মহাযান মূলত একই লক্ষ্যে চলিতেছে।

আবার উভয়ে একই কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ। এই নিমিত্তই সাকার ও নিরাকার, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সেই এক বিশ্বস্রষ্টা জগদীশ্বরকে পাইবার জন্য পাশাপাশি প্রবাহিত দুটি নদীর ন্যায় সাগরে মিশিবার জন্য একটি একটু ঘুরিয়া এবং অপরটি একটু সরল পথে একটানা স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে।

অবলোকিতেশ্বর মূর্তির অর্চনাও তদ্রূপ ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধগণের দ্বারা বোধিসত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বসাধারণের মধ্য সহজে প্রচারিত করিবার জন্য প্রবর্তিত হইয়াছিল। অবলোকিতেশ্বর মূর্তির গঠনের মধ্যে সূক্ষ্ম শিল্পকার্যের বাহাদুরির সঙ্গে সঙ্গে কল্পনারও যথেষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়।

অবলোকিতেশ্বর মূর্তিগুলি দুই হাত, চারি হাত, ছয় হাত, দশ হাত, বারো হাত, এমন কি

সময় সময় সহস্র হস্ত সমন্বিতও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন অবলোকিতেশ্বর তিন বা একাদশ শীর্ষ বিশিষ্ট। যেমন শিবের পার্বতী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী, ইন্দ্রের শচী তেমনি অবলোকিতেশ্বর দেবেরও এক শক্তি আছেন তাহার নাম তারা। এই শক্তি মূর্তিই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার পরিচায়ক।

অবলোকিতেশ্বর সম্বন্ধে ডাক্তার আইটেল (Dr. Eitel) তৎপ্রণীত Handbook of Chinese Buddhism নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। চীন ও জাপানে অবলোকিতেশ্বর সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবাদ প্রচলিত আছে। সেই গল্প বা প্রাচীন কাহিনীটি এই—

অতি প্রাচীনকালে চীন দেশে এক রাজা ছিলেন তার নাম ছিল সুভরনাম্পো। (shubharyynpu) ইনি আমাদের দেশের হিরণ্যকশিপুর ন্যায় অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির নরপতি ছিলেন। এই রাজার গৃহে অবলোকিতেশ্বর দেবকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার নাম হইল কোয়ানউইন (Kwanyin)। কোয়ানউইন রাজার তৃতীয় কন্যা। বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল ক্রমে কোয়ানউইনের জন্য রাজা বিবাহের পাত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে মহা বিভ্রাট কোয়ানউইন বিবাহ করিতে নারাজ। রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যাকে একটি মঠে (আশ্রমে) পাঠাইয়া দিলেন। এবং আশ্রমের অধিবাসিনী রমণীগণের সর্ববিধ নিচ কার্য সম্পাদনে ব্রতী করিলেন। তথাপিও কিন্তু কন্যার মত পরিবর্তিত হইল না। রাজা ইহাতে আরও ক্রোধান্বিত হইলেন, তিনি কোয়ানউইনকে হত্যা করিবার জন জল্লাদের হস্তে অর্পণ করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য। জল্লাদ কোয়ানউইনকে অসি দ্বারা আঘাত করিবামাত্রই তরবারিখানা সহস্রখণ্ডে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল—কিন্তু কোয়ানউইনের জীবননাশ দূরে থাকুক একটি কেশাগ্রও কম্পিত হইল না। রাজার ক্রোধ আরও বাড়িয়া গেল। তিনি কোয়ানউইনকে শ্বাসরোধ করাইয়া হত্যা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এবার তাহার মৃত্যু হইল। কিন্তু যমলোকে মহাবিভ্রাট! নরক স্বর্গে পরিণত হইল, যম মহাপ্রমাদ গণিলেন, এ যে সৃষ্টি রসাতলে যায়, নিয়মশৃঙ্খলা কিছুই থাকে না। নরকে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য যম কোয়ানউইনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দিলেন। একটি শতদলোপরি নিঙ্গপোর (Ningpo) নিকটবর্তী পোটালা (Potala) বা পুটুদ্বীপে তিনি নয় বৎসর পর্যন্ত যমালয় হইতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া বাস করিয়াছিলেন। কোয়ানউইনের কীর্তিকলাপ দিন দিন চতুর্দিকে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিল। পীড়িতের পীড়ামুক্তি, সমুদ্রের করাল কবল হইতে পথভ্রষ্ট নাবিকগণের জীবনরক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ সৎকীর্তিরাজি লোকের মুখে মুখে সর্বত্র ঘোষিত হইতে লাগিল। এরূপ সময়ে কোয়ানউইনের পিতার দারুণ পীড়ার সঞ্চার হওয়ায় কোয়ানউইন নিজের বাহু ছেদন করতঃ সেই মাংস দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া পিতার জীবনরক্ষা করিলেন। এইবার নির্দয় পিতার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। কন্যার এই রূপ মহত্ত্বের স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য তিনি ভাস্করকে কোয়ানউইনের একটি প্রস্তর গঠিত মূর্তি প্রস্তুত করিবার আদেশ করিলেন। ভাস্কর রাজার আদেশ শুনিতে ভুল করিয়া সহস্র চক্ষু এবং সহস্র ভুজসম্বলিত এক মূর্তি নির্মাণ করিয়া ফেলিল। কালবশে তাহাই বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর মূর্তিরূপে চতুর্দিকস্থ জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। কোয়ানউইনকে অবলোকিতেশ্বরের অবতাররূপে প্রমাণিত করিবার জন্য চীন দেশবাসী বৌদ্ধগণ কোয়ানউইন অর্থে যে দেবতা উর্ধ্ব হইতে অধঃপানে দৃষ্টি করেন এবং যিনি লোকেশ্বর ও মানবের সর্ববিধ শোকদুঃখের বিধানকর্তা এবং দয়ার অবতার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া অবলোকিতেশ্বরের আভিধানিক বা প্রকৃত বুৎপত্তিগত অর্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন।[৪] জাপানেও বৌদ্ধেরা কোয়ানউইন দেবীকে অবলোকিতেশ্বরের অবতার রূপে অর্চনা করিয়া থাকে। সেখানেও তিনি সহস্র হস্ত এবং সহস্র চক্ষু বিশিষ্ট রূপে অঙ্কিত।

তিব্বত দেশে অবলোকিতকে চে-রি-সাই (Che-re-si) বা দীপ্ত নয়ন সম্পন্ন দেবতা কহে। আইটেল সাহেব বলেন যে "Avalokita is the first ancestor of the Tibetan Nation." তীব্বতীয়েরা কিন্তু ইহা বিশ্বাস করে না। তাহারা কিন্তু ডারউইনের সিদ্ধান্তানুযায়ী আপনাদিগকে

বানরের বংশজাত বলিয়াই প্রকাশ করে। এ বানর সাধারণ বানর নহে, স্বয়ং অবলোকিতেশ্বর দেব বানরমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া এক রাক্ষসীর সহিত বাস করেন, তাহাতেই তিব্বতীয়দিগের উৎপত্তি।[৫]

তদ্দেশবাসিগণ অবলোকিতেশ্বরকে আমাদের বিষ্ণুর অবতারের ন্যায় মানবের শোকদুঃখ মোচনার্থ বোধিসত্ত্বের অবতাররূপে অর্চনা করেন। য়ুয়নচঙের ভ্রমণকাহিনী পাঠে জ্ঞাত হই যে তিনি অবলোকিতেশ্বর দেবকে পুষ্পগুচ্ছ অর্পণ করিয়াছিলেন। অবলোকিতেশ্বরের মূল মন্ত্র ওঁ মণিপদ্মে হুঁ (Om mani Padme Hun) এবং বীজ মন্ত্র হ্রী, ইহা হৃদয় শব্দেরই রূপান্তর মাত্র।

অবলোকিতেশ্বর সাধারণত 'মহাকরুণা' এবং 'পদ্মাপানি' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মূর্তির অর্চনা ও অভ্যুদয় কোন সময়ে বৌদ্ধধর্মে প্রথম প্রবেশ লাভ করে সে সময়ের নির্ণয় এখন পর্যন্ত হয় নাই। তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে রাজা কণিষ্কের সময় হইতেই অবলোকিতেশ্বর দেবের পূজার রীতি প্রবর্তিত হয়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মূল কারণ এই যে প্রথম খ্রিঃ অঃ রাজা কণিষ্কের নামাঙ্কিত একটি অবলোকিতেশ্বর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব তারিখের কোনও মূর্তি অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। আজ পর্যন্ত অবলোকিতেশ্বরের মোট ৮২টি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই ৮২টি মূর্তিই অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধমূর্তি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন মূর্তিতে তিনি বোধিসত্ত্ব দীপঙ্কর প্রভৃতি রূপে অঙ্কিত হইয়াছেন।[৬] আমরা যে ৮২টি মূর্তির উল্লেখ করিলাম তন্মধ্যে ক্যাম্বিজ Bendall (বেণ্ডল) এবং পুস্তক তালিকায় ১৬৪৩ সংখ্যক অতিরিক্ত পাণ্ডুলিপিতে একত্রিশটি অবলোকিতেশ্বরের পরিচয় আছে। কলিকাতার A. 15 সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে আরও দশটি অবলোকিতেশ্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মূর্তির মধ্যে ৪২টি মূর্তি নিম্নলিখিত স্থানসমূহ হইতে পাওয়া গিয়াছিল। কটাহ প্রদেশে দুইটি, কঙ্কণে চারটি, কোরএ এক, গান্ধার ১, দক্ষিণাপথ ২, দণ্ডভুক্তি ১, নলেন্দ্র ১, নেপাল ২, পোতালক ২, মগধ ৫, মহাচীন ১, রাঢ্য ২, রাঢ় ১, বন্দিকোট ১, বরেন্দ্র ৩, কিশোরয়ণ ১, সমতট ৩, সিংহল দ্বীপ ২, সুবর্ণপুর ১। 'ললিত বিস্তর' বা বুদ্ধদেবের জীবনীগ্রন্থে অবলোকিতেশ্বর দেবের কোনও নামোল্লেখ না থাকিলেও তাহার অন্যান্য নাম, যেমন 'মহাকরুণা' 'ধরণীশ্বররাজ', প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ললিত বিস্তর গ্রন্থ ২১১ খ্রিঃ অঃ চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। 'সাধারণ পুণ্ডরিক' নামক অপর একখানা বৌদ্ধগ্রন্থে কিন্তু অবলোকিতেশ্বর সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আছে। উক্ত পুস্তকে অবলোকিতেশ্বর দেব মহান বোধিসত্ত্বরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। 'সাধারণ পুণ্ডরিক' গ্রন্থ ২৬৫ খ্রিঃ অঃ চৈনিক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল।

খ্রিস্টিয় চারিশত অব্দে প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান এবং সপ্তম খ্রিস্টাব্দে য়ুয়নচঙ ভারত পর্যটনে আগমন করিয়া অবলোকিতেশ্বর ও মঞ্জুশ্রী মূর্তি বিশেষরূপে পূজিত হইতে দেখিয়াছেন। জ্ঞান ও বিধানের অবতার রূপে মহাযান গ্রন্থে মঞ্জুশ্রী দেব উল্লিখিত হইয়াছেন। তাহার আবাহন গীতিও গ্রন্থের প্রারম্ভেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিব্বত দেশিয় বৌদ্ধ লামাগণের 'ত্রিমূর্তি স্তোত্রে' মঞ্জুশ্রীর নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হইলেও কিন্তু তাহারা মঞ্জুশ্রী অপেক্ষা অবলোকিতেশ্বরকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন। তাহাদের এই বিশ্বাসানুযায়ী ত্রিমূর্তি মধ্যে অবলোকিতেশ্বরকেই মধ্যস্থ আসন প্রদান করিয়াছেন।

ডাক্তার বুকানন ও হেমিলটন সাহেবের বিহারের সার্ভের রিপোর্ট এবং প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহামের সার্ভে রিপোর্টের স্থানে স্থানে অবলোকিতেশ্বর দেবের নামোল্লেখ থাকিলেও তেমন বিস্তারিত কোনও বিবরণ উহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সকল রিপোর্টের মন্তব্য পাঠ সহজেই অনুমিত হয় যে তাহারা অবলোকিতেশ্বর সম্বন্ধে বিশেষরূপে কোনও তথ্যানুসন্ধান করেন নাই। কানিংহাম ও বুকানন ব্যতীত Geog's Csoma Korosi নামক গ্রন্থে এবং সিফনার

(Schiefner) ও Schlagim tweit's-এর পুস্তকে অবলোকিতেশ্বর সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। তিব্বতদেশীয় জনসাধারণের বিশ্বাস দলুইলামা অবলোকিতেরই অবতার।

বৌদ্ধ পুরাণোক্ত এ সমুদায় দেবমূর্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সহজেই মনে হয় যে এইরূপ মূর্তিপূজার পদ্ধতি বৌদ্ধগণ হিন্দুদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দু আদর্শানুকরণে মূর্তিপূজা বৌদ্ধ সমাজে গৃহীত হইলেও উভয় সম্প্রদায়ের মূর্তিগুলির গঠনে ও শিল্পে উভয় মূর্তিতে এত পার্থক্য যে একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও সে পার্থক্য অনায়াসে অনুভব করিতে পারে। অপরপক্ষে উভয়ের নামেরই বা কত প্রভেদ।

গ্রীস, রোম প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে যেমন দয়া, ধর্ম, ন্যায়, পবিত্রতা, শান্তি, তৃপ্তি, সুখ প্রভৃতি মানবের গুণ ও প্রবৃত্তিগুলির রূপক মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ বৌদ্ধধর্মের এ সমুদয় মূর্তিগুলিও কোন না কোন নৈতিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। অবলোকিত, তারা, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতিও এইরূপভাবেই অবতার রূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। বৌদ্ধ পুরাণ গ্রন্থে ১০৮টি রূপক মূর্তির উল্লেখ থাকিলেও অতি অল্প কয়েকটিরই সন্ধান পাওয়া যায়। ডাক্তার ওয়াডেল (Waddel) সাহেব অবলোকিতেশ্বর অর্থে (Lord of the world) জগৎপতি বুঝায় বলিয়া তাহার সহিত আমাদের হিন্দু দেবতা প্রজাপতি অর্থাৎ লোকপালনকর্তা ব্রহ্মার সঙ্গে সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার মতে বৌদ্ধগণ ব্রহ্মার আদর্শানুকরণেই অবলোকিতেশ্বর দেবকে গঠন করিয়াছেন।[৭]

ওয়াডেল সাহেবের এই যুক্তি আমরা গ্রহণ করিতে সম্মত নহি। এক হস্তে বিকশিত শতদল, এক হস্তে কমণ্ডলু, এক হস্তে মাল্য ও অপর হস্তে আশীর্বাদ প্রদান করিতেছেন বলিয়া ব্রহ্মার সহিত অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকিলেও আমরা অবলোকিতেশ্বর দেবকে একমাত্র ব্রহ্মার আদর্শানুকরণে গঠিত বলিয়া মনে করি না। আইটেল সাহেবের যুক্তিই এ বিষয়ে সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। তিনি বলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনটি হিন্দু দেবতার প্রত্যেকটির মধ্য হইতেই কিছু কিছু লইয়া অবলোকিতেশ্বর দেবের সৃষ্টি হইয়াছে। মূর্তিগুলি পর্যবেক্ষণ করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।[৮]

আমরা এখানে অবলোকিতেশ্বর দেবের কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন নাম ও তাহার ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম।

১) মহাকরুণা—তিব্বতীয় নাম Thugs-rjschen-po। ইনি শ্বেতবর্ণ, একমুখ ও চতুর্হস্ত বিশিষ্ট এবং দণ্ডায়মানভাবে নির্মিত। তাহার প্রথম দক্ষিণ হস্তে বরমুদ্রা, দ্বিতীয় দক্ষিণ হস্তে জপমালা, প্রথম বাম হস্তে প্রস্ফুটিত শতদল, দ্বিতীয় বাম হস্তে কমণ্ডলু।

২) আর্য অবলোকিত—তিব্বতীয় নাম—h phagsha-s pyanras-g zigs.

ইনি শ্বেতবর্ণ এবং দ্বিভুজবিশিষ্ট।

৩) দুঃস্বপ্ন নিবারক—হিন্দুগণ যেমনে দুঃস্বপ্নে স্মরে গোবিন্দ অর্থাৎ দুঃস্বপ্ন দেখিলে গোবিন্দকে স্মরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বৌদ্ধগণও অবলোকিতেশ্বর দেবকে দুঃস্বপ্ন দেখিলে স্মরণ করেন। তিব্বতীয় নাম—r Mi-lam-n gen-pa dek-che। ইহার গাত্রবর্ণ শ্বেত-কিন্তু পরিধানে নীল বস্ত্র। ইনিও দ্বিভুজ। দক্ষিণ হস্তে শরণ মুদ্রা বামহস্তে শ্বেত শতদল। ইহার গাত্রে কোনও ভূষণ নাই চুলগুলি চূড়ার মত করিয়া বাঁধা।

৪) অবলোকিত-অষ্টাভিতিনিবারক মূর্তি। তিব্বতীয় নাম – S Pyan-ras-g zigs n jigs-pa br gyad s kyobs.

৫) সিংহনাদ—অবলোকিত বা গর্জনকারী সিংহ। তিব্বতীয় নাম S Pyan-ras-g zigs Seng-ge S gra.

সিংহনাদের গাত্রবর্ণ শ্বেত—এক মুখ এবং দুই বাহু। তিনি একটি শ্বেতবর্ণের সিংহের উপরে চন্দ্রের মত গোলাকার আসনে উপবিষ্ট। তাহার মুখ একটু দক্ষিণ দিকে হেলান, মস্তকে মুকুট।

দক্ষিণ হাঁটু অর্ধ উত্তোলিত এবং তাহারই উপরে দক্ষিণ হস্ত রক্ষিত, বাম বাহু লম্বিত। গলায় যজ্ঞোপবীত এবং লোহিত বর্ণের রেশমী বস্ত্র পরিহিত ত্রিনেত্র, নয়নত্রয় নিম্নাভিমুখে নত। বামদিকে একটি প্রস্ফুটিত দল মস্তকোপরি অমিতাভ বুদ্ধ ধ্যানাসনে উপবিষ্ট।

৬) সাগরজিৎ বা সমুদ্রবিজয়ী। তিব্বতীয় নাম S Pyan-ras-gzigs-r gyal-wa-rgya-mtsho. ইহার গাত্রবর্ণ লোহিত—ইনি চতুর্ভুজ। দুইটি হস্ত পরস্পর সংলগ্ন নিম্ন দিকের বাম হস্তদ্বয়ের একটিতে জপমালা এবং অপর হস্তে রক্ত পদ্ম। তিনি বজ্র পালঙ্কে অর্ধোপবিষ্ট।

৭) চতুর্ভুজ-তিব্বতীয় নাম S Pyan ra-g-zigs-zhal gehigs-phy ag-bzhi (P. Che-re-sizhal Chik-Chag-Zhi) এই অবলোকিতল শ্বেতবর্ণ, একমুখ এবং চতুর্হস্ত বিশিষ্ট।

৮) ত্রিমণ্ডল অবলোকিতেশ্বর বা বিচারপতি অবলোকিতেশ্বর—তিব্বতীয় নাম S Pyan-ras-gzigs-hjigs-rten-dbhan g-phyug-gtsa-hkhor gsum-pa (P.Chi-re-si-jig-ten wang-Chuktso-khor-sum) ইহার গাত্রবর্ণও লোহিত। ত্রিমণ্ডল অবলোকিতেশ্বরের দক্ষিণ হস্তে শ্বেতপদ্ম, বাম হস্ত আশীর্বাদ প্রদানোদ্যত, পরিধানে মণিরত্ন খচিত বস্ত্র ও অঙ্গ ভূষণ। ইনি দণ্ডায়মানভাবে অবস্থিত। তাহার দক্ষিণ দিকে বজ্রপাণি এবং বামদিকে হয়গ্রীব দণ্ডায়মান।

৯) ধর্মেশ্বর বজ্র—তিব্বতীয় নাম S Pyan-ras-g-zigs-rdorjeclhes d bang (P-Che-re-si-der-je chhe wang) ইহার গাত্রবর্ণ শ্বেত মস্তকোপরি অমিতাভজিন। ইনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বর প্রদান করিতেছেন—বাম হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির দ্বারা একটি প্রস্ফুটিত কমল ধৃত, দক্ষিণ পদ সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া ইনি পালঙ্কের উপর অর্ধোপবিষ্ট। তাহার দক্ষিণ দিকে শক্তিরূপিণী তারা এবং বাম দিকে ভ্রুকুটি। সম্মুখ ভাগে Vasudhara-g-zhon-men কবাঞ্জলি করিয়া দণ্ডায়মান।

১০) শ্রীখেচর অবলোকিতেশ্বর।

তিব্বতীয় নাম—S Pyan-ras-gzigs-dhal-iden-mkkah-spyod (P-Che-re-si-pal-den-kha-cho) ইহার গাত্রবর্ণ শ্বেত। একমুখ এবং দ্বিভুজ। দক্ষিণ হস্তে বর প্রদান করিতেছেন, বাম হস্ত দ্বারা একটি শতদল ধৃত, ফুলটি কর্ণ পার্শ্বে প্রস্ফুটিত। রেশমী বস্ত্র ও অলঙ্কারে ইনি সজ্জিত। ইহার দক্ষিণ দিকে হরিদ্বর্ণা তারা এবং বাম দিকে শ্বেতবর্ণা ভ্রিকুটি। সম্মুখভাগে পীতবর্ণা বসুন্ধরা করযোড়ে দণ্ডায়মান।

১১) ত্রিমণ্ডল অমোঘবজ্র মহাকরুণা তিব্বতীয় নাম—Thugs-rje chhen-pe-don-yod-rdorv-gtse-hkh or-gsum-pa P.—Thuk-je chhen-bo-ton-dor-tso-khorn sum। ইহার গাত্রবর্ণ শ্বেত, ইহারও দক্ষিণ হস্তে বর, বাম হস্তে কমল, জপমালা, কমণ্ডলু ইত্যাদি। রেশমী বস্ত্রে এবং নানাবিধ অলঙ্কারে ইনি সুশোভিত। ইহার দক্ষিণ দিকে তারা মূর্তি এবং বাম দিকে ভ্রিকুটি মূর্তি।

১২) সুখবতী—তিব্বতীয় নাম Tib-s Pyanvas-gzigs Su-kha-wa-ti (P.-Che-re-si Sukha-wati)। সুখবতী অবলোকিতের গাত্রবর্ণ শ্বেত, এক মুখ এবং ছয় হস্ত। ইহার ছয় হস্তেও বর কমল, যষ্টি, কমণ্ডলু প্রভৃতি আছে। ইনি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পরিধানে মণিরত্ন খচিত রেশমী বস্ত্র, কুন্তল এলায়িত। তারা এবং ভ্রিকুটি দক্ষিণ ও বামে দণ্ডায়মান।

১৩) অমোঘ ভবৃত (Amogha Vauritha)—তিব্বতীয় নাম Tib-S Pyan-ras-gzigs-don-yod-Chho-pai-norbu)। ইহারও গাত্রবর্ণ শ্বেত, এক মুখ এবং দ্বাদশ হস্ত। ইনি মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান, দক্ষিণ পার্শ্বে বসুন্ধরা দেবী এবং বামপার্শ্বে নাগরাজা নন্দ এবং উপানন্দ, দ্বাদশ হস্তে কমল, বর, বেদ, শঙ্খ, কমণ্ডলু, জপমালা ইত্যাদি বিদ্যমান। কণ্ঠে কণ্ঠমালা, মস্তকে মুকুট, পরিধানে মণিরত্ন খচিত রেশমী বস্ত্র, গলে যজ্ঞোপবীত।

এতদ্ব্যতীত খেচরপাণি প্রভৃতি আরও অবলোকিতেশ্বর মূর্তি আছে।

অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী এবং তারা দেবীর পূজা যে দীপঙ্করের সময়েও আমাদের দেশিয়

বৌদ্ধগণের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল তাহা দীপঙ্করের তিব্বতযাত্রা সম্বন্ধীয় বিবরণ পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। যখন নাগৎসু (Nag-teho) দীপঙ্করকে তিব্বতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তিব্বতীয় নরপতি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বিক্রমশিলায় আগমন করেন, সে সময়ে ভারতের সর্বত্র, বিশেষত বঙ্গদেশে অবলোকিতেশ্বর এবং তারা দেবীর পূজা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। নাগৎসুর প্রমুখাৎ তাহাকে তিব্বতের নৃপতি তিব্বতে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন—একথা দীপঙ্কর শুনিলে পর তাহার তিব্বতে যাওয়া উচিত কি অনুচিত তৎসম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য দেবী তারার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অবশেষে তিব্বতের পথে যখন তুষারধবল হিমাদ্রিশৃঙ্গের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য দর্শন করিতে করিতে দীপঙ্কর অগ্রসর হইতেছেন, তখন আমরা তাহার মুখে শুনিতে পাই 'বাস্তবিক হিমবত অবলোকিতেশ্বর দেবের ধর্মমতানুসরণ-কারীদের উপযুক্ত বাসস্থান।' ইহা দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে অবলোকিতেশ্বর দেবের পূজা বহু প্রাচীনকালে হইতেই ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়ছিল।[৮]

ওয়াডেল সাহেব খ্রিস্টিয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে কোনও অবলোকিতেশ্বর মূর্তি প্রাপ্ত হন নাই।

আমরা বিক্রমপুরে যে অবলোকিতেশ্বর মূর্তিটি প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা কতদিনের প্রাচীন তাহা নির্ণীত হয় নাই। তাহা না হইলেও ইহা যে বহুদিনের প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ করিবার কি কোন কারণ আছে? এ পর্যন্ত যে কয়টি অবলোকিতেশ্বর মূর্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহার কোনটির সহিতই এই মূর্তিটির সম্পূর্ণরূপে সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান নাই। অন্য কোন মূর্তির মধ্যেই সর্প চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু এই মূর্তিটির শীর্ষোপরি সাতটি সর্প দেখিতে পাওয়া যায়।[৯] অন্যান্য অবলোকিতেশ্বর মূর্তির মধ্যে সর্প অঙ্কিত নাই বলিয়া এবং এইটিতে সর্প অঙ্কিত রহিয়াছে বলিয়া ইহা যে অবলোকিতেশ্বর মূর্তি নহে, তাহা নয়, কারণ সর্প সমন্বিত অবলোকিতেশ্বর মূর্তিও হয় এইরূপ বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে বহুল উল্লেখ আছে।[১০] এই মূর্তিটি উচ্চে আট ইঞ্চি এবং প্রস্থে ৩½ ইঞ্চি। শিরে কীরিট, গলে যজ্ঞোপবীত ও কণ্ঠাভরণ, কর্ণে অম্বুজাকৃতি কর্ণভূষা, ত্রিনেত্র, মস্তকের উপর সাতটি সর্প ফণা ধরিয়া আছে। মস্তকের উপরিস্থিত সর্ববৃহৎ মধ্যবর্তী সর্পটির উপরে ধ্যানী অমিতাভ মূর্তি। অমিতাভ পদ্মাসন করিয়া ধ্যান করিতেছেন, তাহার নয়নদ্বয় নিমীলিত। দ্বাদশ হস্তের একটি হস্ত ভগ্ন। সে হাতখানাও অভগ্ন ছিল কিন্তু ছোট ছোট ছেলেদের ক্রীড়নক রূপে অবলোকিতেশ্বর দেব বহুকাল বিরাজমান থাকায় তাহাদিগের অত্যাচারে একটি হস্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। অবলোকিতেশ্বর দেব বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান। তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি পুরুষ মূর্তি, সেই শতদলের নিম্নাংশে আবার দুটি পদ্মকোরক, পদ্মকোরকের উভয়পার্শ্বে দুটি পুরুষ মূর্তি, উভয়ে করজোড়ে হাঁটু গাড়িয়া অর্ধোপবিষ্ট। ইহাদিগকে দেবযোনি বলিয়া অনুমিত হয়, কারণ পক্ষ রহিয়াছে, অবলোকিতেশ্বর দেবের পরিহিত বস্ত্র আজানুলম্বিত। তাহার সৌম্যশান্ত মুখশ্রী নত নয়ন, হৃদয় ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। দ্বাদশ খানা হস্ত দ্বাদশ প্রথার দ্রব্যাদি ধারণ করিয়া আছে। প্রথম দু'খানা হস্ত খোলাভাবে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর স্থাপিত, বক্রী হস্তগুলিতে ক্রমান্বয়ে সিংহ, কচ্ছপ, গ্রন্থ, জপমালা, পদ্ম বেদ, গদা ইত্যাদি ধৃত—সবগুলি পরিস্কাররূপে বুঝিতে পারা যায় না। কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্মিত বলিয়া ইহার চিত্র ভাল হয় নাই।

আমরা এখানে 'কারণ্ড ব্যূহ' হইতে অবলোকিতেশ্বর দেবের ধ্যানের উল্লেখ করিলাম ধ্যানটি এই—

"ওঁ নমো ভগবতে আর্যাবলোকিতেশ্বরায়, এবং
ময়াশ্রুতং শ্রুতমেকস্মিন্ সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্ত্যাংবিহ্বতিস্ম।
জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্যারায়ে মহাতাভিজ্ঞ সঙ্খেন...
বোধিসত্ত্বে মহাসত্ত্বে স্তদযথা বজ্রপাণিনা দশপাণিনা চ
বোধিসত্ত্বেন মহাসত্ত্বেন। দশপাণিনা বজ্রাসনেন চ

বোধিসত্ত্বেন দ্বাদশপাণিনা চ বোধিসত্ত্বেন মহাসত্ত্বেন।
গুহাসনেন চ বোধিসত্ত্বেন মহাসত্ত্বেন। আকাশ গর্ভেণ
চ বোধিসত্ত্বেন মহাসত্ত্বেন অনপারিধুত্তেন চ বোধিসত্ত্বেন
মহাসত্ত্বেন, পদ্মাপাণিনা চ বোধিসত্ত্বেন রত্নপাণিনা চ
বোধিসত্ত্বেন মহাসত্ত্বেন সমস্ত ভদ্রেন চ বোধিসত্ত্বেন
মহাসত্ত্বেন, ভৃকুটিমোদেন চ বোধিসত্ত্বেন মহাসত্ত্বেন"—

"কারণ্ডব্যূহ" (ধ্যান)—কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির অমুদ্রিত কারণ্ডব্যূহ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি হইতে এই ধ্যানটি উদ্ধৃত করা গেল।

আমি বিক্রমপুরস্থ সোনারঙ গ্রামে এক গোঁসাই বাড়ি হইতে এই মূর্তিটি সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

আজ এই মূর্তি দৃষ্টে তাহাদিগকে মনে পড়ে, যাহারা ধর্মের জন্য আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, কেমন শিল্পী তাহারা, যাহারা এমন করিয়া ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে আরাধ্যের মানসমোহন মূর্তি গড়িয়া ভাস্কর সৌন্দর্যে ও ভক্তির মাধুর্যে বিশ্বদেবতাকে ক্ষুদ্র মূর্তির মধ্যেও অসীম শক্তিময় করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহাদের সেই মহতী কল্পনা ও ভক্তিকে ধন্য।

এই অবলোকিতেশ্বর মূর্তিটির ন্যায় এরূপ সুন্দর ও ক্ষুদ্র মূর্তি এ পর্যন্ত আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা সম্পূর্ণ রকমের নূতন মূর্তি। ইনি কোন্ নামান্তর্গত অবলোকিতেশ্বর তাহাও এখন স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। যদি 'প্রবাসীর' কোন লেখক ও পাঠক এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন তবে অনুগৃহীত হইব। বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ইত্যাদি কি এই অবলোকিতেশ্বর মূর্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় না?

এই অবলোকিতেশ্বর মূর্তি দেখিতে দেখিতে আমার সেদিনের কথা মনে পড়ে, যেদিন বর্তমানের শ্মশান সদৃশ রামপালের মধ্য বৌদ্ধ যতিগণের মধুর কণ্ঠনিঃসৃত ধর্মসঙ্গীতে চতুর্দিক মুখরিত হইত, যেদিন শীলভদ্র, দীপঙ্কর প্রভৃতি মনীষিগণের দিগন্ত বিশ্রুত জ্ঞান গরিমার বাণী সুদূর তিব্বত ও চীন হইতে বিদ্যার্থিগণকে আহ্বান করিয়াছিল। যাহাদের কীর্তি গৌরব ইতিহাসের বক্ষে জীবিত রহিয়া আজ আমাদের আনন্দে উদ্ভাসিত করিতেছে, আজ সেই পুণ্যতীর্থ বিক্রমপুরের নগণ্য অধিবাসী আমি, আপনাদের নয়নসমক্ষে অবলোকিতেশ্বর দেবের মহিমামণ্ডিত চিরসুন্দর মূর্তি স্থাপিত করিয়া অতীত গৌরবকাহিনীর পুণ্যস্মৃতিতে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। আজ আমার নয়ন সমক্ষে রামপালের শ্মশানদৃশ্য দূরে চলিয়া গিয়াছে, আজ দেখিতেছি সৌধমালা পরিশোভিত, উজ্জ্বল আলোক-কণা-বিচ্ছুরিত নগরীর নাগরিক সমৃদ্ধি ও জনসঙ্ঘের কলনাদের মধ্য দিয়া রামপালের সঙ্ঘারামের শত শত ভিক্ষুগণের মধুর কণ্ঠে অবলোকিতেশ্বর দেবের ধ্যানমন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে 'ওঁ পদ্মপাণি হুঁ।' আর সেই একদিনের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত ভক্তগণের চির-আরাধ্য দেব অবলোকিতেশ্বর আপনার জড়দেহ লইয়া কালের বিজয় গৌরব ঘোষণা করিতেছেন।[১১]

* *প্রবাসী ১৩১৬ কার্তিক*

১. Walter's Yuan-Chuang.

২. Dipankar was born AD 980 in the royal family of Gaur at Bikrampur in Bangala. Indians pandits in the Lands of Snow. Page 50 by Rai Sarat Chandra Das Bahadur C.I.E.

৩. Nearly every village throughout the Buddhist Holy Land contains old Mahayna and Tantrick Buddhist Sculptures and I have also seen these at most of the old Buddhist

sites visited by me in other parts of India. J.R.A.S. 1894—L. A. Waddell M. B. M.R.A.S.'s article on the Indian Buddhist Cult of Avalokita. p 51.

৪. E. Eitels Handbook of Chinese Buddhism and Three lectures on Buddhism p. 123-131 and 2-28.

৫. E. Eitel's Three lectures on Buddhism, pp.123-137.

৬ Anderson's catalogue and handbook of Archllection. 1883 volumes.

৭. "Avalokita's image was modelled after that of the Hindoo Creator Prajapati or Brahma ; and the same type may be traced even in the monstrous images of the later Tantrik period This observation is important with reference to the original functions attributed to the god Avalokita as a Lokesvara or Lord of the World, and Prajapati or Lord of animal's and active creator of the universe, both being titles of Brahma. Though the ordinary function of Avalokita is more. strictly a preserver and defender like Vishnu his image excepting the presence of a lotus is common to Brahma and many other Hindu gods has nothing in common with that of Vishnu ; nor did he seem to be in any way related to Surya or Solar myths." J.R.A.S. of Bengal 1894. p. 57

৮. It is indeed true that Himavat is the province of Avalokitasvara's religious discipline. Indian Pandits in the Lands of Snow. Page 62, 63, by Rai Sarat Chandra Das Bahadur. C. FE p. 74.

৯. কিয়দ্দিবস হইল কলিকাতা মিউজিয়মেও একটি দ্বাদশ হস্ত বিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বর মূর্তি বিহার অঞ্চল হইতে আনীত হইয়াছে, সেটি সেদিন দেখিতে গিয়াছিলাম। এই মূর্তিটি আমার সংগৃহীত মূর্তিটি হইতে অনেক বড়, দ্বাদশ হস্ত। সর্পের ফণার নিম্নাংশ দৃষ্ট হয়, উর্ধ্বাংশ ভাঙিয়া গিয়াছে সম্পূর্ণরূপে। আমার এই অবলোকিতেশ্বর মূর্তির সঙ্গে মিলে না, বহু পার্থক্য বিদ্যমান এ মূর্তিটির শীর্ষদেশ ও নিম্নাংশ ভগ্ন।

১০. Wassiljew "Der Buddhism 1860" Buddhism in "Tibet" by Schlagintweit. Page 54.

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভায় পঠিত।

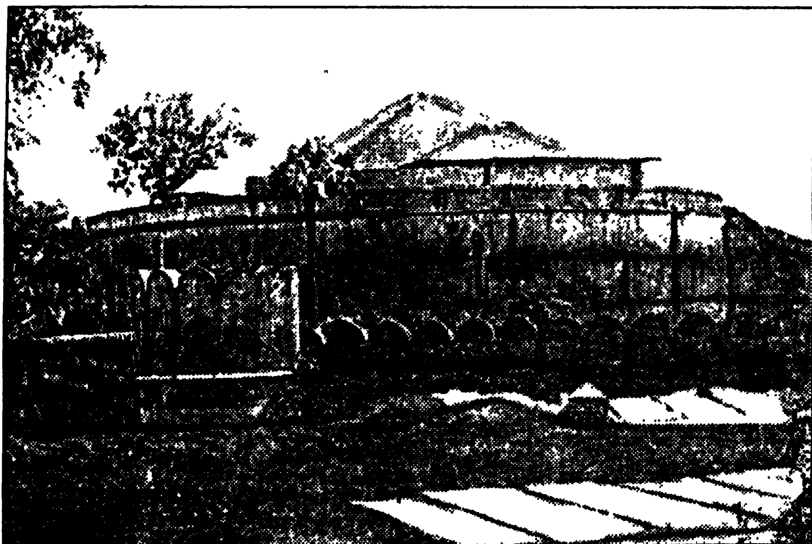
বিক্রমপুরের একটি পুরাতন দুর্গ

সুখবিন্দু সেনগুপ্ত



বিক্রমপুরে অনেক স্থানে পুরাতন ইতিবৃত্ত-সংশ্লিষ্ট অনেক জীর্ণ অট্টালিকাদি বিদ্যমান আছে, তাহা পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিবে, সন্দেহ নাই। যে সকল সুন্দর মঠ, দেবমন্দির প্রভৃতি আমাদের পূর্বপুরুষগণের গৌরবের স্মৃতি মস্তকে লইয়া দণ্ডায়মান ছিল, তাহার কোনটি বা কালের কবলে, কোনটি বা পুরাকীর্তি-সংহারিণী প্রচণ্ডপ্রবাহা পদ্মা কিংবা অন্য কোন নদীর গ্রাসে পতিত হইয়া চিরকালের জন্য আমাদের স্মৃতিপট হইতে মুছিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। পূর্বপুরুষগণের এই কীর্তিস্তম্ভগুলির বিবরণ একত্র সম্বলিত হইয়া ইতিহাসের অক্ষয় পৃষ্ঠায় স্থাপিত না হইলে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস অসম্পূর্ণ এবং অনেক পুরাতত্ত্ব অনুদ্‌ঘাটিত থাকিয়া যাইবে।

আমরা বিক্রমপুরের খ্রিস্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন দুর্গের চিত্রসম্বলিত ক্ষুদ্র বিবরণ উপস্থিত করিতেছি। দুর্গটি আয়তনে বৃহৎ না হইলেও ইতিহাসের অনেক তথ্য ইহার সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং ইতিহাসের হিসাবে ইহার মূল্য কম নহে।



বিক্রমপুরের একটি পুরাতন দুর্গ

দুর্গটি বিক্রমপুরের অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জ মহকুমার এক অতি প্রকাশ্য স্থানে অবস্থিত। সম্পূর্ণ দুর্গ এখন বিদ্যমান নাই, যাহা বর্তমান আছে তাহাও প্রাচীরপরিবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র দুর্গের ন্যায়।

পুরাতন দুর্গের ইহাই[১] বিদ্যমান আছে; অবশিষ্টাংশ নদীগর্ভে নিমজ্জিত অথবা ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে অর্ধ মাইল পর্যন্ত দুর্গের ও সৈন্যবাসের উপযুক্ত নাতিক্ষুদ্র কুঠুরি, অট্টালিকা ও প্রাচীরাদির অনেক ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, দুর্গের প্রসার এক সময়ে নিতান্ত কম ছিল না। যে সব ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে তাহাতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ নাই; সুতরাং ইহার সীমা ও পরিধি নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। দুর্গটি ইছামতী (বর্তমান ধলেশ্বরী) নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বুভুক্ষু নদী তীরবর্তী প্রাচীরাবলী গর্ভভূত করিয়া সমগ্র দুর্গটিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল; কালক্রমে নদীতে চড়া পড়িয়া দুর্গের অবশিষ্টাংশ রক্ষা পাইয়াছে এবং নদী অর্ধক্রোশ পূর্বে সরিয়া গিয়াছে। বর্তমানে দুর্গের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের ভূমিভাগ বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিলে উহার গঠন নিতান্ত আধুনিক বলিয়াই বোধ হয়। এই সব স্থানের মৃত্তিকা বালুকাময় এবং বৃক্ষাদিও ততদূর প্রাচীন নয়।

বৃহৎ দুর্গের ভিত্তিভূমি গোলাকার[২] ছিল; ইহার ভিত্তিভূমির পশ্চিমাংশ সমচতুষ্কোণ এবং পূর্বাংশ অসমান্তরাল চতুর্ভুজের ন্যায়। পশ্চিমাংশ হইতে পূর্বাংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং একটি প্রাচীন দ্বারা ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বর্তমান দুর্গের সংস্থান এবং অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে অনুমিত হয়, ইহা দুর্গের মধ্যে দক্ষিণদিকে অবস্থিত ছিল।[৩] দুর্গের এই অংশ যে পরিখা পরিবেষ্টিত ছিল তাহা প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার পূর্বদিকস্থ পরিখা একটি সুন্দর গভীর জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে এবং এই জলাশয়ের মধ্য হইতে পূর্বদিকের প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। ইহার চতুর্দিক সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত; প্রাচীরগাত্রে কামান সজ্জিত করার ছিদ্র সকল বর্তমান আছে। প্রাচীরাবলী মৃত্তিকা-নিম্নে প্রোথিত হওয়ায় উহার উচ্চতা ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে। ঐ দুর্গের চারিকোণে বৃত্তাকার চারিটি উচ্চতর প্রাচীর আছে; তাহাও প্রাচীরগাত্রের ন্যায় সচ্ছিদ্র। পূর্বাংশে উত্তর-পূর্বকোণেও ঐরূপ একটি গোলাকার প্রাচীর আছে; তাহা আয়তনে উক্ত চারিটি হইতে ছোট। পশ্চিমাংশের প্রাচীরাবলী উচ্চতায় স্থানে স্থানে ১২ ফিট হইবে; পূর্বাংশে ইহার উচ্চতা কোথাও ৩ ফিট, কোথাও বা ৪ ফিটে পরিণত হইয়াছে। এই দুর্গে কোন স্থাপত্যবিদ্যার নির্দশন নাই সত্য, কিন্তু ইহার গঠনপ্রণালী অতীব সুন্দর এবং দৃঢ়। আজও ইহার প্রাচীরাবলী বজ্র সদৃশ কঠিন। চতুর্দিকস্থ প্রাচীর ৩ ফিট পুরু এবং উপরিভাগ সমতল না হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ধবৃত্তাকারে সংবদ্ধ হইয়াছে। দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিবার একটি মাত্র তোরণদ্বার। এই দ্বারটি পশ্চিমাংশের উত্তরদিকস্থ প্রাচীরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা উচ্চে ১২ ফিট ও প্রস্থে ৯ ফিট এবং ইহার বেধ ৭ ফিট।

দুর্গের মধ্যে পূর্বাংশে ইস্টকনির্মিত একটি সুবৃহৎ "টিলা" (?) আছে। এই টিলা এক সময়ে খুব উচ্চ ছিল এবং ইহার উপর হইতে সৈন্যদল বিপক্ষীয় রণতরী সকল পর্যবেক্ষণ করিত। ইহাও ক্রমে মৃত্তিকানিম্নে প্রোথিত হইয়া যাইতেছে। আজও উচ্চে উহা ৪৫ ফিটের কম হইবে না এবং ইহার উপর হইতে নদী দৃষ্টিগোচর হয়। এই টিলার গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর, ঐরূপ প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার চতুর্দিক নিখুঁত গোলাকার। ইহার উপরিভাগ (ছাঁদ) খিলানের ওপর স্থাপিত। ভিতর পূর্বে ফাঁপা ছিল, পরে উহা সর্পসমাকীর্ণ হইয়া বিপজ্জনক হওয়ায় মৃত্তিকা ও বালুকা দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছে। টিলার মধ্যে প্রবেশ করিবার একটি মাত্র দ্বার ছিল, তাহাও জীর্ণ। সংস্কারের সময় একেবারে রুদ্ধ করা হইয়াছে। ঐ দ্বার হইতে তলদেশ পর্যন্ত যে সিঁড়ি ছিল, তাহা বংশখণ্ড সাহায্যে প্রমাণিত হইত। এই টিলাটির আয়তন কত বড় হইবে, তাহা চিত্রদৃষ্টেই কতক বুঝিতে পারা যায়। ইহার ব্যাস ৩০ গজ। বর্তমান দুর্গের পরিধি ৬০০ গজের কম নয়।

সম্ভবত এই ক্ষুদ্র দুর্গমধ্যে যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র এবং ধন রক্ষিত হইত; সেজন্যই ইহাকে

দুর্গমধ্যে স্থাপন করিয়া ইহার রক্ষার নিমিত্ত নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। কিম্বদন্তী এইরূপ টিলার মধ্যে ধনাগার স্থাপিত ছিল। এই দুর্গের মধ্যভাগে পশ্চিমাংশে একটি জলাশয় আছে এবং সেই জলাশয় হইতে টিলার উপরিভাগে পর্যন্ত প্রশস্ত সিঁড়ি আছে। এই সোপানাবলীর বামপার্শ্বে নিম্নে একটি গোলাকার কুঠুরি দৃষ্ট হয়; লোকে বলে, উহাতে বারুদ রক্ষিত হইত। ইহাও জীর্ণ সংস্কারের সময় রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

টিলার উপর হইতে দক্ষিণপূর্বকোণে নিম্নাভিমুখে একটি সংকীর্ণ রাস্তা আছে। সম্ভবতঃ ইহা গুপ্তদ্বার রূপে ব্যবহৃত হইত। এই রাস্তার পার্শ্বভাগেই টিলার মধ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার ছিল। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, যাহারা শত্রুগতিরোধ এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই বিপুল আয়োজন করিয়াছিল, তাহারা পলায়নের সুবন্দোবস্ত করিতেও ত্রুটি করে নাই। যে দূর্গ একদিন শত শত সৈন্যের ভীষণ হুঙ্কারে ও কলরবে এবং অগ্নিবর্ষী কামানের হৃদয়দ্রাবী শব্দে ও অস্ত্রের ঝনঝনায় শব্দায়মান ছিল, আজ তাহা শান্তিপ্রিয় বাঙালি ডেপুটির বাঙ্‌লা, তৎসমীপবর্তী জেলখানা এবং জন কত পুলিশ প্রহরীর আবাসে পরিণত হইয়াছে। ডেপুটির বাঙ্‌লা টিলার ওপর অবস্থিত। যখন মুন্সিগঞ্জে মহকুমা স্থাপিত হয় এবং তদপুযোগী স্থান পরিষ্কৃত করা হয়, তখন এই দুর্গ জঙ্গল-সমাকীর্ণ ছিল। আজ ইহা পরিষ্কৃত হইয়া সুরম্য প্রাসাদে পরিণত হইয়াছে।

দুর্গের চিত্র স্বতন্ত্র পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। উহা দুর্গ মধ্যস্থিত জলাশয়ের পশ্চিম পার হইতে তোলা হয়। সুতরাং ইহাতে চতুর্দিকস্থ প্রাচীরাবলী সম্যক্ দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল জলাশয় হইতে উত্থিত সোপানাবলী, টিলা, তদুপরিস্থ বাঙ্‌লা, দুর্গের মধ্যস্থ প্রাচীরের কিয়দংশ এবং নিম্নে সোপানাবলীর বামপার্শ্বের গোলাকার কুঠুরি মাত্র দেখা যায়।

দুর্গটি ১৬৬০ খ্রিঃ অব্দে মোঘল সম্রাট আরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে বাংলার সুবেদার মীর জুমলা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। টেলার সাহেব তাহার "Tropography of Dacca"-তে এই দুর্গের উল্লেখ করিয়াছেন ; ক্লে সাহেব কৃত "Principal Heads of the History & Statistics of the Dacca Division"-এ ইহার যে ক্ষুদ্র বিবরণ আছে, তাহাতে ইহা "ইদ্রাকপুর কেল্লা" নামে বর্ণিত। তখন ঐ স্থানের নাম ইদ্রাকপুর ছিল এবং ঐ স্থানের নামানুসারে দুর্গের নামকরণ হইয়াছিল। "মুন্সিগঞ্জ" নাম খুব আধুনিক, ইহা সম্ভবতঃ স্থানীয় মুসলমান জমিদারের নাম হইতে উদ্ভুত। বর্তমান সময়েও মুন্সিগঞ্জের এক অংশের নাম ইদ্রাকপুর। টেলার সাহেব ১৮৩০ খ্রিঃ অব্দে এই স্থানে দুর্গ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তখনও দুর্গ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল এবং নদী ঐ স্থান আক্রমণ করে নাই। সেই সময়ে তিনি ঐ স্থানে অনেক অট্টালিকা ও ঘাট ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, ইদ্রাকপুর মুসলমান রাজত্ব সময়ে পূর্ব-বাংলার একটি প্রধান নগর ছিল এবং ঐ স্থান হইতে বিক্রমপুর পরগণার জলকর, শুল্ক ইত্যাদি সংগৃহীত হইত। টেলার সাহেব এই দুর্গ সম্বন্ধে অতি সামান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কি উদ্দেশ্যে এই দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল, তাহা আলোচ্যের বিষয়। ইদ্রাকপুরের ভৌগলিক সংস্থান পর্যালোচনা করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, বাংলার তদানীন্তন রাজধানী ঢাকা নগরীকে সুরক্ষিত করিবার জন্য ঐরূপ স্থানে দুর্গ নির্মাণ করা আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ইদ্রাকপুর মেঘনা, ধলেশ্বরী ও লক্ষ্যা এই তিন নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। পূর্ব-বাংলা নদীবহুল স্থান; শত্রুগণের ঐ প্রদেশ আক্রমণ করিতে হইলে জলযুদ্ধ ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না এবং সাধারণত ঐ প্রদেশে নৌযুদ্ধই সংঘটিত হইত। ইদ্রাকপুর যেরূপ স্থানে স্থাপিত, তাহাতে ইহাকে ঢাকাতে প্রবেশদ্বার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঢাকানগরী আক্রমণ করিতে হইলে ঐ স্থান অতিক্রম করিতে হইত এবং ঐ পথ ভিন্ন অন্য জলপথ ছিল না। সুতরাং ঐ স্থান সুরক্ষিত হইলে ঢাকা একরূপ শত্রু-আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইবে সেই উদ্দেশ্যে এই দুর্গ ইছামতী নদীর দক্ষিণপারে স্থাপিত হয়। নদীর অপরপারে হাজিগঞ্জে এইরূপ অন্য একটি দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল ; তাহারও

ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্তমান আছে। এই উভয় দুর্গ আফগান (পাঠান), আসামী, ফিরিঙ্গি ও মগ প্রভৃতি শত্রুগণের আক্রমণের প্রতিরোধ করিত।

ঢাকা নগরী সংরক্ষিত করা ব্যতীত এই দুর্গস্থাপনের অন্য এক মহত্তর উদ্দেশ্য ছিল। একদিকে পূর্ববঙ্গবাসী যেমন আসামী ও আফগানের আক্রমণে বিপর্যস্ত, তেমনি মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুর অত্যাচারেও উৎপীড়িত হইয়াছিল। নদীবহুল পূর্ব-বাংলায় এই ফিরিঙ্গি ও মগের প্রকোপ এত বাড়িয়া উঠে যে, ইহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত মুসলমান শাসন কর্তাদিগকে নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়, ইদ্রাকপুরে ও হাজিগঞ্জে দুর্গ-স্থাপন ইহার একতম উপায়। পূর্ববঙ্গবাসীদিগকে মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার হইতে উদ্ধার করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ঐতিহাসিকগণও—(রিয়াজ্ উস্-সালাতিন্ রচয়িতা মিরজা মহম্মদ কাজেম প্রভৃতি) লক্ষ্যা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে মীরজুমলা কর্তৃক নির্মিত নৌদুর্গের (Naval fort) নির্দেশ করিয়াছেন।

মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুগণের অত্যাচারে সমগ্র বঙ্গভূমি সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের ঘৃণিত ও পশুতুল্য অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিলে আজও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। তৎকালে একমাত্র আরাকান প্রদেশেই গোয়া, কোচিন, মালাক্কা প্রভৃতি স্থান হইতে নির্বাসিত চরিত্রহীন ফিরিঙ্গিগণের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। আরাকান-রাজ মোঘলের আক্রমণ হইতে সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার নিমিত্ত ইহাদিগকে চাটগাঁও বন্দরে স্থাপন করে এবং সেখানে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। তখন চাটগাঁও "পোর্ট গ্রান্ডো" (Port Grando) নামে অভিহিত হইত এবং উহা মগরাজের অধীনে ছিল। ফিরিঙ্গিগণ ঐ স্থানে বাস করিত এবং নানারূপ দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। এই উদ্দেশ্যে তাহারা এত ঘৃণিত ও নিষ্ঠুর কার্য করিত যে তাহা শ্রবণ করিলে তাহাদিগকে সভ্য-জাতির সন্তান বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। ইহারা যে কেবল বঙ্গোপসাগরের উপকূলের আতঙ্ক-স্বরূপ হইয়াছিল তাহা নহে, ইহারা মগগণের সহিত মিলিত হইয়া উন্মুক্ত নৌকায় আরোহণ করিয়া পদ্মা, মেঘনা এবং তাহাদের শাখানদীর ও খাড়ির মধ্যে ভ্রমণ করিয়া লোকজনের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিত। তাহারা নদীতীরস্থ গ্রামে গিয়া গ্রাম জ্বালাইয়া দিত এবং স্ত্রী-পুরুষ সকলকে ধরিয়া লইয়া যাইত। অক্ষম বৃদ্ধদিগকে অসহনীয় নির্যাতন করিয়া ছাড়িয়া দিত ; কিন্তু যুবক ও প্রৌঢ়গণকে লইয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত, অথবা তাহাদিগকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া স্বীয় দলভুক্ত করিয়া লইত। হাট বসিবার দিনে, বিবাহ দিবসে বা অন্য কোন পর্বোপলক্ষে যখনই লোক সমাগম হইত, তখন তাহারা অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া সমবেত জনসঙ্ঘের উপর পতিত হইত এবং তাহাদিগকে হত্যা করিয়া অথবা বন্দি করিয়া লুণ্ঠনকার্য সমাধা করিত। ইহাদের অত্যাচারে গঙ্গা ও পদ্মার মোহনাস্থিত অনেক স্থান জনশূন্য হইয়া ব্যাঘ্র-ভল্লুকের আবাসরূপে পরিণত হইয়া যায়।[৫] আজও পূর্ববঙ্গবাসী বিশেষত ঢাকা অঞ্চলের লোক ফিরিঙ্গি ও মগের নাম শুনিলেই ভীত হইয়া উঠে। বর্নিয়ার সাহেব ইহাদের অমানুষিক অত্যাচার-কাহিনী তাহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বিবৃত করিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে ক্রোধ ও ঘৃণায় শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ফিরিঙ্গিরা জাতিতে খ্রিস্টান হইলেও ইহাদের আচার-ব্যবহার বর্বরের তুল্য ছিল। তখনকার ভ্রমণকারী বর্নিয়ার সাহেবের উক্তি তাহার সমর্থন করিতেছে।

সুদক্ষ ও দূরদর্শী মীরজুম্‌লা আসামী ও কোচগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্বে পূর্ব-বাঙ্গালা মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার[৬] হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইছামতীর দুই পারে (ইদ্রাকপুর ও হাজিগঞ্জে) এই দুই দুর্গ স্থাপন করেন এবং তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য অতিরিক্ত সৈন্যও নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে পুনরায় "নাওয়ার মহল" গঠিত হইয়াছিল। উক্ত উভয় দুর্গেই একই প্রকারের দুইটি উচ্চ টিলা নির্মিত হয়। এই টিলার উপর হইতে সৈন্যদল শত্রুর রণতরী সকল পর্যবেক্ষণ করিত এবং সর্বদা স্বপক্ষীয় রণতরী সকল ঘাটে বাঁধা থাকিত। শত্রু

দৃষ্টিগোচর হইলে সৈন্যদল রণতরী আরোহণ করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিত। এইরূপে মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার নিবারিত হয়। মীরজুম্‌লার শাসন সময়েই বাংলায় মোগল-শাসন সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং পূর্ববঙ্গবাসী মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়া শান্তিসুখভোগে সমর্থ হয়।

ঐ দুর্গ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। এই দুর্গ-বিষয়ে প্রচলিত কিংবদন্তী এবং লোকমতের সঙ্গে ঐতিহাসিক কোন সত্যের সামঞ্জস্য নাই। স্থানীয় লোকের কাহারও কাহারও বিশ্বাস "ইহা "মগের কেল্লা", কাহারও ধারণা ইহা পর্তুগিজের স্থাপিত। শেষোক্ত দল তাহাদের মত সমর্থন করিবার জন্য এই দুর্গ হইতে ১ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে স্থাপিত "ফিরিঙ্গি বাজার" গ্রাম নির্দেশ করেন। তাহারা বলেন, "ফিরিঙ্গি-বাজারে" পর্তুগিজগণ বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত এই স্থানে দুর্গ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু উভয়পক্ষের ধারণাই যে ভ্রমমূলক তাহা ঐতিহাসিক আলোচনা করিলে সম্যক্ উপলব্ধি হয়। প্রাচীন বাংলায় ইতিহাসে ফিরিঙ্গি-বাজারের নামোল্লেখ আছে।

নবাব মীর জুম্‌লা মুজায়েম খাঁর মৃত্যুর পর মগগণের শক্তি আবার বাড়িয়া উঠে। এই সময় নবাব সায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন। তিনি ঢাকায় আসিয়া মগ ও পর্তুগিজের সমূল-উচ্ছেদ করিবার সংকল্প করেন এবং বহুসংখ্যক রণতরী ও সৈন্যবল সহ হোসেন বেগকে চাটগাঁও প্রেরণ করেন। এই সময় পর্তুগিজগণের কোন পৃথক অস্তিত্ব ছিল না; তাহারা মগদের সহিত মিলিত হইয়া কার্য করিত এবং আরাকান-রাজার অধীন ছিল। হোসেন বেগ পর্তুগিজগণকে ভয় প্রদর্শন করেন এবং আরাকানরাজও তাহাদিগকে অবিশ্বাস করেন। উপায়ন্তর না দেখিয়া ফিরিঙ্গিগণ হোসেন বেগের শরণাপন্ন হয় এবং কতক মোঘলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মগদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও সৈন্য দলভুক্ত হয়। (এই যুদ্ধে মগগণ পরাভূত হয় এবং চাটগাঁও মোঘলের করায়ত্ত হইয়াছিল।) অবশিষ্ট সকলকে হোসেনবেগ ঢাকায় সায়েস্তা খাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাহাদিগকে "ফিরিঙ্গি-বাজারে" স্থাপন করেন। তদবধি এই স্থানের নাম ফিরিঙ্গি-বাজার হইয়াছে। মোঘল রাজত্বের সময় ফিরিঙ্গিবাজার একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত হইয়াছিল। ঢাকা নগরীর অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এই স্থানেরও অবনতি এবং অধুনা ফিরিঙ্গিবাজার একটি গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে। স্টুয়ার্ট সাহেব ও টেলার সাহেব এই স্থানের বিবরণ তাহাদের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এখনও ঐ স্থানে ফিরিঙ্গিদের বংশধরগণ বাস করে। ইহারা এখন ব্যবসা ছাড়িয়া লাঙল ধরিয়াছে, এবং ইহাদের সঙ্গে বর্তমান দেশিয় কৃষকের কোনই পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। সেখানে একটি গির্জাঘর আছে, তথায় একজন রোমান কাথলিক পাদরি আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করেন এবং ইহারা প্রতি রবিবারে গির্জাঘরে গিয়া থাকে। কিন্তু মহামারী কিংবা বসন্তের প্রকোপ হইলে ইহারা রক্ষাকালী ও শীতলা দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করে। দুই বৎসর হইল মুন্সিগঞ্জের নিকটবর্তী দেওভোগ-নিবাসী একজন ভদ্রলোক এই স্থানে মৃত্তিকা নিম্নে "দুই জোড়া কাঁটা চামচ" পাইয়াছিলেন। ইহাদের ঐতিহাসিক মূল্য আছে স্বীকার করিতে হইবে। এ ছাড়া আরও অনেক ভগ্ন ইমারত ও পুরাতন ইস্টকাদি ইহার অতীত গৌরব ও কালের কঠোর শাসনের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

(১) চারি বৎসর অতীত হইল স্থানীয় ভূতপূর্ব সবডিভিসনল অফিসার শ্রীধুত সুরেশচন্দ্র সিংহ মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে এই অংশের জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে।

(২) See Hunter's Statistical Account of Dacca. P. 72

(৩) বর্তমান দুর্গের বহির্ভাগে কিছু উত্তরে একটি সুন্দর মসজিদ আছে। এই স্থানে নাকি পূর্বে একটি পুরাতন মসজিদ ছিল এবং তাহা বৃহৎ দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল; পরে তাহা সংস্কৃত হইয়া বর্তমান সুন্দর নতুন মসজিদে পরিণত হইয়াছে।

(৪) See Taylor's Topography of Dacca – p. 76 and Clay's Principal Heads of the History and Statistics of the Dacca Division. p. 35

(৫) In Major Rennell's Bengal Atlas a considerable district marked as "Lands depopulated by the Maghs."

(৬) মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার সেই সময় কিরূপ ভীষণ ও বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তৎসাময়িক গ্রন্থাদিতেও তাহার আভাষ পাওয়া যায়। ইহারা যে সকলকে ধরিয়া লইয়া যাইত, তাহা কবিকণ্ঠহার প্রণীত সদ্বৈদ্যকুলপঞ্জিকা গ্রন্থের একটি শ্লোকে প্রমাণিত হয়। মগেরা বৈদ্যজাতীয় জনৈক ভদ্রলোকের একমাত্র পুত্রকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া যায়, তাহাতে তাহারা বংশ একেবারে বিলুপ্ত হয়। শ্লোকটি এই—

"মহেশসেনজাভর্ত্তুর্গোপীনাথাৎ সুতো ভবেৎ।
চাটীগ্রামমসৌ নীতোবলান্মবচমুচরৈঃ।"

অর্থাৎ "মহেশ সেনের জামাতা গোপীনাথের একমাত্র পুত্র ছিল, তাহাকে মগেরা বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া যায়।" এই গ্রন্থ ১৫৭৫ শক (১৬৫৩ খৃঃ অব্দে) রচিত হইয়াছিল সুতরাং শ্লোকটি সেই সময়ের মগের অত্যাচারের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইহা শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন সঙ্কলিত কবিকণ্ঠহারের ৫৭ পৃষ্ঠায় আছে।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা - সংখ্যা ৪-১৩১৬ সন

বিক্রমপুর অঞ্চলের খেলার বিবরণ



বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত

বঙ্গদেশীয় খেলাগুলি বাঙালির ঐতিহাসিক ভাণ্ডারের সামগ্রী ঃ

বাংলাদেশের ইতিহাস নাই। কেবল চিরপ্রচলিত এমন কতগুলি জাতীয় প্রথা ও অনুষ্ঠান আছে, যাহাদের গৌরব আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। এই নিজস্ব জাতীয় গৌরবের রত্নরাজি অনুসন্ধান করিতে এখন অনেকেই পল্লীপ্রান্তের নিভৃতগৃহে প্রবেশ করিতেছেন। এই লুপ্তপ্রায় ও অনেকাংশে বিকৃত সামগ্রী সকল অতীতের অতলগর্ভ হইতে পুনরুদ্ধার করিতে কত ত্যাগশীল, কর্মবীর, মহাপ্রাণ ব্যক্তির রক্তরাশি ব্যায়িত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এই বিক্ষিপ্ত রত্নরাজির একটি সুগ্রথিতহার, কোন দিন বাংলাভাষার কণ্ঠশোভন করিবে কি না, ভগবান জানেন; কিন্তু সহৃদয় ও চিন্তাশীল সুধীবর্গের নিকট ইহাদের গৌরব কিছুমাত্র হ্রাস পাইবে না। প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তিই দেশপ্রচলিত চিরন্তন প্রথা ও অনুষ্ঠানগুলিকে সম্মানের চক্ষে দেখিবেন। তাহারা কত যুগ-যুগান্তের সাক্ষী, তাহা কে নির্ণয় করিবে? কত ঝঞ্ঝা, কত বিপ্লব দেশের উপর দিয়া চলিয়া গিয়েছে, কিন্তু তাহারা সেই ঝঞ্ঝা, বিপ্লব অগ্রাহ্য করিয়া আপন গৌরবে এখনও পল্লীপ্রান্তের শীতল ছায়ায় বিরাজ করিতেছে। এই প্রাচীনত্বের নিকট মস্তক আপনিই অবনত হয়। যে পিতৃপুরুষগণের পুণ্যকাহিনী স্মরণ করিয়া কৃতার্থ হই, যাহাদের কীর্তিকলাপের গৌরবে হৃদয় স্পন্দিত হয়, যাহাদের পুণ্যনামে এখনও আমরা দশ জনের মধ্যে মস্তকোত্তোলন করিয়া দাঁড়াইতে পারি, সেই বিরাট পুরুষদের শৈশব সুলভ কত কলহ ও বন্ধুত্ব, কত বিচ্ছেদ ও মিলন, কত হাসি ও অশ্রু, কত হর্ষ ও ব্যথা, এই সকল খেলার প্রতি অঙ্গে জড়িৎ রহিয়াছে, তাহা অবশ্যই ভাবিবার জিনিষ। এই পুণ্যস্মৃতিজড়িত রত্নরাজি আমাদের গৌরবের ধন, ইহাদের বিষয় আলোচনা করিলেও পুণ্য সঞ্চয় হয়।

খেলার বিবরণ সংগ্রহ পরিষদের একটি কার্য ঃ

সাহিত্যপরিষদের ছাত্রসভ্যরূপে বিক্রমপুর অঞ্চলের খেলার বিবরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহাই আজ ব্যক্ত করিব। দুঃখের বিষয় যে, কালমহিমায় অনেক খেলা লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, বিদেশি বন্যায় যখন সমস্ত দেশেই ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন এসব খেলাগুলি যে কিছু লুপ্ত, কিছু বিকৃত হইবে না, সে আশা করা বিড়ম্বনা। তবে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে পড়িলে, তাহা হইতে অনেক সুন্দর তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে। "খেলা" শব্দের অর্থ বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করিলে খেলাগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। ইংরাজি যাহাদিগকে outdoor games বলে, সাধারণ বাংলা ভাষায় তাহাদিগকে "চলতি খেলা" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। তদনুযায়ী indoor games গুলির নাম "বসতি খেলা" রাখা গেল। আমরা যে অর্থে "চলতি খেলা" কথাটা ব্যবহার করিব, outdoor games ঠিক সেই অর্থ প্রকাশ করে। যে সব খেলা খেলিতে বহিঃপ্রাঙ্গণের প্রয়োজন হয়, ঘরে যে সব খেলা খেলা যায় না তাহাদিগকে outdoor games বলে। আমাদের "চলতি খেলা" কথার অর্থ—যে সব খেলার হস্তপদাদির চালনা প্রধান অঙ্গ। একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাইতেছি। "মুগুর ভাঁজাকে" outdoor game না বলিয়া indoor game বলিলে ক্ষতি নাই। কারণ ঘরে থাকিয়াও মুগুর ভাঁজা যায়, সে

** (১৩১৪। ২রা চৈত্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দশম মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধ-লেখক কর্তৃক পঠিত।)*

জন্য কোনও বহিঃপ্রাঙ্গণের দরকার হয় না। কিন্তু মুগুর ভাঁজাকে 'চলতি খেলা' না বলিয়া 'বসতি খেলা' বলিতে পারি না। বুকডন, 'উঠবস' প্রভৃতি খেলাও indooer, কিন্তু "চলতি খেলা'। তবে আমরা বুঝিলাম যে, হস্ত পদাদির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চালনা যে সব খেলার প্রধান অঙ্গ তাহাদিগকে 'চলতি খেলা' বলিব। আর যে সব খেলায় হস্তপদাদির চালনার আবশ্যকতা বিশেষ নাই, বসিয়া বসিয়া শুধু বুদ্ধিবৃত্তিরই চালনা করিতে হয়, তাহাদিগকে আমরা "বসতি খেলা" বলিব। "চলতি" ও 'বসতি' এক আধটির মধ্যে গ্রাম্যতা-দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের মনোভাব জ্ঞাপক, অথচ সহজবোধ্য এবং আলোচ্য খেলাগুলির নামোপযোগী আখ্যা, এই দু'টি ছাড়া আর পাইলাম না। তবে পাণ্ডিত্যের খাতিরে 'চলতি খেলাকে' 'শরীর খেলা' এবং 'বসতি খেলাকে' 'মানস খেলা' বলা যাইতে পারে। কারণ চলতি খেলায় সাধারণতঃ এবং প্রধানতঃ শারীরিক অনুশীলন এবং বসতি খেলায় প্রধানতঃ মানসিক অনুশীলন হয়। কিন্তু এইরূপ নামকরণে 'খেলা' কথাদ্বারা যে ভাব জ্ঞাপিত হয়, তাহার সঙ্গে যে মধুর সহজ সরলতার কথা মনে পড়ে, তাহা নষ্ট হয়।

চলতি খেলার শ্রেণীবিভাগ (ক) সমদল (খ) অসমদল ঃ

'চলতি' খেলার মধ্যে বিক্রমপুরে, ডুগুডুগু, দাড়িয়া-বান্ধা, গোল্লাছুট, চোখবুজানি বা লুকোচুরি, ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এই খেলাগুলির মধ্যে আবার শ্রেণীবিভাগ করা যায়। হাডুডুডু, দাড়িয়া-বান্ধা, ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলাতেই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলে খেলোয়াড়দের সংখ্যা সমান থাকে, কিন্তু ছোট ছোট এমন অনেকগুলি খেলা আছে, যাহাতে একদলে শুধু একটিমাত্র খেলোয়াড় থাকে অন্যদলে একাধিক খেলোয়াড় থাকে, যেমন— লুকোচুরি। এই খেলাতে একজন লোক 'চোর' হয় এবং তাহার অবশিষ্ট খেলোয়াড়গণ দলবদ্ধ হইয়া, তাহার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য যত্নবান হয়। যে খেলাতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলে সমান সংখ্যক খেলোয়াড় থাকে, সে খেলাকে সমদল আখ্যায় অভিহিত করিব এবং যে খেলাতে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলে খেলোয়াড়দের সংখ্যা অসমান থাকে, তাহাকে অসমদল খেলা বলিব। এখানে একথা বলা আবশ্যক যে উভয়দলের শক্তি ও সুবিধার সামঞ্জস্য করিবার জন্য অনেক সময় সমদল খেলা গুলিতেও দুইদলে খেলোয়াড়দের সংখ্যা অসমান হয়। যেমন হাডুডু খেলায় একদলে যদি তিনজন খুব ভাল খেলোয়াড় থাকে, অন্যদলে পাঁচজন বা ছয়জন অপটু খেলোয়াড় থাকিতে কোন আপত্তি হয় না। কিন্তু ইহা শুধু সাময়িক সুবিধার জন্য উভয় দলের অনুমোদিত সাময়িক নিয়ম। খেলার প্রকৃত নিয়মের সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ নাই।

সমদল খেলার ও অসমদল খেলার দৃষ্টান্ত ঃ

সাধারণত সমদল খেলাগুলি অধিকবয়স্ক ছেলেদের মধ্যে প্রচলিত। অসমদল খেলাগুলি অল্পবয়স্ক ছেলেদের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। অসমদল খেলায় একদলে একটিমাত্র খেলোয়াড় থাকে এবং সাধারণত সে 'চোর' নামে অভিহিত হয়, যেমন লুকোচুরি খেলায় 'চোর'। বিক্রমপুরে প্রচলিত অসমদল খেলাগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি খেলা বালকদের বড় প্রিয়, গ্রাম্যপরিভাষাতেই নামগুলি রাখা গেল—চোখ-বুজানি, লোস্তা, কুমির কুমির, ডগারে ডগা, ল্যাদোর ল্যাদোর বা বসুমতী, বাইগণ টিপটিপি, নলডুবানি ইত্যাদি। সমদল খেলার মধ্যে, হাডুডু, গোল্লাছুট, দাড়িয়া-বান্ধা, বুড়িছি, ডাণ্ডাগুলি, ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

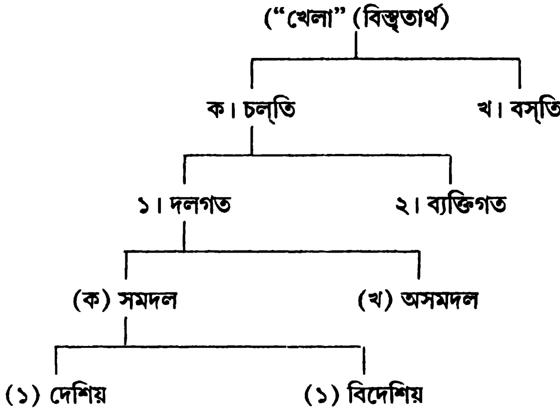
(ক) সমদল খেলা দেশিয় ও বিদেশিয় ঃ

সমদল খেলাগুলিকে আবার দেশিয় ও বিদেশিয় এই দু'ই ভাগে বিভক্ত করা যায়। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ও ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি বিদেশিয় খেলাগুলি আমাদের গ্রামে গ্রামে বেশ প্রচলিত হইয়াছে। অসমদল খেলাগুলির মধ্যে কোন বিদেশিয় খেলা দেখি না।

দলগত ও ব্যক্তিগত খেলা সমদল ও অসমদল ঃ

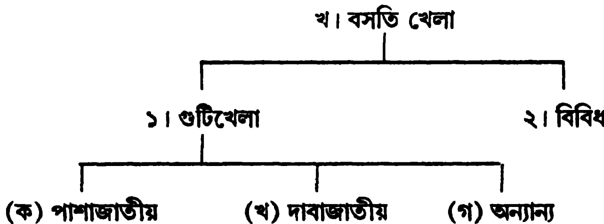
চলতি খেলার মধ্যে যে সব খেলায় দল করিয়া খেলা হয় এতক্ষণ পর্যন্ত সে সব খেলার

কথাই হইল। কিন্তু আমরা খেলার অর্থকে একটু বিস্তৃত করিয়া বুঝাইব। মুগুরভাঁজা, মেটে ডন প্রভৃতিকে খেলার মধ্যে ধরিয়াছি। অথচ সব খেলাতে দল বাঁধিবার কোন দরকার হয় না। কাজেই প্রথমত খেলাগুলিকে দলগত ও ব্যক্তিগত এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। তাহা হইলে মোটের উপর আমরা এ পর্যন্ত নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ পাইলাম।



পাশাজাতীয় ও দাবাজাতীয় খেলার দৃষ্টান্ত ঃ

বসতি খেলার মধ্যে অধিকাংশই গুটিখেলা। অন্য রকমেরও দুই চারটি খেলা আছে। গুটি খেলার মধ্যে কতকগুলি আবার দাবাজাতীয়, কতকগুলি পাশাজাতীয়। পাশাজাতীয় খেলা তাহাদিগকে বলিব যে সব গুটিখেলায় পাশাখেলার মত "দান" ফেলিতে হয়। আর যে সব খেলায় "দান" না ঢালিয়া শুধু দাবাখেলার মত চাল দিতে হয়, তাহাদিগকে দাবাজাতীয় খেলার অন্তর্ভুক্ত করা গেল। একটি কি দুইটি গুটিখেলা আছে, যাহাদিগকে এই দুই বিভাগের কোন বিভাগেই রাখা যায় না। বিক্রমপুরে পাশাজাতীয় গুটিখেলার মধ্যে, পাশা, দশপঁচিশ, ছক্কা পাঞ্জা, অষ্টাঅষ্টা প্রভৃতি সুপরিচিত। দাবাজাতীয় খেলার মধ্যে দাবা, ষোলগুটি, মঙ্গলপাটা, তিনগুটি, বাঘচাল, ২৪ গুটি বাঘচাল, ১২ গুটি পাইট পাইট, ৩ গুটি পাইট-পাইট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এতদবহির্ভূত গুটিখেলার মধ্যে, ফুলফুল, জোড়বেজোড়, ও টোক্কাটাক্কি শুধু এই তিনটি খেলার নাম কার যাইতে পারে। গুটিখেলা ছাড়া অন্যান্য যে বসতিখেলা আছে, তাহার মধ্যে বুদ্ধিমন্ত, তাস, রসকস, আপিলাজাপিলা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। নিম্নে বসতিখেলার একটি মোটামুটি শ্রেণীবিভাগ দেওয়া হইল :



বিক্রমপুরে প্রচলিত খেলার শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আশাকরি আপনারা এই আলোচনাটুকু হইতে একটা পরিষ্কার ধারণা করিতে পারিবেন। অন্যান্য স্থানের খেলাগুলি সম্বন্ধে এ শ্রেণীবিভাগ খাটে কিনা তাহা আলোচ্য নহে।

সমদল খেলার খেলোয়াড় মধ্যে দল বিভাগ করিবার প্রচলিত নিয়ম ঃ

এইখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার। সমদল চলতিখেলা গুলিতে, দুইদল সমান ভাগ হয় এবং অসমদল খেলাতে দুইদলের খেলোয়াড়দের সংখ্যা অসমান থাকে। সমান হউক বা অসমান হইক, দল দুটি ভাগ করিবার একটি সুন্দর আমোদপ্রমোদ রীতি বিক্রমপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। খেলোয়াড়দিগকে দুইদলে ভাগ করিয়া নেওয়ার নাম (গ্রাম্য পরিভাষায়) 'বাঁটিয়া নেওয়া'। 'বাঁটা' শব্দের অর্থ বাঁটকরা অর্থাৎ বণ্টন করা। খেলার পূর্বে দল বাঁটিবার নিয়ম এই—

সমদল খেলায় দলবিভাগ প্রণালী ঃ

সমদল খেলাগুলিতে প্রথমত দুইজন 'রাজখেড়ু' নির্বাচিত হয়। 'রাজখেড়ু' শব্দটা একটু বুঝা দরকার। বিক্রমপুরে খেলোয়াড়কে 'খেড়ু' বলে। 'রাজখেড়ু' কথার অর্থ খেলোয়াড়দের রাজা। এই 'রাজখেড়ু' দুইজন দুই দলের সর্দার হয়। 'রাজখেড়ু' নির্বাচিত হইলে পরে দুইজন করিয়া এক একটি দল করা হয়। এই ক্ষুদ্র দুইদল করিবার সময় দেখিতে হয় যে, দলস্থ দুইজন যেন খেলাতে সমান পটু হয়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলিকে খেলার পরিভাষায় 'কাচ' বলা হয়, তদনুসারে 'রাজখেড়ু' দুইজনের দলটিকে 'রাজকাচ' বলা যায়। 'রাজখেড়ু' দুইজন একজায়গায় বসিয়া থাকে, আর অন্যান্য দলগুলি দূরে গিয়া নিজেদের এক একটা কল্পিত নাম রাখিয়া আসে। এক নাম রাখিবার কোনও নিয়ম নাই। যাহার যাহা ইচ্ছা সেই নাম রাখে। তবে নিম্নোক্ত নামগুলি সমাধিক প্রচলিত। যথা, বন্দুক ও কামান, সিন্দুক ও বন্দুক, ফুল ও ফল, আম ও জাম, আম ও কাঁঠাল, গাছ ও মাছ, চন্দ্র সূর্য, ঢাল ও তরোয়াল (তরবারী) ইত্যাদি। নাম রাখা হইলে এক একটি দল আসিয়া, 'রাজখেড়ুদের' সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং সমস্বরে বলে 'ডাক ডাক কিসকো ডাক'? 'রাজখেড়ুদের' মধ্যে একজন বলে—'হামকো ডাক'। আবার প্রশ্ন হয় 'বন্দুক নিবা না কামান নিবা'? উত্তরকারী 'রাজখেড়ু' তখন তাহার ইচ্ছামত বন্দুক বা কামান বাছিয়া নেয়। তারপর অন্য একদল আসিয়া পূর্বোক্তরূপ উত্তর দেয় এবং খেলোয়াড় বাছিয়া নেয়। এইরূপে দুই রাজখেড়ুর বা সর্দার খেলোয়াড়দের অধীনে সমস্ত খেলোয়াড়গণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া যায়। বিভক্ত হওয়ার পর যদি এমন দুই একটি খেলোয়াড় অবশিষ্ট থাকে, যাহাদের দ্বারা একটি দল হয় না, অথচ তাহাদিগকে লইতে হইবে, তবে তাহাদিগের একজনকে 'জ্যাক' ও তারপর আর একজন থাকিলে তাহাকে 'টম' নাম দিয়া খেলা দেওয়া হয়। তাহারা এক এক বাজিতে এক এক দলে খেলে। এই দলবিভাগকে অনেক 'ধর্মের বাঁই' বা 'ধর্ম-কাচ' বলে। এইজন্যই এই বিভাগের পরে আর কেহ কোন আপত্তি করে না। জ্যাক ও টম এই ইংরেজি নাম দুইটি এত প্রাচীন খেলার মাঝে কি প্রকারে কোন সময়ে আসিল বুঝা যায় না।

অসমদল খেলার দলবিভাগ প্রণালী ঃ

অসমদল খেলাগুলিতে দলবিভাগের জন্য অন্যরূপ উপায় অবলম্বিত হয়। খেলোয়াড়দের মধ্য হইতে তিনজন পরস্পরের হাত ধরিয়া চক্রাকারে দাঁড়ায়। তারপর সকলেই একসঙ্গে হাত ছাড়িয়া দিয়া বা হাতের উপর ডানহাত স্থাপন করে। যদি দুইজনের ডানহাত 'উপুড়' বা 'চিৎ' হইয়া পড়ে এবং একজনের হাত তাহার বিপরীতভাবে পড়ে (অর্থাৎ চিৎ বা উপুড় হয়) তবে শেষোক্ত ব্যক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল বলিয়া মনে করা হয়। তখন অন্য একজন নতুন খেলোয়াড় আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে এবং পুনরায় ওইরূপ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। ক্রমে ক্রমে যখন সকল খেলোয়াড় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, এবং সর্বশেষে দুইজন খেলোয়াড় মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন উত্তীর্ণ খেলোয়াড়দের মধ্যে হইতে একজন আসিয়া, তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং যে পর্যন্ত না অবশিষ্ট খেলোয়াড় দুইজনের একজন উত্তীর্ণ হয় সে পর্যন্ত সে তাহাদের সঙ্গে এই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত থাকে। সর্বশেষে যে অনুত্তীর্ণ থাকে সেই চোর হয় এবং উত্তীর্ণ খেলোয়াড় সকল একদলে যায়। এইরূপে যে বিভাগ করা বা বাঁটা হয় তাহাকে "হাত বাঁটা" বলে।

এই 'হাত বাঁটা' ছাড়া অসমদল খেলায় দলবিভাগের জন্য অন্যান্য উপায়ও আছে। তাহাদের মধ্যে একটি এই : একজন খেলোয়াড় অগ্রবর্তী হইয়া খেলোয়াড়দের সমান সংখ্যক কাঁঠালপাতা বা আমপাতা বা অন্য কোন দীর্ঘাকৃতির পাতা একত্র করিয়া দুইহাতের ভিতরে চাপিয়া রাখে। পাতাগুলির অগ্রভাগ বাহির করা থাকে, এবং সে অংশছাড়া পাতাগুলির অন্য কোন অংশ দৃষ্টিগোচর হয় না। একত্র পাতাগুলির মধ্যে একটি পাতা যে রকমেই হউক চিহ্নিত থাকে। খেলোয়াড়গণ একে একে পাতাগুলির অগ্রভাগ ধরিয়া এক একটি করিয়া টানিয়া বাহির করে। যাহার ভাগ্যে চিহ্নিত পাতাটি উঠিয়া আসে, সেই চোর হয়। সকলের টানা শেষ হইলে পর যদি চিহ্নিত পাতাটি যথাস্থানেই থাকিয়া যায় তবে, যে ব্যক্তি পাতাগুলি ধরিয়াছিল সে চোর হয়। এরূপ আরও দুই তিন রকম বাঁটিবার প্রথা আছে। কিন্তু তাহারা পূর্বোক্ত দুটি উপায়ের কোনও একটির রূপান্তর। প্রাগুক্ত প্রথা দুটির মধ্যে প্রথমটিই অধিকতর প্রচলিত। কারণ তাহাতে আমোদ বেশি। কিন্তু দ্বিতীয়টি সহজ ও অল্প সময়সাপেক্ষ বলিয়া অনেক সময় আদৃত হয়।

উপরোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম ঃ

এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, যেখানে খেলোয়াড়দের মতের মিল হয়, সেখানে এরূপ নিয়মানুসারে দলবিভাগের প্রয়োজন হয় না। এই জন্যই অধিক বয়স্ক বালকদের মধ্যে এবং ক্রিকেট ফুটবল প্রভৃতি বিদেশিয় খেলাতে, উপরোল্লিখিত প্রথা দৃষ্টি হয় না। অল্প বয়স্ক ছেলেদের মধ্যেই এরূপ উপায় অবলম্বনে দলবিভাগ হয়, কারণ তাহারা ব্যক্তিগত মত সম্পূর্ণ অক্ষত রাখিতে চাহে। সুতরাং কোনও মীমাংসা হয় না। সে জন্যই ধর্মের দোহাই দিয়া ভাগ্যপরীক্ষায় নিযুক্ত হয়। পূর্বে এ রকম ছেলে দেখা যাইত, যাহারা "ধর্মবাঁটের" ফলকে অমান্য করা পাপ বলিয়া মনে করিত।

খেলাগুলির নামের ব্যুৎপত্তি ঃ

এখন খেলাগুলির নাম সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। অধিকাংশ খেলাই খেলার একটি বিশেষ অঙ্গ হইতে উৎপন্ন। বসতি খেলার মধ্যে দাবা, পাশা, তাস, ৩ গুটি বা ১২ গুটি পাইট ২, ৩, গুটি বা ২৪ গুটি বাঘচাল, ১৬ গুটি মঙ্গলপাটা প্রভৃতি খেলার নাম যে খেলার উপকরণ হইতে হইয়াছে তাহা সহজেই বোধিগম্য। দশপঁচিশ, পাঞ্জা, অষ্টা-অষ্টা প্রভৃতি খেলার নাম বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় দান হইতে হইয়াছে।[১]

চলতি সমদল খেলার নামের ব্যুৎপত্তি ঃ

চলতি খেলার মধ্যে ঐরূপ। ডুডু খেলার 'ডাক দেওয়া' প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য। এক দমে কতকগুলি শব্দ করিয়া বিপক্ষ দলের কোটে যাওয়ার নাম ডাক দেওয়া। বিক্রমপুরে ডাক দিবার সময় 'ডুডু ডুডু' এইরূপ শব্দই অধিকাংশ স্থলে করা হয়। সে জন্যই এ খেলার নাম ডুডুখেলা। 'বুড়ি ছোয়ানি' খেলায় বুড়িকে ছোয়া প্রধান কাজ, 'চোখবুজানি' খেলায় চোখ বুজে থাকা প্রধান কাজ ইত্যাদি। অসমদল খেলার মধ্যে কোন কোনটিতে চোরের বিশেষ বিশেষ নাম আছে। সে সব খেলার নাম চোরের সেই বিশেষ নামানুযায়ী হইয়াছে। যেমন 'কুমির কুমির' 'মাছ মাছ', 'লোস্তালোস্তা', 'ডগারে ডগা'। 'ডগারে ডগা' খেলাতে চোর গাছে থাকে এবং বিপক্ষদের আক্রমণ হইতে নিজকে বাঁচাইবার জন্য তাহাকে ডালে ডালে ঘুরিতে হয়। আবার অনেক উদ্ভিদের কোমল পল্লবাগ্রভাগকে "ডগা" বলে। তাহা হইতেই বোধ হয় চোরের নাম ডগা হইয়াছে। এবং চোরের ওই নাম হইতেই খেলার নাম হইয়াছে। ডাণ্ডাগুলি প্রভৃতি খেলা খেলার উপকরণ হইতে হইয়াছে। 'দাড়িয়াবান্ধা' নামে একটি খেলা আছে। সে খেলার জন্য একটি প্রশস্ত জায়গাকে বর্গাকৃত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাগ করা হয়। প্রত্যেক অংশের চারদিকে আবার স্বল্প পরিসর একটি পথের মত থাকে। চতুর্দিক পথটিকে দাড়িয়া বলে এবং মধ্যস্থিত বর্গাকৃতি জায়গাটিকে বান্ধা বলে। তাহা হইতেই এই খেলার নামোৎপত্তি।

মোগলপাঠানের যুদ্ধস্মৃতিরক্ষক ঃ

প্রত্যেক খেলার নামের ব্যুৎপত্তি অনুসরণ করা এখন সম্ভবপর নহে। তবে ১৬ গুটি মঙ্গলপাটা নামে পূর্বে যে একটি বসতি খেলার নামোল্লেখ করিয়াছি, সে খেলাটির প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। অনেক জায়গায়াতেই খেলাটিকে ১৬ গুটি মঙ্গল-পাঠান বা মোগলপাঠান বলা হয়। মঙ্গলপাটা যে মোগলপাঠানের অপভ্রংশ তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মোগলপাঠানের যুদ্ধ বঙ্গ ইতিহাসের একটি প্রধান অঙ্ক। ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে মোঙ্গলপাঠানদের যুদ্ধই বঙ্গদেশের প্রধান যুদ্ধ। মুসলমানদের বঙ্গে প্রথম আগমনের সময় যুদ্ধই হয় নাই। তারপর পরাক্রান্ত জমিদারদিগকে অধীনে আনিবার জন্য পাঠানদের যে চেষ্টা তাহাকে প্রকৃত যুদ্ধ বলা যায় না। মোঘল পাঠানদের যুদ্ধ দুই বিক্রমশালী রাজবংশের মধ্যে বহু দিবস ব্যাপিয়া ঘটিয়াছিল, তাই তাহার কাহিনী, বর্গীর হাঙ্গামার কাহিনীর মত বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই খেলাটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করিবার জন্যই ইহার নামকরণ ঐ ইতিহাস প্রসিদ্ধ যুদ্ধানুযায়ী হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে এই খেলাটি কি পূর্বে অন্য নামে প্রচলিত ছিল, শেষে মোগলপাঠানের যুদ্ধের পর বর্তমান নামে পরিবর্তিত হইয়াছে না উক্ত যুদ্ধের পরই এই খেলর প্রথম সৃষ্টি?

অর্থযুক্ত ছড়া, অর্থহীন ছড়া ঃ

কতকগুলি খেলার মধ্যে নানারকম ছড়া আছে। ছড়াগুলির মধ্যে কতকগুলির বেশ অর্থ-বোধ হয়। অন্য কতকগুলির কোন অর্থ আছে বলিয়া মনে হয় না। এই অর্থশূন্য ছড়াগুলি কতকগুলি বসতি খেলার মধ্যে ব্যবহৃত। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভুলাবার জন্য যে সব বসতি খেলা আছে, সে সকল খেলাতেই ছড়ার ব্যবহার হয় এবং তজ্জন্যই সে সব ছড়াগুলি শুধু শিশুদের মনোরঞ্জনার্থ কতকগুলি অর্থশূন্য শব্দবিন্যাস মাত্র। একটি নমুনা দেই। সব ছেলেমেয়ে চক্রাকারে পদ্মাসনে বসে, একজন তখন নিম্নোক্ত ছড়াটি বলে এবং ছড়ার প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়দের এক একটি হাঁটু স্পর্শ করা হয়। ছড়াটি এই—

"আপিলা জাপিলা ঘন ঘন মাছি,
আমের হুক্কা নলের বাঁশী,
একাদল পঞ্চাদল,
কেরে যাবি" কামাস্বল ইত্যাদি।

আবার ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে শান্ত রাখিবার জন্য "ঘুঙ্গি ঘুঙ্গি" নামে একটি খেলা আছে. যাহার তত্ত্বাবধানে শিশু থাকে সে শুইয়া, হাঁটু উপরদিকে উঠাইয়া পা সঙ্কুচিত করে, তারপর শিশুটিকে পার পাতাদুটির উপর বসাইয়া দোলাইতে থাকে এবং নিম্নলিখিত ছড়া বলিতে থাকে—

ঘুঙ্গিলো ঘুঙ্গি দাও (দা-কাটারী) খান দে
দাওখান কেন? পাতাখান কাটতে!
পাতাখান কেন? ছালিমাটি ফেলাইতে।
ছালিমাটি কই? ধোপায় নিছে।
ধোপা কই? হাটে গেছে (ইত্যাদি ইত্যাদি)

এখন হয়ত বুঝিলেন যে এ সব ছড়া অর্থশূন্য কতকগুলি শব্দবিন্যাস মাত্র।

অর্থযুক্ত ছড়া ঃ

চলতি খেলায় যে সব ছড়ার ব্যবহার হয়, তাহারা এরূপ অর্থশূন্য নহে। অনেক খেলায় তাহা বীরত্বব্যঞ্জক এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি করে। অনেক খেলাতে উহা

উত্তেজক বীরত্বব্যঞ্জক না হইলেও বেশ অর্থযুক্ত.; যেমন— চোখবুজানি বা লুকোচুরি খেলা। অন্যান্য খেলোয়াড়গণ যতক্ষণ পর্যন্ত না লুকায়িত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত চোর আপনার চোখ বুজাইয়া রাখে এবং চিৎকার করিয়া বলিতে থাকে : —

"চোখবুজানি লোহার কাঠি পালারে ভাই সকল ক'টি"

অর্থ— আমি লোহার কাঠি (অর্থাৎ শলাকা) দিয়া চোখ বুজাইয়াছি, এই অবসরে তোমাদের সকল খেলোয়াড় কয়জন পালাও।

ডুডু খেলার ছড়া ঃ

ডুডু খেলায় যে সব ছড়া ব্যবহৃত হয়, তাহা বড় উত্তেজক এবং বীরত্বব্যঞ্জক। এই খেলায় ছড়াদ্বারা কথার কাটাকাটি হয়। আপনারা রামরাবণের যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী বীরদের যুদ্ধপ্রারম্ভে বাগযুদ্ধ কথা পড়িয়াছেন, বর্তমান সময়ে অনেক জায়গার কথায় passage-at-arms এর কথা শুনিয়া থাকেন। এই সুযোগে কৃত্রিমযুদ্ধ নিযুক্ত পল্লীবীরদের নিজস্ব পল্লীভাষায় কথিত বাগযুদ্ধের একটু নমুনা শুনুন।

পূর্বে ডাক দেওয়া কাহাকে বলে বুঝাইয়াছি। একদমে কতকগুলি শব্দ করিয়া বিপক্ষদের কোটে যাওয়ার নাম ডাক দেওয়া। ডাক দেওয়ার সময় একজন খেলোয়াড় লাফাইতে লাফাইতে সগর্বে ও সতেজে বলিয়া উঠিল—

"ডুগু ডুগু লপ্পে (লাফে—লম্ফে)
খারা (খাড়া) লইয়া কাপ্‌পে
খারার কপালে ফোটা
মইষ (মহিষ) মারি গোটা গোটা।"

ব্যাখ্যা—"হাতের (খাড়া) কাঁপাইয়া লাফ দিতে দিতে আমি ডাক দিতেছি, ওহে প্রতিদ্বন্দ্বী বীরসকল সাবধান। দেখনা আমার খাঁড়ার কপালে মন্ত্রপূত রক্তচন্দনের ফোটা। এই খাড়া দিয়া আমি গোটা গোটা অর্থাৎ, অনেক মহিষ বিনষ্ট করিয়াছি।"

ইহার পর প্রতিদ্বন্দ্বী বীর পূর্বোক্ত বীরকে তাহার বৃথা আস্ফালনের জন্য বিদ্রূপ করিয়া বলিতে থাকে—

একহাত্তা বলরাম দোহাত্তা শিং
নাচেরে বলরাম তাক্ ধিনা ধিন ধিন

ব্যাখ্যা— "আহা এই না তোমার চেহারা! এ নিয়ে আবার এত আস্ফালন! তোমার শরীরের পরিমাণ একহাত (অর্থাৎ, শক্তির অধিক তোমার আস্ফালন) কিন্তু দুইহাত তোমার শিং দুটি, এই নিয়ে তুমি লম্ফ দেও—ইহা তো শুধু ক্ষুদ্র পুতুল নাচের মত দেখায়।"

আত্মরক্ষাকারী দল যদি আক্রমণকারীকে নিজেদের কোটে ধরিয়া রাখিতে পারে, অমনই যেন জয়োল্লাস করিতে করিতে উৎসাহের সহিত বলিতে থাকে—

"মরা (মড়া) রইছে (রহিয়াছে) মইরা (মরিয়া)
সাতদিন ধইরা (ধরিয়া)
শিয়ালে শকুনে খায়
মরা হাড্ডি দেখা যায়।"

ব্যাখ্যা—"তোমাদের দলের খেলোয়াড়কে আমরা সাতদিন যাবৎ মারিয়া রাখিয়াছি। তোমাদের লজ্জা হয় না! এই তোমাদের দম্ভ। দেখ এসে তাহাকে শিয়াল শকুনিতে খাইয়া ফেলিতেছে এবং হাড় দেখা যাইতেছে।"

ইহার প্রত্যুত্তর দিবার জন্য বিপক্ষ খেলোয়াড় আস্ফলন করিতে করিতে বলে—

"আমার খেড়ু মাড়িয়া কিবা পাইলি সুখ।
লাইখাইয়া ভাঙ্গুম্ তর পাটাতনের বুক।।"

ব্যাখ্যা— "আমার সঙ্গী খেড়ুকে মারিয়া তোমার কোন সুখই বা হইল? কারণ তাহার প্রতিফলস্বরূপ লাথি মারিয়া এই তোমার ঐ প্রশস্ত বক্ষ চূর্ণ করিয়া দিতেছি।"

এইসব ছড়া সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

ডুডুখেলার সামরিকতা ও সম্মুখ যুদ্ধ-নীতি ঃ

সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন, সমদল চলতি খেলাগুলি একরকম কৃত্রিম যুদ্ধ। কাজেই কয়েকটি খেলার রীতিনীতি যুদ্ধের রীতিনীতির সৌসাদৃশ্য আছে, ইহা বলিলে বোধ হয় কেহ বিস্মিত হইবেন না এবং এইভাবে বিচার করিতে গেলে ডুডু খেলা সম্মুখযুদ্ধ স্বরূপ। সম্মুখ যুদ্ধের মত এই খেলাতে একাধারে শক্তি ও সাহস চাই। দলের সর্দার খেলোয়াড়কে সর্বদা দলকে সুশৃঙ্খল রাখিতে হয়। অর্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহরচনা করিয়া দুই প্রান্তে ভাল ভাল খেলোয়াড়দিগকে এবং মাঝে নিকৃষ্ট খেলোয়াড়দিগকে রাখা হয়। শত্রু আসিয়া যেই প্রান্তভাগ আক্রমণ করে, অপর প্রান্তবর্তী খেলোয়াড়গণ অমনই শত্রুর পার্শ্ব আক্রমণের চেষ্টা করে। এই ব্যূহকে সুসংযত ও দৃঢ় রাখা সর্দারের একান্ত কর্তব্য। তাহা না পারিলে শত্রু আসিয়া বিক্ষিপ্ত খেলোয়াড়দিগকে একে একে মারিয়া যায়। এ খেলায় শক্তি ও সাহসের এত প্রয়োজন যে দুর্বল ছেলেরা এ খেলাতে কিছু পশ্চাৎপদ। ঢাকার কুট্টি নামক নিচ শ্রেণীর মুসলমানেরা এই খেলায় খুব পারদর্শী। এই খেলাতে তাহাদের পটুতা বিক্রমপুরে প্রবাদরূপে পরিণত হইয়াছে এবং বিক্রমপুরের সকল খেলোয়াড়ই অল্পাধিক পরিমাণে তাহাদের কৌশল ও সাহস অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে।

গোল্লাছুট ও পলায়ন-নীতি ঃ

গোল্লাছুট নামে একটি খেলা আছে। এই খেলাতে পলায়নবিদ্যার অনুশীলন হয়। পলায়ন-বিদ্যাটি বড় প্রাচীন বিদ্যা। নিত্যনৈমিত্তিক খেলাতেও তাহার অনুশীলন হইত। বর্তমান সময়ে এই বিদ্যাকে আশ্রয় করার আবশ্যকতা বাড়িয়াছে। কিন্তু পূর্বে যেরূপ এ বিদ্যার চর্চা ছিল তখন তত দরকার ছিল না, এখন দরকার হইয়াছে কিন্তু চর্চা নাই। যাহা হউক গোল্লাছুট খেলায় গোল্লা নামে একটি চিহ্নিত স্থান থাকে। একদল সে স্থানে অধিকার করিয়া থাকে, অন্যদল তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া পাহারা দিতে থাকে, গোল্লাধিকারীদলকে besieged party বলা যায়। তাহাদের উদ্দেশ্য বেষ্টনকারী শত্রুদের মধ্য দিয়া কৌশলে নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হওয়া। পূর্বেই বলিয়াছি এই খেলাতে পলায়ন-নীতির অনুশীলন হয়। তাই পলায়ন করিবার জন্য যে সব গুণের আবশ্যক সে সব গুণ (অর্থাৎ খুব দ্রুতগতিতে দৌড়ান, শত্রুদিগের সহিত চাতুরী করা) ইত্যাদি নানা গুণ না থাকিল এ খেলার পারদর্শী হওয়া যায় না।

বুড়িছোয়ানি—বন্দিনী-উদ্ধার ঃ

বুড়িছোয়ানি খেলাতে বন্দিদিগের উদ্ধার করিবার কৌশল প্রদর্শিত হয়। বুড়ি শত্রুদের বন্দিনী। তাহার চারদিক সতর্ক পাহারা। তাহা হইতে শত্রুপুরীতে গিয়া বুড়িকে উদ্ধার করিতে হইবে। শত্রুপুরীতে প্রথম গিয়াই বুড়ির সংবাদ লওয়া হয়, তারপর শত্রুনিধনের জন্য চেষ্টা করা হয়। বুড়িও সুবিধা পাইলেই উঠিয়া দৌড় দেয়।

দাড়িয়াবান্ধা ঃ

দারিয়াবান্ধা খেলাকে যদি যুদ্ধ বলা যায়, তবে ইহাকে কতকগুলি খণ্ড দ্বন্দ্বযুদ্ধের সমষ্টি বলিতে হইবে। বিস্তীর্ণ এক যুদ্ধক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট অংশে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইতেছে। যুদ্ধের সহিত

খেলার যে সাদৃশ্যের কথা এতক্ষণ বলা হইল, তাহা যে সব খেলাতেই দৃষ্ট হয় এমত নহে। উপরিউক্ত খেলা কয়টিতেই এই সাদৃশ্য বিশেষরূপে লক্ষিত হয়।

খেলাগুলির প্রচলন ঃ

এখন খেলাগুলির প্রচলন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ফুটবল ক্রিকেটের মহিমায় এই সব জাতীয় খেলাগুলি লোপ পাইতেছে। কি ছোট কি বড় সকলেই ওই সব বিদেশিয় খেলার অনুরক্ত হইয়াছে। এমনকী নিরক্ষর রাখাল বালকগণ পর্যন্ত মাঠে তাহাদের গোরু ছাড়িয়া দিয়া যেখানে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা হয় তাহার কাছে দাঁড়াইয়া থাকে। ক্রিকেট খেলা বিক্রমপুর অঞ্চল অনেক দিন যাবৎ প্রচলিত হইয়াছে। বিক্রমপুরান্তর্গত মালখানগর প্রভৃতি গ্রাম হইতে বাঙালিদের মধ্যে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ক্রিকেট খেলোয়াড় বাহির হইয়াছেন। ফুটবলের প্রচলন অল্প দিন যাবৎ হইয়াছে। কিন্তু ক্রিকেট অপেক্ষা ইহার প্রচলন অধিক, কারণ এই খেলা অল্পব্যয় সাপেক্ষ।

দেশিয় সমদল খেলার মধ্যে ডুডু, গোল্লাছুট, বুড়িছোয়নী প্রভৃতি গ্রীষ্ম ও বর্ষাকলে খেলা হয়। কারণ এই সব খেলায় বেদনা পাইবার সম্ভাবনা আছে! শীতকালে মাটি শক্ত থাকে, বেদনাও খুব বেশি লাগে। তবে দাড়িয়াবান্ধা খেলাটা সব সময়েই হয়।

চলতি খেলার মধ্যে অধিকাংশ খেলাই পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত, শুধু বসুমতী, চোখবুজানি, কুমির-কুমির, মাছ-মাছ এই অসমদল খেলাগুলিতে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে সকলেই যোগ দেয়। অসমদল খেলা অল্পবয়স্কদের মধ্যেই প্রচলিত।

তারপর ব্যক্তিগত খেলাগুলি যথা, মুগুরভাজা, কুস্তি, লাঠিখেলা, প্রভৃতি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছিল। শুধু বিদেশি "ডাম্বেল পরিচালন" অনেক যুবকের প্রিয় ছিল। ঈশ্বরানুগ্রহে এখন আমরা আত্মরক্ষার ও তদুপযোগী শক্তির উপযোগিতা বুঝিয়াছি। তাই এই দুই বৎসরে বিক্রমপুরে খেলার রাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত। ফুটবল, ক্রিকেট সব চলিয়া যাইতেছে। সকলেই আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত। বিক্রমপুর অঞ্চলে এখন এমন গ্রাম দেখিতে পাইবেন না, যেখানে যুবক ও বালকবৃন্দ লাঠি খেলা অভ্যাস করিতে ব্যস্ত নয়। এক গ্রামের সঙ্গে গ্রামান্তরের এই লাঠি খেলায় Mock-fight (কৃত্রিম যুদ্ধ) হইতেছে। বর্ষাকালে যখন মাঠ ঘাট সকল প্লাবিত হইয়া যায়, তখন হয়ত সকলের মিলিবার সুবিধা হয় না। তাহারা তখন নিজ নিজ বাড়িতে নিজের শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য যত্নপর। মাঝে মাঝে দিন নির্দিষ্ট করিয়া দল বাঁধিয়া 'বাইছ' খেলিতে নদীর দিকে যায়। ইংরাজিতে যাকে Boat-race বলে বিক্রমপুরে তাহারই নাম 'বাইচ' খেলা বা বাইছালিখেলা। এ খেলাতে ভদ্র অভদ্র সকলেই আমোদ পায়।

ডুডু সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত খেলা ঃ

দেশিয় খেলার মধ্যে ডুডু খেলার মত লোকপ্রিয়, সুপরিচিত ও সর্বত্র প্রচলিত জাতীয় খেলা বোধ হয় আর দ্বিতীয়টি নাই। এই রাজধানীতেই যখন এই খেলা দেখিবার জন্য লোকের আগ্রহ দেখা যায় তখনই বুঝিতে পারা যায় যে এই খেলা কতদূর পরিচিত। বিক্রমপুরে বিদেশি বন্যায় যখন অন্যান্য সকল দেশিয় খেলা লোপ পাইতেছিল, তখনও দেখিয়াছি গ্রামের স্থানে স্থানে দুই-চারজন মিলিয়া ডুডু খেলায় তৎপর। গ্রামের অশিক্ষিত জনসাধারণের এই খেলাতে এত আগ্রহ যে, এত ফুটবল ক্রিকেট খেলার আধিক্য সত্ত্বেও যদি কোথাও যুবক বা বালকদল ডুডু খেলার জন্য একত্র হয়, তাহার চতুঃপার্শ্বে বালক, যুবক, বৃদ্ধ, রাখাল, পথিক, ব্যবসায়ী সকলে মিলিয়া এক সরস ও সতেজ আমোদের সৃষ্টি করে। পূর্বে যখন এ খেলার অধিকতর প্রচলন ছিল, তখন বিদ্যালয়ের ছেলেরা ছুটির পর একবার ডুডু না খেলিয়া বাড়ি যাইত না। রাখাল বালকেরা গরুগুলিকে ইচ্ছামত চরিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়া হরিৎপ্রান্তর মধ্যবর্তী কোন বিশাল বট বা অশ্বত্থের বিস্তৃত ছায়ায় অথবা প্রান্তর-প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ঝোপের ক্ষুদ্র ছায়ায়, বাড়ি যাইবার পূর্ব

পর্যন্ত এই খেলার আমোদে মত্ত থাকিত। গ্রামের লোকেরা এই খেলার মধ্যে এমন একটা আকর্ষণের জিনিস পায়, যাহার জন্য এখনও পথিক তাহার গন্তব্যস্থানের কথা ভুলিয়া, গৃহস্থ হাটবাজারের কথা ভুলিয়া, রাখালবালক গোরুর কথা ভুলিয়া, গোয়ালা দুধের কথা ভুলিয়া, অন্ততঃ কতক্ষণের জন্য খেলা দেখিয়া অত্যন্ত আমোদ উপভোগ করে।

বস্‌তি খেলার মধ্যে, তাস, পাশা, দাবা ছাড়া অন্যান্য সব খেলাই মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত। তবে কালমহিমায় অনেক স্থানে মেয়েরা বাঘবন্দি, পাইট পাইট প্রভৃতি খেলা ছাড়িয়া তাসখেলায় মনোনিবেশ করিতেছেন। চলতি খেলার মধ্যে যেমন ডুডু খেলা যুবকদের আদরণীয়, বসতি খেলার মধ্যে পাশা, দাবা তেমনই বৃদ্ধদের আদরের সামগ্রী, পাশা ও দাবাছাড়া বৃদ্ধদের মজলিস জমে না। বিশেষত পাশা খেলা বিক্রমপুরে সুপ্রচলিত। বিক্রমপুরবাসী ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক জ্যোতিষশাস্ত্রাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন মহাশয়ের দাবাখেলায় পারদর্শিতা বিক্রমপুরে প্রবাদস্থানীয়।

উপসংহার ঃ

মেয়েলী খেলার মধ্যে দশ পঁচিশ খেলা সর্বত্র প্রচলিত। বৃদ্ধাদের নিকট এই খেলা বড়ই প্রিয়। দু প্রহরের খাওয়াদাওয়া হইয়া গেলেই বৃদ্ধাগৃহকর্ত্রী সকলকে একত্র করিয়া এই খেলা খেলিবার উদ্যোগ করে। অন্যান্য খেলা বর্তমানকালে, শুধু স্মৃতির বিষয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। ছেলেরাও অনেক সময় এ সব মেয়েলীখেলাতে যোগদান করে। শিশুমনোরঞ্জনার্থ যে সব খেলা আছে, তাহা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে নতুন নতুন ছড়া প্রবর্তিত হইতেছে। তাহাদের ভাষা পরিমার্জিত, ছন্দও সুবিন্যস্ত। পুরাতন ছড়াগুলির সরলতা ও সরসতা এ নতুন ছড়াগুলিতে নাই। এই যে পুরাতন চলিয়া যাইতেছে এবং নতুন হইতেছে, তাহাতে রক্ষণশীলতাপ্রবণ হৃদয়ে দুঃখ হয় সত্য কিন্তু উপায় কি? কবি বলিয়াছেন—

"প্রাচীন চলিয়া যায়
নবীনেরে দিয়া সিংহাসন।"

প্রবন্ধের আয়তন-বৃদ্ধির আশঙ্কায় এ প্রবন্ধে সকল প্রকার খেলার সবিশেষ বিবরণ ও খেলাসম্বন্ধীয় সকল প্রকার ছড়াগুলি সন্নিবিষ্ট করিতে পারি নাই। এক একটি খেলা ধরিয়া তাহার সবিশেষ বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

চল্‌তি ১।

১। ছিদৌড় খেলা ঃ

ছিদৌড় বা ডুগুডুগু—এই খেলা সর্বত্র সুপরিচিত। অতএব ইহার বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। শুধু দুই একটি পারিভাষিক শব্দের অর্থ দেওয়া গেল।

যে স্থানে খেলা হয় তাহাকে দুইভাগে ভাগ করিয়া লওয়া হয়। এক এক ভাগে এক এক দল খেলোয়াড় থাকে। এই এক একটি ভাগকে বিক্রমপুরে চলিত কথায় 'তৈল' বা 'তলি' বলে। দুই তৈলের মধ্যবর্তী সীমাজ্ঞাপক রেখাকে 'সমানতৈল' বলে। ওই রেখাটি যে কোনরূপে চিহ্নিত থাকে।

যে কোন রকম কতকগুলি শব্দ করিয়া বিপক্ষদলের তৈলে যাওয়াকে 'ডাকদেওয়া' বলে।

খেলিবার জায়গার চারদিকেও অনেক সময় একটা সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। তাহার বাহিরে কোনও খেলোয়াড় গেলে সে খেলিতে অক্ষম বলিয়া গণ্য হইবে। চারদিকের এ নির্দিষ্ট সীমাকে বিক্রমপুরে চলিত কথায় 'জ্বলন্তি-পুড়ন্তি' বলে এবং যে এই সীমা অতিক্রম করে সে 'জ্বলিয়া গিয়াছে বা পুড়িয়া গিয়াছে' এইরূপ বলা হয়। অন্যান্য অনেক খেলাতেও এই 'জ্বলন্তি-

পুড়ন্তির' ব্যবহার হয়।

এই খেলার প্রচলন যে সর্বাপেক্ষা অধিক তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে সামরিক নীতি বিদ্যমান তাহারও উল্লেখ পূর্বে করা হইয়াছে।

এই খেলার নামের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিবার পূর্বে ইহা বলিতে চাই যে বিক্রমপুরে এই খেলার তিন-চারটি নাম প্রচলিত আছে যথা— 'ছিদৌড়', 'কপাটি', 'ছিছি', 'ডুগুডুগু'। ইহাদের মধ্যে 'ছিদৌড়' নামটিই পুরাতন বলিয়া মনে হয়। কারণ চাষাভূষাদের মধ্যে ওই নামই প্রচলিত। 'ছিছি' 'ছিদৌড়' নামেরই রূপান্তর। কপাটি নামও চাষা-ভূষাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ঢাকার কুট্টিরা (এই খেলা সম্বন্ধে যাহাদের পারদর্শিতার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।) এই খেলাকে 'কপাটি' নামে অভিহিত করে। বোধ হয় তাহাদের নিকট হইতেই এই নামটি ধার করা হইয়াছে। 'ডুগুডুগু' নাম অপেক্ষাকৃত ভদ্রলোকদের মধ্যেই প্রচলিত, তাহাতেই মনে হয় যে নামটি আধুনিক।

ডাক দিবার সময় 'ডুডুডু' বা 'ডুগুডুগু' বলা হয় বলিয়াই বোধ হয় এই খেলার নাম 'ডুগুডুগু' হইয়াছে। 'ছিছি' বলিয়া 'কপ্‌টি কপ্‌টি' বলিয়া অনেক খেলোয়াড় ডাক দেয়। 'ছিদৌড়' 'ছিছি' ও 'কপাটি' নামও বোধ হয় উহা হইতেই আসিয়াছে।

এই খেলার ছড়া সম্বন্ধে পূর্বেই বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে ছড়াগুলিকে সংগ্রহ করা এখন বড় দুষ্কর হইয়াছে। কারণ কালমহিমায় ছড়াগুলি লোকের স্মৃতিপথ হইতে চলিয়া যাইতেছে। এখানে অতিরিক্ত দু'টি ছড়া দেওয়া গেল।

১। ছিদৌড় কোটরা ধর।
বাইন্যা মাগি টাইন্যা ধর।।

২। ছিয়া ছিয়া ছিয়া।
(তাদের) তগ বাড়ি বিয়া।।
পান নাই সুপারি নাই
তুলসী পাতা দিয়া

২। গোল্লাছুট ঃ

প্রাণালী— খেলোয়াড়গণ সমান দুই দলে বিভক্ত হয়। খেলিবার জায়গার একপ্রান্তে মৃত্তিকাতে একটি গর্ত করিতে হয়। ঐ ক্ষুদ্র গর্তটির নাম 'গোল্লা'। অনেক সময় কোন বৃক্ষের মূল বা কোন তৃণস্তূপকেও 'গোল্লা' করা হইয়া থাকে। গোল্লা হইতে সম্মুখের দিকে কতকটা দূরে (২৫।৩০ গজ) খেলিবার জায়গার অন্য সীমা নির্দিষ্ট হয়। একদল খেলোয়াড় গোল্লা অধিকার করে, অন্যদল খেলিবার জন্য নির্দিষ্ট জায়গার অন্যান্য সকল স্থান অধিকার করিয়া প্রণালীমত অবস্থান করে। যে দল, "গোল্লার" অধিকারী তাহাদের লক্ষ্য বিপক্ষ দলের খেলোয়াড় দ্বারা অস্পৃষ্ট অবস্থায় খেলিবার জায়গার অন্যপ্রান্তে যাওয়া। এইরূপ যে যাইতে পারে সে 'পাকা' বলিয়া গণ্য হয়। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছিবার পূর্বে যদি বিপক্ষ দলের কেহ 'গোল্লার' অধিকারী দলের কাহাকেও ছুঁইতে পারে—তবে শেষোক্ত ব্যক্তি 'মরা' বলিয়া গণ্য। 'গোল্লার' অধিকারীদের লক্ষ্য 'পাকা'— বিপক্ষ দলের লক্ষ্য 'মারা'।

গোল্লার অধিকারী খেলোয়াড়দের মধ্যে আবার একজন উপযুক্ত লোক গোল্লা রক্ষায় নিযুক্ত থাকে। যে খুব দৌড়াইতে ও পালাইতে সক্ষম সেই উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হয়। এই গোল্লা-রক্ষকের উপরেই জয় পরাজয় নির্ভর করে। সে যতক্ষণ না মরে, ততক্ষণ (অন্য সকলে মরিয়া গেলেও) খেলার ফলাফল কিছু নির্দিষ্ট হয় না।

গোল্লারক্ষক ব্যতীত অন্য খেলোড়াদের মধ্যে যদি কেহ 'পাকে' তবে সে আসিয়া পূর্ব নির্দিষ্ট গোল্লার কিছুদুর নতুন গোল্লা নির্দিষ্ট করে এবং সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে। যেই পূর্ব গোল্লারক্ষক

'অ-মরা' অবস্থায় আসিয়া তাহাকে ছুঁইল, অমনি পূর্ব গোল্লারক্ষক ছুঁইলে শেষোক্ত ব্যক্তি মড়া বলিয়া গণ্য হয়।

খেলার প্রথমেই একটা সংখ্যা ঠিক করিয়া লওয়া হয় এবং সেই নির্দিষ্ট সংখ্যক ডাকের মধ্যে বুড়িকে উদ্ধার করিতে হইবে। নচেৎ বুড়ি মারা গেল।

বুড়ি কোন রকমে মারা গেলে, বুড়ির দল হারিল। তখন বিপক্ষদল নিজেদের বুড়ি বসায়। বুড়ি নিরাপদে আসিতে পারিলে বুড়ির দল জিতিল এবং পুনরায় সেই দল বুড়ি বসাইবে। (গোল্লাছুটেও এই নিয়ম)

প্রচলন— গোল্লাছুটের চেয়ে এ খেলার প্রচলন বেশি ছিল। এখন দুই খেলারই অবস্থা একরূপ।

নাম— এই খেলার নাম অনেক যথা— 'বৌ ছোয়ানি' বা 'বুড়ি ছোয়ানি', 'বুড়িছি', 'বৌয়াছি' অথবা 'বৌ আনি'। বৌকে বা বুড়িকে ছুইয়া আনিতে হয় অথবা বৌকে বা বুড়িকে ছোওয়ার উপর জয় পরাজয় নির্ভর করে, এই জন্যই এই সব নামের সৃষ্টি।

মন্তব্য— এই ক্রীড়াযুদ্ধে বুড়ি বিপক্ষদলের বন্দিনী। তাহাকে উদ্ধার করিতে তাহার পক্ষীয় লোক সর্বদা সচেষ্ট, কিন্তু বিপক্ষদল এরূপ শক্ত পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে যে সহজে উদ্ধার দুঃসাধ্য। তাই প্রথমে বুড়ির কাছে যাইয়া তার সংবাদ নিয়া বুড়ির পক্ষের যোদ্ধা, বিপক্ষ প্রহরী বিনাশের চেষ্টা করে, কিন্তু একটি প্রহরীর পশ্চাদ্ধাবন করিতে গেলে অন্যান্য বহু প্রহরী আসিয়া বুড়িকে বেষ্টন করে। বিশেষত বুড়ি সাধারণ খেলোয়াড় হইল। নতুন গোল্লা প্রকৃত গোল্লা হইল। নুতন গোল্লারক্ষক প্রকৃত গোল্লারক্ষক হইল। পূর্ব গোল্লারক্ষক এখন আবার পাকিবার চেষ্টা করে।

যদি 'পাকা' খেলোয়াড়গণ সংখ্যায় বেশি হয়, তবে এইভাবে গোল্লা ক্রমশঃ সম্মুখে অগ্রসর হয়, এবং যদি এইভাবে সীমাতে গিয়া নতুন গোল্লা স্থাপন করিতে পারে, তবে গোল্লারক্ষকের দল 'সাতবাজি' অথবা অন্য কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক বাজি জিতিল।

প্রথম নির্দিষ্ট গোল্লা হইতে যদি গোল্লারক্ষক একবারে পাকিতে পারে তবে এক 'বাজি জিত'।

গোল্লারক্ষক (নতুন বা পুরাতন) মরিলেই এ বাজি হার হইল।

গোল্লারক্ষক বা গোল্লারক্ষকের সঙ্গে স্পৃষ্ট কোন ব্যক্তি যদি বিপক্ষদলের কাহাকেও ছুঁইতে পারে, তবে বিপক্ষদলের সেই খেলোয়াড় 'মড়া' বলিয়া গণ্য। গোল্লারক্ষক যতক্ষণ গোল্লা ছুঁইয়া থাকে ও অন্যান্য খেলোয়াড়গণ যতক্ষণ গোল্লারক্ষককে ছুঁইয়া থাকে ততক্ষণ এ নিয়ম খাটে। 'গোল্লার' সঙ্গে ছোওয়া না থাকিলেও বিপক্ষদলের কাহাকেও তদবস্থায় ছুঁইলে গোল্লার অধিকারী দলের লোক মড়া বলিয়া গণ্য হয়।

গোল্লা খালি থাকিলে বিপক্ষদলের কেহ যদি তাহাতে থু থু ফেলিতে পারে, তবে আর গোল্লারক্ষক তাহাতে আসিতে পারিবে না। তাহাকে বাধ্য হইয়া পাকিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রচলন— পূর্বে এ খেলা ভদ্রেতর সকলের ভিতরই অধিক পরিমাণে প্রচলন ছিল। এখন কদাচিৎ দুই এক গ্রামে ভদ্রলোকদের মধ্যে ইহার প্রচলন দেখা যায়। চাষাদের ভিতর এখনও অনেক জায়গায় আছে।

নাম— 'গোল্লা' হইতে ছুটিয়া গিয়া পাকিতে হয় বলিয়া ইহার নাম 'গোল্লাছুট'।

গোল্লারক্ষককেও অনেক সময় 'গোল্লা' বলিয়া ডাকা হয়।

মন্তব্য— যুদ্ধের পরিভাষায় বলিতে গেলে এ খেলাটা পলায়ন-নীতি শিক্ষা দেয় এবং তজ্জন্যই যাহারা খুব দৌড়াইতে, পাশ কাটিতে ও ছল করিতে পারে তাহারাই এই খেলায় বিশেষ পারদর্শী। গোল্লারক্ষকের সর্বদাই এই লক্ষ্য যে বিপক্ষদলের কোন খেলোয়াড়টি

অমনোযোগী হইয়াছে— খেলিবার জায়গায় কোনও ধারে দুর্বল খেলোয়াড় পাহারা দিতেছে বা পালাইবার ফাঁক আছে। পালাইবার সুবিধা ঠিক করা খুব বিবেচনাসাপেক্ষ।

বিপক্ষদলও মাঠের চারিদিকে এইরূপ সজ্জিত থাকে যে, তাহাদিগকে ছাড়াইয়া যাওয়া বড় কঠিন। এজন্য বিপক্ষদলকে বিপর্যস্থ করিবার জন্য গোল্লারক্ষক তাহার নিজের দলের সকলকে এক যোগে এলোমেলোভাবে পাঠাইয়া দেয়। তাহাদিগকে মারিবার জন্য বিপক্ষদল যখন ব্যস্ত থাকে, গোল্লারক্ষক তখন আপনার পথ খুঁজিয়া লয়।

বিপক্ষদলের নেতা বুদ্ধিমান হইলে গোল্লারক্ষকের পাহারার জন্য একজন খেলোয়াড়কে সর্বদা নিযুক্ত রাখে। সে কিছুতেই গোল্লারক্ষককে নজরের বাহির করে না।

এই খেলায় বিশেষ কোনও ছড়া নাই। তবে গোল্লারক্ষক তাহার পক্ষীয় খেলোয়াড়দিগকে ছুটাইয়া দিতে বিলম্ব করিলে তাহাকে উত্যক্ত করিবার জন্য দুই একটি অশ্রাব্য ছড়া চাষাদের ভিতর প্রচলিত আছে।

শীতকাল ব্যতীত প্রায় সকল কালেই এই খেলা হয়।

৩। বৌ-ছোয়ানি—বুড়ি ছোয়ানি ঃ

প্রণালী—এই খেলার প্রণালী কতকটা পূর্বোক্ত খেলার মত। পূর্বোক্ত খেলায় যেরূপ গোল্লারক্ষকের উপর জয় পরাজয় নির্ভর করে, এখানে সেরূপ 'বৌ' (বা বুড়ি) এর উপর জয় পরাজয় নির্ভর করে। বৌকে বিপক্ষ দলের ভিতর বসিয়া থাকিতে হয়। তাহার পক্ষীয় লোক খেলার জায়গায় এক প্রান্তে একটি সীমার বাহিরে থাকে, সেই সীমা হইতে ডাক নিয়া আসিয়া বুড়ির পক্ষীয় লোক প্রথম বুড়িকে ছোঁয়, তারপর বিপক্ষদলের লোকদিগকে মারিতে চেষ্টা করে। ডাক ডাক থাকিতে যাহাকে ছুঁইতে পারিবে সেই 'মরা'।

বুড়িকে নিজেদের দলে আনা বুড়ির পক্ষীয় লোকের উদ্দেশ্য। যাইবার সময় বুড়িকে মারা অর্থাৎ ছুঁইয়া দেওয়া বিপক্ষদলের উদ্দেশ্য। কাজেই বিপক্ষদল চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে ; যেন যাইবার সময় কেহ না কেহ বুড়িকে ছুইতে পারে।

বুড়ির পক্ষের লোক ডাক নিয়া বুড়িকে ছুইয়া গেলেই লোক বুড়িকে আসিয়া ছুঁইয়া দেয়, বুড়ি না উঠিতে উঠিতে ছুইতে পারিলে বুড়ি সেই ডাকে উঠিতে পারিবে না।

যে ডাক দেয় বিপক্ষদলের ভিতর যদি তাহার ডাক না থাকে, এবং সে অবস্থায় যদি বিপক্ষদলের কেহ তাহাকে ছুয়ে দেয়, তবে ডাকদেওয়া খেলোয়াড় মারা গেল।

সীমার ভিতর থাকিয়া বুড়ির দলের লোক বিপক্ষদলের কাহাকেও পশ্চাৎ দিকে আসিতে দেয় না, একজন শক্ত প্রহরী সর্বদাই আছে। বুড়ির খবর লইয়া যাওয়া মাত্রেই সেই প্রহরী আসিয়া বুড়িকে পাহারা দেয়।

কাজেই বুড়ির পক্ষের লোক সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া বিপক্ষ প্রহরীদিগকে একটি একটি করিয়া মারিতে থাকে, যখন প্রহরীর সংখ্যা কমিয়া আসে, বুড়ি তখন আপন সুবিধা বুঝিয়া নিজ পক্ষীয় লোকের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসে। বুড়ি একবার ছুটিলে আর রক্ষা নাই। হয় তাহাকে নিজের দলে যাইতে হইবে, নচেৎ বিপক্ষের হাতে মারা যাইতে হইবে, সে আর আগের মত নিজের জায়গায় আসিয়া বসিতে পারিবে না।

৪। দাড়িয়া বান্ধা (দাইরা বান্দা) ঃ

প্রণালী—নিম্নলিখিত চিত্রটি হইতে এই খেলার প্রণালী বেশ বুঝা যাইবে।

*   *   *   *   *   *   *

	ক		ক	
		ছ		
	খ		খ	
		জ		
	গ		গ	
		ঝ		
	ঘ		ঘ	
		ঞ		
	চ		চ	

খেলোয়াড়গণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া, একদল প্রথমত তারকাচিহ্নিত লাইনের বাহিরে থাকে। অন্যদল ক, খ, গ, ঘ, চ চিহ্নিত জায়গাগুলিকে অধিকার করিয়া দাড়াইয়া থাকে। শেষোক্ত স্থানগুলিকে 'দাড়িয়া' বলে, এবং ইহাদের দ্বারা বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিখণ্ডকে 'বান্ধা' বলে। দাড়িয়াগুলির প্রস্থ একটি পায়ের দৈর্ঘ্যের সমান। 'বান্ধা' গুলি বর্গাকৃতি। ইহার পরিমাণ এরূপ হয় যে, একজন খেলোয়াড় বান্ধার ঠিক মধ্যস্থলে দাঁড়াইলে, দুই দিকে 'দাড়িয়ার' খেলোয়াড়দ্বয় এক সঙ্গে হাত বাড়াইয়া যেন তাহাকে ছুইতে না পারে।

দুই দলের মধ্যে যাহারা 'দাড়িয়া' নেয়, তাহাদের এক একজন এক একটি 'দাড়িয়া' অধিকার করিয়া থাকে, এবং যাহাতে বিপক্ষ খেলোয়াড় এক 'বান্ধা' হইতে অন্য 'বান্ধাতে' না যাইতে পারে তাহা দেখে। যদি দাড়িয়ার খেলোয়াড় কোনও ক্রমে বান্ধার খেলোয়াড়কে ছুঁইয়া দিতে পারে, তবে সে মড়া বলিয়া গণ্য হয়। এবং একজন লোক মরিলে সমস্ত দলটি সেবারের জন্য খেলিতে অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য হয়। তাই তাহারা আসিয়া তখন দাড়িয়া অধিকার করে, এবং যাহারা দাড়িয়ায় ছিল, তাহারা তাহাদের ভাগ্য পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করে।

যাহারা বান্ধা নেয়, তাহাদের মধ্যে যদি একজনও পাকিয়া আসিতে পারে, তবে তাহাদের একবাজি জিত হইল। 'ক' চিহ্নিত (অর্থাৎ প্রথম) দাড়িয়ার বহির্ভাগে প্রথমতঃ বান্ধার খেলোয়াড়গণ একত্র হয়, তারপর তাহারা একে একে একটি একটি করিয়া বান্ধা পার হইয়া যাইতে চেষ্টা করে। যদি কোন খেলোয়াড় 'চ' চিহ্নিত (অর্থাৎ সর্ব শেষ) দাড়িয়া পার হইয়া

নির্বিঘ্নে বহির্ভাগে পঁহুছুতে পারে, তবে সে 'পাকিল'। এবং পাকিবার পর সে যদি আবার ফিরিয়া সে প্রথম দাড়িয়ার বহির্ভাগে—যেখানে খেলার প্রারম্ভে ছিল— সেখানে পৌঁছিতে পারে, তবে তাহাদের একবাজি জিত হইল। কিন্তু যদি এই যাইবার ও ফিরিয়া আসিবার পথে তাহাকে কোনও দাড়িয়ার খেলোয়াড় ছুইয়া দিতে পারে, তবে সে মরিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার দলও মরিল।

অথবা যদি কোনও এক বান্ধার মধ্যে দুইএর অধিক খেলোয়াড় একত্র হয় তবে তাহারা মরিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দলটিও মরিল।

অথবা যদি কোনও পাকা খেলোয়াড় কোন কাঁচা (যে পাকিতে পারে নাই) খেলোয়াড়ের সঙ্গে এক বান্ধায় একত্র হয় তবে সে দলটি মরিল।

অথবা যদি কোনও খেলোয়াড় খেলিবার জায়গার চতুর্দিকের নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত সীমার বাহিরে যায়, তবে সে দলটি মরিল।

তবে প্রথম দাড়িয়ার বহির্ভাগে খেলোয়াড়গণ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ দাড়িয়ার লোক ছুঁইলেও মড়া হইবে না।

এদিকে যাহারা দাড়িয়া অধিকার করিয়া থাকে তাহাদের পা কাহাকেও ছুঁইবার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে ও পরে কতকক্ষণ ঠিক দাড়িয়ার মধ্যে থাকা চাই। যদি পা বান্দার মধ্যে যায় বা চারিদিকের সীমার বাহিরে যায়, তবে বিপক্ষকে ছুইলেও সে মরিবে না, বরং বিপক্ষ তাহাকে ধাক্কা দিয়ে চলিয়া যাইতে পারিবে।

দাড়িয়ার লোক প্রথম যে দাড়িয়ায় থাকে সে দাড়িয়া ছাড়িয়া অন্য দাড়িয়ায় গিয়া মারিবার তাহার কোনও অধিকার নাই। শুধু কাঁচাকে মারিতে হইলে, পিছনে এক দাড়িয়ায় যাইতে পারিবে, আর পাকাকে মারিবার সময় সম্মুখের এক দাড়িয়ায় যাইতে পারে। অর্থাৎ কাঁচাকে মারিতে হইলে ক দাড়িয়ার খেলোয়াড় ছ দাড়িয়ায়, এবং খ দাড়িয়ার খেলোয়াড় জ দাড়িয়ায়, অথবা গ এর খেলোয়াড় ঝ-তে যাইতে পারিবে ইত্যাদি। আর পাকাকে মারিতে হইলে, চ-এর খেলোয়াড় ঞ-তে, ঘ-এর খেলোয়াড় ঝ-তে যাইতে পারিবে ইত্যাদি। মনে রাখিতে হইবে ছ, জ, ঝ, ঞ দাড়িয়াতে খেলার প্রথমে কোনও লোক থাকে না। খেলোয়াড়গণ শুধু, ক, খ, গ, ঘ, চ দাড়িয়া অধিকার করিয়ে থাকে এবং উহাদের সমান্তরাল যতটি দাড়িয়া থাকে, ততই খেলোয়াড় এক এক দলে থাকিতে পারে।

প্রচলন— এখন এ খেলার খুব প্রচলন আছে। শিক্ষিত যুবকেরাও ইহাতে খুব যোগ দেয়। সকল গ্রামে, সকল শহরেই (পূর্ববঙ্গে) এ খেলার প্রচলন দেখা যায়।

নাম— দাড়িয়াবান্ধা নামের ব্যুৎপত্তি সহজেই বুঝা যায়। পূর্বে দাড়িয়া ও বান্ধা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই নামের সার্থকতা বুঝা যাইবে।

মন্তব্য— এই খেলায় পরিশ্রম খুব বেশি হয় এবং খেলায় চতুরতার বিশেষ আবশ্যক। দাড়িয়ার খেলোয়াড় সর্বদা বান্ধার খেলোয়াড়ের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতেছে, সর্বদা তাহাকে চৌকি দিতেছে। এ অবস্থায় দৌড়াইবার মধ্যে নানা রকম চতুরতা প্রকাশ করিয়া, দাড়িয়ার খেলোয়াড়কে ফাঁকি দিতে হয়। এ খেলায় কোনও দলের জয় পরাজয় বড় কম হয়, কারণ একবার গিয়া পাকিয়া আবার ফিরিয়া আসা বড় কষ্টের কথা। বিশেষতঃ ফিরিয়া আসিবার সময় কাঁচাপাকা মিশিয়া যাইবার ভয় থাকে।

৫। বসুমতী বা ল্যাদোর-ল্যাদোর ঃ

প্রণালী— এই খেলায় একদলে শুধু একজন লোক থাকে এবং অপর দলে আর সকল খেলোয়াড় থাকে। এ অবস্থায় যথারীতি 'বাঁটিয়া' নিয়া একজনকে 'চোর' করা হয়। সে অবশিষ্ট সকল খেলোয়াড়দের মধ্যে একজনকে যতক্ষণ পর্যন্ত না ছুঁইতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত চোর থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত খেলোয়াড় সকল দাঁড়ান অবস্থায় থাকে, সে সময়ের মধ্যে ছুঁইতে না

পারিলে ছুঁইয়া কোন ফল নাই। অর্থাৎ ছুঁইবার পূর্বে যদি খেলোয়াড় একবার মাটিতে বসিয়া পড়িতে পারে, তবে তাহাকে ছুঁইলেও, চোরের, মুক্তি হয় না। দাঁড়ান অবস্থা ছুঁইতে পারিলে, চোর মুক্তি লাভ করিল, আর চোর যাহাকে ছুঁইল সে আবার চোর হইল। চোরের ভয়ে একবার মাটিতে বসিয়া পড়িলে আবার উঠিয়া দাঁড়ান সহজ নয়। উঠিয়া দাঁড়াইতে হইলে— (১) দাঁড়ান অবস্থার কোনও খেলোয়াড়কে তাহার মাথা ছুঁইতে হইবে। (২) অথবা মাটিতে বসিয়া আছে এরূপ দুইটি খেলোয়াড় পরস্পরকে। কিন্তু এইরূপে ছুঁইবার সময় চোর যদি ওই দুইজন খেলোয়াড়ের মাথা একই সময়ে দুই হাতে ছুঁইতে পারে তবে আর তাহাদের উঠা হইবে না। পুনরায় যদি কোনও দাঁড়ান অবস্থার খেলোয়াড় আসিয়া তাহাদের মাথা ছুঁইতে পারে, তবেই তারা উঠিতে পারিবে।

দাঁড়ান অবস্থার কোনও খেলোয়াড় ছুঁইয়া গেলে এবং যাহাকে ছুঁইল তাহার উঠিবার পূর্বে যদি চোর আসিয়া আবার শেষোক্ত খেলোয়াড়কে ছুঁইতে পারে তবে সে বারে আর তাহার উঠা হইল না।

প্রচলন— চৌদ্দ-পনেরো বৎসর পূর্বে এই খেলার খুব প্রচলন ছিল। বিশেষতঃ ছোট ছোট ছেলেরা যাহারা হাডুডু প্রভৃতি পূর্বোক্ত কষ্টসাধ্য খেলাগুলিতে অপটু বা অভিজ্ঞ, এই খেলায় তাহারা খুব আমোদ উপভোগ করিত। কিন্তু আজকাল বড় বিশেষ একটা প্রচলন দেখা যায় না। কচিৎ দুই একটা গ্রামে দেখা যায়। উপরে এই খেলার দুইটি নাম লিখিয়াছি—

(১) বসুমতী— এই নাম কেন হইল বুঝি না। সম্ভবতঃ চোরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বসুমতীই একমাত্র উপায় (কারণ মাটিতে বসিয়া পড়িলে আর চোরের ভয় থাকে না)। এইজন্য ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে।

(২) ল্যাদোর ল্যাদোর— বিক্রমপুরে সাধারণত দুর্বল ছেলেকে ল্যাদা বলে। সব কাজেই যাদের 'গা-ছাড়া' ভাব, উঠিতে, বসিতে, খাইতে, চলিতে, ফিরিতে সব কাজেই যাহাদের (গাছাড়া ভাব) দুর্বলতা প্রকাশ পায় তাহাদিগকে ল্যাদা বলে। তাহাদের বসিবার ধরণটাকে ল্যাদোর বলা হয়। আর এই খেলাতে যে অত্যন্ত অপটু, বসিয়া পড়াই তাহার প্রধান উপায় বলিয়া এই খেলাটাকেও উক্ত নাম অভিহিত করা হয়। অনেক জায়গায় দুই নাম প্রচলিত নাই।

৬। চোখবুজানি বা লুকপলানি ঃ

শুদ্ধ ভাষায় যাহাকে 'লুকোচুরি' খেলা বলে, তাহাকেই বিক্রমপুরে সাধারণ ভাষায় চোখবুজানি বা লুকপলানি খেলা বলে। এই খেলা সর্বত্র প্রচলিত। পৃথিবীর সকল জায়গাতেই কোনও না কোনও রূপে এ খেলার প্রচলন আছে। বঙ্গের সর্বত্রই এই খেলা প্রচলিত, তাই আর ইহার প্রণালী সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করি না।

প্রচলন সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, এই খেলা এখনও বিক্রমপুরের পল্লীতে পল্লীতে, পাড়ায় পাড়ায়, বাড়িতে বাড়িতে প্রচলিত। এই খেলার বিক্রমপুরে প্রচলিত নাম সম্বন্ধে একটি কথা বলা যাইতে পারে।

নাম— অন্যান্য খেলোয়াড় যতক্ষণ পর্যন্ত না লুক্কায়িত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত 'রাজা' চোরের চোখ দুইটি বুজাইয়া রাখে। রাজা যদি মানুষ না হইয়া কোনও গাছপালা হয়, তবে চোর নিজেই নিজের চোখ বুঝাইয়া রাখে। এইজন্যই এই খেলাকে চোখবুজানি খেলা বলে।

'লুকপলানি' নামটা লুকাঁন ও পলান এই দুই সমার্থবাচক শব্দসংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়।

মন্তব্য— চোর যখন চোখ বুজিয়া থাকে, তখন প্রায়ই নিম্নলিখিত ছড়া বলিয়া থাকে—

"চোখবুজানি লোহার কাঠি।
পলারে ভাই সক্কল্ কটি।।"

অর্থাৎ লোহার কাঠি (শলাকা) দিয়া আমার চোখ বুজান হইয়াছে, তোমরা সকলেই এখন পালাও। (সক্কল = সকল)

যদি কোনও ব্যক্তি নির্দিষ্ট সংখ্যক বার অবিচ্ছিন্ন ভাবে চোর থাকে, তবে আবার খেলাটা অন্য রকমের হইয়া যায়। একখণ্ড কাপড় দিয়া তখন চোরের চোখ বাঁধিয়া দেওয়া হয়। অন্যান্য খেলোয়াড়গণ তখন চুপি চুপি যাইয়া চারিদিক হইতে চোরের মাথায় 'চাটি' মারিতে থাকে। চোর যদি তখন কাহাকেও ধরিয়া তাহার নাম বলিতে পারে, তবেই সে মুক্ত হইল, নচেৎ নয়। যাহার নাম বলিয়া চোর মুক্তিলাভ করে, তাহাকে আবার তখন এরূপ চোখ বাধিয়া 'চাটি মারা' হয়।

৭। ডগারে ডগা ঃ

একজন খেলোয়াড় গাছে উঠে, অন্যান্য সকলে প্রথমতঃ নিচে দাঁড়ায। নিচের খেলোয়াড়গণ তারপর চিৎকার করিয়া ডাকে— 'ডগারে ডগা?'

গাছ হইতে ডগা উত্তর দেয়	কিরে ডগা।
পুনর্বার প্রশ্ন হয়	গাছে কেন?
উঃ	বাঘের ডরে।
প্রঃ	বাঘ কই?
উঃ	মাটির তলে।
প্রঃ	মাটি কই?
উঃ	ঐ তো।
প্রঃ	তরা কয় ভাই?
উঃ	সাত ভাই।
প্রঃ	আমারে এক্‌টা দিবি?
উঃ	ছুইতে পারলে নিবি।

শেষোক্ত উত্তর হওয়া মাত্র নিচের খেলোয়াড়দের মধ্যে কয়েকজন গাছে উঠে আর কয়েকজন মাটিতে থাকে। তখন গাছের উপরে প্রথম যে খেলোয়াড়টি ছিল তাহাকে ছুইবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করা হয়। তাহাকে মাটিতে পড়ার পূর্বে ছুঁইতে পারিলে সে আসিয়া মাটিতে দাঁড়াইবে এবং যে ছুঁইল সে তখন গাছে উঠিবে এবং পুনরায় প্রথম হইতে খেলা আরম্ভ হইবে।

উপরি লিখিত ছড়াটির প্রথম ছত্র হইতেই খেলার মান হইয়াছে। গাছে যে খেলোয়াড়টি থাকে তাহাকে 'ডগা' বলা হয়, কেন বুঝিতে পারা যায় না। হয়ত গাছর ডগা (পল্লবযুক্ত শাখাগ্রভাগ) হইতেই গাছের উপরের খেলোয়াড়টির এই নাম হইয়া থাকিবে।

এই খেলা ছেলেপিলেদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত। রাখাল বালকদের মধ্যেই এ খেলার সর্বাপেক্ষা অধিক আদর। মাঠের মধ্যে গরুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া রাখাল বালকগণ মাঠের কিনারায় আসিয়া ছোট ছোট ঝোপের ধারে একটি গাছ বাছিয়া লয় এবং অত্যন্ত উৎসাহের সহিত খেলিতে আরম্ভ করে। অন্যান্য খেলোয়াড়দের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যখন ডগা ডাল হইতে ডালে যাইতে থাকে, তখনকার দৃশ্য বাস্তবিকই মনোরম।

৮। ৯। ১০। ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, বেডমিনটন ঃ

এতৎসম্বন্ধে অধিক বলা অনাবশ্যক, ফুটবল প্রায় সকল গ্রামেই আছে। ক্রিকেটও প্রায় তদ্রূপ, তবে কিছু ব্যয়সাধ্য বলিয়া এখনও সর্বত্র প্রচলিত হয় নাই। টেনিসও অনেক গ্রামে আরম্ভ হইয়াছে। বুড়িগঙ্গার দক্ষিণপারস্থিত গ্রামগুলি ক্রিকেট খেলার জন্য অতি প্রসিদ্ধ। মালখাঁনগর, তেঘরিয়া প্রভৃতি গ্রামের অনেক খেলোয়াড় বাঙালিদের মধ্যে ক্রিকেট খেলার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

১১। কুমির-কুমির ঃ

অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়েরা এই খেলার খুব অনুরক্ত। একজন কুমির হয়, আর সকলে মানুষ হয়। কুমির উঠানরূপ নদীতে ভাসিয়া বেড়ায়। মানুষেরা উঠানের চারিদিকের ঘরে আশ্রয় লয়। কুমির যখন তাহার খাদ্যের জন্য বা তাহার বাচ্চাগুলির তল্লাসে আশেপাশে ঘুরিতে থাকে, তখন মানুষেরা সুযোগ পাইয়া নদীতে স্নান করিতে নামে এবং উৎসাহের সহিত বলিতে থাকে— "এই গাঙ্গে কুমির নাই ঝাপ্পুর, ঝুপ্পর"।

কখন কখন বা মানুষেরা এই সুযোগে নদী পার হইয়া পরস্পরের আশ্রয়-স্থান পরিবর্তন করে। কুমির মানুষের শব্দ পাইয়া পাইয়া, 'হাউ মাউ' বলিয়া দৌড়াইয়া আসে। অমনি পালাইবার জন্য তাড়া পড়িয়া যায়। আশ্রয়স্থানে উঠিবার পূর্বে যদি কুমির কাহাকেও ধরিতে পারে, তবে কুমির মানুষ হয়, আর সেই ধৃতমানুষটি কুমির হয়। মানুষ নদীতে স্নান করিতেছে, এই অবসরে যদি কুমির সেই মানুষের শূন্য ঘর অধিকার করিতে পারে, তবে কুমির মানুষ হয়, আর যে স্নান করিতে গিয়াছিল, সে কুমির হইয়া নদীতেই থাকে।

১২। লোন্তা-লোন্তা ঃ

অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালকদের মধ্যেও এই খেলার প্রচলন দেখা যায়। একজন খেলোয়াড় চোর হইয়া একটি কুণ্ডলীর মধ্যে নিজের রাজত্ব স্থাপন করে। অন্যান্য খেলোয়াড় সকল সে গণ্ডীর বাহিরে থাকে। চোর তখন ডাক (পূর্বে দ্রষ্টব্য) লইয়া বিপক্ষদল ধ্বংসের জন্য বাহির হয়। এক ডাকে বিপক্ষদলের কাহাকেও ছুঁইতে যাইয়া আবার নিজের কুণ্ডলীর মধ্যে ফিরিয়া আসা চাই। গণ্ডীর মধ্যে ঢুকিবার পূর্বে যদি ডাক ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে বিপক্ষদল মৌমাছির ঝাঁকের মত তাহাকে ঘিরিয়া তাহার শরীরের সকল স্থানে অসংখ্য কিল মারিতে থাকে। আবার কাহাকেও যদি ছুঁইতে পারে, তবে আর তাহাকে কেহ কিছু করিতে পারিবে না, কিন্তু যাহাকে ছুঁইয়াছে, তাহার কপালে আবার পূর্বোক্ত দশা ঘটে, এবং সে তখন চোরের রাজ্যে আসিয়া চোরের কার্য করে। ডাক লইয়া মাঝে মাঝে তাহাকেও যাইতে হয়। যখন সকল খেলোয়াড়ই চোরের দলভুক্ত হয়, শুধু একজন মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন সেই অবশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া উঠে 'লোন্তা'! চোরের দল উত্তর দেয়— 'এক'। আবার ডাক হয়— 'লোন্তা'। আবার তাহার উত্তর হয়— 'দুই'। এইরূপে চোরের দলে যতসংখ্যক লোক আছে, তত সংখ্যা পর্যন্ত, এইরূপ ডাক ও উত্তর হইতে থাকে। শেষ সংখ্যা হইয়া গেলে, অবশিষ্ট ব্যক্তি দৌড়াইয়া কুণ্ডলির ভিতর যাইয়া কুণ্ডলি অধিকার করে এবং কুণ্ডলির ভিতর কাহাকেও পাইলে তাহাকে 'কিল' মারিতে থাকে। সকলে বাহির হইয়া গেলে, আবার ফিরিয়া খেলা আরম্ভ হয়।

এই খেলা খেলিতে এবং দেখিতে গ্রাম্য লোকেরা বিশেষ আমোদ পায়। চাষা ও ভদ্র সকল প্রকার লোকের মধ্যেই এই খেলা প্রচলিত।

'লোন্তা' এই নাম কোথা হইতে আসিল বুঝা যায় না।

১৩। ডাণ্ডাগুলি বা দাণ্ডাগুলি ঃ

এই খেলার প্রণালী বর্ণন নিষ্প্রয়োজন ১০।১২ বৎসব পূর্বে এ খেলার খুব প্রচলন ছিল। এখন রাখাল বালকদের ছাড়া অন্য কাহারও মধ্যে এই খেলার প্রচলন বড় একটা দেখা যায় না।

১৪। ১৫। কড়ি খেলা ও মার্বেল খেলা ঃ

এই খেলা দুটির অনেক রকম শাখা আছে। অধিকাংশ শাখাতেই বাজি রাখিয়া খেলা হয়। বাজির পরিমাণ দুইটি কি তিনটি কড়ি বা মার্বেলের বেশি বড় না হয়। মধ্যে ভদ্র অভদ্র সকল ছেলেরাই এই খেলা খেলিত। এখন ভদ্র লোকের মধ্যে মার্বেল খেলার একটি শাখা ছাড়া অন্য কোন রূপ এই জাতীয় খেলা প্রচলিত নাই।

১৬। বাইগন টিপ টিপ—(বাইগন-বেগুন) ঃ

খেলোয়াড়দের মাঝে একজন চোর হয়। অবশিষ্ট কয়জন বৃত্তাকারে মাটিতে বসিয়া থাকে। চোর একখানা কাপড়ের টুকরো দিয়া একটি পুঁটলির মত করে। ধরিবার জন্য কাপড়ের একটা ধার আলগা থাকে। ইহাই চোরের বেগুন, চোর ইহা নিয়া অন্যান্য খেলোয়াড়দের পিছনে পিছনে ঘুরে। এবং মাঝে মাঝে কোন কোন খেলোয়াড়ের পিছনে পুটলিটাকে যেন রাখিয়া দিল, এরূপ ভান করে বা প্রকৃতই রাখিয়া দেয়। কোনও খেলোয়াড় যদি পিছনের দিকে তাকাইয়া বা হাত দিয়া পুটলি না পায়, এবং যদি তাহার পিছনের দিকে তাকান বা হাত বাড়ান চোর দেখিতে পায়, তবে চোর আসিয়া তাহার 'বাইগুন' দিয়া উক্ত খেলোয়াড়ের পিঠে খুব মারিতে থাকে। যে পর্যন্ত উক্ত খেলোয়াড় উঠিয়া গিয়া চোরের গন্তব্যদিক অনুসরণ করিয়া বৃত্তাকারে সমস্ত খেলোয়াড়ের পিছন ঘুরিয়া নিজের জায়গায় না বসে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে চোরের আঘাত সহ্য করে।

আবার যাহার পিছনে রাখা গিয়েছে, সে যদি টের না পায়, (চোর ঘুরিয়া তাহার পিছনে পুনরায় আসিবার মধ্যে), তবে তাহাকে উক্তরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। যার পিছনে রাখা হইয়াছে, যে যদি টের পাইয়া চোরের বাইগুন হস্তগত করিতে পারে, তবে সে পূর্বোক্ত নিয়মানুযায়ী চোরকে মারিতে থাকে, এবং সে সময় হইতে সে 'চোর' বলিয়া গণ্য হয়।

এ খেলার প্রচলন আজ কাল বড় নাই। দুই এক গ্রামে কদাচিৎ বৃদ্ধদের প্ররোচনায় ছোট ছোট ছেলেরা ইহা খেলে। বৃদ্ধেরা তাহাদের ছেলে বেলার প্রিয় খেলার পুনরভিনয় দেখিয়া অতীত জীবনের অনুভূত সুখ, এই বৃদ্ধ বয়সে আংশিক উপভোগ করে।

এ খেলায় চোর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ চোরই এ খেলার সর্বপ্রকার সুবিধা ভোগ করে।

১৭। মাছ-মাছ ঃ

একজন 'মাছ' হয়, অপর সকলে তাহা ঘিরিয়া বৃত্তাকারে দাঁড়ায়, এবং পরস্পর পরস্পরের হাত ধরিয়া মাছের চারিদিকে একটি বেড়ার মত প্রস্তুত করে। 'মাছ' তখন নিজের পায়ের কবজির কাছে হাত রাখিয়া বলে—

"এতটুকুন জল এতটুকু পানি।"

বেষ্টনকারীরা অমনি চিৎকার করিয়া উঠে—

"জাকের জানি।"

মাছ ক্রমে ক্রমে তাহার হাত উপরের দিকে রাখিতে থাকে, এবং প্রত্যেকবারে উক্তরূপ কথা বলে ও উত্তর পায়। যখন মাথা পর্যন্ত জলের পরিমাণ হইয়া যায় তখন মাছ বলে—

"এ দুয়ারটি কাড়বো।"

অমনি উত্তর দেয়— "হাত ছুড়ে' মারবো।।"

মাছ ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রতি দুইজন খেলোয়াড়ের মধ্য দিয়া যাইতে চায়। খেলোয়াড়গণ "হাত ছুড়ে" মারিবার ভয় দেখায়। মাছ একবার সুবিধা বুঝিয়া পলাইবার চেষ্টা করে। যদি কখনও কৌশলে বা জোরে মাছ পালাইতে পারে, তবে সে কুণ্ডলী হইতে বাহির হইয়াই দৌড়াইতে থাকে। অন্যান্য খেলোয়াড়গণও তখন তাহার পিছনে দৌড়ায়। যে দৌড়াইয়া সকলের পূর্বে 'মাছ'-কে ছুইতে পারে, সে তখন 'মাছ' বলিয়া গণ্য হয়, এবং পুনরায় পূর্বোক্তরূপে খেলা আরম্ভ হয়।

শেষোক্ত ছড়াটির ভিতর বিক্রমপুরের পল্লীভাষার স্থলে রাজধানীর ভাষা স্থান পাইয়াছে। পূর্বে এরূপ ছিল না।

১৮। নলডুবানী ঃ

দল বাঁধিয়া যখন স্নান করা হয়, তখন এই খেলাতে খুব আমোদ পাওয়া যায়। স্নানার্থীর

একজন 'নল' হয়। সে অন্যান্য স্নানার্থিদের নিকট হইতে প্রথমতঃ কতটা দূরে থাকে। তখন উভয়দলের সম্মতিক্রমে খেলা আরম্ভ হয়। 'নল'কে ছোঁওয়াই এই খেলার সর্বপ্রধান কাজ। 'নল' ডুব দিয়া সাঁতার কাটিয়া অন্যান্য খেলোয়াড়দের নিকট হইতে দূরে থাকিতে চায়। আর অন্যান্য খেলোয়াড়গণ চারিদিক হইতে তাহাকে ছুঁইতে আসে। যে 'নল'কে সর্বপ্রথম তাহার মাথায় ছুঁইতে পারে, সে তখন হইতে নল বলিয়া গণ্য হয়। এবং তখন আবার সকলে তাহাকে ছুঁইবার চেষ্টা করে।

খেলা শেষ হইলে যাহারা জিতিয়াছে তাহার বিপক্ষকে নিম্নলিখিত ছড়াটি বলিয়া অনেক সময় উত্ত্যক্ত ও অপমানিত করে—

"হইরা গেল কুত্তি
নাক ভইরা মুত্তি।
নাকে হইল ঘাও
পেইয়া পুইছা খাও।।"

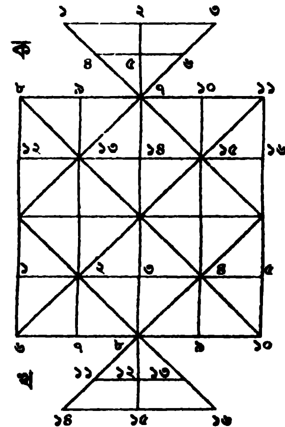
খ—বসতি খেলা

১। তাস, পাশা, সতরঞ্চ ঃ

এই খেলা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। যেখানে বাঙালি আছে সেখানেই এই সব খেলার প্রচলন আছে। বয়সনির্বিশেষে প্রায় সকলেই খেলাগুলির অনুরক্ত।

২। ষোল গুটি মঙ্গলপাটা ঃ

প্রণালী— এই খেলায় দুইজন খেলোয়াড় দুই পক্ষে বসে। পাশে অঙ্কিত একটি কোট আঁকিয়া কোটের দুইধারে সংখ্যাদ্বারা প্রত্যেক ঘরে এক একটি গুটি রাখা হয়। প্রত্যেক পক্ষে ষোলটি গুটি থাকে। এক ঘর হইতে অন্য ঘরে একটি গুটি নেওয়ার নাম চাল দেওয়া। প্রত্যেকটি চাল একটি সরল রেখা অনুসরণ করিয়া দিতে হয়। যেনন অঙ্কিত কোটের 'ক' চিহ্নিত অংশটির মধ্যে, ৬-এর ঘর হইতে, ৩, ৫, ৭-এর ঘরে চাল দেওয়া যায়। ৬ হইতে ২-তে একবারে চাল দেওয়া যায় না। ৬ হইতে ২-এ যাইতে হইলে প্রথমে ৫ বা ৩-এ খাইতে হইবে।



পরস্পর গুটিগুলিকে 'খাওয়া' অর্থাৎ খেলোয়াড়দের পরস্পরের লক্ষ্য থাকে। যার গুটিগুলি আগে 'খাওয়া' যায় তারই একবাজি হার হয়। একটা গুটিকে ডিঙাইয়া যাওয়ার নাম 'খাওয়া'। 'ক' চিহ্নিত অংশ ৫-এর ঘরে যে গুটি থাকে, তাহাকে 'খাইতে' হইলে, ২-এর ঘর হইতে ৭ এর ঘরে এবং ৬ এর ঘর হইতে ৪ এর ঘরে বা তাহার বিপরীতভাবে খাইতে হয়।

পথ পরিষ্কার থাকিলে একবার দুই তিনটা বা ততোধিক গুটি খাওয়া যাইতে পারে। যেমন 'ক' চিহ্নিত অংশে ৮ এর ঘরে আমার একটি গুটি আছে, আর ৯, ৬ এবং ২-এর ঘরে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের এক একটি গুটি আছে। ৭-এর ঘরে এবং ৩ এর ঘরে এবং একের ঘরে কোনও গুটি নাই। এ অবস্থায় আমি একেবারে আমার ৮ এর ঘরের গুটি ৭ এর ঘরে, তথা হইতে ৩ এর

ঘরে এবং তথা হইতে ১ এর ঘরে গিয়া বিপক্ষ ব্যক্তির ৯, ৬ এবং ২ এর ঘরের গুটি 'খাইতে' পারি।

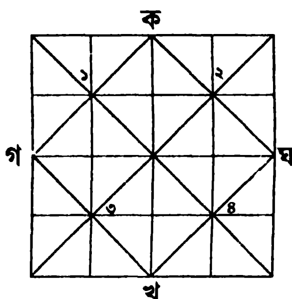
বলা বাহুল্য যে প্রভেদ করিবার জন্য দুই পক্ষে দুই রকম গুটি থাকে এবং একজন উপর্যুপরি দুইবার চাল দিতে পারে না।

নাম— এই খেলার নাম 'মোগলপাঠান' শব্দ হইতে উৎপন্ন। অনেক জায়গাতে 'মঙ্গলপাটা' না বলিয়া 'মোগলপাঠান'ই বলে! বঙ্গের ইতিহাস প্রসিদ্ধ মোগলপাঠানের যুদ্ধকাহিনী পল্লীগ্রামেও সুবিদিত ছিল। সেই যুদ্ধেরই স্মরণার্থ বোধ হয় এই খেলার সৃষ্টি। নাম হইতে বুঝা যায় যে এই খেলা বিশেষ পুরাতন নয়। মোগলপাঠানদের যুদ্ধের পরই এই খেলার সৃষ্টি বা প্রচলন আরম্ভ হয়।

প্রচলন— মেয়েদের মধ্যেই এই খেলার বিশেষ প্রচলন। বিক্রমপুরের সর্বত্রই এই খেলা এখনও প্রচলিত আছে।

৩। ২৪ গুটি বাঘ চাল ঃ

প্রণালী— উপরে অঙ্কিত কোটের অনুরূপ একটি কোট আঁকিয়া, ১, ২, ৩, ৪ চিহ্নিত ঘরগুলির প্রত্যেকটির ছয়টি করিয়া গুটি বসাইতে হয় এবং ক ও খ অথবা গ ও ঘ চিহ্নিত ঘরে এক একটি বাঘ বসাইতে হয়। একজন বাঘচালায়, অন্যজন গুটি চালায়। গুটি চালক ব্যক্তির উদ্দেশ্য বাঘকে বন্দি করা। বাঘচালক ব্যক্তির উদ্দেশ্য গুটিগুলি খাইয়া ফেলা, যেন বাঘটিকে বন্দি করিতে না পারে। এই খেলাতে চাল দেওয়া ও গুটি খাওয়ার নিয়ম 'মোগলপাঠান' খেলার মতন। কোটটিও প্রায় তদনুরূপ। গুটিগুলিকে যখন বাঘের চারিদিকে এরূপভাবে সাজান হয় যে বাঘের আর চাল হইতে পারে না, তখনই বাঘবন্দি হইল। বাঘবন্দি করিতে পারিলে গুটিচালকের একবাজি জিত হইল, আর গুটিগুলি খাইতে পারিলে বাঘ একবাজি জিত হইল।

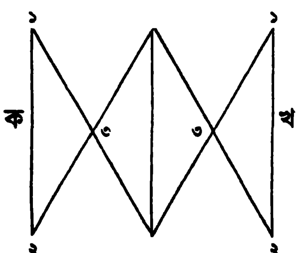


নাম— খেলার উকরণগুলি দ্বারা নাম হইয়াছে। যেহেতু এ খেলায় ২৪টি গুটি ও দুটি 'বাঘ' নেওয়া হয়। অনেক জায়গায় অধুনা এই খেলার নাম 'বাঘবন্দি' হইয়াছে। এই নামটি পশ্চিমবঙ্গ হইতে ধার করা।

প্রচলন— বিক্রমপুরের সকল গ্রামেই স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই খেলার প্রচল আছে, কিন্তু দিন দিন তাহা কমিয়া আসিতেছে।

৪। ৩ গুটি বাঘ চাল ঃ

প্রণালী— পার্শ্বে অঙ্কিত কোটে 'ক' বা 'খ' চিহ্নিত ধারে ১, ২. ৩ চিহ্নিত ঘরগুলির প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া গুটি বসাইতে হয়, আর বিপরীত ধারে (অর্থাৎ 'ক' চিহ্নিত ধারে গুটি বসাইলে 'খ' চিহ্নিত ধারে এবং 'খ' চিহ্নিত ধারে গুটি বসাইলে 'ক' চিহ্নিত ধারে) ৩-এর ঘরে একটি বাঘ বসাইতে হয়। বাঘকে বন্দি করাই ও গুটি খাওয়াই বাঘচালকের লক্ষ্য। এই খেলায় চাল দিবার ও গুটি খাওয়ার নিয়ম পূর্বোক্ত 'বাঘবন্দি' খেলারই মতন। এই খেলাতে গুটির সংখ্যা মোট তিনটি থাকাতে একটি গুটি খাইতে পারিলেই বাঘ চালকের একবাজি জিত হয়।



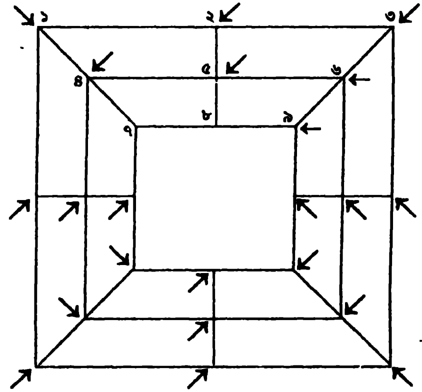
নাম ও প্রচলন— এই খেলারও নাম খেলার উপকরণ হইতে হইয়াছে। পূর্বোক্ত 'বাঘবন্দি' খেলার মত ইহার প্রচলন ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এ খেলাতে বড় আমোদ পায়, কারণ এই খেলা একটু সহজ।

৫। দশপঁচিশ ঃ

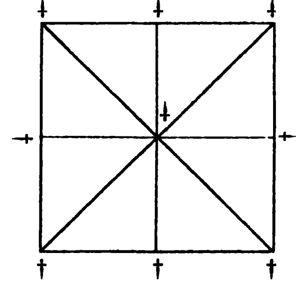
এই খেলার কোঠ ঠিক পাশা খেলার কোঠের মতো। এক এক দলে যত সংখ্যক ইচ্ছা গুটি থাকিতে পারে এবং প্রত্যেক দলে সমান সংখ্যক লোক চাই। পাশার পরিবর্তে এই খেলাতে সাতটি কড়ি চালা হয়। এই খেলা বাঙালির ঘরে ঘরে বিদ্যমান, সুতরাং এতৎসম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন। স্ত্রীলোকদের এসব খেলার আমোদ বেশি। বর্ষীয়সী বৃদ্ধা হইতে বালিকা পর্যন্ত এই খেলার অনুরক্ত।

৬। ১২ গুটি পাইট পাইট ঃ

প্রণালী— প্রত্যেকে ১২টি গুটি লইয়া দুইজনে এই খেলা খেলিতে বসে। পার্শ্বে অঙ্কিত কোঠে তীরচিহ্নিত ঘর গুলির একটিতে প্রথমে একজন একটি গুটি বসায়। তারপর অন্যজন আর একটি গুটি অন্য একটি ঘরে বসায়। এইরূপ একজনের পরে অন্য জন গুটি বসাইতে থাকে। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য এক সারিতে ক্রমান্বয়ে তিনটি করিয়া গুটি বসান। যদি কাহারও তিনটি গুটি ক্রমান্বয়ে (১, ২, ৩ এর ঘরে বা ১, ৩, ৭ এর ঘরে বা ৪, ৫, ৬ এর ঘরে বা ২, ৫, ৮ এর ঘরে ইত্যাদি রূপে) বসিতে পারে, তবে তাহার এক পাইট হইল। এক একটি বার পাইট হইলে বিপক্ষ ব্যক্তির সাজান গুটি হইতে ইচ্ছামত যে কোন একটি গুটি উঠাইয়া নেওয়া হয়। কাজেই যাহার অধিক সংখ্যক পাইট হয়, খেলা শেষে তাহারই জিত হয়। কারণ যত সংখ্যক পাইট হইবে, বিপক্ষ ব্যক্তির ততসংখ্যক গুটি কমিয়া যাইবে, এবং শেষে তাহার আর পাইট করিবার কোন সুযোগই থাকে না। প্রথমত হাতের ১২টি গুটি একটি একটি করিয়া বসাইতে হয়। হাতের গুটি বসান শেষ হইলে, সাজান গুটিগুলিকে চালে দিতে হয়। গুটি বসাইবার সময় এবং গুটি চাল দিবাব সময় দুইটি বিষয়েই খুব লক্ষ্য রাখিতে হয়। কোথায় বিপক্ষ ব্যক্তির পাইট হইবার সম্ভাবনা আছে তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহার পাইট নষ্ট করা। দ্বিতীয় কথা, কোথায় গুটি বসাইলে বিপক্ষ ব্যক্তি সহজে নিজের পাইট নষ্ট করিতে না পারে।



নাম ও প্রচলন— 'পাইট করা' কথায় বিক্রমপুর অঞ্চলে 'সুবিন্যস্ত করা' বুঝায়। যেমন 'চুল পাইট করা'। এই খেলাতে প্রত্যেকের লক্ষ্য থাকে, ক্রমান্বয়ে তিনটি গুটি সারি দিয়া বসান, অর্থাৎ সুবিন্যস্ত করা। আর এই খেলায় প্রত্যেকদলে ১২টি গুটি থাকে। এই জন্যই এই খেলার নাম ১২ গুটি পাইট পাইট। স্ত্রীলোকদের মধ্যেই এই খেলার প্রচলন ছিল। এখন কাল মহিমায় ইহার প্রচলন কমিয়া আসিতেছে।



৭। ৩ গুটি পাইট পাইট

এই খেলার প্রণালী ১২ গুটি পাইট পাইট খেলারই মত। তবে এই খেলায় ১২ গুটির পরিবর্তে ৩ গুটি নিয়া খেলিতে হয়। খেলার নামও তদনুযায়ী হইয়াছে। প্রচলন ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে।

৮। জোড়-বেজোড় ঃ

কতকগুলি গুটি (কড়ি বা তেঁতুল বিচি বা অন্য কোন রকম) এক একজনে লইয়া দুইজনে খেলিতে থাকে। কাপড়ের আঁচল দিয়া গুটিগুলি লুকাইয়া রাখা হয়। তারপর তাহা হইতে কতগুলি গুটি নিয়া মুষ্টির ভিতর লুকাইয়া বিপক্ষ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে— 'জোড় না বেজোড়?' বিপক্ষ ব্যক্তি 'জোড়', 'বেজোড়' ও 'ফাক্কা' এতিনটির একটা উত্তর দেয়। 'ফাক্কা' শব্দ দ্বারা এই বুঝায় যে তাহার হাত খালি, গুটি মাত্রও নাই। যদি উত্তর ঠিক হয়, তবে মুষ্টিতে যতগুলি গুটি ছিল, তাহা সবই সে পায়। উত্তর ঠিক না হইলে, যতগুলি গুটি হাতে ছিল. ততগুলি গুটি আবার প্রথম ব্যক্তিকে দণ্ড স্বরূপ দিতে হয়। 'ফাকা' যেবার থাকে, সেবারে আদান প্রদান মোটে একটি গুটি।

৯। বুদ্ধিমন্ত ঃ

প্রথমত একজন রাজা নির্বাচিত হয়। তারপর খেলোয়াড়গণ সমান সংখ্যক দুটি দলে বিভক্ত হয়। রাজা দুই দলের মধ্যে বসে। দল দুটি রাজার নিকট হইতে এতটা দূরে বসে যে, রাজার কাণে অন্য কেহ আস্তে আস্তে কথা বলিলে যেন কোনও দলের কেহ শুনিতে না পায়। প্রথমতঃ একদল হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া বিপক্ষদলের কোনও ব্যক্তির নাম রাজার কাণে বলিয়া যায়। তারপরে বিপক্ষদল হইতে একজন আসিয়া আবার পূর্বোক্তদলের এক ব্যক্তির নাম রাজার কাণে বলিয়া যায়। এইরূপ ক্রমান্বয়ে এক এক দলের এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার বিপক্ষদলস্থ কোনও ব্যক্তির নাম রাজার কাছ বলিয়া যাইতে থাকে।

বিপক্ষ খেলোয়াড় যাহার নাম যে বারে বলে, সে বারে যদি সেই ব্যক্তি নিজ পক্ষের কর্তব্য সাধনের জন্য বাজার কাছে উপস্থিত হয়, তবে সেই শেষোক্ত ব্যক্তি 'মড়া' বলিয়া গণ্য হয়। ক, খ এর বিপক্ষে খেলিতেছে। ক আসিয়া খ এর নাম বলিয়া গেল, ঠিক তার পরেই যদি বিপরীত পক্ষ হইতে খ নাম বলিতে আসে, তবে খ মড়া বলিয়া গণ্য হইবে। 'মড়া' খেলোয়াড় রাজার কাছে বসিয়া থাকিবে, এবং সে অবস্থায় সে পরামর্শ ইত্যাদি দ্বারা নিজ পক্ষের কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিবে না।

যদি কখনও 'মড়া' খেলোয়াড়ের বিপক্ষদলের লোক মরে, তবে 'মড়া' বাঁচিয়া উঠে। খ 'মড়া', এখন যদি ক এব দলস্থ কোন ব্যক্তি মরে, তবে খ বাঁচিবে এবং পুনরায় নিজ দলে গিয়া খেলিবে।

এক দলের সমস্ত খেলোয়াড় যদি মরিয়া যায়, তবে বিপক্ষ দলের এক বাজি 'জিত' হয়।

একদলের সমস্ত খেলোয়াড় মরিয়া গিয়াছে— শুধু একজন— মনে করুন ক বাঁচিয়া আছে। এখন বিপক্ষদল হইতে যে আসিবে, সে ক এর ডান হাত কি বাঁ-হাতের নাম করিয়া যাইবে। রাজা ক-কে হাত উঠাইতে বলিবে। ক যদি বিপক্ষ খেলোয়াড়ের উল্লিখিত হাত উঠায়, তবে ক-এর হাত 'মড়া'। এইরূপ পা, চোখ, কাণ প্রভৃতিকেও খেলার অঙ্গীভূত করিয়া খেলাকে বাড়ান যায়। ইহাতে একটি সুবিধা এই যে, যে দলের একজন খেলোয়াড় মাত্র বাঁচিয়া আছে, সে দলকে তাহার নিজেদের দলবৃদ্ধি করিবার জন্য, কয়েকবার অবসর দেওয়া হয়।

হাত, পা, চোখ, কাণ প্রভৃতির কোন কোনটিকে খেলার অঙ্গীভূত করা হইবে, তাহা খেলা

আরম্ভ হইবার পূর্বে দুই পক্ষের সম্মতিক্রমে রাজা ঠিক করিয়া দেয়।

নাম— এই খেলাতে বুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন বলিয়াই ইহার নাম 'বুদ্ধিমন্ত' হইয়াছে। এই খেলায় অনুমানশক্তির বিশেষ প্রয়োজন।

এই খেলা আজ কালও মাঝে মাঝে খেলা হয়। বৃষ্টির সময় ঘরে বসিয়া এ খেলা খেলিতে বিশেষ আমোদ পাওয়া যায়।

১০। ফাক্কা ফাক্কা বা টাইলো টুয়নি ঃ

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই খেলাতে বেশ আমোদ পায়। একজন হাত উপুড় করিয়া রাখে। অন্য একজন এক হাত দিয়া সে হাতকে 'চিমটি দিয়া' ধরে, আর একজন আবার তার হাত ঐরূপ 'চিম্‌টি কাটিয়া' ধরে। এ রকম করিয়া সকল খেলোয়াড়ের সকল হাত দিয়া একটি শিকলের মত গড়া হয়। তারপর সে শিকলকে সকলে মিলিয়া উপরে নিচে উঠাইতে ও নামাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত ছড়াগুলি বলিতে থাকে—

টাইলো টুয়নি খইল্‌সা মাছের বুয়নি
মামায় দিল খইল্ সাটা সেরে নিল চিলে,
চিলের লাগুর পাইলাম না ফাক্কা ভাইঙ্গা যা।

যেই ছড়াটি বলা শেষ হয়, অমনি সকলে যার যার হাত সরাইয়া নিয়া শিকলটি ভাঙিয়া ফেলে।

১১। ঘুঙ্গিলো ঘুঙ্গি ঃ

যাহার তত্ত্বাবধানে শিশু থাকে সে চিৎ হইয়া শুইয়া হাটু ভাঙ্গিয়া পা দুটি সঙ্কুচিত করে। তারপর শিশুকে পায়ের পাতার উপর বসাইয়া, উপর ও নিচের দিকে দোলাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ছড়াটি বলে—

ঘুঙ্গিলো ঘুঙ্গি দাওখান দে
দাও খান কেন? পাত খান কাটতে
পাত খান কেন? বৌ ভাত খাইব
বৌ কই? জলেরে গেছে
জল কই? ডাউগে খাইছে
ডাউগ কই? আরা বনে গেছে
আরাবন কই? পুইরা গেছে
ছালি মাটি কই? ধোপ্পায় নিছে
ধোপ্পা কই? হাটে গেছে
হাটে কেন? সুইচ সূতা কিন্‌তে
সুইচ সূতা কেন্? ঝুলিকাথা শিলাইতে
ঝুলি কাথা কেন্? টাকা কড়ি থুইতে
টাকা কড়ি কেন্? দাসী নফর কিনতে
দাসী নফর কেন্? আমার নসুরে হাগাইতে মুতাইতে
তুইল্লা তুইল্লা নাচাইতে।
তুইল্লা তুইল্লা নাচাইতে।।

তারপর শিশুকে সম্বোধন করিয়া বলা হয়—

সোনার ডাইলে পরবা
না গুয়ের ডাইলে পরবা?

কখনও বা শিশুর উত্তর নিয়া কখনও বা শিশুর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, শিশুকে একবার বাঁ-ধারে, একবার ডান ধারে হেলাইয়া বলা হয়—

পর্ পর্ পর্ সোনার ডাইলে পর্।
পর্ পর্ পর্ গুয়ের ডাইলে পর্।।

তারপর এক 'ডাইলে' শিশুকে ফেলাইয়া দিয়া সরিয়া গিয়া বলা হয় 'ছুঁইস্ না ছুঁইস্ না'। শিশু তখন দ্বিগুণ উৎসাহে আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। সংখ্যা ৪। সন ১৩১৪

---

১. শিশুদের মনোরঞ্জনার্থ যে সব বসতি খেলা আছে। তাহাদের নাম, সে সব খেলায় ব্যবহৃত— বসতি খেলায় (১) খেলার উপকরণ হইতে, (২) প্রয়োজনীয় দান হইতে, (৩) ছড়াগুলির প্রথমাংশ হইতে হইয়াছে। যথা আগডোম বাগডোম, আপিলা চাপিলা ইত্যাদি।

বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন ও হিন্দুসমাজ



পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েকবৎসর হইল মুন্সিগঞ্জের কতিপয় ব্রাহ্মণ উকিল ও মোক্তারের উদ্যোগে 'বিক্রমপুর ব্রাহ্মণসভা' স্থাপিত হয়। বর্তমান লেখক তৎকালে মুন্সিগঞ্জে বাস করিতেন। যে কারণে ও যেভাবে ব্রাহ্মণসভার উৎপত্তি হয়, তাহার অনুসন্ধান অনাবশ্যক। কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা মানুষের দুর্বলতাকেও স্বীয় ইচ্ছার সাধনযন্ত্র করিয়া থাকেন। তাই বুঝি আজ এই ব্যবহারজীবসৃষ্ট ধর্মসভার প্রকৃতপক্ষেই সমাজমঙ্গল হেতুত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙালির সম্মুখে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে যে-সকল গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, বাঙালি তাহার সমাধান করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু অমানিশার অন্ধকারে বিভ্রান্ত পথিকের ন্যায় সন্ত্রস্ত ও সচকিত হইয়া পন্থা অন্বেষণ করিতেছে। আজ উচ্চ-নীচ, ভদ্রেতর, শিক্ষিত অশিক্ষিত সমুদয় বাঙালিরই এই অবস্থা। ঈদৃশ সময়ে যিনি অঙ্গুলিসঙ্কেতে গন্তব্য নির্দেশের আশাও প্রদর্শন করেন, তাহাকেই লোকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করে। এই কারণেই বিপন্ন, বিভ্রান্ত, সন্ত্রস্ত ব্রাহ্মণগণ অতি দ্রুত ব্রাহ্মণসভার প্রত্যাশিত সুনায়কত্বের অধীনে আপনাদিগকে স্থাপন করেন।

এইরূপে ব্রাহ্মণসভার পতাকাতলে যে সামাজিক শক্তি-সমবায় ঘটে তাহা উদ্যোক্তাগণের প্রবৃত্তি নিরপেক্ষ হইয়া বিগত ৫/৬ বৎসরকাল পরিচালিত হইতেছিল। আজিও হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয় নাই, আজিও হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণগণ কথঞ্চিৎ নেতৃত্ব করিতেছেন। তাই অপরাপর বর্ণের উন্নতি-চেষ্টা-প্রসূত সমিতিসমূহ অপেক্ষা ব্রাহ্মণসভার গুরুত্ব অধিক একথা অস্বীকার করা যায় না। এস্থলে একটি বৃহত্তর ব্যাপারের সহিত ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ সম্মিলনের তুলনা অমার্জনীয় না হইতে পারে। পলাশিক্ষেত্রে বঙ্গরাজ-লক্ষ্মী ইংরেজ রাজশক্তিকে বরমাল্য প্রদান করেন। তৎপর দিল্লিশ্বরের ইংরেজকে বস্তুত দেয় কিছুই ছিল না। তথাপি রাষ্ট্রনীতি বিশারদ সুচতুর ক্লাইভ দিল্লিশ্বর হইতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানির সনন্দ গ্রহণ করেন। হতশ্রী, শক্তিহীন, হৃতরাজ্য বাদশাহ শাহ আলমের সেই কলমের খোঁচার মূল্য নিতান্ত সামান্য ছিল না। সুবা বাংলার বার্ষিক রাজস্বের প্রায় দশমাংশের বিনিময়ে তাহা ক্রীত হইয়াছিল। সেইরূপ ব্রাহ্মণগণ পূর্বগৌরব ভ্রষ্ট হইলেও তাহাদের সমবেত ফুৎকার অদ্যাপি হিন্দুসমাজে উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। ব্রাহ্মণ সম্মিলনের আনুপূর্বিক অবস্থা দৃষ্টে তাহা আমরা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। চারিদিক হইতে যতই আমরা সংবাদ পাইতেছি, ততই বুঝিয়াছি সমগ্র বঙ্গদেশ উৎসুকচিত্তে 'বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের' নির্ধারণ সমূহের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

'বিক্রমপুর ব্রাহ্মণসভা' অত্যল্প কালমধ্যে বিক্রমপুরবাসীর গভীর মনোযোগের বিষয়ীভূত হয়। কোন কোন ব্রাহ্মণের বিদেশ-প্রত্যাগত যুবক সমাজে পুনর্গৃহীত হওয়ার জন্য ব্রাহ্মণসভার নিকট আবেদন করেন। অন্যান্য অনেক সামাজিক বিষয় ব্রাহ্মণসভায় মীমাংসার জন্য উপস্থিত হইতে থাকে। ব্রাহ্মণসভাও সহৃদয়তার সহিত এই সকল বিষয়ের মীমাংসার চেষ্টা করিতে ছিলেন। ক্রমে ব্রাহ্মণসভা দূরবর্তী স্থানসমূহেও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিল। বর্তমান বর্ষে প্রধানত কাশীপ্রবাসী কয়েকজন বিক্রমপুরবাসী ও স্বনামখ্যাত বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর জমিদারির ম্যানেজার সুপরিচিত বাবু মনোমোহন ভট্টাচার্যের আগ্রহাতিশয্যে ও

উদ্যোগে বিগত ২ ও ৩ কার্তিক তারিখে মুন্সিগঞ্জে 'বিক্রমপুর ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের' অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

'মহাসম্মিলন' বস্তুতই মহাসম্মিলন হইয়াছিল। রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়, বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী, পণ্ডিত হৃষিকেশ শাস্ত্রী, পঞ্চানন তর্করত্ন ও সত্যচরণ শাস্ত্রী, বাবু শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, মৈমনসিংহের উকিলবাবু হরিহর চক্রবর্তী, ধামগড়ের বাবু সতীশচন্দ্র রায়, বিক্রমপুরের পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী ও বাবু মনোমোহন ভট্টাচার্য ও তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শাস্ত্রপারদর্শী বাবু আনন্দমোহন ভট্টাচার্য, কাশী ব্রাহ্মণ সভা সংস্পৃষ্ট বাবু দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় ও মনোমোহনবাবুর অনুবর্তী কাশীর কন্ট্রাক্টর বাবু কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায় এবং নবদ্বীপ মৈমনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালি প্রভৃতি জেলার পণ্ডিতগণ মধ্যে প্রতিনিধিস্বরূপ কয়েকজন এবং বিক্রমপুরের অনেক পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। সাকুল্যে প্রায় ২৫০০ (আড়াই হাজার) ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনে সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের তুলনায় পণ্ডিতসংখ্যা অত্যন্ত অল্প হইয়াছিল।

সভাস্থলে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের অনুপস্থিত বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত ও রাজা মহারাজা প্রভৃতি এবং অপরাপর লোকের সহানুভূতিজ্ঞাপক তদপেক্ষা অনেক অল্প সংখ্যক পত্র ও টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়া থাকে। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় সমুদয় বঙ্গবাসী মহাসম্মিলনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন।

অনেক বক্তা তাহাদের পূর্বপুরুষের চরণধূলিপূত বিক্রমপুর সম্বন্ধে যে সকল মর্মস্পর্শী কথা বলিয়াছেন, তাহাতে বিক্রমপুরবাসীগণ গৌরববোধ না করিয়া পারেন নাই। অনেকে বলিয়াছেন বিক্রমপুর সেনরাজগণের রাজধানী, কৌলিন্যের উৎপত্তিস্থল এবং আধুনিক ব্রাহ্মণগণের এক অতিপ্রধান কেন্দ্র, অতএব বিক্রমপুরই ব্রাহ্মণসভার উপযুক্ত জন্মস্থান, বিদেশাগত বক্তাগণের বিক্রমপুর সম্বন্ধে ঈদৃশভাব ও উক্তি বিক্রমপুরবাসীর হৃদগত কৃতজ্ঞতার উদ্রেক করিতেছে।

বিদেশাগত ভদ্রলোকদিগের উপযুক্ত আদর অভ্যর্থনা ও সৎকার করিতে অসমর্থতা হেতু বিক্রমপুরবাসী আমরা তাহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইতেছি। আশা করি তাহারা নিজগুণে আমাদের ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

বঙ্গের নানা স্থানবাসী বহু ব্রাহ্মণ বঙ্গ সমাজের মঙ্গলোদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া মহাসম্মিলনে পরস্পরকে সৌহার্দজ্ঞাপক করিলেন, একই হিতচিকীর্ষা সকলের হৃদয় আন্দোলিত করিল এবং সভান্তে সকলে সেই শুভসম্মিলনের স্মৃতি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশ উৎসুকচিত্তে সম্মিলনের বর্তমান অধিবেশনের গুরুত্ব এই অধিবেশনের এতদ্দিরিক্ত আর কোনও প্রশংসা করা যায় না।

সম্মিলনে যে সকল লোক উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে পণ্ডিত হৃষিকেশ শাস্ত্রী বা পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নই সভাপতিত্বের যোগ্যতর ব্যক্তি সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনের ব্রাহ্মণ নায়কগণের নয়ন ও মন ব্রাহ্মণত্ব অপেক্ষা ধনবত্তা দ্বারাই অধিকতর প্রভাবিত হইয়াছিল। অন্যথা শাস্ত্রী ও তর্করত্ন মহাশয়কে উল্লঙ্ঘন করিয়া রাজোপাধিক শশিশেখরেশ্বর রায় মহোদয়কে তাহারা কদাপি সভাপতি মনোনীত করিতেন না। রাজা বাহাদুর আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। আমরা ব্যক্তিগতভাবে তাহাকে কিছুই বলিতেছি না। তাহার শিষ্টাচার ও অমায়িক ও নিরহঙ্কার ব্যবহারে আমরা পরম আপ্যায়িত হইয়াছি। সম্মিলনে তাহার উপস্থিতি বিক্রমপুরের সৌভাগ্যের বিষয়। অধিকন্তু যদিও তিনি শেষকালে মনোমোহনবাবু ও তাহার অনুবর্তীগণ দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে তাহার ন্যায় রাজনীতি কুশল বিচক্ষণ ব্যক্তি সভাপতির আসনে উপবিষ্ট না থাকিলে বর্তমান একদেশদর্শী সম্মিলনের কার্যপরিচালন সুকঠিন হইত। কিন্তু সমাজের মঙ্গলোদ্দেশ্যে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, যে সভায় সুযোগ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর

উপস্থিতি সত্ত্বেও ধনপতির সভাপতিত্ব অপরিহার্য হয়, সে সভাকে ব্রাহ্মণসভা আখ্যানপ্রদান শব্দার্থের ব্যভিচার মাত্র। রাজা বাহাদুরের নিজ ভাষায় বলিতে গেলে ধনীগণ ক্ষাত্রশক্তির অঙ্গীভূত দিল্লি দরবারের ন্যায় 'ঘোষণা' সভার অথবা বণিকগণের 'ঝনঝনা' সভাব উপযুক্ত সভাপতি হইতেও পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণগণের 'মন্ত্রণা সভায়' ধনীর সভাপতিত্ব নিতান্তই অশোভন, অনুপযোগী, ও স্বস্থানাতিক্রমী, ব্রাহ্মণসভার উদ্যোক্তাগণ প্রাচীন ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রয়াসী। সুতরাং তাহাদের আহূত সভায় ধনীর সভাপতিত্ব বিশেষত নিন্দনীয়।

সম্মিলনের উদ্যোক্তাগণের যুগোচিত ব্রাহ্মণপ্রীতি বণিকগণেরও লোভনীয়। যে ব্রাহ্মণকুলতিলক সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠের গুরুভার স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়া সম্মিলনকে ধন্য করিয়াছেন, তিনি সভাস্থলে ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায়ের পত্রের প্রতি যে গুরুত্ব আরোপ করেন অনেক ব্রাহ্মণরাজার পত্রের প্রতিও তাদৃশ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। সভাস্থ সকলেই তাহা লক্ষ্য করেন এবং একটুকু কানাকানিও হয়। ব্রাহ্মণপ্রবর নাকি স্মিতমুখে জনান্তিকে বলিয়াছিলেন, 'রাজা শ্রীনাথকে আমাদের পক্ষে কমিট (commit) করাইয়া লইলাম।'

সভাপতি মহাশয় প্রথমেই বলিলেন সভাতে কোন প্রস্তাব সম্বন্ধেই ভোট লওয়া হইবে না। নৈমিষারণ্যে ঋষিদিগের মন্ত্রণা-সভায় কোন্ মত গৃহীত বা অনুসৃত হইবে তাহা নির্বাচিত মধ্যস্থ নির্দেশ করিতেন। কলির ব্রাহ্মণসভায়ও সেই প্রাচীন রীতির অনুকরণে ইংরেজি ভোটপ্রথা* 'একঘরে হইল। 'একঘরে' কিন্তু নিতান্ত গৃহশূন্য নহে ; কারণ ভোটের জন্য মহাসম্মিলনও একটুকু স্থান রাখিয়াছিলেন সভাপতি ও তথাকথিত মধ্যস্থ পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ভোট দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

বাবু অম্বিকাচরণ উকিল ও অন্যান্য সভ্যগণ সভাপতির এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও প্রস্তাবটি গৃহীত না হইলে সভাপতি মহাশয় সভাপতিত্ব স্বীকারে অনিচ্ছুক দেখিয়া প্রতিবাদকারীগণ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হন।

শুনিয়াছি সভাধিবেশনের পূর্বে কয়েকটি বি এ, এম এ উপাধিধারী 'বালক' নাকি তাহাদের প্রতিবাদ দ্বারা মনোমোহনবাবুর অনুচরগণের বড়ই বিরক্তি ভাজন হইয়াছিলেন। অনন্যোপায় হইয়া তাহারা নিম্নলিখিত তিনটি অপূর্বনীতি অনুসরণের প্রস্তাব করেন—

১) সম্মিলনের উদ্যোক্তাগণ ইতিপূর্বে যে সকল প্রস্তাব মুসাবিদা করিয়াছেন, সেই সেই প্রস্তাব বিনা আলোচনায় সম্মিলনের গ্রহণ করিতে হইবে ; কারণ সম্মিলন তো আলোচনা স্থান নহে।

২) 'বালকদের' কথা শুনা যাইবে না।

৩) সভায় ভোট লওয়া হইবে না সভাপতির ঘোষণা দ্বারা প্রস্তাবগুলি গৃহীত বা অগ্রাহ্য হইবে।

যদিও তৎকালে এই-সকল নীতি উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মনঃপূত হয় নাই, তথাপি পরিণামে এই সকল নীতি অনুসারেই সভার কার্য নির্বাহিত হইয়াছিল। মনোমোহনবাবুর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ২/১ জন মাত্র অতি কষ্টে সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটির সামান্য প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ; সময়াভাবের ওজুহাতে আর সকলেরই কণ্ঠরোধ করা হইয়াছিল। কিন্তু মনোমোহনবাবুর অনুকূল বক্তাদের বক্তৃতাকালে কোনও সময়াভাব হয় নাই।

ভোটপ্রথা ইংরেজী বা য়ুরোপীয় প্রথা নহে ; ভারতবর্ষে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও ভোটপ্রথা প্রচলিত ছিল। Modern Review পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল প্রমাণ করিয়াছেন (An Introduction to Hindu Polity) যে প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্র শাসন বিশেষ প্রচলিত ছিল, এবং ভোটের নাম ছিল 'য বহুতবা' বা 'যে-ভূয়সিকস্' ballet voting কে বলিত 'শলাকাগ্রহণ'। 'পঞ্চতন্ত্রনার' মধ্যে 'গণরায়নি' শাসনপ্রথা এদেশে য়ুরোপের আমদানি নহে।

যাহারা ঈদৃশ ভাব হৃদয়ে পোষণ করেন, তাহাদের পক্ষে সভা আহ্বান না করাই সঙ্গত। নির্জনে ও নীরবে স্ব স্ব কর্তব্য সাধনই তাহাদের একমাত্র অবলম্ব্য পন্থা। কিন্তু গরজ বড় বালাই। ঢাকে ঢোলে সভা না করিলে জিদও বজায় থাকে না, নেতৃত্বাভিমানেরও আহুতি হয় না।

যবনিকার অন্তরালে আরও অনেক অভিনয় হইয়াছে। তাহা লোকলোচনের গোচরীভূত হওয়া আবশ্যক। অন্যথা কালক্রমে ব্রাহ্মণসভা বিদ্বেষ সভা মাত্রে পরিণত হইতে পারে।

মনোমোহনবাবুর কোন সুযোগ্য অনুবর্তী আমাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন আপনারা সভায় আসিয়া প্রতিবাদ ও গোলযোগ করিবেন; সেইজন্য আমরা ইচ্ছাপূর্বকই আপনাদিগকে ও আপনাদের মতাবলম্বী পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করি নাই। আপনারা অনাহূত আসিয়াছেন। অভ্যর্থনা সভা (অর্থাৎ তিনি ও তৎপৃষ্ঠীগণ) ইচ্ছা করিলে আপনাদিগকে বলিতে না দিতে পাবেন। ইহা হইতেই পাঠকগণ সভাতে পণ্ডিত-সংখ্যার আপেক্ষিক অল্পতার কারণ বুঝিবেন। বস্তুত উদ্যোক্তাগণ জ্ঞাতসারে কোনও রক্ষণশীলতা বিরোধী ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। তথাপি উপস্থিত সভ্যগণের অনেকাংশ উদার মতাবলম্বী ছিলেন।

উদ্যোক্তাগণ নির্ধার্য প্রস্তাবসমূহের যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন তন্মধ্যে তিনটি সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি ছিল। সংক্ষেপতঃ সেই প্রস্তাব তিনটির মর্ম এই—

১) আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণদিগকে শাস্ত্রপাঠ করিতে দেওয়া হইবে না।

২) কায়স্থগণকে উপবীত ধারণ করিতে বা অপরাপর নিম্নবর্ণসমূহকে উচ্চবর্ণের অনুকরণ করিতে দেওয়া হইবে না।

৩) বিলাত-ফেরতদিগকে সমাজে পুর্নগ্রহণ করা হইবে না।

উদ্যোক্তাগণ প্রাচীন হিন্দু আচার পুনঃ প্রতিষ্ঠার নিতান্ত পক্ষপাতী। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু আচার কি, তাহা কি তাহারা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? মনোমোহনবাবু কি তাহার চাকুরি ও চাকুরিস্থলধাম পরিত্যাগ করিয়া নৈমিষারণ্যে গমণপূর্বক অজিনাবনে শয়নোপবেশন ও প্রভুগৃহের চর্বচোষ্য ও লেহ্যপেয়ের পরিবর্তে স্বচ্ছন্দ বনজাত দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবেন? ব্রাহ্মণ-ডাক্তারগণ কি তাহাদের জীবনোপায় পরিত্যাগপূর্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যজনযাজন আরম্ভ করিবেন? অপর হিন্দুসাধারণ কি ডাক্তারদের অন্ন ত্যাগ করিবেন? চিকিৎসক সম্বন্ধে মহামুনি পরাশরের ব্যবস্থা উদ্যোক্তাগণ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? শামলা-শোভিত চাপকানাবৃত-দেহ উদ্যোক্তাদিগের কুটবুদ্ধি পরিচালনবৃত্তি বারত্রয় সন্ধ্যামন্ত্র পাঠ দ্বারাই ব্রাহ্মণোচিত আচারে পরিণত হইবে কি? তাহারা কি মুসলমানী শামলা ও চাপকান এবং ইংরেজি জুতা, সাবান, বরফ সোডা, লেমনেড, চা, বিস্কুট, ঔষধ, কলের জল ইত্যাদি পরিত্যাগ করিবেন? যে-সকল পুত্র মেধাহীন তাহাদিগকে চতুষ্পাঠীতে প্রেরণপূর্বক ব্রাহ্মণপিতা সভাস্থলে স্বীয় বৈদিক ধর্মপ্রীতি ঘোষণা করিয়া আসর জাঁকাইতে পারেন, কিন্তু যে পুত্র ইংরেজি স্কুলে প্রতি বৎসর পাশ করিয়া প্রমোশন পায়, বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পায়, তাহাকে স্কুল বা কলেজ ছাড়াইয়া কোন পিতা চতুষ্পাঠীতে পাঠাইবেন কি? যে স্কুল বা কলেজে ইংরেজ মুসলমান বা শূদ্র শিক্ষক বা অধ্যাপক আছেন তথায় তাহারা স্ব স্ব পুত্রগণকে প্রেরণে বিরত হইবেন কি? অথবা ব্রাহ্মণ সন্তান ও অন্ত্যজবর্ণের ছাত্রদের আসনের পার্থক্য সাধন করা যাইবে কি? ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-নিরপেক্ষ ইংরেজের দণ্ডাবিধির পরিবর্তে মনুর ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত করিতে পারিবেন? বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ কি কুসীদ-লালসা পরিত্যাগ করিতে পারিবেন? আর যদিই সে অঘটন সংঘটিত হয় তবে হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক, হিন্দুস্থান ইনসিওর্যান্স কোম্পানি প্রভৃতির কি দশা হইবে?

জগত্তারা, জগদম্বা, ভগবতী, ক্ষেমকারী প্রভৃতি আমাদের মাতা মাতামহীগণ প্রসবান্তে অগ্নি থেকেই স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু আধুনিক ধর্মধ্বজী ব্রাহ্মণবাবুগণের ননীবালা, পারুলবালা, সুকুমারী, স্নেহলতা প্রভৃতি গৃহিণীগণের প্রসবান্তে ব্রাণ্ডী সেবন কি সেই বাবুগণই প্রবর্তন করেন নাই? যদি ইংলণ্ডে কুক্কুটমাংস ভোজনের প্রায়শ্চিত্ত অসম্ভব হয় তবে

পঞ্চমহাপাতকের অন্যতম এই সুরাপানের কি ব্যবস্থা হইবে। আর যাহাদের ইংলন্ডযাত্রার শক্তির অভাব, তাহাদের গঙ্গাজলপক্ক কুক্কুটমাংস সেবনের প্রায়শ্চিত্ত রঘুনন্দন ব্যবস্থা করিয়া থাকিলে টেমস নদীর জলের প্রায়শ্চিত্তাতীত মহাপাতকত্ব, কোন স্মৃতিতে বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহাও আমরা জানিতে চাই।

গৃহে অতিথি-সমাগম হইলে স্ববৃত্তিপর ব্রাহ্মণবাবু স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়া অতিথির আহারান্তে অন্নগ্রহণপূর্বক এগারটার পর অফিসে যাইতে পারিবেন কি? রজনীযোগে সকলের আহারান্তে বামনঠাকুর স্বাভিপ্রেত স্থান প্রস্থান করার পর ব্রাহ্মণবাবুর অট্টালিকা অতিথিপদ-ধূলিপূত হইলে গৃহিণীবাবু দুগ্ধ ফেননিভ শয্যা পরিত্যাগপূর্বক মৃদাঙ্গারাধূমে স্বীয় হরিণনয়ন অরুণ করিয়া হাস্যোদ্ভাসিত মুখে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া অতিথি-সৎকার করিবেন কি? আর ননীবালাকে তাদৃশ অশনিসম্পাত সমকঠোর আদেশ প্রদান করিতে ব্রাহ্মণবাবুর সাহসে কুলাইবে কি? ননীবালার সেই ঘোর বিপৎকালে অনাচরণীয় অন্ত্যজের হস্তপক্ক মিষ্টান্নই কি বাবুর একমাত্র ভাবনাস্থল হইবে না।

আর অধিক লিখা নিষ্প্রয়োজন। যদি আচারহীন ব্রাহ্মণের শাস্ত্রপাঠ নিবারণ করিতে হয়, তবে সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে শাস্ত্রপাঠ উঠিয়া যাইবে। কিন্তু যদিও তাহা বাঞ্ছনীয় হয়, তবু তাহা সাধন করিবার শক্তি ব্রাহ্মণসম্মিলনের আছে কি? সম্মিলন কি ভারতবর্ষ হইতে মুদ্রাযন্ত্র বিতাড়িত করিতে পারিবেন? অথবা ইয়ুরোপ ও ভারতবর্ষের পোস্টাল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন? আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ কেন কোন হিন্দু বা অহিন্দুর শাস্ত্রপাঠ ব্রাহ্মণসম্মিলনের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে? যাহা অসম্ভব তাহা প্রস্তাব করিয়া হাস্যাস্পদ হওয়া মাত্র লাভ।

তারপর কায়স্থগণের উপনয়নের বিষয়। কায়স্থগণের উপবীত ধারণের চেষ্টা আমরা নিতান্তই দূষণীয় মনে করি। কায়স্থগণ আমাদিগকে মার্জনা করিবেন। তাহারা ব্রাহ্মণের ত্রিদণ্ডীস্থলে ত্রিগুণিত ত্রিদণ্ডী গ্রহণ করিলেও আমরা আপত্তি করিব না বা তাহাতে বিঘ্ন জন্মাইবার আশঙ্কা করিব না, কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় তাহারা দূষিত অপকর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ত্রিশ-দিনের স্থলে দশদিন অশৌচপালনজনিত নহে, অথবা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাহ্য পার্থক্য লোপাশঙ্কা জনিত কল্পনা মাত্রও নহে। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে কোনও অসমতা নাই। শিক্ষা-দীক্ষা, আচার ব্যবহার, জীবনোপায় ও জীবনযাত্রা প্রণালী বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্পূর্ণরূপে সমাবস্থ। সুতরাং বাস্তবিক বৈষম্যের অভাবহেতু বাহ্য বৈষম্য লোপ কোনও সহৃদয় ব্যক্তিকে ব্যথিত বা ভীত করিতে পারে না। কিন্তু কায়স্থগণের উপনয়ন-প্রবৃত্তি অদ্ভুত রক্ষণশীলতা প্রসূত, এই সম্মুখোন্মুখী উন্নতির যুগে পশ্চাদুন্মুখী স্থিতিশীলতা অবনতির ছায়া।

কায়স্থগণ এ বিষয়ে ভেদবুদ্ধি দ্বারাও পরিচালিত হইতেছেন। উচ্চশ্রেণীর কায়স্থগণ উপনীত হইতেছেন কিন্তু যাহাদিগকে অন্যে শূদ্র বলে এবং যাহারা নিজেরা কায়স্থ নামে পরিচিত হইতে চাহে সেই দে, দত্ত প্রভৃতি বংশোপাধিক কায়িক শ্রমজীবী ব্যক্তিগণের উপনয়নলিপ্সার প্রতি কায়স্থগণ নিরতিশয় বিদ্বেষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। সে বিদ্বেষ অনুদার ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কায়স্থেরা বিন্দুমাত্র ন্যূন নহে।

কায়স্থগণ তাহাদের উপনয়নাধিকারের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণের জন্যও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। ইহা বালকোচিত আত্মপ্রতারণামাত্র। কায়স্থের উপনয়ন শাস্ত্রসঙ্গত কিনা তদ্বিষয়ে পক্ষে বা বিপক্ষে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। বঙ্গসমাজ অনভিমত স্থলে কদাপি শাস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। কায়স্থগণ ইহা নিশ্চয় জানিবেন, তাহাদের উপনয়নাধিকার শাস্ত্রপ্রসূত নহে, পরন্তু তাহাদের আত্মশক্তিজনিত। 'শূদ্র'গণ এখনও তাদৃশ শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে নাই, তাই তাহাদের উপনয়নাধিকার নাই। যেদিন তাহারা আবশ্যকীয় শক্তিলাভ করিবে সেদিন তাহাদের উপনয়নও শাস্ত্রসঙ্গত হইবে।

যে বর্ণে প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য, সীতারাম, সূর্যকান্ত, কেদাররায়, রামচন্দ্র রায় এবং লালাবাবু, রাণী কাত্যায়নী, রাধাকান্ত দেব, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন দত্ত, তরু দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, জগদীশচন্দ্র বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বারকানাথ মিত্র, রমেশচন্দ্র মিত্র, রাসবিহারী ঘোষ, সত্যপ্রসন্ন সিংহ, আনন্দমোহন বসু, মনোমোহন ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, নীলরতন সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিবেকানন্দ স্বামী, কালীপ্রসন্ন সিংহ, এবং অগণিত অন্য বহু কীর্তিমান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে বর্ণ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই উপবীত গ্রহণ করিতে পারেন, সেজন্য কীটদষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোক আওড়াইবার কোনও প্রয়োজন বা সার্থকতা নাই। শক্তিমান চিরকালই সম্মানার্হ। যখন ভারতবর্ষে হিন্দু সূর্য মধ্যাহ্নকিরণ বর্ষণ করিতেছিল তখনও এই বর্ণভেদ বিচ্ছিন্ন হিন্দুসমাজ বক্ষে অবস্থান করিয়া অন্ধ্রবংশীয়গণ রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। কায়স্থগণের উপবীত ধারণের বৈধতা প্রতিপাদনের শক্তি সংস্কৃত শ্লোকের নাই, কিন্তু তাহাদের আত্মশক্তির আছে।

যাহা হউক জাতীয়তার হিসাবে দূষণীয় হইলেও কায়স্থগণ যখন উপবীত ধারণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন তখন তাহাতে বিঘ্ন জন্মাইবার অধিকার কাহারও নাই ; জিদ বজায় ও স্বার্থপরতা ব্যতীত বিঘ্ন জন্মাইবার কোন কারণও দেখি না। ব্রাহ্মণগণ পরিপন্থী হইলে শুধু নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত অপদস্থ ও হাস্যাস্পদ হইবেন মাত্র।

কায়স্থরা ব্রাহ্মণের নিকট কোন বিষয়েই নির্ভরশীল নহেন ; আমরা তাহাদের বাড়ি না গেলে তাহারা ব্রাহ্মণ ব্যতীতই চলিতে পারিবেন ও চলিতে অভ্যস্থ হইবে। কিন্তু কায়স্থ ও অপরাপর জাতির সাহায্য ব্যতীত কয়জন ব্রাহ্মণের জীবনাতিপাত হইতে পারে? মনোমোহনবাবুর ন্যায় কয়েকজন ভাগ্যবান চাকুরীজীবী ও কয়েকজন উকিল, মোক্তার ইত্যাদি দ্বারাই কি ব্রাহ্মণসমাজ গঠিত? অন্যান্য অঞ্চলের কথা দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণ প্রধান বিক্রমপুরেও পণ্ডিতগণ এবং কায়স্থযাজী বহু ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেতর জাতি সমূহের সাহায্য ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। তাহারা কি কায়স্থগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, না করিতে পারিবেন। কায়স্থগণের উপনয়ন কি ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যাধীনেই যাইতেছে না? বস্তুত কায়স্থের উপনয়ন নিবারণ ব্রাহ্মণ সমাজের শক্তির অতীত।

হিন্দু সমাজে এ পর্যন্ত যত বৃহৎ ব্যাপার হইয়াছে প্রায় সমস্তই ব্রাহ্মণের কর্তৃত্বাধীনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য, রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণি, দেবীবর, রাজা রামমোহন রায়, প্রভৃতি সকলেই ব্রাহ্মণ, আমেরিকার আর্যগণ তত্রত্য অনার্যদিগকে যে ভাবে স্বসমাজবহির্ভূত ও নির্মূল করিয়াছেন, তৎপরিবর্তে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ অত্রত্য অনার্যদিগকে হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত ও রক্ষা করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে সভ্যসমাজভুক্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহাই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব, আজিও ব্রাহ্মণগণ অর্ধসভ্য অনার্যদিগকে আর্য ঋষিদের বংশধর কল্পনায় নূতন শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে সুসভ্য হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিতেছেন, তাহা চক্ষুষ্মান ইংরেজগণও স্বীকার করেন। ব্রাহ্মণগণ অন্ত্যজবর্ণসমূহকে নির্যাতন করিতেন বলিয়া যিনি যাহাই বলুন, চিন্তাশীল, সুক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ দেখিতে পান তাহাদের উন্নতি বিধানই ব্রাহ্মণ শাসনের একমাত্র ফল। আজ কি ব্রাহ্মণগণ আপনাদের সেই গৌরবান্বিত অধিকার ও কর্তব্য বিস্মৃত হইবেন? তাহারা কি উপনয়ন প্রয়াসী কায়স্থগণের নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া আপনাদের সম্মান ও সমাজ-নেতৃত্ব বজায় রাখিতে পারেন না? কায়স্থের উপনয়ন কি ব্রাহ্মণের গৌরব ও ব্রাহ্মণ বিহিত সমাজ পদ্ধতির সার্থকতা নহে? মধ্য ভারতে গোঁড়গণ কি ব্রাহ্মণের কর্তৃত্বাধীনেই উপবীতধারী রাজপুতে পরিণত হয় নাই? অনার্য গোঁড়কে উপবীত প্রদান করার পর আর্যবংশসম্ভূত কায়স্থের উপনয়নে ব্রাহ্মণের আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে?

যাহা হউক মহাসম্মিলনের উদ্যোক্তাগণ প্রতিপক্ষের দৃঢ় প্রতিবাদের আশঙ্কায় শাস্ত্রপাঠ-

নিবারণ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি সাহস করিয়া সম্মিলনে উপস্থিত করেন নাই। কায়স্থের উপনয়ন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি এই পরিবর্তিত আকারে সম্মিলনের সম্মুখে উপস্থিত হয়—

'ব্রাহ্মণেতর জাতির কর্তব্য নির্ধারণের জন্য সেই সেই জাতির বিশিষ্ট সামাজিক ব্যক্তিগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শপূর্বক ধর্মরক্ষার সুব্যবস্থা করা।'

ইহাতে কাহারও কোন আপত্তির কারণ নাই। বরং ব্রাহ্মণগণ অপরাপর বর্ণের মঙ্গলানুধ্যানে ব্রতী হইতেছেন দেখিয়া সকলে সুখী হইবেন। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ রোমান ব্রাহ্মণ কেটোর কার্থেজ সম্বন্ধীয় বক্তৃতার ন্যায় সম্মিলনের প্রস্তাবক মহাশয় উল্লিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া তদুপলক্ষেই কায়স্থের উপনয়ন ও তদ্বৎ অন্যান্য বিষয়ে তীব্র আলোচনা আরম্ভ করিলেন। অমনি চারিদিক হইতে তীব্র প্রতিবাদধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। সভাপতি মহাশয় তখন বলিতে বাধ্য হইলেন 'এ সকল আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক'। মনোমোহনবাবুর অনুচরগণ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না। একজন বলিয়া উঠিলেন 'তবে এত টাকা ব্যয় করিয়া সভা করিলাম কেন?' অপর একজন বলিলেন 'যদি আপনারা কথা না বুঝিয়া বিষয় নির্বাচন কমিটিতে এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া থাকেন তবে আমি তার কি করিব?'

রক্ষণশীল উদ্যোক্তাগণের তৃতীয় আপত্তিজনক প্রস্তাব বিলাত ফেরতদিগকে সমাজে পুনর্গ্রহণ না করা সম্বন্ধে। বাবু অম্বিকাচরণ উকিল প্রস্তাবটির প্রতিবাদ করিয়া বলেন 'এই বিষয় এই সভায় মীমাংসা হইতে পারে না ; এ বিষয়ে আলোচনা ও নিষ্পত্তির জন্য এক স্বতন্ত্র কমিটি গঠিত হওয়া সঙ্গত।' তাহাতে উদ্যোক্তাগণ আপত্তি করিতে লাগিলেন। ঐ সভাতেই ভোট গ্রহণ নিষেধের সুযোগে আপনাদের মনোমত প্রস্তাব পাশ করাইয়া লওয়াই তাহাদের আন্তরিক চেষ্টা হইল। তখন বাবু শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'চারি বৎসর পূর্বে ব্রাহ্মণ-সভার কোলার অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইয়াছিল বিলাতফেরতদিগকে সমাজে লওয়া হইবে। তদনুসারে আমি বিলাতফেরতদিগের সঙ্গে আহার করিয়াছি, এবং কোন কোন বিলাতফেরত ব্যক্তির কন্যা হিন্দু সমাজে বিবাহিত হইয়াছে। যদি আজ বিলাতফেরত বর্জন বিহিত হয়, তবে আমার ও যাহারা বিলারফেরতদের কন্যা বিবাহ করিয়াছেন তাহাদের কি ব্যবস্থা হইবে?' বিপদ গণিয়া মনোমোহনবাবু বলিলেন, 'হাঁ, কোলা সভায় বিলাতফেরতদিগকে গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইছাপুরা সভায় তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।' অন্য কোন কোন ব্যক্তিও কম্পিতকণ্ঠে ক্ষীণস্বরে শ্রীশবাবুর স্পষ্ট বাক্যের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোলাসভার নির্ধারণ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু সম্মিলনস্থলে শ্রীশবাবুর সহিত আহার করিতেও কেহ কোন দ্বিধাবোধ করেন নাই।

যখন বিষয় নির্বাচন কমিটিতে সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি আলোচিত হয়, তখন একজন ব্রাহ্মণ করজোড়ে সভাপতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, 'মহারাজ! একটি দুঃখের কথা বলিতে চাই। শিষ্য বাড়ি আহার করিতে গিয়াছিলাম। ঐ শিষ্য জাপান প্রবাসীর বাড়ি আহার করিয়াছে বলিয়া এই পণ্ডিত মহাশয়দের অনেকে আমাকে আটক দিলেন ; সমস্ত দিন অভুক্ত থাকিয়া সন্ধ্যাকালে বিবন্দি হইতে (শিষ্যের বসতি গ্রাম) ফিরিয়া আসিলাম। আরো দুই দিন এরূপ হইয়াছে। তৎপর বালাসুর গ্রামে এক বাড়ি নিমন্ত্রিত হইয়া যাইয়া দেখিলাম এই পণ্ডিত মহাশয়গণ (এস্থলে বক্তা উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীকে পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইতে লাগিলেন) আমার সেই শিষ্যদের সহিত আহার করিতে বসিয়াছেন। পোড়া কপাল! আমিও বসিয়া গেলাম। মহারাজ! তিন দিন অভুক্ত রহিলাম। আমার শিষ্যও আমাকে ছাড়িয়া গেল ; শেষে এই পণ্ডিত মহাশয়দের সঙ্গে পরের বাড়িতে সেই শিষ্য লইয়া পংক্তিভোজন করিলাম। এই দুঃখের কথা কাহাকে বলি?'

যাহা হউক বিপক্ষের স্থির প্রতিজ্ঞা দেখিয়া উদ্যোক্তাগণ একটু নরম হইলেন। শেষে প্রস্তাবটি যে আকারে গৃহীত হয় তাহার মর্ম এই যে উভয়মতাবলম্বী পণ্ডিতদিগের একটি কমিটি গঠিত

হইবে। তাহারা যে মীমাংসা করেন তাহাই গৃহীত হইবে ; কিন্তু তাহাদের নিষ্পত্তি প্রকাশের পূর্বে বিক্রমপুরবাসীগণ বিলাতফেরতদিগকে সমাজে গ্রহণ করিবেন না।

সভাপতি মহাশয় শ্রীশবাবুকে নিজমতের পোষকতায় বক্তৃতা করিতে দেন নাই ; শ্রীশবাবুর মতাবলম্বী অন্য কাহাকেও মুখ খুলিতেও দেন নাই। সভাপতি মহাশয় বলেন শ্রীশবাবু একাকী প্রতিবাদী আছেন, একথা লিপিবদ্ধ হইবে। অমনি চারিদিক হইতে 'আমরা প্রতিবাদী', 'আমরা প্রতিবাদী' এই ধ্বনি উঠিতে লাগিল। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যাহারা প্রতিবাদী আছেন তাঁহাদের সকলেরই নাম প্রতিবাদকারীর তালিকায় লিখিত আছে।

রাজা বাহাদুর শ্যামসুন্দরবাবু প্রভৃতি কাহাকেও বিলাত যাওয়ার বিরোধী দেখিলাম না ; এমন কি পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন এবং মনোমোহনবাবু প্রভৃতিও স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন বিলাত গিয়া শিক্ষালাভ কর, তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু দেশে আসিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত একত্রবাসরূপ সুখটুকু পরিত্যাগ কর ; সমাজের বাহিরে বাস কর। অর্থাৎ "ধরি মাছ, না ছুই পানি।" তর্করত্ন মহাশয় তাহার বক্তৃতায় বলেন 'আমাদের যুবকদের মধ্যে কি এমন স্বার্থত্যাগী নাই যে দেশের জন্য বিদেশে গিয়া শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া এই সুখটুকু পরিত্যাগ করিয়া পৃথকভাবে বাস করিয়া স্বদেশের সেবা করিতে পারে? হিন্দুজাতি ধর্মগত প্রাণ, একথা বাল্যকাল হইতে শুনিতে শুনিতে কর্ণ বধিরপ্রায় হইয়াছে। যদি বিলাত যাওয়ায় পাপস্পর্শ হয় তবে মনোমোহনবাবু প্রভৃতি বিলাত যাইতে ব্যবস্থা দেন কি প্রকারে? আর যদি বিলাত যাওয়ায় পাপস্পর্শ না হয়, তবে বিলাত প্রত্যাগতগণ কেন সমাজে গৃহীত হইবেন না? বিলাত যাওয়ায় দোষ নাই কিন্তু বিলাত-প্রত্যাগতের সমাজে গৃহীত হওয়া দোয, মনোমোহনবাবু প্রভৃতির এই ব্যবস্থার রহস্যোদ্ভেদ কে করিবে? ইহা ডিপ্লোম্যাসি হইতে পারে, কিন্তু ইহা ধর্ম নহে, ব্রাহ্মণোচিতও নহে।

বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। কিন্তু তাহা সম্ভব কি? বিক্রমপুরে বিলাত-প্রত্যাগতগণ প্রতিদিন অধিক হইতে অধিকতর 'চল' হইতেছেন এই প্রত্যক্ষ সত্যটাও কি মুদিতনয়ন সম্মিলনের উদ্যোক্তাগণ দেখিবেন না? মূকবধির বিদ্যালয়ের যামিনীবাবুর গৃহে হাসাড়া কেওটশালা প্রভৃতি গ্রামের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ প্রকাশ্যভাবে পংক্তিভোজন করিয়াছেন এবং যামিনীবাবুর কন্যাগণ হিন্দুসমাজে বিবাহিত হইয়াছেন। সোনারঙের বৈদ্যগণ মুন্সিগঞ্জের উকিলবাবু রত্নেশ্বর সেনের বিলাত-প্রত্যাগত পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে চল করিয়াছেন। মুন্সীগঞ্জের অন্যতম উকিলবাবু উমেশচন্দ্র দাসের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র দাস আমেরিকা হইতে আসিয়া দীর্ঘকাল মুন্সিগঞ্জে উমেশবাবুর গৃহে মুন্সিগঞ্জের অব্রাহ্মণ সকলে রত্নেশ্বরবাবুকে লইয়া আহার করিয়াছেন। সম্প্রতি মালখানগরের সুপ্রসিদ্ধ বাবুগণ প্রকাশ্যভাবে বিলাত প্রত্যাগতের সহিত আহার করিয়াছেন। শুনিয়াছি বজ্রযোগিণীতেও ঐরূপ ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

শুধু তাহাই নহে। বিক্রমপুর হইতে প্রতি বৎসর সর্বজাতীয় বহু যুবক আজকাল সমুদ্রযাত্রা করিতেছেন। আজ বিক্রমপুরের পণ্ডিতের পুত্র পর্যন্ত বিলাতপ্রবাসী। যেসকল দীর্ঘশিখ ব্রাহ্মণপ্রবর স্ফীতবক্ষে সম্মিলনে ব্রাহ্মণ্যের গৌরব ঘোষণায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাদের পরিবারস্থ যুবকগণও প্রধানত অর্থাভাবে সমুদ্রযাত্রা স্বীকার করিতে পারিতেছেন না, তাহাও আমরা অনবগত নহি। আর ঐ যুবকদের পিতা পিতৃব্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতিও যে তাহাদের বিদেশগমনে নিতান্ত নারাজ তাহাও নহে। তবে কথাটা এই যে নিজপুত্র অর্থাভাবে বা মেধাহীনতাবশতঃ যদি ব্যারিস্টারীর অযোগ্য হয় তবে প্রতিবেশির পুত্র ব্যরিস্টার হইলে তাহা কেমন করিয়া সহ্য করা যায়? একদা কোন ব্যবহারজীবী ব্রাহ্মণ আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'যতদিন নিজ পরিবারের কেহ বিলাত না যায়, ততদিন কিছুতেই বিলাত যাওয়ার সমর্থন করিব না।' এবারকার সম্মিলনের গতিও আমাদের নিকট এই ভাবপ্রসূতই বোধ হইল।

যাহা হউক উপরে আমরা যে-সকল তীব্র সমালোচনা করিলাম, তাহা সত্ত্বেও পুনরায় বলিতেছি ব্রাহ্মণ মহা-সম্মিলন বস্তুতই নিরতিশয় সার্থকনাম হইয়াছিল। সম্মিলন আমাদিগকে

আশার বাণী শুনাইয়াছেন। দীর্ঘকাল কংগ্রেস ইত্যাদিতে দেহি দেহি রবে গগন বিদীর্ণ করিয়াও আমরা আমাদের বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ উন্নতি সাধন করিতে পারি নাই ; প্রকৃত লক্ষ্য ও গন্তব্য পন্থাও নির্ণয় করিতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ। বিশেষত সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের নেতৃত্বেও কংগ্রেসও তদ্বৎসভাসমূহ ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জকে প্রত্যক্ষভাবে স্বকীয় পতাকাতলে সজ্জিত করিতে পারে নাই। আর আজ পূর্ববঙ্গের নগণ্যস্থান মুন্সিগঞ্জের অজ্ঞাতনামা ও ক্ষুদ্রশক্তি সামান্য কয়েকজন উকিল মোক্তারের আহ্বানে অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশবাসী ব্রাহ্মণগণ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিতেছেন। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় ও আশার কথা আর কি হইতে পারে? যাহারা জীবনে কদাপি স্ব স্ব পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বহির্ভূত কোন বিষয়ের কোন তত্ত্ব রাখেন না, আজ তাহারা ব্রাহ্মণসভার আহ্বানে সমাজের মঙ্গলালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, ব্রাহ্মণসভা আত্মনিবন্ধকে সমাজনিষ্ঠ করিবার উপায় স্বরূপ হইতেছে।

সূক্ষ্মদর্শী সমাজনায়কের পক্ষে ইহা অতি শুভ মুহূর্ত। ব্রাহ্মণ সম্মিলনের নামমাহাত্ম্যের সূত্রাবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণসমাজ এবং তৎসহ সমগ্র বঙ্গসমাজের উন্নতি বিধানের এই প্রশস্ত সময় ও উপায়। ব্রাহ্ম সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কংগ্রেসে বাবু সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ন্যায় ব্রাহ্মণসভায় একজন সুদক্ষ ও স্বার্থত্যাগী নেতার আবির্ভাব হইলেই তিনি ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনকে সংবিধান ও সুপরিচালনা দ্বারা বাঙালি জাতির প্রকৃত উন্নতির সোপান নির্মাণ করিতে পারিবেন।

এবার মহাসম্মিলনে কলকাতা, বীরভূম ও মৈমনসিংহ হইতে তত্তৎ স্থানে আগামী অধিবেশনের জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। আগামী শীতঋতুতে কলিকাতায় মহাসম্মিলনের অধিবেশন হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এইরূপে বঙ্গের প্রত্যেক জিলা বা বিক্রমপুরের ন্যায় প্রধান প্রধান পরগণার বিভিন্ন গ্রামে প্রতি বৎসর একটি স্থানীয় ব্রাহ্মণসভা ও বিভিন্ন জেলার সদরে বা অন্য প্রধান প্রধান স্থানে প্রতিবৎসর সমগ্র বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের একটি মহাসম্মিলন অধিবেশিত হইলে অচিরকালমধ্যে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বঙ্গসমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারিবে। ব্রাহ্মণসভা এ পর্যন্ত রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া চলিয়াছেন, পরিণামেও তদ্রূপই চলিবেন। অন্যথা ব্রাহ্মণসভার হিতকারীতা বিনষ্ট হইবে।

স্বার্থের হিসাবেও ব্রাহ্মণগণের মহাসম্মিলন রক্ষা ও পুষ্ট করা কর্তব্য। বিক্রমপুর ব্রাহ্মণসভার অনতিদীর্ঘ জীবনকালেই আমরা দেখিতেছি কায়স্থ সুবর্ণবণিক এবং অন্ত্যজ জাতি সমূহের অনেক সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা ভার ব্রাহ্মণ সভার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। ইহা ব্রাহ্মণগণের গৌবর বটে।

ইদানীং আমরা নিম্নবর্ণসমূহের উন্নতি চিন্তা করিয়াছি। যদি তাহারা ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন হইতে অনুকূল ব্যবস্থা প্রাপ্ত হয় তবে অতি সহজে অনেক জটিল সামাজিক সমস্যা মীমাংসিত হইতে পারিবে ; নমশূদ্রগণের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ প্রভৃতি গুরুতর বিষয় আমাদিগকে আর ভীত করিতে পারিবে না। কিন্তু মহাসম্মিলন ব্যতীত ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্রাহ্মণই এই সকল সামাজিক সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম নহেন।

উপসংহারে আমরা ভিন্নমতাবলম্বী হইলেও ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের উদ্যোক্তাদিগকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। মুন্সিগঞ্জের যে-সকল উকিল মোক্তার প্রথম ব্রাহ্মণসভা আরম্ভ করেন তাহারাও আমাদের হৃদগত ধন্যবাদের পাত্র। ব্রাহ্মণসভার সুদূরগামী হিতকারিতা তাহারাই আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, ভগবান তাহাদের হস্ত দ্বারা স্বীয় কার্য সাধন করিতেছেন।

** প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩২০ সন*



বিক্রমপুরের চিত্তরঞ্জন

রমাপ্রসাদ চন্দ

ছেলেবেলায় একটি বাউল সঙ্গীতের একটি পদ শুনিয়া অনেক সময় শিহরিয়া উঠিতাম। পদটি এই--

"আজ মলে কাল দু'দিন হবে শুনে যা পাগলের কথা।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আমাদের মায়াপাশ ছিঁড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। সে আজ এক এক দিন করিয়া এক পক্ষ হইয়া গেল। তবু অনেক সময় মনে সংশয় হয়, চিত্তরঞ্জন কি যথার্থই নাই? জননী জন্মভূমির এত বড় পরাক্রান্ত ভক্তকে কাল অকালে এমন অকস্মাৎ জননীর ক্রোড় হইতে কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন কি? আবার চিত্তরঞ্জনের জীবনকথা স্মরণ করিলে মনে হয় এমন একজন লোক যথার্থই আমাদের মধ্যে ছিলেন কি—যিনি একাধারে সুকরি কৃষ্ণভক্ত, হাইকোর্টের পরিপক্ক ব্যারিস্টার, কংগ্রেসে নায়ক এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের প্রবল দলের অধিপতি ; না চিত্তরঞ্জন কবি কল্পনার সৃষ্টি, স্বপ্ন রাজ্যের অধিবাসী—যাহার পক্ষে এই বাস্তব লোকবঙ্গমঞ্চ, হাইকোর্ট, কংগ্রেস, কাউন্সিল দৃশ্যপট মাত্র? মানুষ কি এমন স্বার্থশূন্য হইতে পারে? এত গভীর স্বদেশ প্রেম কে কবে কোথায় দেখিয়াছে? গত অর্ধশতাব্দী যাবৎ ভারতবর্ষে অবিরাম রাষ্ট্রীয় আন্দোলন চলিয়াছে, কিন্তু এ যাবৎ এমন প্রতাপ রাষ্ট্রনায়কের অভ্যুদয় কেহ কল্পনা করিতে পারিয়াছেন কি? চিত্তরঞ্জনের অভ্যুত্থানের এবং তিরোধানের ভঙ্গীও স্বপ্ন রাজ্যের প্রভাবমণ্ডিত। গত ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে আমরা শুনিয়া আসিতেছিলাম, ব্যারিস্টার সি আর দাশ মহাশয় চরমপন্থী রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারীগণকে বিশেষ সহায়কারী। আমরা কেহ কেহ সন্দেহ করিতাম, সি আর দাশের সাহায্য ব্যতীত বাংলায় চরমপন্থীগণ মাথা তুলিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু তাহাকে রাজনীতিক আসরে প্রকাশ্যে বড় দেখিতে পাওয়া যাইত না। তাহার পর চন্দ্রমণ্ডলে নক্ষত্রের মত মহাত্মা গান্ধীর মণ্ডলীতে চিত্তরঞ্জন সহসা উজ্জ্বল নক্ষত্রের আকারে সমুদিত হইলেন দেখিতে দেখিতে সেই নক্ষত্র মার্তণ্ডের আকার ধারণ করিয়া একেবারে মধ্যাহ্নগগনে আরূঢ় হইলেন ; চন্দ্র, তারা, গ্রহ, উপগ্রহাদি আর জ্যোতিষ্কগণ নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কিন্তু হায় পর মুহূর্তেই মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড তেজ কতকটা সংবরণ করিয়া সেই মার্তণ্ড যখন একটু হেলিয়া অপরাহ্নের শীতল ছায়াবিস্তারে উদ্যোগী হইলেন। অকস্মাৎ কোথা হইতে কাল রাহু আসিয়া তাহাকে একেবারে গ্রাস করিয়া পলায়ন করিল। গত দুই বৎসরকাল ভারতবর্ষের বর্তমান ইতিহাসের ধারা সসম্ভ্রমে যাহার ইঙ্গিতের অনুসরণ করিয়াছে সেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনযাত্রা পূর্বাপর আলোচনা করিলে বোধ হয়, এ যেন এক জন রক্ত-মাংসে গঠিত মানুষের জীবন-চরিত বা আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের একটি অধ্যায় নহে, চিত্তরঞ্জনের জীবনলীলা বঙ্গরঙ্গভূমিতে কোন মহাকাব্যের এক পর্বের অভিনয়। বিংশ শতাব্দীতে এরূপ অসাধারণ পুরুষের অভ্যুদয় বিস্ময়কর।

চিত্তরঞ্জনের ত্যাগ সাধারণ ত্যাগ হিসাবকিতাবের পর যাহা কিছু জমা ছিল তাহা বিলাইয়া দেওয়া নহে ; ইহা আত্মহারা মত্ত ব্যক্তির অঙ্গ হইতে আপনার যাহা কিছু আছে সব খসিয়া পড়া। তাহার এমন আত্মহারা (abandon) ভাব আসিল কোথা হইতে? রাষ্ট্রসেবা, রাষ্ট্রনায়কতা হিসাব-কিতাবের ব্যাপার। যতই তীব্র হউক না কেন, শুধু রাষ্ট্রসেবার প্রবৃত্তি হইতে এই আত্মহারা (abadon) ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে না। চিত্তরঞ্জন প্রৌঢ় অবস্থায় পদার্পণ করিয়া বিদ্যাপতি

ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া চৈতন্য মহাপ্রভুর উপদিষ্ট বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের ভগবদ্ভক্তের আদর্শ শ্রীরাধিকা, চিত্তরঞ্জনের আত্মহারা ত্যাগ, বৈষ্ণবের ভাষায় "সহজ" ত্যাগ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভাবের ফল।

চিত্তরঞ্জন মাতৃভূমির যে মূর্তির উপাসনা করিতেন, সে মূর্তি গেজেটিয়ারে বর্ণিত, মানচিত্রে অঙ্কিত মূর্তি নহে। সে যেন বাস্তব মাতৃভূমির মাটি দিয়া গড়া স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানমূর্তি। এই মূর্তি তিনি কোথায় পাইলেন? চিত্তরঞ্জন কবিত্বশক্তি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কল্পনা প্রবণতা তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। সুতরাং যাহা নিরেট বাস্তব তাহা লইয়া তৃপ্ত থাকা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাংলা-সাহিত্য বিশেষত বঙ্কিম-সাহিত্য চিত্তরঞ্জনের সহায়তা করিয়াছিল। চিত্তরঞ্জন বঙ্কিমচন্দ্রের একজন ভক্ত ছিলেন। যখন তিনি 'নারায়ণ' পত্রের সম্পাদক ছিলেন তখন ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা "সচিত্র বঙ্কিম স্মৃতি সংখ্যা" রূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই পত্রে ১৬ জন লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক নানা দিক হইতে বঙ্কিম-সাহিত্যের মহিমা কীর্তন করিয়াছিলেন। ১৩৩১ সালের আষাঢ় মাসের আমেদাবাদে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে তিনি কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম সাহিত্য সম্মিলনের প্রধান সভাপতিরূপে একটি সুন্দর অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। এই অভিভাষণে বঙ্কিম সাহিত্যের প্রভাব সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন—

"বঙ্কিম-সাহিত্য বাঙালির জাতীয় জীবন গঠন করিয়াছে। যতই অপপ্রয়োগ হউক, স্বদেশী যুগে বঙ্কিম সাহিত্য বাংলায় তাহাই করিয়াছে। যাহা ফরাসি দেশে Voltair এবং Rousseau সাহিত্য করিয়াছিল। .... আমার মনে হয়, কোন কোন দিকে বঙ্কিম বাংলায় Voltair ও Rousseau যদিও এরূপ তুলনা সমস্ত দিক দিয়া সমীচীন নয়।"

এই অভিভাষণের উপসংহারে দেশবন্ধু কমলাকান্তের "আমার দুর্গোৎসব" হইতে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। উদ্ধৃত প্রথম অংশে সুবর্ণময়ী বঙ্গমূর্তির বর্ণনা দ্বিতীয় অংশে কালস্রোতে নিমজ্জিত মাতৃমূর্তি তুলিবার জন্য স্বদেশবাসীকে আহ্বান। দেশবন্ধু যখন এই অভিভাষণ পাঠ করেন তখন এই লেখক সভাস্থলে উপস্থিত ছিল এবং তিনি যে সুরে পাঠে করিয়াছেন, সেই সুর এখনও যেন এই লেখকের কানে বাজিতেছে। উপসংহারে দেশবন্ধু যখন গদ্‌গদ কণ্ঠে মহাকবির মহাস্বপ্ন বৃত্তান্ত পাঠ করিতে লাগিলেন তখন মনে হইল তিনি যেন নিজের স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানমূর্তি বর্ণনা করিতেছেন। শেষে—

চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে এই কালসমুদ্রতাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণ প্রতিমা মাথায় করিয়া আনি, ভয় কি? না হয় ডুবিব ; মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?

এই অংশে পাঠ করিবার সময় ভাবাবেশে দেশবন্ধুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। দেশবন্ধু জন্মভূমিকে দেখিতেন, ধ্যানপরায়ণ ভক্ত সাধকের ইষ্টদেবতার মত এবং ইষ্টদেবতার হিসাবেই স্বদেশের সেবা করিতেন। বঙ্কিম সাহিত্য চিত্তরঞ্জনের মহান হৃদয়ে এইরূপ স্বদেশ ভক্তি বিকাশের সহায়তা করিয়াছিল।

চিত্তরঞ্জনের আর একটি অসাধারণ সাধারণ গুণ ছিল, দুর্জয় সাহস, এই প্রকার সাহস বিক্রমপুর হইতে সংক্রমিত হইয়াছিল। সুবিশাল নদনদীর তরঙ্গের এবং বন্যার সহিত সংগ্রামে বরাবর রত থাকায় বিক্রমপুরবাসীদিগের অধিক মাত্রায় বিকাশপ্রাপ্ত হয়। চিত্তরঞ্জন একদিন বৈশাখ মাসে সস্ত্রীক নৌকায় কীর্তিনাশা পার হইয়া চাঁদপুর যাওয়ায় অনেকের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ সাহসের কার্য তাহার পূর্বপুরুষগণের নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল। রাজস্থানের ইতিহাস-রচয়িতা টডের এবং মারাঠা জাতির ইতিবৃত্তকার গ্রান্ট ডাফের কৃপায় রাজপুত এবং মারাঠাগণের বীরত্বের কাহিনী সুবিদিত এবং প্রতাপসিংহ ও শিবাজী বীরাগ্রগণ্য বলিয়াই পূজিত। যখন প্রতাপসিংহ আকবর বাদশাহের দিগ্বিজয়ী সেনার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহার

কয়েক বৎসর পরে (১৫৯৬-১৬০২) খ্রিস্টাব্দে বিক্রমপুরের ভৌমিক কেদাররায় মোগল সম্রাটের সহিত যুদ্ধে রত হয়েন। প্রতাপসিংহের সহিত যুদ্ধে বাদশাহের সেনার নায়ক ছিলেন নবীন সেনাপতি মানসিংহ-কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধে বাদশাহের সেনার নায়ক ছিলেন প্রবীণ সেনাপতি মানসিংহ। অসম সাহসের হিসাবে মেবারের সেনার এবং বিক্রমপুরের সেনার তুলনা করিতে গেলে বলিতে হয়, মোগল সুবাদার রাজা মানসিংহের সহিত অসম সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কেদার রায় এবং তাহার সেনা অধিকতর সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। মেবারে রাজপুত সেনাকে আশ্রয় দিবার জন্য 'আরাবল্লী' পর্বতমালা ছিল, কিন্তু সমতটের সমতল ক্ষেত্রে মৃত্যু ভিন্ন পরাজয় স্বীকার করিতে অসম্মত বিক্রমপুর সেনার আর কোন আশ্রয় ছিল না। রণক্ষেত্রে সাংঘাতিকভাবে আহত এবং মানসিংহের নিকট নীত কেদার রায় মৃত্যুর কৃপায়ই মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে পুরুষ পরম্পরাগত সাহস একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। চিত্তরঞ্জনে সেই সাহস দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল।

বিক্রমপুরের প্রতি চিত্তরঞ্জনের বরাবরই বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৩৩১ সালের বৈশাখ মাসে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান রাধানগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনের অবসানে ষোড়শ সম্মিলন বিক্রমপুরে মুন্সিগঞ্জে আহুত হইয়াছিল। দেশবন্ধু মুন্সিগঞ্জের অভ্যর্থনা সমিতির অধ্যক্ষের ভার লইয়াছিলেন, কিন্তু শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন মুন্সিগঞ্জে যাইতে সাহস করেন নাই। ষোড়শ সম্মিলনের প্রধান সভাপতি নাটোরের মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়কে তিনি এ সম্বন্ধে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, মহারাজের সৌজন্যে তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

"আলি মঞ্জিল" পাটনা
৩ এপ্রিল, ১৯২৫.

মহারাজ—

যে দিন কলিকাতা ছাড়ি, সেই দিনই আপনার চিঠি পাই। মনে করিয়াছিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করে আসব। তা কর্মবিপাকে হয়ে উঠল না। আশা করি আপনি মুন্সিগঞ্জে যাবেন। আমার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। শরীরের অবস্থা যেরূপ তাতে মুন্সিগঞ্জে সভা সমিতিতে গেলে দু'মাসের যায়গায় অন্তত চার মাস বসে থাকতে হবে, এবার মনে করছি, যেমন করেই হোক, দু'মাসের ছুটি নিব। হয় ভাল করেই বাঁচব, না হয় ভাল করেই মরব। ....

দেশের দুর্ভাগ্যে দেশবন্ধুর ভাগ্যে সেই দুই মাসের ছুটিও মিলিল না। তিনি পাটনা হইতে ফরিদপুর যাইতে বাধ্য হইলেন। তাহার পর দার্জিলিং-এ গিয়া ১৬ জুন অপরাহ্ন ৫টার সময় দুই মাসেরও ছুটি পাইলেন না বলিয়া যেন অভিমানে 'না হয় ভাল করে মরব' এই সত্য প্রতিপালন করিলেন। বঙ্গদেশবাসী তাহার স্মৃতি-মন্দির স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হাসপাতালের বা ধাত্রীবিদ্যালয়ের সাইনবোর্ডের পক্ষে দেশবন্ধুর নাম জীবন্ত রাখা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তাহার মহান চরিত্রের উদ্দীপনা শক্তি জীবন্ত জ্বলন্ত রাখিবে কে? পৃথিবীতে এখন যিনি শ্রেষ্ঠ ভাস্কর আছেন, তাহার দ্বারা চিত্তরঞ্জনের চরিত্রদ্যোতক ধাতু-মূর্তি প্রস্তুত করাইয়া প্রতিষ্ঠিত করিলে চিত্তরঞ্জনের স্মৃতির সম্যক সমাদর করা যাইবে।

** মাসিক বসুমতী—আষাঢ় ১৩৩২ সন*



সমাজ-সংস্কারক
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়

আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে বাল্য-বিবাহ, জাতিভেদ, বিধবা-বিবাহের রাহিত্য প্রভৃতি কয়েকটি প্রথাকে 'সামাজিক সমস্যা' বলা যাইতে পারে। তাহাদের প্রত্যেকেরই স্ব-পক্ষে বিপক্ষে দুই চার কথা বলিবার আছে ; এমন কি যে বহু-বিবাহ প্রথা ইয়ুরোপীয় সভ্যতা ও নীতি-শাস্ত্রের চক্ষুশূল, আমাদের দেশিয় দুইজন উচ্চ শিক্ষিত পরিণত-বয়স্ক লোক সেই প্রথারও আংশিক সমর্থন করিয়াছেন।[১]

কিন্তু কৌলীন্য প্রথা নামক যে একটি কুৎসিত রীতি বঙ্গীয় রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কয়েক পুরুষ যাবৎ প্রচলিত আছে, যাহার ফলে পূর্বে রাশি রাশি কুলীন কন্যা আজীবন অবিবাহিতা থাকিয়া 'যম-বরণ' নামে আখ্যাত হইত, বিংশতি, ত্রিংশৎ বা ততোধিক সংখ্যক রমণী একটি ভিক্ষোপজীবী বাস্তু-ভিটা পরিশূন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিত, অশীতিপর বৃদ্ধের গলদেশে অপরিচিতবসনা বালিকা বরমাল্য অর্পণ করিত, অথবা বর্ষীয়সী পিতামহীকল্পা স্খলিত দশনা কামিনী তদীয়া দৌহিত্রপ্রতিম অনুদগতজ্ঞানদন্ত বালকের সহিত পরিণীতা হইত, এবং অদ্যাপি যাহার ফলে হিন্দুর গৃহে কদলীতলে ও বাসর ঘরে ইত্যাকার করুণ বীভৎস রসের উচ্ছ্বাস অল্পাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই কুপ্রথার স্বপক্ষে, সৌভাগ্যক্রমে, কেহই লেখনী ধারণ বা রসনা কণ্ডুয়ণ করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু তথাপি ইহা ফল্গু নদীর প্রবাহের ন্যায় আজিও কুলীন সমাজের অন্তস্থলে প্রবাহিত আছে। এদেশের মাটির এমনই উর্বরা শক্তি যে একবার একটি প্রথা বদ্ধমূল হইতে পারিলে উচ্চ শিক্ষা বা ন্যায় নিষ্ঠার শত বজ্রপাত ও কুঠারাঘাতেও তাহাকে বিনষ্ট করা যায় না। আজিও ঢাকা ফরিদপুর ও যশোহর প্রভৃতি জেলার কুলীন প্রধান গ্রামে অনূঢ়া, প্রৌঢ়া ও স্বামী-পরিত্যক্তা সপত্নীবর্গ দলে দলে বিচরণ করিতেছে দেখা যায়।

এই ঘৃণিত জঘন্য কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নামক একটি বিক্রমপুর নিবাসী ভদ্রলোক দণ্ডায়মান হন। সকল দিক দেখিতে গেলে ইহাকে পূর্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর বলিলে বলা যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমগ্র ভারতের বিধবার দুঃখে কাঁদিয়াছিলেন। আর ক্ষুদ্র বঙ্গদেশের কুলীন কন্যার দুঃখে ইহার হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। একজন রমণীর নিটোল ললাটের বিলুপ্ত সিন্দুরবিন্দুর পুনরুদ্ধার সংকল্পে বদ্ধপরিকর ; অপরজন যে সব ললনার ললাটপট কখনও সিন্দুর রাগে রঞ্জিত হয় নাই এবং হইবার আশাও নাই, তাহাদের সিঁথিতে সিন্দুর দিতে ও যাহাদের সিঁথির সিন্দুর বর্তমান থাকিতেও স্বামীর অবজ্ঞায় নিষ্প্রভ হইয়া আছে, তাহাদের ললাটের অঙ্গরাগ করিতে সচেষ্ট। কিন্তু শেষোক্তের পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিলে কোন কোন বিষয়ে তাহাকে বিদ্যাসাগর অপেক্ষাও উচ্চতর আসন দিতে ইচ্ছা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল অনুস্বার বিসর্গের পণ্ডিত ছিলেন না, ইংরাজি ভাষায়ও ব্যুৎপন্ন ছিলেন ; বহুসংখ্যক খাঁটি ইংরাজের সহিত ও বিদেশিয় সমাজতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের গ্রন্থের সহিত তিনি সুপরিচিত ছিলেন সুতরাং তাহার নয়নে বাল-বিধবার মলিন মুখশ্রী কঙ্করের ন্যায় জ্বালাকর হওয়া ও তাহার মনে সমাজ সংস্কারকের বাসনা উদিত হওয়া একান্ত অস্বাভাবিক বা অভাবিত নহে। কিন্তু রাসবিহারী আদৌ ইংরেজি জানিতেন না, সংস্কৃতও তদ্রূপ ; বাংলাও অতি সামান্য জানিতেন ; এরূপ স্থলে তাহার মনে

একটা দশপুরুষব্যাপী সামাজিক প্রথার সংশোধনের ইচ্ছার উদয় হওয়া অতি আশ্চর্যজনক ও বিধাতার অপর মহিমার পরিচায়ক। তাহার উপরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদ-গৌরব ও প্রচুর বৈভব তাহার পথটিকে কিয়ৎ পরিমাণে নিষ্কণ্টক করিয়া দিয়াছিল ; কিন্তু রাসবিহারী উক্ত দুই বিষয়েই নিতান্ত ভাগ্যহীন ছিলেন এমন কি, এই সমাজ সংস্কারে যোগ দিবার পরে যখন ইহার সামান্য চাকরটিও হস্তচ্যুত হইল, তখন নিজের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য ইহাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে সমাজের কোন শ্রেণীর লোকই প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন না ; কিন্তু রাসবিহারীর প্রস্তাবিত কৌলীন্য সংস্কার কার্যে পরিণত হইলে বিবাহ ব্যবসায়ী কুলীন ও চাকরিতে অনভ্যস্ত ঘটকবর্গের রোটিকা অল্পাধিক পরিমাণে আহত ও নিহত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং বিধবা-বিবাহের প্রচলন প্রার্থীর বিরুদ্ধে যে স্থলে কেবল লেখনীও লেহনীর আস্ফালন মাত্র হইয়াছে, কৌলীন্য সংস্কার প্রার্থীর মস্তকোপরি সে স্থলে লগুড় ও কুঠারের ঘূর্ণন দেখা গিয়াছে। রাসবিহারীর সেই সব দুর্দৈব কাহিনী বর্ণনা করিবার আগে সংক্ষেপে কৌলীন্য প্রথার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি ; কারণ 'প্রদীপ'-এর অনেক পাঠক-পাঠিকা সে সম্বন্ধে অজ্ঞ ও কুতূহলী থাকিতে পারেন।

একসময় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের ক্রিয়াকর্ম উপযুক্ত শাস্ত্রোজ্ঞ অভাবে লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হইলে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এদেশে আনয়ন করেন। পরে বল্লাল সেন ঐ পঞ্চ বিপ্রের বংশধরদিগকে আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি নয়টি উচ্চ লক্ষণ[২] সমন্বিত দেখিয়া সাধারণভাবে কুলীন সংজ্ঞা দিয়া এদেশীয় পুরাতন ব্রাহ্মণ হইতে তাহাদিগকে পৃথক করেন। তৎপরে লক্ষ্মণ সেন এই ব্যাপক কুলীন সংজ্ঞাধারী ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মধ্যে গুণের তারতম্য অনুসারে শ্রোত্রীয়, বংশজ ও কুলীন (সঙ্কীর্ণার্থে) নামক তিনটি শ্রেণীর সৃষ্টি করেন। যে প্রণালীতে তিনি তাহাদের ঐ সকল গুণের পরীক্ষা করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ গল্প আছে ; তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ গঞ্জিকার গন্ধ থাকিলেও তৎকালীন রাজাদের বিদূষকবৎসল স্বভাব ও রহস্যপ্রবণ খামখেয়ালীর বিষয় স্মরণ করিলে একেবারে "প্রক্ষিপ্ত" বা কল্পনাবিজৃম্ভিত বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। কথিত আছে, একদা রাজা লক্ষ্মণ সেন আদিশূরানীত উক্ত 'কলয়' হইতে উদ্ভূত কুলীনদিগকে রাজসভায় আহ্বান করেন। তাহাতে কতকগুলি কুলীন রাজানুগ্রহ লাভের উৎকট অগ্রিম উত্তেজনা বশতঃ ব্রাহ্মণোচিত নিত্য ক্রিয়া সমাধা না করিয়াই এক প্রহরের মধ্যে রাজ দরবারে আসিয়া হাজির হন। আর কয়েকজন ভূদেব ও দেবাদিদেব উভয়ের মনস্তুষ্টি সঙ্গত মনে করিয়া অতি ক্ষিপ্রতার সহিত সন্ধ্যাহ্নিকাদি সমাপন করিয়া দেড় প্রহর সময়ে রাজসদনে উপস্থিত হন। অপর কয়েকজন রাজকীয় অনুগ্রহ নিগ্রহের দিকে দৃকপাত না করিয়া যথাবিধি ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ করিয়া দ্বিতীয় প্রহরের সময়ে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। শ্রীবৎস রাজা যেমন শনি লক্ষ্মীর বিবাদে সরাসরি ভাবে বিচার করিয়াছিলেন অথবা মুসলমান রাজত্বের সময়ে কাজিরা যেমন সময়ে সময়ে একটি বিশিষ্ট কৌশলের সাহায্যে কোন দুরূহ বিষয়ের মীমাংসা করিতেন ; লক্ষ্মণ সেনও সেইরূপ অতি সহজে ব্রাহ্মণদিগের এই গুণপরীক্ষার ব্যাপার সম্পন্ন করিলেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাহারা আড়াই প্রহরের সময় আসিয়াছিলেন, তাহারাই প্রকৃত নিষ্ঠাবান ও উক্ত নবগুণসম্পন্ন স্থির করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ কৌলীন্য মর্যাদাসম্পন্ন রাখিলেন। যাহারা দেড় প্রহরের সময় আসিয়াছিলেন, তাহারা ক্রিয়াকর্মবিহীন না হইলেও আংশিক পরিমাণে শান্তভাব বর্জিত মনে করিয়া ও শান্তি লক্ষ্মণটি ব্যতীত অবশিষ্ট অষ্টগুণের অধিকারী বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে 'শ্রোত্রীয়' আখ্যা দিলেন। আর আর যাহারা এক প্রহরের মধ্যে আসিয়াছিলেন, তাহারা আচার প্রভৃতি নবগুণ-বর্জিত অথচ সদ্বংশজাত মনে করিয়া, তাহাদিগকে 'বংশজ' নামে অভিহিত করিলেন।



রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়

ইহার পরে দেবীবর ঘটক নামে একটি লোক, যিনি তদানীন্তন সমাজে অতিমাত্র প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, তিনি কৌলীন্য, লক্ষণজ্ঞাপক শ্লোকের 'নিষ্ঠাশক্তি' স্থলে 'নিষ্ঠাবৃত্তি' পাঠ বসাইয়া কুলীনদিগের কুল কন্যাগত করিলেন। অর্থাৎ এই সময় হইতে নিয়ম হইল যে কোন কুলীনের বংশ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে তাহার প্রত্যেক কন্যাকে উচ্চ-বংশে সম্প্রদান করিতে হইবে। ইহার পূর্বে কোন কুলীনের মেয়েদের মধ্যে কাহাকে নামাইয়া কাহাকে বা উঠাইয়া, বিবাহ দিলেও তাহাতে কুল গৌরবের হানি হইত না।

দেবীবর যদি কেবল ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তবে কেহ বড় তাহার দোষ দিত না। কারণ তাহার প্রবর্তিত এই নূতন নিয়মে কুলীন কন্যাগণের বিবাহক্ষেত্র কতকটা সঙ্কুচিত হইলেও এতটা সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল না যে তাহার ফলে এক পুরুষের বহু পত্নীর পাণিগ্রহণ করা, বা কন্যাগুলিকে যাবজ্জীবন অনূঢ়া রাখা অথবা 'স্বজন'[৩] বয়োজেষ্ঠ্যাকে বিবাহ করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল। কারণ তখনও যে কোন কুলীন কুমারের সঙ্গে যে কোন কুলীন কুমারীর বিবাহ হইতে বাধা ছিল না। কিন্তু পরে দেবীবর মেল-বন্ধন নামক একম একটি amendment প্রস্তাব করিলেন, যাহা পাশ হওয়াতে তাহার পূর্ব প্রস্তাবিত বিলটি দ্বারা বিবাহ সম্বন্ধীয় পূর্বোক্ত সর্বদ্বারিকতা রহিত হইয়া গেল। কোন গ্রামে অনেকগুলি লোক থাকিলে আজকালও যেমন সেই গ্রামের কোন ব্যক্তির কোন দোষ উপলক্ষে একটি দলাদলির সৃষ্টি হয় এবং হয়ত কতকগুলি লোক এই অকার্যকারীর সঙ্গেই মিলিত হইয়া একটা দলের সৃষ্টি করেন। সেইরূপ কুলীন সন্তান দিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদের কাহারো কোন একটা দোষকে ভিত্তি করিয়া দেবীবরের চেষ্টায় এক একটা দলের সৃষ্টি হইতে লাগিল এইরূপে ক্রমে ক্রমে ছত্রিশ রকমের দোষ অবলম্বন করিয়া ছত্রিশটি দল উদ্ভুত হইল এই দলগুলিকেই কুলজী শাস্ত্রে[।] 'মেল' বলে ; যথা ফুলিয়া মেল, খড়দহ মেল, সর্বানন্দী মেল ইত্যাদি। দেবীবরের কৃত মেল শব্দের সংজ্ঞা এই "দোষানাং মিলনং মেলঃ।" প্রথমে ইহাদের প্রত্যেক দল অপর দলকে জাতিভ্রষ্ট মনে করিয়া পরস্পরের মধ্যে আহারাদি ও আদান-প্রদান রহিত করেন। কালসহকারে খাওয়ার দলাদলিটা বক্তৃতা-নিপুণা সুরসিকা রসনা দেবীর মধ্যস্থতায় উঠিয়া যায়। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধীয় দলাদলিটা পূর্ণমাত্রায় রহিয়া গিয়াছে। বর্তমান সময়ে এক মেলের লোক অন্য মেলের মধ্যে বিবাহ করিতে পারে না ; সুতরাং বর ও কন্যা সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিতান্ত অল্প পরিসর হইয়া পড়িয়াছে।

কালক্রমে ইহাতে আরো জটিলতা প্রবেশ করিয়াছে। কোন কুলীন নিজ মেলেরই যে কোন পাত্রের সহিত নিজ দুহিতার বিবাহ দিতে পারেন না। ঐ মেলের কোন বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে বিবাহ দিতে হইবে। নতুবা কুলগৌরব অক্ষত থাকে না। যথা, ফুলিয়া মেলের সীতারামের সন্তানের সহিত ঐ মেলের কেবল কেশব চক্রবর্তীর সন্তানের বিবাহ হইতে পারে। ইহাকে "ঘর" বলে। স্বঘরে বিবাহ না দিলে সমাজে নিন্দিত হইতে হয়।

শুদ্ধ ইহাই নহে। বিবাহ-ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণতর করিবার জন্য আরো কয়েকটি সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। পূর্বোক্ত কেশব ও সীতারাম হইতে নিচের দিকে গণিলে পাত্র ও পাত্রী যদি একই সংখ্যায় উপস্থিত হয়, তবেই বিবাহ হইতে পারিবে ; নতুবা 'বিপর্যয়' নামক একটি অপ্রায়শ্চিত্তা দোষ ঘটিবে। সুতরাং পাঠক পাঠিকাগণ দেখিতে পাইতেছেন যে কোন একটি মেয়ের জন্য একটি বর খুঁজিতে হইলে মেল ঘর পর্যায় নামক কতগুলি সঙ্কীর্ণ গলি ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে কেমন একটি ক্ষুদ্র প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হইতে হয় ; এবং যেখানে ভাল বর খুঁজিতে গিয়া শেষে যে অনেক সময়েই মেয়ের জন্য সঙ্কট ভিন্ন আর কিছু জোটে না তাহাতে আশ্চার্যের বিষয় কি আছে?

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রথমে এই মেলভঙ্গ ব্যাপারে কালাপাহাড়ের ন্যায় অবতীর্ণ হন। কালাপাহাড় নিজে হিন্দু হইয়াও শেষে হিন্দুর দেবদেবীর ধ্বংসে প্রবৃত্ত হন ; ইনিও নিজে উচ্চশ্রেণীর কুলীন ও বহুবিবাহ দোষে দুষ্ট হইয়াও এই মেলবন্ধন ভাঙিতে আরম্ভ করেন এবং স্বীয় অভিষ্ট বিষয়ে অনেক পরিমাণে কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। আজ দুই বৎসর হইল ইহার মৃত্যু হইয়াছে। যদি আর দুচারিটি লোক ইহার ন্যায় উদ্যোগ, অধ্যবসায় ও ত্যাগ স্বীকার লইয়া এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তবে সর্বপ্রকার সংস্কারে সুফল ফলিতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

১২৩২ বঙ্গাব্দে বিক্রমপুরে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। বাল্যকালে কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই ; সুতরাং বাংলা শিক্ষাও ইহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। অতি শৈশবেই ইনি পিতৃহীন হন ; তখন ইহার শিক্ষার ও রক্ষার ভার পিতৃব্যের হস্তে অর্পিত হয়। পিতৃব্য মহাশয় স্বীয় দারিদ্র্য ক্লেশ নিবারণের কোন সহজতর উপায় না দেখিয়া, অতি

অল্পকাল মধ্যেই ইহাকে অর্থের বিনিময়ে আটটি বিবাহ করান। এসব বিবাহ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইয়াছিল। তিনি তাহার আত্মজীবনচরিতে লিখিয়াছেন, "আমি বাল্যকাল হইতেই বহু বিবাহের বিদ্বেষী ছিলাম ; সুতরাং 'সম্বন্ধ' নিয়া ঘটক আসিলেই নানা স্থানে পলাইয়া থাকিতাম। বহুবিবাহে সম্মতি থাকিলে বোধ হয় আমাকে শতধিক রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে হইত।" ইহার কিয়ৎকাল পরে সুযোগ্য অভিভাবক মহাশয় ভ্রাতুষ্পুত্রের 'বিবাহে অরুচি' নামক রোগটিকে দুরারোগ্য মনে করিয়া, প্রায় তিন শত টাকার ঋণভার ইহার স্কন্ধে অর্পণপূর্বক ইহাকে পৃথগন্ন করিয়া দিলেন। তখন ঋণ পরিশোধ বা পরিবার প্রতিপালনের জন্য দুই চোখে পথ দেখিতে না পাইয়া, ইনি আরো ছয়টি বিবাহ করেন।[৪] ইহাতে অর্থাভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইলে চাকরি পাইবার অভিলাষে নিজের চেষ্টায় সাধারণ রূপ বাংলা লেখাপড়া শিক্ষা করিলেন। কয়েকদিন পরে ময়মনসিংহ জেলার কোন জমিদারের আশ্রয়ে তহশীলদারী কর্মে নিযুক্ত হইলেন।

বাল্যকাল হইতেই ইহার কিছু কিছু বাংলা কবিতা ও সঙ্গীত রচনার অভ্যাস ছিল। প্রথমত তিনি "রমণীরমণ" নামক একটি পদ্যগ্রন্থ রচনা করেন এবং প্রাচীনকালের ইংরেজি সাহিত্যসেবী দরিদ্র কবিদের প্রবর্তিত সেই সনাতন অব্যর্থ কৌশল অবলম্বনপূর্বক স্বদেশীয় কোন জমিদারের স্তুতিবাদ পুস্তকের শিরোভাগে সংযোজিত করিয়া দেন তাহাতে ঐ জমিদারের সাহায্যে উহা মুদ্রিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি বিদ্যানিধি ও শৈশব 'জ্ঞান চন্দ্রিকা' নামক আরও দুইখানি কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই দুইখানি বই তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক যথেষ্ট আদর ও উৎসাহ পাইয়াছিল। এবং এখনও কোন কোন বিদ্যালয়ে পঠিত হইয়া থাকে।

এই সময়ে একদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সেই চির-নবীন করুণ রসাত্মক "সীতার বনবাস" গ্রন্থ পাঠে উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন ; এবং পাঠ সমাপ্ত হইবামাত্র উহার সারাংশ অবলম্বন করিয়া "সীতার বনবাস" নামক একখানা কবিতা-পুস্তক রচনা করেন। জানকীর সমবেদনা হইতে বর্ষিত অশ্রুজলে যখন তাহার হৃদয় সুষিক্ত ও কোমল ছিল তখন একদিন সহসা স্বীয় সমাজের কুলীন কন্যাগণের দুঃখ দূর করিবার বাসনা তাহার অন্তঃকরণে অঙ্কুরিত হইল। সেই হইতে হিন্দুর ঘরে ঘরে যে সব জনমদুঃখিনী জানকীরা নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতেছে যেমন করিয়া হউক, তাহাদের দুঃখ মোচন করা তাহার জীবনের লক্ষ্য স্বরূপ হইয়া উঠিল।

১২৭৫ সনে "বল্লালী সংশোধনী" নামে কৌলীন্য সংস্কার সম্বন্ধীয় একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন। কিন্তু এই সংস্কার ব্যাপারে মনোনিবেশ করাতে তাহার একমাত্র অবলম্বন তহশীলদারীর কর্মটি পরিত্যাগ করিতে হইল। ঐ পুস্তক রেজিস্টরী করিবার জন্য যখন ইনি সবরেজিস্টরী অফিসে উপস্থিত হইলেন তখন সেখানকার অনেকেই এই পুস্তকের মর্ম অবগত হইয়া ইহাকে ক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিলেন। কারণ অনেকেই জানিতেন যে, ইনি একজন উচ্চ শ্রেণীর কুলীন এবং বহু বিবাহ নিজের ব্যবসায়। অতঃপর ইনি বিক্রমপুরের প্রধান প্রধান শ্রোত্রীয় ও বংশজ সমাজে উপস্থিত হইয়া উক্ত পুস্তক বিতরণ ও মৌখিক বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে ইহার উপরে অসংস্কৃত অবিমিশ্র তিরস্কার বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। এমন কি জনরব উঠিল যে তাহার জ্ঞাতি ও প্রতিপক্ষেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। প্রথমে ইহাকে লোকে নব্য সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মহীন অনাচারী ম্লেচ্ছ বলিয়া মনে করিত ও অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভে চেষ্টা পাইত। কিন্তু পরে ইহারই নিষ্ঠাবান-সাত্ত্বিক আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া ও ইহার অভিপ্রায় পরিষ্কাররূপে অবগত হইয়া ক্রমেই সামাজিক লোকেরা ইহার মতের অনুমোদন করিতে লাগিল।

এই সময়ে ইনি কৌলিন্য-সংস্কারের প্রোগ্রামের ভিতরে কন্যাপণ নিবারণের চেষ্টাটি প্রবিষ্ট করিয়া স্বীয় কর্মক্ষেত্র আরও পরিসর করিলেন। অতঃপর কন্যাপণ ও বহু-বিবাহ নিবারণ মানসে একখানা প্রতিজ্ঞাপত্র প্রণয়ন করিয়া তাহাতে সমাজের প্রতিষ্ঠাশালী লোকদের নাম স্বাক্ষর করাইবার জন্য নানাস্থানে ভ্রমণ বক্তৃতা দান ও বড় বড় বিবাহসভায় উক্ত বিষয় দুটি সম্বন্ধে বাগবিতণ্ডা উপস্থিত করিতে লাগিলেন। বিরুদ্ধ মতাবলম্বী কুলীন ও জীবিকা নাশ ভীত ঘটকবর্গ তাহার বিরুদ্ধে তুমুল কোলাহল উপস্থিত করিল।

অবলার দুঃখে চিরব্যাথিত-হৃদয় স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, নীল দর্পণের সেই লং সাহেব ও কলিকাতাস্থ "ভারতবর্ষীয় সনাতন-ধর্ম-রক্ষণী সভা" তাহার মতের পৃষ্ঠপোষক হইলেন এবং এডুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ, হিন্দুহিতৈষিণী, ঢাকা-প্রকাশ প্রভৃতি সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ তাহার স্বপক্ষে খরবেগে লেখনী চালনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় ও কলিকাতার উক্ত সভার পরামর্শানুসারে গবর্নমেন্ট সমীপে একটি আবেদন করা সঙ্গত মনে করিয়া, আবেদনপত্রে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি লোকের নাম স্বাক্ষর করা হইল। কিন্তু ঐ সময়ে পাপাত্মা শিয়ার আলী তদানীন্তন গবর্নর জেনারেল লর্ড মেয়োর প্রাণ সংহার করাতে সেই দেশব্যাপী বিপদ ও অবসাদের পরোক্ষ ফলে ঐ আবেদনপত্র আর গবর্নমেন্ট সমীপে উপস্থিত করা হইল না।

এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে দুই খানা উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশ করিয়া রাসবিহারীর বল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

অতঃপর ইনি ১২৮২ সনের ২৪ অগ্রহায়ণ তারিখে পর্যায় ভঙ্গ করিয়া স্বীয় কন্যার বিবাহ দিলেন। কুলীন সমাজে ইহাই সর্বপ্রথম 'বিপর্যয়' বিবাহ।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে কুৎসিৎ কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করেন। সেই গানগুলি অন্তত সাহিত্য হিসাবেও বঙ্গভাষায় চিরদিন সম্মান পাইবার যোগ্য। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের শ্যামা-সঙ্গীতগুলি যেমন অকপট নির্ভীক ভক্তির উদ্দাম উচ্ছ্বাস ও অভিনব সুরভঙ্গীর জন্য অমর হইয়া আছে, রাসবিহারীর সঙ্গীতগুলিও তাহাদের অন্তর্নিহিত বিষাক্ত বিদ্রূপ ও মৌলিকতার জন্য চিরদিন বঙ্গসাহিত্যে স্থান পাইবে। পূর্ববঙ্গের অনেকস্থানে সেই গানগুলি এখনও পরমোৎসাহে গীত হইয়া থাকে।

কিন্তু এ সব মৃদু উপায়ে আশানুরূপ ফল না হওয়াতে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পুনরায় গবর্নমেন্ট সমীপে আবেদন করা কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। তদনুসারে রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক ঢাকায় উপস্থিত হইলে তাহার সমীপে এক আবদেন পত্র উপস্থিত করা হয়। ঐ সময়ে বরিশাল জেলা হইতেও আর একটি দরখাস্ত গবর্নমেন্ট সমীপে রাসবিহারীরই উদ্যোগে প্রেরিত হইল। কিন্তু এই জটিলান্ধকার গোলক-ধাঁধার মত হিন্দুর সামাজিক ব্যাপার হইতে দূরে থাকা গবর্নমেন্ট নানা কারণে সঙ্গত বোধ করিলেন।

তখন আর রাজদ্বারের ভিখারি হওয়া নিস্ফল বিবেচনা করিয়া সামাজিকদিগের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া পূর্বের ন্যায় বক্তৃতা প্রদান ও সঙ্গীত গান করিতে লাগিলেন। কিন্তু মেলভঙ্গ প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করিতে কাহাকেও অগ্রসর হইতে না দেখিয়া ১২৮৪ সনের ২২ শ্রাবণ নিজের পুত্র ও কন্যার বিবাহ ভিন্ন মেলে দিয়া ফেলিলেন। বঙ্গের কৌলীন্য সংস্কারের ইতিহাসে উহা একটি চিরস্মরণীয় দিন। পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। এই স্থলে বলিয়া রাখি এই কয়টি বিবাহই ভঙ্গকুলীনের মধ্যে হইয়াছিল।[৫]

কিন্তু ইহার অল্প পরেই ১২ জন নৈকষ্য কুলীনও মেলভঙ্গ করিয়া আপনাপন কন্যার বিবাহ দিলেন; এবং ৮ জন শ্রোত্রীয়, চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে কুলীনে কন্যা সম্প্রদান না করিয়া, শ্রোত্রীয়েরই সহিত কার্য করিলেন।

ইহার পর রাসবিহারীর জীবদ্দশায় তাহার প্রবর্তিত নূতন রীতি অনুযায়ী আরো অনেকগুলি বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু দেশের লোক পরে কি জানি কি বুঝিয়া, সহসা গুরুতর গম্ভীর সাজিয়া স্ব স্ব কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাসবিহারীর চেষ্টা একেবারে বৃথা যায় নাই ; কারণ তাঁহারই পরিশ্রমের ফলে বর্তমান সময়ে কুলীন সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্যায় ঘর (ও কিয়ৎ পরিমাণে মেল) সম্বন্ধীয় বন্ধনগুলি উর্ননাভের জালবন্ধনের ন্যায় দুর্বল হইয়া গিয়াছে ; চিরবিবাহিতা বা যৌথ-পরিণীতা রমণীর সংখ্যাও এখন পূর্বের অপেক্ষা অনেক কম।

১৩০১ সনের ২৮ চৈত্র বাহাত্তর বৎসর বয়সে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার এই অনতিহ্রস্ব জীবনের প্রায় অর্ধাংশ তিনি অবলার দুঃখমোচনে ব্যয়িত করিয়া গিয়াছেন। জীবনের শেষ ভাগে যখন তাহার উৎসাহদাতা পৃষ্ঠপোষকেরা একে একে রণে পৃষ্ঠভঙ্গ হইলেন, যখন ইনি ত্রিংশৎবর্ষব্যাপী নিরুৎসাহময় কঠোর পরিশ্রমের পরে ঝটিকা নিক্ষিপ্ত ভূলুণ্ঠিত কপোতের ন্যায় লাঞ্ছিত পীড়িত ও জীবনান্ত অবস্থায় সমাজের এক প্রান্তে পড়িয়া ছিলেন। যখন সেই দুঃখসময়ে বুভুক্ষু আত্মীয়বর্গের অন্ন-সংস্থান চেষ্টায় তাম্রকূট-পাত্রস্থলী ও জীর্ণ যষ্টি করে লইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলেন, তখনো ইনি হতভাগিনী কুলীন কন্যাদের কথা বিস্মৃত হন নাই ; কারণ দেখা গিয়াছে সুযোগ পাইলেই ইনি কক্ষতল হইতে একখণ্ড কীটদষ্ট "বল্লাল সংশোধনী" বাহির করিয়া সমবেত লোকদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন ; আড়ম্বরশূন্য ক্ষুদ্র বক্তৃতা দ্বারা স্বীয় মতের সমর্থন করিতেন এবং পরিশেষে স্বরচিত হাস্যরসোদ্দীপক সঙ্গীত ভগ্নকণ্ঠে গান করিয়া "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করিতেন। আজও তাহার সেই তামাক পাতার পুঁটুলি, কীটদষ্ট-যষ্টি ও ভাঙাগলার কৌতুকাবহ সঙ্গীত অনেকের মনে আছে।

পরিশেষে তাহার রচিত কয়েকটি গান পাঠক-পাঠিকাদিগকে উপহার দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

শিশুবরের প্রতি বর্ষীয়সী কন্যার উক্তি (কৃষ্ণকান্ত পাঠকের সুর)

আর আমার কাজ কি বিয়ের সাজ পরিয়ে বৃদ্ধকালে।
শিশু বরের পাশে, কোন বা রসের ঘোমটা দিব পাকা চুলে।
গায়ে দিয়ে নামাবলী, গাই শিব-নামাবলী, নিয়েছি মালার ঝুলি হস্তে তুলে ;
ভাল ফললো ফল বল্লালীতে মিললো বর এক কচমা ছেলে
(হায়) লাঠি ভর করিয়ে, এ শিশু বরকে নিয়ে, কেমনে ঘুরবো আমি কলাতলে।
বলবো বা কি, বল্‌বো বা কি বল্‌বো বা কি এয়োকুলে।।
আমার এ অন্তঃকালে, ওর শুভদৃষ্টি হলে ছেলেটি ডরবে এ চাঁদ মুখ দেখিলে
নিয়ে দুগ্ধের বর কল্লে ঘর, ডাকবে সে ঠাকুর-মা বলে।।

বৃদ্ধ বরের প্রতি বালিকা কন্যার উক্তি। (ঐ সুর)

যাইলো সই অই অসুরে বরে হেরে ডরে মরে,
দিলে কাশটা যে আকাশটা ফাটে কাঁপে লাঠির বাঁশটা ঘরে।
সাজায়ে পাটকাপড়ে আটকায়ে মুকুট শিরে, বসলে মায়।
দেখিস বরে নয়ন ভরে।
দেখি পাটে সে মাথাটা ঢেকে পাটে বসেছে ঠাঁট করে।
মোটক সব ঘটকা এসে, শুনালে চোটকা ভাষে, বুড়োটা
ঠোঁট কাপায়ে হাস্য করে
আমি অন্তরেতে ডরিলো, তার মন্ত্র কইতে দন্ত নড়ে।।

কুলীন কন্যাগণের বিবাহ দর্শনার্থিনী প্রতিবেশিনীগণের উক্তি।

(গুরু চিন্তা কর মনরে দিনতো বয়ে যায়।। গানের সুর)

আয়লো আমরা কুলীন বাড়ির বিয়ে সবাই দেখতে যাই।
তোরা এমন বিয়ে দেখিস নাই।
শুনেছিস দানসাগর বিয়ে ; ওদের বিয়ে ঘটে তাই।।
নৈলে নিদেন পক্ষে বৃষোৎসর্গ একটি বৎস চারটি গাই।
দিবে এক বরেই চারটি মেয়ে লোকের মুখে শুনতে পাই
আহা ওদের কেমন কঠিন হিয়া পিতামাতার দয়া নাই।।

নিম্নলিখিত গানটি একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিয়া ছিলেন।

রাগিনী বসন্ত-তাল যৎ

বহুদিন পরে এসেছি চিনি না শ্বশুর বাড়ি
কোন পথে যাইব মাগো বিশ্বনাথ বাড়রীর বাড়ি
যারা ছিল ছেলে পিলে, তাদের হল ছেলে পিলে, বিয়ে
করে গেলাম ফেলে, বয়ে গেল বছর কুড়ি।
বাড়ি ঘর তার নাহি চিনি, কেবল শ্বশুরের নামটি জানি
উত্তরেতে বাগানখানি, সুপারি সব সারি সারি।
দ্বিজ রাসবিহারী বলে, আরত হাসি রাখতে নারি ;
তুমি যারে মা বলিলে সে বটে তোমারি নারি।।

একদা কোন শতাধিক বিবাহকারী কুলীন রাসবিহারীর আনীত প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করার প্রস্তাব কটু ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি রচনা করতঃ সর্বসমক্ষে গান করিয়া কুলীন প্রবরকে নাকাল করিয়া ছিলেন।

বাউলের সুর-তাল খেমটা

সুখ ভাল ভাই দেবীবরের ইজারায়
বল্লালের জমিদারির তহশীলদারী দেয় আমায়,
(দেখ) চারি কুড়ি ঘর সতিন প্রজা আছে আমার পরগণায়,
(ভোলা মন মনরে) তাতে মাঠে পথে বাজে লোকে কত বাজে কথা কয়ে যায়
(আবার) মফস্বলে কোন আমলা যদিবা মামলা বাঁধায়
প্রজার ভাই আসিয়ে, পায় ধরিয়ে, দিয়ে বাবরবদারী নিয়ে যায়।।

রাসবিহারী সম্বন্ধে তাহারই জীবদ্দশায় নিম্নলিখিত গানটি বিক্রমপুরের কুলীন কন্যারা দ্বিতীয় বিবাহ উপলক্ষে গান করিতেন ; অদ্যাপি সেই লক্ষ্ণৌ টুংরী গান অবলা কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া থাকে।

যদি বেঁচে থাকে মোদের রাসবিহারী
তবে সুখে রবে কুলীন-কুমারী।
বাড়ি ঘর ত্যজে, সমাজে সমাজে
একাজে ও কাজে করে দৌড়াদৌড়ি।
উপবাস বয়ে, উপহাস সয়ে
উপদেশ দিয়ে ফিরে বাড়ি বাড়ি।

কিন্তু হায়। কুলীন-কন্যাগণের সে আশা পূর্ণ হইল কৈ!

* *প্রদীপ-১৩০৭ শ্রাবণ*

সংযোজন ঃ

কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ বা কন্যাপণ নিয়ে উনিশ শতকের বাংলায় যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রভাব ঢাকা-বিক্রমপুরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। বিক্রমপুরের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ছিলেন (১৮২৫—১৮৯৪) কুলীন প্রথা বিরোধী আন্দোলনের ছিলেন অন্যতম পুরোধা। পরিবারের অভিভাবকদের চাপে তাঁকে আটবার বিবাহ করতে হলেও, পরবর্তীকালে এর বিরুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষ আন্দোলন সুরু করেন। "বল্লাল সংশোধনী" নামে একটি বই লিখেছিলেন। অনেক গানও রচনা করেন।

'ঢাকা প্রকাশের' ১৮৭৩ সালের ১১ মে "বঙ্গীয় কুলীন কুলবালার আক্ষেপোক্তি" বিষয়ক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে ছিল ঃ

"আমরা উপরিউক্ত বিষয়ে তিনটি মনোহর সঙ্গীত প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদ সহকারে এই স্থানেই গ্রহণ করিলাম। যাহারা সঙ্গীত রসজ্ঞ তাহারা অনুগ্রহপূর্বক একবার গান করিয়া দেখিবেন। এই প্রকার সঙ্গীত রচনার যতই আধিক্য হয়, সমাজের ততই মঙ্গল।... পথকরের মর্ম কিরূপ বুঝিতে পারিয়াছে, কেম্বেল সাহেবের ক্ষেত্রে কবিতা প্রভৃতির কিরূপ পরিচয় পাইয়াছে প্রথম সঙ্গীতটি তাহার সাক্ষ্যস্থল।... শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় গানটি বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবেন সন্দেহ নাই।

নিম্নস্থ সঙ্গীতটি শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত।

কুলীন কুমারীর উক্তি

রাগিণী-আলেয়া ঝিজিট, তাল-ঠেস কাওয়ালী

কেম্বল! কেন তোমার হল এমত উলট্ মত ;
এ ভারত রসাতলের পথ,
নাকি সেখানেতে শপথ কর,
এখানে তার কি পথ কর,
(কেবল) পথকর আর কর
সে পথ করের পথ।
নূতন নিয়ম তোমার সকল
নূতন মত নাহি মান কারো কথা,
বল নূতন নূতন কথা,
হিন্দুর মাথা খেয়ে নাকি উধাও রথ।
আসল পথে নাই তোমার কিছুই মত ;
বিদ্যাসাগর বিচার করে,
রাসবিহারী ঘুরে মরে,
আমাদের যে নয়ন ঝরে,
তার কি পথ?
আমরা কি আর মহারানির প্রজা নই,
মেয়ের প্রজা হৈয়ে মেয়ে। এত দুখের বোঝা বই,
কই কই করুণাময়ীর কৃপা কই,
(হল) মোদের দুখের কাহিনিতে কত বই,
সে সব বইগুলিকে পড়ে দেখ,
না হয় পার্লামেন্টে লিখ,
দেখ দেখ আমাদের
আমাদের নাই কোনও পথ।

এই প্রতিবেদনে উল্লিখিত অপর দুটি সঙ্গীতের একটিতে রাসবিহারীর উল্লেখ আছে। জনৈক নাগরিক লিখিত সঙ্গীতটি হল ঃ

রাগিণী-বাহার

কাম্বেলকে বিক্টরিয়ে রণে কর্ মা নিয়োজন,
বল্লালভূপ চেলা দলে করিতে দমন।
কাজ নাই শিখ সিপাইগণ,
কি কাজ গোলা বরিষণ
আইন আসি খরসান
করগো অর্পণ ;
বিদ্যাসাগর সেনাপতি রাসবিহারী হবে রথী,
মোরা কুলীন যুবতী, সেনা হব যে এখন।
ঘটক কটক সবে,
এথি ভয়ে মৌন রবে,
কুমন্ত্রণা শেষ হবে, না রবে কখন ;
দেবীবরে বেইদ্ধে করে
মেল দুর্গ ভেদ কৈরে,
বিক্টরিয়া জয়স্বরে
ভারতে হবে ঘোষণা।।

১৮৮২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত সঙ্গীত 'অনূঢ়া কন্যার উক্তি' ঃ
"তোরা আয়লো অলি কুসুম তুলি"
—এই গানের সুর।

তোরা বল দেখিলো এ বিপদে উপায় কি করি।
কবর বরণ বরাভরণ নিয়ে বিভূতির গুঁড়ি
বরকে দক্ষিণার বেলাতে দিতে (আট কড়া)
গেঁটে কড়ি আর মেটে হাড়ি।
বালুর শয্যা সে বরশয্যা, ভেবে লজ্জাতে মরি,
(বিয়ের) কুশণ্ডিকা না হতেই (বুড়র) কর্ণে কবে হরিহরি।
থাকতে রাজা এরূপ সাজা, রাজার বিচারত ভারি
এখন চল সকলে জানাই যেয়ে যা করে সে রাসবিহারী।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকায় ১২৮৫ সালের দ্বিতীয় সংখ্যায় একটি প্রতিবেদনে ছিল ঃ "অদ্য কিয়দ্দিন পরে বঙ্গীয় কুলীন সমাজের পুনর্বার শুভ দিন উপস্থিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি দর্শনে আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, সুখসূর্য ১২৮৪ সালের ২২শে শ্রাবণ উদিত হইয়া এদেশীয় কুলীন সমাজের দেবীবর পরিপোষিত মেল বন্ধন জনিত অনিষ্টকর তমসজাল বিদূরিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারই অক্ষুণ্ণ বিভাবলে অদ্য আমাদের শুভদিনের আবির্ভাব হইল। আমরা নিম্ন প্রকাশিত ঘটনাবলী দেখিয়া আহ্লাদে, হর্ষে বিস্ময়ে, যুগপৎ অভিভূত হইয়াছি। বস্তুত ঈদৃশ ব্যাপার সন্দর্শনে সুবিখ্যাত পরিশ্রমকারিতা ও অবিচলিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। এই মহানুভব যদি ইংলন্ড, জৈমনি, কি ইয়ুনাইটেড স্টেটের তুল্য কোন সুসভ্য জনপদে জন্মগ্রহণ করিয়া এইরূপ পর দুঃখ বিমোচনে এবং সমাজ

সংস্করণে তাঁহার অমূল্য জীবন বিসর্জন করিতেন, তবে ইহার নাম স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হইত। কিন্তু এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে প্রকৃত গুণের প্রশংসা নাই বলিয়াই রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এখনও আপন উদর নিবৃত্তি করিতে সক্ষম হইতে পারেন নাই। ইতিহাস পাঠে অনেক ধর্ম সংস্কারকের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের তুল্য সমাজসংস্কারক লোকের নাম প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তথাপি ইনি বঙ্গীয় সমাজের সম্যকরূপ সহানুভূতি প্রাপ্তি হইতে পারেন নাই। অতএব হে উৎসাহীন বঙ্গীয় সমাজ। তোমরা আর কতকাল মোহ নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবে। একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া গুণিজনের গুণের আদর করিতে অভ্যাস কর। আর প্রস্তাবনায় পটুতা দেখাইয়া কার্যকালে পশ্চাৎপদ হইও না। আমরা নিম্নলিখিত কার্যগুলি আহ্লাদ সহকারে সাধারণের গোচর করিতেছি। প্রথমত, বিগত ৫ ফাল্গুন সর্বানন্দী মেলীয় নৈকষ্য কুলীন কোলানিবাসী শ্রীযুত হরমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা, ফুলিয়া মেলস্থ নৈকষ্য কুলীন কুকুটিয়া নিবাসী শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্রের নিকট প্রদত্তা হইয়াছে। উক্ত বিবাহসভায় শ্রীযুত গিরিশচন্দ্র ঘটক সিংহ ও শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র ঘটকরাজ ও শ্রীযুত গুরুনাথ তর্কসাগর প্রভৃতি প্রধান প্রধান কুলাচার্যবর্গ উপস্থিত থাকিয়া কবিতা পাঠ ও কুলকীর্তন ঘটিত সভোচিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়ত ১৮ ফাল্গুন বজ্রযোগিনীনিবাসী পোষিলালবংশীয় শ্রীযুক্ত কালীকিশোর চক্রবর্তীর কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত তত্রগ্রাম নিবাসী মাশচটক বংশ সম্ভূত শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব সিদ্ধান্ত বাগীশের পুত্রকন্যার পরস্পর আদান-প্রদান হইয়া গিয়াছে। উক্ত বিবাহ সভাতেও প্রধান প্রধান কুলাচার্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আমরা একান্ত আগ্রহাতিশয় সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে এই সভাতে শ্রোত্রিয়াগ্রগণ্য মাশ্চটক ও পোষিলাল বংশীয় মহাশয়েরা এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, যে সকল কুলীন মেল ও পর্যায়ানুরোধে ধর্মশাস্ত্র বিগর্হিত স্বজনা ও বয়োজ্যেষ্ঠার পাণিগ্রহণ করিবেন, রজস্বলা কন্যাগণকে অদত্তা রাখিবেন, আমরা সেই সকল কুলীনে কন্য প্রদান করিব না। যদি শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বিশুদ্ধ মহাবলম্বী কুলীন সন্তান পাইতে পারি, তবে সেই সকল সৎপাত্রে আমাদের স্ব স্ব কন্যা প্রদানে বিশেষ যত্ন করিব, নচেৎ সৎ পাত্রাভাবে তুল্য তুল্য রূপে আদান প্রদান করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিব। এই প্রতিজ্ঞা দ্বারা বিশেষ উপলব্ধি হইতেছে যে, যদি উক্ত শ্রোত্রিয় মহাশয়দিগের অঙ্গীকার সর্বতোভাবে প্রতিপালিত হয়, তবে অচিরকাল মধ্যেই শ্রোত্রিয়দিগের সমাজ হইতে কন্যাপণ উঠিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তৃতীয়ত ২৩ ফাল্গুন মাইজপাড়া নিবাসী বল্লভীমেলীয় বিখ্যাত নামা শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সহিত খড়দহ মেলস্থ বাঘিয়ার গাঙ্গুলি রমাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের বংশ সম্ভূত সিংহপাড়া নিবাসী শ্রীযুত জয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রকন্যা এবং ফুলিয়া মেলের শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সন্তান হাসারানিবাসী শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র ও পৌত্রীর সহিত পরস্পর একযোগে তিন মেলে আদান প্রদান অতি সমারোহের সহিত নির্বাহ হইয়া গিয়াছে। এইসভায় শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র ঘটকরাজ ও শ্রীযুত কালীনাথ কবিসাগর শ্রীযুত গুরুনাথ তর্কসাগর ও শ্রীযুত বজ্রনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি কুলাচার্যগ্রগণ্য মহোদয়গণও বিক্রমপুর, দক্ষিণ বিক্রমপুর এবং বাকলা প্রভৃতি সমুদয় স্থানের ঘটকগণ উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কবিতাপাঠ ও রীতিমত বক্তৃতা করিয়া আট আনা সহচারে বিদায় গ্রহণপূর্বক উভয়পক্ষীয় কর্মকর্তাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভাভঙ্গ করিয়াছিলেন। এই কার্য দ্বারা শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় সাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে উপরিউক্ত কার্যগুলি একমাত্র রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রযত্নে অক্ষুণ্নভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। উপসংহারে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, যাহারা মনে মনে, রাসবিহারীবাবুর বিশুদ্ধ মতের পোষকতা করিয়া আসিতেছেন, তাহারা

কার্যদ্বারা স্ব স্ব মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে শিক্ষিত সমাজের ধন্যবাদার্হ হইতে যত্ন করুন।"

১. বঙ্কিমবাবু তাঁহার "কৃষ্ণ চরিত্র" নামক বৃদ্ধ বয়সের গ্রন্থে 'কৃষ্ণের বহু বিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, —"আমিও বিচারে কোথাও পাই নাই যে পুরুষের বহু বিবাহ সকল অবস্থাতেই অধর্ম। ইহা নিশ্চিত যে সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম। * * * আমার বিশ্বাস আমরা যেমন বিলাতের কাছে অনেক শিখিতে পারি, বিলাতও আমাদের কাছে অনেক শিখিতে পারে। তাহার মধ্যে এই বিবাহ-তত্ত্ব একটা কথা।"

গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী তাঁহার Hindu Law নামক পাণ্ডিত্য-পূর্ণ গ্রন্থে তেমনি তীব্র ভাষায় লিখিয়াছেন ঃ "The Hindu Law permits a man to have more wives than one at the same time, although it recommends monogamy as the best form of conjugal life. The Hindu institutions are founded on the requirements of the diversified human nature and condition, and ought not to be lightly interfered with at the instance of persons distinguished by egotistic sentimentalism and spirit of intolerance. * * * It is far better that those men of property that are impelled by inclination should take the responsibility of openly having several wives than that they should secretly contract as many left-handed marriages as they please." Hindu Law. (page 70)

২. আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা শান্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্।।

৩. কুলজী শাস্ত্র অর্থাৎ কৌলীন্য শাস্ত্রের সর্বপ্রধান গ্রন্থের নাম 'মিশ্রগ্রন্থ'। উহাতে ঘটকদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায়, সেকেলে তুলট কাগজের অনেক হস্ত লিখিত বইই সীসার অক্ষরে উঠিয়াছে। কিন্তু এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থটি আজ পূর্যন্ত বুঝি 'আত্মারাম', 'সীতারাম', 'রামানন্দ', 'রামজীবন' প্রভৃতি রামনামের গুণে ছাপাখানার ভূতদিগের হাতে পড়ে নাই।

৪. রাসবিহারীর প্রথম আট বিবাহ তাঁহার পরাধীন দশায় ও অজ্ঞানাবস্থায় সংঘটিত ; সুতরাং যে সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু তাঁহার এই শেষের ছয় বিবাহ সমর্থন করিবার সাহস বা প্রবৃত্তি আমাদের নাই। তবে বিচারকের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই সময়ে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে দারিদ্র্যের কশাঘাত হইতেছিল ও পুরোভাগে বিবাহলভ্য টাকার তোড়া লম্বমান ছিল।

৫. কুলীন দুই প্রকার : নৈকষ্য ও ভঙ্গ। যে সকল কুলীনের কুল মর্যাদা ষোল আনা বজায় আছে, তাহাদিগকে "নৈকষ্য কুলীন" বলে। এই নৈকষ্য কুলীনই যদি অর্থলোভে বা অন্য যে কোন কারণে বংশজের কন্যা বিবাহ করেন, তবে তিনি "ভঙ্গ কুলীন" নামে আখ্যাত হন। এতদ্ব্যতীত এই ভঙ্গ কুলীনের মেয়ে বিবাহ করিলেও নৈকষ্য-কুলীন "ভঙ্গ" হয়েন। ভঙ্গ কুলীন অপেক্ষা নৈকষ্য কুলীনের সম্মান অনেক বেশি। সাত পুরুষ যাবৎ ভঙ্গ-কুলীন বংশজ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। তখন পূর্বে যিনি 'বাড়ুয্যে' ছিলেন, তিনি 'বাড়রী' হয়েন ; এইরূপ মুখুজ্যার পদ্ধতি 'মুখটি' ও চাটুজ্যার পদ্ধতি চাটাতিতে পরিবর্তিত হইয়া যায়। কিন্তু আজকাল ইংরেজি শিক্ষার উত্তাপে সমাজ-বন্ধন শিথিল হওয়াতে ও অর্থবল বা পদ-গৌরবের প্রাধান্যই সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করাতে এই metamorphosis কার্য অনেক সময়েই হইতে দেখা যায় না।

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত রজতনির্মিত বিষ্ণুমূর্তির বিবরণ

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত



আজ প্রায় তিন বৎসর হইল বিক্রমপুরান্তর্গত মুন্সিগঞ্জ থানার এলাকাধীন চূড়াইন গ্রামে মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে এই মূর্তিটি পাওয়া গিয়াছিল। সে গ্রামবাসী বারুইগণ তাহাদের কোন একটি বোরোজ নির্মাণের জন্য নিকটবর্তী একটি শুষ্ক পুকুর খনন করিতে করিতে ইহা প্রাপ্ত হয়। দীর্ঘকাল মৃত্তিকাভ্যন্তরে থাকায় ইহা এতদূর বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল যে ইহা কোন ধাতুতে নির্মিত তাহা প্রথমে কেহই ঠিক করিতে পারেন নাই। পরে ঢাকা নগরীতে নীত হইলে সেখানকার কর্মকারগণ বহু পরিশ্রমে ইহার মিলনত্ব দূরীভূত করিতে সমর্থ হয়। মূর্তিটি রাজার তৈরি, উচ্চে ১২/১৪ ইঞ্চির অধিক হইবে না। প্রাচীন ভারতের শিল্পনৈপুণ্য যে কতদূর লোচনানন্দদায়ক ও উন্নতির কত উচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত ছিল, এই মূর্তিটি হইতে তাহা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।

'চুড়াইন' বা 'চূড়ায়ণি' গ্রাম বিক্রমপুরের সুপ্রসিদ্ধ সেনবংশীয় নরপতিগণের রাজধানী রামপালের অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রামস্থ 'দেউলবাড়ি' (দেবালয়) নামক স্থানে অদ্যাপি বহু ইষ্টকস্তূপ এবং ভগ্ন দেবমন্দিরাদির কঙ্কাল-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি ঐ গ্রামের মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতেই পুনরায় আর একটি প্রাচীন অট্টালিকার একটি অভগ্ন কক্ষও প্রকাশিত হইয়াছে। বিক্রমপুর যে প্রাচীনকালে মহা সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল দিন দিন প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে বিস্মিত ও চমকিত করিতেছে। বিক্রমপুরের বহু গ্রাম হইতেই এইরূপ নব নব আবিষ্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। 'কামারখাড়া' নামক গ্রামেও আজ প্রায় ৭/৮ বৎসর হইল একটি অষ্টধাতু নির্মিত বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়াছিল। ঐ দেবমূর্তির কারুকার্যও নয়ন-মন-মুগ্ধকর।

চূড়াইন গ্রামে প্রাপ্ত এই রজতনির্মিত বিষ্ণুমূর্তি খানা এখন গবর্নমেন্টের অধিকারে ঢাকার কালেক্টরিতে রক্ষিত আছে। উহা পাইবার জন্য উক্ত গ্রামের হিন্দু অধিবাসীবৃন্দ গবর্নমেন্টের নিকট আবেদন করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় যে উহা নাকি লন্ডন নগরস্থ কেন্সিঙ্গটন নামক যাদুঘরে রক্ষার জন্য প্রেরিত হইবে।

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বনমালাবিভূষিত, বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান সৌম্য শান্ত হাস্যময় এই বিষ্ণুমূর্তি যিনি দেখিয়াছেন তাহাকেই বিস্ময়াবিষ্ট নয়নে ইহার লোচনান্দদায়ক শিল্প নৈপুণ্য দৃষ্টে প্রাচীন ভারতে শিল্পের অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্য অনুভব করিয়া বর্তমান অবনতির দিকে লক্ষ্য করিয়া দুঃখে ম্রিয়মান হইতে হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষগণের নিকট ইহা প্রথমে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা ইহাকে মহারাষ্ট্রিয় শিল্প বলিয়া এবং ৮০০/৯০০ শত বৎসর পূর্বে নির্মিত এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় কিন্তু তাহাদের এ উক্তি যথার্থ বলিয়া অনুমিত হয় না। কারণ ইহার সহিত মহারাষ্ট্র শিল্প অপেক্ষা মাদ্রাজ অঞ্চলের দেবমূর্তি সমূহেরই অধিকতর সৌসাদৃশ্য অনুভূত হয় বোধ হয়। যাহারা দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করিয়াছেন তাহারাও চিত্রদৃষ্টে আমাদের এ মন্তব্য অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।

* *প্রবাসী-১৩১৬ জ্যৈষ্ঠ ; ২য় সংখ্যা*

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির বিবরণ সম্বন্ধে মন্তব্য ঃ ভ্রম-প্রদর্শন

গত জ্যৈষ্ঠমাসের প্রবাসীতে "বিক্রমপুরে প্রাপ্ত রজত নির্মিত বিষ্ণুমূর্তির বিবরণ" প্রবন্ধে যে "এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষগণের নিকট ইহা প্রথমে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা ইহাকে মহারাষ্ট্র শিল্প বলিয়া এবং ৮০০/৯০০ শত বৎসর পূর্বের নির্মিত এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন"। ইহা লিখিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত নহে, লেখক মহাশয় এই বিবরণ কি সূত্রে সংগ্রহ করিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। এই মূর্তি সম্বন্ধে এশিয়াটিক সোসাইটির সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুক্ত J. Henry Burkill. M.A. মহাশয় যে অভিমত প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে মহারাষ্ট্র শিল্প বলিয়া বলেন নাই, শুধু দাক্ষিণাত্য শিল্প বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এস্থলে আমারা তাহার অভিমতের অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"The statuette appears to be about 100-150 years old and looks as of Southern India workmanship."

পরিশেষে বক্তব্য এই বার্কিল মহোদয় যে ইহা ১০০ হইতে ১৫০ বৎসরের মধ্যে নির্মিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু এই মূর্তি যে ইহা অপেক্ষা আরও বহু পুরাতন সময়ের তদ্বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

তরণীকান্ত চক্রবর্তী সরস্বতী

* *প্রবাসী* ; *আষাঢ়*-১৩১৬ ;

বিক্রমপুরের দাসত্ব-প্রথা



বিখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ঠাকুরদা গুরুচরণ মহলানবিশের জন্ম ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং সমকালের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর "আত্মকথা" ক্ষুদ্র আকারের হলেও, বাঙালি জীবনের অসাধারণ ছবি ধরা আছে বইটিতে। বিক্রমপুরের দাসদাসী প্রথাও ভরার মেয়ে প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : "আমার মাতামহ রাধামোহন গাঙ্গুলি মহাশয় সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তাহাদিগের বাড়িতে দাসদাসী ছিল, বাড়িতে দোল দুর্গোৎসবাদি পূজা হইত। একসময়ে (১৮৩৬) ওলাওঠা রোগে আমার মাতামহ, মাতামহী এবং বড় মাতুল ও এক মাসীমাতার মৃত্যু হওয়াতে বাড়ি একেবারে শূন্য হইয়া পড়ে। তখন আমার ছোট মাতুল হরচন্দ্র গাঙ্গুলি মহাশয় এবং এক মাসীমাতা মাত্র জীবিত ছিলেন। তাহারা উক্ত বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের বাড়িতেই আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাহাদিগের নিজ বাড়িও আমাদিগের পাড়াতেই ছিল। মাতুল মহাশয়ের বাড়িতে যে সমস্ত প্রাচীন দলিল ছিল তাহা আমাদিগের বাড়িতেই আনিয়া রাখিয়া দিলেন। তাহার মধ্যে একখানা দাসখত আমি ছেলেবেলায় দেখিয়াছিলাম। সে সকল লোকের নাম এবং দলিলের ভাষা আমার ঠিক স্মরণ নাই। আমার বৃদ্ধ প্রমাতামহ বিষ্ণুরাম গাঙুলি মহাশয়ের নামে একজন দাস এই মর্মে দলিল লিখিয়া দিয়াছিল যে, আমি অত্যন্ত দৈন্যদশায় পতিত এবং ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ঋণশোধের অন্য উপায় না থাকায় আমি সস্ত্রীকসন্তানসহ আপনার নিকট নগদ সিক্কা মবলগ ৩০ ত্রিশ টাকা পাইয়া এই খত লিখিয়া দিতেছি যে আমি এবং স্ত্রী সন্তানগণ যতকাল জীবিত থাকিব, আমরাও আপনার দাসত্বে নিযুক্ত থাকিবে, ইহার পর আমার বংশধরগণ বংশপরম্পরায় আপনার বংশধরগণের দাসত্বে নিযুক্ত থাকিবে। কখনোকেহই আপনার বংশধরগণের দাসত্ব পরিত্যাগ করিতে পারিবে না; যদি কাহারো যাইতে নিতান্ত ইচ্ছা হয় তবে পাঁচমণ রসুনের খোসা আপনার বংশধরগণকে দিয়া যাইবে নতুবা কখনও যাইতে পারিবে না। আপনি আমাদিগের বাসস্থান দিবেন এবং চিরকাল ভরণপোষণ করিবেন। আমার ছেলেবেলায় আমি এই দাস পরিবারের তিনটি লোককে দেখিয়াছি (আমার মাতামহের বাড়ির সংলগ্ন জমিতেই ইহাদিগের বাসগৃহ ছিল) একটি বৃদ্ধা বিধবা গৃহিনীর একটি পুত্র এবং একটি বিধবা কন্যা ছিল। আমার ছেলেবেলায়ই সেই বৃদ্ধা এবং বৃদ্ধাটির পুত্রের মৃত্যু হইয়াছিল। কেবল সেই বিধবা কন্যাটি অনেককাল জীবিত ছিল। তাহার নাম ছিল মোক্ষদা। আমার মাতাঠাকুরাণীকে যে পিসিমা বলিয়া ডাকিত। আমার মা তাহাকে ক্ষেমী বলিয়া ডাকিতেন। সে আমার মাতা ঠাকুরানির সেবা শুশ্রূষা করিত। আমার জ্যেষ্ঠ ভাইবোন এবং আমাকে লালনপালন করিত। সে আমাদিগকে ভাইয়ের ন্যায় ভালবাসিত। কখনো আমরা কথা না শুনিলে আমাদিগকে প্রহারও করিত। আমি তাহাকে ক্ষেমী বোন (ক্ষেমী ভগ্নী) বলিয়া ডাকিতাম। আমি কখনো তাহাকে মারিতাম, সে আমার সকল অত্যাচার সহ্য করিত। কখনও আমি নিতান্ত অবাধ্য হইলে মাতা ঠাকুরানির নিকট বলিত "আমি ওর সঙ্গে পারি না"। তাহার একটি কন্যা ছিল। তাহাকে ভিন্ন গ্রামে বিবাহ দিয়াছিল। শেষে তাহার কন্যা ও জামাতাও আমাদিগের পাড়াতেই আসিয়া বাস করিয়াছিল। বৃদ্ধাবস্থায় সেই কন্যার বাড়িতেই সে বাস করিত। আমার প্রায় ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত সে জীবিত ছিল। তখন তাহার বয়স ৮০ বৎসরের অধিক

হইয়াছিল। আমি দেশে গেলে সে আমার সহিত দেখা করিতে আসিত। আমিও তাহাদিগের বাড়িতে যাইতাম। কিছু অর্থ দিলে আমাকে আশীর্বাদ করিত। সে শূদ্রকন্যা আর আমি ব্রাহ্মণ এ প্রভেদ আমার বোধ ছিল না। আমার অধিক বয়সের সময়ও আমি যখন দেশে যাইতাম তখনো দেখা হইলে 'তুই কবে আইচ্ছ' (তুমি কবে বাড়িতে আসিয়াছ) এইভাবে সম্বোধন করিত, তাহা আমার বড়ই মিষ্ট বোধ হইত। এখনো তাহার সেই অকৃত্রিম স্নেহের কথা মনে হইলে আমার চক্ষে জল আসে। দাসদাসীর কথা মনে হইলেই আমাদিগের মনে কেমন একটা খারাপ ভাবের উদয় হয় বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য নিষ্ঠুর দাস ব্যবসায়ের ন্যায় আমাদিগের দেশের দাসপ্রথা নিষ্ঠুর ছিল না। দাসদাসীগণ প্রভুর স্নেহের পাত্রপাত্রী ছিল। কখনো কোনো দাসদাসী অবাধ্য হইলে অথবা চরিত্র দোষ হইলেই মারধর হইত, কিন্তু প্রাচীন গৃহিনীরা দাসদাসীগণকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এখন এই বিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল আলোকের মধ্যে কেহই সেই দাসপ্রথা সমর্থন করিতে পারে না। কিন্তু আমাদিগের দেশের প্রাচীন প্রথায় উভয়পক্ষের মধ্যেই বড় সুবিধা ছিল। প্রভূদের সংসারে কাজকর্মের জন্য কোন চিন্তা করিতে হইত না, কেন না দাসগণের দ্বারা সকল কর্মের সুবিধা হইত। দাসগণের পক্ষেও কি খাইব, কি পরিব সেই চিন্তা ছিল না। দাসগণের পক্ষে আরেকটা মহদ্ভাব ছিল যে তাহারা স্বীয় পরিবারের ভরণপোষণের জন্য এবং শোধের জন্য আত্মবিক্রয় করিয়া চিরদিনের জন্য অধীনতা স্বীকার করিত। তথাপি কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া কখনো চুরি-ডাকাতি করিত না। এটাতে বড়ই মহত্ব ছিল।

•

সতেন্দ্রকুমার দাস 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকায় একটি দলিল উল্লেখ করিছিলেন ঃ

বিক্রমপুরের সাহিত্য-সেবার একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়নের উপকরণ সংগ্রহার্থে আমরা বহুদিন হইতে বিক্রমপুরের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতেছি। আমাদের পরিশ্রম ও চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। আমরা এ পর্যন্ত অনেকগুলি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি, প্রাচীন রাগ-রাগিণী সংযোজিত পদাবলী, কতকগুলি প্রাচীন চিঠিপত্র, হিসাবের ফর্দ ও কয়েকখানি প্রাচীন দলিল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এগুলি সংগ্রহ করিতে আমাদিগকে যথেষ্ট অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। ধীরে ধীরে আমরা সেগুলির পরিচয় সাময়িক সাহিত্যের মধ্য দিয়া পাঠকমণ্ডলীকে উপহার দিতেছি।

আজ একখানি প্রাচীন দলিলের কথা বলি। ইহা একখানি আত্মবিক্রয় পত্র। অতি প্রাচীন যুগ হইতে যে ভারতবর্ষে অন্যান্য দেশের ন্যায় দাস-বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্বেতকায় আর্যগণ যে কৃষ্ণকায় অনার্যদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অনেক সময় দাসে পরিণত করিতেন, তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়।[১]

এই গেল অতি প্রাচীন যুগের কথা। ইহা ছাড়াও সর্বদেশে, সর্বকালে সমাজের কোন না কোন স্তরে দাসত্ব-প্রথার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

আমরা জানিতাম যে দাসত্ব প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রতিদিন নব নব দাসত্ব-প্রথার দলিল আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইতে দেখিয়া, এখন আর তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। মনে হয় এখনও প্রচ্ছন্নভাবে সমাজের মধ্যে দাসত্বপ্রথা প্রচলিত আছে। অন্ততঃ পিনাল কোডের ধারা বিধিবদ্ধ হওয়ার পরেও যে ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অদ্য যে দলিলখানির কথা পাঠকসমীপে প্রকাশ করিতেছি, তাহা আমরা বিক্রমপুরে পরিভ্রমণের সময় মালপদিয়া গ্রামের একজন দরিদ্র গৃহস্থের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলাম।

দলিলখানির অনেকাস্থান কীটদষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার আকার ৪" × ১৬। প্রাচীন বাংলা অক্ষরে লেখা।

এক্ষণে আমরা দলিলখানি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি।

"শ্রীমহিমেমহার্নবেসু ॥
শ্রীযুত কালিকৃষ্ণ দেবশর্ম্ম ॥
সাকিন জহিসার ॥

আস্ত বিক্রিপত্র নিবেদ্নাঞ্চ মেতৎ ॥

ইতি—
শ্রী গোকুল ঢুলি বকলম
লে শ্রীরামচন্দ্র দৈবজ্ঞ।

আমি শ্রীগোকুল ঢুলি[২] আপোনের অদ্দ রোজ হৈতে নফল হৈল ॥ আপোনে জে করিবে আমারে জে অন্ন বছ্র দিআ পির্ত্তিপালোন করিবে আমি সছন্দে এবং বাজিরকবতে আক্রেবল তবিয়তে আমার ইচ্ছা পুর্ব্বক আমি আপোনার কাছে মবলগ সমোট ২০ কুড়ি রূপইয়া পায়া আস্তবিক্রি পত্র লিখিয়া দিলাম ॥ জত জোগ কাল আমি বাচিমু আপোনে লওয়াজিমা খোর পোষ দিআ নফরী করাতে রহ ॥ জদি এহি মেদ মৈর্দ্দে তবিয়তে খালাস করিতে চাই তবে সোওয়া দুই কুড়ি রূপয়া আর সোয়ামোন হলিদ দিতে রাজি রহ ॥ ইতি ॥ সোন ১১২১ একশ সাল ॥ ইতি বিতারিখ মাহে মাহে দোয়াজা বসাক ॥ দলিলং লিখকং নাস্তি দোষঃ ॥ ইতি দলিলং লিখকং শ্রীরামচন্দ্র দৈবজ্ঞ ॥"

এই দলিল হইতে পরিষ্কারই বুঝা যায় যে গোকুল ঢুলি নামক কোনও ব্যক্তি কালীকৃষ্ণ দেবশর্মার নিকট নিজকে কুড়ি টাকায় বিক্রয় করিয়াছিল। দলিলের শেষের তারিখ [১১২১ সনের ২ রা বৈশাখ?] দেখিলেই ইহার প্রাচীনতার সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়।

এই 'জহিসার' কোথায়? বিক্রমপুরে 'সার' শব্দান্ত গ্রামের নাম যথেষ্ট আছে, তন্মধ্যে 'মহীসার' একটি। এই 'জহিসার' মহিসারের অপভ্রংশ হইতে পারে নাকি?

মালপদিয়া গ্রামের (যে গ্রামে দলিলখানা পাওয়া গিয়াছে) পশ্চিমেই 'জৈনসার' নামক একটি গ্রাম আছে। কিংবদন্তী আছে, এগ্রামে নাকি জৈনদের একটি স্তূপ ছিল। আমাদের অনুমান, এই জৈনসার দলিলে 'জহিসার' বলিয়া লিখিত হইয়াছে। অমত থাকিবার ত কিছুই না। তবে যদি কেহ ইহাতে অমত করেন, আমাদের জানাইলে সুখী হইব। আমরা তাহাকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ দর্শাইব।

দলিলের ভাষা সম্বন্ধে আমার নিজের কিছু বক্তব্য, নাই। প্রাচীন জিনিস আবিষ্কার করিয়াই আমি খালাস, ভাষা ইত্যাদির বিচার করিবেন বিশেষজ্ঞরা।

* *মানসী ও মর্মবাণী ; আষাঢ়-১৩৩৪*

পূর্ববঙ্গে ও বিক্রমপুরে ভরার মেয়ে বিক্রি প্রথা : একসময়ে শ্রোত্রীয় ও বংশজ ব্রাহ্মণের মধ্যে কন্যাপণ এত অধিক হইয়াছিল যে এত অধিক পণ দিয়া অনেকেই বিবাহ করিতে পারিতেন না। বিক্রমপুরের কন্যাদিগের মূল্য ৬/৭ শত এবং বয়স অধিক হইলে আরও অধিক, এমন কি ১০০০/১২০০ টাকা স্থল বিশেষে হইত। ত্রিপুরা জিলা প্রভৃতির মেয়েদিগের মূল্য ৩০০/৪০০/৫০০ টাকা হইত। এজন্য অনেক শ্রোত্রীয় বংশজ ব্রাহ্মণ বিবাহ করিতে না পারিয়া নির্বংশ হইয়া যাইত। তাই শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান হইতে কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ কোথাও বা অন্য জাতির লোকেরা উপবীত ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ সাজিয়া মেয়ে বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া ৮/৯ হইতে ১২/১৩ বৎসর বয়স্কা ১০/১২টি মেয়ে লইয়া বিক্রমপুর অঞ্চলে আসিত। ইহার মধ্যে অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ (দাসের ব্রাহ্মণকন্যাও থাকিত), শুনিয়াছি স্থল বিশেষে ২/১টি অন্যজাতীয় কন্যাও থাকিত। সকলকেই তাহারা ব্রাহ্মণের কন্যা বলিয়া পরিচয় দিত। একবার নাকি একটি কন্যার বিবাহের পর তাহার কথাবার্তা শুনিয়া লোকে তাহাকে মুসলমানের কন্যা বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। সেই মেয়েটি

নাকি প্রদীপকে চেরাগ, জলকে পানি ইত্যাদি বলিয়াছিল। এ সম্বন্ধে বিক্রমপুরের একজন প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক স্বর্গীয় রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যবসায়ীদিগের নৌকা বিক্রমপুর আসিলেই চতুর্দিকে জনরব হইত যে অমুকস্থানে ভরার মেয়ে আসিয়াছে। তখন বিবাহার্থী ব্রাহ্মণদিগের লোক সেই নৌকায় যাইয়া উপস্থিত হইত। এক একটি মেয়ের জন্য ১০০, ১৫০, ২০০ এবং স্থল বিশেষে ২৫০ টাকা পর্যন্ত হইত। বিক্রেতারা প্রথমে কিছু কম দরে বিক্রয় করিত। তাহার পর যতই বিক্রেতা সংখ্যা অধিক উপস্থিত হইত ততই তাহারা মূল্যবৃদ্ধি করিতে থাকিত। এবং যে সকল মেয়ে দেখিতে সুশ্রী এবং বয়স অধিক তাহাদিগেরই মূল্য অধিক হইত। এইরূপে শ্রোত্রীয় ও বংশজ ব্রাহ্মণেরা বংশরক্ষা করিত্। এইরূপে ভরার মেয়ে বৎসরে একবার কখনও বা দুইবারও আসিত। ...

আত্মকথা—গুরুচরণ মহলানবিশ। ডঃ নরেশচন্দ্র জানা, ডাঃ মানু জানা ও কমলকুমার সান্যাল সম্পাদিত। পৃঃ ৮১-৮৩

---

১. "বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা"—শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত। "সাহিত্য"—১৩২০, ভাদ্র।

২. 'ঢুলি' কোনও পদবি আছে কিনা জানি না। বোধহয় যাহারা 'ঢোল' বাজাইয়া থাকে তাহারাই ঢুলি।—শ্রীনঃ'।

দুটি গ্রামের চালচিত্র



ভরাকৈর ঃ

বিক্রমপুরের দক্ষিণে পদ্মানদীর উত্তর তীরে বর্ধিষ্ণু গ্রাম ভরাকৈর এবং সাওগাঁও। খুব বড় গ্রাম নয়। গ্রামের উত্তরে কলমা ও ডহরি গ্রাম, পূব দিকে বিধুয়াইল, দক্ষিণে তেলিরবাগ (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের পৈতৃক গ্রাম) ও বহর এবং পশ্চিমে ভরাকৈর খাল ও ধাইদা গ্রাম। একসময় ভরাকৈর গ্রামের বিভিন্ন পাড়া এইভাবে পরিচিত ছিল : কবিরাজপাড়া, পোদ্দারপাড়া, চাটুজ্যেপাড়া, মৌলিকপাড়া, চক্রবর্তীপাড়া, ঘোষেরপাড়া, রায়েরপাড়া, চাঠাতিপাড়া। তাছাড়া কয়েকটি সুপরিচিত বাড়ি ছিল—দারোগা বাড়ি, বিশ্বেশ্বর কবিরাজের বাড়ি, নয়া বাড়ি, দেবেন্দ্র সেনের বাড়ি, জ্যোতিষা বাড়ি, মুখুটি বাড়ি, নাথ বাড়ি, নাজির বাড়ি, চৌধুরী বাড়ি, উকিল বাড়ি, বাড়ুয্যে বাড়ি, কাশী বোসের বাড়ি এবং ঘটক বাড়ি।

সাওগাঁও-এর দুটি পাড়া—উত্তর পাড়া ও দক্ষিণ পাড়া। এই গ্রামের সুপরিচিত বাড়িগুলির মধ্যে ছিল সেন বাড়ি, মনসি বাড়ি, ডাক্তার বাড়ি এবং চক্রবর্তী বাড়ি। মুসলমান পাড়া সেকালে সীমাবদ্ধ ছিল গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে বড়খাল ও ভরাকৈর খালের কাছে। তাছাড়া গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব দিকে কয়েকঘর মুসলমান অধিবাসী ছিল। বিক্রমপুরের যেসব এলাকা পদ্মাগর্ভে একসময় বিলীন হয়ে গিয়েছিল, সেইসব গ্রামের মানুষজন নতুন নতুন গ্রাম পত্তন করে। সেরকমই দুটি গ্রাম হল ভরাকৈর ও সাওগাঁও। গ্রামের উত্তর পূর্বে গোবিন্দ ভিটা, কুণ্ডের ভিটা, সূর্যনারায়ণের ভিটা, শিকারি ভিটা—একসময় ছিল জঙ্গলময়। জনশ্রুতি এই জঙ্গলে বাঘও দেখা যেত। গ্রামের প্রাচীন অধিবাসী ছিলেন কমল বিশ্বাস, গৌরধূপী, রাজমোহন মুখুটি এবং কৈলাশ মুখুটি। গ্রামের বিভিন্ন বর্ণের মানুষদের মধ্যে ছিলেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নাথ, মালাকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, রাজমিস্ত্রি, গোয়ালা, নরসুন্দর, কর্মকার, রজক, তন্তুবায়, বারুজীবী, মৎসজীবী, ভুঁইমালী, গন্ধবণিক, সুবর্ণ বণিক, নমঃশূদ্র, কাউলি (ঢোলবাদক), মাল প্রভৃতি। মাল সম্প্রদায়ের পুরুষ নারী ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াত। কোথাও স্থায়ীভাবে থাকত না। নৌকার ওপর বাস করত।

ভরাকৈর গ্রাম আড়িয়ল বিলের কাছেই। মাঠের আল ও খাল ধার দিয়ে লোক চলাচল করত। বর্ষার সময় খালবিল জলে ভরে যেত। মাঠঘাটও জলে একাকার হয়ে গ্রামের দৃশ্যটিই যেত বদলে। সে সময়ে এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে যেতে নৌকার ব্যবহারই ছিল অপরিহার্য। গ্রামের সব বাড়িতেই নৌকা থাকত। সেকালে রাস্তাঘাট তেমন ছিল না। ফলে সাইকেলও তেমন দেখা যেত না। স্থলপথে চলাচলই ছিল অসম্ভব। মহিলাদের যাতায়াতের জন্য ছিল পালকি বা ডুলি। এই ডুলি বা পালকি বহন করত বিহারীরা। শীতের আগেই তারা এসে ভরাকৈর বাজার, চক্রবর্তী বাড়ি, দারোগা বাড়ি এবং নাজির বাড়ির সামনে অস্থায়ী বাসস্থান তৈরি করত। বর্ষার শেষে শুকনোর সময়ের যাতায়াত তেমন স্বচ্ছন্দ ছিল না। গ্রামের পশ্চিম দিকে কলমা পর্যন্ত একটা রাস্তা (হালট) ছিল। সেই রাস্তার পাশে ছিল চণ্ডীতলা। গোবিন্দ ভিটার পশ্চিমেও একটি হালট ছিল। মৌলিক পাড়া থেকে একটি সড়ক বাজারের পাশ দিয়ে ঘোষবাড়ির পশ্চিম ও উত্তর প্রান্ত হয়ে কলমা গ্রামের দিকে চলে যায়। সড়কটি ব্যক্তিবিশেষের

জমির ওপর দিয়ে গেলেও, পরে ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও জনসাধারণের অর্থে সড়কটি নির্মিত হয়।

গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে প্রবাহিত ভরাকৈর খালের একটি শাখা গ্রামের ভিতর দিয়ে কলমা গ্রাম পর্যন্ত চলে যায়। এর ছিল অনেক শাখা প্রশাখা। এইসব খালের ওপর কাঠের পুল বা বাঁশের সাঁকো বানিয়ে লোকজন যাতায়াত করত।

পানীয় জলের পুকুরের অভাব ছিল না। এইসব পুকুরে স্নানও করা হত। যে কারণে প্রত্যুষে মেয়েরা খাওয়ার জল আগেই সংগ্রহ করে নিত। লোকে জামাকাপড় 'কাচত খালের ঘাটে বা বাড়ির পিছনের ডোবা জাতীয় ছোট পুকুরে। পরে যখন বাজারে একটি নলকূপ বসান হলে, তখন জলকষ্ট সামান্য দূর হয়ে যায়।

প্রথম থেকেই ভরাকৈর ছিল বিক্রমপুরের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র। স্থানীয় যোগী বা নাথরা তাঁতের শাড়ি গামছা বুনতো, মালাকররা শোলা, রাংতা ও কাগজ দিয়ে নানারকম দ্রব্য তৈরি করত। এখানকার ডাকের সাজ একসময় ছিল বিখ্যাত। দারু শিল্পে ভরাকরের খ্যাতি ছিল বহুদূর বিস্তৃত। তাছাড়া মৃৎ শিল্প ও স্বর্ণ শিল্পে বিক্রমপুরের অন্যতম কেন্দ্র ছিল ভরাকৈর।

গ্রাম পত্তনের সূচনা থেকেই এখানে ছিল হিন্দু মুসলমান বসতি। পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচারের ঢেউ এসে লেগেছিল এই গ্রামে। কবিরাজপাড়ায় দীনেশচন্দ্র সেনের বাড়িতে স্থাপিত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মন্দিরে নিয়মিত ধর্মচর্চা হত। হিন্দুদের বারো মাসে তের পার্বণ ছিল ঘরে ঘরে। নিজস্ব দোল মঞ্চ ছিল প্রায় সব সম্পন্ন পরিবারের। রং ও আবির খেলা এবং বুড়ির ঘর পোড়ান ছিল অন্যান্য অঞ্চলের মত।

গ্রামের মানুষ দুর্গোৎসবে আনন্দে মেতে উঠত। দেশভাগের সময়ও যেসব বাড়িতে দুর্গাপুজো হত তার অন্যতম কয়েকটি হল ঃ দারোগা বাড়ি, চাটুজ্যে বাড়ি, মৌলিক বাড়ি, চক্রবর্তী বাড়ি, রায়ের বাড়ি, ঘোষের বাড়ি, মহেন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ি, শ্যামপালের বাড়ি, সাওগাঁয়ের মুন্সি বাড়ি, সেনের বাড়ি, ধূর্জটি কবিরাজের বাড়ি, দীনেশ কবিরাজের বাড়ি, অধর মণ্ডলের বাড়ি, রাজেন্দ্রনাথের বাড়ি, উকিল বাড়ি, নাজির বাড়ি, হরেন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ি, কাশী বসুর বাড়ি, শশী বসু ও মহেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ি, ঘটকবাড়ি, প্রসন্ন চক্রবর্তীর বাড়ি এবং সাওগাঁয়ের চক্রবর্তী বাড়ি। কয়েকটি বাড়ির পুজো বন্ধ হয়ে গেলেও অধিকাংশ বাড়ির পুজো হত যথারীতি। শারদীয় উৎসবে যোগ দিতে প্রতি বছরই আসত প্রবাসী গ্রামবাসীরা। গ্রামে নতুন প্রাণের সাড়া জাগত। মৌলিক বাড়িতে হত মহিষ বলি। পরে এদের পুজোয় আরতির পর আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মৌলিক বাড়ি ছাড়াও কাশী বসুর বাড়ি, চক্রবর্তী বাড়ি ও দারোগা বাড়িতেও মহিষ বলি হত। দারোগা বাড়িতে নাটকাভিনয় ও জলসার ব্যবস্থা ছিল। মুকুন্দ দাসও এখানে যাত্রা করে গেছেন। আরতি নৃত্য হত প্রতিমার সামনে।

নবমীর দিন গ্রামের ব্যাগু মণ্ডলের দল স্বরচিত নবমীর গান গাইত বাড়ি বাড়ি ঘুরে। নৈহাটি ভাটপাড়া থেকেও একটি দল আসত নবমীর গান গাইতে।

গ্রামে শ্যামাপূজা, রাধাকৃষ্ণ পূজা, মনসা পূজা, কার্তিক পূজা, হরিপূজা, রক্ষাকালীর পূজা, শীতলা পূজা, লক্ষ্মী পূজা প্রচলিত ছিল। তাছাড়া চড়ক উৎসব, নীল পূজা ও কালী নাচ দীর্ঘকাল গ্রামের মানুষদের আনন্দের উপকরণ ছিল। বসত জারি ও কবিগানের আসর কোথাও কোথাও। জারিগানে খ্যাতি ছিল ফেদু বয়াতি, জৈনদ্দি এবং মফিজদ্দির। কোথাও বসত ঢাক ঢোলের আসর। প্রসিদ্ধ ঢাকী অশ্বিনী, কৈলাস, যোগেন্দ্র, শরৎ, প্রসিদ্ধ ঢুলী প্যারীমোহন যোগ দিত নানান আসরে। কালী নাচ, যাকে লোকে বলত কালীকাচ তা দীর্ঘদিন ঢাকা জেলার সর্বত্র জনপ্রিয় ছিল।

ভরাকরের বিভিন্ন গৃহে গৃহদেবতার বিগ্রহ থাকলেও কোন মন্দির বা দেবালয় ছিল না। গ্রামের মেয়েরা এবং মায়েরা নানান ব্রত পালন করতেন। সেইসব ব্রতের সম্পর্কে একটি বিবরণ এখানে উদ্ধৃত হল ঃ

বিভিন্ন ব্রত

মাঘ মণ্ডল ও তারা ব্রত ঃ

স্ত্রীলোকদের বিভিন্ন বয়স ও অবস্থায় করণীয় যেসকল ব্রত হিন্দু সমাজে প্রচলিত আছে তাহাদের অধিকাংশই আমাদের গ্রামে প্রতিপালিত হইত। মেয়েদের শুদ্ধাচারিণী ও ধর্মনিষ্ঠ করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। অবিবাহিতা মেয়েরা মাঘ মাসে করিত মাঘ মণ্ডলের ব্রত, তারা ব্রত এবং কার্তিক মাসে যমপুকুরের ব্রত। উঠানে চাউল, হলুদ, বিল্বপত্র প্রভৃতি নানা রঙের গুড়া দিয়া উপরে সূর্য, মধ্যে মণ্ডল ও নিচে অর্ধচন্দ্র আঁকিয়া প্রতিদিন সকালে বালিকারা ছড়া আবৃত্তি করিয়া মাঘ মণ্ডলের পূজা করিত। ব্রতের শেষ দিনে পুরোহিত ডাকিয়া মণ্ডলের লাড়ু, মধু, নৈবেদ্য সহ পূজান্তে ব্রত সমাপন করিত। মাঘমণ্ডল দিনের ব্রত, তাতে প্রধান সূর্য ; তারাব্রত রাত্রির, তাতে প্রধান তারা ও চন্দ্র। প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রে অবিবাহিতা মেয়েরা উঠানে পিটালির গোলা দিয়া সূর্য চন্দ্র ও তারার নানা চিত্র অঙ্কিত করিত। ইহাতেও ছড়া, আবৃত্তি এবং পূজা দ্বারা ব্রতের সমাপন ছিল। বালিকাদের মধ্যে শিল্পরুচি সঞ্চার করা এই দুটি ব্রতের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। মাঘমণ্ডলের ব্রত ৫ বৎসরে সমাপ্ত হইত এবং ব্রত সাঙ্গের দিন লোক খাওয়ান হইত। তারাব্রত ৩ বৎসরের ; ১ম বৎসরে ৪টি, ২য় বৎসরে ৮টি এবং ৩ বৎসরে ১২টি সরা খই, গুড়, মোয়া, ক্ষীরের লাড়ু দিয়া চিত্রের চারিপাশে রাখা হইত।

যমপুকুর ব্রত ঃ

কার্তিক মাসে ঘরের বাইরে একটি ছোট পুকুর কাটিয়া তাহার চারিধারে মানকচু, হলুদ ও কলাগাছ রোপণ করিয়া প্রাতে কিছু না খাইয়া এক মাস এই ব্রত করিতে হয়। মাটি দিয়া কাক, চিল, কুমির, যমরাজা প্রভৃতির মূর্তি নির্মাণ করিয়া পুকুরের চারিপার্শ্বে রাখিতে হয়। এই ব্রতের ফলে নাকি শাশুড়ির সদ্‌গতি লাভ হয়।

মাঘমণ্ডল ব্রতের ছড়া ঃ

মাঘমণ্ডল সোনার কুণ্ডল,
সোনার কুণ্ডলে ঢাইলা ঘি
আমরা হই বড় মাইনষের পুত্রের ঝি।
সোনার মণ্ডলে ঢাইলা মৌ (মধু)
আমরা হই বড় মাইনষের পুত্রের বৌ।
সোনার মণ্ডলে ঢাইলা লাড়ু
শাঁখার আগে সোনার খাড়ু।
চন্দন কাষ্ঠে রাঁধি
জিরা তুষ ফিকি।
দোলায় আসি দোলায় যাই
আঁকে বইসা দই ভাত খাই।
চন্দ্রে সূর্যে দিয়া ফুল
ভইরা উঠুক তিন কুল।

জীবনে কুমারী কন্যার কাম্য বিষয়গুলি অতি স্পষ্টভাবেই ব্রতের ছড়া ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে।

এই মাসে বালিকারা পুকুর ঘাটে বসিয়া সূর্যোদয়ের পূর্বে নিম্নের ছড়াটি সুর করিয়া আবৃত্তি করিত, সমস্ত পাড়া সচকিত হইয়া উঠিত তাহাদের উচ্চমধুর কণ্ঠস্বরে।

ওঠ ওঠ সূর্য ঝিকি মিকি দিয়া,
না উঠিতে পারি আমি ইয়েলের (কুয়াশা) লাইগা।
ইয়েলের পঞ্চকোটি শিয়রে থুইয়া
সূর্য উঠবেন কোন্ খান দিয়া?
বামুন বাড়ির ঘাটা খান দিয়া
বামুনদের মাইয়ারা বড় সেয়ান,
পৈতা যোগায় বেহান বেহান।
ওঠ ওঠ সূর্য ঝিকিমিকি দিয়া।

এইভাবে সূর্যকে উঠাইবার মিনতি থাকিবে বৈদ্য বাড়ি, কায়স্থ বাড়ি প্রভৃতির ঘাট দিয়া এবং সঙ্গে থাকিবে ঐ সকল বাড়ীর মেয়েদের স্বভাব বর্ণনা।

এ-পাড়ার মেয়েদের ছড়ার গান শোনা যাইত ও-পাড়ায়। ও-পাড়ার গান এ-পাড়ায় ; পাড়ায় পাড়ায় যেন প্রতিযোগিতা লাগিয়া যাইত এবং এইভাবে সমস্ত গ্রামের আকাশ বাতাস ছড়ার সুরেলা আবৃত্তিতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত।

তারা ব্রতের ছড়া ঃ

এক তারা দুই তারা .... ষোল তারা পূজি।
ষোল ষোল তারা তোমরা হইও সাক্ষী,
ঘৃত দিয়া করি আমি পঞ্চগ্রাসী (পঞ্চগ্রাসে ভোজন)।
সাগর আন, কাগর আন (নানা রকম দ্রব্য আন)
যোল ঘরের ভুজ্যি খান
যোল ঘরের যোল বর্তী (ব্রতী)
আমি তাদের অধিপতি।
শঙ্কর জিজ্ঞাসা করেন, গৌরী 'তারা' পূজি কী কী পায়?
শঙ্কর হেন স্বামী পায়,
কার্তিক গণেশ পুত্র পায়,
লক্ষ্মী সরস্বতী কন্যা পায়,
নন্দী ভৃঙ্গী নফর পায়,
জয়া বিজয়া দাসী পায়,
ষোল ব্রতীর হাতে ষোল সরা দিয়া
আমি যাই ইন্দ্রপুরে নাটুয়া (নর্তকী?) হইয়া।

শেষ লাইনটিতে বেহুলার দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় নৃত্যগীতে দেবগণকে তুষ্ট করিয়া মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়া পাইবার ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়।

আদর্শ স্বামী, পুত্র, কন্যা, পরিচারক পরিচারিকা লাভের মত সতীত্বের অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারিণী হওয়াও ব্রতীদের কাম্য ছিল।

ঝলকা ব্রত ঃ

বয়স্কা মহিলারা ঝলকা ও নিদান ব্রত করিতেন। দুইটিই উন্মুক্ত স্থানে বৃক্ষতলে হইত বলিয়া অনুমান হয় ইহা বনদেবতার পূজা। ভরাকৈরের খাল ও বড় খালের সঙ্গমস্থলে মুসলমান পাড়ায় পূর্বে বহু গাব, পলাশ ও শিমুল গাছের কুঞ্জ ছিল। ঝলকার ব্রতে পৌষ মাসে সকল বর্ণের মহিলারা এখানে সমবেত হইতেন। বনের প্রতীক একটি হিজল শাখা পুঁতিয়া তাহার সম্মুখে পুরোহিতের পূজান্তে ব্রতকথা শুনিয়া মহিলারা সেখানে বসিয়াই ফলার করিতেন। মৌলিক

বাড়ির কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ইহা হইত বলিয়া রাজনৈতিক কারণে অশান্তির সময় পরে উহা ওই বাড়িরই বহির্বাটির প্রাঙ্গণে হরি ও শিব-মন্দিরের সম্মুখে স্থানান্তরিত হয়।

নিদান ব্রত ঃ

ইহা হইত জ্যোতিষা বাড়ির সম্মুখস্থ মাঠে, বন অভাবে কাফিলা গাছের নিচে। পূজা ও ব্রতকথা সমাপনান্তে মহিলা ব্রতীরা মানসিক কবুতর ছাড়িতেন। এই দু'টি ব্রতে উচ্চ নীচ সকল বর্ণের মহিলারাই অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের বাধা বিস্মৃত হইয়া একস্থানে মিলিত হইয়া ফলার করিতেন।

সত্যনারায়ণ ও শনি সেবা এবং ত্রিনাথের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) পূজা ঃ

সকল বর্ণের হিন্দুরা এক স্থানে মিলিত হইতেন। রাত্রিতে সত্যনারায়ণ ও শনির পাঁচালি গান সহযোগে সুর করিয়া পাঠান্তে পূজার পর কলাপাতার ত্রিকোণ ঠোঙায় সিন্নি প্রসাদ বিতরণ করা হইত। পাঁচালির কাহিনী সুপরিচিত ; দেবতাকে অবজ্ঞা করায় নানা দুঃখ কষ্ট এবং অন্যের পরামর্শে তাহাকে পূজা করিয়া সুখসমৃদ্ধি লাভ।

ত্রিনাথের পূজা বা মেলায় পাঁচালি পাঠের পরিবর্তে একজন কথক থাকিতেন। মৌলিক পাড়ার গিরি দত্তের কথার পরিবেশন খুবই আকর্ষণীয় ছিল। ভক্তদের হাতে হাতে গাঁজার কল্কি ফিরিত। একটি গান ছিল :

সাধুরে ভাই দিন গেলে ত্রিনাথের নাম লইও।
ত্রিনাথ আমার বড় দয়াল, যায়নারে তারে বোঝা
ওরে পাঁচটি পয়সা হলেরে ভাই, ত্রিনাথের পূজা।

প্রায় সারা বৎসরই জাতি বর্ণ নির্বিশেষে কোন না কোন হিন্দুর বাড়িতে এই লৌকিক দেবতাদের আসন পড়িত।

কলেরা ও বসন্ত মহামারী হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় বারোয়ারি কালী ও শীতলা পূজা হইত।

গ্রামের হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের ধর্মোৎসবে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিত না। দুর্গোৎসব ও অন্যান্য পূজার প্রতিমা দর্শন করিতে মুসলমানগণ আসিত। আবার মুসলমান পাড়া হইতে পাঁচ পীরের দীর্ঘ পাঁচটি সজ্জিত ও পতাকা শোভিত বাঁশ লইয়া দলবদ্ধভাবে মুসলমানগণ হিন্দু-পাড়ায় আসিত। তাহারা বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া এক বিশেষ ভঙ্গিতে নৃত্য করিয়া চাউল ও পয়সা লইয়া যাইত।

পৌষ মাসের রাত্রিতে মুসলমন ছেলের দল 'আর বাঘ আর বাঘ' ধ্বনিতে হিন্দুপাড়া মুখরিত করিয়া তুলিত। একটি ছড়া বলিয়া চড়ুইভাতির জন্য তাহার চাউল ও পয়সা মাগিত।

আইলাম রে বরণে।
লক্ষ্মীমার চরণে।।
লক্ষ্মীমা দিলেন বর।
চাউল কড়ি বাহির কর।।

ইহাতে মনে হয় লক্ষ্মীদেবীর প্রভাব হিন্দু ও মুসলমান অন্তঃপুরে যেন প্রায় সমানই ছিল। লক্ষ্মীপূজার সময় মুসলমান বাড়িতেও হিন্দু বাড়ির ন্যায় লাড়ু, মোয়া তৈরি হইত এবং আলপনা দেওয়া হইত।

বাস্তুপূজা ঃ

নিজ বাড়ির উন্মুক্ত স্থানে কাফিলা গাছের তলায় বা কাফিলা গাছের ডাল পুঁতিয়া তাহার সম্মুখে বাস্তুপূজা হইত। কোন কোন বাড়িতে ভেড়া বা তাহার অভাবে পাঁঠা বলি দেওয়া হইত। আবার নিজ মহলের স্বত্ব রক্ষার জন্য সে সকল স্থানে বাস্তুপূজার আয়োজন করিতেন কাশী

বসুর বাড়ি, মৌলিক বাড়ি, চক্রবর্তী বাড়ি, ঘোষের বাড়ি, সুধাংশু মুখার্জির বাড়ি, ধূর্জটি কবিরাজের বাড়ি প্রভৃতি।

ক্ষেত্রপূজা ঃ

ক্ষেত্রপূজা হইত সুধাংশু মুখার্জির বাড়ি, চক্রবর্তী বাড়ি, কাশী বসুর বাড়ি, মৌলিক বাড়ি প্রভৃতিতে। এই পূজা উপলক্ষে হামামদিস্তায় চাউলের গুড়া মাড়িয়া উপাদেয় ছাতু তৈরি করিয়া সকলকে বিতরণ করা হইত।

নববর্ষ উৎসব ঃ

পূজা ব্রত ছাড়া গ্রামের আর একটি উৎসব ছিল নববর্ষের উৎসব। প্রতি বৎসর পহেলা বৈশাখ গ্রামের বালক ও যুবকগণ গ্রামেরই সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বা অন্য কাহারও রচিত একটি সময়োপোযোগী গান গাহিয়া গ্রাম পরিক্রমা করিয়া নূতন বৎসরের আগমন ঘোষণা করিত। দলের পুরোবর্তীর হাতে থাকিত নববর্ষের একটি পোস্টার। অন্যান্যদের হাতে পতাকা। তাহারা প্রত্যেক বাড়িতে উপস্থিত হইয়া চাউল, বাতাসা, ফল প্রভৃতি মাগিত ; পরে আহৃত দ্রব্য সহযোগে হইত চড়ুইভাতি।

মেলা ঃ

মেলা গ্রামের একঘেয়ে জীবনে বৈচিত্র্য আনে। মেলায় যে সকল জিনিস কেনাবেচা হয় তাহা যে হাটেবাজারে খুব দুর্লভ তা নয়। তবে একই প্রকার জিনিসের ঘনসন্নিবিষ্ট দোকানগুলিতে মেলা হাটবাজার হইত পৃথক একটি রূপ ধারণ করে, অনেকটা প্রদর্শনীর মত এবং মেলাতে ভিড় ঠেলিয়া জিনিসপত্র কেনার একটি আলাদা আনন্দ আছে। শিশু ও বালক বালিকাদিগের বহু আকাঙ্খিত এই মেলা আমাদের গ্রামে বৎসরে তিনবার বসিত। অবশ্য বহু পূর্বে আর একটি মেলা বসিত বৈরাগী বাড়িতে। ইহাকে মহিলামেলা বলা যাইতে পারে। কারণ এখানে শুধু মেয়েরাই জিনিস বেচিতেন ও কিনিতেন।

চাটুজ্জে পাড়া ও চক্রবর্তী পাড়ার মধ্যস্থলে খালের পাড়ে একটি ক্ষেতে মাঘী সপ্তমীর মেলা বসিত। এই ক্ষেতের মালিক ছিলেন অটল বৈরাগী, উত্তর দিকে ছিল তাহার আখড়া এবং তিনিই ছিলেন এই মেলার প্রবর্তক। একটি বাঁশের তৈরি রথের মধ্যে বৈরাগীদের উপাস্য দেবতা রাখিয়া তাহা টানা হইত। রবিশস্য উৎপাটিত ক্ষেতে ছোট ছোট চালা উঠিত। শিশুদের নয়নরঞ্জন শোলা ও মাটির খেলনা, মেয়েদের জন্য সস্তা প্রসাধন দ্রব্য এবং নানা মিষ্টান্ন কেনাবেচা হইত। কুম্ভকারগণ হাড়ি, পাতিল এবং লৌহশিল্পীগণ দা, কাঁচি, কুড়াল প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইত।

চক্রবর্তী বাড়িতে শিবরাত্রি উপলক্ষে একটি ছোট মেলা বসিত। কিন্তু চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে ঐ বাড়ির বহির্বাটিতে ও দিঘির পাড়ে যে মেলা বা গলুইয়া বসিত তাহা আকারে বৃহৎ ছিল। সমগ্র মেলার স্থান লোকে গিসগিস করিত। সাধারণত মেলায় যে সকল জিনিস দেখা যায় তাহা ছাড়াও এই মেলায় প্রচুর পরিমাণে সরিষা, ধনে, জিরা প্রভৃতি মশলার আমদানি হইত। তখন গৃহস্থরা সারা বৎসরের জন্য মশলা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন।[১]

ভরাকৈর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রথম পর্বে ছিল পাঠশালা ও টোলভিত্তিক। বিক্রমপুরের অধিকাংশ পরিবারই শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। তার অন্যতম কারণ, সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবার তেমন ছিল না, যাদের আয় থেকেই সারা বছরের সংসার চলত। যে কারণে শিক্ষা ছিল তাদের কাছে অপরিহার্য। সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে ভরাকৈরের চাটুজ্যে বাড়ির টোল এবং কাশী বসুর বাড়ির টোল ছিল বিখ্যাত। রুক্মিনী চট্টোপাধ্যায় এবং গোপালচন্দ্র কাব্যতীর্থ ছিলেন সংস্কৃতে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষের বাড়িতে ছিল মক্তব। পরবর্তীকালে মৌলিক বাড়িতে মিডল ভারনাকুলার স্কুল বা মধ্য বাংলা বিদ্যালয়। পরে এই বিদ্যালয় দারোগা

বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। পাঠশালা ছিল বেশ কয়েকটি। চাটুজ্যে বাড়ি, কাশী বসুর বাড়ি, চন্দ্রমোহন চক্রবর্তী ও কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তীর বাড়ি—কয়েকটি পাঠশালা ছিল। কিন্তু ইংরাজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের পাঠাশালা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ কমতে থাকে। দারোগা বাড়ির পুবের বাড়িতে কেদারনাথ দাশগুপ্ত যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, পরে সেই বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয় উমাচরণ সেনের বহির্বাটিতে। এই বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সময়ের শিক্ষিকাদের মধ্যে ছিলেন সুষমা সেনগুপ্তা, চারুলীলা দাশগুপ্তা, সুভাষিনী সেনগুপ্ত, রাজবালা সেনগুপ্ত, রাজলক্ষ্মী দে (সোম), ইন্দুবালা সেন, সন্ধ্যা দাশগুপ্তা, সুখলতা দাশগুপ্তা এবং গৌরী রায়। মেয়েদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা এবং বিদ্যালয়ের পর তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

ভরাকৈর গ্রামে প্রথম উচ্চ ইংরাজি প্রাথমিক বিদ্যালয় "পল্লী বিদ্যালয়" স্থাপিত হয় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে, অধ্যাপক হরিপদ মৌলিক ও গ্রামের আরো কয়েকজন শিক্ষানুরাগীর উদ্যোগে। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে গ্রামের ছেলেরা পড়তে যেত কলমার "লক্ষ্মীকান্ত উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে" এবং তেলিরবাগের "কালীমোহন দুর্গামোহন ইংরাজি বিদ্যালয়ে"। গ্রামে বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয় চক্রবর্তী পাড়ায় লালবিহারীদের বাড়িতে। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পর প্রথমে অশ্বিনী দস্তরায়ের বহির্বাটিতে, তারপর কালীপ্রসন্ন ঘোষের বহির্বাটিতে বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয়। শিক্ষার আগ্রহে ছাত্ররা এসে বিদ্যালয়ে ভিড় করতে থাকে। তখন মৌলিকদের একটি জমির ওপর বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন, ২খানি টিনের ঘর তৈরি হয়।

গ্রামের পরিবেশ স্বাস্থ্যোপযোগী রাখতে গ্রামবাসী ও প্রবাসী গ্রামবাসীদের অর্থানুকূল্যে গঠিত হয় আশা সম্প্রদায়। এদের একটি শাখা ছিল সেবা সংঘ। আশা সম্প্রদায় পল্লী উন্নয়ন ও দুঃস্থ গ্রামবাসীদের সেবায় নিযুক্ত ছিল। ১৩২৬ সালের সাইক্লোনে এবং ১৩৫০ সালের মন্বন্তরে আশা সম্প্রদায়ের সেবাকর্ম ছিল অতুলনীয়। বিক্রমপুর সম্মিলনী বেঙ্গল রিলিফ কমিটি, রামকৃষ্ণ মিশন, মাড়োয়ারি রিলিফ সোসাইটি সকলের সহযোগিতায় গ্রামের মানুষের প্রাণ রক্ষা করেছিল আশা সম্প্রদায়।

"ভরাকৈর আশা সমবায় সমিতি" গঠিত হয় ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে। বহু মধ্যবিত্ত পরিবার ও কৃষক পরিবার স্বল্প সুদে এবং সহজ কিস্তিতে ঋণ পেত। দেশভাগের পরেও এই সমবায় সমিতির কার্য অব্যাহত ছিল।

ভরাকৈরের কৃতী সন্তান ছিলেন সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষ। তাঁর সম্পাদিত "বান্ধব" পত্রিকা ছিল উৎকর্ষে এবং বৈশিষ্ট্যে অতুলনীয়। গ্রামে এই পত্রিকার নামকে মনে রেখে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে "বান্ধব লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠা করেন প্রমথনাথ দাশগুপ্ত এবং মন্মথ দাশগুপ্ত। গ্রামবাসীরা বহু বই দান করেছিলেন। নিয়মিত 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' ও 'সাহিত্য' পত্রিকা রাখা হত। চিত্তরঞ্জন দাশের 'নারায়ণ' পত্রিকা আসত বিনামূল্যে। বান্ধব লাইব্রেরীর সদস্যরা গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে মাঝে মাঝে সাহিত্যের আসর বসাতেন। কিন্তু লাইব্রেরী ছিল গ্রামের এক প্রান্তে। ফলে সকলের পক্ষে সবসময় যাতায়াত সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বহু প্রবাসী গ্রামবাসী গ্রামে ফিরে আসে। তারা গ্রামের মাঝখানে একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেন।

প্রথম আমলে ভরাকৈর-এ কোন বাজার ছিল না। নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিস সংগ্রহ করতে হত পার্শ্ববর্তী গ্রাম কলমা বা বহরের বাজার থেকে। বর্ষার সময় বা কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে বাজারে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠত। গ্রামের মানুষের প্রয়োজনে মৌলিক বাড়ির দিঘির পাড়ে একটি প্রাত্যহিক বাজার শুরু হয়। পরে মৌলিক পাড়ার পূবদিকে ডাকঘরে যাওয়ার সড়কের ডানদিকে মৌলিকদের দেওয়া জমির ওপর স্থায়ী বাজার তৈরি হয়। প্রথমেই বাজার উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়েছিল। ধীরে ধীরে দোকানপাট গড়ে উঠতে থাকে। কলমা স্কুলের শিক্ষক মহেন্দ্র চক্রবর্তীর দোকানকে সবাই বলত মহেন্দ্র মাস্টারের দোকান। এই দোকানে

নিয়মিত আনন্দবাজার পত্রিকা আসত বিনামূল্যে। সেই কাগজ পড়তে সকালে বিকালে আসত গ্রামবাসীরা। এখানে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে ছিল বিষ্ণুমূর্তি।

বাজারের উত্তরে মৌলিকদের দেওয়া জমিতে তৈরি হয় খেলার মাঠ। ভরাকৈরে-এ ডাকঘর স্থাপিত হয় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে এবং টেলিগ্রাম অফিস স্থাপিত হয় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে। প্রথমে এই ডাক ও তার ঘর ছিল ঘোষবাড়িতে।

বানরি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে কয়েকজন সহকর্মীসহ কার্য পরিত্যাগ করে 'বিদ্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। নানান কারণে আশ্রমের কেন্দ্র ছিল প্রথমে শ্রীহট্টে। সত্যাগ্রহ প্রত্যাহারের পর বিদ্যাশ্রম উঠে আসে সাওগাঁও-এ ডঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনের বাড়িতে। এরা চরকার প্রচলন করেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় বিদ্যাশ্রম কর্মীরা ব্যাপকভাবে সাহায্য কার্য চালিয়েছিল।

আউটসাহি ঃ

কলকাতার আউটসাহি সম্মিলনী ও বাল্য সমিতি 'আউটসাহির ইতিবৃত্ত এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে গ্রামের অবদান নামে' একখানি বই প্রকাশ করেন ১৩৭১ সনে। এই গ্রামটিও যে সমৃদ্ধ জনবসতিপূর্ণ ছিল তা জানা যায় বই-এর বিবরণ থেকে। হিন্দু মুসলমান জনবসতিপূর্ণ গ্রামের পাশে আছে পোড়াগঙ্গা খাল। একসময় গ্রামটি ছিল নদী তীরবর্তী। এখন পোড়াগঙ্গাও শুকিয়ে গেছে। দেশভাগের আগে গ্রামটি ছিল আয়তনে বেশ বড়। অতীতের জঙ্গলপূর্ণ অঞ্চলের স্মৃতি নিয়ে দীর্ঘকাল টিকে ছিল 'গণ্ডারমারা গড়', 'শূয়রের চাপ' এবং 'হাতি-চাঠা পুষ্করিণী'। একসময় নাকি বাঘও দেখা যেত। পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ, বর্ণ-ব্রাহ্মণ (ধোপার ব্রাহ্মণ), ধোপা, নাপিত, কর্মকার, কুম্ভকার, বারুজীবী, গোয়ালা, জেলে, ভুঁজমালি, নমঃশূদ্র ও মুসলমান সকল শ্রেণীর মানুষের বসতি গড়ে ওঠে। জানা যায়, প্রথম যুগে গ্রামে বসতি করেছিল মুসলমান এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা। অনেক পরে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা গ্রামে এসে বসতি করে। গ্রামের তালুকদার গুপ্ত বংশীয়রা জনৈক মুসলমান ব্যক্তির কাছ থেকে জমি বন্দোবস্ত নেন। তখন গ্রামে একটি মাত্র মসজিদ ছিল।

সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে বিক্রমপুরের খ্যাতি ছিল নবদ্বীপের পরেই। তার অন্যতম ছিল আউটসাহি। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা আসতেন এই গ্রামে। বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ভবানীশঙ্কর তর্কবাগীশ, পুরাপাড়ার কালীকান্ত শিরোমণি (স্মার্ত), দীননাথ ন্যায়পঞ্চানন, রাজনগরের শ্রীহরি ন্যায়বাগীশ, পণ্ডিত রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, বঙ্গতন্ত্র তর্কভূষণ, জগদ্বন্ধু তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র সিদ্ধান্তরত্ন, গৌরীকান্ত চক্রবর্তী, চণ্ডীচরণ সার্বভৌম, অশ্বিনীকুমার বিদ্যারত্ন, দুর্গাচরণ সিদ্ধান্তরত্ন ছিলেন আউটসাহির গর্ব। দুর্গাচরণের বাড়িতে টোল ছিল। সেখান থেকে শিক্ষার্থীরা বিদ্যাচর্চা করত। কেবলমাত্র সংস্কৃত নয় ফারসি ভাষা চর্চায়ও আউটসাহি পিছিয়ে ছিল না। বিত্তশালী মুসলমানদের বাড়িতে নিযুক্ত মৌলবি ও মুন্‌সিরা ফারসি ভাষা শিক্ষা দিতেন। তখন হিন্দুদের অনেকেই ফারসি জানতেন। গ্রামের জীবনকৃষ্ণ গুপ্তর বাড়িতে যে মক্তব ছিল, সেখানে ফারসি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রচর্চার অন্যতম কেন্দ্র ছিল আউটসাহি। এই গ্রামের শিবচন্দ্র সেন, রাজীব সেন, পীতাম্বর সেন এবং চন্দ্রনাথ সেন বংশ পরম্পরায় কোচবিহার রাজবাড়ির চিকিৎসক ছিলেন। শিবচন্দ্রের স্ত্রীও আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় সুনাম অর্জন করেন। স্থানীয় মানুষ তাকে বলত 'কবিরাজ ঠাকরুণ'। গুরুপ্রসাদ দাশগুপ্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র দাশগুপ্ত ছিলেন অসাধারণ আয়ুর্বেদ পণ্ডিত। এই বংশেরই পূর্ণচন্দ্র এবং যতীন্দ্রমোহন ছিলেন ঢাকার বিখ্যাত আয়ুর্বেদ চিকিৎসক। উচ্চ ইংরেজি শিক্ষিত হরিমোহন সেন বি এ-ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন। ইনি বিভিন্ন জেলাস্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে চাকরি করতেন। তারা সুশ্রুত সংহিতার বাংলা অনুবাদ এবং প্রকাশও

করেছিলেন। পশ্চিম আউটসাহির ভৈরবচন্দ্র রায়, তার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৈলাশচন্দ্র ছিলেন বিখ্যাত কবিরাজ। এরা চিকিৎসা করতেন ত্রিপুরার মহব্বৎপুরে। কৈলাশচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র ললিতচন্দ্র চিকিৎসক হিসাবে সুদীর্ঘ কলকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিখ্যাত কবিরাজ সুধাংশুভূষণ সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ছিল প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। তিনি একটি আয়ুর্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। 'আয়ুর্বেদ বিকাশ' নামে একটি মাসিক পত্র সম্পাদনা ও প্রকাশ করতেন।

গ্রামে প্রথম ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯০১ খ্রিঃ। এই গ্রামের অন্যতম তালুকদার কালীনাথ বাড়রী নিজ ব্যয়ে এই উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পিতা রাধানাথ বাড়রীর নামে বিদ্যালয়ের নাম হয় "রাধানাথ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়"। এরপর দ্রুত ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। আগে গ্রামে বাংলা শিক্ষার জন্য একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কয়েকটি পাঠশালা ছিল। গ্রামের গুপ্তবংশের পূর্বপুরুষ যুগলকিশোর গুপ্ত এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গ্রামের মেয়েদের জন্য যে বালিকা বিদ্যালয় ছিল দেশভাগের পর তা উঠে যায়।

বাংলার অন্যান্য গ্রামের মতই ছিল আউটসাহি। অতীতে গ্রামের ভিতরে ছিল মাত্র একটি সড়ক। বাজারের গড়ের পশ্চিম পাড় থেকে চক্রবর্তী বাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আকারে ছিল খুবই ছোট। কোন পুল ছিল না। প্রয়োজনে বাঁশের সাঁকো করে নেওয়া হত বর্ষার শুরুতেই। বর্ষার পর আশপাশের জল শুকিয়ে যেত। সাঁকোর প্রয়োজন আর থাকত না। ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর কাঠের পুল তৈরির কাজ শুরু হয়। তবে কোন খাল না থাকায়, বর্ষার জমা জল জমত গড়ে। যা খালের রূপ নিত। তাছাড়া ছিল কচুরিপানার উৎপাত। গ্রামের এক মাইল পশ্চিমে পদ্মা ও ধলেশ্বরীর সংযোগরক্ষাকারী সুবচনী খাল। এই খালও খরায় শুকিয়ে যায়।

প্রথম যুগে এই অঞ্চলের জলবায়ু ভাল থাকায় সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যও ছিল রোগমুক্ত। পরবর্তী সময়ে কলেরা বসন্ত ও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। সে সময় উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাব দেখা দেওয়ায় রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় একটি দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করেন।

গ্রামে প্রথম যুগ থেকেই পানীয় জলের অভাব মেটাতে বড় বড় পুকুর কাটা হত। সেইসব পুকুরের জল সবসময় থাকত পানযোগ্য। জলকষ্ট বাড়ত চৈত্র-বৈশাখ মাসে। গরিব মানুষ ভদ্রপল্লীর পুকুরের জল ব্যবহার করতে পারত। ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের পর টিউবওয়েলের সাহায্যে পানীয় জলের অভাব দূর করা হয়।

আউটসাহি গ্রামে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের বিশেষ কিছুই বাইরে থেকে আমদানি করতে হত না। বরং অন্য গ্রামের মানুষ এখানকার বাজার থেকে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করত। মাছ-দুধ, ধান-চাউল, ঘি-মাখন, তরিতরকারি, পান-সুপারি সবই গ্রামের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসত বাজারে। একসময় গ্রামের শাঁখা শিল্পের খ্যাতি থাকলেও, ঢাকার শাঁখারিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাহা হেরে যাওয়ায় শিল্পটি লোপ পায়। গ্রামের মালীরা কাগজ ও শোলা দিয়ে নয়নশোভন মালা, মুকুট তৈরি করত। তাঁত শিল্পও প্রসিদ্ধ ছিল। মাটির হাঁড়িকুড়ি, লক্ষ্মীর সরা, নানারকম দেবমূর্তি তৈরি হত। দেশি বন্দুক ও তালা তৈরি করে সুনাম অর্জন করেন অক্ষয় কর্মকার। আউটসাহি ব্যবসাকেন্দ্র হিসাবে কোন সময়েই পরিচিত ছিল না।

গ্রামের প্রাচীন কীর্তির অন্যতম হল 'করের দিঘি' এবং 'মঠ'। মঠটি ছিল রাজবাড়ির মঠের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট। কিংবদন্তী নবাবী আমলে রাজশাহীর অধিবাসী বিজয়রাম করগুপ্ত ছিলেন নবাব সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মী। তিনি কার্যোপলক্ষে বিক্রমপুর অঞ্চলে বসবাস করতেন। তিনি এখানে জমি কিনে বসতবাড়ি নির্মাণ, দিঘি খনন (করের দিঘি) এবং মায়ের সমাধির ওপর মঠ নির্মাণ করেন। তার মনোগত বাসনা ছিল বিক্রমপুরের বৈদ্য সমাজভুক্ত হওয়া। কারণ তিনি ছিলেন বারেন্দ্র শ্রেণীর বৈদ্য এবং বৈদ্যকুলেও নিম্নশ্রেণীর। বিক্রমপুরের বৈদ্যসমাজে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করলেও, আউটসাহির গোঁড়া বৈদ্য সমাজ তাকে বৈদ্য

সমাজভুক্ত করেনি। মনের দুঃখে বিজয়রাম আউটসাহির সম্পত্তি তার একজন অবাঙালি কর্মচারীকে দান করে এখান থেকে চলে যান। পরবর্তীকালে এই জমিবাড়ি কিনে নেন দুর্গাকুমার বসু। এই বিশাল সম্পত্তির কিছু অংশ কিনে নিয়ে সংস্কার করেন হরনাথ গুহ। করের দিঘি কালে কালে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। মঠ ক্রমশ জীর্ণ হয়ে পড়ে এবং ভূমিকম্পে মাটির নিচে কিছুটা বসে যায়।

গ্রামে বেশ কয়েকটি পুরনো শিবমন্দিরের মধ্যে সিদ্ধান্তের বাগানের মন্দিরটি ছিল সব থেকে পুরনো। এই মন্দিরে দীর্ঘকাল সাধনার পর চণ্ডীচরণ সার্বভৌম সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাছাড়া অনেক সিদ্ধ পুরুষের সাধনস্থল ছিল মন্দিরটি। আউটসাহির দুই প্রখ্যাত বাদ্যকর দুই ভাই চাঁদ খাঁ ও রোস্তম খাঁ উনিশ শতকের শেষে গ্রামের একমাত্র মসজিদটি নির্মাণ করেন। আউটসাহিতে পুকুর খুঁড়তে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছু প্রাচীন প্রস্তর মূর্তি পাওয়া গেছে। অবশ্য এর বেশ কিছুরই সন্ধান মেলে গ্রামের দক্ষিণে 'রানিহাটা' অঞ্চলে। সব মূর্তিই দেবদেবীর। মূর্তিগুলির কারুকার্য শিল্পসম্মত। এর মধ্যে আছে বিষ্ণু, গণেশ, বরাহ অবতার, নটবর, হর-গৌরী ইত্যাদি।

দেশভাগের আগে আউটসাহির অন্যতম বার্ষিক মেলা ছিল গলইয়া। গ্রামের গুপ্তরা এই মেলা শুরু করেন তাদের জমির ওপর। প্রতি বছর ১ বৈশাখ শুরু হত। চলত মাসখানেক। নানারকম আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা থাকত। বহুদূর থেকে নানাশ্রেণীর মানুষ আসত পণ্যদ্রব্য নিয়ে।

বিক্রমপুরে কবিগানের প্রচলন ছিল। এই অঞ্চলের সুপরিচিত কবিগায়ক ছিলেন ন'দেবসী বর্ণশর্মারা। কৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরচন্দ্র ভট্টাচার্য ছড়া ও কবিতা রচনা করে আসর জমাতেন। কীর্তনিয়া শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়ও কবিগানে সুনাম অর্জন করেন। তিনি নিজেই গান রচনা করে সুর দিতেন। তাঁর ছেলেদের মধ্যে নিঘোর মুখোপাধ্যায়, সুরেশ মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং নেপাল মুখোপাধ্যায় সেকালে অভিনয়ে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আউটসাহির রামায়ণ গান দলের খ্যাতি ছিল বেশি। বেশ কয়েকটি দল ছিল। আনন্দবল, বিহারী, কৈলাস ও নিতাই কীর্তনিয়ার রামায়ণগান দলের নাম ছিল। অন্যান্য অঞ্চলের লোকজন এদের নিয়ে যেত রামায়ণ গানের জন্য। ভক্তি ও ধর্মমূলক গানের একাধিক দল ছিল। ব্রজবল্লভ, মহেন্দ্র ও রাজেন্দ্র কীর্তনীয়ার দল ছিল সবথেকে জনপ্রিয়। এরা শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার প্রেমলীলা ও নিমাই সন্ন্যাস বিষয়ক কীর্তন গাইতেন। বাদন নৈপুণ্যে বিখ্যাত ছিলেন চাঁদ খাঁ ও রোস্তম খাঁ দুই ভাই। এদের উত্তর পুরুষ লালখাঁও এ ব্যাপারে সুনাম অর্জন করেন।

প্রথম থেকেই আউটসাহির জীবনযাত্রা ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ছিল অনেক শৃঙ্খলাবদ্ধ। একের জন্য অন্যে কোনরকম অসুবিধা ভোগ করত না। গ্রামের মাঝখানে ছিল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের বসবাস। চারদিকে অন্যান্য হিন্দু ও মুসলমান পাড়া ছিল। চক্রবর্তীপাড়া, গাঙ্গুলিপাড়া, পুরোহিতপাড়া, বাড়ুজ্যেপাড়া, গুপ্তপাড়া, মধ্যসেনপাড়া, উচলিপাড়া, গুহপাড়া, বারুইপাড়া, গোয়ালাপাড়া, পালপাড়া, বর্ণশর্মাপাড়া, নমঃশূদ্রপাড়া, জেলেপাড়া, বাদ্যকরপাড়ায় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বসবাস ছিল। মুসলমানদের বেশিরভাগ থাকত মামারধূল ও গদাইপাড় অঞ্চলে।

আউটসাহি পুরনো বসতি নয়। ষোল শতকের কোন সময়ে এখানে বসতির শুরু। এখানকার ব্রাহ্মণদের মধ্যে চক্রবর্তীরাই প্রথম বসতি স্থাপন করে। বংশটি লোপ পেয়ে যায় পরবর্তীকালে। বংশের শেষ বংশধর কালীশঙ্কর চক্রবর্তী কাশী থেকে শিবমূর্তি পায়ে হেঁটে নিয়ে এসে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। কালীশঙ্করের জামাতা ঈশ্বর সিদ্ধান্ত ছিলেন মহাপণ্ডিত। তাঁর বাড়িতে ছিল চতুষ্পাঠী। সেখানে আসত বহু বিদ্যার্থী। বাড়িটিকে বলা হত সিদ্ধান্ত বাড়ি। পরবর্তীকালে বাড়ি ও শিবমন্দির জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে।

আর একটি চক্রবর্তী পরিবার এসেছিল পুরাপাড়া থেকে। বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহানন্দ

চক্রবর্তী। স্থানীয় রোষ বংশীয় বৈদ্য যজমানদের কাছ থেকে তালুক লাভ করেছিলেন। এঁরা সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ ও জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপনা করতেন বংশ পরম্পরায়। এঁদের চতুষ্পাঠী বিদ্যার্থীতে ভরে থাকত। এই বংশের দুই কৃতী সন্তান গৌরকান্ত চক্রবর্তী এবং অশ্বিনীকুমার বিদ্যারত্ন কাব্যতীর্থ।

গ্রামের গঙ্গোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ কোথা থেকে এসেছিল তা জানা যায়নি। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে বহু পণ্ডিতের জন্ম। সুবিখ্যাত পণ্ডিত ভবানীশঙ্কর তর্কবাগীশ এই বংশের সন্তান। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এই বংশের সর্বশেষ পণ্ডিত হরিমোহন বিদ্যারত্ন।

বৈদ্যদের মধ্যে মধ্যসেন বংশীয়রা প্রথম আসে আউটসাহিতে। কোথা থেকে তারা এসেছিল তা জানা যায়নি। এরা ছিল তালুকদার। তাদের তালুক ছিল বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। এই গ্রামে আসবার সময় তারা যে পুরোহিতদের নিয়ে আসে, তারা পুরোহিতপাড়ায় বসতি স্থাপন করেছিল।

বাঁড়রিরা এসেছিল পাশের বেতকা গ্রাম থেকে। এরাও ছিল প্রতিপত্তিশালী তালুকদার। এদের বাড়িতে ছিল শিবমন্দির ও কালীমন্দির। কালীনাথ বাঁড়রি ছিলেন গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধার পাত্র। পিতা রাধানাথের নামে তিনি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

গ্রামের প্রধান তালুকদার গুপ্ত বংশীয়রা কুরমিরা গ্রাম থেকে আসে ১০৬২ সনে। এরা শিবমন্দির স্থাপন করেন। গ্রাম্য বিবাদ-বিরোধ মীমাংসা করতেন। বাজার, মেলা, ইংরেজি স্কুল, চতুষ্পাঠ ও মক্তব স্থাপন করেন।

পশ্চিম আউটসাহির উচলিবংশের রামনাথ সেন প্রথম আসেন হাতারভোগ গ্রাম থেকে। এদের আদি বাসস্থান ছিল যশোহর-বেন্দা। এরা ছিলেন প্রভাবশালী তালুকদার। এই বংশে কয়েকজন সাধকের জন্ম হয়।

কায়স্থ পরিবারের অনেকেই (গুহ ও মিত্র) পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। বসুপরিবারের ছিল প্রকাণ্ড বাড়ি। এই পরিবারের দুর্গাকুমার বসু বিজয়রাম করের সম্পত্তির মালিক হন।

আউটসাহির জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গ্রামের স্মৃতিচারণে বলেছেন ঃ নদীমেখলা, শস্যশ্যামলা, কাননকুন্তলা, বিক্রমের লীলাভূমি বিক্রমপুর। দক্ষিণে রাক্ষসী পদ্মা, রাজা রাজবল্লভের কীর্তিনাশ করিয়া 'কীর্তিনাশা' নাম ধরিয়া তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। পূর্বে মেঘনা, উত্তরে ধলেশ্বরী ও শীতললক্ষ্যা, পশ্চিমে মধুমতী। এই বিক্রমপুরের প্রায় মধ্যভাগে 'ছায়া সুনিবিড়', 'শান্তির নীড়', পাখির ডাকে পাগল-করা প্রাণারাম আউটসাহি গ্রাম। চারিদিকে তাহার মাঠ, আজ সেখানে 'দিবা শিবা নিশা কাক'। হয়ত বাংলার লুপ্তগৌরব গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মত বড় সাধের এই গ্রাম নামশেষে পরিণত হইবে।

গ্রামে কি ছিল, গ্রামবাসীরা কি ছিলেন, সেই কথা পরবর্তী বংশধরগণ দেখিবেন না, জানিবেন না, বুঝিবেন না, তাই এই স্মারক রক্ষার প্রয়াস। এখানে একদিন ৪।৫ হাজারের উপর লোক বাস করিত। এই কথা হয়ত এখনও কেহ বিশ্বাস করিবেন না। এখানে না ছিল কি! এখানে ছিল গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ।

আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, নারিকেল, লিচু, তাল, বেল, কুল, জামরুল, গোলাপজাম, ডেফল, জম্বুরা, জলপাই, পেয়ারা, চালতা প্রভৃতি গাছ। গাছে গাছে প্রচুর পরিমাণে ফল ফলিত। চার পয়সা সের দুধ ছিল, পাঁচ পয়সা সের গুড়। সোনার বাংলার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা আনা হইল। এই অঞ্চলের ভারতবাসী পাকিস্তানি হইল। দলে দলে লোক মাটির কান্না অগ্রাহ্য করিয়া বড় সাধের মাতৃভূমি, ঘরবাড়ি ছাড়িয়া যে যে দিকে পারিল ছুটিল। ইজ্জত সব চেয়ে বড়। সোনার গ্রাম শ্মশানে পরিণত হইল। মানুষের বাসভূমি বন্য জন্তুর আবাসস্থল হইতে

চলিল। স্কুল প্রায় উঠিয়া গেল। ডাকঘর আরও ছোট হইল। বাজারে ঘরদরজা রহিল, বাজার আর তেমন জমে না। বাল্যসমিতি বন্ধ হইয়া গেল। বড় সাধের গৃহ এবং গৃহোপকরণ চুরি ও লুঠ হইয়া গেল। পল্লী কল্যাণ আশ্রমের অবস্থাও তাহাই। মানুষ নাই। এই সব রক্ষা করে কে? লোকালয়ে শৃগাল, কুকুর আশ্রয় লইল।

যেই স্থান কল-কোলাহলে মুখরিত থাকিত, তাহা জঙ্গলে পরিণত হইল। যাহাদের অন্য কোন গতি নাই, তাহারা প্রাণহীনের মত সদা-সর্বদা আশঙ্কা বুকে নিয়া গ্রামে পড়িয়া রহিলেন। তাহাদের কথা ভাবিলে দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়। কেবলই মনে হয় এই কি হইল! এই গ্রামের যে একটা ঐতিহ্য আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, কৃষ্টি আছে, তাহার আলোচনার এই প্রকৃষ্ট সময়, পরে আর হইবে না।

গ্রামটি প্রাচীন। পুরাকালে জঙ্গল কিছু বেশি ছিল। 'হাতি চাঠা', 'শূয়র চাপ', 'গণ্ডারমারা গড়' তাহারই ইঙ্গিত করে। গ্রামের জমিদার কালীপ্রসন্ন গুপ্ত মহাশয় শিকার করিতেন, পাঁয়জারি মোল্লা তাহার সঙ্গী। পাঁয়জারি মোল্লাকে বাঘে ধরে। খালি হাতেই বাঘকে শায়েস্তা করেন। ক্রমে গ্রামে জঙ্গল কমে, বসতি বাড়ে। অতি প্রাচীনকালে গ্রামে বাস করিত সাধারণ শ্রেণীর লোক। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি যাহারা পরে গ্রামে প্রতিপত্তি লাভ করেন তাহারা এই গ্রামের আদিবাসী নন, তালুক কিনিয়া এই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাহারা নিজ নিজ কার্য দ্বারা যশস্বী হন এবং গ্রামের উন্নতি সাধন করেন। তাহারা সঙ্গে নিয়া আসেন তাহাদের 'বিত্তাদের'।

সংস্কৃত চর্চার জন্য বিক্রমপুর এককালে বিখ্যাত ছিল। পণ্ডিত ও চতুষ্পাঠী অন্যত্র বিরল। এইজন্য এককালে ইহাকে 'পূর্ব নবদ্বীপ' বলা হইত। আউটসাহিও পিছনে ছিল না। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত ভবানীশঙ্কর তর্কবাগীশ, সাধকশ্রেষ্ঠ চণ্ডীচরণ সার্বভৌম, গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী এবং আধুনিক যুগে অশ্বিনীকুমার বিদ্যারত্ন কাব্যতীর্থ, হরিমোহন বিদ্যারত্ন, দুর্গাচরণ সিদ্ধান্তরত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের পদধূলির স্পর্শে পবিত্রীকৃত এই গ্রাম।

প্রাচীন পণ্ডিতদের প্রায় প্রত্যেকেরই টোল ছিল। দেশবিদেশ হইতে পড়ুয়া আসিয়া এখানে অধ্যয়ন করিতেন। আচার্যপাড়ায় দুর্গাচরণ সিদ্ধান্তরত্ন মহাশয়ের বেশ বড় টোল ছিল। গ্রামের সুধাংশুভূষণ, যতীন্দ্রমোহন, রমেশচন্দ্র, হৈমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, সতীশচন্দ্র, চৈতন্যচন্দ্র, নিতাইচন্দ্র, শ্রীনিবাস এবং বাহির হইতে শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং বিক্রমপুরের অনেক পড়ুয়া এখানে অধ্যয়ন করিতেন। চতুষ্পাঠীতে যাহারা পড়াইতেন তাহারা দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সম্বল কয়েক ঘর যজমান আর নিমন্ত্রণের পণ্ডিতবিদায়। কিন্তু অদ্ভুত ছিল সাহস, ১০।১২ জন বিদেশি পড়ুয়ার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা তাহারা করিতেন।

সিদ্ধান্ত মহাশয়ের পরলোকগমনে গ্রামের টোল উঠিয়া গেল। সংস্কৃত চর্চার দিকে ঝোঁক কম, ইংরাজি চাই। কিন্তু সংস্কৃতদরদী লোকের অভাব ছিল না। শ্যামাচরণ দাশগুপ্ত ও পূর্ণচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়দ্বয় নিজ ব্যয়ে বৃত্তিভোগী পণ্ডিত ও ছাত্র রাখিয়া নিজ বাড়িতে তাহাদের গুরুদেব পণ্ডিতপ্রবর তারিণীচরণ শিরোমণি ও গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্নের চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। বেশ কিছুদিন এই চতুষ্পাঠী চলিয়াছিল। পরে ছাত্রাভাবে ইহা উঠিয়া যায়।

কালে কালে গড়িয়া উঠে অনেক প্রতিষ্ঠান। ছাত্রবৃত্তি স্কুল আউটসাহি বাজারে একটি চৌচালা টিনের ঘরে অবস্থিত ছিল। যুগলকিশোর গুপ্ত মহাশয় এখানে শিশুবৃত্তি স্কুল স্থাপন করেন। কামিনী গাঙ্গুলি মহাশয় প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। প্রচণ্ড-বেত্রদণ্ডের শাসনের মধ্যে শিক্ষালাভ হইত। গাঙ্গুলি মহাশয়ের বেত্রাঘাতের স্বাদ অনেককেই পাইতে হইয়াছে। এই পাঠশালায় পড়ে নাই, এমন ছেলে এই গ্রামে প্রায় একটিও ছিল না। পরে ছোটখাট অনেক পাঠশালা হয়।

আখড়া ঃ

পালপাড়াতে প্রেমানন্দ দাস আখড়া স্থাপন করেন। বেশ সঙ্গতিপন্ন বৈষ্ণব। বহু তাহার

শিষ্যসেবক। দিনরাত্রি কীর্তন হইত। প্রেমানন্দের মৃত্যুর পর ব্রজবল্লভ মোহান্ত হইয়া কীর্তনানন্দে দেশ মাতান। দেশবিদেশে তিনি কীর্তন করিতে যাইতেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন। গ্রামের মহেন্দ্র সূত্রধর একজন সুকীর্তনীয়া। মরণ কর্মকারের একটি নিজস্ব কৃষ্ণলীলার দল ছিল। রামায়ণ গানের জন্য আউটসাহির খ্যাতির কথা অনেকেই জানিত। অনেকগুলি রামায়ণের দল গ্রামের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল।

দুর্গাপূজা :

একসময় গ্রামে অনেকগুলি পূজা অনুষ্ঠিত হইত। বাবুর বাড়িতে ভগবতীর মৃন্ময়ী মূর্তি ছিল না। অষ্ট ধাতুর কাত্যায়নী মূর্তি ছিল। অসুর, সিংহ, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি মাটিদ্বারা তৈয়ারি হইত। পূজায় মহিষ বলি দেওয়ার প্রথা ছিল। হরি দফাদার বলি দিতেন। বড় বাবু (কালীপ্রসন্ন গুপ্ত) মহিষের কাটা মাথা মস্তকে লইয়া রক্তাক্ত কলেবরে পূজার মণ্ডপে প্রবেশ করিতেন। নাটমন্দিরে কলা, শশা, জম্বুরা, নারিকেল প্রভৃতি চারিদিকে টাঙ্গান থাকিত। দশহরার পর এই ফলগুলি বিতরণ করা হইত। গ্রামের উত্তরাংশে গুহমিত্রদের বাড়িতেও পূজা হইত। নোয়াদ্দা ঘটকবাড়ির পূজায় খুব জাঁকজমক ছিল। মধ্য আউটসাহির গাঙ্গুলিবাড়ি, ঘটকবাড়ি, বাঁড়ুরিবাড়ি, পালপাড়ার গোবিন্দ পালের বাড়ি, বিশ্বম্ভর কুণ্ডের বাড়ি এবং নেত্রবতীর বৈদ্যদের বাড়ি বড় পূজা হইত। আচার্যপাড়ার চাটাতিরা খুব ঘটা করিয়া পূজা করিতেন। তাহাদের প্রতিমা খুব বড় ছিল। পশ্চিম আউটসাহির ডাক্তার গৌরমোহন সেনের বাড়ি, দুর্গাচরণ বাড়ুজ্যের বাড়ি এবং হরিমোহন বিদ্যারত্নের বাড়িতেও পূজা হইত। আচার্যবাড়ি ও দাশের বাড়ির লোকেরা মাঝে মাঝে পূজা করিতেন। আউটসাহি বাজারে দুর্গাপূজার দশহরা হইত। দেশ বিভাগের পর আউটসাহি সম্মিলনীর সদস্যদের উদ্যোগে গ্রামে এক সর্বজনীন পূজা হইয়াছিল। এতদুপলক্ষ্যে প্রায় হাজার টাকা সংগহীত হয় এবং আনুমানিক পাঁচ শত টাকার মধ্যে পূজা সমাপন করিয়া বাকি টাকায় কর্তৃপক্ষ গ্রামের দুঃস্থদের মধ্যে চাউল ও কাপড় বিতরণ করেন। এই দুর্গোৎসবে শ্রীহরিকুমার ভট্টাচার্য ও শ্রীসুশীলচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়া গ্রামবাসিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন।

রয়ানী পূজা :

কবিরাজ রাধামাধব ঘটা করিয়া রয়ানী পূজা করিতেন। মনসা ও বেহুলার ইতিহাস অবলম্বন করিয়া নানারূপ মূর্তি তৈয়ারি হইত। সে এক অপূর্ব ব্যাপার! মাসাবধি মনসার গানে গ্রাম মুখরিত থাকিত। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি দিবসে পূজা হইত এবং এক মাসের আনন্দোৎসবের সমাপ্তি ঘটিত।

বিশ্বকর্মা পূজা :

ভাদ্রের সংক্রান্তিতে এই পূজা হয়। নমঃশূদ্র মিস্ত্রিরা এই পূজা করিতেন। এককালে বড়ই ঘটা করিয়া এই পূজা হইত। আউটসাহি ইংরাজি বিদ্যালয়ে ইহার দশহরা জমিত। কত নাচ, কত গান, কত উৎসাহ, কত আনন্দ, কত হৈ-হুল্লা!

স্কুলের অসুবিধা হওয়াতে পরে 'লোহাই-আন্দিতে' অর্থাৎ বসুদের ছোট দিঘিতে এই দশহরা হইত। এই উপলক্ষে নৌকা-বাইচে মহা উৎসাহ ও আনন্দের স্রোত বহিত।

কার্তিক পূজা :

এই গ্রামের কার্তিকের দশহরা বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মস্তবড় কার্তিক তৈয়ারি হইত। মনোমোহন দে (মোক্তার) নিজে কার্তিক তৈয়ারি করিতেন। অনেক কুম্ভকার তাহার মত কার্তিক তৈয়ারি করিতে পারিত না। তাহার এই কার্তিক দেখিতে গ্রামান্তর হইতে লোক আসিত। দুইদিন ব্যাপী কবিগান হইত। একটা আনন্দের ফোয়ারা ছুটিত। প্রকাণ্ড মেলা বসিত। গুপ্ত

বাবুদের বাজারে এই দশহরা হইত। বার্ষিক আনন্দোৎসবের মধ্যে কার্তিকের দশহরা ও মেলা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

পৌষপার্বণ ঃ

সমস্ত পৌষমাস ব্যাপিয়া মুসলমান ছেলের দল ছড়া গাহিয়া এই উৎসব করিত।

"আইলাম রে বরণে।
লক্ষ্মীমার চরণে।।
লক্ষ্মীমা দিলেন বর।
চাউল কড়ি বাহির কর।।"

"আর বাঘ, আর বাঘ" ইত্যাদি ধ্বনিতে সন্ধ্যার পর গ্রাম মুখরিত হইত। এই চাউল মাগিয়া নিয়া তাহারা চড়ুইভাতি করিত। নূতন ধান উঠিবার পর এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইত। সকলেই কিছু কিছু দান করিতেন। পৌষ-সংক্রান্তির দিন ঘুড়ি উড়াইবার ঘটা পড়িয়া যাইত। 'কাম্নি', 'গোপ্তা', 'বো-কাটা' ইত্যাদি ধ্বনিতে আকাশবাতাস মুখরিত হইত। এক পয়সার ঘুড়ির সূতা ধরিবার জন্য কতই না অনর্থ ঘটিত। সরস্বতী পূজার দিনও ঘুড়ি উৎসবে গ্রাম মাতিয়া উঠিত।

নীল পূজা ঃ

আউটসাহির নীলপূজার খ্যাতি কম ছিল না। মাঠের পাশে করদের মস্তবড় দিঘি। তাহার পূর্বপাড়ে গোয়ালবাড়িতে চৈত্র-সংক্রান্তির সময় অনেক দিন গভীর রাত্রিতে নিশিপূজা হইত। নিশিপূজার পরে 'বালারা' বঁইচি কাঁটা ও সিংমাছের উপর গড়াগড়ি দিতেন। সিংমাছের কাঁটা বিদ্ধ অবস্থায় শরীরে ঝুলিত। বঁইচি কাঁটায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইত, তবুও তাহারা বেদনা অনুভব করিতেন না। চড়ক পূজায় পিঠের চামড়া ফোঁড়া খুব অসম্ভব কাহিনী নয়।

নাট্যাভিনয় ঃ

নাট্যাভিনয়েও এই গ্রামের ছেলেরা পিছাইয়া ছিল না। গ্রীষ্মের ছুটিতে অথবা পূজাবকাশে কলেজ বন্ধ হইলে নাটকের মহড়া চলিত। হরিশচন্দ্র, কেদার রায়, রাজারাণী, বিল্বমঙ্গল, চন্দ্রগুপ্ত, দুই পুরুষ, মন্ত্রশক্তি অভিনীত হইয়াছিল। জ্ঞানচন্দ্র, উপেন্দ্রচন্দ্র, উপেন্দ্রকুমার, অবিনাশচন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, সুধীরচন্দ্র, অবনীকান্ত, জিতেন্দ্রমোহন, জিতেন্দ্রচন্দ্র, দেবেন্দ্রচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, মণীন্দ্রভূষণ, সত্যেন্দ্রচন্দ্র, সত্যেন্দ্রকুমার, হৃষীকেশ, নন্দলাল, মুকুন্দলাল, রণজিৎকুমার, মণীশচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, ইন্দ্রভূষণ, নৃপেন্দ্রমোহন, বিলাসচন্দ্র, অপূর্বভূষণ প্রভৃতি নাটকের বিশেষ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। গুরুগম্ভীর প্রফুল্লচন্দ্র সেন রাজারানীর রানী এবং উপেন্দ্রনাথ প্রমদা সাজিতেন, ইহা আপনাদের বিশ্বাস হয় কি? মাঝে মাঝে ভারি কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটিত। একবার 'সরলা' নাটক দাশের বাড়িতে হইতেছিল ; সন্ধ্যার সময় খবর পাওয়া গেল 'গদাধরচন্দ্র' অনুপস্থিত। অবনীকান্ত প্রস্তাব করিলেন নীলকমল ও গদাধরচন্দ্রের দুই ভূমিকায়ই তিনি একা নামিবেন। তাহাই হইল, অবনী দাদা একাই অপূর্ব কৃতিত্বের সহিত নীলকমল ও গদাধরের অভিনয় করিতে লাগিলেন। শ্যামা গদাধরের উৎপীড়ন ও আস্ফালন সহ্য করিতে না পারিয়া এক প্রচণ্ড ধারাল বঁটি হস্তে (জিতেন্দ্রমোহন শ্যামা সাজিয়াছিলেন) গদাধরকে কাটিতে গেলেন। চিকের ভিতর অবনীকান্তের নব বিবাহিতা বালিকা স্ত্রী "কাটিয়া ফেলিল, কাটিয়া ফেলিল" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন।

আই এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইবার সংবাদ যেদিন আসে ঠিক সেই দিনও নাটক করা সুধীরচন্দ্রের মত শক্ত লোকের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। এই সব অভিনয় উচ্চাঙ্গের হইত। দেশদেশান্তরের লোকের প্রশংসা অর্জন করিত। পঞ্চাশ, ষাট বৎসর পূর্বেও আউটসাহিতে উচ্চাঙ্গের নাট্যাভিনয় হইত। পরলোকগত ভোলানাথ চক্রবর্তী, অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলি, নলিনীকান্ত

গাঙ্গুলি, নিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কামাখ্যা মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন দে প্রভৃতি তখন অভিনয় করিতেন। জ্ঞানবাবু ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা।

খেলাধুলা ঃ

গ্রামে খেলার মাঠ ছিল না। কিন্তু প্রতিযোগিতায় এই গ্রাম কোন দিন পশ্চাৎপদ হয় নাই। ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায় এই গ্রামের বিশেষ সুনাম ছিল। নিশি গাঙ্গুলি, অবিনাশ সেন, রমেশ সেন, অটল গাঙ্গুলি, বিচিত্র গুহ, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, কালীত্রাণ বাঁড়ুরি প্রভৃতির খেলা যিনি দেখিয়াছেন তিনি ভুলিতে পারিবেন না। অবিনাশবাবু ক্রিকেট ও ফুটবল উভয় খেলাতেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমেশ এক সময় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিশিষ্ট সভ্যরূপে যশস্বী হন। ফুটবল খেলাতে বিচিত্রবাবুর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। অটলবাবুর ক্রীড়ানৈপুণ্যও উল্লেখ করিবার মত। উভয় খেলাতেই তিনি সবিশেষ পটু ছিলেন। বড় শহরে খেলিলে তিনি বাংলাদেশের খ্যাতনামা খেলোয়াড় বলিয়া একবাক্যে স্বীকৃত হইতেন।

পলাশতলাই একমাত্র খেলার মাঠ ছিল। এই মাঠেই নানারূপ খেলা অনুষ্ঠিত হইত। বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ অটল গাঙ্গুলি অকালে লোকান্তরিত হন। তদীয় পত্নী শ্রীমতী কনক আভা দেবী অটলবাবুর স্মৃতিতে অটল মেমোরিয়াল শীল্ড প্রদান করেন। বিক্রমপুরের নানা ক্লাব প্রতি বৎসর এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিত। সুধীরচন্দ্র সেন ক্রিকেট খেলা প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্যে তাহার পিতামাতার নামে 'আনন্দ-মোক্ষদা মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ' দান করিয়া গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের খেলোয়াড়দিগকে উৎসাহ দিয়াছিলেন।

এই সময় কিছুকালের জন্য স্থানীয় স্কুলের নিকট একটি খেলার মাঠ সংগ্রহ করা হয় এবং এই সব প্রতিযোগিতামূলক খেলা ঐ মাঠেই অনুষ্ঠিত হইত। গ্রামবাসীদের মধ্যে এই উপলক্ষ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ দেখা যাইত। গ্রামের মহিলাদের মধ্যেও অনেকে সাগ্রহে খেলা দেখিতেন।

ধর্মনিষ্ঠা ঃ

স্বধর্মনিষ্ঠার জন্য এই গ্রাম চিরদিনই বিখ্যাত। প্রাচীন যুগে বহু মহিলা সহমরণ বরণ করিয়াছেন, এরূপ জনশ্রুতি। ব্রাহ্মধর্মের যখন খুব প্রভাব তখন এই গ্রামবাসী স্বর্গত রাজেশ্বর গুপ্ত, কাশীচন্দ্র গুপ্ত এবং ঈশানচন্দ্র সেন এই ধর্ম গ্রহণ করেন। অক্ষয়কুমার সেন ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ছিলেন এবং উন্নত চরিত্রের জন্য সকলের শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন। অনেক সাধক ও ভক্তজন এই গ্রাম পবিত্র করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর সাধকশ্রেষ্ঠ চণ্ডীচরণ সার্বভৌম যুবা বয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। রজনী চক্রবর্তী মহাশয় গৃহী হইয়াও একরূপ সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি আলখাল্লা পরিতেন ; তাহার 'পাগলা হরিবোল' ধ্বনিতে গ্রাম প্রকম্পিত হইত। ছেলের দল ছুটিয়া আসিত। তিনি তাহাদিগকে কোলেপিঠে তুলিয়া আনন্দ করিতেন। কৈলাস আচার্য মহাশয় নির্বিরোধ বৃদ্ধ। তিনি গেরুয়া পরিতেন এবং সাত্ত্বিক জীবন যাপন করিতেন। চণ্ডীচরণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশীভূষণ চাটাতি বাড়িতে দেবমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। আচার্য মহাশয়ের বাড়িতে ও চাটাতি বাড়িতে প্রায়ই কীর্তন হইত। সেই প্রাণচঞ্চল, আনন্দমুখর পল্লী আজ শ্মশানে পরিণত। কোন্ পাপে, কাহার অভিশাপে গ্রামের এই শোচনীয় পরিণতি কে এই প্রশ্নের জবাব দিবে?"

স্বদেশী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে আউটসাহি যুব সমাজের অবদান আজ বিস্মৃত। গ্রামের যুব সমাজকে স্বদেশিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত বাল্য সমিতি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যুব সমাজের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। বিদেশি দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী প্রচারে তারা এগিয়ে আসে। তাদের অন্যতম প্রেরণা ছিলেন গ্রামের দুই জমিদার ভ্রাতা ইন্দুভূষণ গুপ্ত ও রাজেন্দ্রভূষণ গুপ্ত। তারা কলকাতা থেকে স্বদেশী বস্ত্রও আমদানি করেন। সে সময়ে মহাত্মাজীর চরকা আন্দোলন শুরু না হলেও, আউটসাহিতে চরকা তৈরি করে ঘরে ঘরে

বিতরণ করা হত। জমিদার বাড়িতে স্থাপিত হত সূতাকল ও সেলাইকল। সে সময়ে যুব সমাজকে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন সুধাংশুভূষণ সেন এবং অক্ষয়কুমার সেন। গ্রামের ছাত্র ও যুবসমাজ মাথায় পাগড়ি বেঁধে স্বদেশী প্রচার করত। সেসময়ে পিটুনি করও চালু হয়েছিল গ্রামে। অনুশীলন সমিতির প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না আউটসাহি। অনেকেই ছোরা ও লাঠিখেলায় দক্ষতা অর্জন করে। এই খেলা শেখাতেন পুলিনবিহারী দাসের শিষ্য হরলাল গাঙ্গুলি। স্কুল কলেজের ছাত্ররা শিক্ষাক্ষেত্র বর্জন করে স্বদেশী আন্দোলনের সামিল হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে আউটসাহিতে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনে সুরু হল নতুন পর্ব। নেতৃত্বে ছিলেন দেবেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। নানারকম জনকল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসেন। চরকা তৈরি করে বাড়ি বাড়ি পাঠাতেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, পঞ্চায়েতি মাধ্যমে গ্রাম্যবিবাদ মীমাংসা এরকম নানা কাজের মাধ্যমে তারা সর্বজন মান্য হয়ে ওঠে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে বিক্রমপুর সহ আউটসাহির মানুষও ঝাঁপিয়ে পড়ে। গ্রামে কংগ্রেস কমিটি গঠিত হলে তার সভাপতি হন প্রিয়বালা গুপ্তা এবং সম্পাদক হন অনিলচন্দ্র সেনগুপ্ত। গ্রামে একটি মহিলা সমিতি গঠিত হলে সভাপতি হন কমলকামিনী গুপ্তা এবং সম্পাদক গিরিজা গুপ্তা। সেসময়ে অন্যান্য মহিলা কর্মীদের মধ্যে ছিলেন মৃণালিনী দেবী, ইচ্ছাময়ী দেবী, হেমনলিনী দাশগুপ্তা, সুরবালা গুপ্ত, কিরণবালা সেন প্রমুখ। গ্রামের বহু যুবক তখন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে স্বদেশী আন্দোলনে জড়িত হয়ে কারাবরণও করেন। কিরণচন্দ্র সেন আউটসাহিতে 'পল্লী কল্যাণ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৩৬ খ্রিঃ। আশ্রমের কর্মকাণ্ড গ্রামের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। পরবর্তী পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন। তার প্রভাবও আউটসাহিকে উদ্দীপ্ত করেছিল।

১. ভরাকৈর ইতিহাস এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ভরাকৈর ও সাওগাঁও—হৃষীকেশ মৌলিক রচিত ও সম্পাদিত।



আত্মজীবনী
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়

"আমার জীবন বৃত্তান্ত প্রকাশের চিন্তা কখনও হৃদয়ে উদয় হয় নাই। ১২৮১ সনের চৈত্র মাসে ঢাকার সুবিখ্যাত ডেপুটি কালেক্টরবাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় আমাকে এই কার্যে প্রবৃত্ত হইতে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়া স্বয়ং সমস্ত ব্যয় প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। তাঁহারই পুনঃ পুনঃ অনুরোধে আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়া, ১২৮২ সনের আশ্বিন মাসে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিয়াছিলাম। উপরি উক্ত দেশহিতৈষী মহাত্মার উৎসাহেই আমি এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। প্রকৃত ঘটনা যতদূর স্মরণ ছিল, তাহাই এই সামান্য পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছি। অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় ইহা সুখকর হইবে না, এবং সে বিষয়ে যত্নও করি নাই। ভরসা এই যে, রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কুপ্রথাসমূহ বঙ্গবাসী প্রত্যেক হিন্দুর রক্ত বিন্দুর সহিত আন্দোলিত হইতেছে। সুতরাং অকিঞ্চিৎকর পুস্তক সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে লজ্জিত হইতেছি না। দেশহিতৈষী মহাত্মাগণ একবার পাঠ করিয়া দেখিলেই আমার সমুদয় পরিশ্রম সফল হইল মনে করবি।

আমি ফুলিয়ার মুখোটি বিষ্ণুঠাকুরের বংশোদ্ভব হরিকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র কৃষ্ণ কিশোর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র ; পিতামহ মহোদয় বল্লালি ক্ষেত্রে তিন মুখোপাধ্যায়ের এক মুখোপাধ্যায় বলিয়া বিখ্যাত। ইহাকে অনুপনয়নকালে ছলক্রমে অপহরণপূর্বক সুবিখ্যাত মহারাজ রাজবল্লভ, তাঁহার পুরোহিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যা বিবাহ করাইয়া কুলভঙ্গ করেন। আচার ব্যবহার গুণে ইনি ভঙ্গকুলীন হইয়াও সমাজে অত্যন্ত সম্ভ্রম লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি অনেকে ইহাকে ভঙ্গকুলীন বলিয়াও জানিতে পারেন নাই ; কারণ ইনি সমাজে প্রধান প্রধান শ্রোত্রিয়দিগের বাটিতে বল্লালি কিংবা বৈদিকী ক্রিয়াকালে আহুত হইয়া নৈকষ্যের তুল্য সম্মানিত হইতেন। তাঁহার সম্ভ্রম প্রভাবে আমরা অদ্যাপি সেইরূপ সুখ সম্মানের অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছি। ফলতঃ ইনি অতিশয় জ্ঞানী ও ধার্মিক ছিলেন। উক্ত পিতামহ মহাশয় বিখ্যাত বিষ্ণু ঠাকুর মহাশয়ের প্রপৌত্র। পিতামহ মহোদয় চরমাবস্থায় নব্বই বৎসর বয়সে তাপসের ন্যায় কাশীধামে বাস সরিয়া তথায় দেহ বিসর্জনপূর্বক মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি স্বয়ং ভঙ্গ হইয়াও বহু বিবাহ করেন নাই ; যদি ইচ্ছা করিতেন, উন্নত বংশজ মাত্রই সমাদর সহকারে ইহাকে কন্যা প্রদান করিতেন সন্দেহ নাই। ইহাতেই অনুমিত হয় যে, বহুবিবাহ সর্বথা ইহার অননুমোদিত ছিল। পশ্চিম বাংলার অন্তর্গত বেলঘরিয়া ইহার পৈত্রিক বাসস্থান, কিন্তু বিক্রমপুরান্তর্গত তারপাশা গ্রামে মাতার মাতামহ কর্তৃক স্থাপিত হইয়া তথায় বাস করিতেন। তারপাশা পূর্বে অতি সম্ভ্রান্তগণের আবাসভূমি ছিল। ভুলুয়া ও শ্যামপুর প্রভৃতি পরগণার ভূম্যধিকারীগণ এই স্থানের অধিবাসী, তদীয় বংশ পরম্পরা, অদ্যাপি মহাশয় বলিয়া সমাজ মধ্যে বিখ্যাত আছেন। প্রসিদ্ধ আছে রামদেব রায় মহাশয় হইতে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত ইহাদিগের বিপুল ভূম্যধিকার ছিল। কালের গতিক্রমে তদীয় বংশধরগণ বিত্তচ্যুত হইয়াছেন। পুনর্বার পূর্ব বাংলায় যত প্রধান প্রধান কুলীনগণ আসিয়াছেন তাহাদের অধিকাংশই উক্ত রায় মহাশয়দিগের আনীত এবং তজ্জন্যই ইহাদিগের অসাধারণ সম্ভ্রম। আমি উক্ত রায় মহাশয়দিগের আশ্রিত থাকিয়া পৈতৃক ভদ্রাসনেই বাস করিতেছি ; পিতা ঠাকুর মহাশয় আমাকে অতি শৈশবাবস্থায় রাখিয়া

স্বর্গারোহণ করেন। তখন পিতৃব্য শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই আমার অভিভাবক ছিলেন ; দরিদ্রতাবশত আমাকে অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি ৮টি বিবাহ করান। আমি বাল্যকাল হইতেই বহু বিবাহের প্রতি বিদ্বেষী ছিলাম, সুতরাং সম্বন্ধ নিয়া ঘটক আসিলেই নানা স্থানে পলাইয়া যাইতাম। বহু বিবাহে সম্মতি থাকিলে বোধ হয় আমাকে শতাধিক রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে হইত। অভিভাবক মহাশয়, প্রতিকূল মতি দেখিয়া প্রায় তিনশত টাকা ঋণ ভার অর্পণপূর্বক আমাকে পৃথগন্ন করিয়া দেন। তখন আমার বিদ্যা-বুদ্ধি অথবা এরূপ কোন ক্ষমতা ছিল না যে, ঐ ঋণ পরিশোধ বা পরিজন সকলের ভরণপোষণ করিতে পারি, সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া আরও ছয়টি পরিণয় স্বীকার করিতে হইল। তাহাতে আমার ঋণ পরিশোধ এবং পরিবারবর্গের কিঞ্চিৎ কালের ভরণপোষণের সংস্থান হইলে, আমি সাধারণরূপ যৎকিঞ্চিৎ বাংলা লেখা শিক্ষা করিয়া পরগণে হুশেনসাহির জমিদারদিগের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক তহশীলদারি কর্মে নিযুক্ত হইলাম। আমার প্রতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের এবং প্রজাদিগের সাতিশয় স্নেহ ছিল। এই সুযোগে বর্ষ মধ্যে ছয় মাস কাল অবকাশ গ্রহণ করিয়া শ্বশুরালয় কিংবা নিজ বাটিতেই বাস করিতাম। বাল্যকাল হইতে আমার কিছু কিছু বাংলা পদ্য ও সঙ্গীত রচনার অভ্যাস ছিল। আমি প্রধানত রমণী রমণ কাব্য নামে একখানা বাংলা পদ্য পুস্তক প্রণয়ন করি। কিন্তু অন্যূন দুই শত টাকা না হইলে ঐ পুস্তক মুদ্রিত হইতে পারে না বলিয়া পুস্তকের শিরোভাগে বিক্রমপুরস্থ কালীপাড়ার সুবিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী মহাশয়ের বিবরণ বর্ণনা করিলাম। তদ্দর্শনে উক্ত বাবু অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে দুইশত টাকা সাহায্য প্রদান করেন। তদ্দারা ঐ পুস্তকখানা প্রাচীন প্রণালীতে মুদ্রিত হয়। তৎকালে বিক্রমপুরস্থ মাইজপাড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালীকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঢাকা জেলাস্থ স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর ছিলেন, আমি তাঁহাকে উপহার স্বরূপ একখণ্ড পুস্তক অর্পণ করিলে তিনি আমাকে বালকদিগের সদুপদেশপূর্ণ একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিতে অনুমতি করেন। তদনুসারে আমি বিদ্যাবিধি নামে একখানি ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তক প্রণয়ন করি। উহা অবিলম্বেই ঢাকা জেলায় বঙ্গবিদ্যালয় সমূহের পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্য মধ্যে সন্নিবেশিত হয়। এবং ঢাকা কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত সোমনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও উক্ত কলেজাধীন স্কুলের নিম্নশ্রেণীর পাঠ্য মধ্যে উহা পরিগণিত করেন। অতঃপর আমি শৈশব জ্ঞান চন্দ্রিকা নামে একখানি ক্ষুদ্র পদ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করি। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও উক্ত কলেজের ব্যবহার শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র এবং শ্রীযুক্তবাবু সোমানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখাইলে তাঁহারা সদয় হইয়া ঢাকার ভূতপূর্ব সুবিখ্যাত কবি হরিশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে উহা সুন্দররূপে মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করেন। হরিশবাবু কর্তৃক উহা মুদ্রিত হইলে পর অতি সত্বরেই মুদ্রামুদ্রণের ব্যয় সংগৃহীত হয় এবং অত্রত্য ডেপুটি ইন্সপেক্টরগণ উহা বঙ্গবিদ্যালয় সমূহের নিম্ন শ্রেণীর পাঠ্য মধ্যে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সন্নিবেশিত রাখেন।

এক দিবস আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাস আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া এতদূর বিগলিতচিত্ত হইলাম যে, কোন মতেই অশ্রু বিসর্জন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। পাঠ সমাপ্তি মাত্রই আমি ঐ পুস্তকের সারাংশ অবলম্বনপূর্বক, সীতার বনবাস নামধেয় একখানা ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়া মুদ্রিত করিলাম। অনন্তর বর্তমান কৌলীন্য প্রথায় আমার জ্ঞাতিবর্গের ও প্রতিযোগী ব্যক্তিদিগের কুৎসিত নিয়ম এবং অসংখ্য স্ত্রী-জাতির দুরবস্থার পরাকাষ্ঠা দর্শন করিয়া আমি তাহার বিরুদ্ধবাদে দণ্ডায়মান হইলাম। এবং ১২৭৫ সনের বৈশাখ মাসে "বল্লালিসংশোধনী"* নামে কৌলিন্য সম্বন্ধীয় একটি বক্তৃতা ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া এই কার্যে মনোনিবেশ করাতে আমাকে তহশীলদারি কার্যটিও পরিত্যাগ করিতে হয়। যখন আমি ঐ পুস্তকখানা রেজেস্ট্রি করিবার নিমিত্ত সাব রেজেস্টরের কাছারিতে উপস্থিত হইলাম, তখন অনেকেই আমার পুস্তক শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং আমি ক্ষিপ্ত হইয়াছি

বলিয়া অনেকের মনে সন্দেহের উদয় হইল। কারণ অনেকেই আমাকে প্রধান বংশীয় কুলীন, এবং বহু বিবাহ আমার নিজ ব্যবসায় বলিয়া জানিতেন। সুতরাং স্বকীয় ব্যবসায়ের প্রতিকূলতা দর্শনে সকলেই আমার নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া বিজ্ঞলোক মাত্রকেই ঐ পুস্তকের এক এক খণ্ড বিতরণ করিলাম। অনন্তর বিক্রমপুরের প্রধান প্রধান শ্রোত্রীয় ও বংশজ সমাজে উপস্থিত হইয়া ঐ পুস্তক বিতরণ ও মৌখিক বক্তৃতা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন সামাজিক লোকেরা আমার মুখে এক অভিনব কথা শ্রবণ করিয়া আমাকে ক্ষিপ্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং তিরস্কার করিতেও ত্রুটি করিলেন না। অধিক কি, যে সমস্ত লোকেরা আমাকে কৌলিন্য নিয়মে দেবতার ন্যায় মান্য করিতেন তাঁহারা আমাকে বসিবার নিমিত্তও সমাদর বা সম্ভাষণ করিলেন না। আমি তাহাতে দুঃখিত না হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সকলকেই এইমাত্র অনুরোধ করিয়াছিলাম, যে আপনারা অনুগ্রহপূর্বক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি একবার পাঠ করিয়া দেখিলেই আমি কৃতার্থ হইব। কিন্তু অনেকেই ভর্ৎসনা করিয়া পুস্তক দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অনেকে গ্রহণ করিয়াও পাঠ করিলেন না। কেহ বা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আপনার লিখিত বিষয়গুলি সকলই সত্য বটে, কিন্তু আপনার জ্ঞাতি ও প্রতিযোগী ব্যক্তিগণ কি এই বক্তৃতায় বাধ্য হইবেন? কেবল আপনিই লোক সমাজে নিন্দনীয় হইবেন, সন্দেহ নাই। আবার এইরূপও এক জনরব উঠিল যে, আমার জ্ঞাতি ও প্রতিযোগী ব্যক্তিগণ সুযোগ পাইবামাত্র আমাকে হত্যা করিবেন। আমি লজ্জা ও ভয়ে তিন বৎসর পর্যন্ত শ্রোত্রিয় বংশজ সমাজান্তর্গত নানাস্থানে শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিয়া কালযাপন করিতে লাগিলাম। নিজ বাটিতে আমার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী, দুইটি কন্যা ও একটি সহধর্মিণী ছিল। আমার জ্ঞাতিগণ ও দুর্নিবার ঘটকগুলি বাটিতে আসিয়া যেরূপ ভর্ৎসনা, আস্ফালন ও বাগাড়ম্বর করিত, তাহাতে আমার পরিবারবর্গের এরূপ বিশ্বাস জন্মিল যে, উহারা আমাকে পাইবামাত্র বধ করিবে তাহার সন্দেহ নাই। তখন গমনাগমন বিষয়ে সাবধান করিবার আশায় আমার সহধর্মিণী, বালিকাদ্বয় সহ নিজ মাতুলালয় নাগরভাগ গ্রামে আসিয়াই আমার অন্বেষণে একজন লোক পাঠাইয়া দেয়। ঐ লোক আমার নিকট আসিয়া এইরূপ সংবাদ জানাইল যে, আপনাদের বাটিতে এক ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, আপনার ব্রাহ্মণী, নাগরভাগ আসিয়াছেন। অতএব আপনি শীঘ্র আসুন, তখন আমি অতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নাগরভাগ যাইয়া সবিশেষ সমাচার অবগত হইলাম। পত্নীর মাতুলগণ ও আমার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীও সবিশেষ অবগত হইয়া বলিলেন যে, যাবৎ আপনার শঙ্কা দূর না হয়, তাবৎ আপনি কোন ক্রমে বাটি যাইতে পাইবেন না, শ্রীমতীকেও এখানেই রাখিলাম, আপনিও মধ্যে মধ্যে এস্থলে আসিবেন। আমি দুই দিবস মাত্র তথায় বাস করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলাম। শৈশব জ্ঞানচন্দ্রিকা ইত্যাদি পুস্তকে যাহা কিছু উপার্জিত হইল, তাহা আমি সময়ে সময়ে ভগিনী ঠাকুরাণীকে পাঠাইয়া দিতাম। তদ্দারা তিনি নিজের ভরণপোষণও পৈত্রিক ক্রিয়া কর্মের অংশ দিয়া কোন প্রকারে কালযাপন করিতেন, আমি গ্রামে গ্রামে প্রধান প্রধান শ্রোত্রিয় বংশদিগের বাটিতে বাটিতে কেবল সংকল্প সিদ্ধির মানসে কি বালক কি বৃদ্ধ কি যুবক সকলকেই বক্তৃতা দ্বারা সদুপদেশ দিয়া বেড়াইতাম। যৎকালে আমি সামাজিক প্রাচীন শ্রেণীস্থ লোকদিগের নিকট প্রথম উপস্থিত হইতাম, তৎকালে অনেকেই আমাকে নব্য সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী বিবেচনা করিয়া অবজ্ঞা করিতেন ; কিন্তু আচার ব্যবহার দর্শন করিয়া এবং মনের ভাব জানিয়া ক্রমেই লোকসমাজ, আমার মতের অনুমোদন করিতে লাগিল। তখন সমাজ দ্বারা কন্যা পণ ও বহু বিবাহ নিবারণ মানসে একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র প্রণয়ন করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত আমি সকলকে অনুরোধ করিলাম ; কিন্তু অনেক স্থানের শ্রোত্রিয় মহাশয়গণ বলিলেন, আমরা তারপাশার মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ আপনার জ্ঞাতিগণ ও বাঘিয়ার গাঙ্গুলি মহাশয়দিগকেই অত্যন্ত আশঙ্কা করি, আপনি একাকী যে কথা বলিতেছেন, আপনার জ্ঞাতিগণ এবং প্রতিযোগী ব্যক্তি সকল সম্পূর্ণরূপে তাহার প্রতিবাদী। যদি সেই কুলমণ্ডলীর মধ্যস্থ শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বাঘিয়া

সমাজের ডিংসায়ী ও বটব্যালদিগের নাম স্বাক্ষর করাইতে পারেন তবে আমরাও অবশ্যই স্বাক্ষর করিব। সকলেই এই কথা বলিয়া বিদায় দিলেন, আমিও "ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া প্রয়োজনীয় স্থানে প্রস্থান করিলাম। বাঘিয়া সমাজে ডিংসায়ী এবং বটব্যালদিগেরই কর্তত্ব। ডিংসায়ী মহাশয়গণ সাহাবাজনগর এবং মাগুর খণ্ড ও বটেশ্বর এই তিন গ্রামে বাস করেন। তন্মধ্যে সাহাবাজনগর ও মাগুর খণ্ডের ভট্টাচার্য মহাশয়দিগেরই সমধিক সম্ভ্রম। যদিও শ্রোত্রিয় পদ মর্যাদা বিষয়ে ইহাদিগের প্রতিযোগী ব্যক্তির বিলক্ষণ সম্ভাব আছে, কিন্তু ফুলিয়া ও খড়দহ মেলস্থ প্রধান প্রধান কুলীনগণ ইহাদের শিষ্য বলিয়া ইহারা সমাজে অদ্বিতীয় সম্ভ্রম লাভ করিয়াছেন। সাহাবাজনগর গ্রামে শ্রীযুক্তেশ্বর কালীনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় এবং তদীয় পিতৃব্য ভ্রাতা শ্রীযুক্তেশ্বর রাজমোহন ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্তেশ্বর প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়গণ বাস করেন, ইহারা সকলেই অতি জ্ঞানী ও সদ্বক্তা এবং সর্বাংশে বিজ্ঞ, ইহাদের মধ্যে পূর্বোক্ত ঠাকুর মহাশয়ই জ্যেষ্ঠ, আমিও ইহারই মন্ত্রশিষ্য ; অতএব সংকল্পসিদ্ধির মানসে তাঁহার পাদ-পদ্ম চিন্তা করিয়া তদীয় নিকেতনরূপ কাশী ধামে উপস্থিত হইলাম। ভগবান আমাকে দর্শন করিয়া যেরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন, তাহাতে বোধ হইল যেন সে দিবস আমার প্রতি তিনি শতগুণে প্রসন্ন হইয়াছেন। সুতরাং আমি আপনাকে নিতান্ত সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিলাম। আমি প্রণাম করিবা মাত্র ভগবান আশীর্বাদ প্রয়োগ পূর্বক বলিলেন, আমরা তোমার জন্য লোক পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, তাহাতে তুমি আপনিই আসিয়াছ, ইহা আমার বড়ই আহ্লাদের বিষয়। আমি কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি উত্তর করিলেন, কৌলীন্য সম্বন্ধে তুমি যে সৎপ্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছ, তাহাতে আমাদের ডিংসায়ী এবং বটব্যাল শ্রেণীর সকলেই যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ফলত আমরা সকলেই সম্পূর্ণরূপে তোমার সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমি গুরুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলাম, এবং আমার এইরূপ নিশ্চয় বিশ্বাস হইল যে, যখন ভগবানের ইচ্ছা হইয়াছে, তখন অবশ্যই আমার সংকল্পসিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। আমি সানন্দে হাস্য করিয়া বলিলাম, এই মহৎ প্রস্তাবে আপনার সম্মতি বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। আপনি "সহস্রারে"ও বাস করিতেছেন এবং হৃদ্‌পদ্মেও বাস করিতেছেন। আপনার ইচ্ছা না হইলে এ প্রস্তাব আমার হৃদয়ে উদিত হইবার সম্ভাবনা কি? আপনি যেমন এদিকেও কর্তা, তেমন সামাজিক বিষয়েও কর্তা। আপনি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই।

অনন্তর আমি প্রতিজ্ঞা পত্রখানা পাঠ করিয়া তাঁহার নিকট বলিলাম যে, ইহাতে সামাজিকদিগের নাম স্বাক্ষর করাইবার মানসে প্রথমত পুষিলাল ও মাশচড়ক মহাশয়দিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলাম! তাঁহারা বলিলেন, যদি বাঘিয়া সমাজের ডিংসায়ী এবং বটব্যালদিগের নাম স্বাক্ষর করাইতে পারেন, তবে আমরাও অবশ্যই স্বাক্ষর করিব। অতএব এখন আপনাদিগের নাম স্বাক্ষর করাই একান্ত প্রয়োজনীয়। গুরুদেব বলিলেন, তুমি কিছুকাল এস্থানে অপেক্ষা কর, তোমার যাহা প্রয়োজন হইবে, আমরা তাহাই করিব। তখন তিনি শ্রীযুক্তেশ্বর রাজমোহন ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্তেশ্বর প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য প্রভৃতি মহোদয়গণকে আনাইয়া বলিলেন, তোমরা যে রাসবিহারীর জন্য লোক পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, সে স্বয়ংই এখানে উপস্থিত হইয়াছে। আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবামাত্র তাঁহারা এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন যে "অচিরে তোমার সংকল্প সিদ্ধি হউক।" বাস্তবিক আমার প্রস্তাবিত বিষয়ে তাঁহারা যারপরনাই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। এবং ঐ দিবসেই সাহাবাজনগর, মাগুরখণ্ড ও বটেশ্বর নিবাসী সমুদয় ডিংসায়ী এবং বটব্যাল মহাশয়দিগকে সংবাদ দিলেন। পর দিবস সকলে গুরুদেবের আসরে উপস্থিত হইয়া নাম স্বাক্ষর করিলেন এবং দুর্নিবার ঘটক কুলীনগুলির দৌরাত্ম্য হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্বক অভয় প্রদান করিলেন। যাহারা অনুপস্থিত ছিলেন, প্রত্যেকের বাড়িতে যাইয়া তাহাদিগেরও নাম স্বাক্ষর করান হইল। ঐ সময় কালীপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজকান্তবাবুর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে তথায় সমুদয় ঘটক কুলীন উপস্থিত ছিলেন। এই সংবাদ

শ্রবণ করিয়া তাহারা অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত করিলেন, কেহ বলিলেন, কুল কুঠার রাসবিহারীর অস্থিচূর্ণ কবির, কেহ বলিলেন, উহার নাসাকর্ণ ছেদন করিব, কেহ বলিলেন, উহার মস্তক মুণ্ডন করাইয়া ঘোল ঢালিব। তদ্রূপ বাগাড়ম্বরের সময় আমি স্বাক্ষরিত কাগজ পত্রাদি কক্ষদেশে লইয়া অক্ষুব্ধ চিত্তে বাগযুদ্ধের মানসে বীরবেশে সভামধ্যে উপস্থিত হইলাম। ব্রাহ্মণেভ্যাঃ নমঃ বলিয়া সকলকে নমস্কার এবং বাবুদিগকেও যথাবিধি অভিবাদনপূর্বক যথোচিত স্থানে আমি উপবেশন করিলে, বিপক্ষদল একবার সক্রোধ নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই আবার ডিংসায়ী ও বটব্যাল মহাশয়দিগের মুখাবলোকনপূর্বক অধোবদন হইলেন এবং বহ্বাড়ম্বরকারী কুলাচার্যগণ নির্বাক রহিলেন। এইরূপে সকলেই মৌনাবলম্বন করিলে একজন অন্য জনের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। বাবুদিগের সমক্ষেও এক কৌতুকাবহ ব্যাপার উপস্থিত হইল। এমন সময় আমার পিতৃব্য ভ্রাতার পুত্র কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়, ইঙ্গিত ক্রমে ব্রজচন্দ্র বাবুকে অনুরোধ করিলেন যে তিনি আলাপ উত্থাপন করেন। তদনুসারে উক্ত বাবু হৃদয়ের ভাব গোপন এবং বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শন পূর্বক অন্যদিকে অবলোকন করিয়া বলিলেন, রাসবিহারী খুড়া! তুমি যে নিজ বংশাবলীর নিন্দা করিয়া দেশে দেশে বেড়াও ইহার কারণ কি? যাহাতে মর্যাদার ও জীবনরক্ষার কে আপনি কুঠার আঘাত করে? আমি উত্তর করিলাম, বাবু, তুমি জমিদার, বিশেষত আমাদিগের আশ্রয়। ভাল! তুমিই বিচার করিয়া দেখ, আমিই সৎকথা বলি, না ইহারাই উচিত কথা বলেন? অনন্তর তাঁহার উত্তর অপেক্ষা না করিয়াই আমি মেল ভঞ্জন সংক্রান্ত যে একটি বক্তৃতা হিন্দু হিতৈষিণীতে মুদ্রিত করিয়াছিলাম, তাহা এবং মৎপ্রণীত একখণ্ড কৌলীন্য সংশোধিনী অর্পণ করিয়া বলিলাম, ইহারা ইহারই উত্তর করুন। যদি মহাত্মা ব্যক্তিদিগের বিচারে অকর্তব্য কার্য বলিয়া স্থির হয়, তবে আমি অবশ্য ক্ষান্ত হইব। পক্ষান্তরে কর্তব্য কার্য বলিয়া বিবেচিত হইলে এই সৎকার্য সম্পাদনে সচেষ্ট হইব বলিয়া সকলকেই অঙ্গীকার করিতে হইবে। তখন ব্রজচন্দ্র বাবু কাশীচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, রাসবিহারী খুড়া যখন বিচার প্রার্থী আছেন, তখন আমরা ইহাকে অবিচারে কি করিতে পারি? ইনি যাহা লিখিয়াছেন, আপনারা তাহার উত্তর লিখুন। আমরা বিজ্ঞ মহাশয়গণ দ্বারা বিচার করাইব। তখন কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় দম্ভ করিয়া বলিলেন, ইহার সহিত আমাদিগের কিসের বিচার? আমাদের বাইশ পুরুষ যাবৎ যে নিয়ম চলিয়া আসিতেছে তাহাই উত্তম। আমাদের পূর্বপুরুষগণ কি এককালে নির্বোধ ছিলেন? আমি উত্তর করিলাম যে, বাবু! এই কাথাটিরই বিচার করা হউক। বাবাজী বলিলেন বাইশ পুরুষের প্রথা, যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমি অবশ্যই ক্ষান্ত হইব। আমাদিগের পূর্ব পুরুষ, যে গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য হইতে মেলের উৎপত্তি হইয়াছে, তিনি নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলির সহিত কুল করেন। উক্ত ভট্টাচার্য হইতে আমার দশ পুরুষ হইয়াছে। অতএব গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্যের সন্তানের সহিত নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলির সন্তানের আদান প্রদানে বাধা কি? আর ইহাও আমাদের বিবেচনা করা আবশ্যক, যে কি হেতুই বা আদান প্রদান রহিত হইয়াছে, তাহাতেও দেখা যায় যে, কৌলীন্য মর্যাদাপন্ন কুলীনগণ মধ্যে ফুলিয়া, খড়দহ, সর্বানন্দী এবং বল্লভী প্রভৃতি ছত্রিশটা দলের উৎপত্তি হয়। আর সেই ছত্রিশ দলের লোকেরাই ছত্রিশ জন সমাজচ্যুত অর্থাৎ দোষী ব্যক্তিদিগের সমন্বয় করেন, তাহাতেই দেবীবর ঘটক বলেন "দোষাণাং মিলনং মেলঃ"। এই সূত্রেই ফুলিয়া, খড়দহ, সর্বানন্দী, বল্লভী প্রভৃতি ছত্রিশটা মেলের উৎপত্তি হইল। আর প্রত্যেক দলই অপর দলকে জাতিভ্রষ্ট জ্ঞান করিয়া আহারাদি ও আদান প্রদান রহিত করিয়াছিল। ক্রমে সেই সংস্কারের লাঘব প্রযুক্ত আহারাদির প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কেবল সামাজিক লোকদিগের অবিবেচনায় পূর্ববৎ আদান প্রদানের প্রথা প্রবর্তিত হয় নাই। আমরা যে অমূলক কথার আপত্তিতে ব্রাহ্মণ হইয়া যাবজ্জীবন কন্যাগুলিকে অদত্তা রাখিতেছি, স্বজলা বয়োজ্যেষ্ঠার পাণিগ্রহণ করিতেছি, আর এক এক ব্যক্তি শতাধিক পরিণয় করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে যারপর নাই নিন্দিত হইতেছি, ইহা হইতে মূর্খতার কার্য আর কি হইতে পারে? আমার

পিতৃব্য মহাশয় ও ভ্রাতুষ্পুত্র কাশীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলুন, আমাদিগের কোন্ পূর্ব পুরুষ বহু বিবাহ করিয়াছিলেন? কাশীচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অথবা পিতৃব্য মহাশয়ের পিতা ও আমার পিতামহ কৃষ্ণকিশোর মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি যে সমাজে অদ্বিতীয় সম্ভ্রম লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কি বহু বিবাহ করিয়াছিলেন? কেবল পিতৃব্য মহাশয় নিজে কুড়ি বিবাহ করিয়াছেন এবং আমাদিগকেও কতকগুলি বিবাহ করাইয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই বিবাহ সংখ্যার আতিশয্যে পিতামহ মহাশয় অপেক্ষা আমাদের সম্মানের কি কিছু আধিক্য হইয়াছে? না সেই নির্মল কুলে কলঙ্ক উৎপত্তির কারণ হইয়াছে? আমার নিশ্চয় বিশ্বাস এই, যেমন দৃঢ়ব্রত ভগীরথ পতিত পাবনীর প্রবাহ চালিত করিয়া পূর্ব পুরুষদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন. সেইরূপ সামাজিক মহাত্মাদিগের দয়াতেই হউক অথবা গবর্নমেন্টর আনুকূল্যেই হউক যদি সঙ্কল্পিত সংস্কার প্রথা প্রবর্তিত করিতে পারি, তবে আমাদিগের দুষ্কৃতিজনিত দুর্ভোগ হইতে নিষ্কলঙ্ক পিতৃকুল যে উদ্ধার পাইবেন, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই! বরং ইহাতে ভগীরথ অপেক্ষাও আমার অধিক কৃতিত্ব লাভের আশা আছে। ভগীরথ কেবল লোকান্তরিত পূর্বপুরুষদিগকে স্বকর্ম ভোগ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রথা প্রবর্তিত হইলে আমাদিগের নিরপরাধ পূর্বপুরুষগণের অপত্য কৃত পাপের ভোগ হইতে মুক্তি এবং আমাদিগেরও শতাধিক পরিণয় জনিত ঐহিক পাতিত্য হইতে উদ্ধার সাধন হইতে পারে। বাস্তবিক এই পাপকারী প্রথার সংশোধন হইলে যে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল সাধন হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? ধনঞ্জয় নিজ বংশাবলীকে সমরাঙ্গনে সমবেত দেখিয়া এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, জ্ঞাতিগণ নিহত হইলে তদীয় বিধবা পত্নীগণ হইতে সঙ্কর উৎপন্ন হইয়া আমাদের উর্ধ্বতন সহস্র পুরুষ নরক পতিত করিবে। যে সঙ্কর উৎপত্তির আশঙ্কায় পার্থ সমর পরিহারপূর্বক রাজ্যের আশা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহা সামান্য দোষজনক নহে। অধিকন্তু যাবতীয় পত্নীগণের ধর্ম রক্ষার অসম্ভাবনা এবং এক পুরুষের লোকান্তর গমনে অসংখ্য রমণীগণের বৈধব্য ঘটনা যখন, সেই সঙ্কর উৎপত্তির কারণ, তখন উহা সামান্য বিষয় বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে। ইহা শ্রবণ মাত্র ব্রজচন্দ্রবাবু হা হা শব্দে হাস্য করিয়া বলিলেন, কাশীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়, পাগলাকে তো কোন কথাতেই উপেক্ষা করা যায় না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, বাবু, আপনার এত যোগশাস্ত্র যুক্তি প্রয়োজন কি? আমাদের যে মন্ত্রণাটি স্থির হইয়াছে তাহা উহাকে বলুন। অনন্তর যে অভিপ্রায়ে বক্তাদিগের উচ্চতর কোলাহল রব সমুত্থিত হইয়া চতুর্দিক মুখরিত করিতেছিল, ব্রজচন্দ্র বাবুর মুখ হইতে তাহা বিনিঃসৃত হইল। তিনি বলিলেন, "রাসবিহারী খুড়া! আমরা শাস্ত্রযুক্তি বুঝি না। তুমি যদি আমাদের সকলের বিরুদ্ধ মতে চল. তবে তোমাকে সমাজচ্যুত করিব"। এ পর্যন্ত আমিও বাবুর এই কথাটিরই অপেক্ষা করিতেছিলাম। ঐ কথা শ্রবণ করিয়া আমার মনে কিছুমাত্র ভয় বা সঙ্কোচের উদয় হইল না, বরং সাহসপূর্বক হাস্য করিয়া বলিলাম. 'দেখ বাবা. এটি আমার সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয় কথা। যদি আমার ন্যায় অপরাধী আরও দুই একজন পাইতাম তবে কখনও তোমাদিগের সহিত আহারাদি করিতাম না। কিন্তু তাহা না পাওয়াতেই তোমাদিগের দেবীবরীয় কলুষিত সমাজের সংশ্লিষ্ট থাকিতে হইয়াছে"। এই কথা শ্রবণ মাত্র ডিংসায়ী ও বটব্যাল মহাশয়েরা হা হা শব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। ব্রজচন্দ্রবাবু ও কিছুকাল মৌনাবলম্বন করিয়া আমাকে প্রবোধদানপূর্বক বলিলেন. দেখ খুড়া! তোমাদের এই ব্যবসায় ব্যতিরেকে জীবিকা নির্বাহের অন্য উপায় নাই। অতএব আমরা তোমাকে অনুরোধ করি, তুমি এই চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হও। কেবল আমরাই অনুরোধ করিতেছি এরূপ নহে, ঐ দেখ তোমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও ভ্রাতুষ্পুত্র কালীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি সকলেই অনুরোধ করিতেছেন। আমি উত্তর করিলাম, দেখ বাবা, আমি যাহাদিগের অনুরোধে বাধ্য আছি তাহাতে কি ক্ষুদ্রাণুরোধে বাধ্য হইয়া এই মহৎ কার্য হইতে ক্ষান্ত হইতে পারি? বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,

আপনার জ্ঞাতিগণের এবং আমাদের অনুরোধ অপেক্ষা কাহার অনুরোধ প্রবল হইল? আমি উত্তর করিলাম, যে শাস্ত্রকে মান্য করিয়া আমরা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতেছি, যে শাস্ত্রকে বিশ্বাস করিয়া দেবদেবীর অর্চনা করিতেছি, যে শাস্ত্রকে বিশ্বাস করিয়া পিতা-মাতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিতেছি এবং যে শাস্ত্রকে বিশ্বাস করিয়া অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৈদ্য, কায়স্থেরা আমাদের দশম বর্ষীয় বালকের চরণামৃত ও পদরজ শিরে ধারণ করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইতেছেন, যদি সেই শাস্ত্র সত্য হয়, তবে যে আমাদের সহস্র পুরুষ পর্যন্ত পিতৃদেবেরা এই কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিতেছেন, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই। পিতৃব্য মহাশয় এবং কাশীচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আমাকে ইহলোকে শত্রু বোধ করিতে পারেন, কিন্তু লোকান্তর গমন করিলে যে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিবেন, তাহাতেও আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। অতএব আমি যখন এই মহৎ কার্যে জীবন পণ করিয়াছি, তখন কি তোমাদের ক্ষুদ্রাণুরোধের বাধ্য হইয়া এই মহতী চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত থাকিব? এই কথা বলিবামাত্র আমার বিপক্ষ ঘটক কুলীনবর্গের মুখ মলিন হইল, আমার পক্ষাবলম্বী ডিংসায়ী ও বটব্যাল মহাশয়েরা হা হা শব্দে হাস্য করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন, আমি ও ব্রাহ্মণেভ্য নমঃ বলিয়া প্রস্থান করিলাম। তৎপরে আমি বিক্রমপুরস্থ প্রায় সমুদায় শ্রোত্রিয় বংশজ এবং মহাত্মা কুলীনদিগের নাম স্বাক্ষর করাইয়া, তৎসমুদায় ক্রমে হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম, ঐ সময়ে মহামহিম লঙ্ সাহেব মহোদয় আমার এই মহান প্রস্তাবের সংবাদ শ্রবণ করিয়া, বিক্রমপুরস্থ কুণ্ডু বাবুদিগের বাটিতে উপস্থিত হইয়াই, তাঁহার আগমনের কারণ জানাইলেন এবং বিক্রমপুরবাসী পণ্ডিতগণের সহিত আমাকে আনয়নপূর্বক একটা সভা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে কুণ্ডুবাবুগণ সভার দিন অবধারণ করিয়া, পণ্ডিতবর্গকে আহ্বান করিলেন এবং সাহেব মহোদয়ের আগমণের কারণ জানাইয়া আমার নিকটও আহ্বানপত্র পাঠাইয়া দিলেন। আর ঐ পত্রে ইহাও লিখিত ছিল যে, আপনার প্রণীত কয়েক খণ্ড পুস্তক গ্রহণ ও আপনার কৌলীন্য বিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণ করার নিমিত্তই সাহেব মহোদয় অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়াছেন। আমি উক্ত পত্র পাঠে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া কয়েক খণ্ড পুস্তক সমভিব্যবহারে কুণ্ডুবাবুদিগের বাটিতে উপস্থিত হইলাম। পণ্ডিতগণও তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং যথা সময়ে সভার অধিবেশন হইল। পাদ্রিসাহেব আমার শৈশবজ্ঞান চন্দ্রিকা, পদ্যময় সীতার বনবাস এবং বল্লালী সংশোধনী পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। আর কৌলীন্য বিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া এবং আমি প্রধান বংশীয় কুলীন ও চতুর্দশটি বিবাহ করিয়াছি, ইহা অবগত হইয়া অসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পাদ্রি সাহেব এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মতামত জিজ্ঞাসা করাতে চতুর চূড়ামণিরা এক মাস মধ্যে সাহেবকে তাহা জানাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। সাহেবও আমার প্রস্তাবিত বিষয়ে সাধ্যানুযায়ী সহায়তা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর সভা ভঙ্গ করিয়া সকলেই প্রস্থান করিলেন। লঙ সাহেবের আগমনের সংবাদ জানিয়া আমার অভীষ্ট সিদ্ধি সম্বন্ধে সামাজিক লোকদিগের হৃদয়ে একটি আশার সঞ্চার হইল। বিপক্ষদল আমার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক পাতি উত্থাপন করিয়া স্বার্থপর ঘটক কুলীনগুলির নাম স্বাক্ষর করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং বিক্রমপুরের অনেকানেক পণ্ডিতও দুর্নিবার ঘটক কুলীনগুলিকে শঙ্কা করিয়া ঐ অবৈধ পাতিতে নাম স্বাক্ষর করিলেন। যখন শ্রীযুক্ত কালীনাথ শিরোমণি ও শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ ন্যায়বাচস্পতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ নাম স্বাক্ষর করিলেন, তখন আমি বলিলাম, আপনারা যে ধর্মশাস্ত্রবেত্তা হইয়া ধর্মের অবমাননা করত কতিপয় নরাধমের আশঙ্কায় এই হিন্দু সমাজকে তুচ্ছ করিলেন ইহা কি ভবাদৃশ ব্যক্তিবর্গের উচিত কার্য হইয়াছে? তখন পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীকান্ত শিরোমণি মহাশয় বলিলেন. আপনি একাকী একটি কথা বলিতেছেন, কিন্তু আপনার জ্ঞাতিবর্গ এবং প্রতিযোগী ব্যক্তি প্রভৃতি সকলেই উক্ত প্রস্তাবে অসম্মত। কিন্তু যখন ইহারা আমাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করিবেন, তখন কি আপনি একাকী রক্ষা করিতে সক্ষম

হইবেন? আমি উত্তর করিলাম, "আপনারা ধর্ম্ম রক্ষা করিলে, ধর্ম্মই আপনাদিগকে দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা করিতেন। যাহা হউক আপনারা অবিলম্বেই জানিতে পারিবেন যে, এই নরাধমগুলি ভিন্ন, অন্য কেহ সমাজে কর্ত্তৃত্ব করিতে সক্ষম কি না?" এই বলিয়া আমি প্রস্থান করিলাম। আমার মতের পোষণার্থ প্রথমত হিন্দু হিতৈষিণী, বিক্রমপুর পত্রিকা তৎপর ঢাকা প্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়গণ লেখনী ধারণ করিয়া, যাহাতে এই কুপ্রথা দেশ হইতে তিরোহিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে স্বীয় স্বীয় পাঠকবর্গকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সামাজিক দোষবিশেষ বলিয়া অনেকে সমাজ দ্বারাই ইহার সংশোধনের যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, এই মহৎ কার্য সমাজ দ্বারা কখনও সংশোধিত হইতে পারে না। কারণ সামাজিক শক্তির আধার স্বরূপ কোন কর্তা আমাদের সমাজে নাই। সুতরাং কর্তা ব্যতীত কর্ম হইতে পারে না। এরূপ মতভেদ সময়ে দেশহিতৈষী মহোদয়গণ প্রোক্ত কার্য সম্পাদন মানসে স্থানে স্থানে সভা সংস্থাপন করিয়া নানা দেশীয় মহোদয়গণের স্বাক্ষর ও সম্মতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন, আমিও প্রোক্ত সভা সকলে বারংবার উপস্থিত হইয়া কন্যাপণ ও বহু বিবাহ নিবারণ বিষয়ক বক্তৃতা দ্বারা সভ্যগণের উৎসাহ বর্ধন করিতে লাগিলাম এবং বারংবার কলিকাতা মহানগরীতে গমন করিয়া এ বিষয়ের প্রস্তাব করাতে তত্রত্য ক্ষমতাবলম্বী প্রধান প্রধান মহাত্মাগণও উৎসাহিত হইলেন। ভারতবর্ষীয় সনাতম ধর্ম রক্ষণী সভার সভ্য মহোদয়গণ ও প্রথমত সমাজ শাসন দ্বারা সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করিয়া ও কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। তৎপর সর্বসম্মতিক্রমে গবর্নমেন্টে আবেদন করা স্থির করিয়া, আবেদনের পাণ্ডুলিপি উক্ত সভার মাসিক কাগজে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলেন। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও আমাদের পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট দুই তিন খণ্ড পুস্তক প্রকাশ করিয়া সাগ্রহে অগ্রসর হইলেন। এ সম্বন্ধে গবর্নমেন্টের অনুকূল ভাব জানিয়া, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহোদয়গণ অপরিসীম পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আবেদন পত্রে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নাম স্বাক্ষর করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নির্দেশানুসারে ঢাকা বরিশাল ও বিক্রমপুর হইতে বহু সংখ্যক কুলীন, শ্রোত্রীয় বংশজ এবং প্রধান প্রধান বৈদ্য কায়স্থ মহাশয়দিগের নাম স্বাক্ষর করাইলাম। ইতিমধ্যে বঙ্গদেশের বিশেষত কুলীন কন্যাগণের দুর্ভাগ্য বশত পাপাত্মা সিয়ার আলি দ্বারা ভূতপূর্ব গবর্নর জেনারেল লর্ড মেওর অকালে হত্যা হওয়াতেই আমাদের সকলের উদ্যোগ চেষ্টা স্থগিত থাকিল।

তখন আমার অভীষ্ট সিদ্ধি সম্বন্ধে রাজ-শাসনে নানা বিঘ্ন দর্শন করিয়া, পুনর্বার সমাজ শাসন নিমিত্ত অত্যন্ত পর্যটন ও পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমত আমি ভঙ্গ কুলীনদিগের মেল ও পর্যায় ভঞ্জন বিষয়ে ফুলিয়া, খড়দহ, সর্বানন্দী, বল্লভী প্রভৃতি সমুদয় কুলীনগণের সম্মতি লইলাম। আমাদিগের এইরূপ মন্ত্রণা স্থির হইল যে ভঙ্গাবস্থার প্রধান প্রধান কয়েক ব্যক্তি, মেল পর্যায় ভঞ্জন করিয়া আদান প্রদান করিবেন। এবং সমাজস্থ মহোদয়গণ ঐ কার্য উপলক্ষে একটি মহতী সভার আহ্বানপূর্বক যাহাতে ভঙ্গ ও নৈকষ্য কুলীনগণ সুপ্রণালী বদ্ধ হইয়া একাধিক পরিণয় কি স্বজন ও বয়োজ্যেষ্ঠার পাণিগ্রহণ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য হইতে ক্ষান্ত থাকেন, তাহার সদুপায় বিধান করিবেন। কিন্তু অন্যূন ৫০০০ টাকা না হইলে কোন মতেই উক্ত কার্য নির্বাহ হইতে পারে না, অন্যান্য কর্মকর্তৃগণ ও তাদৃশ ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ, সুতরাং তজ্জন্য কালীপাড়ার জমিদার সমীপে এই বলিয়া প্রার্থনা করিলাম যে "আপনারা আমাদের এই মহৎ কার্য সম্পাদনার্থ সভা সংস্থাপন করিয়া সাহায্য করুন। আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হই।" কিন্তু কোন কথাতেই উক্ত জমিদারগণ সম্মত হইলেন না। তৎপরে আমি ঢাকা নগরীতে গমন করিয়া ১২৮০ সনের ৩৪ সংখ্যক হিন্দু হিতৈষিণী পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রেরিত পত্রিকাখানি প্রকাশ করিলাম।

প্রেরিত পত্র

মহাশয়, পূর্ব বাংলার কুলীন সম্প্রদায় মধ্যে ভঙ্গ কুলীনদিগের সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ আনা আর বহু বিবাহ ইহাদের ব্যবসায়। ইহারা একজনে শতাধিক পরিণয় করিয়া থাকেন, তদ্দরুণ ইহাদের কন্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। ঐ সকল কন্যাগুলিকে মেল পর্যায়ের অনুরোধে যারপরনাই দুরবস্থা সহ্য করিতে হয়। এখন আমি ভঙ্গ কুলীনদিগের মেল পর্যায় নানা অনিষ্টের কারণ বলিয়া ফুলিয়া ও খড়দহ এবং সর্বানন্দী, বল্লভী প্রভৃতি মেলস্থ সমুদয় কুলীনগণের হৃদ্বোধ জন্মাইয়াছি। ভঙ্গ কুলীনদিগের মেল পর্যায় ভঞ্জনে কাহারও কোন আপত্তি নাই। বিক্রমপুরের অনেকানেক প্রাচীন শ্রেণীর প্রধান প্রধান ভঙ্গকুলীন মহাশয়েরা মেল পর্যায় পরিত্যাগ করিয়া পূর্বরূপ সর্বসারিকতা নিয়মে আদান প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। এই কার্য নির্বাহার্থ কালীপাড়ার জমিদারদিগকে একটি সভা করার অনুরোধ করা যাইতেছে। উক্ত বাবুগণ যদি পূর্ববাংলার ঘটক, কুলীন এবং বংশজগণকে আহ্বান করিয়া একটি সভা করেন, আর ব্রাহ্মণ জমিদারগণ সকলেই ঐ সভায় যোগদান করেন, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যেই ভঙ্গ কুলীনদিগের মেল পর্যায় ভঞ্জন হইয়া অনেকগুলি কুলীন-কন্যার দুরবস্থা দূর হইতে পারে।

উপসংহার কালে সামাজিক মহাত্মাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, যাহাতে কালীপাড়ায় একটি সভা হয় এবং অন্যান্য ভূম্যধিকারিগণও ঐ সভায় যোগদান করিয়া এই সৎকার্য সম্পাদন করিতে সচেষ্ট হন, এ বিষয়ে সকলেই অনুরোধ করেন।

শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়
বিক্রমপুর—তারপাশা

উল্লিখিত প্রেরিত পত্রানুসারে হিতৈষিণী সম্পাদক বাবু ও কালীপাড়ার জমিদারণকে একটি সভা করার জন্য এবং অন্যান্য জমিদারগণকে ঐ সভায় যোগ প্রদানপূর্বক আমাদিগকে সাহায্য করণার্থ স্বকীয় পত্রিকায় বিশেষ অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু কিছুতেই উক্ত জমিদারগণের চৈতন্য হইল না। অনন্তর আমি চন্দ্রপ্রতাপ, ভাওয়াল, ধানকোড়া, মুড়াপাড়ার জমিদারগণের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের ঐ কার্য নির্বাহার্থ কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করিলাম, তাহারাও অনেকেই কিছু কিছু সহায়তা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তৎপরে আমি বিক্রমপুর হিতসাধিনী সভায় উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম, সভাও আমার পরোক্ষে সহায়তাতে সম্মত হইয়া যে সকল জমিদারগণ চাঁদা প্রদানে সম্মত ছিলেন, তাহাদিগের নিকট এই বিবরণে পত্র লিখিলেন যে, আপনারা শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবিত বিষয়ের অঙ্গীকৃত টাকা এই সভায় প্রদান করুন ; সভার বিশ্বাস মতে কার্য নির্বাহ হইবে। যদি কোন কোন কারণে কার্য সম্পাদন না হয়, তবে আপনাদের টাকা ফেরত পাইবেন। আপনাদের টাকার দায়ী সভা থাকিলেন। কিন্তু চাঁদা দাতৃগণ চাঁদার টাকা দেওয়া দূরে থাকুক, সভাকে পত্রোত্তরেও বঞ্চিত করিলেন।

যে সকল কুলীন মহাশয়েরা মেল, পর্যায় ভঙ্গ করিয়া আদান প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তাহারাও প্রায় দুই বৎসর পর্যন্ত এ অপেক্ষায় থাকিয়া, তৎপরে অনেকেই বর্তমান প্রণালীতে কার্য করিলেন। অনেকে আদান প্রদান স্থগিত রাখিয়া অনবরত জগদীশ্বর সমীপে আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হউক বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আমিও একেবারে নিঃসহায় হইয়া নিম্ন লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে বিক্রমপুরের প্রায় সমুদয় বংশজদিগের নাম স্বাক্ষর করাইলাম।

প্রতিজ্ঞা পত্র

"ভঙ্গকুলীনদিগের মেল ও পর্যায় নানা অনিষ্টকর বিবেচনায় আমরা বংশজগণ এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ভঙ্গকুলীন মহাশয়েরা মেল পর্যায় ভঞ্জন করিয়া পূর্বরূপ সর্বসারিকতা নিয়মে

আদান প্রদান করিলে, আমরা তাঁহাদিগের কুলের হানি জ্ঞান করিব না ; কারণ অদ্যাপি আমরা কৌলীন্য গ্রন্থে স্পষ্ট জানাইতেছি যে, ইহা দেবীবরের কৃত নানা অধর্মকর আধুনিক প্রথা, সুতরাং ইহা ত্যাগ করিলে কুলীনদিগের কৌলিন্য মর্যাদার হানি কোন মতেই হয় না। অতএব আমরা ইহাতে যারপর নাই সন্তোষের সহিত সম্মত আছি। আর যাহারা এই নিয়মে আদান-প্রদান করিবেন তৎ সন্তানদিগের নিকট আমরা চির প্রচলিত প্রথা মতে গণপণ দিয়া কন্যা প্রদান করিব।

আমাদের পূর্ব্ববৎ পরস্পর আদান প্রদান না থাকাতে বংশাভাব এবং অনেকে বিজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া জাতি মান নাশ করিতেছেন। তৎ প্রযুক্ত আমরা বিধান করিতেছি যে, আমাদের তুল্য প্রতিযোগী মতে আদান-প্রদান করিলে, কাহারও কোন মানে হানি হইবে না।

আমরা মন্বাদি শাস্ত্রের মতে অর্থাৎ কন্যাদি কারণ ভিন্ন কৃতদার পাত্রে কন্যা প্রদান করিব না। সকলেই উপরোক্ত বিবরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া এই পত্রিকায় নাম স্বাক্ষর করিলাম। অনন্তর বিক্রমপুরস্থ প্রধান প্রধান বংশজ ও নিম্ন কুলীনদিগের নাম ধাম ইত্যাদি উক্ত প্রতিজ্ঞা পত্র হিন্দুহিতৈষিণী ও ঢাকা প্রকাশে প্রকাশ করিলাম এবং ১২৮৭ সনের ২৪ অগ্রহায়ণ তারিখে পাঁচ পুরুষ ভঙ্গ কেশব চক্রবর্ত্তীর সন্তানে আমার ও আমাদের কন্যা প্রদান করাতে অনেকানেক প্রধান প্রধান ভঙ্গকুলীন মহোদয়গণ পূর্ব প্রথা পরিত্যাগ করিয়া আদান প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদা ঢাকা নিবাসী প্রাতঃস্মরণীয় আমার মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরাজমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়গণ একত্র হইয়া বহু বিবাহ নিবারণ বিষয়ে বিবিধ প্রকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তখন কালীপ্রসন্ন ও রাজমোহন বাবুর প্রস্তাবে ব্রজসুন্দরবাবুর পোষকতা ক্রমে স্থিরীকৃত হয় যে, বর্তমান কৌলিন্য কুপ্রথা বিষয়ক কয়েকটি সঙ্গীত আবশ্যক।...

অনন্তর আমি বিক্রমপুর ও বাকরগঞ্জের প্রধান প্রধান পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইয়া উক্ত গানগুলি প্রকাশ করিতে লাগিলাম এবং সর্বসাধারণেই গানগুলি শিখিয়া সর্বদা হাটে মাঠে গাহিতে লাগিল। বিশেষত রমণীগণ দ্বিতীয় বিবাহাদিতে অশ্লীল গান পরিত্যাগ করিয়া, আনন্দের সহিত উক্ত গানগুলি গাহিতে লাগিল। সামাজিক লোকেরাও শুনিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে সকলের মত পরিবর্তিত হইয়া উঠিল। আমার চেষ্টার পূর্বের শ্রোত্রীয় ও বংশজদিগের এই প্রকার নিয়ম ছিল যে কিঞ্চিৎ উন্নতাবস্থা হইলেই প্রধান কুলীনে অর্থাৎ বহু বিবাহকারী পাত্রে কন্যা প্রদান করিয়া যাবজ্জীবন কন্যাগুলির দুরবস্থার একশেষ করিতেন। এখন অনেকেই পরিণাম দৃষ্টি করিয়া নামমাত্র কুলীনে সৎ পাত্র পাইলেও কন্যা প্রদান করিতে লাগিলেন। পূর্বে কুলীনদিগেরও এই নিয়ম ছিল যে যাহারা ৩০০ তিন শত টাকা পর্যন্ত কন্যাপণ দিতে ইচ্ছুক থাকিয়াও একটি পুত্রকে বিবাহ করাইতে পারেন নাই, তাহারাও ২০/১৫/৩০ বৎসর পর্যন্ত কন্যাগুলি অদত্তা রাখিয়া এক এক বহুবিবাহকারী পাত্রে ৫/৭টি কন্যা এককালীন প্রদান করিতেন। অধুনা তাহারাও অনেকেই এক একটি অকৃতদার পাত্রে এক একটি কন্যা প্রদান করিতে লাগিলেন। এমন কি এখন আমার প্রস্তাবিত বিষয়ে সমুদয় ঘটক, কুলীন সম্মত আছেন। কিন্তু যে পরিমাণ লোক সমবেত হইলে আমাদের সুনিয়মাবলী সংস্থাপন করিয়া প্রাচীন শ্রেণীস্থ প্রধান প্রধান কুলীন মহোদয়গণ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, তদ্রূপ সাহায্যকারী ধনী কিংবা জমিদারগণ অমনোযোগী থাকাতেই আমি সমাজ শাসনের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া যৎকালে ঢাকা নগরীতে গবর্নর জেনারেল বাহাদুর শুভাগমন করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহার সমীপে বহু বিবাহ নিবারণ মানসে যে আবেদনপত্র প্রদান করিয়াছিলাম, সর্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

To,

His Excellencey the Viceroy and Governor General of India.

May it please your Lordship. We the undersigned subjects of her gracious Majesty in the District of Dacca and its vicinity beg most respectfully to approach your Lordship with this humble memorial with sanguine hope that the subject of great interest concerning the present state of Hindu females which your memorialists bring to notice may meet with your Excellency's kind consideration.

The most detestable system of polygamy which obtains among Hindus more specially among the Koolin Brahmins of Bengal has been the cause of great mischief to the community and distress and misery to the poor and helpless females whose condition makes them the object of your Lordship's pity.

The Koolin Brahmins make marriage as their profession and marry many wives for a vain consideration of a trifling money but never take care of interest of their wives.

The present system of polygamy is not warranted by any authority. nay it is repugnant to the rules of Hindu Law. and in consistent with the dictates of morality and conscience.

This system does never obtain among any other nations. It has taken its roots so deep among Hindus in Bengal. that it has become totally impossible for the community to exert to uproot it. without the interference of the Sovereign power, We humbly presume therefore to pray for a Legislative interference to put a stop to this system except in case of barrenness. inchastity & c. of the wife as permitted by the rules of HIndu Law.

And your memorialists as in duty bound shall ever pray.

To,

Dr. Lyall Esqr. B. S.

Magistrate of Dacca.

Sir.

I beg most respectfully to bring before your honour the accompanying memorial signed by the respectable Hindus of Dacca and its vicinity and solicit the favour of your forwarding to His Excellencey the Viceroy and Governor General of India.

I have the honour to be, sir,
your most obedient servant,
RASHBEHARY MOOKERJEE

Pandit Iswar Chandra Bidyashagar's first discourse on polygamy Vol.I
Ditto Vol. II

One Pamphlet called Koulinnashangsheodhini.

A pamphlet containing the proceedings of the Sonatan Dharmarakshine Shabha of India at Calcutta regarding Koolinism.

A pamphlet containing the proceedings of the Fareedpoore Society for the prevention of the absue of Koolinism and the sale of daughters.

A Lecture on Koolinism delivered by Babu Abhaychandra Das at Dacca.

এই আবেদন পত্রের পাণ্ডুলিপি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রেরিত। ইহাতে বহু সংখ্যক কুলীন ও বহু বিবাহকারী কুলীন এবং প্রধান প্রধান বৈদ্য, কায়স্থ মহোদয়গণের নাম স্বাক্ষর করাইয়া ঢাকার ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে আবেদনপত্র অর্পণ করিয়াছিলাম। আর ঐ আবেনদপত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ভারতের সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার কৌলীন্য বিষয়ক বক্তৃতা ফরিদপুর কৌলীন্য সংশোধিনী সভার পুস্তক, শ্রীযুক্তবাবু অভয়চন্দ্র দাস মহাশয়ের কৌলীন্য বিষয়ক বক্তৃতা, তৎ প্রণীত কৌলীন্য সংশোধিনী পুস্তক প্রভৃতি অর্পণ করিয়াছিলাম। গভর্নর জেনারেল বাহাদুর ঐ আবেদনপত্র পাইয়া আমাকে যে পত্রিকাখানি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

Sylhet Camp,
Dated, the 10th August.

To,
Babu Rash Behary Mukhopadhyay
Dacca

Sir,

By order of the Governor General your Letter of the 3rd instant with the papers annexed therewith has been forwarded to the Secretary of the India Government, Home Department, for proper order.

Yours obediently
Captain Baring
Private Secreatrary to the Governor General.

অনন্তর ঐ আবেদনের পোষকতার্থে আমি বাকরগঞ্জ জিলায় গমন করিয়া নানা পল্লী ভ্রমণপূর্বক বহু সংখ্যক কুলীন, শ্রোত্রীয় ও বংশজ এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আর প্রধান বৈদ্য, কায়স্থ মহাশয়দিগের নাম স্বাক্ষর করাইয়া রায়েরকাঠি নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু মাধবনারায়ণ রায়চৌধুরী মহোদয় দ্বারা উপরিউক্ত বিবরণে আর একখানি আবেদনপত্র গভর্নমেন্টে অর্পণ করিলাম।

আমি যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছি, তাহা এই—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠাতীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা শান্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্।।

আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ দর্শন, শান্তি, তপ, দান এই নয়টি ব্রহ্মচর্যের লক্ষণ দর্শন করিয়া আদিশূরানীত পঞ্চ গোত্রজ, পঞ্চ বিপ্রের সন্তানদিগকে বিখ্যাত বল্লালসেন মহামান্য কৌলীন্য মর্যাদা প্রদান করেন। অনন্তর লক্ষ্মণসেন ইহাদিগকে গুণাগুণের পরীক্ষা মানসে

রাজবাটিতে আহ্বান করায় কতকগুলি কুলীন নিত্যক্রিয়া সমাধান না করিয়াই এক প্রহরের সময়ই নিত্যকর্ম সম্পাদন করিয়া এবং অনেকে যথাবিধি মতে ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ করিয়া আড়াই প্রহরের পর রাজধানীতে উপনীত হইলেন। লক্ষ্মণসেন, যাহারা আড়াই প্রহরের পর উপস্থিত ছিলেন, কেবল তাহাদিগকেই নবগুণ বিশিষ্ট জানিয়া সম্পূর্ণ কৌলীন্য মর্যাদাসম্পন্ন রাখিলেন। যাহারা দেড় প্রহরের সময় উপস্থিত ছিলেন, তাহাদিগের প্রতি এইরূপ বিবেচনা করিলেন, যে ব্রাহ্মণে কেবল শ্রাদ্ধানুরোধেই দেড় প্রহরের মধ্যে নিত্য ক্রিয়া সমাধা করিবে ইহাদিগের ক্রিয়া লোপ হয় নাই। কিন্তু শান্ত ভাব রহিত বিধায় তাহাদিগের অষ্টগুণে শ্রোত্রীয় সংজ্ঞা করিলেন। যাহারা এক প্রহরের সময় উপস্থিত ছিলেন, তাহাদিগেরই বংশজ সংজ্ঞা করেন, অর্থাৎ ইহারা সম্পূর্ণ গুণহীন বিবেচনায় কেবল সদ্বংশজাত বলিয়াই বংশজ সংজ্ঞা করিয়াছিলেন। তৎকালে কুলীনগণ কেবল ব্রহ্মচর্যের প্রভাবেই কৌলিন্য মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদনন্তর ধূর্তচূড়ামণি দেবীবর নিষ্ঠা শান্তি স্থলে নিষ্ঠা বৃত্তি পাঠ পরিবর্তন করিয়াই কুলীনগণের কন্যাগত কুল করেন। মহাত্মা ব্যক্তি মাত্রই বিবেচনা করিতে পারেন, বল্লাল কি লক্ষ্মণসেন, কন্যাগত কুল করিয়া কুলীনদিগকে বিপদগ্রস্ত করার কিছু মাত্র কারণ দৃষ্ট হয় না, আর যৎকালে পরীক্ষা করেন তৎকালেও কুলীনদিগের আদান-প্রদানের বিবেচনায় মর্যাদার ন্যূনাধিক করেন নাই। সুতরাং দেবীবরের দুরভিসন্ধি হইতেই কুলীনদিগের কন্যাগত কুলের সৃষ্টি হয়।

তৎ প্রমাণস্বরূপ অদ্যাপি কায়স্থাদির সেইরূপ কৌলীন্যের নিয়ম রহিয়াছে। যদিচ দেবীবর কন্যাগত কুল করিয়াছিলেন, তথাপি এক পুরুষের বহু বিবাহ করা কি যাবজ্জীবন কন্যাগুলিকে অদত্তা রাখা কি স্বজনা ও বয়োজ্যেষ্ঠার পাণিগ্রহণ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য করা হইত না। কারণ তৎকালে কুলীনগণ, সর্বদারিকতাবস্থায় থাকিয়া, সকলের সহিতই সকলের আদান প্রদান করার প্রথা প্রচলিত ছিল। আর এক ব্যক্তি একটি কন্যা নিম্ন পাত্রে প্রদান করিলে যে কিঞ্চিন্মাত্র ম্লান জ্ঞান করিতেন, পুনর্বার দ্বিতীয় কন্যা উর্ধ পাত্রে অর্পণ করিলেই সম্পূর্ণ মর্যাদা প্রাপ্ত হইতেন। তৎপরে দেবীবর কুলীনদিগকে ছত্রিশটা মেল শৃঙ্খলে দৃঢ় বন্ধন করাতেই ইহাদিগের এই দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে। কৌলীন্য মর্যাদা প্রাপ্ত হওয়ার পর কুলীনগণ দ্বাদশ পুরুষ পর্যন্ত সুনিয়মে ছিলেন। তৎপরে আহিত মুখোপাধ্যায় বংশোদ্ভব গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য আর যোগেশ্বর পণ্ডিত হইতেই মেল উৎপত্তি হয়। পূর্বে কুলীনগণ পূর্ব বাংলাতেই বসতি করিতেন, তৎ প্রযুক্ত পূর্ব বাংলা কুলীনদিগের আদি স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরে গঙ্গাহীন স্থানে বাস করিতে অসম্মত হইয়া অনেকেই বল্লালের নিকট গঙ্গাতীরে বাসস্থান প্রার্থনা করাতে বল্লাল সেন ফুলিয়া ও খড়দহ প্রভৃতি গ্রামে কুলীনদিগের বসতি স্থান প্রদান করেন। যৎকালে ফুলিয়াতে গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য আর খড়দহে যোগেশ্বর পণ্ডিত সমাজপতি ছিলেন, তৎকালে শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় আর মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় উভয়কে উভয় সমাজে সমন্বয় করাতেই প্রথম ফুলিয়া ও খড়দহ এই দুইটি দলের উৎপত্তি হয়। অনন্তর এখনও যেমন কোন গ্রামে অধিক লোকের বাস থাকিলে প্রথম দুইটি তৎপরে ক্রমে ৪/৫টি দোষে ৪/৫টি দল হয়, তদ্রূপ এই পঞ্চ গোত্রের বহু সন্তানেও সর্বানন্দকে সমন্বয় করিয়া সর্বানন্দী কি বল্লভকে সমন্বয় করিয়া বল্লভী প্রভৃতি ক্রমে ছত্রিশটি দোষী ব্যক্তির সমন্বয় করাতে ছত্রিশটি দলের উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই কারণেই দেবীবর দোষানাং মিলনং মেল এই সূত্রে ছত্রিশটি মেল নির্দেশ করেন। ইহারা প্রত্যেক দলেই অপর দলকে জাতিভ্রষ্ট জ্ঞান করিয়া আহারাদি ও আদানপ্রদান রহিত করিয়াছিলেন। এখন দীর্ঘকাল গত হওয়াতেই সেই সকল দলাদলির ভঞ্জন হইয়া পুনর্বার সকলের সহিত সকলের আহারাদি করা হইতেছে। কিন্তু আদান প্রদানের কোট অদ্যাপিও বর্তমান থাকাতে এক এক ব্যক্তির শতাধিক পরিণয় করা কি কতকগুলি কন্যাকে আজীবন অদত্তা রাখা এবং পশুবৎ স্বজনা ও বয়োজ্যেষ্ঠার পাণিগ্রহণ করা হইতেছে। অতএব যেমন ছত্রিশটি দলাদলির ভঞ্জন হইয়া পুনর্বার সকলের সহিত সকলের আহারাদি করা হইতেছে, তদ্রূপ সকল মেলের সহিত সকল মেলের পূর্ববৎ আদান প্রদান সুখ,

সম্মান ও পূর্ণ সমন্বয়ের সহিত সংসারযাত্রা নির্বাহ করা হয় এই আমার বাঞ্ছা। উপসংহারে মহাত্মা ব্যক্তি বর্গকে ইহাও জানাইতেছি যে বর্তমান কৌলীন্য প্রথায় আমার সম্পূর্ণ সার্থকতা আছে। আমি ফুলিয়ার মুখোটি বিষ্ণু ঠাকুরের বংশোদ্ভব। এবং কাঁচাদিয়ার কুলাচার্য মহামান্য বৈদ্যনাথ বিদ্যাভূষণ ঘটক মহাশয়ের দৌহিত্র। পিতৃকুল বহু বিবাহ করিয়া প্রতিপালন হইতেছেন। মাতৃকুল বর্তমান কৌলীন্য দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। অভিভাবক মহাশয় আমাকে বহু বিবাহ করাইয়া সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়াছেন। আমিও সন্তানগণকে বহু বিবাহ করাইলেই একপ্রকার জীবিকা নির্বাহ করিতে পারি। কিন্তু এই পাপ প্রথা আমাদের ঐহিক ও পারত্রিকের অনিষ্টকর বলিয়াই আমি কৌলীন্য সংশোধিনী পুস্তকে ও সংগীতাদিতে ইহার সবিস্তার দোষ প্রকাশ করিয়া সংশোধনের প্রার্থনা করি। এসম্বন্ধে যে সকল পত্র ও পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার কয়েকখানা মাত্র সর্বসাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশ করিলাম।

ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্মবলম্বী সভার পত্র

ধার্মিকবর শ্রীযুক্তবাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়, দেশ হিতৈষি বরেষু।—

সবিনয়মাবেদনম্। আপনার ১১ চৈত্র দিবসীয় পত্রসহ বহু বিবাহ ও কন্যাপণ নিবারণ পক্ষে সম্মত ব্যক্তিগণের স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞা পত্রের প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইয়া সভা অসীম আনন্দ লাভ করিলেন। উক্ত প্রথাদ্বয় নিবারণ পক্ষে আপনি যে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া ঈদৃশ আয়াস স্বীকার দ্বারা এতৎ সভার প্রস্তাবের পোষকতা করিতেছেন, ইহা নিতান্ত সন্তোষের বিষয় সন্দেহ নাই ও অঞ্চলের লোকদিগের ঔদাস্য ও বিরুদ্ধাচারণ যদিও ক্ষোভকর বটে, কিন্তু তদ্দারা যে কোন হানি হইতে পারে এমত বোধ হয় না। রাজ নিয়ম দ্বারা কর্মটি সুসিদ্ধ করা এখানকার বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই অমত। সে যাহা হউক সভার মহাধিবেশন সময় নিকটবর্তী, ঐ উপলক্ষে অনেক পণ্ডিত মহাশয়দিগের বিচারে কি প্রকার ধার্য হয়, শীঘ্রই জানা যাইবে এবং যথাকালে আপনিও নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হইবেন। ও অঞ্চলের গণণীয় ঘটকদিগের বিশেষত যাহারা উক্ত বিষয়ে প্রতিকূলতাচরণ করিতেছেন তাহাদের সকলের ঠিকানার সহিত একখানা তালিকা অবিলম্বে পাঠাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

কিমধিকমিতি।
কলিকাতা, পাথরিয়াঘাটা।
ধর্ম সভার কার্যালয়। ১৯১৮

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।
অবৈতনিক সম্পাদক।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পত্র।

অশেষগুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্তবাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়, মদেকসদয়েষু

সাদর সম্ভাষণমাবেদনম্। আপনার প্রণীত কৌলীন্য বিষয়ক একখণ্ড পুস্তক পাইয়াছি। আমার পুস্তক মুদ্রিত হওয়ার পূর্বে এই পুস্তক পাইলে আমি তন্মধ্যে ইহার আদ্যন্ত সন্নিবেশিত করিতাম, এবং আপনার পুস্তক আদ্যন্ত পাঠ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছি ও তাহার ইংরেজি অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছি। আমার পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে এই অনুবাদও মুদ্রিত হইবে। ইংরেজি অনুবাদ পক্ষীয় সাহেববর্গের অবগতির জন্য মুদ্রিত হইতেছে। তাহারা আপনার পুস্তকের অনুবাদ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। এক ব্যক্তি বহু বিবাহকারী কুলীন বহু বিবাহ প্রথায় বিরক্ত হইয়া যাহা বলিতেছেন, তাহাতে তাহাদের মনে এতদ্বিষয়ক অন্যায় ও অত্যাচারের বিষয় যত প্রতীতি জন্মিবে, অন্য লোকের কথায় তত হইবার সম্ভাবনা নহে।

গভর্নর জেনেরল বাহাদুর আগামী নভেম্বর মাসে কলিকাতা প্রত্যাগমন করিবেন। ঐ সময়

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের অভিপ্রেত বিষয়ের সবিশেষ সমস্ত জানাইব এবং যাহাতে তিনি এতদ্বিষয়ে অনুকূল হন তাহার যথোচিত চেষ্টা করিব। ইতিমধ্যে আবেদন পত্র স্বাক্ষর করাইয়া প্রস্তুত হইতে হইবে। এ অঞ্চলের স্বাক্ষরকার্য আরম্ভ হইয়াছে। যাহাতে সকলে মনোযোগী হইয়া অধিক স্বাক্ষর করেন, তাহার চেষ্টা দেখিতেছি এবং তজ্জন্য সকল স্থানে যাইতেও হইতেছে। এ অঞ্চলের নাম স্বাক্ষরের বন্দোবস্ত শেষ হইলে আপনাদিগের অঞ্চলে যাইবার ইচ্ছা আছে। যদি নিতান্ত অসুবিধা না হয়, পূজার পর যাইব স্থির করিয়াছি। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর যত অধিক হইবে ইষ্টসিদ্ধির ততই সম্ভাবনা। এখানকার কর্তৃপক্ষ মনোযোগী না হইলে ইংলণ্ডীয় কর্তৃপক্ষের গোচর না করিয়া এবার ক্ষান্ত হওয়া হইবে না।

বহু বিবাহকারী কুলীনদিগের নামাদি সংগৃহীত হইলেও অনুগ্রহপূর্বক পাঠাইয়া দিবেন, কোজাগর পূর্ণিমার মধ্যে না পাইলে কোনও উপকার হইবে না।

সর্বসাধারণের জন্য যে আবেদনপত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে আর কিছু পরিবর্তিত করিবেন না। যেরূপ হইলে কর্তৃপক্ষের অভিমত হইবে তদনুরূপ করা হইয়াছে। কুলীনদিগের আবেদনপত্র পরিবর্তন আবশ্যক বোধ হইলে করিতে পারেন। অত্রত্য সমস্ত মঙ্গল। মহাশয়ের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সংবাদ দ্বারা পরিতোষ প্রদানে আজ্ঞা হয়। ব্যস্ততাবশত ভাল করিয়া পত্র লিখিতে পারিলাম না। ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না। কিমধিকমিতি।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্মোপদেশিনী মাসিক পত্রিকা। ১২৭৭। ফাল্গুন।

তদনন্তর বিক্রমপুরান্তর্গত তারপাশা গ্রামনিবাসী ফুলে মেল, সম্প্রদায়ক শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, বল্লালকৃত বর্তমান কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বহু বিবাহ ও শুক্র বিক্রয় নিবারণ জন্য স্বরচিত গ্রন্থের মর্ম অবলীলাক্রমে বক্তৃতা করিয়া সভ্যগণের অসীম সন্তোষ সমুৎপাদন করণান্তর ধন্যবাদ লাভ করিবেন।

এডুকেশন গেজেট ১২৭৯। ৪৩ সংখ্যা।

কৌলীন্য সংশোধন ও কন্যাপণ নিবারণ সম্বন্ধে বাকরগঞ্জে কোন উদ্যোগ হয় না, এজন্য বিক্রমপুরের শ্রীযুত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এদেশে আইসেন। প্রথমত রাজনগর গ্রামে একটি ক্ষুদ্র সভাতে বক্তৃতা করিয়া অনেককে তাঁহার প্রার্থনার বিশেষ মর্ম জ্ঞাত করাইয়া সন্তুষ্ট করেন। সকলেই এক বাক্য হইয়া তাঁহার প্রার্থনাকে সৎ বলিয়া স্বীকার করেন। তৎপরে কোটালিপাড়া রাঢ়ী শ্রেণী এবং বৈদিক শ্রেণী উভয় শ্রেণীর লোকেরাই তাঁহার রচিত পুস্তকাদি এবং কৌলীন্য ও কন্যাপণ নিবারণ বিষয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ও তাঁহার সদভিপ্রায়ে ধন্যবাদ করিলেন। তৎপরে শিকারপুর, রাকুদিয়া ও রহমতপুরের লোকেরাও তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাকার কুলীন এবং শ্রোত্রীয় বংশজ সকলে মুক্তকণ্ঠে তাহার মতকে উত্তম বলিয়া স্বীকার করিলেন। তৎপরে গাড়ুরিয়া, কলসকাঠির জমিদার ও কুলীন মহাশয়েরাও সকলে যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন। কেবল কলসকাঠির বাবু বরদাকান্ত রায় এসকল মতে সন্তুষ্ট হন নাই। আরও দুই একজন রাসবিহারী যদি সমাজ শোধনে ব্রতী হইয়া তাঁহার ন্যায় পরিশ্রম ও পর্যটন করেন, তবে বিশেষ উপকারের বিষয় হয়।

ঢাকা প্রকাশ ১২৮১, ৪ সংখ্যা

বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়কে না জানেন, বোধ হয় না ঢাকা প্রকাশের গ্রাহকমণ্ডলীর মধ্যে এমন কোনও ব্যক্তি আছেন। ইনিং স্বয়ং কুলীন ও বহু বিবাহকারী হইয়াও বহু দোষাকর অধিবেদন প্রথার নিরাকরনোদ্দেশে কায়মনোবাক্যে অপরিসীম ক্লেশ সহকারে

প্রতিনিয়ত যেরূপ যত্ন করিতেছেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিলে এমন ব্যক্তি নাই, তাঁহাকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন। ইনি বহু বিবাহের বহু দোষদ্যোতক পুস্তক ও গান রচনা করিয়া সর্বত্র প্রচার করিতেছেন, অসহনীয় শীতবাতাতপ এবং সামাজিক অসভ্য লোকের উৎপীড়ন ও অপমান সহ্য করিয়াও স্থানে স্থানে পরিভ্রমণপূর্বক উক্ত বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি আকর্ষণ করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন অথচ নিজের দারিদ্র্য পরিবার বর্গের অন্নাচ্ছাদন ঘটিত কষ্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ মাত্র করিতেছেন না। রাসবিহারীর ন্যায় একজন সাধারণ ব্যক্তির সম্বন্ধে এতদপেক্ষা মহত্বের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা ইহার সহিত আলাপ ব্যবহার করিয়া যেরূপ জানিয়াছি, তাহাতে দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি, ইনি উল্লিখিত বিষয়টি তাঁহার জীবনের একটি প্রধান লক্ষ স্থির করিয়াছেন। এক মুহূর্তের নিমিত্তও ইহাকে উক্ত বিষয়ের চিন্তা আলোচনা অথবা কোন না কোনরূপ উদ্যোগ চেষ্টা শূন্য থাকিতে দেখা যায় না।

ইতঃপূর্বে গবর্নর জেনেরল বাহাদুর ঢাকায় আগমন করিলে তাঁহার সমীপে প্রচলিত অধিবেদন প্রথা আইন দ্বারা নিবারণ করিতে যে আবেদন প্রদত্ত হয়, তাহাও প্রধানত শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের প্রযত্নে প্রস্তুতিকৃত এবং বহু সংখ্যক ভদ্র সম্ভ্রান্ত সামাজিক হিন্দুদিগকর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত উক্ত আবেদনের কোন ফল দর্শন না করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে এই এক সংস্কার জন্মিয়াছে, ঢাকা হইতে যেরূপ আবেদন প্রদত্ত হইয়াছে, বাঙ্গালী প্রধান যাবতীয় স্থান হইতে যদি এইরূপ আবেদন প্রেরিত হয় গবর্নমেন্ট অবশ্যই মনোযোগী হইয়া প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন, উক্ত রূপ সংস্কারের বশবর্তী হইয়াই কিছুদিন হইল উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় বরিশালে গমন করিয়াছিলেন। ঐ জেলার নানা পল্লীতে পরিভ্রমণপূর্বক বহু সংখ্যক কুলীন বংশজ, শ্রোত্রিয় ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতির মত এবং নাম স্বাক্ষর করাইয়া রায়েরকাঠি নিবাসী দেশহিতৈষী জমিদারবাবু মাধবনারায়ণ রায়চৌধুরী মহোদয়ের দ্বারা উক্ত বিষয়ে আর একখানি আবেদনপত্র গত ৮ মাঘ তারিখে গভর্নমেন্টে প্রেরণ করিয়াছেন। পরন্তু আগামী আষাঢ় মাসে কৃষ্ণনগর, কলিকাতা এবং হুগলি অঞ্চলে গমন করিয়া তত্রত্য প্রধান প্রধান সামাজিক লোকদিগের দ্বারাও উক্ত উদ্দেশ্য আইন দ্বারা বহু বিবাহ নিবারণোদ্দেশে আরো কয়েকখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অতীব আক্ষেপের বিষয় এই, ইহার যেরূপ যত্ন ও উদ্যোগ চেষ্টা সেরূপ অর্থ বল নাই যদি ইহার তদনুরূপ অর্থ সামর্থ্য থাকিত, এতদিন উদ্দিষ্ট বিষয়ে অনেক দূর কৃতকার্য হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক আমাদিগের সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে "যে যাহা চায়, সে তাহা পায়" এই প্রসিদ্ধ বাক্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া যাইতে পারিবেন। আমাদিগের আবেদন পত্রের গবর্নমেন্ট হইতে যে আদেশ হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শন করা গেল।

Letter No. 961

Extract from the proceedings of the Govt. of India in the Home Department (public) under dated Simla the 27th June, 1875.

Read memorials dated 3rd August, 1874, and 20th, January 1975, respectively from Babu Rash Behari Mukherjee and others residents in the district of Dacca and from Babu Madhab Narayan Rai Chowdhury and others residents in the district of Bakerganj, praying that legal measures may be adopted for the abolition of the system of polygamy prevalent among Hindus of Bengal more especially among the Koolin Brahmins.

Resolution. The Governor General in Council while entirely sympathizing with the object which the memorialists have in view, considers that it is one which must mainly be attained by social actions among all classes of Hindus,

and that legislation on subject would only be mischievous if it were not in accordance with the flecings and practice of a large majority of the people.

No. 962/63

Ordered that a copy of this order Resolution be forwarded to Babu Rash Behari Mookerjee and Mabhab Narayan Ray Chowdhury for information.

True Extract

Sd Plauden

For Offg. Secy. to the Govt. of India

To

Babu Rashbehary Mookerjee,

আমি রাজ্য শাসনে নিরাশ হইয়া, সমাজ শাসন দ্বারা যাহাতে এই কলুষিত প্রথা নিবারিত হয় তন্নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগপূর্বক অত্যন্ত পর্যটন ও পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই স্থির করিলাম যে, অগ্রে নিজে ভিন্ন মেলের সহিত স্বীয় পুত্র, কন্যার আদান প্রদান করিয়া এই সৎকার্যে অগ্রসর হইব। প্রথমত আমি খড়দহ মেলের বাঘিয়ার গাঙ্গুলী মহাশয়দিগকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহারা কেহই সাহসী হইয়া আমার সহিত আদান প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। তৎপর আমি মাইজপাড়া নিবাসী বল্লভীমেলস্থ শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করাতে তিনি পরম আহ্লাদিত হইয়া, আমার সহিত আদান প্রদান, করিতে সম্মত হইলেন। আমাদিগের এইরূপ মত স্থির হইলে এই কার্য সমাধা সময়ে সামাজিক প্রধান প্রধান লোকদিগকে অর্থাৎ যে সকল মহাশয়গণ উপস্থিত হইলে আমাদিগের একটি সুনিয়মাবলী স্থির হইয়া অচিরকাল মধ্যেই বহু লোকের কষ্ট নিবারণ হইতে পারে ঐরূপ ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করা আবশ্যক। কিন্তু ইহাতে ব্যয় বাহুল্যের সম্ভাবনা দেখিয়া স্বয়ং এইরূপ ব্যয়ভার বহন করিতে অসমর্থ প্রযুক্ত আমার সাহায্যকারী ধনী ও জমিদার মহাশয়দিগের নিকট কিছু কিছু অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। তাহারাও অনেকেই সম্মত হইয়া একটি চাঁদার ফর্দে নাম দস্তখত করিয়া অশ্রুপাত করিলেন। সামাজিক মহাত্মারাও আমাদিগের সম্পূর্ণ রূপ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই সংবাদ জানিয়া প্রধান প্রধান পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়েরাও চতুর্দিক হইতে স্বীয় স্বীয় পত্রিকায়, আহ্লাদ প্রকাশ ও সামাজিক লোকদিগকে আমাদিগের সহায়তা করিবার নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে দুইখানা পত্রিকার বিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

অমৃতবাজার পত্রিকা—১২৮৩, ২০ সংখ্যা

"ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য সম্বন্ধে বিক্রমপুরে একটি মহাআন্দোলন হইতেছে। বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভঙ্গ কুলীন এই আন্দোলনের নেতা। রাসবিহারী বাবুকে আমরা দেখিয়াছি। তিনি প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোক এবং ইংরেজি জানেন না। সুতরাং এই আন্দোলনটি কোন হিন্দু ধর্মে অবিশ্বাসী ইংরেজি ভাষা অভিজ্ঞ যুবকের দ্বারা উৎপত্তি হইলে যেমন হিন্দুসমাজে অগ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা হইত, নচেৎ তাহা আর হইবে না। বিশেষত যখন আমরা দেখিতেছি যে ঢাকার হিন্দু হিতৈষিণী পত্র ইহার সপক্ষতা করিতেছেন, তখন ইহা যে ঢাকার হিন্দু সমাজের অনুমোদিত তাহা বলা যাইতে পারে। এই আন্দোলনটি কি তাহা এখনও আমরা বলি নাই। রাঢ়ীয় শ্রেণী কুলীন ব্রাহ্মণেরা ৩৬টি মেলে বদ্ধ। ইহার মধ্যে কোন এক মেলের কুলীন সকল মেলের সহিত আদান প্রদান করিতে পারেন না। এক একটি মেলের এক একটি

করিয়া পালটি ঘর আছে। এই দুইটি ঘরের পরস্পরের মধ্যে চিরকাল আদান প্রদান করিতে হয়। ইহার ফল এই হইয়াছে যে কোন কোন মেলের পালটি ঘরে পুরুষের অভাবে সেই মেলের কন্যাগণের অনূঢ়াবস্থায় চিরকাল যাপন করিতে হইতেছে। কোন কোন স্থলে একটি পুরুষের গলায় দশটি বিশটি করিয়া কন্যা গাঁথিয়া দেওয়া হইতেছে। কোন কোন স্থলে মাতুল বংশে আদান প্রদান ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। আমরা অনেক সময় এমন লোমহর্ষাকর বিবরণও শুনিয়াছি যে, একটি পাল্‌টি ঘরের পুরুষ মুমূর্ষ অবস্থাপন্ন হইয়াছে, কন্যার পিতা তাহার কুল রক্ষার্থে সম্প্রদান করিয়া দিলেন, কন্যা বিবাহের পরক্ষণেই বিধবা হইল। কিন্তু মেল বন্ধন হিন্দু শাস্ত্র সম্মত নহে, এবং উহা ভঙ্গ করিয়া ফেলিলে শাস্ত্র বিগর্হিত কার্য করা হয় না। বরং এ প্রথার জন্য বহু সংখ্যক বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ স্বজনাপরিণয় জন্য দোষের উৎপত্তি হইতেছে। বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এই মেল ভঙ্গ করিয়া যাহাতে কুলীনদের মধ্যে সর্বদ্বারিকতা প্রথা প্রবর্তিত হয় ইহার জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, এবং তিনি স্বয়ং একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। মেলবন্ধন জন্য কুলীনদিগের যে কত অসুবিধা, কত মনোকষ্ট ও কত গ্লানি সহ্য করিতে হইতেছে, তাহা এক্ষণে তাহাদের মধ্যে অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। বিশেষত যখন মেল ভাঙিয়া আদান প্রদান করিলে শাস্ত্রবিরোধী কার্য করা হয় না, কি সমাজচ্যুত হইতে হয় না, তখন আমাদের ভরসা হইতেছে যে, এই আন্দোলনের নেতা ও তাঁহার সাহায্যকারীগণ কৃতকার্য হইবেন।"

১২৮৩ সনের ১২ সংখ্যা ভারত সংস্কারক পত্রিকা।
এই সাপ্তাহিক পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মেল ভঙ্গের চেষ্টা ঃ

কোন প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়াছেন, যত আমরা নিকৃষ্ট জাতীয় জীব দর্শন করি, ততই তাহাদিগের মধ্যে শ্রেণী বিভাগের সংখ্যা অধিক দেখিতে পাই। মনুষ্য তিন বা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। চতুষ্পদদিগের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক শ্রেণী। পক্ষীদিগের মধ্যে ততোধিক, ক্রমে কীটদিগের মধ্যে তাহার সংখ্যা করা যায় না। দুঃখের বিষয়, স্বভাব ইতর জন্তুদিগের মধ্যে যাহা করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য বুদ্ধি বলে তাহা স্বজাতীর মধ্যে আনয়ন করিয়াছেন। হিন্দুদিগের চারি জাতিই থাকুক, তাহাই আবার কত শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শত শত বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে। জাতিপ্রধান ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈদিক, বারেন্দ্র ও রাঢ়ী এই তিন শ্রেণীই থাকুক, কিন্তু তাহার মধ্যে আবার কত ভাগ ও উপবিভাগ। কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া কুলীনোপাধি প্রাপ্ত হন, ইহারাই রাঢ়ীর শ্রেণী সংগঠন করেন। ইহারা ৩৬টি মেলে বদ্ধ, তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান নাই। যাহাদের গাত্রে কৌলীন্য গন্ধ যত অধিক, তাহারা তত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বিচরণ করেন। যাহারা অত্যন্ত মুখ্য কুলীন তাহাদিগের একটি কিংবা দুইটির অধিক ঘর নাই। সে কৌলিন্য গর্ব সংরক্ষণ করিবার জন্য ইহারা প্রাণান্তেও ভিন্ন ঘরে পুত্র কন্যার বিবাহ দান করেন না। এই কুপ্রথা হইতে সমাজের যে কত অমঙ্গল এবং শাস্ত্র ও ধর্মের যে কিরূপ অবমাননা হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কুলীন কন্যাগণকে পালে পালে কখন একটি গুণহীন পুরুষর হস্তে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইতেছে, কখন আজীবন অবিবাহিত রাখিয়া তাহাদিগের পাপের পথে সহায়তা করা হইতেছে, কখন মৃত্যু শয্যায় বৃদ্ধের কণ্ঠে বরমালা দিয়া বালিকাগণ জন্ম সার্থক করিতেছেন। কখন বা মুমুর্ষ বৃদ্ধা এক বালকের কণ্ঠে বরমাল্য দিয়া দেহশুদ্ধিপূর্বক চিতারোহণ করিতেছেন। কেবল ইহা নহে। শাস্ত্রে যে আছে

"সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীং।
উদ্ধহেত দ্বিজো ভার্য্যাং ন্যায়েন বিধিনা নৃপ।"

পিতৃকুলের সপ্তমী ও মাতৃকুলের পঞ্চমী পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিবেক। কুলীনদিগের মধ্যে সে শাস্ত্রনিয়ম রক্ষা পায় না। সময় সময় পিতা পুত্রে দুই সহোদরাকে বিবাহ করিয়া এক আশ্চর্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেছেন। সময় সময় সপ্ত বা দশ পুরুষ পর্যন্ত পরস্পর দুই ঘরে পরিবর্ত করিয়া বিকৃতশোণিত ও পুনঃ পুনঃ বিপর্যস্ত সম্বন্ধ হইতেছে। ঘৃণা, লজ্জা, শাস্ত্রভয়, ধর্মভয় ও ভাবীবংশের অনিষ্ট ভয়, কৌলীন্য মর্যাদা হানির আশঙ্কার নিকট পরাভব মানিয়াছে।

সম্প্রতি বিক্রমপুরনিবাসী বাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় কুলীনদিগের মেল ভঙ্গের জন্য বিশেষ চেষ্টাপর হইয়াছেন শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। সর্বাঙ্গবিকারপূর্ণ বর্তমান হিন্দু সমাজের কোন অঙ্গের স্বাস্থ্য বিধানার্থে যিনি সচেষ্ট হন, আমরা তাঁহাকে সমাজের প্রকৃত হিতৈষী বলিয়া প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করি। রাসবিহারী বাবু যদি কুলীনদিগের মেল ভঙ্গ করিতে সমর্থ হন, অনেক অসুবিধা ও কদাচার হইতে কুলীন সমাজকে বিমুক্ত করিতে পারিবেন। রাসবিহারী বাবু স্বয়ং একজন প্রাচীন দলস্থ হিন্দু, অনেকগুলি হিন্দু পণ্ডিত তাহার পৃষ্ঠবল হইয়াছেন। আমরা আশা করি এ অঞ্চলের সুবিজ্ঞ কুলীন মহোদয়গণও প্রস্তাবিত সমাজ সংস্কারের সহায়তা করিতে ত্রুটি করিবেন না।

যেখানে উৎপত্তি সেখানেই নিবৃত্তি প্রকৃতির নিয়ম। এক শ্রেণী হইতে যেমন নানা শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে, সেইরূপ সকল শ্রেণী ক্রমে এক শ্রেণীতে মিলিত হইবে। কিন্তু ইহা যে সহজে সম্পন্ন হইবে, বোধ হয় না। সমাজে একটি নিয়ম বদ্ধমূল হওয়া যেমন সহজ নহে, বদ্ধমূল একটি নিয়ম রহিত হওয়াও সেইরূপ সহজ নহে। মানের গর্ব ত্যাগ করা সামান্য কথা হইলেও কোন ত্যাগ স্বীকার অপেক্ষা সহজ নহে। যাহা হউক কয়েক ব্যক্তি দৃষ্টান্ত স্বরূপ দণ্ডায়মান হইলে কুসংস্কারপূর্ণ ও অমঙ্গলকর কুলাচার যে আপনা হইতে তিরোহিত হইবে তাহার সন্দেহ নাই।"

পশ্চিম বাংলার সাহায্যকারী মহোদয়গণের সহিত আদান প্রদান বিষয়ের বিশেষ পরামর্শের নিমিত্ত আমি যুবরাজের আগমন উপলক্ষে কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। প্রথমত সনাতন ধর্মরক্ষণী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিলাম, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের লোকান্তর গমনের পর, শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া কৌলীন্য সংশোধনের প্রস্তাবটি রহিত করিয়াছেন। আমি ঐ সংবাদ শ্রবণে যার পর নাই দুঃখিত হইলাম, এবং যাহাতে ঐ মহৎ প্রস্তাবটি সভা হইতে উঠিয়া না যায়, তন্নিমিত্ত সভাপতি মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বর্তমান কৌলীন্য কুপ্রথাটি যে সম্পূর্ণরূপ হিন্দুধর্মের অবনতির মূল, তদ্বিষয়ে কিছু বক্তৃতা করিলাম। কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই প্রস্তাবটি যে এই সভার প্রধান কর্তব্য কার্য স্থির করিয়া বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও জানাইলাম। এবং ঐ সভার অধিবেশন সময়ে উপস্থিত হইয়া কিছু বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন আমাদের সভা হইতে যখন ঐ আন্দোলনটি রহিত করা হইয়াছে, তখন আপনি সভায় উপস্থিত হইলে বিশেষ ফল হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আমি সভাপতি মহাশয়ের ভাব ভঙ্গীতে ঐ সভার দ্বারা আমার সহায়তার প্রমাণ পরিত্যাগ করিলাম। তথাপি আমি সভার অধিবেশন সময়ে, উপস্থিত হইয়া আমার প্রার্থনীয় বিষয়ের সম্বন্ধে কিছু বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তাহাতেও সভাপতি ও সভ্যগণের মত না হওয়ায়, আমার এই বাসনাটি সম্পন্ন হইল না। তৎপরে আমি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করাতে তিনি আমাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং আমি যে মেল ভঙ্গ করিয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। আমি ঐ কার্যকালীন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া বলিলাম যে, যেমন কপিলের অভিশাপে সাগর-সন্তান-সমুদয়ের এই অধঃপতন হইয়াছিল, সেইরূপ দেবীবরের কুপ্রথাতেও আমার পূর্ব পিতামহ সকলের অধঃপতন হইতেছে।

সগরবংশোদ্ভব মহামতী ভগীরথ পতিত-পাবনী গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়া স্বীয় পিতৃপুরুষদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, আমিও তদ্রূপ সাগর আনয়ন মানসে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছি। যদি দেবীবরের কলুষিত প্রথা পরিত্যাগ করিয়া পুত্রকন্যার আদান-প্রদান কালীন এই সাগর নিয়া উপস্থিত হইতে পারি, তবে আমার পিতৃদেবেরাও যে অপত্যকৃত পাপের ভোগ হইতে মুক্ত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। আমি এই কথা বলিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে উপস্থিত হইবেন এবং উক্ত কার্যের সাহায্যার্থে ২০০ শত টাকা প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্মত হইলেও আমার মনে এইরূপ একটি আশঙ্কা হইল যে, যদি তিনি এরূপ বিবেচনা করেন যে, কেবল আমার যত্নে এমন একটি সমাজে যাওয়া উচিত নহে। ঐ আশঙ্কা দূর করিবার মানসে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিলাম, মহাশয় যে যাইবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন, ইহাতে আমার সন্দেহ হয়। যদি কেবল আমার যত্নে যাওয়া আপনার কোনও বন্ধু অপরামর্শ বোধ করেন, তবে ত আপনার যাওয়া হয় না। অতএব আপনি কালীপাড়ার, মাইজপাড়ার এবং ভাওয়ালের জমিদার মহাশয়দের নিকট পত্র লিখিয়া মতামত গ্রহণ করুন। আমি এই কথা বলিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাহা উচিত বোধ করিয়া ঐ সকল জমিদার মহোদয়গণের নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, বিক্রমপুরের শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা আসিয়াছেন। তিনি মেল ভঙ্গ করিয়া পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে বাসনা করেন, এবং কার্যকালে আমাকে তথায় উপস্থিত হইতে বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন, আমিও তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ সম্মত আছি। কিন্তু এ বিষয়ে আপনাদিগের মত না জানিয়া কোন মতেই তথায় যাইতে আমার সাহস হয় না, আপনাদিগের সম্মতিসূচক পত্র পাইলে আমি আহ্লাদের সহিত ঐ কার্যে উপস্থিত হইতে প্রস্তুত আছি। তৎপরে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত একটি সভা আহ্বান করিয়া আমার পদ্যময়ী সীতার বনবাস, শৈশবজ্ঞান চন্দ্রিকা ও সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত আর কৌলীন্য বিষয়ক সঙ্গীতাবলী শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও সভ্যগণ ঐ সভায় যে সমুদয় কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সাহাবাজনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নামক এক ব্যক্তি যে ১২৮২ সনের ৪৯ সংখ্যক ঢাকা প্রকাশ পত্রিকায় একখানা প্রেরিত পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমি এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

ঢাকা প্রকাশ

এই সাপ্তাহিক পত্রিকা ঢাকা নগরী হইতে প্রকাশিত। আমাদের সমাজ সংস্কারক শ্রীযুক্তবাবু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় যুবরাজের আগমন উপলক্ষে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমত তিনি সনাতনধর্মরক্ষণী সভার অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রার্থনীয় বিষয়ের সম্বন্ধে কিছু বক্তৃতা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু সভ্যগণের মত না হওয়াতে তাঁহার সেই বাসনাটি সম্পূর্ণ হয় নাই। কেবল জয়পুরের মহারাজকে একখানি জীবনবৃত্তান্ত উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন মহারাজও উক্ত পুস্তক সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদনন্তর, রাসবিহারীবাবু পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে তিনি রাসবিহারীবাবুকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পদ্যময়ী সীতার বনবাস ও শৈশবজ্ঞান চন্দ্রিকা এবং তদীয় সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হন। এবং ঐ সমস্ত পুস্তক তদীয় যন্ত্রে উৎকৃষ্টতর রূপে মুদ্রিত করিবেন বলিয়াও অস্বীকার করেন। আর কৌলীন্য বিষয়ক সঙ্গীতগুলি শ্রবণ করিয়া করুণ রস স্থলে হুঁ হুঁ শব্দে ক্রন্দন ও হাস্য স্থলে হা হা শব্দে হাস্য করিয়া সমবেত সভ্যগণের সহিত এক বাক্যে বলেন, এইরূপ একটি রত্ন আমাদিগের পশ্চিম বাংলায় বর্তমান থাকিলে আমরা পশ্চিম বাংলার যার পর নাই সৌভাগ্য জ্ঞান করিতাম। তৎপরে মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে মেল পর্যায় ভঙ্গ করিয়া পূর্বরূপ সর্বদ্বারিকতা নিয়মে আদান প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তৎশ্রবণে বিদ্যাসাগর মহাশয় পরম

পরিতুষ্ট হইলেন। ঐ কার্যকালীন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপস্থিতির নিমিত্ত প্রোক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রার্থনা করিলে তিনি সন্তোষ প্রকাশপূর্বক উপস্থিত হইবেন বলিয়া সম্মত হইলেন। এবং উক্ত কার্যের সাহায্যের ২০০ টাকা প্রদান করিবেন বলিয়াও অঙ্গীকার করিলেন। এখন আমরা জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাধু সঙ্কল্প অচিরে পূর্ণ হউক।

বশংবদ—

শ্রীরাজমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কালীপাড়ার জমিদার মহাশয়দের বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। বাবুগণ আমার অপেক্ষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্রের উত্তর লিখিতে বিলম্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহারা আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। আর এই বিবরণে পত্রোত্তর লিখিলেন, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে মেল ভঙ্গ করিয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন তাহা আমাদের অপরামর্শ মতে নহে। আমরা সকলেই মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্পূর্ণরূপে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। এই কার্যে মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক উপস্থিত হইলে আমরা যারপর নাই আহ্লাদিত হইব। ভাওয়ালের জমিদার রাজা বাহাদুর মহাশয় ও এরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ সময় মাইজপাড়া নিবাসী বাবু তারাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের মাতা ঠাকুরাণীর কাশীপ্রাপ্তি হওয়াতে, রায় মহাশয় তাহার শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে কাশীধামে ছিলেন ; বাড়ির কার্যকারিগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্রখানা রায় মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন, তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এইরূপ উত্তর লিখিলেন, যে শ্রীমান রাসবিহারী নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তি নহে। ইনি আমার পিস্তুত ভ্রাতষ্পুত্র, আর যে কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ইহার আদান প্রদানের কথোপকথন সুস্থির হইয়াছে ; সেই কালীকিশোরও আমাদিগেরই দৌহিত্র। আমাদের সাহায্যেই ইহারা এই মহৎকার্যে প্রবৃত্ত হইবেন। ঐ সময় মহাশয় দয়া করিয়া উপস্থিত হইলে আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইব। আমি বাড়ি যাইবার সময় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বিস্তারিত বিবরণ নিবেদন করিব। তারাপ্রসাদ রায় মহাশয় আমার নিকটেও এইরূপ একপত্র লিখিয়াছিলেন যে, আমি তোমার পত্রের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক পত্র পাইয়াছি, আর তিনি যে তোমাদের কার্যে উপস্থিত হইবেন, ইহা শুনিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলাম। আমি সত্বরই বাড়ি পঁহুছিব বাসনা রাখি। যাওয়ার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। আমি বাড়িতে পঁহুছিয়াই তোমার সহিত এ বিষয়ের সমস্ত পরামর্শ স্থির করিব। তারাপ্রসাদ রায় মহাশয় বাড়ি আসিলে, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বলিলেন, আমি কলিকাতা আসিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়িতে উপস্থিত হইয়াছিলাম! দুঃখের বিষয় আমি তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম না। তিনি তাঁহার পিতার কাতরতা সংবাদ পাইয়া কাশীধানে গমন করিয়াছেন। তৎপরে বলিলেন, দেখ বাবা! এখন আমি তোমার প্রার্থনীয় কার্যটিই জীবনের মূল বলিয়া স্থির করিয়াছি। এই মহৎ কার্য নির্বাহ হইলেই আমার সমুদয় অর্থবিত্তের সার্থকতা হয়। আমি আগামী বৈশাখ মাসেই মাতৃস্বর্গার্থে কিছু দানাদি উপলক্ষে কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ঘটক কুলীনদিগকে আহ্বান করিবার মানস করিয়াছি, ঐ সময়ে তোমাদের কার্যের সমস্ত বিষয় সুস্থির করিব। তিনি ১ চৈত্র তারিখে আমার সহিত এইরূপ কথোপকথন করিয়া ১৩ তারিখে ওলাউঠা রোগে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। সুতরাং আমার ও বাবু কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমুদয় উদ্যোগ চেষ্টা বিফল হইয়া গেল।

বাবু কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার আদান প্রদানের নানা বিঘ্ন জন্মিলে, আমি পুনরায় বাঘিয়ার গাঙ্গুলী মহাশয়দিগকে বাধ্য করিবার জন্য অত্যন্ত পর্যটন ও পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পাঁচ বৎসর কাল অপরিমিত পরিশ্রমের পর, সমুদয় বিজ্ঞ গাঙ্গুলী, ডিংসায়ী ও বটব্যাল, শ্রোত্রিয় এবং কালীপাড়ার জমিদারি মহাশয়দিগের পরামর্শে, বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত রাসমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, আমার

পুত্র কন্যার সহিত তৎপুত্র কন্যার আদান প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। এইরূপ পরামর্শ স্থির হইল যে, একটি প্রকাশ্য সভাতে এ প্রস্তাবের বিশেষ আন্দোলন করিয়া কার্যের দিন ধার্য করিব। ইহার অব্যবহিত কাল পরেই সাহাবাজনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়িতে একটি পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনেকানেক ঘটক কুলীন এবং ডিংসায়ী বটব্যাল মহাশয়গণ উপস্থিত হইলেন, আমি ও শ্রীযুক্ত হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পরামর্শকারী মহোদয়গণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ঐ সভায় উপস্থিত হইলাম। প্রথমত মেলবন্ধন দ্বারা আমাদিগের যে সকল দোষের ঘটনা হইতেছে, তদ্বিষয় কিছু বক্তৃতা করিয়া গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দিগকে সম্বোধনপূর্বক বলিলাম, আপনাদিগের পূর্বপুরুষ নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার পূর্ব পিতামহ গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্যের আদান প্রদান ছিল। সেই গঙ্গানন্দের সন্তান আমি প্রস্তুত আছি, আপনাদের নীলকণ্ঠ গঙ্গোপাধ্যায়ের সন্তান একজন আমার সহিত অগ্রসর হইয়া এই সৎকার্যের পথ প্রদর্শন করুন। আমি এই কথা বলিলে প্রাচীন শ্রেণীস্থ সর্বমান্য শ্রীযুক্ত মানিকচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, আপনি যে সৎকথা উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে আমরা সমুদয় গাঙ্গুলিগণই বাধ্য আছি। অতএব আমাদের হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র কন্যার সহিত আপনার পুত্র কন্যার আদান প্রদান করুন। আমরা সকলেই পরম আহ্লাদের সহিত উপস্থিত হইয়া কার্য সম্পাদন করিব।

ঐ সময় কয়েকজন গোঁড়া গাঙ্গুলি সম্মুখবর্তী হইয়া বলিলেন, জেঠা মহাশয় বৃদ্ধ হইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছেন বলিয়াই স্বীকার করিলেন। কিন্তু যে প্রথাটি ১০/১২ পুরুষ পর্যন্ত বহাল হইয়াছে তাহা কি আর প্রচলিত হইতে পারে। আমি নানাপ্রকার উপদেশ বাক্য বলিলেও তাহারা কোনও মতে সম্মত হইলেন না।

শ্রীযুক্ত মাণিকচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বাবু হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি দিন ধার্য করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এই মহৎ কার্যে প্রবৃত্ত হও। আমরা প্রাচীন গাঙ্গুলীগণ আহ্লাদের সহিত উপস্থিত হইয়া কার্য সম্পাদন করিব। তৎপরে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়েরাও ব্রাহ্মণেভ্যোঃ নমঃ বলিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেলেন, আমি হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও প্রস্থান করিলাম।

১২৮৪ সনের ২২ শ্রাবণ তারিখে আমাদের আদান প্রদানের দিন ধার্য করিলাম। ঐ কার্য বিশেষ ব্যয় বাহুল্যের আবশ্যক বিধায় আমার প্রধান সাহায্যকারী ঢাকার এসিস্ট্যান্ট কমিশনার শ্রীযুক্ত বাবু অভয়চন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাঁহার প্রযত্নে ভাওয়ালের জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় ২০০ টাকা ও ধানকোড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় ১০০ টাকা, মুড়াপাড়ার জমিদার মহোদয়গণ ৫০ টাকা, মোট ৩৫০ টাকা সংগ্রহ হইল। তদ্বারা আমি সামাজিক লোকদিগকে আহ্বান করিয়া আহ্লাদের সহিত কার্য নির্বাহ করিলাম। কার্যকালীন সাহাবাজনগর নিবাসী মদিষ্টদেব শ্রীযুক্তেশ্বর কালীনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ও শ্রীযুক্তেশ্বর প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় ও শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত লালমোহন বটব্যাল, তারপাশা নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু মদনমোহন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ঘটক প্রভৃতির সাহায্যেই আমি নির্বিঘ্নে কার্য নির্বাহ করিয়াছিলাম। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কার্যকালে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। *(সংক্ষেপিত)*

বর্তমান মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর



আয়তন : ২,৪৩,৮০০ একরের মধ্যে জলভাগ বাদ দিয়ে ২,৩৬,০০০ একর
জনসংখ্যা : ১৬,৩৪,৮৩৬
পুরুষ : ৮,১৭,৪০৫
নারী : ৮,১৭,৪৩১
শিক্ষার হার (গড়ে) : ২৭.৪৩%
প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ (২০-৫৫) : ৪,২৭,৫২৬
প্রাপ্ত বয়স্ক নারী (১৮-৪০) : ৪,২৬,৯১৪

মুন্সিগঞ্জ থানা :

আয়তন : ৮০ বর্গ মাইল বা ৫১,২০০ একর
জনসংখ্যা : ৪,৭৮,৬৫৮
পুরুষ : ২,৩৭,৩৩২
নারী : ২,৪১,৩২৬
ইউনিয়ন : ১০
১. মুন্সিগঞ্জ সদর ২. রিকাবিবাজার ৩. পঞ্চসর ৪. মহাকালি ৫. রামপাল ৬. বজ্রযোগিনী ৭. চরকেওয়ার ৮. মোল্লা কান্দা ৯. আদারা ১০. শিলয়ই

মৌজা : ৯৬	গ্রাম : ২৫৪
শিক্ষার হার : ৩১%	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ১৩
মাধ্যমিক বিদ্যালয় : ১৩	মহাবিদ্যালয় : ৩
[একটি মহিলা কলেজ সহ]	মাদ্রাসা : ৬
প্রাথমিক বিদ্যালয় : ৯৮	শিক্ষক : ৪৪৩
পাবলিক লাইব্রেরী : ২	আবাদি জমি : ৩৮,০০০ একর
হাসপাতাল : ১	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র : ২
ডাকবাঙলো : ১	সরকারি মৎস্যখামার : ২
পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র : ১	গবাদি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র : ১
পল্ট্রি ফার্ম : ২	হাটবাজার (বেসরকারি) : ৮
স্টেডিয়াম : ১	খেলার মাঠ : ১৫
সমবায় সমিতি : ৪৫৫	ক্লাব : ৫৮
কলকারখানা : ৫০০	নৌবন্দর : ২
সিনেমা হল : ২	ব্যাংক : ১৬
পাকা রাস্তা : ২০ মাইল	আধা পাকা রাস্তা : ১৫ মাইল
কাঁচা রাস্তা : ২৫ মাইল	পোস্ট অফিস : ২০
কোল্ডস্টোরেজ : ১৬	

গজারিয়া থানা ঃ

আয়তন ঃ ৪৭ বর্গমাইল
জনসংখ্যা ঃ ১,৪৯,৪৮০
পুরুষ ঃ ৭৪,৮৪০
নারী ঃ ৭৪,৭০০
ইউনিয়ন ঃ ৮
১. বাউশিরা ২. ভবের চর ৩. গুয়াগাছিয়া ৪. বালুয়াকান্দি ৫. হোসেনদি
৬. টেঙ্গার চর ৭. গজারিয়া ৮. ইসলামপুর

গ্রাম ঃ ১২১	শিক্ষিতের হার ঃ ২৫%
প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ৬০ (সরকারি)	প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ৫ (বেসরকারি)
জুনিয়ার স্কুল ঃ ১	মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ ৬
মাদ্রাসা ঃ ২	জুনিয়ার ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ঃ ৩৫
মহাবিদ্যালয় ঃ ২	খেয়াঘাট/লঞ্চঘাট ঃ ৩
আবাদি জমি ঃ ১৮,৩০০ একর	খামার ঃ ১
পশুহাসপাতাল ঃ ১	পাকা রাস্তা ঃ ১১ মাইল
কাঁচা রাস্তা ঃ ৩৭ মাইল	সেতু/কালভার্ট ঃ ৫/৭
হাসপাতাল ঃ ১	পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক ঃ ৫
ব্যাংক ঃ ৮	খেলাধুলার মাঠ ঃ ৬
প্রধান হাটবাজার ঃ ৮	

* দ্রষ্টব্য ঃ নীল কুঠি (পুরনো বাউশিয়া)

শ্রীনগর থানা ঃ

আয়তন ঃ ৮৪ বর্গমাইল
জনসংখ্যা ঃ ৩,৫৪,৩২৯ বর্গমাইল (১৯৮৬ খ্রিঃ)
ইউনিয়ন সংখ্যা ঃ ১৪
১. শ্রীনগর ২. ষোলঘর ৩. শ্যামসিদ্ধি ৪. আটপাড়া ৫. পাটভোগ ৬. ভাগ্যকূল
৭. বাঘড়া ৮. তন্তর ৯. কুকটিয়া ১০. কোলাপাড়া ১১. রাঢ়িখাল ১২. বীরতারা
১৩. হাঁসাড়া ১৪. বাড়ৈখালি

গ্রাম ঃ ১৩৬	শিক্ষিতের হার ঃ ৩০%
প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ২৯৮	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ ১৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ ৪	মাদ্রাসা ঃ ৫
মহাবিদ্যালয় ঃ ২	আবাদি জমির পরিমাণ ঃ ৩১,৬৭৭,২৮ একর
মৎস্য চাষ প্রকল্প ঃ ২	পশু হাসপাতাল ঃ ১
বিল ঃ ১	নদী ঃ ১
পদ্মার খাল ঃ ১০/১৫	পাকা রাস্তা ঃ ১৫ মাইল
কাঁচা রাস্তা ঃ ২৮ মাইল	সেতু/কালভার্ট (পাকা) ঃ ২৮
সেতু/কালভার্ট (কাঁচা) ঃ ৯৭	হাসপাতাল ঃ ১
শিশু ক্লিনিক ঃ ১৪	ক্লাব ঃ ১৪
কোল্ডস্টোরেজ ঃ ১	এতিমখানা ঃ ১
ব্যাংক ঃ ১০	স্টেডিয়াম ঃ ১
খেলার মাঠ ঃ ২০	

লৌহজং থানা ঃ

আয়তন ঃ ৫৫ বর্গমাইল বা ৩৫২০০ একর
জনসংখ্যা ঃ ১,৮৮,৯৩৭
পুরুষ ঃ ৯৫,৪৩৮
নারী ঃ ৯৩,৪৯৯
ইউনিয়ন ঃ ১২
১. লৌহজং ২. টেউটিয়া ৩. গাওদিয়া ৪. বেজগাঁও ৫. খিদিরপাড়া ৬. কলমা
৭. ধাইধা ৮. বলতলি ৯. কণকসার ১০. হলিদিয়া ১১. কুমারভোগ ১২. মেদিনীমণ্ডল

গ্রাম ঃ ১০৩
মৌজা ঃ ১২১
শিক্ষার হার ঃ ৩১%
প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ৭১
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ ২
মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ ৯
মহাবিদ্যালয় ঃ ২
ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ঃ ৯
এতিমখানা ঃ ১
সরকারি মৎস্য প্রকল্প ঃ ১
জলমহল ঃ ৩
সমবায় সমিতি ঃ ১০৭
খাদ্যগুদাম ঃ ৩
স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঃ ৪
পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ঃ ৫
লঞ্চঘাট ঃ ৬
পোস্ট অফিস ঃ ১৫
ব্যাংক ঃ ৯
পাকা রাস্তা ঃ ৪ মাইল
আধা পাকা রাস্তা ঃ ৫ মাইল
কাঁচা রাস্তা ঃ ৪৬ মাইল
পাকা পুল ঃ ১৯
কাঠের পুল ঃ ৬৭

সিরাজদিখান থানা ঃ

আয়তন ঃ ৭০ বর্গমাইল
জনসংখ্যা ঃ ২,৫৪,৪৩৬
পুরুষ ঃ ১,২৬,২৮৭
নারী ঃ ১,২৮,১৪৯
ইউনিয়ন ঃ ১৪
১. চিত্রকোট ২. শেখের নগর ৩. রাজনগর ৪. কেয়াইন ৫. বাসাইল ৬. বালুচর
৭. লতব্দি ৮. রশুনিয়া ৯. বয়রাগাদা ১০. ইছাপুরা ১১. মালখাননগর ১২. মধ্যপাড়া
১৩. জৈনসার ১৪. কোলা

গ্রাম ঃ ১৬০
শিক্ষিতের হার ঃ ২৬%
প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০৪
মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ ১৬
মাদ্রাসা ঃ ২
মহাবিদ্যালয় ঃ ২
আবাদি জমির পরিমাণ ঃ ২৯,৬০০ একর
হাসমুরগি খামার ঃ ১ (সরকারি)
মৎস্য খামার ঃ ১ (সরকারি)
পাকা রাস্তা ঃ ৪ মাইল
লঞ্চঘাট ঃ ৭
হাসপাতাল ঃ ১
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক ঃ ২
মাতৃমঙ্গল পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ঃ ৭
ক্লাব ঃ ৭৪
এতিমখানা ঃ ১
ব্যাংক ঃ ১৩
খেলার মাঠ ঃ ১৫
প্রধান হাটবাজার ঃ ১৩
দ্রষ্টব্য স্থান ঃ রাজনগর রাজবল্লভ সেনের শিবমন্দির

টংগিবাড়ি থানা ঃ

আয়তন ঃ ৪৯ বর্গমাইল
জনসংখ্যা ঃ ২,০৯,৮৯৬
পুরুষ ঃ ১,০৭,৪৫৭
নারী ঃ ১,০২,৪৩৯
ইউনিয়ন ঃ ১২
১. আবদুল্লাপুর ২. বেতকা ৩. সোনারঙ টংগিবাড়ি ৪. আউটসাহি ৫. আড়িয়ল-বালিগাঁও ৬. ধরিপুর ৭. কাঠাদিয়া শিমুলিয়া ৮. যশলং কামারখাঁড়া ৯. দিঘির পাড় ১০. পাঁচগাঁও ১১. বাসাইল বানারি ১২. টংগিবাড়ি

গ্রাম ঃ ১৭৭ শিক্ষিতের হার ঃ ২৪%
প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ৭৮ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ঃ ১২
মাদ্রাসা ঃ ৮৫ মহাবিদ্যালয় ঃ ২
এতিমখানা ঃ ২ ব্যাংক ঃ ১২
প্রধান হাটবাজার ঃ ১২ খেয়াঘাট/লঞ্চঘাট ঃ ৬
আবাদি জমির পরিমাণ ঃ ২২,৬৯৫ একর হাঁসমুরগি গবাদি পশুর খামার ঃ ৩ (সরকারি)
হাঁসমুরগি গবাদি পশুর খামার ঃ ২৫ (বেসরকারি) পাকা রাস্তা ঃ ১০ মাইল
কাঁচা রাস্তা ঃ ১২৫ মাইল সেতু/কালভার্ট/কাঠের পুল ঃ ৬৭
হাসপাতাল ঃ ১ পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ঃ ১০
রেস্ট হাউস ঃ ১ ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান ঃ ৬
দ্রষ্টব্য স্থান ঃ আউটশাহীমঠ ● সোনারঙের মঠ

বিক্রমপুর—গ্রামনাম ঃ

উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর গ্রামসংখ্যা ছিল ৪৪৪। হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে গ্রামগুলির নাম, থানা, হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যা, নারী পুরুষ সংখ্যা, বিস্তৃত তথ্য দিয়েছেন। আমরা কেবল তাঁর দেওয়া গ্রাম নামের একটি তালিকা উল্লেখ করলাম। সেসময়ে উত্তর বিক্রমপুরে জনসংখ্যা ছিল ৪,৭৮৩ এবং দক্ষিণে বিক্রমপুর ২,৪৫৯ জন। বোঝা যাচ্ছে, দক্ষিণের তুলনায় উত্তরে জনবসতি ছিল অনেক বেশি।

উত্তর বিক্রমপুর ঃ

লৌহজং থানা

১. দিঘলী	২. বেজগাঁও	৩. দুয়াল্লী	৪. গাউপাড়া/গাউতলি
৫. গাওদিয়া	৬. ধানকুনিয়া	৭. ব্রাহ্মণগাঁও	৮. কাজিপাড়া
৯. সাতথরিয়া	১০. যশলদিয়া	১১. কুশরা	১২. বিলকুলিয়ানী
১৩. শিমুলিয়া	১৪ নাগেরহাট	১৫ কুড়িগাঁও	১৬. আটিগাঁও
১৭. বৌলতলি	১৮. সেরপাড়া	১৯. পূর্ব নওপাড়া	২০. ক্ষিতিরপাড়া
২১. ধাইরপাড়া	২২. বাসুদিয়া	২৩. সংগ্রামবিল	২৪. কালিকট
২৫. তেওতা	২৬. তেঁতুলিয়া	২৭. উত্তর কুমারভোগ	২৮. দক্ষিণ কুমারভোগ
২৯. তারপাশা স্টেশন	৩০. মাওয়া	৩১. উত্তর মেদিনীমণ্ডল	৩২. দক্ষিণ মেদিনীমণ্ডল
৩৩. সুদ্ধিসার	৩৪. রাজাবাড়ি	৩৫. দিঘিরপাড়	৩৬. পাঁচগাঁও
৩৭. বাত্রৈসার	৩৮. উত্তর হলদিয়া	৩৯. দক্ষিণ হলদিয়া	৪০. কনকসার

৪১. ভোগদিয়া	৪২. কলিকাতা	৪৩. বড়মোকাম	৪৪. গৌড়গঞ্জ
৪৫. ডহরি	৪৬ ছত্রিশ	৪৭. মালীঅঙ্ক	৪৮. কুসমাসার
৪৯. পালগাঁও	৫০. চৌদ্দহাজারী	৫১ রাণাদিয়া	৫২. মৌজা
৫৩. দক্ষিণ চারিগাঁ	৫৪. পিঙ্গনাইল	৫৫. মহৎ গাঁ	৫৬. ঝাউটিয়া
৫৭. কুণ্ডরারবাগ.	৫৮. মাইজগাঁও	৫৯. পয়সা	৬০. পশ্চিমপাড়া
৬১. বিদগাঁ	৬২. বহর	৬৩. সেনহাটি	৬৪. তারাটিয়া
৬৫. পাইকারা	৬৬. সুভরিয়া	৬৭. মালিনী	৬৮. উয়ারি
৬৯. মিটুসার	৭০ ধামালিয়া	৭১. কলিকাল	৭২. কোরহাটি
৭৩. ঘোলতলি	৭৪. বনসেওৎ	৭৫. পাটলি	৭৬. চৌদ্দহাজারি
৭৭. তেলিরবাগ	৭৮. ভোজগাঁও	৭৯. ফুলকোচি	৮০. ঘাসভোগ
৮১.জাঙ্গালিয়া	৮২. পাচলদিয়া	৮৩. শাসনগাঁও	৮৪. ধরারহাট

মুন্সিগঞ্জ ঃ

৮৫. আটপাড়া (বজ্রযোগিনী)		৮৬. বজ্রযোগিনী	৮৭. সুখবাসপুর
৮৮. রামপাল	৮৯. কালাঞ্জীপাড়া	৯০. চাঁপাতলি	৯১. কাঁটাখালি
৯২. কাটাগাঁও	৯৩. সুয়াপাড়া	৯৪. ধামদা	৯৫. চুড়াইন (মুন্সিগঞ্জ)
৯৬. নাহাপাড়া	৯৭ মহাকালী	৯৮. কেওয়ার	৯৯. বিনোদপুর
১০০. রামগোপালপুর	১০১. পঞ্চসার	১০২. পানাম	১০৩. জোড়ারদেউল
১০৪. দেওভোগ	১০৫. রন্সিং	১০৬. ফিরিঙ্গিবাজার	১০৭. পুরাণবাজার
১০৮. বিলিহোগলা	১০৯. ভাসানচর	১১০. রঞ্জ	১১১. মুন্সিরহাট
১১২. মীরেশ্বর	১১৩. রিকাবিবাজার	১১৪. মহিষপুর	১১৫. ঘাসিরপুকুরপাড়
১১৬. নৈরপুকুরপাড়	১১৭. বাগেশ্বর	১১৮. খোদদাদপুর	১১৯. ছাপরা
১২০. গণকপাড়া			

টংগিবাড়ি ঃ

১২১. মাকোহাটিবাজার	১২২. মহেশপুর	১২৩. টক	১২৪. কাজিরকস্বা
১২৫. কল্কাগোবিন্দপুর	১২৬. বল্লালবাড়ি	১২৭. শাঁখারিবাজার	১২৮. আমতলি
১২৯. পুরাপাড়া	১৩০. আউটসাহী	১৩১. নোয়াদ্দা	১৩২. কাইচাইল
১৩৩. বালীগাঁও	১৩৪ আরিয়ল	১৩৫. কল্মা	১৩৬. ভরাকৈর
১৩৭. টংগিবাড়ি	১৩৮. নাটেশ্বর	১৩৯. সোনারং	১৪০. পাইকপাড়া
১৪১. আবদুল্লাপুর	১৪২. খিলপাড়া	১৪৩. কান্দাপাড়া	১৪৪. দক্ষিণ বেতকা
১৪৫. কাঠাদিয়া	১৪৬. ভাটপাড়া	১৪৭. বিন্দুসার	১৪৮. উত্তর বেতকা
১৪৯. শিমুলিয়া	১৫০. আলদি	১৫১. ধাইদা	১৫২. চাঠাতিপাড়া
১৫৩. নয়ানন্দ	১৫৪. দুলিহাটা	১৫৫. ধীপুর	১৫৬. ধামারণ
১৫৭. হাটখাড়া	১৫৮. ছোটকেওয়ার	১৫৯. সেরাজাবাদ	১৬০. পুড়া
১৬১. বাঘিয়া	১৬২. নয়না	১৬৩. মান্দ্রা	১৬৪. নশঙ্কর
১৬৫. কামারখাড়া	১৬৬ স্বর্ণগ্রাম	১৬৭. মূলচর	১৬৮. পয়সাগাঁও
১৬৯. বানরি	১৭০. হাসাইল	১৭১ বেড়াপাড়া	১৭২. বাহেরক
১৭৩. বালিগাঁ	১৭৪. রাউতভোগ	১৭৫. শিলিমপুর	১৭৬. ছটফটিয়া
১৭৭. মীতারা	১৭৮. গারুরগাঁও	১৭৯. আউটপাড়া	১৮০. দ্বিপাড়া

১৮১. সিংহের নন্দন	১৮২. চাচুরতলা	১৮৩. দশলং	১৮৪. চাঙ্গরী
১৮৫. ধোপরাপাশা	১৮৬. আদাবাড়ি	১৮৭. বিয়ানিয়া	১৮৮. সুবচনী
১৮৯. মালধা	১৯০ কুণ্ডেরবাজার		

সেরাজদিঘা ঃ

১৯১. মরিচাঙ্গ	১৯২. ভাগুিগাঁও	১৯৩. শূলপাড়া	১৯৪. আড়িগাও
১৯৫. খালপাড়	১৯৬. চিত্রকোট	১৯৭. শেখেরনগর	১৯৮. তেঘরিয়া
১৯৯. রাজানগর	২০০. নয়ানগর	২০১. কাজীশাল	২০২. গোবরদি
২০৩. টোলবাসাইল	২০৪. বেজেরহাটি	২০৫. বয়রাগাদি	২০৬. ফুরসাইল
২০৭. কাজিরবাগ	২০৮. ফেগুনাসার	২০৯. মালখানগর	২১০. মালপদিয়া
২১১. তেলিপাড়া	২১২. চোরমর্দন	২১৩. খৈরগাঁও	২১৪. বাহেরকুচি
২১৫. খালদি	২১৬. শিয়ালদি	২১৭. মধ্যপাড়া	২১৮. ভুইরা
২১৯. পাঐলদিয়া	২২০. পান্‌সা	২২১. কৃষ্ণনগর	২২২. সিঙ্গারদক
২২৩. রাজদীয়া	২২৪. উত্তর হলদিয়া	২২৫. দক্ষিণ হলদিয়া	২২৬. কনকসার
২২৭. কাঁঠালতলি	২২৮. খিলগাঁও	২২৯. জৈনসার	২৩০. ভবানীপুর
২৩১. আটিমভোগ	২৩২. চাইনপাড়া	২৩৩. গৌরীপুর	২৩৪. রক্ষিতপাড়া
২৩৫. হাটেরপাড়া	২৩৬. জীবসারা	২৩৭. ছয়তানতলি	২৩৮. কোলা
২৩৯. তাজপুর	২৪০. রসুনিয়া	২৪১. কুসুমপুর	২৪২. চন্দনধূপ
২৪৩. চামরদি	২৪৪. পশ্চিমপাড়া	২৪৫. ইছাপুরা	২৪৬. বারৈখালি
২৪৭. আবিরপাড়া	২৪৮. সন্তোষপাড়া	২৪৯. সুজানগর	২৫০. কারারবাগ
২৫১. তালতলা	২৫২. কাকালদী	২৫৩. পাউসার	২৫৪. শিমুলী
২৫৫. বাহিরঘাটা	২৫৬. শিবরামপুর	২৫৭. কুচিয়ামোরা	২৫৮. কর্মকার হাউলি
২৫৯. লতব্দী	২৬০. লস্করপুর	২৬১. বাসনিয়াহাটি	২৬২. ঘনশ্যামপুর
২৬৩. হাজিগাঁও	২৬৪. গোপালপুর	২৬৫. মোহনপুর	২৬৬. নারায়ণনগর
২৬৭. বরালিয়া	২৬৮. গোপীনাথপুর	২৬৯. মজিদপুর	২৭০. বাড়িহাজি
২৭১. শোলপুর	২৭২. শিকারপুর	২৭৩. উত্তর রাঙামালিয়া	২৭৪. দক্ষিণরাঙামালিয়া
২৭৫. পাড়াভূমি	২৭৬. চরবিশ্বনাথ	২৭৭. ছাতুরচর	২৭৮. পাথরঘাটা
২৮৯. ঘোড়ামারা	২৮০. রামকৃষ্ণদি	২৮১. কৈরাখোলা	২৮২. ধালপুর
২৮৩. চণ্ডিবর্দি	২৮৪. আরমহল	২৮৫. রামানন্দ	২৮৬. কমলাপুর
২৮৭. গয়তলা	২৮৮. মামুদপুর	২৮৯. মধুটুপী	২৯০. দানিয়াপাড়া

শ্রীনগর ঃ

২৯১. আইরলবিল	২৯২. কামারগাঁও	২৯৩. মান্দ্রা	২৯৪. বাড়িখাল
২৯৫. মাইজপাড়া	২৯৬. কুশারীপাড়া	২৯৭. পরানীমণ্ডল	২৯৮. দক্ষিণপাইকসা
২৯৯. শ্রীনগর	৩০০. ষোলঘর	৩০১. হাসাড়া	৩০২. আলমপুর
৩০৩. কেওটখালি	৩০৪. উমাপাড়া	৩০৫. দয়হাটা	৩০৬. হৃদপুর
৩০৭. হরপাড়া	৩০৮. শ্যামসিদ্ধি	৩০৯. কয়কীর্তন	৩১০. শীলামতি
৩১১. পাটভোগ	৩১২. আটপাড়া	৩১৩. চাইরগাঁও	৩১৪. নিমতলী
৩১৫. বড়সাতগাঁও	৩১৬. বীরতারা	৩১৭. সাহাপুর	৩১৮. বেলতলী
৩১৯. সিংপাড়া	৩২০. সুন্দরদি	৩২১. ব্রাহ্মণখোলা	৩২২. কাননিসাব

৩২৩. পানিয়া	৩২৪. উত্তরগাঁও	৩২৫. রাজদি	৩২৬. তন্তর
৩২৭. পাড়াগাও	৩২৮. সুরদিঘা	৩২৯. পাইলভোগ	৩৩০. ×
৩৩১. নোয়াপাড়া	৩৩২. নাগরভাগ	৩৩৩. কুকটিয়া	৩৩৪. বিবন্দী
৩৩৫. হোগলাগাঁও	৩৩৬. ছোটবেজগাঁও	৩৩৭. বাঘরা	৩৩৮. ভাগ্যকুল
৩৩৯. নয়াবাড়ি	৩৪০. কাইঠাপাড়া	৩৪১. শ্রীধরপুর	৩৪২. কোলাপাড়া
৩৪৩. দোগাছি	৩৪৪. নাগরনন্দী	৩৪৫. কাজিরপাগলা	৩৪৬. তেঁতুলিয়া
৩৪৭. দেউলভোগ	৩৪৮. কাদিরপুর	৩৪৯. সোদ্ধারদিয়া	৩৫০. দামলা
৩৫১. দেওপাড়া	৩৫২. তিনগাঁও	৩৫৩. আরব্ধিপাড়া	৩৫৪. আইরালবিল

দক্ষিণ বিক্রমপুর ঃ

৩৫৫. পালং	৩৫৬. কার্তিকপুর	৩৫৭. ছয়গাঁও	৩৫৮. উপসী
৩৫৯. বিঝারি	৩৬০. জপসা	৩৬১. নগরফতেজঙ্গপুর	৩৬২. বিলাসখান
৩৬৩. চিকন্দি	৩৬৪. রুদ্রকর	৩৬৫. কাক্দি	৩৬৬. ভোজেশ্বর
৩৬৭. জাজিরা	৩৬৮. কোয়রপুর	৩৬৯. রামভদ্রপুর	৩৭০. লোনসিং
৩৭১. নরিষা	৩৭২. চান্দনি	৩৭৩. মুলফৎগঞ্জ	৩৭৪. ধানুকা
৩৭৫. দাসারতা	৩৭৬. গয়ঘড়	৩৭৭. তিলৈ	৩৭৮. চাকদহ
৩৭৯. বুড়িরহাট	৩৮০. কুরাসি	৩৮১. কোটাপাড়া	৩৮২. পাটনিগাঁও
৩৮৩. বাঘিয়া	৩৮৪. ডোমসার	৩৮৫. ভক্তাইসার	৩৮৬. দুলুখণ্ড
৩৮৭. দেওভোগ	৩৮৮. বালাখানা	৩৮৯. রায়নন্দলালপুর	৩৯০. ধামারণ
৩৯১. আক্সা	৩৯২. মসুরা	৩৯৩. শিলংঘড়	৩৯৩. স্বর্ণঘোষ
৩৯৫. পাটানিধি	৩৯৬. আচুরা	৩৯৭. কাপাসপাড়া	৩৯৮. ভড্ডা
৩৯৯. কান্দাপাড়া	৪০০. নীলাহন	৪০১. চাম্টা	৪০২. তেলিপাড়া
৪০৩. আনাখণ্ড	৪০৪. দেওঞ্জুরী	৪০৫. কাঞ্চনপাড়া	৪০৬. বালুচরা
৪০৭. হুগলি	৪০৮. আমতলী	৪০৯. আটিপাড়া	৪১০. আনাখাঁন
৪১১. সিংহলমুড়ি	৪১২. রাহাপাড়া	৪১৩. বাজনপাড়া	৪১৪. রুকুনপুর
৪১৫. ভুমসরা	৪১৬. কাজিশুকর	৪১৭. শান্তা	৪১৮. নাগেরপাড়া
৪১৯. বানিয়াচুয়া	৪২০. রাজগঞ্জ	৪২১. কাঁঠালবাড়িয়া	৪২২. কাঁশাভোগ
৪২৩. সূর্যমণি	৪২৪. মাঐসার	৪২৫. পণ্ডিতসার	৪২৬. কাঠহুগলি
৪২৭. সালদহ	৪২৮. জালিয়াহাটি	৪২৯. ভয়মঙ্গল	৪৩০. দিনারা
৪৩১. সিঙ্গাচুয়া	৪৩২. কান্দিগাঁও	৪৩৩. সানাইসার	৪৩৪. পাচক
৪৩৫. কমলাপুর	৪৩৬. ভুচুরা	৪৩৭. তুলাসার	৪৩৮. সাজনপুর
৪৩৯. বাইকান্দি	৪৪০. কেদারবাড়ি	৪৪১. গৌরাঙ্গের ভাঙা	৪৪২. রূপসার

স্বাধীন বাংলাদেশে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম লেনিন লিখিত 'ঐতিহ্যবাহী মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রকাশিত হয়েছে। এই বই-এ প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে সম্প্রতিকালের বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে। তিনি লিখেছেন খ্রিঃ পূঃ ২৮০০ থেকে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিক্রমপুরের রামপাল ছিল প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী। বিক্রমপুর অথবা রামপাল কখনো কখনো চন্দ্রবংশ, সেন ও পাল রাজাদের রাজধানী ছিল। এদেরও আগে বলিরাজা পশ্চিম থেকে বিতাড়িত হয়ে বঙ্গদেশ জয় করেন। তাঁর রাজধানী ছিল বিক্রমপুরের গঙ্গানগরে। বিক্রমপুর নামটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত সম্ভবপর হয়নি। তবে অধিকাংশের সিদ্ধান্ত বিক্রমপুর

পরগণা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজা বিক্রমসেন। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই মতের সমর্থক। শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনে আছে বিক্রমপুরের উল্লেখ। টলেমির বিবরণে আছে, ইদ্রাকপুর বা বর্তমান মুন্সিগঞ্জের নাম ছিল বিক্রমপুর। তিনি মুন্সিগঞ্জের কাছে নদীতে বিলুপ্ত গঙ্গানগরের কথা বলেছেন। উইলিয়াম হান্টারও এই মতের সমর্থক।

বিক্রমপুর পরগণা হিসাবে পরিচিত হয় কবে থেকে? আইন-ই-আকবরী, ব্রিটিশ আমলের দলিল দস্তাবেজ, জেলা গেজেটিয়ারে এই অঞ্চল বিক্রমপুর পরগণা নামে উল্লিখিত হয়েছে। বর্তমানের ৩৬২ বর্গমাইলের বিক্রমপুর একসময় ছিল আরো বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। পরবর্তীকালে বিক্রমপুর পরগণার কোন কোন অংশ যুক্ত হয়েছে অন্য জেলায় এবং কোন কোন অংশ নদী ভাঙনে লুপ্ত হয়ে গেছে।

খ্রিঃ পূঃ তিন হাজার বছর আগে বিক্রমপুর ছিল বাঙালি সভ্যতা ও সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম কেন্দ্র। হিন্দু ও বৌদ্ধ সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল এই অঞ্চলে। মন্দিরময় বিক্রমপুর বেদ, পুরাণ, ত্রিপিটক, উপনিষদ পাঠ এবং দেবদেবীর স্তব গানে মুখরিত হয়ে উঠত। বলা যায়, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মচর্চার কেন্দ্র হিসাবে বিক্রমপুরের খ্যাতি ছিল ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ধর্মশিক্ষার জন্য এখানে আসত ছাত্ররা। বিক্রমপুর অঞ্চলে তৈরি মসলিন পাওয়া যায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার মিশরীয় মমির গায়ে। সমসাময়িককালে এই ধরনের বস্ত্র একমাত্র তৈরি হত বিক্রমপুরে। খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ শতকে বিক্রমপুরের সূক্ষ্ম মসলিনের উল্লেখ করেন গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস।

মুসলিম শাসকরা ১৩৩০ খ্রিস্টাব্দে বিক্রমপুর থেকে রাজধানী প্রথমে সরিয়ে নিয়ে যান সোনারগাঁ। তারপর ঢাকায়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের ঐতিহ্যশালী প্রাণকেন্দ্রে ইসলামধর্ম প্রচার করেন হযরত বাবা আদম শহিদ (রঃ)। পরবর্তীকালে হিন্দুরাজাদের পরাস্ত করে এখানে বিস্তৃত হয় মসলিন আধিপত্য। বিক্রমপুরের কাজিকসবায় আছে এদেশের প্রাচীনতম বাবা আদমের মসজিদ।

সিরাজুল ইসলাম লেনিন আরো লিখেছেন : 'বিক্রমপুরের হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম সভ্যতার অপরূপ কারুকার্য ও শিল্প সুষমায় ভাস্বর প্রাচীন ভাস্কর্য মূর্তি, শিলালিপি ও খোদাই করা স্তম্ভ স্তরে স্তরে সাজিয়ে রেখে গেছেন ঢাকা যাদুঘরে বিক্রমপুরের সুসন্তান উক্ত যাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা কিউরেটর ডঃ নলিনী ভট্টশালী। যে শিলালিপি ও স্তম্ভ বর্তমান জাতীয় যাদুঘরে স্থান লাভ করেছে, তার অর্ধেক সংগৃহীত হয়েছে বিক্রমপুর থেকে। এখানকার সেন ও পাল রাজাদের বাড়ি, চাঁদরায়, কেদার রায়, রাজ রাজবল্লভের প্রাসাদ, বিভিন্ন জমিদার বাড়ি এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে নানা দেবদেবীর অসংখ্য ভাস্কর্য ও মূর্তি নানা কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে, নয়তো পাচার হয়ে গেছে দেশের বাইরে। উদাহরণ স্বরূপ রাজা রাজবল্লভের রাজধানী রাজনগরের নবরত্ন, পঞ্চরত্ন, সপ্তদশরত্ন, একবিংশরত্ন ও শতরত্ন এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য বিচিত্র কারুকার্য খচিত সুন্দর সৌধমালা দ্বারা পরিশোভিত সৌন্দর্য ও স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন যা প্রাচ্যের একটি দর্শনীয় রাজবাড়ি হিসেবে সুপরিচিত ছিল, তা পদ্মার ভাঙনে বিলীন হয়ে যায়। পদ্মা গ্রাস করে চাঁদরায়, কেদার রায়ের রাজধানী প্রসিদ্ধ নগরী শ্রীপুরকে, গ্রাস করে রাজবাড়ির মঠকে। এসব কীর্তি ধ্বংস করেই পদ্মার আরেক নাম হয় কীর্তিনাশা। পরবর্তীকালে পদ্মা লৌহজং বন্দর, ভাগ্যকুলের জমিদারের প্রতিষ্ঠিত কতিপয় সৌধমালা এবং আরো বহু সংখ্যক হাটবাজার গ্রাম এবং প্রাচীন কীর্তি ধ্বংস করে। ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ শ্রীপুর আক্রমণ করে চাঁদরায় কেদার রায়ের গৃহদেবতা, 'শীলামাতা'র বিগ্রহটি সঙ্গে করে নিয়ে যান। শিল্পকর্মে ভাস্বর সেই অপূর্ব মর্মর মূর্তিটি এখন মানসিংহের জন্মস্থান ভারতের অম্বর রাজ্যে রয়েছেন বলে জানা যায়। .. (মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুরের ইতিহাস। পৃঃ ৩৫৮-৫৯)

এককালে বিক্রমপুর ছিল জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদ চর্চাকেন্দ্র। এখানে একটি মানমন্দিরও ছিল। পঞ্জিকা তৈরিতে অদ্বিতীয় এই জনপদের খ্যাতি ছড়িয়ে ছিল সর্বত্র। উজ্জয়িনী ও নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা তাদের তৈরি পঞ্জিকার অনুমোদন নিতেন এখানে। ন্যায়শাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্র, ব্যাকরণ গ্রন্থ ও বহু সংস্কৃত কাব্য রচনা করেছিলেন বিক্রমপুরের পণ্ডিতেরা।

হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'বিক্রমপুরের ইতিহাসে' উল্লেখ আছে বুদ্ধদেব আমন্ত্রিত হয়ে দুতিনবার শ্রীপুর এসেছিলেন। তিনি বিক্রমপুরের মানুষের পর্ণকুটিরে মুগ্ধ হয়ে শ্রমণদের ঐরকম কুটিরে বসবাসের উপদেশ দেন। বুদ্ধদেব বিক্রমপুরে যেখানে বসে বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা করতেন, পরবর্তীকালে সেখানে ৮ ফুট উঁচু প্রস্তর নির্মিত বৌদ্ধমূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। খ্রিঃ পূঃ ২৮০০ সালে অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমা মুনি বলিরাজার আমন্ত্রণে বিক্রমপুর আসেন। মহাকবি কালিদাসও এসেছিলেন এই ঐতিহ্যশালী জনপদে। খ্রিঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে এসেছিলেন গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস. চীনা পরিব্রাজক হু-এন-সাঙ। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এসেছিলেন বিক্রমপুর। তিনি এখানে ছিলেন প্রায় দুবছর। সেখানে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের দশম অধ্যায়ে তার উল্লেখ আছে।

মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুরের ইতিহাসবেত্তারা তাদের রচনাবলীতে বহু পরিমাণে আকার উপাদান সমূহ ব্যবহার করেছেন এবং প্রায়ই তাঁদের বর্ণনায় অঙ্গীভূত করেছেন সত্যিকার আকর দলিলপত্র কিংবা ওইসব দলিলের সারসংক্ষেপ, যোড়শ শতকের মূল্যবান আকর উপাদান মেলে আবুল ফজলের ইতিবৃত্ত 'আকবর নামায়', সপ্তদশ শতকে এই ধারা অনুসরণে লিখিত হয় বাংলার তৎকালীন মোগল সেনাধ্যক্ষ মির্জাখানের স্মৃতিকথা 'বাখাস্তিন-ই-গাইবি' এবং আবদুল হামিদ রচিত 'পাতশাহনামা' ও মুহম্মদ সালিহকাম্বুর 'আমলই সালিহ' (সালিহের শ্রম) মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুরে অন্যান্য শিল্পের চেয়ে স্থাপত্য শিল্প তখন নির্ভরশীল ছিল ধনী পৃষ্ঠপোষকদের ওপর। মোঘল আমলে শক্তি ও আধিপত্য প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বেশি বেশি সংখ্যায় জমকালো প্রাসাদ ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটতে লাগল। এইসব দালানের মুসলিম স্থাপত্য শৈলীর পাশাপাশি স্থান পেতে লাগল স্থানীয় শিল্পরীতির ঐতিহ্য। ভাগ্যকুলের কুণ্ডের বাড়ি, শ্রীনগরের রাধাকান্ত সার বাড়ি এবং রামপালে বল্লালসেনের ভূদৃশ্যপটের পরিবেশ চমৎকার খাপ খেয়ে গিয়েছিল। স্থাপত্য শৈলীর বিচারে স্থানীয় দালানগুলি ছিল নিরাভরণ, সরল ছাদের। পারস্য, মধ্য এশিয়া এবং ভারতের দিল্লি আগ্রা থেকে আমদানি করা মুসলিম স্থাপত্য শৈলীর বৈশিষ্ট্য ছিল রেখার শোভনতা, কারুকার্যের জটিলতা ও সুসমঞ্জস্য অনুপাতবোধ। যদিও কিছু কিছু মন্দির ও বসতবাড়ি সে সময়ে কারুকার্য খচিত ও ব্যাস রিলিফ শোভিত পোড়া মাটির টালির আস্তরণ দিয়ে নির্মিত হয়েছিল, তবু সাধারণভাবে তা ছিল ইটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরি ও চুনকাম করা এবং দেয়ালগুলিতে জানালা থাকত খুবই কম ও তাও আবার সংকীর্ণ।

মিনিয়েচার (মুদ্রাবয়ব) চিত্রই ছিল এই যুগের চিত্রশিল্পের প্রধান ধরন। ষোড়শ শতাব্দীতে মিনিয়েচর চিত্রের জৈন ঐতিহ্যের প্রবহমান ধারা হিসেবেও পরিচিত। বস্তুত চিত্রকলার এই বিশেষ ধরনটি সৃষ্টি হয়েছিল পারস্যেই। নানা প্রকৃতির এইসব ছবি দেখলে মনে হয় শিল্পী যেন বাড়িগুলিতে ওপর থেকে দেখছেন। সপ্তদশ শতকে, বিশেষ করে ইউরোপীয় বিষয়বস্তু ইত্যাদিকেও এই মিনিয়েচর চিত্রে কখনও কখনও প্রবেশলাভ করতে দেখা যায় (যেমন ম্যাডোনা ও শিশুর চিত্র) আর দেখা যায় কিছু কিছু ইউরোপীয় অংকন রীতিকে গ্রহণ করতে। ছবিগুলিতে ব্যবহৃত রঙগুলি প্রকৃতিতে বস্তুজাত, সাধারণত খনিজ পদার্থ জাত, আর এই রং আজও পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে।

মধ্যযুগের মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুরে অতীতের মহাকাব্যের নানা ঘটনা ও জনশ্রুতি বীর

কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে সঙ্গীত ও নৃত্য সহযোগে নানা ধরনের জনপ্রিয় উৎসব ও আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান হোত। বিশেষ করে বিষ্ণুর উপাসনা ও বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে এগুলি ছিল সম্পর্কিত। কখনও কখনও বিশেষ পূজার অনুষ্ঠান ইত্যাদি উপলক্ষে এইসব উৎসব মঞ্চস্থ হোত সামন্ত ভূস্বামীদের গৃহে এবং মণ্ডপেও। তবে রাজ্যের জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে অনেক সময় উৎসবগুলি তাদের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে ফেলত এবং পরিণত হোত কৃত্রিম ভণ্ডামিতে।' *মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুরের ইতিহাস-সিরাজুল ইসলাম লেলিন, পৃঃ ৯৮-৯৯*

বিক্রমপুর ঃ

Celebrated as the ancient seat of government under the Hindu Kings of Bengal, from the reign of Vikramaditya up to the time of the overthrow of the dynasty by the Musalmans. The place where the Hindu princes resided is still pointed out as Rampal, a little to the west of Firinghi Bazar. The site of the palace of king Ballal Sen consists of a quadrangular mound of earth, covering an area of about three thousand square feet, and surrounded by a moat about two hundred feet wide. There are no traces of buildings within this enclosed space, but in its vicinity, and in the country for many miles around, mounds of bricks, and wall foundations at a great depth below the surface, are met with, and were formerly used as building materials for the coustruction of houses in the city. Near the site of Ballal Sen's palace there is a deep excavation called Agnikunda, where it is said the last Hindu prince of Bikrampur and his family burned themselves on the approach of the Musalmans. Tradition relates that the Prince, when he went out to meet the invaders of his territory carried with him a messenger pigeon, whose return to the palace was to be regarded by his family as an intimation of his defeat, and a signal to put themselves to death. It appears that the prince gained the victory, but unfortunately, while stopping to drink from the river after the fatigues of the day, the bird escaped from his garment in which it was concealed, and flew to its destination. The Raja hurried home, but arriving too late to avert the consequences of the unhappy accident, he cast himself upon the funeral pile, still smoking with the ashes of his family, and thus closed his dynasty. The large Rajnagar temple on the banks of the Ganges in the Fiscal division of the same name is also an object of interest, and in 1870 was reported to me as in danger of being washed away by the river."[১১]

[Statistical Account of Bengal Vol. V. p. 70-71]

রামপাল ঃ

"রামপাল নামক এক প্রকাণ্ড দিঘির পাড়ে, প্রাচীন রাজধানী বিক্রমপুর অবস্থিত ছিল বলে জানা যায়। দিঘিটির দৈর্ঘ্য এক মাইলের তিন চতুর্থাংশ এবং প্রস্থে এক চতুর্থাংশ। এ দিঘির উত্তরে অবস্থিত ছিল বল্লাল বাড়ি বা সেনরাজা বল্লাল সেনের প্রাসাদ। এর ভগ্নাংশ এখন প্রায় ৩০০০ বর্গফুট বিস্তৃত একটি চতুষ্কোণা মাটির ঢিবিমাত্র যা চারদিকে ২০০ বর্গ ফুট বিস্তৃত একটি খালের দ্বারা বেষ্টিত। এই দিঘির প্রায় দেড় কিলোমিটারের মধ্যে অন্যান্য ভবনাদির ভিত্তি এবং ভগ্নাবশেষের চিহ্ন পায়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সত্তর

হাজার টাকা মূল্যের একটি হীরক খণ্ড এ এলাকার একজন চাষী জমি চাষকালে পেয়েছিলেন। বল্লাল বাড়ির অভ্যন্তরে একটি স্থান খনন করে অগ্নিকুণ্ড নামে একটি গভীর গর্ত পাওয়া গেছে। প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায় বিক্রমপুরের শেষ রাজপুত্র মুসলমানদের আগমনের ফলে নিজেদেরকে স্বপরিবারে অগ্নিদগ্ধ করেন। এই বল্লাল বাড়ির নিকটেই বাবা আদম শহিদের মাজার অবস্থিত। বাবা আদমের মসজিদটির দৈর্ঘ্য ৪৩ ফুট, প্রস্থে ৩৬ ফুট এবং ৬½ ফুট বিস্তৃত এর দেয়াল। এরমধ্যে রয়েছে ৬টি মিনার। বাবা আদম সম্পর্কে অনেক প্রচলিত কাহিনী থাকা সত্ত্বেও তিনি যে একজন দরবেশ বা সাধক ছিলেন সে সম্পর্কে সবাই একমত। তিনি সুদূর মক্কা থেকে এখানে এসেছিলেন, একজন হিন্দু রাজা কর্তৃক একজন মুসলমানের উপর সংঘটিত অবিচারের প্রতিকার করার জন্য। তিনি রাজার হাতে নিহত হলেও এর অল্পদিনের মধ্যেই রাজার পতন ঘটে।”[২০]

...বহুবার এই পরগণার সীমানা পরিবর্তন হওয়ার জন্য ইহার কিয়দংশ বর্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হইয়াছে। উত্তরে ধলেশ্বরী নদী, দক্ষিণে ইদিলপুর পরগণা, পূর্বে মেঘনা ও পশ্চিমে পদ্মা—সাধারণত এই চতুঃসীমার অন্তর্গত ভূভাগ বিক্রমপুর নামে পরিচিত। বিক্রমপুরের বহু প্রাচীন কীর্তি লোপ করায় এই অঞ্চলে পদ্মার নাম যে কীর্তিনাশা হইয়াছে। ...বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ যে, প্রাচীন-কালে এই স্থানে বিক্রম নামক জনৈক রাজার রাজ্য ছিল।

“মুন্সিগঞ্জ হইতে তিন মাইল পশ্চিমে বিক্রমপুরের প্রাচীন রাজধানী রামপাল অবস্থিত। প্রবাদ অনুসারে, পালবংশীয় নৃপতি রামপালদেবের নাম হইতেই এই স্থানের ‘রামপাল’ নাম হইয়াছে। বিক্রমপুর অঞ্চলে যে এক সময়ে পাল রাজগণের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, বিক্রমপুরের বিভিন্ন প্রাচীন স্থান হইতে প্রাপ্ত পালযুগের বহু শিল্পদ্রব্য, প্রস্তরমূর্তি ও মৃত্তাকর্য হইতে তাহার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেনবংশীয় নৃপতি বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রফলকে ‘স খলু শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ’ এইরূপ লিখিত আছে। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকে অনুমান করেন যে, এই শ্রীবিক্রমপুর ও বর্তমান রামপাল অভিন্ন।

“মুন্সিগঞ্জের দেড় মাইল উত্তর-পশ্চিমে ধলেশ্বরীর দক্ষিণে কূলে সুপ্রসিদ্ধ গঞ্জ মীর কাদিম অবস্থিত। মীর কাদিম হইতে আর দেড় মাইল পশ্চিম ফিরিঙ্গিবাজার গ্রাম। নবাব শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া ফিরিঙ্গি বন্দিদিগকে আনিয়া এই স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এখানে একটি পুরাতন রোমান ক্যাথলিক গির্জাঘর আছে।

“বিক্রমপুরের বহু গ্রামে বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবী মূর্তি অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহুকাল ধরিয়া সংস্কৃতচর্চা ও জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনার জন্য বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধি ছিল। বিক্রমপুরের পর নবদ্বীপে পঞ্জিকা প্রস্তুত আরম্ভ হয়। বিক্রমপুরের স্থানীয় সময় উজ্জয়িনী হইতে ইহার দেশান্তর দুই দণ্ড চৌত্রিশ পল ঠিকভাবে গণনা করিয়া পঞ্জিকায় দেওয়া হইত। নবদ্বীপ ও কলিকাতায় পঞ্জিকা প্রস্তুত আরম্ভ হইলে তাহাতে বিক্রমপুরের স্থানীয় সময়ই দেওয়া হয়। আধুনিককালের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিচারপতি স্যর চন্দ্রমাধব ঘোষ, বিজ্ঞানাচার্য স্যর জগদীশ চন্দ্র বসু প্রভৃতি বাংলার বহু খ্যাতিমান পুরুষ বিক্রমপুরের লোক বিপ্রকল্পলতিকা নামক গ্রন্থ অনুসারে সেনবংশীয় বিক্রমসেন বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠাতা। এ অঞ্চলের পাতক্ষীর, দই, সন্দেশ ও নারিকেলের জিবা-চিড়ার খ্যাতি আছে। বাংলার শেষ হিন্দু রাজবংশ রামপাল নগরে বহুকাল রাজত্ব করেন। এই স্থানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রদেবের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। খড়্গবংশের পতনের পর চন্দ্রবংশীয় রাজগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শ্রীচন্দ্রদেবের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল। তাঁহার মাতার নাম ছিল কাঞ্চনা। এই তাম্রশাসন দ্বারা শ্রীচন্দ্রদেব পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির নেহকাষ্ঠীগ্রামে পীতবাস গুপ্তশর্মাকে ভগবান

বুদ্ধের উদ্দেশে কিছু জমি দান করেন। "লঘুভারত" গ্রন্থ অনুসারে মহারাজ লক্ষ্মণসেন রামপালে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ বল্লালসেন নির্মিত বলিয়া কথিত একটি বৃহৎ প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা বল্লালবাড়ি নামে পরিচিত। রামপাল দিঘি, বল্লাল দিঘি প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দিঘি এখানে বর্তমান। গত শতাব্দীতে এই স্থানে একজন কৃষক মাটি খুঁড়িতে গিয়া ৭০ হাজার টাকা মূল্যের একখণ্ড হীরক পাইয়াছিল। রামপালের নিকট ধামদ গ্রামে একখানি সোনার পুঁথি পাওয়া গিয়াছিল, ইহার ২৪টি পাতার প্রত্যেকটি ৩০ ভরি ওজনের। রামপাল একটি বিস্তীর্ণ নগরী ছিল; ইহার নিকটস্থ পঞ্চসার, দেওভোগ, বজ্রযোগিনী, সুখবাসপুর, জোড়াদেউল প্রভৃতি বহু স্থানে প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কাহারও কাহারও মতে নালন্দা মহাবিহারের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ শীলভদ্র রামপালে জন্মগ্রহণ করেন। রামপালের সেনবংশের পতন সম্বন্ধে কথিত আছে, সেনবংশীয় রাজা দ্বিতীয় বল্লালসেন যখন রাজা তখন একজন মুসলমান প্রজা ফকিরের আশীর্বাদে পুত্র-সন্তান লাভ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য রাজনিষেধ সত্বেও একটি গোহত্যা করেন। এক টুকরা মাংস চিলে রাজপ্রাসাদে নিক্ষেপ করিলে রাজা অনুসন্ধান করিয়া ঘটনার কথা জানিতে পারিয়া মুসলমান প্রজার শিশু-পুত্রটিকে বধ করিতে আদেশ দেন। রাজাদেশে শিশুপুত্র নিহত হইলে শোকসন্তপ্ত পিতা মক্কাশরীফে গমন করেন; তথায় হজরত আদম তাঁহার করুণ কাহিনী শুনিয়া বহু অনুচর লইয়া রামপালের নিকট আসিয়া কয়েকটি গোবধ করেন। সুতরাং রাজা দ্বিতীয় বল্লালের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। কথিত আছে, চৌদ্দ দিন যুদ্ধের পর হজরত আদম যখন সন্ধ্যায় নমাজ পড়িতেছিলেন সেই সময়ে দ্বিতীয় বল্লাল সহসা আসিয়া তরবারির আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করেন। যুদ্ধে আসিবার সময়ে দ্বিতীয় বল্লাল সঙ্গে করিয়া একটি শিক্ষিত পারাবত আনিয়াছিলেন এবং পরিবারবর্গকে বলিয়া আসিয়াছিলেন যে, যুদ্ধে হারিয়া যাইলে তিনি পারাবতটি ছাড়িয়া দিবেন এবং প্রাসাদে উহা পৌঁছাইলে পরিবারবর্গ তাঁহার পরাজয়ের কথা জানিতে পারিবেন। হজরত আদমকে নিহত করিয়া দ্বিতীয় বল্লাল যখন দিঘিতে স্নান করিতেছিলেন, সেই সময়ে পারাবতটি হঠাৎ ছাড়া পাইয়া রাজপুরীতে চলিয়া যায়। রাজ পরিজনের সকলে তখন একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন করেন। রাজা তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিয়া মনের দুঃখে নিজেও অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দেন; এই জন্য তিনি পোড়া রাজা নামে পরিচিত। রামপালের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড নামে একটি জলাশয় এখনও বিদ্যমান; উহা খনন করিলে বহু পরিমাণে অঙ্গার পাওয়া যায়। প্রবাদ, এই অগ্নিকুণ্ডেই রাজা দ্বিতীয় বল্লালসেন সপরিবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হন। রামপালের ঠিক উত্তরে কাজি-কস্‌বা গ্রামের দুর্গাবাড়ি নামক স্থানে আদম শহিদ বা বাবা আদমের মসজিদ ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। ইহার শিলালেখ হইতে জানা যায় যে, ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইহা সুলতান জালালউদ্দীন ফতে শাহের রাজত্বকালে মালিক কাফুর কর্তৃক নির্মিত হয়। ইহা ঢাকা জেলার প্রাচীনতম মসজিদ; মসজিদের প্রবেশদ্বারের নিকটে দুইটি প্রস্তরস্তম্ভ হিন্দু মুসলমান রমণীগণ কর্তৃক সিন্দুর লিপ্ত হইয়া থাকে। বামপার্শ্বের পশ্চিমে আবদুল্লাপুর ও পাইকপাড়া গ্রামের মধ্যে কানাইচঙ্গের মাঠ নামে একটি ক্ষুদ্র প্রান্তর দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, এই স্থানে রাজা দ্বিতীয় বল্লালসেনের সহিত মুসলমানদিগের যুদ্ধ কানাইচঙ্গ নামক একজন সৈনিক দ্বিতীয় বল্লালের পক্ষে বিশেষ সাহস ও দক্ষতা প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার নাম হইতে যুদ্ধক্ষেত্র কানাইচঙ্গের মাঠ নামে পরিচিত হয়। ইহা আবদুল্লাপুরের যুদ্ধ নামে অভিহিত। কাহারও কাহারও মতে এই যুদ্ধেই দ্বিতীয় বল্লালসেন নিহত হন এবং তাহার পর হইতে পূর্ববঙ্গে হিন্দু রাজত্বের অবসান হয়। আবদুল্লাপুর গ্রামে মহারাজ বল্লালসেন নির্মিত মীরকাদিম খালের উপর একটি পুরাতন সাঁকো আজও বিদ্যমান।[২১] *[ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। ৮০৩-০৪]*

বিক্রমপুর সম্পর্কে ধনঞ্জয় দাসমজুমদার তাঁর 'বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কিছুটা আবেগতাড়িত হলেও, তাঁর বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক তথ্যের কিছু সন্ধান মেলে। তিনি লিখেছেন সমুদ্র থেকে উত্থিত ঢাকার বিক্রমপুর, চন্দ্রপ্রতাপ এবং বরিশাল নিয়ে গঠিত রাজ্যটি দেব বংশের রাজাদের তাম্রলিপিতে 'বিক্রমপুর ও নাব্য রাজ্য' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন রামপাল। তাঁর পূর্বপুরুষ ভারত সম্রাট বীরবিক্রম বা সম্রাট ধর্মপালের নামে স্থাপন করেন বিক্রমপুর রাজ্য এবং রাজধানীর নাম দেন রামপাল। রামপাল তাঁর মাতস্বসা, পুত্র, ভূষণার স্বাধীন রাজা হরিবর্মার বৈমাত্রেয় ভাই শ্যামল বর্মাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। "শ্যামল বর্মাই সম্রাট রামপাল প্রতিষ্ঠিত বিক্রমপুর নাব্য রাজ্যের প্রথম সন্ধিবদ্ধ স্বাধীন রাজা ও বঙ্গের প্রতিরাজরূপে রাজত্ব করেন এবং তাঁহারই বংশধর মন্দা রায় এই রাজ্যের স্বাধীন রাজারূপে ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের সহিত সন্ধি করিয়া বার ভুঁইয়া নাম ধারণ করেন। সুতরাং শ্যামল বর্মার বংশধরগণ দেব ও রায় উপাধি গ্রহণ করিলেও একমাত্র তাঁহারাই ধারাবাহিকরূপে এই বিক্রমপুর রাজ্যে রাজত্ব করেন ...।' শ্যামলবর্মা রামপালের কাছ থেকে রাজ্য পেয়েছিলেন ১০৮৪ খ্রিস্টাব্দে। শ্যামল বর্মার পর তাঁর পুত্র ভোজবর্মা রাজা হন। এই বংশেরই উত্তরপুরুষ দশরথদেব দনুজমাধব। দনুজ মাধবের পুত্র রামচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপ শাসন করতেন। বিক্রমপুরে রাজা শ্যামল বর্মার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। তাছাড়া শ্যামল বর্মা ও ভোজবর্মার বহু তাম্রলিপি ও শিলালিপিও পাওয়া গেছে। সোনারগাঁয়ে তাদের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। যতীন্দ্রমোহন রায়ের 'ঢাকার ইতিহাসে' আছে, রাজপ্রাসাদের সামনে পরিখার ওপর ছিল চলন্ত সেতু। এখানে যে বন্দর ছিল, সেই বন্দর থেকেই ইবন বতুতা যবদ্বীপ যাত্রা করেছিলেন। দশরথদেব দনুজ মাধবের বংশধর রাজা মন্দা রায় ওরফে মন্ত্রি রায় বা মুকুট রায় বিক্রমপুরের রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন অন্যতম বার ভুঁইয়া। তাঁর পতন ঘটে মগ-পতুর্গিজ এবং কেদার রায়ের মিলিত আক্রমণে। এই রায় বংশই ছিল ঢাকার নান্না অঞ্চলের বিখ্যাত জমিদার। ইংরেজ আমলের শেষ পর্যন্ত এদের জমিদারি ছিল।

বজ্রযোগিনী :

"বিক্রমপুরের রাজধানী রামপাল নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সুপ্রসিদ্ধ বজ্রযোগিণী গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামটিকে একটি ছোটখাট পরগণা বলা যাইতে পারে ; ইহা সাতাইশটি পাড়ায় বিভক্ত। ইহার এক-একটি পাড়া এক-একখানি গ্রামের সমান। এই গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় তিনটি ডাকঘর আছে; ইহা হইতেই গ্রামখানির বিশালতা অনুমান করা যাইতে পারে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে এই গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের জন্মস্থান। এই গ্রামে ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বিশিষ্ট বৌদ্ধ জ্ঞানী ও পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ এক রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কথিত। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী ও মাতার নাম প্রভাবতী। বার বছর ধরিয়া দীপঙ্কর সুপ্রসিদ্ধ বজ্রাসন বিহারে অধ্যয়ন করেন। পরে তৎকালের প্রাচ্য বৌদ্ধদের সর্বপ্রধান স্থান সুবর্ণদ্বীপের (ব্রহ্মের পেগু জেলার সুধর্ম নগর—বর্তমান নাম থেটন) মহাসংঘিকাচার্যের নিকট আরও বার বছর অধ্যয়ন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় বৌদ্ধপণ্ডিত দ্বিতীয় ছিল না। মহারাজ নয়পাল তাঁহাকে বিক্রমশিলা মহাবিহারের সর্বাধ্যক্ষ পদে বরণ করেন। তথা হইতে তিব্বতীয়গণ কর্তৃক সনির্বন্ধ অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি তিব্বতে গমন করিয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম পুনরুজ্জীতি করেন। তিব্বতে তাঁহার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তিব্বতে দীপঙ্কর প্রতিষ্ঠিত বজ্রযোগিণী মূর্তির নামকরণ স্পষ্টতই তাঁহার জন্মস্থানের নাম হইতেই হইয়াছে। দীপঙ্কর শতাধিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দান-শ্রীও অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বজ্রযোগিণী গ্রামে দীপঙ্করের গৃহ এখনও নাস্তিক পণ্ডিতের বাড়ি বলিয়া পরিচিত।" ২২

[বাংলায় ভ্রমণ—অখণ্ড সংস্করণ। পৃঃ ২৬৮]

বর্তমান বজ্রযোগিণী একটি বেশ বড় গ্রাম। গ্রামে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা অন্যান্য গ্রামের তুলনায় অনেক বেশি।

রঘুরামপুর/সুখবাসপুর/কামারপাড়ার মঠ ঃ

রামপালের দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রঘুরামপুর গ্রামে বিক্রমপুরের চাঁদরায় কেদার রায়ের অব্যবহিত পূর্বে রঘুরাম রায় নামে একজন স্থানীয় রাজা ছিলেন। তাঁহার বীর সেনাপতি রামমালিক পল্লী কবিতায় স্থান পাইয়াছেন।

রাম মালিকের লাঠি।
রঘুরামের মাটি।।
উঠলে লাঠির ডাক।
দৌড়ে পালায় বাঘ।।
গুলি ফিরে ঝাঁকে।
রামের লাঠির পাকে।।
মালিক ধরে লাঠি।
যম যেন সে খাটি।।

[ঢাকার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ৪৯৮ পৃষ্ঠা যতীন্দ্র মোহন রায়]

"রঘুরামপুরের পশ্চিমে সুখবাসপুর গ্রামের দিঘির ধারে রাজা রঘুরামের একটি প্রমোদ ভবন ছিল বলিয়া গ্রামটির নাম সুখবাসপুর হয় বলিয়া কথিত। এই গ্রামে একটি সুন্দর তারা মূর্তি পাওয়া গিয়াছিল।

"মুন্সিগঞ্জ হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে সেরাজাবাদ গ্রামে বিক্রমপুরের বাউল সম্প্রদায়ের প্রবর্তক সুধারাম বাউলের আখড়া অবস্থিত। তাঁহার রচিত বহু বাউল সঙ্গীত এ অঞ্চলে চলিত আছে। সেরাজাবাদ হইতে প্রায় ৩ মাইল আরও দক্ষিণে কামারপাড়া গ্রামের উচ্চ মঠটি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ; এই গ্রামে একটি দিঘির সংস্কারকালে লব্ধ অতি সুন্দর রজত-নির্মিত শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী একটি চতুর্ভুজ ত্রিবিক্রম মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। পদ্মের উপর দণ্ডায়মান মূর্তিটি সর্বসুদ্ধ ১৪ ইঞ্চি। দুই পার্শ্বে রজত-নির্মিত লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্তি ; পাদদেশে অষ্টধাতুর গরুড় ও উপরে অষ্টধাতুর চাল বিদ্যমান। বিগ্রহটি সম্বন্ধে নানারূপ অলৌকিক ঘটনার কাহিনী প্রচলিত আছে। *[বাংলায় ভ্রমণ—অখণ্ড সংস্করণ। পৃঃ ২৬৮-২৬৯]*

ভাগ্যকুল ঃ

পদ্মার ভাঙনে এই ঐতিহ্যশালী গ্রামটির বহু অংশই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মুন্সিগঞ্জ জেলার দক্ষিণ পশ্চিমের এই গ্রামটিতে ছিল মনোরম জমিদার বাড়ি এই জমিদাররাই রায় পরিবার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে ৫০ হাজার টাকা দান করেছিলেন।

বাবা আদমের মসজিদ ঃ

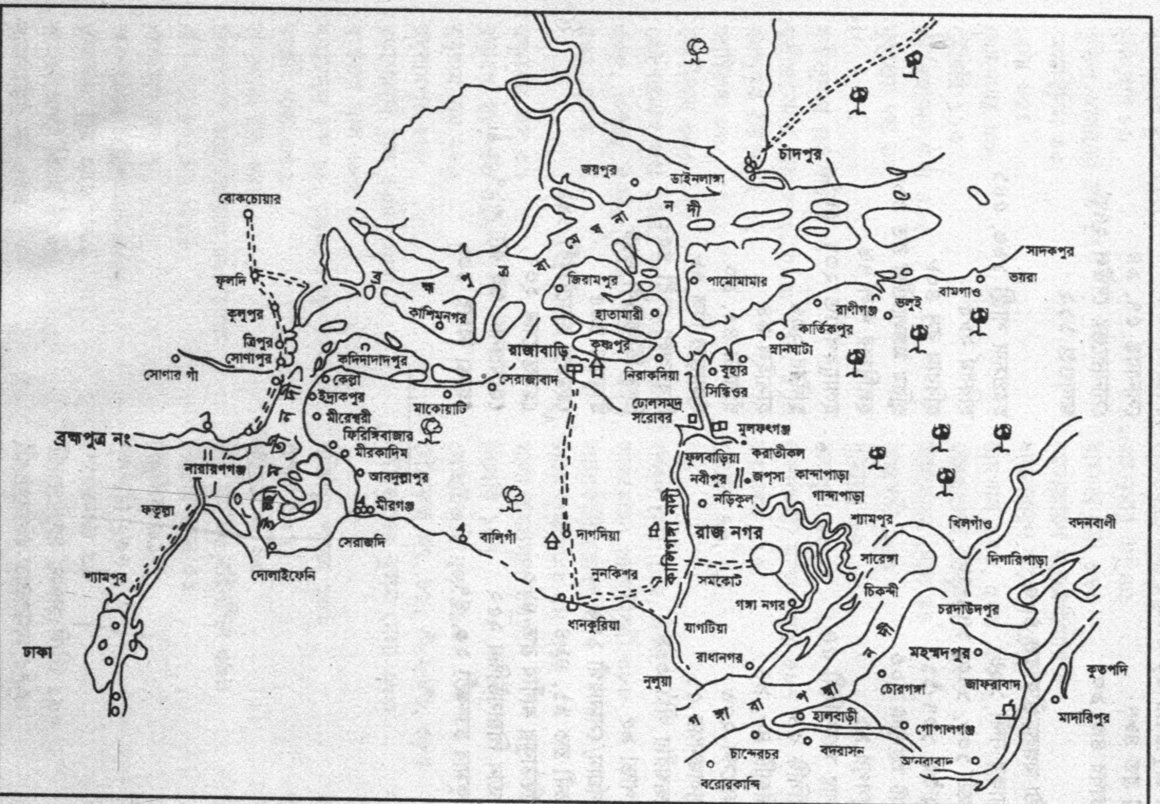
"মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের রামপাল অঞ্চলে ১৪৮৩ সনে সুলতান ফতেহশাহের সময়ে মালিক কাফুর বাবা আদম শহিদের মসজিদ নির্মাণ করেন। কথিত আছে সুফীসাধক বাবা আদম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলে আসেন এবং বল্লাল সেনের নিকট পরাজিত ও নিহত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। মসজিদটি ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি উত্তর-দক্ষিণে ৪৩ ফুট এবং পূর্ব পশ্চিমে ৩৬ ফুট। অভ্যন্তরে দুটি সারিস্তম্ভ দ্বারা বিভক্ত। প্রতি সারিতে দুটি করে পাথরের স্তম্ভ রয়েছে। এই ইমারতের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে সম্মুখভাগের তিনটি খিলান সম্বলিত প্রবেশপথ, ছাদের ক্ষুদ্র ৬টি গম্বুজ, চার কোণায় আটকোণীয় বুরুজ, বক্রাকার কার্নিশ, দেয়ালে প্যানেল, মিহরাব প্রাচীরে তিনটি অবতল মিহরাবে সূক্ষ্ম ও ব্যাপক পোড়ামাটির নক্‌শা। প্রধান মিহরাবটি এবং দুই পার্শ্বে দুই

মিহরাবের পাশের দেয়ালব্যাপী লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশা ও গোলাপফুল, ঝুলন্ত প্রদীপ ও খিল প্রভৃতি উপকরণ দেখা যাবে। সুলতানী আমলের এই মসজিদে কোন বারান্দা ছিল না এবং কোন খোলা চত্বরও দেখা যায় না।" (ঢাকা জেলা গেজেটিয়ার ১৯৯৩। পৃঃ ৮০৭)

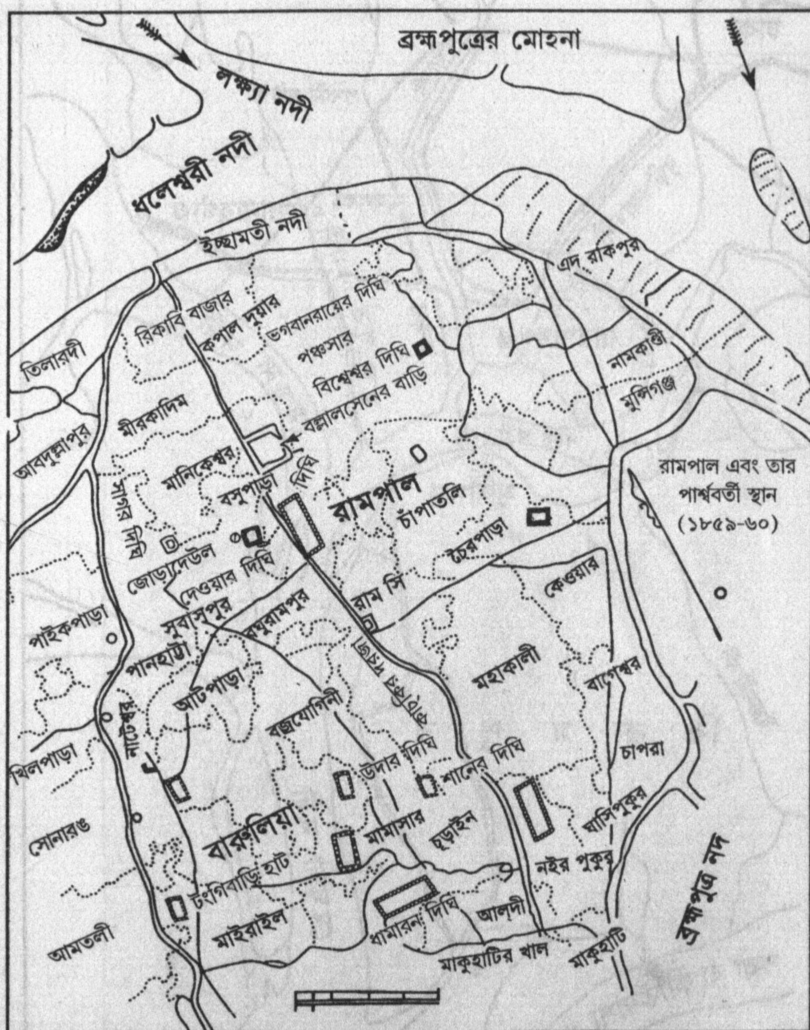
"ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার বাবা আদম শহিদের মসজিদটির স্থাপত্য গুরুত্ব সর্বাধিক। ৪৩ ফুট × ৩৬ ফুট উত্তর-দক্ষিণ লম্বা এ মসজিদটি এতদঞ্চলে খুবই আকর্ষণীয়। মোহম্মদ যাকারিয়া এভাবে বর্ণনা দেন, ইস্টকনির্মিত এই মসজিদের প্রাচীরগুলো ৬ ফুট প্রশস্ত। চারকোণায় ৪টি অষ্টকোণাকার টারেট রয়েছে। পূর্ব দেয়ালে ৩টি দরজা আছে। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ২টি করে দরজা থাকার কথা। দরজার পরিবর্তে সেখানে আছে গভীর কুলুঙ্গি। পশ্চিম দেয়ালে আছে ৩টি মিহরাব। মসজিদের অভ্যন্তরভাগে আছে গ্রানাইট পাথরের নির্মিত দু'টি স্তম্ভ। স্তম্ভ দু'টি মেঝে থেকে ৪ ফুট পর্যন্ত অষ্টকোণাকৃতির। এরপর ষোল কোণাকৃতির। এ দু'টি স্তম্ভ ও চারপাশের দেয়ালের উপর মসজিদের ৬টি গম্বুজ স্থাপিত। মিহরাবগুলি পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ছিল।

"বাবা আদমের মসজিদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ঢালু কার্নিশ, যা বাঁকানো অবস্থায় আছে। মসজিদটিতে তিনটি খিলান পথ রয়েছে যার ভিতর দিয়ে অভ্যন্তরে যাওয়া যায়। খিলানগুলো দ্বি-কেন্দ্রিক। খিলানের উপরে বেড়ি বা মৌল্ডিং দেখা যাবে। কখনো দু'সারি এবং মধ্যবর্তীটি তিনসারি। এর উপরে একটি শিলালিপি রয়েছে। এ শিলালিপির পাঠোদ্ধার করে জানা যায় যে সুলতান ফতেহ্ শাহের রাজত্বকালে জনৈক মালিক-উল-মোয়াজ্জেম নামক এক ব্যক্তি হিজরী ৮৮৮/১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেন। একনজরে দেখলে মনে হবে যে এর সাথে দিল্লির কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের আলাই দরওয়াজার সাদৃশ্য রয়েছে, বিশেষ করে গম্বুজের আকৃতি এবং কেন্দ্রীয় মিহরাব, তীরফলক দ্বারা খাঁজ কাটা মিহরাবের খিলানে। লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশা, ঝুলন্ত শিকল ও ফুল প্রভৃতি মোটিভ দ্বারা এ মসজিদটি অলঙ্কৃত করা হয়। প্রাক মুঘল যুগে ছয় গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ দেখা যাবে মুয়াজ্জেমাবাদের মসজিদে।" (বাংলাদেশের মুসলিম পুরাকীর্তি—ডঃ সৈয়দ মাহমুদুল হাসান। পৃঃ ২১৩-১৪)

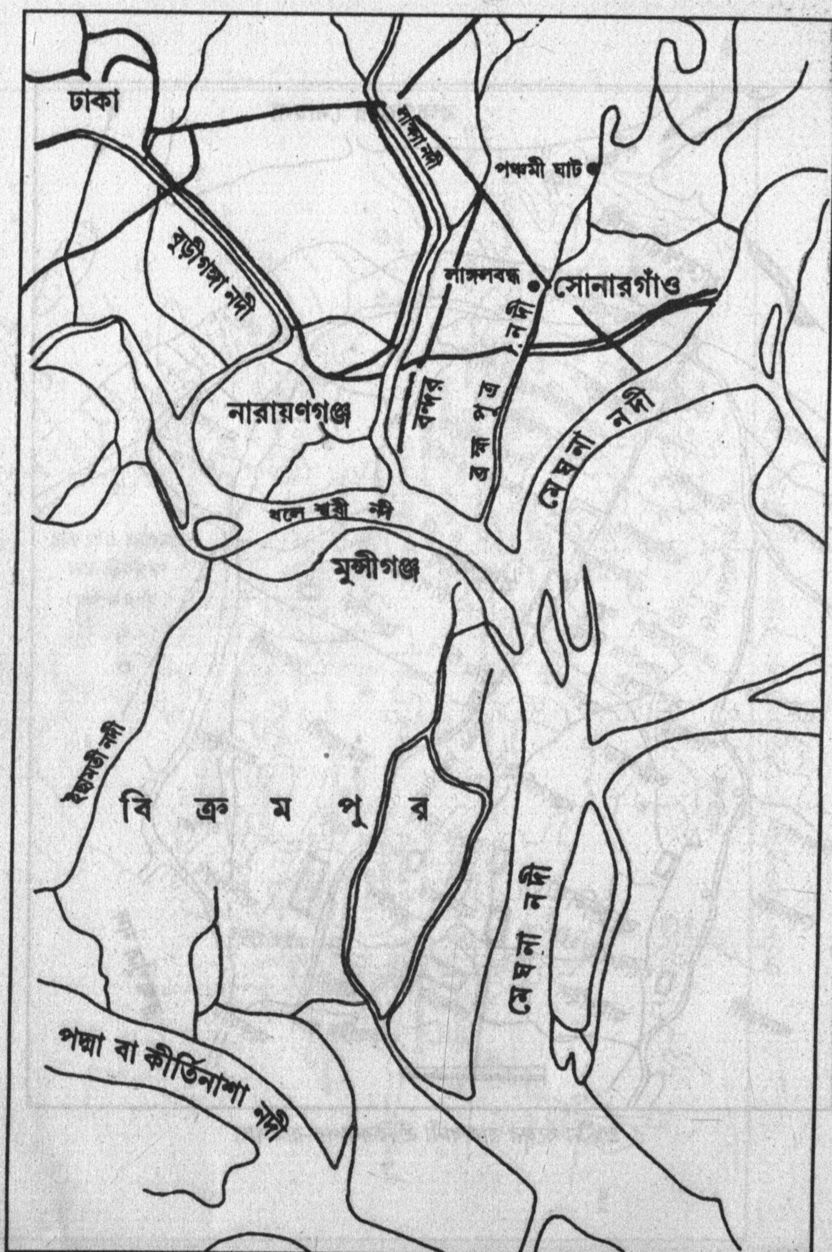
নির্ঘণ্ট



প্রাচীন বিক্রমপুর ঃ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তর 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে



প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর-রামপাল



ঢাকা
পাগলা নদী
পঞ্চমী ঘাট
বুড়ীগঙ্গা নদী
লাঙ্গলবন্ধ
সোনারগাঁও
নারায়ণগঞ্জ
বন্দর
ব্রহ্মপুত্র নদী
মেঘনা নদী
ধলেশ্বরী নদী
মুন্সীগঞ্জ
ইছামতী নদী
বি ক্র ম পু র
মেঘনা নদী
পদ্মা বা কীর্তিনাশা নদী



দ্বাদশভুজ অবলোকিতেশ্বর বা লোকনাথ মূর্ত্তি

দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞান [তিব্বতীয় চিত্রপট হইতে]

নটরাজ



বিষ্ণুমূর্ত্তি পাঁচ গাঁ,



বাসুদেব, বাঘ্‌রা



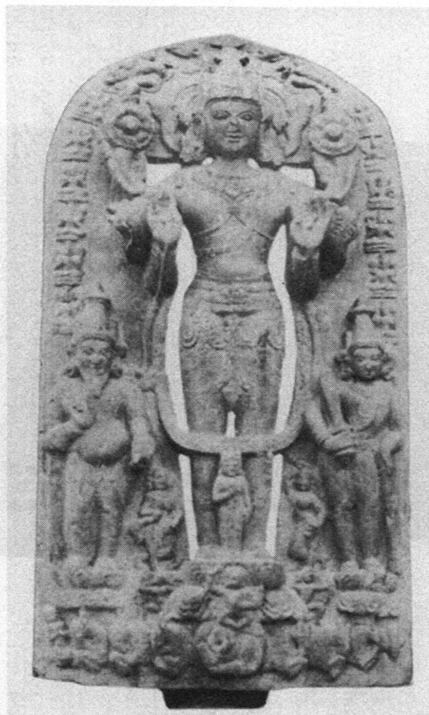
গারুড় গাঁ,



অর্দ্ধনারীশ্বর



বিষ্ণুমূর্ত্তি—টঙ্গিবাড়ী,



দ্বাদশাদিত্যশোভিত সূর্য্যমূর্ত্তি,



নৃসিংহ মূর্ত্তি-টঙ্গিবাড়ী



অষ্টভুজা-মহিষমর্দ্দিনী



তারা



সরস্বতী



সদাশিব মূর্ত্তি